বৃটিশের মুখে প্রায় প্রতিনিয়তই শুনিতে পাই, ভারত সেই পথেই প্রশস্ত হইবে; সুতরাং এক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষে ভারত ত্যাগই ভারতীয় সকল সমস্যার সমাধানের সহজ এবং সার্বভৌম পন্থা। ভারতে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ শোষণসঞ্জাত সামর্থ্যই জগতের প্রবল জাতিগুলিকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। বৃটিশ যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে, তবে অন্যান্য শক্তিও ভারতের স্বার্থ শোষণের জন্য প্ররোচিত [illegible] না এবং বৃটিশের এই সাম্রাজ্য-স্বার্থকে [illegible] করিয়া আন্তর্জাতিক জগতে অশান্তির আবর্ত উঠিবার তেমন আশঙ্কাও থাকিবে না; বিপুল জনবলে জাগ্রত স্বাধীন ভারত জগতে অভিনব নৈতিক শক্তি সঞ্চার করিবে।

কাহারপাড়ার মামলার রায়

চট্টগ্রামের দায়রা জজ শ্রীযুক্ত শৈবাল-কুমার গুপ্ত কাহারপাড়া মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যে ঘটনা হইতে এই মামলার উদ্ভব হয়, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে; কারণ [illegible]দেশে এমন অমানুষিক ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় না। গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রিযোগে ৬ষ্ঠ সংখ্যক গঞ্জাম সিভিল পাইওনীয়ার কোরের সামরিক পোষাক পরিহিত বহুসংখ্যক লোক কামোন্মত্ত অবস্থায় চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কাহারপাড়া গ্রামে হানা দেয়। তাহারা বেপরোয়া মারপিট, লুণ্ঠন, গৃহে পেট্রোল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে এবং নারী ধর্ষণও তাহাদের এই বর্বর অত্যাচারে বাদ পড়ে নাই। ইহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া দুইজন পল্লীবাসী নিহত হয়। উক্ত শ্রমিক বাহিনীর লোকেরা এই পল্লীর একটি রমণীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, প্রথমে এই ব্যাপার ঘটে। ইহা হইতেই পরবর্তী দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লোক গ্রামটি আক্রমণ করে, আমরা সংবাদ হইতে ইহাই জানিতে পারি; কিন্তু দুর্বৃত্তদের সংখ্যা কত ছিল, তাহা জানা যায় না; তবে বাহিনীর কর্ম-চারীদের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রায় ৪ শত লোককে বাহির হইতে ঘিরিয়া লইয়া ব্যারাকের ভিতরে পুরিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র একশত লোককে বিচারার্থ উপস্থিত করা সম্ভব হয় এবং সেই একশতের মধ্যেও মাত্র ৫৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধার্য করা যায়। বিচারে ইহাদের দশ জন বেকসুর খালাস পাইয়াছে এবং ৪৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে। বিচারক অপরাধীদের মধ্যে এক জনের ৬ মাস, ২০ জনের ৯ মাস, দুই জনের দুই বৎসর, এক জনের তিন বৎসর, ২১ জনের পাঁচ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের বিধান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য দুর্বৃত্ত নরপশুরা কোনরূপ [illegible] অত্যাচারই বাকী রাখে নাই, এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রতি এই দণ্ড-বিধান নিতান্তই লঘু হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই মামলায় দোষীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল; কিন্তু তাহারা ধরা পড়ে নাই; আমাদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ ক্ষোভের কারণ। যাহারা ধরা পড়িয়াছে এবং যাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি এইরূপ লঘু দণ্ড বিধান সেই ক্ষোভকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। এই সব ঘৃণিত নরপশুগুলোকে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত ছিল এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ইহাদের এক একজনকে টিকটিকিতে চড়াইয়া বেত্রাঘাতে জর্জর করা হইলে, তবে আমাদের মনের জ্বালা কতকটা প্রশমিত হইত। দায়রা জজ তাঁহার রায়ে ক্যাপ্টেন ইয়ং এবং মিঃ উইলিয়াম নায়েক নামক পাইওনীয়ার বাহিনীর দুই জন কর্মচারীর আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। জজের মতে তাঁহারা আদালতে আসিয়া সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। তাঁহারা ৪ শত লোককে ব্যারাকে লইয়া যান, অথচ ইহাদের একজনকেও তাঁহারা চিনেন নাই; জজ একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমাদের পক্ষে এই বাহিনীর কর্মচারীদের আচরণের সম্বন্ধে নানা রকমের সন্দেহ উঠে; কারণ ৪ শত জন লোক রাত্রিকালে ব্যারাক হইতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিকট ছুটি না লইয়াই বাহিরে আসিল এবং কর্মচারীরা তাঁহাদের একজনেরও নাম জানেন না, ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার। ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারীরা সত্যই আসামীদিগকে সনাক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অসামর্থ্য জানাইয়া অপরাধীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, জজ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমরাও এই দাবী করিতেছি যে, এই সব কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হউক এবং যদি এতৎসম্পর্কে ইঁহাদের দায়িত্বহীনতা বা অপরাধীদিগকে প্রশ্রয় দানের ইচ্ছা প্রমাণিত হয়, তবে তাঁহাদিগকেও যথোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হউক। কিছু-দিন হইতেই দেখিতেছি, সেনা বিভাগীয় এক শ্রেণীর লোকের মনে বেপরোয়া পশু-প্রবৃত্তি একান্তই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই শ্রেণীর নরপশুদিগকে কঠোর হস্তে সায়েস্তা করা একান্তই দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব

আবার বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব উঠিয়াছে। শুনিতেছি, ভারতের বর্তমান প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের সূত্রে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নিকট বঙ্গ ভঙ্গের নূতন একটি পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এবং শ্রীহট্ট এই কয়েকটি অঞ্চল লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিবার কথা হইয়াছে। এইভাবে পাঞ্জাবের পশ্চিম অঞ্চল এবং সিন্ধুদেশ লইয়া অপর একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী প্রবৃত্তি পরিতুষ্ট হইতে পারে, আমরা জানি, তাঁহার চেলার দল এইভাবে পূর্ব-পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থান পাইয়া আনন্দের হুল্লোড় তুলিতে পারেন, আমরা ইহাও স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার এই অনিষ্টকর ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যুক্তিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কিছুতেই সায় দিবেন না। এমন উৎকট প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিমিশনের দায়িত্ব কতখানি আছে, আমরা ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ব্রিটিশ প্রভুরা যেন বিস্মৃত না হন। এই সঙ্গে তাঁহাদিগকে আমরা ইহাও জানাইয়া দিতেছি যে, বঙ্গভঙ্গের যুগের চেয়ে বাঙালী জাতি সমধিক সংঘবদ্ধ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা পূর্বাপেক্ষা জনসাধারণের অন্তরে অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছে; এইরূপ অবস্থায় বঙ্গভঙ্গের কোন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইলে বিশেষ এবং ব্যাপক আকারে অনর্থ দেখা দিবে। বঙ্গভাষাভাষীদিগকে লইয়া বাঙলাদেশ পুনর্গঠিত হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু বাঙলাদেশকে আমরা কিছুতেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হইতে দিব না; কারণ, তাহার ফলে বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস পাইবে এবং বাঙলার জাতীয় জীবন সাম্প্রদায়িকতার বিষে এবং ভেদ নীতির মূলীভূত কূট কৌশল-সৃষ্ট অনৈক্যের প্রভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এইভাবে বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয়-তার মূলে আঘাত করিতে গেলে তুমুল অনর্থ ঘটিবে। বাঙলার তরুণেরা নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে। তাহারা লর্ড মর্লের পাকা ব্যবস্থা কাঁচা করিয়া ফেলে। দেশের জন্য, জাতির জন্য আত্মোৎসর্গের সে অগ্নিময় উদ্দীপনা এবং পশু-শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত দুর্জয় মনোবল বাঙলার তরুণেরা এখনও হারায় নাই। প্রয়োজন হইলে তাহারা এই সত্য ভারতের ভাবী ইতিহাসে শোণিতের অক্ষরে উদ্দীপ্ত রাখিবে এবং অনৈক্য এবং ভেদ নীতির আবর্জনাকে জাতীয়তার আগুনে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। আমরা স্পষ্টভাষাতেই বলিতেছি যে, বাঙলাকে ভাঙ্গিয়া পাকি-স্থান গড়া যাইবে না; পক্ষান্তরে পাকিস্থানের

গঠন পরিকল্পনার গোড়া এই বাঙলা হইতেই উৎখাত হইবে।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে মিঃ শহিদ সুরাবর্দী তাঁহার সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ইতঃপূর্বে মিঃ সুরাবর্দীর অনেক গুণের কথা আমরা শুনিয়াছি এবং বাঙলার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীস্বরূপে তাঁহার বিশেষ বিদ্যাবত্তারও আমরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু উপদলীয় স্বার্থ বাগাইবার জন্য তিনি কিরূপ তৎপর, মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের উদ্যোগে তাহা জানা গেল। মুসলমানদের পক্ষে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র লীগেরই আছে, মিঃ সুরাবর্দী এই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলিতেছেন এবং দেখিতেছি, কংগ্রেসের ভারতের সার্বভৌম আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতেই তিনি একান্ত আগ্রহ-পরায়ণ; বাঙলা দেশের কয়েকটি সমস্যা সমাধানের ভ্রান্ত দোহাই দিয়া তিনি পাকেচক্রে সে কাজটা করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতেছি যে, অন্তত তাঁহার এই কৌশল ধরিয়া ফেলিবার মত বুদ্ধি বাঙালীর মাথায় আছে; সুতরাং তিনি কংগ্রেসকে বাহন করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙালী অনেক মরিয়াছে এবং বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক ছেলেরা দীর্ঘদিন জেলে কাটাইয়াছে, তথাপি বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার নামে কাহাকেও তাহার ব্যক্তিগত বা উপদলীয় স্বার্থ বাঙালী সিদ্ধ করিতে দিবে না; কারণ বাঙালী জানে, প্রকৃতপক্ষে সে পথে বাঙলার অন্ন-সমস্যা দূর হইবে না; পক্ষান্তরে লুণ্ঠন ও শোষণের দুর্নীতির দ্বারই উন্মুক্ত হইবে; সেইরূপ রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির মামুলি অজুহাতেও বাঙালী মুসলিম লীগের অনিষ্টকর নীতিকে প্রশ্রয় দিতে এবং কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত নয়; কারণ বাঙালী জানে, তাহা করিতে গেলে কার্যত বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের নির্যাতন, লাঞ্ছনা এবং কারাক্লেশকেই চিরন্তন করিয়া তোলা হইবে।

ব্রিটিশ প্রভুত্ব অবসানের ইঙ্গিত

মিঃ ফেণার ব্রকওয়ে ইংলণ্ডের ইন্ডিপেন্ডেণ্ট লেবর পার্টির একজন কর্মকর্তা। ইনি বহুদিন হইতেই ভারতের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন নির্ভীকচেতা এবং স্পষ্টবাদী লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সেদিন তিনি বিলাতের একটি সভায় ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বলেন, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সৈনিকেরা যেদিন বিদ্রোহ করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেইদিনই বুঝিয়া লইয়াছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ ফেণার ব্রকওয়ের এই উক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। উপরে উপরে দেখিতে গেলে, ইহাই মনে হইবে যে, ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনাদের বিদ্রোহের উক্ত ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয় এবং সহজেই তাহা দমিত হইয়াছিল; কিন্তু এতদ্দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সেনারা আর ব্রিটিশ শক্তিদের ভাড়াটিয়া সিপাহীর মত চলিতে প্রস্তুত নহে; তাহারা অন্যান্য সব সভ্যদেশের সৈন্যদের মতই জাতির স্বার্থ এবং মর্যাদা বুঝিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছে। বিদ্রোহের এই প্রবৃত্তি বিদেশী শাসকেরা শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিবেন ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু মানবোচিত মর্যাদার দিক হইতে ভারতীয় সেনাদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিদ্রোহের অভিযোগে যুদ্ধের এই কয়েক বৎসরে কতজন ভারতীয় সেনাকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, ঠিক জানা যায় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ফিলিপ ম্যাসন বলেন, যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে ভারতীয় সেনাদলের ৭৮ জনকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে এবং ১৮৫ জনকে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে; ইহা ছাড়া প্রায় ৩৭ হাজার সৈনিককে বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যা তুচ্ছ করিবার নহে। মিঃ ম্যাসনের উত্তরে দেখা যায়, দণ্ডিত সৈনিকদের মধ্যে বেশীর ভাগই নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানিতে পারি নাই; সুতরাং কি জন্য ইহারা এইভাবে নরহত্যা করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল বোঝা সম্ভব নয়। মিঃ ম্যাসন আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, সামরিক আদালতে আসামীদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার যে সব সুযোগ প্রদান করা হয়, এই সব সৈনিকদিগকেও সেগুলি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই জবাবে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারি না। প্রত্যেক আসামীরই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সমস্ত সুযোগ থাকা প্রয়োজন হয়; এই সব বিচারের আসামীরা রুদ্ধ কারাকক্ষের ভিতরে সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিল কি? এই প্রসঙ্গে ভারতীয় উপ-কূলরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত নয় জন বাঙালী যুবকের কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের কাহাকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বাহির হইতে ব্যবহারজীবের সাহায্য গ্রহণের সুযোগ দান করা হয় নাই। বস্তুত ভারতীয় সেনা বিভাগ এখনও বিদেশীর প্রভুত্বে পরিচালিত হইতেছে। এই সব বিদেশীয়েরা সকলে ভারতীয় সেনাদের জাতীয় মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে, ইহা স্বাভাবিক নয়। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি প্রশ্নোত্তরে সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিমানবহরের একজন সিগন্যাল অফিসার কিছুদিন পূর্বে এই আদেশ জারী করেন যে, "তোমরা ভারতীয় ভৃত্যদের সঙ্গে পরিচিত হইলে দেখিবে, তাহাদিগকে তোমার আদেশ মানিতে বাধ্য করিতে হইলে তাহাদিগকে লাথি মারিতে হইবে।" সরকারপক্ষ এই আদেশের সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহারা শুধু এই কথা বলিয়াছেন যে, এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয়, তাহার ফলে আদেশটি প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। সুতরাং সেনা বিভাগের সকল স্তরে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ কিভাবে প্রখর হইয়াছে এতদ্দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়; কিন্তু অধীন জাতির এই মর্যাদাবোধ ইজ্জৎমোহে অন্ধ সকল শ্বেতাঙ্গ সামরিকের পক্ষে বরদাস্ত করা নিশ্চয়ই সহজ নয়; এবং যাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, তাহাদের মনে একটা আক্রোশের ভাবও সৃষ্ট হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্র সিংয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যোগীন্দ্র সিং ভারতীয় সেনা বিভাগের একজন সৈনিক। তিনি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে গ্রীসে যান। গ্রীসে থাকিবার সময় 'মাতাদীন' নামক একটি ছায়াচিত্র তাঁহাদিগকে দেখানো হয়। তিনি এই চিত্রের প্রতিবাদ করেন; কারণ এই ছায়াচিত্রে ভারতবাসীদিগকে বাবুর্চি এবং খানসামার জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে তাঁহার কলহ ঘটে এবং সেই কলহসূত্রে একজন ইংরেজ সেনা নিহত হয়। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং সামরিক বিচারে যোগীন্দ্র সিং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। বর্তমানে তিনি লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ আছেন। যোগীন্দ্র সিংহের অপরাধের সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাহি না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ যেমন জাগ্রত হইয়াছে এবং বিদেশী প্রভুত্বের পরি-প্রেক্ষিতে তাহাতে কিরূপ সমস্যার কারণ ঘটিয়াছে, আমরা সেই কথাই বলিতেছি। ভারতীয় সেনা বিভাগের লোকেরা সাধারণত অপরাধপ্রবণ নহে। নিয়মানুবর্তিতার জন্যই এতদিন তাহারা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জন করিয়া আসিয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের অবস্থা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ এতগুলি সৈনিক কিভাবে খুনের অভিযোগে পড়িল, তাহা জানিবার জন্য দেশের লোকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

লৌহ শিল্পের প্রসার ও লৌহের ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতীয় লৌহশিল্পের ইতিহাস এবং তাহার প্রসারের পথে নানা অন্তরায়ের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। স্বাধীন দেশ হইলে ভারতে যে সকল বেসরকারী চেষ্টা হইয়া বিফল হইয়া গিয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না; সরকারী সাহায্য আসিয়া তাহাকে উন্নতির পথে ঠেলিয়া দিত।

ভারতবর্ষে তাহা যে হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু যতটুকু বাধানিষেধ উপস্থাপিত করা যায়, তাহাতে কোনও ত্রুটি হয় নাই। বিদেশী বণিকের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের দেশে আইনকানুনে বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার মধ্যে যে দোষ মজ্জাগত তাহা দূর করা দুঃসাধ্য।

ভারতের নবজাগরণের পথে সাক্ষাৎ সরকারী সাহায্য না পাওয়া গেলেও অপরাপর স্বাধীন দেশে নিজেদের শিল্পরক্ষার জন্য যে পথ অবলম্বন করে, তাহার জন্য ভারতবর্ষেও প্রচণ্ড দাবী উত্থাপিত করা হয়। তাহার ফলে যে সুবিধালাভ করা যায়, তাহা দিয়াশলাই, চিনি, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের সহিত লৌহ শিল্প লাভ করিয়াছে। বরং বলা উচিত, লৌহশিল্পই এ বিষয়ে প্রথম স্থান ধরিয়াছে।

সংরক্ষণ ও সাহায্য

টাটা কোম্পানীর উদ্ভব সম্বন্ধে বলিবার সময় লৌহ-শিল্পের উপর সংরক্ষণ শুল্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্য না পাইলে ভারতের লৌহ-শিল্পের বিস্তারের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ১৯২১ সালে মার্চ মাসে ইণ্ডিয়ান ফিস্কাল কমিশন বা ভারতীয় অর্থনৈতিক পরামর্শ সভা নির্বাচিত হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় আইন পরিষদে প্রয়োজনানুসারে আমদানী শুল্কের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোনও শিল্পের রক্ষণ শুল্কের দাবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী এক ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্ক নির্ধারণ সমিতি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে এই সমিতি জন্মলাভ করে।

ট্যারিফ বোর্ডের নিকট প্রথমেই লৌহ-শিল্পের দাবী উপস্থাপিত করা হয়। বহু আলোচনা চলে; সমস্ত বিষয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯২৪ সালে ইস্পাত-শিল্প রক্ষণ আইন Steel Industry Protection Act, 1924.) প্রবর্তিত হইয়া যে সকল ভারতীয় ইস্পাতের সহিত বিদেশী দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সেইরূপ ইস্পাত দ্রব্যের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক স্থাপিত করা হয়।

নগদ সাহায্য বা "বাউণ্টি"

এইরূপ শুল্কের সাহায্য পাইয়াও লৌহ-শিল্পের বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নাই, সেইজন্য নগদ টাকা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ১৯২৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি টনে ১২, টাকা হিসাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা এবং মোট ১৬ লক্ষ টাকার অনধিক দিবার ব্যবস্থা হয়।

১৯২৪ সালে তিন বৎসরের জন্য রক্ষণ শুল্ক আইন পাশ হইয়াছিল। ইহার পরও রক্ষণ শুল্কের প্রয়োজনবোধ হইতে লাগিল এবং ১৯২৭-২৮ হইতে ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত কার্যকাল প্রসার করিয়া ১৯২৭ সালে ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণ আইন পাশ হয় এবং এখন হইতে নগদ সাহায্য বা "বাউণ্টি" রদ করা হয়।

বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৯৩০ সালে সীসামাখা চাদর-(Galvanised sheets) শিল্প সরকারী রক্ষণ-শুল্কের সাহায্য গ্রহণ করে (প্রতি টন চাদরের উপর ১৯২৭ সালের ৩০ টাকা স্থলে ৬৭ টাকা করা হয়) ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ রাখিবার ব্যবস্থা হয়।

এত সত্ত্বেও টাটা কোম্পানী নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিল এবং ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ১লা এপ্রিল ১৯২৭ হইতে টাটা কোম্পানীর নিকট ভারত সরকার টনে ১১০ টাকা হারে সাত বৎসরের জন্য রেলের লাইন ক্রয় করিবার চুক্তি সম্পাদন করে। তাহাতেও নানা অসুবিধা হওয়ায় গভর্নমেণ্ট হইতে টন প্রতি আরও ২০ টাকা বেশী দিতে স্বীকার করা হয়।

১৯৩০ সালে যে আইন পাশ হয়, তাহা ২৯শে মার্চ হইতে বলবৎ হয়; ইহাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকারের বিদেশী মালের উপরও রক্ষণ-শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় ইস্পাত-শিল্প আরও সুযোগ লাভ করে।

১৯৩১ সালের Indian Finance (Supplementary and Extending) Act, 1931—নূতন আইনে আমদানী শুল্কের উপর শতকরা ২৫ টাকা হার বৃদ্ধি করা হয়; সুতরাং উত্তরোত্তর বিদেশী মাল আমদানীর অসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩৪ সালে ৩১শে মার্চ তারিখে রক্ষণ শুল্কের সমস্ত আইনের কার্যকাল শেষ হইবার কথা; অথচ গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় কার্যকাল (Steel and wire Industries Protection Extending Act, 1934.) ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৩২ সালে তার এবং তারের পেরেক (Wire and Wire Nails Industries) শিল্প রক্ষণ শুল্কের সাহায্য লাভ করে এবং উহারও কার্যকাল ১৯৩৪ সালে ৩১শে মার্চ শেষ হইবার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৩৪ সালে ট্যারিফ বোর্ড পরিবর্তিত আকারে রক্ষণ শুল্কে বহাল রাখিবার সুপারিশ জানায়। তখন গভর্নমেণ্টে লৌহ দ্রব্যের উপর ঘরোয়া শুল্ক (Excise duty) চাপাইবার প্রস্তাব করে এবং প্রতি টনে চার টাকা করিয়া শুল্ক ধার্য হয়। ১৯৩৪ সালে নূতন আইন (The Iron and Steel duties Act, 1934.) পাশ হয় এবং এখন হইতে আমদানী শুল্কের উপর অতিরিক্ত (surcharge) শতকরা পঁচিশ টাকা আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

লৌহ-শিল্পের সহিত সীসামাখা চাদর (Galvanised sheets) ঢালাই পাইপ (cast iron pipes) ও তার ও তারের পেরেকের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ঢালাই পাইপের প্রকাণ্ড দুইটি কারখানা চলিতেছে এবং প্রয়োজনের অনুপাতে আরও বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। দেশে যখন প্রচুর পিগ্ আয়রণ জন্মিতেছে, তখন লৌহের সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি যে তৈয়ারী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে লৌহের সঙ্গে নানাপ্রকার খাদ—যথা ম্যান্‌গানিজ, ক্রোমিয়ম, টংস্টেন, ভ্যানেডিয়ম, মলিবডেনম্ প্রভৃতি মিলাইয়া বহুপ্রকার এবং বিবিধ গুণশালী লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। এতদিন যে হয় নাই, ইহাই এখন আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অস্ত্র-শিল্পের সম্ভাবনা

যখন এই সকল লৌহ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন দেশে প্রকাণ্ড অস্ত্র-শিল্প গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু যে জাতির সমস্ত কর্ম অপরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়, সে জাতির পক্ষে অস্ত্র-শিল্পের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অস্ত্র-শিল্প ছাড়া জাহাজ, মোটর ও অন্যান্য যান সংক্রান্ত শিল্প গড়িয়া উঠিবার কথা। সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী স্বার্থে তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। আবার যুদ্ধের চাপে সেই সকল শিল্পের জন্য সরকার হইতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এখন ইংরেজের গরজ, হয়ত কিছুদূরে অগ্রসর হইতে পাইবে; তাহার পরও যদি রুশ কর্তৃক ভারত আক্রমণ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ভারতে অস্ত্র-শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

লৌহ বনাম ইস্পাত

ইস্পাতের সৃষ্টি অতি সহজ হইয়া যাওয়ায় লৌহ আজ অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও বলিতে হয়, লৌহ একেবারে বিতাড়িত হয় নাই। লৌহের সুবিধার মধ্যে দেখিতে পাই যে, যখন কাজ চলিতেছে, তখন তাহাকে বারে বারে গরম করিয়া পিটিতে থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং তাহা উত্তরোত্তর শক্তিমান হইতে থাকে, সুতরাং কামারশালে কাজ করিবার পক্ষে ইহাতে বিশেষ সুবিধা। সংযোগ বা জোড়াই কার্যে লৌহই প্রশস্ত; সংযুক্ত পদার্থের শক্তি সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভর করা যায়। আরও দেখা যায় যে সব বয়লারে বাষ্প বা ষ্টীম উৎপাদিত হয়, তাহার অধিকাংশই লৌহ হইতে সৃষ্ট; বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইস্পাত অপেক্ষা লৌহ দ্বিগুণ বা তিনগুণ স্থায়ী। ইস্পাত উত্তপ্ত অবস্থায় জলের সংস্পর্শ সহ্য করিবে না।

ইস্পাতের স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে। ইহা দামে সস্তা এবং অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার খাদ মিশ্রণে তাহা নূতন শক্তি লাভ করিয়া থাকে। 'পিন' দিয়া জোড়া বা রিভেট না করিয়া প্রকাণ্ড আকারের পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং লৌহশিল্পে দুইপ্রকার বস্তুরই যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহারের কথা লিখিতে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; ব্যবহার তালিকা কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ করা যাইবে, তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তার কথা। যাহা দামে সস্তা, ইচ্ছামত যাহাকে ঢালাই করা যা[illegible] সূক্ষ্ম তার, পাত, অথবা যে কোনও রকম আকৃতি, প্রয়োজনমত তীক্ষ্ণতা গ্রহণে যাহা সমর্থ; যাহাকে বাঁকাইয়া মোচড়াইয়া আকৃতি দিতে তাপের সাহায্যই যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; যাহাকে আকারে বিরাট হইতে অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় সহজেই পরিণত করা যায়; আকৃতির অনুপাতে অন্য যে কোনও ধাতুর সহিত শক্তির বিচারে যাহাকে সহজেই তুলনা করা যায়; তাহা যে জগতের প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপরাপর ধাতু বা অন্যান্য খনিজের সহিত মিশ্রণে লৌহের কাঠিন্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে সাধারণ লৌহ যে সকল কার্যের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেরূপ স্থানেও নবকলেবর প্রাপ্ত লৌহ আপনার আসন আপনিই বাছিয়া লইয়াছে।

গঠন সংক্রান্ত দ্রব্য

লৌহ ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে যাহা সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা দিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু সে বস্তুটি যে কি তাহা লইয়াই সমস্যা। আকার ধরিয়া হিসাব করিলে গঠন সংক্রান্ত দ্রব্যাদির কথা মনে করা যাইতে পারে। লৌহ না থাকিলে বর্তমানের বৃহদাকার পুলের কথা স্মরণ করা যাইত না; সভ্যতার গতি অনেক পরিমাণে হ্রস্ব বা লঘু হইয়া পড়িত। আধুনিক সভ্যজগতের ঘরবাড়ি হইতে আকাশচুম্বী স্তম্ভ, (যথা আইফেল টাওয়ার) গৃহাদি (Skyserapers) কিছুই সম্ভব হইত না।

যান

আজ জগতের গতি নির্ভর করিতেছে, লৌহের উপর। এখানকার কোন যানই লৌহ ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় না। বাষ্পীয় রথ বা রেল অর্থাৎ ইঞ্জিন, গাড়ির মূল কাঠাম (platform), চাকা, মাটীতে পাতার রেল বা পথ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় যাহা কিছু লৌহ ছাড়া কিছুই নয়। বৃহদাকার জলযানের জন্য লৌহের চাদর না হইলে চলিতে পারে না; মোটর, সাইকেল প্রভৃতি সকল কাজেই লৌহ চাই।

যুদ্ধাস্ত্র

আকার হিসাবে যুদ্ধাস্ত্র বা মারণযন্ত্র নিতান্ত হেয় নয়। কামান, গোলা, গুলী, বোমা, মাইন, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, বিমানপোত লৌহ সংক্রান্ত বস্তু। তন্মধ্যে শেষের দুইটিতে হয় লৌহমিশ্রিত কঠিন অথচ হাল্কা চাদর অথবা কাঠ আসিয়া দেখা দিতেছে। যাহাই হউক, অজস্র লোক মারিবার জন্য লৌহই প্রধান

যন্ত্র, বয়লার প্রভৃতি

লৌহের প্রভাবে যন্ত্রপাতির (machinery) বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। সকল প্রকার যন্ত্রের তালিকা দেওয়া কখনই সম্ভব নহে। এই সকল যন্ত্র চালাইবার শক্তি সৃষ্টি করিতে যে বয়লার প্রভৃতি লাগে, তাহা লৌহের পাত হইতে উদ্ভূত। যন্ত্র তৈয়ারী করিতে যে যন্ত্রের দরকার, তাহাও লৌহমাত্র। [illegible] চাদরের অন্য যে কাজই থাকুক, তাহা "ঢেউ খেলান" (Corrugated) আকারে আমরা পাইয়া গৃহনির্মাণে লাগাইতেছি। ঘর ছাউনিতে আগে যাহা লাগিত, অর্থাৎ খড়, উলু, গোলপাতা, চাঁচ, পাট কাঠী, নারিকেল ও তালপাতা, নারিকেল কাঠি, খোলা, টাইল, পাকা-ছাদ প্রভৃতি তাহা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। বড় কারখানার ছাউনীতে এখন "করগেট" লৌহই প্রধান সহায়।

হাতিয়ার ও তৈজস

ছোটোখাটো হাতিয়ার (Tools and implements) লৌহের সমাবেশ। ঘরের তৈজসপত্রের মধ্যে লৌহের সহিত অপরাপর ধাতব পদার্থের কিছু কিছু ভাগাভাগি আছে, কিন্তু যাহার আধার বড় এবং কিছুদিন ধরিয়া কাজে লাগিবে তাহা লোহার পাত বা চাদর। জলের ট্যাঙ্ক তৎসংযুক্ত পাইপ বা নল, দেয়ালের গায়ের বৃষ্টির জল নামিবার পাইপ, কড়া, চাটু, বেড়ী, হাতা, খুন্তি সবই লোহার। এনামেল বা কলাই করা বাসনের মধ্যে লোহার অংশ বেশী; লোহা সেখানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। টিনের কানাস্তারা বা টিনের কৌটা বলিয়া আমরা টিন বা রাঙকে অযথা প্রাধান্য দিয়া থাকি; কিন্তু সেখানে লোহাই সব, রাঙের সংস্পর্শ আছে মাত্র।

তার, পেরেক, স্ক্রু, বালতি, তালা, চাবি; খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, আসবাব, তৈজস প্রভৃতি সকল রকম মিলিয়া আমরা লোহার শৃংখলে বাঁধা পড়িয়াছি। কর্তন যন্ত্রের সবই লোহা; মোটা দা, কুঠার, করাত, বঁটী হইতে ছুরি, চাকু, ক্ষুর, কাঁচি, টেবিলের শোভা, চামচ, কাঁটা, অস্ত্রচিকিৎসার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লৌহেরই বিভিন্ন সংস্করণ। আমরা ইহার বিচিত্র রূপের মাত্র খানিক পরিচয় আমদানী তালিকা হইতে পাইয়াছি।

রাসায়নিক পদার্থ

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে লৌহ আজ বহু আকৃতি ধারণ করিয়া জগতের কাজে লাগিতেছে। প্রাকৃতিক লৌহ অক্সাইড, রবার, পেণ্ট, মেঝ প্রভৃতিতে লাল রঙ করিতে মিশ্রিত করা হয়। প্রাকৃতিক লৌহ অক্সাইড-গ[illegible]ধক দূর করিবার জন্য

কাঠের গুঁড়া বা র‍্যাঁদা চাঁচা কাঠের সহিত মিশাইয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা আছে।

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে; তাহা মোটামুটি রঙ (Paint) বা রঞ্জনের (Dye) কাজে লাগে। 'প্রসিয়ান ব্লু' (Prussian blue) নামক সুন্দর নীলবর্ণ পাইতে ফেরিক ফেরোসায়েনাইড ব্যবহৃত হয়। ফটোর ছবি এবং ব্লু-প্রিণ্টিং*-এর জন্য ফেরাস অক্সালেট ও ফেরিক সোডিয়ম অক্সালেট এবং কেবল ব্লু প্রিণ্টিং-এর জন্য ফেরিক এ্যামোনিয়ম অক্সালেট ও ফেরিক সাইট্রেট লাগে। ইহার মধ্যে ফেরিক এ্যাসিটেট ও ফেরিক সাইট্রেট ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কাপড় প্রভৃতি ছাপাই কাজে রঙ ধরাইতে ফেরিক এ্যাসিটেটের অপর ব্যবহার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চামড়া, লোম, পালক প্রভৃতি রঙগীন করিতে ইহার সাহায্য লইতে হয়। কাষ্ঠ সংরক্ষণে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই। ফেরিক ক্লোরাইড অপর এক অতিপ্রয়োজনীয় পদার্থ। কাচ ও চীনা মাটীর পাত্র তৈয়ারী করিতে ইহা বিশিষ্ট বর্ণ দিয়া থাকে; রঞ্জনের কার্যে ইহার প্রয়োজন; চর্বি ও তৈল শিল্পে রঙ (Paint) ও বার্ণিস শিল্পে এবং শান পাথর মাজাঘষা কাজে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের সাহায্যকারী (Catalytic Agent) বা অনুঘটক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে এবং ফটোর কাজে সামান্য পরিমাণে লাগিয়া থাকে। ফেরাস-এ্যাসিটেট, ফেরাস-ক্লোরাইড প্রভৃতি লোহের আরও বহুপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ বাহির হইয়াছে এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যবহার জানা গিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার বিবরণ একান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধে দেওয়া হইল না।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া আয়ুর্বেদে লৌহ ব্যবহার হইতেছে আজ সঠিক কাল নির্ণয় করিয়া বলা বড় কঠিন ব্যাপার। লৌহ ভস্ম * করা এবং তাহা রোগ নিরাময় করিবার অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিলাইয়া ব্যবহার আবহমান প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, লৌহ সংযুক্ত আরও বহু প্রকার ঔষধাদি প্রচলিত আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত সংখ্যা দুই শত পঁয়ষট্টি।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে লৌহ-ঘটিত নানা ঔষধ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ অম্ল (mineral acids), উদ্ভিজ্জ অম্ল (Organic acids) ও অঙ্গারাম্ল, অক্সিজেন, ব্রোমিন ও আওডিন সহ‡ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও লৌহের নানারূপ ব্যবহার আছে।

লোহের গাদ

লোহের ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণভাবে বলিতে গেলে লৌহ নিষ্কাসনের সময় যে গাদ বাদ যায়, তাহার ব্যবহারের কথা মনে রাখা দরকার। প্রধানত ভাল রাস্তা করিতে বা সিমেণ্ট পাথর জমাইয়া (Concrete) "কংক্রুট" করিতে বা সিমেণ্ট প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। রেল লাইনের গায়ে যে পাথরের টুকরা দেখা যায়, তাহার জন্য পাথর কাটা এবং ভাঙ্গা প্রয়োজন হয়। অথচ তাহা স্বস্থানে থাকিলে কাহারও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। সেই পাথরের পরিবর্তে লোহার গাদের টুকরা ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। কর্মশক্তি হিসাবে দুই-ই এক। অথচ এই গাদ বিনা ব্যবহারে যদি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কারখানার ধারে ধারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান আবদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এই "গাদের পাহাড়" দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই পর্বত-প্রমাণ গাদ সরল সহজ কাজ চালাইবার পক্ষে, লোক, মালপত্রাদি চলাচলের পক্ষে কত বিরাট অন্তরায়। সুতরাং পাথরের পরিবর্তে গাদ ভাঙ্গিয়া চালাইলে কেবল যে পাথর বাঁচিয়া যায় তাহা নয়, লোহার গাদ সরিয়া গিয়া জায়গা খালি হইয়া কাজের সুবিধা হয়।

*প্রধানত বাড়ী পুল প্রভৃতির নক্সা (Plan) কাপড় কাগজ প্রভৃতির উপর আঁকিয়া নিখুঁত রাখিবার জন্য যে নীল কাগজে ছাপ তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে ব্লু-প্রিণ্টিং বা "নীল-ছাপ" বলা হয়।

* লৌহকে উত্তপ্ত অবস্থায় পিটিয়া খুব পাতলা পাত করিয়া, তাহা এক একবার উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র (চোনা ও কুলথ কলায়ের কাথে ভিজাইতে হইবে। এই প্রক্রিয়া তিনবার পালিত হইলে লৌহ শোধিত হইল। শোধিত লৌহ গোমূত্র সহ মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিতে হয়। বারংবার গজপুটে দগ্ধ হইবার পর যখন অঙ্গুলি পেষণে প্রাপ্ত চূর্ণ বেশ মসৃণ বলিয়া মনে হয়, তখন লৌহ প্রকৃত ভস্ম হইয়াছে বলা হয়।

§ ফেরি সলফ্, ফেরি-ফস্ফেট, ফেরি-পারক্লোর ইত্যাদি।

† ফেরি-সাইট্রাস, ফেরি-টার্টারাস।

‡ ফেরাস্ ব্রোমাইড, ফেরাস আয়োডাইড, ফেরাস অক্সাইড, ফেরি কার্ব প্রভৃতি।

স্মৃতির মূল্য

অস্কার ওয়াইল্ড

স্বামীহারা শোকাকুলা বিধবা।
কি নিয়ে কাল কাটাবে?
সম্মুখে দীর্ঘ জীবন।
সবাই উপদেশ দিলে—
"জীবন ভ'রে স্বামীর ধ্যান কর।"
চ'ললো ধ্যান।
ধ্যানে নানা বাধা।
তাই স্বামীর একখানা তৈল-চিত্র তৈরী হোল।
তাকে সামনে রেখে ধ্যান হয়।
সকলেই বলে—"সুন্দর ছবি, খাসা ছবি, নিখুঁত ছবি।"
বিধবাও বলে—"সুন্দর ছবি",—
আর কাঁদে।

* * * * * *

দিন যায়।
চিত্রকর আরো ছবি আঁকে।
বিধবাকে দেয়। আগের ছবির
চেয়েও সুন্দর। জীবন্ত,—
চোখে যেন ভাষা ফুটে উঠেছে।
বিধবা চিত্রকরকে দেয় পুরস্কার।
নিজে ছবি আঁকা শেখে।
দিন যায়। কতো ছবি তৈরী হয়।
বন, প্রাসাদ, পাখী, ফুল, বাগান,
মানুষ—স্বামী।
ঘরে কতগুলি আবর্জনা জমে ছিল।
সেগুলোকে বিধবা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার
করলে। জঞ্জালের সাথে ফেলে
দিলে স্বামীর পুরোনো একখানা
মলিন ফটোগ্রাফ।
ওখানার আর এখন
প্রয়োজন নেই।

অনুবাদক—শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য, বি-এ

ইহ
কাবে
সম্বে

শহরের রাস্তায় বিহারী দাস রায়
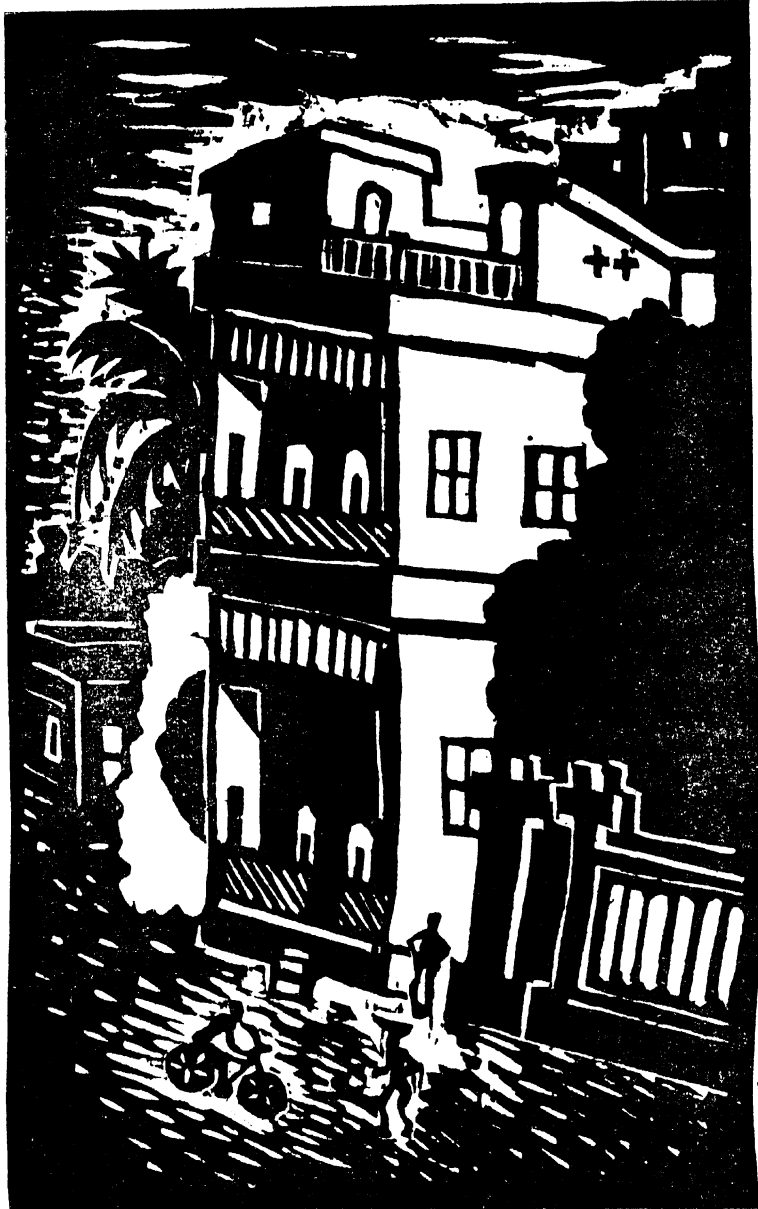
অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পরিবর্তন

সঞ্জয়কে মীনা চিনতে পারলে না। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক পরিবর্তনই ঘটে—বিশেষ করে মেয়েদের।

সঞ্জয় এখন কী করবে? নিঃশব্দে এখান থেকে সে কী বেরিয়ে যাবে? মীনা তাকে চেনে না; সুতরাং চাকরিটা পাবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

তবুও সঞ্জয় একবার শেষ চেষ্টা করে—যদি কোনরকমে বিস্মৃতিকে তার স্মৃতির ফলকে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। অনেক আশা নিয়ে সে মীনার কাছে এসেছিল—চাকরিটা তার এর আগে পর্যন্ত হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল। মীনার স্বামী যখন মেজর রাণা তখন এ চাকরি তার অবশ্যম্ভাবী। আর মীনা? মীনা কে সে জানে—মীনাক্ষী রায়—স্ব

অনু

তার খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ভেবে
সঞ্জয়—তাকে দেখে মীনা খুশীই হ
পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে সে
খুবই আপ্যায়িত করবে। কিম্বা অনু
প্রকাশে যদি বাধা থাকে তাহলে অনু
প্রকাশে কোন কার্পণ্য থাকবে না নিশ্চয়ই। ত
এ এমন বেশি কী প্রত্যাশা? উপকা
বিনিময়ে খানিকটা প্রত্যুপকার প্রার্থনা মাত্র।

কিন্তু মীনা তাকে চিনতেই পারলে
চাকরি না হলেও হয়ত তেমন কিছু দুঃ
কারণ থাকত না। মহানগরীর রৌদ্রতপ্ত রা
পথের সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় আছে। বে
জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কয়েক বছ
স্বচ্ছন্দতায় সে একেবারে ভুলে যায়নি। তি
টাকার কেরাণী জীবন তখনকার দিনের
ঈপ্সিত বস্তু! কেরাণী যূপকাষ্ঠে আত্মব
দেবার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা বাঙালী শি
মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের! সাপ্লাই আর রে
এ আর পি আর কনট্রাক্টরির দৌলতে ম
যুদ্ধের আওতায় দুর্ভিক্ষের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দে
এমন যোগাযোগ তখনকার দিনে কল্পন
করা যেত না।

সঞ্জয়ই তো তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে
পাঁচ বছরের পঁয়তাল্লিশ টাকার কেরাণীগি
বাঁধাধরা জীবনযাত্রাকে। একশো পঁচিশ থে
তিনশো পঁচিশে উঠতে মাত্র তার লেগে
তিনটি বছরের ব্যবধান। সাপ্লাই অফিসে সা
সেজে সে কর্তৃত্ব করেছে, লাঞ্চ খেয়েছে, কণ্ট্রা
বন্ধুদের মোটরে চড়েছে, বালীগঞ্জের তিন
ফ্ল্যাটে জীবনকে সে রসিয়ে রসিয়ে উপভো
করেছে। অজ পাড়া গাঁ থেকে স্ত্রী, প
পরিবার নিয়ে এসে খাঁটি ক্যালকেশিয়ান জী
যাপন করে মহাযুদ্ধকে সে আশী
জানিয়েছে। আর তখনকার দিনে মীনা
রায়ের মতন অনেক মেয়ে তার দরজায়
দিয়েছে। আর সকলের কথা থাক—মী
কথাই সঞ্জয়ের সবচেয়ে মনে পড়ছে এখন।

সঞ্জয়ের বন্ধু আশু লাহিড়ী মীনা
নিয়ে এলো একদিন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাঙ
তখন হাহাকার এমনি উঠেছে—চল্লিশ ট
চালের মণ। একবেলা আহার করে, ফ্যান খে
মধ্যবিত্ত পরিবার কোনরকমে বেঁচে আ
আর দরিদ্র চাষী, ক্ষুধাকাতর জনসম্প্র
বুভুক্ষু নিরন্ন হয়ে রাস্তায় মৃত্যু বরণ কর
সহরের রাজপথ ঘিরে মৃত্যুর মিছিল—বাঙ
পল্লীতে পল্লীতে অনাহারের মড়ক। যে যে
করে পারছে জীবিকার সংস্থান করছে। ন
নীতি, সমাজ, ধর্ম, আদর্শ—মানুষের ক্ষু
কাছে সব কিছুই হার মেনেছে। ছেলে
সঙ্গে মেয়েরাও নেমেছে জীবনের রাজপথে
পাথেয় সঞ্চয়ে আজ ঘরের বাইরে তাদেরও
পড়েছে। বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবা
মেয়েরা তখন তাদের স্কুল, কলেজে

বিদ্যাকে ঝালিয়ে নিয়ে সাপ্লাই, এ আর পি আর যুদ্ধের অফিসে ভীড় বাড়িয়ে তুলেছে।

মীনাক্ষী রায় তাদেরই একজন।

আশু লাহিড়ী এসে সঞ্জয়কে ধরলে—তুমি তো একজন কেষ্টবিষ্টু লোক হে! দাও না মেয়েটির একটা হিল্লে করে। আমার ছাত্রী—সত্যিই অভাবে পড়েছে; মীনার সেই দৃষ্টিধারা সঞ্জয়ের এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। গোধূলির অবসন্ন সন্ধ্যায় সেখানে ক্লান্তির রেখা—জীবনে তার গভীর হতাশা।

আশু লাহিড়ীকে সঞ্জয় জানালে—চাকরি অবিশ্যি হতে পারে; কিন্তু তাহলে তো পড়াশুনা ছাড়তে হবে।

আশু লাহিড়ী উত্তর দিলে—পড়াশুনার আর দরকার নেই—এখন বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়। মীনাও সে কথা সমর্থন করে কুণ্ঠিতভাবে অনুনয় জানালে—বড্ড উপকার হবে আমার। দেশে বুড়ো বাপ মা—সংসারে উপার্জনক্ষম আর কেউই নেই। কি হার্ড টাইম বুঝতে পারছেন তো!

অফিসের মাদ্রাজী সাহেব সঞ্জয়ের হাতধরা। তার সুপারিশে মীনার চাকরি হয়ে গেল—পঁচাশী টাকার কেরাণীগিরি। মীনা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল—কী উপকারটা যে করলেন তা আর কী বলবো!

অনেকবার সঞ্জয়ের বাড়িতেও সে এসেছে। পঁচাশী টাকাতে মাত্র দুমণ চাল পাওয়া যায় অথচ সংসারের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। সেই দুর্দিনে সঞ্জয় তাকে আরও অনেক প্রকারে সাহায্য করেছে!

কিন্তু আশ্চর্য আজ আর মীনার স্মরণ হচ্ছে না তাকে—তার সেই দুর্গত দিনের সাহায্যকারী বন্ধু সঞ্জয় সরকারকে আজ আর তার মনেই পড়ে না?

কেমন করেই বা পড়বে? ঘটনার স্রোত এখন ভিন্ন পথে। মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে শান্তির চেয়ে অশান্তির প্রকোপই বেশি। সাপ্লাই অফিসের দরজা বন্ধ হয়ে আসছে। এ আর পি'র দল ক্ষুধাকাতর। যুদ্ধের দরুণ সাময়িক অর্থস্ফীতিতে ঘাটতি পড়েছে প্রচুর। বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে চলেছে বেড়ে। সর্বনাশা যুদ্ধের পরিণামকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। পথে পথে কর্মখালি আজ দুর্লভ।

তিনশো পঁচিশ টাকার চাকরি সঞ্জয়ের একদিনেই চলে গেল। চলে গেল জীবনের সে ঐশ্বর্যের দিন—হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যে দিন আলোকোজ্জ্বল ছিল। বালীগঞ্জের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হল। স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে আবার পাঠিয়ে দিতে হল ম্যালেরিয়ার দেশে। মেসের অখাদ্য খেয়ে লাঞ্চ খাওয়াব দিনকে আজ ভুলে যেতে হয়েছে সঞ্জয়ের। সকাল বিকালে টিউশনি করা— সেখানেও প্রবল প্রতিযোগিতা। সকাল বেলা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সারা দুপুর তার উমেদারীতে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

আর মীনাক্ষী রায়?

ভাগ্য তার হঠাৎ খুলে গেছে। এই যুদ্ধই তাকে এনে দিয়েছে জীবনের নতুন সম্পদ। সাপ্লাই থেকে রেশনে—রেশন থেকে কেমন করে না জানি মেজর রাণার সহধর্মিণী হয়ে বসলো সে। কোন পার্টির জলসায় নাকি তাদের দুজনের মধ্যে দেখাশুনা হয়। মীনার গানে মুগ্ধ হয়ে মেজর রাণা তাকে প্রেম নিবেদন করে। অর্থ প্রাচুর্যের লোভে মীনাও তাকে বিবাহ করার প্রস্তাবে রাজী হয়। পাঞ্জাবের কোন গণ্ডগ্রামে রাণার অশিক্ষিতা স্ত্রী বর্তমান—রাণা তার প্রতি বিমুখ; কেননা জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গেই সে অশিক্ষিতা মেয়ের কোন পরিচয় নেই। মীনাকে নিয়ে রাণা নতুন করে ঘর বাঁধবে।

কাগজে কাগজে তাদের বিয়ের সংবাদ প্রকাশিত হল।

আশু লাহিড়ী এসে সংস্কারের দোহাই দিয়ে অনেক গালমন্দ দিয়ে গেল—জীবনে সে আর অমন মেয়ের মুখ দেখবে না।

আশু লাহিড়ী তার মুখ না দেখুক, তাতে মীনার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোডের পর মস্ত চকমেলানো প্রাসাদ—প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ঘিরে কেয়ারী করা ফুলের বাগান—টেনিস লন—সঞ্জয়ের মতন এ দৃশ্য দেখলে আজ আশু লাহিড়ীরও নিশ্চয়ই মনে ঈর্ষা জাগতো।

গ্রীণ রঙের প্রকাণ্ড বুইক 'কার'খানা রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যখন তখন দেখা যায় মেজর রাণার স্ত্রী মিসেস মীনাক্ষী রাণার চোখে মুখে জীবন-ক্লান্তির এতটুকু ছেদ পড়েনি।

শিলপ ঘুরে এলো—এ নামের লোককে মেম-সাহেব চেনেন না।

সঞ্জয় তখন নামটা পালটে লিখলে—আশুতোষ লাহিড়ী। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় মহামান্যা মিসেস রাণা যদি অনুগ্রহ করে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সে দর্শনপ্রার্থী।

সঞ্জয় শুধু দেখতে চায় মীনাকে—জীবনের ভাঙা ঘাটের পদচিহ্নগুলিকে কেমন করে সে নিঃশেষে মুছে দিতে পেরেছে! আর সঞ্জয় সরকারকে ভোলবার সঙ্গে সঙ্গে তার গুরু আশু লাহিড়ী, তার দরিদ্র মাতা পিতা, দুঃখ-পীড়িত বাঙলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সব কিছুই সে ভুলতে পেরেছে কিনা!

এরপর আর সঞ্জয় তার চাকরির কথা বলবে না—বলবে না তার বর্তমান জীবনের কাহিনী। সে এখন স্কুল-মাস্টার; সভানেত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব নিয়ে সে শুধু এখানে উপস্থিত হয়েছে মাত্র।

মেজর রাণার সঙ্গে নেমে এলো মীনাক্ষী রাণা। টয়লেটের উগ্র গন্ধে সারা ঘরখানি আমোদিত হয়ে উঠলো।

বসবার সময় তার নেই—পেণ্ট করা মুখখানিতে আর বাঙালী মেয়ের লাবণ্য চোখে পড়ে না। সাড়ির শালীনতাকে পরিত্যাগ করে লম্বা ট্রাউজার পরেছে সে। এখনি নাকি কোন নাচের পার্টিতে যোগদান করতে হবে। পাঞ্জাবী বেশভূষায় চেহারার সঙ্গে মনের পরিবর্তনকে তার সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়ালেও মেজর রাণার কটিবন্ধ হাতখানাকে মীনা টেনে নিলে না, শুধু স্বল্প মাথা হেঁট করে অভিবাদনের প্রতিদান জ্ঞাপন করলে সে।

আমায় হয়ত চিনতে পারছেন না? সঞ্জয়ের কণ্ঠ থেকে দ্বিধা এবং কুণ্ঠার সুর ফুটে উঠলো।

মীনা বেশ স্পষ্টভাবে উত্তর দিলে—I don't remember so.

সঞ্জয় দেঁতো হাসি হেসে বললে—সঞ্জয় সরকারকে নাই বা চিনলেন—আশু লাহিড়ীকে চেনেন তো?

আশু! বিস্ময়ের ভান করে মীনা! তারপর কোথায় যেন সে একটু পরিচয়ের সূত্র খুঁজে পেলে—Good God! you are মাস্টার মশাই? খুকুদির মাস্টার? eh!

সঞ্জয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, খুকুর মাস্টার। খবর কী খুকুর? বি-এ ফেল করে এখন সে কী করছে? মাঝে তো সাপ্লাই-এ চাকরি করছিল—শুনেছিলাম।

মীনার ভেতর এবারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সুর্মা টানা চোখ দুটি হঠাৎ যেন ছল ছল করছে। পরিষ্কার বাঙলায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে বললে—আপনি শুনে দুঃখিত হবেন—খুকুদি মারা গেছে!

—মারা গেছে! বেঁচেছে! অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাহলে রক্ষা পেয়েছে বেচারি! যাক, আমাদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে আপনি যদি অনুগ্রহ করে সভানেত্রীত্ব করেন, —আমি সেই আবেদন নিয়েই এখানে আজ এসেছি। এই রবিবার দিন আমাদের পুরস্কার বিতরণী সভা। আপনার বাড়ি থেকে আমাদের স্কুল মাত্র বিশ মাইল দূরের গ্রাম। সেই গ্রাম্য স্কুলে আপনি উপস্থিত হলে আমি এবং আশু দুজনেই ভারী খুসী হব! আর মেজর রাণাও শুনেছি খুব সোস্যাল। আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ না থাকলেও এই উপলক্ষে আমি ওঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মেজর রাণা আপ্যায়িতের হাসি হাসলেন।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়ালো। মীনাকে তার দেখা শেষ হয়েছে।—আচ্ছা চলি তবে—নমস্কার মিসেস রাণা। রবিবার দিন বিকেল তিনটেয় আমি নিজে এসে নিয়ে যাবো আপনাদের দুজনকে।

মীনা মিষ্টি হেসে সম্মতি জ্ঞাপন করে বললে—একটু চা খেয়ে যান!

সঞ্জয় ধন্যবাদ জানালে—বিশেষ ব্যস্ত। আপনার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি মিসেস রাণা। আজকে একটুও সময় নেই আমার। আর একদিন বরও তোলা রইলো চায়ের নিমন্ত্রণ।

রাস্তায় বার হয়ে সঞ্জয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। গ্র্যান্ডট্র্যাঙ্কের রাস্তায় সন্ধ্যার নিবিড় স্নিগ্ধতা। মিনিট দশেক হেঁটে গেলে স্টেশনে পেঁছানো যাবে।

বাইরে এসে বাড়িটার দিকে একবার তাকালে সঞ্জয়। মীনার নামে বাঙালী ধরণের বাড়ির নামকরণ করা হয়েছে—মীনাক্ষী।

যুদ্ধের আওতায় চোরাবাজার ফেঁপে উঠেছে। ফেঁপে উঠেছে মেজর, ক্যাপ্টেন আর লেফটেন্যান্টের দল। কোথায় ছিল এরা ? দেশের মাটির সঙ্গে কোথায় এদের সংযোগ ?

সঞ্জয়কে মীনা চিনতে পারলে না তাতে তার ক্ষতি নেই—অতি প্রত্যাশিত চাকরিটা তার হল না; তাতেও সঞ্জয় ব্যথিত নয়। বালীগঞ্জের তিন তলার ফ্ল্যাট থেকে মহাযুদ্ধের অবসানে তাদের শ্রেণীর লোক আবার হিদারাম বাড়ুয্যের গলির মেসের অন্ধকার কক্ষে নেমে এসেছে। রাজপথের জনতায় বেকারের দল বেড়ে চলেছে। সঞ্জয় তার জন্যে বিচলিত নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত মীনা রায় মেজর রাণার সঙ্গিণী হয়ে যে সমাজ এবং জীবনকে ভেঙে দিয়ে গেল—তার জন্যে সঞ্জয়ের মনে বিক্ষোভ জাগে কেন? এই যুদ্ধে এমনি অনেক ঘর, অনেক জীবন, অনেক বিশ্বাস, সংস্কার আর আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পুরাণো জীবনের ক্লান্ত সুর কেটে গিয়ে কোলাহল সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে—তার তীব্রতাকে মেনে না নিলে উপায় কী? মীনাক্ষী রায়ের কাছে সঞ্জয় সরকারের যে পরিচয় ছিল—মীনা রাণার কাছে আজ সে পরিচয় বাতিল হয়ে গেছে—এখন সে খুকুদির মাস্টার!

কিন্তু সে কথা ভাবার আগে সঞ্জয়ে[র] এখন এখান থেকে সরে দাঁড়ানো দরকার[।] গ্রীণ রঙের প্রকাণ্ড বুইকখানা গর্জন করে তেড়ে আসছে। মেজর রাণার চেহারায় জীবনে[র] জৌলুষ দীপ্যমান। আর মীনাক্ষী রায়[?] বাঙলার মধ্যবিত্ত পরিবারের মুমূর্ষু মেয়ে এখন সে নয়—দিনের অন্ন সংগ্রহে এখন আ[র] তাকে দুশ্চিন্ত দিবস যাপন করতে হয় না[।] মেজর রাণার স্ত্রী মীনাক্ষী রাণা ফটকা[-]বাজারে ফেঁপে উঠেছে।

সঞ্জয় রাস্তার একপাশে গিয়ে স[রে] দাঁড়ালো। গ্র্যান্ডট্র্যাঙ্ক রোড ধরে গ্রী[ণ] বুইকখানি সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড়ের গতিতে উড়ে চলেছে।

সমবায় চাষ

বিশ্ব বিশ্বাস

বর্তমান জগতে প্রায় সব স্বাধীন দেশেই সমবায় চাষের প্রবর্তন হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সমবায় চাষের প্রচলন সাম্প্রতিক। প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র চাষীদের মধ্যে অল্পবিস্তর সহযোগিতা ও সমবায় বর্তমান আছে। কোন রাজনৈতিক প্রচারক অথবা কোন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার কাছে তাহাদের এ সমবায়ের শিক্ষালাভ করিতে হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে সংগঠন এবং পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিবার শিক্ষালাভ করিয়াছে। প্রকৃতির নিকট তাহাদের এ শিক্ষালাভ। মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় কোথাও বা এই সমবায় উন্নততর ও সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে আবার কোথাও বা মানুষের বাধাদানের ফলে ইহা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। তবু আমাদের বলিতে হইবে যে, সমবায় লিপ্সা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

আমাদের দেশে চাষবাসে সমবায়নীতির প্রবর্তন করিবার কথা উঠিলে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইহা অসম্ভব কারণ নাকি বহুবিধ অসুবিধা বর্তমান। অসুবিধা যে কতকগুলি আছে তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাই বলিয়া আমরা স্বীকার করি না যে ভারতে সমবায় চাষ অসম্ভব কারণ বাধা ও অসুবিধা যা' আছে তা' সবই সামাজিক সৃষ্টি—প্রাকৃতিক নয়। ব্যক্তি বিশেষ অথবা সমাজ-দত্ত অসুবিধা ইচ্ছা থাকিলেই দূর করা যায়। অনেকেই বলেন যে, সমবায় চাষ আমাদের দেশে নূতন। চাষীরা স্বভাবতই অবস্থা পরিবর্তনে উৎসাহী নয় ফলে এই নূতন জিনিষটির দিকে তাহাদের আগ্রহ ও ঝোঁক না হইতে পারে। কথাটা ভুল কারণ অল্প-বিস্তর সমবায়ভাব আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। দু'একটা উদাহরণ দিলেই ইহা বোঝা যাইবে।

আমাদের দেশে চাষে যে সমবায়নীতি চলিয়া আসিতেছে তাহা মোটেই ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়—খুব সামান্য মাত্র। যেটুকু সমবায় প্রচলিত আছে তাহা শ্রমবদল পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ এবং তাহাও নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রামের জমিতে জো হইয়াছে। রামের একার একখানা লাঙলে ঐদিনে জমির সমুদয় কর্ষিত হইতে পারে না ফলে রাম গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজনের আমন্ত্রণ করতঃ হাল বলদ সহ ক্ষেতে লইয়া আসিল এবং জমি চাষ করাইয়া লইল। শ্যামের ক্ষেতে ফসল পাক ধরিয়াছে। দিনের মধ্যে ফসল না তুলিলে নষ্ট হইতে পারে, ফলে তাহার আমন্ত্রণে তাহা[র] গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজন ক্ষেতে নামিয়া তাহা[র] ফসল তুলিয়া দিল। এইভাবে লাঙল দিয়[া] গতর দিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায়[্য] করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে অজস্র বিষয়ে অজস্র ভাবে বিদ্যমান। দু'একস্থলে আরও এক প্রকারের শ্রমবদল পদ্ধতি আছে ধরুন ক একজন গরীব চাষী—এক টুকরো জমি আছে কিন্তু হাল কিম্বা বলদ নাই। খ'এ[র] মানুষের শ্রম দরকার। খ'এর হাল বলদ আছে সে ক'কে হাল বলদ দিল এবং তার পরিবর্তে সে খ'এর ক্ষেতে খাটিয়া তাহার হালবলদের ঋ[ণ] শোধ করিল। আবার ধরুন গ জমিতে চাষ দিতে ওস্তাদ। ঘ ফসল কাটিতে ওস্তাদ। গ'এর ফস[ল] কাটার সময় ঘ সাহায্য করিল এবং ঘ'এ[র] জমিতে চাষ দেওয়ার সময় গ সাহায্য করিল একের অযোগ্যতা অন্যের যোগ্যতায় এইভাবে পূরণ করিয়া লওয়া হয়।

এই সবই সমবায়। সামান্য হ'ক, আ[র] অনিয়ন্ত্রিত হ'ক এ সবের মূলতত্ত্ব যা[হা] আধুনিক ব্যাপক ও বিস্তৃত সমবায় চাষে[র] মূলতত্ত্বও তাহাই। ফুলের মধ্যেকার যৎসামা[ন্য] একটা বীজ তাহাই একদা একটা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে প্রচলিত এই সমবায় পদ্ধতি যতই সামান্য হ' না কেন, উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে পরিচালনায় সংগঠনে ইহা যে বিরাট ও উন্নততর হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ রাখা চলে না। আ[র] যখন ইহা শ্রম বাঁচায় ও লাভ আনে তখ[ন]

অনুঃ

উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে কোন চাষী এর প্রতি বিমুখ হইবে না।

অনেকে আবার বলেন যন্ত্র ছাড়া যৌথ চাষের কোন সার্থকতা নাই। একে ত' আমাদের দেশ পরাধীন এবং তার উপর দেশের চাষীরা অত্যন্ত গরীব ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত। এমতাবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ একদল চাষীর সমবেত চেষ্টায় চাষের যন্ত্র ও কলের লাঙল কেনা অসম্ভব। যন্ত্রই যদি তাহারা ব্যবহার করিতে না পারিল তাহা হইলে এ যৌথচাষের মূল্য কি? যাঁহারা এই কথা বলেন আমরা তাঁহাদের সামনে বিগত যুদ্ধের সময়কার উত্তর-পশ্চিম চীনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতে চাই। গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা এখনও বিশেষভাবে কাজে পরিণত হয় নাই। তার কথা বাদ দিলে এক এই উত্তর-পশ্চিম চীন ছাড়া আর কোথাও সাম্রাজ্যবাদীদের এড়াইয়া ও ধনতান্ত্রিকদের সহায়তা না লইয়া বিপুল অর্থনৈতিক সংগঠন ঘটেনি। যুদ্ধের জন্য ও অর্থের অভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহারা যন্ত্রের সহায়তা লইতে পারে নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে একজোট ও সরল কর্মপ্রচেষ্টায় তাহারা এমন এক অর্থনৈতিক সংগঠন ঘটাইয়াছে যার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়নি, শুধু মাত্র হাতে গতরের কাজে স্বল্প অর্থ ও স্বল্প হাঁতিয়ারেই ইহা সম্ভব করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম চীনে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশেও সম্ভব হইতে পারে। যন্ত্রের সাহায্য বিনা একজোট কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ভারতের চাষী তাহাদের আর্থিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম এবং দরিদ্রের মধ্যে সুন্দর, সংস্কৃত ও উন্নত জীবনযাপন করিবার আশা রাখে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এড়াইয়া এবং ধনতান্ত্রিকদের সহায়তা না লইয়া চাষী-ভারত যদি উত্তর-পশ্চিম চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে এবং আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের মতে তাহাই নিরাপদ ও শ্রেয়ঃ। এই আলোচ্য সমবায় চাষে প্রথম প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত কৃষি-প্রচেষ্টাকে যৌথ উৎপাদন খামারের মধ্যে আনয়ন এবং একজন যোগ্য চাষীর অধীনে গ্রাম ইউনিট অথবা স্বজাতি ইউনিট অথবা আত্মীয়স্বজন ইউনিটের চাষী দলের শ্রমশক্তির মধ্যে নিবন্ধকরণ। এই ব্যাপারে হয়ত বড় বড় চাষী ও জমিদাররা অরাজী হইতে পারে এবং বাধা দিতে পারে। দেশের সরকারের মনোভাব যদি সমাজতান্ত্রিক হয়, তাহা হইলে আইন দ্বারা তাহাদের প্রবর্তিত করান যাইতে পারে, কিন্তু যদি তাহা না হয় তাহা হইলে যত কম বিশেষ সুবিধাদানে পারা যায়, তাহাদের রাজী করানর চেষ্টাই প্রকৃষ্ট উপায়। ধর্মগোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা এর বিরোধিতায় মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে খুশি করাইয়া কাজ হাঁসিল করার চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। যৌথ সমবায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র চাষীদের মধ্যে চালু করিলে চলিবে না পরন্তু মধ্যবিত্ত, ছাত্র, মজুর এমন কি সৈন্যদলের মধ্যেও প্রচলিত করা যায় এবং শুধু চাষে নয়—সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনে চাই এই সমবায় পদ্ধতি। যৌথ সমবায় উৎপাদন কেন্দ্রের সহিত যৌথ সমবায় ক্রয় কেন্দ্র, যৌথ সমবায় যানবাহন প্রতিষ্ঠান, যৌথ সমবায় কর্জ কেন্দ্র, যৌথ সমবায় কুটীরশিল্প কেন্দ্রের পত্তন না করিলে যৌথ উৎপাদন সফলতা লাভ করিতে পারে না।

এই সব ব্যাপক ও বিপুল যৌথ উৎপাদনের মূল সার্থকতা জনসাধারণের সহিত সংযোগে। চীনের বর্ডার অঞ্চল জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী থাকায় জাপ-যুদ্ধ চলাকালেও সাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্যক সফলতা লাভ করিয়াছিল। সংগঠনের শক্তিতে নিঃসহায় সর্বহারারা জাপযুদ্ধে রত থাকিয়াও পূর্বের চেয়ে ভাল খাওয়া-পরার আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে আর সেই সময় আমাদের দেশের লোকেরা যুদ্ধের গোলমালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হইয়াও না খাইয়া দলে দলে মরিয়াছে। বস্তুত সংগঠনের শক্তি এমনই অভাবনীয়। মহামতি লেনিন তাই বলিয়াছেন যে, সর্বহারাদের অন্য কোন শক্তি নাই—শুধু আছে একটি শক্তি—সংগঠন শক্তি। ঐক্যবদ্ধ শ্রমের শক্তি তাই অতুলনীয়।

শ্রমের শক্তি অতুলনীয় হইলেও সামাজিক বাধা অপনয়নে খানিকটা যে সরকারী সহায়তা দরকার হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বাধীন দেশের পক্ষে সমবায় চাষে সরকারী সাহায্য পাওয়া বিশেষ দুর্লভ নয়, তবে পরাধীন দেশে সাহায্য ত পাওয়াই যায় না বরং ধর্মের গোঁড়ামি ও জমিদারদের একগুঁয়েমিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। উত্তর-পশ্চিম চীনের সরকার লোকায়ত্ত সরকার বলিয়াই বহু অসুবিধার মধ্যে তাহারা যাহা করিয়াছে, আমাদের বিদেশী অপ্রিয় সরকার অনেক কিছু সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে তাহা করিতে পারে নাই। সামনে জাপান—মাথার উপর জাপানী বোমা—পদতলে অগ্নিদগ্ধ মাটি তবু চীন গণমানবের অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক উন্নতি বিধানের কর্মপদ্ধতি লইয়া কাজ করিয়াছে। আমলাতান্ত্রিক সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পরিকল্পনার খসড়া তৈয়ারী করে, মোটা মাহিয়ানা ও রাহা খরচে কমিটি আর কর্মচারী নিয়োগ করে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার কথা যখনই উঠে, তখনই অর্থের অভাব অজুহাত দেখান হয়। পরিকল্পনার জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহা যদি জনসাধারণের জন্য ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে চাষীদের ভিটেয় ঘুঘু চরিত না এবং তাহাদের জন্য যাহারা মাথা ঘামায় তাহাদের চোখের সামনে পরিকল্পনার খসড়ার পর খসড়া ঝুলাইয়া আশ্বস্ত করিবার দরকার হইত না। একমাত্র লোকায়ত্ত সরকার জনসাধারণের জন্য উন্নতিমূলক কর্মপন্থার সম্মুখীন হইতে পারে। মন্ত্রিত্বের গদি বদলাইতেছে—শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনও আসন্ন, জনসাধারণও লোকায়ত্ত সরকারের আশ্বাস পাইতেছে। কোন সরকারই খাঁটি লোকায়ত্ত সরকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না যদি না জনসাধারণ তথা চাষী-মজুরের উন্নতিমূলক কার্যপন্থার নিকষ পাথরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জনসাধারণ তারই অপেক্ষা সাগ্রহে করিতেছে।

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

প্রবন্ধঃ—"পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা"

আবৃত্তিঃ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "সাজাহান"

প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১ম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারিদ্বয়কে ১টি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মঃ—প্রবন্ধটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং উহা ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পৃষ্ঠার অধিক যেন না হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুগণের বয়স ২৫ বৎসরের অনধিক হওয়া চাই। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৩। খ্যাতনামা সাহিত্যিক দ্বারা প্রবন্ধ বিচার করা হইবে এবং ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্র দ্বারা জানান হইবে। মনোনীত প্রবন্ধ দুইটি সঙ্ঘের হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাইতে হইলে যথোপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র যোগদান করিতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে তাঁহাদের স্কুল ও কলেজের নাম ও শ্রেণী উল্লেখ করিয়া ১৫ই বৈশাখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

কোন প্রবেশ ফী নাই।

২৯শে বৈশাখ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে এবং ঐ তারিখেই উভয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার নাম পাঠাইবার ঠিকানাঃ—

শ্রীমুরারিমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্য-শাস্ত্রী, সম্পাদক, প্রগতি সঙ্ঘ সাহিত্য শাখা, ধর্মতলা, পোঃ সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

মহিম ডাকাত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পি ৬৫১-এ, মহানির্বাণ রোড, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাঙলার লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধারের একটা অকপট চেষ্টা যোগেন্দ্রবাবুর রচনার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলার ইতিহাসের একটা বিশেষ দিক তিনি তাঁহার কয়েকখানি বহু প্রশংসিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস তন্মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস হইলেও কাহিনীটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকালের সমাজচিত্র এই গ্রন্থে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে বাঙলার সর্বত্র কিভাবে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য চলিত তাহারই একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বইটি এমনই রোমাঞ্চকর যে, আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

অমৃতের সন্ধানে—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী পাবলিকেশনস, কদমকুঁয়া, পাটনা, মূল্য দেড় টাকা।

মৃগয়া অভিযান, বর্ষা বিলাস, যাত্রামঙ্গল, অমৃতের সন্ধানে, বিলম্বিত, হরিহর ছত্রে, গানের আসর, রঙীন ফানুস এই আটটি গল্পের সমষ্টি এই "অমৃতের সন্ধানে।" প্রেমের ব্যাপারে অতৃপ্তির এক বেদনাময় চিত্র 'অমৃতের সন্ধানে' শীর্ষক গল্পটিতে রূপলাভ করিয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে।

তাজমহলের দেশে— রচয়িতা—মৃগনাভী। প্রকাশক—বাণী-নিকেতন, বরিশাল ও কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস। শেখর, প্রবোধ, চন্দ্রা বাইজী প্রভৃতি কতকগুলি চরিত্র নিয়া একটি রোমান্টিক কাহিনী স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। আখ্যানভাগে নূতনত্ব আছে, কিন্তু ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী মামুলী ধরণের।

মহারাজ নন্দকুমার—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত। ওরিয়েন্ট বুক কোং, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

মহারাজ নন্দকুমার বাঙলা দেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। লেখক এই বইখানাতে তাঁহার জীবনালেখ্য কিশোরদের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা সহজ। ইতিহাসের কাহিনীকে রূপকথার মত মিষ্টি করিয়া তিনি বইটিতে বিবৃত করিয়াছেন।

আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পটভূমিকা—লেখক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

নামেই পুস্তিকাটির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট স্থাপনা একটি অভিনব ব্যাপার, কিন্তু পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনসমূহের উপর উহার পটভূমিকা যে আগেই রচিত হইয়া রহিয়াছে, লেখক তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নেতাজী (নাটক)—শ্রীশৈলেশ বিশী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা বারো আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের চিরস্মরণীয় চারিটি বৎসরের ঘটনাবলী নাটকাকারে বিবৃত করা হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় ঠিকই বলিয়াছেন—"তাঁর জীবনের গতি—১৯৪১ সাল হ'তে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি এত দ্রুত যে কোন সাহিত্যিক, নাট্যকার বা লেখকের সে উল্কা গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা কঠিন। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর জীবনের এই চার বৎসরের ঘটনা একটা জাতির দুশো বৎসরের মরা বাঁচার ইতিহাস—যার পটভূমি হচ্ছে—ভারত, ইউরোপ ও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া।" নাটকের তিনটি অঙ্কে ও তদন্তর্গত দৃশ্যগুলিতে এই ভাবে ঘটনার বিন্যাস করা হইয়াছে, যথা, নেতাজীর প্রতি কংগ্রেসের শাস্তি প্রয়োগ, ব্ল্যাক হোল মনুমেণ্ট ধ্বংস, খাইবার গিরিপথ ধরিয়া নেতাজীর দেশত্যাগ, ফ্রান্সের নরমাণ্ডী উপকূলে এবং নরওয়ে উপকূলে বাহিনী সংগঠন, সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতা লীগের অধিবেশনে যোগদান, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন, ইম্ফল রণাঙ্গনে যুদ্ধ, বার্মার নানাস্থানে সংগ্রাম এবং অতঃপর জাপ গবর্নমেণ্ট আত্মসমর্পণ করিলে আজাদ হিন্দ গবর্নমেণ্ট কি করিবে তৎসম্বন্ধে সেনানীবৃন্দের সহিত আলোচনা ও জাপানের মতিগতি বুঝিবার জন্য নেতাজীর বিমানযোগে জাপান যাত্রার পর নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে। দৃশ্য সংস্থাপনা ভালই হইয়াছে। তবে প্রথম দৃশ্যটিকে প্রস্তাবনা হিসাবে দিলেই ভাল হইত। এরূপ নাটক রচনা খুবই দুরূহ ব্যাপার। লেখকের এই অভিনব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ছাপার ভুল সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

সৈনিক ও নিরস্ত্র ভারতঃ—শ্রীদিগন্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক—আর, এন, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ২৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একখানি গদ্য কবিতার বই। অধিকাংশ কবিতাই সুরচিত এবং তথাকথিত অতি আধুনিকা হইতে মুক্ত, তবু সবকয়টি কবিতাতেই বিপ্লবাত্মক ধ্বনি স্ফুরিত হইয়াছে।

UNITY—An anthology compiled by the University Students Union. Ashutosh building, Calcutta, 1946.

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক সংকলিত ইংরাজী ও বাংলা লেখা গদ্য পদ্য রচনাবলীর সংগ্রহ গ্রন্থ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক বিনয় সকার, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং কতিপয় ছাত্রের লিখিত বহু সুলিখিত রচনায় পুস্তকটি সমৃদ্ধ।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অবসান—শ্রীরমাপতি বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীহর্ষ, ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

ট্রট্স্কিকে হত্যা করানো এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ভাঙিয়া দেওয়ার ব্যাপারে লেখক আধুনিক রুশ কর্ণধারের উপর এক হাত নিয়াছেন। এই কমিউনিস্ট বিরোধিতার দিনে পুস্তিকাটি অনেকেরই নিকট রুচিপ্রদ হইবে।

1. British Policy in Eritrea and Northern Ethiopia.

2. British Policy in Eastern Ethiopia, the ogaden and the reserved area.

By Sylvia Pankhurst

ইরিত্রিয় এবং পূর্ব ইথিওপিয়ায় বৃটিশ নীতির মহিমা সিলভিয়া পাঙ্ক্হার্স্ট মহাশয় এই দুইখানা পুস্তিকায় বিবৃত করিয়াছেন। লেখক সহজভাবে ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেই বৃটিশ নীতির স্বরূপ বিশেষরূপে ধরা পড়িয়াছে। প্রতিখানি পুস্তিকার মূল্য ১ শিলিং।

বাঙলার মা ও বোনদের প্রতি—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। প্রকাশক—শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, ১—১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

১৩৩৭ সাল বৈশাখ "বেণু" পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত) নেতাজী সুভাষচন্দ্রর বাঙলার নারী জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল বহু যত্ন সহকারে ও নিষ্ঠার সহিত লুপ্তপ্রায় প্রবন্ধাবলী পুনরুদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলার মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ওজস্বী ভাষায় সুভাষচন্দ্র পনর বৎসর পূর্বে এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যে আশার কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনী' গঠনের দ্বারা তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বীণা দাস এই গ্রন্থের ভূমিকার শেষাংশে লিখিয়াছেন—"বাঙলার নারী সমাজের সমস্যা, তার কর্তব্য আর দায়িত্ব সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী এবং আজকের দিনেও এমন সময়োপযোগী প্রবন্ধ খুব বেশী লেখা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।" এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া প্রকাশক দেশবাসীর এবং বিশেষ করিয়া বাঙলার নারী সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। আশা করি বাঙলার প্রত্যেক মা ও বোন এই গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

শ্রীব্রহ্ম সংহিতা—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত টীকা সমন্বিতা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট। ঠিকানা—শ্রীভক্তিবিদ্যালয়, পোঃ বৃন্দাবন, জেলা মথুরা। মূল্য আট আনা।

ব্রহ্ম সংহিতা বৈষ্ণব সমাজের অতি আদরের গ্রন্থ। বৈষ্ণব জগতের মূল সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই গ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি, বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, আলোচ্য গ্রন্থের শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীকৃত টীকার তিনি যে অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা নির্ভুল। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য আট আনা।

এ খানা বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৪৭ সংখ্যক গ্রন্থ। বিশাল অর্ণব সদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা হিসাবে এই গ্রন্থখানাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন, "যেমন বিশাল কোনো স্থানকে দূর থেকে দেখলে তার একটি অখণ্ড ও আবছা দৃশ্য চোখে পড়ে, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যকে এই প্রবন্ধে দূর থেকেই তেমনি দেখা গেল।" সত্যি প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের অখণ্ড রূপ ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু সে রূপ আবছা নয়। প্রাঞ্জল ভাষায় ও সুস্পষ্ট

প্রকাশ ভঙ্গীতে বর্ণিতব্য বিষয় বেশ মনোজ্ঞভাবে ধরা দিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার তত্ত্ব, গ্রন্থাদির সন্ধান, গ্রন্থাদি কিসের উপর লেখা হইত তাহার বিবরণ দিবার পর লেখক সংস্কৃত গ্রন্থরাজিকে ১৪টি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগের সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই ১৪টি বিভাগ এই—১। বৈদিক সাহিত্য, ২। বেদাঙ্গ, ৩। পুরাণ ইতিহাস, ৪। ধর্ম অর্থ কাম শাস্ত্র, ৫। দর্শন, ৬। জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র, ৭। আয়ুর্বেদ ও উপবেদ, ৮। কাব্য নাটক কথা প্রভৃতি, ৯। অলঙ্কার, ১০। সংকীর্ণ কাব্য, টীকা টীপ্পনী, ১১। নিবন্ধ, ১২। তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র, ১৩। বিবিধ লৌকিক বিষয়, ১৪। শিলালিপি ও তাম্র লিপি। সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য ও লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। মোটের উপর অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক মূল্যবান কথা শুনাইয়াছেন।

দিল্লী চলো—নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখিত। প্রকাশক, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা

নেতাজী ও তাঁহার সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই সেগুলি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়াছে। দেশ ছাড়ার পরবর্তী বৎসর কয়টি নেজাতীর জীবনে কর্মের প্লাবন আনিয়াছিল। তাঁহার সেই সময়ের রচনা বক্তৃতা ও বাণী প্রভৃতির সম্বন্ধে জনসাধারণের অদম্য কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। "দিল্লী চলো" গ্রন্থের প্রকাশক সে কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। আলোচ্য গ্রন্থে নেতাজীর মোট ১৪টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগ) হেড কোয়ার্টার্স হইতে "Blood Bath" (রক্তস্নান) নামে নেতাজীর কতকগুলি রচনা ও বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। সেই বইটির সমগ্রটুক এবং আরও চারিটা বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া এই বইটি সংকলন করা হইয়াছে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, অসাধারণ সংগঠন শক্তি এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত দুর্বার হৃদয়াবেগের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁহাকে দুঃসাহসীব জয়যাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল, রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে তাহারই পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাণী বিদ্যুতের মত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিকের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিত। এই জনাই বৃটীশ-পক্ষীয় রাজসিক আড়ম্বর-পুষ্ট যোদ্ধাদের নিকট যাহা কল্পনারও বহির্ভূত, নেতাজীর নিঃস্ব, দেশপ্রেম মাত্র সম্বল আজাদী সেনানীরা তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন। নেতাজীর এই নিবন্ধগুলি পড়িয়া প্রত্যেকেই প্রাণে প্রেরণা পাইবেন। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। কয়েকখানা ছবি আছে।

গান্ধীবাদের পুনর্বিচার—এম এল দান্তওয়ালা প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনূদিত। প্রাপ্তি-স্থান, ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানা কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকায় প্রধানতঃ যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজীর অবধারণা নূতনভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অধ্যাপক দান্তওয়ালা স্পষ্ট দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, 'গান্ধীজী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তা লইতে চান না, ইহা মনে করা ভুল। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা হইল, কি করিয়া অল্প ব্যয়ে প্রচুর উৎপাদন করা যায়। তাহার ফলে যদি বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়, সেটি সমাধানের দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকগণ অপরের উপর ছাড়িয়া দেন। পৃথিবীর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত দারিদ্র্য রোগের সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় নাই। গান্ধীজীর প্রধান লক্ষ্য সেই দিকে।' গান্ধীজীর ভাব ও ধারণাগুলোকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন, যথা—পুঁজিবাদের বিরোধিতা, যন্ত্র বিরোধিতা, যন্ত্র ছাড়া শোধনের অন্যান্য উপায়গুলির উপেক্ষা, অছিগিরির নীতি, অহিংস সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। নিতান্ত অল্প কথায় এই সকল গুরুতর বিষয় আলোচনা করিয়া লেখক গান্ধীবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। ২৪।৪৬

নব-অভিযান—(জনতা পুস্তকমালার ১নং পুস্তক)। প্রাপ্তিস্থান—আজাদ হিন্দ কিতাব। ২৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। "নব-অভিযান," "কংগ্রেস ও জনগণ" (আচার্য নরেন্দ্র দেব), "নেতৃবৃন্দের প্রতি নিবেদন" এবং "প্রত্যাবর্তন" (অরুণা আসফ আলী) এই কয়েকটি উদ্দীপনাময় রচনা এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

SOME MEMORABLE LETTERS ON AUGUST REVOLUTION

—প্রাপ্তিস্থান—আজাদ হিন্দ কিতাব, ২৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আগষ্ট আন্দোলনের নায়ক জয়প্রকাশনারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, রামমনোহর লোহিয়া ও অরুণা আসফ আলীর চারিটি উল্লেখযোগ্য পত্র এই পুস্তিকাখানাতে একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে।

রাখালী—(কবিতা-সংগ্রহ)—জসীমউদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৬৬ পৃষ্ঠা; মূল্য—১।৹ আনা।

পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের "রাখালীর" তৃতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙলা দেশে কবিতা গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দুর্লভ ব্যাপার। জন কয়েক অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ভাগ্যবান কবি ভিন্ন সচরাচর আর কোন কবির জীবনেই এরূপ সৌভাগ্য হয় নাই। "রাখালী"র তৃতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হইতেও পল্লী-কবি জসীমউদ্দীনের কবিতার জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির রচনাভঙ্গী, ভাব-ভাষা বাঙলার নিজস্ব। এই কবিতা গ্রন্থের সব কয়টি কবিতার ভিতরেই বাঙলার অন্তরাত্মা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে; কানন-কুন্তলা, নদী-মেখলা পল্লী বাঙলার স্নিগ্ধ শ্যামল-শ্রীর সাক্ষাৎ তাঁহার কবিতায় যেমনটি পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে মেঠো ফুলের সুবাস, পাখীর গান ভিড় জমাইয়া তুলিয়া পাঠকের মনকে এক আনন্দঘন রসলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। বর্তমান কঠোর বাস্তবতাপূর্ণ নাগরিক জীবনে তাঁহার কবিতার স্নিগ্ধ মধুর রসের আবেদন একান্ত উপভোগ্য। বর্তমান সংস্করণে "রাখালী" আরও জনপ্রিয়তা লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

স্বদেশী গান—শ্রীঅনাথনাথ বসু সম্পাদিত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, ৮সি রমনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের' পক্ষ হইতে আলোচ্য পুস্তিকাখানা সম্পাদন করা হইয়াছে। স্বদেশী গান পরাধীন জাতির অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত গীতরূপ। পরাধীন জাতির দুশ্চর মুক্তি তপস্যায় এই সব সঙ্গীত সাধকদের প্রাণে প্রেরণা যোগায়, শক্তি সঞ্চার করে। অতীতে ও বর্তমানে যে স্বদেশী সংগীতগুলি শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে বহু কণ্ঠে গীত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছে, সেইরূপ ৩২টি স্বদেশী গান এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। বইটি দেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

শেষ প্রশ্ন—চারুচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীফটিক-লাল দাস, বি-এ চন্দননগর। মূল্য আট আনা।

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন তথা কমলকে লইয়া বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ এক সময় হইয়া গিয়াছে। প্রবর্তক সঙ্ঘের স্বর্গীয় চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই আলোচনা কিন্তু সেই সকল বিতর্কমূলক সমা-লোচনা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। কমল চরিত্রকে তিনি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার কথাবার্তা উদ্ধৃত করিয়া, শুধু প্রগলভা নয় বিদ্রোহিনী নারীরূপে কমলের পরিপূর্ণ একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে। বইটি সাহিত্য রসিকদের আদরণীয় হইবে। শেষ প্রশ্নের পূর্বাভাষ স্বরূপ শরৎচন্দ্রের নিজের মুখের কতকগুলি মৌলিক বাণী বইটির মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। ২৯।৪৬

লুকিয়ে থাকে প্রেম—চিত্রিতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—অর্চনা পাব্লিশিং, ৮সি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

লুকিয়ে থাকে প্রেম, কেন এমন হয়, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, নীল চিঠি প্রভৃতি মোট দশটি ছোট গল্প এই বইয়ে স্থান পাইয়াছে। প্রায় সব-কয়টি গল্পই প্রেমমূলক। কিন্তু একঘেয়ে প্রেমের গল্প যাহা সচরাচর বাহির হয়, আলোচ্য বইয়ের গল্পগুলি সেরকম নহে। এর প্রত্যেকটি গল্পই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সবগুলি গল্প ঠিক ঠিক টেকনিক দুরস্ত না হইলেও প্রশংসা করার উপযুক্ততা প্রত্যেকটি গল্পেরই আছে। প্রথমত গল্পবলার উপযোগী মিষ্টিভাষা তাঁর আছে, আর বলার ভঙ্গীটিও চমৎকার। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য বিষয় লেখিকার সংবেদনশীল মনের সহজ ও অবাধ প্রকাশ ক্ষমতা। আমরা গল্পগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি পাঠক মহলে বইটির আদর হইবে। বইটির ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট মনোরম। ২২।৪৬

রক্ত রাখী—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। আর এন চাটার্জি অ্যাণ্ড কোং, ২৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানা রচিত। গ্রামের মেয়ে কিশোরী দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, সংযম-বিহীন শহরে আসিয়া নানা দুর্জ্ঞেয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। নানা অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়া আসে তার জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। লেখক একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া এই নারীচরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানবতার কুৎসিত ও মধুর দুইটি রূপ চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিশোরী, বিনোদ, সুরমা, বিজন প্রভৃতি নরনারীগুলি মনে বেশ ছাপ রাখিয়া যায়। বাঙলার মন্বন্তর-সাহিত্যে এই বইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, কাগজ উত্তম, এবং প্রচ্ছদপট মনোরম।

—ছয়—

দেখতে দেখতে সুমিতার চারতলা বাড়িটা প্রায় ভরে উঠল।

যেখানে যেসব ছেলেরা ছড়িয়েছিল, তারা তো এলই, মেয়েরাও বাদ গেল না। আর এতগুলি ছেলেমেয়ের কর্তৃত্ব করবার ভার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল সুমিতার ওপরেই। কিন্তু কর্তৃত্ব করা কি সহজ? দিনের বেলা অবশ্য খুব বেশি অসুবিধা হয় না। আটটা নটা বাজতে না বাজতে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে নিজেদের এলাকায়। কেউ কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নেয়, কেউ বা রেশনের থলে। বইতে আর কাগজপত্রে সেগুলোকে একেবারে ঠাসাঠাসি করে তারা নেমে পড়ে রাস্তায়।

তারপর বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে সারাদিন। প্রায় নির্জন কলকাতার বুকের ওপর নামে আরো নির্জন দ্বিপ্রহর। শীতের চাঁপাফুলী রৌদ্রেও সামনের পীচ জ্বলতে থাকে—কোলাপ্সিবল গেটে বড় বড় ভারী তালা আঁটা বাড়িগুলোকে যেন ভুতুরে বলে মনে হয়। সুমিতার বাড়িতেও কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। মেয়েরা নিজেদের ঘরে পড়াশুনো করে, রিপোর্ট তৈরী করে, পোস্টার লেখে। শুধু বাতাসে কোনো খোলা জানালা থেকে কর কর করে শব্দ ওঠে, কোথাও বা গঙ্গাজলের কল থেকে ছর ছর করে অবিশ্রান্ত জল পড়ে।

ঠিক এই সময়টাতে সুমিতার কিছু ভালো লাগে না। নিজের মনটাকে ভারী অপ্রস্তুত, ভারী নিরবলম্ব, ভারী অসহায় বলে বোধ হয়। এত কাজ আছে, এত দায়িত্ব আছে। সমস্ত জীবনটাকে ছবির মতো সামনেই তো দেখতে পাওয়া যায়। দুস্তর কঠিন পথ। বিঘ্ন, বাধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস। মাঝে মাঝে নিজের শক্তির ওপরেও সংশয় আসে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, অপেক্ষা করবার উপায় নেই। দিগ্‌দিগন্তে প্রচণ্ড ধ্বনি তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। আর সেই রথের দড়ি ধরে টানছে গণ-জনতা। তার সামনে থেমে দাঁড়ানো তো চলবে না। হয় রথের দড়ি টানো নতুবা জন-জগন্নাথের জয়রথের চক্রতলে চূর্ণ নিষ্পিষ্ট হয়ে যাও। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, গত্যন্তর নেই কিছু।

আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্কে বিহ্বল ব্যাকুল কলকাতা। সব বিশৃঙ্খল, সব অসংলগ্ন। কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন কিসের একটা সুতীক্ষ্ম সংকেতময়তা—একটা অনিবার্যতার ইঙ্গিত। নিজের রক্তের মধ্যে সুমিতা শুনতে পায় রথচক্রের গর্জন। আসছে—আসছে—তার আর দেরী নেই। আকাশে ঝড়ের মেঘ উড়েছে, সেই মেঘের বুকে বিদ্যুতের রক্ত-শিখায় লক্‌লক্‌ করে যাচ্ছে তার রক্ত পতাকা। দুপুরের বাতাসে বিচিত্র শব্দ বাজে—মনে হয় কোথাও দৃষ্টির অগোচরে—কোনো একটা নেপথ্য লোকে কারা যেন লক্ষ লক্ষ তরোয়ালে শান দিয়ে চলেছে, তাদের দিন আসছে তাদের প্রবল প্রচণ্ড মুহূর্ত আসছে ঘনিয়ে। এই যুদ্ধ শুধু এশিয়া-ইয়োরোপে খানিকটা বিচ্ছিন্ন রক্তপাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না। বদলে দেবে লক্ষ কোটি মানুষের চিরাচরিত অপমানের ইতিহাস, নতুন করে গড়ে তুলবে আর এক পৃথিবী। সার্থক এবং পরিপূর্ণ, বিপুল এবং বিরাট।

কিন্তু তবুও নির্জন দুপুর। ঘরে বাইরে একটা আশ্চর্য শূন্যতা। সেই শূন্যতা যেন চেতনার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনিমেষ আর আদিত্য, আদিত্য আর অনিমেষ মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। বহুদূরে কোথায় সমুদ্রের নীল-তরঙ্গ প্রতিহত হচ্ছে গ্র্যানাইটের শৈল-সিকতায়। বাতাসে নারিকেল-বীথির মর্মর। ঈজিয়ানের সমুদ্র। পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ইংরেজ কবির এলোমেলো কবিতার লাইন। অনিমেষ কোথায়, অনিমেষ কত দূরে? এইসব কবিতাগুলো কখনও কি তার মনে পড়ে না? সমুদ্রের জল হীরার মতো ঝলমল করছে। কিরণবর্ণা অ্যাটলান্টা কি চিরদিনের জন্যেই তার আড়ালে তলিয়ে গেল, আর কোনোদিন উঠে আসবে না? সৈনিকের জীবনে কি একটি মুহূর্তও নেই, নেই এতটুকুও অবকাশ?

দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল আসে। চব্বিশটা ঘরের ওপর দিনান্তের মলিন ছায়া ঘনাতে থাকে। তারপর চব্বিশটা ঘরে একটার পর একটা আলো জ্বলে ওঠে। ছেলেরা ফিরে আসে।

আর নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকবার সুযোগটুকুও ফুরিয়ে যায় সুমিতার।

বড় একটা কেট্‌লিতে চায়ের জল ফোটে। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসে তার চারপাশে। কাচের গ্লাস, মাটির ভাঁড়, হাতল ভাঙা পেয়ালা যে যা পারে যোগাড় করে নিয়ে বসে। তর্ক চলে, আলোচনা চলে।

—লেবারকে মবিলাইজ্‌ করতে গেলে আগে ওদের লিটারেচার ভালো করে পড়ানো দরকার। অন্তত একটা ক্ল্যারিটি অব্‌ ভিসন—

—আমার কিন্তু মনে হয় খাঁটি থিয়োরী ওদের মনে সাড়া দেবে না। ওরা কাজ বোঝে, কথা বোঝে না।

—আহা সে তো বটেই, সেটা কে অস্বীকার করছে। আমরা তো ওদের বক্তৃতা দিয়েই উদ্ধার করে দিচ্ছি না। বক্তৃতায় কাজ হলে তো সুরেন বাঁড়ুয্যের আমলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত। আসল কথা—ওদের বোঝানো দরকার কিসের জন্যে ওরা লড়ছে কেমন করে ওরা লড়বে।

—বেশ তো, সেটাই বোঝাও।

—বোঝাচ্ছি তো নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে ভেস্টেড্‌ ইনটারেস্টের শিকড়টা কোন অবধি গিয়ে যে পৌঁছেছে, সেটাও ভালো করে পরিষ্কার করে দেবার দরকার আছে তো। তাই বলছিলাম লিটারেচারটা কিছু কিছু পড়ানো ভালো।

—কিন্তু সেটা সকলের জন্যে নয়। ওতে অনর্থক সময় নষ্ট, উৎসাহেরও অকারণ অপব্যয়। এটা তো মানো কোনো কাজে সবাই-ই লীড্‌ নিতে পারে না, মাত্র দু'একজনকেই সে দায়িত্ব নিতে হয়?

—মানি।

—আর এও নিশ্চয় জানো, পিপ্‌লের সামনে যে বাস্তব সমস্যাগুলো আসে, তাকেই ওরা একমাত্র স্বীকার করে। ফাঁকা আদর্শের মূল্য কী, বলো? আমাদের ন্যাশনাল স্ট্রাগ্‌ল থেকে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। স্বাধীনতা-আন্দোলন আমরা বারে বারেই তো করেছি। দেশের সবাইকে ডাক দিয়েছি, মধ্যবিত্তকে, শ্রমিককে, কৃষককে। কিন্তু ফল কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত? আমরা বন্দেমাতরম্‌ বলে আহ্বান জানিয়েছি, তারাও ছুটে এসেছে। জেলে গেছে, নির্যাতন সয়েছে, পিটুনী ট্যাক্সের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে। তার পরের ইতিহাস দেখো। আমরা যারা উকিল, তারা আবার আদালতে ফিরে এসে 'ইয়োর অনার' বলে সওয়াল করেছি, যারা ছাত্র তারা আবার ইস্কুল, কলেজে ফিরে গিয়ে অধ্যয়নের তপস্যায়

মন দিয়েছি, যারা জমিদার তারা 'এ' ক্লাস প্রিজনার হয়ে সসম্মানে জেল খেটে আবার এসে যথানিয়মে জমিদারী করেছি। কিন্তু একবার ভাবো কৃষকের কথা। কী লাভ হয়েছে তার, এ থেকে সে কী পেল?

অপর পক্ষে এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছেঃ তা হলে তুমি কী করতে বলো?

—যা করতে বলি, তা এই। ওদের রাতারাতি বিপ্লব করতে চেয়ো না। মোটা প্রয়োজনগুলো মোটা কথায় ওদের বুঝিয়ে দাও, যদি কাজ হয় তো তাতেই সব চাইতে বেশি হবে।

—তুমি কি মনে করো দশ বছর আগে আমাদের যে পলিটিক্যাল লাইন অব্ এ্যাক্টিভিটিজ্ ছিল, আজো তাই আছে? আজকের লিটারেচার শুধু কতগুলো কথার সমষ্টি নয়, তা প্র্যাক্টিক্যাল।

তর্ক চলে, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সবাই উত্তপ্ত বোধ করে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে চা। দুধ-চিনির মাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে আর উদ্দীপনাও বেড়ে উঠতে থাকে সমান তালে।

গল্প করে, হাসি-ঠাট্টা করে। এক পাশে দু'তিনজনে মিলে ঘরোয়া আলোচনা চালায় চাপা গলাতে। কেউ নিজের ঘরে বসে চুপ চাপ করে পড়ে, কেউবা লেখে। তারপর আলোচনায় যখন ছেদ পড়ে, সবটাই যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, তখন সুমিতা মধ্যস্থতা করে। বলে, আর তর্ক নয়—ওসব কচকচি এখন থাক। এবার কাব্যপাঠ হোক।

কথাটা কাণে যাওয়া মাত্র অল্প বয়সী একটি ফর্সা ছেলের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে সে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। রমলা বলে, সুমিতাদি, ইন্দু কিন্তু পালালো।

সুমিতা হাসে, না, না, কবি পালালে চলবে না। এবারে তোমার পালা, রাজনীতির এই মরুভূমিতে তুমি কবিতার মরুদ্যান দু'-চারটে জাগিয়ে তোলো দেখি। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

ইন্দু যেন লজ্জায় আরো ছোট হয়ে যায়। একটু আগেই এই ছেলেটি যে রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে হাতাহাতির উপক্রম করেছিল, একথা এখন কিছুতেই যেন মনে করা চলে না।

ইন্দু বলে, না, সুমিতাদি।

—না কেন? সভার সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কই পকেট থেকে বার করো খাতা। একটা গরম গরম কিছু শুনিয়ে দাও দেখি।

ইন্দু প্রাণপণে কী বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু চারদিকের প্রবল কোলাহলে তার গলার স্বর অসহায়ভাবে হারিয়ে যায়। কবিতা শোনবার জন্যে সকলের মন যে একেবারে হাহাকার করে উঠেছে তা নয়। দুর্দান্ত তার্কিক এবং পরম সপ্রতিভ ইন্দুর এই বিপন্ন অবস্থাটা সকলের কাছে ভারী উপভোগ্য বলে বোধ হয়। বিশেষ করে তর্কে যারা হেরে গেছে, তাদের গলাই আরো বেশি জোরালো হয়ে ওঠে।

জলে ডোবা মানুষের মতো ইন্দু অবশেষে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ টেনে বার করে। একবার শেষ চেষ্টা করে বলে, এ কবিতাটি ভালো হয়নি।

উল্লসিত চীৎকার ওঠেঃ না, না চমৎকার হয়েছে। পড়ো কবি, শোনাও আমাদের।

আর উপায় নেই। ইন্দু শেষবারের মতো তাকায় সকলের মুখের দিকে—কিন্তু কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। এমনকি সুমিতারও না। অতএব নিরুপায় হয়ে কবিতা পড়তে সুরু করে।

প্রথমে ভীরু, তারপর ক্রমশ গলার স্বর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ইন্দু কবিতা পড়তে সুরু করেঃ

হংস-মিথুন, নীড়ের ঠিকানা কই
অসীম সাগর দুলিছে পাখার নীচে,
ছুটেছ কোথায় কোন্ মরীচিকা পিছে
পথের সঙ্গী আমরা তো কেহ নই—

একজন মন্তব্য করেঃ এখনো হংস-মিথুনের কবিতা!

সুমিতা বলে, চুপ। বে-রসিকের মতো আগে থাকতেই টিপ্পনী কাটতে যেয়ো না।

হংস-মিথুন দেখো দিগন্ত-তলে
মেঘের মতন কামানের ধোঁয়া জমে।
আলোর আভাস দেখে কি পড়েছো ভ্রমে?
আগুনে বোমায় মারণ-যজ্ঞ চলে।

এইবারে সকলে চুপ করে যায়। হংস-মিথুন নীড় হারিয়েছে। কবিতার ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইন্দু বলে চলে, বিলের বুকে বুনো কলমী ফুলের আড়ালে-আড়ালে তোমাদের যে মিলন-বাসর, আজ সেখানে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আজ বন্দুক হাতে এসেছে শিকারী, তাদের সাথে সাথে এসেছে লোল-জিহ্বা ঝুলে পড়া হিংস্র শিকারী কুকুরের দল। আজ আর নিস্তার নেই, রক্ষা নেই কারো। তোমাদের স্বপ্নাতুর বালক রজনী অপমৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেলঃ

হংস-মিথুন, এখন সেদিন নয়,
হাঁকিছে শিকারী, ডাকিছে যুগের শিখা,
কোনো আলো নেই, নেই কোনো সান্ত্বনা,
বধির স্বর্গে ভাষাহীন প্রার্থনা,
দেবতার বেদী বলির রক্তে লিখা
লোভী পুরোহিত জাগিছে বিস্ময়—

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইন্দু থেমে যায়। কবিতা থামে, তার রেশ হারায় না। সকলে চুপ করে বসে থাকে। এত বস্তুবাদী এরা, এত বুদ্ধিবাদী, তবু কারো সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে না। কবিতা ভালো কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তার দোলাটা বাজছে রক্তের মধ্যে, তার ছন্দটা যেন মর্মরিত হয়ে উঠছে শিরায় শিরায়।

খানিক পরে একটি দুটি করে কথা বেরুতে থাকে।

—বাঃ, বেশ হয়েছে।

—মন্দ হয়নি তো কবিতাটা।

—নাঃ, কবির হাত আছে সেটা মানতেই হবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতবর্ষে ইন্দুই নব-জীবনের গান গাইবে।

বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধিও সজাগ হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে।

—তবে প্রকাশ-ভঙ্গিটা এখনো গতানুগতিক।

—আরো স্ট্রেট্ মানে আরো তীক্ষ্ন হওয়া দরকার। ইন্দুর বুদ্ধি যতটা ধারালো হয়ে উঠেছে, মন ততটা নয়। ওর ভেতরে একটা ডুয়্যালিটি আছে। বাইরে ও ভয়ঙ্কর যুক্তিপন্থী, কিন্তু মনে রোমান্স একেবারে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে।

—তবু চেষ্টাটা ভালো।

—নিশ্চয়। তবে আরো সজাগ মন চাই। এখনো ও হংস-মিথুনের জন্যে বিলাপ করছে। কিন্তু পুরানো নীড়ের ঠিকানা যদি নাই থাকে, তা হলেই বা এত কাতর হবার কী আছে! নতুন নীড় খুঁজে নিতে হবে, নতুন করে বাঁচতে হবে। হংস-মিথুন পরাজয়ের মধ্যেই তলিয়ে যাবে কেন? তারও দিগন্ত আছে—আরো বিস্তীর্ণ পৃথিবী আছে। কবি, সেই বৃহত্তর পৃথিবীরই জয়গান করো।

—ঠিক কথা। কবি তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ'—

ইন্দু উত্তর দেয় না। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নিজের ঘরে উঠে চলে যায়। কোনো সমালোচনায় সে কখনো জবাব দেয় না, যে যা বলে, নীরবেই শুনে যায় চিরকাল।

বাইরে রাত বাড়ে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ট্রাফিকের স্রোতে মন্দা পড়তে থাকে। রান্না-ঘরের তত্ত্বাবধানে যারা ছিল, তারা এসে খবর দেয়, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, এবার বৈঠক ভাঙতে পারে।

খাওয়ার ঘরেও তর্ক আর আলোচনা চলে পুরোদমে। মাঝে মাঝে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাও ওঠে।

—উঃ, মাণিকতলার বস্তিতে কী দিন-গুলোই গেছে ভাই।

—আর ইঁদুরগুলো? এক একটা যেন বাচ্চা শুয়োরের মতো দেখতে। সারারাত ঘরে কী গণ্ডগোল যে করত! সুরেশদার পায়ে কামড়ে দিলে সেবার, একটু হলে চাই কি একটা আঙুলই কেটে নিয়ে যেত।

—নাঃ, এখানে রাজার হালেই আছি বলে মনে হচ্ছে। একেবারে রাইট্ রয়্যাল! স্বাধীন ভারতে আমরা সুমিতাদিকে জন-খাদ্য-বিভাগের প্রেসিডেণ্ট্ করে দেব।

সুমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, থাক, অত অনুগ্রহে দরকার নেই।

—অনুগ্রহ মানে? ভোটের জোরে করে দেব—দেখবেন।

—সত্যি বড্ড খাওয়া হচ্ছে। এ রকম খাওয়া-দাওয়া হলে ক'দিন বাদে আয়েসী হয়ে পড়ব, বাড়ি ছেড়ে আর নড়তে পারব না।

সুমিতা বলে, যাও না তোমরা সব বাড়ি ফিরে। ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমার হাড় আর জ্বালিয়োনা।

খেতে খেতেই একজন গান জুড়ে দেয়ঃ

"যবোনা আজ ঘরে রে ভাই,
যাবোনা আর ঘরে—"

সকলে মুহূর্তে তাকে থামিয়ে দেয়।—থাম, থাম্ বাপু, তোকে আর তেওট তালে হাম্বের-রাগিণী ভাঁজতে হবে না। বিষম লাগিয়ে এমন খাওয়াটা একেবারে মাটি করে দিবি দেখছি।

এমন খাওয়া! তাই বটে সুমিতার মনটা হঠাৎ ছলছল করে ওঠে। কত অল্পে এরা খুশি, কত সামান্য আয়োজনে এরা পরিতৃপ্ত! অথচ, এরা সবাই যে গরীবের ঘরের ছেলে তা নয়। ভালো খাওয়া-দাওয়া কাকে বলে তা এদের অজানা নেই। কিন্তু যে পথে আজ এরা পা দিয়েছে. সেখানে অতীত জীবনকে এরা মুছে ফেলেছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে এত দিনের অভ্যাস, এতদিনের সংস্কার।

কী খেতে পায় এখানে? একটুকরো মাছ, একটুখানি ডাল, আর কোনোদিন বা একটু তরকারী। তাতেই খুশির সীমা নেই, যেন রাজভোগ খাচ্ছে। ওরা মুখে যা কিছু তর্ক করুক. যা কিছু বলুক—জীবনের লক্ষ্য ওদের বাঁধা। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কঠিন পৃথিবী ডাকছে, ডাকছে কঠিনতম কর্তব্য। নতুন মানুষ, নতুন জগৎ। সেই নতুন মানুষদের না আনা পর্যন্ত—সেই নতুন জগৎকে সৃষ্টি করে না তোলা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই—দাঁড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই।

দুশো বছরের পরাধীনতার অভিশাপ। দুশো বছরের কালো অন্ধকার জাতির আর দেশের বুকের ওপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেই পাথরকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে। উদয়-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই লগ্নের জন্যে—যেদিন দিক-চক্রে তিমিরহারী সূর্যের বাণী বয়ে দেখা দেবেন সূর্য-সারথি।

তাঁরই প্রতীক্ষা, তাঁরই সাধনা। বস্তির বিষাক্ত অবরোধে, কারখানার ধোঁয়া আর আগুনে, খর রৌদ্রে, দিগ্বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে। তিলে তিলে নিজেদের জীবনকে ক্ষয় করে ওরা মহা-জীবনের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে।

কতদিন খাওয়া জোটে না, শোবার জন্যে এতটুকু জায়গা পর্যন্ত জোটে না। দু'এক-জনের সাস্পেক্টেড টি বি, কেউবা ম্যাল নিউ-ট্রিশনে ভুগছে। সাধারণের চোখে ওরা শহীদের সম্মান পাবে না, ফুলের মালাও নয়। ওরা বক্তৃতা দেয় না, সভা-সমিতি করেও বেড়ায় না। তাই ওদের নাম নেই কোনোখানে. তাই কেউ ওদের চেনে না। যেদিন মরবে, সেদিনও unwept, unlamented, unsung মহা জীবনের যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণের হবি-বিন্দু মুহূর্তে ছাই হয়ে মিশিয়ে যাবে!

ছেলেরা তখনো পরমানন্দে খাচ্ছে।

—বাঃ, কী চমৎকার ডালটা। কতদিন পরে এমন ডাল জুটল বল দেখি?

—যাই বলো, জগদ্দলের সেই হরবন্শীর মা খাসা অড়োরের ডাল রান্না করে। মোটা মোটা রুটির সঙ্গে সেই ডাল একদিন খেলে তিনদিন পেট ভরে থাকে ভাই।

অকারণেই সুমিতার চোখে জল এল।

রাত বারোটা বেজে গেল।

যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারা-দিন খেটে এসেছে, এখন ঘুমোচ্ছে একেবারে কুম্ভকর্ণের মতো। শুধু দু'চারজন এখনো আলো জেলে পড়াশুনো করছে। আর ঘুম নেই সুমিতার চোখে।

ইন্দুর কবিতার লাইনগুলো মনের কাছে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কবিতা কার? শুধু কি ইন্দুর, না সুমিতারও?

হংস-মিথুন, এখন সেদিন নয়;
বিলের বুকেতে বুনো কলমির ফুল।
বিভোর স্বপ্নে প্রহর হয়েছে ভুল—
কালের আঘাতে সে মোহের হোলো-লয়।—

হংস-মিথুনের মতো নীড় ভাঙলো কাদের? অনিমেষের আর সুমিতার? দেশের আরো বহু মুগ্ধবিহ্বল প্রেমিক-প্রেমিকার? স্বপ্ন দেখছিল তারা, একটা মধুর আ[...] মধ্যে পড়েছিল মূর্চ্ছিত হয়ে। কিন্তু আঘাত—এল নিষ্ঠুর কাল। কোথা[...] নির্মম বাণ এসে বি'ধল অ্যাডোনিসের ব[...] ঈজিয়ানের হীরা মাখানো জল রক্তে লাল গেল।

নীচে নিঃশব্দ রাত্রি—ওপরে তারা[...] আকাশ। অস্বচ্ছ আলোয় পিঙ্গল অ[...] রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর ওপরে প্রেতচ্ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক চক্ষু [...] গুলোর স্রোতে ভাঁটা পড়ে গেছে একে[...] এক আধখানা মোটর যা চলেছে, তাদের যেন বড় বেশী জোর—যেন [...] শব্দে দুপাশের বাড়িগুলো অবধি [...] উঠছে। মাঝে মাঝে দু'একজন প[...] চলেছে, তাদের জুতোর শব্দ যেন পাঁচগু[...] বহুদূর থেকে ভেসে এসে বহুদূরে [...] ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু কোথায় এত [...] কারা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে—হাল্কা একটা গান, সুরটা খ্যামটার মতো। প্রতিমু[...] যারা আসন্ন দুর্বিপাকের প্রহর গুণছে. যেন ওই গানের ভেতর দিয়ে নশ্বর-জ[...] শেষ আনন্দটুকু উপভোগ করে নিতে চা[...]

(ক্রম[...]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[৫]

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সংগে সংগে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টারের খোঁজ করলাম। শুনেছিলাম, তিনি এখানেই আছেন কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করেছিলেন বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর সন্ধান পেলাম না। তখন আর বেশি দেরী করা উচিত হবে না ভেবে সোজা 'কালেওয়া'র রাস্তা ধরলাম। দিনের আলো ফুটে ওঠার সংগে সংগেই বৃটিশ বিমানগুলি ঘোরাফেরা শুরু করলে, একেবারে নীচে দিয়ে। কিছুদূর চলি, আবার বিমানের শব্দে গাছতলায় আত্মগোপন করি, আবার চলি। প্রত্যেকেই খুব অসুস্থ বোধ করছি। মনে হচ্ছে এমনিভাবে আর বেশিদূর যেতে পারবো না। তারপর পথের ধারে অসংখ্য মৃতদেহ দেখে দেখে মনের আশা ভরসা সব কিছুই মাটীতে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদেরও হয়তো এমনি ভাবে পথের ধারে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হতে হবে। মৃত্যুতে দুঃখ নাই, কিন্তু এমনি ভাবে সহায় সম্বলহীন হয়ে পলে পলে মৃত্যু বরণ—এযে অসম্ভব! মাঝে মাঝে টোটা ভরা পিস্তলটির দিকে তাকিয়ে ভাবতাম—হয়তো এরই সাহায্য একদিন নিতে হবে। চৌধুরী বলতো "এতটা সাহস আমার নেই—কাজেই সংগে করে রেখেছি যথেষ্ট 'মরফিয়া'। যদি জীবনে এমন দিন একান্তই আসে, তখন ব্যবহার করা যাবে।" এমনি তখন মনের অবস্থা, তবু প্রাণের ক্ষীণ আশা নিয়ে চলেছি যদি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁাছাতে পারি। মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। আমরাও আজ তাই বেঁচে আছি। নিজেদের যা' চেহারা হয়েছে দেখলে মনে হয় শ্মশান থেকে যেনো কোনও প্রেতাত্মা উঠে এলো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গোঁফ, পরণে ময়লা সার্ট ও প্যান্ট—চোখ বসে গেছে। একে অপরের দিকে তাকাই প্রাণের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও বাইরে সাহস সঞ্চয় করে হাসি আর ভাবি কতোদিনে অবসান হবে এই কষ্টের। আর এর শেষই বা কোথায়?

চলতে হবে তাই চলেছি; সবাই চলেছে আমরাও চলেছি। বেলা প্রায় একটার সময় এসে হাজির হলাম 'পন্থা' নামে একটি গ্রামে। গ্রাম আগে ছিলো বর্তমানে আছে মাত্র কয়েকটি ভাংগা কুটীর। আজকে আর বেশী চলা একেবারেই অসম্ভব, কাজেই দিনটা ও রাতটা এখানেই কাটানো স্থির করলাম। পরিত্যক্ত গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলাম। কুটীর বেশির ভাগই ভেংগে গেছে। এর মধ্যে দু একটা যা মাথা তুলে আছে সেগুলি আগে থেকেই অধিকার করেছে আমাদের ও জাপানীদের পীড়িত সৈন্যরা। যেখানে তারা রয়েছে তার আশে পাশে রয়েছে অনেক মৃতদেহ। 'মিনথা' থেকে টাংগুর পথে দেখেছি শুধু জাপানীদের মৃতদেহ। এখান থেকে সুরু হয়েছে আমাদের। একটি ভাংগা কুটীরে আমরাও আশ্রয় নিলাম। এবার রান্নার বন্দোবস্ত করতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেলাম কয়েকটি কুমড়ো গাছ। তারই কিছু ডাঁটা ও শাক তুলে নিয়ে এলাম। সংগে ছিলো অল্প চাল। তাই আজকের খাওয়াটা একেবারে মন্দ হোল না। কিন্তু আজ আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম—জীবনে তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমাদের সামনেই একটি ভাংগা কুটীরে কয়েকজন রুগ্ন জাপানী আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদেরও কিছু খাবার ছিলো না। কিছুদূরে একটি মরা কুকুর পড়ে ছিলো। কতোদিনের তা বলা যায় না। জাপানীরা সেই কুকুরটিকে কেটে ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস টুকরো টুকরো করলো। তারপর কুড়িয়ে আনলে একটি ভাংগা টিনের টুকরো। একটু উনান মতো করে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালালো। তারপর সেই মাংস সেই টিনের উপর রেখে সেঁকতে শুরু করলে! একটি কঞ্চি এনে তা দিয়ে তৈরী হোল 'চপস্টিক' (chop stick)! তারপর শুরু হোল তাদের খাওয়া! পাঁচ ছ'জন এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরম আনন্দ সহকারে সেই আধপোড়া কুকুরের মাংস খেতে লাগলো! বেশীক্ষণ এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না! অবস্থা আজ প্রায় সমপর্যায়ে কাজেই এদের অবস্থা আজ পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে পারি। ক্ষুধা পেলে মানুষ কি না খেতে পারে? বাঁচবার জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। মনে পড়ে গেলো ছেলেবেলাতে গল্প পড়েছিলাম কোনও এক লর্ডের ছেলে যুদ্ধে কয়েকদিন খেতে পায়নি! কয়েকজন সৈনিক কয়েকদিনের শুকনো এক টুকরো রুটি 'ডাস্টবিনে' ফেলে দিয়েছিলো আর সেই লর্ডের ছেলে পরম পরিতৃপ্তির সংগে সেই রুটির টুকরো খেয়েছিলো! সেদিন মনে হয়েছিলো এ শুধু গল্প, এর মধ্যে সত্যতা থাকতে পারে না। কিন্তু আজ বুঝেছি মানুষের ক্ষুধার জ্বালা কি তীব্র! তাই তো লড়ায়ে ঘোড়া, গরু, গাধা কিছুরই মাংস বাদ যায় না—অবস্থার ফেরে!

এখান থেকে কিছু দূরে শুনলাম, দু'একটা গ্রাম আছে। দুপুরে খাওয়ার পর আরদালীকে পাঠালাম, যদি কিছু চালের জোগাড় করতে পারে। খানিক পরে ঘুরে এসে জানালে পয়সা দিয়ে কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, তবে কাপড় জামা থাকলে তার পরিবর্তে কিছু চাল পাওয়া যেতে পারে। নিজেদের পুরাতন জামা দিয়ে পাঠালাম একটী ছিটের সার্টের পরিবর্তে মাত্র এক পাউন্ড চাউল! যাই হোক্ প্রাণ বাঁচলে সব কিছুই হবে, এই আশাতে আমরা প্রায় চার পাউন্ড চাল যোগাড় করলাম! দিন দুয়েকের জন্য এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো! সংগে সংগে প্রাণে আশা এলো—এবার পথের পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম পড়বে আর চেষ্টা করলে কিছু চাল পাওয়া অসম্ভব হবে না!

পরের দিন সকালে উঠেই চলতে লাগলাম! এবার রাস্তা অনেকটা ভালো! সন্ধ্যার অল্প আগে একটী ছোট পল্লীতে আশ্রয় নিলাম! পরদিন পেঁাছলাম 'ওয়াটক্'! এখানে পেঁাছে প্রথমে কোথাও জায়গা পেলাম না। রাস্তার ধারে যা দু'একটা ভাংগা মন্দির আছে সেখানে পড়ে আছে মৃতদেহ! কাজেই একেবারে ভিতরের দিকে গ্রামের মাঝে আশ্রয় খুঁজে এলাম! এখানে আমাদের পূর্ব পরিচিত কয়েকজন 'আজাদ হিন্দ দলের' লোকের দেখা পেলাম। তারমধ্যে রোহিণী চৌধুরী, লাহা আর সেনগুপ্ত, এই তিনজন বাঙালী ও আর দুইজন ইউ, পি'র লোক! এ দলটী এবার আমাদের সংগে যোগ দিলে! আগে আমরা ছিলাম চারজন, এবার হলাম নয়জন! তার উপর সুবিধা হচ্ছে চৌধুরী বেশ সুন্দর বর্মী ভাষা বলতে পারে কাজেই নানা কাজে তার অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে! এ গ্রামে কিছু ধান পাওয়া গিয়েছিলো, তাই কুটে চাল তৈরী করে নিলাম! কাছেই একটী বড় নদী! শুনলাম তাতে এত বেশী জল যে, পার হওয়া অসম্ভব! ভাবলাম দু'একদিন গ্রামেই থাকবো তারপর সুযোগ সুবিধা দেখা যাবে। কিন্তু পরদিন

সকালে দেখি নদীর একটী জায়গা দিয়ে কতক জাপানী পার হচ্ছে! আমরাও তৈরী হলাম! এক জায়গাতে প্রায় বুক জল। সকলে সেখান দিয়ে পার হচ্ছে! স্রোত এতো বেশী যে, আড়াআড়ি পার হতে গেলেও অনেকদূর পর্যন্ত নীচের দিকে নেমে যেতে হয়। সকলে যেভাবে পার হচ্ছে আমিও সেইভাবে তৈরী হলাম, অর্থাৎ বুট, পট্টী ও প্যাণ্ট খুলে শুধু একটী মাত্র 'আণ্ডারওয়ার' ও সার্ট গায়ে রইলো। আর যা কিছু জিনিস ছিলো সব কিছু 'পিঠু'টার মধ্যে ভর্তি করে তা মাথার উপর চাপালাম। সাঁতার একেবারেই জানি না কাজেই ভয় বেশ করছিলো। যাই হোক সকলে পার হচ্ছে আমরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে জলে নামলাম! মাথায় বোঝা নেওয়া একেবারেই অভ্যাসের বাইরে কাজেই 'পিঠু' জলে পড়ে গেল! ধরবার চেষ্টা করতেই স্রোতের মাঝে আর পা রাখতে পারলাম না! কোন রকমে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ওপারে উঠলাম! জিনিষপত্র সবই ভেসে গেলো! অন্যান্য জিনিসের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইনি! তবে আমার ডায়েরী ও পিস্তলটী যাওয়াতেই বিশেষ দুঃখিত হলাম! যাক, কোনক্রমে প্রাণ তো বেঁচে গেলো! এবার আর সঙ্গে ভারী জিনিস কিছুই নেই! চৌধুরীর কাছে একটী প্যাণ্ট ছিলো, পরলাম। খানিক দূর চলার পর বুটের অভাব বেশ ভালো করেই অনুভব করলাম! পথে অসম্ভব কাদা। কোথাও হাঁটু জল। কাদায় পা রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো! এইভাবে খানিকদূর যাওয়ার পর একটী গ্রামে এলাম। এবারও একটী ছোট নদী পার হতে হবে। এই গ্রামে আসার পর দেখলাম আমাদের কয়েকজন অফিসার ও সিপাহী এখানে জমা হয়েছে! শোনা যাচ্ছে এ পথে এই নদীর পর আরও একটী খুব বড় নদী পার হতে হবে! সে নদীতে এতো বেশী স্রোত যে, একমাত্র হাতী ছাড়া সে নদী পার হওয়া অসম্ভব! এখানে গান্ধী রেজিমেণ্টের ডাক্তার মেজর শাহ ও মেজর হাসানের সঙ্গে দেখা হোল। তাঁরাও এখানে আটকা পড়েছেন। শা'হের কাছে শুনলাম ডাঃ বীরেন রায় ও কানাই দাস আগেই নদী পার হয়ে গেছে! মেজর হাসানের সঙ্গে আগে পরিচয় ছিলো না, শুধু নামই শুনেছিলাম। তিনি বার্লিন থেকে নেতাজীর সঙ্গে আসেন এবং রেজিমেণ্টের আসার আগে তিনি কিছুদিন নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে। তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে ও তাঁর ব্যবহারে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি! এতো দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁকে সর্বদা হাসতে দেখেছি! কাপড়, জামা তাঁরও কিছু ছিলো না, যা পরেছিলেন, শুধু তাই! পা এক জায়গাতে কেটে যাওয়াতে খালি পায়েই হাঁটতে হচ্ছিল। আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন,—"সামনের নদী পার হয়ে আমরা সোজা পথে না গিয়ে 'চিন্দুইন' নদীর ধার ধরে ধরে 'কালেওয়া'র পথে চলবো! কাছে যে ছোট নদীটা ছিলো তাতেও প্রায় আগের নদীর মতোই জল! কাজেই এবার একটু তৈরী হয়েই নদীতে নামলাম। রোহিণী চৌধুরী ও আমার আরদালী দিলওয়ারা সিং খুব ভালো সাঁতার জানতো! তাদের আগে নদী পার করিয়ে ওপারে একটু নীচের দিকে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম! আমার কাছে কোনো বোঝাই ছিলো না, কাজেই ডাঃ চৌধুরীর জিনিসপত্র আমরা আধাআধি করে ভাগ করে নিলাম। তারপর বিশেষ সতর্কভাবে জলে নামলাম! কিন্তু অবস্থা সেদিনকার মতো একই হোল। খানিক পরেই আর ভার রাখতে পারলাম না। তখন রোহিণী আমাকে জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়ে—ডানদিকে সাঁতার কাটতে বললো। আমি সেভাবে চলার চেষ্টা করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে কোনও রকমে দিলওয়ারার সাহায্যে তীরে উঠলাম। আমার কাছ থেকে পিঠুটা জলে ভেসে গিয়েছিলো, রোহিণী তা উদ্ধার করে। আজকের দিনে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকজন জলে ভেসে গেলো। তাদের বাঁচাবার কোন উপায় ছিলো না! এবার নদী পার হওয়ার পর আমরা একটী বিরাট দলে পরিণত হলাম! আট দশজন অফিসার ও প্রায় দেড়শো সিপাহী।

এতোবড় একটী দল, একসঙ্গে পথ চলা নিরাপদ নয়, তাই আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মেজর হাসানের সঙ্গে চলতে লাগলাম! একটী ম্যাপ তাঁর সঙ্গে ছিলো—আমরা সেইটি দেখে তদনুযায়ী পথ চলছিলাম। প্রথমদিন এমনিভাবে সারাদিন চলার পর একস্থানে উপস্থিত হলাম। সেখানে আগে একটী গ্রাম ছিলো, কিন্তু বর্তমানে অর্ধদগ্ধ কয়েকটী কাঠের খুঁটী ছাড়া গ্রামের আর কোনো চিহ্ন নেই! রাতে এখানেই থাকতে হবে কাজেই কয়েকটী পোড়া টিন সংগ্রহ করে একটু ছাদের মতো তৈরী করলাম। তার ভিতরে আমাদের ভিজে কম্বল বিছিয়ে নামেমাত্র বিছানা তৈরী হোল! ছোট ছোট 'পিশু'র কামড় অসহ্য হোল। বহু খোঁজাখুঁজির পর একটু কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালানোর পর ধোঁয়াতে 'পিশু'র অত্যাচার একটু কমলো। এই গ্রামেও কিছু কিছু শাক-সব্জীর গাছ ছিলো—তাই সিদ্ধ করে ভাত খাওয়া হোল! রাতে সেই ভিজে জামা কাপড় পরেই শুয়ে পড়লাম, কিন্তু মশার কামড় আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদে পোকা 'পিশু'! গায়ে দেবার মতো কিছু নেই। চৌধুরীর ভিজে মশারীটা দিয়ে বেশ করে আপাদ-মস্তক মুড়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তি যথেষ্ট, তাই নিদ্রা এলো! "শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়" এই প্রবাদ বাক
যে কতোখানি সত্য তা বেশ ভালো করেই
বুঝতে পারছি! পাঁচ মাইল হাঁটার পর
মনে হচ্ছে আর একপা এগুনোও সম্ভব
তখন এই শরীরটীকে মনের আদেশে অ
দশটী মাইল টেনে নিয়ে গেছি! সামান্য এ
ভিজে জামা গায়ে দিলে ভয় হোত, জ্বর হ
হয়তো বা 'নিউমোনিয়া' হবে, কিন্তু এ
প্রতিদিন শুধু জলের মধ্যে থেকে দিন
ভিজে জামা কাপড় ব্যবহার করেও
শরীরে সব সহ্য হয়।

পরদিন সকালে উঠে আবার যাত্রা! এ
অবশ্য সন্ধ্যার আগে একটী ছোটখাটো গ্র
আশ্রয় পেলাম! এ গ্রামে লোকজন আ
আমরা একটী খালি বাড়িতে আশ্রয় নিল
আর আমাদের লোকেরা বর্মীদের বাড়ির ন
কোনও রকমে রাত কাটালো। চা-পাতা স
সঙ্গে ছিলো, কিন্তু এতোদিন চিনি বা
কিছুই ছিলো না, এবার গ্রাম থেকে কিছু
সংগ্রহ করলাম! আর সংগ্রহ করলাম
বর্মী 'সিলে' অর্থাৎ 'সিগার'। ধূম-পা
কিছুদিন বাধ্য হয়েই বন্ধ রাখতে হয়েছি
এবার সুযোগ পাওয়াতে ইচ্ছাটা খ
বলবতী হয়ে উঠলো।

রাতটা গ্রামে কাটিয়ে আবার ভোর বেল
চলতে শুরু করলাম। এবার আমাদের পেঁছা
হবে 'মোলায়েক'। আজ সেখানে পেঁৗ
সম্ভব নয়—তাই, দিনে খানিকটা বিশ্রাম
হোল। ইচ্ছা, রাতে হাঁটা। গ্রাম থেকে 'গা
নিয়ে চলতে লাগলাম! আমাদের মধ্যে অনে
অসুস্থ ছিলো, তাদের পক্ষে এইভাবে পথ
একেবারে অসম্ভব। তবু মেজর হাসান
গরু তাড়ানোর মত করেই সঙ্গে নিয়ে চলে
কারণ পথের ধারে একা যে পড়ে থাকবে ম
তার নিশ্চিত। তাই কষ্ট সহ্য করেও
রকমে যদি তারা পেঁছাতে পারে 'কালেওয়
তবে তাদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা হতে পার
এমনিভাবে সকলকে নিয়ে যাওয়াও বড় সে
কথা নয়, বিশেষ করে সঙ্গে কয়েক
আমাশয়ের রুগী! তারা খানিকটা চলে, আ
বসে পড়ে। আবার তাদের তাড়া দিবে বা
কথায় সঙ্গে করে নেওয়া। এমনিভাবে চ
চলতে ভোরের একটু আগে 'মোলায়ে
কাছে এসে পেঁছলাম। এতো
একসঙ্গে শহরে থাকা নিরাপদ
কাজেই শহর থেকে প্রায় দু'ম
দূরে একটী ছোট জঙ্গলে আশ্রয় নিল

আগে এখানে একটী ছোট শহর ছি
এখনও অনেক সুন্দর সুন্দর বড় বড়
চারদিকে পড়ে রয়েছে! ফুটবলের মাঠ, স্কু
বাড়ি, সব কিছুই দাঁড়িয়ে থাকলেও
এখানে একেবারেই নেই! সকলেই গ্রামে অ
নিয়েছে! এখানে আসার পর আমাদের নয়জ

মধ্যে পাঁচজনের জ্বর হোল। এর পরে আমাদের পক্ষে আর হে'টে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়! রোহিণী চৌধুরীকে ধরলাম, যে করেই হোক একটী নৌকার বন্দোবস্ত করো। শুনেছিলাম 'মনেয়াতে' আমাদের একটী হাসপাতাল খোলা হয়েছে—সেই পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। চৌধুরী ঘোরাঘুরির পর জানালে, এই জংগলে থাকলে কোনও খবর পাওয়া যাবে না। নদীর ধারে গ্রামের যে বাজার আছে, সেখানে ঘর খালি আছে। আমরা সেখানে গিয়ে থাকলেই ভালো হয়। জায়গাটা অবশ্য খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, আমাদের সাথী এতোগুলি রুগী, বিপদকে ভয় করলে চলবে না। বাজারের ঘরে এসেই আশ্রয় নিলাম। রোহিণী চৌধুরী রেংগুনে আলুর ব্যবসা করতো, মাসে লাভ কম করে প্রায় হাজার টাকা থাকতো। সবকিছু দান করলেও তার কাছে হাজার দুয়েক টাকা ছিলো। কাজেই এখানে আসার পর আবার দোকানপসার দেখে, খাওয়ার সখ জেগে উঠলো। মাছ, মাংস ও ভাত বহুদিন পরে একসাথে খেয়ে পরম পরিতৃপ্তি পেলাম। আবার লোকালয়ে এসে যে এমনিভাবে দিন কাটবে—তা কয়েকদিন আগেও ভাবতে পারি নি! এখানে দুদিন থাকার পর, চৌধুরীর অক্লান্ত চেষ্টায় শেষে একটী নৌকার যোগাড় হোল! ছোট নৌকা আমরা নয়জন, আর এগারজন বর্মী ও মাঝি মাল্লা তিনজন। ভাড়া ঠিক হোল একেবারে 'মনেয়া' পর্যন্ত দেড় হাজার টাকা। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ভগবানের নাম নিয়ে নৌকায় উঠে বসলাম! জায়গা একেবারেই কম! কোন রকমে একটু বসে যাওয়া। শরীর নড়াবার যো নেই! তবু হাঁটার চেয়ে এযে শতগুণে ভালো।

আমরা বহু কষ্টে বসবার মতো একটু জায়গা পেলাম! অন্য যে এগারজন বর্মী ছিলো, তাদের মধ্যেও কয়েকজন অসুস্থ। একজন তো একেবারে শয্যাশায়ী! আমাদের মধ্যেও ডাঃ চৌধুরীর জ্বরের উপর আমাশা শুরু হোল। যুক্তপ্রদেশবাসী দুজনের মধ্যে একজনের প্রবল জ্বর! সারা রাত নৌকো চলার পর ভোরের আগে একটী গ্রামের পাশে নৌকো বাঁধা হোল! দিনের মতো গ্রামে আশ্রয় খুঁজে নিলাম! কারণ দিনের বেলা নদীতে নৌকো চালানো মোটেই নিরাপদ নয়! 'চিন্দুইন' নদীর দুধারেই অসংখ্য পল্লী। রাস্তা থেকে দূরে বলে, এ সকল পল্লী বিমান আক্রমণ থেকে এখনো পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে! গ্রামে দেখলাম, শুধু কাপড়ের অভাবটাই বেশী, চালের অভাব এদিকে নেই। কাপড়ের অভাবে অনেকেই খদ্দরের কাপড় ব্যবহার করছে। সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ করে আবার নৌকোতে উঠে বসলাম! আগে এই নদী হে'টে পার হয়েছি, আজ তারই কি ভীষণ মূর্তি! নৌকো স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছে, মাঝিরা শুধু নজর রেখেছে ঘূর্ণিস্রোতের উপর! অন্ধকার রাত, খালি নদীস্রোতের শব্দ শোনা যাচ্ছে! আশপাশের গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ আলোর রেখা! নদীর উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অনেক বড় বড় গাছ কাঠ প্রভৃতি! আমাদের ছোট্ট নৌকাখানা আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে স্রোতের বেগে! সারারাত চুপচাপ বসে থাকা! চোখে ঘুম আসে অথচ ঘুমাবার উপায় নেই! এমনিভাবে পঞ্চম দিনে পে'ছিলাম 'মিনজিন'। এখানে নদীর কাছাকাছি একটী বৌদ্ধমন্দিরে থাকবার জায়গা ঠিক করলাম! এখানকার বাজারে প্রায় সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়! পায়ে জুতো ছিলো না, আড়াই টাকা দিয়ে কিনলাম একটী কাঠের খড়ম! বাজার থেকে মাংস কিনে আনা হোল! রুগীদের জন্য 'সুপ', অন্যদের জন্য মশলা দিয়ে রাঁধা! এখানে লীগের সভাপতির সংগে দেখা করলাম! তিনি 'রাসনে'র জায়গা দেখিয়ে বললেন, "যা ইচ্ছা নিন।" চাল, ডাল, নুন, তেল, বিস্কুট, বিড়ি সব কিছুরই বন্দোবস্ত ছিলো। আমার একটী খাকী সার্ট ছাড়া অন্য জামা ছিলো না—তাই একটি খদ্দরের সার্ট ও একটী ছোট মশারী চেয়ে নিলাম! সন্ধ্যার পর বেশ জোরে বৃষ্টি হোল, কাজেই সে রাত্রে আর যাওয়া হয়ে উঠলো না! এখানে 'আজাদ হিন্দ দলের' কয়েকজন কর্মী আছে। তারা নৌকা করে এখান থেকে 'কালেওয়া' পর্যন্ত পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে! ফ্রন্টে আমাদের অবস্থার খবর পাওয়ার পরই এদিক থেকে সব রকম বন্দোবস্ত শুরু হয়। কিন্তু পথ বন্ধ তাই সব জিনিস নৌকা করে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। 'কালেওয়া'র আগে কোনো বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর নয়! কাজেই 'কালেওয়া'তে আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজেরা উপস্থিত থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করছেন!

দ্বিতীয় দিনেও আমরা 'মিনজিন' ছিলাম! সেখানকার লোকেরা তখন ভয় পেয়ে দূরের গ্রামগুলিতে চলে যাচ্ছে। কারণ, শুনলাম, বৃটিশ নাকি কাগজ ফেলেছে যে, গ্রামবাসীরা যেন মিলিটারী ক্যাম্প স্টেসন ও নদীর তীরের গ্রামগুলি থেকে দূরে সরে যায়! বৃটিশ বেশ ভালো করেই জানতে পেরেছে যে, পথ বন্ধ হওয়াতে জাপানীরা নদীপথ ব্যবহার করছে! সকালেই কয়েকখানা বিমান এসে নদীর উপর যেসব নৌকা ছিলো তার উপর মেসিনগান চালায়। একটি ছোট জাপানী স্টীমার একেবারে লতাপাতা দিয়ে ঢাকা ছিলো—তাতে গুলী লেগে আগুন লেগে যায়! আমরা মোটা দেওয়াল দেওয়া বুদ্ধ মন্দিরের মাঝে বসে বসে অনবরত মেসিনগানের টিক টিক আওয়াজ শুনেছিলাম! খানিক পরেই বিমানগুলি চলে গেল, কিন্তু সারাদিন প্রায় মাথার উপর পাহারা দিতে লাগলো! সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা আবার নৌকো চালালাম! যে লোকটীর জ্বর হয়েছিলো তার অবস্থা বেশী খারাপ! বার বার উঠে দাঁড়াতে চায়। ভয় হতে লাগলো হঠাৎ না পড়ে যায়। সেইজন্য তার হাত পা বে'ধে

দিলাম। নৌকো ছেড়ে দিয়ে মাঝিরা দেখি বেশ আরামে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আমাদের চোখে মোটেই ঘুম নেই। নৌকো আপন মনে ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি দেখে আমাদের ভয় হয়। মাঝিকে ডেকে তুলি! সে ঘুম চোখেই জলের দিকে একটু তাকিয়ে বলে, "কেসা মিশিবু" অর্থাৎ পরোয়া নেই। সে তো পরোয়া নেই বলে আবার বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে অথচ সেই বিরাট জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে আমরা বার বার ভয় পাই! যদি নৌকো একবার ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ে তা হলে মৃত্যু অবধারিত। একবার সত্য সত্যই নৌকো একেবারে ঘূর্ণিস্রোতের কাছাকাছি এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি মাঝিকে ডাকাতে তারা বহু কষ্টে নৌকো সরিয়ে আনে। এইভাবে সারারাত কাটিয়ে ভোরের বেলা আবার একটী ছোট গ্রামের পাশে নৌকো বাঁধা হোল! এখানে নেমে গ্রামে 'তাজি' অর্থাৎ সর্দারের কাছে আমাদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বললাম। সে আমাদের থাকার জন্য একটী মন্দির ঠিক করে দিলে। তারপর দুপুরে বেলা বর্মী মেয়েরা আমাদের জন্য ভাত তরকারী রেঁধে নিয়ে আসে! এক একটী বাড়ি থেকে একজনের জন্য খাবার এলো। তারা আমাদের খাইয়ে তাদের বাসন নিয়ে চলে গেল। বর্মীদের খাবার প্রথা হচ্ছে এইরকম—মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার উপর ছোট ছোট টেবিল দেওয়া হয়। কতকটা আমাদের দেশের জলচৌকির মতো। একটী বড় পাত্রে ভাত থাকে আর অন্য কয়েকটী পাত্রে থাকে তরকারী। সামনে খালি থালা থাকে, তাতে অল্প অল্প করে ভাত তরকারী তুলে নিয়ে খেতে হয়। আমাদের মতো থালায় সব ভাত একসঙ্গে নিয়ে বসলে বর্মীরা তা দেখে হাসে। সন্ধ্যাতেও এমনিভাবে গ্রাম থেকে ভাত তরকারী এলো, আমরা তাই খেয়ে আবার নৌকোতে উঠলাম! শুনেছি বর্মার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম প্রত্যেক গ্রামের 'তাজিকে' হুকুম শুনিয়েছেন যে, তারা যেন জাপানী ও আজাদ হিন্দ সৈন্যদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। সেই আদেশ মতোই হয়তো আমরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

এইভাবে দিনে বিশ্রাম ও রাতে নৌকো চালিয়ে প্রায় দশদিনে 'মোলায়েক' থেকে নদী-পথে একশো আশি মাইল পথ পার হয়ে ১৪ই আগস্ট তারিখে 'মনেয়া' এসে পেঁছিলাম। ভোরের একটু আগে পেঁছেছিলাম, কাজেই শেষ রাতটা নদীতীরেই কাটিয়ে দিলাম! ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমাদের আই এন এ হাসপাতালের খোঁজে বেরুলাম! হাসপাতাল কাছেই ছিলো, খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি! হাসপাতালে প্রথমেই মেজর সত্যেশ ঘোষের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি আমার অবস্থা দেখে তো অবাক! তারপর বললেন, "বাসু, তুমি ১লা জুলাই থেকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছ।" আমি জানালাম, "সে খবর পরে হবে, আগে আমার যে রুগী আছে তাদের হাসপাতালে আনার বন্দোবস্ত করুন। তারপর একটু ভালো খাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।" রুগীদের আনবার জন্য তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স গাড়ী পাঠানো হোল। হাসপাতাল সবে মাত্র খোলা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 'ফ্রন্ট' থেকে রুগী এসে পেঁছায় নি। আমরাই প্রথম রুগীর দল। আমরা সকলেই হাসপাতালে ভর্তি হলাম। সকলেই আমাদের কাছ থেকে তখন খবর জানবার জন্য ব্যস্ত। কারণ আগের দিকে যে একটা বিপর্যয় ঘটেছে সে খবর সকলে জানলেও প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! এখানে ডাঃ ঘোষ ছাড়াও হাসপাতালের কম্যাণ্ডার মেজর রঙ্গচারীকেও আগে থেকেই জানতাম। আমার অবস্থা দেখে সকলেই সহানুভূতি জানালেন। ঘোষ সাহেবের কাছ থেকে কিছু কাপড় জামা যোগাড় করলাম। তারপর বহুদিন পরে গরম পরোটা ওমলেট সংযোগে চিনি ও দুধের চা খেলাম! আমাদের ডাঃ চৌধুরীও আমারই সঙ্গে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছেন। চৌধুরীকে আমাশা বেশ শক্ত ভাবেই ধরেছে। যার যার জ্বর হয়েছিলো, একেবারে বেহুঁস। এই হাসপাতালটীর 'টামু' কাছাকাছি 'পন্থা' যাওয়ার কথা ছিলো, এবং সেজন্য তৈরী হয়েই তারা সিংগাপুর থেকে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে হাসপাতাল আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি! হাস-পাতালে প্রায় পাঁচশো রুগী রাখার মতো বন্দোবস্ত করা হয়েছে, আর এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটী আমবাগানেও প্রায় দুশো রুগী রাখার মতো ব্যবস্থা করা হচ্ছে! আমরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু'চার দিন পরেই মেজর আকবর আলী শাহ হাসপাতালে ভর্তি হলেন জ্বর নিয়ে। এদিকে চৌধুরীর আমাশা কমে গেল, কিন্তু তাকে আবার জ্বরে ধরল।

পথে আমার স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ ছিলো না, কিন্তু এখানে পেঁছানর পরই আমাকেও ম্যালেরিয়া ধরলো। চৌধুরী ও শাহের জ্বর ক্রমে 'টাইফাস' বলে প্রমাণিত হোল। দুজন ডাক্তার এইভাবে 'টাইফাসে' আক্রান্ত হওয়াতে হাসপাতালের প্রত্যেক ডাক্তার যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে তাদের চিকিৎসা ও সেবা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ডাঃ শাহ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। যথাবিধি সামরিক কায়দায় তাঁকে সেলামী দেওয়ার পর তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তখন চৌধুরীর অবস্থাও ততো সুবিধার নয় সেইজন্য শা'হের মৃত্যুসংবাদ তার কাছে গোপন রাখলাম। কিন্তু এখবর চাপা রইলো না। পরদিনই চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনলাম শা' নাকি

মারা গেছেন।" আর গোপন রাখা চলে না, কাজেই জানালাম, খবর সত্য।

সেইদিন থেকে চৌধুরীর অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। 'ইনজেকশন' নেওয়ার পর আমার জ্বর সেরে গেলো। যতোটা সম্ভব চৌধুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম। একদিন আমাকে বললে, "বাসু, আমারও দিন ফুরিয়ে আসছে।" তাকে অনেক বোঝালাম "ভয়ের কোনো কারণ নেই, তোমার জ্বর ছেড়ে গেছে, শুধু একটু দুর্বলতা আছে। দুধ একটু বেশি করে খেলেই ও দুর্বলতাটুকু কেটে যাবে।"

পরের দিন তিরিশে আগস্ট বেলা প্রায় চারটের সময় চৌধুরী বললেন, "আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে, একবার মেজর প্রসাদকে ডেকে দাও।" তৎক্ষণাৎ মেজর প্রসাদকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনি এসে একটি 'সেরামিন' 'ইনজেকশন' দিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় চৌধুরী তার নিজের আরদালীকে ডেকে সারা শরীর বেশ ভালো করে 'স্পঞ্জ' করালেন। বেলা প্রায় ছটার সময় অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে যায়, রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেজর প্রসাদকে ডেকে আনলাম। 'সেলাইন' দেওয়া শুরু হোল, কিন্তু নাড়ীর কোনও উন্নতি না দেখে বুঝতে পারলাম আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় তার আত্মা আমাদের ছেড়ে অমরলোকে প্রস্থান করলো।

আমরা দুজনে লক্ষ্ণৌতে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি। মালয়েতে দেখা হয়েছে, আবার একই সঙ্গে ফ্রন্টে এসেছি, একই সঙ্গে পিছু হটেছি। নানা দুঃখ কষ্টের মাঝে একই সঙ্গে কাটিয়ে আমাদের মধ্যে হয়েছিলো প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আজ সেই দুঃখ কষ্টের সাথী পুরাতন বন্ধুকে হারিয়ে প্রাণে যে বেদনা পেলাম তা জানাবার নয়। চারদিকে মৃত ও মৃত্যু দেখে হৃদয় অনেকটা পাষাণে পরিণত হলেও আজ প্রিয় বন্ধুর বিয়োগে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো, কাজেই আজ আর শেষকৃত্য হতে পারে না। মৃতদেহ যত্ন-সহকারে রেখে দেওয়া হোল, কাল সকালে যথাবিধি কাজ করার জন্য। ঠিক পাঁচটি বছর পূর্ণ হোল তার চাকরীর। আমাদের পরিচয়েরও আজ পূর্ণ হোল পাঁচটি বছর, আর সব কিছু শেষ হোল আজই।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে বহু রুগী ভর্তি হয়েছে আর প্রতিদিন কমপক্ষে দশ পনের জন করে মারা যাচ্ছে। তাদের সৎকার করা প্রায় অসম্ভব। রাবণের চিতার মতো একটি চিতা জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে প্রায় এক মাইল দূরে। মৃতদেহগুলি নিয়ে গিয়ে তারই মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

সেই সময়ে সেখানে আমাদের এ ডি এম এস কর্ণেল 'রয়' ছিলেন। সকালে হাসপাতালের সব ডাক্তার মিলে স্ট্রেচারে করে আমরা চৌধুরীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেলাম। সেখানে সামরিক কায়দায় আমরা সকলেই অভিবাদন করলাম। তারপর একটি নূতন চিতা তৈরী করলাম তার জন্য। পরে অন্যান্যরা সকলেই চলে এলেন। আমি, সাব-অফিসার গুপ্ত, মেজর ঘোষ, আমার ও চৌধুরীর আরদালী শেষ পর্যন্ত চিতা ধুয়ে বেলা প্রায় চারটেয় ক্যাম্পে ফিরলাম। চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রাণে আঘাত পেয়েছি, তার উপর সারাদিন আগুনের কাছে থাকাতে আমার আবার জ্বর এলো। তখন অন্য হাসপাতালটির কাজ শুরু হয়েছে। আমি মেজর রঙ্গচারীকে, আমাকে সেখানে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলাম। কারণ এই হাসপাতাল আর আমার কাছে ভালো লাগছিলো না। যেদিন চৌধুরীর মৃতদেহ সৎকার করি সেইদিন সন্ধ্যায় তার খালি বিছানায় এসে ভর্তি হোল—আর একজন বাঙালী, চন্দ্র। ভদ্রলোক আগে পোস্ট অফিসে কাজ করতেন পরে 'সিঙ্গাপুর ব্রডকাস্টিং-এ' কাজ করেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। পরে জাপানী ভাষা ভালো করে শিক্ষা করার পর তিনি 'হিকারী কিকনে' দোভাষীর কাজ করতেন। বহুদিন থেকেই জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। ভর্তি হওয়ার পরেই আমাকে বললেন, "ডাক্তারবাবু আমার আর বেশি দিন বাকী নেই।" তাঁর অবস্থা দেখে অবশ্য তাই মনে হোল তবু প্রবোধ দিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনিও মারা গেলেন। এর পরে আমার আর এখানে একেবারেই ভালো লাগলো না, কাজেই আমিও তাড়াতাড়ি 'মাহু' হাসপাতালে চলে গেলাম। সেখানে ডাক্তার ছিলেন মেজর ঘোষ। দুশোর উপর রুগী। কাজেই আমার নাম রুগীর তালিকাতে থাকলেও সকাল বেলাটা আমাকেও ডাক্তার হিসাবে কাজ করতে হোত। এই হাসপাতালটি ছোট একটি বাগানের মধ্যে। গ্রাম এখান থেকে দুই এক মাইল দূরে দূরে। আমরা রোজ সন্ধ্যার সময় বাইরে রাস্তায় বেড়াতে যেতাম। রুগী অনেক আসতো। 'কালেওয়া'তে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে, তবে সেখানে বিমান আক্রমণ খুব বেশি—কাজেই যতোটা সম্ভব বেশি সংখ্যায় রুগী পাঠানো হচ্ছে 'ইউ'-তে। 'ইউ' থেকে রেলপথে ও লরীতে রুগী আসছে 'মানরা ও মাহু'তে। বেশির ভাগই হচ্ছে আমাশা ও পুরাতন ম্যালেরিয়া। রুগীরা যে অবস্থায় হাসপাতালে এসে পৌঁছাচ্ছে সে দৃশ্যও বড় করুণ। ক্ষীণ, দুর্বল দেহ, পরনে জামা কাপড় নেই। অনেকে আবার বহুদিন ঠিক মতো খেতে না পাওয়াতে খুব বেশি খেতে আরম্ভ করেছে 'কালেওয়াতে' আর সঙ্গে সঙ্গে অসুখ। আমি এ-ক্যাম্পে আসার পর আজাদ হিন্দ দলের নাহার মৃত্যু হয় 'মনেয়া হাসপাতালে।

(ক্রমশ)

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20

রূপসী
তরল আলতা
PARIS AT YOUR DOORS
ENJOY PARIS IN INDIA
Elite
BEAUTY SERIES
SANYCO

নিজ নিজ মতলব চরিতার্থ করার জন্য উন্মুখ হয়ে যেখান সেখান থেকে ওঁৎ পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই কেউ বিঁধে যায় আপনার পায়ে, কেউ ছিঁড়ে দেয় আমার জামা।

যে পেরেকটি আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, তার পরিচালক ছিলাম আমি। আমি বেজায়গায় বেকায়দায় সেটা পুঁতেছিলাম। নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা আমার আদপেই নেই, বিশেষ করে পেরেকের নেতৃত্ব গ্রহণের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। মাথা যখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছিলো, রাগের ঝোঁকটা যখন একটু মন্দা পড়েছিলো—তখন একথা ভেবেছিলাম। তাই, আমার নিজের ক্ষতির জন্যে নিজেকেই দায়ী করা মনস্থ ক'রেছিলাম। হাতে একটি হাতুড়ি পেলেই আমরা নিজেদের পেরেকের অধিপতি মনে করি, আর স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না ক'রে পেরেকের ব্যবহার শুরু ক'রে দিই। তার ফলে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার আমাদের করতে হয়। একথাও ভেবে দেখেছিলাম।

কিন্তু নিজেকে দায়ী ক'রে আর রাখা যায় কতক্ষণ। যখন পেরেকদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে তাদের গালাগাল করলেও তাদের রা করার উপায় নেই—কথা বলার ভাষা নেই, তখন নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই ভাল। আমার হাতে হাতিয়ার আছে হাতুড়ি। চিন্তার কোনো কারণ আমার নেই। আমার হাতে চালিত হ'য়ে যদি কোনো পেরেক উদ্ধত আক্রোশে আমাকে আক্রমণ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে ব'লে মনে হয়, বেপরোয়া হাতুড়ি পিটে সে-পেরেককে সম্পূর্ণ সমাধিস্থ করে দি। পথের কণ্টক দূর করার জন্যে প্রায়ই এমন বেপরোয়া হাতুড়ি ব্যবহার করতে হচ্ছে। কখনো-বা চারপাশের উদ্ধত পেরেক উপড়ে ফেলে দি। যেভাবে প্রথম রাত্রে দেয়ালের সবকটা পেরেক খুঁজে খুঁজে উপড়ে ফেলেছিলাম, সেইভাবে অনেক সময় আক্রমণ চালাতে হয়।

আসল কথা, পেরেক-সম্প্রদায়ের ওপর আমার জাতিক্রোধ জন্মে গিয়েছে। তাদের আদপে মাথা তুলতে দিতেই রাজি না। টেবিলের কোণে বা চেয়ারের হাতলে অতি ক্ষুদ্র পেরেকেরও সামান্য জাগরণ দেখলে আঁৎকে উঠতে আরম্ভ করেছি। সেই সৌখীন জামাটা ছেঁড়বার পর থেকে এ এক ভয়ানক আতঙ্কের মধ্যে পড়া গেছে। সামান্য পেরেকও যে এমন নাজেহাল করতে পারে, আগে অতটা বুঝিনি। আজকাল দৃষ্টি তাই সর্বদা সজাগ রাখতে হচ্ছে। এদের মত বর্বর জাত আর নেই। কোন্ অন্ধকারের মধ্যে কখন কিভাবে সঙ্গীন উঁচু করে এরা আক্রমণ করবে, তার ঠিক নেই।

ডুবে ডুবে জল খায় এই পেরেক। পাকে পাকে এদের বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যদি একদিন একত্রিত হয়, তাহলে অস্তিত্ব বজায় রাখাই মুস্কিল হবে দেখছি। এদের এই বিক্ষিপ্ত আক্রমণই যখন এঁটে উঠতে পারছিনে—এদের মিলিত আক্রমণ তাহ'লে কতটা ভয়াবহ হবে—সহজেই তা অনুমান করতে পারছি। অতএব এই আতঙ্ক নিয়ে বাস না করে এর একটা বিধিব্যবস্থা করা দরকার। পেরেকের ওপর প্রভুত্ব করার প্রথম দিকটায় অনেক কাজ গুছিয়ে নেওয়া গেছে। আমার হয়ে এই পেরেক আমার পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্রাদি বহন করেছে, আমার সুখের জন্যে এই পেরেকরা আমার আসবাবপত্র জুড়ে দিয়েছে, আমি সময় দেখে নিজের কাজে গিয়ে যাতে ঠিকমত পেঁছিতে পারি, তার জন্যে দেয়ালঘড়ি ধরে বছরের পর বছর ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে কী না করিয়েছি এদের দিয়ে।—এতদিন নির্বিবাদে নিষ্কাম কর্তব্যপালনের পর হঠাৎ কি হ'লো,—একটানে ছিঁড়ে দিলো আমার জামাটা। আর তার পর থেকে প্রেতের মত আমার পিছু লেগে আমাকে হুমকি দিতে লাগলো অনবরত। যেখানে সেখানে মাথা তুলে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলো আমাকে!

তাই শেষবেশ ঠিক ক'রেছি—এবার আপোষ-রফা করে ফেলতে হবে, জানতে হবে সত্যিই কি চায় এরা। ঘুমের বিঘ্ন আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। সেদিন রাত্রে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে এই কথা ভাবছিলাম। মনে হ'লো, সমগ্র পেরেক-সম্প্রদায় আমার বিছানা ঘেরাও ক'রে যেন দাঁড়িয়ে। কেউ খর্ব, কেউ দীর্ঘ; কেউ ঋজু, কেউ-বা স্থূল। এরা সবাই মিলে একটি সম্প্রদায়, না, এরা এক একজন এক একটি সম্প্রদায়—ভাবার চেষ্টা করলাম। এরা সবাই পেরেক,—না, কেউ কাঁটা, কেউ গজাল, কেউ পেরেক। বুঝতে পারলাম না। ওদের মধ্যে কেউ লোহ, কেউ তাম্র—ভাষায় কী-সব যেন বললো, বোঝা গেলো না। একটা কথা শুধু এই বুঝলাম যে, ওরা কিছু একটা চায়। ভালো ক'রে বোঝবার জন্যে কাণ বাড়িয়ে দিলাম, ওরা কলরব ক'রে উঠলো। আমার কাণের দৈর্ঘ্য দেখে ওরা ভড়কে গেলো কি না, বুঝলাম না। কয়েকটা মাথা-মোটা পেরেক এগিয়ে এসে অনেক কথা ব'লে গেলো—ভাষাটা বড় গোলমেলে। সরু লিকলিকে সৌখীন একটা পেরেক হুমকি দিয়ে কি যেন দাবী জানাল, তা-ও বুঝলাম না। এই সব গোলমালে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানিনে। ভোরবেলা চেঁচামেচিতে লাফিয়ে উঠলাম। চোর ঢুকেছিল বাসায়।

সকালবেলা দেখা গেল, বিশেষ কিছু খোয়া যায়নি, খোয়া গিয়েছে শুধু হাতুড়িটা।

৭। সমাধান এখনও হয় নাই। মিস্টার সুরাবর্দী গভর্নরকে বলিয়াছিলেন, তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামের তালিকা দাখিল করিবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তাঁহাকে লিখিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করেন—তিনি যেন কলিকাতায় উভয়ের সাক্ষাতের পূর্বে তালিকা দাখিল না করেন।

জানা গিয়াছে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কতকগুলি সর্তে বাঙলায় কংগ্রেসকে সচিব-সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি দিয়াছেন। সে সকল সর্তের ৩টি এইরূপঃ—

(১) প্রধান সচিবকে বাদ দিলে সচিবের সংখ্যা মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সমান হইবে।

(২) স্বরাষ্ট্র বিভাগের বা বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার কংগ্রেসী সচিবকে দিতে হইবে।

(৩) দুর্নীতি নিবারণ জন্য এক সমিতি গঠিত করিতে হইবে।

সচিবদিগের বেতন সম্বন্ধে কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কেবল 'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী সচিবদিগকে অল্প বেতন গ্রহণ করিতে অথবা বিনাবেতনে কাজ করিতে বলিয়াছেন। যে সময় বাঙলার মত বিহারেও দ্বৈতশাসন প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে বিহারের (তখন বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত) সচিব মধুসূদন দাস মহাশয় বিনাবেতনে কাজ করিবেন, প্রস্তাব করিলে গভর্নর বলেন, তাহা আইনত অসিদ্ধ। সচিবগণ কিরূপ বেতন লইবেন, তাহার নির্দেশ আইনে নাই—তাঁহারা ৫০৲ বেতন পর্যন্ত লইতে পারেন। তাহারই নির্দেশ আছে। কংগ্রেসী সচিবগণ বেতনের হার হ্রাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙলায় কংগ্রেসীরা যদি তাহা করিতে সম্মত হন, তাহা হইলেও লীগের অনুগত সচিবগণ তাহাতে সম্মত হইবেন কি? নাজিমুদ্দীন সচিব-সঙ্ঘ গত দুর্ভিক্ষের সময়েও বেতন এক পয়সা কম গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্য ভাণ্ডারে তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেন নাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাঙলায় যে সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়েন—তাহাতে তিনি প্রয়োজন অনুসারে সচিবদিগের বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মাসিক ৫ শত টাকা মাত্র লইয়া সচিব হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। অবশ্য ত্যাগ সম্বন্ধে অনেকেই যে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিবার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

কংগ্রেসকে তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে সকল সচিব গ্রহণ করার অধিকার প্রদত্ত হইবে কি না অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জাতীয়

দলভুক্ত মুসলমানকেও সচিব-সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না, তাহাও জানা যায় নাই। এবার যদি কংগ্রেস জাতীয় দলের মুসলমানদিগকে সচিব-সঙ্ঘ গঠনকালে বর্জন করিতে সম্মত হয়েন, তবে যে তাহা কংগ্রেসের পক্ষে গৌরবজনক হইবে, এমন মনে করা যায় না।

এদিক কি ওদিক—যাহাই হউক, বর্তমান সপ্তাহ মধ্যেই হইয়া যাইবে। যদি কংগ্রেসের সহিত সর্ত লইয়া মীমাংসা না হয়, তবে স্যার ফ্রেডরিক বারোজ মুসলিম লীগকেই যথেচ্ছা সচিব-সঙ্ঘ গঠিত করিতে দিবেন কি না এবং লীগই বা কি করিবেন, তাহা লইয়া আর অনুমান করার প্রয়োজন নাই।

কংগ্রেসকেই এ বিষয়ে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

বাঙলার এই আসন্ন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আর একটি সমস্যার উল্লেখ করিতে হয়। মিস্টার জিন্নার পাকিস্থান দাবী সম্পর্কে বিলাতের সচিবত্রয় কি করিবেন? মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীয়াকে যে কংগ্রেসের নেতৃদল হইতে বিদায় দেওয়া হয় নাই, তাহার ফল এখন ফলিতেছে। তিনি পূর্বেই যে ব্যবস্থায় লীগের দাবী স্বীকার করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি অবজ্ঞা করেন নাই। পরন্তু তাঁহার প্রস্তাবের দ্বিতীয় দফারই কিছু পরিবর্তিত আকার গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে। তিনি উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত, যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সকল স্বতন্ত্র করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোট প্রদানের অধিকারের ভিত্তিতে বা অন্য কোন উপায়ে অধিবাসীদিগের মত জানিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভারতের অখণ্ডত্ব অস্বীকার করা হইয়াছিল।

বিলাতের সচিব-মিশন নাকি এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে সম্মত হইয়াছেন—

(১) পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে যে সকল জিলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল ও শ্রীহট্ট লইয়া পাকিস্থানের পূর্বভাগ গঠিত হইবে।

(২) পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্থানের পশ্চিমভাগ হইবে।

(৩) পাকিস্থানের জন্য একটি ও অন্যান্য অংশের জন্য একটি—দুইটি কেন্দ্রী সরকার গঠিত করা হইবে।

বলা বাহুল্য, এই পূর্ব ও পশ্চিম অংশ "নিশার স্বপনসম" অসার হইবে, তা[illegible] সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে হয়, যদি পাকি[illegible] কায়েম করিতেই হয়,—যদি মুসলিম ল[illegible] অসঙ্গত দাবী স্বীকার করা হয়, তবে পাকিস্থান রক্ষা করিতে আরও কিছু কা[illegible] হইবে। কংগ্রেস যে প্রস্তাব করিয়া[illegible] বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহাতে মুসলমানদি[illegible] ভিন্ন ধর্মাবলম্বী না বলিয়া ভিন্ন জা[illegible] বলিয়া স্বীকার করা হয়। কংগ্রেস কির[illegible] তাহা করিতে পারেন, তাহা আমরা বু[illegible] পারি না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যা[illegible] কংগ্রেসের কর্মচারী সমিতির সদস্যদি[illegible] জানাইয়াছেন—বাঙালী বঙ্গদেশের বি[illegible] স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

এদিকে মিস্টার সুরাবর্দীর ক্ষ[illegible] "বিষমাগ্নি" রোগে পরিণতি লাভ করিয়া[illegible] তিনি মিস্টার জিন্নার মত কলিকাতা পাকিস্থানের জন্য চাহেনই; অধিকন্তু বলে[illegible]

(১) বাঙলা প্রদেশ অবিভক্ত রা[illegible] পাকিস্থানে প্রদান করা হউক;

(২) বিহার হইতে মানভূম, সিংহ[illegible] হাজারীবাগ তিনটি জিলা যদি স্ব[illegible] "আদিবাসী প্রদেশ" করা না হয়, তবে বাঙ[illegible] সহিত সংযুক্ত করিয়া পাকিস্থানের ক[illegible] বৃদ্ধি করা হউক।

(৩) বিহার হইতে পূর্ণিয়া জিলাও বাঙ[illegible] আনিয়া পাকিস্থানকে প্রদান করা হউক।

(৪) সমগ্র আসামে মুসলমানগণ সং[illegible] লঘিষ্ঠ হইলেও আসাম প্রদেশ বাঙলার স[illegible] অর্থাৎ পাকিস্থানে সংযুক্ত করা হউক।

মিস্টার জিন্নার দাবী কিভাবে দেখা হ[illegible] তাহা এখনও বলা যায় না। আরব্য উপন্যা[illegible] গল্পের ধীবর কলসে বন্দ দানবকে ম[illegible] দিয়া যেমন তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া[illegible] বৃটিশরা তেমনই মুসলমানদিগকে অস[illegible] প্রশ্রয় দিয়া এখন তাহাদিগের দাবীর [illegible] দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। ধীবর [illegible] বুদ্ধিবশে দৈত্যকে আবার কলসে [illegible] করিয়াছিল। বৃটিশ সচিবরা যদি পাকিস[illegible] দাবী অসঙ্গত বলেন, তবে তাঁহারা দেখিবে[illegible] স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের দাবীও কেবল শূ[illegible] কলসে দমকা বাতাসের গর্জন। স্যার ফি[illegible] খাঁ নুনকে সকলেই জানেন—তিনি তাঁ[illegible] প্রভু ইংরেজকে তুষ্ট করিবার জন্য লিখি[illegible] ছিলেন—পলাশীর যুদ্ধ দুপ্লের অধ[illegible] ফরাসীদিগের সহিত ক্লাইভের পরিচা[illegible] ইংরেজদিগের সহিত হইয়াছিল। তিনি চেঙ্গিজখানের ছেঁড়া মোজার মুকুট মা[illegible] দিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন, তবে তাহা বে[illegible] হাস্যোদ্দীপকই হইতে পারে।

বাঙলার জাতীয়তাবাদী মাত্রকেই ব[illegible] বিভাগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বৈদেশিকা

নিরাপত্তা কমিটিতে রুশ-পারস্য বিতণ্ডার নিষ্পত্তি স্বীকার করিতে ইংগ-আমেরিকার একটু বেগ পাইতে হইতেছে ইহা সত্য; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্যাপারটা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া নিরাপত্তা কমিটি অর্থাৎ ইংগ-আমেরিকা কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন না। আমেরিকায় পারস্যের রাজদূত অবশ্য রুশ-পারস্য চুক্তি সানন্দে স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু শুধু এই ব্যক্তির ভরসায় উচ্চবাচ্য করা ইংগ-আমেরিকার পক্ষে সুবিবেচনা হইবে না। পারস্যের প্রধান মন্ত্রী সোজাসুজি জোরে কিছু বলিতেছেন না বটে, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে যাহা বলিতেছেন, তাহাতে লণ্ডনে বেভিন মহাশয় বা ওয়াশিংটনে বার্নেস মহাশয়ের আশা করিবার মত কিছু নাই।

মস্কো বলিতেছে, রুশ-পারস্য বিতণ্ডা ছিলও না, আজও নাই; বিশেষত রুশ-পারস্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর নিরাপত্তা কমিটি আর এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে না। এই রুশ-পারস্য চুক্তির জন্য স্ট্যালিনের কূটবুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। এই চুক্তির প্রধান কথা হইতেছে তৈল। এতাবৎকাল শুধু ব্রিটেনই পারস্যের তৈল সম্বন্ধে সুবিধা-সুযোগ উপভোগ করিতেছিল। যুদ্ধের সময় সংগোপনে আমেরিকার সংগে পারস্যের আলাপ চলে এবং রাশিয়া তাহাতে প্রতিবাদ জানাইয়া নিজের দাবী উপস্থিত করে। তখন পারস্য ঘোষণা করে যে, কোন শক্তিকেই তৈল সম্বন্ধে কোন সুবিধা দেওয়া হইবে না। আমেরিকা তাহা মানিয়া নেয়, কিন্তু রাশিয়া যে নীরবে এই ঘোষণা স্বীকার করিয়া লয় নাই, তাহার প্রমাণ এইবার পাওয়া গেল। এই তৈল-চুক্তির বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই ঃ চুক্তি সম্প্রতি ৫০ বৎসরের জন্য হইল; প্রথম ২৫ বৎসর সোভিয়েট-পারসিক তৈল কোম্পানীর শতকরা ৪৯ অংশের মালিক থাকিবে পারস্য এবং শতকরা ৫১ অংশের মালিক থাকিবে রাশিয়া; শেষ ২৫ বৎসর সমান সমান, অর্থাৎ উভয়েই শতকরা ৫০ অংশের মালিক হইবেন। অতঃপর পারস্যের কোন্ ভূখণ্ডে এই সম্মিলিত কোম্পানী তৈল আহরণ উদ্দেশ্যে খননাদি করিবেন, তাহার একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট-পারসিক তৈল কোম্পানী হইতে পারস্যের যে অনুপাতে লাভ হইবে, তাহা ইংগ-পারসিক তৈল কোম্পানী হইতে লাভের অনুপাতের চেয়ে বেশী। প্রথমোক্ত কোম্পানী হইতে সমগ্র পরিমাণ তৈলের অর্ধাংশ (প্রথম ২৫ বৎসরে অর্ধাংশের কিছু কম) তাহার প্রাপ্য; দ্বিতীয়ত, কোম্পানী হইতে পারস্য ব্যবসায়ে লাভের উপর একটি 'রয়ালটি' পাইয়া থাকে, কমপক্ষে এই 'রয়ালটি'র পরিমাণ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩২ সালের পূর্বে পারস্যের প্রাপ্য আরও অনেক কম ছিল, কিন্তু নূতন 'কনসেসনে' পারস্য তাহার প্রাপ্য অনেক বাড়াইয়া লয়। বৃহৎ ত্রিশক্তির মধ্যে বহু পূর্বেই ব্রিটিশ এবং সম্প্রতি রাশিয়া পারস্যে খুঁটি গাড়িল। বাকী রহিল আমেরিকা। আমেরিকার প্রতি পারস্যের দুর্বলতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। সময়, সুযোগ এবং কূটবুদ্ধির যোগ হইলে আমেরিকাও পারস্যের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তাহার ভাগ বসাইতে পারিবে।

রুশ-পারস্য চুক্তির ফলে যে সমস্ত শক্তির দুর্ভাবনা বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে তুরস্ক অন্যতম। স্মরণ থাকিতে পারে, তুরস্কের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার সহুংকারে ঘোষিত দাবীর কথা। দার্দানেলিস এবং কার্স ও আর্দাকান লইয়া তুরস্কের চিন্তার অবধি নাই। পারস্যে রুশ-প্রভাব অর্থ তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার সান্নিধ্য বৃদ্ধি। আজারবাইজান হইতে তুরস্কের সীমান্ত দূরে নয়; ইহার উপর তুরস্কে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ কুর্দরা রহিয়াছে এবং তাহাদের বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দিতে রাশিয়া পশ্চাৎপদ হইবে না, যদি তাহাতে রাশিয়ার প্রয়োজন সাধিত হয়। শত্রুর দেশে গৃহবিবাদ লাগাইয়া নিজে সুবিধা আদায় করা একটি সুপ্রাচীন নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রুশ-ভীতির ফলে সম্প্রতি তুরস্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনের বলে দেশের ১৬ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের যুবা, ৪০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ এবং এমন কি, ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসরের স্ত্রীলোকদিগেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকা হইয়াছে, যাহাতে ইহারাও মিলিটারী ট্রেণিং নিতে পারে। এক বৎসরও গত হয় নাই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, ইতিমধ্যেই আগামী যুদ্ধের জন্য তুরস্ককে প্রস্তুত হইতে হইতেছে।

মিশরের দেখাদেখি ইরাকও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩০ সালে এ্যাংলো-ইরাকী চুক্তিপত্র বিধিবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রের গোড়ায় বলা হয় যে, ইরাক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতার চিহ্ন হিসাবে বসরার নিকট এবং ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম অঞ্চলে ব্রিটেন ঘাঁটি নির্মাণ করিবার অধিকার গ্রহণ করিল এবং এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করিল। এছাড়া ব্রিটিশ পরামর্শদাতা, ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ এবং ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করিতে হইবে ইরাকের উপর এই বাধ্যবাধকতা রহিল। এই চুক্তির মেয়াদকাল ছিল ২৫ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩০ হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ইরাককে এই প্রকার বৃটেন কথিত স্বাধীনতা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য ইরাকের আর নাই। মিশর ইংগ-মিশরীয় চুক্তির মেয়াদ হইতে দশ বৎসর কমাইতে চাহিতেছে, ইরাকও নয় বৎসর কমাইয়া এখনই একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাহিতেছে। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ, ব্রিটিশ পরামর্শদাতা এবং ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারের বিশেষ বিদ্যা এবং বুদ্ধির প্রয়োজন তাহার শেষ হইয়াছে, অন্তত এ বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে, একথা সে ব্রিটেনের দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতে চাহিতেছে।

চীনের সমস্যাটা আবার ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জেনারেল মার্শালের মধ্যস্থতায় যে মিটমাট হইয়াছিল, তাহা দুই দিনও টিকিল না; মাঞ্চুরিয়ায় উভয় পক্ষে অর্থাৎ কমুনিস্ট এবং গভর্নমেণ্ট পক্ষে তুমুল যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। মিটমাটের কথা চলিতেছে এবং ভাঙ্গিতেছে। এখন পর্যন্ত চীনের কমুনিস্ট পার্টি রাশিয়ার সাহায্য পাইতেছে, একথা মনে করিবার কারণ ঘটে নাই। বরং সর্বশেষ সংবাদে ইহাই জানা যাইতেছে যে, মাঞ্চুরিয়ায় আইন এবং শৃংখলা ব্যাপারে হারবিনে চীনা গভর্নমেণ্টের মিলিটারী ডেলিগেশনের সংগে অপসৃয়মান লালফৌজের সর্বপ্রধান কর্মচারীর একটা নূতন চুক্তি হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই তবে কেন্দ্রীয় নিউজ এজেন্সী বলিতেছেন যে, জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় যে সম্রাট দাঁড় করাইয়াছিল, তাঁহাকে চীন গভর্নমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিতে রাশিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

"গুলমোরের থোলো"

ভাবোন্মত্ত নগরকীর্তনীয়াদের ঊর্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর মতো গুলমোরের শাখা দক্ষিণ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। সারিবন্ধ গুলমোরের বৃক্ষ সূর্যাস্তের অভ্রআবীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রক্তপুষ্পের দাগ নিক্ষেপ-নিযুক্ত। পথে পথে এই পুষ্প কীর্তনীয়ার দল। সুদীর্ঘ পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুষ্পিত রক্তিম রেখা। অথবা নবীন বৈশাখে বন-লক্ষ্মী যেন সীমন্তে সিন্দুর আঁকিয়া স্বচ্ছ সবুজ শাড়ীর গুন্ঠন টানিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কিম্বা অপহৃতা জানকীর রক্তিম চীনাংশুকখানা আকাশপথ হইতে স্খলিত হইয়া তরুশিরে আজ সংলগ্ন। অথবা,—আর অধিক উপমার প্রয়োজন কি? কয়েকদিন হইল কলিকাতায় গুলমোরের ফুল ফুটিতে শুরু করিয়াছে—আর কয়েকদিনের মধ্যে এমন একটিও গুলমোরের গাছ থাকিবে না, ফুলন্ত প্রলাপে যাহা প্রগল্ভ নয়। এপ্রিল, মে দুই মাস গুলমোরের পালা। এপ্রিলের শেষে এমন হইবে যে ঝরা-ফুলের পাপড়িতে গাছের তলাকার ধুলা পর্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, অবশেষে ফুলের রক্তিম আভা গাছের গুঁড়ি বেষ্টিত করিয়া একটি রক্তাভ ছায়া-গোলক নিক্ষেপ করিবে। তারপরে বর্ষার প্রথম ধারাপাতের সঙ্গে ফুল ঝরিতে শুরু করিবে, শ্রাবণের মাঝামাঝি ঘনসবুজ পল্লব ছাড়া কোথাও আর পুষ্পপ্রাচুর্যের চিহ্নটি পর্যন্ত থাকিবে না। ঋতু বিপর্যয়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া ঘনসবুজ ক্রমে ঘন শ্যামল, শ্যামল ক্রমে পান্ডুর এবং পীতাভ হইবে। শীতের প্রারম্ভে পাতা ঝরিতে ঝরিতে শীতের শেষে বৃক্ষগুলির নগ্ন কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তখন এই নাগা সন্ন্যাসীর দলের শুষ্ক ফলের চিমটার শব্দ করিয়া নগর পরিভ্রমণের পালা। তারপরে কেমন করিয়া সকলের অগোচরে কঙ্কালে হরিৎরেখা দেখা দিতে থাকে, ক্রমে শীর্ণতা পত্রলেখায় ঢাকিয়া যায়। তারপরে অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে—

"প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে
অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।"

বাস্তবিক কোন ফুল যদি অরুণ কিরণকে তুচ্ছ করিতে পারে তবে এই কৃষ্ণচূড়ার দল। কৃষ্ণচূড়া না গুলমোর? কি এর নাম? গুলমোর নামটিই আমার পছন্দ। গুলমোর মানে ময়ূর ফুল। বাস্তবিক ময়ূরই বটে! ফুলগুলি ময়ূরের মতো পেখম মেলিয়া আছে, আবার পত্র-শ্যামল বৃক্ষটি ফুলের কলাপ বিস্তার করিয়া বাতাসের বেগে যেন

প্র-না-বি-র পাতা

নাচিতেছে। এমন করিয়া কোন ফুল আর আমাকে নাড়া দেয় না। ইহাতে যে প্রচণ্ডতা ও প্রাচুর্য, যে ঐশ্বর্য ও সম্ভোগ-রস আছে তাহা আর কোথায় পাইব। বাস্তবিক ইহার নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক পুষ্পমুষ্টি 'পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল', কিম্বা কবি যদি ক্ষমা করেন, তবে "ওড়না ওড়ায় পুষ্পের রঙে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।"

দিগঙ্গনাদের এপর্যন্ত দেখিলাম না, অপ্সরীদের দেখিবার সৌভাগ্যও ঘটিল না, কিন্তু তাহাদের নৃত্যচঞ্চল ওড়নার প্রান্ত দেখি নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? বায়ুচঞ্চল গুলমোরের ভঙ্গী যে নিপুণতমা নর্তকীর পদক্ষেপকেও পরাজিত করে—ইহার অধিক কি দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার অধিক কি কালিদাস রবীন্দ্রনাথও দেখিতে পাইয়াছেন? তাঁহারা ওড়নার প্রান্তটুকু দেখিয়াই ওড়নাধারিণীকে বুঝিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক এই মানব সংসারের আসরেই দিগঙ্গনার নৃত্য, এখানেই অপ্সরীদের সঙ্গীত; পৃথিবীতেই স্বর্গ, গৃহের কোণেই বৈকুণ্ঠ এবং প্রিয়ার চোখেই মুক্তি।

মানুষের সংসারের প্রান্ত ঘেঁষিয়া প্রকৃতির সংকীর্তনের শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বিশ্বজীবনের চিরন্তন ধূয়া তাঁহাদের সঙ্গীতে ধ্বনিত। আমরা শুনিয়াও শুনি না। দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু একবার যে শুনিয়াছে, একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে নাই। মানুষ জন্মিয়া অবধি ভালোমন্দ আবশ্যক অনাবশ্যক ছোটবড় কত না কাজ করিতেছে ঠিক সেই সময়েই তাহার কানের কাছে 'তারের তম্বুরা বাজে'। ঋতুতে ঋতুতে ফুলে ফুলে গন্ধেবর্ণে প্রকৃতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু মানুষ নাকি বড় ব্যস্ত, মানুষ নাকি বড় কর্মী, তাহার এসব দেখিবার অবসর নাই। আদিম অরণ্য তাহার বনচ্ছায়ায় ডুরে শাড়ীর অঞ্চল বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার পল্লব-ব্যজনী ক্লান্ত দেহের প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়াই আছে, কেবল মানুষের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা মাত্র। প্রকৃতির সহিত মানুষের বিচ্ছেদই জগতের আদিমতম বিরাট-তম বিরহ। এই বিরহের তাপেই মানব জীবন তপ্ত এবং অভিশপ্ত। এই মৌলিক বিরহই নানা আকারে মানুষের জীবনকে দুঃসহ দুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানীরা যাঁহাকে প্রকৃতি পুরুষ বলেন, ভক্তেরা যাঁহাকে রাধা কৃষ্ণ বলেন কবিদের কাছে তাহাই মানব ও প্রকৃতি। না জানি কোন্ দুর্জয় অদৃষ্টের অভিশাপে প্রকৃতি আজ খণ্ডিতা, মানুষ আজ মথুরায় ক্ষণকালের রাজগীতে নিযুক্ত। বিচ্ছেদের এই অভিশাপ কি ঘুচিবে না? আর কাহারো চোখে না হোক কবিদের চোখে অন্ততঃ ঘুচিয়াছে—তাই গুলমোরের পুষ্পমুষ্টি তাঁহাদের

'পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল',

তাঁহারা প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষের নিত্য লীলা দেখিয়া ধন্য হন। আমরা দেখি আর না দেখি, আমাদেরই অঙ্গনে প্রান্তে নিত্যলীলা চলিতেছে—আমরা দেখি আর না দেখি, আমাদেরই চোখের সম্মুখে—

"অদ্যাপি করয়ে লীলা সেই শ্যামরায়
কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

কবিরা সেই ভাগ্যবানের অন্যতম।

পাহাড়

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এখনো অনেক দূরে।
এখনো সম্মুখে আছে
পাথরের দেশ;
তারপরে কিছু কিছু বিছানো সবুজ ঘাস
ফিকে-নীল কুসুমেরও হয়েছে উন্মেষ।
দু'একটি রক্তহীন গাছে গাছে
যৌবনের হলো অবকাশ।

উপরে যে দেখা যায়
কুয়াসা-জমাট পথ, মেঘে-ঢাকা
পর্বত-শিখর;
ওখানে স্বপন আছে, আরো আছে
যৌবনের মূর্তি-আঁকা
সতেজ সজীব জীবন।
নেই শুধু এখানের মত উঁচু-নীচু
বাঁকানো পাথর;
ওখানে কুয়াসা-ঢাকা অনেক স্বপন!

সে পথ অনেক দূরে,
নয় জেনো তোমার আমার।
উপরের স্বর্গ ছেড়ে নীচে নেমে দেখ
আমাদের জাগানো পাহাড়!

অমানুষের ডায়েরী

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

আমার বাবা বলতেন, আমি অতিমানুষ হবো।

কেন বলতেন, জানি না। তবে এটুকু জানি, বাবা ঠিকুজী বিশ্বাস করতেন না; আর ভগবানকে মানতেন মায়ের অনুরোধে। তাঁর বুদ্ধি ছিলো জৈববাদী, বিচার করতেন দেখেশুনে, চোখ বুজে নয়। কিন্তু আশ্চর্য, আমি অতিমানুষ হবার আগেই বাবা মারা গেলেন।

আজ বাবা নেই—নিশ্চিন্ত আরামে আমি আমার দাদাদের চোখে অমানুষ হয়ে উঠেছি। দশ-চক্র তো বটেই, নিজের খেয়ালও আছে।

অমানুষ বটে, কিন্তু ছিলাম ভালো।

পৈতৃক মাটি আঁকড়ে থাকিনি, দিক্-দিগন্তে ছুটে বেড়াই, দায়িত্বহীন। সংসার বলতে নিজে একা, সঙ্গী করেছি কাগজ-কলম। পেশা ছিলো গল্প লেখা, নেশা ছিলো বিচার-বিহীন। নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো আমি পথ চলেছি স্রোতের মুখে। নিরালম্ব ভবঘুরে, কিন্তু নির্মক্ষিক জীবন নয়। অন্তরে একাকী, তবু ছিলাম আমি মানুষ নিয়ে মেতে। অতএব অমানুষ। কিন্তু মানুষ নাকি আমাকে হতে হবে—নিজের প্রয়োজনে না হোক, অন্ততঃ বাবার খাতিরে। ভবিষ্যদ্বাণী।

কিন্তু ভগবান আমার নিয়ন্তা নন।

হিতৈষীরা ছুটে এলেন, মায়ের মুখ পাংশু হলো। দাদারা বজ্রাহত।

মানুষ হওয়াটা বাবুগিরি—আমার জন্যে নয়।

সুতরাং গৃহহীন বেদুইন আমি। পথে প্রান্তে দিনান্তে নিশান্তে। মায়ের চোখের জল, দাদার দীর্ঘশ্বাস, আরো অনেক অনেক কিছু পড়ে রইলো পুরানো বেড়ার ধারে, আমার বাড়ির আনাচে কানাচে।

আমি পথে নেমে এলাম।

সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে শুধু একজনকে বলে এলামঃ মায়া, মানুষ হওয়া সইলো না আমার, অমানুষ হতে চাই। চোখে জল? ছিঃ!

তারপর।

তারপর, রাশিয়া কিংবা রাঁচি—বেশ আছি।

রাশিয়া নয়, রাঁচি।

উত্‌রাই চড়াই পাহাড়ের জাঙাল ডিঙিয়ে একদিন যখন শহরটার উপান্তে এসে পৌঁছালাম, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সাহিত্যিক নয়, একেবারে বন্য বনে গেছি। ফুটফুটে গায়ের রঙে থোকা থোকা নিস্তেল ছাইয়ের প্রলেপ, লোহিতচক্ষু, উড়ন্ত চুল—ট্রাউজার আর সার্টের খাঁজে খাঁজে কলিয়ারীর সধূম স্বাক্ষর। দিনের সূর্য মিয়ানো দুর্বল, যেনো মৃত্যুময় রাত্রি এসে আমার সংগে মিতালি করেছে। দেয়াল বিস্তৃত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, আমি নই, যেনো ক্যামেরার মুখে দাঁড়িয়ে আছি হলিউডের নায়ক—মাইনিঙের সেট—হাতে সেফটি ল্যাম্প, সারা দেহ কালিতে কর্দম।

আমার হাতে সেফটি ল্যাম্প নেই, আছে খাকী রঙের পুরো ট্রাভ্‌লিং ব্যাগ। যথেষ্ট। সাবধানী তাচ্ছিল্যে হাতের ব্যাগটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বললামঃ বুঝলে রতন, হাজার-খানেক মানুষের সংগে, হাঁ, খাঁটি মানুষের সংগে মিশে এলাম।

—কোথায় দাদা?

—ধানবাদে। না না, কলিয়ারীটা মস্ত বড়ো। মজুর কুলি, হাঁ, তিন মাস পাহাড়ের গায়ে সাবল কুঁদে এলাম। বেশ থ্রিলিং মনে হবে তোমার, অবশ্যি প্রথম প্রথম, তারপরে—ছোঃ.

I have given it up. All rubbish!

—মজুরকুলির কাজ করলেন আপনি? আপনি না—" —রতন বিস্মিত চকিত।

—হাঁ, ডিগ্রিধারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কিন্তু সেটা হয়েছি বাবার হুকুমে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অধ্যায়। পরের অধ্যায়গুলো আমার হাতে।

—মানে?

—মানেটা কঠিন নয়, রতন। ডিগ্রি নিয়েছি ডিগ্রির খাতিরে নয়, মানুষকে বুঝবার প্রয়োজনে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার। ডিগ্রি নিয়েছি মানুষের হাত থেকে, মানুষকে বুঝেছি। বিদ্যেটা যে পাথেয়, পথ নয়, পথের শেষও নয়।

—মানে?

—আবারো মানে? চোখ রাঙিয়ে কাজ করিয়ে মাটির সোনা যারা ঘরে তুলতে পারে, তারাই নাম কিনেছে মানুষ বলে। আবার তারাই হলো অতি মানুষ। আর যারা সাবল মেরে পাথর ভেঙে অন্ধকারে সোনা খুঁড়ে মরলো, তারা হলো মজুরকুলি, অমানুষ ক্রিমিকীট। কিন্তু কাজ করে তো অমানুষেরাই? মানুষকে চিনেছি, ভাই, এ অধ্যায় তাই অমানুষের সংগে অমানুষের মতো কাটাতে চাই।

—তবে চাকরী ছাড়লেন কেন?

—রতন, চাকরী করতে যাইনি আমি। কলিয়ারীকে আর কলিয়ারীর অমানুষদের বুঝতে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারলাম, কুলিদের দল বাড়ানো যেমনি সহজ, ওদের হয়ে কাজ করাটা ঠিক তেমনি কঠিন। সহজের পথে ছেড়ে দিয়ে, কঠিনের পথেই পা বাড়ালাম। দল ছেড়ে দিয়ে দলকে নিয়েই মেতে আছি।

—কেন মেতে আছেন? সভ্যতার পুঁজ নিয়ে মেতে আছেন কেন?

বুঝতে দেরী হলো না, রতনের মানুষী রক্তে তখন সভ্যতার নূপুর বেজে উঠেছে। রতনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, দিতে চাইনি আমি। রতনও যে মানুষেরই দলে। তারা সোনার দামে নাম কিনেছে, মানুষ, সোনার মানুষ। কলিয়ারীর খাদে-খোরে যারা সাবল মেরে পাষাণ ভাঙে, সোনা খুঁজে এনে দেয়, তারা তো মানুষ নয়—তারা ক্রিমিকীট। সভ্যতার অগ্নিমান্দ্যে অস্পৃশ্য উদ্গার। আমিও যে ক্রিমির দলে এসে গেছি আজ, শাপদগ্ধ ডিগ্রিধারী অমানুষ এক। মানুষের সত্‌ভাই আমি।

ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠলো।

রতনের ডাক পড়েছে। দাঁতকা ডাক্‌দর—রতন সার্জন ডেন্টিস্ট। প্যারি, লন্ডন, নিউ-ইয়র্ক—প্রতিটি বিলাসকুঞ্জ রতনের চোখে এখনো স্মৃতির তুলিতে সুর্মা টেনে দেয়। প্যারি থেকে রাঁচি—হাইড পার্ক থেকে রাঁচি মেন রোড! ছোঃ উড়ন্ত ধুলির ছোপটা রতন ক্যালিকোয় মুছে নেয়। ছোঃ,

This native land! Rotten!

তারপর। নাকে ক্যালিকো রুমাল আর দাঁতের পুঁজ খোঁজা শুরু।

তারপর রাঁচিতে জমে উঠলাম বেশ।

জীবনের প্রাচুর্য যেখানে ঢিলে হয়ে গেছে, রং নেই, গদাময় নিস্তরংগ নিরেট জীবন, সেখানেই আনাগোনা বেশি। এরা মধ্যবিত্ত। আবার যেখানে রঙের বাহার, জীবনের গতিচ্ছন্দ সুধারসে টলোমল, সেখানেও যাতায়াত আছে। এরা অভিজাত। এ দুয়ের বাইরে, শহরের প্রাণ যেখানে পক্ষাঘাতে জীর্ণ জর্জর, ক্ষুধার জগত, সেখানেও যাই বৈ কি! বসুন্ধরার ভুলের সন্তান, জনারণ্যে দুর্বার আগাছা—তাদের রক্তে খুঁজে মরি সর্বনেশে ঢেউ, মানুষ মারার ঢেউ, বিপ্লবী জোয়ার।

কিন্তু এরা মধ্যবিত্ত—সুখ নয়, স্বস্তির কাঙাল। দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে কর্তা ও গৃহিণী—ছোটখাটো নিরেট সংসার। মাসের শেষে গোনা টাকা, কর্তার হাতে আসে

বিধাতার আশীর্বাদের মতো। গৃহিণী শুধু গিন্নি নন, সহধর্মিণী—সংসার সমুদ্রের সাথী দুইজন, পরপারের সহযাত্রী। ছেলে দুটি আমারই মতো ডিগ্রিধারী, কিন্তু অমানুষ নয়। মানুষ হবার পথে পা দুখানি সদাই চঞ্চল। পিতামাতার স্নেহের দুলাল, দুরন্ত নয় কোনমতে—একান্ত সুবোধ, গৃহগত প্রাণ। বাঙালী সন্তান। মেয়ে দুটি বেশ, সুঠাম সুন্দর, একটু বা সজাগ চঞ্চল। নিস্তরংগ নির্জীব জীবনে এরা দুটি স্পন্দনের মাপকাঠি যেনো। দুই ঠোঁটে মিষ্টি হাসি লেগে আছে, মুখর উচ্ছল। দুজন এক নয় তবু। একজন মহিলা, আরেকজন মেয়ে। কিন্তু দুজনেরই বাঙালী চোখ, লজ্জাভারে আরক্ত আঢুল। মহিলাটি প্রোষিতভর্তৃকা, মেয়েটি কুমারী।

—চা খাবেন তো? করে আনি?—বললেন প্রোষিতভর্তৃকা।

—খাবো। করে আনুন—শুধু চা।" সিগ্রেটের ধোঁয়ার ফাঁকে বললাম আমি।

পূবের আকাশে তখন পশ্চিমের আলো। সারি সারি শালবন, পাহাড়ী পর্যায়। ঢিবি ঢিবি মাটির পাহাড়, নোয়ানো আকাশের গায়ে লেগে আছে আধো আলো আধো অন্ধকারে। স্তবকে স্তবকে মেঘ জমে আছে, বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত। সন্ধ্যা আসে শ্রান্তিময়ী, দুয়ারে প্রদীপ। সন্ধ্যা হয়, যেনো বাঙালী বনিতা গুণ্ঠনের অস্বচ্ছ আড়ালে ঝিকমিক হাসে। জানালার ফাঁকে আরো উর্ধে চেয়ে দেখি এক ফালি চাঁদ, এক ফালি কুমড়োর মতো হলুদ ভাস্বর।

—আকাশে নয়, টেবিলে দেখুন, চা। চাঁদ নয়, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রোষিত-ভর্তৃকা। চকিত চমকে চোখ ফিরালাম।

একী, আমি জাম্বুবান নই, এতো খেতে পারবো না আমি।

—খেতে পারেন আপনি, জানি।

—সে কি, জানেন?

—না খেলে ঐ রকম জাঁদরেল শরীরটা বাগালেন কী করে?

অন্তরে অন্তরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। জাঁদরেল শরীর আমার। রাজেন মাস্টারের আখড়ায় পুরো সাতটি বছরের ডনকুস্তির সাধনা, খোয়াইনি এখনো। ইস্পাতের মতো মাংসপেশী তৈরী করতে হবে, সম্মুখে বিরাট ভবিষ্যৎ—সমাজ সংস্কার, দেশের সেবা। রাজেন মাস্টারের গমগমে গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে সহসা এসে বিঁধলো যেনো। সাবাস রাজেন মাস্টার, আমার যৌবনের গুরু।

—আপনার উপন্যাস পড়লাম, সুকান্ত-বাবু।"—প্রোষিতভর্তৃকা বললেন হঠাৎ।

—পড়লেন? কেমন পড়লেন?

—প্রশংসা চানতো? প্রশংসা পেলেন। কিন্তু একটা কথা আমি কোনমতেই বুঝতে পারছি না যে!" —একটু বা সংকুচিত দেখালো তাকে।

—একটা কথা? আমি ভেবেছিলাম অনেক কথাই বুঝতে পারছেন না। বলুন, কী বুঝতে পারছেন না আপনি?" সিগ্রেটের ডগায় আবার আগুন ধরালাম।

—যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসতে পারলো না অথচ দেবরকে ভালোবাসে, সে স্ত্রীর মনে দুঃখ হতে পারে—কিন্তু তারপক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠা, এ কী সম্ভব, অন্তত আমাদের সমাজে? না হয়ে উঠবে কোনদিন?

—হয়ে উঠবে না? যদি সম্ভব হয়েই ওঠে, তবে কেমন হয় বলুন তো?

ভদ্রমহিলা কিঞ্চিত বিব্রত হলেন মনে হলো।

—জানেন, মিসেস চৌধুরী, আসলে আমরা অন্ধ সবাই। বাবার স্নেহে, মায়ের শাসনে আর ধর্মের হুকুমে আমরা যে গণ্ডীর মধ্যে গড়ে উঠেছি, সেই গণ্ডীর বাইরে তাকালেই আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে আসে। সেখানে অনেক আলো, অনেক চমক। আলোকে ভয় করি বলেই আমাদের কাছে নূতন সব কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু এই মনে হওয়াটা যে কতো মিথ্যে একদিনও ভেবে দেখেছেন কি?

—এতে আর ভেবে দেখবার আছে কী?

—আছে বৈ কি। দুশ্চরিত্র স্বামী দিনের পর দিন আপনার উপর অত্যাচার করে চলেছে অথচ আপনি দেবতার আসনে বসিয়ে সেই স্বামীকেই পুজো করে যাবেন, এই জিনিস আপনারা কেমন করে বরদাস্ত করেন, আমি তো বুঝে উঠতে পারিনে।

—কিন্তু এ যে সমাজের শাসন বরদাস্ত না করে উপায় কী?

—সমাজ? অত্যাচারটাও সমাজের নিয়ম? এ সমাজ যাদের সৃষ্টি, তারা দুহাজার বছর আগে মরে শেষ হয়ে গেছে। দুহাজার বছর পরে আজ বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও সেই মৃত সমাজকেই আঁকড়ে পড়ে থাকবেন আপনারা?

—আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা নয়, সুকান্ত-বাবু উচ্ছৃংখলতার কথাই বলছি আমি। আইন ভংগ করে বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরাকে আমি উচ্ছৃংখলতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনে। সমাজে বাস করতে হলে শৃংখলাকে মানতেই হবে।

—কিন্তু এ যে শৃংখলা নয়, শৃংখল। দু'পায়ে শৃংখল জড়িয়ে পথ চলতে গেলে হোঁচট আপনাকে খেতেই হবে।

—তবে কি সে শৃংখলকে ভেঙে চুরে বাড়িঘর ছেড়ে উন্মাদের মতো বেরিয়ে যেতে বলেন আপনি? বেশ মজা তো! সব নিয়মকেই ভেঙে দিতে চান?

—সব নিয়মের কথা তো হচ্ছে না! নিয়ম মানুষকে পংগু করে দেয়, বাড়তে না. সে নিয়মকে ভাঙার নামই সভ্যতা। স জিনিসটি পানাপুকুরের জল নয়, চৌধুরী, বেগবতী নদীর মতো খরস্রো বাধাকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়াই তার তাকে বাধা দিতে গেলেও দুকূল ছাপিয়ে তার নিজের পথ করে নেয়। এ যে বিজ্ঞান!

এক মিনিট বিরাম, নিরন্ধ্র, নির্বাক।

দরজার আড়াল থেকে ঘরে প্রবেশ ক গৃহকর্ত্রী, চারটি সন্তানের জননী। মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলা। অধরোষ্ঠে চোয়ানো তাম্বুলের ছোপ, কপালে সু সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুরে শিরার্ধে অবগুণ্ঠিতা। দুই চোখে উচ্ছ স্নেহের আভাস, মৃদু মন্দ মধুর হেসে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মা। আমারো ছবি আমার চোখের তারায় মুহূর্তে ওঠে। সেই মূর্তি, সেই মুখ, সেই উপচানো স্নিগ্ধ দুটি চোখ। ছিন্নবাধা প বালকের মতো আমি অমানুষ আজ। আমার মা? তোকে মানুষ হতে হবে সেদিনের মায়ের কণ্ঠ, মায় আমাদের কোলকাতার ছোট্ট লতানো বাড়িটি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো যেনো। নয়, বাস্তবের মূর্তি নিয়ে মা আমার আ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে!

—আজ আমাদের এখানে কালীপ শ্মশানকালী। হিনুতে বাঙালীর এ এক উৎসব। আজ তোমার এখান থেকে চলবে না, সুকান্ত। খেয়ে যেতে প্রশান্ত হেসে আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত করলেন মা।

—বেশ তো, থেকেই যাবো, খেয়েই

—বড়ো খুসী হলাম, বাবা!"

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি।

মিসেস চৌধুরী কখন যে উঠে ছিলেন লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ মনে হলো যেনো ফাঁকা। অনেকক্ষণ বকে বকে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেন জা ঐ ছোট বসবার ঘরটি আমার বড়ো লাগছিলো। চৌকো পরিপাটি ঘর, আস তেমন বাহুল্য নেই। টেবিলের ফুল ঢাকনার উপর গুটিকতক বই, একটা টাইমপীস ঘড়ি—মাঝখানে একটা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে বেতের চেয়ার অতি আধুনিক, তুলোর গদিতে বসে আসে চোখে। একধারে ত্রিতল কাঠের রকমারি বইয়ের আশ্রয়। উত্তর দেয়াল ছোট একটা তক্তপোষে মসৃণ বিছানাটি প্র চোখে পড়ে—নিভাজ ধবধবে বিছানা। মনে মনে বাড়িটার একটা পরিপূর্ণ ছক

ছিলাম—সহসা জানলার পর্দা ঠেলে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঘরটাকে বুদে দিয়ে গেলো। গায়ের জহর জ্যাকেটটা আকণ্ঠ চেপে সিগ্রেটের তপ্ত নিকোটিনে গলাটা আরেকবার চাঙ্গা করে নিলাম। চেয়ে দেখি, ভিতর দরজা দিয়ে প্রবেশ করছেন মিসেস চৌধুরী। চোখে মুখে সুচতুর হাসির ঝিলিক।

—এ কী? একেবারে শামুকের মতো গোঁজ হয়ে বসে আছেন যে?" বললেন তিনি।

—ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু হাতে ও কী?

—এ্যাস ট্রে। ছিঃ, সারা ঘর আপনি সিগ্রেটের ছাই ছিটিয়ে এ কী করেছেন?

—অমানুষকে ঘরে স্থান দিলে ঐ রকম শাস্তি পেতে হয়, মিসেস—

—বড্ড নোংরা আপনি। জানেন, সুকান্তবাবু, এ বাড়িতে সিগ্রেট খাওয়া একেবারে মানা। সে জন্যেই তো এ্যাস ট্রে টেবিলে রাখতে পারি না—হাঁ!

—যাক্, নিয়ম ভঙ্গ করে দিলাম আমি। এবার চলবে।

—চলবে বৈকি! বাবা নেই বাড়িতে? দাদা অবিশ্যি খান সিগ্রেট্, তবে ঘরে নয়, বাইরে।

—দেয়ালে ঐ নিকেল-মোড়া ফটোখানা কার, মীনা দেবী?

—আমি আবার দেবী হলাম কবে থেকে—ছিঃ!

—বাঙালী মেয়েরা দেবী হয়েই জন্মে কিনা তাই। সে থাক্, কার ফটো?

—উনি ক্যাপ্টেন কে পি চৌধুরী। কে বলুন তো?

স্পষ্টই দেখতে পেলাম মিসেস চৌধুরীর দুই গণ্ড লাল হয়ে উঠেছে। গর্বের একটা অতি পরিচিত ছাপ এবার যেনো চোখে মুখে উদ্ভাসিত হলো।

—বুঝেছি, এ বাড়ির জামাই। কোথায় আছেন তিনি?

—ইটালীতে ছিলেন। আপাততঃ দেশে ফিরেছেন—রাওলপিন্ডি।

ফটোখানা দেখে এবং পরে পরিচয় পেয়ে আমি খানিকটা চমকেই উঠেছিলাম। বাঙালীর ছেলে? প্রশস্ত বুকের উপর তেছরী করে বাঁধা ক্রসবেল্টের ধার ঘেঁষে ঝকঝকে তিনটি তারা, সামরিক সম্মানের নীরব সাক্ষী। ব্যাকব্রাস চুলের উপর তির্যক টুপিটি লেগে আছে ঠিক। দীর্ঘায়ত চোখ দুটি যেনো এক ঝাঁক বিমানের পিছনে ছুটেছে, উৎকণ্ঠিত উজ্জ্বল। বৃটিশের ফ্রেমে-আঁটা বাঙালী তরুণ! কোথাকার ছেলে কোথায় আসীন্!

—শ্বশুরে বাড়ি কোথায়? যান না সেখানে?

—ওকথা কেন, সুকান্তবাবু! সব জেনেও আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন বলুন তো?

—মিসেস চৌধুরীর হাস্যোজ্জ্বল ঝকঝকে চোখ দুটি মুহূর্তে ছলছল করে উঠলো। অভিনয় নয়, সত্যিকার দুঃখের একটা মুখর ব্যঞ্জনা তাঁর সারা দেহে যেনো কথা কয়ে উঠলো। এতোটা আমি আশঙ্কা করতে পারিনি। নিজের অহেতুক প্রশ্নের জন্য নিজেকেই আমি অপরাধী মনে করলাম। সত্যিই তো, জেনেও কেন আমি তাঁকে লজ্জা দিতে গেলাম?

—ছিঃ, বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে আমার। আমাকে ক্ষমা করুন, মীনা দেবী!

শাড়ির আঁচলে হয়তো বা নিজেরই অলক্ষিতে একবার চোখ মুছে নিয়ে মীনা দেবী বললেনঃ ক্ষমার কথা কেন, সুকান্তবাবু! কত লোকেই তো ঐ এক প্রশ্ন করে আমাকে। কিন্তু কী দোষে আমার শ্বশুর বাড়িতে স্থান হলো না, বলতে পারেন?

—আপনার কোন দোষের তো প্রয়োজন হয় না! আপনি বি এ পাশ করেছেন, ধরনে ধারণে আধুনিক, স্বামীকে প্রাণময় ভালবাসেন—শ্বশুর বাড়িতে স্থান না হওয়ার পক্ষে ওদের কাছে ওগুলোই তো যথেষ্ট কারণ। স্বামীকে ভালোবাসেন, ওদের কাছে একথার যেমন কোন দাম নেই—স্বামীকে নিয়ে সুখে থাকতে চাওয়াও তেমনি অপরাধ।

—কিন্তু, কী আমি করতে পারি—বলুন!

—অমানুষের উপদেশ নিয়ে আপনার তো কোন লাভ হবে না, মিসেস—

—কেন নিজেকে অতো ছোট মনে করেন আপনি?

—কী জানেন, মীনা দেবী, আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেকদিন থেকেই ঘুণ ধরে আছে। গোটা ইমারতটাই আজ পড়োপড়ো। পুরনো সমাজটা যেখানে এসে ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সে মুমূর্ষু। অথচ নূতন সমাজ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, তখন মুমূর্ষু সমাজ মরতে মরতেও তাকে বাধা দেবার জন্যে মারমুখী হয়ে ওঠে। মৃত্যু আর জীবনের এ এক চিরন্তন লড়াই।

—কোথায় এর শেষ?

—শেষ কি আছে! লড়াই করতে করতেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। পুরনোর চিতাভস্মে নূতনের জয়যাত্রা—ঐ তো আমাদের সভ্যতার মর্মকথা। অমানুষ হলেও শুধু একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, মীনা দেবী। যে যুগের আপনি জন্মগত প্রতিনিধি, সে যুগের আদেশকে অমর্যাদা করবার অধিকার আপনার নেই। শ্বশুর বাড়িতে স্থান না হওয়াটা বড়ো কথা নয়, নিজের শিক্ষা ও সমাজের সংগে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করেন, সেটাই আপনার কাছে বড়ো হয়ে উঠুক—এই আমি চাই।

মিসেস চৌধুরী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মনে মনে আমিও একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। যেটুকু বেদনা তিনি আমার অহেতুক প্রশ্নে পেয়েছিলেন, হয়তো বা সেটুকু কেটে গেছে। যাক্, খানিকটা শুধরে নিয়েছি। আরেকটা সিগ্রেট ধরালাম আমি।

এবার কনিষ্ঠা ঘরে প্রবেশ করলো। সুন্দর একহারা ঋজু চেহারা। দুই কানে দুটি পাহাড়ী কুণ্ডল, কাঁধের উপর চুলের সর্পিল বেণীটি সযত্নে প্রলম্বিত। ক্রোড়ে তার শুভ্র একটি শিশু।

—কে এই শিশু? আচমকা প্রশ্ন করলাম আমি।

—দিদির ছেলে, আপনাকে দেখাতে আনলাম। কেমন, সুন্দর নয় ছেলে? ডিল্‌কি দিয়ে শিশুটিকে মৃদু একটু দোলা দিয়ে লীনা বোঝাটা আমার কোলে রেখে আবার বলে উঠলোঃ হাঁ সুকান্তদা, খোকনের একটা নাম রেখে দেবেন তো? রাখি রাখি করে কোন নামই রাখা হচ্ছে না। আপনি না সাহিত্যিক! ভালো নাম রাখা চাই—হাঁ!

কিন্তু সুকান্তদা ততক্ষণে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দুই হাতের বেড়ির মধ্যে খোকন এমনি এক ভঙ্গীতে কিলবিল করে কুঁকড়ে উঠলো, আমি তো নাচার! ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মহাবীর। আমার দুরবস্থা দেখে দুই বোন তো হেসে লোপাট! শিশুকে যথাস্থানে পেঁছে দিয়ে আমি বলে উঠলামঃ কিন্তু এদিকে যে মহাবিপদ হলো, লীনা!

—সে কী! বিপদ?

—হাঁ, আরেক কাপ চা খাওয়াতে হচ্ছে যে!

—ওমা, এই বিপদ আপনার? ছিঃ এক্ষুণি করে দিচ্ছি আমি। শুধু চা, আর কিছু দেবো না কিন্তু। একটু পরে ভাত খাবেন—কেমন তো?

—আর কিছু দিলেও আমি খাবো ভেবেছো? আমি জাম্বুবান নই।

—না, জাম্বুবান নন্, মহাবীর হনুমান আপনি। জানেন, হনুমান সীতার ভাতের হাঁড়ি একদম উদোম করে দিয়েছিলো?—বলে উচ্ছলিত হাসির কল্লোল ছুটিয়ে লীনা ঘর থেকে ছুটে পালালো।

আমি তো অবাক! যাদের সঙ্গে মাত্র সাত দিনের পরিচয়, তারা এতো সহজভাবে আমাকে আপন করে নিলো কেমন করে—আমি সে কথাটাই শুধু ভাবছিলাম। নিজের গৃহে যাকে আপন জনেরা অমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি, যার গৃহকণ্টক নিয়ে বাহির বিশ্বের উদার আকাশের নীচে ছাড়া আর কোথাও স্থান হলো না, মানুষেরই ঘরে তাকে নিয়ে কেন এই মানুষী আদর? মানুষের গৃহাঙ্গনে কেন এই অমানুষী বিলাস?

—সুকান্তবাবু

আমি আবার প্রকৃতিস্থ হলাম।

—লীনাকে লীনা বলেন, কিন্তু আমাকে দেবী কেন?

—আপনি যে মহিলা! বাঙালী সমাজে মহিলা ও মেয়েতে মর্যাদার ঐটুকু তফাৎ—কেন, — কী সত্যি নয়, মীনা দেবী?

—হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনি তো সে সমাজের হুকুম মানেন না!

—কিন্তু আপনারা তো মানেন?

—না, আমরাও মানিনা আর। আপনিও না মেনে দেখতে পারেন—এ বাড়িতে কেউ ফাঁসি দেবে না আপনাকে।

—সত্যি?

—হাঁ, সত্যি। এ আমি নিজে জবানবন্দী দিলাম।

—আমিও বাঁচলাম! দূরে দূরে! এসব দেবীটেবী কি আমার মতো অমানুষের পোষায়! অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে, মীনা।

সামনের দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে প্রবেশ করলেন স্বয়ং গৃহকর্তা। পক্ক কেশ, কিন্তু দেহটি ভংগুর নয় মোটে। মনে হয়, অনেক ঝড়ের প্রকোপ মাথাটা তার ঝলসে দিয়ে গেছে, কিন্তু দেহের দেয়াল ধ্বসেনি এখনো। মধ্যবিত্ত সমাজের দৃঢ় প্রতিনিধি। বাঁ হাতের বগল-চাপা নীল অফিস ফাইলটার দিকে চেয়ে বিস্মিত হবো কিনা ভাবছিলাম—এমন সময় বৃদ্ধের পিছনে এসে দাঁড়ালো তাঁরই বংশধর, এ বাড়ির বড়ো ছেলে। কুঞ্চিত-ভাঁজা চেহারা নয় সুগোল পালিশ-করা চোখে মুখে নিঝঞ্ঝাট জীবনের নীরব স্বাক্ষর। এখনো মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে বনস্পতি, বাপ।

—আজো এতো রাত্রি পর্যন্ত অফিস করে এলেন? কালী পুজোর ছুটি নেই?

—কেরাণী, সুকান্ত, কেরাণীর দিনরাত্রি নেই। কালী পুজোর ছুটি? হাঁ, আছে, কাগজে কলমে আছে—কাজে নয়—উচ্ছ্বসিত একটা দীর্ঘশ্বাস সযত্নে চেপে বৃদ্ধ ধরণী চক্রবর্তী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেনঃ ওরে, সকান্তকে চা দিয়েছিস তো? লীনু!

—একবার নয়, বাবা, তিনবার চা খেলেন সুকান্তদা। বলতে বলতে বাবার পাশ ঘেঁষেই লীনা চায়ের বাটি হাতে ঘরে ঢুকলো। সুকান্তদা পাঁপর ভেজে এনেছি। না না, আমার মোটেই ইচ্ছে ছিলো না—মা বললেন, তাই। বলে কোন কথার অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মীনার দুই চোখ তখন দেয়ালে নিবদ্ধ।

—আমাদের বাবার কথাই ভাবছিলাম, সুকান্তদা! মীনার কণ্ঠ ভারী মনে হলো।

কী ভাবছিলে বাবার কথা?

—আমরা একটু চোখের আড়াল হলে বাবা অস্থির হয়ে ওঠেন। বলেনঃ তোদের ছেড়ে আমি কাশী গিয়েও শান্তি পাবো না, মীনু। আরো একজন বাবার কথা ভাবছিলাম। নিজের একমাত্র ছেলে, ছেলের বৌ, এমনকি নির্মল ঐ শিশুটিকে পর্যন্ত ভুলে কেমন নিশ্চিন্তই না আছেন! লোকটা সত্যিই পাষাণ!

—সবাই কি সমান, মীনা!

—সমান তো নয়, জানি। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব আর কতদিন সইবো! বাবার মুখের দিকে আর যে চাইতে পারি না আমি!

—সইতে তোমাকে আরো হবে, শুধু তোমাকে নয়, আমাদের সবাইকে। নূতন মানুষের নূতন সভ্যতা তৈরী হচ্ছে, তোমার ভিতর আমার ভিতর, আরো যারা জেগে উঠছে তাদের ভিতর। চূর্ণ হবে পুরনো পৃথিবী।

—কিন্তু জাগছে যারা, তাদের এই জাগা কতটুকু জাগা? সুকান্তদা, এ যে অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্বল জাগা!

—ক্ষুদ্র? ক্ষুদ্র নয়, মীনা। আমাদের পিতামহদের পাপের দেনায় ডুবে ছিলাম আমরা, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু। এযে আমাদের শোধরাতেই হবে, ভাই! সময় একটু লাগবে বৈকি। মনে রেখোঃ ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা আছে কিছু, বিশ্ব যেথা রয়।

সপ্তরঙা প্রজাপতি-পাখা নিয়ে জীবন যেখানে উড্ডীন নয়, সেখানে মানুষ দুই মুঠি অন্নের কাঙাল। রঙ-বেরঙের-হোরি খেলা নেই, পেটের লড়াই ভুরভুরে মেঠো গন্ধে আর সধূমে কালির আখরে সেখানে লেখা হয় মানবের ইতিহাস। আমারো রক্তে কি নেই তাদের পরিচয়? আমারো ক্ষুধা কি নয় তাদের ক্ষুধার নামান্তর? সবুজ ধানের ক্ষেতে সোনার শরৎ, ভূরি ভূরি ফসল ফলেছে। কিষাণের মজুরের রক্তে কেনা ধান। তবু কি কিষাণ পায় এক গোটা ধান? যে কটি মানুষ ঐ পাহাড়ী টিলায় আর বাংলো-বিতানে, বিলেতী নেশার ফাঁকে হুকুম চালায়, তাদেরই গোলায় অন্ন মেসিনের মুখে কিষাণের ভবিষ্যত বেচা হয়ে গেছে। কিষাণ-কিষাণী তাই অন্ন খুঁজে মরে তাদের উপোষী আকাশে। আমিও যে তাদেরই দোসর! শাপদগ্ধ ডিগ্রিধারী অমানুষ এক—মজুর-কিষাণের আর সর্বহারা মানুষের কর্মী একজন!

রৌদ্র-চটা ক্লান্ত দেহে ফিরে আসি ঘরে। যাদের দাবীর আহ্বানে রাঁচিতে এসেছি, যাদের দুঃখের আমি সত্য প্রতিনিধি, তাদের মাঠের আলে আর ফার্নেসের ধারে কেটে যায় দিন। তাদের দুঃখ আর দর্দিনের হাহাকারে খুঁজে মরি বিপ্লবের ঢেউ—গৃহহীন আমি সব্যসাচী। সেখানে সোনার মানুষ নেই, সেখানে একরঙা জনতার ভিড়। দ্রাবিড়ী কোল ভীল ওরাঁও মুণ্ডার দল আমার সুহৃদ। মীনা ও লীনারা সেখানে অজ্ঞাত অচিন। ধরণীবাবুর ফা[...] বাঁধা কেরাণী জীবন কোথায় সেখানে? ত[...] মীনা ও লীনারা নয় আমার অচিন। ধর[...] বাবুর ওষ্ঠাগত প্রাণ আর তার সুবোধ ছে[...] যতো দুঃখ গ্লানি আশা—তারাও আমার [...] এসে ভিড় করে থাকে। সিঁথিতে সিঁদুর অ[...] মীনা ও লীনার মা—তারো অশ্রু ঠাসা [...] চোখ আমার মায়ের মতো হাতছানি দিয়ে ডা[...] আমি যেনো বিভূঁই বিদেশে মায়াবী বা[...] গোটা দুনিয়াটা যেনো আমার সংগে [...] কোলাকুলি দিতে চায়। সোনার মানুষ [...] ক্ষুধিত মানুষ সব একাকার হয়ে যায়।

শ্রান্ত আমি, নিজের মানুষী ধর্মে [...] নই তবু।

—দিনরাত্রি রোদে ঘুরে কেন নিজে[...] সর্বনাশ করছেন? রতনের কথাগুলো ক[...] নয়, স্নেহের লাইনিং দেওয়া আবদার শু[...] রতন আমাকে ভালোবাসতে চায়, ভালোবা[...] খাতিরে, মানুষের প্রেরণায় নয়। আত্মবে[...] মানুষের এ এক বিলাস। দেশের মাটিতে [...] বিদেশী সাধক, যারা দেশী মাটির টবে বিদে[...] ফুলের গন্ধ খুঁজে মরে, রতন তাদের দ[...] প্রতিনিধি। আমাকে ভালোবাসায় তার কি[...] বিলাস? তবুও রতন শান্ত ভদ্র, কিছু [...] দুর্বল।

—রতন, আমি তো তোমাদের দলের মা[...] নই। সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে ঘুরে [...] আমি। আমি কি, ভাই, মানুষ ভেবেছো?

রতনের অভিজাত চক্ষু দুটি নুয়ে [...] এবার।

—বিকেলে যে আজ এনগেজমেণ্ট, আছে তো দাদা?

—মনে আছে, রতন। মিঃ সেনের বা[...] চায়ের আসর। বড়লোকের বাড়িতে আম[...] টেনে নিয়ে চা খাওয়ানোর মানেটা কি ব[...] পারো?

—ওই ওদের স্বভাব, দাদা। মানু[...] আদর করাটাই যেনো ওদের কাছে সব। জানে, ওরা, আমাকে তো দুদিনে আপন নিয়েছে। দু'বছরেও তাই ছাড়তে পারি[...] আজ।

—ওদের রক্তে যে তোমাদেরই ঢেউ, [...] আমার সেখানে কতটুকু মিল?

'রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ বাঙলা সাহিত্যে গল্প লেখকরূপে নূতন সম্ভাবনা লইয়া উপ[...] হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুকাল [...] অত্যন্ত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'আমা[...] ডায়েরী' পাঠ করিয়া পাঠকগণ লেখকের [...] দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন, এই জ[...] বর্তমান সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইল।

—সম্পাদক,

দেশের কথা

(২৬শে চৈত্র—২রা বৈশাখ)

দুই জাতি—কলিকাতায় নিরন্নের মৃত্যু—নৌবাহিনীর প্রতি ব্যবহার—বাঙলায় সরকারের চাউল ক্রয়—বৃটিশ মিশন—সর্দার শান্ত সিংহ—বাঙলায় সচিব-সঙ্ঘ।

দুই জাতি—এদেশের মুসলমানগণ মিস্টার জিন্না প্রমুখ ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি। ধর্মের ভিত্তিতে যে জাতি-বিভাগ গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ তাহাও যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার আশা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু পূর্ব-পুরুষের বংশধর। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেই মানুষের জাতির পরিবর্তন হয় না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—এই স্বতন্ত্র জাতি সম্বন্ধীয় মত কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

কলিকাতায় নিরন্নের মৃত্যু—কলিকাতায় যে আবার নিরন্নের মৃত্যু ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলেও সরকারের কতকগুলি লোক তাহা স্বীকার করিতে অসম্মত। বাঙলা সরকার যতটুকু স্বীকার করেন—ভারত সরকারের খাদ্য-সেক্রেটারী মিস্টার বি আর সেন সেটুকুও স্বীকার করিতে অসম্মত। তাঁহার কথা এই যে, যাহারা চিরকালই অনাহারে মরে, তাহারাই মরিতেছে—উহাতে আশংকিত হইবার কোন কারণ নাই। বাঙলা সরকার কলিকাতায় ভিখারীদিগকে ধরিয়া নিরন্নাশ্রয়ে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু কেন যে লোক ভিক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে, তাহার কারণ তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া—মফঃস্বলে লোকের অন্নার্জনের উপায় করিয়া দিতে আবশ্যক আগ্রহের অভাবই দেখাইতেছেন। "গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল" দিলে কি হইতে পারে?

নৌবাহিনীর প্রতি ব্যবহার—ভারতীয় নৌবাহিনীর ভারতীয় সেনাদলে যে বিক্ষোভ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য দেশের লোক সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেশের লোকের বিশ্বাস, সৈনিকরা আশানুরূপ ব্যবহার লাভ করা ত পরের কথা, যে বৈষম্যদ্যোতক ব্যবহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সেইজন্য তাহাদের অপরাধ লঘু মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু এদেশে লোকমতের মূল্য কি, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া কর্তারা কয়জনের প্রাণদণ্ড ও বহু সৈনিকের অন্য কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ও ঘৃণার বিষয় এই যে, তাঁহারা ব্যবহারজীবের দ্বারা অভিযুক্ত সৈনিকদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেন নাই। কাজেই বিচার হইয়াছে—"না দলিল, না উকীল, না আপীল।" একথা ভারতবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না।

বাঙলা সরকারের চাউল ক্রয়—এক বৎসর পূর্বে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন "এজেণ্টের" মারফতে সরকারের চাউল ক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা—সর্বত্র সরকার ঐ ব্যবস্থা বর্জন করিয়াছিলেন। কেবল বাঙলা সরকারই উহা বর্জন করেন নাই। তাহার কুফল যে কত ফলিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সেদিন কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে কেন্দ্রী সরকারের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হইয়াছে—এখনও বাঙলায় ঐ প্রথা ত্যক্ত হয় নাই! কেবল তাহাই নহে, যে ইস্পাহানী কোম্পানীর সম্বন্ধে এত কথা আলোচিত হইয়াছিল যে, সেই কোম্পানীর নিয়োগের সমর্থন করিয়া বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ পুস্তিকা প্রচার পর্যন্ত করিয়াছিলেন, সেই ইস্পাহানী কোম্পানীর প্রভাব সমান রহিয়াছে—যে দুইটি কেন্দ্রে এজেণ্টের মারফতে চাউল ক্রয় চলিতেছে, সেই উভয় কেন্দ্রেই ইস্পাহানী কোম্পানীর কাজ চলিতেছে।

বৃটিশ মিশন—বিলাতী সরকার এদেশে আগত মন্ত্রিত্রয়কে নির্দেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন বুঝাপড়া শেষ না করিয়া প্রত্যাবর্তন না করেন। এদিকে প্রকাশ, তাঁহারা নিম্নলিখিত-রূপ প্রস্তাব করিবেন—

(১) পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট লইয়া পাকিস্থানের পূর্বাঞ্চল গঠন করা হইবে।

(২) পাঞ্জাবের পশ্চিম ভাগ লইয়া উহার পশ্চিমাঞ্চল গঠিত হইবে।

(৩) পাকিস্থানের জন্য একটি ও ভারতের অন্যান্য অংশের জন্য আর একটি কেন্দ্রী সরকার গঠিত হইবে।

এইরূপ বিভাগে লোকের আপত্তি অবশ্য অনিবার্য। কিন্তু মিস্টার জিন্নার দাবী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি পাকিস্থানের দুই অঞ্চলের যোগ জন্য মধ্যবর্তী পথ চাহেন এবং কলিকাতা বন্দর তাঁহার না হইলে চলিবে না।

ওদিকে সামরিক কর্মচারীর মত, ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে তাহার আত্মরক্ষার অসুবিধা ঘটা অনিবার্য।

বলা বাহুল্য, পাকিস্থান স্বীকৃত হইলে শিখস্থানের, রাজস্থানের ও অন্য বহু "স্থানের" দাবী ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিবে। কাজেই অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা ভাবিলে হাস্য ও দুঃখ উভয়ই সম্বরণ করা দুষ্কর হয়।

সর্দার শান্ত সিংহ—এদেশে মিস্টার জিন্না ও স্যার ফিরোজ খাঁ নুন যে বলিতেছেন, পাকিস্থান না পাইলে মুসলমানরা বিদ্রোহী হইবে, বিলাতে সর্দার শান্ত সিংহ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—পাকিস্থান কায়েম হইলেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং যদি তাহা হয়, তবে তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। হিন্দুরা যদি মুসলমানদিগের গলা কাটে, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? গত দুই যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য খৃষ্টানরা খৃষ্টান-দিগের গলা কাটিয়াছে—মার্কিনও মার্কিনের অধিবাসীর রক্তসিক্ত পথে অগ্রসর হইয়া বর্তমান সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছে। কাজেই যদি রক্তপাত হয়, হউক। স্বাধীনতা লাভের মূল্য হিসাবে দশ লক্ষ লোকেরও মৃত্যু তুচ্ছ।

বাঙলায় সচিবসঙ্ঘ—কংগ্রেস নিম্নলিখিত সর্তে বাঙলায় কংগ্রেসকে সচিবসঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি দিতে প্রস্তুত—

(১) প্রধান সচিবকে বাদ দিলে যে কয়জন সচিব হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কংগ্রেসী অর্ধাংশ হইবেন।

(২) কংগ্রেসী সচিবকে হয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের নহে ত বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার দিতে হইবে।

(৩) দুর্নীতি নিবারক বোর্ড গঠিত করিতে হইবে। ইত্যাদি—

মিস্টার সুরাবর্দী এই তিনটি প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত হইবেন, বলেন নাই।

এই অবস্থায় কি হইবে, তাহা বলা যায় না।

ইতস্তত

মার্ক টোয়েন তখন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। একদা তাঁদের শিক্ষক মহাশয় "আলস্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বলেন। মার্ক টোয়েন একেবারে সাদা খাতা পেশ করেছিলেন।

উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রথমবার অ্যামেরিকা গেছেন, হোয়াইট হাউসের একধারে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন স্নানের পর কিছু সময় তিনি দিগম্বর হয়ে পায়চারী করতেন। এইরূপ সময়ে একদিন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর দরজায় আঘাত করেন। চার্চিল সাহেব বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন, তিনি বললেন "ভিতরে আসতে পারো।" রুজভেল্ট সাহেব ঘরে ঢুকে প্রধান মন্ত্রীর দিগম্বর বেশ দেখে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী না দমে রুজভেল্ট সাহেবকে জড়িয়ে ধরে' বললেন "আমাদের ইংরাজদের আপনার কাছে কি-ই বা লুকোবার আছে?"

পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে রুশ আর ইরাণের মধ্যে তেল মাখামাখির চুক্তি হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের পর ইহারা যদি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং তখন যদি ঝড়তি-পড়তি কিছু থাকে, তবে তাহাই শুধু ইঙ্গ-মার্কিনের ভাগে জুটিবে। আপাতত সেই সুদুর্লভ ইরাণের ফুলেল তেল শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া বঞ্চিতদিগকে উদাস করিয়া বেড়াইতেছে। রবীন্দ্র সংগীতটি যে খুড়োর কিছু কিছু আসে, তা প্রমাণ করিবার জন্যই বুঝি তিনি গান ধরিলেন—"গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় উদাস করিয়া।"

* * * * * * *

প্রাক্তন ভারতসচিব "আ-মরি" সাহেব ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নাকি প্যারিসে গিয়াছেন। "কিন্তু প্যারিসে না গিয়া দিল্লী আসিলেই তিনি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতেন। যে-বন্ধুরা তাঁহার গো-রক্ষপুরীয় নীতির দোহাই পাড়িয়া রক্ষা পাইতে চাহিতেছেন —তাঁহাদের সমূহ উপকার হইত"—কথাটা অবশ্য খুড়োই বলিলেন, কিন্তু নেহাৎ বোকা বনিয়া যাইবার আশংকায় কথাটিকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার অনুরোধ জানাইতে পারিলাম না।

* * * * * * *

সম্প্রতি জিন্না সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি নাকি নিজকে ভারতীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার সাজসজ্জা এবং মনোভাবের
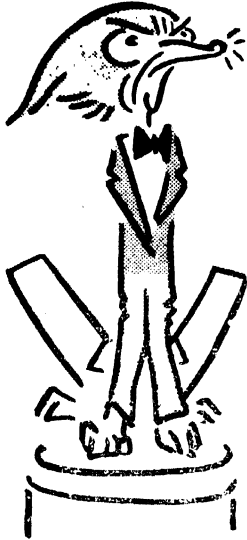
পরিচয় এযাবৎ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সহজ কথাটি আমাদের বহু আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই ব্যাপারে সত্যই তিনি আমাদিগকে একেবারে বোকা বানাইয়া দিলেন। যাহোক, অতঃপর তিনি ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে "নীলবর্ণের" বিভ্রম আমাদের মন হইতে একেবারেই ঘুচিয়া যাইবে।

* * * * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, বাঙলা দেশ হইতে বিপুল খাদ্যসম্ভার এবং অন্যান্য সর্ব-সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নাকি তিব্বতে চালান হইয়া যাইতেছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিশু খুড়ো "হ য ব র ল"র বিড়ালটির ভাষায় বলিলেন—"কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রাণাঘাট, তিব্বত —ব্যাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল !"

* * * * * * *

কলিকাতার রাস্তায় আবার অনশনজনিত মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রসংগটা আলোচনার সময় লীগদলীয় স্যার জিয়াউদ্দীন বলেন—শুধু বাঙলা দেশেই এত
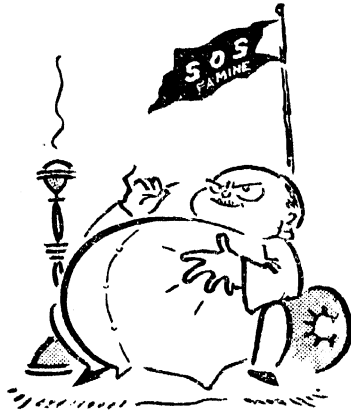
অনশনে মৃত্যু কেন হয়, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। আমরা বলি—ব্যাপারটা আমাদেরও বুদ্ধির অগম্য। এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিতে হইলে একমাত্র বাঙলার প্রাক্তন লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলই পারেন !

* * * * * * *

প্রাসংগত, বিহারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংএর উক্তিও মনে পড়ে। তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—বিহারে খাদ্যসংকটের কোন আশংকাই নাই। কংগ্রেসের "অনুগ্রহ" সর্বত্র থাকিলে আর অনশনজনিত মৃত্যুর আশংকা থাকিত না। কথাটি স্যার জিয়াউদ্দীন বুঝিতে পারিলেন কি ?

মন্ত্রিত্রয়ের সংগে দেখা করিয়া আসার প রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদকে সাংবাদি গণ নানারকম প্রশ্ন করিতে থাকেন। মৌলা সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের "গোল" আর কত দূরে, এই ক আপনারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন সাংবাদিকগণ তাহার উত্তরে কি বলিলেন, তা সংবাদে বলা হয় নাই। আমাদের বিশু খু বলিলেন—"সিমলার খেলায় পেনাল্টি কি পাইয়াও গোলটা ফস্কাইয়া গেল, সেই ক মনে করিয়াই বোধ হয় সাংবাদিকগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। শুধু "গো-হো-হে করিয়া আপসোস করিতে বোধ হয় তাঁহারা অ রাজী নহেন।

* * * * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম, কলিকাতা বিশ বিদ্যালয়ের বি এস-সি পরীক্ষ প্রশ্নপত্র খুব কঠিন বোধ করায় পরীক্ষার্থী নাকি একজোটে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পরীক্ষ হল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বি খুড়ো অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন ছাত্রবন্ধুরা কাজটা ভাল করেন নাই। দিল্লী যে তিনটি ছাত্র "Quit India" প্রশ্নে পরীক্ষা দিতেছেন, তাঁহারা এই উদাহ দেখিয়া যদি কঠিন প্রশ্ন এড়াইবার জ পালাইয়া যান, তবে তাহা পরীক্ষকদের প খুব সুখকর হইবে না !"

* * * * * * *

ইস্টারের ছুটির কয়টা দিন এক নিরিবিলিতে কাটাইবার জন্য মন্ত্রি বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। এই কয়দিন যে তাঁহাদিগকে বিরক্ত না করিলে উপকৃত হইবে
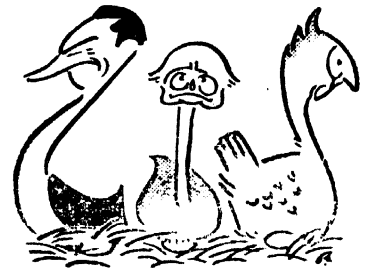
বলিয়া একটি বিবৃতিও দিয়াছেন এ বলিয়াছেন—চিন্তার কোন কারণ নাই, কিন্ত তাঁহারা ছুটি কাটাইলেন, সেই সংবাদ ইস্টা পর ঘোষণা করা হইবে। আমরা অবশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি এবং অনুমান করি পারিতেছি—আমাদিগকে উপহার দেওয়ার (এই উৎসবের একটি অংগ) এই কয় তাঁহারা ইস্টারের ডিম চিত্রিত করিবে "বসিয়া ডিমে তা-ও দিতে পারেন"—বলিে খুড়ো।

নবযুগের 'দিনরাত' ছবিতে চিত্র-প্রযোজক ও তারকাকে দুর্বৃত্তরূপে দেখানোয় ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ যে আপত্তি জানিয়েছে সে ব্যাপারটি গড়িয়েছে অনেক দূর। কোন কোন পান্ডার প্ররোচনায় পড়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ নবযুগের কাছ থেকে এর জন্যে কৈফিয়ৎ দাবী করে এবং ছবি থেকে ঐ সমস্ত অংশ বাদ দেবার জন্যে বলে। নবযুগও সহজে ভয় পাবার লোক নয়, তারা, শোনা গেল, বেশ মুখের মতই জবাব দিয়েছে। জবাবের কথা যাক, আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ কোন ছবির কাহিনী বা চরিত্র নির্বাচন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার মত বেয়াদপি দুঃসাহস পেলে কোথা থেকে। এতো দেখছি প্রায় নাৎসী-প্রথা। হঠাৎ প্রযোজকদের আঁৎকে ওঠার কারণই বা কি এমন ঘটলো? 'দিনরাত'-এর প্রযোজক ও তারকা চরিত্রের সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘের পান্ডাদের কারো চরিত্রের বড় বেশি মিল পাওয়া গিয়েছে কি? দুর্নীতিপরায়ণ প্রযোজক, পরিচালক বা তারকার অভাব কিছু নেই। খোলাখুলিভাবেই নীতিবিগর্হিত কাজ ক'রতে অনেককেই দেখা গিয়েছে। কেউ এক বা দুই স্ত্রী বর্তমান থাকতেই কোন তারকাকে বিয়ে ক'রে তাই নিয়ে বড়াই ক'রে বেড়ান, কেউ তারকাকে বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, কেউ মদ্য এবং রেসকেই জীবনের সার মর্ম করে তোলেন। কোন মহিলা প্রযোজক আবার স্বামী থাকতেও পরপুরুষকে শয্যা-সঙ্গী করে রাখছেন অগোপনেই, কোন পরিচালক ছবির চেয়ে ছবির তারকার জন্যে বেশি মাথা ঘামান, কোন তারকা নবাগতা ভদ্রবংশীয়া অভিনেত্রীদের নষ্ট করার তালেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এসব তো দিনরাতের মতই পরিষ্কার ঘটনা—তবে 'দিনরাত' নিয়ে এতো আপত্তি উঠলো কেন? কাজের বেলা প্রযোজক বা তারকারা যা তা করে যেতে পারেন, তাকে চিত্রিত করতে গেলে কেন তাহলে সেটা অন্যায় হবে? তাছাড়া নবযুগের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকারই বা ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ পেলো কোথা থেকে? এই ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘই দিনকতক আগে সংবাদপত্রে তারকা, প্রযোজক ও পরিচালকদের কীর্তিকলাপের সমালোচনা হয বলে কাগজ-ওয়ালাদের শাসিয়ে দেবার মত ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল—ভারতব্যাপী পত্রপত্রিকায় তার জবাবও ভালরকমই পেয়েছিল তারা। ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘের পান্ডাদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ঘটেছে—নয়তো এতটা বাড়াবাড়ি করতো না নিশ্চয়ই।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

গত সপ্তাহে নিতান্তই চুপিসাড়ে দীপক ও পার্ক শো হাউসে রঞ্জিৎ ফিল্মসের শততম ছবি 'চাঁদ চকোরী' মুক্তিলাভ করেছে। মমতাজ শান্তি ও সুরেন্দ্র ছবিখানিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। গত সপ্তাহে পূর্ণ-পূরবী-উত্তরায় মুক্তিপ্রাপ্ত এম পি প্রডাকসন্সের 'সাত নম্বর বাড়ী' দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা আনতে সক্ষম হয়েছে বলে শোনা গেল। সব চেয়ে বেশি প্রশংসা পাচ্ছে কাহিনীর অভিনবত্ব, মলিনার অভিনয় এবং আলোকচিত্র। এ সপ্তাহের নতুন মুক্তি হচ্ছে জ্যোতিতে শোরী পিকচার্সের বছরখানেক আগেকার ছবি 'শালিমার', যার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চন্দ্রমোহন, মনোরমা, বেগম পারা ও প্রমীলা। আগামী আকর্ষণের তালিকায় রয়েছে মিনার-ছবিঘর-বিজলী'তে চিত্ররূপার 'শান্তি': ভূমিকায় মলিনা, শিপ্রা সন্তোষ সিংহ, ফণী রায়, রবি রায় প্রভৃতি, আর মঞ্চেতে আসছে স্টারে আশু ভট্টাচার্যের লেখা 'মণীশের বৌ' এবং কালিকায় স্বপনবুড়োর লেখা পেশাদারী মঞ্চে প্রথম ছেলেদের নাটক 'বিষ্ণুশর্মা'। চিত্রবাণী লিমিটেডের 'এই তো' জীবন' সম্ভবত আগামী ৩রা মে শ্রী ও উজ্জ্বলায় মুক্তিলাভ করবে—ছবিখানি সম্পর্কে স্টুডিও মহলের অভিমত খুবই উঁচু। ঐ তারিখে চিত্রা ও রূপালিতে নিউ থিয়েটার্সের 'বিরাজ-বৌ'-এর অবগুণ্ঠন মোচন হবার সম্ভাবনা আছে। অমর মল্লিকের পরিচালনায় তোলা এই ছবিখানি প্রায় বছর দেড়েক গুদাম-জাত হ'য়ে রয়েছে।

রবিবার ২১শে এপ্রিল সকাল সাড়ে নয়টায় শ্রীরঙ্গমে 'সুবর্ণ-ভূমি' নামে জাতীয়তামূলক নৃত্যনাট্য অভিনীত হবে।

বিবিধ

'মানে-না-মানা'র জুবিলী উৎসবে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে তাদের নির্ভেজাল একপ্রস্ত গালাগালি করার পর দেখছি শৈলজানন্দের আফসোসের অন্ত নেই। শোনা গেল ঐ ব্যাপারের পরই তিনি নাকি দূত মারফৎ পান্ডা-চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের কাছে একটা মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সেই সূত্রে গত সপ্তাহে কজনকে একটা পার্টিতে আপ্যায়িতও করেছেন। ফলাফল জানা যায়নি। তবে শৈলজানন্দ বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না, কারণ, তাঁর যদি স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে তাহলে অনায়াসেই মনে পড়বে যে, যে সাংবাদিকদের

তিনি পার্টি দিয়ে অর্থাৎ আপ্যায়নের ঘুষ দিয়ে বর্তমান ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইছেন, এদেরই তিনি বছর দুই পূর্বে 'শহর থেকে দূরে'কে নির্বাচনে প্রথম করিয়ে দেবার জন্যে অনুরূপ আপ্যায়ন-ঘুষ দিয়েছিলেন, তবে তাতে ফল বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। এবারের ফলাফল জানার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইলুম।

* * * * *

বম্বের একটি খবর থেকে জানা গেল যে মধু বসুর আগামী ছবি হিন্দী 'গিরিবালা'র নায়িকারূপে সাধনা বসু অভিনয় করবেন। ছবিখানির নাম 'পুনর্মিলন' রাখলে কেমন হয়?

* * * * * *

নীতিন বসু পরিচালিত বম্বে টকীজের আগামী ছবি 'নৌকাডুবি'র নব সংস্করণ 'মিলন'-এ নায়িকা ও উপনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যথাক্রমে মিসেস সরকার ও মিসেস মিশ্র নামের দুই আই-সি-এস পত্নী নির্বাচিতা হয়েছেন। কোন আই-সি-এস চলচ্চিত্র-শিল্পে যোগ দিয়েছে বলে কিন্তু আজও শোনা যায় নি।

* * * * *

উদয়শঙ্কর পরিচালিত 'কল্পনা' জগতে একটা রেকর্ড করবে রেকর্ড-সংখ্যক নাচের দিক থেকে—ছবিখানিতে সব শুদ্ধ ৮০ প্রকারের নৃত্য থাকবে। কোন কোন নৃত্যে এককালে শতাধিক শিল্পীকে দেখা যাবে। সবই তো চমকপ্রদ, কিন্তু এদিকে তুলতে যে ষোলমাস ইতিমধ্যেই কাবার হয়ে গেছে।

* * *

নৃত্যশিল্পী রামগোপাল আমেরিকায় আবার নাচ দেখাতে যাবেন এবং সেই সুযোগে ওখানে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধীয় একখানি ছবি তোলারও চেষ্টা করবেন। জগদ্বিখ্যাত পরিচালক সিসিল ডি মিলী এবিষয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

* * * * *

শুধু মেট্রো গোল্ডুইনই নয়, আমেরিকার আর-কে-ও পিকচার্সও ভারতে চলচ্চিত্র ব্যবসা ফলাও করার তোড়জোড় করছে বলে জানা গেল। এদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের একটি প্রতিনিধিদল এই বিদেশী ব্যবসাপত্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে ভারতীয় সরকারের দোরে ধর্না দিয়ে পড়েছে।

* * *

বিলাতী চিত্রজগতের সবচেয়ে ধনী আর্থার র‍্যাঙ্ক সাম্যবাদের স্রষ্টা কার্ল মার্ক্সের জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তোলা ঠিক করেছেন।

* * * * *

তাজমহল পিকচার্সের 'বেগম' চিত্রে প্রভার একটি প্রধান ভূমিকা ছিল, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ সময়ে চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রভা বাকি দিনের জন্যে দিনপিছু তিন হাজার টাকা দাবী করে। কর্তৃপক্ষ অত টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং প্রভা যে ভূমিকায় অভিনয় করছিলো তার বাকি অংশ অপর একজনকে দিয়ে করিয়ে এবং এমনি কায়দায় তাকে দাঁড় করায় যাতে তার মুখ না দেখা যায়।

* * *

এ্যাসপেণ্ডিয়ার হারীন এণ্ড কোং নাম দিয়ে কবি ও নাট্যকার হারীন চট্টোপাধ্যায় নিজের চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। প্রথম ছবির নাম 'আজাদী'।

সমুদ্রগর্ভে শিশু আগ্নেয়গিরি

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে যে, জাপানে—টোকিওর ২৩৫ মাইল দক্ষিণে—সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাঁশুটে রঙের ৮০ ফুট উঁচু প্রস্তরস্তূপ দেখা গেছে। এই প্রস্তরস্তূপ-দ্বীপটি ছোট্ট পাহাড়ের মতই দেখতে। এটির আয়তন ১০০ গজ চওড়া ও ২০০ গজ লম্বা। এটিকে প্রথম

সমুদ্রগর্ভে শিশু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

আবিষ্কার করেছে এক বৃটিশ ডেস্ট্রয়ারের নাবিক দল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এটি প্রথম দেখা যায় যখন, তখন এর ভেতর থেকে আগ্নেয়গিরির মত গলিত আগুন, ধোঁয়া, কাদা মাটি উদ্গত হওয়ার ফলে আশপাশের কয়েক মাইলব্যাপী সমুদ্রের জল ফুটন্ত গরম জলের মত টগবগ্ করে ফুটছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলছেন যে, এই পার্বত্য দ্বীপটি জাপানের আগ্নেয়গিরিমালারই একটি শৃঙ্গাবিশেষ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন এই সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি থেকে কোনও আশঙ্কার সম্ভাবনা নেই, তাঁরা মনে করেন এই অগ্নি-উদ্গারণের ফলে একটি নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ আগ্নেয়গিরিও সমুদ্রে বিলীন হবে। আমাদের মনে হয় জাপানের দেবতা—মার্কিনদের পদভার সহ্য করতে না পেরে নতুন দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার মতলব করছেন।

কদলী ভক্ষণে মৃত্যু

ইংলণ্ডে একটি তিন বছরের মেয়ে চারটি কলা খেয়ে মারা গেছে বলে জানা গেছে। মেয়েটির নাম ডরোথি, ব্রিডলিংটনের সিউয়ারবাই এভিনিউ-নিবাসী মিঃ ও মিসেস শিপ্‌লির কন্যা। মেয়েটির মা বিবৃতিতে বলেছে কলা চারটি খাওয়ার পর মেয়েটি কয়েকঘণ্টা দিব্যি ভালো ছিল—শুধু তাই নয় ডরোথির ভাই জোসেফও খেয়েছিল দুটো কলা তার কিছুই হয় নি। অথচ তাঁর মেয়েটি কলা খেয়ে যেন কেমন করে এভাবে মারা গেল, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কলা খেয়ে ডরোথির মৃত্যু ঘটাতে ব্রিডলিংটনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কলার দেশে থেকে আমরা একটা কলা না খেতে পেয়ে মরছি—আর ওদেশের একটি তিন বছরের শিশু চারটি কলা খেয়ে মরে গেল,—চাঞ্চল্যকর সংবাদ নয় কি?

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ...

খবর পাওয়া গেছে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী বয়স হয়েছিল যার, সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এঁর পরিচয়—জেমস ওয়াল্টার উইলসন, জর্জিয়া প্রদেশবাসী নিগ্রো। মরবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল—১২০ বছর, অত বেশী বয়সের লোক আর কেউ আমেরিকাতে ছিল না। ১৮২৫ সালের ১৫ই মে উইলসনের জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়া প্রদেশের এক চাষ-বাড়ীতে। এই ভদ্রলোক ১১৭ বছর বয়স অবধি এমন সুন্দর স্বাস্থ্য বজায় রেখেছিলেন যে, কখনও তাঁকে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়নি। এত বয়সেও তাঁর দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি সবই অক্ষুন্ন ছিল এবং তাঁর বয়স যখন ৬৯ বৎসর তখন তাঁর শেষ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—মরবার কিছুদিন আগে এঁর রক্তহীনতা দেখা দেয় এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু এগিয়ে আসছে। যেদিন তিনি মারা গেলেন, সেদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র চার্লি উইলসনকে ডেকে বলেন—"পুত্র আমি আজ তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো—যাবো আমার আপন ঘরে ফিরে।" এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই

জেম্‌স্ ওয়াল্টার উইলসন্

তাঁর নাড়ী বন্ধ হয়ে গেল! অদ্ভুত মৃত্যু! বাঁচতে হলে ঐ রকম বাঁচতে হয়, মরতে হলে এই রকম মরণই চাই!

খেলাধূলা

হকি

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রতিযোগিতার শেষ ভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালিত এই বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতায় তাহার বিপরীত মনোভাবই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। খেলায় অনুপস্থিত হওয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় দেখা দিয়াছে। খেলোয়াড়গণের মধ্যে উৎসাহের অভাব। ফলে খেলার স্ট্যান্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াও নীরব। এই বিষয় তাহাদের কোন করণীয় আছে ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেটন হকি প্রতিযোগিতা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার বাহিরের অনেকগুলি দল যোগদান করিয়াছে। বাঙলার হকি খেলার শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করিয়া নিঃসন্দেহে বলা চলে "বাহিরের একটি দলই বেটন কাপ" বিজয়ীর সম্মানলাভ করিবে।

প্রথম ডিভিসন লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল এতদিন লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করিয়াছিল। এই দল বোম্বাইতে খেলিতে গেলে তাহাদের অবর্তমানের সময় রেঞ্জার্স ক্লাব ধীরে ধীরে পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়া শীর্ষ স্থান দখল করিয়াছে। গ্রীয়ার স্পোর্টিং দলও সমানে পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়া শীর্ষ স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন্ দল হইবে তাহা বর্তমান অবস্থায় বলা খুবই কঠিন। তবে মোহনবাগান দল বোম্বাইর খেলায় পরাজিত হইয়া যে উৎসাহ ও উদ্যম হারাইয়াছে তাহাতে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িতে পারিবে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতিযোগিতার ফলাফল যাহাই হউক না কেন আমরা চাই বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এখন হইতেই আগামী বৎসরে কিরূপে বাঙলার হকি খেলার স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর হয় তাহার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করেন। যদি তাঁহারা নীরব থাকেন বুঝিব নামের জন্যই এসোসিয়েশনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, কাজের জন্য নহে।

ফুটবল

ফুটবল মরসুম আগতপ্রায়। বিভিন্ন বিশিষ্ট দলের পরিচালকগণ দলের খেলোয়াড়গণকে অনুশীলনে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইতেছি এই অনুশীলনের মূল্য কি? এই অনুশীলনে যোগদান করিলেই কি খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবেন? ইহার জন্য নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া কি প্রয়োজন নাই? প্রতি বৎসরই তো অনুশীলনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রকৃত ফল কতটুকু হয়? দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাছা বাছা খেলোয়াড় আনাইবার বা জোগাড় করিবারই বা প্রয়োজন কেন হয়? যদি সত্য কথা প্রকাশ করা হয় অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে এই আশঙ্কায় আমরা প্রকাশ করিলাম না। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা চাই বাঙলার ফুটবল খেলার প্রকৃত উন্নতি—বাঙলার মাঠে বাঙালী খেলোয়াড়গণের প্রাধান্য। বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী করিয়া যাঁহারা দল শক্তিশালী করেন তাঁহারা দলের সুনাম রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু দেশের খেলোয়াড়দের উন্নতির পথ রোধ করেন, ইহা বলিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইতেছে না।

নববর্ষ উৎসব

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির পরিচালকগণের প্রচেষ্টায় এই বৎসর বাঙলার ২২৬ স্থানে নববর্ষ উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে প[illegible] লক্ষের অধিক বালক ও বালিকা যোগদান ক[illegible] সকল স্থানেই শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শ[illegible] জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সামরিক কায়দায় জাতী[illegible] পতাকা অভিবাদন, সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শন[illegible] জাতীয় সংগীত সমবেতভাবে গীত হইয়া[illegible] বাঙলার ব্যায়ামোৎসাহী বালক বালিকাগণ এ[illegible] সম্মেলন, একত্রে ব্যায়াম প্রদর্শন, জাতীয় জীব[illegible] ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতার চরম আদর্শ প্রদর্শ[illegible] করিয়াছে। এতদিন যাঁহারা বলিয়াছেন "বাঙালী[illegible] মধ্যে একতা নাই", "বাঙালী একের নির্দে[illegible] চলিতে পারে না" তাঁহারা নিশ্চয়ই এখন এক[illegible] বলিতে পারিবেন না। সুযোগ ও সুবিধা দি[illegible] সমস্তই সম্ভব। তবে ইহার জন্য আন্তরি[illegible] প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নববর্ষ উৎসব যাঁহারা প্র[illegible] প্রচলন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে[illegible] ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই[illegible] ইহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে দীর্ঘ ১৬ বৎসরে[illegible] একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। প্রচলনকারিগণের একনিষ্ঠতা ইহার সাফল্য আনিয়াছে—জাতীয় জীবনের নূত[illegible] রূপ সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

এই সমিতির পরিচালকগণ একটি শিক্ষাশিবি[illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই শিবিরে বাঙলার বিভি[illegible] জেলার দুই শত যুবক যোগদান করিয়াছেন। এ[illegible] কেন্দ্রে বিভিন্ন ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা ছাড়া সামরিক আইন, নাগরিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনী[illegible] সকল কিছু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বাঙলা[illegible] ইতিপূর্বে এই জাতীয় শিবির কখনও প্রতিষ্ঠি[illegible] হয় নাই। জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে এইরূ[illegible] শিক্ষা শিবিরেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিখি[illegible] বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির পরিচালকগণ ইহ[illegible] ব্যবস্থা করিয়া আরও একটি নূতন আদ[illegible] প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ঋতু-সংহার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত্রি কি তবু মায়াময়, ঝরে ছায়া-তুষার?
পেঁজা-তুলো হয়ে নীলাভ কুয়াশা গাঢ় হাওয়ায়
জমছে। দূরের মায়াঝাউ তার রিক্ত শিথিল সাদা শাখায়
স্বপ্ন-মেখলা ধীরে জড়ায়। মায়া ছড়ায়।
আহা কী রাত! ভ্রান্তিবিলাসে শ্রান্তিহীন—
(আমি বিলীন! তুমি বিলীন!)
এখানে শুধুই মেঘ-পাথার।
বুড়ো মায়াঝাউ,—শিথিল শাখায় ঝরছে এখন ছায়া-তুষার।

অথচ এ নয় রাত্রি। নিপুণ ইন্দ্রজাল
মৃদু মখমলে সূর্যকে ঢেকে রাখছে। দুর্যোধনের মার।
হে সারথি! এ কী শর্করা-মোড়া চারুপ্রহার?
ভ্রান্তিবিলাসে শ্রান্তি নেই,
ক্লান্তি নেই,
যেহেতু দু-ভাঁড় সুরা পাই, তাই
বিধাতার বিভ্রান্তি নেই?

কোথা সকাল, কাঁচা সকাল!
এ ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে ফুঁড়ে যাক্, ফুঁয়ে উড়ে যাক্,—
প্রগাঢ় লাল
আলোর বন্যা আকাশে আসুক, ভেঙে চুরে যাক্ মায়া-জঞ্জাল।

সে ঢেউয়ের মুখে এ কতটুকু?
বারে বারে যারা বানচাল হলো
তারা জানুক্:
ঘুম-ভাঙা রাতে স্বপ্ন নেই, সে স্বপ্ন নেই
(আরো কিছুকাল! তারপরে শুধু ধূ ধূ ধূসর—মরু-ঊষর।)
হে বন্ধু শোনো এইখানেই
রাত্রি হনন করেছি, সমুখে কাঁচা-সকাল—
প্রগাঢ় লাল!
দিগন্তে লীন নীলাক্রান্ত ঘন পাহাড়,
আর নয় আজ মন-মরকত পান্নার চারু পাতাবাহার।
দৃঢ় প্রহার
এ মূঢ় জীবনে সাড়া আনুক্।

দেশী সংবাদ

৯ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় উপকূলবাহিনীর ৯ জন সৈনিকের ফাঁসি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, জমাদার এম বি ঠাকুর প্রমুখ নয়জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ, গোলন্দাজ এম রহমান ও গোলন্দাজ আর এন ঘোষের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ এবং গোলন্দাজ এ সি দে'র প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালের ৬ই জুলাই ও ৫ই আগস্টের মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে সামরিক আদালতে সরাসরি বিচার করিয়া তাহাদের প্রতি ঐ সকল দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। গোলন্দাজ এ সি দে ব্যতীত অপর সকলকেই অন্যান্যের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

কলিকাতার মেয়র এক বিবৃতিতে বলেন যে, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নিরন্ন নরনারীর কলকাতা আগমন এবং কলিকাতা নগরীতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কলকাতায় মৃতের হার সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত মার্চ মাসে অনাহারে ছয়জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া মৃতের হিসাবের রেকর্ডে ঐ মাসে আরও ১০৬ জনকে 'অজ্ঞাত মৃতের' তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১০ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন।

রেশন হ্রাসের প্রতিবাদে ও মাগ্‌গী ভাতার দাবী জানাইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছে।

মধ্যপ্রদেশের অস্তি-চিমুর মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত আরও ৫ জন রাজনৈতিক বন্দীকে তাঁহাদের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলা গভর্নমেণ্টের খাদ্য বিভাগীয় ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস কে চ্যাটার্জি এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কাহারও শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে। মিঃ চ্যাটার্জি বলেন যে, গভর্নমেণ্ট মজুতাগারে এখন মোট ৩৭০০০০ টন খাদ্য আছে। ইহার মধ্যে ১৪০০০০ টন আছে কলিকাতায় এবং অবশিষ্ট খাদ্যশস্য বিভিন্ন জেলায় রহিয়াছে।

১১ই এপ্রিল—শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া আগ্রা সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

১২ই এপ্রিল—চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এস কে গুপ্ত লেবার ইউনিটের ৪৯ জন সৈনিককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কাহারপাড়া গ্রামে গৃহদাহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, পাশবিক অত্যাচার, নরহত্যা ও লুঠতরাজ করার অভিযোগে আসামীগণ অভিযুক্ত হয়।

অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলের সহিত তাহাদের আলোচনার বিবরণ কমিটির নিকট প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলা দেশে লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠন বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, আহ্বান করা হইলে পাঞ্জাব প্রদেশের মত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দল মুসলিম লীগের সহিত বাঙলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবে।

শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ এক বিবৃতিতে তাঁহার প্রতি লাহোর দুর্গে কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত দুর্গ ভারত সরকারের নির্যাতনের পীঠস্থান। তাঁহাকে ক্রমাগত ১৬ মাসকাল একটি সেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু আজ নয়াদিল্লীতে বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪৫ মিনিটকাল আলোচনা হয়।

১৩ই এপ্রিল—আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অদ্য দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য প্রফুল্লকুমারের চেষ্টা, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং গভীর দেশাত্মবোধের উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, আনন্দবাজার পত্রিকা আজ উন্নতির যে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রফুল্লকুমারের জীবনব্যাপী সাধনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের প্রারম্ভে কিরূপ বিপদের মধ্য দিয়া সাবমেরিনযোগে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া জার্মানী হইতে পূর্ব এশিয়ায় গিয়াছিলেন, নেতাজীর পার্সন্যাল সেক্রেটারী মেজর আবিদ হাসান এবং নেতাজীর স্টাফ অফিসার মেজর এন জি স্বামী অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাহা বিবৃত করেন। মেজর হাসান নেতাজীর সঙ্গে ঐ সাবমেরিনে ছিলেন। জার্মানী হইতে পূর্ব এশিয়ায় সুমাত্রায় পৌঁছিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগিয়াছিল। মেজর হাসান এবং মেজর স্বামী বলেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

১৪ই এপ্রিল—মুসলিম লীগের দাবী মিটাইবার জন্য কংগ্রেস কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচিত হয়।

অদ্য নববর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির উদ্যোগে টালা পার্কে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণের এক বিপুলায়তন সমাবেশে সমিতির এক শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৫ই এপ্রিল—দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির ৪ দিনব্যাপী সভায় আলোচনার পর কংগ্রেস কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তৎসম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস ৪টি মূল বিষয় দাবী করিতেছে। প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা; দ্বিতীয় অখণ্ড ভারত; তৃতীয়, পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বশীল প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র; চতুর্থ, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে সকল বিষয়ের ভার থাকিবে সেগুলির দুইটি তালিকা প্রণয়ন। এই তালিকা দুইটির একটি বাধ্যবাধকতামূলক।

কলিকাতার রাজপথগুলি হইতে গভর্নমেণ্টের পরিচালনাধীন যে সব নিরন্ন মেয়েপুরুষ সংগ্রহ করা হয় অকস্মাৎ তাহাদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাহিরশুড়ায় সরকারী নিরন্ন আশ্রমে যে সব নিরন্ন আছে, তাহাদের মধ্যে ভাগ্যের পরিহাসে একজন গ্রাজুয়েট ও একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে সমর সচিব মিঃ ম্যাসন বলেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ৭৮ জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই এপ্রিল—চুংকিং-এ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনা জাতীয় সৈন্যদল কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের কাজে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদল পিপিন-মুকদেন রেলপথের উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

১২ই এপ্রিল—বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট একখানি হোয়াইট পেপার প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে অনাবৃষ্টি, যানবাহনের অসুবিধা, যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির দরুণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে অব্যবস্থাই বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের প্রধান কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। ভারত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া উহাতে বলা হইয়াছে যে, ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সাধারণত যে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, তাহা না হওয়ায় প্রায় ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হইবে।

১৫ই এপ্রিল—অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদ হইতে পারস্য প্রসঙ্গ প্রত্যাহার করিবার জন্য পারস্যের প্রতিনিধি মিঃ হোসেন আলাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অদ্য নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে পারস্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই পারস্য সরকারের মুখপাত্র এই ঘোষণা করেন।

চুংকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাংচুন তিন লক্ষ কম্যুনিস্ট সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

ডায়াপেপসিন
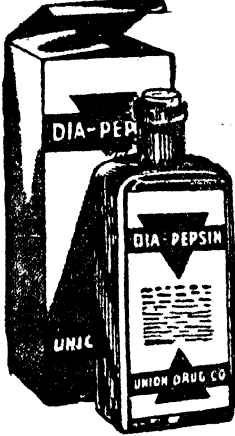
হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন সেই কার্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপসিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

(২)

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷

"দেশ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চ প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

ঠিকানাঃ ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
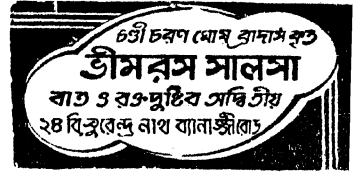
ম্যালেরিয়ায় ম্যালোজেন ২৲, দদ্রুরোগে স্ত্রীরোগে ওপনসি ২৷৷০, শক্তি রক্ত ও উদ্যমহীনতায় টিস, বিন্ডোর সুপরীক্ষিত গ্যারাণ্টীড। জটিল পুরাতন রো সুচিকিৎসার নিয়মাবলী লউন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (গভঃ রেজিঃ ১৪৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শক্তিশালী সংগঠনে গঠিত ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫৬নং ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনেক শাখা আছে এবং বিশেষ স্থানে ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শীঘ্রই আরও শাখা খোলা হইবে।

এস, দাশগুপ্ত
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

—দি—

হুগলী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকা

৩১, ৩, ৪৬, তারিখের হিসাব।

আদায়ীকৃত মূলধন অগ্রিম জমা সহ ও সংরক্ষিত তহবিল ঃ— ৩৩,৫৩,৪০

নগদ কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি ঃ— ২,৩০,৪৬,৯৪৮

আমানত ঃ— ৪,০৭,০২,৩৫

কার্যকরী মূলধন ঃ— ৪,৭৮,৬৫,৬৫

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ১৪ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 27th April, 1946. [২৫ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস-লীগ আলোচনার ব্যর্থতা

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী দলের নেতা বা বাঙলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দীর মধ্যে কংগ্রেস-লীগ মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য যে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা চলে, তাহা অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে এই ব্যর্থতা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয় বরং এ উদ্যমের পরিণতি যে এইরূপে দাঁড়াইবে, আমরা পূর্বে হইতেই তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম; কারণ, আমরা জানি, তেলে জলে কখনই মিশ খায় না। অসাম্প্রদায়িক আদর্শে জাতিকে সংহত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে সুদৃঢ় করিয়া জাতির সংহতি-শক্তিকে ক্ষুন্ন করিতেই মুসলিম লীগ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। মিঃ সুরাবর্দীর তৎসম্পর্কিত উক্তি, বিবৃতি, পত্রালাপ এবং তাঁহার আলোচনার ধারার সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে, লীগের সংকীর্ণ, অনুদার নীতিকেই তিনি আগাগোড়া নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূল সকল উদ্যমকে তিনি একান্তভাবেই উপেক্ষা করেন। মন্ত্রি-মণ্ডলে মুসলমান সদস্যদিগকে মনোনীত করিবার অধিকার শুধু লীগেরই আছে, কার্যত মিঃ জিন্নার এই অনুশাসন তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পরে সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় নাই। শুনিতে পাই, এই প্রশ্নটিকে নিখিল ভারতীয় ব্যাপার স্বরূপে গণ্য করিয়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে নাকি বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কিত এই প্রাদেশিক ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই। আমরা কিন্তু এ যুক্তির কোন সঙ্গতি দেখিতে পাই না। মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই বিষয়টিকে বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং মন্ত্রিমণ্ডলে কংগ্রেস দলের অভিমতানুযায়ী একজন মাত্র মুসলমান সদস্যও গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। মুসলিম লীগ যদি কোন প্রদেশেই মুসলমান মন্ত্রী নির্বাচনে কংগ্রেসের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে রাজী না হয়, তবে কংগ্রেসই বা প্রাদেশিক ব্যাপার বলিয়া বাঙলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুন্ন করিতে যাইবে কেন? বস্তুতঃ নিখিল ভারতীয় প্রশ্নের দোহাই দিয়া যদি বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী-মুসলমানদিগকে উপেক্ষা করিত, তবে কংগ্রেসের পক্ষে তাহা নিতান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতারই কাজ হইত বলিয়া আমরা মনে করি। দেখা যাইবে এরূপ অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মিঃ সুরাবর্দী কংগ্রেসকে অপদস্থ করিবার অভিসন্ধি লইয়াই এই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কংগ্রেস পক্ষ হইতে যে কয়েকটি সর্ত উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই তিনি ডিক্টেটরী ভঙ্গীতে বাতিল করিয়া দেন। ইহার মূলে তাঁহার পূর্বকল্পিত অভিসন্ধিমূলক মনোভাবেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিতর্কমূলক কোন বিল যাহাতে মন্ত্রিমণ্ডল হইতে উত্থাপন করা না হয়, কংগ্রেস হইতে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। মিঃ সুরাবর্দী এমন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই, ইহা স্বাভাবিক; কারণ একমাত্র সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গাইয়াই তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং মুসলিম সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার পক্ষে তাহাই সোজা পথ। এইরূপ প্রবঞ্চনা ব্যতীত জনকল্যাণ সাধনের দ্বারা লোকমতকে আকর্ষণ করিবার মত ত্যাগ-বৃত্তি বা নিঃস্বার্থপরতা লীগ-ওয়ালাদের মধ্যে এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। মুসলিম লীগ দলভুক্ত প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত কংগ্রেস ও লীগ হইতে সমানসংখ্যক মন্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা কংগ্রেসপক্ষের অন্যতম সর্ত ছিল। পোষ্য তোষণের বেপরোয়া অধিকার লীগের হাতে রাখিতে হইলে কংগ্রেসের এই দাবী তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইচ্ছামত মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের সংখ্যা বাড়াইয়া লীগওয়ালারা মন্ত্রিত্বের গদী কায়েম রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং মিঃ সুরাবর্দী ইহাতেও অসম্মত হন। সকল শ্রেণীর রাজবন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে হইবে, ইহাই কংগ্রেস পক্ষের শেষ দাবী ছিল। বলা বাহুল্য, সুচতুর সুরাবর্দী সাহেব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া এই সর্তে রাজী হইতে সমূহ প্রমাদ গণনা করেন। কারণ, কংগ্রেসীদলের সঙ্গে তিনি যে সহযোগিতা করিবেন না এবং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কংগ্রেসের ন্যায় সমুন্নত উদার আদর্শমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়, ইহা তিনি জানেন। কংগ্রেসী দলকে নিজের বাগের মধ্যে ফেলিয়া ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থে সুসার জমানোই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে সস্তা সাম্প্রদায়িক জিগীরে প্রবঞ্চিত মুসলমান দল, অপর পক্ষে স্বার্থান্বেষী শ্বেতাঙ্গ সমাজকে হাতে না রাখিলে তাঁহার

পক্ষে সে কৌশল খাটানো সম্ভব হয় না। দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের জন্য চেষ্টা করিতে গেলে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সমর্থন পাওয়া যাইবে না, ইহা তিনি ভাল রকমেই জানেন; সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি অপারগ। দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের অধিকার সম্পূর্ণরূপে গভর্নরের হাতে, সুবে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর পক্ষে এমন স্বীকৃতি নিশ্চয়ই মর্যাদাজনক নহে; কিন্তু মন্ত্রিত্বের মর্যাদা-বিরোধী অসহায় এবং দুর্বলের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এমন যুক্তির ধাপ্পা দিয়া তিনি কংগ্রেসের শেষোক্ত সর্তও বাতিল করিয়াছেন। বস্তুত কংগ্রেসী দলের উপস্থাপিত সর্তসমূহের কোন একটি মানিয়া লইলেও মুসলমান সমাজের স্বার্থহানি ঘটিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সর্তগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, ঐসব সর্ত মানিয়া লইলে ব্রিটিশ প্রভুদের রুষ্ট হইবার কারণ আছে। মিঃ সুরাবর্দী মুখ্যত তাঁহার মন্ত্রিগিরির মনিব এবং মুসলিম লীগ দলের প্রধান মুরুব্বী ব্রিটিশ প্রভুদের মনের দিকে চাহিয়াই সুচতুরভাবে কাজ করিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে দেশের মুক্তি-প্রয়াসী কংগ্রেসী দলের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে আমরা ইহাতে খুসীই হইয়াছি। কংগ্রেসী দল যে মিঃ সুরাবর্দীর কূট কৌশল ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং কংগ্রেসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম পরিতৃপ্তির বিষয়।

আত্মদাতাদের বেদনা

গত ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই দিবস কলিকাতার একটি জনসভায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপার যোল বৎসর পূর্বেকার কথা; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছে। বহুদিন হইতেই প্রবল পরাক্রম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত হানা বাঙলার তরুণদের অন্তরের স্বপ্ন ছিল। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের একদল যুবক এই স্বপ্নকে কার্যে পরিণত করে। ইহার পর ভারতের বুকের উপর কালচক্রের গতি অনেক রকমে ঘুরিয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা এখন আর স্বপ্নের দুঃসাহসিক উন্মাদনার মধ্যে নাই, বর্তমানে তাহা বাস্তব আকার পরিগ্রহ করিতে বসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তিরা এখনও কারাপ্রাকারের মধ্যে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। আইনের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য দুরন্ত প্রেরণাই ইঁহাদের অপরাধের মূলে ছিল, নতুবা অন্য কোন কারণে ইঁহারা আত্মদানে প্রবৃত্ত হন নাই। ভারতবর্ষ অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা যখন সুনিশ্চিত, তখন বাঙলার এই সব আত্মদানব্রতী স্বাধীনতার উপাসকদিগকে সুদীর্ঘকাল কঠোর কারাক্লেশ ভোগ করিবার পরও এখনও বন্দী রাখার পক্ষে কোন্ কারণ আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। ইঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হোক, আমাদের এই দাবী এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইঁহারা যতদিন পর্যন্ত কারাকক্ষে রুদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার অবাধ আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকর প্রভাব সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত হইবে না। এই সঙ্গে রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত বাঙলা দেশে অপরাপর বন্দীদের কথাও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, আজাদ হিন্দ ফৌজের অবরুদ্ধ সৈনিক এবং সেনানীর কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উঠে। সম্প্রতি আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম অধ্যক্ষ কর্নেল হবিবুর রহমানকে মুক্তিদান করা হইয়াছে; ইহা সুখের বিষয়। এই সম্পর্কে ইহাও শুনিতে পাইতেছি যে, এই দলের অন্যান্য যাঁহারা বন্দী আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিবেচনাও কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হইবে এবং ইঁহাদের অপর কাহারও বিরুদ্ধে মামলা চালানো হইবে না। ইহাও শোনা যাইতেছে যে, কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি, লেঃ কর্নেল আলাগাপ্পান, লেঃ কর্নেল লোকনাথন্ আজাদ হিন্দ দলের এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভারত সকারের বিচার-বিবেচনা শেষ হয় নাই, এই-জন্য যাহা কিছু বিলম্ব ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে দৃষ্টি লইয়া কাজ করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা আগাগোড়া নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হইয়াছে। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে মামলা চালানোর পর্ব আদৌ আরম্ভ না করিলেই সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করা হইত। এখন এই দলের আর কাহারও বিরুদ্ধে মামলা চালানো হইবে না, ইহা যখন স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অনর্থক বন্দী করিয়া রাখার মূলে কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। সমগ্র ভারত এই দলের প্রতি সংবেদনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন কিংবা যাঁহারা অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহাদের সকলকে অবিলম্বে মুক্তিদান করাই সরকারের পক্ষে কর্তব্য। প্রত্যেক দেশেই ব্যাপক কোন রাজ-নীতিক পরিবর্তনের মুখে রাজনীতিক বন্দী-দিগকে মুক্তিদান করা হয়; ইহাতে শান্তি স্বস্তির পথে নূতন শাসন প্রতিষ্ঠার পথ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে করিয়া রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদা[illegible] ব্যাপক ফল পাওয়া যায় না এবং লোকে[illegible] শাসকদের মতিগতি সম্বন্ধে সন্দেহ-স[illegible] কারণ থাকিয়াই যায়। ব্রিটিশ মন্ত্রী এদেশে পদার্পণ করিবার পূর্বেই রাজন[illegible] বন্দীদের ব্যাপকভাবে মুক্তিদানের [illegible] অবলম্বন করা উচিত ছিল। এখনও গভর্নমেণ্টের এ সম্বন্ধে ভ্রান্তি না[illegible] তবে অনর্থের কারণ ঘটিবে বলিয়াই মনে করি।

পরলোকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

গত ১৭ই এপ্রিল শ্রীযুত শ্রীনিবাস [illegible] পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী নীতিতে মহামতি গোখেলের মন্ত্রশিষ্য [illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজ[illegible] ইতিহাসে একটা বৈশিষ্ট্য [illegible] স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। [illegible] অধ্যাত্ম-সাধনার ত্যাগের আদর্শকে ভিত্তি [illegible] রাজনৈতিক কর্মসাধনার সঙ্গে ম[illegible] অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রীর রাজনীতির সঙ্গে আমাদের মতে[illegible] ছিল না; কিন্তু প্রবল স্বদেশপ্রেম, ম[illegible] প্রাখর্য এবং চরিত্রের মাধুর্য-প্রভাবে ভারতের সকল দল এবং সকল সম্প্[illegible] শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বাগ্‌বিভূতি লোকচিত্তকে গভী[illegible] প্রভাবিত করিত; সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন[illegible] ন্যায় তিনিও বাগ্মিতা গুণে সমগ্র [illegible] বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প[illegible] বয়সেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে; তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের মনীষীম[illegible] যে ক্ষতি ঘটিল, তাহা সহজে পরিপূরিত না। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে অ[illegible] আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আস্পর্ধার দৌড়

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ এবং মালয় হইতে [illegible] হিন্দ ফৌজের বহু সৈনিক কলি[illegible] আসিতেছেন। গভর্নমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত ইঁহাদের সাহায্যের জন্য কোন ব্যবস্থা [illegible] নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য স[illegible] হস্তক্ষেপের ফলে বাঙলা গভর্নমেণ্ট দিগকে কিছু সাহায্য করিতে সম্মত হই[illegible] কিন্তু সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ কম্যাণ্ডাণ্ট আখ্যাধারী এক ব্যক্তি সরকারকে তারযোগে এই নির্দেশ দিয়াছে ইঁহাদের সাহায্যের জন্য খুব কম খরচ [illegible] হইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া এবং মাত্র পাঁ[illegible]

হাত-খরচা দিতে হইবে। ইহার অতিরিক্ত ব্যয় করা সংগত হইবে না। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সাহায্যপ্রার্থীদের জন্যই শ্বেতাঙ্গ কম্যান্ডান্ট-পুংগবের এই হুকুম; কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা নাই। তিনি ডিক্টেটরী ভঙ্গীতে বাঙলা সরকারের উপর হুকুম চালাইয়াছেন—ব্রহ্মদেশ ও মালয় হইতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ কলিকাতায় আসিবেন, তাঁহাদিগকে গ্র্যান্ড হোটেলের ন্যায় উত্তম অভিজাত হোটেলে বাসা দিতে হইবে এবং তাঁহারা যাহাতে উপাদেয় খাদ্য ও রুচিকর পানীয় লাভ করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া দিয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে। এই ব্যক্তি কে আমরা জানি না। ভারতবর্ষের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া এই শ্রেণীর জীবগুলো এখনও এদেশের লোকদিগকে এমন ইতরের দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস পায়, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু কোন খুঁটার জোরে এই শ্রেণীর লোকদের এমন সাহস। এমন লোকেরা যতদিন এদেশে ঠাঁই পাইব, ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন কিংবা কোন মিশনই আসিয়া ভারতবাসীদের সংগে ব্রিটিশ জাতির সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না এবং ইঁহাদের দুর্বিনীত এবং স্পর্ধিত আচরণ ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিবে। বলিতে কি, আত্মমর্যাদায় জাগ্রত কোন জাতিই অসংযত প্রভুত্বস্পর্ধী এমন আচরণ সহ্য করিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক সর্বনাশ সাধন করিতেছে। লোকটি যদি সত্যসত্যই ভারত গভর্নমেণ্টের আশ্রিত হয় এবং তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কারণ ইজ্জতের এই মোহ ব্রিটিশ জাতির অস্থিমজ্জাগত এবং ভারত গভর্নমেণ্ট সেই ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্বেই পরিচালিত হইয়া থাকেন, তথাপি ভারত গভর্নমেণ্টকে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা এমন সব লোককে এখনও সায়েস্তা করুন এবং এদেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন। ভারতের বুকের উপর বসিয়া এবং ভারত-ভূমির শোণিতসম অন্নজলে পুষ্ট হইয়া ভারতবাসীদের এমন অবমাননা এদেশের লোক কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না; আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, গায়ের রংয়ের এমন দেমাক্—বর্বরোচিত ইজ্জতের এই মোহ ভারতবাসীরা চুরমার করিয়া ছাড়িবে। স্বাধীনতার কথা, সে সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা কূটকৌশলের ফাঁকে ফাঁকে বিলম্বিত করিলে তাহা বরং বরদাস্ত করা চলে; কিন্তু এই সব পশুকে সর্বাগ্রে বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

জুজুর ভয়

স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের রাজনীতি বিভাগীয় সম্পাদক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে সম্প্রতি বিলাতের স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া এক চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সদস্যদের সংগে বর্তমানে ভারতে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ব্যর্থ হইলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কিভাবে কংগ্রেস ও জাতীয় দলের আন্দোলনকে ধ্বংস করিবেন সেজন্য এখন হইতে তোড়জোড় বাঁধিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের নির্দেশ অনুযায়ী সেনাদল সাজিতেছে, পুলিশের দলবল সজ্জিত হইতেছে। মিঃ ব্রকওয়ে এই খবরও দেন যে, সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে এই সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইনস্পেক্টর জেনারেলগণ তাঁহাদের অধীন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিশ ইনস্পেক্টরদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশ মানিয়া লইবে বলিয়া যাহাদিগকে তাঁহারা সন্দেহ করেন, এমন সব লোকদের এক ব্যাপক তালিকা তাঁহারা যেন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। দিল্লীর সরকারী মহলে মিঃ ব্রকওয়ের এই উক্তি সমর্থিত হয় নাই; কয়েকটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ইহার প্রতিবাদও করিয়াছেন; কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট হইতে যে ভিতরে ভিতরে পুলিশ ও গোয়েন্দা দলের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে, আমরা নানা সূত্রে ইহার পরিচয় পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির শুভ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাঁহারা আশাশীল, তাঁহারা যাহাই মনে করুন না কেন, আমরা মিঃ ব্রকওয়ের এই বিবৃতি একান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল, ভারতের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিতেছেন, ইহা ঠিক; কিন্তু ইংরেজ রাজনীতিকদের কথার ভিতর অনেক কূটকৌশল খেলে, ইহা আমরা জানি। মিঃ ব্রকওয়ের মতে ইংলেণ্ডের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ভারতের সম্বন্ধে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এমন কি, তাহাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ব্রকওয়ে বলেন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ লোপ করিবার পক্ষে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল আর কোন দিন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এসব কথাই ঠিক বলিয়া আমরাও স্বীকার করিয়া লইতেছি; কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় এই যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে যতই উদার ভঙ্গীতেই অগ্রসর হউক না কেন, বড় জোর প্রতিশ্রুতিই শুধু দিয়াছেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনের অজুহাতে তাঁহারা কূটনীতির পাক খেলিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য-বাদসুলভ নগ্ন মূর্তি এখনও ধারণ করিতে পারেন; সে সুযোগ তাঁহাদের হাতে আছে। ফলতঃ তেমন অবস্থা দেখা দিলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই যুক্তি উপস্থিত করিবেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেই গিয়াছিলেন; কিন্তু কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদীর দলই অনর্থ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে; সুতরাং ভারতের শান্তি, স্বস্তি এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য কঠোর হস্তে দুষ্টের দমনে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রহ্মদেশের সম্পর্কে ব্রিটিশের নীতি যে কূট চক্রে ঘুরিয়াছে, তাহাতে ভারতের সম্বন্ধেও তাঁহাদের পক্ষে ইহা একান্ত অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাহসের সংগে জগতের কোন জাতিকে এ পর্যন্ত স্বাধীনতা দানের জন্য কার্যকর পন্থা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করে নাই। অতীতের ইতিহাসে আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ড সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি এ প্রমাণ দিবে; সুতরাং স্বার্থমূলক সংস্কার তাহাদের স্বাভাবিক সেই অদূর-দর্শিতা ভারতের সম্পর্কেও অন্ধ করিবে, ইহা আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া নাই; একথা তাঁহারা যেন বোঝেন। কার্যত যদি তাঁহারা স্বেচ্ছায় ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করেন, তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই শুভবুদ্ধির পরিচয় দিবেন; কিন্তু যদি দুর্বুদ্ধি তাঁহাদিগকে এখনও ভারতের রাজনীতিক অবস্থা এবং জগতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া ফেলে তবে তাঁহারাই বিপন্ন হইবেন। ভারতবাসীরা নিজেদের ক্ষমতার জোরেই দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইবে এবং সেজন্য কোনরূপ আত্মদানে তাঁহারা ভীত হইবেন না। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুক যে, সেক্ষেত্রে পুলিশের দাগী তালিকানুযায়ী স্বদেশপ্রেমিক কর্মী সন্তান-দিগকে জেলে পুরিয়া তাঁহারা নিস্তার পাইবেন না, সমগ্র ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং ভারতভূমির লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে দাঁড়াইবে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ

কারাবাস, আত্মগোপন, পুনরায় কারাবাস —পর্যায়ক্রমে দীর্ঘকাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়া কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম দীর্ঘ ঋজুদেহ এই বিশিষ্ট নেতা মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারত হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধান সমগ্র জগতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার পর ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের পটভূমিকায় যাঁহাদের আত্মগোপন দেশব্যাপী চাঞ্চল্য, পুলিশী তৎপরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল,—তাঁহারা হইতেছেন অরুণা আসফ আলী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, রামমনোহর লোহিয়া ও তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্মিগণ।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে বিহারের অন্তর্গত সীতাবদিয়ারা নামক গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গত ১৯৪৫ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে তিনি ৪২ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন।

পাঠ্যজীবনে জয়প্রকাশ মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ধনীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাজেই নিজের অর্থসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া উচ্চশিক্ষালাভার্থ বিদেশে গমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমেরিকায় অধ্যয়নার্থ এক বৃত্তিলাভ করায় তাঁহার এই বাধা দূর হয় এবং ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আমেরিকা গমন করেন। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কালিফোর্ণিয়ায় পেঁছিয়া দেখিলেন, ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বৎসরের পাঠ আরম্ভ হইতে তখনও তিন মাস বাকি।

এই তিন মাস নিষ্কর্মাভাবে বসিয়া থাকা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। বিশেষত তদনুরূপ আর্থিক স্বাচ্ছল্যও তাঁহার ছিল না। সুতরাং তিনি একটি ফলের আড়তে শ্রমিক হিসাবে কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রমিকের কাজে ছাত্র জয়প্রকাশ

আমেরিকায় অধ্যয়নকালে পরীক্ষার পর অবসর সময়ে তিনি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এইরূপভাবে তিনি ফলের আড়তে, ঝালাই-মিস্ত্রীরূপে লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় এবং পরিচারক হিসাবে রেস্তোরাঁয় কাজ করিয়াছেন।

ফলের আড়তে তাঁহাকে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করিতে হইত। তাঁহার সমস্তটা সময় আঙুর, পীচ, খোবানী ও বাদাম ফলের মধ্যে কাটিত।

ফলের বাগানে ফল সংগ্রহের পর ফল-

গুলিকে প্রথমে বাছাই করা হয় এবং পরে চূণ ও গন্ধকের দ্রাবকে ডুবাইয়া সেগুলিকে পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে কারখানায় পাঠান হয়।

ফলের ঝুড়ির সারিগুলির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝুড়ি হইতে খারাপ ফল বাছাই করাই ছিল জয়প্রকাশের কাজ।

ফলের আড়তে (Fruit-farm) জয়প্রকাশকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। দিন দশ ঘণ্টা ... সপ্তাহের সব দিনই সমভাবে ... করিতে হইত। একদিনও ছুটি ছি... অবশ্য এই হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের ... উপার্জনও যাহা হইত, তাহা একজন শ্র... পক্ষে যথেষ্টই ছিল বলা যায়। তিনি ... ঘণ্টা চল্লিশ সেণ্ট অর্থাৎ দৈনিক চার ... উপার্জন করিতেন। এইভাবে তখনকার বিনিময়ের হার অনুসারে ফলের আড়তে ... আয় হইত দৈনিক চৌদ্দ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৪২০, টাকা। এই উপার্জন ... তিনি প্রতি মাসে আশি ডলার, ... ২৮০, টাকা সঞ্চয় করিতেন।

ফলের আড়তের কাজ ফুরাইয়া যাওয়া... জয়প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্র... হইলেন। কিন্তু তখনও বিশ্ববিদ্যালয় ... নাই। তাঁহাকে কিছু দিন অপেক্ষা ক... হইল। এই সময় তিনি নিজে তাঁহার অ... রন্ধন করিতেন।

অর্থাভাববশত ও অন্যান্য কারণে ... প্রকাশকে আমেরিকায় ক্রমাগত কয়েকটি ... বিদ্যালয় পরিবর্তন করিতে হয়। এ...

কালিফোর্ণিয়ায় অধ্যয়নকালে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে যে বেতন দিতে হইত, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন তাহার এক-চতুর্থাংশ ছিল। অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া আরও কম খরচে পড়াশুনা চালাইবার উদ্দেশ্যে তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিলেন। এই স্থানে এই অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় নির্বাহের জন্যও তাঁহাকে তথাকার এক পাঁচ ফল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে হইল। অতঃপর আইওয়া হইতে তিনি উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের পর তাঁহার রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিভাবে এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে এই পরিবর্তন সাধিত হইল, তাহা পরে বলিতেছি।

কালিফোর্ণিয়ায় অনেক ভারতীয় বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে শিখ ও পাঠানগণের সংখ্যাই বেশী। একটি পাঠান দলের সহিত জয়প্রকাশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই দলের নেতা ছিলেন শের খাঁ নামক এক বিশালকায় পাঠান। শের খাঁ দৈর্ঘ্যে ও আয়তনে দীর্ঘকায় সীমান্ত-গান্ধীরও দ্বিগুণ।

অসহযোগ আন্দোলন ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে অবস্থিত ভারতীয়গণের হৃদয়েও অভূতপূর্ব জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয়গণ যখন জানিতে পারিলেন যে, জয়প্রকাশ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কলেজ ও সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন সকলে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেন এবং সে জন্য তাঁহার পক্ষে কোথাও চাকুরী সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত না।

পড়াশুনা এবং চাকুরি—ক্রমান্বয়ে এইভাবে আমেরিকায় জয়প্রকাশের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি কোথাও সৌখীন, পদমর্যাদা-সম্পন্ন চাকুরি করেন নাই। আমেরিকায় গগন-চুম্বী সৌধতলে, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া কেরাণীগিরিও করেন নাই। আমাদের দেশের যুবকগণ যে কাজ করিতে লজ্জা অনুভব করেন, যে কাজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বংশগৌরব ও আত্মসম্মানের ক্ষতিকারক বলিয়া আমাদের ধারণা, জয়প্রকাশ আমেরিকায় তাহাই করিয়াছেন। ফলের আড়তে, 'জ্যামে'র কারখানায়, আহার কারখানায় শ্রমিকরূপে এবং দোকানে বিক্রেতা ও 'কাফে'সমূহে আহার্য পরিবেশনকারী ভৃত্যের কাজ করিতেও তিনি কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই। এই-ভাবে তিনি হাতে-কলমে যে কাজ করিয়াছিলেন এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়—করিয়াছিলেন, তাহা অংকশাস্ত্র সমাজতত্ত্ব মনোবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা অপেক্ষাও বেশী। মস্তিষ্কের অনুশীলন করিতে গিয়া তিনি হাতকে উপেক্ষা করেন নাই; মস্তিষ্ক ও হাত—এতদুভয়ের যথোপযুক্ত অনুশীলন করার ফলে তিনি জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমেরিকায় লব্ধ তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহাকে গতিপথের নির্দেশ দান করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষা

রাজনীতিক গতিপথের জন্য তাঁহার মনে যে ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল, উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি তাহার সন্ধান পান। আমেরিকার মত ধনীর দেশেও তিনি ধনৈশ্বর্যের পাশাপাশি চূড়ান্ত দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হন এবং অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। আর্থিক বৈষম্যের এই সমস্যা দূরী-করণের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি ভাবিতেই পারিতেন না কতিপয় ব্যক্তি অনাবশ্যক প্রাচুর্যের ভিতর জীবন কাটাইবে, অথচ তাহাদেরই চতুষ্পার্শ্বে অগণিত ব্যক্তি অবিরাম পরিশ্রম করিয়াও অপরিচ্ছন্ন দরিদ্র জীবনযাপন করিবে।

উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক নিষ্ঠাবান সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিতেন, ধনতন্ত্রশাসিত ব্যবস্থায় কখনও এই দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আর্থিক বৈষম্যের সমস্যা-সমাকুল জয়প্রকাশের মনে অধ্যাপকের এই উক্তি নূতন আলোকপাত করিল। তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল।

তিনি মার্কস্‌বাদ সম্পর্কিত যাবতীয় পুস্তক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তালোকে নূতন আলোড়ন ও বিপর্যয়ের সূত্রপাত হইল। ইহার পর তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইল এবং তিনি সমাজতন্ত্রবাদে নব দীক্ষা লাভ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবন নূতন গতিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ছাড়িয়া দিয়া অর্থনীতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিশেষভাবে প্রশংসিত হইল এবং তিনি অর্থনীতির মেধাবী ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন।

তিনি উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিউইয়র্কে গমন করেন এবং সেখানে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া তিন মাস যাবৎ শয্যাগত থাকেন।

জয়প্রকাশ আমেরিকায় প্রায় আট বৎসর কাল অতিবাহিত করেন এবং পাঁচটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি অংকশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাণিবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে তিনি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন।

আমেরিকায় দুই একবার তাঁহার পড়াশুনায় অর্থাভাবহেতু ব্যাঘাত জন্মে। জীবিকানির্বাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ব্যয়ভার বহন করিবার উপযুক্ত অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁহাকে পড়াশুনা স্থগিত রাখিয়া অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। অর্থো-পার্জনের জন্য তিনি কায়িক কোন পরিশ্রমই গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার শিক্ষালাভের ঐকান্তিকতা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়।

ভারতে প্রত্যাবর্তন, কংগ্রেসে যোগদান ও কারাবরণ

১৯২৯ সালে জয়প্রকাশ ভারতে প্রত্যা-বর্তন করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পরেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের শ্রমিক-সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানবিভাগের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। আমেরিকায় শ্রমিক হিসাবে কার্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

ইহার কয়েক মাস পরেই আইন অমান্য-আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী পদে (১৯৩০—৩২) বৃত হন।

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার কারাদণ্ড হয় এবং নাসিক জেলে অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবিগণের সহিত তিনি কারা-জীবনযাপন করেন। তৎকালে নাসিক জেলে মাসানী, অচ্যুত পটবর্ধন এবং আরও অনেকে ছিলেন। কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও তিনি নিশ্চেষ্ট বন্দিজীবন যাপন করেন নাই। এই সময় দেশের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল, সংগ্রামপ্রবণ জাতীয়তাবোধকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আবশ্যক। তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ নাসিক জেলেই কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের 'ব্লু-প্রিন্টে'র খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য জেলেও কর্মোন্মুখ উৎসাহী তরুণ বন্দিগণ অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবর্তনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া আইনসভাগুলি অধিকার করিবার জন্য কার্যক্রম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী দলও এই সময় তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং জয়প্রকাশ তৎকালে আচার্য নরেন্দ্রদেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী কর্মিগণের প্রথম সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। এই সম্মেলনে তিনি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের সংগঠক সমিতির জেনারেল

সেক্রেটারি নির্বাচিত হ'ন। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বামপন্থী শক্তিসমূহকে সংহত করিয়া তিনি নানাস্থানে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলসমূহ গঠন করেন। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে বোম্বাই নগরীতে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গঠন করেন। পুঁজিপতিরা জাতীয়তার নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে কংগ্রেসের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার না করিতে পারে, এই সময় হইতে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের তাহাই হইল প্রধান লক্ষ্য। মতবাদের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কালে জয়প্রকাশের ব্যক্তিত্ব আরও প্রখর হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তিনি কংগ্রেসে শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন। লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি তাঁহার দলগত শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন এবং রাজনীতিক মতবাদকে আরও স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হ'ন, কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের জেনারেল সেক্রেটারির পদ গ্রহণের জন্য তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালে জয়প্রকাশের পুনরায় কারাদণ্ড হইল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেন। দেওলী জেলে আবদ্ধ থাকিয়াও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং এই বন্দিদশাতেই তিনি অক্লান্ত ও ঐকান্তিকভাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল পুনর্গঠন করেন। দেউলী বন্দিনিবাসে তিনি অনশনব্রত অবলম্বন করেন। এই অনশনব্রতের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে।

১৯৪২ সালে জয়প্রকাশ হাজারিবাগ জেলে বন্দিদশা যাপন করেন। এই সময় সমগ্র ভারত আগষ্ট বিপ্লবের উত্তেজনায় চঞ্চল এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তি দেশব্যাপী নির্যাতনের তাণ্ডব বহাইয়া দিয়াছেন। ভারতের এই ঐতিহাসিক সংকটকালে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের দীপালী রজনীতে হাজারিবাগ জেল হইতে তিনি অন্যান্য পাঁচজন সহকর্মিসহ পলায়ন করেন।

অজ্ঞাতবাসে তাঁহার আগষ্ট বিপ্লব পরিচালনার অক্লান্ত চেষ্টা, আত্মগোপনকারী তাঁহার অন্যান্য সহকর্মিগণের সন্ধ্যানে এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভারতব্যাপী ভ্রমণ, নেপালের পার্বত্য অরণ্যে বিহারের সহকর্মিগণের সহিত তাঁহার আলোচনা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার খোলা চিঠি এবং ছাত্রগণ ও আমেরিকান সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে তাঁহার পুস্তিকা প্রচার—এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার রহস্যময় গতিবিধি ও কার্যকলাপ—যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি রোমাঞ্চকর।

জয়প্রকাশের পলায়ন কাহিনী

জয়প্রকাশের রহস্যজনক পলায়ন ও আত্মগোপনের কাহিনী এ পর্যন্ত অজ্ঞাতই ছিল। সম্প্রতি বারাণসী হইতে দিল্লী গমনের কালে তিনি তাঁহার কারা-পলায়ন ও অজ্ঞাতবাসের চমকপ্রদ কাহিনী সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

১৯শে এপ্রিল তারিখের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত তাঁহার এই বিবৃতি হইতে জানা যায়ঃ

১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর জয়প্রকাশ তাঁহার পাঁচজন সহকর্মিসহ হাজারিবাগ জেল হইতে পলায়ন করেন। ইহার পূর্ব হইতেই কিছুকাল যাবৎ তাঁহারা পলায়নের কলাকৌশল সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ তাঁহারা তাঁহাদের পরিধেয় ধুতির সাহায্যে কারাপ্রাচীর টপকাইবার মহড়া দিতেছিলেন। অমা-অন্ধকারাচ্ছন্ন দীপালী রজনীতে তাঁহারা পলায়নের সংকল্প করিলেন। এই বিশেষ রাত্রিটি তাঁহারা পলায়নের উদ্দেশ্যে এই জন্য নির্বাচিত করিলেন যে, দীপালী উৎসবের আনন্দ আয়োজনের জন্য এই রাত্রিতে কারাগারে প্রহরাকার্যে কিঞ্চিৎ শিথিলতা হওয়া স্বাভাবিক এবং অমাবস্যা রাত্রি বলিয়া জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সন্দেহজনক গতিবিধি বুঝিতে পারিবেন না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাত্রিতে তাঁহারা ছয়জন একজনের কাঁধে আর একজন চড়িয়া ধুতির সাহায্যে কারাপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিয়া যান। স্থির হয়, যিনি সর্বপ্রথমে প্রাচীর পার হইবেন, তিনি তাঁহাদের সকলের জুতা ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ও কিছু টাকাকড়ি-বাঁধা একটি পুঁটলী প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা ঐ পুঁটলীর কথা ভুলিয়া যান। ইহার ফলে নিঃসম্বল অবস্থায় অনাবৃত পদে তাঁহাদিগকে দুর্গম পথ চলিতে হইল।

সর্বাপেক্ষা অসুবিধা ও কষ্ট হইতে লাগিল জয়প্রকাশেরই বেশী; কারণ খালি পায়ে চলা তাঁহার কোন দিনই অভ্যাস ছিল না। জেল হইতে পলায়ন করিয়া তিন দিন ব্যাপী অনাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে ছোটনাগপুরের কণ্টকাচ্ছন্ন, শ্বাপদসংকুল ৫৬ মাইল অরণ্যপথ অতিক্রম করিবার পর প্রথম তাঁহাদের যে আহার্য মিলিল, তাহা অন্নব্যঞ্জন নহে—তাহা হইতেছে চিড়া এবং গুড়। ক্ষুৎপিপাসাকাতর দুর্গমপথের এই অভিযাত্রীদের পা কাটিয়া এবং ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঝরিতেছিল। ছয়জন ব্যক্তির সঙ্গে এক মাত্র অতিরিক্ত ধুতি ছিল; তাহাই বারো ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পা বাঁধিয়া ত হাজারীবাগ হইতে গয়া অভিমুখে হইলেন। গয়ায় পৌঁছিয়া তাঁহারা ছ ছয় দিকে যাত্রা করিলেন। জয়প্রকাশ ও এক সাথী কাশী অভিমুখে রওনা হই রামনগর হইতে নৌকাযোগে তাঁহারা কা পৌঁছিলেন।

এই সময় হইতেই জয়প্রকাশ দাড়ি র আরম্ভ করিলেন। তিনি এত কৃশ গিয়াছিলেন যে, শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত ত কোন অপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে পারিতেন না।

জয়প্রকাশের অজ্ঞাতবাসকালীন কলাপের সূত্রপাত হয় কাশীতে। এই তিনি পাৎলুন পরিধান করিতেন। বা অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি ধুতি-পা পরিধান করিতেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত জয়প্র ইউরোপীয় পরিচ্ছদে মুসলমানের মত এবং এই সময় তিনি মুসলমানী নাম করিতেন। পাঞ্জাবে ভ্রমণকালে তিনি লা নিকট গ্রেপ্তার হন।

জয়প্রকাশ কেবল দুঃসাহসী বিপ্ল প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিক নহেন, লেখক হিসাবেও তাঁহার যোগ রচনাকুশলতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সরল অনাড়ম্বর ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী তাঁহার রচিত "সমাজতন্ত্রবাদ কেন? Socialism ?) একখানি প্রসিদ্ধ

বিহারের সারন জেলার সীতা নামক ক্ষুদ্র গ্রামে এক অখ্যাত কৃষক-প জয়প্রকাশের জন্ম হইয়াছিল এবং যে জ যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বকাল আধুনিক নাগরিক সভ্যতা হইতে দূ পল্লীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয় তিনিই আজ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের বিশিষ্ট নেতা। এদেশে শ্রমিক নেতা হই কিংবা সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াই শ্রমিক ও কৃষক জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা তাহার সহিত সংযোগ সাধারণতঃ প্রয়োজন নাই। নেতার ব্যবহারিক দিক অপেক্ষা তাত্ত্বিক দিব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষক-পরিবারে করিয়া এবং আমেরিকায় নানা কারখানা হিসাবে কার্য করিয়া জয়প্রকাশ কৃষক জীবনের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে পরোক্ষ নহে, তাহা তাঁহার জীবনের তাঁহার রক্তমাংসের সহিত মিশিয়া তা অঙ্গীভূত হইয়াছে। এবং এই ত উৎস হইতেই তিনি সমাজতান্ত্রিক দ লাভ করিয়াছিলেন, এই অভিজ্ঞতা কার্যকলাপের মূলে প্রেরণা যোগাইয়া

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[৬]

আমাদের যারা 'কালেওয়া' থেকে আসছে তাদের মুখে শুনলাম, বহু নূতন নূতন জাপানী সেনা এগিয়ে যাচ্ছে আর পুরনো অসুস্থ সেনারা ফেরত আসছে। আমরা খাদ্য ও গোলাগুলীর অভাবেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি. কাজেই বৃটিশ যে খুব শীঘ্র এগিয়ে আসতে পারবে না, তা বেশ ভালো করেই জানতাম।

আমাদের হাসপাতালে রোগীদের জন্য খুব ভালো বন্দোবস্ত ছিলো। খাওয়া তো ভালো ছিলোই, তা ছাড়া আমরা যথেষ্ট ডিম ও দুধ কিনতাম। প্রায় প্রত্যেক রোগীই প্রত্যহ আধসের দুধ ও একটি ডিম পেতো। নেতাজীর আদেশ ছিলো; "রোগীদের বাঁচাবার জন্য যতো টাকা খরচ করতে হয় করবে, তাতে কিছুমাত্র কার্পণ্য যেন না হয়। কারণ টাকা যথেষ্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু একটি প্রাণ গেলে তা ফিরে পাওয়া যাবে না!"

আমি যখন হাসপাতালে, তখন আমাদের রেজিমেণ্টগুলি আস্তে আস্তে ফেরত আসছিল। সুভাষ রেজিমেণ্ট মালয়া থেকে বিশ মাইল দূরে একটি গ্রামে ক্যাম্প করেছে। গান্ধী রেজিমেণ্ট সোজা চলে যাচ্ছে মান্দালয় আর আমার আজাদ রেজিমেণ্ট 'মাহু' থেকে মাত্র নয় মাইল দূরে 'চাঙ্গু'তে ক্যাম্প করেছে। অবশ্য রেজিমেণ্টগুলি শুধু নামেতেই আছে। তাদের বেশীর ভাগ অফিসার ও সিপাহী সকলে রোগী হিসাবে হাসপাতালেই ভর্তি হয়ে আছে। আমি এখনও 'এটিব্রিন' খাচ্ছি, কাজেই আমার পক্ষে ক্যাম্পে যাওয়া সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, ডাক্তার চৌধুরী মারা গেছে, তৃতীয়, ডাক্তার প্রসারকরের এখনও কোন খবর নেই। অথচ একজন ডাক্তারের দরকার, কাজেই হাসপাতাল থেকে সাব অফিসার গুপ্তকে সেখানে পাঠানো হ'ল।

আমি তখনও 'মাহু' হাসপাতালে। একদিন সকালে কর্নেল গুলজারা সিং ও কর্নেল হবিবর রহমান এসে হাজির। আমাকে দেখে উভয়েই খুব আনন্দিত হয়ে 'শেক হ্যান্ড' করলেন। তারপর কর্নেল গুলজারা সিং সাহেব বললেন "বাসু, তোমাকে এখনো অসুস্থ দেখছি। শীগ্‌গীর ভালো হয়ে নাও। আমাদের ডাক্তারেরও অভাব।" আমি উত্তরে জানালাম, 'এটিব্রিন' শেষ হলেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।"

একদিন শুনলাম নেতাজী 'ইউ'-তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিলো 'কালেওয়া' পর্যন্ত যাবেন, কিন্তু পথে এক জায়গাতে প্রায় দশ মাইলের উপর পথ হাঁটিতে হবে বলে অন্যান্য অফিসাররা তাঁকে আগে যেতে দেন নি। আমাদের হাসপাতালে হয়তো যে কোনোও সময়ে এসে পড়তে পারেন। আমরা যেন সব সময় তৈরী থাকি। তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হ'ল, তিনি এলে কি কি প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার যথাযথ উত্তর কি হতে পারে।

তিনি ডাক্তার না হ'লেও এমন প্রশ্ন সময় সময় করতেন, যাতে ডাক্তারকেও উত্তর দেবার জন্য একটু ভাবতে হোত। কাজেই আমরাও সব কিছু প্রশ্নের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। 'রাশন' প্রত্যেকে কতো পায়? প্রত্যেকটি জিনিসের 'ক্যালোরিক' মূল্য কতো? একজন রোগী প্রকৃতপক্ষে তার যতোটা দরকার ততটা খাদ্যমূল্য পাচ্ছে কিনা? আমরা রোজই তৈরী হয়ে থাকতাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে আসতে পারলেন না। 'ইউ' থেকেই রেঙ্গুন ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমি মাহু থেকে চাঙ্গু ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর। ছোট্ট একটি শহর। আমরা সকলে এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরে থাকতাম। এখানে অনেক 'ফুঙ্গি চঙ্গ' অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির আছে বলেই এ জায়গায় নাম 'চাঙ্গু'। এখানে এ পর্যন্ত আমার রেজিমেণ্টের মাত্র দশ বারোজন অফিসার ও প্রায় তিনশো সিপাহী এসে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই চর্মরোগে ভুগছে। হাসপাতাল একেবারে ভর্তি, রোগী আর সেখানে পাঠানো সম্ভবপর নয়। আমার কাছে ঔষধও বেশী নেই। একমাত্র নিমপাতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। নিমপাতার জল সিদ্ধ করে তাদের সারা শরীর ধোয়ান হোত। তারপর নিমপাতা বেটে তাই মাখানো। এখানেও ডিম ও দুধ পাওয়া যেতো। রোগীদের যথেষ্ট পরিমাণে খেতে দিতাম। আমরা এখানে বেশ আমোদেই থাকতাম। বহুদিন পরে নানা দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে আবার সুখের মুখ দেখলাম।

এখানে আশপাশের সব গ্রাম নিয়ে প্রায় একশো ভারতীয় ছিলো। আগে এখানে কোনও লীগের প্রতিষ্ঠা হয় নি। আমরা আসার পর কয়েকজন অফিসার উদ্যোগী হয়ে এখানে ভারতীয় লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ডাক্তার বড়ুয়া লীগের সভাপতি হন।

আমরা সকলে আবার সমবেত হওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে একটি ছোট পার্টি হয়। তাতে সকলেই আমাকেই ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হওয়ার জন্য একদিন একটি পার্টি দেওয়ার অনুরোধ করেন। হাতে পয়সা কম, কাজেই কর্নেল সাহেব অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে একশো টাকা দেন। তাই দিয়ে আমি একটি ছোট পার্টির বন্দোবস্ত করি। সেদিন সকলেই চৌধুরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে কর্নেল সাহেব দুঃখের সঙ্গে চৌধুরীর সেই ছুটি চাওয়ার কথাটির উল্লেখ করেন। ইম্ফল থেকে তার বাড়ি ছিলো মাত্র একশো মাইলের মধ্যে, তাই অতি দুঃখেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু এ দুঃখ সে সহ্য করতে পারে নি। তবে দুঃখের মাঝেও আমরা গৌরব অনুভব করেছি যে, সে দেশের জন্যই কষ্ট স্বীকার করেছে, দেশের কাজেই প্রাণ উৎসর্গ করেছে।

'চাঙ্গু' ছোটখাট বেশ একটি সুন্দর জায়গা। স্টেশন এখান থেকে প্রায় এক মাইলের উপর। মাঝে মাঝে বিমান এসে স্টেশনের কাছাকাছি একটি পুলের উপর বোমা ফেলে চলে যেতো। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, রোজ রোজ বোমা খেয়েও পুলটি ভাঙ্গতো না, কাজেই বিমানগুলির আসা একেবারে ধারাবাহিক হয়ে উঠেছিলো। আমরা দূর থেকে দেখতাম কিভাবে বোমাগুলি পড়ছে। এখানে যেদিন বোমা পড়তো, সেইদিনই বিমান থেকে অনেক 'প্রোপাগান্ডা' কাগজও ফেলা হোত। তার মধ্যে একটি থাকতো সাপ্তাহিক Sky Bulletin'। বর্মী ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই কাগজ ফেলা হোত। তাতে বৃটিশ কোথায় কোথায় অগ্রসর হচ্ছে জার্মানীর অবস্থা কি.—সব কিছু ম্যাপ দিয়ে দেখানো হোত।

'চাংগুতে' কয়েকঘর 'অ্যাংলো বর্মীজ' থাকতো। কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের এক পাশে রাখা হয়েছিল। তারা সেখান থেকে তিন মাইল এলাকার বাইরে যেতে পারতো না। বেলা তিনটের পর বাইরে যাওয়ার হুকুম ছিলো না। তবে বিশেষ কাজে পুলিশের অনুমতি নিয়ে বিকালে বা সন্ধ্যাতেও বাইরে আসতে পারতো। এখানে একটি গীর্জা আছে। সেখানে বহু ইভাকুয়ী ইউরেশিয়ান সপরিবারে বাস করতো।

একমাত্র সকালের দিকে বিমানগুলির নিয়মিতভাবে পুলটি আক্রমণ ছাড়া এখানে যুদ্ধের অন্য কোনও উপদ্রব ছিলো না। বিকালে মাঠে ফুটবল ম্যাচ প্রায় রোজই হোত। তাছাড়া ব্যাডমিণ্টন, লেডিজ ভলিবল প্রভৃতি খেলাও পুরাদমে চলতো। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রতি গৃহেই গ্রামোফোনের সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শোনা যেতো। দোকানপাটও ঠিকভাবেই খোলা হোত। এমন কি মাঝে মাঝে সখের দলের থিয়েটার পর্যন্ত হোত। আমরা এখানে আসার পর এখানকার প্রত্যেকেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতো। মাঝে একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের বৌদ্ধ মন্দিরে থাকা নিয়ে। এখানে মন্দির এলাকার মধ্যে জুতা পায়ে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ অবশ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই আইনের বাইরে। আমরা দিনরাত মন্দিরের ভিতরে জুতা ব্যবহার করতাম বলে অনেক বর্মী তাতে আপত্তি করে। পবিত্র মন্দির এতে অপবিত্র করা হয়, বুদ্ধদেবকে অপমান করা হয়। কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু তাদের বুঝিয়ে দেন যে, সৈনিক হিসাবে এরা দিনরাত জুতা ব্যবহার করে। ইচ্ছাপূর্বক কেহই বুদ্ধদেবকে অপমান করে না। সৈনিকরা দেশরক্ষা করে কাজেই তারা এইভাবে জুতা ব্যবহার করলে তা মোটেই দোষনীয় নয়। যাহোক, কিছুদিন থাকার পর আমাদের ব্যবহারে সকলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়। কারণ প্রত্যেক দেশের সৈন্যদলের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা দেখা যায়, যা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে একেবারেই ছিলো না। আমরা যেখানেই গিয়েছি, আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে এতোটুকু অভিযোগ আমাদের শুনতে হয়নি। তাদের এতো সুন্দর ব্যবহার করার প্রধান কারণই হচ্ছে দেশের প্রতি ও নেতাজীর প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা।

এখানে আমাদের সৈন্যরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করত। অনেক বর্মী তাদের বাড়ি এদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতো। সকলেই বলতো—এমন কি বর্মী সৈন্যদের চাইতেও আমাদের সৈন্যদের ব্যবহার শতগুণ ভালো। তবু তো ভাষাগত পার্থক্য যথেষ্ট আছে।

পুজা কোথায়, কবে কেটেছে খবর পাইনি, কিন্তু দীপালীর খবর এখানে পেলাম। ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দুদের এইটিই হচ্ছে প্রধান উৎসব। মালয়াতেও দেখেছি, এখানেও দেখলাম। দেওয়ালির রাতে এখানকার কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী আমাদের প্রায় সব অফিসারকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাতে আলো সকলেই বড় ভয়ে ভয়ে জ্বালাতো, তাই দীপান্বিতার রাত্রিতেও জ্বলে উঠলো মাত্র কয়েকটি প্রদীপ। তাও বিমানের আওয়াজ শুনলে তা নিভিয়ে দেবার জন্য পাখা হাতে নিয়ে একজন করে লোক তৈরী থাকতো। আমরাও বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে কয়েকটি দীপ জ্বালিয়ে দীপালি উৎসব করলাম।

এখানকার লীগ প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বড়ুয়া বর্মী বিবাহ করে অনেকদিন থেকেই এখানে বসবাস করছেন। বাঙালী তিনি ছাড়া মাত্র আর একজন ছিলেন। কাজেই প্রায় রোজ সন্ধ্যাতে আমি তাঁর বাড়ি যেতাম। অনেক রাত অবধি গল্প করতাম। এখানকার লোকেরা আমাদের মুখে লড়াইয়ের গল্প অনেক শুনতো। এখানে বৃটিশ তরফ থেকে অনেক কাগজ পড়তো, তার উপর কয়েকজন অ্যাংলো বর্মী থাকাতে প্রকৃত খবর কতকটা গোপন হোত, কতকটা বা অন্যরূপে প্রকাশ পেতো। আমাদের কাছে সব শুনে তারা অনেক সময় বলতো, "আমরা তো শুনেছি অন্যরূপ।"

কিছুদিন পর এখানে আমাদের রেজিমেণ্টের ডাক্তার হয়ে এলেন মেজর এম পি মিশ্র। তিনি আসার কয়েকদিন পরেই আমার আবার জ্বর হয়। প্রথমদিন তো এমনি কাটলো। দ্বিতীয় দিন থেকে কুইনাইন খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনে ডাঃ মিশ্র কুইনাইন 'ইনজেকসন' দিলেন, কিন্তু তবু জ্বরের উপশম না হওয়াতে তিনি আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। সপ্তম দিনে বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলাম। যে জ্বর ছাড়াবার জন্য এতো চেষ্টা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই তা সেরে গেলো। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশী থাকাতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে। এখানে ক্যাপ্টেন যোশীও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেরিবেরি হওয়ার দরুণ। ডাঃ যোশী সুভাষ রেজিমেণ্টের সঙ্গে 'হাকা' ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন। আমরা দুজনে পাশাপাশি বিছানা লাগিয়ে একে অপরকে শোনাতে লাগলাম নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা। এইভাবে প্রায় দশ দিন হাসপাতালে কাটানোর পর শুনলাম আমাদের এখান থেকেও শীঘ্র মান্দালয় যেতে হবে। রোগীদের পাঠানোর বন্দোবস্ত হতে লাগলো, কাজেই আমি আমার রেজিমেণ্টে ফিরে এলাম। এখানে সকলে মান্দালয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

আমাদের সরিয়ে জাপানীরা এসব জায়গা অধিকার করতে চায়। তাদের
চিন্দুইন নদীর ওপারে বৃটিশের অ
রোধ করা। ঠিক হ'ল প্রথমে রোগী
নিয়ে আমি মান্দালয় যাব। দ্বিতীয়
ঔষধের বাক্স প্রভৃতি নিয়ে যাবেন ডাঃ
এবং তৃতীয় ও শেষ দল নিয়ে যাবেন
অফিসার মেনন। হঠাৎ এখান থেকে চলে য
শুনে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হলো, বি
করে এখানকার ভারতীয়রা। কবে নাগাদ
যাবো তা গোপন রাখা হয়েছিল। আ
যাবার দিনই কয়েকটি বাড়ি থেকে, আ
নিমন্ত্রণ আসে খাওয়ার জন্য। সেইদিনই চ
যাচ্ছি সুতরাং একদিনে সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক
অসম্ভব। প্রথমে গেলাম ডাঃ বড়ুয়ার বা
তিনি দুঃখ করে জানালেন, "আপনি এ
শীগ্‌গীর চলে যাবেন তা ভাবতেও পারি
তাই আপনাকে একদিন খাওয়ানো পর্য
হয়নি। সৈন্যদলের মধ্যে বাঙালী
একেবারেই দেখা যায় না তবু আপনা
কিছুদিন পেয়ে বেশ আনন্দে দিন কেটেছে
কয়েকখানা পুরী ও চা খেয়ে সেখান থে
বিদায় নেওয়ার পরই পথের মাঝে মিঃ ভিনাই
আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তি
শুনতে পেয়েছেন আমি শীগ্‌গির যাচ্ছি, আ
সেই 'শীগ্‌গীর' যে 'আজ' তা তিনি জানতে
না, আমিও জানালাম না। সম্ভব হলে প
একদিন খাওয়া যাবে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রু
দিয়ে সরে পড়লাম। সন্ধ্যাকালে প্রায় দেড়
সৈন্য (তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন রোগী) নি
স্টেশনে এসে পেঁছিলাম। রাত প্রায় দশ
নাগাদ গাড়ি এলো। কতকগুলি খোলা গা
চালের বস্তাতে ভর্তি ছিলো, আমরা তাতে
উঠে বসলাম। এতটুকু জায়গা খালি নে
গাড়ি চলতে লাগলো। খানিক পরেই খো
গাড়িতে চড়ার ফলভোগ করতে হোল। ইঞ্জি
কয়লার অভাবে কাঠে চলে, কাজেই, ছো
ছোট কাঠের আগুন উড়ে এসে গায়ে পড়
লাগলো। তাতে অল্প অল্প কাপড়, জ
পুড়তে লাগলো। শুনেছিলাম পথে '
(Mu) নদীর পুল নাকি ভেঙ্গে গে
হয়তো আজ রাতেই 'সাগাই' পেঁছান য
না। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো, তাই, দেখ
পেলুম পুল কতকটা মেরামত করা হয়ে গে
তবে পুলের উপর দিয়ে 'এঞ্জিন' যেতে পার
না। কাজেই এদিককার এঞ্জিন আমাদের গা
ঠেলে পার করে দিলে, ওপার থেকে অন্য এঞ্জি
এসে গাড়ি টেনে নিলে। প্রায় ভোরের দি
আমরা সাগাই এসে পেঁছিলাম। রোগী
স্টেশন থেকে অল্প দূরে একটা বড় গ
তলায় বসিয়ে রেখে আমরা ক্যাম্পের সন্ধ
বেরুলাম। খানিক পরেই ক্যাম্প খুঁজে পে
এবং ক্যাম্প কমান্ডারকে রোগীদের আনার ব
বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করলাম। কিছু

জিরে লরী করে রুগী নিয়ে আসা হ'ল। তাদের জন্য আলাদা একটি বাড়ি ঠিক করা ছিলো, সেখানেই আপাতত আমরা একটি অস্থায়ী হাসপাতাল খুলে তাদের সাময়িক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলাম।

'সাগাঁইতে' মাত্র তিনদিন ছিলাম। আগে একজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর খোঁজ পেলাম না। তাঁর একটি মেয়ে এখানে একটি দোকান করেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম তিনি মারা গেছেন। মেয়েটি, মা বর্মী হলেও বাঙলা খুব সুন্দর বলতে পারেন। তাঁর একটি বোন এখানকার জাপানী হাসপাতালে নার্সের কাজ করেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা হোল। শুনলাম জাপানী হাসপাতালগুলি একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের হাসপাতালে এতো রোগী, যে অনেকে শুধু গাছতলাতেই পড়ে আছে। প্রতিদিন তাদের মৃত্যুও হচ্ছে। জাপানীরা ঠান্ডা দেশের লোক, একে এদেশের গরম তারা সহ্য করতে পারে না, তারপর ম্যালেরিয়া। আমাদের পক্ষে ম্যালেরিয়াটা গা সওয়া, কিন্তু তারা ম্যালেরিয়া সহ্য করতে পারে না। বহু জাপানী ম্যালেরিয়াতেও মারা গেছে। আমাদের পিছনে আসতে দেখে অনেকে যুদ্ধের খবর জানতে চায়, আর আমাদের পিছু হটার কারণও জানতে চায়। জাপানীদের কাছে অনেক সৈন্য আছে তাদের একদল ক্লান্ত হয়ে পড়লে, অন্যদল তাদের বদলে আসে। কিন্তু আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম। একদলের পরিবর্তে অন্যদল পাঠানো একেবারে অসম্ভব। কাজেই পিছু হটে বিশ্রাম করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

এখান থেকে মান্দালয় যাওয়ার দিন মেজর প্রিতম সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি যাচ্ছেন মান্দালয়। তাঁর কাছে একখানা লরী ছিলো। তাঁকে জানালাম, আমার কাছে কিছু রোগী আছে তারা একেবারে হাঁটতে অক্ষম। যদি তিনি তাঁর লরী করে তাদের নদীর পারে পেঁছানর বন্দোবস্ত করেন তবে বিশেষ ভালো হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। আমি সন্ধ্যার আগেই সকলকে নদীর তীরে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর মেজর সাহেবকে জানালুম, তিনি যেন মান্দালয় পেঁছেই ঘাটে লরী পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ইরাবতী নদী পার হই। তারপর পেঁছেই দেখি লরী প্রস্তুত। রোগীদের নিয়ে আবার সেই 'কৃষি কলেজ' ক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। রাত তখন প্রায় দুটো। কাজেই রোগীদের হাসপাতালের বারান্দায় রাতের মতো শোবার ব্যবস্থা করে নিজে আশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগলাম। শুনলাম এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার হচ্ছেন, মেজর বাওয়া ও ক্যাপ্টেন মল্লিক। খোঁজ করে মল্লিকের ঘরে এসে হাজির হলাম। সেখানে এসে দেখি ডাঃ কানাই দাস ও ডাঃ প্রসারকরও এসে হাজির হয়েছেন। বহুদিন পরে আবার প্রসারকর ও দাসের সঙ্গে দেখা, কাজেই সেই গভীর রাতেই খানিকটা হৈ চৈ। রাতের মতো সেই ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে ঘুম।

সকালে ওঠার পর আবার খুব কলরব শুরু হ'ল। প্রসারকরের কোনো খবর আগে পাইনি, শুনলাম তিনি টামু থেকে 'সিবোর' রাস্তা ধরে পরে মার্চিনা-মান্দালয় রেললাইন দিয়ে মান্দালয় আসেন। এখানে আসার পর মেমিও হাসপাতালে ভর্তি হন। মাত্র দুদিন আগে সেখান থেকে এখানে এসে পেঁছেছেন।

আমার রোগীদের সব কিছু বন্দোবস্ত করলাম। এখানে পেঁছানোর পর যুদ্ধের কিছু খবর শোনা গেল। বৃটিশ বড় একটা আগে বাড়ছে না, তবে মাঝে মাঝে দু' এক জায়গাতে 'প্যারাট্রুপ' কিছু কিছু নামিয়েছে। টামু থেকে 'কালেওয়ার' রাস্তা শুধু জঙ্গলে ভর্তি। কাজেই জাপানীরা বৃটিশকে চিন্দুইন নদীর পরপারে আটকাতে চায়। ওদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যুদ্ধ খুব জোর চলছে। মালয়াতে যে জাপানী সেনাপতি যুদ্ধ জয় করেছিলেন, সেই জেনারেল ইয়ামাসিটা (তিনি মালয়ের ব্যাঘ্র নামে পরিচিত) বর্তমানে ফিলিপাইনে বদলী হয়েছেন। তাঁর উপর জাপানীদের অগাধ বিশ্বাস। আমাদের বর্মা ফ্রণ্টে জাপানী বিমান কমে যাওয়ার এই একটি কারণ। যেহেতু জাপানীদের পক্ষে বর্মার চাইতে ফিলিপাইনের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশী। ওদিকে জার্মানীর অবস্থাও খুব খারাপ।

মান্দালয় পেঁছানোর পরই আবার আমার জ্বর হয়। মল্লিক আমাকে মেমিও হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। আমার রেজিমেন্ট শীঘ্রই 'পিমনা' (Pyinmana) যাবে; কাজেই, আমার পক্ষেও যতোটা শীঘ্র সেখানে পেঁছানো সম্ভব ততটাই ভালো। আমি কৃষি কলেজেই থেকে গেলাম। কয়েক দিন পর মেজর মিশ্র এসে পেঁছোলেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, "বাস্, তোমার আরো কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করা দরকার। আমি সকলের আগে পিমনা গিয়ে রুগীদের সব কিছু বন্দোবস্ত করবো—তুমি পরেই এসো।" আমার শরীর অসুস্থ হলেও আমরা বেশ আমোদেই এখানে দিন কাটাতাম। বৃটিশের বিমানগুলি দিনরাত ঘোরাঘুরি করলেও জাপানীদের বিমানধ্বংসী কামানগুলির প্রতাপে বেশী নীচে নামতে পারতো না। মাঝে মাঝে খুব উপর থেকেই বোমাবর্ষণ হতো, তবে তা বিশেষ কার্যকরী হোত না। এখানে খাওয়া ও থাকার বেশ ভালো বন্দোবস্ত ছিলো। আমরা দিনের বেলায়ও বেশ নির্ভয়ে এখানে কাজ করতাম।

আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় চার মাইল দূরে 'মান্দালয় হিল'; সেই পাহাড়ের নীচেই আমাদের গান্ধী রেজিমেণ্টের ক্যাম্প। ডাঃ বীরেন রায় ফ্রণ্ট থেকে আসার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন দুপুরে সেখানে হাজির হলাম। আমি ও বীরেন কলকাতাতে প্রায় একসঙ্গেই ডাক্তারী পড়ি। অনেক দিন পর দেখা হওয়াতে খুবই আনন্দ হ'ল। ডাঃ 'চানকে' একজন মারাঠী, কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে মিলেমিশে এতো সুন্দর বাঙলা বলতে পারেন যে, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তাঁকে বাঙালী বলে ভুল করা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এ'দের ছাড়া আরও কয়েকজন পুরানো অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলাম।

কিছুদিন পর সুভাষ রেজিমেণ্টের ডাঃ রাও এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে একবার 'টামুতে' দেখা হয়েছিলো। রাও বাঙলা বলতে না পারলেও বেশ বুঝতে পারতেন, কারণ তিনি চার পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত 'এরিয়ান ক্লাবে' তিনি কয়েক বছর খ্যাতির সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন। এর পর 'আকে বোনামুরা' থেকে ডাঃ ইলিয়াস (ক্যাপ্টেন) ও ডাঃ নিরঞ্জন দাস (লেফটেন্যাণ্ট) এসে উপস্থিত হলেন। কাজেই আমাদের গৃহ ও গ্রহ দুই-ই পূর্ণ হোল। তা'ছাড়া চাঁদনী রাতে সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন চানকে ও ক্যাপ্টেন রায় প্রায়ই এসে আমাদের দলে যোগ দিতেন। আমাদের অত্যাচারে অন্যান্য অফিসারের মাঝে মাঝে একটু যে বিরক্ত বোধ না করতেন তা নয়। একটা ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, "Sweet is the remembrance of trouble when you are in safety." আমাদেরও সেই অবস্থা। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে আবার আজ একসঙ্গে বহু পুরাতন বন্ধুরা মিলিত হ'তে পেরেছি; কাজেই এ আনন্দ যে কতটা উপভোগ্য তা বোধ হয় ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্যে উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমরা যখন সিঙ্গাপুর ছাড়ি, তখন ডাঃ ইলিয়াস সেখানে ছিলেন। তারপর যখন আমাদের এদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসে, দুজন ডাক্তার মারা যান ও অনেকে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, তখন সিঙ্গাপুর থেকে চারজন ডাক্তার নিয়ে আসা হয় নেতাজীর বিমানে করে। ডাঃ ইলিয়াস তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দল বেঁধে বাইরে বেড়াতে যেতাম কয়েক মাইল দূর পথে। এখানকার দোকানপাট প্রায় বেশীর ভাগই খোলা, কিন্তু জিনিসের দাম অত্যধিক। তবু মাঝে মাঝে রসগোল্লা খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারতাম না। একটি মাত্র দোকানে রসগোল্লা তৈরী হোত। এক একটির দাম এক টাকা। অন্যান্য সব জিনিসের দামই বেশ চড়া।

ডিম একটি চার টাকা। একটি ব্রেড এক টাকা, এক প্যাকেট সিগারেট বিশ টাকা। আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি যে নালা ছিলো, সেখানে অনেক মাছ ছিলো। প্রায়ই দুপুরে গিয়ে কিছু কিছু মাছ ধরে আনতাম।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর শুনলাম, আমাদের পুরো ডিভিসন পিমনা যাবে। কৃষি কলেজ ক্যাম্প শীঘ্রই খালি করে দিতে হবে। আমরা তখন মান্দালয় হিল ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক হোল যারা সুস্থ ও সবল, তারা আগে যাবে—পরে রুগীদের নিয়ে ডাক্তাররা যাবে। কাজেই হিল ক্যাম্পে বেশীর ভাগ সৈন্যই অল্প দিনের মধ্যে চলে গেলো। আমরা সেখানে একটি বড় গোছের হাসপাতাল স্থাপনা করে কাজ করতে লাগলাম।

আমাদের ক্যাম্পের কাছেই একটি হাসপাতাল ছিলো। একদিন বিকালে বেড়াতে যাওয়ার পর দু একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্য একদিন সান্ধ্যভোজে তাঁদের চারজনকে নিমন্ত্রণ করি। ভোজ্য বস্তু ছিলো অতি সাধারণ। তবে আলাপ আলোচনা যথেষ্ট হ'ল। জাতীয়তা থেকে শুরু করে সভ্যতা, বর্তমান যুদ্ধ--কোন কিছুই বাদ পড়লো না। একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি বিমানকে বড় ভয় করেন, কথায় কথায় প্রত্যেকবারই বলছিলেন, যতো বড় আলোচনাই করুন, বর্তমান জগতে একমাত্র বাস্তব সত্য হচ্ছে—বিমান ও তা থেকে বোমাবর্ষণ। 'চানকে' সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের "Nationalism in East and West" শেষ করেছেন; কাজেই বেশ খানিকটা বিদ্যার নমুনা দিলেন। নেতাজীকে প্রত্যেক বর্মীই যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক শিক্ষিত বর্মীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে সহানুভূতি জানায়। কথায় কথায় একজন বলেন, একবার একটি কাগজে ছাপা হয়েছিল নেতাজী রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেবেন। ভারতীয় যতো ছিল তারা তো উপস্থিত হলোই, তাছাড়াও বহু বর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলো। একজন বর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তিনি এ সভায় কি জন্য উপস্থিত হয়েছেন? উত্তর হ'ল; I have come to see the Indian Lion who keep the whole British nation awake" অর্থাৎ যে ভারতীয় সিংহ বৃটিশকে সর্বদা সজাগ রাখে আমি তাঁকেই দেখতে এসেছি। এর দ্বারা নেতাজীর প্রতি বর্মীদের মনোভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য বর্মীদের সঙ্গে ভারতীয়দের মনোমালিন্যের কথা মাঝে মাঝে শোনা যে না যায়, তা নয়। তবে আমার মনে হয়, সেটা একটু নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইভাবে নানারূপ আলাপ আলোচনার মধ্যে অনেক রাতে আমাদের আসর ভাঙলো।

আমাদের ক্যাম্পের পাশেই মান্দালয় হিলের উপর খুব বড় প্যাগোডা। অনেক জায়গাতে ছোট ছোট বহু প্যাগোডা যুদ্ধে ধ্বংস হোলেও এখানকার প্যাগোডা এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একদিন উপরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। উপর থেকে মান্দালয় শহরের শোভা খুবই মনোরম। দুর্গের কাছাকাছি আমাদের আর একটি ক্যাম্প আছে, এখানেও একটি হাসপাতাল আছে। সেখানে ক্যাপ্টেন লতিফ ও লেফটেন্যান্ট গাঙ্গুলী তখন কাজ করতেন। সেখানেও মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম—আর গাঙ্গুলীর নিজ হাতের তৈরী সন্দেশ খেয়ে আসতাম।

আমাদের এখান থেকে 'পিমনা' যাওয়া বন্দোবস্ত হয়েছে। ঠিক হয়েছে প্রত্যে ডাক্তারের সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ ষাট করে রুগী প্রায় পঁচিশজন করে নার্সিং সিপাহী, আ কিছু কিছু ঔষধের বাক্স যাবে। সঙ্গে চা ডাল সব কিছুই থাকবে—রুগীদের রান্না ক খাওয়ানর দায়িত্ব সবকিছু হবে ডাক্তারের। সঙ্গে কিছু কিছু করে টাকা থাকবে—আবশ্যক মে পথে রুগীদের জন্য দুধ, ডিম বা ফল কি দেওয়ার জন্য।

(ক্রমশ

ভারত-মিত্র মনিয়ার উইলিয়ামস্

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পাশ্চাত্যে যাঁহারা অসাধারণ সংস্কৃতবিৎ হইয়াছেন স্যার মনিয়ার-উইলিয়ামস্ তাঁহাদের অন্যতম। যাঁহারা তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধান পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন মনিয়ার উইলিয়ামসের সংস্কৃত-জ্ঞান কী বিশাল! ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি আরও যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন সেইগুলিও তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন।

মনিয়ার উইলিয়ামস্ জাতিতে ইংরাজ হইলেও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরই এইচ এইচ উইলসনের প্রথম সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধান প্রকাশিত হয়। স্যার মনিয়ার ইংলণ্ডে শিক্ষালাভপূর্বক ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে কেরানিপদে নিযুক্ত হন। তিনি হেইলেবেরি-স্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন; কিন্তু ভারতে যাইয়া চাকুরী গ্রহণের ইচ্ছা না থাকায় অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। 'পুরাতন হেইলেবেরি কলেজের স্মৃতিকথা' শীর্ষক তিনি যে ইংরাজি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে উপরোক্ত অধ্যাপক উইলসনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। ১৮৪৪-১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি হেইলেবেরির ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজে সংস্কৃত, ফার্সী ও হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হেইলেবেরি কলেজ উঠিয়া যায়। ১৮৪৩ খৃঃ সংস্কৃত অধ্যয়নকালে তিনি বোডেন বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৬০ খৃঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মনিয়ার ছিলেন দ্বিতীয় বোডেন অধ্যাপক এবং তাঁহার গুরু উইলসন বোডেন অধ্যাপকপদে প্রথম সংবৃত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যাপক উইলসনের নিকট মনিয়ার সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন অধ্যাপক পদ বিশেষ সম্মানীয় ও উচ্চ। লেপ্টেনান্ট কর্ণেল বোডেন কর্তৃক এই পদ স্থাপিত হয়। বোডেন বোম্বাইতে মিলিটারী অফিসার ছিলেন। তিনি ১৮০৭ খৃঃ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮১১ খৃঃ ২১শে নবেম্বর লিসবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যারও মৃত্যু হয় ১৮২৭ খৃঃ ২৪শে আগস্ট। তিনি ১৮১১ খৃঃ ১৫ই আগস্ট এই উইল করেন যে, তাঁহার সকল সম্পদ ও অর্থদ্বারা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামানুসারে একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হইবে। উক্ত পদের উদ্দেশ্য হইবে—'খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা, যাহার সাহায্যে ইংরাজগণ ভারতীয়গণকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কার্যে সহজে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।' নানা কারণে উক্ত পদে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেহ নিযুক্ত হন নাই। এই পদে উইলসন প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন ১৮৩২ খৃঃ এবং দ্বিতীয় অধ্যাপক হন মনিয়ার উইলিয়ামস্ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতাধ্যাপক থাকিবার কালে মনিয়ার স্বীয় ব্যয়ে তিনবার ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি প্রথমবার আসেন ১৮৭৫-৭৬ খৃঃ, দ্বিতীয়বার ১৮৭৬-৭৭ খৃঃ এবং তৃতীয়বার ১৮৮৩-৮৪ খৃঃ। এই তিন সময়ে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন যথাক্রমে লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন এবং লর্ড লিটন। দ্বিতীয়বারে মনিয়ার উইলিয়ামস কলিকাতাস্থ গভর্নমেণ্ট হাউসে লর্ড রিপনের অতিথি হন। তাঁহার প্রথম আগমনকালে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এইবার স্যার রিচার্ড টেম্পল কলিকাতার বেলভিডিয়ার গভর্নমেণ্ট হাউসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। স্যার জেমস ফার্গুসন কর্তৃক ১৮৮৪ খৃঃ স্যার মনিয়ার বোম্বাই গভর্নমেণ্ট হাউসে সমাদৃত হন। এই তিনবারেই স্যার মনিয়ার ভারত এবং সিংহলের বহু নগর ও গ্রাম পরিভ্রমণপূর্বক স্থানীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের উপাদান সংগ্রহ করেন। ভারতের সকল বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং সংস্কৃতে কথা বলিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। দার্জিলিংএ অবস্থানকালে মনিয়ার সাহেব তিব্বত ভ্রমণকারী রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের নিকট হইতে সংস্কৃত-গবেষণায় বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মনিয়ার ১৮৮৩ খৃঃ অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি তিনি যথাক্রমে ১৮৮২-৮৮ এবং ১৮৯২ খৃঃ ফেলো ছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব ল (ডি সি এল) ডিগ্রি প্রদানপূর্বক সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ খৃঃ তিনি স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৭ খৃঃ কে সি এস আই হন। ১৮৯৯ খৃঃ ১১ই এপ্রিল ফ্রান্সের কানেস নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ প্রুফটি পর্যন্ত তিনি দেখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ মধ্যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হইতে প্রকাশিত হয়।

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামসের প্রথম গ্রন্থ একখানি বৃহৎ ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষক উইলসনের আগ্রহেই তিনি এই কাজে প্রবৃত্ত হন এবং সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ-রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই সর্বপ্রথম ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান এবং ইহা ১৮৫১ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানই তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। উহার প্রথম সংস্করণ ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে প্রায় এক হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল এবং এইগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিক্রীত হয়। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণে অল্পাধিক এক লক্ষ বিশ হাজার শব্দ ছিল। আরও ষাট হাজার শব্দ সংযোগ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত হয়। নূতন সংস্করণটি এক খণ্ডে ১৩৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বিশেষ উপযোগী। জার্মেনির জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি কাপেলার ও ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ই লিউমান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহাকে এই অভিধান প্রণয়নে সাহায্য করেন। অটো বহ্টলিংক, রডলফ রথ, আলব্রেকত ওয়েবার এবং অন্যান্য জার্মান সংস্কৃতজ্ঞগণ সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ যে সংস্কৃত-জার্মান অভিধান প্রস্তুত করেন উক্ত অভিধানের নিকট মনিয়ার উইলিয়ামস স্বীয় সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের অশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। মনিয়ার সাহেব স্বীয় অভিধানের নব সংস্করণে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। তিনি এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ "Every particle of its detail was thought out in my own mind." অর্থাৎ "এই সুবৃহৎ গ্রন্থের খুটিনাটি টুকরাটি পর্যন্ত আমি নিজ মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি।"

উক্ত অভিধানের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেনঃ 'অক্সফোর্ডে প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাকালে জানিয়াছি যে, সংস্কৃত অভিধানের উদ্দেশ্য হইবে এই ভাষার ধাতুগত সরল শব্দার্থসমূহ ক্রমান্বয়ে সজ্জিত করা। কারণ, সংস্কৃত গ্রীক ভাষারও অগ্রজা এবং গ্রীক ও অন্যান্য ইউ-

রোপীয় ভাষা-তত্ত্ব শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। তুলনামূলক, ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তিও সংস্কৃত।' এইজন্য তিনি যে অভিধান রচনা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত সংস্কৃত শব্দের ইংরাজি এবং সদৃশ ইণ্ডো-আর্য ভাষাসমূহের অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়ামস উক্ত ভূমিকায় আরও বলেনঃ "আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃতই প্রাচীনতম এবং এবং ইংরাজি অন্যতম আধুনিক ভাষা। আর্য ভাষাসমূহ কোন সাধারণ নামহীন অজ্ঞাত ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহাদের এক জন্মস্থান সম্ভবত ব্যাক্ট্রিয়া (বাল্‌ক)। এই কেন্দ্র হইতে আটটি ভাষা-স্রোত প্রবাহিত হয়; দুইটি এশিয়াতে এবং ছয়টি ইউরোপে। এশিয়ার ভাষা-স্রোত দুটির একটি ভারতীয়, অপরটি ইরাণীয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, অর্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা এবং হিন্দি, মারাঠী, গুজরাতি, বাঙলা, উড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষা ভারতীয় প্রবাহের অন্তর্গত। জেন্দ, প্রাচীন ফার্সী, পহলবী, আর্মেনীয়, আধুনিক ফার্সী এবং পুস্তু প্রভৃতি ইরাণীয় প্রবাহের মধ্যবর্তী। কেল্টিক, হেলেনিক, ইটালীয়, টিউটনিক, স্লাভনিক ও লিথুয়ানিয়ান—এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষা-স্রোত। সংস্কৃত শব্দের ধাত্বর্থ জানিলে এই সকল ভাষার গঠন-প্রণালী বোঝা সহজ হয়। গ্রীক, জার্মান বা অন্য কোন আর্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের সমাস-বন্ধ পদ ব্যবহার-শক্তি অনেক বেশী।" মনিয়ারের মতে গ্রীক বা লাটিন ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য বহুগুণে বেশী। তাঁহার অভিধানে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখও আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তিনি প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হইতে প্রকাশিত বিশাল সংস্কৃত অভিধানে শত শত সংস্কৃত (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্যর মনিয়ার বলেনঃ "সংস্কৃত গ্রন্থের বৃহত্ত্ব-দর্শনে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। ভার্জিলের ঈনিডে নয় হাজার লাইন এবং হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসিতে যথাক্রমে বার হাজার ও পনের হাজার লাইন আছে; কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ লাইন আছে! কতকগুলি বিষয়ে, যথা পারিবারিক স্নেহ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় সংস্কৃত গ্রীস ও রোমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর সহিত তুলনায় উচ্চতর স্থান অধিকার করিবে। নৈতিক জ্ঞানের গভীরতায় সংস্কৃত সাহিত্য অতুলনীয়। শিক্ষিত হিন্দুগণ এলজেব্রা, গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতিতে সম্ভবত আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের আর কথা কি? সংস্কৃতের মত অন্য কোন ভাষার ব্যাকরণ এত সমৃদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক নহে। ইউরোপের প্রাচীনতম জাতি-গণ উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিবার অনেক পূর্বে ভারতে এই সকল বিষয় সমধিক উন্নত হইয়াছিল।" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য স্যার মনিয়ার ইংরাজিতে যে গ্রামার লিখিয়াছেন তাহাও চমৎকার। এতদ্ব্যতীত তিনি 'নলোপাখ্যান' এবং 'শকুন্তলা'র একটি সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার একটি সুলিখিত গ্রন্থ আছে।

'ভারতের ধর্ম' শীর্ষক তাঁহার যে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ আছে তাহাতে তিনি লিখিয়াছেনঃ "ভারতে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আজীবন অধ্যয়ন দ্বারা ভারতীয় ধর্মের এই বিবরণ আমি লিখিতেছি।" 'ইণ্ডিয়ান উইস্‌ডম্‌ (ভারতীয় প্রজ্ঞা) শীর্ষক বইখানির দ্বারা তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বইটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বর্ণনা আছে। এই পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ "ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, পারিবারিক জীবন ও আচারের চিত্র অঙ্কনে সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয় গ্রীক ও রোমান কাব্য অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব ও সত্য। নারীর রূপ ও গুণ বর্ণনায় হিন্দু কবি সকল অতিরঞ্জন উপেক্ষা করিয়া বাস্তব জগৎ হইতে কৈকেয়ী ও কৌশল্যা, মন্দোদরী ও মন্থরা প্রভৃতি বাস্তব জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। হেলেন বা এমনকি পেনি-লোপ অপেক্ষা সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ হিন্দু নারীগণ আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য। মহান পতিভক্তিতে এবং দুঃখ ও প্রলোভনের মধ্যে অদম্য ধৈর্য ও সহনশীলতায় সীতা হেলেন বা পেনিলোপের অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিতা। সাধারণভাবে হিন্দু নারীগণ দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ। অতীতকালে হিন্দুর গৃহে যে সরলতা ও পবিত্রতা বিরাজ করিত, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পতিব্রতাগণের জীবন। সর্ব-কালে, সর্বদেশে মানব চরিত্রে যে প্রীতি, মমতা, স্নেহ প্রভৃতি কোমল গুণ বিকশিত হয়, সেইগুলির বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য গ্রীক কাব্যকে পরাস্ত করে। সংস্কৃত সাহিত্য এখন বহু পরিচ্ছেদে পরিপূর্ণ যাহা হইতে জানা যায় প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও পবিত্রতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল। হিন্দু নারীদের ধর্মমূলক সামাজিক কর্তব্য পালনে যে গভীর নিষ্ঠা ছিল তাহা অন্য দেশে দুর্লভ। হোমারের কাব্যে যে সভ্যতার চিত্র আছে তাহা সংস্কৃত কাব্যে চিত্রিত সভ্যতার নিকট নিষ্প্রভ। অযোধ্যা ও লঙ্কায় যে বিলাসিতার বর্ণনা আছে তাহা স্পার্টা ও ট্রয়ে কখনও সম্ভব হয় নাই। রাম একাধারে আদর্শ পতি, আদর্শ পুত্র ও আদর্শ ভ্রাতা। লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম মানবজাতির কাম্য। দশরথ ত[illegible] পিতা এবং কৌশল্যা আদর্শ মাতা। রামা[illegible] নৈতিক ভাব নিশ্চিতই ইলিয়াড অ[illegible] গভীরতর। রামায়ণ বা মহাভারত পা[illegible] প্রত্যেকের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিবে যে, হোমারীয় কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সং[illegible] কাব্যের প্রত্যেক বর্ণনায় যে গভীর ধ[illegible] নিহিত তাহা হোমারের কাব্যে অদৃষ্ট।"

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে স্যার মনিয়ার [illegible] মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'মৃচ্ছকটিকম্'-স[illegible] তিনি বলেন "যে দক্ষতার সহিত আখ্যায়ি[illegible] উদ্ভাবিত, যে কৌশলে উহার ঘটনাপর[illegible] ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত, যে নৈপুণ্যের [illegible] চরিত্রগুলি চিত্রিত এবং যে ভাষার পারি[illegible] উহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে তাহার দ্বারা [illegible] পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকের সমকক্ষ।" সং[illegible] নীতিশাস্ত্রের অকপট প্রশংসায় মনি[illegible] পুস্তকখানি মুখরিত। তাঁহার ধারণা প[illegible] মাত্রেই এই সকল গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত নৈ[illegible] ভাবে অভিভূত হইবেন। তিনি বলেন "ব্রা[illegible] উপনিষদ, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্র[illegible] সংস্কৃত পুস্তক উপদেশপ্রদ এবং নীতি[illegible] বাক্যে পরিপূর্ণ এবং নৈতিক শিক্ষা প্র[illegible] ও দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত।" হিন্দুধর্ম [illegible] তাঁহার বইখানিতে তিনি আমাদের [illegible] ঐতিহাসিক বিকাশ দেখাইয়াছেন। উক্ত [illegible] তিনি বলেন "হিন্দুধর্ম বেদ হইতে উ[illegible] হইয়া অন্তে সকল ধর্মের সারসম্পন্ন হই[illegible] সকল প্রকার মানব মনের উপযোগী ভাব [illegible] ইহার মধ্যে বিদ্যমান। ইহা উদার, সারগ্র[illegible] সর্বভাবসম্পন্ন ও গতিশীল। ভারতে পাঁ[illegible] কথিত ভাষা থাকিলেও উহার একটিমাত্র [illegible] ভাষা, একটিমাত্র দেব সাহিত্য আছে। [illegible] ধর্মমত, বর্ণ, আশ্রম ও ভাষা নির্বি[illegible] সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এই সাহিত[illegible] ভাষাকে শ্রদ্ধা করেন। এই ভাষার [illegible] সংস্কৃত, এই সাহিত্যের নাম সংস্কৃত সাহি[illegible] এই দেব সাহিত্যই অনন্ত জ্ঞানরাশির [illegible] এবং হিন্দু ধর্ম, দর্শন, নীতি প্রভৃতির ব[illegible] হিন্দু ধর্মের সকল তত্ত্ব, সকল মত, [illegible] প্রথা, সকল বিধি এই দর্পণে পরিষ্কার [illegible] প্রতিফলিত। এই সংস্কৃত সাহিত্য প্রস্তর[illegible] তুল্য; ভারতের কথিত ভাষাগুলিকে সজ্জ[illegible] ও সমৃদ্ধ করিবার এবং বৈজ্ঞানিক ও ধ[illegible] ভাব প্রকাশের অসীম মালমশলা উহার অ[illegible] বিদ্যমান।"

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্ কালিদ[illegible] শকুন্তলার একটি সরল ইংরাজি অ[illegible] করিয়াছেন। অনুবাদটি মৌলিক ও প্রা[illegible] উহার ভূমিকায় তিনি বলেনঃ "এই না[illegible] একটি মাত্র অঙ্ক যিনি মনোযোগপূর্বক [illegible] করিবেন, তিনিই মহাকবির অলে[illegible] প্রতিভার এবং কল্পনার প্রাচুর্যতায়

হইবেন। যে সৌন্দর্য-প্রীতি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, মানব হৃদয়ের গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্মতম ভাবের প্রকাশ ও প্রশংসা, এই ভাব-সংঘর্ষের পরিচয় কালিদাসে দৃষ্ট হয়, তাহা অসাধারণ ও বিস্ময়কর। জগতের সাহিত্যে 'শকুন্তলা' একটি উজ্জ্বল ও অমূল্য রত্ন।" বর্তমান ভারতের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এবং তাহাদের পূর্ব-পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়। ভারতীয় পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় যে বাগ্মিতা আছে তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত; নিশ্চয়ই আমার সেইরূপ বাগ্মিতা বা সংস্কৃতজ্ঞান নাই।" 'বর্তমান ভারত' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন: "ইংরাজী সহিত গ্রীক ভাষার যে সম্বন্ধ, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃতেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। সংস্কৃত ব্যাকরণই ভারতের সকল ভাষার ব্যাকারণের জননী। সাধারণ শিক্ষার জন্য জ্যামিতি পাঠ যেমন আবশ্যক, সংস্কৃতের সমন্বয় ভাবটি সাহিত্য সাধনার পক্ষে তেমনি উপযোগী, সংস্কৃত সাহিত্যে যে আদর্শ কবিতা, গভীর দর্শন, সুচিন্তিত বিজ্ঞান ও সংনীতি পাওয়া যায়, তাহা জগতের অন্য কোন ভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতই হিন্দুদের সকল কথিত ভাষার স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও জীবনী-শক্তির উৎস। সংস্কৃতই হিন্দুধর্মের সকল ভাবের আকরভূমি।"

সংস্কৃতের সেবায় মনিয়ার উইলিয়ামস জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত ভারত-মিত্র, অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ ও উদারচেতা মহাপুরুষ। তিনি ভারতেই জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবাসীরূপেও আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি। আজী পাশ্চাত্যে সংস্কৃত প্রচার করিয়া তিনি ভারতে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যেন আমা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদে হৃদয়ে প্রীতির আলোকে জাগরূক থাকুক।

জীবাণু

এইচ জি ওয়েলস্

[এইচ জি ওয়েলস্ সুপরিচিত লেখক। বার্ণাড শ'র যুগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি তাঁর স্বকীয় প্রতিভাবলে ইংরেজী সাহিত্যে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র আসন অধিকার করে আছেন। তাঁর সাহিত্যে বিজ্ঞান জীবনদর্শনের প্রভূত সহায়তা করেছে। তাঁর অনূদিত গল্পটি অদ্ভুত বিষয়বস্তু-নির্বাচনের একটি চমৎকার নিদর্শন।]

তিনি অধ্যাপক, জীবাণুবিদ্যার গবেষক। সেদিন ল্যাবোরেটরীতে একজন লোক এলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। অণুবীক্ষণের তলায় এক টুকরো কাঁচ রেখে লোকটিকে তিনি বল্লেন: এই যে দেখছেন, এ হচ্ছে সর্বজন-বিদিত কলেরার-ব্যাসেলি, কলেরার জীবাণু স্বয়ং।

সেই রোগপাণ্ডুর লোকটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে এর আগে কোনদিন এরূপ জিনিস দেখেনি। তাই নিজের ফ্যাকাসে রঙের হাতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললো: আমি চোখে কিছু কম দেখি স্যার!

অধ্যাপক বল্লেন: তাহলে আপনি এই কাঁচটার ভেতর দিয়ে দেখুন। মনে হয়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রটার আলো আপনার দৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। হুঁ, আমাদের দৃষ্টিশক্তিরই এতো প্রভেদ, যে কি আর বলবো।

আগন্তুক লোকটি বললো: হ্যাঁ, এইবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখতে তো সে রকম কিছু মনে হয় না। ছোট ছোট সবুজ রঙের সুতোর মতো। কিন্তু এই অণুর মতো পদার্থ বাড়তে বাড়তে সমস্ত লণ্ডন শহরটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কি অদ্ভুত!

সে উঠে দাঁড়ালো। কাঁচের টুকরোটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রটার তলা থেকে সরিয়ে এনে জানালার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে বললো: কি ছোট, দেখাই যায় না। একটু ইতস্তত করে আবার বললে: এগুলি কি জীবিত? এরা কি এখনও বিপজ্জনক? অধ্যাপক বাধা দিয়ে বল্লেন: ওগুলোকে ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলেছি। আমি মনে করি, পৃথিবীতে যতো জীবাণু আছে, সবগুলোকেই মেরে ফেলা উচিত।

রোগপাণ্ডুর লোকটি মুচকি হেসে বললো: আমার মনে হয় কার্যক্ষম জীবাণু আপনার কাছে থাকে না?

বলছেন কি? আলবাৎ আমাদের রাখতে হয়। এই দেখুন না আছে আমার কাছে। এই বলে অধ্যাপক উঠে গিয়ে একটি মুখ-বন্ধ-করা টিউব নিয়ে এলেন। বললেন: এই দেখুন জীবিত বীজাণু।

ব্যাক্টেরিয়ার জীবাণু। বলতে কি টিউবে পুরে রাখা এশিয়াটিক কলেরা।

সে লোকটির মুখে আশার উদ্দীপনা দেখা গেলো।

এমন জিনিস রাখা বিপজ্জনক, যাই বলুন না কেন।—টিউবটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লোকটি বললো।

অধ্যাপক লোকটির উৎফুল্লভাব লক্ষ্য করলেন। তাঁর এক পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র এনে লোকটি কাল এসে যখন তাঁর সাথে দেখা করলো, তখন থেকেই একে অধ্যাপকের ভালো লেগেছিলো। উস্কোখুস্কো কালো চুল, ধূসর দুটো গভীর চোখ, হকচকানো, সপ্রতিভ হাবভাব, এসব দেখে তাঁর ভালোই লেগেছিলো। আর যাই হোক সে বিজ্ঞানের অরসিক ছাত্র নয়। তাই তার এরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক।

তিনি চিন্তিত ভাবে টিউবটি হাতে নিয়ে বল্লেন: হ্যাঁ, এখানে মহামারীর বীজ বন্দী হয়ে আছে। একে ভেঙে পানীয় জলের সরবরাহ ট্যাংকে মিশিয়ে দিন, অমনি দেখবেন মৃত্যুর তাণ্ডব। রহস্যজনক অদ্ভুত মৃত্যু, নিমেষের ভয়াবহ মৃত্যু, দুঃখময় দুঃসহ মৃত্যু সারা সহরটা ছেয়ে ফেলবে। সহরের আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে মরণের রুদ্র নৃত্য চলবে। সে ছিনিয়ে নিবে স্বামীর কাছ থেকে প্রেয়সীকে, মার কাছ থেকে ছেলেকে, রাজনীতিবিদকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে, সে ছিনিয়ে নেবে শ্রমিককে তার দুঃদহ কর্তব্যের বোঝা থেকে। সে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। এ-বাড়ী থকে ও-বাড়ী, যেখানে জল ফুটিয়ে খায় না। সে ছড়িয়ে যাবে ঘোড়ার আস্তাবলের জলাধারে, ছড়িয়ে পড়বে ঝরণার জলে যেখান থেকে ছেলে মেয়েরা অসাবধানতাবশতঃ জল খেতে যাবে। এ জীবাণু চলে যাবে মাটির তলায়, আবার বেঁচে উঠবে ঝরণার জলের সংগে; ছড়িয়ে পড়বে আরো অনেক, অনেক জায়গায়। জলের ট্যাংক থেকে এর যাত্রা হবে শুরু, এবং তাকে ধরতে না ধরতেই ও সমস্ত সহরটাকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে।

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলে

এই ভেবে যে এই উচ্ছ্বাস তাঁর পক্ষে অশোভন।

কিন্তু জানেন, এটা এখানে বেশ নিরাপদ, হ্যাঁ, বেশ নিরাপদই আমি বলছি। লোকটি মাথা নাড়লো। তার চোখ দুটি জ্বলে উঠলো। সে বেশ করে গলা খাঁকারি দিয়ে বললোঃ এই সব এনার্কিস্ট যারা আছে আমি বলবো তারা বোকা, স্রেফ গর্দভ। নইলে এমন সব ভয়ংকর জিনিস থাকতে কিনা তারা যা ব্যবহার করে? আমার মনে হয়—

তার কথা শেষ না হতেই দরজায় কোমল স্তর মৃদু টোকা পড়লো। অধ্যাপক গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

এক মিনিট সময় নষ্ট করবো তোমার। অধ্যাপক-পত্নী অনুরোধ করেন। তিনি কথা বলে ফিরে আসতেই আগন্তুক লোকটি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললোঃ ও, চারটা বাজতে বারো মিনিট। মাপ করবেন স্যার, আমি আপনার এক ঘণ্টা অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। সাড়ে তিনটার সময়ই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু যাই বলুন না কেন, আপনার কথাগুলো বাস্তবিকই চমৎকার। আমি আর এক মিনিটও থাকতে পারি না। চারটার সময় আমাকে আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে।

সে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলো। অধ্যাপক তাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে চিন্তিতভাবে ল্যাবোরেটরীতে ফিরে এলেন। তিনি তার কথাই ভাবছিলেনঃ লোকটিকে টিউটনিক বা ল্যাটিন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমার কেমন জানি আশংকা হচ্ছে। সে কেমন করে জীবাণুগুলো সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলো। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কি ভেবে হঠাৎ টেবিলের ধারে ছুটে গেলেন। বারকয়েক পকেট হাতড়ে দেখলেন। দরজাটার দিকে ছুটে গেলেন।

হলের ভেতর টেবিলের উপরই রেখেছি তা'হলে। তিনি ভাবলেন।

মিন্নি! তিনি ডাকলেন তার স্ত্রীকে চীৎকার করে।

এই যে আমি। দূর থেকে জবাব এলো।

তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কি আমার হাতে কিছু ছিলো?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

না তো। আমার মনে হয়......

নীল জীবাণু ধ্বংস করে দেবে সব। অধ্যাপক চীৎকার করতে করতে রাস্তার ধারে ছুটে গেলেন।

দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনে মিন্নি ভয়ে জানালার ধারে ছুটে গেলো। নীচে রাস্তায় রোগা মতো একটা লোক ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ছিলো তখন।

অধ্যাপক তার পেছনেই ছুটে চলেছেন। পায়ে চটিজুতো, মাথায় নেই টুপি। একটা চটি খুলেই গেলো। সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি পাগল হয়ে গেছেন। মিন্নি ভাবলো, তাঁকে সেই ভয়ংকর বিজ্ঞানের বাতিকে পেয়েছে।

সেই রোগা লোকটি চারদিক তাকিয়ে অধ্যাপককে দেখেই গাড়োয়ানকে কি জানি বললো। গাড়ীর দরজাটা ঝপ্ করে বন্ধ হয়ে গেলো। সপাং করে পড়লো চাবুক। ঘোড়ার পাদুটো উপরে উঠলো এবং দেখতে দেখতে গাড়ীটা অধ্যাপকের দৃষ্টি ছাড়িয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মিন্নি জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। তারপর হতবুদ্ধি হয়ে ঘরের ভেতর চলে এলো। ভাবলোঃ তিনি অবশ্য বড়ই একগুঁয়ে। কিন্তু লণ্ডনে এমন গরমের সময়ে খালি পায়ে ছোটা......। হঠাৎ তার একটা ভাল কথা মনে হলো। তাড়াতাড়ি জামা পরে, জুতো পায়ে দিয়ে হলঘরে গেলো। সেখান থেকে তাঁর টুপি, ওভারকোট নিয়ে নিচে নেবে গেলো। বাইরে গিয়ে একটা গাড়ী ডেকে বললোঃ আমাকে হ্যাভলক্ ক্রিসেণ্ট দিয়ে নিয়ে চলো। আর দেখো কোন ভ্যালভেট্ কোট-পরা ভদ্রলোককে ছুটে যেতে দেখতে পাও কি না?

ভ্যালভেট্ কোট? মাথায় টুপি নেই? বহুত আচ্ছা মেম সাহেব। বলতে বলতে কোচম্যান খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে দিলো।

কয়মিনিট পর কোচম্যান আর ফাজিল লোকদের আড্ডা বসলো হ্যাভরস্টক আস্তাবলের কাছে। তারা নীল রঙের লাগামওয়ালা ঘোড়াটাকে অমনভাবে ছুটতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো। ওটা ছুটে যাবার সময় ওরা চুপ করেই ছিলো। কিন্তু যেই ওটা চলে গেলো অমনি তাদের মধ্যে বুড়ো গোছের একটি লোক, নাম তার টুটল্‌স্, বললোঃ কে গেলোরে, হ্যারী জেকস্ বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, সে খুব চাবুক কসাচ্ছে। ছোক্‌রা মতো একটি ছেলে জবাব দেয়।

হ্যাল্লো, ঐ যে আর একটা পাগল আসছে হাওয়ার মতো ঘোড়া ছুটিয়ে। বললো টমি বাইলস্।

এ যে দেখছি জর্জ, টুটল্‌স বললো, মদখোরের মতোই ঘোড়া ছুটাচ্ছে সে। সে কি হ্যারীর পেছনে ছুটছে?

আড্ডাটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠলো। সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠেঃ জর্জ রেস্ চলছে। জোরে চাবুক কসাও। ওকে ধরা চাই কিন্তু।

আরে একটা ! মেয়ে বলে মনে হচ্ছে? ছোকরাটা বললো।

তাইতো, তাইতো হে, আরো একটা গাড়
যে আসছে তেমনি বেগে। হ্যাভারস্টকের সব
গাড়ীগুলোই আজকে পাগোল হয়ে গেছে
নাকি? মেয়েটিও ওকে ধরবার জন্যেই ছুটছে
বোধ হয়।

তার হাতে কি?

মনে হচ্ছে একটা টুপি।

কি বলছিস্? এক জর্জের পেছ
তিনজন। একি কাণ্ড! মিন্নির গা
ছুটছে। হ্যাভারস্টক আস্তাবলের প
কেটে ক্যাম্পডেন স্ট্রীট দিয়ে। সে চেয়ে আ
জর্জের গাড়ীটার দিকে। সেই তার স্বামী
অমন জোরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সবার আগের গাড়ীতে যে লোক
যাচ্ছিলো, সে এক কোণে গুড়িশুড়ি মে
বসে আছে। তার হাতে ছোট টিউবটা, যা
ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত। তার মন শংক
ও আনন্দে দুলছিলো। তার বারে বা
এই ভয় হচ্ছিলো। তার চেয়েও বেশী
করছিলো তার দুষ্কর্মের কথা মনে ক
কিন্তু একটা পৈশাচিক আনন্দ তার ভয়
দূর করে দিলো। এর আগে আর ক
সন্ত্রাসবাদী এমন নূতন রকমের ধ্বংসা
কর্মপন্থা অবলম্বন করেনি। রাভাকে
ভ্যাইলেণ্ট প্রভৃতি নামকরা এনার্কিস্টরা
কাছে এখন তুচ্ছ! এখন সে যা করতে য
তা অচিন্তনীয়। উঃ কি চমৎকার উপ
সে কাজটা হাসিল করেছে। পরিচয়প
জাল করে ল্যাবোরেটরীতে যাওয়া, তার
সুযোগ বুঝে টিউব সরিয়ে ফেলা। ব্রা
জগৎ জানবে তার নাম। যারা তার নামে
সিঁটকাতো তারাও জানবে। সকলেই ত
নেহাৎ নিষ্কর্মা, অপদার্থ ভাবতো। স
লোক তাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা কর
এখন সে দেখিয়ে দেবে লোককে অপাঙ
করা কি দুষ্কর্ম! মৃত্যু, মৃত্যু—চারি
মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চালিয়ে দেবে।

—এ কোন রাস্তা? নিশ্চয়ই
এণ্ড্রু স্ট্রীট। হ্যাঁ, তাইতো। সে
পড়লো। অধ্যাপক মাত্র পঞ্চাশ গজ দ
সব মাটি করলে তাকে এক্ষুণি ধরে ফেল
পকেট হাতড়ে দশ শিলিং পাওয়া গে
তাই কোচম্যানের দিকে ছুড়ে দিয়ে বল
আরো জোরে। সে উঠে বসলো।
করে ঘোড়ায় আবার চাবুক পড়লো। ঝাঁ
চোটে টিউবটা ভেঙে দু'এক ফোঁটা মে
পড়ে গেলো, সে শিউরে উঠলো।

ওঃ মনে হচ্ছে আমিই সবার আগে
পড়বো। যাক্ আমি শহীদ হবো। না,
মৃত্যু অসহনীয়। আমার কিন্তু বিশ্বাসই
না এগুলোর তেমন কোন শক্তি আছে।
দাঁড়িয়ে উঠলো। টিউবের তলায় তখনো দ

টা অবশিষ্ট ছিলো, সে ওটা খেয়ে লো, দেখবার জন্যে সত্যিই কি ঘটে। রপর মনে হলো, এখন আর ছুটে পালিয়ে ভ কি ? ওয়েলিংটন স্ট্রীট গিয়ে সে কাচম্যানকে থামতে বললো। সে ফুটপাথে মে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ধ্যাপকের অপেক্ষায়। আসন্ন প্রতীক্ষমান মৃত্যু াকে সম্ভ্রম-গম্ভীর করে তুললো। অট্টহাসি সে সে অধ্যাপককে সম্বর্ধনা জানালো। —আমি এনার্কিস্ট। আপনার কিন্তু বড্ড দেরী য়ে গেলো বন্ধু! আমি সেটা নিজেই খেয়ে ফেলেছি। কলেরা ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

অধ্যাপক গাড়ীতে বসেই চশমার ফাঁক দয়ে তার দিকে গভীর কৌতূহলে য়ে রইলো।

—আপনি খেয়ে ফেলেছেন? এনার্কিস্ট!

.....আরও কি যেন বলতে গিয়ে তিনি থেমে গলেন। লোকটির মুখে মৃদু হাসি। তিনি কে ডাকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটি ল্টো মুখে ওয়াটালু স্ট্রীটের দিকে চলতে াগলো ও ইচ্ছে করেই লোকের সংগে নিজের রীর ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে চললো। অধ্যাপক তদূর অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, মিন্নি খন যে তাঁর পাশে ওভারকোট আর টুপি য়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা তিনি টেরই পাননি।

—ও, তুমি এসে গেছো, ভালো। বলে তিনি সই অপসৃয়মান সন্ত্রাসবাদী লোকটার দিকে কিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

—তুমি ঘরের ভেতরে এলেই ভালো রতে। ওদিকে তাকিয়েই তিনি বললেন।

মিন্নি এটা স্পষ্টই বুঝলো যে তাঁর মাথা খন ঠিক নেই। গাড়িতে জুতো পরতে পরতে ঠাৎ তিনি বল্লেন ঃ যাই বলো, ব্যাপারটা কিন্তু ুবিধের নয়। তুমি জানো, যে লোকটি আমার াড়ীতে গিয়েছিলো সে হচ্ছে এনার্কিস্ট। াহা ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন, বেশী কিছু বলছি া তোমার কাছে। আমি শুধু তাকে চমক াগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। জানতাম না তো স যে এনার্কিস্ট। তাই তার কাছে সেই তুন রকমের জীবাণুর কথা বলছিলাম। গুলো জন্তুর গায়ে লাগিয়ে দিলে নীল রঙ য়ে যায়। কিন্তু তাকে বোকা বানিয়ে দেবার ন্যে বলেছিলাম ওগুলো এশিয়াটিক কলেরার ীবাণু। তাই ওগুলো নিয়ে সে ছুটে গেলো ডনের জলের সংগে মিশিয়ে দিতে। হয়তো এতক্ষণে লণ্ডনের জলকে নীল করে দিতো, ন্তু সে ওগুলো খেয়েই ফেলেছে। জানি না র কি হবে। সেই জীবাণু দিয়ে বিড়ালের চ্চাটাকে নীল করেছিলাম, তিনটে কুকুরের নাও নীল রং হয়ে গিয়েছিলো। আর ঐ যে ড়াই পাখীটা তারও রং গাঢ় নীল হয়ে য়েছিলো। কিন্তু আবার ওগুলো তৈরী করতে আমার আবার কিছু টাকা আর শক্তি নষ্ট করতে হবে।

মিন্নি কোটটা এগিয়ে দিলো।

—এই গরমে কোট পরবো কেন ? ও হ্যাঁ, মিসেস্ জেবারের সংগে দেখা হয়ে যেতে পারে। আর মিসেস্ জেবারই বা এমন কি লোক যে এই গরমের সময় আবার কোট গায়ে দিতে হবে ? আচ্ছা বলছো যখন, তাহলে দাও।

শেষ পর্যন্ত তিনি কোটটা গায়ে দিলেন।

অনুবাদক—**শ্রীকৃষ্ণ ধর**

—সাত—

—সুমিতাদি?

সুমিতা চমকে উঠলঃ কে?

মিষ্টি হাসির আওয়াজ পাওয়া গেলঃ ভয় পেলে নাকি? আমি রমলা।

—ওঃ। কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ উঠে এলি যে?

—এমনি, ঘুম আসছিলো না। আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখছিলাম তুমি কখন থেকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছো। তাই এলাম।

—বেশ, আয়।

রমলা এসে পাশে দাঁড়ালো। ওপাশের একটা ঘর থেকে যে আলো এসে পড়েছিল, তাতে করে রমলাকে সুমিতা দেখে নিলে একবার। শ্যামবর্ণা একটি ক্ষীণকায়া মেয়ে, দেখলে কেউ সুন্দরী বলতে রাজী হবে না। কিন্তু রূপ না থাকলেও লাবণ্য আছে। চোখ মুগ্ধ হয়ে যায় না, স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ছোট বোনের মতো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, আদর করতে ইচ্ছে করে।

সুমিতা আস্তে রমলার পিঠে হাত রাখল। রমলা আরো ঘন হয়ে তার কাছে এগিয়ে এল, যেন আশ্রয় খুঁজছে।

—কী হল রমলা? কিছু বলবি?

রমলা কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে বাইরের তরঙ্গিত রাত্রির ভেতরে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, আদিত্যদার কোনো খবর কি আসেনি সুমিতাদি?

—না তো।

—আর অনিমেষদার?

বুকের ভেতরে একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুমিতা বললে, নাঃ।

—ওখানে কী সব গণ্ডগোল হয়েছে, তুমি জানো?

সুমিতা মনের ভেতরে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। এ আলোচনা তার ভালো লাগছে না, এ প্রসঙ্গটাকে সে এড়াতে চায়। শ্রান্ত গলায় জবাব দিলে, নাঃ, কিছুই না।

রমলা চুপ করে রইলো। এ কৌতূহল-গুলো স্বাভাবিক হলেও এগুলো তার বলবার কথা নয়। রাত বারোটার পরে যে প্রসঙ্গ ও যে চিন্তা তার স্নায়ুকে এমন ভাবে সজাগ করে রেখেছে, তারা সম্পূর্ণ আলাদা। আদিত্য আর অনিমেষের কথাটা তারই ভূমিকা মাত্র।

রাস্তার ওপরে জোরালো টর্চের আলো পড়ল। মচ্ মচ্ করে জুতোর শব্দ। দু'জন সার্জেণ্ট রাউণ্ডে বেরিয়েছে। শান্তি রক্ষা করছে যুদ্ধ-বিঘ্নিত নিশীথ নগরীর। গ্রামোফোনে হিন্দী খ্যামটার গানটা বারে বারে বাজছে, ঘুরে ঘুরে বাজছে। বোধ হয় মদের বোতল খুলে নিয়ে বসেছে একদল।

রমলা আস্তে আস্তে, অত্যন্ত কোমল গলায় বললে, আজকে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে সুমিতাদি।

—ব্যাপার? কী ব্যাপার?

রমলার স্বর আরো মৃদু হয়ে এলঃ আজকে দেখা হয়েছিল।

—তাই নাকি? বাসুদেবের সঙ্গে?

রমলা চুপ করে রইল।

—কি বললে?

—যা বলে আসছে চিরকাল।

—অর্থাৎ ফিরে এসো? তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছি! জীবনে শুধু রাজনীতি নয়, তার অন্য দিকও আছে। এই তো?

—শুধু এই? আরো অনেক কথা। তার মাথা মুণ্ডু কিছুই নেই। এত করেও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না সুমিতাদি। ঢের লেখাপড়া শিখেছে, তবু এই সহজ জিনিসটা কেন যে বুঝতে পারে না—আশ্চর্য।

সুমিতা সস্নেহে হাসলঃ সবাই কি সব জিনিস বুঝতে পারে বোকা? পৃথিবীতে একদল নির্বোধ থাকবেই—হাজার চেষ্টা করলেও তারা কখনো তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াতে পারবি না।

রমলা যেন আহত হল একটুখানিঃ তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ না তো?

সুমিতা রমলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলঃ ঠাট্টা করব কেনরে? যা সত্যি, তাই বলছি। বাসুদেব চৌধুরী কখনো আদিত্য সেন হতে পারবে না, ওরা আলাদা ধ[...] মানুষ।

রমলা বললে, আমি বড় বিপদে গেছি সুমিতাদি। যেখানে যাই কেমন খোঁজ নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে কী বলব।

—এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে ভ[...] রাগ হয়, তাই না?

রমলা মাথা নীচু করে জবাব দিলে, কিন্তু তার আকার ইঙ্গিতে এটা অন্তত হয়ে উঠল যে বাসুদেব নিতান্ত অশোভন তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও যে অনু[...] তার মনে জাগে, সেটা আর যাই হোক, র[...] নয়, এটা নিশ্চিত।

—ত হলে এখন কী করবি?

—কী করব তাই তো তোমাকে জি[...] করছিলাম। আজকে একটা ভারী বিশ্রী বলেছে সেই থেকে মনটা বড় খারাপ আছে।

—কী বিশ্রী কথা বলেছে? সু[...] দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর কৌতূহলী হয়ে লজ্জিত মুখের ওপরে পড়ল।

—বলেছে—রমলার গলাটা একবার উঠলঃ বলেছে, আমি যদি কথা না তা হলে আত্মহত্যা করবে এবারে।

—আত্মহত্যা!

রমলার সুরে যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার পাওয়া গেলঃ হুঁ।

—পাগল নাকি রে? একটা ব[...] মানুষ আত্মহত্যা করবে কী রকম? ও[...] ভয় দেখিয়েছে।

রমলা প্রতিবাদ করলেঃ না সু[...] ভয় দেখানো নয়। যে রকম মানুষ সব[...] পারে। সব সময় খেয়ালের ওপরে থাকে[...] যে কী করে বসবে—

হঠাৎ কেমন একটা বিদ্বেষে [...] মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। রমলা দুঃখ[...] বাসুদেব যে তাকে জ্বালাতন করে[...] সেজন্যে ক্ষোভ করছে, আত্মহত্যা কর[...] দেখিয়েছে বলে তার অস্বস্তির নেই। কিন্তু সবকিছুর ভেতর দি[...] সুর স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা[...] সেটা গর্বের। সাধারণ একটি কাে[...] তবু একজন তাকে এত বেশি ভালো[...] তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চায়, [...] কাছে যেমন গৌরব, তেমনি আনন্দে[...] হয়ে উঠেছে!

ক্ষণিকের জন্যে সুমিতার [...] কালো হয়ে গেল। বাসুদেব রমলাকে প্রাণ দিয়ে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। [...]

...ই রমলার, এমন কিছু বিশেষত্বও নেই। আর ...? তার তো সব ছিল, তবু অনিমেষ তাকে স্বীকার করে নিলো না, বৃহত্তরের আহ্বানে অনায়াসে পেছনে ফেলে চলে গেল। বাসুদেবের মতো গদ্যময় ইতিহাসের অধ্যাপক যেখানে বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে নিজের হাতে নিজের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে ...য়, সেখানে কবি রোম্যাণ্টিক অনিমেষ এমন ...বে নিজেকে বজ্রকঠিন করে তুলল কী ...পায়ে? এমন একটা বজ্রমণির ছোঁয়াই কি সে ...পেয়েছিল?

সুমিতা হঠাৎ রূঢ়ভাবে বলে ফেলল, তারও দোষ আছে। প্রশ্রয় দিস বলেই ওসব ...কে কাঁদবার সুযোগ পায়! পুরুষকে এখনো ...নিসনি কিনা। মিষ্টি কথা ভালো করে ...জিয়ে বলতে ওরা ওস্তাদ, কথার প্যাঁচে ...লাককে ভুলিয়ে দেওয়াতেই ওদের বাহাদুরী।

সুমিতার স্বরের রূঢ়তায় রমলা চমকে ...ল। ঠিক এমনটা সে আশা করেনি, সুমিতাদির পক্ষে এটা কেমন অশোভন আর অস্বাভাবিক বলে তার ঠেকেছে। সে কথা ...লতে পারল না, শুধু মূক বিস্ময়ে সুমিতার ...খের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমিতা যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেছে। ...কটানা বলে চলল, কথা বলা একটা আর্ট, ...ন আর্ট ওরা ভালো করেই জানে। কিন্তু ...দের আর্ট শুধুমাত্র আর্ট ফর আর্টস সেক— ...জীবনে তার প্রয়োগ নেই ওরা মুখে যা বলে, ...র এতটুকুও যদি অনুভব করত, তাহলে পৃথিবীর চেহারাটা এতদিনে আগাগোড়াই ...দলে যেত, বুঝলি?

রমলা শুনে যেতে লাগল, জবাব দেবার ...তো কোনো কথাই সে আর এখন খুঁজে ...চ্ছে না।

—কী, কথা বলছিস না যে?

—কী বলব?

—কী বলবি?—যেন অন্ধ একটা রাগে ...ঠাৎ ফেটে পড়ল সুমিতাঃ সোজা বাড়ি ...রে যা—বাসুদেবকে বিয়ে করে বেশ একটা ...স্নী বাম্নী হয়ে বোস। দিন কাটবে ভালো, প্রজাপতির অনুগ্রহে বংশবৃদ্ধি করতে পারবি, ...তে বাধা পড়বে না।

সুমিতাদি!

এতক্ষণে সুমিতার চমক ভাঙল। ...সে করছে কী! এ কার কথা কাকে সে ...চ্ছে! রাত্রির এই পরম বিস্ময়কর বিচিত্র মুহূর্তটিতে নিজের মনের একান্ত নিভৃত ...লতাটাকে এই ভাবে সে প্রকাশ করে বসল ...য পর্যন্ত! যে আঘাত নিজেকে সে দিতে ...য়েছিল, স্বগতোক্তিটা শেষে সজোর হয়ে ...ই আঘাতটা গিয়ে পড়ল বেচারী রমলার ...রে! রমলার কী দোষ! কালো মেয়ে সে— রবীন্দ্রনাথের অতি সাধারণ মেয়ে সে—একজন পুরুষের প্রেম যদি তার সেই অতি সাধারণ জীবনটিকে মধুর উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ করে দিয়ে থাকে, তাতে সুমিতার এতটা হিংসা করবার কী আছে! নিজেকে সে এমন করে ছোট করে ফেলল অবশেষে!

সুমিতার হাতখানা আবার রমলার পিঠের ওপরে ফিরে এল।

—না সুমিতাদি—রুদ্ধ গলায় রমলা বললে, আমি ফিরে যাব না। আত্মহত্যা করে করুক, কিন্তু সে নিয়ে ভাবলে তো আমার চলবে না। ওর চাইতে ঢের বড় কাজ আমার আছে।

সুমিতা বললে, থাক থাক। কিছু মনে করিসনি ভাই। তোকে একটু ঠাট্টা করলাম খালি। বাসুদেবের কথা না হয় ভাবা যাবে কাল সকালে, এখন তা নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তুই গিয়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বিছানায় শুয়ে পড়, ঢের রাত হয়ে গেছে।

রমলা আর দাঁড়ালো না। মনের মধ্যে তীব্র ঘা লেগেছে একটা। সুমিতাকেও সে আর সহ্য করতে পারছে না। যেখানে আশ্রয়, আশা করেছিল, সেখানে দেখেছে দাবাগ্নি। সুমিতাদির বুকের ভেতরে এমন একটা আগ্নেয়গিরি যে লুকিয়ে রয়েছে, একথা কি সে কোনো দিন স্বপ্নের মধ্যেও ভাবতে পেরেছিল!

রমলা চলে গেল। বারান্দায় সুমিতা আবার একা। কলকাতা গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে এখন। সাড়া নেই, শব্দ নেই, গ্রামোফোনটাও থেমে গেছে। শুধু আকাশে নক্ষত্রমালার আবর্তন চলেছে নিয়মানুগ গতিতে—পৃথিবীর ওপর এত অসংলগ্নতা, এত বিশৃঙ্খল সত্ত্বেও ওদের কোনো নিয়মভঙ্গ ঘটবে না কোনো দিন।

চব্বিশটা ঘরের আলো নিবেছে। সবাই ঘুমিয়েছে, হয়তো রমলাও ঘুমিয়ে পড়বে একটু পরে। কিন্তু সুমিতার আজ আর ঘুম আসবে না। হংস-মিথুন নীড়ের ঠিকানা হারিয়েছে, ঠিকই লিখেছে ইন্দু। এবার অসীম সাগরের ওপর দিয়ে অশ্রান্ত যাত্রা দিগন্তের দিকে—সেই দিগন্ত, যা কামানের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, রাঙা হয়ে গেছে বোমার আগুনে।

•

শালের বন, ছোট লাইন, ছোট ট্রেন। মন্থর-গতিতে চলতে চলতে খেলনার মতো রেলগাড়িটা এসে জঙ্গলের মধ্যে থামল। স্টেশন নয়, স্টেশনের পরিহাস। একদিকে ঘন জঙ্গল অচ্ছেদ্য রেখায় তরাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, অন্যদিকে চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্র। সমান মাপে ছাঁটাইকরা- কোমর সমান উঁচু চা গাছের শ্রেণী ওদিকের দিগন্তরেখায় মিশে গেছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিরিষ গাছ ছায়া দিচ্ছে তাদের। আর সামনে কাঠের খুঁটি দেওয়া একখানা চালাঘর, তার গায়ে লেখা বাতাসীপুর স্টেশন।

আদিত্য নেমে দাঁড়ালো পাথর ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে। শুধু পাথর নয়, প্রচুর বালিও মিশে আছে। এককালে এখান দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝোরা বয়ে যেত বোধ হয়। কিন্তু সে ঝোরা আজ ফল্গুধারা হয়ে মাটির তলায় মিলিয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে অসংলগ্ন বালুবিস্তৃতি।

বালি আর পাথরের মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত-ভাবে হাঁটতে লাগল আদিত্য। কোথায় কোন-দিকে যাবে ঠিক জানা নেই। এই পর্যন্ত জানে এখানে নেমে মাইল তিনেক হাঁটলে বাগান পাওয়া যাবে—যে বাগানে আজ অনিমেষ বিপন্ন, আর বিব্রত হয়ে আছে।

একটা চুরুট ধরিয়ে আদিত্য চিন্তা করতে লাগল।

বাঙালি স্টেশন মাস্টার কিছুক্ষণ থেকে আদিত্যকে লক্ষ্য করছিলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

—আপনার টিকেটটা দিয়েছেন স্যার?

—না—এই নিন।

টিকেটখানা হাতে নিয়ে তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন স্টেশন মাস্টার। —ওঃ, কলকাতা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

—রংঝোরা বাগান। কোন্‌দিক দিয়ে যাব বলতে পারেন?

—ওঃ, রংঝোরা? তা এদিক দিয়ে নেমে এগিয়ে যান। ভালো পীচের রাস্তা আছে, মাইল তিনেক হাঁটলেই বাগান পাবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

আদিত্য চলতে সুরু করলে।

মনের ভেতর বিশৃঙ্খল চিন্তা ঘুরছে। বাগান যে কী ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণাই তার নেই। অনিমেষ সেখানে কীভাবে আছে, কেমন আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া বাগান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী সে শুনেছে, তাতে মনটা আরো বেশি সংশয় পীড়িত হয়ে আছে। বিচিত্র দেশ—বিচিত্রতর পরিবেশ। জঙ্গলের মধ্যে অষ্টাদশ শতকীয় রাজ্যপাট। চা বাগানের সাহেব বিধাতার মতো দণ্ডধর। নির্মম আর সংক্ষিপ্ত বিচার—কালাজ্বরে স্ফীতোদর কুলির পিলে ফাটানো সেখানে এমন কিছু চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়। তার খবর বিশ্বদূত রয়টারের মুখে এসে পৌঁছায় না—ফ্লাইউডের বাক্সে তার রোমাঞ্চকর বার্তা নিউজ এডিটরকে অনুপ্রাণিত করে না। শালবনের নিভৃত পত্রাচ্ছাদনের রহস্যময় অন্তর্লোকে রহস্যজনকভাবেই তা মিলিয়ে যায়—যেমন করে জঙ্গলের পথে অত্যন্ত অনায়াসে ভালুক এসে বজ্র আলিঙ্গনে

একটা মানুষের হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিয়ে যায় কিংবা নীল গাইয়ের সিং বুকের পাঁজরা ভেঙে ফুসফুসটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলে।

বাগান তো ফরবিডেন প্যারাডাইজ—ঢোকবার কোন উপায় নেই। আশ্রয় কুলি-লাইন, কিন্তু সেও নিরাপদ নয়। সাহেবের শ্যেন দৃষ্টিকে তা এড়াতে পারবে না। কোথায় অনিমেষ—কী ভাবে আছে কে জানে।

চলতে চলতে হঠাৎ আদিত্যের চোখ পড়ল সামনের দিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা। তুষারপুঞ্জিত শুভ্রবপুতে হীরার মতো সূর্যকিরণ। পূর্ব দিগন্তে সূর্য সারথি দেখা দিলে ওখানে তার প্রথম সম্বর্ধনা। আদিত্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

পীচের পথ চলেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে গড়ে দেওয়া পথ. মসৃণ, মনোরম। চমৎকার বীথিপথ। আলগা হয়ে যাওয়া বনের আড়ালে আড়ালে সূর্য আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। আশ্চর্য জগৎ। শাল গাছের মাথায় হরিয়াল ডাকছে—বনমুরগী চলেছে ছুটে।

কেমন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ যেন আদিত্যকে আচ্ছন্ন করে দিলে। মনে পড়ল কলকাতা। দিগন্তে যুদ্ধ আর ভীতিজর্জর রাজপথে মানুষের ক্লেদাক্ত শোভাযাত্রা। কবি ইন্দুর কয়েকটা লাইন মনে পড়ছেঃ

প্রাচীতে প্রারব্ধ হোলো যুগান্তের মহানরমেধ
নিষ্প্রদীপ নিশীথ নগরী।
বিদেহী রেতারে বাজে প্রলয়ের সমুদ্র গর্জন
ভয়ার্ত মানুষ পশু চলিয়াছে ক্লেদাক্ত মিছিলে
শোভাহীন উগ্রতায় প্রাসাদের পরিসীমা পারে
আঁকড়ি রাখিতে হবে দুর্মূল্য জীবন।

দুর্মূল্য জীবনকে আঁকড়ে রাখতে হবে। নাগরিক জীবন। সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত, বিস্বাদ, যক্ষ্মার রোগীর মতো বিড়ম্বিত, মনুষ্যত্বের বিচারে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এদিকে শ্যামবাজার, ওদিকে টালীগঞ্জ—মাঝখানে ডালহাউসি স্কোয়ার। যমুনা আর সরস্বতী এসে মিশেছে গঙ্গায়। বাঙালি জীবনের ত্রিবেণী সঙ্গম।

কিন্তু ত্রিবেণী সঙ্গম? মানবতার মহাতীর্থ? নাকি পশ্চিম গামিনী সুবর্ণরেখায় উপনদীর আত্মদান—তিলে তিলে, রক্ত দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে মানবতা দিয়ে?

আর—এখানে অরণ্য। আদিম অরণ্য. প্রাথমিক অরণ্য। পৃথিবীর প্রথম প্রাণশক্তির শ্যামায়িত বিকাশ। কোথায় ছুটেছ তোমরা, পালাচ্ছ কোথায়? শহরে, গ্রামে? তার চাইতে চলে এসো এখানে, সব ভুলে যাও. ভুলে যাও সেদিনের কথা—যেদিন এই বনানীর আশ্রয় থেকে তোমরা বেরিয়ে চলে এসেছিলে, তোমরা ভেসে পড়েছিলে সভ্যতার স্রোত প্রবাহে, এগিয়ে গিয়েছিলে বিজ্ঞানীদের জ্যামিতিক পরিমিতি কষা রাজপথ দিয়ে। তার ফলে এল দ্বন্দ্ব, এল সমস্যা। অনেক পেলে, হারালেও অনেক। খনির তলা থেকে জাগিয়ে তুললে ঘুমন্ত কালযবনকে, তার হাতে তুলে দিলে বিশ্বকর্মার হাতুড়ি। সব কিছুকে ভেঙে চুরে সে গড়ে দিলে যন্ত্র—যান্ত্রিকতা, আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, বৈদ্যুতিক স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দানবের রক্তে জেগে উঠেছে পাশব বিদ্রোহ। হাতুড়ি ফেলে দিয়ে গদা তুলে নিয়েছে হাতে, ভেঙে চুরমার করছে সমস্ত. কিছু বাকী রাখছে না কোনখানে।

তারচেয়ে পালাও পালাও, পালিয়ে এসো এখানে। এই জঙ্গলে, এই শালবনানীর নিভৃত মর্মলোকে। দৈত্যের গদা এখানে তোমাদের খুঁজে পাবে না। আবার পশুর মাংস, আবার চকমকির আগুন—আবার পাথরের অস্ত্র। শহরে পড়ে থাক শীলারা. পড়ে থাক হেমন্তবাবুরা—বক রাক্ষসের মুখে খাদ্য জুগিয়ে দিক নিরীহ নির্বোধ প্রজাবৃন্দ। তোমরা চলে এসো, আদিমতায় ফিরে যাও—সার্থক হোক ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের স্বপ্ন থেকে ডি এইচ লরেন্সের কামনা। জ্যামিতির রেখা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক. বিদ্যুতের তার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাক পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে—

কিন্তু!

কিন্তু এ কী ভাবছে আদিত্য! একি কথা, ওর মনের কথা, না কাল রাত্রে ট্রেনের সেই দুর্বিষহ প্রহরগুলোর প্রতিক্রিয়া এটা। সেই রাজনীতির তর্ক, সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা মেয়েটি—শশাঙ্কের সেই স্বার্থপর পলাতক মুখচ্ছবি। কিন্তু একি সত্য। এতদিন ধরে রাজনীতি চর্চা আর ফিজিক্সে এম এস-সি পাশ করবার এই কি পরিণতি।

না—না, কখনো না। মানুষ কখনো পিছোয় না. পিছোনো তার ধর্ম নয়। মানুষ কখনো আর হামাগুড়ি দিয়ে তার শৈশবে ফিরবে না, মাতৃগর্ভে তার প্রত্যাবর্তন হতে পারে না কোনদিন। যে দানব আজ বিদ্রো[illegible] তার বিদ্রোহকে দমন করতে, দলন ক[illegible] কতক্ষণ লাগবে। অমিত মানুষের শ[illegible] অপরিসীম তার আত্মবিশ্বাস। আবার [illegible] পড়বে কালযবন, পশু চূর্ণ হয়ে যাবে—ব[illegible] মানুষের শক্তি নতুন রূপে, নতুন নির্দেশ [illegible] তাকে। আজ যে হিংসা উন্মত্ত হয়ে উঠে[illegible] সে তো এই আদিম সত্তারই দান,—ত[illegible] নিয়ন্ত্রণ করাই মানুষের সভ্যতা, মান[illegible] প্রগতির তাৎপর্য।

ঘুমিয়ে থাক শালবন—শান্ত পরিতৃ[illegible] নিয়ে নির্জনতার অখণ্ড আনন্দে বিস্তীর্ণ [illegible] থাক তার নীলচ্ছায়া। এখানে আর অ[illegible] ফিরে আসব না। জ্যামিতির রেখা অ[illegible] টেনে আনব এখানে. বয়ে আনব বিদ্যু[illegible] শক্তি প্রবাহ। তোমরা আজ যারা ভয় [illegible] পালিয়ে যাচ্ছ, তোমরা আবার ফিরে আ[illegible] ফিরে আসবে কলকাতায়—কলকাতাকে সঞ্চ[illegible] করবে দিকে দিকে. অরণ্যে প্রান্তরে। পলাত[illegible] মিছিল সেদিন রূপায়িত হবে বিজ[illegible] অভিযানে।

ইন্দু লিখেছেঃ

প্রশান্ত সমুদ্রজলে ফেনায়িত নিষ্ঠুর স[illegible]
দিগন্তের চক্রতীর্থে রক্তশতদল
দেবতার সিংহাসন ভাবীযুগে করিবে র[illegible]

কিন্তু এখনো সময় হয়নিঃ

মালয়ের তীরে তীরে
পীতরক্তে নামিল যে[illegible]
সিদ্ধার্থের স্বপ্ন বয়ে
তন্দ্রাতুর পাষাণ দেব[illegible]

আদিত্য চলেছে এগিয়ে। চুরুটের [illegible] ভেসে যাচ্ছে শালবনের বাতাসে বাতাসে। [illegible] পড়ছে অনিমেষও কবিতা লিখত এক [illegible] কবি অনিমেষ। আজ চা-বাগানের অক্লান্ত [illegible] যে কীভাবে আছে সেটা অনুমানও [illegible] পারছে না আদিত্য।

দূরে কতগুলো ঘরবাড়ি—একটা বা[illegible] শ্যামায়িত ব্যাপ্তি। ওই কি রংঝোরা ব[illegible] আদিত্য পা চালিয়ে দিল। ([illegible]

দেবল দেঈ

শ্রীত্রিদিব নাথ রায়

প্রেম কোন জাতি মানে না, কোন ধর্ম মানে না, কোন সংস্কার মানে না—ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডীদাস তাই রজকিনী রামীর প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, বিল্বমঙ্গল গণিকার প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, অষ্টম এডওয়ার্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসন তুচ্ছ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী লিখিয়া জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অমর হইয়াছেন। বিহ্লন-শশিকলার প্রেমের কাহিনী লইয়া একাধিক কাব্য রচনা হইয়াছে, বিদ্যাসুন্দরের আখ্যান লইয়া বহু কাব্য রূপ পাইয়াছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকাহিনী লিখিয়া আজিও কালিদাস অমর, রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনী লিখিয়া সেক্সপীয়র জগতের বরেণ্য। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দু'একটি এমনি প্রেমের কাহিনী চোখে পড়িয়া যায়, যাহার তুলনা কাল্পনিক উপন্যাসেও বিরল।

ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন তুর্কী ও আফগান বিজেতাগণের পদভরে ভারতমাতা সন্ত্রস্তা, পাঠান, মুঘল, রাজপুতের অসি-ঝনৎকারে ভারতের আকাশ পূর্ণ, তাহাদের শোণিতধারায় ভারতের ধূলি কর্দমাক্ত, সেই সময়ের একটি করুণ প্রেমের কাহিনী বিদেশী কবির সুনিপুণ লেখনীতে লিপিবদ্ধ হইয়া সেই ভয়াবহ ঘটনার ঘূর্ণীবাত্যার মধ্যে আজিও শাশ্বত হইয়া আছে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ বিনসাম বা মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিষ্ঠিত বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যখন জলালুদ্দীন ফিরোজ খিলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে তাঁহার এক সৈনিক কর্মচারীর পুত্র আমিনুউদ্দীন মুহম্মদ হাসান কবিতা রচনা করিয়া খ্যাত হইয়া উঠিতেছিলেন। কালে ইনি আমীর খুসরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আমীর খুসরু সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সভা-কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে "হিন্দুস্তানের শুকপক্ষী" বলিত। তিনি অসংখ্য কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ তাঁহার রচিত শ্লোকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ৬৫১ হিজরীতে (১২৫৩ খৃঃ অঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২৫ হিজরীতে (১৩২৫ খৃঃ অঃ) ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। যে সময়ে তিনি হিন্দুস্তানে ছিলেন, সেই সময়ে দুর্দান্ত মুঘলগণ বারংবার ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিতেছিল; তিনিও একবার তাহাদিগের হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। খুসরু সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরও কিছুকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহার পরবর্তী শাসকগণের বীভৎস লীলা দর্শন করিয়াছিলেন।

আমীর খুসরু আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খাঁ ও গুজরাটের রাজকন্যা দেবল দেঈর প্রণয় সংঘটিত এক অপূর্ব কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে মোট ৪,৫১৯টি শ্লোক ছিল। কাব্যটি আলাউদ্দীনের জীবিতাবস্থায় রচিত। কিন্তু ইহার শেষাংশের ৩১৯টি শ্লোক আলাউদ্দীন ও তাঁহার পুত্র খিজির খাঁর মৃত্যুর পর রচিত হইয়াছিল। কবি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, পূর্বাংশের ৪,২০০ শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার চারি মাস ও কয়েকদিন সময় লাগিয়াছিল; ৭১৫ হিজরীর জুল্‌কাদাহ্ তারিখে এই অংশটি সমাপ্ত হয়।

এই কাব্যের উপাখ্যানভাগ স্বয়ং শাহজাদা খিজির খাঁ কর্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় অবস্থানকালে রচিত হইয়াছিল। সেইখানেই ইহা কাব্যাকারে গ্রথিত করিবার জন্য কবিকে দেওয়া হয়। কবির নিজ ভাষায় সেই স্মরণীয় মুহূর্তের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"তাহার পর শাহ্‌জাদা খিজির খাঁ তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে উপস্থিত ব্যক্তিগণের অগোচরে তাঁহার প্রণয় কাহিনীটির নিকটে আমাকে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করেন। যখন আমি সেই হৃদয়দ্রবকারী কাহিনীটি নয়ন-গোচর করিলাম তখন আপনা হইতেই নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আমি সর্বান্তঃকরণে সেই নয়নাভিরামের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। এই মহৎ কার্যে আমাকে নিযুক্ত করায় আপনাকে ধন্য মনে করিলাম এবং সেই কাহিনীটি তুলিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।"

কবি এই কাহিনীর নাম দিয়াছেন "আশিকাহ্" বা "প্রেমের কাহিনী" কেহ কেহ ইহাকে "ইশ্‌কিয়াহ্"ও বলিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণত ইহা "খিজির খানী" নামেই পরিচিত। কাব্যে নায়িকার নামের কবি কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন—"দেবল দেঈ"র পরিবর্তে "দুবল রাণী" এই নাম দিয়া কবি বলিতেছেন—

"সকলেই তো জানে 'দৌলত' শব্দের বহুবচনে হয় 'দুবল' তাই এই কাব্যে আমি প্রচুর 'দৌলত' সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।" *

গ্রন্থটি সুলতান আলাউদ্দীনকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং গ্রন্থারম্ভে কবি পরমেশ্বরকে এই বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

"মেরে নামা বনামে আঁ খোদাবন্দ্
কে দিল হারা বখো বাঁ দাদ্ পৈবন্দ।

"যে পরমেশ্বর পুরুষের হৃদয় সুন্দরী নারীর হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দেন, সেই সর্বশক্তিমানের নাম লইয়া কাব্য আরম্ভ করিলাম।"

পরমেশ্বর ও পয়গম্বরের স্তুতি করিয়া কবি নিজ ধর্মগুরু নিজামুদ্দীন আউলিয়া এবং সুলতান আলাউদ্দীনের স্তব গান করিয়াছেন। তাহার পর মুঘলদিগের হস্তে নিজের বন্দী হইবার কথা বর্ণনা করিয়া পূর্বোক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। পরে হিন্দুস্তানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মুইজুদ্দীন মুহম্মদ বিনসাম হইতে মুইজুদ্দীন কাইকুবাদ ও সামসুদ্দীন কাইও-মারুস্ পর্যন্ত পূর্ববর্তী সুলতানগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে জালালুদ্দীন ফিরোজ খিলজীর রাজত্বকাল বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে সুলতান আলাউদ্দীনের শাসনকালের ঘটনাবলী—সিংহাসনারোহণ, মুঘল-আক্রমণরোধ, গুজরাট, চিতোর, মালব প্রভৃতি দেশ-জয়ের বর্ণনা করিয়া প্রধান বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন।

সুলতান আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই ভ্রাতা উলুঘ খাঁকে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা রাইকরণ বা রাজা কর্ণের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী দিয়া প্রেরণ করেন। রাজা কর্ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধনরত্ন, স্ত্রী, দাসী প্রভৃতি শত্রুর হস্তে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। উলুঘ খাঁ সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিয়া দিল্লীতে সুলতানকে উপহার দেন। বন্দিনী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজা কর্ণের রূপসী যুবতী স্ত্রী "কন্‌বালা দেঈ" বা "কমলা দেবী" ছিলেন। তাঁহাকে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরণ

---

* পারস্য ভাষায় "দৌলত" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য, তাহার বহুবচনে হয় "দুবল"। আমরা সাধারণ বাঙলা ভাষায় "ধনদৌলত" শব্দ ব্যবহার করি।

করা হইল এবং তিনি আলাউদ্দীনের মহিষী-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

কমলাদেবীর গর্ভে রাজা কর্ণের দুইটি কন্যা হইয়াছিল। প্রথমটি গুজরাট হইতে পলায়নকালে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন, দ্বিতীয়টির নাম "দেবল দেঈ" বা "দেবলা দেবী।" সুলতান কমলাদেবীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং যখন তিনি কন্যাকে নিজের নিকটে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সম্রাট রাজা কর্ণের নিকট হইতে দেবলা-দেবীকে চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজা কর্ণ সম্রাটের আদেশে কন্যা দেবলাদেবীকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেনাপতি উলুঘ খাঁ সসৈন্যে গুজরাট আক্রমণ করিলেন * । রাজা কন্যা ও বিশ্বস্ত অনুচর-বর্গকে লইয়া রায়রায়ান রামচন্দ্র দেবের পুত্র শঙ্করদেবের আশ্রয় লইবার জন্য দেবগিরির দিকে পলায়ন করিলেন। রাজা কর্ণ কন্যাকে লইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিতেছেন জানিয়া শঙ্করদেব দেবলাদেবীর পাণি প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতা ভিল্লমদেবকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে দেবলাদেবীর বয়স মাত্র আট বৎসর। রাজা কর্ণ বাধ্য হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যখন তিনি কন্যাকে দেবগিরিরাজের নিকট পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন সুলতানের সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দেবলাদেবীর অশ্ব আহত হইয়া চলিতে না পারায় সুলতানের বাহিনীর পুরোবর্তী রক্ষিদলের নেতা পঞ্চমী তাঁহাকে বন্দিনী করিল। রাজা কর্ণ পলায়ন করিলেন। দেবলাদেবীকে সেনাপতি উলুঘ খাঁর সম্মুখে লইয়া গেলে তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট দেবলাদেবীকে তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

দেবলাদেবী নিতান্ত বালিকা হইলেও তাঁহার রূপ-লাবণ্য সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার দশমবর্ষীয় পুত্র খিজির খাঁর সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কমলা-দেবীরও তাহাতে সম্মতি ছিল; কারণ খিজির খাঁর সহিত তাঁহার ভ্রাতার সাদৃশ্য থাকায় তিনি খিজির খাঁকে সমধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু প্রধানা মহিষী, খিজির খাঁর মাতার এ বিবাহে আদৌ ইচ্ছা ছিল না; তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা অলপ খাঁর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন।

এদিকে বালক খিজির ও বালিকা দেবলা-দেবী পরস্পরের সান্নিধ্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বালসুলভ ক্রীড়াকৌতুকের মধ্য দিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দেবলাদেবী ও খিজির খাঁ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত; ক্রমে একথা মহিষীর কর্ণগোচর হইলে তাঁহাদিগকে প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে রাখিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ ও পরিচারক-পরিচারিকা-বর্গের দৌত্যের ভিতর দিয়া বাল্যের প্রীতির অঙ্কুর কিশোর-কিশোরীর অন্তরে গভীর পূর্বরাগে বিকশিত হইয়া উঠিল।

মহিষী যখন তাঁহাদের এই গোপন মিলন ও পূর্বরাগের কথা জানিতে পারিলেন, তখন দেবলাদেবীকে দূরে লোহিত প্রাসাদে প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। খিজির খাঁ মাতার এই নির্মম অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন; দুঃখে, ক্ষোভে পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রের পীড়ার আশঙ্কায় এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলে খিজির খাঁও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই কিশোর-যুগল গোপনে মিলিত হইলেন, হৃদয়াবেগে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল—সাবধানতা কোথায় ভাসিয়া গেল। মহিষী তখন তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—দেবলাদেবীকে লোহিত প্রাসাদে প্রেরণ করা হইল। বিদায়কালে পথিমধ্যে প্রণয়ী-যুগলের ক্ষণিক মিলন হইল—খিজির খাঁ নিজ মস্তক হইতে কুঞ্চিত কেশ-দামের এক গুচ্ছ কর্তন করিয়া প্রেয়সীকে অভিজ্ঞানস্বরূপ উপহার দিলেন, দেবলাদেবী দিলেন নিজ হস্তের অঙ্গুরীয়ক।

মহিষী পুত্রের বিবাহের জন্য আর কাল-বিলম্ব করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। অলপ খাঁর কন্যার সহিত খিজির খাঁর বিবাহ স্থির হইল ও অচিরে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। ওদিকে লোহিত প্রাসাদে বিরহবিধুরা চক্রবাকীর ন্যায় এই সংবাদে দেবলাদেবী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে প্রেমাস্পদকে তাহার এই হৃদয়হীনতার জন্য ভৎর্সনা করিয়া একটি পত্র লিখিলেন। অনুতপ্ত নায়ক নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উত্তর দিলেন।

প্রণয়ীযুগল অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে পরমেশ্বরের নিকট নিয়ত পরস্পরের সহিত মিলন কামনা করিতে লাগিলেন। বিরহখিন্ন খিজির খাঁর শোচনীয় অবস্থা মহিষীর কর্ণগোচর হইলে তিনি পুত্রের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণও তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিল যে, মুসলমানের পক্ষে চারিটি স্ত্রী বিবাহ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তখন খিজির খাঁ দেবলাদেবীকে বিবাহ করিলে ক্ষতি কি? অবশেষে মহিষী স্বীকৃত হইলেন; সুলতান তো পূর্বেই বাগ্দান করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবলাদেবীকে লোহিত প্রাসাদ হইতে লইয়া আসিয়া খিজির খাঁর সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। প্রণয়িযুগলের সুখের অবধি রহিল না। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া গেলেন।

কিছুকাল 'রভসে' কাটিয়া গেল অদৃষ্ট-দেবতা অলক্ষ্যে ক্রূর হাসি হাসিলেন দেবতারাও যেন ইঁহাদের প্রেমে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। একদা সম্রাট পীড়িত হইয়া পড়িলে পিতৃভক্ত শাহ্জাদা খিজির খাঁ শপথ করিলেন—পিতা আরোগ্যলাভ করিলে তিনি নগ্নপদে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করিবেন সুলতান ক্রমে সুস্থ হইতে থাকিলে খিজির খাঁ তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। নগ্নপদে ভ্রমণ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না; কিছুদূর ভ্রমণ করিবার পর তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইল—তখন তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে অশ্বারোহণে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন।

খোজা সেনাপতি মালিক কাফুর সুলতানের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল; সে খিজির খাঁর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। এই অবসরে সে পুত্রের প্রতি সুলতানের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সুলতানকে সে বুঝাইল যে, তাঁহাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যেই কুমার তাঁহার শপথ ভঙ্গ করিয়াছেন।

সুলতান সেই পাপাত্মার প্রতি এতই অনুকূল ছিলেন যে, তাঁহার এই যুক্তিহীন কথায় সহজেই আস্থা স্থাপন করিলেন খিজির খাঁর প্রধান সহায়ক তাঁহার মাতুল ও শ্বশুর অলপ খাঁকে নিজ উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায় বুঝিয়া কাফুর কৌশলে তাঁহাকে অপসারিত করিতে মনস্থ করিল; সে সুলতানকে বুঝাইল যে, শ্বশুরের পরামর্শেই খিজির খাঁ পিতাকে অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছেন। ক্রোধান্ধ সুলতান বিচার না করিয়াই অলপ খাঁকে হত্যা করাইলেন খিজির খাঁ এই সময়ে মীরাটে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, ক্রুদ্ধ সুলতান তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন* এবং গঙ্গার অপর পারে আমরোহা নামক অরণ্য সমাকুল স্থানে দুই মাস অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। এতদ্ব্যতীত কুমারকে

---

* খুব সম্ভবত রাজা কর্ণ সম্রাটের আদেশ-পালনে সম্মত হন নাই নচেৎ অকারণে উলুঘ খাঁ গুজরাট আক্রমণ করিবেন কেন?

* খুব সম্ভবত কাফুর এই সময়ে সুলতানকে অল্প অল্প করিয়া বিষপান করাইতেছিল, পাছে খিজির খাঁ নিকটে থাকিলে সব জানিতে পারেন সেই জন্যই সে যাহাতে কুমার নিকটে না আসে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

াহার প্রদত্ত হস্তী, চন্দ্রাতপ প্রভৃতি রাজকীয় নিদর্শনসমূহ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। ইহা যে মালিক কাফুরের চাতুরী, তাহা বলাই বাহুল্য। কাফুর যে ধীরে ধীরে সুলতানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া নিজের ক্ষমতার পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গভীর মনোবেদনার সহিত পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত রাজার দুলাল হিসাবুদ্দীন নামক এক কর্মচারীর হস্তে রাজকীয় নিদর্শনসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া আমরোহায় বনবাস করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরেই পিতার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই খিজির খাঁ সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে নিকটে পাইয়া পিতার স্নেহ উদ্রিক্ত হইল—কিছুকালের জন্য পিতা-পুত্রের মিলন হইল। কিন্তু এ মিলন ক্ষণস্থায়ী। আবার খল কাফুরের বিষমন্ত্রণা সুলতানের কর্ণে হলাহল ঢালিতে লাগিল। সম্রাট যতদিন সুস্থ না হন, ততদিন কুমার গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ হইলেন। সুলতান অবশ্য কাফুরকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যেন কুমারের জীবননাশের কোন চেষ্টা না করা হয়। পতিগতপ্রাণা দুবলরাণী স্বামীর বন্দিদশার সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার হতভাগ্য জীবনে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিলেন।

৭১৫ হিজরীর ৭ই শাওয়াল তারিখে সম্রাটের ইহজীবনের অবসান হইল। খিজির খাঁর আশাদীপ চিরতরে নির্বাপিত হইল। সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র শাহাবুদ্দীন উমরকে সিংহাসনে বসাইয়া কাফুরই রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ খিজির খাঁকে বন্দী করিয়া রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহার আদেশে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করা হইল। এই পাপের ফল পাপাত্মাকে অচিরেই ভোগ করিতে হইল। মৃত সম্রাটের অনুরক্ত দাস ও রক্ষিবৃন্দ কাফুরকে হত্যা করিয়া সেই সংবাদ খিজির খাঁর কর্ণগোচর করিয়া জানাইল—তাহারা তাঁহার প্রতি আচরণের প্রতিশোধ লইয়াছে। খিজির খাঁ অন্ধ; সুতরাং সুলতানের অপর পুত্র কুৎবুদ্দীন মুবারক শাহ্ উমরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুবারক অন্ধ ভ্রাতার নিকট হইতে তাঁহার ধর্মপত্নী দেবলাদেবীকে চাহিয়া পাঠাইলেন। ঘৃণাভরে খিজির খাঁ তাঁহার আদেশ প্রত্যাখ্যান করিলেন। মুবারক তখন নিষ্কণ্টক হইবার জন্য সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এইরূপ সকল ব্যক্তিকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার আদেশে শাদী নামক একজন কর্মচারী খিজির খাঁ, শাদী খাঁ ও উমরকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

যখন হত্যাকারিগণ খিজির খাঁকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, দেবলাদেবী স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে তাঁহাকে দৃঢ়-আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। জহ্লাদের নৃশংস অস্ত্রাঘাতে তাঁহার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইল, মুখ ক্ষতবিক্ষত হইল—এইরূপে সম্রাট-কুমার ও তদীয় বধূর জীবনলীলার অবসান হইল। নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দুইটি প্রণয়ী-হৃদয় অমৃতলোকে মিলিত হইল।

কুমারদিগকে হত্যা করিয়া দুর্বৃত্তগণ কুমারদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিল। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাবৃন্দ তাহাদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও নিহত হইলেন। অবশেষে সম্রাটের আত্মীয় ও আত্মীয়াগণের মৃতদেহ গোয়ালিয়র দুর্গের বিজয়মন্দির নামক বপ্রের (bastion) নিম্নে সমাহিত হইল।

সম্রাট্ আলাউদ্দীনের প্রিয়পুত্রের জীবন-লীলার এইরূপ শোচনীয়ভাবে অবসান হইল। কবি আমীর খসরুর অমর লেখনীপ্রসূত স্বর্গীয় প্রেমের এই শোচনীয় কাহিনী অপূর্ব কাব্যে আজিও শাশ্বত হইয়া আছে।

বিবর্তন

সুকুমারী চৌধুরী

রমেন মাস্টার লণ্ঠনের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্কুলের ছাত্রদের খাতা দেখিতেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন টেস্ট পরীক্ষা ইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের খাতা দেখার ভার মেনের উপর পড়িয়াছে।

ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে কল্পনা প্রবেশ রে—"চা খেয়ে একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো। সই বেলা চারটে থেকে বসেছ. সাতটা বেজে গল।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রমেন বলে—এখনও কত খাতা দেখতে হবে দেখেছ?"

—"তা দেখেছি, একবার সব পাতা উল্টে পায়ে নম্বর দিয়ে দাও না।"

—"হুঁ তাই দেব। খোকার জ্বরটা ছেড়েছে ?"

—"জ্বর ত' কালই ছেড়েছে। তারপর আর আসেনি ত'!"

—"হ্যাঁ তা বটে—" কেমন যেন অন্যমনস্ক ইয়া যায় রমেন। কল্পনা নীরবে চলিয়া যায়।

রমেন পাতা উল্টাইয়া চলে। একখানা াতায় আসিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি স্থির ইয়া যায়—প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে, পরে শান্তমুখে অধীর আগ্রহে পড়িয়া চলে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কি সুবিধা হইয়াছিল?" াহার উত্তর দিয়াছে একটা বালক—"কর্ন-য়ালিশের কি অধিকার ছিল আমাদের রাজ্য াসন করিবার? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া রীব প্রজাদের উৎপীড়নের সুবিধা জমিদারদের তে দেওয়ার কারণ কি? যাহাতে ভারতবর্ষের ধিকাংশ লোক গরীব হইয়া থাকে, শিক্ষার ানও সুযোগই না পায়, নিজের অন্নবস্ত্রের ন্তায় একান্তভাবে নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া কিতে পারে, ইহাই নয় কি?" রমেন পাতা টাইবার পূর্বে খাতার উপরের পৃষ্ঠা খিবার জন্য খাতা বন্ধ করে—ছাত্রের নাম ফুটস্বরে দুইবার বলে—"মুরারিমোহন দে।" হার পর আবার পাতা উল্টাইয়া চলে।

"ডুপ্লের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ"—উত্তরে লিখিয়াছে—"ডুপ্লের ডুপ্লিসিটি চাল রেজ ভাল রকমই শিখিয়াছে। (আমরা কিছুই খি নাই—তথাপি লিখিতে হইবে)—সেকালে ল চাঁদ সাহেবকে হস্তগত করিয়া আনোয়ার দিনকে নিহত করিয়াছিল—তাহারা দুজনে জাত, এমন কি আত্মীয়ও ছিল—চাঁদ সাহেব নোয়ারের ভগ্নিপতি ছিলেন। একালে ইংরেজ য়াকে হস্তগত করিয়া হিন্দুদের দুর্বল রবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু জিন্নারা ষ্টমেয়।

আর ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান—কি কিছুই বুঝিবে না? আনোয়ারের মত অন্ধ হইয়া (অবশ্য আনোয়ারের দৃষ্টিশক্তি ঠিকই ছিল) নিজেদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে? ইংরেজদের হাতের পুতুল হইয়া জাতি কি চিরদিনই নির্বিকার থাকিবে? হিন্দুস্থানের আজাদ কি কেবল স্বপ্ন ? কল্পনা ? বিলাস ?"

রমেন কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলে—হাতের আঙুল খাতার মধ্যে রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। খোকার চীৎকার কানে আসিয়া বাজে—"মা, একটা কমলালেবু দাও না।"

—"কাল তোমার বাবা মাইনে পেলে নিয়ে আসবেন যাদু।"

—"মাইনে আমি বুঝিনে। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে, কি খাব তবে?"

জেদী পুত্র মাতার কাতর মিনতি মানিতে চাহে না।

সামনের টাঙানো বহুদিনের পুরানো ক্যালেণ্ডারখানার উপর চোখ পড়ে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে চক্র হাতে কৃষ্ণের ছবি। তেজোদীপ্ত মুখ—সুন্দর চেহারা। ঘুম ভাঙিয়া "ঠাকুর দেবতার" মুখ দেখিবার লোভটুকু ছাড়িতে পারে নাই কল্পনা, তাই ক্যালেণ্ডারের দিন দেখা শেষ হইয়া গেলেও ছবিটা সরায় নাই।

নীচের লেখাটি এখনও জ্বল জ্বল করিতেছে,—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে—এস সুদর্শনধারী মুরারি।"

অস্ফুটস্বরে আবার রমেন বলে, মুরারি।

তাহার পর আবার আঙুলের চিহ্নিত স্থানটি খুলিয়া পড়িতে থাকে রমেন—"রেগুলেটিং অ্যাক্ট সম্বন্ধে বলিতে গেলে ওয়ারেন হেস্টিংসের কথা না বলিয়া পারা যায় না। একটি স্বাধীন দেশের লোক এমন হয়? অযোধ্যার নবাবকে করদানে স্বীকৃত করাইয়াই রেহাই দেয় নাই, ক্রমাগত পাঁচ লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ—কত টাকা যে অন্যায় নিষ্ঠুরভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। তাহার নিষ্ঠুরতার বর্বরতার অনেক কথা ঐতিহাসিকও হয়ত লিখেন নাই; অথবা লিখিলেও সে ইতিহাস বাহির হইবার উপায় ছিল না। চৈৎ সিং অত্যন্ত কাপুরুষ ছিল। হেস্টিংস বিদেশী পাষণ্ড। কিন্তু একজন দেশী লোক কি করিয়া অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিল? চৈৎ সিং গোয়ালিয়রে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল, কিন্তু যুদ্ধ করিয়া হেস্টিংসকে তাড়াইবার কোনও উপায় করিল না কেন? তখনও কি বিদেশীদের এমন সর্বনাশা সর্বগ্রাসী রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই ? এখনকার মত সাহসী বীর্যবান কি তখন একজনও ছিল না ?"

একটি বিড়াল শিশু কখন রমেনের কোলে গিয়া বসিয়াছে, তাহার হুঁস নাই। রমেনকে পাতা উল্টাইতে দেখিয়া এখন ক্রমাগত সে থাবা দিয়া তাহার হাত ধরিতেছে বলিয়া রমেনের চেতনা হয়। খোকার আদরের পুষি।

"কিরে তুই কখন এলি?"

"ম্যাও।"

পুষি একটিমাত্র সাড়া দিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করে। আয়াসের ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া।

কল্পনা আসে—"রাত যে এগারোটা বেজে গেল। বেড়াল-ছানা কোলে নিয়ে ধ্যান করছো নাকি? খাতা তো ছাই দেখচো। খেয়ে নিয়ে এখন আমাকে ত' ছুটি দাও।"

তাত দেবেই। তবে এখন আর কল্পনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ত রমেনের তেমন দৃষ্টি নাই। অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে তাহাদের বিবাহের পর। রমেনের সে সদা অপ্রস্তুত-ভাব। তাহার জন্যে এতটুকু কষ্ট হইলেই কল্পনার কাছে কৃতজ্ঞ সঙ্কোচ-ভাব আর তাহার নাই।

যতদিন কল্পনার কষ্টে রমেনের সঙ্কোচ-দ্বিধা ছিল, কল্পনাও কোনও পরিশ্রমেই কষ্ট

প্রকৃতির বুকে জাগা উদ্দাম যৌবনের ছোঁয়া পেয়ে ফুটে ওঠা ফাগুনি মিলন গীতি, শিল্পী সৌরেন রায়ের মাদক কণ্ঠে রচা সুরের মালা —
N 27582............

সৌরেন রায়
N 27582 (আধুনিক)
একি স্বপ্ন শুধুই : আজো কী নীরব রবে?

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী
N 27583 (আধুনিক)
জানি প্রিয় জানি তুমি : ভালবাসা মোর কহিতে

কুমারী মঞ্জু গুপ্তা ও দিলীপ রায়
N 27586 (হিন্দি ভজন)
বৃন্দাবন কি মঙ্গল লীলা : মোসে কাহে কো

কুমারী শেফালী সেনগুপ্তা
N 27584 (আধুনিক)
মরমী শোন মরম কথা : সে তো প্রিয় ভুল

মৃণালকান্তি ঘোষ
N 27585 (শ্যামা-গীতি)
শ্যামা আমার; নীরব কেন
পাষাণ হ'য়ে আর কত

রাজেন সরকার
N 27587 (যন্ত্র-সংগীত)
ক্লারিওনেট সুর : পরদেশী বালাম
" " যব তুমহি চলো

"হিজ মাষ্টারস ভয়েস"

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ দমদম - বোম্বাই মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর
VR—212-4-46

অজর

জ্বরান্তে সেবনে উত্তম টনিকের কার্য্য করে।
প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা ইমিউনিটি লিঃ
৪/৫, নেপাল ভট্টাচার্য্য ১ম লেন
• কলিকাতা •

ধবল ও কুষ্ঠ

গায়ে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গ স্ফীতি, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজি সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দো আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসা

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

প্রতিষ্ঠাতা—**পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ**
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

বিনা অস্ত্রে
চক্ষুছানি

ডিভাইন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষু রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয় নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্ব আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

বিবর্তন

সুকুমারী চৌধুরী

রমেন মাস্টার লণ্ঠনের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্কুলের ছাত্রদের খাতা খিতেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন টেস্ট পরীক্ষা ইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের খাতা দেখার ভার মেনের উপর পড়িয়াছে।

ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে কল্পনা প্রবেশ রে—"চা খেয়ে একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো। ই বেলা চারটে থেকে বসেছ, সাতটা বেজে ল।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রমেন বলে—খনও কত খাতা দেখতে হবে দেখেছ?"

—"তা দেখেছি, একবার সব পাতা উল্টে য়ে নম্বর দিয়ে দাও না।"

—"হুঁ তাই দেব। খোকার জ্বরটা ছেড়েছে ?"

—"জ্বর ত' কালই ছেড়েছে। তারপর আর সেনি ত'!"

—"হ্যাঁ তা বটে—" কেমন যেন অন্যমনস্ক ইয়া যায় রমেন। কল্পনা নীরবে চলিয়া যায়।

রমেন পাতা উল্টাইয়া চলে। একখানা তায় আসিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি স্থির ইয়া যায়—প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে, পরে শান্তমুখে অধীর আগ্রহে পড়িয়া চলে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কি সুবিধা হইয়াছিল?" তাহার উত্তর দিয়াছে একটা বালক—"কর্ন-য়ালিশের কি অধিকার ছিল আমাদের রাজ্য াসন করিবার? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া রীব প্রজাদের উৎপীড়নের সুবিধা জমিদারদের াতে দেওয়ার কারণ কি? যাহাতে ভারতবর্ষের ধিকাংশ লোক গরীব হইয়া থাকে, শিক্ষার কানও সুযোগই না পায়, নিজের অন্নবস্ত্রের িন্তায় একান্তভাবে নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া াকিতে পারে, ইহাই নয় কি?" রমেন পাতা ল্টাইবার পূর্বে খাতার উপরের পৃষ্ঠা খিবার জন্য খাতা বন্ধ করে—ছাত্রের নাম স্ফুটস্বরে দুইবার বলে—"মুরারিমোহন দে।" াহার পর আবার পাতা উল্টাইয়া চলে।

"ডুপ্লের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ"—উত্তরে ত্র লিখিয়াছে—"ডুপ্লের ডুপ্লিসিটি চাল ংরেজ ভাল রকমই শিখিয়াছে। (আমরা কিছুই শখি নাই—তথাপি লিখিতে হইবে)—সেকালে ল্লে চাঁদ সাহেবকে হস্তগত করিয়া আনোয়ার দ্দিনকে নিহত করিয়াছিল—তাহারা দুজনে ক জাত, এমন কি আত্মীয়ও ছিল—চাঁদ সাহেব আনোয়ারের ভগ্নিপতি ছিলেন। একালে ইংরেজ জ্ঞাকে হস্তগত করিয়া হিন্দুদের দুর্বল রিবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু জিন্নারা ুষ্টিমেয়।

আর ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান—কি কিছুই বুঝিবে না? আনোয়ারের মত অন্ধ হইয়া (অবশ্য আনোয়ারের দৃষ্টিশক্তি ঠিকই ছিল) নিজেদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে? ইংরেজদের হাতের পুতুল হইয়া জাতি কি চিরদিনই নির্বিকার থাকিবে? হিন্দুস্থানের আজাদ কি কেবল স্বপ্ন? কল্পনা? বিলাস?"

রমেন কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলে—হাতের আঙুল খাতার মধ্যে রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। খোকার চীৎকার কানে আসিয়া বাজে—"মা, একটা কমলালেবু দাও না।"

—"কাল তোমার বাবা মাইনে পেলে নিয়ে আসবেন যাদু।"

—"মাইনে আমি বুঝিনে। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে, কি খাব তবে?"

জেদী পুত্র মাতার কাতর মিনতি মানিতে চাহে না।

সামনের টাঙানো বহুদিনের পুরানো ক্যালেণ্ডারখানার উপর চোখ পড়ে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে চক্র হাতে কৃষ্ণের ছবি। তেজোদীপ্ত মুখ—সুন্দর চেহারা। ঘুম ভাঙিয়া "ঠাকুর দেবতার" মুখ দেখিবার লোভটুকু ছাড়িতে পারে নাই কল্পনা, তাই ক্যালেণ্ডারের দিন দেখা শেষ হইয়া গেলেও ছবিটা সরায় নাই।

নীচের লেখাটি এখনও জ্বল জ্বল করিতেছে,—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে—এস সুদর্শনধারী মুরারি।"

অস্ফুটস্বরে আবার রমেন বলে, মুরারি। তাহার পর আবার আঙুলের চিহ্নিত স্থানটি খুলিয়া পড়িতে থাকে রমেন—"রেগুলেটিং অ্যাক্ট সম্বন্ধে বলিতে গেলে ওয়ারেন হেস্টিংসের কথা না বলিয়া পারা যায় না। একটি স্বাধীন দেশের লোক এমন হয়? অযোধ্যার নবাবকে করদানে স্বীকৃত করাইয়াই রেহাই দেয় নাই, ক্রমাগত পাঁচ লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ—কত টাকা যে অন্যায় নিষ্ঠুরভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। তাহার নিষ্ঠুরতার বর্বরতার অনেক কথা ঐতিহাসিকও হয়ত লিখেন নাই; অথবা লিখিলেও সে ইতিহাস বাহির হইবার উপায় ছিল না। চৈৎ সিং অত্যন্ত কাপুরুষ ছিল। হেস্টিংস বিদেশী পাষণ্ড। কিন্তু একজন দেশী লোক কি করিয়া অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিল? চৈৎ সিং গোয়ালিয়রে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল, কিন্তু যুদ্ধ করিয়া হেস্টিংসকে তাড়াইবার কোনও উপায় করিল না কেন? তখনও কি বিদেশীদের এমন সর্বনাশা সর্বগ্রাসী রূপ তাঁহাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই? এখনকার মত সাহসী বীর্যবান কি তখন একজনও ছিল না?"

একটি বিড়াল শিশু কখন রমেনের কোলে গিয়া বসিয়াছে, তাহার হুঁস নাই। রমেনকে পাতা উল্টাইতে দেখিয়া এখন ক্রমাগত সে থাবা দিয়া তাহার হাত ধরিতেছে বলিয়া রমেনের চেতনা হয়। খোকার আদরের পুষি।

"কিরে তুই কখন এলি?"

"ম্যাও।"

পুষি একটিমাত্র সাড়া দিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করে। আয়াসের ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া।

কল্পনা আসে—"রাত যে এগারোটা বেজে গেল। বেড়াল-ছানা কোলে নিয়ে ধ্যান করছো নাকি? খাতা তো ছাই দেখচো। খেয়ে নিয়ে এখন আমাকে ত' ছুটি দাও।"

তাত দেবেই। তবে এখন আর কল্পনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ত রমেনের তেমন দৃষ্টি নাই। অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে তাহাদের বিবাহের পর। রমেনের সে সদা অপ্রস্তুত ভাব। তাহার জন্যে এতটুকু কষ্ট হইলেই কল্পনার কাছে কৃতজ্ঞ সংকোচ-ভাব আর তাহার নাই।

যতদিন কল্পনার কষ্টে রমেনের সঙ্কোচ-দ্বিধা ছিল, কল্পনাও কোনও পরিশ্রমেই কষ্ট

পাইত না। কিন্তু এখন তাহার অল্পে ক্লান্তি-বিরক্তি হয়।

—"খোকা ঘুমিয়েছে কল্পনা?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি খেয়েছে?"

—"সাবু।"

—"কমলালেবু চাইছিল না?"

—"তাত চাইছিলই। ও ত' আর বাপের অবস্থা বুঝে চাহিদা কম করতে শেখেনি। অবুঝ শিশু!"

চাহিদাই বা এমন কি? একটা কমলালেবু। মানুষের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? কল্পনা পুত্রকে অবুঝ বলিল বটে—কিন্তু পুত্রের পিতাকেও কি পরোক্ষে আঘাত করিল না?

—"তুমি যাও কল্পনা, ভাত দাও। আমি এখনি যাচ্ছি।"

কল্পনা চলিয়া যায়। কিন্তু কি নম্বর দিবে রমেন। এক নম্বরও ত' দিতে পারে না সে। এরকম দৃষ্টিভঙ্গী কেন ঐ শিশুর? নম্বর না দিয়াই রমেন খাইতে যায়। খাইয়া আসিয়া রমেন শুইয়া পড়ে। মনে হয়, একটি নম্বরও দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু মুরারি ত পড়িয়াছে সব—শিখিয়াছেও অনেক। ফেল করাইবে কেমন করিয়া সে। কিন্তু এত পক্কতা করিবারই বা দরকার কি ছিল? এত মোড়লি না করিলেই পারিত। ফেল করিয়া মজাটা বুঝুক না।

পরক্ষণেই একখানা কচি কিশোর মুখ তাহার দৃষ্টিতে ধরা দেয় তহার দীপ্ত তেজে। ফেল করিয়াও তাহা করুণ হয় না কেন? অভিমান বেদনার পাশেও তাহার তেজ ত কমিয়া যায় নাই। বরং তাহা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া শিক্ষক রমেনের কথা না মানিয়াই মানুষ রমেন আশি নম্বর বসাইয়া দেয় মুরারির খাতায়।

রমেন মুরারিকে স্কুলে দেখে নাই আর। টেস্ট পরীক্ষার পর আর তাহাকে দেখিবার কথাও অবশ্য নহে। ঠিক বুঝিতে পারে না—কোন্ ছাত্রটি মুরারি।

একদিন স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের হঠাৎ আবির্ভাব হয় বিদ্যালয়ে। তিনি বলেন—"দেখি মাস্টার মশায়, ছেলেরা কেমন উন্নতি করছে—কয়েকখানা খাতা দেখি। পাশ ত প্রায় সবাই করছে।"

আলমারির মধ্য হইতে পুরাতন পরীক্ষার খাতা টানিয়া লন সেক্রেটারী মহাশয়। প্রথমেই মুরারিমোহনের খাতাটি তাঁহার হাতে পড়ে। পড়িয়া তিনি বিরক্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—"দেখুন মাস্টার মশায়, এটা ভাবপ্রবণতার স্থান নয়। এখানে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের ছেলেরা যেমন মাতামাতি শুরু করেছে, তাতে তাদের বিদ্যাশিক্ষা না হলেও অন্য শিক্ষা যথেষ্ট হয়ে যাচ্ছে। For the sake of duty......I am bound to sack you. আপনি আমার স্কুল কালই ছেড়ে যাবেন।"

সেক্রেটারী দ্রুতপদে রাস্তায় নামেন। রমেন বসিয়াই ছিল, হাতখানা মাথায় উঠিল মাত্র।

রাস্তায় একদল বালকের চীৎকার শোনা যায়—"জয় হিন্দ," "দিল্লী চলো।"

নিতান্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দি চাহিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া চিরকালের নির রমেন ক্ষিপ্তস্বরে কহে—"দিল্লী কে রসাতলে যাও।"

বাঙলায় সচিবসংঘ গঠন সম্পর্কে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক নেতা মিস্টার সুরাবর্দীর সহিত কংগ্রেসী দলের যে আলোচনা হইতেছিল, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় অনেকেই স্বস্তি অনুভব করিবেন। তিনি একজন বর্ণ" হিন্দুকেও সচিবসংঘে না পাইলে বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজ তাঁহাকে সচিবসংঘ গঠিত করিতে দিবেন কিনা, তাহা আমরা জানি না, তবে মিস্টার সুরাবর্দী সুর তুলিয়াছেন, তিনিই প্রধান সচিব হইবেন এবং তিনি সচিব হইলেও বাঙলা শাসন করিবেন।

মিস্টার সুরাবর্দীর সহিত কংগ্রেসী দলের পক্ষে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পত্র পাঠ করিলে কেন কংগ্রেস এতদিন কলিকাতায় ও দিল্লীতে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময় উৎপাদন করে। কারণ মিস্টার সুরাবর্দী যে সকল সর্ত দিয়াছিলেন, সে সকল কংগ্রেস কখনই স্বীকার্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না এবং মিস্টার সুরাবর্দী প্রথমাবধিই বলিতেছিলেন—তিনি সেই সকল সর্তের কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কংগ্রেস তাঁহাদিগের সর্তের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বাঙলায় মুসলিম লীগের সহিত সচিব-সংঘে যোগ দিতেন, তবে মিস্টার সুরাবর্দী বলিতে পারিতেন—তিনি যে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের লোভে সবই করিতে পারেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং তাঁহাদিগের পাকিস্থান দাবীতেও কংগ্রেস সম্মত হইবে। কেবল সে কথা সুস্পষ্টরূপে বলিতেছেন না।

সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আছে—যে স্থানে ভেকও বক্তা, তথায় মৌন থাকাই শোভন। তেমনি এ কথা বলিলে অসংগত হইবে না যে, যে সচিবসংঘে গত লীগ সচিব সংঘের বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিস্টার সুরাবর্দী প্রধান সচিব, সে সচিবসংঘে কংগ্রেসের যোগদান সম্ভব নহে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফল কি ফলিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব কাহাদিগের তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সুচিন্তিত রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজকে সেই রিপোর্টের প্রথম ভাগ ও সঙ্গে সঙ্গে উড কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আজ বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কারণ দুর্ভিক্ষ কমিশন দেখাইয়াছেন:—
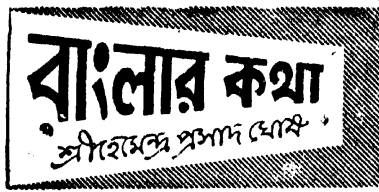
(১) মুসলিম লীগ সচিবসংঘ অনায়াসে মিথ্যা প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বাঙলায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই। সেই প্রচার-কার্যের ফলে বিদেশের ও অন্যান্য প্রদেশের লোক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ভারত সরকার যে বিদেশে বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রকৃত বিবরণ পাঠাইতে দেন নাই, তাহাও বাঙলার সচিব সংঘের প্ররোচনায় কিনা, তাহা আমরা জানি না; তবে আমরা জানি, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া যে স্যার আজিজুল হক বাঙলার সচিবসংঘের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছিলেন, চাউলের মূল্য কমিতে আর বিলম্ব নাই, তিনিই জাহাজে পাঞ্জাব হইতে বাঙলায় গম পাঠাইবার জন্য এমন জাহাজে মাল তুলিয়াছিলেন যে, তাহার কল অচল হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রহসনে পরিণত হয়।

(২) সরকার রেশনের দোকান প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির হইলেও যাহাদিগকে চাকরীতে বহাল করা হইবে, তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের হার কিরূপ হইবে, তাহা বিবেচনায় বিলম্ব করিয়া এই সচিবসংঘ বহু লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন।

(৩) অন্য সকল প্রদেশে এজেন্সীর মারফতে শস্য ক্রয়-প্রথা অনিষ্টকর প্রতিপন্ন হইলেও বাঙলায় সেই প্রথাই প্রবর্তিত করা হয়।

(এখনও তাহার শেষ হয় নাই। যাঁহাদিগকে এজেণ্ট নিযুক্ত করায় বিশেষ আপত্তি হইয়াছিল এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সচিবদিগকে পুস্তিকা প্রচারও করিতে হইয়াছিল, তাঁহারা যে মুসলিম লীগের অনুরক্ত সে কথা মিস্টার সুরাবর্দী ব্যবস্থা পরিষদেই ঘোষণা করিয়াছিলেন।)

(৪) সচিব সংঘের ত্রুটিতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল। (আজও তাহার শেষ হয় নাই) কলিকাতার উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনাবৃত অবস্থায় খাদ্যশস্য রাখিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) সচিবসংঘ পাঞ্জাব হইতে নিরন্নদিগের জন্য খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া তাহা বিক্রয়ে কোটি টাকারও অধিক লাভ করিয়াছিলেন। সে লাভ মানুষের জীবনের বিনিময়ে করা হয়।

(৬) সচিবসংঘ যে খাদ্য নিরন্নদিগকে দিয়া সাহায্য করিতেছেন বলিয়াছিলেন, তাহাতে লোক জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত হয়।

এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন মত প্রকাশ করেন, যে সময়ে সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠন করাই প্রয়োজন ছিল, সেই সময়ে যে তাহা হয় নাই, সে জন্যও বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংঘ দায়ী। কারণ তাঁহারাই সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠন চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, যে মুসলমান মুসলিম লীগের আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা কখনই তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিবেন না—তাহাই মুসলিম লীগের নীতি।

স্যার ফ্রেডারিক বারোজকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিস্টার সুরাবর্দীকে তিনি বাঙলায় সচিবসংঘ গঠনে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই ঐ সচিবসংঘে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন।

এই সচিব সংঘ যে বিচারেও বাধা দিতে সংকোচ বোধ করেন নাই, তাহা কুলটীর মামলায় দেখা গিয়াছে।

এই সচিব সংঘের কার্যকালে বাঙলায় দুর্নীতি কিরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহা বাঙলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে।

কংগ্রেস যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া আপনাদিগের উপস্থাপিত সব সর্ত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিব-সংঘে যোগ দেন নাই, ইহা আমরা প্রদেশের সৌভাগ্যজনক বলিয়াই বিবেচনা করি।

কারণ মিঃ সুরাবর্দী যে সকল সর্ত দিয়াছিলেন, সে সকলে সম্মত হইয়া সচিব-সংঘে যোগ দিলে কংগ্রেসী সচিবদিগের দ্বারা বাঙলার প্রকৃত কল্যাণকর কার্য সাধন সম্ভব হইত না, পরন্তু তাঁহারা সচিব-সংঘে থাকায় সচিব-সংঘের সকল ত্রুটির জন্য দায়ী হইতেন।

আমরা মনে করি, আজ বাঙলায় কংগ্রেসের কর্তব্য গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসকেই দেশের লোকের স্বার্থরক্ষার ও সচিব সংঘের অনাচার নিবারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমান সকলেই যে কংগ্রেসী দলের সহিত একযোগে কাজ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। কংগ্রেস তাঁহাদিগের সহযোগে যে সম্মিলিত দল গঠিত করিতে পারিবেন, সেই দল—বিরোধী দলরূপে যে আপনাদিগের প্রভাব অনুভূত করাইতে পারিবেন এবং বাঙালীর প্রকৃত স্বার্থরক্ষার উপায় করিতে পারিবেন—সতর্ক থাকিয়া সচিব সংঘের অনাচার নিবারণ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দেশের কথা

(৩রা বৈশাখ—৯ই বৈশাখ)

বাঙলার সচিবসঙ্ঘ—বিলাতী ক্যাবিনেট মিশন—কাপড়ের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য—রাজাগোপালাচারিয়া—শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল—বঙ্গবিভাগ।

বাঙলার সচিবসঙ্ঘ—কংগ্রেস মিস্টার সুহীদ রাবদীর সর্তে মুসলিম লীগের সহিত ম্মিলিত সচিবসঙ্ঘে স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব লয়া বিবেচনা করায় মিস্টার সুরাবদী হার মনোমত কয়জন লীগপন্থীর নাম র্ভর্নরকে প্রদান করেন। তাঁহাদিগের সহিত জন তপশীলী হিন্দুর নামও আছে—গেন্দ্রনাথ মণ্ডল। অবশিষ্ট সচিবদিগের ম—মিস্টার সুরাবর্দী, মৌলবী আহম্মদ াসেন, খান বাহাদুর আবদুল গফরান, খান হাদুর মহম্মদ আলী, খান বাহাদুর ায়াজেমউদ্দীন হোসেন, খান বাহাদুর এ এফ ম আবদুর রহমান, মিস্টার সামসুদ্দীন ামেদ।

মিস্টার সুরাবর্দী সচিবসঙ্ঘ গঠন সম্পর্কে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকলে কংগ্রেসী-গকে বিশেষ কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মৌলানা াবুল কালাম আজাদকে আক্রমণের ত্রুটি নাই। ঢনি প্রথমেই ফতোয়া দিয়াছেন—"আমি সংবাদ-ত্রে পাঠ করিয়াছি, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন র্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথম দপ্তরখানায় গমন রেন, তখন সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদিগকে য় হিন্দ' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলিয়া ম্বর্ধিত করিয়াছেন। এসব আমি সমর্থন-াগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার নুরোধ আমরা যখন দপ্তরখানায় প্রবেশ রিব, তখন যেন পূর্বাচরিত আমাদিগকে ম্বর্ধিত করা হয়—সরকারী কর্মচারীরা ন কোনরূপ রাজনীতিক ধ্বনি না করেন। ামি বাঙলার সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট শষ্টাচার ও শৃঙ্খলা চাহি।"

ইহা মিস্টার সুরাবর্দীরই উপযুক্ত কথা।

বিলাতী ক্যাবিনেট মিশন—বিলাতী ্যাবিনেট মিশন বহু লোকের সহিত ালোচনা করিয়া অবকাশ যাপন জন্য কাশ্মীরে মন করিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা াবার আলোচনা করিবেন। কেহ কেহ আশা রেন, এইবার তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রস্তাব কাশ করিবেন।

এদিকে বিলাতের সংবাদ, যদি মিশনের স্তাব গৃহীত না হয়, তবে কংগ্রেসকে দলিত রিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে এবং সেজন্য দ্যোগপর্ব শেষ হইয়াছে—আয়োজন আরম্ভ ইয়াছে। যাঁহাদিগকে দমন করা প্রয়োজন াঁহাদিগের নামের তালিকাও নাকি প্রস্তুত রা হইতেছে। অবশ্য সে তালিকা পুলিশের বারাই প্রস্তুত করা হইতেছে।

কাপড়ের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য—ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে শ্যামে কাপড় পাঠাইতেছেন। ভারতের লোক উলঙ্গ থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন, এই বস্ত্র রপ্তানির রাজনীতিক উদ্দেশ্য আছে—শ্যামকে বস্ত্র দিয়া হাত করিবার' অভিপ্রায়ে ইহা করা হইতেছে, সেইজন্য কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের পক্ষে স্যার মহম্মদ আজিজুল হক বলিয়াছেন—শ্যাম হইতে খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। সেইজন্যই বস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছে। তবে এখনও খাদ্যশস্য পাওয়া যায় নাই। তাই ভারত সরকার এখন সানন্দে বলিতে পারেন—

নাকের বদলে নরুণ পেলাম
ডুব-ডুবাডুব-ডুব।"

স্যার মহম্মদের কৈফিয়ৎ যে অসাধারণ তাহা বলা বাহুল্য।

রাজাগোপালাচারিয়া—মাদ্রাজের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া তাঁহার মতের জন্য কংগ্রেসী দলের অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এই অনুমতি প্রার্থনার কারণ কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে যাহাই হউক, এবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের পরে যখন দলপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে, তখন যাহাতে তাঁহাকেই দলপতি করা হয়, কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সেইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজে কংগ্রেসীরা বহু মতে সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীযুক্ত প্রকাশমকে দলপতি নির্বাচিত করিয়াছেন।

উড়িষ্যার সচিবসঙ্ঘ—উড়িষ্যায় কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব (প্রধান মন্ত্রী) স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও সমরান্ত পুনর্গঠন বিভাগসমূহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী বেসামরিক সরবরাহ ও রাজস্ব বিভাগদ্বয়ের, শ্রীযুক্ত লিঙ্গরাজ মিশ্র—শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগত্রয়ের, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কানুনগো আইন ও বিচার বিভাগদ্বয়ের এবং শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস রায়—পূর্ত, শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগত্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ—মধ্যপ্রদেশের গভর্নর পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লকে কংগ্রেস দলের দলপতিরূপে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন জন্য আহ্বান করায় তিনি সেই আহ্বানানুসারে ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে সহঃসচিবদিগের তালিকা প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—গত ১৭ই এপ্রিল মাদ্রাজে পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। তিনি শিক্ষকরূপে কাজ আরম্ভ করিয়া ৩৮ বৎসর বয়সে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারত-ভৃত্য সমিতিতে যোগ দেন এবং প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে উহার সভাপতি হইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্বে তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন বটে, কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে মতভেদ হেতু জাতীয় দলে যোগ দেন। তিনি মাদ্রাজের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার, কেন্দ্রী ব্যবস্থাপক সভার ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সরকারের প্রথম প্রতিনিধি হইয়া ২ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ বিভাগ—মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশকে পাকিস্থানভুক্ত করিবার—অভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীহট্টের সহিত যুক্ত করিয়া পাকিস্থান গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন—যদি পরে ভাষানুসারে প্রদেশ পুনর্গঠনের কথা হয়, তবে তাহা বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এখন যদি বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগের কোন প্রস্তাব হয়, তবে তাহার তীব্র প্রতিবাদই করিতে হইবে। পাঞ্জাবের পক্ষে সর্দার শান্ত সিংহ বলিয়াছেন, —সেই প্রতিবাদে যদি ১০ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। স্বাধীনতার মূল্য ১০ লক্ষ লোকের জীবন অপেক্ষাও অধিক।

বঙ্গীয় নির্বাচন—মৌলবী ফজলুল হক বলিয়াছেন, মুসলিম লীগের অনাচারে বাঙলায় মুসলমান সদস্য নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। স্যার আবদুল হালিম গজনভীর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খান বাহাদুর তমিজুদ্দীন খানের নির্বাচন বাতিল করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

বৈদেশিকা

বর্তমান এবং আগামী সপ্তাহে আন্তর্জাতিক বাদবিতণ্ডা ইউরোপ ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছে এবং চলিবে। নিউইয়র্ক শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে সম্প্রতি বিশেষ উষ্মার সহিত যে-রাষ্ট্রের সম্বন্ধে গলাবাজি চলিতেছে বৈঠকে এপর্যন্ত তাহার স্থান হয় নাই। এই অস্পৃশ্য রাষ্ট্রটি হইতেছে ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেন। কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়াও স্পেন সমস্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে গত যুদ্ধের ভাবী শান্তি বৈঠকের সমস্যা। এই বৈঠক বসিবে প্যারিসে এবং ইহার তারিখ ১লা মে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স পক্ষপাতহীনতার নামে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্যত তাহাকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব নীতি বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। শুধু এই পক্ষপাতিত্ব প্রত্যক্ষে এবং সোজাসুজি না হইয়া পরোক্ষে এবং বাঁকা পথে চলিয়াছিল। জার্মানী এবং ইতালী ফ্রাঙ্কোর পক্ষে এবং রাশিয়া স্পেনে গণতন্ত্রী গভর্নমেন্টের পক্ষে সোজাসুজি সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো গৃহযুদ্ধে জয়ী হন। ইহার কিছুকাল পরেই মহাযুদ্ধ বাধিল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞ স্পেন জার্মানীর পক্ষে এবং মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। স্পেন তাহা করে নাই এবং যদিও তাহার সহানুভূতি এবং নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা অক্ষশক্তির পক্ষেই ছিল তথাপি স্পেন যুদ্ধে জড়িত হয় নাই। যুদ্ধশেষে অক্ষশক্তির পতনের ফলে স্পেনের আন্তর্জাতিক একাকীত্ব স্পেনের গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এদিকে রাশিয়া ও ইউরোপে আপন মিত্রশক্তি সংখ্যা বৃদ্ধিতে তৎপর; স্পেনে একটি গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রবাদী গভর্নমেন্ট তাহার সহায়ে স্থাপিত হইলে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে স্পেনের একটা বিশেষ ভৌগোলিক মূল্য রহিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে স্পেন যাহাতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে, তজ্জন্য ব্রিটেনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ অবস্থায় স্পেন যদি রুশ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত পড়ে। অতএব স্পেনে কি প্রকার গভর্নমেন্ট স্থাপিত হয়, এ বিষয়ে ব্রিটেন উদাসীন থাকিতে পারে না। ফ্রাঙ্কো গভর্নমেন্ট অন্তত রুশ-বিরোধী থাকিবেই এ ভরসা ইংরেজের আছে। যদি ফ্রাঙ্কো গভর্নমেন্ট উৎপাটিত হইয়া সমাজতন্ত্রী গভর্নমেন্ট স্থাপিত হয়, তবে তাহার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে রাশিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, কিন্তু ব্রিটেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে। অতএব স্পেনে যাহা আছে, তাহাই থাক এই নীতিই ব্রিটেনের কাম্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে স্পেনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনিয়াছেন রুশপ্রভাবের অন্তর্ভুক্ত পোল্যান্ড। তাহার নালিশ এই যে, স্পেনের অতীত ইতিহাস ফ্যাসি-প্রভাবমুক্ত নয়, বর্তমান ইতিহাসও তাহাই; নাৎসী জার্মানীরা স্পেনে আশ্রয় পাইয়াছে; তাহারা স্পেনে আত্মগোপন করিয়া আছে; স্পেনের সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়াছে; এমন কি জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ স্পেনের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া আণবিক বোমা সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়াছে। অধিকন্তু ফ্রান্সের সীমান্তে স্পেনের সৈন্য মজুত করা হইয়াছে। অতএব ফ্রাঙ্কো গভর্নমেন্ট বিশ্বশান্তির নিদারুণ বাধা জন্মাইয়াছে এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এই মর্মে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করুন ইহাই পোল্যান্ডের দাবী। এই দাবী সমর্থন করিয়াছেন রাশিয়া এবং ফ্রান্স; ইহার বিরোধিতা করিতেছেন ইংলণ্ড। ব্রিটিশ ডেলিগেটের যুক্তি হইতেছে এই যে, যদিও ফ্রাঙ্কো গভর্নমেন্ট ইংরেজের প্রিয় নয় তথাপি স্পেনে গৃহবিবাদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। অপক্ষপাত অনুসন্ধান করিয়া তারপর সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত। রাশিয়া পোল্যান্ড এবং ফ্রান্স যে সমস্ত আশঙ্কার কথা বলিতেছেন এবং যে সমস্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া পোল্যান্ড এই প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন সে সমস্ত সংবাদ সত্য নয় ইহাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন, ইত্যাদি। ফলে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, পোল্যান্ডের প্রস্তাব পাশ হওয়া সম্ভব হইবে না। এখন পর্যন্ত ইঙ্গ-আমেরিকাই জাতিপুঞ্জের বৈঠকে রাশিয়ার চেয়ে বেশী ভোটের মালিক। রাশিয়ার সঙ্গে এই দুই শক্তির সম্পর্ক ক্রমাগত রেষারেষির পর্যায়ে আসিয়া পড়িতেছে। পারস্যের ব্যাপারে মতান্তর একেবারে মনান্তরে পৌঁছিয়াছে। অস্ট্রেলিয়া একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনিয়াছে তাহাও ফ্রাঙ্কো গভর্নমেন্টের স্বার্থের অনুকূলেই বলিতে হইবে। বৈঠকে এ বিষয়ে বাদানুবাদ আজও শেষ হয় নাই।

শান্তি বৈঠক বসিবার তারিখ ১লা মে, কিন্তু এই তারিখে বৈঠক বসিবার সম্ভাবনা
অত্যন্ত কম। বিভিন্ন প্রধান রাষ্ট্রের পররা
সচিবের সভা বসিবে ১লা মে'র আগেই এ
তাহাদের আলোচনার সুবিধার জন্য কিছুক
যাবৎ তাহাদের ডেপুটিদের বৈঠক বসিয়া
কিন্তু মতের ঐক্য কিছুতেই হইতেছে ন
গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিবে
বৈঠক বসিয়াছিল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে
তাঁহারা আসিতে পারেন নাই। এবারও
বৈঠকের ফল শুভ হইবে তাহার কোন সম্ভাব
দেখা যাইতেছে না। পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠ
প্রধানত ২টি বিষয় আলোচিত হইবে। প্রথম
জার্মানীর সম্বন্ধে কি করা হইবে; দ্বিতীয়
জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধমান পাঁচটি দেশের সং
যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হইবে তাহা কি ম
রচনা হইবে। এই পাঁচটি দেশ হইতে
ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী বুলগেরিয়া, রুমানি
এবং ইতালি। তন্মধ্যে ফিনল্যান্ড ছাড়া অ
দেশগুলির সম্পর্কে সন্ধিপত্র ডেপুটিদে
বৈঠকে রচিত হইতেছে। কিন্তু এই রচি
হওয়া ব্যাপারটা মোটেই সুচারুরূ
চলিতেছে না, কেননা বিভিন্ন রাষ্ট্রে
ডেপুটিদের মতের ঐক্য কিছুতেই হইতে
না। ডেপুটিদের বৈঠকে যদি কোন সিদ্ধান্তে
উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় (এবং
সম্ভাবনা মোটেই দেখা যাইতেছে না) তা
হইলে পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন চটপট ক
শেষ করিতে পারিবেন এ ধারণা করা অসঙ্গ
ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে প্রধ
প্রধান রাষ্ট্রের পরস্পর স্বার্থবিরোধী এ
বিষয় রহিয়াছে যে, একমত হওয়া ইহাদে
পক্ষে দুঃসাধ্য। যতদিন জার্মানীর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ চলিয়াছিল, ততদিন সকলেই প্র
বাঁচাইবার দায়ে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলে
জার্মানবধ পালা সাঙ্গ হওয়ার আগেই অথ
জার্মানীর আর কোন আশা নাই ইহা বুঝিব
মাত্রই প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ স্বা
উদ্ধার করিবার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিলে
ফলে আপৎকালে যে ঐক্য এবং নৈকট্যবো
গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারে ধ্বংস হওয়
যোগাড় হইয়াছে। বিশ্বশান্তির চেয়ে এখ
আত্মস্বার্থ প্রসারই বড় স্থান পাইয়াছে
রাশিয়া তাহার রাজ্য এবং প্রভাব বিস্ত
করিতে কৃতসংকল্প এবং ইঙ্গ-আমেরিকা তাহাতে
বাধাদান করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে
পারস্য লইয়া বিতণ্ডার ইহাই প্রধান তত্ত্ব এ
আজ স্পেন লইয়া ভিন্ন মত এবং ভিন্ন প
অবলম্বনেরও ইহাই তাৎপর্য। পররা
সচিবদের বৈঠকে এই বিরোধী স্বার্থে
সমন্বয় হওয়ার আশা অত্যন্ত কম। আগাম
সপ্তাহে ইউরোপে এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থে
একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইবে।

বিলাতে ফিরিয়া যাইবার আগে যে-কোন মূল্যে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে টি মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য নাকি মন্ত্রি-ন শ্রমিক সরকারের নির্দেশ পাইয়াছেন। াদটায় আমরা উৎফুল্ল হইতে পারিলাম না,

ননা আমাদের নিরাশাবাদী বিশুখুড়ো বলেন—"মীমাংসা দর্শনটা জৈমিনির, গ্রাজীর এই দর্শন বড় আসে না, সুতরাং কোন মূল্যে কোন রকম মীমাংসার রোধিতা করাই তাঁর পণ।"

* * * * *

মুছলমানদিগকে হিন্দুরাজের অধীন করিয়া দিয়া গেলে তারা দেশে যে হত্যা ও সে ঘটাইবে তার তুলনায় চেঙ্গীস খাঁর াচারের ইতিহাস ম্লান হইয়া যাইবে"—লয়াছেন স্যার ফিরোজ খাঁ নুন। সংবাদে া হইয়াছে, স্যার ফিরোজের এই ভাষণ নাকি গ মহল চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ রয়াছেন। আমাদের কাছে কিন্তু বড়ই টান লাগিল। নুনের ট্যাক্স কি সত্যই ঠয়া গেল?

* * * * *

মন্ত্রীমিশন নাকি সম্প্রতি আগ্রায় তাজমহল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদের কথা উল্লেখ রয়া বলেন—"তাজমহল দেখিয়া নাকি ন্ত্রিত্রয় বড়ই অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁরা শ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' পড়িয়াছেন—ং ভারত ছাড়িয়া যাইবার আগে—'হে হৃদয়, মার সঞ্চয়, দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-ন্তে ফেলে যেতে হয়'—মনে করিয়াই বিচলিত য়া পড়েন!"

* * * * *

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা নাকি সম্প্রতি "এ্যাস্পারাগিলিন" নামক একটি ঔষধ াবিষ্কার করিয়াছেন এবং সংবাদে বলা হইয়াছে ইহা নাকি "পেনিসিলিনের" অপেক্ষাও অধিক ার্যকরী। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ াই, রুশ করিৎকর্মা জাতি, এসপার-ওসপার

যা হয় একটা কিছু না করিয়া যে তাঁরা নিরস্ত হইবেন না, একথা আমরা জানিতাম!

* * * * *

লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি টেলিফোনযোগে রান্নার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের এখানে রান্নার ব্যবস্থাটাই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং হেঁসেল বা টেলিফোনের প্রশ্নই অবান্তর, তাছাড়া খাদ্য খাওয়া ব্যাপারে ক্রমাগত "Wrong Number" আর "Engaged" শুনিবার জন্যও আমরা উৎসাহ বোধ করিতেছি না।

* * * * *

জনৈক সহযোগী সংবাদ দিতেছেন—শ্রীরামপুর স্টেশনে নাকি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। খুড়ো

বলিলেন—স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল তবে মিথ্যা বলেন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে দিয়া শ্রীরামপুরে তিনি সত্যই রামরাজ্য স্থাপন করিলেন!

* * * * *

বারজন মন্ত্রীর মধ্যে লীগের সাতজন এবং কংগ্রেসের পাঁচজন লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনা চলিতেছে। সংখ্যা-বণ্টনটা সুরাবর্দী সাহেব সাত-পাঁচ ভাবিয়াই হয়ত করিয়াছেন, কিন্তু যাঁরা সাতেও নাই, পাঁচেও নাই—তাঁরা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ভবিষ্যতের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছেন।

* * * * *

মোটর দুর্ঘটনা হইতে পথচারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সামরিক যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে পথে-ঘাটে প্রেমের

প্রগতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া না দিলে অবস্থার কোন উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা যতদূর জানি—অনেক দুর্ঘটনাই "Public exhibition of affection" হইতে হয়।

উজ্জয়িনীর গলি

উজ্জয়িনীর সেই গলিটি কি আমাদের র এই পথটির চেয়ে অধিকতর মনোরম ? সেই যে গলির মোড়ে দীপশিখাবাহিনী বকা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কবিকে র্থনা করিয়াছিল! কবির কথা বিশ্বাস ত হইলে বলিতে হয়—এমন সুন্দর পথ পৃথিবীতে নাই। সংকীর্ণ বঙ্কিম পথ— দিকে শ্বেত পাথরের বাড়ি; প্রত্যেক বাড়ির । শঙ্খচক্রের মুদ্রা, দ্বারের পাশে তরু; আবার কোন কোন বাড়ির সিংহ- । 'সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে'। র অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্বেই গৃহ- নীর পারাবতগুলি ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে গ করিয়াছে—এতক্ষণে তাহারা তন্দ্রিত— র শৈথিল্যে তাহাদের মুখ হইতে তণ্ডুল- স্খলিত হইয়া পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গনে ঃ রেখার সৃষ্টি করিতেছে। আর ময়ূরে কলাপ সংযত করিয়া একটি পায়ের উপরে করিয়া পালকে মুখ গুঁজিয়া দণ্ডায়মান। রের শঙ্খ ঘণ্টা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ; রুর গন্ধ ও সূক্ষ্ম ধূম্রজাল সমস্ত অঙ্গন- য়া বাসরের রহস্যময় যবনিকা টানিয়া ছে—আর সৌধসংকটের অবকাশে সন্ধ্যার টি দীপমান্যা। এমন সময়ে সন্ধ্যার লক্ষ্মীর সন্ধ্যা তারারূপে দীপশালিনী মালবিকা পাষাণের সোপানে সোপানে রক্তিম চরণের দ্ম বিকশিত করিয়া নামিয়া আসিল। এমন র আর কী আছে? ইহার চেয়ে সুন্দর কী হইতে পারে?

তবু এক-একবার মনে হয় আমাদের পাড়ার পথটাও কম সুন্দর নয়। প্রশস্ত পথের দিকে পুষ্পতরু—আকণ্ঠ ফুলের ভারে তে। বকুল জারুল গুলমোর. এবং কা-লতা, আর আছে গোত্রহীন সোনার । সোনাঝুরি ফুল! সন্ধ্যাবেলায় এখানে গলের মন্দিরে আরতি ধ্বনি বাজে না বটে. গুরুর গুরু-গন্ধও আকাশকে নিবিড় ধতায় ভরিয়া দেয় না সত্য, আর ভবন ী ও সযত্নলালিত পারাবতের যুগও অনেক- গত। এখানকার বাড়িগুলি কলের গঠিত—সব কেমন যেন অত্যন্ত কাটা- —প্রয়োজনসাধনের অতিরিক্ত বাহুল্য- ত। আর পথটাও বঙ্কিম নয়. সংকীর্ণ তো । তবু এ পথ অসুন্দর এমন বলি করিয়া ?

আর হায়, হায়, যত বড় মহাকবিই আসুন কন—তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মালবিকা দীপ হাতে করিয়া যে অগ্রসর

হইয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা মাত্রও নাই। তবে কি এখানে মালবিকার সগোত্রভূতদেরই অভাব? তাহা নয়। মালবকন্যাদের এখানে দেখা পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? কিন্তু গৌড়কন্যা গৌড়িনীদের অভাব নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু কবির প্রতি তাহাদের যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে—এমন কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ ফুটবল খেলা শেষ করিয়া বিজয়ী খেলোয়াড়টি ফিরিলে নিশ্চয় কোন না কোন গৌড়িনী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়—হাতে তখন তাহার দীপশিখা থাকে না—বৈদ্যুৎ আলোর টর্চের বাতি থাকিলেও থাকিতে পারে। এ কালের গৌড়িনীর পোষাক পরিচ্ছদ এবং প্রসাধন কলা যে সেকালের মালবিকার সঙ্গে মিলিবে এমন আশা করা উচিত হইবে না—তবু যে একালের গৌড়িনী সেকালের মালবিকার চেয়ে কম সুন্দর ইহা ফুটবল খেলোয়াড়টির সাক্ষ্য ছাড়াও বিশ্বাস করা চলিতে পারে।

আমি মোটা কলমে একালের সন্ধ্যার একটি বর্ণনা দিলাম—কবির সূক্ষ্ম কলম চলিলে তাহা আরও না জানি কত সুন্দর হইত! আসল কথা সৌন্দর্য বস্তুতে নাই—কবিদের লেখনীর গোমুখীই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবিরা সৌন্দর্যের ভগীরথ। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিব, উজ্জয়িনীর গলিটি অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন ঈষৎ দুর্গন্ধময় বাঁকা চোরা একটি নোংরা গলি ছাড়া আর কিছু নয়—অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতো আর কি?

তবে কেন এমন হয়? বস্তুত যাহা অত্যন্ত সাধারণ কাব্যে তাহা অসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হয় কেন? কাব্যের বিশেষ গুণেই বস্তুর অসুন্দর কাব্যে সুন্দর হইয়া ওঠে। শুধু কাব্যশিল্পের নয়—শিল্প মাত্রেরই ইহা বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ গুণটির স্বরূপ কি—যাহার ফলে জীবনের অসুন্দর কাব্যে সুন্দরত্ব লাভ করিতেছে। ইহাকে পূর্ণতা বলা যাইতে পারে। শিল্প ও জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া লইয়া পণ্ডিতজনেরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিতণ্ডা চালাইয়া থাকেন, বস্তুত তাহার হেত্বভাব। শিল্প ও জীবন পরস্পর প্রতিযোগী নয়—পরস্পর পরিপূরক। জীবন সেতুর ছায়া জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াই সেতুচক্রকে পূর্ণতা দিতেছে। মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি সেই জলাশয়—জীবন-সেতু সেই জলাশয়ে প্রতিফলিত না হওয়া অবধি জীবন অসম্পূর্ণ; কল্পনা ও অনুভূতির মানস সরোবর বাস্তব সেতুর পরিপূরকভাবে আর একটি শিল্পসেতু রচনা করিয়া সেতুচক্রকে সম্পূর্ণতা দান করিতেছে। একমাত্র শিল্পে বা একমাত্র জীবনে পূর্ণতা নাই। উজ্জয়িনীর গলি বাস্তবে অসম্পূর্ণ—তাহার উপরে শিল্পের মহিমা প্রতিফলিত হওয়াতে তাহাকে পূর্ণ অর্থাৎ সুন্দর মনে হইতেছে। আমাদের পাড়ার পথটাও বাস্তবে অসম্পূর্ণ—কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহার উপরে কবিদৃষ্টির পুষ্প-বৃষ্টি না হওয়াতে তাহা পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই —অর্থাৎ এখনো শিল্পের সৌন্দর্য লাভ করে নাই। তবে কি পূর্ণতা আর সৌন্দর্য অভিন্ন? পূর্ণতাই সুন্দর। কিন্তু সে আবার কেমন কথা? পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুন্দর বলিয়া কি চতুর্থীর চন্দ্রকলা সুন্দর নয়? চতুর্থীর চন্দ্র-কলাও অবশ্য সুন্দর—কিন্তু একটা আসন্ন পরিপূর্ণতার পটভূমিতেই তাহার খণ্ডতা সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই পূর্ণতার পটভূমিচ্যুত হইলে অতিশয় সুন্দরও আর সুন্দর নয়। রামচন্দ্রের নীলোৎপল নেত্র অবশ্যই সুন্দর ছিল—কিন্তু সেই নেত্র ছিন্ন করিয়া দেবী পদতলে উৎসর্গ করিবার সংকল্পমাত্রেই দেবী কেন অপহৃত পদ্মফুলটি ফিরাইয়া দিলেন তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে কি? উৎপাটিত নীলোৎপল নেত্র আর সুন্দর নহে —অসুন্দরের উপহার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই দেবী পদ্মটি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

জীবনে যাহা অসুন্দর মানুষকে তাহা গ্লানি দেয়—কারণ তাহাতে পূর্ণতার আভাস নাই। কিন্তু সেই অসুন্দর যখন শিল্পসত্তা লাভ করে তখন তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরিতে চাহে না। বাস্তবে যে-অভাব তাহার ছিল, শিল্পের মাধ্যমে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবে যে-দৃশ্য দেখিয়া বলি—কি কুৎসিত, শিল্পে তাহাকে দেখিয়া বলি—কি সুন্দর কুৎসিত। এমনি ভাবে প্রতিনিয়ত বাস্তব শিল্পে দ্বিজত্ব লাভ করিতেছে এবং শিল্প বাস্তবে দ্বিত্বলাভ করিতেছে। কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারো বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। উজ্জয়িনীর গলি বস্তুত যেমনি হোক কবি-কল্পনার ত্রিশিরা কাঁচের মাধ্যমে পরিদৃষ্ট বলিয়া তাহা সুন্দর; আর আমাদের পাড়ার পথটির উপরে সেই দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই বলিয়া তাহা বাস্তব মাত্র—তদধিক কিছু নহে।

ধ্রটি হয়তো অনেক কিছ্বই রয়েছে, কিন্তু মোটামর্টি একটা ধারার প্রবর্তক হিসেবে তো সেগর্লিকে গ্রাহ্য ক'রে নেওয়া চলতে পারে। প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা যা উপহার দিচ্ছেন, লোকে যে তাতে খর্শী নয় মোটেই তার একটা প্রমাণ ক্রমবর্ধমান সৌখীন সম্প্রদায়ের সংখ্যা থেকেই উপলব্ধি করা যায়—প্রমোদকে নতুন র্প দেবার চেষ্টা আজ শর্ধ্ এদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। এদের জিনিসই ধার ক'রে ব্যবসাদারী মাজাঘসার মধ্যে দিয়ে তার সর্ষ্ঠ্ র্পদানের দিকে সচেতন না হ'লে এখনকার প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা জনসাধারণের কাছ থেকে একেবারে দ্রে সরে যেতে বাধ্য হবে।

বিবিধ

বম্বের দেখাদেখি মাদ্রাজেও চলচ্চিত্র কর্মীদের একটি ইউনিয়ন সংগঠিত হ'য়েছে—এর সভাপতি হ'চ্ছেন সি এস আর অঞ্জনয়েল্; উদ্দেশ্যঃ দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র শ্রমিকদের স্বখ-স্ববিধার ব্যবস্থা করা।

* * * *

স্বভাষচন্দ্র বাঙালী ছিলেন অথচ তারই বাঙলায় প্রায় সমদয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান মিলে আজাদ হিন্দ সাহায্য ভাণ্ডারে মাত্র বিশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। যেখানে বম্বের এক চা-পার্টিতে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন-কয়েক কেবল চিত্রপ্রযোজক মিলেই আটাত্তর হাজার টাকা তোলে—এই নিয়ে অন্যান্য প্রদেশ দস্তুরমত বিদ্রূপ ক'রছে।

* * * * *

গত বৎসরে ভারত সরকার চলচ্চিত্র থেকে প্রমোদকর বাবদ আয় ক'রেছে এক কোটি ষোল লক্ষ টাকা।

* * * * *

বাবরোও পাই মাঝে প্রভাত ফিল্মস্ কিনতে গিয়ে আবিষ্কার করে যে, প্রভাত ফিল্মস্ গত পনের বছর ধ'রে পনের লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছে।

* * * * *

অভিনেত্রী শান্তা হ্বলীকর ভারতভূষণ প্রডাকসন্স নামে নিজস্ব একটি চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রেছেন।

* * * * * *

র্পাঞ্জলি পিকচার্স নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'য়েছে। দেবকী বসরে সহকারী রতন চট্টোপাধ্যায় প্রথম ছবির পরি-চালনাভার পেয়েছেন। প্রথম ছবির নাম 'অলকানন্দা', কাহিনী মন্মথ রায়ের।

* * *

শ্রীমতী কাননও রিজেন্ট পার্কে নিজস্ব স্ট্বডিও নির্মাণের ব্যবস্থা ক'রেছেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি যক্তরাষ্ট্রে সফর ক'রতে যাচ্ছেন।

খেলাধূলা

হকি

বেঙ্গল হকি—এসোসিয়েশন পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইলেও চ্যাম্পিয়ান-সিপ নির্ধারিত হয় নাই। মোহনবাগান ও গ্রীয়ার প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িলেও রেঞ্জার্স ও পোর্টকমিশনার্স এই দুইটি দলের মধ্যে এখনও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে কে চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা কঠিন। উভয় দলই সমান সংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিয়া সকল খেলা শেষ করিয়াছে। গোলের গড়পড়তা হিসাবে রেঞ্জার্স লীগ তালিকার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু হকি লীগ প্রতিযোগিতায় গোলের গড়পড়তার কোন মূল্য নাই। চ্যাম্পিয়ান সিপের জন্য রেঞ্জার্স ও পোর্ট কমিশনার্স দলকে পুনরায় এক খেলায় মিলিত হইতে হইবে। ঐ খেলার ফলাফলের উপর চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ভর করিতেছে। পোর্ট দল গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান—এই বৎসরে চ্যাম্পিয়ান হইলে আশ্চর্যের বিষয় হইবে না।

মোহনবাগান দল লীগ তালিকার তৃতীয় স্থানে অবস্থান করিতেছে। প্রতিযোগিতার শেষ দুইটি খেলায় আশানুরূপ খেলিতে না পারায় এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে আমরা পূর্ব হইতেই এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম। ফলাফল দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হই নাই।

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন বাঙলার বাহিরের বহু দলের নাম তালিকাভুক্ত দেখিয়া আমরা বলিয়াছিলাম "সকল দল আসিলে হয়।" আমাদের সেই উক্তি অনেকেরই বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবান্তর কিছু বলি নাই তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। একের পর এক সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে "অমুক অমুক দল যোগদান করিতে পারিবে না বলিয়া জানাইয়াছে।" প্রতি বৎসর এইরূপ দলের না যোগদান করিবার সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই বলিয়াই আমরা সাহসী হইয়াছিলাম বলিতে "সকল দল আসিলে হয়।" আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না কেন প্রতি বৎসর একই প্রহসন অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে সকল দলের যোগদানের কোন স্থিরতা নাই তাহাদের তালিকাভুক্ত কেন করা হয়? প্রতিযোগিতার দিক হইতে ইহা খুব সম্মানের বলিয়া মনে করি না। এই জন্যই প্রতি বৎসর আমরা পরিচালকগণকে অনুরোধ করি, স্থির নিশ্চিত না হইয়া কোন দলকে তালিকাভুক্ত না করিতে। আমরা আশা করি, পরিচালকগণ আগামী বৎসরে এই বিষয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়া খেলার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সহঃসভাপতি মিঃ ডি মেলোর বিবৃতি হইতে জানা যায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিবেন। প্রথম দলে যাইবেন পতৌদির নবাব, অমরনাথ ও এস ব্যানার্জি। ইহারা ২৫শে এপ্রিল বিমানযোগে দিল্লী হইতে রওনা হইবেন। দ্বিতীয় দল করাচী হইতে রওনা হইবে ২৫শে এপ্রিল তারিখে। ঐ দলে যাইবেন বিজয় মার্চেণ্ট, ডি ডি হিন্দেলকার, আর এস মোদী ও বিনু মানকড়। অবশিষ্ট সকল খেলোয়াড় করাচী হইতে ২৪শে হইতে ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে যে কোনদিন হইতে রওনা হইবেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের যাত্রা লইয়া এবার তারিখ পরিবর্তন ও স্থান পরিবর্তন হইতে দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য হইয়াছি। ইহার পর যাত্রার ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্য কোনরূপ পরিবর্তিত সংবাদ না শুনিতে হইলেই সন্তুষ্ট হইব।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়া যেরূপভাবে প্রতিদিন দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হয়, তিনি ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের জন্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মনোভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া না ফেলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করিবার সময় কোন নির্দেশ দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহা না হইলে তিনি বহু অবান্তর কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। খেলার ফলাফলেই ভারতীয় দলের শক্তি ও সামর্থ্য প্রমাণিত হইবে তাহার জন্য পূর্ব হইতে বড় বড় বুলি আওড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে লোকের বাক সংযম নাই তাহাকে কোন গুরুদায়িত্ব পদে অধিষ্ঠিত করিলে অনেক সময়েই বিপদ ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের উচিত এখনই ম্যানেজার মহাশয়কে জানাইয়া দেওয়া যে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়াছেন খেলোয়াড়গণের ভ্রমণের সময় যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাঁহাকে দল সম্পর্কে "বুলি আওড়াইবার" জন্য প্রেরণ করা হয় নাই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলিবার জন্য আগামী নবেম্বর মাসে ভারতে আসিবেন। তাঁহারা ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে থাকিবেন। ইহার মধ্যে লাহোর, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ এই পাঁচটি স্থানে চারি দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট খেলায় যোগদান করিবেন। এই সংবাদ খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে ভ্রমণ ব্যবস্থার জন্য দেড় লক্ষ টাকা প্রয়োজন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এত অধিক টাকা প্রয়োজন হইবার অর্থ কি? ইতিপূর্বে অনেক বৈদেশিক দলই ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল ভ্রমণ ব্যবস্থার জন্য এত অধিক অর্থ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না। আমরা আশা করি, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভ্যগণ যাঁহারা এই ভ্রমণ ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহারা এইদিকে দৃষ্টি দিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে চেষ্টা করিবেন।

এ্যাথলেটিকস

বাঙলা দেশে এ্যাথলেটিক স্পোর্টস বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। বাঙলার জনপ্রিয়তা প্রবাসী বাঙালী সমাজের মধ্যেও উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে সেইজন্যই দেখা যাইতেছে বোম্বাই, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাঙালী ক্লাব এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আয়োজন করিতেছেন। এই বৎসরে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সংবাদ আমরা পাইয়াছি, তাহা খুবই উৎসাহ-উদ্দীপক। এই সকল স্থানের বাঙালী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীকে যখন স্থানীয় সাধারণ অনুষ্ঠানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখিব, তখন প্রকৃতই আনন্দলাভ করিব।

দেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—লক্ষ্ণৌ ষড়যন্ত্র মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি লক্ষ্ণৌ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে মিঃ জিন্না ও বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলের মধ্যে পুনরায় আলোচনা হয়।

বাঙলার কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে অদ্য কলিকাতায় কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় এবং লীগ দলের নেতা মিঃ সুরাবর্দীর মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয়।

বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আজ গভর্নরের নিকট আরও পাঁচজন মন্ত্রীর নাম পেশ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা মোট ৯জন হইবে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা নিরাপত্তা বন্দী শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র গুহ প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত ২৩শে মার্চ শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও শিলাবৃষ্টির ফলে প্রায় ৫০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, মিয়ানওয়ালি জেলায় এক নৌকাডুবির ফলে প্রায় এক শতজন তীর্থযাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১৭ই এপ্রিল—অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলের মধ্যে দ্বিতীয় দফা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়।

বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার ময়লাপুরস্থ ভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন সহায়কে সিঙ্গাপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন যে, আগামী মে মাস হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত—এই চার মাসকাল ভারতে এক নিদারুণ খাদ্য সংকট দেখা দিবে।

অদ্য দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক পুনরায় আরম্ভ হয়। পণ্ডিত নেহরুর মালয় ভ্রমণ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

চৌমোহনীর (নোয়াখালী) এক সংবাদে প্রকাশ, বেগমগঞ্জ থানার কুতুবপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র নাথ নামে এক তাঁতি তাঁহার নিজের এবং পরিবারের অনশনের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে।

মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট মালাবার স্পেশ্যাল পুলিশ বাহিনীকে ভাঙিয়া দিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে ডাঃ জি ডি দেশমুখের বিল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই বিলে কতকগুলি অবস্থায় হিন্দু বিবাহিতা মহিলাদিগকে পৃথক্‌-ভাবে বসবাস ও ভরণপোষণ সম্পর্কে অধিকার দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল—আজ নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী ও ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়।

বাটানগরে বাটা সু ফ্যাক্টরীর সাত হাজার কর্মী ধর্মঘট শুরু করে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

১৯শে এপ্রিল—কিশোরগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ যে, গত রবিবার ভৈরব ষ্টেশনের সন্নিকটে রেলওয়ে লাইনের ধারে দৈবাৎ একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৭ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃতদেহগুলি কিশোরগঞ্জের শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২০শে এপ্রিল—বাঙলায় কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

পুলিশের দাবী পূরণ না করায় ঢাকার পুলিশেরা প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মঘট করিয়াছে।

২১শে এপ্রিল—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাঞ্জাব অথবা বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছেদের কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্রচণ্ড-ভাবে তাহার প্রতিবাদ করা হইবে।

নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী ভূপাল হইতে এই মর্মে এক তার পাইয়াছেন যে, আতঙ্কহেতু হিন্দুরা ব্যাপক-ভাবে ভূপাল ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য বিমানযোগে দিল্লী হইতে ভূপালে গমন করেন।

অদ্য কলিকাতাস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীগণ কর্তৃক আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে অপরাহ্নে কাশীপুর ৬নং রতনবাবু রোডস্থিত বিশ্রাম শিবিরে জাতীয় পতাকা অভিবাদন, সমষ্টি ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুত কে সি নিয়োগী সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মানব অধিকার সম্পর্কিত কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিমানযোগে অদ্য সকালে কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

২২শে এপ্রিল—বাঙলার ভাবী প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যরূপে ৭জন মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের এক-জনের নাম গভর্নরের নিকট পেশ করিয়াছেন।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের অনুমোদনক্রমে শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাব অদ্য তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন:—শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, শ্রীলিঙ্গরাজ মিশ্র, শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিশ্বাসরায়।

পাটনার বাঁকিপুর ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত জয়প্রকাশনারায়ণ বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ আজ ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার বিপ্লবী অনুপ্রেরণা স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মাদ্রাজ আইন সভার কংগ্রেস দলের নেতা পদে শ্রীযুত টি প্রকাশম্‌ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ৮২ ভোট পাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত সি এন মুথুরঙ্গ মুদালিয়র ৬৯ ভোট পাইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি নিরাপত্তা পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। পারস্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করে।

মাদ্রিদ রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফ্রান্স এবং রুশিয়ার মধ্যে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে একটি গোপন চুক্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা ফ্রান্সের মধ্য দিয়া রুশিয়ার স্পেন আক্রমণ সম্ভব হইতে পারে।

১৭ই এপ্রিল—দক্ষিণ আফ্রিকা পরিষদে এশিয়াবাসী ভূমিস্বত্ব ও ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বিল গৃহীত হইয়াছে।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ২১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 4th May, 1946. [২৬ সংখ্যা

আবার সিমলা

ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের তৎপরতার কেন্দ্রস্থল, সম্প্রতি দিল্লী হইতে সিমলায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। সিমলার এই সাম্প্রতিক আলোচনার ফল কি হইবে, আমরা এখনও বলিতে পারিতেছি না, তবে এ সম্বন্ধে আমরা খুব আশাশীল নহি; বস্তুত মন্ত্রিমিশনের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা আগাগোড়াই সন্দিহান রহিয়াছি। আমাদের মতে ভারতের উপর হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অপসারিত করিবার অভিপ্রায় লইয়া তাঁহারা ভারতে আসেন নাই এবং ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়াও তাঁহাদের অন্তরের উদ্দেশ্য নয়; কারণ যদি সেই উদ্দেশ্যই তাঁহাদের থাকিত, তবে তাঁহারা এভাবে উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এদেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নিজদিগকে জড়িত করিতেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা সোজসুজি যাহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতা চায়, তাহাদের হাতেই শাসনভার সমর্পণ করিতেন। ফলত এই পথে ছাড়া অন্য কোনভাবে বর্তমান শাসনতন্ত্রগত সমস্যার সহজে সমাধান হইতে পারে না এবং সব দেশে সেইভাবেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন এ পথে গমন করেন নাই; অথচ একথা সত্য যে, ভারতবাসীরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দলবলকে ঘাড়ে ধরিয়া বিতাড়িত করিত, তবে প্রভুরা দায়ে পড়িয়া সেই পথই ধরিতেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, বিশ্ববাসীকে স্বাধীনতা প্রদানের আদর্শের যত কথা তাঁহারা প্রচার করেন, কার্যতঃ সেগুলিতে তাঁহাদের আন্তরিকতা একটুও নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আন্তরিকতার এই অভাবের জন্যই মন্ত্রিমিশনের আলোচনায় গ্রন্থি পড়িতেছে এবং তাহা এমনভাবে বিলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, মন্ত্রিমিশন প্রকারান্তরে পাকিস্থানী নীতিই মানিয়া লইয়াছেন এবং হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইবে, এমন প্রস্তাব করিয়াছেন। এই দুইটি রাষ্ট্রের উপরে একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট রাখা হইবে বটে, কিন্তু সে গভর্নমেণ্টের হাতে যথাসম্ভব কম ক্ষমতা থাকিবে। বলা বাহুল্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ডিত করিবার এই নীতি কংগ্রেস কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন যদি এমন প্রস্তাব সত্যই করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে ভারতবর্ষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধিতেই তাঁহারা পরিচালিত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় উদগ্র বৈপ্লবিক কর্মসাধনার ভিতরেই অদূর ভবিষ্যতে ভারতের কর্মিবৃন্দকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে এবং দেশ কংগ্রেসের নিকট হইতে শেষ সংগ্রামের জন্য সেই আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছে।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি

সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলায় বিনা-বিচারে আটক রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি-দানের আদেশ দান করিয়াছেন, কলিকাতার নূতন মেয়র-নির্বাচন-সূত্রে এই তথ্য প্রথম প্রকাশ পায়। প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার এতৎসম্পর্কিত নীতির কতকটা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইতঃপূর্বেই এ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিয়াছেন; সুতরাং সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলের এই ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের কোন বিশেষ নীতির উদার মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের অসহায়ত্বই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে; কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট শুধু বিনা বিচারে আটক রাজনীতিক বন্দীদিগকেই মুক্তি প্রদান করেন নাই; তাঁহাদের অনেকেই রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদিগকেও মুক্তিদান করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দী এ বিষয়ে এখনও আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি লইয়াই চলিতেছেন এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের নথিপত্র পুনর্বিবেচনা করিবার মামুলী যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। বস্তুত আমাদের কাছে এসব যুক্তির কোন মূল্যই নাই; কারণ রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণ চোর-ডাকাত নয়। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বেদনাই তাহাদের কাজের মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছিল; আজ দেশবাসী তাঁহাদের মুক্তি দাবী করিতেছে। জনমতের মর্যাদা মানিতে হইলে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে, নতুবা জনমতানুযায়ী শাসন পরিচালনের যুক্তির কোন মূল্যই থাকে না এবং মন্ত্রিগিরি, আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের প্রতি আনুগত্যেই পর্যবসিত হয়। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী শাসনাধিকার হাতে লইবার কালে জনসেবার উন্নত আদর্শে তাঁহার অনুরাগ কত গভীর, তাহা বুঝাইবার জন্য

অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শুধু কথার চালবাজিতে লোকে ভুলিবে না। তিনি এবং তাঁহার অনুগত মন্ত্রিমণ্ডল দেশসেবার ক্ষেত্রে কাজে স্বাধীনচিত্ততা কতটা দেখাইতে পারিবেন, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দুইজন ভারতবন্ধুর মৃত্যু

ডক্টর এডওয়ার্ড টমসন এবং খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক কাউণ্ট হারমান কাইজারলিং কিছুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক টমসন বাঁকুড়া ওয়েলেসিয়ান মিশন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; তখন রবীন্দ্র-প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি বাঙলা শিখিতে আরম্ভ করেন; পরে রবীন্দ্রনাথের রচনার কিছু কিছু তিনি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। ভারতের রাজনীতির সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক রাখিতেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সহিতও তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ডক্টর টমসন ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। ইংরেজ লেখকেরা অনেকেই সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদিগের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন এবং বিদেশী শাসকদের অবলম্বিত চিরাচরিত পদ্ধতি ক্রমে তাঁহাদিগকে খুনে ডাকাত প্রভৃতি রূপে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ডক্টর টমসন 'আদার সাইড অফ দি মেডেল' নামক একখানা পুস্তকে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরেজদের বর্বর আচরণ ও নিদারুণ অত্যাচারকে ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। ইংরেজ সরকার এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সত্য মিথ্যা হইয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ডক্টর টমসন ভারত সম্পর্কে যে সব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদারচিত্ততার পরিচয় প্রতি অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাউণ্ট কাইজার-লিংয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রধানত সংস্কৃতি বা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতেই ছিল। তিনি এ দেশের রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মূলীভূত মৈত্রীর মাধুর্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। যুদ্ধের এই বিপর্যয়ের ফলে বহুদিন হইতে কাইজারলিংয়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন সংবাদ পাই নাই। ইউরোপের এই দুইজন মনীষীর পরলোকগমনে ভারতবাসী দুইজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল এবং সে অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়।

মিঃ জিন্নার আদর্শ

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম অধিনায়ক জেনারেল শাহ নওয়াজের সঙ্গে মোসলেম লীগের সর্বময় অধিনায়ক মিঃ জিন্নার কিছুদিন পূর্বে ভারতের রাজনীতিক অবস্থা বিশেষভাবে মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী নীতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। জেনারেল শাহ নওয়াজ সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল বলেন, তাঁহার সঙ্গে মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্না তাঁহাকে পাকিস্থানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন। মিঃ জিন্নার যুক্তি এই যে, মুসলমানদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও ঔষধপত্রের অভাব দূর করিবার জন্য তিনি পাকিস্থান দাবী করিতেছেন। বলা বাহুল্য, কূটনৈতিক মিঃ জিন্নার এই যুক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করা জেনারেল শাহ নওয়াজের পক্ষে কঠিন হয় নাই। তিনি মিঃ জিন্নাকে স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দেন যে, ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহারও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না; পক্ষান্তরে তৃতীয় পক্ষের শাসন এবং শোষণ সমভাবেই চলিতে থাকিবে; এরূপ অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রথমে ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য করাই দেশব্যাপী এই অন্ন-বস্ত্রগত সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। জেনারেল শাহ নওয়াজ মিঃ জিন্নাকে আরও বলেন যে, এইভাবে ভারত স্বাধীন হইবার পর যদি হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে, তবে তিনি মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে হিন্দু প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গৌরব বোধ করিবেন। বলা বাহুল্য ভারতের বর্তমান রাজনীতির এই গূঢ় গতির সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার যে জ্ঞান না আছে এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের স্বাধীনতাও চাহেন না এবং মুসলমান জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীকার সাধনের জন্য আন্তরিকতাও তাঁহার নাই। বস্তুতঃ কংগ্রেসকে খর্ব করিয়া উপদলীয় স্বার্থসিদ্ধির দুর্বুদ্ধিই তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

মনস্বিনী পার্ল বাক ভারতের বুভুক্ষুদের বেদনা মার্কিন জাতির নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি তিনি মার্কিন সাংবাদিকদের একটি আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ভারতের নরনারীর জীবনীশক্তিকে নিরন্তর ক্ষুণ্ণ করিতেছে। তাঁহার মতে বর্তমানে ভারতের ১৩ কোটি ২০ লক্ষ লোক গড়ে জনপ্রতি দৈনিক ১৬০ ক্যালরীর অধিক খাদ্য পাইতেছে না। কৃষিজীবীরা কিঞ্চিৎ অধিক পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও গড়ে মাথা প্রতি ১২৫০ ক্যালরী মাত্র। অথচ দৈনন্দিন আহার্যে ২ হাজার ক্যালরীর কম থাকিলেই পুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৬০০ ক্যালরীর কম হইলে অপুষ্টি জনিত ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়। আর ৮ শত ক্যালরীর কম হইলে অনাহার জনিত মৃত্যু ঘটে। এই হিসাব অনুসারে বাহির হইতে উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে সরকারী হিসাব মতেই এই বৎসর ১ হইতে ২ কোটী ভারতবাসী প্রাণ হারাইবে। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে যে, ভারতের এমন অবস্থার জন্য দায়ী কে? এই সম্পর্কে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাক এবং ভারতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মামুলী যুক্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু জগতে অন্য দেশও তো আছে, অথচ কোন সভ্যদেশেই তো এইভাবে মানুষের অনাহারে মরিবার মত অবস্থা ঘটে না। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ হার্বার্ট হুভার সম্প্রতি জগতের বিভিন্ন দেশে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া ভারতে আগমন করেন। আমরা দেখিতে পাইলাম, তিনি অষ্ট্রেলিয়াবাসী-দিগকে উদ্দেশ করিয়া ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। সেই বিবৃতিসূত্রে ভারতের আমলাতন্ত্রকে প্রচুর সুখ্যাতি করিয়াছেন। মিঃ হুভার পরাধীনের বেদনা জানেন না বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ জাতির শাসন-মর্যাদার মোহ তাঁহাকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সংস্কারাবদ্ধ রাখিবে, ইহাও স্বাভাবিক; নতুবা ভারতের এই দুর্দশার জন্য তিনি ইংরেজ জাতির ভারত সম্পর্কিত নীতিকেই আক্রমণ করিতেন এবং ব্রিটিশ স্বার্থপ্রভাবিত ভারতের আমলাতন্ত্রকেই ভারতের এমন শোচনীয় অবস্থার জন্য সাক্ষাৎ-সম্পর্কে দায়ী করিতেন। প্রকৃত-পক্ষে পরাধীনতাই ভারতের এই দুর্দশার মূল কারণ। বিদেশীর প্রভুত্ব ধ্বংস না হইলে ভারতবাসীরা এই ভাবেই পোকা মাকড়ের মত মরিতে থাকিবে এবং জগতের প্রবল জাতিরাও অনুগ্রহাপেক্ষী ভারতকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিবে। ভারতের নিদারুণ খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে জগতের প্রবল শক্তিসমূহের এই অবজ্ঞার দৃষ্টিরই সর্বত্র আমরা পরিচয় পাইতেছি। তাঁহারা একে অপরকে দেখাইয়া দিতেছেন কিংবা সদিচ্ছাপূর্ণ উপদেশ বৃষ্টি করিতেছেন। ভারতের সমস্যা ইঁহাদের সকলের কাছেই গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, তবে ব্যাপার ভিন্ন রকম দাঁড়াইত; সুতরাং জগতে যদি মানুষের বাঁচিতে হয়, তবে আগে আমাদের স্বাধীনতা চাই নতুবা বর্তমানের দৈন্যভার বহন করিয়া আমাদের পক্ষে জীবনধারণ বৃথা।

পঁচিশে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ সমাগতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ এইদিন আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। বাঙলা দেশের জলবায়ুর সঙ্গে কবির অন্তরের নিবিড় সংযোগ ছিল। এই দিবস সেই বাঙলার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় ঘটে; বঙ্গ-প্রকৃতি স্তুতিচ্ছন্দে বিশ্বকবিকে বরণ করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নাই; ইহা একান্ত সত্য। কিন্তু এমন বাস্তব সত্যকেও আমরা যেন সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আসন্ন ২৫শে বৈশাখের পুন্যতিথি সম্বন্ধে চেতনা কবির প্রত্যক্ষ সত্তার প্রভাবময় প্রেরণাতেই আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অবদান আমাদের জাতীয় জীবনে এমন একান্ত সত্যে পরিণত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রাণবত্তাকে আমরা বিচার-বিতর্কের দ্বারাও বঞ্চনা করিয়া উঠিতে পারি না। আজও বৈশাখের ভোরের হাওয়ায় আমাদের মনের কোণে কবির বাণীর মৃদুমন্দ ছন্দ জাগে; নিদাঘ সূর্যের হোম-হুতাশন-জ্বালায় এবং কালবৈশাখীর প্রলয়-লীলায় কবির প্রাণময় স্পর্শই সতত আমরা অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ প্রাণবান্ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার অবদানরাজির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণধারা আজও এ দেশের সকল মহৎ চেষ্টায় সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। প্রবল এ প্রাণক্রিয়াকে অস্বীকার করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। আমরা কালের দাস; স্বভাবতঃ কালের বিচার করিয়াই আমরা চলি এবং কালের ছাপ মাপিয়া আমরা সব ভাব গ্রহণ করি। এইরূপে কালের গতিক্রমে বিস্মৃতির মেঘে জীবনের দ্যুতি আমাদের দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই পরিম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু কবি যিনি, তিনি কালজয়ী। তিনি তমের পরপারে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাদীপ্ত হিরণ্যবর্ণ পুরুষকে কাল আচ্ছন্ন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কাল-ব্যবধান তাঁহাকে সমধিক মহীয়ানই করিয়া থাকে এবং এমন মর্ত্য-জীবনের মহিমাকে অমৃতের ছন্দে চিন্ময়-গরিমায় মূর্ত করিয়া তোলে। কালের ব্যবধানে কবি সকলের অন্তরে অব্যবধান আত্মীয়তায় সমধিক জীবন্ত সত্তাতেই অধিষ্ঠিত হন। ২৫শে বৈশাখ এই সত্যেই আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। কে বলিবে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইয়াছি? তিনি এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তাঁহার প্রাণময় সাধনার সূত্রে দুরন্ত বীর্যে আমাদের জাতীয় জীবনে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই প্রেরণা সঞ্চার করিতেছেন। ২৫শে বৈশাখের পুণ্যতিথিতে আমরা সেই অমরকবি— আমাদের সঙ্কট-পথের জ্যোতির্ময় রবিকে বন্দনা করিতেছি।
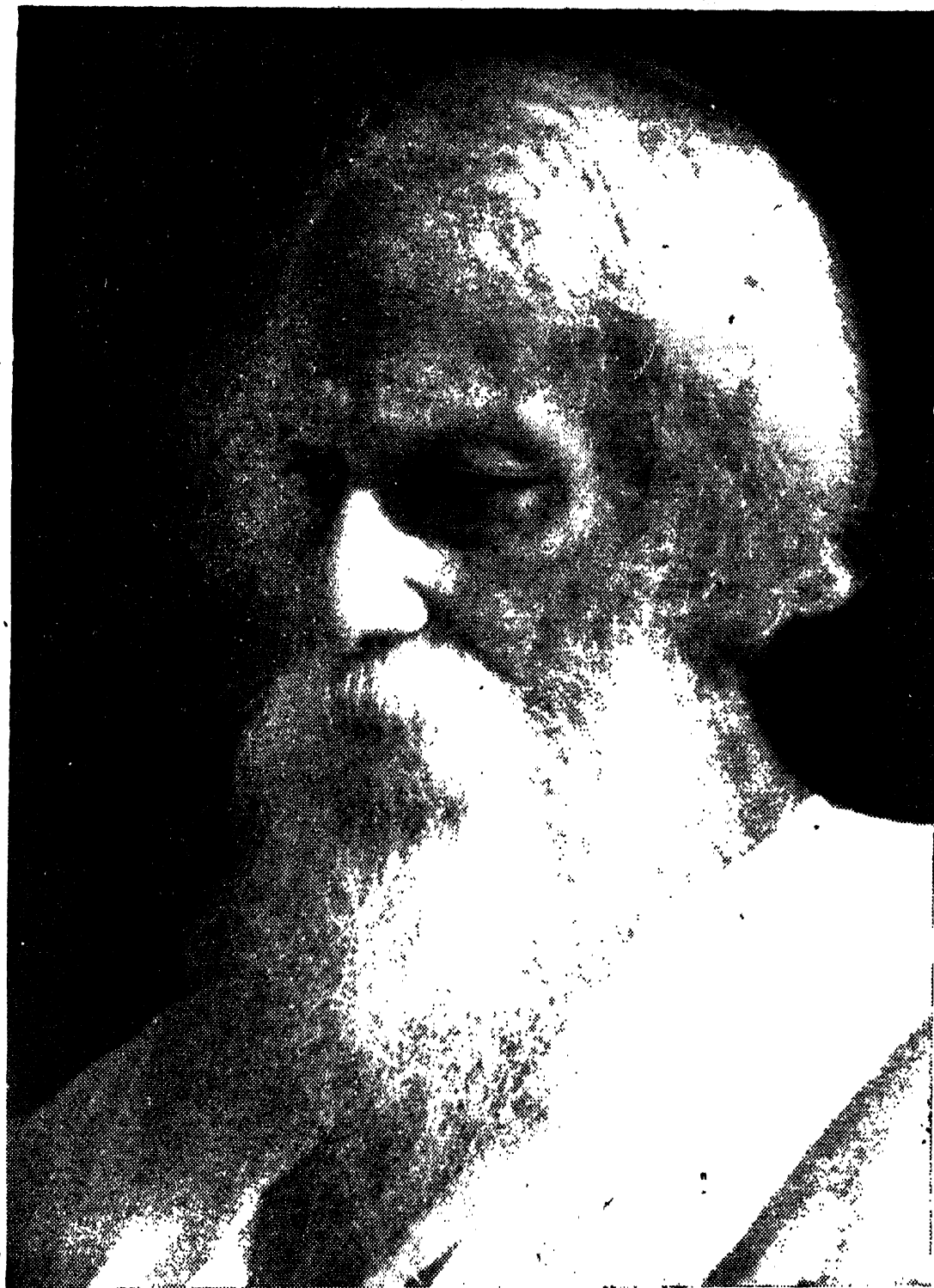
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলা

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখিত

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন

দীর্ঘকাল পরে অদ্য মহারাজের প্রীতিস্নিগ্ধ পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। গতকল্য মহারাজের ঠিকানায় একখানি কাহিনী[১] পাঠাইয়াছি—আশা করিতেছি তাহা মহারাজের কথঞ্চিৎ প্রীতিকর হইতে পারে। কাব্যের গুণে যদি বা না হয়, ত' ঔদার্যগুণে।

সম্প্রতি এখানে ওলাউঠা, প্লেগ এমনকি, গ্রীষ্মেরও উপদ্রব না থাকাতে নিতান্ত চাঞ্চল্যবিহীন শান্তভাবে দিনপাত করিতেছি, এইজন্য মহারাজের নিকট প্রার্থনা মহিম ঠাকুরকে[২] একবার পাঠাইয়া দিয়া কিছুকালের জন্য আমাদিগকে সজাগ সচঞ্চল করিয়া তুলিবেন। ত্রিপুরায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—গল্প আলোচনায় তাহার কথঞ্চিৎ রসাস্বাদনের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

এবারে ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় সর্বদাই মহারাজের গুণগান করিতেছেন, এবং তিনি মহিম ঠাকুরেরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইতি ১৪ই পৌষ ১৩০৬

গুণানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃৎ ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। স্কুলের বন্দোবস্ত লইয়াও অনেক সময় গেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা করা যাইতেছে। কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্যাল্ সায়ান্সে এম্ এ পাস করা একটি সুযোগ্য লোক পাওয়া গেছে তিনি নানাপ্রকার শিল্পকার্যেও দক্ষ। তাঁহার অধীনে ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা ও আমাদের জন্য একটি ছোটখাট Workshop খোলা যাইবে।

হেস্‌কে[৩] দুই সপ্তাহ বাড়ি ছাড়িবার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। আমার পত্র পাইয়াই, কবে তাহাকে বাড়ি খালি করিতে হইবে দিন স্থির করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়ো—তাহা হইলে বেচারা আগে হইতে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

মহারাজকে শান্তিনিকেতনের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি—আশা করি তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পিতাঠাকুর রাজকুমারের আগমন সঙ্কল্পে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিতকাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁহার আশঙ্কা। এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান। মহারাজ তাঁহার এই কাজে আত্মীয়ভাবে যোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

জগদীশবাবুর[৪] সেই টাকাটা সুরেনকে[৫] ১৯নং স্টোর রোড্ বালিগঞ্জের ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়ো। সে বিলাতে যথাস্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এই কাজে তোমরা অনবধানবশত দেরি করিয়ো না। যত সময় যাইবে ততই জগদীশবাবু বিপন্ন হইবেন এবং তাঁহার কার্যে ব্যাঘাত হইবে।

আমি আজ এখনই বোলপুরে রওনা হইতেছি। সকালের প্যাসেঞ্জারে ছাড়িব। এখন ভোর সাড়ে চারটে। আলো জ্বালিয়া তোমাকে লিখিতেছি, তুমি এতক্ষণে শয়নাগারের ভিত্তি কম্পান্বিত করিয়া তুলিয়াছ। তোমার সেই লেখা অবিলম্বে পাঠাইয়ো—প্রেসে লেখা দিবার সময় আসিয়াছে। তোমার হারা ক্যামেরা পাইয়াছ ত! হারানই উচিত ছিল। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র ত্রিপুরার সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

প্রবাসের পালা[৬] শেষ করে আবার আমাদের সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বল্‌তে পারিনে। দেশে বিদেশে সম্মান সম্বর্ধনা ত অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছুই লাগে না। আশ্রম জননীর স্তন্যধারায় যে কি অমৃত ক্ষরণ হয় সে কথা দূরে থাকতে মাঝে মাঝে ভুলে যাই—সেখানকার কারখানা ঘরের কৃত্রিম তৈরি কেমিক্যাল ফুড খেয়ে মনে হয় আর কিছুর বুঝি কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজন যে কত সুগভীর তা এখানে এলে তখনি বোঝা যায়—মনে হয় বেঁচে গেলুম বেঁচে গেলুম।

এখন বিদ্যালয়ের ছুটি—ছেলেরা সবাই বাড়ি গেছে কেবল এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেরা এবং পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে আছে। আমি সম্মানের তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে এখানে নির্জনে আশ্রয় নিয়েছি। এখন পূজার ছুটি বলে আপাতত অনেক উৎপাত থেকে রক্ষা পেয়েছি কিন্তু শুনতে পাচ্চি ছুটির পরে নবেম্বর মাসে আমাকে সং সাজিয়ে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং চাঁদা আদায় চল্‌চে[৭]—সুতরাং নবেম্বরের কয়েকদিন পূর্বেই আমাকে বাঙলা দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে। আজকাল বাঙলা দেশের বাইরেও আমার পক্ষে নিরাপদ স্থান নেই, মনে করচি হরিদ্বারের কাছে আর্যসমাজীদের যে গুরুকুল আছে সেইখানে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস যাপন করে আসব।

তোকে আর কি বলব তুই তোর শিক্ষা সমাধা করে আয়, বড় হয়ে আয় পূর্ণ হয়ে আয়, বিশ্বপৃথিবীর আশীর্বাদ নিয়ে আয়—ঐশ্বর্য আড়ম্বরের মোহ তোকে না ধরে, বিলাসের প্রলোভন তোকে না ভোলায়, জনতা আবর্তের টানের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে তোর আপনাকে যেন একেবারে তলিয়ে না দিস্। ইতি ২৩শে আশ্বিন ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোর কাজকর্মের কথা শুনে খুব খুসি হলুম। দেখা হ'লে আরও খুসি হব। বিদেশে এক রকম সম্মানের সঙ্গে কাটিয়ে এলুম—দেশে বোধ হয় মান রক্ষা হবে না—নানা ভাবের বাঁকা কথা এখন থেকেই শোনা যাচ্চে। সে কথাগুলো বিশেষ শ্রুতিমধুর বলে বোধ হচ্চে না। তোর বাবাকে[৮] আমার সাদর সম্ভাষণ জানাস। ইতি ৯ই শ্রাবণ ১৩২৭

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১। এই গ্রন্থ রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।
২। "কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর এক সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের কর্ণধার ছিলেন।"
৩। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শশিকুমার হেস।
৪। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ত্রিপুরেশ্বরের নিকট হইতে জগদীশচন্দ্র বহুবিধ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রবাসীতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।
৫। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। ১৯১২-১৩ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রবাস।
৭। তখনও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কথা ঘোষিত হয় নাই।
৮। কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খাঁচার পাখীর দেশে মুক্ত বিহঙ্গের জন্ম বিধাতার নানা পরিহাসের মধ্যে বোধ হয় নিষ্ঠুরতম পরিহাস। সকল মহামানবের আবির্ভাবের মধ্যেই এই পরিহাস নিহিত থাকে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী—ভারতের এ যুগের এই দুই ক্ষণজন্মা পুরুষের কথা আলোচনা করলে এই সত্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা হয়তো অধিকতর সত্য। গান্ধীজীর চিন্তার ভাষা তবু যেন এ-লোকের, তাতে অন্ন-বস্ত্রের স্থূল সমস্যার জবাব মেলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাকি একেবারেই অন্য-লোকের! ফলে, কেউ ভক্তিভরে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলে, উনি হলেন কবি, ও'র ভাষা আমরা বুঝব কি? আর একদল সমাজ-বিজ্ঞানী সেজে বলে, ও'র চিন্তা বুর্জোয়া-জগতের, দেবতাদের কাজে লাগতেও পারে, সর্বহারাদের নয়! সত্যের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করার এই অন্ধ প্রয়াস যতই পরিহাসজনক হোক, তরুণ মনে এর ক্ষতচিহ্ন সহজে মেটে না। পরের হাতের পুতুল সেজে উৎসাহের সরল আবেগে তারা পরস্পরকে ব্যথা দেয় এবং ব্যথা পায়। অব্যর্থ কালের প্রবাহে যেদিন উৎসাহে ভাঁটা পড়ে, শান্ত বুদ্ধির বিচারে জীবনে তখন জোড়া-তালির দিন আসে—তখন হয়তো বা নিজেদের মধ্যে হাতে হাত মেলাবার ইচ্ছা জাগে কিন্তু দেখা যায় শক্তি লোপ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী! এ যুগের দুটি মুক্ত বিহঙ্গ। কত ভিন্ন ধরণের প্রতিভা অথচ কী গূঢ় ঐক্য দু'য়ের মধ্যে। খাঁচার রাজ্যে, সীমা-ঘেরা বুদ্ধির রাজ্যে একদিন কত ভুল বোঝাবুঝি গেছে এ'দের নিয়ে। এ'দের দু'জনার চিন্তার তথাকথিত বৈপরীত্যই তৎকালীন চেলাদের মধ্যে সেদিন বিভেদ ঘটিয়েছিল। মুক্তপাখার আকর্ষণে এ'রা নিজে কিন্তু সব বাধা উজিয়ে এগিয়ে এলেন, পরস্পরের নিঃসঙ্গ জীবনে সন্ধান পেলেন দোসর জনার। একে অন্যের অসমাপ্তিটুকু পূরণ করে মূর্ত ক'রে তুললেন ভারতের বর্তমান যুগ-মানসটিকে। আজ মনে হয়, ভারত-প্রতীক এই দুই মহামানব—এ'রা যেন একে দুই, দু'য়ে এক। কোনো অর্থহীন হে'য়ালি সৃষ্টি করার জন্যে বলছি না, অন্তরের গভীরে শান্ত বিশ্লেষণে বিচার করলে আভাসে উপলব্ধি করা যায় এ'দের ঐক্য। ভারতের পূর্ব প্রান্তে মুক্তির যে নূতন সুর রবিকররাগে প্রথম উন্মীলিত হয়ে একদিন প্রাণের ছন্দে নিজেকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ত্যাগ ও কর্মের মোহন-ছন্দে সেই সুর অবশেষে লাভ করল জীবনের সংগীত মহিমা। কবি গাইলেন:—

"হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।

* * * * *

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়!"

বাঙলার কবির মানসপটে ভাবের যে আভাস ফুটে উঠল, গুর্জর দেশের কর্মী তাপস কর্মের ভাষায় তাকে অচিরেই রূপ দিলেন ভারতব্যেপে। যে-টুকু তুচ্ছ অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল, তা ভাব ও ভাষার মধ্যের চিরন্তন অসম্পূর্ণতা, অনিবার্য বলেই তার বেদনা এত গভীর, এত রহস্যময়।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দিনে অন্যান্য নানা সৌভাগ্যের মধ্যে এই পরম সৌভাগ্যের কথা এবার বিশেষ করে মনে হচ্ছে যে, আমাদের জাতীয়-জীবনের এই বিরাট মহাকাব্য রচনার দিনে আমরা জন্মলাভ করেছিলাম। পলে পলে আমাদেরই চোখের সামনে গড়ে উঠেছে ভারতের বুকে জুড়ে এই জীবনকাব্য, অক্ষরের পর অক্ষর লিখে, পংক্তির পর পংক্তি সাজিয়ে। কখনো দেখেছি সে রচনায় সহজ প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত বেগ, কখনো দেখেছি প্রাণপণ সংযমে কত অপরিহার্য সংশোধন ও পরিমার্জন। পরম হতভাগ্য সেই মূঢ় যে এই কাব্যের পাতায় কালির আঁচড়ের কাটাকুটিটুকুই কেবল দেখল, তার সার্থক ছন্দটি কান পেতে শুনল না।

ভারতের রাষ্ট্র-আন্দোলনের অতি-প্রত্যূষ-লগ্নে যখন কাঙালবৃত্তি সম্বল করে সকলে 'আবেদন নিবেদনের থালা' বইতে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর 'সাধনা' পত্রিকায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভাবী গুরুর যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তার মধ্যে জাতীয় কবির উপযুক্ত দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাই। সেদিন পাঠকদের কানে যা হয়তো কবির কল্পনাবিলাস বা নিষ্ফল দুরাকাঙ্ক্ষা বলে মনে হয়েছিল, ভারতের ভাগ্যাকাশে অদৃশ্য অন্তরালে সেই অঘটন তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল সত্যের আলোকে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবার আগ্রহে। ভারতবাসী একদা সচকিত হয়ে শুনল:

"......আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকে খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে, সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চির-পরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন।"

কবির এ স্বপ্ন সুদূর ১৩০০ সালের স্বপ্ন, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন শতাব্দীর ঊষা-স্বপ্ন। এই একই বৎসরে ইংরেজি ১৮৯৩ সালে, গান্ধীজী ভারত ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম পদার্পণ করেন। আজ মনে হয়, চব্বিশ বছরের অখ্যাত সেই তরুণ যুবার মধ্যে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ভারতের কবির বাণীটিকে সফল করে তোলার আয়োজন সেদিনই শুরু করেছিলেন ভারতের জনগণের দৃষ্টির অলক্ষ্যে। আমাদের মন আজ বলে, গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকা বাস ভারতের ভাবী জননায়কের কবিকল্পিত 'খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাসের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। এই দক্ষিণ আফ্রিকা পর্বই গান্ধী-জীবনে উদ্‌যোগ পর্বের অজ্ঞাতবাস তথা 'আত্মনির্মাণের পর্ব'।

এই আত্মনির্মাণের অতি বিস্ময়কর ইতিহাস আজ আর কারোর অবিদিত নেই। গান্ধীজী নিজেই সে ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর নিজের ভাষায়। সংক্ষেপে তাঁরই ভাষায় শোনা যাক:

Brahmacharya, which I had been observing willy-nilly, since 1900, was sealed with a vow in the middle of 1906. Events were so shaping themselves... as to make this self-purification on my part a preliminary as it were to Satyagraha. I can now see that all the principal events of my life, culminating in the vow of **brahmacharya**, were *secretly preparing me for it.*

ইং ১৯০৭—০৮ সালের "Passive Resistance Movement" বা সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ফলে আফ্রিকায় গান্ধীজী প্রথম কারাবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় "ধনঞ্জয় বৈরাগী"র জন্ম এরই সমসাময়িক; তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক প্রকাশিত হয় ১৩১৬ [ইং ১৯০৯] সালের বৈশাখে। ভারতের যুগ-মানস সমগ্র দেশবাসীর, এমন কি এই দুই মহামানবের নিজেদেরও অলক্ষ্যে ভাবের এক অখণ্ড পরিপূর্ণতায় এবং কর্মের বলিষ্ঠ প্রেরণায় ভারত মহাসাগরের দুই প্রান্তে অনিবার্য বেগে পরিণতি লাভ করছিল। দুজনেরই কী অটল নিষ্ঠা ধর্মের প্রতি। সে ধর্ম সংকীর্ণ সংস্কারগত মৃতের ধর্ম নয়, সে ধর্ম একাধারে প্রেম ও শান্তির অক্ষয় অমৃত উৎস। ঐশী প্রেরণার দুর্লভ এই শুভ পরিণয়ে স্থান বা কালের কোনো ব্যবধানই ব্যবধান নয়। সেদিনের সংগ্রামে গান্ধীজী তাঁর সংগীদের যা বলেছিলেন, তার সংগে ধনঞ্জয়ের উক্তির মূল ভাবটি তুলনা করলে চমৎকৃত হতে হয়। এ তো কোনো সুচতুর রাষ্ট্রনৈতিক তার্কিকের বাক্-জাল মাত্র নয়, এ যে সত্যতপস্বী নির্ভীক বীরের হৃদয়-নিঙড়োনো বাণী।

(১)
No matter what may be said, I will always repeat that it is a struggle for religious liberty. By religion, I do not mean formal religion, or customary religion, but that religion which underlies all religion, which brings us face to face with our Maker. If you cease to be men, if, on taking a deliberate vow, you break that vow,....you undoubtedly forsake God. To repeat again the words of the Jew of Nazareth, those who would follow God have to leave the world, and I call upon my countrymen, in this particular instance, to leave the world and cling to God, as a child clings to its mother's breast.—An Indian Patriot in South Africa by Joseph J. Doke, p. 7]

[(২) ৩নং প্রজা॥ বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কি বলব?

ধনঞ্জয়॥ বলব, আমরা খাজনা দেব না।

৩নং প্রজা॥ যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়॥ বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪নং প্রজা॥ বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়॥ তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

৫নং প্রজা॥ ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়॥ দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

[**প্রায়শ্চিত্ত; দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য**]

রাজনীতির রাজ্যে এ এক সৃষ্টি-ছাড়া

ভাষা, পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা কদাচিৎ মেলে; অথচ শাসক-শাসিত উভয়পক্ষই এ ভাষার প্রাণশক্তিকে অবহেলা করার সাহস রাখে না। এর প্রেরণায় আঘাত পড়ে গিয়ে সমস্ত মিথ্যার মূলে; দলপদ্ধতিতে এ বাণীর সার্থকতা নয়, এ বাণীর মৃত্যুও তাই দলের ক্ষয়েতে হয় না।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর কল্পনা আগে না গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আগে, এমন মিথ্যা তর্কের মতো মূঢ়তা আর কি হতে পারে জানি না। দুটি ভিন্ন ধারা অবলম্বন করে একই স্বদেশ-আত্মার এই যে আশ্চর্য বিকাশ, এর সমগ্র মূর্তিটাই হল ঐতিহাসিক সত্য; চুল-চেরা তথ্য বিচারে সেই সত্যদৃষ্টিটি হারালে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি। নিরস্ত্র ভারতের যুগান্তের মূক বেদনা সেদিন কথা কয়ে উঠেছিল তার এই দুই সন্তানের মধ্যে, এইটিই সবচেয়ে স্মরণীয় কথা।

অবশেষে সেই সাধক তপস্বী অবতীর্ণ হলেন ভারতের বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এতদিন সে আন্দোলন ছিল বহির্মুখী। দেশের জনগণের অন্তর্লোকে তার দৃষ্টি তখনো পেঁছয় নি। কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল সেদিনের সেই তপস্বী বীরকে, বিশেষ করে 'স্বদেশী আন্দোলনের' বেদনায় উদ্বুদ্ধ এই বাঙলার কাছে। ১৯১৯ সালের এপ্রিলে মহাত্মাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কিয়দংশ এণ্ড্রুজ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'Mahatma Gandhi's Ideas' গ্রন্থে (পৃ ২৫২—৫৩)। কী অপরিসীম আগ্রহ এবং তজ্জনিত উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে চিঠিখানিতে! নৈবেদ্যের দুটি কবিতার অনুবাদও সেই সঙ্গে তিনি পাঠিয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মার সাক্ষাৎ পরিচয় শান্তিনিকেতন আশ্রমেই হয়েছিল। কবির উদ্বেগের অবধি ছিল না, পাছে তাঁর এতদিনের স্বপ্ন যায় ভেঙে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নানা পরখের মধ্য দিয়ে ক্রমে একদিন দুজনে পরস্পরকে চিনে নিলেন। সি এফ এণ্ড্রুজ এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা শোনবার মতোঃ

The Poet's belief in soul-force has always been fundamental. It colours all his own poems and his own personal outlook upon human life. But whenever the popular methods appeared to him to diverge from that high standard, he became pained and immediately expressed himself in writing.

ভাবের যে অবিস্মরণীয় আদান-প্রদান হয়েছিল এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মার মধ্যে, কে বলতে পারে, হয়তো সেই পরখ তাঁদের নিজেদেরকেই নিজের চোখে পূর্ণতর এবং স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। সেদিন রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাকে বারে বারেই উন্নততর চিন্তা ও উদারতর বাণীর প্রতি নিয়ত উদ্বোধিত করে মহাত্মা তথা সমগ্র ভারতবাসীকে অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী করে রেখে গেছেন। মহাত্মাও বিশ্বকবির তৎকালীন প্রবল বিশ্বমুখীনতাকে ভারতের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যোগযুক্ত রাখতে প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন। পরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,—কেবলমাত্র সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'! এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?"

১৯২১ সালের প্রবল উত্তেজনার মুখে কতখানি দুঃসাহস এবং কী বেদনা নিয়ে এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা আজ বুঝতে পারি, যখন দেখি সেদিনের সেই চরখা গান্ধীবাদীদের আধুনিক পরিণত দৃষ্টিতে "এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনধারার প্রতীক। সেই জীবনধারার সঙ্গে বিজ্ঞান, এমন কি কল-কব্জার অনিবার্য বিরোধ নাই।"

গান্ধীজী অনতিবিলম্বেই 'শান্তিনিকেতনের কবিকে ("Bard of Santiniketan") তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আশ্বাস দিলেনঃ

Nor is the scheme of non-co-operation or Swadeshi an exclusive doctrine. My modesty has prevented me from declaring from the house-top that the message of non-co-operation, non-violence and Swadeshi is a message to the world. It must fall flat if it does not bear fruit in the soil where it has been delivered.

এই বিচার বিতর্কের বুকে বসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে সমগ্র দেশবাসীর সমক্ষে মহাত্মাকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করে উদাত্ত কণ্ঠে বললেনঃ

"মহাত্মা তাঁর সত্য প্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কংগ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিক্যাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারিনে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।"

প্রত্যুত্তরে মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথকে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেদিন গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেনঃ

I regard the Poet as a Sentinal warning us against the approach of enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Ignorance, and other members of that brood.

কী প্রবল আত্মস্বতন্ত্রতা অথচ কত গভীর আত্মীক যোগ এই দুই মহামানবের মধ্যে—ভারতের ভাগ্যাকাশে দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের চিরভাস্বর এই লীলা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের, একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। শান্তিনিকেতনের কর্মীদের সঙ্গে গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে আলোচনা প্রসঙ্গে অতি মূল্যবান একটি কথা মহাত্মাজী বলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তথা গান্ধীজী—উভয় পক্ষের ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই আলোকে এঁদের দুজনের সাহিত্যকে নূতন করে পাঠ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে না পেয়ে যাঁরা হয়রাণ তাঁদের দিকে ফিরে সেদিন তিনি অট্টহাস্যে বলেছিলেনঃ

It is a reflection both on Gurudev and myself.

তারপর দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেনঃ

I have found no real conflict between us. I started with a disposition to detect a conflict between Gurudev and myself but ended with the glorious discovery that there was none.—Viswa-Bharati News; 1946 February.

রবীন্দ্র প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেরাদুন জেল থেকে এক পত্রে এই দুই ভারতপ্রতীকের ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে অতি সুন্দর ইঙ্গিত করেছিলেন (Viswa-Bharati Quarterly, Vol. VII Part III):

Again I think of the richness of India's age-long cultural genius which can throw up in the same generation's two such master-types, typical of her in every way, yet representing different aspects of her many-sided personality.

সাম্প্রতিকতার কুয়াশায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, এই দুই মহামানবের ঐক্যরূপটি আজো তাই সর্বদা সুস্পষ্ট নয় আমাদের সামনে। নূতন-বিচারের দূর-দৃষ্টিতে সে কুয়াশা নিশ্চয় কাটবে, কিন্তু তার পূর্বে এই দুই চিন্তানায়কের মতামত সম্বন্ধে তুলনামূলক বিশদ আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাঙলার বাইরে এ ধরণের আলোচনা আজো উল্লেখযোগ্যভাবে কোথাও আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঙলাদেশেও এ আলোচনা আশানুরূপ হয়নি। বাঙলার বাইরে আলোচনা আরম্ভ না হবার প্রধান একটি কারণ মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের সামাজিক, রাষ্ট্র-

নৈতিক তথা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কোনো সুসম্পন্ন ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ আজো মুদ্রিত হয়নি। যা-কিছু প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে তার অধিকাংশই এখনো Mordern Review বা Visva-Bharati Quarterly পত্রিকার মধ্যে লুপ্তপ্রায়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আন্দোলন সম্পর্কে লেখা এক গ্রন্থে বাঙলার বাইরের কোনো লেখকের দুর্বল ঐতিহাসিকতার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" (ইং ১৮৯২) প্রবন্ধের অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করতে হয়েছে Visva-Bharati Quarterly (Vol xi Part III) পত্রের গত সংখ্যায়। প্রাথমিক তথ্য আহরণের পথেই যদি এ ধরণের বাধা থাকে তবে আলোচনা সুগম হবে কেমন করে! যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তায় রবীন্দ্র-গান্ধী আলোচনার সে-পথ অচিরে সুগম হোক, রবীন্দ্রজন্মোৎসবের শুভলগ্নে সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনা করি।

শান্তিনিকেতন তীর্থে পণ্ডিত জওহরলাল

[গত ৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতি তাঁহার প্রাণের টানে তিনি আসাম সফর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য। তাঁহার ভাষণে তাঁহার সেই আন্তরিকতা গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সম্পূর্ণ ভাষণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।]

তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি বাংলাদেশে এসেছি। ইতিমধ্যে আমাকে আসামে যেতে হয়েছিল। এই তিন সপ্তাহ অনবরত অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে শান্তি কাকে বলে অনুভব করার অবসরও পাইনি। গত রাত্রিতে ১টার সময়ে এখানে পৌঁছানোর পরই আমি অনেকদিন পরে প্রথম শান্তি ও স্বস্তি পেলাম। বাকি সংক্ষিপ্ত রাত্রিটুকুই আমার দেহ-মনকে বিশ্রাম ও নূতন শক্তি দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। এ কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কতখানি আরামের স্থান তা এর থেকে পরিস্ফুট হয়। আজ প্রভাতে নানা স্মৃতির ছবি মনে জেগে উঠেছে—গুরুদেবের স্মৃতি, পূর্বে-পূর্বেবার যখন এখানে এসেছি তার স্মৃতি। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের ও বিশ্ব-ভারতীর পরিপূর্ণ নিহিতার্থ সম্বন্ধে নানা চিন্তাই আমার মনে জেগেছে।

বর্তমান যুগে আমাদের জীবনে যত প্রশ্ন ও সমস্যা জেগেছে সে সকলের সমাধান এখানে হওয়া সম্ভব নয় তা ঠিক; কিন্তু আজকের দিনে ভারতের শুধু ভারতের কেন সারা জগতের. যে সব প্রধান প্রধান সমস্যা তার কতকগুলির সমাধানের চেষ্টা এখানে অবশ্যই হয়; সেটুকুও কম কথা নয়। সে সকল সমস্যা যে কি কি সে কথা নিয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে; তবে আমি আজ তিনটি সমস্যার কথা বলব; সে তিনটিকে নিশ্চয়ই সকলেই আজকালকার দিনের বিশেষ সমস্যা বলে স্বীকার করবেন।

এ যুগের সর্বপ্রধান প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত? আজকালকার দিনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জাতীয়তার সঙ্গে যদি কোনও উদারতার ভাব সংযুক্ত না থাকে তবে নিছক জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণই বটে। একথাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে জাতীয়তা না থাকলে আমাদের সমস্ত সত্তাই হয়

মূলহীন। আবার আন্তর্জাতিকতাও আজকের দিনে কেবল যে ভাল তা নয়. নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা যদি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট বন্ধনে বাঁধা না থাকে তবে তা শীঘ্রই অনির্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যাবে। এই দুটি ভাব-ধারাকে মিলিয়ে দুইয়ের মধ্যে যে আপাতদ্বন্দ্ব রয়েছে তা মিটিয়ে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা।

বহুকাল ধরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে ও বেড়ে চলেছে; কারণ আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ-স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা নিহিত রয়েছে। দ্রুতগামী যানবাহনাদির আবিষ্কার ও প্রবর্তন হওয়ায় দেশ-দেশান্তরে যাবার সুবিধা হয়েছে; তা ছাড়াও আমাদের ঘিরে প্রতিদিনই নূতন নূতন এমন সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়ে চলেছে যাতে দেশকালের ব্যবধান ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাতেও মানুষের মনে একথা জাগিয়ে দিচ্ছে যে মানুষের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আন্তর্জাতিকতাই তার স্থান গ্রহণ করছে। জগতের সর্বহারাদের মধ্যেই আমরা বিশেষভাবে আন্তর্জাতিকতার নানাভাবের বিকাশ দেখতে পাই। অন্য এক দিকেও আন্তর্জাতিকতা দিন দিন নিঃশব্দে বেড়ে চলেছে, অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। তা ছাড়াও আন্তর্জাতিকতার বিকাশ খণ্ড খণ্ডরূপে নানাভাবে আমাদের কাছে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, যেমন রেডিও যন্ত্র ও সিনেমা যন্ত্র প্রভৃতির প্রসারের দ্বারা, বা বিনিময় ও বাণিজ্যের নানা নূতন ধারা প্রবর্তনের দ্বারা।

সুতরাং মানুষ একথা ভাবতে শিখেছে যে আন্তর্জাতিকতা দ্বারাই ভাবী যুগের চিন্তা-ধারা প্রধানতঃ পরিচালিত হবে। কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে তা ঠিক; তবুও যখনই মানুষের সামাজিক জীবনে সংকটের কাল উপস্থিত হয়েছে জাতীয়তার ভাবের দ্বারাই কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী দেখে সর্বাগ্রে এই কথাই আমাদের মনে উদিত হয় যে মানুষের মনে যখনই গভীর বেদনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মানুষ আন্তর্জাতিকতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গভীর জাতীয় অনুপ্রাণনার দ্বারাই পরিচালিত হয়। যতগুলি রাষ্ট্র এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে আপন আপন ভাগ্যকে সংকটাপন্ন করেছিল প্রত্যেকটিই জাতীয় অনুপ্রাণনার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেছে। এমন কি যে দেশের জনগণ সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাবের ভাবুক ছিল এবং ভাবত যে পৃথিবীময় অত্যাচারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে সারা জগতের শ্রমিক দল একতাবদ্ধ হয়ে লড়বে. তারাই বোধ হয় জাতীয়তার ভাবে সব চেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

সুতরাং, আমার মনে হয় যে আজকের দিনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে এই দুটি ভাবধারার সামঞ্জস্যবিধান করা। মানবহৃদয়ের গভীর তলদেশে জাতীয় ভাবের বীজ উপ্ত আছে, একে উৎপাটিত করতে হলে আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের যে দৃঢ়মূল যোগ-বন্ধন রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে; আমাদের জাতির সমগ্র অতীতকে ভুলতে হবে। সে তো অসম্ভব সাধনের চেষ্টা। সে না করে কি চলে না? জাতীয়তা ও আন্ত-র্জাতিকতা এ দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা হবে কেন? এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কি সম্ভব নয়? এই বৃহৎ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা শান্তিনিকেতনের জীবনধারায় দেখতে পাই। হয়তো এর যথার্থ পথ আপনারা এখনও দেখতেও পাননি, অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন; কিন্তু আপনারা যে ঠিক পথটি পাবার উদ্দেশ্যে ফিরছেন এবং হয়তো কতকটা পেয়েওছেন এইটেই হল আসল কথা। সেই-টুকুই আপনাদের মস্ত বড় কীর্তি।

এ যুগের দ্বিতীয় সমস্যাটির কথা এবার বলব। পুরাতন ও নূতনের মিলনসাধন ও একীকরণের উপায় কি? আমরা পুরাতনকে ও অতীতকে ছাড়তে পারি না। সে আমাদেরই জিনিস, আমাদের গৌরবের জিনিস। অথচ আমরা বর্তমান যুগে বাস করছি, এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি। অতীতকে ভিত্তি করেই বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে; অতীতকে বাদ দিলে বর্তমান শূন্যে-ঝোলা বস্তুর মত অসাড় হয়ে পড়ে; কিন্তু অতীতই তো সব নয়। এ জগতের অন্য সব কিছুর মতই মানুষের জীবনধারাও দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে মানুষের মন বাইরের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। প্রায় সর্বদাই সে পিছনে পড়ে থাকে এবং ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে স্থাণু হয়ে পড়ে থাকে। হয়তো এই কারণেই নূতন ও পুরাতনে মিল হয় না, এবং আজকের দিনের অনেক সমস্যাই এই কারণ থেকেই উদ্ভূত। অতীতের গৌরবের বস্তু ও মূল্যবান সারবান বস্তুসমূহকে আমরা অবশ্যই ধরে থাকব; কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের পরিবর্তনধারাকে হৃদয়ঙ্গম করে নিজেদের তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতেও হবে। ভারতবর্ষ ও চীনের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার ধারা এক দিকে যেমন আমাদের উৎসাহদীপ্ত করে তোলে, আবার পশ্চাতে টেনেও রাখে। সুতরাং অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

মানুষের বাইরের জীবন ও আন্তর্জীবনের সামঞ্জস্যসাধনও আজকের দিনের আরেকটি সমস্যা। এই সামঞ্জস্যের অভাবই অনেক সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যুগে আমাদের জীবনধারায় যেমন প্রশান্তভাবের অভাব হয়েছে এমন বোধ হয় আর কখনও হয়নি। বাইরের ব্যাপারে সামঞ্জস্য রক্ষা করে হয়তো আমরা চলতে পারি কিন্তু আজকালকার খুব অল্প লোকই নিজ অন্তরের শান্তি অক্ষুন্ন রেখে চলতে পারেন। বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্যসাধন না করতে পারলে আমাদের জীবনে প্রতিক্ষণেই বিভিন্ন জটিল মনোভাবের সংগ্রাম চলতে থাকবে।

শান্তিনিকেতনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মাল্যভূষিত করা হইতেছে

আমার মনে হয় বিশ্বভারতী এই সব সমস্যাকেই কোনও না কোনও উপায়ে সমাধান করার ভার নিয়েছেন। নিখুঁত ও সুন্দরভাবে এই সমাধানে পেঁছানো খুব দুঃসাধ্য, হয়তো বা অসাধ্যই। কিন্তু আমাদের দেশে এ জায়গাতেও অন্ততঃ এই সকল সমস্যা নিয়ে চিন্তা চলেছে ও সে সকলের সমাধানের চেষ্টা চলেছে—এই জ্ঞান আমাদের মনে আশা ও আনন্দ এনে দেয়। আপনারা কতটা সাফল্যলাভ করেছেন তা আপনাদেরই ভাববার কথা। তবে এই সব সমস্যার মীমাংসার পথ যাঁরা খুঁজছেন আপনারা তাঁদের অগ্রণী, শুধু অগ্রণী বললে সবটা বলা হয় না, আপনারাই এই কাজের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু এইটুকুই বিশ্ব-ভারতীকে সার্থকতার পথে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। গুরুদেবের প্রভাবের কথা কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, আশ্রম অন্তরে বাহিরে আজও গুরুদেবের দ্বারাই ভরে রয়েছে। সাড়ে তিন বৎসর আগে আমি শেষ-বারের মত এখানে এসেছিলাম। এবার দেখছি যে তারপর থেকে আশ্রম অনেক বেড়ে উঠেছে। আরও বৃদ্ধি এর হবে। আপনাদের তহবিল বেড়েছে; সুন্দর বাড়ি-ঘর সব তৈরী হয়েছে, চারিদিকে আপনাদের কার্যাবলী বিস্তার ও বিকাশ লাভ করেছে। এ খুব আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল প্রশ্ন এ নয় যে আপনাদের ঘর-দুয়ার বাড়ানো হয়েছে কিনা; আসল প্রশ্ন এই যে বিশ্বভারতী গুরুদেবের মনের যে আদর্শের প্রতীক ছিল, আজও সেই আদর্শ এখানে পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে আছে কিনা, এবং আশ্রমের জীবনধারা ও কার্যাবলীর মধ্যে সেই আদর্শই প্রাণধারার মত নিত্যপ্রবাহিত হচ্ছে কিনা। কোনও শক্তিমান ও প্রাণবান পুরুষ যখন গত হন তখন তাঁকে ঘিরে যারা ছিল তাদের পক্ষে তাঁর আদর্শ ও ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলা প্রায়শঃই কঠিন হয়ে পড়ে। তবে বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনেক সময়েই পরেও থেকে যায়; এবং বিশ্বভারতীর উপর গুরুদেবের প্রভাব যে যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হবে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

আমার কাছে শান্তিনিকেতন আমাদের দেশের বা বিদেশের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একটি বিকল্পমাত্র নয়। অনেক জায়গায়ই এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল অট্টালিকা ও অনেক বেশী বস্তুসম্ভার ও অর্থের প্রাচুর্য আছে। কিন্তু এর একটি নিজস্ব ভাব আছে, একটি স্বরূপ আছে। এই যে আম্রকুঞ্জে আপনাদের সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেছেন এর মধ্যে সেই স্বরূপটি স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্যান্য জায়গায় বিস্তৃত সভাগৃহে পাশ্চাত্যের হাস্যকর অনুকরণে সজ্জিত হয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে যে সমাবর্তন উৎসব হয় তার চেয়ে এ কত প্রাণবান ও সুন্দর। অল্পক্ষণের জন্যও এখানে এলে মনে সুন্দরভাব জাগে। বিশেষতঃ আমার মত মানুষ—যাকে সর্বক্ষণ এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হয় তার পক্ষে এখানে এলে বাস্তবিক উপকার হয়। এমন জীবনযাত্রা আমার বাঞ্ছিত নয় কিন্তু ভাগ্য যেন আমাকে এমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। তবু যখন ঝড়ের মেঘের মত আমাকে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়, চুপ করে থাকতে ইচ্ছে হলেও অনর্গল বাক্যজাল বিস্তার করতে হয়, তখন শান্তিনিকেতনের একটুখানি স্মৃতি আমার মনে শান্তির প্রলেপ দিয়ে যায়। রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যাপীড়িত আমার মন এখানে এসে যেন ছায়াসুশীতল মৃদুবায়ু হিল্লোলিত মরূদ্যানে প্রবেশ করে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জীবনে যাঁহাদিগের প্রভাবের বিষয় উত্তরকালে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের কথা বলিয়া গিয়াছেন বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। রাজনারায়ণবাবু একাধারে লেখক ও প্রচারক—শিক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি যে জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাহা ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এই বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী এবং হয়ত উভয়ের সেই জাতীয়তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উভয়েরই পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবু ৭০ বৎসরেরও অধিক পূর্বে "জাতীয় সভায়" বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাহা আনুপূর্বিক লিখিত হয় নাই; তাহার সারাংশ মাত্র তখন 'ন্যাশন্যাল পেপার' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। তাহার পরে ১৮৯৮ সালে ১৯শে বৈশাখ তিনি ঐ বিষয়ে মেদিনীপুরে এক বক্তৃতা করেন এবং ঐ বৎসর ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় 'বঙ্গভাষা' সমালোচনা সভার এক অধিবেশনে তাহা প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করেন। "সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।" সেই প্রবন্ধে রাজনারায়ণবাবু বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ—

"গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙলা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর কীর্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্তি কীর্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্তিস্থান অযোধ্যা প্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগ তীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের কীর্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙালী কবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জুনের গুণ-কীর্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙলা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙলা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর, কিন্তু বঙ্গপ্রকৃতি বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহা-কল্লোল-সমন্বিত বেগে সমুদ্রসমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনি বাঙলা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও তেজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?"

রাজনারায়ণবাবু বাঙলা কবিতার যে বিশাল ও ওজস্বী অবস্থার বিষয় কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার শিষ্যপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সৃষ্ট হইবে, তাহা প্রবন্ধ
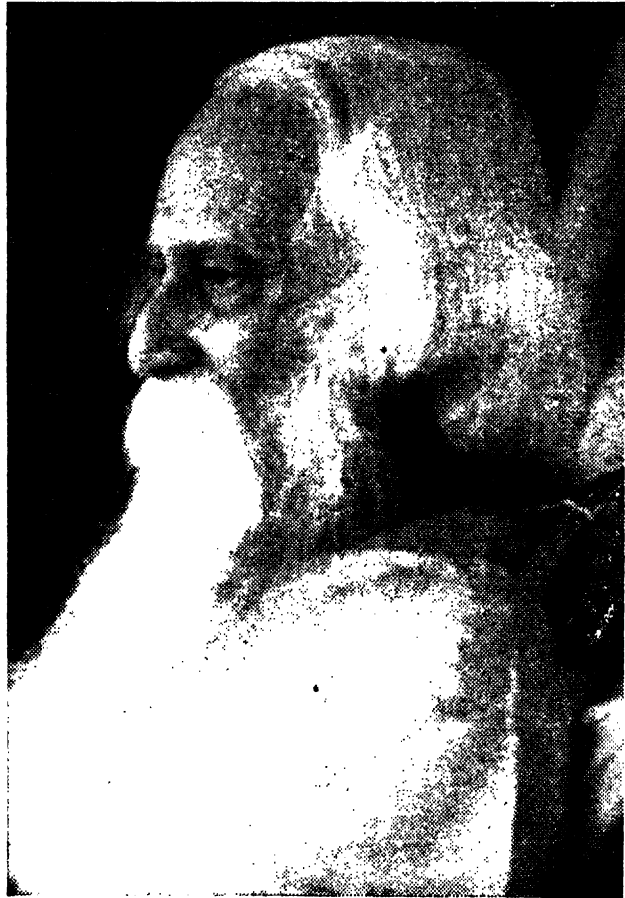
রচনাকালে তিনি মনে করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না।

কিন্তু তিনি যে সময়ে ঐ উক্তি করিতেছেন, তখন বালক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা সপ্রকাশ হইতেছে। তাহার কয় বৎসর পরে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। যে প্রবন্ধে তিনি ঐ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেন—"রবীন্দ্রবাবু যখন ক খ লিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ-দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখনও উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই।" কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেনঃ—

(১) "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন ও প্রশংসার পাত্র।"

(২) "তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙলার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্য যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙলা সাহিত্যে মূল্যবান সম্পদ হইয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথকে আজকাল যে অনেকে বিশ্ব-কবি বলিয়া থাকেন, তাহার কারণ—প্রয়াগ-তীর্থে যেমন গঙ্গা ও যমুনা সম্মিলিত হইয়াছে, তাঁহার রচনায় তেমনই সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত হইয়া অভিনবভাবে লোককে মুগ্ধ করিয়াছে—কেবল তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকেই মুগ্ধ করে নাই, বিদেশের সাহিত্য-রসিকরাও তাহাতে যে রস পাইয়াছেন, তাহা অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সেইজন্য তিনি সর্বত্র সমাদৃত। মোরাশ বোকাই বলিয়াছেন,—শিল্পীর কোন বিশেষ দেশ নাই। রবীন্দ্রনাথের মত কবির সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। তাঁহার রচনার দ্বারা তিনি একদিকে যেমন তাঁহার দেশবাসীকে বিদেশের ভাবের সহিত পরিচিত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই বিদেশীদিগকে তাঁহার স্বদেশের ভাবের সহিত পরিচিত করিয়াছেন—তাঁহার রচনায় তিনি বিশ্বের মানবসমাজকে এই ভাবের ভাবুক করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন।

যতদিন পৃথিবীর লোক "শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি রব" ঘৃণার্হ মনে করিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনা করিবে—যতদিন মানুষ মানুষদের আদর করিবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের রচনা সমাদৃত থাকিবে। তাঁহার রচনাসমূহ পৃথিবীর লোককে যে নূতন ভাব-রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে, তাহাতে মানুষের সকল ভাবক্ষুধা মিটিবে।

শেষ পৃষ্ঠা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিরাট শূন্যের বুকে বহুকাল প্রতীক্ষার শেষে
প্রাণের একান্তে এসে যে মুহূর্ত হোলো রূপায়িত,
বহুবার তীব্র হতাশায়
সে সব মুহূর্ত জানি ধীরে ধীরে ফিরে গেছে
কিছু দাগ এঁকে রেখে পৃথিবীর পটভূমিকায়।

তাদের যাত্রার সেই বিফল প্রবাহে
সহসা নামিল নাকি বাধাহীন দুরন্ত জোয়ার?—
মৃত্তিকার সুপ্ত প্রাণ ডেকেছে তাহাকে;—
রূপ রস অনুরাগ—কালের পৃষ্ঠায় মুছে যাওয়া—
নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেলো আমাদের পঁচিশে বৈশাখে।

এ তোমার জন্মতিথি! তবু চোখ জলে আসে ভরে,
তবু শুধু ম্লানমুখে রাত্রির প্রহর গুণে চলি।
জানি আজ পঁচিশে বৈশাখ!
আরো জানি—আমাদের ঘিরে আছো, ছেয়ে আছো তুমি,—
তবু যেন কোথা দিয়ে রয়ে গেছে কী বিরাট ফাঁক!

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

★ ★ ★ ★ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের দ্বন্দ্ব চিরকালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু ও নব্যহিন্দু আন্দোলনের নেতাদের মতামত লইয়া সমালোচনা এবং কখনো কখনো তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্লীলতা ও শালীনতার সীমানা ছাড়াইয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করেন নাই। কোন কোন রচনার মধ্যে সাময়িক উষ্মা বা চপলতা যে প্রকাশ পায় নাই. তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সেসব রচনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্থায়ী সাহিত্য সংগ্রহ হইতে নির্মমভাবে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর যেসব আক্রমণ সমালোচনার নামে সাময়িক সাহিত্যে চলিয়াছিল, তাহার পুরোভাগে ছিল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠে ও কড়া'—কড়ি ও কোমলের ব্যঙ্গ-অনুকৃতি। এই ধরণের ছোটো-বড়ো অনেক রচনা বাঙলা সাহিত্যে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে একটু সন্ধান করিলেই চোখে পড়িবে।১

মাসিক পত্রের মধ্যে প্রধানত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ও সাপ্তাহিকের মধ্যে 'বঙ্গবাসী' রবীন্দ্রনাথ ও বিশেষভাবে রবীন্দ্র ভক্ত ও অনুকারকদের উপর বহু বৎসর ধরিয়া নানাভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন এইসব সমালোচনার উত্তর দেন নাই। তবে বন্ধুবান্ধবরা সমবেদনাপূর্ণ পত্র লিখিলে সুখী হইতেন এবং তাঁহারা পত্রিকাদিতে 'বন্ধুকৃত্য' ২ করিলে যে খুশি হইবেন সে ইঙ্গিত তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল নানা অজুহাতে সমালোচকদের অহেতুকী আঘাতে জর্জরিত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে যিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বিশেষ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডি এল রায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিক মহলে পত্রিকার আপিস হইতে কলেজের হস্টেল পর্যন্ত সর্বত্র, লেখাপড়াজানা ভদ্রসমাজ যেন দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, দ্বিজুরায়ের দল ও রবি ঠাকুরের দল।

দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মতান্তর তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা সংক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষ যুগের মনোবৃত্তি ও রুচিবোধের ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। তাই ইহার সম্যক আলোচনা প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, রুচি ও নীতি রীতি ও ভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু নূতন নূতন সম্প্রদায় (School) গড়িয়াছে। এই শাশ্বত কারণেই লেখকদের মতান্তর অনেক সময়ই মনান্তরে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাগতিক ও অতিজাগতিক বিষয়ে দৃষ্টি-ভঙ্গির এমনই পার্থক্য ছিল যে, উভয়ের মধ্যে মত-সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্মুখী দৃষ্টি হইতে যে বিষয়কে উপমার উপর উপমা সংযোগে, তুলনার উপর তুলনাযোগে অতুলনীয় ভাষার ইন্দ্রজালে অনির্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি করিতেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই অত্যন্ত বাস্তবভাবে দেখিয়া, নিরলংকৃত স্পষ্টতায়, সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। শিক্ষাভিমান-হীন সরল হৃদয়ের মধ্যে অনায়াস উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবার অসামান্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল; সেইজন্যই প্রাকৃত জনের মনোহরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে আদর্শবাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া গড়িতেন, মরমিয়ার ভাষায় যাহাকে প্রাণস্পন্দিত করিতেন—তাহার উল্টা দিকের রূপটিকে বিদ্রূপিত (grotesque) করিয়া দেখাইতে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিধা হইত না। সুন্দরের পক্ষে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সম্মানের জন্য বাহিরের প্রসাধন আবশ্যক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সামান্য রচনাকে শুধু

প্রকাশ করিয়া খুশি হইতেন না, তাহাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অসামান্য শ্রম স্বীকার করিতেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্টবাদী, বাস্তবপন্থী; তাই তাঁহার প্রকাশধর্মে আবেগটাই বড়ো হইয়া উঠিত, রীতিটা নহে। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে ভাষা ছন্দ মিল বিষয়ে খুব বেশি হুঁশিয়ার হইয়া সাহিত্যের রাজপথে চলিবার প্রয়োজন ছিল না। সাধারণের সমক্ষে বাহির হইবার জন্য আটপহুরে সাজ পরিলেই চলে। কারণ fineness বা লালিত্য তাঁহার কাম্য ছিল না—স্পষ্ট কথা মোটা করিয়া বলিলে সকলেই বুঝিতে পারে—এইখানেই ছিল তাঁহার গর্ব। বাঙলা দেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের মন্থনে উঠিল সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার কথা; আরও কিছুকাল পরে সেইটি আসিয়া দাঁড়াইল বাস্তব সাহিত্যের সৃষ্টি-পরিকল্পনায়।

সংগীতে, কবিতায়, হাসির গানে নাটক-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান বঙ্গসাহিত্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে দুই বৎসরের কনিষ্ঠ; কিন্তু সাহিত্য-দরবারে তিনি প্রবেশ করেন অনেক পরে। বাঙলার সাহিত্য সমাজে

---

(১) দ্রঃ অমৃতলাল বসু প্রণীত 'বৌমা' (১৩০৩) প্রহসন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি কবিতা ও ভানু সিংহের পদালীর একটি গানের প্যারডি আছে। সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮২।

(২) প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৫—৭। পত্র—৭ই আষাঢ় ১৩০৬, পুনশ্চ—১০ই আষাঢ়।

দ্বিজেন্দ্রলালকে রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তাঁহার কাব্য ও গানকে তিনিই যে সমাদৃত করেন, তাহা দ্বিজেন্দ্র-চরিত পাঠকদের নিকট অজ্ঞাত নহে। পাঠ্যাবস্থায় তিনি 'আর্যগাথা'র যে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন, সে সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করিব না। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৬ সালের শেষ দিকে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন ও সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বিলাত হইতে ফিরিবার বেশ কয়েক বৎসর গত না হইলে তিনি বাঙলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ড কবিতা ও গানের সংগ্রহ। এই সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই এমন কথা বলা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য খুব ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং উদার-ভাবে তাঁহার ভাব ও ভাষা নিজ রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'আর্যগাথা'র অধিকাংশই গান, তবে কবিতাও আছে। প্রেমের কবিতা ও বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবিতাই বেশি। এছাড়া 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে যেমন বিদেশী কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যখণ্ডেও অনুরূপ অনুবাদ অংশ রহিয়াছে।

'আর্যগাথা' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ এই উদীয়মান কবিকে সাহিত্য-দরবারে অভিনন্দন করিয়া লইলেন (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ)। তখন রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি সোনারতরী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে; 'চিত্রা'র কবিতা সাধনায় বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে; জনসাধারণের নিকট 'রাজা ও রাণী' নাটকের রচয়িতা বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। 'আর্যগাথা'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি গান ঐ কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় হিন্দুস্থানী সংগীতের সহিত বাঙলা গানের পার্থক্য কোথায়, তাহা বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছিলেন। বাঙলা গান যে কেন হিন্দী গানের মতো হইতে পারে না, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

যে মাসে 'সাধনায়' আর্যগাথার সমালোচনা প্রকাশিত হইল, সেই সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরানী' কবিতা (১৩০১ অগ্রহায়ণ) বাহির হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ঢাকায়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাকে খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই কবিতার প্রেরণা কোথা হইতে পান, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় (১৩০০ ফাল্গুন) 'প্রেমের অভিষেক' নামে এক কবিতা লেখেন। 'চিত্রা'য় ঐ কবিতার যে পাঠ আমরা পাই, তাহা হইতে সাধনার পাঠ অন্যরূপ ছিল। তাহাতে 'কেরানী-জীবনের বাস্তবতার ধূলি-মাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা।' তৎসত্ত্বেও সেখানে ছিল আদর্শবাদ—

...'সেথা হতে ফিরে এসে
স্মিতহাস্যসুধাস্নিগ্ধ তব পুণ্য দেশে,
কল্যাণ কামনা যেথা নিয়ত বিরাজে
লক্ষ্মীরূপে, সেই তব ক্ষুদ্র গৃহমাঝে
বুঝিতে পেরেছি আমি ক্ষুদ্র নহি কভু,
যত দৈন্য থাক মোর, দীন নহি তবু।'

এই কবিতা পাঠ করিবার পর পাঠক যদি 'কেরানী' কবিতাটি পাঠ করেন ত দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কোথা হইতে তাঁহার inspiration পাইয়াছিলেন। সংসার-জীবনে 'প্রেমের অভিষেকে'র বৈপরীত্যে প্রেমের নির্বাসন ছিল বর্ণনার বিষয়। কবিতাটির মধ্যে অদ্ভুত রস ও হাসিবার বিষয় থাকিলেও উহার ভিতরে একটু দীর্ঘশ্বাস থাকিয়া গিয়াছিল। বিবাহিত জীবনের উপর, প্রেমের উপর ধিক্কার—এই ছিল মুখ্যতত্ত্ব।

আমাদের বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের মনে এই 'কেরাণী' কবিতাটি পাঠের পর 'কৌতুক-হাস্য' সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এবং তিনি পঞ্চভূতের ডায়েরি আলোচনায় অতি বিস্তৃতভাবে উহার ব্যাখ্যা করেন। ৩

রবীন্দ্রনাথ বহু বিচার দ্বারা কৌতুকের কারণ কী হইতে পারে, তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন; তাঁহার মতে কৌতুকের একটা প্রধান উপাদান আকস্মিক নূতনত্ব; অসম্ভব ও অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সম্ভব ও সংগতের মধ্যে তেমন নাই। কেরানী জীবনের মধ্যে স্ত্রীর ব্যবহার ও পরুষ বাক্য প্রয়োগের মধ্যে অসম্ভবতা কিছুই নাই, বিস্ময়ের ব্যাপারও নাই। 'কৌতুক-হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনাটি ব্যাপক-ভাবেই করিয়া বলিলেন যে, কৌতুকের মধ্যে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়, তাহাতে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু সে মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই উহা হয় ট্র্যাজেডি। যথার্থ কৌতুক-হাস্যের মধ্যে সংগতি রক্ষার প্রয়োজন হয় না। হিং টিং ছট্ ও জুতা আবিষ্কারের মধ্যে অসংগতি ও অসম্ভবতা অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে আসিয়া পড়ে বলিয়া উহা আমাদের হাস্য উদ্রেক করে।

যাহা হউক, ইহার পর হইতে দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্যপ্রতিভা এই কৌতুক-হাস্যের পথ বাহিয়া চলিল। ৪

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সংগীত সমাজের উৎসাহে ও তাগিদে তিনি ১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে 'গোড়ায় গলদ' ৫ প্রহসন রচনা করেন; সেকথা অতি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। বিপুল সাফল্যের সহিত উহা সংগীত সমাজে অভিনীত হয়। 'গোড়ায় গলদ' রচনার পর রবীন্দ্রনাথ আর কোনো প্রহসন কিছুকাল লেখেন নাই। প্রায় দুই বৎসর পরে কয়েকটি ছোট ছোট Satire বা বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ-কৌতুক লিখিলেন। Satire-এর উদ্দেশ্য কেবল হাস্যসৃষ্টি নহে, প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করাই মূল অভিপ্রায়। সেগুলি হইতেছে 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' (১৩০১ ভাদ্র) 'স্বর্গীয় প্রহসন' (সাধনা ১৩০১ আ-কা), 'নূতন অবতার' (১৩০১ পৌষ)। সকলগুলিই দেবতাদের লইয়া এবং প্রচলিত লৌকিক ধর্ম লইয়া বিদ্রূপ; উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট,—নব্য হিন্দুদের উদ্ভট ধর্মমতবাদের ব্যঙ্গ। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শচী, কার্তিক ছাড়া শীতলা, মনসা, ঘেঁটু, ওলাবিবি প্রভৃতি অনেককেই নাটকের মধ্যে লেখক আনিয়াছেন। 'নূতন অবতারে' গঙ্গা ও ভগীরথকে টানিয়াছেন। এই প্রহসন কয়টি পাঠের পর পাঠকগণ যদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' (১৩০২) পড়েন ত' দেখিবেন রবীন্দ্রনাথের এইসব satire-এর প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আছে কিনা। অবশ্য বহু হাস্যমুখর গানে নাটকটি উজ্জ্বল হইয়াছে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, 'স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে।' ইহা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল; তিনি লিখিয়াছেন, "বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্বশ্রেণী অর্থাৎ পণ্ডিত গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাতফেরত এই সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্গত করা হইয়াছে।" নাটক রচনার 'উদ্দেশ্য' কী তাহা ভূমিকায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

'কল্কি অবতার' লিখিবার দুই বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'বিরহ' ৬ নামক সামাজিক প্রহসন (১৩০৪) রচনা করেন। ইহা পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণে রচিত। প্রহসনখানি 'কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে' উৎসর্গ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে তখন কিভাবে দেখিতেন ও উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ আমরা নিম্নে উৎসর্গ পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

৩। কৌতুক হাস্য, সাধনা ১৩০১ পৌষ। কৌতুক হাস্যের মাত্রা, ঐ ফাল্গুন।

৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতঃপর অদলবদল, রাজা গোপীকা রায়ের সমস্যা হারাধনের শ্বশুর বাড়ি যাত্রা প্রভৃতি বহু আষাঢ়ে গল্প তাঁহার অপরূপ ভঙ্গিতে লিখিয়া চলিলেন।

৫। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি 'চিত্রাঙ্গদা' ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হয়।

৬। পাবলিক থিয়েটারে 'বিরহ' ১৩০৬ কার্তিক ১৯এ (১৮৯৯ নভেম্বর ৪) অভিনীত হয়।

"বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।—সব বিষয়েরই দুটি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু আধটু দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি প্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণ-রসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর। হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গান মাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থান-বিশেষে উভয়েই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমেতি বিস্তারেণ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

'বিরহ' প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। এমন কি জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও উহার অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথকে উহা উৎসর্গিকৃত হইলেও, তিনি ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু পর বৎসরে (১৩০৫) দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' নামক কাব্য প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (১৩০৫ অগ্রহায়ণ) তাহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা, আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পর পরিণতি সহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। 'আষাঢ়ে'র গ্রন্থকর্তাও যে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু যে কবিতাগুলি তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে।......তাঁহার হাস্য-সৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।"

এদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নব নব পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন; 'কাহিনী' (১৩০৬ ফাল্গুন) গ্রন্থের অন্তর্গত নাট্যকাব্যগুলি তাঁহার সেই অপরূপ পরীক্ষার অন্যতম প্রকাশ। এই নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় হইতে যেসব নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে নাট্যকাব্যের পদ্ধতিকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত গৈরিশ ছন্দ অনুসরণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ছন্দ গ্রহণ করেন। পাষাণী (১৩০৭ আশ্বিন), সীতা (১৩০৯), তারাবাঈ (১৩১০) প্রভৃতি নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্যের ন্যায় পৌরাণিক অর্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ডাঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "পাষাণীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণের পরিচয় আছে। ...কয়েকটি গান আছে। সেগুলিও প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের গানের অনুকৃতি।" ৭

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' (১৩০৯) কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আর্যগাথা' ও 'আষাঢ়ে'র ন্যায় 'মন্দ্র'কেও রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' (১৩০৯ কার্তিক) সমাদৃত করিলেন। এই সমালোচনা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন, তাহা বোধহয় উক্ত কবির কাব্য-শক্তির চরম বিচার হইয়া গিয়াছে। "দ্বিজেন্দ্রলালের কবিধর্ম রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম হইতে একেবারে স্বতন্ত্র" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রশংসা এমন অকুণ্ঠ হইল। তিনি লিখিলেন, "এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাব বিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ।...কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য বিস্ময়, কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।"

[৭ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ ৩৮৬]

অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, "মন্দ্র কাব্যের জাতীয় সঙ্গীত কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত-আশা'র অনুভূতি লক্ষণীয়। 'আলেখ্য' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র ক্ষীণ প্রভাব আছে।" (সু সেন, ২য় পৃঃ ৫৪০)

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাটিকা রঙ্গমঞ্চে তেমন সমাদর লাভ করিল না; পাষাণী রঙ্গমঞ্চে স্থানই পায় নাই। তিনি বুঝিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিতে হইলেই সংস্কৃত বহুল ভাষায় নাটকের সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নহে; সংলাপে স্বচ্ছন্দগতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। এই ধরণের নাটক রচনার ব্যর্থতা তিনি বুঝিতে পারিলেন; রবীন্দ্রনাথও নাটক সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথা বলিলেন না; যাহা তাঁহার ভালো লাগে তাহার প্রশংসা করেন, যাহা ভালো লাগে না তৎসম্বন্ধে নীরব থাকেন, ইহাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সুরু হওয়াতে নূতন ধরণের নাটক রচনার প্রয়োজন লেখকগণ অনুভব করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে যে নূতন আত্মচেতনা আসে, তাহা বিংশ শতকের শুরু হইতে, এমন কি তাহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল; রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, শিবাজী, বঙ্গবিজেতা, সিরাজদ্দৌলা পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় বাঙালীর চিত্তকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরাণীরহাটের নাট্যরূপে বসন্ত রায় আবার এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল (১৯০১ এপ্রিল ৬)। একথা বলিলে বোধহয় দুঃসাহসিকতা হইবে না যে, বসন্ত রায় বাংলার প্রতাপাদিত্যকে বাংলার শেষ বীররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নাট্যকারগণকে উদ্বোধিত করে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (ষ্টারে ১৯০৩ অগস্ট ১৫) 'বঙ্গের শেষ বীর' ক্লাসিকে (১৯০৩ অগস্ট ২৯) স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই অভিনীত হয়। মোট কথা বাঙালী সেদিন রাষ্ট্রনীতিতে আদর্শের সন্ধানে ফিরিতেছিল। দেশের মধ্যে এই শ্রেণীর নাটকের চাহিদা দেখা দিলে, দ্বিজেন্দ্রলালও এই দিকেই ঝুঁকিলেন। তিনি দেখিলেন যে, স্বদেশের জন্য যে তীব্র বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে বোধ করিতেছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার পক্ষে ঐতিহাসিক নাটক রচনাই প্রশস্ত। স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহের মুখে বীরত্বব্যঞ্জক নাটক রচনা করিতে পারিলে, লোকের ভাবপ্রবণ মনকে সহজেই উদ্দীপিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর প্রথম নাটক হইতেছে প্রতাপসিংহ (১৩১২ বৈশাখ)। এই সুপরিচিত নাটকখানি কীভাবে স্বদেশী যুগের গোড়ার দিকে বাঙালীর চিত্তকে অধি-

কার করিয়াছিল, তাহা সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে জানা যায়।

দেশব্যাপী অভিনন্দনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিলেন না। এই নীরবতার কঠোরতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে আঘাত দিল। এতদিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। ইতিমধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র অভিনয় হইয়াছিল (১৩১১ অগ্র ১২)। অমর দত্ত, 'মহেন্দ্র' মনোমোহন গোস্বামী, 'বিহারী' কুসুম 'বিনোদিনী' রাকী 'আশার' ভূমিকায় নামিয়াছিলেন,—সকলেই তখন কলিকাতার সেরা নটনটী। এই অভিনয়ের সম্ভাবনাতেই 'সাহিত্য' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন (১৩১১ কার্তিক)। দ্বিজেন্দ্রলালও রবীন্দ্রনাথের উপর নানা কারণে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর 'ন্যায্য' ক্রোধ প্রকাশের সুযোগ কবিই দিলেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার কার্যালয় হইতে তদীয় সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও লেখক' নামে এক সুবৃহৎ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৩১১ ভাদ্র ২৯ [১৯০৪ সেপ্ট ১৪])। এই পুস্তকে বঙ্গ সাহিত্যের জীবিত ও মৃত বহু লেখকের জীবনী সংগৃহীত হয়; আর জীবিতগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ অনুরুদ্ধ হইয়া আপনার জীবনকথা নিজেরাই লিখিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনকথা লিখিতে গিয়া তাঁহার কাব্য-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটি ব্যক্ত করেন। আমরা পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই কাব্যগ্রন্থের ২৬টি খণ্ডের জন্য কবি যে প্রবেশক-কবিতা লিখিয়া দেন, তাহা জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। তিনি তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্যে কাহার যেন নির্দেশ অনুভব করিতেছিলেন; সমস্ত কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকারূপে উদ্ধৃত করেন 'আমারে কর তোমার বীণা' এই গানটি। কবির আত্মকাহিনীতে কবি-রবীন্দ্রনাথের কথাই ছিল, মানুষ-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি পংক্তিও ছিল না। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থখানিতে বহু অখ্যাত জীবিত লেখকের জীবনীও সন্নিবিষ্ট হয়, অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের নাম যে কেন নাই, তাহা বুঝিলাম না।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মচরিত পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অভাবিতরূপে বিরক্ত, উত্ত্যক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন ও জানিতে চান, যথার্থই সেই আত্ম-জীবনীর মর্মানুসারে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনা সম্পর্কেই Divine inspiration (ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা) দাবী করেন কিনা এবং করিলে, তিনি উহার কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। এই লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের পত্র ব্যবহার চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিতকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেন রবীন্দ্রনাথ জবাবে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কাহারও মতামত গ্রহণ করিতে উৎসুক নহেন; আর যাঁহারা গূঢ় অভিসন্ধি বা মৎলব (motive) লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসেন, তাঁহাদের কাছে তিনি কোনোরূপ কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রের জবাবে তাঁহাকে পুনরায় লিখিয়া পাঠান যে, তিনি যদি তাঁহার দুর্নীতিমূলক ও লালসাপূর্ণ লেখাগুলি সম্পর্কেও ঐরূপ inspiration দাবী করিতে লজ্জিত ও সংকুচিত না হন, তবে প্রকাশ্যে সত্যের খাতিরে, তিনিও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিবেন যে সেসকল রচনা দৈবশক্তি প্রণোদিত নহে। এই তথ্যগুলি দেবকুমার লিখিত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থ হইতে গৃহীত (পৃ ৪৭৫—৭৭)। রবীন্দ্রনাথের পত্র আমরা দেখি নাই, পত্রগুলি কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

১৩১১ সালের শেষ দিকে উভয় সাহিত্যিকের মধ্যে মনোমালিন্য কি আকার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে জানা যাইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের মনে কী সব প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত পত্রের অভাবে রবীন্দ্রনাথের উত্তর হইতে স্পষ্ট হইবেঃ তজ্জন্য আমরা পত্রখানি নিম্নে উধৃত করিলামঃ—

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বোলপুর

আপনি আমার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে ভর্তি হইতে পারিবেন না এ কথাটা এতটা জোরের সঙ্গে কেন যে বল্লেন আমি ভাল বুঝতে পারলেম না। "আপনার নিন্দুকের দলে আমি যোগ দিতে পারব না" এ কথাও ত আপনি বলতে পারতেন। এ সমস্ত অনাবশ্যক কথা গায়ে পড়ে উত্থাপন করা কি জন্যে?

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরের স্তুতিবাদ করা তবে এ কাজ আপনি পারবেন না এমন কথা বলাও আপনার পক্ষে অযোগ্য হয়েছে।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় বিচার শক্তির দোষে একজন লোকের মন্দকেও ভাল বলা—সে কাজ আপনি পারবেন না এ কথা আপনি জোর করে কি বলবেন? আপনার "মন্দ"কে আমি ভাল বলেছিলেম বলে অনেকে আমার বিচার শক্তির প্রতি দোষারোপ করেছিলেন—যদি বস্তুতই আমি সে দোষের ভাগী হই তবে তার উপরে আমার হাত নেই।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় অন্যের ভালকে ভাল বলা তবে আমার সম্বন্ধে আপনি সে কাজে অক্ষম এ কথা এতটা উগ্রতার সঙ্গে না বল্লেও ক্ষতি হত না।

বোধ হয় আপনার বিশ্বাস আমার একদল স্তাবক আছে—অর্থাৎ যাদের প্রশংসা উক্তির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয় না—হয় তাদের বুদ্ধির, নয় তাদের স্বভাবের দোষ দিয়ে আপনি তাদের প্রশংসা বাক্যকে স্তাবকতা শব্দে অভিহিত করচেন। আপনি তাদের যা মনে করচেন তারা যদি সত্যই তা হয় তবে নিজেকে তাদের চেয়ে অনেক উচুদরের লোক বলে ঘোষণা করা কিছু না হোক অনাবশ্যক। ওতে কেবল আপনার অন্তঃকরণের একটা অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছে।

অপ্রিয় সত্য বলা সম্বন্ধে আপনি কিছু অহংকার প্রকাশ করেছেন। এমন একদল লোক আছেন অপ্রিয় সত্য বলাটা যাঁদের একটা বিশেষ সখ—আমরা কাউকে খাতির করে কিছু বলিনে মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে থাকি এই বলে তাঁরা গায়ে পড়ে গর্ব প্রকাশ করেন। মনের অবস্থাটা এ রকম হলে পর সত্য নির্ণয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি থাকে না, ঔদ্ধত্যের আনন্দে অপ্রিয়তাটাকেই যতদূর সম্ভব কচ্‌লে তোলা হয়।

কিন্তু সে আপনার নিজের স্বভাব নিজে বুঝবেন—আপনি আমাকে অপ্রিয় সত্য জানাবার জন্যে যতটা উদ্দীপনা অনুভব করেছেন যতদূর শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করেছেন—কোনোদিন প্রিয় সত্য শোনাবার জন্য ততটা উৎসাহ অনুভব ও ক্লেশ বহন করতে যদি না পেরে থাকেন তবে তার ক্ষতি পুরস্কার আপনার অন্তরের মধ্যে থেকেই লাভ করবেন।

এবারে আপনার চিঠি থেকে এই বুঝলুম আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে আমরা অহংকৃত। এর বিপরীত ধারণার কথাও আপনারই ন্যায় ভাল লোকের মুখ থেকে শুনেছি —আপনি বলবেন যাঁর কাছে শুনেছি তিনি স্তাবক —তা যদি হয় তবে যাঁরা নিন্দার কথা বলেন তাঁরা যে নিন্দুক নন তা কেমন করে বুঝব? এর থেকে বস্তুত এই বোঝা যাচ্ছে আমাদের পরিবারকে কেউবা এক রকম বলেন কেউবা অন্য রকম বলেন—সকলেই একভাবে একই কথা বলেন না।

দ্বিতীয় নালিশ এই যে, আমাদের বাড়িতে নিজেদের নাটকেরই অভিনয় করা হয়েছে। সেটা আপনার মতে "Self advertising"। আপনার বাড়িতে এবং অন্য বাড়িতেও আপনার মুখে আপনারই রচিত গান বিস্তর শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন সে কাজটাকে "Self advertising" বলে গণ্য করিনি। এমন কি, আপনার নিজের শিশু সন্তানগুলিকেও আপনি নিজের গানের দোহারকি বানিয়ে যখন অতিথিদের আপ্যায়িত করেছেন তখনো এক মুহূর্তের জন্য আমার এবং আশা করি আর কোনো ভদ্রলোকের মনে আপনার প্রতি এ রকম সংশয় উদয় হয়নি—আপনি যখনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন তখনি আপনার স্বরচিত কাব্য আপনার মুখ থেকে শুনেছি একবারো তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু তাতে আমি প্রত্যেকবারই বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করেছি "disgusted" হইনি। তারপরে আর একটা কথা বলা আবশ্যক আপনি বোধ হয় জানেন আপনার "বিরহ" সমারোহ সহকারে আমাদের বাড়িতে অভিনীত হয়েছে—এ ছাড়া আলিবাবা, আবুহোসেনের অভিনয় হয়েছে—

* পত্রখানি রবীন্দ্র ভবন হইতে পাইয়াছি। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু হয়েছে কি না হয়েছে সে তর্ক আমি অনাবশ্যক বোধ করি।

সঙ্গীত সমাজে আমার লেশমাত্র কর্তৃত্ব নেই—এমন কি, সেখানে জ্যোতিদাদাও নিজের শান্ত স্বভাববশতই কর্তৃত্ব করতে বিরত। সেখানে অন্যান্য বহুতর নাটকের অভিনয়ের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে আমার রচনাও অভিনীত হয়ে থাকে তবে তার থেকে আপনি এইটেই জানবেন সেখানে কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ আমার রচনা পছন্দ করে থাকেন—তাঁদের সবাইকে আমার স্তাবক বলে যদি সান্ত্বনা লাভ করেন তবে সে পথ মুক্ত আছে।

নিজের কথা বলামাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম—এটাকে ইচ্ছাপূর্বক অহঙ্কার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।

মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেরিয়েছেন এ কথা আপনারই মুখে শোনা গেল—তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন—আর কারো মুখে শুনিনি তার কারণ এ নয় যে, আপনি ছাড়া আর কেউ সত্য বলেন না। আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয় সেই জন্যেই তিনি এ কথা ভুলে যান যে আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারো মনে বেদনা লাগতে পারে। আমার কবিতা আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হতে পারে। কিন্তু যিনি চিরজীবন নিজের মানমর্যাদা সমস্তই অতি সহজে সকলের কাছে নত করে রেখেছেন একদিনের জন্যও যাঁকে কেউ অহঙ্কার অনুভব করতে দেখেনি তিনি আমার কবিতা advertize করবার ভার নেবেন এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এমন কি, আমার বিশ্বাস, আপনিও জানেন তিনি পারিবারিক আত্মশ্লাঘার জন্য এ কাজ করেননি—স্নেহবশত বা পরিচয়বশতই করেছেন—কিন্তু আপনি এমন এক স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন যেখানে আঘাত পেলে শান্তভাবে সত্য গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজে আমাদেরই রচিত গান গাওয়া হয় এ কথা সত্য নহে—এমন সকল লোকের গান আছে যাহাদের নামও কেহ জানে না এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে আমাদের কোন্ গান যে কাহার এ পর্যন্ত তাহা advertize করাও হয় নাই—কোনো গানই যে আমাদের তাহা অনুমান ছাড়া জানিবার উপায় নাই।

আপনি আমার এবং আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার এবং সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে পারেন আমাকে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন—ভালই করেছেন—আমার এ বয়সে আমি যদি কোনো শিক্ষা পেয়ে থাকি তবে আশা করি আপনার অপ্রিয় আচরণ আমার পক্ষে দুঃসহ হবে না। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩১২।

ভবদীয়—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহার পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১২ সালের শেষ দিকে বরিশালে আহূত প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য সম্মিলনীর কথা হইতেছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। 'বঙ্গবাসী' আদি কয়েকখানি পত্রিকা ঐ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে বরিশালে দেবকুমারকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমি যদিও রবিবাবুর ঐ লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা মুক্তকণ্ঠেই আমি মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না। অবশ্য সে বিষয়েও যে ঘোর মতভেদ আছে তা বলাই বাহুল্য।' (দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫১২)।

এই সকল ব্যক্তিগত পত্রাদি বিনিময় ছাড়া এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু লেখেন নাই। তাঁহার প্রথম আক্রমণ হইল কাব্যে অস্পষ্টতা লইয়া, দুর্নীতির আলোচনা আরও কয়েক বৎসর পরে শুরু হয়। ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (বোধ হয় পূজা সংখ্যায়) দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতার প্যারডি ও তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুব রসাইয়া প্রকাশ করিলেন।

১৩১৩ সালের আষাঢ় (১৯০৬ জুলাই) মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় বদলী হন; সেই সময়ে লোকেন পালিত গয়ার ডিস্ট্রিক্ট জজ। এই গয়া হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন চরিতকার বলেন যে, গয়াবাসকালে লোকেন পালিতের সহিত তাঁহার প্রায়ই সাহিত্য লইয়া আলোচনা হইত। লোকেন সাহিত্য-রসিক ছিলেন; সাহিত্যের মধ্যে সুনীতি দুর্নীতির প্রশ্ন তুলিয়া তিনি রসসম্ভোগকে ব্যাহত হইতে দিতেন না। আর্টের দিক হইতে যাহা অনবদ্য তাহাই তাঁহার উপভোগ্য ছিল। লোকেন পালিতের সহিত তাঁহার তর্ক ও মতভেদ এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি অবশেষে প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গয়া হইতে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন,—

"এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম স্পষ্টত হাতে কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথা বলিনি। কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এইসব অন্ধ স্তাবক ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলি বড়ই বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চলল এবং রবিবাবুর প্রতিভার যে রকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যে অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়বে। আজ তিনদিন ধরে [লোকেন] পালিতের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করলাম; তা রবিবাবুর personality এমনি dangerously strong যে, তিনি আমার যুক্তি খণ্ডন করতে অক্ষম হয়েও আমার points সব avoid করে কেবল সেই সব অস্পষ্ট দুর্নীতিপূর্ণ লেখায় art ও গুণই দেখতে লাগলেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি? * * নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবে না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট style ও ideas অনুকরণই করে ক্রমে আমাদের মাতৃভাষার templeএ আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে তুলবেন।" (দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৫৬৭-৯৮)।

আমাদের মনে হয়, এই উত্তেজিত মনোভাব হইতেই তিনি 'সোনার তরী' কবিতাটির প্যারডি ও 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ লেখেন (সাহিত্য ১৩১৩ আশ্বিন, কার্তিক।) 'সোনার তরী' কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে আষাঢ় মাসে, তাঁহার 'কেরানী' কবিতা প্রকাশিত হইবার নয়মাস পূর্বে। তেরো বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ কবিতাটি বাছিয়া তাহার অর্থোদ্ধারে যে কেন চেষ্টান্বিত হইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বঙ্গদর্শনে ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ' নামে একটি অকিঞ্চিৎকর লেখা উপলক্ষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাসী ১৩১৩ সালের কার্তিক মাসে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন—"বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুধু তাহা নহে, যাহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই; যদি এটি রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে আমি ইহার প্রতিবাদও করিতাম না।... আমাদের এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"লেখকের মতে এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা বৃহৎ 'আইডিয়া' আছে। কাব্যের জড়তা সাধারণত আইডিয়ার জড়তা হইতেই প্রসূত হয়। যেখানে আইডিয়া স্পষ্ট সেখানে ভাষা প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের নিকটে প্রচ্ছন্ন সেখানে ভাষাকে অবশ্য অস্পষ্ট হইতে হইবে। , সেটা বৃহৎ 'আইডিয়া'র ফলে নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার ফলে।"

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনারতরী'র অস্পষ্টতার উল্লেখ করিয়া বহু বিচার করিলেন ও অবশেষে বলিলেন, "এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়, একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী।" শুধু তাই নহে, অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে লিখিলেন,

"যদি স্পষ্ট করিয়া না লিখিতে পারেন, সে আপনার অক্ষমতা, তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলে গভীর হয় না, কারণ ঐ ডোবার জল ত অস্পষ্ট। স্বচ্ছ হইলেও shallow বা অগভীর হয় না, কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ। অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া বা miraculous দাবী করিয়া স্পষ্ট কবিতার ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।"

ইহার এক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ-দর্শনে (১৩১৪ মাঘ) 'কাব্যের উপভোগ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রশংসা আছে বটে, তবে প্রবন্ধটির বেশির ভাগই হইতেছে রবীন্দ্র-নাথের 'জীবন দেবতা'বাদের সমালোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন, "আমার 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রবন্ধ পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যেসব কবিতার ভাব গ্রহণ কর্তে অসমর্থ, সেসব কবিতা দেখলাম যে, কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি সেই চেলা-দিগকে এইখানে বলে রাখি যে, রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যাই লেখেন তাতেই তা ধিন, তাকি ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এ্যাঁও এ্যাঁও বলে কোরাস দিতে পারি না. রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।"

"রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে ('বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে যাহা প্রকাশিত হয়) inspiration দাবী করে যখন নিজের কবিতাবলীর সমালোচনা কর্তে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।" ইহার পর 'সোনারতরী'র উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "পাঁচজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতাটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছেন, তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে. কবিতাটির সত্য কোন অর্থ নাই।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার মতামত জানিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার জবাব দেন (বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ)। দ্বিজেন্দ্রলাল ও 'সাহিত্যে'র সকল আক্রমণের ইহাই একমাত্র উত্তর,—ইহার পূর্বে বা পরে রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আর কিছুই লেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উত্তরের মধ্যে দুঃখ ও বিরক্তি আছে, কিন্তু কোথাও উষ্মা বা তিক্ততা নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভাল কবিতা না লিখিতে পারাতে ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না। * * শক্তির অভাবে যে ত্রুটি ঘটে তাহার সকলের চেয়ে বড় শাস্তি নিষ্ফলতা।......

"আমার 'আত্মজীবনী' প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি দ্বিজেন্দ্রবাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। এবং সেই কারণে তিনি আমার দর্পহরণ করা কর্তব্য মনে করিয়াছেন।

"আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল ক্ষেত্রে তাহা যে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা আমার কাব্য সমালোচনা উপলক্ষে পূর্বেই বলিয়াছেন। আমার বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমার গদ্য প্রবন্ধেও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে, নহিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন ভুল বুঝিবেন কেন। কারণ আমি মনে জানি, অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্যে পারম্পর্যের যে ধারাবাহিকতা অনুভব করিয়া-ছিলেন, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, আইডিয়া সম্বন্ধে মানুষ প্রথমে অচেতন থাকে, সেই আইডিয়াই মানুষকে চালায়, মানুষকে করায়। "আমাদের পরিণত অবস্থার কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে।" আত্মজীবনীতে তিনি সেই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছিলেন। "কথাটা সত্য কি মিথ্যা সেকথা স্বতন্ত্র. কিন্তু ইহা অহঙ্কার নহে। কিন্তু তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা কিছু অসম্ভব নহে। আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য বোধ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে এবং যে ব্যঙ্গ কদাচ কোনো ব্যক্তি বিশেষের মর্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই ব্যঙ্গে ও ভর্ৎসনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।"*

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিতকার দেবকুমার বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সভাসমিতিতে 'ব্যঙ্গ' 'ভর্ৎসনা' প্রভৃতি কিছুই করেন নাই। উভয়েরই 'চেলারা' উভয়ের মধ্যে বিরোধের ইন্ধন নিত্য জোগাইয়া আসর জমাইবার জন্য এইরূপ করিয়া বিষয়টিকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। (দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ৫৭৭—৮)।

বঙ্গদর্শনে তাঁহার বক্তব্য লিখিবার কয়েক-দিন পরে তিনি একখানি পত্রে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কবির নির্বিকার মনের পরিচায়ক। তিনি শিলাইদহ হইতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়া-ছিলেন (১৩১৪ ফাল্গুন ৮) ঃ—দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়, অন্তত আমি ত এই বলেই চুকিয়ে দিলুম। এতে বৃথা অনেক সময় যায়—আমার আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন এই রকম বৃথা অগ্নি-কাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে অনন্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে—সব পাপ শান্ত হোক" (স্মৃতি পৃ ৬৮)।

'আইডিয়া'র অস্পষ্টতা লইয়া সমা-লোচনান্তে বৎসরাধিককাল পরে আরম্ভ হইল রবীন্দ্র কাব্যে দুর্নীতিপরায়নতার আলোচনা।*

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দুর্নীতি দেখিয়া লিখিলেন, 'দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।'

দুর্নীতির উদাহরণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্র-নাথের কতকগুলি প্রেম সংগীত বাছিয়া লইয়া বলিলেন যে, সেগুলি 'সবই ইংরেজী কোর্ট-শিপের গান', আর কতকগুলি লম্পটের বা অভিসারিকার গান। তিনি আরও বলিলেন যে, 'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতা নাই। শয্যা রচনা. মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবি-দিগের কবিতা হইতে অপহরণ। * * * রবিবাবুর খণ্ড কবিতায়ও ঐরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়।' 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের কথা তুলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, "রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। * * * অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে, কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা [বিদ্যাসুন্দরের] হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়। কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়; সুরুচি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।" সেই হইতে 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল এই ধুয়া উঠে। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনার আঠারো বৎসর আগে। রবীন্দ্রনাথ ইহার কোনো জবাব দেন নাই। তবে প্রিয়নাথ সেন এক দীর্ঘ

[* রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ পৃ ৫০১—৫]

* (কাব্যেনীতি, সাহিত্য ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা'র সৌন্দর্য নানাভাবে ব্যাখ্যা* করিলেন। এরূপ বিস্তৃত রসবিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাট্যকাব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে লিখিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় সংগীত রচনার দ্বারা যশোমণ্ডিত হন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বাঙালীকে সংগীতে মাতাইয়াছিলেন তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইয়াছে। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (১৩১২, ভাদ্র, আশ্বিন) এই গীতরাজি প্রথম বাহির হয় এবং অনতিবিলম্বে 'বাউল' নামে পুস্তকাকারে সেগুলি প্রকাশিত হয়। ইহার এক বৎসর পর দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া বাসকালে (১৩১৩ আশ্বিন) 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বিখ্যাত সংগীতটি রচনা করেন (দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫৪২—৩)। রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে' গানটি ইতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল। উভয় গীতের ভাবধারা তুলনীয়। বস্তু বা তথ্যবিশ্বাসী কবি গানটিকে নানা তথ্যের দ্বারা জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' অধিক লোকপ্রিয় হইল। ইহাতে কবির মনে কোন সূক্ষ্ম অভিমান জাগিয়াছিল কিনা বলা যায় না, তবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কোন রচনা সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম ঐতিহাসিক নাটকে সফলতা লাভ করিয়া পর পর অনেকগুলি নাটক রচনা করিলেন—'প্রতাপ সিংহে'র (১৩১২) পর 'দুর্গাদাস' 'নূরজাহান' (১৩১৩), 'মেবার পতন', 'সাজাহান' (১৩১৫)। এই সকল নাটক দেশবাসীর চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। উগ্র স্বাদেশিকতার সহিত দেশ সম্বন্ধে অবাধ উচ্ছ্বাস মিশ্রিত হওয়ায় সেদিন এইসব নাটক বাঙালীর খুবই ভাল লাগিয়াছিল।

দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মোহ স্বদেশী যুগের গোড়ার দিকে ছিল, তাহা এখন বহু পরিমাণে সত্যপথাশ্রয়ী হইয়া শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৩১৪ সাল হইতে তাঁহার জীবনের গতি ক্রমেই গভীরের দিকে চলিয়াছিল; আদর্শকে মূর্তি দিবার চেষ্টায় 'গোরা'র সৃষ্টি। বাঙালী স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হইতে আদর্শ বাঙালী-বীরকে জাতীর জীবনের সংগ্রামের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। বীরপূজা শুরু হয় সেই সময় হইতে এবং রবীন্দ্রনাথই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় তাহার প্রথম মঙ্গলাচরণ করেন। আজ ক্ষীরোদপ্রসাদ ও হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রতাপাদিত্যকে এই বীরের সম্মান দান করিলেন; দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বীরের জয় ঘোষণা করিয়া লিখিলেন 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত না সেই ধন্য দেশ! ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ!" সমসাময়িক নাটকে, উপন্যাসে, সংগীতে এই বীরকে নানা কল্পনার জালে জড়াইয়া, নানা কালবিরুদ্ধ বাণী তাঁহার কণ্ঠে দিয়া, তাহাকে যে দেবোপম চরিত্র রূপে প্রকাশের চেষ্টা হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখিত হইল (১৩১৬ বৈশাখ)।

এই নাটকে তিনি প্রতাপাদিত্যকে যথাযথ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণীতে দেখিয়া নৃশংসতার মূর্তিরূপে চিত্রিত করিলেন। এবং প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীকে সৃষ্টি করিলেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কবির মন কোনো দিন প্রসন্ন ছিল না, তাহা তিনি বৌঠাকুরাণী হাটের ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশাভিমানের অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়া, তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক কোনো দিন লোকপ্রিয় হয় নাই।

এদিকে কাব্যে দুর্নীতি ও সুনীতি লইয়া রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল ও তদীয় ভক্তদের মধ্যে মাসিক পত্রিকা মারফৎ কথা কাটাকাটি চলিতেছে। এইসব ঘাতপ্রতিঘাতে কবির মন অত্যন্ত ক্লান্ত। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন।*

"আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। 'প্রবাসী'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না। ......তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই, কেন না আমার কবিতা ত রয়েইছে—যদি ভালো হয় ত ভালোই, যদি ভালো না হয় ত' ও আবর্জনা দূর করাবার জন্যে চোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশব্দে স'রে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছে করিনে।...... চতুর্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত ক'রে তুলো না।'

ইতিমধ্যে 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বাণী' পত্রিকায় (১৩১৭ কার্তিক) উহার এক সহৃদয় সমালোচনা প্রকাশ করেন; তখন অনেকে দুই সাহিত্যিকের পুনর্মিলনের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে 'গোরা'র প্রতি দরদ দেখাইলেও অন্তর হইতে কাঁটা তিনি তুলিতে পারেন নাই। এদিকে সাময়িকপত্রে কাব্যে রুচি ও নীতি লইয়া উভয়ের ভক্তদের মধ্যে মসীবর্ষণ চলিতেছে। এই মসীযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নামেন নাই; দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি প্রায়ই বলিতেন, "কেন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য আখড়ায় নামছেন না—এই সব অশক্ত শিখণ্ডীদের বাণ মেরে কী হবে?" (উদাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫২)। সত্যই রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'কবি'র লড়াইএর আখড়ায় নামাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের এই তূষ্ণীভাবই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। এইবার তিনি কবিকে নাটকের মধ্যে নামাইয়া চরমভাবে অপমানিত করিবেন স্থির করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নামে একটি প্যারডি নাটিকা 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাইবার পর তিনি সেই রচনাটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ধিত করিলেন। নাটিকাটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ-বিদায়ে'র প্যারডি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন 'এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।' একথা স্টারে অভিনয় রাত্রে দর্শকরা বিশ্বাস করে নাই এবং নাটিকাটি পাঠ করিলে লেখকের সে উক্তিকে যথার্থভাবে গ্রহণ করা কঠিন। তিনি ভূমিকায় আরও লিখিলেন, "ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় ত তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র।......একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন, তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষত যদি কোন কবি, কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপেই চাবকাইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডসয়ার্থ মহাকবি শেলি ও বাইরনকে এইরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন।" এইরূপ মানদণ্ড হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে দণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইলেন! তিনি আরও বলিলেন, 'যিনি দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু; এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করেন না।'

---

* প্রিয়নাথ সেন, চিত্রাঙ্গদা, সাহিত্য ১৩১৬ —কার্তিক। দ্রঃ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাব্যসমালোচনা, সাহিত্য। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাহিত্য ১৩১৬ অগ্রহায়ণ। তুঃ কাব্যে নীতি, মানসী, ১৩১৬ ভাদ্র; কাব্যে অপহরণ ১৩১৬ অগ্রহায়ণ।

* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ১৩১৭ ভাদ্র ২৭। দ্রঃ প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক।

'আনন্দবিদায়' নাটকখানি অভিনীত হয় (১৩১৯ পৌষ ১; 1912 Dec. 16) স্টার থিয়েটারে। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং নাট্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কৌতুক উপভোগ করিবেন আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দর্শকমণ্ডলীর মনোভাব দেখিয়া তাঁহাকে রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।* রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে; সেদিন বাঙালী ভদ্র শিক্ষিত দর্শকগণ রবীন্দ্রনাথের এই অপমান নীরবে সহ্য করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন বুঝিলেন, গত সাত বৎসর ধরিয়া তিনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; তাঁহার প্রতিভার দ্বারা রবীন্দ্রপ্রতিভা ম্লান হইবার নহে। 'আনন্দবিদায়' নাটিকাটিতে যে কি পরিমাণ ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল, তাহা ঐ অপাঠ্য গ্রন্থখানি না পড়িলে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তখন বিলাতে সমাদৃত হইতেছে, তিনি সেখানে যশস্বী হইতেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সে-যশকে বাঙালির যশ, ভারতীয়ের গৌরবরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহার অকিঞ্চিৎকর নাটকের মধ্যে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ ঐ নাটিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; সেগুলি 'উদাসী' মনের পরিচায়ক নহে ঃ—

"একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি * *—
কিবা ত্যাগ কিবা দান,
'পরিষৎ' জল ছিটাইয়া দিলেই (কবিবর)
স্বর্গে উঠিয়া যান।"
(২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

"আমি লিখছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে—
নিজেই বুঝিনা তার অর্থ বুঝবে কি আর অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি।"
"এখন কর গৃহে গমন—নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাবব।'
(ঐ ৩য় দৃশ্য)।

২য় ভক্ত—এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হয়ে আসবেন।
৩য় ভক্ত—P.D. কি?
২য় ভক্ত—Doctor of Poetry
৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এ'র কবিতা বুঝবে? ৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত দরকার নেই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' নিলেই হোল। ২য় ভক্ত। তারপর রয়টার দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrew-এর একটা certificate যোগাড় করলেই P. L. ৩য় ভক্ত। P. L. কি? ২য় ভক্ত। Poet Laureate। ১ম ভক্ত। ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে এ'কে একদম ঋষি বানিয়ে দেই—" (ঐ ৩য় দৃশ্য)।

'আনন্দবিদায়ে'র অভিনয়ের পর (১৩১৯ ১লা পৌষ) দ্বিজেন্দ্রলালের বোধ হয় মনের পরিবর্তন হয়। তাই 'ভারতবর্ষ' মাসিকের সূচনায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে দৈববাণীর ন্যায় সত্যরূপে পরিণত হইয়াছিল—। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর (১৩২০, জ্যৈষ্ঠ ৩, অথবা ১৯১৩, মে ১৭) পর দেবকুমার তাঁহার জীবনচরিত লেখেন, তাঁহার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আছে; সেই পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধটি অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে।

"দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাঙলার পাঠক সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না, তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধুলো রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে, তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু উপস্থিতমত সেটা যত বড় উৎপাতই হোক, সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালী পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধুলো জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। * * * সাময়িক পত্রে যে সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয়, তাহা সাহিত্যের চির-সাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য, তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই। আর যাহা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে, তাহা মায়া মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি ত পারিই নি, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।" [১৩২৪, ভাদ্র]

প্রায় নয় বৎসর পরে (১৩৩০ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে তাঁহার এক পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, কোনদিনই তিনি তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে কাহারো সঙ্গে আলোচনা করেন নাই। "তার কারণ, যার কাছ থেকে কোন ক্ষোভ পাই, তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি। * * * তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পোঁছায় নি।" (জানুয়ারী ১৯২৭। তীর্থংকর, পৃঃ ২৮২)।

*বীরবল, সাহিত্যে চাবুক, সাহিত্য ১৩১৯ মাঘ।
* * সাহিত্য ১৩১৭ ভাদ্র। প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণে শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত মানস-সুন্দরীর আলোচনার সমালোচনায় আছে 'চক্রবর্তী লেখকের প্রতিপাদ্য এই, প্রত্যেক কবিই আংশিকরূপে ঋষি। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব এইখানে।' পৃঃ ৩৪৪।

শান্তিনিকেতনের আদর্শ

শ্রী উপেন্দ্রকুমার দাস

প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই তপোবন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী, তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে, আমরা যাঁদের ঋষি-মুনি বলে থাকি, অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী-পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

"কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানস-মূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি।" ১ তপোবনের এই মানস আদর্শেই কবি তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু কেন করলেন? রবীন্দ্রনাথ কবি। সত্যের আনন্দময় অমৃতময় রূপের পূজারী তিনি; সেই রূপের প্রকাশই তাঁর কাজ, তাঁর কাজ কাব্য সৃষ্টি। সেই কাজই তিনি করছিলেন। এই অবস্থার কথা বর্ণনা করেই শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে।' তারপর জগতে আসার সময় যিনি তাঁকে শুধু 'খেলাবার বাঁশি' দিয়েছিলেন, তার কবি সেই বাঁশি বাজাতে বাজাতে আপনার সুরে মুগ্ধ হয়ে সংসার-সীমা ছাড়িয়ে একান্ত সুদূরে চলে গিয়েছিলেন, তিনিই আবার কেমন করে তাঁকে সংসারের তীরে জনতার মাঝখানে নিয়ে এলেন, তার পরিচয় আছে ঐ কবিতাতেই। এসে যা দেখলেন, তাতে তাঁর কবিচিত্ত বেদনায় নিপীড়িত হতে লাগল। তিনি দেখলেন সত্যের সুন্দরের অপমান, দেখলেন শিবের পায়ে ধুলো দিচ্ছে স্বার্থোদ্ধত হীন বর্বরতা। আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি এবং ইনিই শান্তং শিবমদ্বৈতম্। আর বিশ্বাস করতেন—"মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর।" তিনি লিখেছেন—"আমরা জ্ঞানে কর্মে প্রেমে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া বার বার তাঁহাকে নমস্কার করি।" ২। এই জন্য বাঙলার আদি যুগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সে বাণী—

> "শোন হে, মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই"

এইটি রবীন্দ্রনাথেরও বাণী। তাই দেখি, জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছেও তিনি মানুষের ধর্মের কথাই বলে গেলেন· বাস্তবিক একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে, তাঁর সকল কাব্যে, সকল কর্মে, সকল প্রচেষ্টায় এই মানুষেরই মহিমা প্রকাশিত হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে মানুষেরই গৌরব। এখানে কবি ভারতের চিরন্তন ধারারই অনুসরণ করেছেন। ভারতের ধর্ম, তার দর্শন, এক কথায় তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস—মোটের উপর এই মানুষেরই মহিমার ইতিহাস। ভারত যতদিন আত্মবিস্মৃত হয়নি, ততদিন শুধু জ্ঞানে ও ভাবে নয়, বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও মানুষের এই মহত্ত্বকে স্বীকার করেছে। তার-পর যখন থেকে সে আত্মবিস্মৃত হল, তখন থেকেই মানুষকে সে ছোট করে দিল আর তখন থেকেই শুরু হল তার দুর্গতি। এই দুর্গতির এখনও অবসান হয়নি। বাস্তব জগতে জনতার মাঝখানে এসে কবি দেখতে পেলেন এই দুর্গতির ভয়াবহ রূপ; দেখতে পেলেন মনুষ্যত্বের চরম অপমান।

মানুষের হীনতা কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সাধারণভাবে এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের পরাধীনতাই এর অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মনুষ্যত্ব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর নির্ভর করে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবেই মনুষ্যত্বের চর্চা করেছে। এদেশে শ্রেষ্ঠ মানুষকে বলা হয় মহাত্মা। ভারতের ক্ষেত্র ভিন্ন। ভারতের দৃষ্টি অন্তর্মুখী। ভারত মানুষের মহিমা উপলব্ধি করেছে আত্মার ক্ষেত্রে, সেখানেই জেনেছে তার স্বরূপ। তাই ভারতের সব সাধনাই মূলত আত্মিক সাধনা।

এই সময়ে দেশ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েছে। তাই সেই শিক্ষার আলোতেই নিজেদের হীনতার পুরো ছবিটি দেখতে পেয়ে শিক্ষিত বাঙালীর মন অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের এই গ্লানি থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগল। তাঁদের সদা-জাগ্রত দেশাত্মবোধ স্বভাবতঃই তাঁদের দৃষ্টি ফেরাল ঘরের দিকে—নিজেদের অতীত গৌরবের দিকে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের রহস্যটি কোথায়, তারই সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন তাঁর আত্মিক সাধনার কথা।

এই জন্য দেখি, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তখন দেশের অধিকাংশ মনীষীরই অভিমত ভারতে মনুষ্যত্ব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর নির্ভরশীল নয়। "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।" দেশবাসীকে এই কথাটাই তাঁরা নানাভাবে বলতে লাগলেন।

কিন্তু 'শুধু মানুষ হ' বললেই ত আর লোকে মানুষ হয়ে ওঠে না। জীব-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই চেষ্টা করে, সাধনা করে মানুষ হতে হয়। তার এই চেষ্টা বা সাধনার প্রধান অঙ্গ শিক্ষা। কিন্তু তখন আমাদের দেশে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, যাতে করে তার এই মহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। শিক্ষার প্রাচীন ধারাটি লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, আর নতুন যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তাতে আর যাই থাক মনুষ্যত্ব-সাধনার লক্ষ্য ছিল না। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে. যাঁর নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব-শিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার; যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।" ৩

রবীন্দ্রনাথ কবি। সহজ কথায় বলতে গেলে কবির কাজ সুন্দর করে প্রকাশ করা। কবিরা চিরকাল তাই করে এসেছেন। কিন্তু সেই ভাবকে আবার কর্মে রূপ দেওয়ার দৃষ্টান্ত তাঁদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। একমাত্র রবীন্দ্র-নাথই তেমনি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। দেশে মনুষ্যত্বের অপমান দেখে দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে মনুষ্যত্ব-সাধনার কোন ব্যবস্থা নেই দেখে ব্যথিত কবি প্রতিকার-স্বরূপ শুধু আশ্রমের ভাবটি প্রকাশ করেই

১। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ১

২। ধর্মপ্রচার, ধর্ম, পৃঃ ৬৯

৩। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ১—২

ক্ষান্ত হলেন না; তিনি স্বয়ং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাঁর ভাবকে কর্মে রূপ দিলেন।

এই প্রসংগে আর একটি কথা বলার আছে। আত্মবিস্মৃত দুর্গত জাতির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নিজের প্রতি অবিশ্বাস, সব বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করে থাকা। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা এই মনোভাবের মূর্ত প্রতিবাদ দেখতে পাই। আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনেব অন্যতম মূল মন্ত্র। ধর্মে, সাহিত্যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি এই মন্ত্র প্রচার করেছেন ও মেনে চলেছেন। আমাদের মানুষ হয়ে উঠবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, অন্যে তা কখনও করে দেবে না, একথা তিনি ভাল করে জানতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে এই আত্মনির্ভরতার মনোভাবটিও কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মরমী কবি। তাঁর কাব্য, তাঁর কর্ম, তাঁর জীবনের বহুমুখী প্রকাশের মধ্যে তিনি একই পরম সত্যের আবির্ভাব দেখতে পেতেন; সেইজন্য শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁর এক বিশেষ রকমের কাব্য-সৃষ্টিই বলা চলে। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং লিখেছেন-"যে-প্রেরণা কাব্যরূপে রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল, কেবলমাত্র বাণীরূপে নয়, প্রত্যক্ষরূপে।" ৪

কবির চোখে সবই কাব্য। মানুষকেও তিনি কাব্যরূপে দেখতেন। তাই শান্তিনিকেতনের আদর্শ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন—"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতঃই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি পশ্য দেবস্য কাব্যং, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখ।" ৫

পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছেন। সেই জন্য মানুষকে তিনি দেখেছেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। মানুষের যথার্থ পরিচয় যে তার আত্মার ক্ষেত্রে, একথা বিশ্বাস করেছেন দৃঢ়ভাবে। তাছাড়া ভারতের এই অধ্যাত্ম আদর্শে মানুষ যে কত বড় হতে পারবে, এ শুধু তাঁর কাছে কল্পনা বা জ্ঞানের বিষয় ছিল না, তিনি তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন নিজের পিতার জীবনে। তাই সেই জীবনাদর্শে ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

ভারতীয় জীবনাদর্শের যে ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তার সামাজিক রূপ বর্ণাশ্রম। রবীন্দ্র-জীবনীর লেখক প্রভাতকুমার বলেন—"বর্ণাশ্রমের আদর্শ তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই আদর্শ বর্তমান কালোপযোগী করিবার জন্যই তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'এই আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়—বাল্যে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা—সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির সংগে একতভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা.........যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গল সাধনা, বার্ধক্যে সংসার বন্ধনকে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া, বসবাস ও শিক্ষাদান" ৬ সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

আশ্রমের স্থান আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। কবি তাঁর পিতা মহর্ষির সাধনার স্থান শান্তিনিকেতনে তাঁর অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে আছে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের কথায় যেটিকে বলা যায়—

"The idea of the humanity of God, or the divinity of Man the Eternal" 7—ঈশ্বরের মানবত্ব অথবা চিরন্তন মানবের ঈশ্বরত্ব। মহর্ষির সাধনপূত স্থানটিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের তথা এখানকার যাবতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মূল এবং লক্ষ্য যে, আধ্যাত্মিক এই কথাটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল।

আধ্যাত্মিক কথাটায় কারো কারো মনে হয়ত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। আমরা সঙ্কীর্ণ অর্থে কথাটা ব্যবহার করিনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংগে যাদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন—রবীন্দনাথের আধ্যাত্মিকতার অর্থ বৈরাগ্য নয়, পরলোকসর্বস্বতা নয়, সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একান্তে বসে পরমাত্মার ধ্যান নয়। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ উপনিষদের। সেই আদর্শের প্রত্যক্ষ রূপ তিনি দেখেছিলেন আপন পিতার জীবনে। মহর্ষি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্র বলেছেন—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ
তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত
তদ্ ব্রহ্মনি সমর্পয়েৎ॥" ৮

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যেকোন কর্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের নিজের, অসংখ্য রচনা থেকে মাত্র দুটি ছত্র উদ্ধৃত করছি, তাতেই তাঁর মূল সুরটি ধরা পড়বে, তিনি লিখেছেন—

"সর্ব কর্মে তুমি আছ এই জেনে সার
করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ সত্য, জীবন সত্য, মানুষ সত্য। জগৎ তাঁরই লীলা, জীবনে তরঙ্গিত হচ্ছে তাঁরই ইচ্ছা, মানুষের মধ্যে রয়েছে তাঁরই প্রকাশ। ভারতের যে জীবনাদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তারও এই একই লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী এক পরম সত্য বিরাজ করছেন। "ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ। —এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যা কিছু পদার্থ সমুদয়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।" এইটিই ভারতবর্ষের মর্মবাণী। জীবনের ক্ষেত্রে নানা কর্মের মধ্যে এই বাণীকে রূপায়িত করে তোলাই ভারতের সাধনা। স্বার্থের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত, নানা মতবাদের গোলকধাঁধায় পড়ে দিশেহারা জগতের কাছে এই সাধনার কথা প্রকাশ করতে হবে; বাস্তব ক্ষেত্রে তার ভিখিরীর দশা হলেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জগৎকে ভারতের অনেক কিছু দেবার আছে এবং তা তাকে দিতে হবেও—রবীন্দ্রনাথের ছিল এই দৃঢ় অভিমত। নিজে তিনি সারা জীবন ধরে এই মত অনুসারে কাজ করে গেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমও তাঁর সেই কাজেরই অংগ। তাঁর একটা কথা সত্যের কোন বিশেষ সাধনাকে যিনি নিজের জীবনে গ্রহণ না করেছেন, তাঁর পক্ষে সেই সাধনার কথা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়, আর করলেও সেরকম লোকের কথা কেউ শোনে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতের যে-সাধনার কথা প্রচার করে গেছেন, নিজের জীবনে তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে শান্তিনিকেতন আশ্রম তাঁর সেই সাধনারই অংগ। রবীন্দ্র-জীবনী বলছেন—"ভারতের সাধনা, ভারতের আত্মাকে প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, বিদ্যালয় তাহার উপলক্ষ্য; অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়া আপনার সার্থকতা অনুসন্ধান করিতেছিল, ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই কর্মপ্রবাহের একটি তরংগ মাত্র।" ৯

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শান্তিনিকেতনের আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।" ১০

এইটে ভারতের আদর্শ। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সাধনা, কিছু হওয়ার সাধনা; যাকিছু করা সবই এই লক্ষ্যে পেঁছাবার

৪। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ১
৫। 'জন্মদিনে', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ পৃঃ ১৫১

৬। রবীন্দ্র জীবনী পৃঃ ৩৭১—৭২
7 Golden Book of Tagore pp. 309.
৮। মহানি ৮।২৩

৯। রবীন্দ্র জীবনী পৃঃ ৩৮০
১০। স্বদেশ পৃঃ ২৯

উপলক্ষ্য মাত্র। এই চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোন হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হইনে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে।" ১১

এই সাধনাকে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আহারে-বিহারে, এক কথায় সমগ্র জীবনে এই হওয়ার আদর্শেরই তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। আর আমাদের মনে হয়, শিক্ষার যথার্থ আদর্শ জানা নয়, হওয়া। অন্তত প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিক্ষার এই আদর্শই ছিল মনে হয়। সেখানে বিদ্যার্থীরা একটি বিশেষ আদর্শে মানুষ হত। তাঁদের অর্জিত জ্ঞান শুধু তথ্য মাত্র হয়ে থাকত না; তা রূপ নিত তাদের জীবনে। তপোবনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী গুরুর অধীনে ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংযমের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানে কর্মে প্রেমে আনন্দে তারা পরিপূর্ণ জীবনযাপন করে মানুষ হয়ে উঠতো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমেও শিক্ষার এই আদর্শেরই অনুসরণ করলেন। তিনি লিখছেন —"আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধ মোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। ......

শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা। সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সুসমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।" ১২

তপোবনের ব্রহ্মচারীদের ন্যায় শান্তি-নিকেতন আশ্রমের ব্রহ্মচারীরাও নিয়ম সংযম কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে, কবি এই ইচ্ছাই করেছিলেন। ভিৎ শক্ত না হলে যেমন কোন বড় ইমারত টিকতে পারে না, খুব ভাল করে চাষ না দিলে যেমন জমিতে ভাল ফসলের আশা করা যায় না, তেমনি জীবনের গোড়ার দিকে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনা না থাকলে পুরোপুরি মানুষ হওয়া যায় না—এই ছিল কবির বিশ্বাস। সেই জন্যই ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলেন। আশ্রমের প্রথম বিদ্যার্থীদের তিনি অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। দীক্ষা দেওয়ার পর তাদের উপদেশ দেন; তাতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন এবং উপসংহারে তাদের জীবনের উচ্চতম আদর্শের কথা বলেন। কবি এই বলে তাঁর উপদেশের উপসংহার করেন—"আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানে আছেন। ......প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে মনে করবে।" ১৩ এই মনে করবার মন্ত্র,—গায়ত্রী মন্ত্রটি তিনি তারপর তাদের বুঝিয়ে দেন।

সেই সময়কার অর্থাৎ আশ্রমের আদি যুগের ছাত্রদের সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তী মশায় লিখেছেন—"ছাত্রেরা নগ্নপদে থাকিত, জুতো ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, সকলে নিরামিষ আহার করিত। প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ং সন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় বসিতে হইত, তাহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। রন্ধন ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে হইত, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁধে* তাহারা স্নানার্থে গমন করিত; তারপর শুচি-স্নাত হইয়া উপাসনান্তে এখনকার লাইব্রেরীর মাঝের ঘরে বা সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বেদগান করিত। সকল ছাত্র ও অধ্যাপক সেই সময়ে মিলিত হইতেন। উপাসনান্তে ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বনছায়াতলে গিয়া উপবেশন করিত।" ১৪

আশ্রমে বিদ্যার্থীদের মানুষ করে তোলার ভার গুরুর। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন সক্রিয়ভাবে। কেননা, মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই প্রেরণা পাচ্ছে, সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষার্থ সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়, গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে; যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।" ১৫

এই গুরুর আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন এমনি আদর্শ গুরু। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের যেমন দ্বিতীয় নেই, তেমনি তাঁর মত বা তাঁর কল্পিত গুরুও একান্ত দুর্লভ। তবে একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ যেরকম গুরুর কথা বলেছেন, ঠিক তেমনি গুরু না পাওয়া গেলেও গুরুর সেই আদর্শকে যিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁকেই গুরু বলে মানা চলে। রবীন্দ্রনাথের সহযোগীরাও ছিলেন তেমনি গুরু। যার মধ্যে যে ভাব রয়েছে, তিনি যদি দেখেন সেই ভাবের সাধনার কোন্ ক্ষেত্র কোথায় প্রস্তুত হয়েছে, কোন্ সাধক সেখানে আসন গ্রহণ করেছেন, তাহলে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণেই তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথের অল্প কয়েকজন সহযোগী এমনিভাবেই এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরাও আশ্রমের কাজকে নিজেদের সাধনা বলেই মনে করতেন। এ'দের সম্বন্ধে কবি লিখ্‌ছেন—"যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে। কেননা, কর্ম ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প এবং অল্প যে কয়জন শিক্ষক আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন এতস্মিন খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ—এই অক্ষর পুরুষে আকাশ ওতোপ্রোত, তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন তমেবৈক জানথ আত্মানম্—সেই একমে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানে নয়, মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়-বুদ্ধিতে নয়, আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগ-ধর্মের উজ্জ্বলতা।" ১৬

শান্তিনিকেতন আশ্রমে মানুষ গুরু ছাড়া আর একজন গুরু আছেন প্রকৃতি।

ভারতীয় সাধনার একটি মূল তত্ত্ব বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা। প্রাচীন ভারতের তপোবনে এই তত্ত্বটির বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়েছিল দুটি সুরের সঙ্গম ক্ষেত্রে; একটি মানবাত্মার সুর আর একটি বিশ্ব-প্রকৃতির। শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্ব-প্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সঙ্গমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত।" ১৭

১১। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৭

১২। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেব-বর্মণকে লিখিত পত্র, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, পৃঃ ৩৫৭

১৩। রবীন্দ্র জীবনী পৃঃ ৩৭৮

* আশ্রমের দক্ষিণ দিকে এই বাঁধ বা জলাশয়টি এখনও আছে।

১৪। অজিত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, পৃঃ ১৩

১৫। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ২

১৬। জন্মদিনে, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

১৭। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বিশ্ব-ভারতী সং, পৃঃ ৩৫৭

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এখানকার শিক্ষা ব্যাপারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এখানকার উন্মুক্ত আকাশ, দূরে দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে-পড়া খোলা মাঠ, এখানকার গাছপালা, পাখী, ঋতুতে ঋতুতে এখানকার প্রকৃতির নব নব রূপ এখানকার বিদ্যার্থীদের চিত্তে দোলা দিয়েছে, সহায়তা করেছে তাদের আপন অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায়, সহজ আনন্দে বেড়ে উঠতে। যে বিশেষ জীবনাদর্শে ছেলেরা মানুষ হয়ে উঠবে বলে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন তার উপযোগী পরিবেশ রচনার প্রধান কাজ করেছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি। কবি তাঁর আশ্রমে প্রকৃতির সঙ্গে ছাত্রদের প্রাণের যোগটি যে কী রকম সহজ সেই সম্পর্কে লিখছেন—"ছেলেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়-ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি সঞ্চার করে।......আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন—যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গসঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমে ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানারকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।" ১৮

প্রকৃতির সঙ্গে ছাত্রদের এই যোগ পূর্ণ হয় জ্ঞানে ও কর্মে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"এই আশ্রমের গাছপালা পশুপাখী যা-কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জানবে এটি খুবই দরকার।" ১৯ এই জানাতে তাদের মন জাগবে চোখ-কাণ খুলবে, আর প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগটি হবে পাকা রকমের। তারপর, আশ্রমের এই সব গাছপালা পশু-পাখীর যথাসাধ্য সেবার ভারও ছেলেরা নেবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। ছেলেরা গাছ লাগাবে, গাছে জল দেবে, পাখীদের কাঠবিড়ালীদের খেতে দেবে, তবে না তাদের ভালবাসতে শিখবে। আর প্রকৃতির সঙ্গে এই ভালবাসার যোগ, এই আত্মীয়তার যোগ এইটেই ত রবীন্দ্রনাথের তথা ভারতের আদর্শ।

ভারতীয় সাধনার আর একটি বিশেষ তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে তাঁর কর্মে রূপ দিয়ে গেছেন। এটি উপনিষদের আনন্দ-তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ কবি। সত্যের আনন্দময় রসময় রূপের প্রকাশই তাঁর কাজ। এই জন্য, তাঁর সাধনা প্রধানত আনন্দেরই সাধনা। সেই জন্য, শান্তিনিকেতনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানকার আনন্দ। কবি বিশ্বাস করতেন আনন্দ না থাকলে কোন কল্যাণ-কর্মই হতে পারে না। ছেলেদের মানুষ করা ত নয়ই। যে-শিক্ষকের আনন্দ নেই তিনি কিছুই দিতে পারেন না আর যে-ছাত্রের আনন্দ নেই সেও কিছু দিতে পারে না। তাই, তিনি ইচ্ছে করতেন এখানকার সব কাজ হবে কর্মীদের অন্তরের সহজ আনন্দে, এখানকার নিয়ম সংযম কৃচ্ছ্রতা সে-সব মানতে হবে 'আনন্দের সঙ্গে। আশ্রম-বাসীকে তিনি নানা উৎসবে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে সাহিত্যালোচনায় একেবারে আনন্দে ভরপুর করে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের আনন্দ যদি চলে যায় তবে সে-জীবনে এগিয়ে আসবে মরু। নিষ্ফলতার হাহাকারে হবে তার পরিসমাপ্তি। তাই দেশের পরম দুর্দিনেও তিনি আনন্দোৎসব বন্ধ করতে রাজি হন নি।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের আদর্শ। নানা কর্মের, নানা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই আদর্শকে সফল করে তোলার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা আশ্রমের ছাত্রদের দিনকৃত্যের যে বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি তাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। ছাত্রদের অবশ্য পালনীয় অনেক নিয়ম তিনি রচনা করে গেছেন আর তাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন বহুবার। আত্মনির্ভরতা ছিল কবির জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র। তাই, তাঁর ছাত্রদেরও তিনি সব দিক থেকে আত্ম-নির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। এমন কি শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি এই নীতি মেনে চলতেন। তিনি লিখেছেন—"শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা আমার বলবার আছে, যা আর কেউ শেখায় তা শেখা যায় না, যা নিজে শিখি তাই আসল শেখা।" ২০। ছাত্র নিজেই শিখবে। তার জন্য চাই শুধু উপযুক্ত পরিবেশ—শিক্ষকের সহায়তা সেই পরিবেশেরই সামিল। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় আমাদের দেশে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন ছাত্র-স্বরাজের। কবি ইচ্ছা করেছেন তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজেদের সব কাজ কর্ম যতটা সম্ভব নিজেরাই করবে, এমন কি নিজেদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলারক্ষার ভারও নেবে ছাত্রেরাই। তাতে করে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে শিখবে, আর নিজেদের কাজের ভালমন্দর দায়িত্ব নিজেরাই নেবে বলে পরস্পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করবার কাপুরুষোচিত প্রবৃত্তি তাদের থাকবে না। কবি লিখেছেন—"এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।" ২১

কবি সুন্দরের পূজারী। অসুন্দরকে তিনি কোথাও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিদ্যা-লয়ের ছাত্রেরা অন্তরে-বাইরে সুন্দর হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর কামনা। তিনি চাইতেন তাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম সবই সুন্দর হবে। তিনি চাইতেন তারা "আপনার চারদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্রবাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তুলবে। এই একত্রবাসের সতর্ক দায়িত্ববোধ সভ্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া এই বোধটি জন্মায় না। কবি তাঁর বিদ্যালয়ে সেই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের আপন সাধনারই একটি অঙ্গ। তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরও তিনি তাঁর সাধনার সঙ্গী বলেই মনে করতেন। তাঁর বিদ্যালয়কে ও এখানকার ছাত্রদের তিনি কী চোখে দেখতেন আমরা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানা থেকে তা জানতে পারব।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅতুলেন্দু সেনকে ১৩১৮ সালের ২০শে আশ্বিন তিনি পত্রখানা লেখেন। তাতে লিখেছেন,—"...তোমরা আমার উচ্চতম সাধনার সঙ্গী। তোমাদেরই জীবনের মধ্যে আমার সকল তপস্যার সার্থকতা। তোমাদেরই জীবনের মধ্যে আমার জীবন, আমার পূর্ণতার সার্থক মূর্তি দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে—তাঁহাকে তোমরা নিরাশ করিয়ো না তোমাদের সকলের কাছে আমার এই প্রার্থনা। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই আমার এই আশীর্বাদ জানাইয়ো। তোমাদের অন্তরের কেন্দ্রস্থল হইতে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আপনার সমস্ত সৌন্দর্য ও পবিত্রতা লইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে বিকশিত হইয়া উঠুক। তোমরা মহৎ ভাবে চিন্তা করিতে শেখ—উদারভাবে কর্ম করিতে থাক—অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যের মধ্যে তোমাদের মুক্তি হউক। মঙ্গল হউক, সর্বতোভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক এবং যেখানেই যখন তোমরা থাক চারিদিকেই মঙ্গল বিকীর্ণ করিয়া বিরাজ কর—প্রতিদিনই জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে চিত্তকে স্থাপন

১৮। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ৩
১৯। শিক্ষা, পৃঃ ২৫২

২০। ১১।১।১৯৩৫ তারিখে শ্রীবিমল মিত্রকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র।

২১। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃঃ ৬

কর এবং প্রতিদিনই ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর যিনি তোমাদিগকে স্বার্থের সংকীর্ণতা ও অসৎ প্রবৃত্তির আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত জীবনের অভিমুখে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।।"

এখানেই শান্তিনিকেতনের সত্যিকারের বিশেষত্ব। এখানকার গুরু ও শিষ্যের "অন্তরের কেন্দ্রস্থল হইতে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আপনার সমস্ত সৌন্দর্য ও পবিত্রতা লইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে বিকশিত হয়ে উঠবে।" এইটি এখানকার মূল তত্ত্ব এইটিই লক্ষ্য। এখানকার নিয়ম-সংযম, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কাজকর্ম, এখানকার নৃত্যগীত আনন্দোৎসব সব কিছুই এই মূল তত্ত্বটিকেই প্রকাশ করছে।

কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নি। এর মূল তত্ত্বটি ভাবরূপে ছিল তাঁর মনে, ছিল তাঁর জীবনের সংগে অবিচ্ছিন্ন হয়ে। সেই জন্য তাঁর জীবনে যেমন যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাঁর আশ্রমে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন,—"এই আশ্রমটি কবির জীবনের তাপমান যন্ত্রের মত; উত্তরকালে কবির জীবনে যেসব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যে সমস্ত নব ভাবের সমাবেশ হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানও সেই অনুসারে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়াছে।" ২২

সত্যের পূজারী যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্যের দিকে। বিশেষ কোন রূপের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, পরিবর্তনকে তিনি ভয় করেন না। তিনি জানেন সত্য এক এবং অপরিবর্তনীয়, কিন্তু পরিবর্তন ঘটে তার বাইরের প্রকাশের। শান্তিনিকেতনেও তাই হয়েছে। তার মূল সত্য অপরিবর্তনীয় কিন্তু বাইরের রূপ বদলে গেছে। এটা স্বাভাবিকই হয়েছে। শিশু স্বভাবের নিয়মেই পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠে, চারাগাছ হয় মহীরূহ। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই পরিণত রূপ পরবর্তীকালের বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী ভারতীয় সাধনারই মর্মকথা প্রকাশ করছে। কী এই সাধনা? রবীন্দ্রনাথেরই কথায় এই সাধনা—"প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।" ২৩ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন জগতের কাছে ভারতের এই সাধনার কথা প্রকাশ করার বিশেষ দায় রয়েছে ভারতবাসীর। ভারতবাসী অন্যের কাছে কেবল হাত পাতবে, অন্যকে কিছুই দিতে পারবে না, সত্যি সত্যি এমন দীনহীন অবস্থা তার নয়। সে আত্মবিস্মৃত; নৈলে দেখতে পেত সম্পদ তার অফুরন্ত। সে সম্পদ বস্তুগত নয়, আত্মিক। তারই জন্য জগৎ আজ বুভুক্ষিত। ভারতকে তা দিতে হবে, আর অন্যের যা শ্রেষ্ঠ আছে, তা তাদের কাছ থেকে নিতে হবে এমনি করে দেওয়া-নেওয়ায় মানুষের সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতে বিধাতার একটা বিশেষ ইচ্ছা কাজ করছে। এ দেশকে তিনি যেন মহামানবের মিলন-তীর্থ করতে চান। তার জন্য সেই আদিযুগ থেকে এখানে কত বিচিত্র জাতিকেই না তিনি টেনে এনেছেন। আর তাদের সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত প্রভেদের মধ্যে পরম ঐক্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার বিরাট সাহিত্যের মধ্যে এই ভাবটি বহুবার প্রচার করেছেন। তিনি জানতেন বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষ মিলতে পারে না; সেখানে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে; মিলনের ক্ষীণ সূত্র সহজেই ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সত্যলাভের ক্ষেত্রে, আত্মার ক্ষেত্রে মানুষ মিলতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্র তেমনি একটি ক্ষেত্র। তাই, বিশ্বমানবের মিলনভূমি হ'ল বিশ্বভারতী। কবি তাঁর 'ভারততীর্থের' ভাবকে এখানে বাস্তব রূপ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা পরম একের সাধনা। বিশ্বভারতীতে দেখা গেল তারই একটা বিশেষ প্রকাশ। এই জন্যই বিশ্বভারতী সম্পর্কে মহাত্মাজীকে লিখিত তাঁর একখানা পত্রে তিনি লিখেছেন—

"Viswa Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure." 24—

"বিশ্বভারতী যেন একটি পণ্যতরী। সে বহন করে নিয়ে চলেছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। জগতের আজ বড় দুর্দিন। মানুষে মানুষে ব্যবধান আজ দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল; হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী মরিয়া হয়ে উঠল আত্মবিনাশের অন্ধ আবেগে। মানুষের সভ্যতার এই চরম সংকটের দিনেই ত বিশ্বভারতীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এর মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের ঋষি কবি ভারতীয় সাধনার যে মর্মবাণীকে রূপ দিতে চেয়েছেন, যে পরম একের কথা বলেছেন, যে মহামিলন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, মানুষ যতদিন তাকে নিজের জীবনে গ্রহণ না করেছে, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সংগে ততদিন জগতের কল্যাণ নেই; ততদিন শান্তি নেই। কেননা, এই পরম এককে স্বীকার না করলে সত্যিকারের ঐক্য থাকতে পারে না। আর ঐক্য যেখানে নেই, সেখানে কল্যাণও থাকতে পারে না এবং যেখানে কল্যাণ নেই, সেখানে শান্তিও নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব।" ২৫

মনে হয় সেদিন এল বলে, যেদিন জগতের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত দিশেহারা মানুষ বলবে পথ কোথায়; আলো কই, আর বিশ্বভারতী তাদের পথের সন্ধান দেবে, তাদের দেখাবে আলো; যেদিন নূতন যুগের ভোরে বেরিয়ে আসবে তরুণ যাত্রীদল, বলবে আমরা বেরিয়েছি নতুন জগৎ গড়ে তুলতে, আমাদের মন্ত্র কই, আর বিশ্বভারতী তাদের দেবে সেই মন্ত্র, সেই পরম একের মন্ত্র যে মন্ত্র বলে—"মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।"

২২। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, পৃঃ ১৯৪
২৩। স্বদেশ, পৃঃ ৫৩

24—Tagore's letter to Gandhijee, published in Harijan of 2.3.40.
২৫। শিক্ষা পৃঃ ১৯১

—আট—

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তেমনি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রবার্টস। শিরাস্নায়ুতে নর্ডিক নীলরক্ত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে বারে বারে। কপিশ চোখে বন্যহিংসা জ্বলছে—বন আর বাঘ-ভালুকের সংস্পর্শে থেকে রবার্টস তাদের স্বভাবেরও খানিকটা আয়ত্ত করে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

হাতের সামনে জাপানীরা নেই। যারা মালয় কেড়ে নিয়েছে, যারা ডুবিয়ে দিয়েছে প্রিন্স অব ওয়েলস, সমুদ্র শাসক ব্রিটানিয়াকে যারা সমুদ্রের তলায় চালান করে দেবার মতলব করেছে, তাদের কাউকে হাতের সামনে পাচ্ছে না রবার্টস। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রু যে আছে সেও নিতান্ত অবহেলা বা অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। এই চরম দুর্বল মুহূর্তে আর চূড়ান্ত দুঃসময়ে সাপের মতো এরা এসে মাথা তুলেছে মাটির তলা থেকে। কিন্তু এই উদ্যত মাথাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে—ব্রিটানিয়া শুধু সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সসাগরা পৃথিবীর মাটিতেও তার তুল্য মূল্য অধিকার, তার সমান মর্যাদা।

মাথার ভেতরে হুইস্কির নেশা। বাঘের মতো দৃষ্টিতে অনিমেষের দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টস। যেন গ্রাস করবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তাকে। শুনেছিল জাপানীরা নাকি দরকার হলে নরমাংস খায়, সেও দেখবে নাকি একবার?

দূরে কুলিরা ভীত, বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না তারা, কথা বলবার শক্তি বা সাহস পাচ্ছে না কেউ। মাইনে বাড়াবার দাবী তুলেছিল, সে দাবীর জবাব রবার্টস তৈরী করে রেখেছে তার দুনলা বন্দুকের মুখে। তাদের মধ্যে হঠাৎ এসেছিল অনিমেষ, এসেছিল একটা নতুন পৃথিবীর খবর নিয়ে। কোথায় নাকি এমন একটা দেশ আছে যেখানে মালিক বলে কেউ নেই, যেখানে কথায় কথায় বুকে পিঠে বুটের লাথি এসে পড়ে না। যেখানে খাটুনি কম। মজুরী বেশি। যেখানে ওরা সব, ওদেরই সব। ম্যানেজার নেই, সুপার-ভাইজার নেই, বাগানের ছোট বড় লাটসায়েব বাবুরা নেই, বেগার খাটুনি নেই। যেখানে কুলির ছেলে বাবুদের চাইতেও বেশি লেখাপড়া শেখে, বাবুদের চাইতেও বেশি রোজগার করে। ব্যানার্জিবাবু সেই দেশের খবর ওদের দিয়েছিল—আশ্বাস দিয়েছিল সেই দেশের মানুষদের মতো ওরাও সব পারে, এত বড় পৃথিবীটার যা কিছু আছে সব চলে আসবে ওদেরই হাতের মুঠির ভেতরে।

সব কথা ওরা বোঝেনি, যতটুকু বুঝেছিল তাই ওদের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল একটা বিচিত্র আস্বাদ, একটা বিপুল অনুভূতি। আশায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মন। ব্যানার্জি বাবুকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিলঃ ব্যানার্জিবাবু সব করতে পারে, তাদের গুণিনদের মতো অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে। একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে ওরা উঠে দেখবে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োয় একটা নতুন সূর্যের আলো পড়েছে; ম্যানেজার নেই, বাবুরা নেই। কলটা ওদের—বাড়িঘরগুলো ওদের—সব ওদের, শহরও ওদের। সেই দিনের আসন্ন ইঙ্গিত যেন ওরা শুনতে পাচ্ছিল।

কিন্তু কী হল— এ কী হয়ে গেল।

সমস্ত মন নিরাশার মধ্যে তলিয়ে গেছে। সামনে ব্যানার্জিবাবু পড়ে আছে রক্তাক্ত হয়ে। ওদের জীবনে যে সম্ভাবনার কথা ওরা শুনেছিল তা একটা নিছক রূপকথা। যা আছে তাই সত্য—যা এতকাল চলে আসছে তাই সত্য। কিছুই বদলাবে না। চিরকাল ওদের বুকের সামনে বন্দুকের নলটা উঁচু হয়েই থাকবে, চিরদিন ওরা ভয় করেই চলবে। কাঞ্চন-জঙ্ঘার মাথার ওপরে সে সূর্য আর কখনো উঠবে না।

রবার্টস আগুন ঝরা গলায় বললে, কী, সব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো যে? কুলিরা কাঁপতে লাগল; কথা বলতে পারল না।

—এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও—আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাও। ছুঁড়ে ফেলে দাও জঙ্গলের মধ্যে। গো—

এক পা এক পা করে কুলিরা এগোতে লাগল। রক্ত শুধু অনিমেষের গা থেকেই ঝরেনি, তাদের বুকের ভেতরেও যেন ওই আঘাতগুলো এসে পড়েছে।

—আর শোনো। এর একটি বর্ণও যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। যদি কেউ বলে, তার অবস্থাও ঠিক এই রকম হবে—রিমেম্বার।

কুলিরা অনিমেষের দেহকে বহন করে নিয়ে গেল।

সপদদাপে ঘরে ঢুকল রবার্টস। মনের মধ্যে ভয়ংকর কী একটা ঘটে চলেছে। যেন একটা প্রচণ্ড যুদ্ধে গৌরবময় জয়লাভ হয়েছে তার। নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাসের একটা প্রবল উদ্দীপনা। আঃ কেন সে যোগ দিলে না যুদ্ধে? আজ যদি সে সেনাপতি হত, তাহলে মালয়ের যুদ্ধের ইতিহাসটাই হয়তো বদলে যেত, সব কিছু হয়ে যেত সম্পূর্ণ অন্যরকম। রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভ্‌স—

ঘরে ঢুকে আরও দুপেগ্‌ হুইস্কি গিললে সে। একটা মাসিকপত্র খুললে, প্রথমেই বেরিয়ে পড়ল অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের একটা ছবি। দ্য ডেভিল দ্য মনস্‌টার। দাঁতের ভেতর থেকে বেরুল একটা চাপা রূঢ় গর্জন। পরক্ষণেই পত্রিকাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললে রবার্টস।

তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা কিল মারলে কলিং বেলটার ওপরে। বেলটা শুধু যে বেজে উঠল তাই নয়, টেবিলটা শুধু কেঁপে উঠল থর থর শব্দে। ওটা কাঠের টেবিল না হয়ে যদি তোজোর মাথা হত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়ো হয়ে যেত বোধ হয়।

কম্পিত পায়ে সাঁওতাল কুলি ঢুকল একটা।

—ডাক্তার কো বোলাও—

—জী—

কুলিটা পালিয়ে বাঁচল। হাতের পাশেই রবার্টসের দো-নলা বন্দুকটা দাঁড়ো করানো। মগজের ভেতরে হুইস্কির আগুন নেচে বেড়াচ্ছে। বন্দুকের একটা গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার দিকে ছিটকে আসাটা আজকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে।

খবর পেয়েই যাদব ডাক্তার এল। ঘটনাটা নিজের চোখেই দেখেছে সে সমস্ত। শ্রাদ্ধ এ পর্যন্ত গড়াবে কল্পনাও সে করতে পারে নি। তাই নিজের মনের ভেতরে এক ধরণের অনুতাপ তাকে পীড়ন করছিল। কিন্তু এ সময়ে তাকে আবার খবর কেন? আশঙ্কা হচ্ছিল।

বলির পশুর মতো যাদব ডাক্তার এসে সেলাম দিলে।

—সিট্‌ ডাউন ডাক্তার।

ডাক্তার তবু দাঁড়িয়ে রইল। অপাঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল রবার্টসের হাতের পাশেই রাখা টোটাভরা দোনলা বন্দুকটার দিকে।

—ইয়েস স্যার—

রবার্টস বিকটভাবে ধমকে উঠলঃ নো—নো ইয়েস স্যার। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো।

—ই—ইয়েস স্যার—জড়িত গলায় অস্পষ্ট-ভাবে জবাব দিয়ে একটা পুঁটলির মতো যাদব ডাক্তার ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

রবার্টস তখন গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। মদের পর মদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আজ তার মনের সব কিছু সীমাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। রক্তের মধ্যে তার যেন যুদ্ধের বিউগল বাজছে। যাদব ডাক্তার আড়ষ্ট দৃষ্টিতে রবার্টসকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—খাবে একটু?

—নো স্যার—এক্সকিউজ মি—

—হো—হোয়াই? রবার্টসের দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগলঃ তুমিও কি ওদের সঙ্গে ভিড়েছ নাকি? আমাকে দিয়েছ বাদ দিয়ে? হো—হোয়াট্‌স ইয়োর আইডিয়া?

—নাথিং স্যার—

—দে দেন হো-হোয়াই? কেন খাবে না?

—মানে, আ-আমি ওসব বেশি স্ট্যান্ড করতে পারি না স্যার—

—রা-রা-রাস্কেল।

ফট্‌ করে একটা সোডার বোতল খুললে রবার্টস। হুইস্কি ঢাললে গেলাসে। সমস্ত শরীরটা তার টলছে, তবু আজ মদে বিরাম দেবে না সে! রক্তে রক্তে বিউগ্‌ল বাজছে, স্নায়ুর ভেতরে সে শুনতে পাচ্ছে যেন টর্পেডোর বিস্ফোরণে ফেনায়িত প্রশান্ত সাগরের উত্তাল গর্জন।

—ডাক্তার—

—ইয়েস স্যার?

—কী ভেবেছ? স্বাধীন হয়ে গেছ তোমরা?

—না স্যার, কক্ষনো না।

—ভেবেছ, যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, তাই না? এইবার তোমরা আমাদের বুকের ওপরে চেপে বসবে।

—নেভার স্যার। যাদব ডাক্তার নেশা করেনি, তবুও তার গলা জড়িয়ে আসছেঃ আমি কখনো একথা বিশ্বাস করি না। ওয়ারফান্ডে আমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছি।

—রিয়্যালি? বেশ, বেশ? আই ওয়াণ্ট এ ডগ লাইক ইউ। আর ইউ নট এ ডগ ডাক্তার?

—ডগ স্যার?—যাদব ডাক্তার মাথার মসৃণ টাকটাকে চুলকে নিলে এইবারেঃ ই ইয়েস স্যার এ ভেরি লয়্যাল ডগ।

রবার্টস টলছে, চোখের রাঙা দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে ক্রমশ। অস্বাভাবিক গলায় বলে চলল, দ্য জার্মানস আর ডগস, দ্য জাপ্‌স আর ডগস, দ্য ইণ্ডিয়ানস আর ডগস। ইউ আর এ ডগ ডাক্তার।

সার্টেনলি স্যার।

—ডাক্তার, কুকুর কি কখনো স্বাধীনতা দাবী করতে পারে?

—কখনো না স্যার।

—কুকুর সব সময় লাথি খাওয়ার জন্যে তৈরী থাকে নিশ্চয়?

—নিশ্চয় স্যার।

ঘোলা চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রবার্টস। মদের নেশায় সমস্ত চিন্তা আর বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। একটা অপরিসীম ঘৃণা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে অনুভূতির অন্ত প্রত্যন্তে। জার্মানদের ওপরে ঘৃণা, জাপানীদের ওপরে ঘৃণা, ইণ্ডিয়ানদের ওপরে ঘৃণা। দুর্দিন আর দুঃসময় এসেছে বলেই আজ মাটির তলা থেকে কেঁচোরা অবধি কেউটে হয়ে উঠেছে। ব্যানার্জিবাবু! ছদ্মবেশে ঢুকে তারই রাজ্য-পাটে ভাঙন ধরাবার উপক্রম করেছিল! দ্য ডগ! আর সামনে বসে আছে যাদব ডাক্তার। তাদেরই একজন, তাদেরই মতো কালো চামড়া। হোক লয়্যাল, তবু এ ডগ ইজ এ ডগ আফ্‌টার অল।

—ইউ থিঙ্ক সো?

—ই ইয়েস স্যার—তেমনি শঙ্কিত গলায় যাদব ডাক্তার জবাব দিলে।

—দেন—

বিদ্যুৎগতিতে রবার্টস উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা লাথি ঝেড়ে দিলে যাদব ডাক্তারের বুকের ওপরে। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরুল কি বেরুল না, পর মুহূর্তেই চেয়ার শুদ্ধু যাদব ডাক্তার হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মেজেতে।

প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম পুরস্কার। মিনিটখানেক যাদব ডাক্তার হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল মেজেতে। বিনা মেঘে বাজ নেমেছে আকাশ থেকে। ব্যথার চাইতেও বেশি জেগেছে বিস্ময়—কী অপরাধে এই শাস্তি?

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। তার চোখের সামনে রবার্টসের চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা করলে ওই রকম আরো দু একটা লাথির পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তড়িৎগতিতে সে উঠে পড়ল, তারপর মুক্তকচ্ছ হয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল বাইরে। কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম পুরস্কার। একটুর জন্যে মাতালের লাথিতে তার দুর্মূল্য মহাপ্রাণীটা বেরিয়ে যায়নি। রবার্টস হো হো করে হেসে উঠল। যাদব ডাক্তারের পলায়নটা ভারী উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে তার।

অ্যানাদার ভিক্টরী। আজকে মালয় ফ্রণ্টে থাকলে নির্ঘাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত রবার্টস।

কুলিরা অনিমেষকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল—নিয়ে এল ফ্যাক্টরীর সীমানার বাইরে। যারা এতক্ষণ রবার্টসের বাংলোর সামনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও সন্ত্রস্তভাবে পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে লাগল।

রবার্টস বলে দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিতে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কোন গণ্ড-গোলই আর থাকবে না তা হলে। সেইখানেই পড়ে থাকবে, শেয়ালে বা অন্য জানোয়ারে খেয়ে শেষ করে দেবে। কোন দায়িত্ব থাকবে না রবার্টসের, কোন অসুবিধাও না। জানোয়ারে যাকে মেরে ফেলেছে, তার সম্বন্ধে রবার্টস আর কীই বা করতে পারে?

কিন্তু কুলিরা অনিমেষকে ভেতরে নিয়ে গেল না।

বনের আড়ালে তখন দিনান্ত ঘনিয়ে আসছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োর ওপর দিয়ে রক্তের ধারা যাচ্ছে গড়িয়ে। অনিমেষের সর্বাঙ্গেও রক্ত। ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ছে। নাক দিয়ে কপাল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত নামছে, দিনান্তের আলোয় সে রক্ত জ্বলছে চুনীর মতো। নির্মমভাবেই তাকে মেরেছে রবার্টস।

কুলিরা অনিমেষকে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে। শুইয়ে দিল চা গাছের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তারপরে জটলা করতে লাগল কী করা যায়।

না—কখনোই না। প্রাণে ধরে তারা ব্যানার্জিবাবুকে কখনো জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে না। তাকে বাঁচাবে, তাকে লুকিয়ে রাখবে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন এখনো মুছে যায়নি মন থেকে। রবার্টসের বন্দুকের নল দেখে ভয় পেয়েছিল, সাময়িক-ভাবে একটা নৈরাশ্য আর অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ওদের চেতনাকে। কিন্তু সেটাই সব নয়—সেটাই শেষ কথা নয়।

ওদের রক্তের মধ্যে ডাক এসেছে। পৃথিবী ওদের, দিন ওদের, আগামী কালের যা কিছু সব ওদের। ভয় পেলে চলবে না। এর শোধ দিতে হবে, এর বদলা নিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। এখানকার চা বাগানের বিষাক্ত বাতাস আর কালাজ্বরের মৃত্যু-বীজানু ওদের নির্জীব করে ফেলছে বটে, কিন্তু এই ওদের শেষ পরিচয় নয়। এই বাগানে যখন আড়কাঠি ওদের ভুলিয়ে আনে, তার আগে ওদেরও দিন ছিল, ওদের দিগন্ত ব্যাপ্ত আকাশ ছিল একটা। ওদের পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়ার গন্ধ ভাসত, ওদের দেশে এমনি করে ফুটত শালের ফুল। ওরা সজীব ছিল—ওরা সেদিন কুলি ছিল না মানুষ ছিল। দিন মজুরীর বদলে কথায় কথায় ওদের কেউ লাথি মারতে পারত না, চোখ রাঙাতে পারত না। সেদিন ওরা তীর শানিয়ে রাখত, টাঙীতে ধার দিয়ে রাখত। আজ ওদের সেই তীর ভোঁতা হয়ে গেছে, মরচে পড়ে গেছে ওদের টাঙীতে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ এসেছে, এসেছে ওদের যুদ্ধের দিন। আবার ওরা নতুন করে সেই অস্ত্রগুলোকে শান দেবে—এর বদ্‌লা নেবে।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন কী করা যায়? (ক্রমশঃ)

কবির পদ্মা

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য, দুই তীর-ভূমির মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিতা। এক দিকে ঘনবসতি পল্লী, প্রৌঢ় শস্যক্ষেত্র, প্রাচীন বয়সের আম কাঁঠালের বাগান, আর একদিকে নূতন-জাগা কোমল চর, জলচর পাখীর পায়ের চিহ্নগুলি এখনো তাহাতে অবিকৃত, একদিকে সুউচ্চ তটভূমির প্রান্ত ঘেঁসিয়া বিদেশী মাল্লার দল ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়া গুণ টানিয়া চলিয়াছে, আর একদিকে নিষ্কলংক কন্যাভূমির শুচি-শুভ্রতা দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত; পূর্বতীরে তাহার সূর্যোদয়, আর পশ্চিমতীরের দূরতম প্রান্তে নিমজ্জমান সূর্যগোলকের শেষতম বিন্দুটি পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়—আর এ দুইকে সংযুক্ত করিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের নীলকান্ত পাষাণের নির্মল তোরণ, নিম্নে পদ্মার জলপ্রবাহ, বর্ষায় গৈরিক, শরতে নীলাভ, শীতান্তে নীল।

রবীন্দ্রনাথের পদ্মা প্রবাহের এক দিকে—

'কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউ ঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে পড়া পাড়',

আর,— 'কভু শান্ত হাম্বাম্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূরে শূন্য পরে
চিলের সু-তীব্র ধ্বনি, কভু বায়ু ভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর, মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত
শান্তিরাশি।'

আর একদিকে—

'নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশুদিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেতো আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে—প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মতো দেখা যেতো—আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে।'

আবার—

'আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শীষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।'

এই গেল পদ্মার দুই তীরের অবস্থা। আর ঊর্ধ্বে—

'স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার',
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা।'

আর ওই সঙ্গে নিম্নে—

'ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্ধ-মগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে, তার স্নেহ জ্বালাতন।'

সংসারের গতি স্বর্গ হইতে মর্তে প্রত্যাবর্তনের পথে দুষ্যন্তের রথের মতো—কাছের জিনিষ দূরে যাইতেছে—দূরের বস্তু
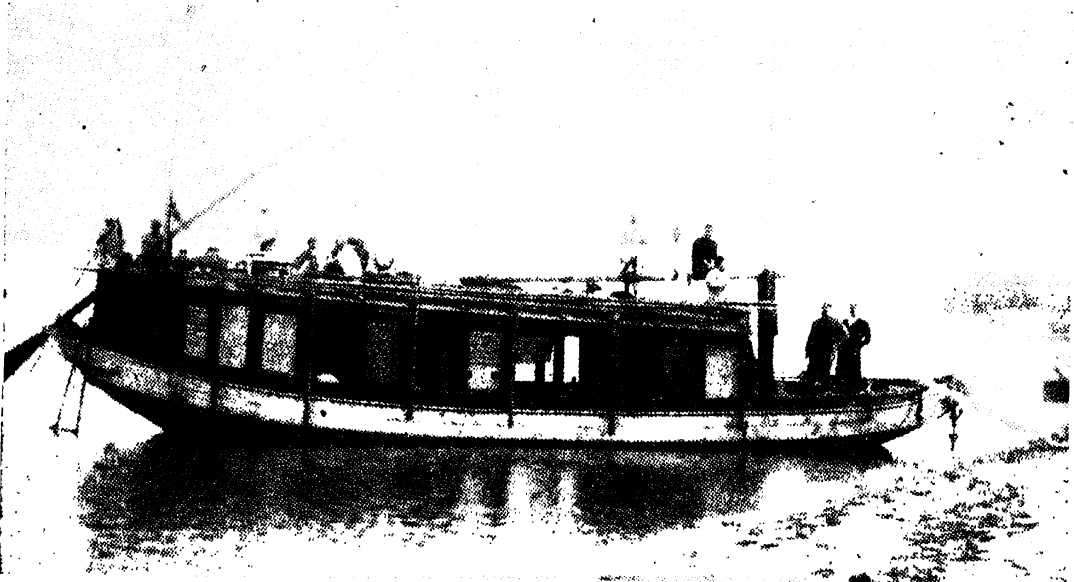
পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের বোট

কাছে আসিয়া পড়িতেছে—ছোট বড়, এবং বড় ছোট হইতেছে—আমরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুষ্মন্তের মতো নিত্য নিয়ত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। কবির পদ্মাও এই নিয়মের অন্তর্গত। বহুকাল পরে পরিচিত পদ্মা কবির কাছে অপরিচিতপ্রায়া।

"...এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সব শেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বন রেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটা ঝাপসা বাষ্প-রেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হ'য়েছে। এইতো মানুষের জীবন: ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।'

এই যদি জীবনের ধর্ম হয়, ইহজীবনেই যদি একদা-প্রিয় অপরিচিত হইয়া পড়ে তবে কবির সেই আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কোথায়? পরজন্মে পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসিলে পদ্মা কবিকে চিনিতে পারিবে এমন ভরসা কি জোর করিয়া করা চলে? অথবা যে-পদ্মা পূর্ব দিগন্ত হইয়া অপসৃত হইতে হইতে পশ্চিম দিগন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে—সে কি কবির জীবনের গতির সঙ্গেই তাল রাখিয়া চলিতেছে না? কবির জীবনের অস্তাচল ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইবার জন্যই কি সে পূর্বাচলের দিগন্ত পরিত্যাগ করে নাই? আর আজ যখন কবি পশ্চিম দিগন্তেরও পরপারে অস্তমিত—তখন কবির পদ্মা কি তাঁহার সহগমন করে নাই। নদীকে সর্পিণী বলা হইয়া থাকে—তাহা যদি হয় তবে সর্পিণী কি নির্মোকখানা মাত্র ফেলিয়া রাখিয়া সূক্ষ্মতর শরীরে প্রস্থান করে নাই! আমরা যাহাকে এখন পদ্মা বলিতেছি—তাহা যে তাহার নির্মোক মাত্র নয়—তাহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে?

শুধু পদ্মা কেন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই অনন্ত নাগিনী। সে মুহুর্মুহু নির্মোক পরিত্যাগ করিতেছে। আমরা তাহার খোলসটা মাত্র দেখি, কবিরা দেখিতে পান তাহার স্বরূপকে। কেবল খোলসটা দেখি বলিয়াই বিশ্ব আমাদের চোখে বস্তুপিন্ড। নদী বারি-প্রবাহ, তরু অঙ্গারের বিকার, পাহাড় প্রস্তর-স্তূপ—আর আকাশ অগাধ শূন্যতা। সেই-জন্যই কবির পদ্মায় আর আমাদের পদ্মায় এত প্রভেদ। কবির পদ্মা চিত্রাঙ্গদা বলিয়াই কবির সহিত তাহার গান্ধর্ব পরিণয় সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের কাছে সে মানচিত্রের নির্জীব নীল রেখা।

কবির সহিত পদ্মার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহা চিন্তা করিতে মন সরে না। কবি-স্বর্গে পদ্মা সূক্ষ্মতর স্বরূপে বিরাজ করিতেছে বরঞ্চ এই জল্পনা করিয়াই সুখী হইব। স্বর্গের ভূ-বৃত্তান্ত আমার ভালো জানা নাই—তবু মনে হয় সেখানে পদ্মার অনুরূপ একটা নদী আছে এবং সেই নদীর ঘাটে সোনার তরী নামে একখানা বোট বাঁধা। মৃত্যুর পরে কবি সেই পরিচিত নদী, সেই পুরাতন নৌকা দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছেন। আপন অভ্যস্ত কোণটিতে গিয়া বসিয়াছেন। তপসে, ফটিক প্রভৃতি মাঝি মাল্লার দল নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা নিজ নিজ স্থানে আসিয়া লগি, বৈঠা, হাল ধরিয়া বসিয়া অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। এ যাত্রার আর শেষ নাই—কারণ এ যাত্রা লক্ষ্যহীন, যে-নিরন্তর অবাধ গতির স্বপ্ন খণ্ডিত, বিস্মিত সারা জীবন ধরিয়া কবি দেখিয়াছেন—ওখানে তাহারই—যেন পরমাসিদ্ধি!

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[৭]

ডিসেম্বরের শেষদিকে। প্রথমদল নিয়ে যাত্রা করলো, লেফটেন্যান্ট প্রসারকর। তার দু'দিন পরে আমিও পঞ্চাশজন রুগী ও পঁচিশজন নার্সিং সিপাহী নিয়ে যাত্রা করলাম। কিছুদূরে, প্রায় বারো মাইলের পর এক জায়গাতে পুল ভেঙেছে, কাজেই আপাতত ট্রেণ চলাচল বন্ধ। আমরা লরী করে এসে নৌকাতে নদী পার হয়ে রেল স্টেশনের প্রায় এক মাইল দূরে একটী গ্রামে আশ্রয় নিলাম। সঙ্গে কয়েকজন ছিলো, যাদের সাহায্য ব্যতিরেকে চলা অসম্ভব। পরদিন সন্ধ্যায় স্টেশনে খবর নিয়ে জানলাম, আজ রাতে গাড়ী চলার আশা আছে। গ্রামে গরুর গাড়ী, ভাড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সঙ্গে কয়েকটি অক্ষম রুগী, তাছাড়া প্রত্যেক দলের সঙ্গে পনের দিনের মতো 'রাশন' ও রান্নার বাসন-কোসন। কাজেই গরুর গাড়ী না পাওয়াতে বড়ই ভাবনায় পড়তে হল। খবর নিয়ে শুনলাম, কাছাকাছি জাপানীদের লরীর আড্ডা আছে। সেখানে গিয়ে ভাঙা ভাঙা জাপানীতে তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে, একটি লরীর বিশেষ দরকার। তারা রাজী হয়ে সন্ধ্যার আগে আমার কাছে দুটী লরী পাঠিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় গাড়ী পেয়ে আমরা তাতে চড়লাম কিন্তু গাড়ী খুব বেশী দূর যেতে পারলো না। অল্প দূরে—মাত্র 'চৌসে' (Kyaukse) পর্যন্ত এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরাও এখানেই নেমে পড়লাম। স্টেশনগুলির কাছাকাছি থাকা মোটেই নিরাপদ নয়, অথচ এই সমস্ত রুগী ও মালপত্র নিয়ে দূরে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। যাই হোক প্রায় আধ মাইল দূরে একটি জনহীন পল্লীতে আশ্রয় নিলাম। এখানে ক্যাপ্টেন মল্লিকের দলও এসে হাজির হল। সকালে বাজার থেকে কিছু দুধ ও কমলা লেবু কিনে আনলাম। দুধের চা তৈরী হল। রুগীদের রান্না করে খাওয়ান হল। এখানে আমাদের একটি 'মোটর ইউনিটের' শাখা ছিলো। সেখান থেকে আমার দলের জন্য দুটি লরীর বন্দোবস্ত করলাম একেবারে 'কুমে রোড' পর্যন্ত—এখান থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে। এবার যাতে আমাদের পথে কষ্ট না হয় সে জন্য আগে থেকে বিশ মাইল পঁচিশ মাইল দূরে ক্যাম্পের বন্দোবস্ত হয়েছে। 'কুমে রোডেতেই' এই রকম একটি ক্যাম্প আছে। স্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে, রাস্তার কাছাকাছি এক বড় পরিত্যক্ত গ্রামে আশ্রয় নিলাম। সকালে দেখি ডাঃ প্রসারকরও এখানে আটকা পড়েছেন। শুনলাম আশপাশের স্টেশনগুলির উপর বোমা বর্ষণ হওয়াতে গাড়ি একেবারে অচল। কাজেই ঠিক কবে নাগাদ যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলা যায় না। এখানকার ক্যাম্পে 'রাশনে'র বন্দোবস্ত ছিলো, কাজেই সঙ্গের জিনিস ব্যবহার না করে এখান থেকেই প্রত্যহ 'রাশন' নিতে সুরু করলাম। আমার পরেই ডাঃ মল্লিক তাঁর দল নিয়ে এসে পেঁাছালেন। মল্লিকের দলে বেশীর ভাগই কঠিন রুগী। তারপর এলেন ডাঃ শান্তিস্বরূপ, তারপর ডাঃ বাম। কাজেই প্রায় আড়াইশো রুগী নিয়ে আমরা পাঁচজনে এখানেই একটি অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরী করে কাজ করতে লাগলাম।

এখানকার বাজারে যথেষ্ট কমলালেবু পাওয়া যেতো। রুগীদের তাই কিনে খাওয়াতাম। মাঝে মাঝে ভালো কলা ও আনারসও পাওয়া যেতো। এইভাবে কয়েকদিন কাটানোর পর হাতের টাকা ও ঔষধপত্র কমে যেতে লাগলো। পনের দিনের মতো পাথেয় নিয়ে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু পনের দিন তো প্রায় এখানেই কেটে গেলো, এখনও কতোদিন এখানে কাটাতে হবে বা কতোদিনে 'পিম্‌না' পেঁাছাতে পারবো, তারও কোনও স্থিরতা নেই। ইতিমধ্যে একদিন কর্ণেল দত্ত ও কর্ণেল শাহ নওয়াজ এখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের দুরবস্থার কথা সব কিছু তাঁদের জানালাম। পথ খরচের টাকা কর্ণেল শাহ নওয়াজ আমাদের দিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন অবস্থা যেরূপ দেখা যাচ্ছে যদি ট্রেনে সম্ভবপর না হয় তা হলে যারা সুস্থ আছে তাদের পদব্রজে আর রুগীদের গরুর গাড়ি করে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। ঔষধের জন্য মান্দালয়ে কর্ণেল গোস্বামীকে চিঠি দিলাম। দু'একদিন পরেই ক্যাপ্টেন চান্‌কে কিছু ঔষধ নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমাদের এখানকার ক্যাম্প কম্যান্ডার গান্ধী রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সাধু সিং। যুদ্ধে একবার আহত হওয়ার পর বর্তমানে আবার কাজ করছেন। স্টেশনের কাছাকাছি গান্ধী রেজিমেন্ট রয়েছে। একদিন আমরা ডাঃ দাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে পেঁাছলাম। ক্যাপ্টেন সিঙারা সিং কাছাকাছি জঙ্গল থেকে একটি হরিণ শীকার করেছেন, তারই চামড়া তখন ছাড়ানো হচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে এলাম। সন্ধ্যার পর সেদিন ক্যাপ্টেন সাধু সিং-এর ওখানে গেলাম। হরিণের মাংস এতোদূরে পেঁাছে দেওয়ার জন্যই আমাদের যাওয়া।

কাছাকাছি নালাতে তখন ছোট ছোট কই, মাগুর মাছ যথেষ্ট পওয়া যেত। আমার কয়েকজন সিপাহী দুপুরের পরে চলে যেতো, আবার সন্ধ্যার সময় অনেক মাছ ধরে আনতো। এদের মধ্যে অনেকেই মাছ খায় না। কাজেই আমরাই তা শেষ করতাম। একদিন আমি ও চান্‌কে ছিপ নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায় বেরুলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর তিনটি কাঁকড়া ও দুটি পুঁটী নিয়ে ফিরে আসতে হল। এইভাবে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহটি কেটে যাওয়ার পর শোনা গেলো এবার ট্রেন যাবে। কাজেই প্রথম দলে (লেফটেন্যান্ট) প্রসারকর যাবার জন্য তৈরী হলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে লোক ফিরে এলো। গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরী আছে। সে রাতে পূর্ণিমার আলো ঝলমল করছিলো। রাত প্রায় এগারটার সময় আমরা শুনতে পেলাম বিমানের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মেসিনগানের শব্দ। আমাদের ধারণা ছিলো গাড়ি চলে গেছে কাজেই এ আক্রমণটা হচ্ছে স্টেশনের উপর। কিন্তু পরদিন সকালে আমাদের ভ্রম ভাঙলো। ডাঃ প্রসারকর তিনজন আহতকে নিয়ে এসে হাজির করলেন। শুনলাম গাড়িটি সবেমাত্র স্টেশন থেকে বার হয়ে মাত্র মাইলখানেক পথ এসেছে এমন সময় হঠাৎ দুটি বিমান এসে পড়ল। জায়গাটির পাশে ধানের ক্ষেত, তার উপর পরিষ্কার চাঁদের আলো কাজেই বেশ তৎপরতার সঙ্গে তারা ট্রেনটিকে আক্রমণ করে। সকলেই গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। বহু জাপানী হতাহত হয়। আমাদের মাত্র তিনজনের গুলী লাগে, তবে তাও বিশেষ মারাত্মক হয়নি। পরের দিনও আর গাড়ী যায়নি। এদিকে ক্যাম্পে লোকসংখ্যা বেশী হওয়াতে এবং জায়গাটা স্টেশন থেকে একটু বেশী দূরে হওয়াতে

আমিও আমার দল নিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি একটি বুদ্ধ-মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। সেদিন গাড়িতে 'মেসিনগান' চলার পর আমাদের লোকেরা অনেকেই বেশ ভীত হয়েছে। তারা ট্রেনে করে যাওয়ার চাইতে হে'টে যাওয়াই বেশী নিরাপদ মনে করল। সক্ষম লোকেরা হে'টে গেলে রুগীদের পরিচর্যা করার লোক থাকে না, কাজেই তাদের অনেক করে বোঝালাম। চতুর্থ দিনে আবার ট্রেন পাওয়া গেলে জাপানীরা আমাদের দেড়শো লোক পাঠাতে বলল। কাজেই আমি ও প্রসারকর আমাদের দল নিয়ে হাজির হলাম। দুটি প্যাসেঞ্জার বগী আমরা পেয়েছিলাম। এবার আমি সকলকে অভয় দিলাম। কারণ, এ পর্যন্ত আমি দেখেছি ঠিক আমার উপর আক্রমণ কোথাও হয়নি। ভোরের দিকে আমরা 'তাজি' পে'ছিলাম। এতোবড় জংসন স্টেশন, কিন্তু স্টেশন-বাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। স্টেশনের উপরে যে কতো বোমা পড়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। বহু কষ্টে জাপানীরা মাত্র একটি লাইন ঠিক করে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটি ছোট বাজারের পাশে গাছগুলোতে আশ্রয় নিলাম। শুনলাম আজ রাতে আর হয়তো যাওয়া সম্ভবপর হবে না। বিকালে গাছতলাতে দাঁড়িয়ে আছি। একটি বাঙগালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি রেলে কাজ করেন। পরের দিন দুপুরে তাঁর ওখানে যাওয়ার [illegible] [illegible]মন্ত্রণ করলেন। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে [illegible] [illegible]রা হল। ভদ্রলোক এখানে একা [illegible] [illegible] করেন। বাপ, মা, স্ত্রী সকলেই [illegible] [illegible]লো' থাকেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার গাড়িতে উঠলাম। ভোরের আগে আবার নামলাম একটি ছোট স্টেশনের পাশে। গাড়ি থেকে নেমে সকলেই গ্রামের মাঝে, বাগানে ও গাছতলাতে জায়গা নিলো। আমরা কাছাকাছি একটি ফুঙিগ চৌঙ্গ অধিকার করলাম। সকাল সকাল রান্না করে সকলকে খাওয়ানোর পর মনে হল, এতগুলি লোক একসঙ্গে থাকা নিরাপদ নয়। কাজেই খাওয়ার পর প্রত্যেককে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে রইলাম আমি, প্রসারকর আর মাত্র কয়েকজন। বেলা প্রায় চারটের সময় ছ'খানা বিমান এসে হাজির! প্রথমে তারা রেল লাইনের উপর—গাড়িগুলির উপর খুব মেসিন গানের গুলী ছোড়ে। তারপর হঠাৎ দুটি বিমান একেবারে আমাদের মাথার উপর এসে উপস্থিত। একটি মাত্র 'ট্রেঞ্চ' ছিলো। সকলে তারই ভেতর ঢুকে পড়লাম। বিমান দুটি বেশ মনের আনন্দে মন্দিরের উপর গুলী চালালো।

মিনিট দশেক পরে বিমানগুলি চলে যাওয়ার পর আমরা 'ট্রেঞ্চ' থেকে বাইরে এসে দেখি মন্দিরের অনেক জায়গাতে গুলী লেগেছে। ভিতর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মন্দিরে কেউ ছিলো না। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি, শুধু বিছানাতে অল্প অল্প আগুন লেগেছে। বর্মীরাও ছুটে এলো এবং তারাই জিনিসপত্র বার করতে লাগলো। স্টেশনে গাড়িতে আমাদের ঔষধপত্র ছিলো। সেখানে লোক ছিলো। তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে খবর নিলাম—সকলেই নিরাপদে আছে। গাড়িগুলির মধ্যে একটি 'ওয়াগনে' জাপানী মেয়েরা যাচ্ছিল। সেই গাড়িতে আগুন লেগে তাদের কাপড় জামা সব কিছু পুড়ে গেছে। ইঞ্জিনের উপরই বিশেষ করে আক্রমণ হয়। কিন্তু জাপানীরা ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে বেশ চালাক। তারা ভালো ইঞ্জিনখানাকে নীচে ঢাকা দেওয়া জায়গাতে লুকিয়ে রাখে, আর একখানা ভাঙা ইঞ্জিন রেলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রথম প্রথম তো বৃটিশ ভাঙা ইঞ্জিনের উপর যথেষ্ট গুলী খরচ করতো; পরে দিনে হলে খুব নীচে এসে নম্বর দেখতো; কিন্তু রাতের বেলা আন্দাজেই অনর্থক গুলী ছুঁড়তে হ'ত।

সন্ধ্যায় আবার সদলবলে গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি পিম্‌না থেকে কিছুদূরে এক জায়গাতে দাঁড়ালো। আমি সকলকে নামিয়ে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম, আর ডাঃ প্রসারকরকে পাঠালাম ক্যাম্পের খোঁজে। প্রথমদিনে [illegible] [illegible] সন্ধান নিয়ে প্রসারকর ফিরে এলেন। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় গরুর গাড়ি করে রুগী পাঠানোর বন্দোবস্ত হল। আমাদের ক্যাম্প পিমনা থেকে প্রায় ন'মাইল দূরে 'ইয়েজিন' নামে ছোট্ট একটি পল্লীতে। পল্লীটির মধ্যে আছে শুধু দু'নম্বর হাসপাতাল—যা 'মনেয়ার্তে' কাজ করছিলো। রেজিমেণ্টগুলি আশপাশের জঙ্গলের মধ্যে খড়ের ঘর বে'ধে বাস করছে। রুগীদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমি আমার রেজিমেণ্টে যোগদান করলাম। ছোট ছোট বাঁশঝাড়ের জঙ্গল তার মধ্যেই প্রায় তিন মাইল ব্যাপী জায়গাতে আমাদের ছড়ানো ছড়ানো ক্যাম্প। আমি একটি ছোট ঘর পেলাম একা থাকার জন্য।

এখানে আসার পর আবার বেশ কাজ পড়লো। প্রত্যেককে পরীক্ষা করা, তাদের টীকা দেওয়া, ইনজেকসন দেওয়া ইত্যাদি। বিমানাক্রমণের ভয়। এজন্য এক একটি ঘর খুব দূরে দূরে। আমাদের রেজিমেণ্টের হাসপাতাল আমার ঘর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। অন্যান্য অফিসারদের ঘর আবার সেখান থেকেও প্রায় আধ মাইল দূরে। সুতরাং সামান্য কাজের জন্য মাইলের পর মাইল পথ হাঁটিতে হত। তারপর আবার পথ বদল হত। নিত্য নূতন পথ হ'ত। কারণ একই পথে কয়েকদিন চলাচল করলে সেখানে সরু রাস্তা হয়ে যায় এবং সে পথ বিমান থেকে বেশ দেখা যায়।

এখানে কয়েকদিন থাকার পর একদিন সকালে মেজর রঙ্গচারীর সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছি, হঠাৎ দেখি তাঁর ঘর ভর্তি ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর মেয়েরা। এ'রা সকলেই মেমিও হাসপাতালের নার্স। আপাতত রেঙ্গুন যাচ্ছেন। এখানে প্রথম মেজর লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সঙ্গে আলাপ হয়। পরিচয়টা করিয়ে দেন মেজর রঙ্গচারী। মেজর লক্ষ্মীর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত থাকলেও এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। বেশ খানিকক্ষণ গল্প হ'ল। সকলে চা-পান করার পর বিদায় নিলাম।

ঔষধপত্র আমাদের কমে আসছিলো। নূতন কিছু পাওয়া যাবে না; কাজেই বেশ কৃপণের মতোই ঔষধ ব্যবহার করতাম। আমাদের একজন মারাঠী ডাক্তার—ক্যাপ্টেন বাম—গাছ-গাছড়া জোগাড় করতেন। 'ক্যালেগুলা' গাছের রস দিয়ে যে ঔষধ হোত, তা ঘায়ে ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া যেতো। আমাদের মেজর মিশ্রও নানা গাছগাছড়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন।

এখানে বীরেন রায় প্রভৃতি সকলেই এসে জমেছেন। একদিন মেজর হাসান বললেন যে, এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে একটি গ্রামে একটি বিপন্ন বাঙালী পরিবার আছে, যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় কিছু সাহায্য করো। আমি ও বীরেন রায় একদিন দুপুরে খাওয়ার পর গ্রামের সন্ধানে বেরুলাম। বর্মীরা ভুল করে চিটাগং বস্তী বললেও প্রকৃতপক্ষে গ্রামের নাম হচ্ছে চি-উঙ্গ-গা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের সন্ধান পেলাম। একটি বিধবা স্ত্রীলোক, একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। স্বামীটি মাত্র একমাস হয় মারা গেছেন। স্ত্রী রক্তহীনতা ও ম্যালেরিয়াতে একেবারে শয্যাশায়ী। একটি ছেলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে একেবারেই পঙ্গু। তারা সকলেই একটি বর্মীর বাড়িতে পড়ে আছে। আমরা তাদের সব খোঁজ খবর নিলাম। স্বামীটি এখানকার পোস্টমাস্টার ছিলেন। বৃটিশ যখন বর্মা ছেড়ে যায়, তখন এ'রাও মাচিনা পর্যন্ত যান; কিন্তু সেখান থেকে ভারতবর্ষে আসার কোনও সুবিধা করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে জাপানীরা মাচিনা অধিকার করে। তখন আবার এইখানেই ফিরে আসেন। এখানে আসার পর স্ত্রীটি রসগোল্লা, সন্দেশ তৈরী করতেন, স্বামীটি তাই বিক্রী করে সংসার চালাতেন। তারপর ম্যালেরিয়া হওয়াতে মাসখানেক আগে মারা গিয়েছেন; হাতে পয়সাকড়িও বিশেষ কিছু নেই। এই দূর বিদেশে—আত্মীয়স্বজনবিহীন অবস্থায় এমনিভাবে বর্মীদের বাড়িতে পড়ে থাকা যে কতটা কষ্টকর, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম। ঔষধ এবং টাকাকড়ি দিয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ক্যাম্পে ফিরে আসার পর অন্যান্য অফিসারদের এ'দের কথা বলতেই তাঁরা সকলেই কিছু কিছু করে টাকা দিলেন। আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে দেখাশোনা করতে লাগলাম। প্রথমে বর্মীরা তাঁদের বিশেষ যত্ন নিতো না; কিন্তু আমাদের ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে কতকটা ভয়েই, একটু দেখাশোনা করতো। বিশেষ চেষ্টায় রুগী দুটির স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, কিন্তু এখনও কিছুদিন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক। আমরা আমাদের হাত-খরচ বাঁচিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়

গত রবিবার হতে কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নৃত্যনাট্য শ্যামা অভিনীত হয়েছে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের কাহিনী সুবিদিত—ইতিপূর্বে একাধিকবার কলকাতায় অভিনীত হ'য়েছে। প্রথমবার স্বয়ং কবিগুরু উপস্থিত ছিলেন। তা' ছাড়া 'শ্যামা' গ্রন্থখানিও কয়েক বছর ধরে শিক্ষিত সমাজের গোচরে আছে—আরও রয়েছে কথা ও কাহিনীর পরিশোধ কবিতা—শ্যামার আপাতঃ মূল ওখানে। কাজেই শ্যামার কাহিনীর বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

এর কাহিনী বর্ণনা না করলেও মূল ভাবটির বর্ণনা করা যেতে পারে। কবিগুরু বলতে চান পাপের ভিত্তিতে প্রেম কখনো প্রতিষ্ঠা পায় না। রক্তের রেখা প্রণয়ীযুগলের মাঝে এমন দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে যে তাদের মিলিত হবার কোনই আশা থাকে না। তারা রক্তনদীর দুই পার থেকে পরস্পরের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দেয়—হাতে হাত স্পর্শ করতেই তড়িতাহতের ন্যায় দুজনে চমকে ফিরে যায়—অথচ মনে মিলন ব্যাকুলতার অভাব যে আছে তা নয়। ভালবাসার আকর্ষণ আর নীতি-

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে বজ্রসেনের ভূমিকায় কৃষ্ণ মেনন ও শ্যামার ভূমিকায় সেবা মাইতি

বোধের বিকর্ষণে, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ দুই বিরুদ্ধ শক্তি মিলে ক্রমাগত ট্রাজিক নৃত্যপরিমণ্ডল রচনা করে চলতে থাকে। শ্যামা নৃত্যনাট্যের মূলে রয়েছে নৃত্য রচনার এই আইডিয়া, যা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানাটানিতে। নৃত্যনাট্যের কাহিনী ও নৃত্যনাট্যের আইডিয়া পরস্পরের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করেছে। নৃত্যরস ছাড়া এ কাহিনী ঠিক এমনভাবে বলা যেতো না। নৃত্যনাট্যের টেকনিকই হচ্ছে গিয়ে কাহিনীর যথার্থ আধার।

নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ যাকে নৃত্যনাট্য মনে করেন, ভারতীয় সাহিত্যে বিরল। এখানেও নৃত্যও আছে, নাট্যও আছে, কিন্তু নৃত্যনাট্য নেই বললেই হয় সবাই জানেন নৃত্যনাট্যের সজীব রূপটি কবি জাভা দ্বীপে গিয়ে প্রথম দেখতে পেলেন। অথচ তার অনেক আগে থেকেই নৃত্যনাট্য রচনার ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল—কিন্তু কোনো সজীব আদর্শকে প্রত্যক্ষ করতে না পারায় তা বাস্তবরূপ লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজার চরম নৃত্য দৃশ্যটির মধ্যে পরবর্তী নৃত্যনাট্য বীজাকারে নিহিত। সেই বীজ অংকুরিত হয়েছে জাভার নৃত্যনাট্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তার সঙ্গে কবি যোগ করে দিয়েছেন, সঙ্গীত। জাভার নৃত্যনাট্যকে মূক নাট্য বললেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের শিল্পসত্তা একটা চতুরঙ্গ পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর। ভাষা, সুর, নৃত্য এবং বর্ণচ্ছটা—এই চার অঙ্গ নিয়ে তাঁর চতুরঙ্গ টেকনিক। শ্যামা, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি তার দৃষ্টান্তের স্থল।

আমরা সকলেই মুখের ভাষার সঙ্গেই পরিচিত। সুরের ভাষাও অনেকে জানি—কিন্তু দেহের ভাষা, বা দেহভঙ্গীর ভাষা যাকে নৃত্য বলা হয় তার সঙ্গে আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় নেই বললে কম বলা হয়। নৃত্যের ভাষা আমাদের কাছে 'গ্রীক'তুল্য দুর্জ্ঞেয়। অথচ নৃত্যনাট্যের রসোপভোগের জন্য ভাষার অ আ, ক খ, কর খল টুকু অন্ততঃ জানা অনিবার্য। নতুবা নাচের যথার্থ রস পাওয়া যাবে না, কিম্বা নাচের সঙ্গে যে ভাষ্য-সঙ্গীত চলতে থাকে তারই বেনামীতে নাচকে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এমন বেনামীতে রসভোগ যে একেবারেই নিরর্থক তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

চিত্রকলায় যা 'ডেকোরেটিভ আর্ট'—নৃত্যকলা ঠিক তাই—অন্ততঃ ভারতীয় নৃত্যকলা। ইউরোপের Ballet প্রভৃতি নৃত্য বাস্তবের তল্পিবাহক—তার মধ্যে 'Decorative art'-এর ছোঁওয়া লাগেনি। কিন্তু ইউরোপের নৃত্যকলার ও চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইতিহাসের একই পর্বের অন্তর্গত। সে ইউরোপের বহুনিন্দিত মধ্যযুগের কথা। ভারতের নৃত্য, চিত্র, এমন কি সাহিত্য ও সমাজ—সকলের মধ্যেই আছে 'ডেকোরেটিভ' শিল্পের প্রাণাবর্ত। 'ডেকোরেটিভ' শিল্প কি করে? বস্তুজগৎকে একটা সুসমঞ্জ 'Pattern'-এর মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করাই হচ্ছে গিয়ে 'ডেকোরেটিভ' আর্ট বা অলংকরণ শিল্পের চরম লক্ষ্য। কোনো শিল্পী বা এদিকে একটু বেশী অগ্রসর, কেউ বা ততদূর এগোতে পারে নি—কিন্তু সবারই লক্ষ্য এক। 'ডেকোরেটিভ' শিল্পের চরমে পেঁাছান কখনই সম্ভব নয়—কারণ সমস্ত বস্তু জগৎকে একটিমাত্র 'প্যাটার্ণে' সংহত করা মানুষের সাধ্য নয়। এখন প্যাটার্ণ-এ বাঁধবার উদ্দেশ্যে শিল্প যেমনি ডেকোরেটিভ হয়ে উঠল—অমনি তাকে কতক পরিমাণে বস্তুস্বভাব পরিত্যাগ করতে হয়। মাছ আর ঠিক বাস্তব মাছ হয় না—পদ্মফুলের মধ্যে আতিশয্য এসে পড়ে, মানুষের হাত পা সরু সরু বলে নিন্দিত হতে থাকে। বাস্তববাদীরা অসন্তুষ্ট হন—কিন্তু ভুলে যান যে এই অসন্তোষের মূলে আছে তাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা। ভারতীয় সাহিত্যেও ডেকোরেটিভ বা প্যাটার্নমূলক। কালিদাসের কাব্যকে অনেকে যে অবাস্তব মনে করেন তার কারণ মানুষের জীবনকে একটা প্যাটার্ণ-এ এনে ফেলা যে সমাজের লক্ষ্য সেই সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি তিনি। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা 'অনড়, অসাড়, স্থাণু' এবং যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু সে নিন্দা কি তার প্রাপ্য? এ দেশের বিভিন্ন জাতিকে, বিচিত্র শিক্ষা-দীক্ষাকে এবং বিচিত্রতর আচার ব্যবহারকে একটি সামাজিক প্যাটার্ণ-এ বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদ্গণ। এ সমাজ প্রগতিশীল নয়। [illegible] প্রগতিশীল, কিন্তু তাকে প্যাটার্ণ-এ বাঁধা সম্ভব নয়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত সবদেশেই অল্পবিস্তর সভ্যতার আদর্শ ছিল—প্যাটার্ণ সৃষ্টি আর সেই আদর্শেই গড়ে উঠেছে তার চিত্র, সাহিত্য, নৃত্য এবং সমাজ। দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' বৈকুণ্ঠে জ্যোতির্ময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে অবিরাম দিব্য নৃত্য চলছে। আর কৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে গোপীদের যে রাসনৃত্যের পরিকল্পনা হয়েছে, এই দুইয়ের মূলেই আছে বিশ্বব্যাপারকে একটা চরম প্যাটার্নের মধ্যে প্রতীক-হিসাবে রূপায়িত ক'রে তুলবার প্রয়াস। বর্তমান জগৎ এই প্যাটার্ন-প্রতীককে অস্বীকার করেছে। এখনকার কোন কবি আর রাসনৃত্যের পরিকল্পনা করবেন না। তাঁর পরিকল্পনা হয়তো হবে কৃষ্ণ গোপীদের পিছনে লক্ষ্যহীন লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছেন। আধুনিকতার পরিভাষায় এরই নাম প্রগতি।

কিন্তু প্যাটার্ণ-এ বাঁধবার উদ্দেশ্য কি? যা কিছু তৎ-স্থানিক, তৎকালিক, যা ক্ষণিক, খণ্ড এবং ছিন্ন তাকে বর্জন, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের স্থাপন, বহুর মধ্যে একের সন্ধান—এই ছিল গিয়ে মানুষের আদর্শ। এখন এই আদর্শকে বাস্তব করে তুলতে গেলে খণ্ড ছিন্ন বাদ দিয়ে নিত্য এবং এককে সংগ্রহ করে মালা গেথে তুলতে হয়। প্যাটার্ণ সেই মালা গাঁথবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। নৃত্যের ভাষা এই প্যাটার্ণ-এর ভাষা—মুখের ভাষার সঙ্গে গোড়ায় তার অনৈক্য রয়েছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্য বজ্রসেন, উত্তীয় এবং শ্যামার প্রেমের তথ্যরূপকে বেছে গুছে নিয়ে শাশ্বতে পেঁাছতে চেষ্টা করেছে। সেখানে

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের শিল্পিবৃন্দ। বামদিক হইতে : সেবা মাইতি, লক্ষ্মীনারায়ণ, বেলা মিত্র, পানিভরণ, পুষ্প মাইতি, কৃষ্ণ মেনন, পূরবী দত্ত

পৌঁছবার জন্যে তাকে বাস্তব পন্থা পরিহার ক'রে ডেকোরেটিভ পন্থা গ্রহণ করতে হ'য়েছে। কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণের কথা আগেই বলেছি। এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির টানাটানিতে একটি সম্পূর্ণ নৃত্যচক্র সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে। বাস্তবের কণ্টক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত যে হ'য়ে গিয়েছে তার প্রধান প্রমাণ শ্যামা নাটকে ঘাতকের উত্তীয় বধের নৃত্য-দৃশ্যটি। অন্য যে কোন শ্রেণীর নাটকে রঙ্গমঞ্চে ঘাতক কর্তৃক বন্দীকে বধ দর্শকের মনে জুগুপ্সার সঞ্চার করে দিতো। কিন্তু এখানে তেমন কোন ভাবের সঞ্চার হয়নি। তার কারণ এখানে বন্দীবধ ব্যাপারটি আদৌ বাস্তব ঘটনা নয়—নৃত্যভঙ্গির ফুল লতাপাতা কাটা একটি ডেকোরেটিভ প্যাটার্ণ মাত্র। বর্তমান লেখকের চোখে এই নৃত্যদৃশ্যটিই নাটকের শ্রেষ্ঠ নৃত্য।

বজ্রসেন ও ঘাতক, উত্তীয় ও শ্যামা, সকলেই নিজ নিজ অংশে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। শ্যামার সঙ্গিনীগণের কৃতিত্ব সামান্যও নয়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করেছে। যাঁদের আশংকা ছিল রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে তাঁর জাদু স্পর্শের অভাবে নাটকের অঙ্গ হানি হবে—তাঁরা অবহিত হ'তে পারেন। নৃত্য, কথা, সঙ্গীত ও বর্ণসজ্জার দিব্য চতুরঙ্গ রীতি আগের মতোই দর্শককে শিল্পনন্দনের সংবাদ দান করে—তাতে কোন ন্যূনতা ঘটেনি।

অরূপ রতন

অরূপ রতন রূপক নাটক। রূপক নাটক লেই অভিনয়ে এক রূপদান বিশেষ কঠিন—রণ একই সঙ্গে নাটকের গল্প এবং গল্পের মর্ম বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই দ্বিবিধ ভার বহন করে সাবলীলভাবে চলা সহজ নয়। কিন্তু কবির শিল্প কৌশল অনেক পরিমাণে এই সমস্যা সমাধান ক'রে কাজটি সহজ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এই রূপক কাহিনীর বাহন দুইটি,—গান আর জনতার হাস্যরস পূর্ণ সংলাপ। এই যুগল বাহন থাকাতে দ্বিগুনিত বোঝা থাকা সত্ত্বেও নাটকটি তার পরিণামে গিয়ে পৌঁছতে বাধা পায় না।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, ঠাকুর্দা, সুবর্ণরাজ ও বিদেশী রাজত্রয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। জনতার অভিনব প্রেক্ষাগৃহকে হাস্য মুখর করে রেখেছিল। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত এবং শ্রীকণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক সঙ্গীত অরূপ রতনের দুইটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা যেতে পারে।

অদৃশ্য রাজারূপে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরাভিনয়ের দ্বারা যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন তা অপূর্ব। অদৃশ্য রাজা বা অরূপরতনকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কেবল তাঁর স্বর শোনা যায়। অভিনয়ের সুযোগ এতে নাই। কিন্তু দূরাগত কণ্ঠস্বর অতর্কিত দৈববাণীর মহিমায় শ্রুত হয়ে দর্শকগণকে চমকিত করে দিয়েছে। অরূপ রতনের আশাতীত সাফল্যের জন্যে আমরা অভিনেতাদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

নৃত্যনাট্য দুটিতে দৃশ্যসজ্জা ও দেহসজ্জার বিচিত্র পরিকল্পনার জন্য শ্রীবিশ্বরূপ বসু ও শ্রীবিনায়ক মসোজির কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

রূপ চর্চ্চায়-
অপরিহার্য্য।
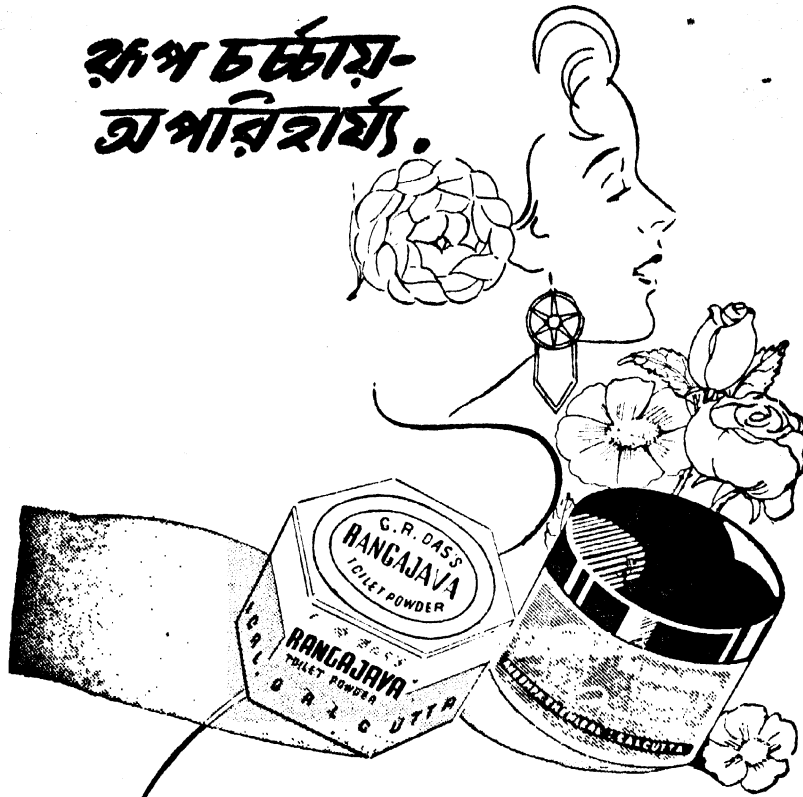
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
স্নো ও পাউডার

বিশুদ্ধ ও সুনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ।
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মসৃণ ও কোমল হয় এবং ব্রণ প্রভৃতি
চর্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ মৃদু, মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী।
সর্বত্র পাওয়া যায়।

অনুরূপা কেমিক্যাল কলিকাতা

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক
"দেশ"
প্রতি সংখ্যা চারি আনা
বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹
ঠিকানাঃ ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮, অক্ষয় বোস লেন, শ্যামবাজার।

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে
বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

প্রথম মাত্রা সেবনেই ইহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবেন। হুপিং কাশি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে প্রথম হইতে শ্বাসারি সেবন করিলে রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

মূল্য—প্রতি শিশি ৸৹
ডাক মাশুল ।৹

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস. সি. শর্ম্মা এণ্ড সন্স।
সাহাপুর, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা

গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড পেথিক লরেন্সের আলাপ-আলোচনা হইয়া যাওয়ার পর জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে লরেন্স সাহেব বলিলেন,—"আমাদের মধ্যে বেশ ফলপ্রসূ কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে।" সাংবাদিক —সেই "ফল" কবে আমাদের ভাগ্যে মিলিবে
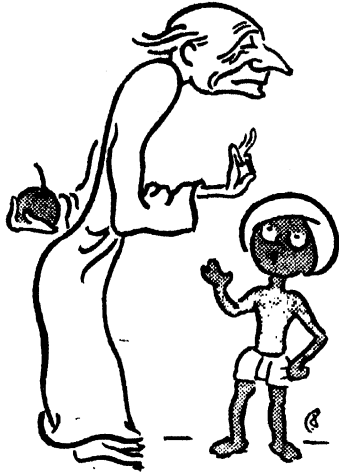
প্রশ্ন করিলে নাকি ভারত সচিব মহাশয় কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। "কিন্তু কোন অসৌজন্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেই পারিতেন—মা ফলেষু কদাচন।"—কদাচ যিনি চুপ করিয়া থাকেন না, এই উক্তি অবশ্য সেই বিশু খুড়োই করিলেন।

* * * * * *

কেনার ব্রকওয়ে একটি বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে,—মন্ত্রি-মিশন ব্যর্থ হইলে দেশে যদি বিদ্রোহ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তাহা দৃঢ় হস্তে দমন করিবার জন্য

পুলিশ বাহিনীকে নাকি শিখাইয়া-পড়াইয়া তোলা হইতেছে—অর্থাৎ স্বাধীনতা অনিবার্য তবে কিনা সেই স্বাধীনতা সাধারণের না হইয়া পুলিশেরই হইবে।

* * * * *

একটা গুজব শুনিতেছি, বাঙলাকে নাকি দ্বিধা-বিভক্ত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। গুজব সত্য হইলে বাঙলা নিশ্চয়ই সমবেত কণ্ঠে ধরণীকে দ্বিধা করিয়া দিবার দাবী উত্থাপন করিবেন।

* * * * * *

"শহীদ-কিরণ পত্রাবলীতে ফজলুল হক সাহেবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন,—"বর্তমানে স্পীকারের আসন চিড়িয়াখানা বা পাগলা-গারদের ম্যানেজারের আসনের অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ নহে। বিশু খুড়ো বলিলেন, "এ কথা সত্য। চিড়িয়াখানার ম্যানেজার তবু জন্তু-জানোয়ারকে সামলাইতে পারে এবং পাগলা গারদের ম্যানেজারেরও পাগল সামলাইবার ক্ষমতা আছে।"

* * * *

বাঙলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, সাতজন মুসলমান (মুছলমান বা লীগ বলিলেই ঠিক বলা হয়) ও তপশীল-

ভুক্ত সম্প্রদায়ের একজন লইয়া মন্ত্রীরা সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছেন আট; বাঙলার ভাগ্যে সুতরাং নির্ঘাত অষ্টরম্ভা!
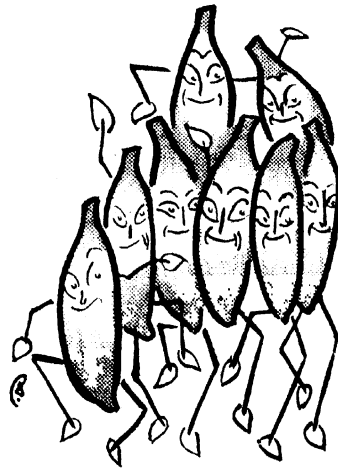
* * * * *

বাঙলার উজীর প্রধান সুরাবর্দী সাহেব তাঁহার প্রথম ফরমান জারি করিয়াছেন। উজীরবৃন্দ যেদিন প্রথম সরকারী দপ্তরখানায় "তশরিফ নিবেন" সেদিন কর্মচারীরা যেন তাঁহাদিগকে অন্যান্য প্রদেশের মত "জয় হিন্দ" বলিয়া সম্বর্ধনা না জানায় ইহাই হইল উজীর সাহেবের নির্দেশ। আশা করি, কর্মচারীরা এই সম্বন্ধে অবহিত হইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার!

* * * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম, গভর্নমেণ্ট নাকি অতিরিক্ত দমকল বাহিনীকে কর্মচ্যুত করিতেছেন। দম ফুরাইয়া আসিবার সময় যে

কলের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই দমকলকে নির্বিচারে বিকল করিবার ব্যবস্থাকে দমবাজি বলিলে কি খুব বেশি বলা হয়?

* * * * * *

শুনিলাম, দিল্লীতে নাকি ১৪৪ ধারা প্রবর্তন করা হইয়াছে। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে বন্দুক, লাঠি বা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কেহ চলাফেরা করিতে পারিবেন না। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"কতকদিন আগে শুনিয়াছিলাম—"চাঁদীর বুলেট" নামক একপ্রকার অস্ত্র নাকি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই অস্ত্রও কি এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে?"

* * * * *

ভোর" কমিটির রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন, —চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ভারতবর্ষে মাথাপিছু খরচ করা হয় মাত্র পাঁচ আনা ন' পাই। কিন্তু ডাঃ রায় বোধ হয় ভুল হিসাব দেখাইয়াছেন; আমরা যতদূর জানি, চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু খরচ হয় মাত্র সোয়া পাঁচ আনা এবং অবস্থার তারতম্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র পাঁচ পয়সা—শেষের হিসাবটা অবশ্য খুড়োর।

অজ্ঞাতদাতার অপরিমেয় দান

সম্প্রতি বিদেশের এক সংবাদে অদ্ভুত এক দানের খবর জানা গেছে। ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলের অলড্রুইক ভিকারেজ বা মঠটিতে মাত্র কয়েকদিন আগে এক গ্রাম্য ডাকহরকরা এসে কড়া নাড়লো। মঠাধ্যক্ষ খামটি খুলে দেখেন নামহীন এক দাতা ১০ হাজার পাউণ্ডের এক তাড়া নোট পাঠিয়ে লিখেছেন—"চার্চ অফ্ সেণ্ট রিচার্ড গির্জার অধীনে সব সময়েই আরোগ্যশালা ছিল—এখনও যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন।" মঠাধ্যক্ষ এই অনামা দাতার মহানুভবতার কথা উল্লেখ করে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন—আমাদের ছোট্ট মঠটির পক্ষে আরোগ্যশালা পরিচালনা করার উপযুক্ত বছরে ৩০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করাই সম্ভব হয়নি। এ দান ভগবানের পাঠানো দান। কে যে এ টাকা পাঠিয়েছেন তা আমি জানি না—তবে আমরা সবাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্য তিনি!" সত্যই তো ধন্য তিনি, নামের জন্য প্রতিষ্ঠার জন্য, কীর্তির জন্য দান অনেকেই করেন—অনামা অজ্ঞাত থেকে যিনি দান করেন—তিনিই তো ভগবান।

নিউইয়র্কে চার্চিলের তাড়নার শোভাযাত্রা

সুলতানের সংস্কার মোচন

মরোক্কোর সুলতান মৌলা মহম্মদ বেন ইউসুফ—৮ লক্ষ প্রজার ওপর রাজত্ব করেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান কাজেই ধর্মের নিয়মানুযায়ী সমস্ত সংস্কারগুলি এতদিন মেনে এসেছেন। সুলতানের প্রাসাদের ভিতরের কোনও ছবি বা ফটো এতদিন নিতে দেওয়া হোত না। সম্প্রতি তাঁর রাজ্যাভিষেকের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে রাজপ্রাসাদের ভিতরের একাধিক ছবি নেওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। প্রতি বছরে তাঁর রাজ্যাভিষেকের বাৎসরিক উৎসবে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয়। এই ভোজসভায় মহামান্য সুলতানের উজীর ও পাশা'রা মিলিত হন—এবারও মিলিত হয়েছিলেন। সুলতানী ভোজের আয়োজন যে কিভাবে হয়—তা এতদিন নিমন্ত্রিতরা ছাড়া বাইরের আর কেউ জানতে পারতো না। এবার ছবি তোলবার অনুমতি দিয়ে সুলতান বাহাদুর সে ভোজের আনন্দের ভাগ অপরকেও দিয়েছেন। মন্বন্তরের প্রকোপে পৃথিবী যখন না খেয়ে মরছে—মরোক্কোর সুলতানের ভোজসভার আয়োজনের ছবি দেখে তখন যে তারা আনন্দ পাবে এতে আর সন্দেহ কি?

সুলতানের ভোজসভার আয়োজনটা কি রকম!

চার্চিলের নিউ ইয়র্ক-সম্বর্ধনা

গত ১৫ই মার্চ ভূতপূর্ব বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে নিউইয়র্কে সম্বর্ধিত করার আয়োজন হয়েছিল—'চার্চিল-দিবস' ঘোষণা ক'রে—এ খবরটা হয়তো কাগজে পড়েছেন। কিন্তু আসলে যে সম্বর্ধনার চেয়ে তাঁকে অপদস্থ করবার আয়োজনটাই বেশী হয়েছিল, সে খবর আর কজন রাখেন বলুন! নিউইয়র্কে শ্রমিক ও কমিউনিস্টরা দল পাকিয়ে নানারকম শ্লোগ্যান বলে আর পোস্টার নিয়ে তাঁকে একেবারে নাজেহাল করবার চেষ্টা করেছিল। এইসব পোস্টারে ভারতের উপর নির্যাতন, প্যালেস্টাইন, আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংরাজের দুর্ব্যবহারের কথার উল্লেখ ছিল। কিন্তু চার্চিল সাহেব দমবার পাত্র নন। তিনি তারই মধ্যে শোভাযাত্রা করেছেন, বক্তৃতা করেছেন, ভোজ-সভায় খানাপিনাও করেছেন। ইংরেজ জাতির লজ্জা জয় করার যে শক্তি আছে তার পরিচয় তিনি দিয়ে এসেছেন সেখানে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা নানারকম ছড়া বানিয়েছিল—সেগুলি ভারী মজার—যেমন হচ্ছে—

"উইনি উইনি গো এওয়ে—
ইউ-এন্-ও ইজ্ হিয়ার টু স্টে"
"ওয়ান-টু-থ্রি ইট্ ইজ্ পীস্
ফর মি, ফোর-ফাইভ্ সিক্স
চার্চ হিল ফিক্স; সেভেন এইট্
নাইন-জয়েন আওয়ার লাইন।"

এদেশে চার্চিল সাহেব আসেননি—এসেছেন তাঁরই জাতভাই মন্ত্রীমিশনের মন্ত্রীরা—আমরা কিন্তু তাঁদের এভাবে সম্বর্ধনা করিনি—এটা কি আমাদের ভদ্রতার পরিচয় নয়?

দেশী সংবাদ

২৩শে এপ্রিল—শিলংয়ে নিঃ ভাঃ গুর্খা লীগ সম্মেলনের অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গুর্খা সম্প্রদায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বতোভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করিবে।

মার্কিন দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ হার্বার্ট হুভার দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কলিকাতায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে তাঁহার বাসভবনে আহূত বাঙলার বিশিষ্ট হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। উহাতে সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ভারতে অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের সীমা পুনঃ নির্ধারণ করিতে হইবে।

২৪শে এপ্রিল—অদ্য বৃটিশ মন্ত্রিত্রয় কাশ্মীর হইতে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রেল কর্তৃপক্ষ ও নিখিল ভারত রেল কর্মচারী সঙ্ঘের বিরোধে সালিশী করার ভার বিচারপতি মিঃ রাজাধ্যক্ষের উপর অর্পিত হইয়াছে।

বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা অদ্য গভর্নমেণ্ট হাউসে শপথ গ্রহণ করেন।

২৫শে এপ্রিল—ভারত সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল এসান কাদিরের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

বি এ আর ও ই আই আর কর্মীদের ধর্মঘট সম্পর্কে ব্যালট গ্রহণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এ যাবৎ উহার ফলাফলের যে আনুমানিক আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ভোট ধর্মঘটের অনুকূলে পড়িয়াছে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, রেঙ্গুণে নেতাজী ফাণ্ড কমিটির কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা আনার যে ভয় দেখান হইয়াছে, সত্য সত্যই যদি তাহা আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভারতে ও ব্রহ্মদেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে।

২৬শে এপ্রিল—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

সাতারা জেলার "পত্রী সরকারের" সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের রাজনৈতিক অপরাধ মার্জনা করা হইয়াছে বলিয়া বোম্বাই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের পরে সাতারার প্রায় ৪ শতটি গ্রাম এই স্বাধীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে ছিল। বোম্বাই গভর্নমেণ্ট ২৭ জন দণ্ডিত বন্দীর মুক্তি ও ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দিয়াছেন।

২৭শে এপ্রিল—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ মীমাংসাকল্পে উভয় দলের প্রতিনিধিদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধি দল কংগ্রেস ও লীগের সভাপতিকে স্ব স্ব ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিনিধি মনোনীত করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

রাণাঘাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নাসিরুদ্দিন রাণাঘাট মহকুমার হিন্দু অধ্যুষিত চন্দ্র নওপাড়া গ্রামের অধিবাসিগণকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়। অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মৌলবী আশরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। নেতাজী প্রবর্তিত আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানাইয়া এবং ভারতবর্ষ খণ্ডিত করার পরিকল্পনার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্প জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত রবিশংকর শুক্ল—প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯শে এপ্রিল—মাদ্রাজে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজ পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত টি প্রকাশম অদ্য গভর্নরের নিকট এগারজন মন্ত্রীর নাম পেশ করেন।

এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধদলের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা এইরূপঃ—একটি ভারতীয় 'ইউনিয়ন' (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, শুল্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উহার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। প্রদেশগুলিকে মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলে ভাগ করা হইবে এবং পূর্বোক্ত ইউনিয়নের যে সকল ক্ষমতা নির্ধারিত হইবে, সেগুলি ছাড়া অন্য সকল রাষ্ট্রিক ক্ষমতারই প্রদেশগুলি অধিকারী হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মিঃ এস এম ওসমান (মুসলিম লীগ) ও শ্রীযুত নরেশনাথ মুখার্জি (কংগ্রেস) যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি নির্বাচিত হন।

মেজর জেনারেল শা নওয়াজ এবং নেতাজীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মহবুব অদ্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য টোকিওতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে, তাহার বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে এপ্রিল—আজ নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে পারশ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নূতন করিয়া মতবিরোধ দেখা দেয়। রুশ প্রতিনিধি মঃ গ্রমিকো পরিষদের কার্যতালিকা হইতে রুশ-পারশ্য বিরোধ সম্পর্কিত বিষয়টি বাদ দিবার জন্য দাবী জানান; তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, পরিষদের কতিপয় সদস্য রুশ পারসিক গভর্নমেণ্টের ঘোষণাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন।

বার্লিনের সোভিয়েট এলাকায় কম্যুনিষ্ট ও সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক দলকে একত্র করিয়া "সাম্যবাদী সম্মিলিত দল" নামে যে নূতন দল গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি চতুঃশক্তির সাধারণ নীতি কি হইবে, সে সম্বন্ধে বার্লিনের সম্মিলিত সামরিক গভর্নমেণ্ট একমত হইতে পারেন নাই।

২৮শে এপ্রিল—কবি ও ঔপন্যাসিক ডাঃ এডওয়ার্ড টমসন লণ্ডনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু ছিলেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ

(১৪শ সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

প

ব

ভ

ম

র

ল

শ

স

হ

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ]   ২৮শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 11th May, 1946   [২৭ সংখ্যা

দেশ-নায়ক

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা-দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতর কার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন

কবিগুরু মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন উৎসবে অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন।

পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভান্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র-দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এই-খানেই। কিন্তু কেন বলব "যদি", কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবন-ক্ষেত্রে তুমি বহন ক'রে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে, জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র সন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য, ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতউদ্যত ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি ক'রে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলা দেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়-বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাকে।

মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন-উৎসবে কবিগুরু ও সুভাষচন্দ্র

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কুশলায়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হোতে পারে না। স কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হোতে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলা দেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয় মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।*

***নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাষণ, গুরুদেবের পুণ্য জন্ম তিথিতে দেশবাসীকে আমরা উপহার দিতেছি। ১৯৩৯ সালের মে মাসে এই ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্তু তখন উহা প্রচার করা হয় নাই। —সম্পাদক, "দেশ"**

মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন- উৎসবে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিমলার আলোচনা

গত ৫ই মে, রবিবার হইতে সিমলায় বড়লাটের ভবনে ত্রি-দলীয় অর্থাৎ কংগ্রেস, মুসলিম এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের মধ্যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আস্থা পোষণ করিবার জন্য দেশবাসীকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে আলোচনার ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেদিন সিমলাতে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতাকালেও তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজেরা ভারতবর্ষের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। মুষ্টিমেয় ইংরেজ আমাদের উপর শাসন চালাইতেছে, ইহা কেবলমাত্র আমাদেরই লজ্জার কথা নহে, ইংরেজের পক্ষেও ইহা লজ্জার কথা। এই লজ্জার দরুণই তাহারা ভারত ত্যাগের সংকল্প করিয়াছে। মহাত্মাজীর উপদেশের যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করি। তিনি নিজেও সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মত অনেকটা এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, এই কয়েক দিনের জন্য মন্ত্রী মিশনের সদিচ্ছাকে স্বীকার করিয়া লইলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই; পক্ষান্তরে মিশনের চেষ্টা যদি অবশেষে তাঁহাদের নিজেদের আন্তরিকতাহীনতার জন্য ব্যর্থ হয়, তবে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির স্বরূপই সমধিক উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে এবং ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য নৈতিক বলে অধিক শক্তিশালী হইবে; অধিকন্তু সেক্ষেত্রে জগতের প্রগতিশীল জনমতের আনুকূল্যও আমরা লাভ করিব। মহাত্মাজী বলেন, মন্ত্রী মিশনকে লোকে প্রবঞ্চক আখ্যা দিতে চায়; কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা বাস্তবিকই আন্তরিকভাবে কাজ করিতেছেন; কিন্তু যদিই-বা তাঁহারা প্রবঞ্চক বলিয়া শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হন, তাহা হইলেও জাতির পক্ষে কোন ক্ষতির কারণ ঘটিবে না। আমরাও জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই আলোচনা লক্ষ্য করিতে বলি; ইংরেজ আজ ভারতবর্ষকে উদারতাবশে স্বাধীনতা দিতে যাইতেছে, আমরা ইহা কোনদিনই বিশ্বাস করি না। আমাদের মতে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের এই সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা তাঁহাদের আন্তর্জাতিক নীতিরই একটা অঙ্গ এবং জগতের অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাঁহাদিগকে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে; শুধু ভারতে নহে, মিশর এবং প্যালেস্টাইনেও ইংরেজের একই নীতি একই লক্ষ্যে এইভাবেই কাজ করিতেছে এবং আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনার ভিতর দিয়া কৌশলে ইংরেজ এশিয়ায় নিজেদের স্বার্থকেই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে নিরাপদ করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ মিশর হইতেও যাইতে চাহে না, প্যালেস্টাইন হইতেও সরিয়া পড়িবার মতলব তাহাদের আদৌ নাই; সেইরূপ ভারত হইতে ইংরেজ স্বেচ্ছায় তাহার লটবহর গুটাইয়া লইবে, এমন আশা করাও বৃথা। ইংরেজের এতৎসম্পর্কিত কূটনীতির মর্ম ক্রমেই ব্যক্ত হইয়া পড়িবে এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতের অখণ্ডত্ব এবং একজাতীয়ত্বের ভিত্তি লইয়া এই আলোচনার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিবে। আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগের অযৌক্তিক দাবী কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিবে না এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন মুসলিম লীগের দাবীকে ভিত্তি করিয়াই একটা রফা করিতে চেষ্টা করিবেন। সুতরাং এই আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশাশীল নহি; বস্তুত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও তাঁহাদের মনের কোণে এই আলোচনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান রহিয়াছেন এবং তাঁহারাও বুঝিতেছেন যে, স্বাধীনতাকামী ভারতের কাছে তাঁহাদের কোন অভিসন্ধি আর খাটিবে না। তাঁহারা ইহাও জানিতেছেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হইলে ভারতব্যাপী একটা প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিবে এবং সেজন্য তাঁহারা প্রস্তুতও হইতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য এখন হইতেই ঠাটবহর সজ্জিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যে একেবারে ভিত্তিহীন নয়, ক্রমেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার নিকট বাঙলা গভর্নমেন্টের লিখিত একখানা গোপন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রে ভবিষ্যতে জনসাধারণের মধ্যে যদি বিক্ষোভ ও অশান্তি দেখা দেয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন শহরের জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ বজায় রাখিতে এবং যথারীতি চালাইয়া যাইতে পারিবেন কি না, জানাইতে বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপার কোথায় গিয়া দাঁড়াইবার আশংকা আছে, এতদ্দ্বারাই বোঝা যায়। কিন্তু আমরা সেজন্য ভীত নহি। দেশবাসী ব্রিটিশ প্রভুত্ব উৎখাত করিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। আমরা অবশ্য অশান্তি এবং অরাজকতা চাহি না; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাসূত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপে অশান্তি ও অরাজকতার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সত্যই যদি আমাদিগকে পড়িতে হয়, তবে অদৃষ্টকে আমরা দোষ দিব না; প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমরা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিব।

বন্দী বীরদের মুক্তি

এতদিন পরে ভারত গভর্নমেন্টের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। তাঁহারা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্তগণের বিরুদ্ধে আর কোন মামলা চালাইবেন না, ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের পররাষ্ট্র সচিব মেজর-জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক জেনারেল মোহন সিং এবং জেনারেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ভারতভূমির সুসন্তান। ইঁহাদের অতুলনীয় ত্যাগবীর্যে ও চরিত্র-গরিমায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। আমরা ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য গর্ব বোধ করি এবং সেই গর্ব অন্তরে লইয়া ইঁহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। দেখিতেছি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্বন্ধে ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আমাদের অভিমত এই যে, ভারত সরকার যদি জনমতানুকূলতার দ্বারা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের মূলীভূত নীতি সফল করিতে চান, অর্থাৎ দেশে শান্তিময় একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করাই যদি তাঁহাদের এই নীতির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে কয়েকজনের নামে এখনও মামলা চালানো হইতেছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা কর্তব্য এবং সেই সঙ্গে ইঁহাদের মধ্যে ইতঃপূর্বে বিচারের ফলে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মুক্তিদান করা উচিত। কারণ ইঁহারা অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন, এই অপরাধেই যদি ইঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়া থাকে এবং ভারত সরকারের কাছে মানবতার মহিমা যদি এমনই বড় হয়, আর তৎসম্পর্কে তাঁহাদের নীতি-নিষ্ঠা সত্যই এমন দৃঢ় থাকে, তবে তাঁহাদের অধীন যে সব কর্মচারী আগস্ট আন্দোলনের সম্পর্কে এ দেশের লোকদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছে, আগে তাহাদিগের বিচার করা

উচিত। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে চার বৎসর ধরিয়া জেলের মধ্যে ক্রমাগত তাঁহার উপর কিরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা বিদেশে যুদ্ধের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কোথায় কাহার উপর কি অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেজন্য সরকারের অন্তরের মানবতার সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের অধীন জেল কর্মচারী ও গোয়েন্দা পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁহারা অন্ধ। এই বৈষম্য দেশবাসীর অন্তরে বিক্ষোভেরই কারণ সৃষ্টি করে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করিয়া জনমতের সমর্থন করাই সরকারের পক্ষে দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে রাজনীতিক বন্দীদের কথাও আসিয়া পড়ে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এই প্রদেশের বিনা বিচারে অবরুদ্ধ সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া কিছুদিন পূর্বে আমরা শুনিতে পাই; এতৎসম্পর্কে প্রায় পক্ষকাল অতীত হইতে চলিল একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ বন্দীদিগকে পূর্বেরই ন্যায় দুই একজন করিয়া মুক্তি দেওয়া হইতেছে; সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পর মাত্র দুইজন বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে এবং ৬১জন এখনও অবরুদ্ধ আছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রে মিঃ সুরাবর্দীর নিজের কোন কৃতিত্ব নাই; আমলাতান্ত্রিক মামুলী ধারায় পুলিস ও সিভিলিয়ান প্রভুদের মর্জিই এ ব্যাপারে এখনও কাজ করিতেছে। ইঁহারা নেহাৎ ইজ্জৎ রাখিবার জিদ লইয়া চলিতেছেন; নতুবা বাঙলা দেশে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ অবশিষ্ট ৬১ জনকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়াতে আশঙ্কার যে কোন কারণ থাকিতে পারে না, সকলেই তাহা বোঝেন। স্বৈরাচারী শাসকদের এই ব্যবহার দেশের লোককে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। দেশবাসী আমলাতান্ত্রিক এই স্বৈরাচার বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়, মন্ত্রীরা তাহাই বুঝুন। প্রকৃতপক্ষে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শুধু বিনা বিচারে অবরুদ্ধদিগকেই মুক্তি দিলে চলিবে না, যাঁহারা দেশসেবামূলক কর্ম-প্রণোদনার জন্য বিচারের ফলে দণ্ডিত হইয়াছেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি সেই সব মামলার আসামীদিগকেও মুক্তি দিতে হইবে। সমগ্র জাতি আজ দেশের এই বীর সন্তানদিগকে নিজেদের মধ্যে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

পরলোকে ভুলাভাই দেশাই

গত ২২শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই পরলোকগমন করিয়াছেন। এই দুঃসংবাদ দেশবাসীর নিকট একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিছুদিন হইতেই তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারত শোকে মুহ্যমান হইয়াছে। শুধু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবস্বরূপেই নয়, মনীষী, বাগ্মী এবং সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিক নেতা হিসাবেও শ্রীযুত ভুলাভাই ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে বোম্বাই প্রদেশের এডভোকেট জেনারেলের পদত্যাগ করিয়া ভুলাভাই স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পর দেশসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা বিকীরিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের দলপতিরূপে তিনি তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা এবং শাসনতান্ত্রিক নীতিতে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান

করিয়াছেন। পরিশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল এবং লেফটেন্যান্ট ধীলনের মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে শ্রীযুত দেশাই যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি সমগ্র জাতির একান্ত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। আইনঘটিত জটিল এবং দুরূহ প্রশ্নসমূহে অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করিবার পক্ষে তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। তিনি এই মামলায় ব্যবহারবিজ্ঞানের দিক হইতে মানুষের সার্বভৌম উদার অধিকারকে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই অধিকারকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীযুত দেশাই প্রতিপন্ন করেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের পতাকাতলে সমবেত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কগণ অন্যায় কিছু করেন নাই। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এবং সেইরূপভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীরই আছে। শ্রীযুক্ত দেশাই ইহাও যৌক্তিকতায় দৃঢ় করেন যে, এক্ষেত্রে রাজানুগত্যের প্রশ্ন উত্থাপন করা সার্বভৌম ব্যবস্থার বিধিসম্মত নহে; কারণ তেমন আনুগত্য একটা চিরন্তন নীতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং যদি সে যুক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোন পরাধীন জাতির পক্ষেই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ভুলাভাইয়ের এই অভ্রান্ত উদার দৃষ্টিপ্রসূত যুক্তি ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে মানব-মর্যাদাময় এক অভিনব অধ্যায়কে উন্মুক্ত করিয়াছে এবং তিনি প্রখর মনীষা-প্রভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন। ভারতের এমন একজন স্বদেশপ্রেমিক নেতাকে হারাইয়া আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

স্যার তারকনাথের বাসভবন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ স্যার তারকনাথ পালিতের প্রাসাদোপম বাসভবন এবং তৎসংলগ্ন ২৫ বিঘা জমির বিশাল উদ্যানভূমি ১৬ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা এজন্য শ্রীযুত বিড়লার নিকট হইতে বায়নার টাকা পর্যন্ত লইয়া ফেলিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। স্যার তারকনাথ তাঁহার অসামান্য দান প্রভাবে বাঙালী জাতির কাছে পুণ্যশ্লোক হইয়া রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত তাঁহার পবিত্র বাসভূমি এইভাবে বিক্রয় করিবার আগে বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীকে কিছুই জানান নাই। আমাদের বাঙালীদের একটি দুর্নাম এই যে, আমরা পূর্বসুরীদের স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট সচেতন নহি; কিন্তু সম্প্রতি এবিষয়ে আমাদের সমাজ অনেকটা সজাগ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসতবাটী পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা হইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বাস-ভবনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ বাসভবনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্পে সমগ্র বাঙালী জাতি আজ উদ্যোগী হইয়াছে। জাতীয় চৈতন্যের ঠিক এই শুভ মুহূর্তে দানবীর ও মনীষী স্যার তারকনাথের বাসভবন এবং কীর্তিকে পণ্যবস্তুরূপে বাজারে উপস্থিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী জাতির যে কত বড় লজ্জার কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বস্তুতঃ স্যার তারকনাথের স্মৃতির পবিত্রতার কাছে, বিশ্ব-বিদ্যালয় যে ১৬ লক্ষ টাকা পাইতেছেন, তাহা

কিছুই নয়। আমরা তাঁহাদিগকে এখনও এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভারতের বহু জনকল্যাণকর কার্যের সঙ্গে বিড়লা পরিবারের সম্পর্ক আছে, আমরা আশা করি, তাঁহারা যদি এই সম্পর্কে বায়নার টাকা জমা দিয়া থাকেন তবে তাহা প্রত্যাহার করিয়া বাঙালী জাতির মুখ রক্ষা করিবেন।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার উদ্যম

রাণাঘাট মহকুমার চর-নওপাড়ার খাসমহল হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানদিগকে আনিয়া জমি বিলি করিবার নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। এই সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুত কেশবচন্দ্র মিত্র এবং রাণাঘাটের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী এবং সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই বিবৃতি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চর-নওপাড়ার খাসমহলের এই সব হিন্দু প্রজারা যে খাজনা দিতে অস্বীকৃত বা অপারগ হইয়াছেন ইহা নহে, তাঁহারা খাজনা দিতে প্রস্তুত আছেন, শুধু তাহাই নয়; যথারীতি সেলামী দিতেও তাঁহারা রাজী আছেন; তথাপি তাঁহাদিগকে ভিটেছাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং ইহার মধ্যেই ৬০টি পরিবারের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে ২২টি মুসলমান পরিবারকে নূতন জমিতে পত্তন দেওয়া হইয়াছে। বহুদিনের বাসিন্দা হিন্দু প্রজাদের কোন আবেদন-নিবেদনই গ্রাহ্য করা হইতেছে না, পক্ষান্তরে আগন্তুক মুসলমানদিগকে সরকারী মহল হইতে নানাভাবে সাহায্য করা হইতেছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ এম নাসীরুদ্দীন এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া প্রকাশ এবং মুসলীম লীগের দলবলও এই কার্যে তাঁহার অনুকূলতা করিতেছে। কিছুদিন হইতে এই ব্যাপার সম্পর্কে সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই। ইহাতে জনসাধারণের মনে অধিকতর সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লোকে ইহাকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পূর্বোদ্যম বলিয়া মনে করিতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতা চাহিয়াছেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিকতার নমুনা যদি এইরূপ হয়, তবে সমগ্র বাঙলা দেশে অচিরে সাম্প্রদায়িক অনর্থ দেখা দিবে এবং দেশের সর্বনাশ ঘটিবে। ইহার মধ্যেই পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চল হইতে অশান্তির খবর পাওয়া যাইতেছে। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের ভৈরববাজার অঞ্চলে এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনের কতকাংশে কয়েক মাস ধরিয়া ক্রমাগত গুণ্ডার উপদ্রব চলিতেছে। সম্প্রতি একদল গুণ্ডা ভৈরব হইতে ঢাকাগামী ট্রেনে মহিলাদের কক্ষে হানা দেয় এবং যথেচ্ছ লুঠতরাজের পর মুসলিম লীগের পতাকা উড়াইয়া পাকিস্থানী ধ্বনি করিতে করিতে সেই ট্রেনেই গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এইরূপভাবে ট্রেনে হানা দিয়া মালপত্র লুঠ একদিনের ব্যাপার নয়, মাঝে মাঝেই প্রকাশ্য দিবালোকে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে; শুধু ইহাই নয়, গুণ্ডার দল ট্রেনে উঠিয়া নারী-হরণ করিতেছে এবং ধর্ষিতা নারীদিগকে বিক্রয় করিতেছে বলিয়াও আমরা অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি অথচ এ পর্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। বরিশালের কোন কোন অঞ্চল হইতেও আমরা উপদ্রবের সংবাদ পাইতেছি। এইসব ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, বাঙলা দেশ কি তবে গুণ্ডার রাজত্বে পরিণত হইতে চলিল! বাঙলা গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ সুরাবর্দীর এ সম্পর্কে কি বক্তব্য আছে, দেশবাসী তাহাই জানিতে চায়।

ভারতের বেদনা

ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে। আমেরিকা বর্তমানে জগতের সবচেয়ে বড় মহাজন। অবস্থার জোরে সে এখন বিশ্বের অভিভাবকত্ব করিতেছে। ভারতবর্ষ এই আমেরিকার কাছে অন্নপ্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষাই জুটিয়াছে। ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য স্যার মণিলাল নানাবতী সম্প্রতি লণ্ডনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, আমেরিকা ভারতবর্ষকে এক ছটাক খাদ্যশস্যও দেয় নাই, অথচ এক লক্ষ টন দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। স্যার মণিলাল বলিয়াছেন যে, জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ যদি বাহির হইতে ২০ লক্ষ টন খাদ্যের সাহায্য না পায়, তবে ভারতের রেশন ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িবে, এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমরা জানি, এজন্য মার্কিন গভর্নমেণ্টের বস্তুত কোন মাথাব্যথা নাই, ইংরেজেরই মত তাঁহারাও সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁহারা নিজেদের শোষণ স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতেছেন। ভারতে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াই থাকে এবং ভারতের লোকেরা খাদ্যাভাবে থাকিতে অভ্যস্তই আছে, আমরা মার্কিন রাজনীতিকদের মুখে এই ধরণের কথাই শুনিতে পাইতেছি। সত্য কথা এই যে, জগৎ জুড়িয়া রাক্ষসী আর আসুরিক প্রবৃত্তিরই দৌরাত্ম্য চলিতেছে, বিগত মহাসমরের শিক্ষা পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহকে সংস্কারমুক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং মানবতার কোন আবেদনই ইহাদের অন্তর স্পর্শ করিবে না এবং দুর্বল যাহারা তাহারা ইহাদের কাছে লাথি গুঁতা খাইয়াই মরিবে। দুর্বলতা এজগতে সবচেয়ে বড় পাপ এবং এই পাপ হইতে জাতিকে ভগবানও রক্ষা করিতে পারেন না। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচিতে হয়, এই পাপ কাটাইয়া উঠিয়া তবে তাহাকে বাঁচিতে হইবে। জাতির দুঃখ বেদনা, অবমাননা এবং বুভুক্ষার তাপ বৈপ্লবিক আবেগে এই পাপ সমাজ দেহ হইতে উৎখাত করিবার জন্য যদি আমাদিগকে প্ররোচিত করে, তবেই আমরা রক্ষা পাইব, নতুবা পশুর জীবনই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে। শুধু নৈতিক যুক্তিতে জগতে মানুষের মর্যাদা মিলে না, শক্তিই মর্যাদা লাভের একমাত্র পন্থা। জাতির অন্তরে দুর্জয় শক্তির উদ্বোধন করাই আমাদের পক্ষে বাঁচিবার পথ; ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

পরী

শ্রীতারাপদ রাহা

উপমাটা যে কিসের দিব বুঝিয়া উঠিতেছি না; শুষ্ক তরু মঞ্জরিল,—অথবা ঊষর মরু সহসা হরিৎ ক্ষেত্রে পরিণত হইল,—কিংবা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গুণে কোন স্বল্পজন লোকালয় এক রাত্রির মধ্যে মহানগরীতে পরিণত হইল।

আমার বক্তব্য হইতেছে—জাপান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই রেঙ্গুনে বোমা পড়িল, সংগে সংগে শ্রীকোল গ্রামের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল।

জনবিরল পথসকল শহরাগত লোকের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। ময়লা-ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা গ্রাম্যলোকের চোখে বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া সেখানে হাল-ফ্যাসানের জামা-জুতা-পরা সৌখীন লোকের চলাফেরা আরম্ভ হইল।

নবাগত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শহুরে বুলি শুনিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, তাহাদের গায়ে প্রজাপতির মত রঙবেরঙের জামা-কাপড় দেখিয়া গিয়া নিজের মা-বাপের কাছে গিয়া বায়না ধরে।

নগ্নপদা অবগুণ্ঠিতা কলসীকক্ষা ম্যালেরিয়া-জীর্ণা স্নানার্থিনীদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গ্রামের তরুণদের চোখে অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, তাহারা এখন পথে-ঘাটে স্যাণ্ডেল-সু-পরা বিচিত্রাভরণ-ভূষিতা প্রভাত-ফুল্লকমলসদৃশা শহরাগতা তরুণীদের দিকে চাহিয়া থাকে। রঙবেরঙের সাড়ী, সাপের মত দোদুল্যমান বেণী, বিহংগের মত মিষ্টি বুলি, প্রজাপতির মত হালকা গতি,—এ যেন গ্রামে এক মহান্ আবির্ভাবের মত।

চৈতন্যদাস একতারা লইয়া গান গাইতে আসিলে ছেলেমেয়েরা সব ছুটিয়া আসিত,—এখন তাহারা মহেন্দ্র দাস আর কালীপদ বিশ্বাসের বাড়িতে গ্রামোফোন শুনিতে যায়। ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম বাজে, কোথাও এস্রাজ।

খগেন মিত্তিরের নয় বৎসরের মেয়ে অণিমা আবার ডুগি-তবলার সংগে সংগত করিয়া গান গায়। গ্রামের লোকের কাছে সবই বিস্ময়।

এত রঙ্গ আমাদের গ্রামে থাকতে—গ্রাম নাকি এতদিন কানা হয়ে ছিল,—গ্রামের সাবেক অধিবাসীরা বলাবলি করে। উপমাটা অবশ্য ব্যাকরণসম্মত হইল না, তবুও গ্রামবাসীর মনোভাব ত বুঝা গেল।

ঝিনাইদহ হইতে বাস রিজার্ভ করিয়া এক্কাগাড়ি ভাড়া করিয়া লোক আসিতেছেই। প্রথম প্রথম লোকে খোঁজ-খবর রাখিত, শেষে আর সম্ভব হইল না। পথে পথে বাড়িতে বাড়িতে নূতন মুখ। গ্রামের বুড়োবুড়ি পথে কোন নূতন মুখ দেখিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, খোকা, তুমি কোন বাড়ি এসেছ?

মজুমদার বাড়ি।

নাম কি তোমার?

অনিলকুমার মজুমদার।

বাপের নাম কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার।

ওঃ, যোগেশের ছেলে তুমি, ক' ভাইবোন তোমরা?

তিন ভাই, দু'বোন।

বেশ, বেশ...ভাগ্যিস যুদ্ধ বাধল, নইলে কে তোমাদের দেখতে পেত!

ঠিক সেই সময়েই আর দুইটি ছেলে হাতে গুলতি লইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে:

তোমরা কোন্ বাড়ি এসেছ?

মিত্তির বাড়ি, প্রফুল্লকুমার মিত্তির আমাদের মামা।

ওঃ রাণীর ছেলে তোমরা?

এমনি করিয়া ছোট বড় প্রায় সকল বাড়িতেই লোক আসিয়াছে। কেহ ছেলেপিলে লইয়া নিজের পল্লীভবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ মামাবাড়ি, কেহ ভাগিনীপতির বাড়ি; কেহ বা কলিকাতায় শুধু প্রতিবেশী ছিল, অন্য কোথাও বাড়ি না পাইয়া প্রতিবেশীর সহিত তাহাদের গ্রামে আসিয়া একটিমাত্র ঘর চাহিয়া লইয়া তাহাতেই ছেলেপিলে লইয়া বাস করিতেছে।

প্রথম প্রথম এই নবাগতদের দেখিয়া গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেবুড়ো সবারই রোমাঞ্চ জাগিত। ক্রমাগত কিছুদিন দেখিবার পর প্রায় গা-সহা হইয়া উঠিতেছিল—এমন সময় গ্রামে এক নূতন ব্যাপারের সাড়া পড়িয়া গেলঃ সান্যাল বাড়ির একটি ছেলেকে পরীতে ধরিয়াছে।

শহর হইতে আধুনিক রুচিসম্পন্ন অনেক লোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শুনিয়া নাক সিটকাইলেনঃ যত সব পাড়াগেঁয়ে কাণ্ড,—পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ভূতে ধরে,—ছেলেদের আবার পরীতে ধরা আছে নাকি?

কেহ মন্তব্য করিল, বোমা আর কামানের আওয়াজে পরীরা সব অন্য দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে, আমরা যেমন এসেছি। তাদেরও 'ইভাকুয়েশান।'

হাতে বিশেষ কাজ না থাকায় কেহ কেহ কৌতূহলবশতঃ গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখিতেও আসিল।

তাহারা দেখিল, তাহারা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নয়। ছেলেটি এ গ্রামের নয়, তাহাদেরই মত শহর হইতে কয়েকদিন আগে এখানে মামাবাড়িতে আসিয়াছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, বয়স কুড়ি একুশ—থার্ড ইয়ারে পড়ে।

ছেলেটির মায়ের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে,—কোন স্ত্রীলোক দেখিতে আসিলেই চোখের জল ফেলিয়া বলেন, সুস্থ ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি এলাম, কি যে হ'ল ছেলের, তোমরা কেউ যদি কিছু জান ত একটা উপায় কর।

নির্মলা এই দশ বৎসর পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন,—একটি মাত্র ছেলে, তার এই কাণ্ড! স্বামী সরকারী বড় চাকরে,—যাওয়ার কথা ছিল মধুপুর,—বাড়িও ঠিক হইয়াছিল—কিন্তু সেখানে দেখাশুনা করিবার লোক নাই বলিয়া শ্রীকোল শ্বশুরবাড়িতে পাঠাইয়াছেন।

নির্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, তবুও বাপের বাড়ি এসেছিলাম তাই, ওকে নিয়ে যদি মধুপুরে যেতাম ত কি হ'ত!

আর ছেলেপিলে নেই?

আছে, দুটি মেয়ে,—ছোট।...এদেরও বিরক্ত করে মারছি, ভাই। বাপ-ভাই কেউই বাড়ির বা'র হতে পারছেন না এর জন্য,—কখন যে কি হয় বলা ত যায় না। খুব কাছাকাছি ভদ্রঘরও আর নেই,—দিনের বেলা যে যার কাজে চলে যায়।

শহরাগতা একজন বলিয়া ওঠেন,—কেন রাস্তার ওপারেই ত চক্কোত্তি বাড়ি,—বাড়ি ভরতি লোকজন,—শহর থেকেও কত নতুন লোকজন এসেছে,—ডাক দিলেই ত পারেন।

ম্লান হাসিয়া নির্মলা বলেন,—আরে ভাই, জানেন না ত সব,—এ সব পাড়াগেঁয়ে কাণ্ড—এরা মরবে, তবু ও বাড়ির কেউ আসবে না।

ও মা, এমন ত কোনদিন শুনি নি।

এরা ডাকলে ত। দুই গেরস্থের মুখ দেখাদেখি নেই,—এমন বিশ বছর। আমি যখন ছোট, তখন একবার কি কাইজে!...তারপর দুই গেরস্থের লোকজনই সব লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে হাটবাজার করতো।

বাবুবা!

চক্কোত্তি বাড়ির জানালায় কয়েকটি মেয়ের মুখ দেখা যাইতেছে,—কৌতূহলী মুখঃ এ বাড়িতে কাহারা আসিল, তাহারা দেখিতে আসিয়াছে। একটি মেয়ের মুখখানা বড় সুন্দর, রঙ ফর্সা, একবারে নিখুঁত গড়ন।

নবাগতার দৃষ্টি সেদিকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও মেয়েটি কে ভাই—চক্কোত্তি বাড়ির জানলায়?

রসিক চক্কোত্তির নাতনী—নাম অতসী, আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে এল—এক বাস্ এ—বাপ কণ্ট্রাক্টর করে কলকাতায়—নির্মলা বলিলেন।

তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিয়া কথাবার্তা হইতেছে লক্ষ্য করিয়া মেয়েগুলি জানালা হইতে সরিয়া গেল, পরক্ষণেই কে গান ধরিল—"ওপারের আলোছায়া, আবার আনিছে মায়া..."

কে ভাই?

নির্মলা উত্তর দিবার ফুরসুৎ পাইল না। সুজিৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল—দুই একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল,—দুই হাত মুঠা করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—এসেছিস, মুণ্ডমালা গলায় প'রে আবার এসেছিস?

নির্মলা ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিলেন, শহরের ও গ্রামের যে সব মেয়েরা নির্মলার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তাঁহারাও গিয়া ধরিলেন। সুজিৎ এক ধাক্কায় সকলকে ফেলিয়া দিয়া হাত মুঠ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল,—পারবি নে, তুই পারবি নে—আমি একে নেব, তোরা রাখতে পারবি নে—পারবি নে, পারবি নে.....,

দাঁতে দাঁত লাগিয়া কড়মড় শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ আস্ফালন। নির্মলার ছোট ভাই, বাপ ও দুজন প্রতিবেশী ছেলে ছোকরা ছুটিয়া আসিয়া চাপিয়া ধরিল, সুজিৎকে ঠেকাইতে পারিল না। সে উহাদের ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘরের দেওয়ালে কোন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে দমাদম ঘুষী লাগাইতে লাগিলঃ আসতে দেব না তোদের, আমি একে নেব—আমি একে নেব।

এবার সমাগত পুরুষ মেয়ে সবাই তাকে একসঙ্গে চাপিয়া ধরিল,—নির্মলা কলসী কলসী জল তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিলেন।

চক্কোত্তি বাড়ির জানালায় আবার কয়েকটি মুখ দেখা যাইতেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করিবার পর সুজিৎকে একটু শান্ত হইতে দেখা গেল। নবাগত মহিলাটি নির্মলার নিকট বিদায় লইতে গেলে নির্মলা বলিলেন, অনেক কষ্ট করে গেলেন—কি আর বলব—ঋণী করে রেখে গেলেন......কোন্ বাড়িতে এসেছেন, ছেলে সুস্থ হ'লে যাব একবার বেড়াতে।

যাবেন, নিশ্চয় যাবেন,—আমি এসেছি রায় বাড়িতে। ছেলের আবার ফিট হ'লে আমায় খবর দেবেন।

নাম ত আমি জানি নে, ভাই!

আমার নাম বিভাবতী ঘোষ,—শুক্কার মা বলে খবর দিলেই চলবে।

বিভাবতী চলিয়া গেলেন। নির্মলার একটি দরদী বন্ধু জুটিল। নির্মলা মনে মনে ভাবিলেন—কলিকাতা ফিরিয়া গিয়া বন্ধুত্বটা আরও পাকা করা যাইবে।

গ্রামের আশেপাশে যত নামকরা ডাক্তার কবিরাজ ছিলেন, কেহই সুজিতের চিকিৎসায় কোন সুফল দেখাইতে পারিলেন না। এ না কি তাহাদের শারীর-বিজ্ঞানের বাইরে।

অবশেষে শ্রীধরপুর হইতে রোজা আনা হইল। রোজা তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। নাম সুদর্শন চক্রবর্তী।

সুদর্শন দিন তিনেক সান্যাল বাড়ি থাকিয়া রোগীর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলেন,—রোগী রোজার কথার জবাবও দিল। তিনি মত প্রকাশ করিলেন,—রোগীকে শুদ্ধ পরীতে ধরিয়াছে।

শ্মশানের ছাই, কবরের মাটি, বেশ্যার দোরের ধুলা, চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি—কি কি দ্রব্যের সংমিশ্রণে তিনি এক কবচ করিয়া দিলেন। ঐ কবচ অঙ্গে ধারণ করিতে হইবে,—পথ্য যত বাসি, পচা এ'টো অশুদ্ধ দ্রব্য।

রোজা বেশ মোটা টাকা লইয়া গেলেন,—বলিয়া গেলেন,—সাবধান, শুদ্ধ বিশুদ্ধ দ্রব্য

যেন ইহাকে কোন সময়ে খাইতে দেওয়া না হয়। অন্তত এক পক্ষকাল ঠিকমত চলিতে পারিলে অসুখ সারিয়া যাইবে।

কবচ ধারণ করিবার পর দিন পাঁচেক ছেলেটি ভালই থাকিল, তাহার পর আবার সেই খিচুনি আরম্ভ হইল। দেখা গেল মাদুলীর দ্রব্য সব ছুটিয়া গিয়াছে। খোঁজ করিয়া জানা গেল—আগেকার দিন সন্ধ্যায় নির্মলা সুজিৎকে এক বাটি খাঁটি দুধ খাইতে দিয়াছিলেন, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া ছেলের শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছিল।

নূতন করিয়া মাদুলীর ব্যবস্থা করিতে শ্রীধরপুর আবার লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছিল,—এমন সময় সান্যাল মহাশয়ের বিশ্বস্ত প্রজা তাহের আলি আসিয়া বসিল। সকল কথা শুনিবার পর সে বলিল,—বাবু, হুকুম করেন ত আমি ফকীর আনতি পারি, জেন্-পরী ছাড়াতি তিনি একেবারে ওস্তাদ, মাত্র পাঁচসিকে খরচ,—আর এক জোড়া কাপড়।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক হইল—তান্ত্রিক রোজা ত একবার দেখা হইয়াছেই,—এবার ফকীর রোজাই দেখা যাক।

তাহার পরদিন তাহের শ্রীরামপুর হইতে তিনজন ফকীর লইয়া আসিয়া হাজির হইল। প্রধান ফকীরের নাম কেসমৎ আলি, অপর দুইজন তার চেলা। কেসমৎ সশিষ্য নেপাল মুছুল্লির বাড়িতে উঠিলেন,—হিন্দুবাড়িতে তাহাদের কাজ করা—অসুবিধা।

সুজিৎকে নেপাল মুছুল্লির বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইবে,—কিন্তু একটু আগে তাহার ফিট হইয়া গিয়াছে। এখন সে বুঁদ হইয়া বসিয়া আছে,—পর মুহূর্তেই আবার কি হয় বলা যায় না। গ্রামের দশ বারোটি ছেলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। সংগে তাহার মামা শিবনাথ ও দাদু হরনাথ। তাহার মা-ও সংগে যাইতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু হরনাথ বারণ করিলেন।

গ্রামের ছেলে বুড়ো যে যেখান হইতে শুনিল, ছুটিয়া চলিল,—ভূত তাড়ানো দেখিবে।

নেপাল মুছুল্লির বাইরের উঠান লোকে ভরিয়া গিয়াছে। বেঞ্চ-মাদুরে জায়গা না হওয়ায় লোকসকল আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়াছে। সকলের মুখেই কৌতূহল।

রোগী সুজিৎকে ফকীরের নির্দেশমত একটা মাদুরে পূবমুখো করিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। পাশেই একটা তক্তপোষে ফকীর কেসমৎ আলি পশ্চিমের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন,—তাহার দুই শিষ্যের একজন তার শিরোদেশে ও একজন তার পাদদেশে বসিয়া ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। সংগে সংগে সুজিতের সর্বাংগ আবার কাঁপিতে লাগিল। এইবার আবার তাহার ফিট হইবে মনে করিয়া কয়েকটি ছেলে তাহার হাত-পা চাপিয়া ধরিয়া রাখিল।

মন্ত্র পড়িতে পড়িতে একজন ফকীর গিয়া সুজিতের গায়ে অংগুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। রোজা কেসমৎ আলি এবার উঠিয়া গিয়া সুজিতের মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে?

সুজিতের মুখ দিয়া উত্তর হইল,—ডাকিনী যোগিনী।

কেন এসেছেন আপনারা?

আমরা একে রক্ষা করতে চাই।

কেন,—কি হয়েছে এর?

একে শুদ্ধ পরীতে ধরেছে,—তার হাত থেকে আমরা একে রক্ষা করতে চাই।

তবে,—রক্ষা করছেন না কেন?

পারছি না আমরা,—শুদ্ধ পরীর সংগে পেরে উঠছি না,—অশুদ্ধ পরী হলে পারতাম।

আপনারা টের পেলেন কি করে?

আমরা সব জানতে পারি।

একে রক্ষা করবার আপনাদের এমন কি দায় পড়েছে?

ছেলেটি কালীভক্ত ছিল।

ওঃ—

—বলিয়া কেসমৎ আলি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা আর কতক্ষণ থাকবেন?

জানি না। শুদ্ধ পরী এলেই আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়, যতক্ষণ আমরা লড়ে থাকতে পারি।

কি করলে শুদ্ধ পরীকে তাড়ানো যায়?

তা তোমরাই জান।

আমরা জেন-পরীকে তাড়াতে পারি,—শুদ্ধ পরী তাড়ানো মন্ত্র জানি না।

তবে এসেছ কেন?

জনতার ভিতর হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—শ্মশানের ছাই, কবরের মাটি—এই সব দিয়ে মাদুলী করে দেওয়ায় কয়েকদিন ভাল ছিল।

কেসমৎ আলি বলিলেন, তাহ'লে এই সব দিয়ে কবচ করে দিন?

আরও দুই একটি প্রশ্ন করিবার পর কেসমৎ আলি বলিলেন, আমরা জেন-পরী তাড়াতে পারি, শুদ্ধ পরীকে পারি না, আপনারা সেই ঠাকুরকেই আবার ডাকুন।

জনতা কোলাহল করিতে করিতে ফিরিয়া গেল, সুজিৎকে ছেলেরা সব ধরাধরি করিয়া বাড়ি আনিল।

শ্রীধরপুরে সুদর্শন ঠাকুরের কাছে আবার লোক গেল,—কিন্তু তিনি আসিলেন না। কবচ একবার ছুটিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আর তিনি কবচ দেন না। গুরুর নিষেধ আছে।

বাড়ির লোকেরা সব প্রমাদ গণিলেন।

শুক্লার মা বিভাবতী প্রায় প্রতিদিনই আসিয়া সুজিতের খবর লইয়া যাইতেন। এখানে আসিয়া হাতে বিশেষ কাজ ছিল না—নির্মলার সংগে বন্ধুত্বও তাঁহার জমিয়া উঠিতেছিল। তাহা ছাড়া আর একটা কারণও ছিলঃ তাঁহার স্বামী মিঃ জে এম ঘোষ ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপকঃ বিকৃত-মস্তিষ্ক অনেক লোককে তাঁহার কাছে আনা হয়। স্বামীর নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসা দেখিয়া মানব মনের গতিবিধির অনেক খোঁজ-খবর তিনি জানেন।

ফকীর চলিয়া যাইবার দুদিন পর সুজিৎকে দেখিতে আসিলে নির্মলা তাহাকে বলিলেন, কি করি ভাই বলুন ত—একবার মনে হচ্ছে কলকাতায়ই ফিরে যাই, যার ছেলে তার কাছে ফেলে দিই—তিনি যা জানেন তা করুন।

বিভাবতী একদৃষ্টে নির্মলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,—ফকীর তান্ত্রিক ত দেখানো হ'ল। এবার আর কোন চিকিৎসা করতে আপত্তি আছে আপনাদের?

আপত্তি কি?—কিন্তু কি চিকিৎসাই বা আছে,—আর কে-ই বা করবে?

যদি আমি করি?

যা'ন—এই কি ঠাট্টার সময়?—সত্যি যদি কোন উপায় থাকে ত বলুন?

ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি—যদি আপনাদের অমত না থাকে ত একবার চেষ্টা করে দেখি।

নির্মলা সহসা বিভার হাত ধরিয়া বলিলেন, ভাই,—সত্যিই যদি পারেন—চিরকাল কেনা হয়ে থাকব আমি।

কিন্তু একটা কথা আছে।

কি?

আমি যা বলব—করতে হবে কিন্তু—মান অপমানের কথা ভাবলে চলবে না।

ছেলের বড় কি আমার মান অপমান?

শুধু আপনার কথা নয়, গেরস্থের কথা; আপনি বাপের বাড়ি এসেছেন, বাপকে জিজ্ঞাসা করুন।

নির্মলা তখনই গিয়া বাপ হরনাথ ও ভাই শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলেন। তাঁহারা দুজনাই বলিলেন, একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? সুজিতের অসুখ ভাল করিতে তাঁহারা যে কোন কাজ করিতে রাজী আছেন।

নির্মলা আসিয়া বিভাকে জানাইলে বিভা বলিলেন, তা হ'লে আমি কাজ আরম্ভ করি।

সে কথা আবার বলতে!

ইহার পর দুইদিন আর বিভাবতীকে সান্যাল বাড়ি দেখা গেল না। তৃতীয় দিন বেলা প্রহর দেড়েকের সময় বিভা সান্যাল বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন, সুজিৎ স্তব্ধ

হইয়া বসিয়া আছে। নির্মলা কাছে আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাই, ছেলে কেমন আছে ?

এই ত একটু আগে ফিট হয়ে গেল, আপনি চিকিৎসা করবেন বলে গেলেন,—আর দেখা নেই !

বিভাবতী হাসিয়া বলিলেন,—এদিকে আবার মজার ব্যাপার ঘটেছে।

চিকিৎসার কথার কোন জবাব না দিয়া হাসিয়া মজার ব্যাপারের প্রসঙ্গ তোলায় নির্মলা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ?

ওদিকে আবার চক্কোত্তি বাড়ির সেই মেয়েটির ফিট হওয়া আরম্ভ হয়েছে, তার আবার ভুতে ধরল কি না কে জানে ?

কোন্ মেয়েটি ?

সুজিৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে।

বিভা উত্তর করিলেন,—সেই যে ফর্সা মেয়েটি এসে জানলায় দাঁড়ায়,—অতসী—যার সঙ্গে আপনারা এক 'বাস'এ এলেন। কাল গেছলাম ও বাড়িতে বলে এলাম, এক কাজ করুন, ওকে সুজিতের সঙ্গে বিয়ে দিন, একে পরীতে ধরেছে, ওকে ধরেছে ভুতে—বিয়ে দিলে ভুত-পরীতে মারামারি করে দু'জনাই পালাবে।

নির্মলার মুখ দেখিয়া বোঝা যায় তিনি বিভার এ সময় রহস্য করা পছন্দ করিতেছেন না। বিভা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বেপরোয়া-ভাবে বলিয়া চলিলেন, অতসীর মায়ের সুজিৎকে দেখে বড় পছন্দ—বললেন, দুই গেরস্থে বিবাদ না থাকলে তিনি এম্নেই কথা পাড়তেন। বিবাদ না থাকলে......তা ছাড়া ছেলের যে আবার অসুখ হয়ে পড়ল, নইলে—রোমিও জুলিয়েটের মতই না হয় হ'ত—রোমিও জুলিয়েটের গল্প জানেন ত ?

না ভাই—ইংরেজি বই আমি পড়ি নি।

সে-ও এমনি শত্রুর ঘরের মেয়ে—শত্রুর ঘরের ছেলে......তা বাপু বিবাদটা মিটিয়েই ফেলুন না,—আমি একবার চেষ্টা করেই না হয় দেখি।

ছেলের অসুখ সারুক ত!

তা ওদিকে আবার মেয়েরও ত অসুখ, বিয়ে হ'লেই অসুখ সেরে যাবে।

নির্মলা এসব কথায় বড় কান দিতে চাহেন না,—বলেন—ওর চিকিৎসা শুরু করবেন কবে থেকে,—তাই বলুন।

এই আজ থেকেই—বিকেলে আমার ওখানে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ রইল—আপনাদের মানে—আপনার, সুজিতের আর তার দুই বোনের।

সে সব পরে হবে।

না, আজই।

সুজিতের ত বিশ্বাস নেই, হয়ত বিকেলে তখনও ফিট হয়ে পড়ে থাকবে।

না, আজ আর ওর ফিট হবে না।

নির্মলা অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন।

বিভা বলিলেন—দেখবেন বলে যাচ্ছি আমি।

বেশ ভাল থাকে ত—যাব।

ভাল থাকে ত না,—ভাল ও থাকবেই,—এবং নিশ্চয়ই আপনি যাবেন।

আচ্ছা, দেখা যাবে!

সেদিন সত্যই আর সুজিতের ফিট হইল না,—বিভা মন্ত্র জপ আরম্ভ করিয়াছেন কিনা—কে জানে ?

বিকালে রায় বাড়িতে নির্মলা পুত্র কন্যা-সহ চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া দেখেন, সে বাড়িতে আরও লোকের সমাগম হইয়াছে,—অতসী তার ছোট ভাই, বোন ও তাহাদের মা আগেই আসিয়া গিয়াছেন।

মেঝেতে মাদুরের উপর চাদর পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। অতসী, তার মা, ভাই, বোন আগে আসিয়া তাহাতে বসিয়াছে। নির্মলাকে তাঁহার পুত্র-কন্যা লইয়া তাহাতেই বসিতে হইল। বিভাবতী আমন্ত্রিতদের জন্য জলখাবার করিতে রান্নাঘরে ব্যস্ত আছেন—একবার শুধু আসিয়া হাসিয়া নির্মলাকে অভ্যর্থনা করিয়া আবার তখনই চলিয়া গেলেন।

নির্মলা এরূপ সংকটে পড়িবে আগে বুঝিতে পারে নাই,—পারিলে হয়ত আসিতেন না। এক ঘরে একই ফরাসে বসিয়া পরিচিত লোকের সাথে কথা বলিতে না পারার মত দুর্ভোগ আর নাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অবশ্য এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে—আবার আসিয়া বসিতেছে, এ শত্রুতার কথাও তাহারা বুঝে না—সুতরাং ইহার মধ্যেই তাহাদের ভাব হইয়া গিয়াছে। সুজিৎ ও অতসী দুই পাশে দুইজন চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুস্কিল হইয়াছে নির্মলার। অতসীর মা সুমতি আর নির্মলা এক সঙ্গে ছেলেবেলায় আম কুড়াইয়াছেন, খেলা করিয়াছেন—কুমারের জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়াছেন, তারপর দুইজনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুইজনের বাপের বিবাদ আরম্ভ হয় আরও দু'এক বৎসর পর।

নির্মলা ও সুমতি দু'জনেরই শহরে জীবন কাটিয়াছে, পাড়াগাঁয়ের বিবাদ তাঁহাদের অন্তরে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাপের বাড়ি দুইজনেই ইহার আগেও কতবার আসিয়াছেন, কতবার হয়ত একই সময়ে আসিয়াছেন,—নদীতে স্নান করিতে গিয়া পরস্পরকে দেখিতেও পাইয়াছেন—কিন্তু কথা কেহ কাহারও সঙ্গে বলেন নাই। দুই-জনের বাপের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ দুইজনেই পরস্পরকে একবার মাত্র দেখিয় চক্ষু নত করিয়াছেন। আজ একই ঘরে একই ফরাসে বসিয়া—কথা না বলিতে পারিয় দুইজনই বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। নির্মলা এরূপ অবস্থায় আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরে বিভার কাছে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সুমতিই মৌন ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—ছেলে একটু ভালো ?

নির্মলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হউক গম্ভীর, কথা ত ঐ আগে বলিয়াছে। উত্তর দিলেন,—কি জানি, আজ ত এখন পর্যন্ত ভাল আছে।

এখন কি চিকিৎসা হচ্ছে ?

ঠিক সেই সময়ে খাবারের ডিস্ হাতে বিভা ঘরে ঢুকিলেন—নির্মলা তাঁহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—রোজা-বদ্যি ত অনেক হ'ল—এবার ইনি কি চিকিৎসা করবেন বলছেন।

সুমতি বিভার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন,—এ সব বিদ্যেও জানা আছে না কি ?

একটু-আধটু—

বলিয়া মৃদু হাসিয়া প্লেট রাখিয়া—নির্মলাকে ডাকিয়া বিভা বলিলেন,—আসুন না,—একটু সাহায্য করবেন।

নির্মলাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বিভা বলিলেন,—ফিটের কথা হচ্ছিল বুঝি ?

হাঁ,—কেন বলুন ত!

একটা কথা বলে রাখি, ভাই,—কিছু মনে করবেন না,—ওদের মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যেন। ওরা ওকথা গোপন রাখতে চায়,—আমি হঠাৎ সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম,—তাই—দেখে ফেলেছি। হাজার হ'ক মেয়ে কি না,—বুঝলেন না,—কোথায় বিয়ে দিতে হয়,—তারা আবার ওসব শুনে,—বুঝলেন না,—পুরুষের বেলায় আলাদা কথা,—হাজার হ'ক—

নির্মলা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা।

কিছু মনে করবেন না, ভাই,—আসুন খাবারটা নিয়ে যাই!

নির্মলা বিভার সঙ্গে খাবার লইয়া বসিবার ঘরে ঢুকিতে দেখে সুজিৎ—অতসীর দিকে তাকাইয়া আছে,—উহারা ঘরে ঢুকিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল। অতসীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

বিভাও ইহাদের সাথে চা খাইতে বসিলেন। একথা ওকথার পর তিনি হঠাৎ সুজিৎ ও অতসীর দিকে দ্রুত চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—এ দুটি বেশ মানায় কিন্তু,—দিন না একটা শুভ দিন দেকে ঘুরিয়ে,—আমরা এখানে থাকতে থাকতে,—নিমন্ত্রণটা খেয়ে যাই।

শুনিয়া সুমতি মৃদু হাসিলেন। নির্মলা

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—ছেলে ত আগে আমার ভাল হ'ক!

বিভা বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ছেলে আমি দ্বদিনেই ভাল করে দিচ্ছি,—সে ভার আমার উপর,—নইলে আপত্তি নেই ত আপনাদের?

নির্মলা সুমতির দিকে চাহিয়া অসহায়ের মত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—দুই গেরস্থের যা সম্বন্ধ তাতে—

সুমতিও নীরবে ম্লান হাসি দিয়া ঐ একই কথা জানাইলেন।

বিভাবতী সে কথা একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—রেখে দিন আপনারা পাড়াগেঁয়ে এই বিবাদের কথা,—যত সব—, বিবাদের পর আবার বন্ধুত্বটা জমবে ভাল, দেখবেন।

অতসী লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে চায়ের পেয়ালা হাতে উঠিয়া পালাইল। সুজিৎও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া ঘরের বাইরে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চায়ের শেষে বিভাবতীর অনুরোধে অতসীকে গান গাইতে হইল। বেশ মিষ্টি গলা। সুজিৎ ঘরে না আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াই অতসীর গান উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

সেদিন আর সুজিতের ফিট হয় নাই,—মেজাজটাও অনেকটা ভাল বলিয়া বোধ হইল। নির্মলা আর বাপের কাছে কোন কথা খুলিয়া বলেন নাই,—সুমতির সহিত কথা বলিয়া আসিয়া কি এক অপরাধের ভার তিনি মনে মনে বহন করিতেছিলেন। পরের দিনও সুজিতের বেশ ভালই কাটিল।

বিভাবতী তার পরের দিন আসিয়াই নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ভাই।—ছেলে কেমন?

আপাতত ভালই,—কিন্তু আপনি চিকিৎসা আরম্ভ করবেন কবে থেকে?

বিভা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—চিকিৎসা ত শুরু হয়ে গেছে,—ফলও পেয়েছি,—কিন্তু আমার কথা শুনে না চললে সব ভেস্তে যাবে।

কথা না শুনব কেন?

শুনবেন ঠিক?—মানে কথা রাখতে পারবেন ত?

নিশ্চয়।

তা'লে কালই আপনাদের এখানে সুমতি দেবী, অতসী আর তার ভাইবোনের সঙ্গে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে।

মানে?

মানে—চায়ের নিমন্ত্রণ।

আপনার নিমন্ত্রণ ত রোজই হ'তে পারে,—কিন্তু আর যা বলছেন,—তাতে কি বাবা রাজী হবেন?

রাজী করাতে হবে তাঁকে,—আমার সঙ্গে ত কথা আছে,—আমি যা বলব 'না' করতে পারবেন না।

কি যে বলেন আপনি বুঝি না,—কথা ছিল চিকিৎসা করবেন,—কিন্তু কি যে করছেন আপনি। সেদিনকার কথা বাবাকে বলি নি। তিনি শুনলে—

কথাটা আর তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বিভা,—নির্মলাকে হাত ধরিয়া লইয়া একটা ঘরে গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সুজিৎ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

প্রায় মিনিট পনের পরে শুধু নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া তার বাবাকে ডাকিয়া সেই ঘরে লইয়া আসিলেন। আবার ঘরের দরজা বন্ধ হইল।

পরের দিন হরনাথ সান্ন্যালের বাড়িতে হইল সুমতি ও তার পুত্র কন্যার নিমন্ত্রণ,—নিমন্ত্রণ চায়ের নয়,—নৈশ ভোজনের। নির্মলা নিজে চক্রবর্তী বাড়ি গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। এতদিন পরে—শত্রুপক্ষের মেয়ে আসিয়া নিজের মেয়েকে নিমন্ত্রণ করায় রসিক চক্রবর্তীর হৃদয় জয়ের আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বিভার অনুরোধে সেদিন রাত্রেও অতসীকে সান্ন্যাল বাড়িতে গান গাইতে হইল। মেয়েটির চেহারা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া হরনাথ সান্যাল বড় খুসিঃ তুমি রোজ এসে আমাকে একখানা করে গান শুনিয়ে যাবে,—দিদি,—নইলে তোমার দাদুর সঙ্গে আবার লাঠালাঠি শুরু করব,—তা বলে দিচ্ছি। হরনাথ সান্যালের কথা শুনিয়া আর সবার সঙ্গে অতসীও হাসিয়া উঠিল।

আবহাওয়াটা বেশ সহজ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ সান্যাল বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে অতসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুধু হাসি নয়,—আসতে হবে রোজ সন্ধ্যায়,—আসবি ত বল?

অতসী মুখ রাঙা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হাঁ।

প্রায় মাস তিনেক পরের কথা।

শ্রীকোল গ্রামে এত বড় ভোজ বহুকাল হয় না। দুই গৃহস্থের দীর্ঘকাল শত্রুতার পরে মিলনটা একটু নিবিড় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রীতির উচ্ছ্বাসটা সাধারণে বুঝিল ভোজের আয়োজন দেখিয়া। আর এত লোক সমাগমও বড় দেখা যায় না। খুব কম করিয়াও প্রায় দেড় হাজার লোক খাইল।

ফুলশয্যার রাত্রে সান্যাল বাড়িতেও আয়োজনটা কম হইল না। একদিনের লাঠির প্রতিযোগিতা যেন ভোজের প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

বিভার দুই বাড়িতেই পরম সমাদর। তারই বুদ্ধি ও কৌশলে দুই শত্রুর মিলন,—সুজিতের নিরাময়,—ও বেজায় মজার বিয়ে। এদিন বিভা সান্যাল বাড়িতে দেখাশুনা করিতে করিতে রহিয়া গেলেন। সুমতিও বেহান্ নির্মলার বাড়িতে আসিয়াছেন।

খাওয়া দাওয়া সারিতে রাত্রি প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। বাড়ির লোকে সবাই শুইয়া পড়িয়াছে। বিভা, নির্মলা ও সুমতি একত্রে বসিয়া পান খাইয়া সবে মাত্র দোতালার এক ঘরে এক বিছানায় শুইলেন। এমন সময়—

তেতালার রুদ্ধ ঘর হইতে যেন সেই পরিচিত চীৎকার কানে আসিল, আবার এসেছিস?......আমি একে নেব,—তোরা রাখতে পারবি নে,—পারবি নে, পারবি নে,—

নির্মলার দমটা যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—সুমতির মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল,—বিভাবতী ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেলেন। এ কি হইল!

তিনজনই বিছানা ছাড়িয়া উপরে ছুটিলেন। শব্দ আরও অনেকে শুনিয়াছিল—তাহারাও ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলেই ব্যাপার কি বুঝিতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়াছেন।

বরকনের ঘরে তখনও ফিটের আনুষঙ্গিক গোঙানি চলিয়াছেঃ কিন্তু—অতসী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া কাহাকেও ডাকে না কেন?

সুমতি একটু অধৈর্য হইয়া দরজার কড়া নাড়িলেন,—অমনি গোঙানি থামিয়া গেল।

ভাল করিয়া বুঝিতে নির্মলা গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন, সুজিৎ!

কি মা?

তোর অসুখ করেছে?

না,—মা।

তবে অমন করছিলি কেন?

কৈ, না ত।

ব্যাপার বুঝিয়া সবাই মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে শুনিয়া গেলেন তেতালার রুদ্ধ ঘর কৌতুকের হাসিতে গোঙাইয়া উঠিতেছে।

একটু পরে হাসি থামিলে অতসী বলিল,—ছিঃ কি করলে বলত,—ও'রা কি মনে করলেন বল ত?

বা রে,—তুমি অমনি করে জড়িয়ে ধরলে কেন,—পরীতে ধরলো, চেঁচাব না?

জিগ
ঘোরানো সিঁড়ি
আধুনিক রুচি সম্মত
জিগ ঘোরানো সিঁড়ি বর্তমানে বহু হাসপাতাল, সিনেমাগৃহ, সরকারী ভবন ও সাধারণ আবাসগৃহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহা শ্রেষ্ঠ উপকরণ হইতে প্রস্তুত এবং অসাধারণ দৃঢ়তা ও গঠন সৌষ্ঠবের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ইহার সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন প্যাটার্ণ সত্যই আনন্দদায়ক।
নিম্নলিখিত সাইজে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়ঃ—
৩, ৩½, ৪, ৪½, ৫, ৫½ এবং ৬ ফুট।
ডি, এন, সিংহ এণ্ড কোং
হেড্ অফিস ও কারখানা—৬১, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া
শো-রুম—৩৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন—হাওড়া ৩৪৮ ও বড়বাজার ৪৭৫৭।

গৃহলক্ষীর গৌরব
বঙ্গলক্ষ্মী সিন্দুর

ক্ষয় রোগের কারণ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

যাকে ইংরেজিতে টুবারকুলোসিস এবং থাইসিস বলে, আর বাঙলায় বলে যক্ষ্মা, তাকেই প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় বলে consumption আর বাঙলায় বলে ক্ষয়রোগ। এই দুটি কথার একই মর্ম। সাধারণপক্ষে অন্যান্য নামের বদলে এই নামটাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই ক্ষয়রোগ আমাদের দেশে আজকাল এতই বেড়ে গেছে যে, এখন প্রায় ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এটি পাল্লা দিয়ে চলবার উপক্রম করেছে। একথা বললে খুব অত্যুক্তি করা হয় না যে, বাঙলাদেশে আজকাল ম্যালেরিয়া হয় যত বেশি, ক্ষয়রোগও হয় প্রায় তত বেশি। অন্যান্য দেশেও এ রোগ আছে বটে, কিন্তু প্রায় সকল দেশেই একে যথাসাধ্য দমন করে ফেলা হয়েছে, কোনো দেশেই এর তেমন প্রাচুর্য ঘটতে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এই বাঙলা দেশে এ রোগটি বছরের পর বছর উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। অথচ এর কোনো প্রতিকার নেই, এর বিরুদ্ধে কোনো সমবেত চেষ্টা নেই, এমন কি আশ্চর্যের কথা এই যে, যথেষ্ট লোক এতে ভুগতে থাকলেও তার চিকিৎসার উপযুক্ত স্যানাটোরিয়মও এদেশে একটির বেশি দুটি স্থাপিত হয় নি। সকল দেশেই দেখা যাচ্ছে যে, এ রোগকে অনেকটা নিবারণও করা যায়, আর চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্যও করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে তার কোনোটাই হয় না। এখানে প্রথম অবস্থায় এ রোগটি প্রায় ধরাই পড়ে না, ম্যালেরিয়াতে ভুগতে অভ্যস্ত লোকে ভাবে ম্যালেরিয়ার মতোই কিছু হয়েছে, তারপর যখন অতি বিলম্বে জানা যায় যে ক্ষয়রোগ তখন ডাক্তার দেখিয়ে সামান্য কিছু চিকিৎসা করায়, অবশেষে যথাকালে নির্ধারিত ভাবে মরে। সবাই জানে যে এতে মরতেই হবে, মাতৃভাষায় লেখা যত গল্পে সাহিত্যে আর উপন্যাসেও তাই বলে, ডাক্তারেরাও তাই বলে, সুতরাং এর আর বুঝি কোনো বিহিত নেই।

কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? তা যদি হয় তবে অন্যান্য উন্নত দেশের লোকেরা এ রোগটিকে আমাদের মতো এতটা মারাত্মক মনে করে না কেন? তারা এ রোগ থেকে পরিত্রাণই বা পায় কেমন করে, আর আক্রান্ত হলেও অধিকাংশ রোগী আরোগ্যই বা হয় কেমন করে? তার কারণ তারা এর প্রতিকারের উপায় জানে, তারই জোরে তারা অনায়াসেই এর হাত এড়িয়ে চলতে পারে এবং আক্রান্ত হলেও সুচিকিৎসার দ্বারা একে দমন করতে পারে। আমরা তা জানি না বলেই পারি না। আমাদেরও এ রোগ সম্বন্ধে সকল তথ্য ভালো করে জানা দরকার, এর বিরুদ্ধে সাবধানতার উপায়গুলি শিখে রাখা দরকার। অজ্ঞতাই আমাদের মনে অতিরিক্ত বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেছে। যদি সঠিকভাবে সকলেই জানতে পারে যে কেমন করে এর উৎপত্তি হয়, কোথা থেকে এ রোগ শরীরের মধ্যে ঢোকে, কেন এটা এমন মারাত্মক হয়, কি উপায়ে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর কি উপায়েই বা এ থেকে আরোগ্য হওয়া যায়, তাহলে সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝবে যে, আমাদের অতটা ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞাতব্য কথা এই যে, এটি বিশেষ একরকম বীজাণুর দ্বারা মানুষের শরীরে জন্মলাভ করে, তার নাম সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি টি-বি, অর্থাৎ ব্যাসিলাস টুবারকুলোসিস, বাঙলায় বলা যেতে পারে যক্ষ্মা বীজাণু। কিন্তু বীজাণু বললেই সাধারণের মনে আজকাল একরকম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মনে হয় এরা বুঝি এমন দুর্দান্ত হিংস্রজাতের জীব যে, এরা আমাদের আক্রমণের জন্যই সর্বদা ওৎ পেতে বসে থাকে এবং একবার কাউকে আক্রমণ করতে পারলেই নির্ঘাত রোগ সৃষ্টি করে, আর নির্ঘাত তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু ঐ সকল ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বীজাণুরা কখনো ঐভাবে ক্রিয়া করে না এবং সকল রকম রোগের বীজাণুও সমান-ভাবে ক্রিয়া করে না। বীজাণুদের মধ্যেও বিস্তর জাতিভেদ আছে, তার মধ্যে প্রত্যেক জাতি আপন চরিত্র অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে। তার মধ্যে কোনো জাতি বা দ্রুতক্রিয়াশীল, কোনো জাতি বা বিলম্বিত ক্রিয়াশীল। মামলার মধ্যে যেমন ফৌজদারি আর দেওয়ানি আছে, রোগের মধ্যেও তাই আছে। সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে তার নির্দিষ্ট বীজাণুচরিত্রের উপর। সুতরাং ক্ষয়রোগের আক্রমণকে বুঝতে হলে সমস্ত অলীক আতঙ্ককে দূর করে দিয়ে তার বীজাণুর চরিত্রগুলিকে আগে সম্যকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। বীজাণুর সম্যক পরিচয় জানতে পারলেই রোগ সম্বন্ধে অনেক রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ক্ষয়রোগের নির্দিষ্ট বীজাণুটি এখন থেকে পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে জার্মান পণ্ডিত রবার্ট ককের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং তখন থেকেই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধান চলতে থাকে। তারই ফলে জানা যায় যে, এটি এমন এক উদ্ভিজ্জ জগতের বীজাণু, যার চতুর্দিকে জড়ানো থাকে একরকম চর্বিজাতীয় পিচ্ছিল আবরণ। এই বীজাণু অতীব সূক্ষ্মাকৃতি, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেও এত সূক্ষ্ম এবং সামান্য দেখায় যে চেনবার জন্য বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন না করলে মাইক্রোস্কোপে দেখেও একে যক্ষ্মা বীজাণু বলে চেনা যায় না। সেইজন্য বিশিষ্ট প্রকারের একটি রং দিয়ে রঞ্জিত করে নিয়ে তবে একে সনাক্ত করতে হয়। কিন্তু ওর উপরকার চর্বিযুক্ত আবরণটি পিচ্ছিল বলে সহজে তাতে কোনো রং ধরে না, কেবল ফুকশিন নামক একরকম লাল রং গরম করে ওর উপর ঢেলে দিলে সেই রং পাকা হয়ে ওর গায়ে লেগে যায়। আরো অনেক রকম বীজাণুর গায়ে ঐ লাল রংটি ধরতে পারে বটে, কিন্তু সে তেমন পাকা হয় না, অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে ফেললেই উঠে যায়। কেবল যক্ষ্মা বীজাণুর বিশিষ্টতা এই যে একবার লাল রংটি ধরে গেলে পরে অ্যাসিড দিলেও সে রং আর কিছুতে ওঠে না, তার ওপর অন্য কোনো রংও আর ধরে না। এই বিশিষ্টতার জন্য একে বলা হয় অ্যাসিড-ফাস্ট বীজাণু। যক্ষ্মা রোগ ছাড়া আরো একটি রোগের বীজাণুর এই প্রকার বিশিষ্টতা আছে, সেটি কুষ্ঠ রোগের বীজাণু। তবে এই দুই-এর পরস্পরের মধ্যে আকারপ্রকারের কিছু পার্থক্য আছে, যা দেখলেই অনায়াসে চেনা যায়। সুতরাং রোগীর কফের মধ্যে যক্ষ্মা বীজাণু আছে কিনা পরীক্ষা করতে হলে আগে তাকে ঐ লাল রং দিয়ে রঞ্জিত করে নিতে হয়, তারপর অ্যাসিড দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলে নীল রং দিয়ে আবার তাকে রঞ্জিত করতে হয়। তখন মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে নিরীক্ষণ করলেই দেখা যায় যে, যক্ষ্মা বীজাণু থাকলে সেগুলিকে নীলবর্ণের পটভূমির মধ্যে লালবর্ণে রঞ্জিত অবস্থায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই বীজাণু-গুলিকে দেখায় যেন ভাঙা সরু সরু ঝাউ-কাঠির ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি দাঁড়িরেখার মতো, তাতে মাঝে মাঝে ঝাউকাঠির

মতোই সামান্য সামান্য গাঁঠযুক্ত। অন্যান্য অনেক রোগের বীজাণুর মতো এই বীজাণুর কোনো লেজ নেই, এর আদৌ কোনো গতিশক্তি নেই, আর এর থেকে কোনো বীজও (spore) জন্মায় না। কেবল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এরা আপন আপন সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এদের বংশবৃদ্ধি হয় অতি মন্থর গতিতে, অন্যান্য বীজাণুদের তুলনায় এরা অতি মন্থরভাবে বর্ধনশীল। অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে কালচার (culture) করলে অন্যান্য বীজাণুরা যেখানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দলে দলে দৃষ্টিগোচর উপনিবেশ (colony) স্থাপনা করে ফেলে, সেখানে এদের তেমন বংশবৃদ্ধি করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এ কথাটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু এমন মন্থরপ্রকৃতি হলেও একবার জন্ম নিলে এরা সহজে মরেনা, চর্বিজাতীয় আবরণটি এদের অনেক মারাত্মক অবস্থা থেকে রক্ষা করে। অনেক বীজাণুধ্বংসী তেজস্বী ওষুধের ক্রিয়াকে তুচ্ছ করেও এরা বেঁচে থাকতে পারে। কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে এরা কয়েক ঘণ্টা টিঁকে থাকতে পারে, অ্যান্টি-ফর্মিন নামক কড়া অ্যান্টিসেপটিকের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বীজাণুই মরে যায় কিন্তু এরা মরে না। আমাদের পেটের মধ্যে গিয়ে পাকস্থলীর অ্যাসিড লেগে অনেক বীজাণুই মরে যায়, কিন্তু যক্ষ্মা বীজাণুর ঐ অ্যাসিডের দ্বারা কোনো অনিষ্ট হয় না। কেবল উত্তাপ আর শুষ্কতাকে এরা মোটে সহ্য করতে পারে না। ফুটন্ত জলের মধ্যে থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরে, ফুটন্ত দুধের মধ্যে এদের মরতে এক মিনিটের বেশি বিলম্ব লাগে না। সেইজন্য দুধ ফুটিয়ে খেলে এই বীজাণুর সংক্রামণের কোনো আশঙ্কা থাকে না। রোদ এবং বাতাস এদের পক্ষে খুবই মারাত্মক। ভিজে অবস্থায় থাকলে এদের রোদে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু বাতাস লেগে শুকিয়ে গেলে তারপর রোদ পেলে শীঘ্রই এরা মরে যায়। রোগীর কফের মধ্যে যে অসংখ্য যক্ষ্মা বীজাণু নির্গত হয়, সেই কফ খোলা রাস্তায় পড়ে থাকলে বাতাস লেগে শীঘ্রই শুকিয়ে যায়, তখন সরাসরি রোদ লাগলে সমস্ত বীজাণুই মরে যায়। কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই কফ পড়ে থাকলে যদিও কালক্রমে সেটা শুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু তেমন সরাসরি রোদ লাগতে পায় না বলে সেই শুকনো কফের গুঁড়ার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে যক্ষ্মা বীজাণুরা বৎসরাধিককাল পর্যন্তও বেঁচে থাকতে পারে।

এই বীজাণু কোনো বহির্বিষ ক্ষরণ করে না। কিন্তু এর দেহপদার্থের মধ্যে একরকম অন্তর্বিষ (endotoxin) থাকে যা আমাদের পক্ষে মারাত্মক। এই অন্তর্বিষের নাম ট্যুবারকুলিন। বীজাণুর দেহ বিচ্ছিন্ন হলেই এই বিষটি সঞ্চারিত হয়ে আমাদের অনিষ্ট করতে থাকে। সুতরাং আমাদের যে রোগ জন্মায় তা ওর এই অন্তর্বিষের দ্বারা।

এই বীজাণু আমাদের শরীরের মধ্যে দুধ এবং খাদ্যাদির সঙ্গে মিশে মুখ দিয়েও প্রবেশ করতে পারে, আবার বাতাসের ধুলোর সঙ্গে মিশে, কিম্বা মুখোমুখি অবস্থিত রোগীর হাঁচিকাসির দ্বারা নির্গত নিষ্ঠীবনবিন্দুর সঙ্গে মিশে সরাসরি আমাদের প্রশ্বাসগ্রহণের সময় নাক দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। যদি পেটের মধ্যে ঢোকে তাহলে অন্ত্রস্থ ঝিল্লি ভেদ করে এরা অন্ত্রসংলগ্ন গণ্ডের মধ্যে গিয়ে জমা হয় এবং সেখানে সুযোগ থাকলে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। আর নাক দিয়ে যদি ঢোকে তাহলে ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে এরা আশ্রয় নেয় এবং সেখানে সুযোগ থাকলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তবে মুখ দিয়ে ঢোকার চেয়ে নাক দিয়ে ঢোকাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ফুসফুসে গেলে সহজেই ক্ষত জন্মানো সম্ভব হয়। গিনিপিগের শরীরে প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে একটিমাত্র তেজস্বী বীজাণুকে তার নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুদিন পরে তার ফুসফুস যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়েছে।

মানুষের শরীর ছাড়াও গরুর শরীরে এই বীজাণু রোগের সৃষ্টি করে থাকে। সেইজন্য আমরা দুই রকম যক্ষ্মা বীজাণুর উল্লেখ করে থাকি, এক রকমকে বলি মানবাশ্রয়ী (hominis, T) আর এক রকমকে বলি গব্যাশ্রয়ী (bovis, PT)। কিন্তু দুই জাতের বীজাণুর অন্তর্বিষ বা ট্যুবারকুলিন একই প্রকৃতির। কাজেই মানুষের বীজাণুর দ্বারাও গরুর রোগের সৃষ্টি হতে পারে, আবার গরুর বীজাণুর দ্বারাও মানুষের রোগের সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত রোগাক্রান্ত গরুর দুধে অনেক সময়েই যক্ষ্মা বীজাণু থাকে এবং সেই দুধ খেয়ে শিশুদের শরীরে স্ক্রোফুলা বা গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ জন্মায়। তবে এটা বিলাতে এবং বিশেষত স্কটল্যাণ্ডেই প্রায় দেখা যায়, যেহেতু সেই দেশের লোকে দুধ ফুটিয়ে খেতে তেমন অভ্যস্ত নয়। আমাদের দেশে এটা খুবই বিরল, কারণ আমরা দুধ ফুটিয়ে না নিয়ে কখনই খাই না, এবং দুধ ফুটে উঠলেই এক মিনিটের মধ্যে তার বীজাণু মরে যায়।

গরু ছাড়াও গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে, শুকরের শরীরে এই বীজাণুর দ্বারা রোগ জন্মাতে পারে, এবং সেটা সাধারণত তাদের মুখ দিয়ে ঢুকে পেটের ভিতরেই হয়। ঘোড়া, ছাগল, গাধা, ভেড়া, বিড়াল কিম্বা ইঁদুরের এ রোগ প্রায়ই হতে পারে না। ছোটো জানোয়ারের মধ্যে গিনিপিগ আর খরগোস সহজেই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

লোকে বলে যে যক্ষ্মা রোগ উত্তরাধিকার-সূত্রে বংশানুক্রমে বর্তায়, আর এ রোগ নাকি মায়ের গর্ভে থেকেও সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু এটা নিতান্ত ভুল কথা। মায়ের কিম্বা বাপের বীজ যদি বীজাণুক্ষত হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা কোনো সন্তানই উৎপাদন হতে পারে না। গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে বীজাণু প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। তবে জন্মের পরে মাবাপের শরীরের বীজাণু সন্তানের শরীরে মেশামেশি করার দরুণ অনায়াসেই প্রবেশ করতে পারে, এবং সচরাচর তাই ঘটে থাকে। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে যক্ষ্মাক্রান্ত বাপমায়ের সন্তানেরাও অনেক সময় যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে থাকে। এটা শুধু অবাধ মেশামেশির ফলেই ঘটে। নতুবা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যক্ষ্মারোগ মায়ের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই যদি স্থানান্তর করা হয় এবং তাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে একটু যত্নের সঙ্গে লালনপালন করা যায় তাহলে সে সম্পূর্ণ সুস্থই থাকে, কখনই তার যক্ষ্মা হয় না।

যক্ষ্মা বীজাণুর সংক্রমণ অন্যান্য রোগের বীজাণুর সংক্রমণের মতো নয়। এর সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি জানতে গেলে রোগীর খুব বাল্য-কাল থেকেই তার সূত্র অনুসরণ করতে হয়। সাধারণত নাক দিয়েই এই বীজাণু ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এখনকার বৈজ্ঞানিক-দের অভিমত এই যে, তা একবারের মতো বা আকস্মিক ভাবে ঘটে না, বরঞ্চ বহুবারই ঘটে। আজকাল বাল্যাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই শরীরে এই বীজাণুর সংক্রমণ কোনো সময় একবার প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং যক্ষ্মা রোগের প্রথম বীজ বপন আমাদের প্রায় প্রত্যেকের শরীরে বাল্যা-বস্থাতেই একবার করে ঘটে যায়। কিন্তু তাতে প্রায়ই কোনো রোগ জন্মায় না। তখন সেই বীজাণু ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে সামান্য একটু ক্ষতের সৃষ্টি করে, কিংবা গলদেশস্থ গণ্ডের মধ্যে গিয়ে গণ্ডবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু ঐ সকল ক্ষত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুকিয়ে গিয়ে কিংবা ক্যালসিয়মের দ্বারা বুজে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ পদার্থে পরিণত হয়ে থাকে। সুতরাং তাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় না, বরং এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সকলের শরীরেই ঐ বীজাণুর বিরুদ্ধে এক রকম প্রতিরোধ শক্তি (immunity) জন্মায়। এই প্রতিরোধ শক্তিটি কারো শরীরে জন্মেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার উপায় আছে। খুব অল্প মাত্রায় ট্যুবারকুলিন নিয়ে গায়ের চামড়ার উপর টিকা দেবার মতো প্রয়োগ করলে—যদি শরীরে প্রতিরোধ শক্তি জন্মে থাকে, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে উঠবে আর যদি না জন্মে থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। এমনি ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে

যে বিশেষ করে শহরবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জন লোকেরই প্রতিরোধ শক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট আছে, অতএব ধরে নিতে হয় যে, তাদের প্রত্যেকেরই শরীরে পূর্বে কোনো সময় ঐ বীজাণুর আক্রমণ ঘটেছিল।

অতঃপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো অনেকেরই আরো একাধিকবার এইরূপ ভাবে যক্ষ্মা বীজাণু কর্তৃক সংক্রামিত হবার যোগাযোগ ঘটে। তাতেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। বরং বহুদিনের অন্তরালে এক একবার অল্প সংখ্যার বীজাণু দৈবাৎ শরীরে প্রবেশ করলে পূর্বেকার সঞ্চিত প্রতিরোধ শক্তির দ্বারা তাকে দমন করে ঐ শক্তির মাত্রা উত্তরোত্তর আরো কিছু বেড়েই যায়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে তখন এর বিপরীতও ঘটতে পারে। সমস্তই নির্ভর করে বীজাণুর সংখ্যার উপর এবং তাদের বারে বারে অধিক মাত্রায় প্রবেশের সুযোগের উপর। অল্প সংখ্যায় কালে ভদ্রে প্রবেশ করলে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু অধিক সংখ্যায় অথবা নিত্য নিত্য প্রবেশ করলে যথেষ্টই ক্ষতি আছে। তখন বীজাণুর মাত্রা প্রতিরোধ শক্তির মাত্রাকে ছাপিয়ে যায় এবং তাই থেকেই রোগের সূত্রপাত হয়।

অতএব বীজাণু কখনো শরীরে প্রবেশ করলেই যে রোগ জন্মাবে এ কথা ঠিক নয়। অল্প মাত্রায় প্রবেশ করলে ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে বরং লাভ আছে, কিন্তু অধিক মাত্রায় প্রবেশ করলে উপস্থিত ক্ষেত্রে অনিষ্ট আছে। আমরা এটা দেখতে পাই যে বাল্যাবস্থায় যারা যক্ষ্মা বীজাণুর সঙ্গে পরিচিত হয়নি, যথা নেপালী, গুর্খা প্রভৃতি পর্বতবাসীরা, এরা বীজাণুপূর্ণ শহরে বাস করতে এলে অধিকাংশই প্রচণ্ড যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়, যেহেতু তাদের আগে কোনো প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়নি। ক্যালমেট তাই বলেন যে, সারাজীবন ধরে যখন এই বীজাণুকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন শিশুদের শরীরে জন্মের দশ দিনের মধ্যেই সামান্য কিছু মৃদু বিষাক্ত গরুর বীজাণুকে টিকা দেবার মতো উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে খাইয়ে প্রতিরোধ শক্তিটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে দেওয়াই ভালো। অবশ্য এ পদ্ধতি সকলে অনুমোদন করে না

যাই হোক, যক্ষ্মা বীজাণু শরীরে প্রবেশ করলেই যে তা মারাত্মক হবে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। এমন কি যাদের শরীরে প্রকৃত ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছে এবং কফের মধ্যে যথেষ্ট বীজাণু পাওয়া যাচ্ছে, তারাও যদি কোনো উপায়ে নিজেদের প্রতিরোধশক্তিকে বাড়িয়ে নিতে পারে তাহলে তাদের রোগটি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হয়ে যায়, এটা আজকাল যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে। অতএব অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের প্রতিরোধশক্তির উপর। বীজাণুকে ভয় করে কোনো লাভ নেই, আর তাকে আজকাল সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলাও আমাদের পক্ষে সুকঠিন। যক্ষ্মাবহুল স্থানে বাস করে কী ব্যাপার হয় সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। মনে করুন শহরের পথ দিয়ে কত রকমের কত লোকজন যাতায়াত করছে, তার মধ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত মানুষও যে অনেক আছে তাতে সন্দেহ নেই। তাদের নিষ্ঠীবনের মধ্যে সর্বদাই লক্ষ লক্ষ বীজাণু থাকে। তারা যদি হাঁচে কাসে কিম্বা চেঁচিয়ে কথা বলে তাহলে তাদের মুখ থেকে সেই নিষ্ঠীবন দফায় দফায় বেরিয়ে পাঁচ ফুট দূর পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অজানিতভাবে তাদের কারো সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে থাকলেই ঐরূপ থুতুবৃষ্টির দ্বারা অনেক বীজাণু আপনার নাকের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে। কিম্বা মনে করুন তারা পথের উপর খানিকটা থুতু ফেলে দিয়ে চলে গেল। বলা বাহুল্য তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজাণু রয়েছে। সেই থুতু যদি রোদে বাতাসে শুকিয়ে যাবার সময় পায়, তাহলে কোনো কথা নেই। উন্মুক্ত স্থানে পড়ে রোদ লেগে সমস্ত বীজাণুই মরে যাবে। কিন্তু যদি সেই থুতুটা শুকিয়ে যাবার পূর্বেই সদ্য সদ্য আপনার জুতোর তলা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেন, আর সেই জুতো সমেত যদি নিজের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢোকেন তাহলে কী হবে একবার ভেবে দেখুন। থুতুটা জুতার তলায় জিউলি আঠার মতো জড়িয়ে যাবে। সেই থুতুর কণাগুলো আপনার ঘরের মেঝেতে সেখানকার ধুলোর সঙ্গে অদৃশ্যভাবে মাখামাখি হয়ে যেতে থাকবে। সেখানে জীবন্ত বীজাণুগুলো গুঁড়া গুঁড়া ধূলিকণার মধ্যে চারিয়ে গিয়ে তেমনি অদৃশ্যভাবেই বহুকাল বেঁচে থাকবে, যেহেতু ঘরের মধ্যে সরাসরি রোদ ঢুকতে পারে না সেই হেতু শীঘ্র তারা মরবে না। আর ঘরে একবার ঢুকে পড়লে তারা সেখান থেকে সহজে বিদায়ও হবে না। যতবার ঘর ঝাঁট দেওয়া হবে ততবার তারা নতুন করে তাড়না পেয়ে বাতাসে উড়বে, তখন কিছু কিছু নাকের মধ্যে ঢুকবে, কিছু কিছু ফার্নিচারে লাগবে, আর ঘরের জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবার পরে কিছু কিছু আবার মেঝেতেই ছড়িয়ে পড়বে। সেই মেঝেতে খেতে বসলে বাটি গ্লাসের তলায় লেগে খাদ্যের সঙ্গে মিশে তার কিছু কিছু হয়তো পেটের মধ্যেও চলে যাবে। প্রত্যেক সূক্ষ্মতম ধূলাকণাটির সঙ্গে অন্ততঃ এক ডজন করে বীজাণু লেগে থাকতে পারে। প্রত্যেকবার ঘর ঝাঁট দেবার সময় কিংবা ফার্নিচার প্রভৃতি ঝাড়বার সময় সেই সব বীজাণু অদৃশ্যভাবে বাতাসে ওড়ে এবং কিছুকাল ঘরের ভিতরকার বাতাসে ভেসে থাকতে থাকতে খুব ধীরে ধীরে আবার মেঝেতে গিয়ে পড়ে। সেই সব বীজাণুর পক্ষে একাধিকবার ঘরর ভিতরকার মানুষের নাকের মধ্যে ঢুকে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আর যদি বাড়ির মধ্যে কোনো যক্ষ্মারোগী থাকে তাহলে তো কথাই নেই, যে বাড়িতে তারা কিছুকালও বাস করে সেই বাড়িতেই প্রচুর বীজাণু ছড়ায়, আর সেই বীজাণু বহুকাল পর্যন্ত সংক্রমণের প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকে। ক্ষয়রোগ ঘর থেকেই মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়, পথে ঘাটে নয়, সেইজন্য একে বলা হয় ঘরের রোগ। যারা সর্বদা বাইরে বাস করে তাদের এরোগ সহজে হয় না, যারা অধিকাংশ সময় ঘরে বাস করে তাদেরই হয়, বিশেষ যারা রৌদ্রবিহীন ঘরে বাস করে। আর এই সকল ঘরের মধ্যে বাস করে যদিও বা আমরা অনেক সাবধানে থেকে এবং ধুলো উড়ার সময় নাকে কাপড় দিয়ে কতকটা এড়িয়ে চলতে পারি, কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। তারা ঘরে কিংবা বাইরে দিনের মধ্যে দুশোবার ধুলোর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে, মেঝেতে হাত লাগিয়ে হামাগুড়ি দেয়, থুথু ফেলবার নর্দমা থেকে বল কুড়িয়ে আনে, উঠনের ধুলোর ওপর লাটু ঘোরায়, মার্বল খেলে, আর সেই ধুলোমাখা হাত বারে বারে নিজের মুখে দেয়, সেই হাতে খাবার খায়! সুতরাং বীজাণু তাদের নাক দিয়ে ঢোকে, মুখ দিয়ে ঢোকে, গলা দিয়ে ফুসফুসে ঢোকে। কিন্তু তাদের প্রতিরোধশক্তি বলবান থাকলে সহজে কিছু অনিষ্ট হয় না, সে-শক্তি দুর্বল হয়ে গেলেই রোগ তাদের চেপে ধরে।

অতএব একথা নিশ্চিত যে যক্ষ্মা রোগটি বারবার বীজাণুর পুনরাক্রমণের ফলেই হয়ে থাকে, প্রথম বয়সের প্রথম আক্রমণে প্রায়ই হয় না। তথাপি রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজাণু সংক্রমণের সম্ভাবনাকেও যে যথাসম্ভব বিরল করা দরকার এটুকু বলাই বাহুল্য। প্রতিরোধশক্তি মাত্রেরই একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমার মধ্যেই তার যতকিছু সাফল্য। সে শক্তি এমন নয় যে অনেক বেশী সংখ্যার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করলেও তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে। কিংবা সে শক্তি এমনও নয় যে নিত্য নিত্য যদি খুব অল্প সংখ্যাতেও বীজাণু এসে দফায় দফায় প্রবেশ করতে থাকে, তবে তার দ্বারা যে রোগের সম্ভাবনা হবে তাকে চিরদিন প্রতিরোধ করতে পারবে। এক দিকে যেমন স্বাস্থ্যই শক্তির মূল, অন্যদিকে তেমনি বীজাণুই রোগের মূল। অতএব রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভালো করে আপন প্রতিরোধশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হবে, অন্যদিকে তেমনি বীজাণুকেও যথাসম্ভব পরিহার করে রোগ সৃষ্টির সুযোগকে সম্পূর্ণ নিবারণ করতে না পারলেও অনেকটা বিরল করতে হবে।

আমরা বলেছি যে, চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অনেকেই একবার কিংবা একাধিকবার যক্ষ্মা বীজাণু কর্তৃক সংক্রামিত হয়ে থাকে সে সময়টা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো অনিষ্ট

হয় না, কারণ তখন প্রতিরোধশক্তি খুব তেজালো থাকে। কিন্তু যৌবনের সময় নানা কারণে সেই শক্তি কমে যায়। আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা সংকটের সময়। ত্রিশ পার হয়ে গেলে আর তত ভয় নেই, তখন শক্তিটা আবার বেড়ে যায়। ত্রিশের পর পূর্ণ-বয়স্ক মানুষদের পক্ষে এই বীজাণুর সংক্রমণ সহজে নতুন করে ধরতে পারে না, অর্থাৎ নিতান্ত বহুসংখ্যার বীজাণু এককালীন ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ না করলে কিংবা স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নিতান্ত ভেঙে না পড়লে এরোগ তাদের শরীরে পুনরাক্রমণের দ্বারা নতুন করে সহজে জন্মাতে পারে না। স্বামী কিংবা স্ত্রী যক্ষ্মাতে ভুগছে এমন অবস্থার চল্লিশ হাজার বয়ঃপ্রাপ্ত দম্পতির মধ্যে এক সময় পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে একজন রোগে ভুগতে লাগলো, কিন্তু অপরজন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগে আক্রান্ত হলো না। অতএব বয়স্ক লোকেরা নিজেদের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারলে এ রোগে আক্রান্ত হবার ততটা আশংকা নেই। কিন্তু কেবল আঠারো বছর থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে কেন যে এই রোগের প্রবণতা এমন বেড়ে যায় সেকথা বলা কিছু কঠিন। হয়তো যৌবনের অত্যাচারে, পড়াশুনার চাপে, অনিয়মে অনিদ্রায় শরীরের প্রতি অবহেলায়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, যথেষ্ট আলোবাতাসের অভাবে এবং আরো নানা কারণে ঐ বয়সের নরনারীর ঐ বিশিষ্ট শক্তিটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক, এই সকল বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু আমাদের শিখে রাখা দরকার যে ছেলেমেয়েদের চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বীজাণুর সংস্পর্শ থেকে যতটা পারা যায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আর পনের বছরের পর থেকে ত্রিশ বছর বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত তাদের শরীরের পুষ্টির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতিরোধশক্তিকে যতটা সম্ভব উচ্চশিখরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে, তবেই তারা ক্ষয়রোগের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

ক্ষয়রোগের সূত্রপাত কেমন করে হয়? বীজাণু ভেঙে গিয়ে তার থেকে যে অন্তর্বিষটি নির্গত হয়, সেই বিষের ক্রিয়াকে যখন শরীরের স্বাভাবিক শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না, তখনই হয় রোগের সূত্রপাত। এই বিষ আমাদের শরীরস্থ কোষের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক, যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানকার কয়েকটি কোষকে গলিয়ে নষ্ট করে দেয়। তখন তার চারিপাশের কোষগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়, এবং অনেক সংখ্যায় মিলে ঐ বিষ এবং বীজাণু সমেত অকর্মণ্য অংশটিকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করে। এমনিভাবে বীজাণু ও বিষ-পদার্থকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি কোষে মিলে সেখানে একটি উঁচুমতো পোস্তদানার আকারে গুটিকার সৃষ্টি হয়। একেই বলে ট্যুবারকল্, আর এর থেকেই রোগটির নাম হয়েছে ট্যুবারকুলোসিস। টিউবার অর্থে গ্যাজ বা স্ফীতি, ট্যুবারকল্ অর্থে দানা দানা ফোস্কার মতো গুটি ওঠা। প্রথমে ফুসফুসের মধ্যে এইরকম কতকগুলি গুটি উঠতে শুরু হয়। তখন ঐ গুটির চারিপাশের সুস্থ কোষেরা তাড়াতাড়ি তাকে গণ্ডি দিয়ে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে, যাতে ভিতরকার বিষটি আর গণ্ডি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আরো কোনো অনিষ্ট করতে না পারে। প্রথমে এই গণ্ডিটি মাকড়সার জালের মতো খুব সূক্ষ্ম হয়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটি মজবুত হয়ে উঠতে থাকে। এদিকে গুটিকার ভিতরে যে বীজাণুরা আছে তারাও সংখ্যায় বাড়তে থাকে। যদি তারা সংখ্যায় কম থাকে আর তাদের অন্তর্বিষের তেজটাও কিছু কম থাকে তাহলে তারা আর গণ্ডি ভাঙতে না পেরে সেইখানে আবদ্ধ থেকেই মরে যায়, পরে রক্তের ক্যালসিয়ম এসে সেই গুটিকার ভিতরের গহ্বরটিকে একেবারে বুজিয়ে ফেলে। এইখানেই ট্যুবারকলের সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু যদি বীজাণু থাকে সংখ্যায় বেশি আর তার বিষটা থাকে তেজস্বী, তাহলে তারা গণ্ডিটা মজবুত হবার পূর্বেই অনায়াসে ভেঙে ফেলে, আর নতুন কোষে কোষে প্রবেশ করে নিজেরা নষ্ট হয়ে কোষগুলিকেও নষ্ট করে অন্তর্বিষটা গুটিকার চারিদিকে আরো ছড়াতে থাকে। প্রকৃতি কিন্তু হার মানে না, সে ভাঙা গণ্ডিকে ঘিরে আবার বড়ো করে গণ্ডি দিতে শুরু করে। এমনিভাবে ভাঙতে ভাঙতে এবং গড়তে গড়তে গুটিকাগুলি ক্রমে বড়ো হয়ে ওঠে, পাঁচটা গুটিকা একত্রে মিশে অনেকটা বড়ো হয়ে যায়। তখন ফুসফুসের অনেকখানি করে অংশ স্থানে স্থানে গলে নষ্ট হয়ে গিয়ে হলদে রং-এর পুঁযেভরা এক একটা গহ্বরে পরিণত হয়। তখন ফুসফুসটিকে দেখায় যেন পোকায় খাওয়া ফলের মতো, কিম্বা ঘুনে ধরা গাছের গুঁড়ির মতো। ক্রমে ছোটো ছোটো গহ্বরগুলি মিশে গিয়ে একটা বড়ো গহ্বরে পরিণত হয়। কিন্তু গহ্বর হয়ে যাবার পরেও প্রকৃতি চেষ্টা করতে থাকে যাতে সেটাকে সুস্থ ফুসফুস থেকে স্বতন্ত্র রেখে সংকুচিত করে ফেলতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কেবল এই চেষ্টাই চলতে থাকে। তাই গহ্বর হয়ে যাবার পরেও রোগীর সেরে উঠবার সম্ভাবনা থাকে, যদি অনুকূল অবস্থা এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং গহ্বর হওয়া মানেই যে খুব খারাপ কথা তা নয়। ঝাঁঝরা করা ফুসফুসের অংশকে গহ্বরে পরিণত করে তাকে সুস্থ অংশ থেকে পৃথক করে দেবার জন্য এটা প্রকৃতিরই একটা প্রচেষ্টা, যেমন মাংস পচে গেলে সেখানটা গহ্বর হয়ে যায়।

যক্ষ্মা রোগ ফুসফুসে ছাড়া পেটের ভিতরেও হয়, গণ্ডমালাতেও হয়, হাড়ের মধ্যেও হয়, স্বরযন্ত্রেও হয়, চামড়াতেও হয়, —কিন্তু ফুসফুসের রোগটাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। কারণ হৃদপিণ্ড ছাড়া অন্য সকল রকমের যন্ত্রকেই বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব, কিন্তু ফুসফুস এমন যন্ত্র যে তাকে এক মিনিটের জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়। তবু একটি ফুসফুস রোগমুক্ত থাকলে অন্য ফুসফুসটিকে কৃত্রিম উপায়ে বিশ্রাম দিয়ে রোগটিকে আরোগ্য করা আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

ক্ষয়রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর, ওজন কমে যাওয়া এবং রক্তহীনতা। জ্বরের দ্বারা শরীরের মধ্যে অনবরতই দাহ চলতে থাকে, এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এতে শরীরের চর্বি কমে যায়, মাংস শুকিয়ে যায়, আর রক্ত পাতলা হয়ে যায়। এইজন্যই একে বলা হয় ক্ষয়রোগ। এই লক্ষণগুলি ছাড়া রোগটি যদি ফুসফুসে হয় তবে তার সঙ্গে কাসি থাকে, কখনো কখনো বুকে ব্যথা থাকে, শ্বাসকষ্ট থাকে, এবং মাঝে মাঝে রক্ত ওঠাও থাকে। রোগটি যদি পেটে হয় তবে এর সঙ্গে উদরাময় কিম্বা আমাশা থাকে, অক্ষুধা অরুচি প্রভৃতি থাকে, উদরীও থাকতে পারে।

প্রথমে অন্য একটি রোগকে অবলম্বন করেও ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হতে পারে। কোনো একটি রোগে বহুদিন যাবত ভুগলেই শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি কমে যায়, তখন ক্ষয়রোগ আক্রমণের সুযোগ হয়। আমরা তাই প্রায়ই দেখতে পাই যে ডায়েবিটিসের পরে ক্ষয়রোগ দেখা দিল, কিম্বা পুরানো ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পুরানো আমাশা, পুরানো ব্রঙ্কাইটিস, অথবা টাইফয়েড বা নিউমোনিয়ার পরে এই রোগ ধীরে ধীরে তার লক্ষণ প্রকাশ করতে লাগলো। মেয়েরা উপর্যুপরি সন্তান প্রসব করতে থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগ আক্রমণ করতে দেখা যায়। তেমনি সচ্ছল অবস্থা থেকে দারিদ্র্যের অবস্থায় গিয়ে পড়লে, মুক্ত স্থানে বাস করা থেকে শহরের আবদ্ধ স্থানে বাস করতে শুরু করলে, কিম্বা মনের কষ্টে, নিরানন্দে থাকলেও এই রোগ প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই সকল বৈচিত্র্য থেকেই বোঝা যায় যে, রোগটির প্রত্যক্ষ কারণ যদিও জীবাণু, কিন্তু পরোক্ষ কারণ জীবনীশক্তির হ্রাস,—যার দ্বারা বীজাণুরা প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় হবার প্ররোচনা পায়।

গত ৫ই মে হইতে সিমলা শৈলে বিলাত হইতে আগত মন্ত্রিত্রয়ের সহিত কংগ্রেসের ৪ জন ও মুসলিম লীগের ৪ জন প্রতিনিধির যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বাঙলার আশঙ্কার বিশেষ কারণ যে আছে, তাহা বাঙালীরা অনুভব করিতেছেন। তাহার প্রধান কারণ, যে সকল ভিত্তিতে আলোচনা হইতেছে, সে সকলের মধ্যে সামন্ত রাজ্যসমূহের কথা, অন্তর্বর্তী সরকার অর্থাৎ বড়লাটের শাসন পরিষদে রাজনীতিক দল-সমূহ হইতে সদস্য গ্রহণ, বৃটিশ সেনাবলের ভারতবর্ষ ত্যাগের সময়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা—এ সকলের উল্লেখমাত্র না থাকিলেও প্রথম কথা যে সকল জেলায় প্রধানত মুসলমানরা আর যে সকলে প্রধানত হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকলকে ধর্মভেদে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘ করার প্রস্তাব আছে। যে সকল জেলায় হিন্দুরাও যেমন প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন, মুসলমানরাও তেমনই, সে সকল জেলা সম্বন্ধে কোন কথা না বলায় বুঝা যায়—"প্রধানত" কথার কোন গুরুত্ব নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু—ভারতবর্ষে এই প্রদেশত্রয়ই প্রধানত মুসলমানপ্রধান, পঞ্জাবে ও বাঙলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্যার প্রভেদ অধিক নহে। উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ধর্মানুসারে গঠিত কোন সঙ্ঘে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাঙলাকে নামে না হইলেও কার্যত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা যে গত কয় বৎসর বিশেষভাবেই হইতেছে, তাহা আমরা অবগত আছি।

প্রথম চেষ্টায় গত লোক গণনায় মুসলমান-দিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ্য সভায় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার করিয়াছিলেন। সেই লোকগণনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহারই ভিত্তিতে বাঙলায় মুসলমানদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইলেও পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল—পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের জেলা-গুলি স্বতন্ত্র ও আসামের মুসলমানপ্রধান অংশের সহিত সংযুক্ত করিয়া পূর্ব পাকিস্থান করা হইবে এবং পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের একাংশ লইয়া পশ্চিম পাকিস্থান করা হইবে। মিস্টার জিন্না প্রস্তাব করেন—উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষার্থ যে পথ থাকিবে—সুয়েজ খাল যেভাবে সবল জাতির দ্বারা রক্ষিত, তাহা সেইভাবে রক্ষিত হইবে।

কিন্তু তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; কারণ সে ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্থান অর্থনীতিক হিসাবে অসম্ভব হয়। কাজেই তিনি অসংগত দাবী করিতেও দ্বিধা করেন নাই—কলিকাতা, হাওড়া জেলা ও হুগলী জেলা হিন্দুপ্রধান হইলেও অচল পাকিস্থান সচল রাখিবার জন্য তাঁহাকে দিতে হইবে। তাহার পরে তাঁহার শিষ্য মিস্টার সহিদ সুরাবর্দী বলেন, বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—বরং বিহারের মানভূম, সিংহভূম, হাজারীবাগ ও পূর্ণিয়া জেলা কয়টি এবং সমগ্র আসাম প্রদেশ বাঙলায় সংযুক্ত করিয়া তাহা পূর্ব পাকিস্থানে পরিণত করা হউক। কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন, সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে বাঙলায় মুসলমানগণ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন না—কাজেই বাঙলা পাকিস্থানভুক্ত করার দাবীও চলিবে না।

কিন্তু বিলাতের মন্ত্রিত্রয়ের প্রস্তাবানুসারে সমগ্র বাঙলাই মুসলমানপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

লোকগণনার পরে—এবার কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে মুসলমান সদস্য নির্বাচন। এই সকল নির্বাচনে যেরূপ অনাচার মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে বিষয় প্রথমে গভর্নর মিস্টার কেসীকে জানাইলে তিনি বলেন, তিনি ফতোয়া জারী করিয়াছেন, রাজকর্মচারীরা যেন নিরপেক্ষ থাকিয়া নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, সেই ব্যবস্থা করেন। তিনি বিদায় লইয়া যাইবার পরে গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজকেও সেই কথা জানান হয়। তিনি মিস্টার কেসীর উক্তির পুনরুক্তি করেন। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি সৈয়দ নওসের আলী যে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, যশোহরে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মুসলিম লীগ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন এবং তিনি তাহার অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন, তখনও সে বিষয়ে প্রতীকার হয় নাই।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে স্যার আবদুল হালিম গজনবীর প্রতিপক্ষের নির্বাচন নাকচ করিবার জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে অবাধে কিরূপ অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুসলমান রাজকর্মচারীরাও কিরূপে সহায় ছিলেন।

বাঙলার মুসলমানদিগের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্য অর্জন করিয়া মুসলিম লীগকেই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান প্রতিপন্ন করা এই সকল অনাচারের উদ্দেশ্য ছিল, সন্দেহ নাই।

একদিকে এই—আর একদিকে বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটাইবার কিরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি নদীয়া জেলায় পাওয়া গিয়াছে। তথায় রাণাঘাট মহকুমাস্থিত চরনপাড়া গ্রামের খাসমহল হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উচ্ছেদের নোটিশ দিয়াছেন।

নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং মুসলমান। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি চরের হিন্দু প্রজাদিগকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে মুসলমান কৃষক আনাইয়া পত্তন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত ১৯শে এপ্রিল এই ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা হাকিম মিস্টার ইয়াকুব আলীকে লইয়া চরে যাইয়া হিন্দু প্রজাদিগকে মৌখিক আদেশ প্রদান করেন—তাহারা যেন নবাগত বা নবনীত মুসলমানদিগকে তাহাদিগের দখলী জমি ছাড়িয়া দেয়—নহিলে তাহাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে। আবেদনে প্রকাশ, মুসলমান প্রজাদিগের নিকট যে সেলামী লইয়া জমি দেওয়া হইতেছে, হিন্দুদিগের নিকট তাহার তিন গুণ টাকা দাবী করা হইয়াছিল।

জানা গিয়াছে, মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমের সঙ্গে ১৯শে এপ্রিল মহকুমা মুসলিম লীগের সম্পাদকও চরে গিয়াছিলেন।

এই সকল হইতে যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

বাঙলা হিন্দুর প্রদেশ ও মুসলমানের প্রদেশ—যাহাতে যে যাহার ন্যায়সংগত অধিকার সম্ভোগ করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহা দেখিবার ভার যে সকল রাজকর্মচারীর উপর ন্যস্ত—তাঁহারা যদি পক্ষপাতিত্বদুষ্ট ব্যবহার করেন, তবে যে তাঁহাদিগকে পদের অযোগ্য বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা বলাবাহুল্য।

আমরা আশা করি, কংগ্রেস এই সকল বিষয়ও বুঝিবেন এবং যাহাতে অখণ্ড ভারত ধর্মানুসারে খণ্ডিত না হয়—সে দাবী করিবেন ও সেই দাবী স্বীকৃত না হইলে কোন মীমাংসা করিবেন না।

রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যে সুরসিক ভক্তের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"রামানন্দ সনে মোর দেহ ভেদ মাত্র," তাঁহার প্রেমভক্তি ও রসজ্ঞতার কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাইবেন,—পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীলবাসুদেব সার্বভৌম বলিলেন, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায়ের সংগে একবার অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।

তোমার সংগের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিহোঁ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥

তাঁহার নামাঙ্কিত পদাবলীর বিচার বিশ্লেষণের স্পর্ধা আমার নাই। তথাপি যে বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি, তাহার কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক লেখক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-এর এস মহাশয় 'রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী' প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি আমি আদ্যোপান্ত অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছি। সুতরাং তথ্য নির্ণয়ের জন্য এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বিবৃত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আজ পর্যন্ত রায় রামানন্দ ভণিতাযুক্ত একটি মাত্র পদের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম। অকস্মাৎ এতগুলি পদের আবিষ্কার এবং বংগাক্ষরে তাহার প্রকাশ আমি বাংগলা সাহিত্যসেবিগণের পক্ষে সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। এই পদগুলি উড়িষ্যা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, পুঁথিখানি উড়িয়া অক্ষরেই লিখিত ছিল। অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যাপক মহাশয় পুঁথির লিপ্যন্তর ও পাঠোদ্ধার কার্য সমাধা করিয়াছেন। তাহার পর বিস্তৃত ভূমিকায় যে ভাবে তিনি অনুকূল ও প্রতিকূল মতের আলোচনা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ ও শব্দার্থ সন্নিবেশ সহকারে নিজ ব্যয়ে পুস্তকখানি সর্বসাধারণের গোচরে আনিয়াছেন, তাহাও কম প্রশংসার কথা নহে। তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও বৈষ্ণব সাহিত্যপ্রীতি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমার ভরসা আছে, সাহিত্যরসিকগণ পুস্তকখানির যথাযথ আলোচনা করিবেন এবং পুস্তকখানি সাধারণ্যে সমাদৃত হইবে।

আমি প্রথমে ভূমিকা লিখিত দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। অধ্যাপক মহাশয় পদামৃত সমুদ্রে ধৃত চম্পতি রায়ের ভণিতাযুক্ত একটি পদ ভূমিকায় তুলিয়া দিয়াছেন। এই পদটি চম্পতি রায়ের রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমি কিছুদিন পূর্বে দেশ পত্রিকায় 'চম্পতি' বা 'বাহিনী পতি' পদরচয়িতাগণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্য পরিষদ্-প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস' পদসংকলনেও এই পদটি প্রকাশিত হইয়াছে। নানা স্থানের পুরাণো পুঁথি এবং রসকল্পবল্লী প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত পদাংশ আলোচনায় আমরা এই পদ চণ্ডীদাস ভণিতায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রয়োজন বোধ করিলে প্রিয়রঞ্জনবাবু পরিষদ প্রকাশিত চণ্ডীদাস পুস্তকখানি দেখিতে পারেন।

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানি কবিরাজ গোস্বামীর রচিত কি না, ভূমিকায় সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার।
তাহা উখারিয়া দিলা কি কৃপা তোমার॥

যদুরঞ্জন রচিত এই দুই পংক্তি পয়ারের ব্যাখ্যায় প্রিয়রঞ্জনবাবু বলিতেছেনঃ—'উখারিয়া অর্থ উদ্ঘাটিত করিয়া; গ্রন্থের অমূল্য নিধি উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া যায় ব্যাখ্যার দ্বারা, টীকা টিপ্পনী ভাষ্যের দ্বারা। কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দ লীলামৃতের টীকা করিয়াছিলেন, তাহা যে রচনাও করিয়াছিলেন তেমন কথা কোথায় পাওয়া যায়? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু গোবিন্দ লীলামৃত অর্থে এখানে গ্রন্থ না ধরিয়া যদি "শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারূপ অমৃতের নিগূঢ় ভাণ্ডার" এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে টীকা ভাষ্য না বুঝিয়া ইহা হইতে মূল গ্রন্থও ধরিয়া লওয়া চলে। যদুনন্দনের "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত" কথা কয়টি শ্লিষ্ট শব্দরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাস্তবিক শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত যে শ্রীকৃষ্ণ দাসের রচিত, আজ পর্যন্ত কোন সুপণ্ডিত বৈষ্ণব সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এখন আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত" যদি কবিরাজ গোস্বামীরই রচনা হয়, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মুখে গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোক প্রকাশ করিলেন কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য শ্রীল রূপ সনাতনের নিকট, বিশেষরূপে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট। শ্রীরাধার মহাভাব বিভাবিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যে সমস্ত প্রলাপোক্তি কবিরাজ গোস্বামী শুনিয়াছিলেন, গোবিন্দ লীলামৃতে তিনি অনুরূপই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ভাবের অনুরূপ হওয়ার জন্যই তিনি চরিতামৃতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোক উচ্চারণ করাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি পরবর্তী কালের গ্রন্থ হইতেও শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। "সুকৃতি লভ্য ফেলা লব" কথা কয়টি হইতেও আমার অনুমান সমর্থিত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঐ কথা বলিয়াছিলেন, দাস গোস্বামীর মুখে তাহা শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী কথা কয়টি সংযুক্ত করিয়া ভাবানুরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। তবে তর্কস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, হয়তো গোবিন্দ লীলামৃতের মধ্যে দুই চারিটি প্রাচীন শ্লোকও সংগৃহীত রহিয়াছে।

এইরূপ দুই একটি আনুষংগিক বিষয়ের আলোচনার শেষে এইবার আমি মূল প্রসংগে আসিয়া পৌঁছিতেছি। পদগুলি প্রকৃতই জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রণেতা শ্রীল রায় রামানন্দ বিরচিত কি না ইহাই মূল প্রশ্ন। প্রিয়রঞ্জনবাবু ভূমিকা মধ্যে অতি বিস্তারিত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্নটি তিনি নানা দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, পদগুলি সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত কবি রায় রামানন্দের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। আমার মতে যৎসামান্য বাধা আছে। প্রিয়রঞ্জনবাবু অপর সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া একটি দিকে দৃষ্টি দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি বাঙলা পদাবলী লইয়া আলোচনা করেন নাই। আমি এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার উত্থাপিত বাধা অপসারিত হইলে তখন বুঝিতে পারা যাইবে পদগুলি প্রকৃতই রায় রামানন্দ বিরচিত অথবা অন্য রচিত পদ তাঁহার ভণিতাযুক্ত!

প্রসংগত একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, ইতিপূর্বে আমি উড়িষ্যা হইতে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পদগুলি কটকের রায় সাহেব শ্রীযুত আর্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়ের নিকট ছিল। যতদূর স্মরণ হয় ১৩৪২ সালের ভারতবর্ষে পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পদগুলি কিন্তু আদি বা বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক কবি রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী আছে। প্রকাশিত পদগুলি যদি রায় রামানন্দ রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে শ্রীবৃন্দাবনে স্মরণ মংগল প্রণেতা শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীপুরুষোত্তমে রায় রামানন্দ দণ্ডাত্মিকা পদ রচনার পথ-প্রদর্শক। কিন্তু পদকল্পতরু ধৃত পদের সংগে প্রকাশিত রামানন্দ পদাবলীর কোন কোন পদের ঐক্য বিস্ময়জনক। প্রিয়রঞ্জনবাবু কি লক্ষ্য করেন নাই যে, রায় রামানন্দ ভণিতাযুক্ত দুই একটি

পদ গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোকের হুবহু অনুবাদ? এইরূপ হইবার কারণ কি, ভূমিকায় তাহার কোন সদুত্তর নাই। রামানন্দ পদাবলীর দুই তিন পৃষ্ঠায় এইরূপ অনুবাদের সুস্পষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে।

রামানন্দ পদাবলী ৭ পৃষ্ঠায়—

জটিলা দেখিলা বধূ অঙ্গে পীতাম্বর।
সশঙ্কিত হয়া বোলে নিষ্ঠুর উত্তর॥
আরে ললিতা বিশাখা প্রমাদ হৈল।
রাই অঙ্গে পীতাম্বর কেমনে সাজিল॥

গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোকের অনুবাদ। এই কয় পংক্তির সহিত তুলনীয়—

পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড, ১৪০—১৪১ পৃষ্ঠা—

হেনই সময়ে মুখরা দেখয়ে
উড়নি পিয়ল বাস।
বিশাখাকে কহে কিবা দেখি ওহে
দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস॥
হাহা পরমাদ বড় পরমাদ
একি পরমাদ হায়।
দ্রব হেম কাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায়॥

রামানন্দ পদাবলী ৮ পৃষ্ঠা—

গবাক্ষ জালেতে দিশে সূর্যের কিরণ।
পড়্যা রাই নীলাম্বর দিশএ অরুণ॥
এ কে তুমার নয়নু নিত্যে বহে লোর?
না দিশিছে বোলতু শ্রীকৃষ্ণ অমর॥
পীত বস্ত্র কাঁহা তুমি দিথ বধূ অঙ্গে।
বিচারিয়া নাহি কহ সুবুদ্ধি তরঙ্গে॥

গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোকের অনুবাদ। তুলনীয় পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড, ১৪১—১৪২ পৃষ্ঠা—

গবাক্ষ জালেতে দেখ পরতেকে
রবির কিরণ লাগি।
ইহার কারণে তোমার মরমে
শঙ্কা কেনে উঠে জাগি॥
শুদ্ধ সতী জনে হেন কহ কেনে
অবুধ জনার মতি।
এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম
বড় পরমাদ অতি॥

রামানন্দ পদাবলী ১১ পৃষ্ঠা—

হে গঙ্গে হে গোদাবরী হে মনি কণ্ডনী।
ধবলী শ্যামলী নামে করে বাঁশী ধ্বনি॥
কালন্দী কমল তরে যত বংশী প্রিয়ে।
হী হী রম্ভে চম্পে হসি ব্রজ বিধু বাএ।
ইত্যাদি

গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোকের অনুবাদ। তুলনীয়—পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা—

গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী শ্যামলী।
পিষঙ্গী কালিন্দী তুঙ্গী যমুনা কমলী॥
হংসী বংশী প্রিয়ে অলি হরিণী করিণী।
রম্ভা চম্পা কহিয়া করয়ে হি হি ধ্বনি॥

রামানন্দ পদাবলী ১২ পৃষ্ঠা—

পিয়ায়ে বচ্ছায়ে দুগ্ধ দুহায়ে সখারে।
দোহন গর্জন যেন শরদ বদরে॥

তুলনীয় প—ক, ৩ ৪র্থ ৫৮ পৃষ্ঠা—

দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায়ে সখারে।
বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্ষভরে॥

রামানন্দ পদাবলী ১৪ পৃষ্ঠায় মাতা যশোমতী কুন্দলতাকে বলিতেছেন, রাধিকাকে আনিয়া রন্ধনের আয়োজন কর। পদকল্পতরুর মধ্যেও ৪র্থ শাখায় ৫৯ পৃষ্ঠায় ঐ কথাই আছে। রামানন্দ পদাবলীর ১৪ পৃষ্ঠায় পাঠোদ্ধারের গোলযোগে একটি অপাঠ্য পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে—

"দুবাসরে বিনানীরে রন্ধনে সুধা প্রণীটে"

প্রকৃত পাঠ এইরূপ হওয়া সম্ভব—

"দুর্বাসার বরে রাই বিনানীরে রন্ধনে সুধা প্রণীটে।"

রামানন্দ পদাবলী ২০ পৃষ্ঠা—

তুলসীরে ললিতা যে বচন ভাষিয়া।
পুন বলে কৃষ্ণ গেল হেরিয়া সঙ্গীয়া॥
পুষ্পেহার নাগবল্লী বীড়ী কৃষ্ণে দিব।
সঙ্কেতে স্তাগ বুঝিয়াঁ সত্বরে আসিব॥
* * * * *
শুনিয়া তুলসী তবে ললিতার বাণী।
কৃষ্ণ মার্গ অনুসরি চলে বিনোদিনী॥
* * * * *
উপহার দিয়া অগ্রে উভা বিনোদিনী।
দেখিয়া আনন্দ হৈল শ্যাম নাগর মণি॥
পুষ্পেহার লয়াঁ তার করে নিবেদিল।
রাইরে মিলাও তুমি শীঘ্র হৈয়া চল॥

তুলনীয় প-ক-৩ ৪র্থ খণ্ড, ১৪৭ পৃঃ—

শুনইতে রাইক ঐছন বাণী।
ললিতা যত নহি তুলসিকে আনি॥
তাম্বুল বীড় আর কুসুমক দাম।
দেই পাঁঠাওল নাগর ঠাম॥
তুলসী গমন করল বনমাঝ।
খোঁজই কাহাঁ নব নাগর রাজ॥
* * * * *
তুলসী উলসি ভৈ তৈখনে গেল।
হেরি নাগর বর হরষিত ভেল॥
নাহক অতি উৎকণ্ঠীত জানি।
তুলসী কহল সব রাইক বাণী॥
কুসুমক হার হৃদয় পর দেল।
কহ মাধব সব দুখ দূরে গেল॥

রামানন্দ পদাবলীর ২৬ পৃঃ, ২৮ পৃঃ, ২৯ পৃঃ ও ৩০ পৃষ্ঠার সঙ্গে প-ক-৩ ৪র্থ খণ্ড, ১৫০—১৫১ পৃঃ, ১৫৪-১৫৫ পৃঃ মিলাইয়া পড়িলে এইরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। রামানন্দ পদাবলীর ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠার সঙ্গে প-ক-৩ ৪র্থ খণ্ডের ১৬০ ও ১৬১ পৃষ্ঠা তুলনীয়। যথা—

রামানন্দ পদাবলী—

নন্দ রাজা কোলে করি আনন্দে ভাসে।
অকলঙ্ক চন্দ্রমুখে চুম্ব দিয়া তোষে॥
সখাবৃন্দ তাম্রাগণ মধ্যে রামহরি।
গুণী জন গান করে নৃত্যবাদ করি॥

পদকল্পতরু—

ব্রজপতি কোরহি লেয়ল দুহুঁ জন
চুম্বন করল বয়ান।
সমুখহি নর্তক বাদক গায়ক
যন্ত্র মেলি করু গান॥
পড়য়ে বন্দিগণ ছন্দ মনোহর
* * * * * * *

অধিক উদ্ধৃত করিয়া কোন লাভ নাই। রামানন্দ পদাবলীতে অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় যে ক্রম অনুসৃত হইয়াছে, পদকল্পতরুর মধ্যেও সেই ধারা দেখিতে পাইতেছি। সখা-সখীদের নাম এবং তাহাদের কার্য পরম্পরারও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রামানন্দ পদাবলীর রচয়িতা এবং পদকল্পতরুর পদকর্তাগণ যে একই আকর গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। ইহাও নিশ্চিত যে, এই আকর গ্রন্থ গোবিন্দ লীলামৃত। এইজন্যই পদকল্পতরুর পদের সঙ্গে রামানন্দ পদাবলীর এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রামানন্দ পদাবলীর সঙ্গে পদকল্পতরুর যে পদগুলির ঐক্য দেখা গেল, তাহার মধ্যে রায় শেখরের কোন পদ নাই। রায় শেখর দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর মূল উপাদান হয়তো স্মরণ মঙ্গল হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ পদাবলীর সম্বন্ধে সে কথা বলিবার উপায় নাই। রামানন্দ পদাবলীর অনেক পদ গোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। এখন দেখিতে হইবে গোবিন্দ লীলামৃত কাহার রচিত এবং কোন্ সময়ে রচিত। গোবিন্দ লীলামৃত যদি শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী বা শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক কোন কবির রচিত হয়, তাহা হইলে রামানন্দ পদাবলীর পদ রায় রামানন্দ বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ষোল আনা। আর গোবিন্দ লীলামৃত যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিরচিত হয়, তাহা হইলে পদগুলি রায় রামানন্দ রচিত বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। তখন উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত চণ্ডীদাস পদাবলীর মত এ পদগুলিও অন্যকৃত এবং রায় রামানন্দ ভণিতাযুক্ত এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইবে। আশা করি পণ্ডিতগণ রামানন্দ পদাবলীর আলোচনায় কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। আমি গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। বিচারে অন্যরূপ স্থিরীকৃত হইলে মত পরিবর্তন করিতে হইবে।

—নয়—

কুলি লাইনে নিয়ে রাখবার কোন উপায় নেই। সাহেবের চোখ শয়তানের চোখ। আর তার চাইতেও বেশি ভয় ওই ডাক্তারটাকে। ওই লোকটাকে ওরা কখনো দুচক্ষে দেখতে পারে না। ব্যানার্জিবাবুর মুখে শুনেছে, ওদের অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করার জন্যেই নাকি ডাক্তার এখানে থাকে। কিন্তু ওরা তার পরিচয় পায়নি কোনদিন। ওষুধ চাইতে গেলে গালাগালি করেছে, কখনো দেখতে এলেও গাল দিয়ে গেছে অশ্রাব্য ভাষায়, যেন অসুখ করাটা ওদের পক্ষে একটা প্রচণ্ড অপরাধ।

ওই ডাক্তারটাই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে দিনরাত। ও ঠিক খবরটা জোগাড় করে সাহেবের কানে পৌঁছে দেবে। তা হলে?

উপায় ঠিক হয়েছে। ধরমবীরের কাঠের গোলায় ব্যানার্জিবাবুর জায়গা হতে পারে। ধরমবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ব্যানার্জিবাবুর। ধরমবীর লোক ভালো, গান্ধী মহারাজের চেলা।

......সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বন থেকে সবে ফিরে এসেছে ধরমবীর, ফিরে এসেছে তার কাঠগোলায়! অনেকগুলো গাছে আজ দাগ দিয়ে আসতে হয়েছে, কাল থেকে কাটাবার পালা।

শালবনের মাঝখানে ধরমবীরের কাঠগোলা। শুধু শালবন নয়, এখানে ওখানে দু-একটা আম গাছ, লেবু গাছ, পাহাড়ী বাঁশের কয়েকটা ঝাড়ও আছে। আর এই আরণ্যক পরিবেশের ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধরমবীর তার কাঠের গোলা ফেঁদে বসেছে। বড় বড় শুকনো শালের গুঁড়ি, চেরাকাঠের স্তূপ। সেই কাঠ থেকে বিচিত্র একটা মিষ্টি গন্ধ উঠে চারদিক ভরিয়ে দিয়েছে। ক্লান্ত ধরমবীর নেমে পড়ল টাট্টু থেকে।

নির্জন থম থম করছে চারদিক। যারা কাজ করছিল তারা চলে গেছে, একটা স্তব্ধতায় ভরে আছে সমস্ত। ধরমবীর টাট্টুটাকে একটা কাঠের খুঁটিতে বেঁধে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওপরে। চাবির তাড়াটা বার করে ঘর খুললে, আলো জ্বাললো, তারপর একটা ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের তাগিদে অর্ডারের আর বিরাম নেই, এক মুহূর্তও সে বিশ্রাম পাচ্ছে না। এই লোকজনে তার কুলোবে না, আরো জোগাড় করতে হবে।

ধরমবীর একবার ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। সব যেন মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। একার সংসার। প্রথম জীবনে একটি মেয়ে তাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছিল, তার ফলে আর বিয়ে করাটা ঘটে উঠল না তার কপালে। তারপরে উনিশ শো তিরিশ সাল এল। গান্ধী মহারাজ ডাক দিলেন স্বরাজের লড়াইয়ের জন্যে। ডাণ্ডীতে সত্যাগ্রহ। আইন ভাঙতে হবে—লড়তে হবে সরকারের বিরুদ্ধে—সত্যাগ্রহীর বুকের শেষ রক্তকণা দিয়ে স্বরাজ আনতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ধরমবীর, জেল খেটে এল। তারপর ঘুরতে লাগল জীবনের চাকা। টাকা দরকার, বাঁচা দরকার। বন ইজারা নিলে, সুরু করলে কাঠের ব্যবসা। আজ তার অবস্থা ভালো, অনেক টাকার মালিক সে।

প্রেম তাকে দুঃখ দিয়েছে, ব্যথা দিয়েছে বলেই সেটাকে সে ভুলতে চেয়েছে। কিন্তু যা ভুলতে পারেনি তা গান্ধী মহারাজের কথা, ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের শপথ।

তাই ধরমবীর আজো পড়াশোনা করে। ভালো হিন্দী জানে, ইংরেজিও জানে একরকম। সেইজন্যেই এই জঙ্গলের মধ্যেও জোগাড় করেছে একগাদা রাজনীতির বই। এতদিন একা ছিল, এইবারে এসে জুটেছে আর একটি আশ্চর্য লোক, তার নাম ব্যানার্জিবাবু। আশ্চর্য মনের মিল ঘটেছে দুজনের। এক সঙ্গে পড়ে, এক সঙ্গে আলোচনা করে। ব্যানার্জিবাবু যে কত জানে ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ধরমবীর। তার যেন মনের কবাট খুলে যাচ্ছে, যেন তার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে নতুন ভাব, নতুন ভাবনার একটা জগৎ। এই সন্ধ্যাবেলাতেই রোজ ব্যানার্জিবাবু তার কাছে আসে আজও আসবে নিশ্চয়।

ধরমবীর সিগারেট ধরিয়ে ব্যানার্জিবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় চোখে পড়ল বাগানের একদল কুলি আসছে। কী একটা মানুষের মতো জিনিস তারা বয়ে আনছে। আশঙ্কায় শিউরে উঠল ধরমবীর। নিশ্চয় জানোয়ারে মেরেছে কাউকে, কিন্তু কাকে?

দ্রুতপায়ে সে নেমে এল বারান্দা থেকে। বললে, কে?

—আমরা। বাগানের কুলি।

—কী হয়েছে?

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে।

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে। তিন লাফে ধরমবীর নেমে পড়ল নীচে। বললে, কে মারলে?

—সাহেব।

তারপরে খানিকটা উত্তেজিত কোলাহল। তার মাঝখানেই সব কথা শুনতে পেল ধরমবীর, বুঝতে পারলে সমস্ত। কিন্তু তখন আর সময় নেই সে সব আলোচনা করবার। ধরাধরি করে অনিমেষকে নিয়ে এল নিজের ঘরে, শুইয়ে দিলে বিছানায়। আঘাতের জায়গাগুলো ধুয়ে আইডিন লাগালে, তারপরে মুখে ঢেলে দিলে ব্র্যাণ্ডি।

আস্তে আস্তে চোখ মেললে অনিমেষ।

—কেমন আছো ব্যানার্জিবাবু?

—কে, ধরমবীর? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। কিন্তু মাথায় বড় কষ্ট হচ্ছে।

—সকালেই ডাক্তারকে খবর দেব। বাগানের ডাক্তার তো আর তোমাকে দেখতে আসবে না, আমি সকালে সাইকেলে দিয়ে লোক পাঠাব মাণিক নগরে।

—আচ্ছা—অনিমেষ চোখ বুজল, তারপরে আস্তে আস্তে চোখ মেলল।

—ভাই, বুকে ভয়ানক লেগেছে। আমার হার্টের অবস্থা আগেই খারাপ ছিল। বোধ হয় বাঁচব না। তুমি শুধু একজনকে একটা খবর পাঠাও।

—কাকে খবর পাঠাব?

মুহূর্তের জন্যে অনিমেষের মুখের সামনে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। সুমিতা একদিন আকাশে বাতাসে যে ফুলের গন্ধের মতো পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, একদিন যাকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ওর সমস্ত প্রাণ, সমস্ত গান, সমস্ত কবিতা। তারপর যখন জীবনের স্রোত বইল অন্যমুখে সেদিনও যে ওর পাশ ছাড়েনি, সমস্ত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, সেই সুমিতা।

কিন্তু না। এখন দুর্বলতার সময় নয়। এখন সে মরবে না, তার বাঁচবার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ এসেছে, এসেছে স্বাধীন ভারতের মানুষদের সৈনিক ব্রতে দীক্ষিত করবার পরমতম অবকাশ। এখন মরলে চলবে না। আর যদি বা মরে তাতেই বা ক্ষতি কী। সুমিতার কাজে তাতে বাধা ঘটবে না, হয়তো বা মনের দিক থেকে একটা মুক্তিই খুঁজে পাবে সে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে রইল অনিমেষ। বললে, আদিত্যদাকে খবর দাও একটা—আদিত্যদাকে—

আদিত্যদা! ঠিকানা কী?

কিন্তু ঠিকানা পাওয়া গেল না। অনিমেষ আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলে ধরমবীর। আদিত্যের নাম সে শুনেছে অনিমেষের মুখে, যে খবরের কাগজে আদিত্য চাকরি করে সে কাগজটার নামও

জানে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে একটা চিঠি লিখলে কলকাতায় তার এক দেশোয়ালী ভাইয়ের নামে। সে যেন যেমন করে হোক খবরটা ওই পত্রিকার অফিসে আদিত্যবাবুকে পেশছে দেয়।

এদিকে কুলিরাও চুপ করে বসে ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত তারা লাইনে ফিরে গেল না। যতই সময় কাটছে, মনের ভেতরের ভয়টা ততই বেশি করে মুছে যাচ্ছে হালকা কুয়াশার মতো। পাহাড়ী জীবন, মহুয়া ফলের গন্ধ, শানানো তীর, মাদলের শব্দ। চা-বাগানের বাঁশি, কালাজ্বর আর বাবুদের ভয়ে যা এতকাল চাপা পড়ে ছিল, তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে আবার। অগ্ন্যুদ্গারের নতুন সম্ভাবনায় বুকের তলায় ধূমায়িত হয়ে উঠছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

তাদের দিন আসছে, তাদের পৃথিবী আসছে। ব্যানার্জিবাবুর কথা মিথ্যে নয়, তাদের স্বপ্নও মিথ্যে নয়। কোনো অন্যায় আর তারা সহ্য করবে না, এর বিচারের ভার নেবে নিজেদেরই হাতে। একবার দেখিয়ে দেবে তারা শুধু মার খেতেই জানে না, দরকার হলে দিতেও জানে।

ধরমবীরের গোলার বাগানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বসে রইল তারা। ব্যানার্জিবাবু বেঁচে আছে তো ?

—হ্যাঁ।

—বাঁচবে তো ?

—বলা যায় না।

পাথরের মতো বসে রইল তারা। তারপর সেইখানেই নিয়ে এল তাদের ঘরের ভাত পচানো মদ। রবার্টসের মতো ওদেরও শিরায় শিরায় নেশার আগুন জ্বলতে লাগল। যুদ্ধে ওরাও জয়লাভ করবে, ওরাও দমন করবে ওদের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে।

রাত বাড়তে লাগল। ধরমবীরের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রহর জেগে অনিমেষের শুশ্রূষা করছে ধরমবীর। শালবনের মধ্যে থম থম করছে রাত। বহুদূরে কোথায় হাতীর ডাক শোনা যাচ্ছে—জঙ্গলের ভেতর থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। শালবনের খসখসে পাতাগুলোতে বাতাসের অশ্রান্ত দোলা, নানা জাতের পোকার অশ্রান্ত ঐকতান। কুলিরা কতগুলো কাপড়ের মশাল জেবলে নিয়ে গোল হয়ে বসেছে ধরমবীরের গোলায়। আগুনের আলোয় ওদের কালো মুখগুলোকে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো অসাড় নিষ্কম্প বলে বোধ হচ্ছে।

ভুল করেছিল রবার্টস।

রক্তবীজের রক্ত পড়েছে মাটিতে। তার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে জেগে উঠছে এক এক সৈনিক, এক একজন শত্রু। অকালে বিনাশ করতে গিয়ে রবার্টস অকালেই জাগিয়ে তুলেছে চামুণ্ডাকে। সাঁওতালের বুকের ভেতরে সাঁওতাল বিদ্রোহের অতীত ইতিহাস অনুরণিত হয়েছে।

রাত আরো বাড়তে লাগল একটা একটা করে নিবতে লাগল মশালের আলো। পচাইয়ের হাঁড়ি নিঃশেষিত হয়ে আসতে লাগল। শুধু ব্রোঞ্জের মতো কঠিন মুখগুলো অন্ধকারের ভেতরেও জেগে রইল। জেগে রইল তাদের চোখে আগ্নেয়গিরির আগুন।

পরের দিন।

ভোরের বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল রবার্টসের। নেশাটা কেটে গেছে, চাঙ্গা আর ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। আর তখনি মনে পড়ে গেল অনিমেষের কথা।

কুলি সর্দারকে ডেকে পাঠালো রবার্টস।

—ব্যানার্জিবাবুকে কী করেছিস?

—জঙ্গলে ফেলে দিয়েছি হুজুর।

—জঙ্গলে—কোথায়?

—কালী ঝোরার খাদের ভেতর।

যাক নিশ্চিন্ত। কালীঝোরার গভীর খাদ। মানুষ প্রমাণ জল সেখানে। দুপাশে দুর্ভেদ্য ঝোপ, চারদিকে শালবনের ছিদ্রহীন পত্রাবরণ। আশে পাশে হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই। সুতরাং অনিমেষের জন্য আর ভাবতে হবে না।

—কী বলেছি, মনে আছে তো?

—আছে হুজুর।

—একথা যেন বাইরে কেউ টের না পায়। রটিয়ে দিবি ব্যানার্জিবাবুকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

—জী হুজুর।

কুলি সর্দার চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল রবার্টসের শুধু ঘুষি নয়, ঘুষও দরকার। ভেতরে ভেতরে অনিমেষ কতটা এগিয়ে গেছে কে জানে। অথচ আজকে বড় দুর্দিন। খবরের কাগজের পাতায় আর রেডিয়োতে ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসছে। এখান ওখান থেকে আসছে ধর্মঘটের বিবরণ। সুতরাং আরো একটু সতর্ক হওয়া দরকার। কাজ করা দরকার আরো একটু বুদ্ধিমানের মতো। সময়টা সত্যিই বড় খারাপ।

কুলি সর্দারকে আবার ডাকলে রবার্টস।

—এই শোন।

—কী হুকুম হুজুর?

—তোদের সকলকে আজ মদ খাওয়ার বাড়তি পয়সা দেব আমি। আট আনা করে বেশি মজুরী সকলের মিলবে আজকে—যা বলে দে সবাইকে।

—জী হুজুর।

কুলি সর্দার সেলাম ঠুকলে একটা। অনুগৃহীত হওয়ার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু সত্যিই কি অনুগৃহীত হয়েছে অতটা? লোকটার চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি যেন খেলা করে গেল, ঠোঁটের কোণে যেন ঝিলিক দিয়ে গেল বিচিত্র একটা হাসির আভাস।

সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রবার্টসের।

—হাসলি যে—এই উল্লুক?

—না হুজুর, হাসিনি তো?

—না ? অল-রাইট। —রবার্টস গর্জে উঠল অকস্মাৎঃ গেট আউট, গেট আউট রাস্কেল। অর আই উইল শুট ইউ—

কুলি সর্দার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো মেরুদণ্ড খাড়া করে। শেষ ঘা পড়েছে। এরপরে আর অপেক্ষা করা চলে না। এর পরে যা করবার তাদেরই করতে হবে।

—জী হুজুর—

বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সেইদিন সন্ধ্যা।

রোজকার অভ্যাসের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছিল রবার্টস। বেলা ডুবে আসছে—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙা করে দিয়ে জঙ্গলের ওপারে অস্তে নামছে সূর্য। চমৎকার বাতাস দিচ্ছে—শালফুলের গন্ধটা নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায়।

খট্ খট্ করে আসছে ঘোড়াটা, কাঁধে ঝুলছে বন্দুক। বনের সান্ধ্যশ্রী রবার্টসের মনটাকে প্রসন্ন আর প্রফুল্ল করে তুলেছে। গাইতে গাইতে চলেছে সেঃ টিপ্পেরারি—টিপ্পেরারি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবময় অভিযান-গীতি।

দুদিকে জঙ্গল—মাঝখানে ঝোরা। তার ওপর দিয়ে একটা কাঠের পুল। খট্ খট্ করে বীরদর্পে ঘোড়া পুলের ওপর উঠে পড়ল। রবার্টসের গলার স্বর চড়ল আরো এক পর্দা; টিপ্পারে—রি—

কিন্তু গানটা শেষ করা রবার্টসের কপালে ছিল না।

জঙ্গলের ভেতর থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো তীর এসে বিঁধল—একটা রবার্টসের বুকে আর একটা পেটে। প্রবল কণ্ঠে একটা অভিশাপ দিয়ে আছড়ে পড়ল রবার্টস। ছুটন্ত ঘোড়ার পা-দানীতে একখানা পা আটকে গিয়ে ঝুলন্ত মাথাটা কাঠের খুঁটিতে আছড়ে আছড়ে চুরমার হয়ে গেল, তার পরেই শেষ আশ্রয়চ্যুত হয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল বিশ ফুট নীচে কর্দমাক্ত ঝোরার মধ্যে। খট্ খট্ করে বাগানের দিকে ছুটে চলে গেল ঘোড়া, আর ঝোরার কাদাজলটা লাল হয়ে উঠল একটু একটু করে। ......তার পরেই আগুন জ্বলল।

আর ঠিক পরের দিন বেলা বারোটার সময় রংঝোরা বাগানে এসে পৌঁছল আদিত্য।

(ক্রমশ)

হিসাবে নির্বাচিত হন মেজর এস পি মিশ্র। তিনি তাঁর সহকারী হিসাবে তিনজন ডাক্তার নির্বাচন করেন—ক্যাপ্টেন চান্‌কে, লেঃ রাও ও লেঃ প্রসারকরকে। আমার তখনও মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিলো, কাজেই আমাকে বাদ পড়তে হল। গান্ধী রেজিমেণ্টের বীরেন রায় ও কানাই দাসও বাদ পড়লেন। কাজেই তাঁদের ঠাট্টা করে বললাম, "তোমরা হচ্ছ মারাঠী, যোদ্ধার জাত। আমরা বাঙ্গালী বৃটিশের মতে যোদ্ধার কোনও গুণ আমাদের নেই। কাজেই এগিয়ে যাও বন্ধু, আমরা জানাচ্ছি অন্তরের শুভেচ্ছা, জয় হিন্দ।" শুনলাম শুধু X' রেজিমেণ্ট এখানে থাকবে, অন্যান্যরা পিছু হটে 'জিয়াওয়াদী' যাবে। এবারও আগের মতো প্রত্যেক ডাক্তারকেও কিছু কিছু রুগী সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এবার সঙ্গে যাবে শুধু নিজের নিজের রেজিমেণ্টের রুগীরা।

এদিকে এই পরিবারটিকে এখানে একা রেখে যেতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা নয়। তাদের রেঙ্গুনে পাঠাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেই কথা তাঁদের জানালে বললেন, "আপনারা যা ভালো বুঝবেন তাই করুন।" তখন তাঁদের রেঙ্গুনে পাঠানোই স্থির করলাম। কারণ, সেখানে এমন পরিবারদের সাহায্য করবার জন্য কয়েকটি আশ্রমের মতো স্থান আছে। তা ছাড়া লীগ আছে—সাহায্যের অভাব হবে না। আমরা এখান থেকে চলে গেলে দেখবার কেউ থাকবে না। তাদের পাঠাবার প্রায় সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন। বৃটিশ 'মিকটিলা' এসে পেণছেছে —এখান থেকে মাত্র নব্বই মাইল দূরে। কাজেই আমাদের তাড়াতাড়ি পিছনে যাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হোল। তখন কর্ণেল গোস্বামী বললেন, "সত্যেন, তুমিই এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এ'ছাড়া তো অন্য উপায় দেখছি না।" তখন এক নম্বর ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্ণেল আরসাদ —তিনিও আমাকে এদের সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন।

আমি দশখানা গরুর গাড়ীতে প্রায় চল্লিশ জন রুগীকে নিয়ে এবং সঙ্গে এ'দের নিয়ে আবার পিছু হটতে শুরু করলাম। প্রথম রাতে প্রায় বারো মাইল দূরে, পিম্‌নার কাছাকাছি একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। তখন পিম্‌নার উপর খুব ভীষণভাবে বিমান আক্রমণ হচ্ছে। প্রত্যহ তিন চারবার করে প্রায় বিশ পঁচিশখানা বিমান এসে বোমার পর বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে। মিলিটারী এখানে বিশেষ ছিলো না। ছিলো শুধু একটি ছোট গোছের জাপানী "এরোড্রোম"। সন্ধ্যার পর আবার আমাদের গরুর গাড়ী সারি বেঁধে চলতে শুরু করলো। রাতেও পথের উপর ঘন ঘন বিমান ঘুরছে মোটরের আলোর সন্ধানে। আমাদের গরুর গাড়ী অন্ধকারে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করতে করতে নির্ভয়ে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। প্রায় আট মাইল আসার পর, আমরা 'সিটং' নদীর তীরে একটি ছোট পল্লীতে এসে হাজির হলাম। এবার এখান থেকে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে একেবারে নদীপথে 'জিয়াওয়াদী' যাওয়ার। গরুর গাড়ীতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে—একদল গাড়ী মাত্র একটি রাতের পথ চলবে। তারপর তারা ফিরে যাবে। আবার নূতন জায়গাতে গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে। সব সময়ে সব পল্লীতে দরকার মতো গাড়ী পাওয়া যায় না। তারপর গরুর গাড়ী শুধু আমাদের দরকার নয়, জাপানীদেরও দরকার। এই গ্রামে অনেক আখের ক্ষেত। প্রথম দিনে খুব খানিকটা আখের রস খাওয়া হোল। এখানকার ক্যাম্প কম্যাণ্ডার লেঃ শর্মা—আমাদেরই এক ডাক্তার বন্ধু।

পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের জন্য পাঁচখানা নৌকা ঠিক করা হল। তার মধ্যে দুটি বেশ বড় ছই দেওয়া, অন্যগুলি ছোট ছোট এবং খোলা। একটি ছই দেওয়া নৌকার মধ্যে সেই বাঙালী পরিবারটি, আমি, একজন রুগ্ন অফিসার ও আমাদের আরদালী। আর ছিল ঔষধের বাক্সগুলি। অন্যান্য নৌকায় সকলকে ভাগ করে দিলাম। আর সব নৌকা আগে ছাড়তে বললাম, তারপর সকলের শেষে আমাদের নৌকা ছাড়লাম। তখন সিটং নদীতে জল খুব বেশী ছিল না, তার উপর জলের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ পড়ে পথ আটকে দিয়েছে। দিনের বেলা নৌকা চালানো মোটেই নিরাপদ নয়, রাতের অন্ধকারে চালানোও মুস্কিল। তার উপর গ্রামের সর্দার এদের নৌকাগুলি ধরাতে, মাঝি-মাল্লারাও বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। গবর্ণমেণ্টের রেট হচ্ছে মাইল প্রতি দু' টাকা, অথচ মালপত্র নিয়ে ব্যবসা করলে এরা সহজেই হাজার হাজার টাকা লাভ করতে পারে। আমি বর্মীভাষা জানি না, কিন্তু ছোট ছেলে গোরাঙ্গ খুব সুন্দর বর্মী জানে। সেই আমাকে বললো, এরা অনেক কিছু কথা বলাবলি করছে।

প্রথম রাত্রি, আস্তে আস্তে খানিকটা এগুলাম। প্রথম রাতে প্রায় এগারটা পর্যন্ত নৌকা চালানোর পর মাঝিরা আর চালাতে রাজী হোল না। তখন আমরা তীরে নেমে বালির উপর কম্বল বিছিয়ে আরামে ঘুমালাম। আবার ভোরের আগে মাঝিদের ডেকে নৌকা ছাড়লাম। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নদীতীরের একটি গ্রামের কাছাকাছি নৌকা বাঁধলাম। সারাদিন সেই গ্রামেই কাটুলো।

এইভাবে খুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। এতো ধীরে ধীরে গেলে পুরো এক মাসেও গন্তব্যস্থানে পেণছান সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পর মাত্র দু' ঘণ্টা ও ভোরে দু' ঘণ্টা—এইভাবেই মাঝিরা নৌকা চালাতে লাগলো। আমি তাদের দিনের বেলাও নৌকা চালাতে বললাম। প্রথমটা তারা রাজী হোতে চাইলে না। কিন্তু পরে আমি খুব জবরদস্তি করাতে রাজী হল। আমরা আমাদের খাঁকী পোষাক খুলে ফেলে, শুধু লুঙ্গি পরে বাইরে বসতাম। তৃতীয় দিনে আর তিনখানা নৌকা পিছনে পড়ে। আমাদের শুধু দুখানা নৌকা, তাও প্রায় দূরে দূরে। সকাল প্রায় এগারটা পর্যন্ত নৌকা চালান হত। তারপর নদীর তীরেই কোনও পল্লীতে নেমে রান্না-খাওয়া সেরে প্রায় চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম করতাম। আবার রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত নৌকা চালানো হত। তারপর নেমে রান্না-খাওয়া সেরে ঘুম। সিটং নদীতে খুব মাছ, কাজেই প্রায় রোজই মাছ কিনতে পেতাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমার পিছনের নৌকাতে বেশ একটা কলরব শোনা গেল। ভাবলাম কেউ হয়তো জলে পড়ে গেছে। নৌকা থামিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করলাম। অল্প পরে শুনলাম, তাদের নৌকাতে একটি বড় মাছ উঠেছে। কাছে আসতে দেখলাম সত্যই প্রায় একটি সের পাঁচেক ওজনের মাছ—সে কি জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়েই নৌকাতে উঠেছে আত্মহত্যার জন্য। বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আমরা সকলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মাছটির সদ্গতি করলাম। নদীর উপর দিয়ে ঘন ঘন অনেক বিমান যাতায়াত করলেও আমাদের নৌকাতে কোন আক্রমণ হয়নি। এইভাবে চলতে চলতে সাতদিনে 'টাঙ্গু' এসে পেণছলাম। এখানে নদীর উপর একটি পুল আছে। দিনের বেলা বৃটিশ বোমা বর্ষণে সেটিকে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। জাপানীরা আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে সেটি কাজ চালানোর উপযুক্ত করে সারিয়ে নেয়। আমরা পুল থেকে মাইল খানেক দূরে নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। আমি এখানে একদিন থাকার বন্দোবস্ত করলাম দুটি কারণে—প্রথমত, আমাদের সঙ্গে যা রাশন ছিল, প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত আমাদের তিনখানা নৌকা এখনও পিছনে। তাদের জন্য অপেক্ষা করে এখান থেকে একসঙ্গে যাবার ইচ্ছা। আমাদের মাঝিদের বাড়ি এখানে; কাজেই প্রথমটা তারা এখান থেকে যেতে রাজী হল না। পরে তাদের অনেক বুঝিয়ে রাজী করানো গেল। তারা বাড়ি চলে গেলো—কথা রইল—পরদিন সন্ধ্যায় এসে আমাদের নিয়ে যাবে। অবশ্য নৌকা দুটি আমরা আমাদের কাছেই আটকে রাখলাম।

পরের দিন সকালে এখানকার জাপানী হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আমাদের পঞ্চাশজন লোকের জন্য তিন দিনের মতো রাশন নিয়ে এলাম। সারা দিনে পুলের উপর তিন-চারবার বিমানাক্রমণ দেখলাম। পুলের কাছাকাছি কেউ থাকে না; কাজেই ক্ষতিটা হল শুধু পুলের। সন্ধ্যার পর থেকে একজনকে নদীতীরে পাহারা দিতে দাঁড় করালাম। উদ্দেশ্য, আমাদের নৌকা

যেতে দেখলে ডেকে থামাবে। কিন্তু সারা রাত পাহারা দিয়েও আমাদের কোন নৌকা আসতে দেখা গেলো না।

আমার পক্ষে আর বেশী অপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। কাজেই আজ সন্ধ্যাতেই এখান থেকে চলে যাবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যে মাঝিদের ফিরে আসার কথা ছিলো, তারা এলো না। মহা বিপদে পড়লাম। আমার সিপাহীদের মধ্যে দুজন নৌকা চালাতে জানতো। একটা নৌকা তারা চালাতে পারবে, কিন্তু অন্যটির জন্য দুজন মাঝির দরকার। গ্রামের সর্দারকে ডেকে সব বললাম, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হল না। তখন বাধ্য হয়েই একটু বলপ্রয়োগের পথ ধরতে হল। সিপাহীদের নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে দিলাম—নীচের দিকে যে কোন খালি নৌকা যেতে দেখবে, তক্ষুণি আটকাবে। ভালো কথায় কাজ না হলে বলপ্রয়োগও যেন তারা করে।

একটি নৌকা ধরা হোল। আমাদের পেঁছে দিতে বললাম। প্রথমে রাজী হতে চাইলে না। তখন বললাম, আমাদের নৌকার মাঝি পালিয়ে গেছে—তোমরা আমাদের জিয়াওয়াদী পর্যন্ত পেঁছে দিলে তোমাদের ন্যায্য ভাড়া তো দেবই তার উপর এই নৌকাখানাও তোমাদের দেবো। তারা তখন রাজী হোল। তাদের নৌকাখানা গ্রামের সর্দারের জিম্মায় রেখে দিয়ে আমাদের নৌকা নিয়ে সন্ধ্যার পরই আমরা আবার রওনা হলাম। প্রথম রাতে খুব বেশি দূর এগুতে পারিনি। কাজেই পরদিন দিনের বেলায় নৌকা চালালাম। তৃতীয় দিনে জিয়াওয়াদী থেকে প্রায় আট মাইল দূরে নদীতীরে একটি গ্রামে উপস্থিত হলাম। এখানে মাঝিদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমার পাঁচজন লোককে পাহারা রেখে দিলাম পিছনের নৌকার জন্য। গ্রামের সর্দারকে ডেকে চারখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করে আমরা রওনা হলাম। প্রায় তিন মাইল পরেই একটি হিন্দুস্থানী গ্রাম। সেখানে আমাদের সর্বকিছু বন্দোবস্ত করার জন্য লীগের কতকগুলি লোক ছিল। কাজেই গরুর গাড়িগুলি বিদায় করে—দিনের মতো আমরা এই গাছতলাতে বিশ্রাম করলাম।

সন্ধ্যার পর এখান থেকে গরুর গাড়ি করে রামনগর বস্তিতে উপস্থিত হই। এই গ্রামে আমাদের এখানকার হাসপাতালের একটি শাখা আছে। এখানকার ডাক্তার ক্যাপ্টেন হেম মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার সাথী রুগী কয়েকটিকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। বাঙালী পরিবারটিকে আপাতত একটি হিন্দুস্থানীর বাড়িতে রাখা হলো। পরদিন সকালে 'তিওয়ারী চকে' মেজর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে এই পরিবারটি আপাতত কোথায় থাকতে পারে, সেই পরামর্শ করলাম। দুপুরে তাঁর ওখানেই খাওয়া ও বিশ্রাম শেষ করে এখানকার একজন বাঙালী ডাক্তার বড়ুয়ার বাড়ি গেলাম। তিনি এখানে সপরিবারে থাকেন, তবে তাঁদের সন্তানাদি কিছু হয় নাই। তিনি এই পরিবারটিকে নিজের বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁদের এই বাড়িতে রেখে যাই। তার পরদিন আমি আমার রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেই। বর্তমানে আমাদের রেজিমেন্ট শুধু নামেই। যখন আমরা ফ্রন্টে যাত্রা করি, তখন আমার রেজিমেন্টে সবশুদ্ধ সৈন্যসংখ্যা দু হাজার। তারপর যখন ফ্রন্টে পেঁছাই, তখন অনেকেই অসুস্থ হওয়ায় আমরা সংখ্যায় ছিলাম প্রায় তেরশ'। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন মাত্র চারশো। তারপর অনেকে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ছ'শো! তারপর সুস্থ-সমর্থেরা X' রেজিমেন্টে যোগ দেওয়াতে আমাদের এখানে প্রায় এখন তিনশো জন আছে।

জিয়াওয়াদীর অধিবাসী সকলেই ভারতীয়। এ জায়গাটা হচ্ছে ডুমরাও মহারাজের জায়গা। এখানে একটি বড় চিনির কল আছে। প্রায় আট-দশ মাইল জায়গা জুড়ে অনেকগুলি ছোট ছোট বস্তি আছে। অধিবাসী প্রায় সকলেই আরা জেলার লোক। প্রায় সকলেই গরীব। চাষ-আবাদ করে। দেশ থেকে নানাপ্রকার লোভ দেখিয়ে তাদের আনার পর তাদের কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই তারা দেশে যেমন জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোত, এখানেও তাই হচ্ছে। এখানে এসে বসবাস শুরু করার পর দেশে যাওয়ার সুযোগ বিশেষ ঘটে না। অনেকেই আছে যাদের জন্ম এখানেই, আর যারা এ পর্যন্ত দেশের মুখও দেখেনি। প্রথম প্রথম বিবাহ ও অন্য কাজে এরা দেশে যেতো, কিন্তু এখন এখানে লোকসংখ্যা এত বেশি হয়েছে যে, এখন আর দেশে যাবার দরকার হয় না। বর্তমানে পুরো জায়গাটি 'জয় হিন্দের' জমি নামে বিখ্যাত। তার কারণ শোনা যায়, এ-জমি সবই আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টকে দান করা হয়েছে। এখানকার বস্তিগুলির নাম বেশির ভাগই ভারতীয়—যেমন রূপসাগর, গাদুগড়, হস্তিনাপুর, জয়নগর প্রভৃতি। আমি চিনির কল থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে চকোইন নামে একটি বস্তিতে আমার ঔষধপত্র নিয়ে থাকতাম।

আমরা এখানে আসার প্রায় একমাস আগে এখানকার চিনির কলের কাছাকাছি বোমা পড়ে। তাতে মিলের কিছু ক্ষতি হওয়াতে এখন মিল বন্ধ। মিলের জন্য এখানকার সব জমিতেই আখ লাগানো হয়। এবার মিল বন্ধ হওয়াতে চাষীরা নিজেরাই আখের রস বার করে তাই জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করছে। প্রত্যেক গ্রামেই দিনরাত আখ মাড়াই কল চলছে ও গুড় তৈরী হচ্ছে।

মেমিওতে যে হাসপাতালটি কাজ করেছে, এখানেও সেই হাসপাতালটি কাজ করছে। এ হাসপাতালের কম্যান্ডিং মেজর খান। গাদুগড়ে সব চেয়ে বেশী রুগী রাখার ব্যবস্থা আছে। তা'ছাড়া রামনগর তেওয়ারী-চকের দুটি শাখাতেও প্রায় চার পাঁচশো রুগী রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। সবশুদ্ধ এখানকার হাসপাতালে প্রায় এক হাজার রুগী। তা ছাড়া যারা রেজিমেন্টে আছে তাদের মধ্যেও অনেকেই বড় দুর্বল।

একদিন গাদুগড় হাসপাতালে বেড়াতে যাই। আমরা যখন ফ্রন্টে যাই মেজর খাঁন অসুস্থ হয়ে রেঙ্গুনেই থাকেন। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা যখন মান্দালয়ে তখন ক্যাপ্টেন মল্লিক রেঙ্গুনে বদলী হন। এখানে এসে দেখি আবার এখানকার হাসপাতালে সার্জন হয়ে এসেছেন। এখানে এসে রেঙ্গুনের অনেক গল্প শোনা গেলো।

জানুয়ারী মাসের তেইশ তারিখে রেঙ্গুনে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে নেতাজীর জন্মোৎসব হয়। সেদিন রেঙ্গুনের সমুদয় ভারতীয় নেতাজীকে সোনা ও রূপা দিয়ে ওজন করে। এই যুদ্ধের বাজারে প্রায় দুশো বিশ পাউন্ড সোনারূপা দান বড় সামান্য কথা নয়। তারপর রেঙ্গুনের ভারতীয় অধিবাসী যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, প্রত্যেকে মাথা পিছু একগজ করে খদ্দরের কাপড় দান করে। তারপর তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে 'বাহাদুর শাহ স্কোয়াড' নামে একটি ছোট্ট বাহিনী তৈরী হয়। এই ছোট্ট বাহিনীটির অন্য নাম হচ্ছে 'আত্মহত্যা বাহিনী'। জাপানীদের সেনাবাহিনীতে যেমন 'কামে কাজে' অর্থাৎ আত্মহত্যা বাহিনী আছে এটিও সেইরূপ। এতে বেশ সুস্থ সবল ও উৎসাহী কয়েকটি যুবক তাদের শরীরের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করে। যদিও জাতীয় বাহিনীর প্রত্যেকেই প্রাণ দানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তবুও এই বাহিনীটি বিশেষ-ভাবে গর্বিত ও নেতাজীর জন্মোৎসবে রেঙ্গুনের ভারতীয়দের নেতাজীকে উপযুক্ত উপহার দান। নেতাজী নিজে তাঁর জন্মোৎসবের পক্ষপাতী ছিলেন না। যখন এখানে সব কিছু ঠিক হয়, তখন তিনি বিশেষ কাজে জাপানে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—কাজেই দেশবাসীকে নিরুৎসাহ করে তিনি তাদের দুঃখিত করতে চান নি।

নেতাজীকে আমাদের দেশবাসী যে কতখানি শ্রদ্ধা ভক্তি করে, এ তারই একটি নিদর্শন। তখন টাকাকড়ি ও কাপড়ের বিশেষ দরকার। কাজেই প্রত্যেক ভারতীয় তাদের সর্বস্ব নেতাজীকে দান করেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য। হবিব, করিম গণি, আদমজী প্রভৃতি রেঙ্গুনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তাঁদের কোটী কোটী টাকার

ব্যবসা ও সম্পত্তি সবই দান করে ফকির হয়েছেন।

নেতাজী রেংগুনে যখন ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের কবরে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন, তখন তিনি হৃদয়াবেগ রুদ্ধ রাখতে পারেন নি। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, "হে ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট, আমি আজ দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, আপনার এই দেহাবশেষ আমরা ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারপর যেখানে সমস্ত সম্রাটের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে, সেইখানে আমরা আপনার এই দেহাবশেষও সমাধিস্থ করবো।" ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাটের প্রতি স্বাধীন ভারতের গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে আমাদের নেতাজীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর মহান হৃদয় ও দেশপ্রেমের প্রকৃত পরিচয়।

ক্যাপ্টেন মল্লিকের মুখেই শুনলাম, রেংগুনে আমাদের হাসপাতালের উপর নিদারুণ ও হৃদয়হীন বিমানাক্রমণের প্রকৃত খবর। ফেব্রুয়ারী মাসের এগার তারিখে বৃটিশের বহু বিমান, সংখ্যায় প্রায় ষাটখানা, ভীষণভাবে এই হাসপাতালটির উপর আক্রমণ চালায়। মিয়াং নামে জায়গাটি একেবারে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয় সেদিনের আক্রমণে। এখানকার হাসপাতালটি বহুদিনের—এখানে আমাদের বহু রুগী থাকতো। একদিন হঠাৎ বিমানগুলি এসে আক্রমণ শুরু করে। প্রথমে কয়েকটি বোমা পড়ার পর ধূলি ও ধোঁয়াতে একেবারে সব জায়গা অন্ধকার হয়ে যায়। পাঁচ হাত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। রুগী ও ডাক্তাররা প্রত্যেকেই অসহায়ভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি করে। অনেকে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। প্রথম বোমা বর্ষণের পর শুরু হয় পেট্রল ও আগুনে বোমা। হাসপাতালের পাশে একটি পুকুর ছিলো। আগুন দেখে অনেকেই জলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর শুধু পেট্রল ও আগুন। সারা পুকুরে পেট্রল ছড়িয়ে পড়ে ও আগুন লাগে। আহতদের ভীষণ আর্তনাদ। ধূলি ধোঁয়া ও মানুষ পুড়ে যাওয়ার ভীষণ দুর্গন্ধে স্থানটি একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী এই ভীষণ 'কারপেট বোম্বিং' চলে। চার পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ধ্বংস-স্তূপ।

এই বিমানাক্রমণের খবরে নেতাজী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে আসার জন্য প্রস্তুত হন কিন্তু আক্রমণ এতো ভীষণ ছিলো যে, তখন পথে বার হওয়া অসম্ভব ছিলো। আক্রমণ শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই তিনি 'মিয়াংএ' এসে উপস্থিত হন। আহতদের বর্মা স্টেট হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তখন তাঁর উপস্থিতি যেন দেবতাদর্শনের মতো প্রত্যেকের প্রাণে সঞ্জীবতা এনে দিল। প্রায় দেড় শো থেকে দু'শো রুগী মারা যায় এই বিমান-আক্রমণে। হাসপাতালের উপর এই নৃশংস আক্রমণে রেংগুনের প্রত্যেক ভারতীয় ও বর্মী বৃটিশের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। পরে ভারতীয়দের এক সভাতে আবার দুই কোটী টাকা তুলে নূতন হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আক্রমণের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। (ক্রমশ)

Made by 3R INK people

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ফটোগ্রাফার
ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দেশের কথা

(১০ই বৈশাখ—২৩শে বৈশাখ)

বাঙলায় সচিবসঙ্ঘ—ভারতীয় নৌ-সেনাদল—বিদেশ হইতে খাদ্য প্রেরণ—মীমাংসার চেষ্টা—কংগ্রেসের সভাপতি—মাদ্রাজে মন্ত্রিমণ্ডল—ভুলাভাই দেশাই—রেল ধর্মঘট—মেয়র নির্বাচন।

বাঙলায় সচিবসঙ্ঘ—বাঙলায় মিস্টার সুরাবর্দী প্রধান সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। তাঁহার সচিবসঙ্ঘে হিন্দুর মধ্যে তপশীলী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ব্যতীত আর কেহই নাই। তিনি একজনও "বর্ণ হিন্দুর" সহযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। জনরব, আর একজন তপশীলী—শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক তাঁহার বর্তমান চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বা ছুটি লইয়া সচিব হইতে পারেন।

ডক্টর রাধাবিনোদ পাল—কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল সামরিক কার্যে অপরাধীদিগের বিচার জন্য অন্যতম বিচারক মনোনীত হইয়া টোকিও যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতীয় নৌ-সেনাদল—বিদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় নৌ-সেনাদলের বিচারে প্রকাশ পাইতেছে, বেতন ও ব্যবহার উভয় বিষয়েই শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে যে বৈষম্যদ্যোতক আচরণ করা হয়, তাহা যে কোন জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। সেইরূপ ব্যবহার-বৈষম্যই ভারতীয় নৌ-সেনাদলে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সেনাদলের সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় ও অভিযোগের প্রতিকার না হওয়ায় তাহারা প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিচারকালে যে সকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে, সে সকল সরকারের পক্ষে সম্ভ্রমের পরিচায়ক নহে—নিরপেক্ষতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কি আর ভারতীয়দিগের প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

বিদেশ হইতে খাদ্য প্রেরণ—এই কৃষিপ্রধান দেশে—ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইলেও এদেশের বিদেশী সরকার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই। এখন দুর্ভিক্ষ অনিবার্যপ্রায় দেখিয়া তাঁহারা বিদেশে ভিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু খাদ্যবোর্ড ভাবিতেছেন—সর্বাঙ্গে যখন ক্ষত—তখন ঔষধ প্রয়োগ কোথায় করা যাইবে? চীন, জাপান, ভারত এ সকল ব্যতীত ইউরোপের নানা দেশেও খাদ্যাভাব। মার্কিণ হইতে মিস্টার হুভার আসিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খাদ্যবোর্ড যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিবার আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে ভারতের অভাব দূর হইবে না। কাজেই ভারতের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন ও আন্দোলন চলিতেছে।

ভুলাভাই দেশাই—বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও কংগ্রেসী নেতা ভুলাভাই দেশাই কয় মাস রোগ ভোগের পরে গত ৫ই মে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ আরম্ভ করিয়া পরে ব্যবহারাজীব হইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কংগ্রেসের কার্যে যোগ দিয়া তিনি দুইবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং দুইবারই স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু মুক্তি পাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পরে তিনিই কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের নেতা ও কংগ্রেসী দলের দলপতি হইয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের ফলে যখন কংগ্রেসী নেতারা কারারুদ্ধ, সেই সময়ে তিনি মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি বহু কংগ্রেসীর অপ্রীতিভাজন হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর লালকেল্লায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বিচারে আসামীদিগের পক্ষে ব্যবহারাজীবের কাজ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের সভাপতি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবার আর সভাপতি থাকিতে চাহেন না। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল, তাহাতে তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেই সভাপতি করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বহু সদস্যও তাঁহার সহিত একমত। কংগ্রেসের নিয়মানুসারে যে অধিবেশনে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন হইবে, তাহা বোধ হয় আগামী নভেম্বর মাসের পূর্বে হইবে না।

মাদ্রাজে মন্ত্রিমণ্ডল—মাদ্রাজের ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত প্রকাশম্ প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীকে প্রধান মন্ত্রী করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতির পরামর্শ গ্রহণ না করায় তিনি কংগ্রেসের কর্মকর্তাদিগের সাহায্য বা অনুমোদন লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল যে সর্বতোভাবে কংগ্রেসানুগ এবং তাহা নিয়মানুগভাবেই গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

কলিকাতায় মেয়র নির্বাচন—এবার মিস্টার ওসমান কলিকাতার মেয়র ও শ্রীযুত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। মিস্টার ওসমান মুসলিম লীগ দলভুক্ত। যে সকল মুসলমানাতিরিক্ত কাউন্সিলার তাঁহার নির্বাচন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে "কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দল" ভুক্ত বলিলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক জানাইয়াছেন—তাঁহাদিগের কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক নাই এবং তাঁহারা কংগ্রেসের মনোনয়নে নির্বাচিতও হন নাই। মেয়র নির্বাচনে মুসলিম লীগ দলেও যেরূপ অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া লীগেও ভাঙ্গন ধরিতে পারে।

রেল ধর্মঘট—যুদ্ধের সময় রেলে যে বহু কর্মচারী গ্রহণ করা হইয়াছিল, এখন তাহাদিগের অনেককে বরখাস্ত করা হইতেছে এবং যুদ্ধকালীন ভাতাও বন্ধ করা হইতেছে। ইহার প্রতিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে রেল কর্মচারীরা ধর্মঘট করিবেন, স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহাদিগকে এখন ধর্মঘট স্থগিত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন; কারণ, আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় রেলে ধর্মঘট ঘটিলে খাদ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানির অসুবিধায় লোক বিপন্ন হইবে।

মীমাংসার চেষ্টা—বিলাত হইতে আগত মন্ত্রিত্রয়—বর্তমানে সামন্ত রাজ্যের সমস্যা স্থগিত রাখিয়া কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সিমলায় যাইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে মীমাংসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কংগ্রেস অখণ্ড ভারত ও ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত কোন মীমাংসায় সম্মত হইতে পারেন না। মুসলিম লীগ স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল নহেন—ভারতবর্ষ খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থান রচনার জন্যই আগ্রহসম্পন্ন। অর্থাৎ কংগ্রেসের মত ও লীগের মত পরস্পরবিরোধী। মন্ত্রিত্রয় যে প্রস্তাব পত্রে জানাইয়াছেন, তাহাতে—

(১) স্বাধীনতার কথা;

(২) ইংরেজ সেনার ভারতত্যাগের সময় নির্দেশ;

(৩) ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন মধ্যবর্তী সরকার গঠনের কথা—

কিছুই নাই।

মহাত্মা গান্ধীও সিমলায় গমন করিয়াছেন।

ক্রিকেট

হঠাৎ সংবাদপত্রগুলি ক্রিকেট-সচেতন হইয়া উঠিয়া ক্রিকেট খেলার তাৎপর্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে আমার নীরব হইয়া থাকা উচিত নয়। আমাকেও কিছু লিখিতে হয়। প্রথমে ভাবিলাম ক্রিকেট সম্বন্ধে না লিখিয়া বাঙলা মতে 'ডাং-গুলি' খেলা সম্বন্ধে কিছু লিখি। তারপরে ভাবিলাম তাহাতে লোকে প্র-না-বি'কে ক্রিকেট অনভিজ্ঞ ভাবিবে কিংবা 'ডাং-গুলি' বিশেষজ্ঞ ভাবাও বিচিত্র নহে। সত্য কথা বলিতে কি ক্রিকেট ও 'ডাং-গুলি' দুই খেলাতেই আমার সমান অভিজ্ঞতা। বিশেষ, খেলা ও ঔষধ এ দুটি বিষয়ে বৈদেশিক প্রভাবকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তাই নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধেই কিছু লিখিতে হইল।

কোন বিষয়ে লিখিতে গেলে প্রথমে তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা বিধেয়। ক্রিকেট খেলার সংজ্ঞা কি? দর্শকমাত্রেই জানেন, ক্রিকেট এক-প্রকার খেলা, যাহাতে একজন লোক মাঠের মধ্যে তিনটা কাঠি পুঁতিয়া একটা লাঠি হাতে করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকে, আর এক ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়া একটা 'বল' ছুড়িয়া পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিটিকে আহত করিতে চেষ্টা করে। লোকটি প্রায়শ আহত হয়—কিন্তু মাঝে মাঝে 'বল'টি লোকটির গায়ে না লাগিয়া কাঠিতে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। তখন বিপক্ষের কি আনন্দ! এমন কেন হয়, বুঝিতে পারি না। লোকটির গায়ে লাগিলেই তো আনন্দিত হইবার কথা। বোধ করি ভদ্রতার খাতিরে মনের আনন্দ চাপিয়া রাখে। যখন খেলা চলিতে থাকে, তখন দর্শকগণ মাঠের মধ্যে বসিয়া কমলালেবু ও চীনেবাদাম খাইতে থাকে। বলের দ্বারা আহত হইলে লোকটি মাঠের মধ্যে ব্যথায় ছুটাছুটি করে—লোকটা কতবার ছুটিল, সেই অঙ্ক লিখিয়া রাখা হয়—পরে উভয় পক্ষের অঙ্কের সংখ্যা বিচার করিয়া কে কতবার আহত হইয়াছে, তদ্দ্বারা হারজিত নির্ণীত হইয়া থাকে। আমার এই সংজ্ঞা যে ভ্রান্ত নহে, তাহার স্বপক্ষে একটি ইংরেজি গল্প পড়িয়াছিলাম। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে বন্দী হইয়া একজন ফরাসী সৈনিককে কিছুকাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সে একদিন মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিল। সে কি দেখিল? আমি যাহা দেখিয়াছি, সে ঠিক তাহাই দেখিয়াছিল। একটি লোক বল ছুড়িয়া দণ্ডধারী ব্যক্তিটিকে আহত করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হাতের লক্ষ্য অভ্রান্ত নহে বলিয়া বলটি গায়ে না লাগিয়া প্রায়ই কাঠি তিনটিতে লাগিতেছিল। ফরাসী সৈনিকটি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এমন ভ্রান্ত নিশানা লইয়া ইংরেজ কি রকমে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জিতিল। তারপরে তাহার যখন বল ছুঁড়িবার পালা আসিল, বলের প্রথম আঘাতেই আত্মরক্ষাশীল ব্যক্তিটিকে সে ধরাশায়ী করিয়া দিল এবং এতদিনে ওয়াটার্লুর পরাজয়ের কথঞ্চিৎ শোধ লওয়া হইল ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। বস্তুত ইহাই ক্রিকেট খেলার স্বরূপ—প্রাকৃত জনে যাহাই ভাবুক না কেন!

ক্রিকেট খেলার ইতিহাস জানি না, কিন্তু তাহার তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ যে না জানি এমন নয়। ক্রিকেট খেলায় লোকে যেমন আগ্রহ অনুভব করে, এমন আর কিছুতেই নয়। এই যে ছয় বৎসরব্যাপী বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গেল, ইহা কি থামানো যাইত না? একটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সূচী ঘোষণা করিয়া দিলে—অবশ্যই থামিত, অন্তত সেই কয়েক দিনের জন্যে যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রিকেটের মাঠেই যথার্থ আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত ও ভিত্তি-পাত। আবার ইংগ-ভারতীয় সম্বন্ধের কালো মেঘের রজতরেখাও এই ক্রিকেট খেলা। প্রিন্স রণজি ইংলণ্ডে যে সম্মান ও আদর পাইয়াছেন, তাহা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জোটে নাই। এক ডজন প্রিন্স রণজি ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারিলে এতদিনে স্বরাজ আমাদের করতলগত হইত! এবারে ভারতীয় যে দলটি ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছে—তাহাদের উক্তি কি আশাজনক নয়? একজন ভারতীয় খেলোয়াড় বলিয়াছেন—'ইংলণ্ডের মাটি বেশ নরম!' এমন আশার বাণী কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক বলিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের কাছে বিলাতের মাটি বিলাতি মাটি, যেমন নীরস, তেমনি কঠিন, যত ভিজানো যায়, তত আরও বেশি কঠিন হয়। মহাত্মা গান্ধীকে গোলটেবিল হইতে শূন্যহাতে ফিরিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতা পতৌদির নবাবকে তেমন ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইবে না, তিনি খ্যাতি ও সুযশে পকেট ভরিয়া লইয়া ফিরিবেন, ওদেশের হোটেলওয়ালা ও দোকান-দারদের পকেট পূর্ণ করিয়া দিয়া—

'তুমি দিলে সত্য রত্ন পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।'

ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ কি? আণবিক বোমার আকার কত বড় জানি না (জানিবার ইচ্ছাও নাই), নিশ্চয়ই ওই ক্রিকেট বলটার চেয়ে বড় নয়। ক্রিকেট বলই পরমাণবিক বোমা, যাহার তুলনায় আণবিক বোমা তুচ্ছ। ক্রিকেট বলই ভাবী জগতের অদৃষ্ট নির্ণয় করিবে। এমন একদিন আসিবে, যখন আস্ত্রিক যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে, কিন্তু মানুষের যুদ্ধ-স্পৃহা মিটিবে না—তখন ক্রিকেট খেলাই যুদ্ধের সাধ মিটাইবার কাজে লাগিবে। দুধের স্বাদ ঘোলে—কিন্তু পরিণত মানব সমাজের পক্ষে দুধের চেয়ে ঘোল কি অধিকতর উপকারী নয়? তখনকার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব মিটাইবার প্রধান উপায় হইবে ক্রিকেট খেলা। দুই জাতির মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহা মিটাইবার উপায় হইবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। খেলার ফলাফল বিবদমান জাতিদ্বয় সানন্দে স্বীকার করিয়া লইবে, আধুনিক শান্তির সর্তের মতো অনিচ্ছুক স্কন্ধের উপরে তাহা বলপ্রয়োগে চাপাইয়া দিতে হইবে না। রাষ্ট্রসংঘের পরে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা U. N. O. এবং তাহার পরে I. C. A. বা ইণ্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলার অপর নাম লীলা। আমাদের শাস্ত্রমতে লীলাতেই জগতের সূত্রপাত, আবার আমাদের শাস্ত্রমতে লীলাতেই হইবে জগতের সমাধান। আদ্যন্তে চ একই পরিণাম, কেবল মাঝখানে যা একটু গোল। এইটুকু কোনমতে পার হইতে পারিলেই আর চিন্তা নাই।

বৈদেশিকা

২৫শে এপ্রিল তারিখ হইতে প্যারিসে পররাষ্ট্রসচিবগণের কনফারেন্স আরম্ভ হইয়াছে। যোগ দিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের সচিব বার্ণেস্, ব্রিটিশসচিব বেভিন, ফরাসীসচিব বিডোল্ত এবং রুশসচিব মলোটোভ্। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে যে পররাষ্ট্রসচিবগণের বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে চীনের সচিবও উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে শক্তিবর্গ কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। বর্তমান বৈঠকের তারিখ স্থির করিবার সময় তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন পররাষ্ট্রসচিবদের সর্বসম্মতিক্রমে সন্ধিপত্র রচিত হইবে এবং শান্তি বৈঠকে ঐ সন্ধিপত্র যথারীতি শক্তিবর্গ দ্বারা গৃহীত হইবে। কিন্তু সচিবগণের মধ্যে যে পরিমাণ বাদানুবাদ চলিতেছে তাহাতে সম্প্রতি এই আশার সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। ব্রিটিশ-আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পরস্পরের স্বার্থ এত পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটা মিটমাট আশু সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। প্যারিসে পররাষ্ট্রসচিবদের কাজের তালিকার মধ্যে প্রধান হইতেছে জার্মেনীর সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পেঁছা এবং পরাজিত অক্ষশক্তি এবং তাহার সহযোগী হিসাবে ইতালী, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার সঙ্গে সন্ধির সর্ত স্থির করা। পশ্চিম জার্মেনী সম্বন্ধে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্রিটেন এবং ফরাসী স্থির করিয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে, জার্মেনী যাহাতে ভবিষ্যতে ফরাসীর নিরাপত্তা নষ্ট না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। কিন্তু কিভাবে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইবে তাহা লইয়া ব্রিটেন এবং ফরাসীর মতভেদ ঘটিতেছে। সাধারণত ব্রিটিশের মত হইতেছে এই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মেনীকে পঙ্গু করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয় কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহাকে পিষিয়া মারিলে চলিবে না, কেন-না বিজয়ী জাতিদের কর্তব্য হইতেছে জার্মেনীকে সমগ্র ইউরোপের কাজে খাটানো,—তাহাকে একেবারে ধ্বংস করা নয়। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মেনীর প্রতি ব্রিটিশনীতির উদারতা লইয়া ইঙ্গ-ফরাসী-মনান্তর ঘটিয়াছিল এবং ঐ উদারনীতির ফলেই হিটলারের অভ্যুদয় এবং শক্তিসংগ্রহ সম্ভব হইয়াছিল—ফরাসীদেশ একথা ভুলে নাই।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইতেছে ইতালি। প্রথমত, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে তাহার সীমান্তরেখা নির্ণয়; দ্বিতীয়ত, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কত আদায় করা; তৃতীয়ত, তাহার উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যের অংশগুলি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত বিষয়ে ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে রাশিয়ার স্বার্থের সংঘাত লাগিবেই। ত্রিয়েস্ত লইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। গত ১৯১৪—১৮ যুদ্ধের পর এই ভূখণ্ড অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে কাড়িয়া লইয়া ইতালীকে দেওয়া হয়, এখন যুগোশ্লাভিয়া ত্রিয়েস্ত লইতে কৃতসংকল্প। তাহার দাবী হইতেছে এদিক দিয়া ইতালীর সীমান্তরেখা ১৯১৪ সালে যেখানে ছিল সেখানে ঠেলিয়া নেওয়া। একটি বিশেষজ্ঞের কমিশন এই অঞ্চলে সীমান্ত-সমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের রিপোর্ট তৈরী করিতেছিলেন কিন্তু এই রিপোর্টে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতনৈক্য ঘটিয়াছে, ঘটিবারই কথা, কেননা এই বিশেষজ্ঞ-কমিশনটিতে চতুঃশক্তির প্রতিনিধিই আছেন। ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থ হইতেছে যাহাতে ত্রিয়েস্ত অঞ্চলটি ইতালীই পায়, কিন্তু রাশিয়ার মনোগত ইচ্ছা ইহা যুগোশ্লাভিয়া পায়; মনে রাখিতে হইবে যুগোশ্লাভিয়া রুশপ্রভাবসীমার অন্তর্ভুক্ত। ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে যুগোশ্লাভিয়ার উগ্রতা এত অধিক যে, অনেকে মনে করিতেছেন, শান্তি-বৈঠকে যদি ইহা ইতালীকেই দান করা স্থির হয় তবে মিত্রশক্তির সৈন্য অপসারিত হওয়া মাত্রই যুগোশ্লাভিয়া ত্রিয়েস্ত অঞ্চল গায়ের জোরেই দখল করিবে। অতএব ত্রিয়েস্ত এখন যাহাকেই দেওয়া হোক, রাশিয়ার অভিপ্রায় পরিণামে সিদ্ধ হইবে বলিয়াই মনে হয়। ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেও ইঙ্গ-আমেরিকার সহানুভূতি ইতালীর পক্ষে। যে-শক্তিকেই ভূমধ্যসাগরে আপন স্বার্থ বজায় রাখিতে হইবে তাহাকেই ইতালীর সঙ্গে ভাব রাখিয়া চলিতে হইবে। কাজেই ইতালী একেবারে মারা না যায় এদিকে ব্রিটেনের লক্ষ্য রাখিতে হয়। এবিষয় রাশিয়ার দয়ামায়ার পরিমাণ কম। তাহার নিজের এবং যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের পক্ষ হইতে ইতালীর উপর তাহার দাবীর অঙ্ক বেশ মোটাই হইবে। পররাষ্ট্রসচিবগণের বৈঠকে প্রথমেই রাশিয়ার পক্ষ হইতে ইতালীর নিকট হইতে রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার জন্য ৩০ কোটি ডলার দাবী করা হইয়াছিল। বেচারা ইতালী কিছুতেই এত টাকা দিতে পারিবে না এই অজুহাতে বৈঠক স্থির করিয়াছেন যে, চতুঃশক্তির বিশেষজ্ঞদের একটা কমিটি ইতালীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবে। সেই রিপোর্ট দৃষ্টে ব্যাপারটার মীমাংসা পরে করা হইবে।

ইতালীর উপনিবেশ লইয়াও সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়া তো ট্রিপলিটানিয়ায় একমেবাদ্বিতীয় ট্রাস্টী হইতে চাহিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হইলে এরিত্রিয়ার দিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ বেভিন মহাশয়ের ভাষায় রাশিয়ার দাবীর অর্থ হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গ্রীবা ঘেঁসিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ লাভ করা। ইংরেজের মতে এই দাবীর কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আসল কথা হইতেছে চোরের মাল যখন পাওয়া গিয়াছে তখন যে তাহা লইতে পারিবে তাহারই লাভ। ইঙ্গ-আমেরিকা বড় জোর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে এই দুই অঞ্চল দিতে রাজী হইতে পারে, একা রাশিয়ার হাতে কিছুতেই দিবে না। ডোডাকোনিজ দ্বীপপুঞ্জেও রাশিয়া ঘাঁটির দাবী করিতেছে, কিন্তু এই দ্বীপপুঞ্জের উপর ভৌগোলিক এবং অন্যান্য কারণে গ্রীসের দাবীর আনুকূল্য করিতেই ব্রিটেন ইচ্ছুক। রাশিয়াকে এই অঞ্চলে কোন ঘাঁটি দিতে তাহার গুরুতর আপত্তি। একবার একথাও হইয়াছিল যে, ইতালীকে তাহার উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হোক। কিন্তু ইহাতেও ব্রিটেনের আপত্তি।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটিবার কারণ নাই। রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে কোন উগ্রভাব এ পর্যন্ত দেখায় নাই এবং ইঙ্গ-আমেরিকারও এই দেশটির প্রতি দুর্বলতা রহিয়াছে।

রুমানিয়ার ব্যাপারেও ইঙ্গ-আমেরিকা কোন সমস্যা উপস্থিত করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের মনে হয় না। একে তো সে দেশের শাসনব্যবস্থায় একটু উন্নতি সম্ভবত হইয়াছে তার উপর রাশিয়ার অতি নিকটবর্তী এবং তাহার প্রভাবসীমার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রুমানিয়ার ব্যাপারে কোন উৎকট প্রশ্ন তুলিয়া ব্রিটেনের কোন লাভ নাই। কিন্তু বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর ব্যাপার স্বতন্ত্র। আজ পর্যন্ত বুলগেরিয়ার গভর্নমেণ্টকে ব্রিটেন এবং আমেরিকা স্বীকারই করেন নাই। হাঙ্গেরীতে তেলের প্রশ্ন রহিয়াছে এবং শাসনযন্ত্রের ভার ক্রমশ কম্যুনিস্টদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। অতএব হাঙ্গেরী লইয়াও বিতর্ক উপস্থিত হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শান্তি-বৈঠকে খুব শান্তির আশা করা বিজ্ঞজনোচিত হইবে না। মূলত যেখানে উভয়পক্ষে অর্থাৎ ইঙ্গ-আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থের এত বিরুদ্ধতা রহিয়াছে সেখানে এই সমস্ত জটিলবিষয়ে উভয়ের একমত হওয়া শক্ত। অন্তত সম্মিলিতভাবে সন্ধিপত্র রচনা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করা যদি এই শান্তি-বৈঠকে শক্তিচতুষ্টয়ের পক্ষে সম্ভব হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা অভাবনীয়ই বলিতে হইবে।

মন্ত্রিমিশন ভারতীয় সমস্যা সমাধানের আলাপআলোচনার জন্য নেতাদিগকে শৈলে আহবান করিয়াছেন। আলোচনার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে কংগ্রেস আশাবাদী, লীগপন্থী আনন্দ-চঞ্চল, আর সিমলার আবহাওয়ায় দাবী-দাওয়ার উষ্ণতাও অনেক লাঘব হইবে—সকলের মুখে এই কথাও শুনিতেছি। শুধু ট্রাম-বাসের যাত্রীরাই সিমলার স্থান-মাহাত্ম্যে গদগদ হইয়া উঠিতে পারিলেন না;—মেঘটা নিশ্চয়ই সিঁদুরে কিন্তু আমরা নেহাৎ ঘর-পোড়া গরু কিনা, হয়ত তাই!

* * * *

কায়েদে আজমের সহিত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নৈশ সাক্ষাতের ব্যবস্থা"—সহযোগী "আজাদের" সংবাদ-শিরোনামা।
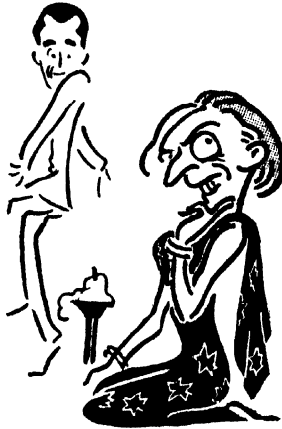
"বেলা হলো মরি লাজে" গানটি কায়েদে আজম গাহিয়াছিলেন কিনা, পরবর্তী সংবাদে সেকথা অবশ্য "আজাদ" জানান নাই!

* * * * * *

সুরাবর্দী সাহেব বাঙলার উজীরের তক্তে আরোহণ করিয়া সর্বসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে—সমাজের সেরা মগজওয়ালা লোকদিগকে তিনি জড়ো করিবেন এবং তাঁহারাই গভর্নমেন্টকে নানা জন-হিতকর কার্যে উপদেশ প্রদান করিবেন। "উজীরালির পোর্টফোলিও যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের উপদেশ কোন কাজে লাগিবে না বলিয়াই"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের স্বার্থ যে পাটের দরের সহিত জড়িত সে সম্বন্ধে তিনি (সুরাবর্দী সাহেব) একটি কথাও বলেন নাই কেন?"—প্রশ্ন করিতেছেন "আর্থিক জগৎ"। "লীগ মন্ত্রীদের সেই 'পাট' নাই বলিয়া"—এত সহজ কথাটার অর্থ "আর্থিক জগৎ" করিতে পারিলেন না?

* * * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত চরনওপাড়া গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া পূর্ব-বঙ্গ হইতে আগত মুসলমানদিগকে নাকি সেইখানে বসবাস করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে। মুসলমানদিগকে কেহ যাহাতে আর "বাঙাল" বলিতে না পারে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বোধ হয় সেই পরিকল্পনাকেই কার্যকরী করিতেছেন, ইহাকে হিন্দু বিদ্বেষ বলিতেছে নেহাৎ দুষ্ট লোকেরা!

* * * * * *

কলিকাতায় সম্প্রতি মেয়র নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গত বিলাতের হাইউইকম প্রদেশের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেখানে মেয়র নির্বাচন হইয়া গেলে—মেয়র এবং কাউন্সিলারদিগকে নাকি একটি পাল্লায় তুলিয়া ওজন করা হয়। প্রথাটি অদ্ভুত কিন্তু আমাদের মনে হয় এই প্রথার প্রবর্তন এখানে হইলে ভালই হয়, নির্বাচনের পূর্বে এবং পরের ওজন দেখিলে কর্পোরেশনের তেলে-জলে কতটা "পুরুষ্টু" হওয়া যায় তার একটা সঠিক হিসাব রাখার সুবিধা হয়।
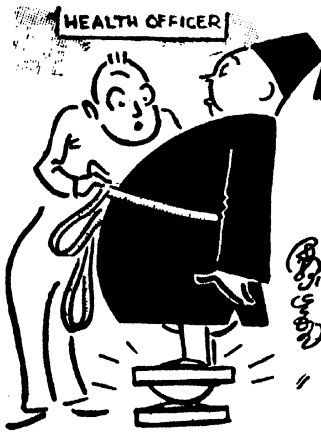
* * * * *

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার বলিয়াছেন — "আমেরিকাতে আমরা দুর্ভিক্ষ বলিতে বুঝি ব্যাপক মৃত্যু। ভারতবর্ষ এখনও সেই অবস্থায় উপনীত হয় নাই"। বিবৃতি শুনিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমেরিকা হইতে ভারতকে খাদ্য সাহায্য দেওয়ার যে প্রস্তাব চলিতেছে তাহা কি তবে হুভার-বর্ণিত অবস্থায় উপনীত হইবার আগে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই?

* * * * *

মিঃ চার্চিল—এবার্ডিনে তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে সখেদে বলিয়াছেন—"পৃথিবী আজ বড়ই অসুস্থ"। পৃথিবীর দিকে তাকাইবার সুস্থতা মিঃ চার্চিল স্বয়ং কবে

এবং কেমন করিয়া অর্জন করিলেন আমাদের এই সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে খুড়ো বলিলেন—"বিড়ালের জীবনেও আহ্নিকে বসার সময় আসে!"

* * * * * *

কয়দিন নেট প্র্যাকটিসের পর ভারতীয় ক্রিকেটারগণ ৪ঠা মে হইতে বিলাতে খেলিতে আরম্ভ করিবেন। দিল্লীর নেট্ প্র্যাকটিসের পর মন্ত্রিমিশনও এই ৪ঠা মে হইতেই সিমলায় ফাইন্যাল খেলায় নামিবেন। আমরা আশা করি দুই জায়গাতেই সত্যি-কারের "ক্রিকেট খেলা" হইবে, Body line bowling-এর তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আর হইবে না।

নবযুগ চিত্রপটের 'দিনরাত' ছবিখানার বিষয়ে বম্বের ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের আপত্তি তোলা নিয়ে গত-পূর্ব সপ্তাহে আমরা যে মন্তব্য করি, বাঁকুড়া থেকে এক ভদ্রমহিলা তার ওপরে এক দীর্ঘ পত্র লিখে ভারতীয় চিত্রজগতের অধিবাসীদের সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চেয়েছেন। ভদ্রলোক বিশেষ করে মহিলারা অসঙ্কোচে চলচ্চিত্রে যোগদান ক'রতে পারেন কি-না সেই কথাটা জানতে চাওয়াই হ'চ্ছে তার চিঠির মুখ্য উদ্দেশ্য। 'দিনরাত' নিয়ে বম্বের প্রযোজকরা এই আপত্তি তোলেন যে, ছবিখানিতে প্রযোজক ও তারকাদের দুশ্চরিত্র দেখান হ'য়েছে—তাতে, আমরা মন্তব্য করি যে, এতে আপত্তি করার কারণ নেই, যেহেতু চিত্রজগতে চরিত্রহীন প্রযোজক বা তারকার অভাব নেই। কিন্তু তাই বলে একথা আমরা মোটেই ইঙ্গিত করতে চাইনি যে, চিত্রজগতে সবাই সমান চরিত্রহীন বা ওখানে সৎলোক কেউই নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত চিত্রজগতও সবরকম চরিত্রের লোকের দ্বারাই অধ্যুষিত, তবে চলচ্চিত্রের অধিবাসীরা সবক্ষেত্রের চেয়ে বড় বেশী পাবলিসিটি পায় বলে ওরাই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে থাকে। ওদের মধ্যে মন্দ লোক যেমন আছে, ভাল লোকও তেমনি, বরং প্রথম দলীয়রা সংখ্যাতে অনেক কমই। আর চরিত্র রাখা-না-রাখাটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যক্তিগত মর্জীর উপরেই নির্ভর করে—কারণ বহু জাতবেশ্যা দেখেছি যারা অভিনেত্রী হ'য়ে শালীনতা ও ভদ্রতায় ভদ্রমহিলাদেরও হার মানিয়ে দেয়, আবার বহু মহিলা দেখি বাজারের তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যাদেরও লজ্জা দেয়। নিছক শিল্পের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি নিয়ে যারা যোগদান করে বা যারা চলচ্চিত্রের যে কোন বিভাগেরই হোক কাজটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তারা ঠিক চরিত্র বজায় রেখেই চলে, আর যারা সখ ক'রতে আসে বা চলচ্চিত্রের জৌলুসে আকৃষ্ট হ'য়ে আসে তারা নৈতিক বলকে দৃঢ় রাখতে পারে না—এ শ্রেণীর ব্যক্তিরা চলচ্চিত্রে যোগদান না করেও চরিত্র খুইয়ে বসবে। আগের চেয়ে চলচ্চিত্র জগতের আবহাওয়া অনেক পরিচ্ছন্ন—সেটা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, বহু ভদ্রব্যক্তি, মহিলা ও পুরুষ উভয়ই, শালিনতা ও নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেও কাজ করে যাচ্ছে, ভারতের সর্বত্রই—আগে যেমন চরিত্রহীনতাই ছিল চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের সার্টিফিকেট, এখন তার জায়গায় আস্তে আস্তে প্রকৃত কাজের লোকেরাই জমায়েৎ হচ্ছে যাদের নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও নৈতিক চরিত্র অন্য কোন ক্ষেত্রের অন্য কারুর চেয়ে কম নয়, বেশীও নয়।

শ্রেষ্ঠ ছবি

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের বিচারে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ১৯৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হ'চ্ছে:—

শ্রেষ্ঠ দশখানি ছবি (দেশী)—১। ভাবীকাল, ২। পর্বত পে অপ্‌না ডেরা, ৩। দুই পুরুষ, ৪। কাশীনাথ, ৫। একদিন-কা সুলতান, ৬। আয়না, ৭। দিনরাত, ৮। মন-কী-জিৎ, ৯। দেবদাসী, ১০। মজদুর।

শ্রেষ্ঠ ছবি (বিদেশী)—

১। গ্যাস লাইট, ২। লস্ট উইক এণ্ড, ৩। আরসেনিক এণ্ড দি লেস, ৪। এ সং টু রিমেম্বার, ৫। উইলসন, ৬। এ থাউজেণ্ড এণ্ড ওয়ান নাইট, ৭। হেনরী ফিফ্‌থ, ৮। ড্রাগনসীড, ৯। সেভেন ক্রশ, ১০। দি পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে।

শ্রেষ্ঠ কাহিনীঃ—ভাবীকাল (বাঙলা), পর্বত পে অপ্‌না ডেরা (হিন্দী), শ্রেষ্ঠ পরিচালক; নীরেন লাহিড়ী (ভাবীকাল), শান্তারাম (পর্বত পে অপ্‌না ডেরা;) শ্রেষ্ঠ সুরকারঃ পঙ্কজ মল্লিক (দুই পুরুষ), আমির আলি (পান্না); শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রঃ সুধীন মজুমদার (দুই পুরুষ), ভি অবধূত (পর্বত পে অপ্‌না ডেরা); শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রীঃ লোকেন বসু (দুই পুরুষ); এ কে পারমার (পর্বত পে অপ্‌না ডেরা); শ্রেষ্ঠ দৃশ্যসজ্জাঃ সৌরীন সেন (দুই পুরুষ), রুসী ব্যাঙ্কার (একদিন-কা সুলতান); শ্রেষ্ঠ অভিনেতাঃ দেবী মুখার্জি (ভাবীকাল); পৃথ্বীরাজ (দেবদাসী); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীঃ চন্দ্রাবতী (দুই পুরুষ), গীতা নিজামী (পান্না); পার্শ্বচরিত্রেঃ অমর মল্লিক (ভাবীকাল), ইয়াকুব (আয়না); প্রভা (মানে না মানা), রঞ্জিৎকুমারী (চল চলরে নৌজয়ান); শ্রেষ্ঠ গীতকারঃ শৈলেন রায় (দুই পুরুষ); গোপাল সিং (মজদুর); শ্রেষ্ঠ সংলাপঃ প্রেমেন মিত্র (ভাবীকাল), উপেন্দ্র আসাক্ (মজদুর); শ্রেষ্ঠ ছবিঃ ভাবীকাল ও পর্বত পে আপ্‌না ডেরা।

স্টুডিও সংবাদ

কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা সিনে প্রডিউসর্সের 'মাতৃহারা' এখন সম্পাদনাকক্ষে। ছবিখানি শোনা যাচ্ছে রূপবাণীর বর্তমান আকর্ষণের পরই ওখানে মুক্তিলাভ ক'রবে।

মলিনা, জহর, সন্তোষ সিংহ, কমল মিত্র, পূর্ণিমা, প্রমীলা, প্রভা, মঙ্গল চক্রবর্তী, ফণী রায় প্রভৃতি ভূমিকাতে থাকায় অভিনয়ের দিক থেকে ছবিখানি স্মরণীয় হবে আশা করা যায়।

* * *

এসোসিয়েটেড ওরিয়েণ্টাল ফিল্মসের 'দেশের দাবী'-র চিত্রগ্রহণ সমর ঘোষের পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সর্বজনে মিলিতভাবে সুখে কিভাবে বাস ক'রতে পারে কাহিনীতে তার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ভানু ব্যানার্জি, বিপিন মুখার্জি, শৈলেন পাল, সন্তোষ সিংহ, কৃষ্ণধন, নবদ্বীপ, সাধন সরকার, জ্যোৎস্না, সাবিত্রী, প্রভা প্রভৃতি।

* * * * *

ফণী বর্মার পরিচালনায় বাঙলার বর্তমান অবস্থা অবলম্বনে প্রণব রায়ের লেখা এসোসিয়েটেড প্রডাকসন্সের ছবি 'মন্দির'এর চিত্রগ্রহণ এগিয়ে যাচ্ছে।

* * * * * *

এম পি প্রডাকসন্সের 'তুমি আর আমি'র চিত্রগ্রহণ অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। শ্রীমতী কানন ছাড়া প্রথিতযশা বহু শিল্পী এতে অভিনয় ক'রছেন। ছবিখানি হ'চ্ছে হিন্দী এবং বাঙলা দু'ভাষাতেই।

* * * * *

তরুণ পরিচালক আশু বন্দ্যোপাধ্যায় কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে 'রক্তরাখীর' পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কাহিনীটিও তারই লেখা।

* * * *

বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'তপোভঙ্গ'র চিত্ররূপ রজনী পিকচার্সের প্রযোজনায় আলোক চিত্রশিল্পী বিভূতি দাস পরিচালনা ক'রছেন।

* * * *

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী ক্যালকাটা টকীজের প্রথম ছবিখানির পরিচালনা ভার লাভ ক'রেছেন। বর্তমানে তিনি চিত্রনাট্যটি রচনায় ব্যস্ত আছেন।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

গত মঙ্গলবার, ৩০শে স্টার থিয়েটারে নূতন নাটক 'মনীষের বৌ' মঞ্চস্থ হ'য়েছে। নাটকটি লঘুরসের, নৃত্যগীতবহুল; রচনা ক'রেছেন আশু ভট্টাচার্য, পরিচালনা ক'রেছেন মণীন্দ্র গুপ্ত এবং ভূমিকায় আছেন ভূমেন রায়, ধীরেন দাস, শিবকালি, বাণী, ছায়া; রেখা প্রভৃতি।

* * *

গত সপ্তাহে নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে—নিউ সিনেমা-চিত্রা-রূপালিতে নিউ থিয়েটার্সের যুগান্তকারী চিত্র 'উদয়ের পথে'র হিন্দী সংস্করণ 'হামরাহী', প্রধান ভূমিকাগুলিতে বাঙলা সংস্করণের শিল্পিরাই অভিনয় ক'রেছেন। সিটি-বীণা-উজ্জ্বলাতে দেবকী বসু পরিচালিত 'মেঘদূত'ও গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রেছে; সঙ্গীত পরিচালনা ক'রেছেন কমল দাশগুপ্ত এবং ভূমিকায় আছেন লীলা দেশাই, সাহু মোদক, ওয়াস্তী, কুসুম দেশপাণ্ডে প্রভৃতি।

* * * * *

এ সপ্তাহের আকর্ষণ হচ্ছে প্যারাডাইস-দীপকে রঞ্জিত চিত্র 'রাজপুতানী', ভূমিকায় আছে বীণা, জয়রাজ ও বিপিন গুপ্ত।

বিবিধ

মধু-সাধনা বসুর 'পুনর্মিলন' সম্পর্কে যে খবর বের হ'য়েছিল শ্রীমতী সাধনা তা সত্যি নয় বলে প্রতিবাদ লিখে পাঠিয়েছেন—'গিরিবালা'তে অভিনয়ও তিনি ক'রছেন না।

* * * * *

ভারত সরকারের ইনফরমেশন ফিল্মস্ ও ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড উঠে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতের সমস্ত সিনেমায় সরকারী প্রচারমূলক ছবি দেখাবার বাধ্যতামূলক অর্ডিন্যান্সটি এখনও কেন বহাল আছে কেউ বলতে পারেন কি?

* * *

কলকাতায় মুসলমানদের প্রথম চিত্র-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন শহরের দেয়ালে দেয়ালে, বিশেষ ক'রে মুসলমান পল্লীগুলিতে দেখা দিয়েছে—নাম, মহুয়া ফিল্মস্ লিমিটেড। মুসলমান মালিক সহরের কয়েকটি চিত্রগৃহ কেবলমাত্র ইসলামীয় সমাজ ও কাহিনী অবলম্বনে ছবি দেখাবার পণ ক'রে তো আগে থেকেই বসে আছে।

* * *

শৈলজানন্দ নাকি তাঁর কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চলচ্চিত্র সাংবাদিক সকাশে অনুশোচনা-পত্র পাঠিয়েছেন। জুতো মেরে গরু দানের এ চালাকী মন্দ নয়!

* * * * *

উদয়শঙ্কর তাঁর ছবি 'কল্পনা'তে ছবি সংক্রান্ত নানা বিষয়ের পরীক্ষা ক'রেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে সেট—চিরাচরিত উপায়ে তা তৈরী না ক'রে তিনি কতকগুলি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত ও অর্ধবৃত্ত আকারের কাঠ সাজিয়ে চমৎকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন।

* * * * *

আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট 'দিল্লী চলো' নামে যে ছবিখানি তুলেছিল পণ্ডিত নেহরু মালয় থেকে তার একটি কপি নিয়ে আসেন এবং সেটি একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দেখানো হয়।

* * * * *

অশোককুমার বম্বের রোজ এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত সঙ্গীতযন্ত্র বিক্রয় প্রতিষ্ঠানটি কিনে নিয়েছেন।

* * * * *

আলেকজাণ্ডার কর্ডার বিখ্যাত ছবি 'থিপ অফ বাগদাদ' এবারে হিন্দী ভাষা যোগ ক'রে দেখাবার চেষ্টা হ'চ্ছে। নায়িকা জুন ডুপ্রেজের স্বর দেবেন সুজাতা খান্না, পরিচালিকার স্বর আশালতা ভট্টাচার্য এবং জন জাষ্টিনের স্বর দেবেন লণ্ডন মসজিদের ইমাম।

* * * * *

'৪০ ক্রোড়' ছবিখানি মুসলমানদের আপত্তির জন্যে বম্বেতে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে। ছবিখানিতে পাকিস্তান বিরোধী প্রচার থাকাই হ'চ্ছে মুসলমানদের আপত্তির কারণ।

খেলাধূলা

হকি

বাঙলার হকি মরসুম শেষ হইয়াছে। ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। পোর্ট কমিশনার্স দল হকি লীগ ও বেটন কাপ উভয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ১৯৪২ ও ১৯৪৪ সালে পোর্ট কমিশনার্স দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হইয়াছিল। গত বৎসর মহমেডান স্পোর্টিং দল পোর্ট দলকে এই সম্মানলাভ হইতে বঞ্চিত করে। কিন্তু এই বৎসর পুনরায় সেই গৌরব অর্জন করিয়া হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছে। বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় পোর্ট দল এই সর্বপ্রথম বিজয়ীর সম্মানলাভ করিল। এই সম্মানলাভ করিতে পোর্ট দলকে ফাইন্যালে গত তিন বৎসরের বিজয়ী বি এন আর দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। বি এন আর দল এই বৎসর বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিলে পর পর চারি বৎসরের বিজয়ী হইয়া নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, কিন্তু পোর্ট দলের জন্য বি এন আর দলকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। পোর্ট দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে পোর্ট দল কি লীগ, কি বেটন কাপ প্রতিযোগিতার কোন খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বাঙ্গলার হকি খেলার স্ট্যান্ডার্ড যে খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গলার হকি পরিচালকগণের উচিত আগামী বৎসরে কিরূপে বাঙ্গলার হকি স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর করিতে পারা যায় সেই বিষয় এখন হইতেই চিন্তা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যদি তাঁহারা এই বিষয়ে দৃষ্টি না দেন, কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

ফুটবল

বাঙ্গলার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও প্রথম হইতে খেলার মাঠে খেলোয়াড় ও দর্শকগণের বিপুল সমাগম হইতেছে। দীর্ঘকাল হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া আমরা এমন হইয়া গিয়াছি যে, অধিক দর্শক অথবা খেলোয়াড়গণের সমাগম দেখিয়া আমরা বাঙ্গলার ফুটবল খেলা সম্পর্কে বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারি না। আমরা চাই দেখিতে বাঙলার ফুটবল খেলার অভাবনীয় উন্নতি। কবে আমাদের সেই আশা ও কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে জানি না, তবে তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

ফুটবল মরসুমের সূচনায় এই বৎসরে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। কারণ এইরূপ ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও মরসুমের সূচনায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে কোন এক বিশিষ্ট ক্লাব আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণের হুমকি প্রদর্শন করায়। এই ক্লাবের প্রতিবাদের যুক্তি হইতেছে যে, আই এফ এর সাধারণ সভায় লীগের উঠা নামা ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর হঠাৎ লীগ খেলা আরম্ভ হইবার পূর্বে তাহা পরিবর্তন করিয়া উঠা নামা বন্ধ রাখা হইল বলিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই অন্যায়। ন্যায় বা অন্যায় সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা বলিতে পারি, তবে বর্তমান অবস্থায় কিছু বলিব না। আই এফ এর পরিচালকগণ এই হুমকির ফলে চঞ্চল হইয়াছেন এবং পুনরায় এই বিষয় আলোচনা করিবেন, ইহা জানাইয়া দেওয়ায় উক্ত ক্লাব আদালতের সহায়তা গ্রহণ ব্যবস্থা বর্তমানে বন্ধ রাখিয়াছেন। শোনা যাইতেছে আই এফ এ পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখিবেন। এই গণ্ডগোলের এইখানেই যদি অবসান হয় খুবই ভাল, তবে দুঃখ হইতেছে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যদের জন্য। এতদিনে একটি শক্তিশালী বিত্তশালী ক্লাবের পাল্লায় পড়িয়া কি 'নাজেহাল'ই না ইঁহারা হইলেন ও হইতেছেন।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিয়াছে। খেলোয়াড়দের সকলেই সুস্থ দেহে আছেন। একটি মাত্র খেলা এই পর্যন্ত হইয়াছে। তাহাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তবে যে অবস্থার মধ্যে ভারতীয় দলকে খেলিতে হইয়াছে, তাহাতে সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন খেলোয়াড়দের অপূর্ব দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া।

প্রবল শীত তাহার উপর বৃষ্টি, মাঠ সিক্ত। এইরূপ অবস্থায় অনভ্যস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কিরূপে নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শন করিবেন? আবহাওয়ার সহিত পরিচিত হইলেই খেলার ফলাফল অন্যরূপ হইবে এই বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

লীগ ও বেটন কাপ বিজয়ী পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলোয়াড়গণ

দেশের মাটি

মৃণালকান্তি পুরকায়স্থ

মোরা, মাঠে মাঠে লাঙল চালাই মাটি মায়ের ছেলে,
রোদে পুড়ি শীতে জমি ভিজি বৃষ্টি জলে।
মোদের, গ্রামের পথে শান্তি ছড়ায় শীতল তরু-ছায়া।
এক পাশে তার কাজল-ধারা নদীর নীল-মায়া।
মোদের, আকাশ-ভরা ধূপছায়া মেঘ রৌদ্র রঙ পাখি—
এই আঙিনায় গাছের পাতায় আলপনা দেয় আঁকি
শিউলি বকুল পারুল বৃষ্টি পাতার বাঁশি বাজে
চৈত্র দিনে বনদেবী সাজেন ফুল-সাজে।

দিনের চোখে তন্দ্রা আসে ঝিঁ ঝিঁ পোকার স্বরে;
সিঁদুর রাঙা সন্ধ্যা নামে সুদূর মাঠের পরে।
ফেরে নীল সাগরে চাঁদের ডিঙি মেঘের পাল তুলে।
কোটি তারার কণ্ঠি দোলে গহন রাতের গলে।—
মোরা খেয়াল খুশির কাটাই দিন—মাতি বাউল গানে
মোদের, ছয়টি ঋতু জীবন-রস নিত্য যোগায় প্রাণে—
গোঠে চরাই ধেনু মোরা মাঠে ফলাই ধান,
মোরা, ধন্য ধূলির পরশ পেয়ে—মাটি মায়ের দান॥

দেশী সংবাদ

৩০শে এপ্রিল—রাওয়ালপিণ্ডির নিকট এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনার ফলে কতিপয় ভারতীয় অফিসার সহ ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষ মোট ৩৬২ জন নৌ-সৈনিককে আটক করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২৫ জনকে কর্মস্থলে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে, ৪২ জনকে কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে ও ৬০ জনকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং ৮৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। একজনকে অপমান করিয়া বরখাস্ত করা হইয়াছে। বাকী ৫০ জন নৌসেনার সম্বন্ধে এখনও তদন্ত চলিতেছে।

আজ রাত্রে কলিকাতায় গড়ের মাঠে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে। জনৈক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাহার পত্নীসহ ময়দানে হাসপাতাল রোড দিয়া ফীটনযোগে যাইতেছিলেন। এই সময় সৈনিকের বেশ পরিহিত ছয় জন ভারতীয় বলপূর্বক তাঁহার পত্নীকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যায়।

১লা মে—অদ্য রাত্রিতে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আচার্য কৃপালনী নয়াদিল্লী হইতে সিমলা যাত্রা করেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী জানান যে, কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য এ আই সি সি অফিসে নিম্নলিখিত তিনটি নাম পেঁৗছিয়াছে—(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং (৩) আচার্য জে বি কৃপালনী।

ফরিদকোট রাজ্যে ব্যাপকভাবে দমননীতি ও অত্যাচার চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের কাবুল লাইন হইতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মেজর জেনারেল আজিজ আমেদ এবং অপর ছয়জন অফিসারকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২রা মে—সিমলায় বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধি দল আজ বড়লাটের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। এদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বড়লাটের সহিত এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটকাল আলোচনা করেন। অদ্য মহাত্মা গান্ধী সদলবলে সিমলায় পেঁৗছেন।

দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের কাবুল লাইন হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল জে কে ভোঁসলে এবং অপর চারিজন অফিসারকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

৩রা মে—আড়াই মাস যাবৎ নারায়ণগঞ্জের তিনটি মিলে যে শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছিল, অদ্য শ্রমমন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের এক সভায় উহা প্রত্যাহৃত হয়।

১১ দিন ধর্মঘটের পর কলিকাতায় দমকল কর্মীদের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে।

দিল্লীর কাবুল লাইন হইতে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের অন্যতম সদস্য মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ কর্ণেল কার্সালিওয়াল, লেঃ কর্ণেল ইনায়েতুল্লা ও মেজর জগজিৎ সিংকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য সমিতি

রেঙ্গুন হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ পাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়াছেন। এই ১১ জনের মধ্যে বর্তমানে ৫ জন রেঙ্গুনে, ৪ জন ভারতবর্ষে এবং দুইজন মালয়ে আছেন। মিঃ বসীরকে রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে খাদ্য সম্মেলনে ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জে পি শ্রীবাস্তব বলেন, বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর সম্ভাবনা খুবই কম। আমাদিগকে আহার্যের পরিমাণ আরও হ্রাস করিতে হইবে।

৪ঠা মে—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের নয়জন মেডিক্যাল অফিসার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতায় এক আজাদ হিন্দ ফৌজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বিবৃত করেন। আগামী এক মাসের মধ্যেই উক্ত হাসপাতালের উদ্বোধন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমাস্থিত চরণপাড়া গ্রামের খাস মহলের জমি হইতে হিন্দু রায়তগণের উপর নদীয়া জেলার কালেক্টর কর্তৃক উচ্ছেদের নোটিশ প্রদত্ত হওয়ায় এবং ঐ সকল জমি পূর্ববঙ্গ হইতে আনীত মুসলমান রায়তগণকে বিলি করার আয়োজন হওয়ায় চরণপাড়া এবং অপর ছয়খানি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর জেনারেল মোহন সিংকে বিনাসর্তে কাবুল লাইন হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

৫ই মে—সিমলায় বড়লাট ভবনে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সভাপতিত্বে বৃটিশ প্রতিনিধি দল, কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ—এই তিন দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক আরম্ভ হয়। বৈঠকে নিখিল ভারতীয় যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই পরলোকগমন করিয়াছেন। গত চারমাস যাবৎ তিনি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

সমগ্র ভারতের রেলওয়ে কর্মচারীদের ব্যালট ভোট গৃহীত হইবার পর অদ্য নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্মচারী সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ভারত সরকারের নিকট আগামী ১লা জুন এই মর্মে এক নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ২৭শে জুনের মধ্যে তাঁহাদের দাবীসমূহ পূরণ করা না হইলে স্টেট রেলওয়েসহ ভারতের সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারী উক্ত দিবস হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন।

৬ই মে—সিমলায় ত্রি-দলীয় বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ত্রি-দলীয় বৈঠকে যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন দলকে সেগুলি চিন্তা করিয়া দেখার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে বৈঠক ৮ই মে পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা, প্রদেশসমূহের ভাগ বণ্টন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রশ্ন বৈঠকে বিবেচিত হয়। এইদিন বড়লাট ও মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদের মধ্যে গান্ধীজীর দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে এপ্রিল—জার্মানি ও জাপানকে আগামী ২৫ বৎসরকাল নিরস্ত্র করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষীয় গভর্নমেণ্টসমূহের বিবেচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক খসড়া চুক্তি রচনা করিয়াছেন।

প্যারিসে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের অধিবেশনে ইতালীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

১লা মে—বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মে অপরিচিত লোকের নিকট আণবিক শক্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের অপরাধে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রিভি কাউন্সিলে বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এই আপীল করেন।

৩রা মে—প্যালেস্টাইনে আরও এক লক্ষ ইহুদী প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া সুপারিশ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন তদন্ত কমিটি যে পরিকল্পনা করিয়াছে, উহার প্রতিবাদকল্পে দশ লক্ষ আরব ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

৪ঠা মে—কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সংশোধন সম্পর্কে যে বৃটিশ প্রতিনিধি দল আপোষ আলোচনা চালাইতেছেন, তাঁহারা নীতিগতভাবে মিশর হইতে বৃটিশ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়াতে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। যবদ্বীপের বড় শহরগুলিতে ইহা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। বলীদ্বীপ ও সেলিবিসে যুদ্ধ প্রসারলাভ করিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বৃটেনের পরিকল্পনা লইয়া লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়াছে।

৬ই মে—জেরুজালেমে বোরখা পরিহিতা তিন শত মুসলমান রমণী "আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তে রঞ্জিত ভূমি আমরা ছাড়িয়া দিব না" এই প্রকার বাক্যসম্বলিত পতাকা লইয়া শহরের রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বাঙলার প্রেস ফটোগ্রাফীর উৎকর্ষ সাধন এবং বিদেশে উহার প্রচার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় স্থানীয় প্রেস ফটোগ্রাফারদিগকে লইয়া বঙ্গীয় প্রেস ফটোগ্রাফার সমিতি গঠন করা হইয়াছে। গত ১৬ই এপ্রিল 'আনন্দবাজার' অফিসে উহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে কর্মকর্তা নির্বাচন করা হইয়াছে—সভাপতি শ্রীযুত কাঞ্চন মুখার্জি; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীযুত তারক দাস ও বীরেন সিংহ, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত নীরদ রায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুত ব্রজকিশোর সিংহ, যুগলকিশোর সান্যাল, শম্ভুদাস চ্যাটার্জি, পান্না সেন।

দেশ

সূচীপত্র

অভিনব আবিষ্কার!
বেবী মলম
খোস, পাঁচড়া, চুলকানি
দাদ, হাজা, ঘামাচি, ফোঁড়া, কীট-
দংশন ও একজিমার অব্যর্থ মলম।
সোল এজেন্ট—
মাধব এণ্ড কোং
জোড়াসাঁকো .... কলিকাতা

সর্দ্দি ও কাসির
বিজ্ঞান সম্মত মহৌষধ
সিরোলিন
'রচি'
SIROLIN

শাইকো
খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা,
পোড়া ঘা, নালীঘা, ফুস্কুড়ি, চুলকানি,
ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে
অব্যর্থ
এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
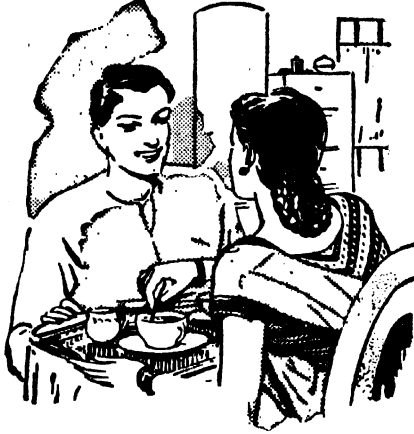
বেলা চারটে বাজে। চা-রসিকদের কাছে এই সময়টি সত্যিই অমূল্য। পৃথিবীর সর্বত্র, সমাজের সকল স্তরে, ধনী-দরিদ্র নির্বিচারে সবাই যেন কী এক জাদু মন্ত্র বলে বেলা চারটের সময় চা-পানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। কি আনন্দ কোলাহল মুখরিত গৃহপ্রাঙ্গন, কি নিঃসঙ্গ নরনারীর নিরানন্দ গৃহকোণ, অপরাহ্ণের চায়ের জন্য এই উৎসাহ-চঞ্চলতার অভাব কোথাও নেই। এই পরম ক্ষণটিতে সমস্ত পৃথিবীই বুঝি চায়ের আসরে এসে মিলিত হয়।

সামান্য একটি ছোট্ট গাছের পাতা, অথচ তার মধ্যে কত তৃপ্তি আর কত আনন্দই না আছে! মনে হয় পৃথিবী তার মাটির ভাণ্ডার থেকে বুঝি এই অপূর্ব পানীয়টি দান করেছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে। কিন্তু চা তৈরির ঠিক প্রণালীটি অনেকেরই জানা নেই বলে' এই দানের মূল্য আমরা বুঝতে পারিনে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

১। জল ফোটাতে ও চা ভেজাতে আলাদা আলাদা পাত্র ব্যবহার করবেন।

২। যে পাত্রে চা ভেজাবেন সেটা যাতে বেশ গরম ও শুকনো থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

৩। প্রত্যেক কাপের জন্য এক চামচ চা নিয়ে তার ওপর আর এক চামচ চা বেশি নেবেন।

৪। টাটকা জল টগবগিয়ে ফুটিয়ে নেবেন। একবার ফোটানো হয়েছে এমন জল আবার ব্যবহার করবেন না। আধ ফুটন্ত বা অনেকক্ষণ ধরে ফুটেছে এ রকম জলেও চা ভালো হয় না।

৫। আগে চায়ের পাত্রে পাতাগুলো ছাড়বেন এবং পরে গরম জল ঢেলে অন্তত পাঁচ মিনিট ভিজতে দেবেন।

৬। দুধ ও চিনি চা-টা কাপে ঢালার পর মেশাবেন।

সব সময়েই চলে

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 248

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ]   ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 18th May, 1946.   [২৮ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা

সিমলার ত্রি-দলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে। সম্মেলনের এই ব্যর্থতায় আমরা বিস্মিত হই নাই. প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং আমরা এই ব্যর্থতার সংবাদ পাইবার জন্যই সমধিক আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সুতরাং সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, সম্মেলনের এই পরিণতিতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি; কারণ ত্রি-দলীয় এই সম্মেলন যদি সার্থকতা লাভ করিত. তবে সমগ্র জাতির আদর্শই ক্ষুণ্ণ হইত। আমরা আগাগোড়াই এই কথা বলিয়া আসিয়াছি যে. ব্রিটিশ মন্ত্রি-মিশনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ বিশ্বাস নাই এবং তাঁহারা ভারতে আসিয়া যে ভাবে এদেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বতঃই আমাদের মনে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যই যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য থাকিত. তবে মুসলিম লীগের সঙ্গে মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইতেন না। বস্তুত মুসলিম লীগের মূলীভূত ভারত বিভাগের যুক্তিকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা আলোচনার পথে অগ্রসর হন এবং লীগের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই সমর্থন করিয়া তাঁহাদের সমগ্র নীতি কার্যত নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ভারত ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় এবং মুসলিম লীগের দাবীর আড়ালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈন্যের ঘাঁটি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য কায়েম রাখিবার অভিসন্ধি অন্তরে লইয়াই তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন, আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবশেষে কংগ্রেস-নেতৃগণ এই সম্বন্ধে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগের অনিষ্টকর নীতি মানিয়া লইয়া পরোক্ষ ভাবে ভারতে ব্রিটিশের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চাল তাঁহারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিতেছি। ব্রিটিশ প্রভুত্ব ধ্বংস করিব, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দলবলকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত না করিয়া আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না, ইহাই সোজা কথা। মন্ত্রী মিশন সমগ্র ভারতের এই দাবী যদি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে জাতীয়তাবাদী ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের কোন আপোষ-নিষ্পত্তিই সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুত মিশনের অবলম্বিত নীতির দোষেই সিমলার আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে: তথাপি মন্ত্রী মিশনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই; সম্ভবত অতঃপর তাঁহারা বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্পর্কিত ব্যাপারে মন দিবেন এবং সাময়িক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য এই যে, অখণ্ড ভারতের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া আগে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; লীগের সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা কোনক্রমেই ভারতের শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। মিঃ জিন্নার দলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল এদেশের রক্ত-মাংস চুষিয়া খাইবে, এবং দফায় দফায় আমাদিগকে জ্বালাইয়া মারিবে, আমরা ইহা সহ্য করিব না। আমরা জাতিকে তেমন দুর্গতির ফাঁদে কিছুতেই ফেলিতে দিব না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদের দাবীতে সম্মত হন ভাল, নতুবা দুর্বুদ্ধিই যদি তাঁহাদিগকে এখনও অভিভূত রাখে, তবে সমগ্র ভারতের জনমতের প্রতিরোধেরই তাঁহাদিগকে সম্মুখীন হইতে হইবে। তাঁহারা এই সহজ সত্যটি জানিয়া রাখুন যে, স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে ভারতবাসীরা আর ভীত নহে।

অতঃপর—

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইবার পর ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন কোন্ কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, তৎপ্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট রহিয়াছে। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তাঁহার এতৎসম্পর্কিত ঘোষণায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে. সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন দাবীর জন্য ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাজনীতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করা হইবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. মিঃ এটলী অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ন্যায় এক্ষেত্রে ভারতের সর্বজনীন সম্মতির মামুলী যুক্তি উত্থাপন করেন নাই। তিনি এদেশের শাসনতন্ত্র নির্ণয়ে সকল দলের যতদূর সম্ভব ঐকমত্যের যুক্তিই উপস্থিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতে আসিয়া এই নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করেন নাই এবং সেইজনাই এতটা গোল ঘটিয়াছে। তাঁহারা কংগ্রেস দলকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠকেই সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এখন সিমলার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিবে কি? মৌলানা আজাদ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, এবার মিশনের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐকমত্য ঘটুক, আর না

ঘটুক, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের সম্বন্ধে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ-পত্র দেওয়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কে স্থিরীকৃত নীতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ও লীগ দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, তাঁহাদের যদি এইরূপ উদ্দেশ্যই থাকিত, তবে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদিগকে একযোগে পদত্যাগ করাইয়া নূতন গভর্নমেণ্ট গঠনে সুযোগ ঘটানো হইত না। কারণ, কংগ্রেস কিম্বা লীগ কোন দলই যদি যোগদান না করে, তবে সাময়িকভাবেও কোন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে না। তারপর মিঃ জিন্না নিজের সংকল্পে দৃঢ় আছেন বলিয়াই আমরা জানি, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাগ করিবার নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মানিয়া না লইলে লীগ দল সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেণ্টেও যোগদান করিবে না, সিমলার বৈঠক ভাঙিয়া যাইবার পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় লীগ দলকে উপেক্ষা করিয়াই গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে কিনা ইহাই প্রশ্ন এবং কি কি সর্তে সেই গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে ইহাও বিবেচ্য বিষয়; কারণ তাহার উপরই গভর্নমেণ্ট গঠনে কংগ্রেসী দলের সহযোগিতা লাভ নির্ভর করিতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানে সংকল্পবদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে মিঃ জিন্নার অযৌক্তিক আবদারকে উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী তাঁহাদের ভারত ত্যাগের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মিঃ জিন্না যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন এবং তাঁহার সহযোগিতা সে পথে মিলুক বা না মিলুক, সেজন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন না, তখন তাঁহার মতও বদলাইবে; অধিকন্তু তাঁহার দলবলও সুবোধের মতই আসিয়া গভর্নমেণ্ট গঠনে যোগদান করিবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা প্রদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতাহীনতাই মিঃ জিন্নাকে প্রশ্রয় দিয়াছে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও কংগ্রেসের ভিতরকার বিরোধকে আশ্রয় করিয়া তিনি নিজে সুবিধা করিয়া লইবার ফিকিরেই শুধু ঘুরিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের উপর হইতে নিজেদের প্রভুত্ব অপসারিত করিতে চাহিবেন না; সুতরাং তাঁহারা কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধতা করিবেন। মিঃ জিন্না ইহা বুঝিয়াই এতটা বাড়াবাড়ি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন ব্রিটিশ যদি সত্যই ভারত ছাড়িয়া যাইবে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তবে বাস্তব অবস্থার চাপে মিঃ জিন্নার মনে সুবুদ্ধির সঞ্চার হইতে দেরী হইবে না। এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

মিঃ এ সি চ্যাটার্জির সম্বর্ধনা

গত ৯ই মে বৃহস্পতিবার আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি কয়েক বৎসর ভারতের বাহিরে বীরোচিত সংকটসংকুল জীবনযাপনের পর বাঙলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশবাসী তাঁহাকে যেরূপ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি পূর্বে বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি সামরিক কার্য সম্পর্কে সিংগাপুরে প্রেরিত হন এবং সেখানে ব্রিটিশ সেনাদলের আত্মসমর্পণের সংগে তিনিও জাপানীদের হাতে বন্দী হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ দলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার পর, মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি তাঁহার সংগে যোগদান করেন। তাঁহার শক্তি এবং প্রতিভা বিদেশী গভর্নমেণ্ট সমূহেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরেজের দখল হইতে ভারতের যে অংশ আজাদ হিন্দ ফৌজ উদ্ধার করিবে এমন সম্ভাবনা ছিল, জেনারেল চ্যাটার্জি নেতাজী কর্তৃক সেই অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যদোষে ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ভারতের পূর্ব দ্বারপথে প্রবেশ করিয়াও নেতাজীকে ফিরিয়া যাইতে হইল; নতুবা স্বাধীন বাঙলার স্বাধীন শাসনকর্তারূপে আমরা জেনারেল চ্যাটার্জিকে সম্বর্ধনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতাম। পরাধীন দেশে তিনি আজ সম্বর্ধিত হইয়াছেন; কিন্তু জাতির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-উৎসারিত এই অভিনন্দনেরও অত্যন্ত গূঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্গম পথের অভিযাত্রী দলের এইরূপ অভিনন্দন আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করে; এতদ্দ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা জাতির অন্তরে একান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং পশুশক্তির কোনরূপ প্রতিকূলতাই সে ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। দেখিতেছি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এ সত্য এখনও অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহারা মেজর-জেনারেল মিঃ এ সি চ্যাটার্জির ন্যায় ভারতের একজন বীর সন্তানকেও নির্যাতিত, নিগৃহীত করিয়াছেন; কিন্তু পরাধীন দেশে স্বাধীনতার যাঁহারা পূজারী, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই পুরস্কার। গত ১২ই মে, রবিবার কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে একটি বিরাট সভায় মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জিকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্ধিত করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি সকলকে নেতাজীর সার্বভৌম উদার আদর্শের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল; সুতরাং ভারতের লোকেরা সে বৃহদাদর্শের প্রেরণা লাভ করিলে এখনও এক হইতে পারে এবং উপযুক্ত নেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে দেশের স্বাধীনতার জন্য ভেদবিভেদ বিসর্জন দিয়া তাহারা জীবন দিতে সমর্থ, নেতাজী তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জির এই উদ্দীপনাময়ী বাণী জাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিবে এবং জাতি এই সত্যকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিবে যে, আমাদের ভিতরকার যত ভেদবিভেদ পরাধীনতার গ্লানি হইতেই উদ্ভূত এবং পরাধীনতার আব-হাওয়ার মধ্যেই সেগুলি পরিবর্ধিত হইবার সুবিধা পাইতেছে। বস্তুত এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আমরা যে মুহূর্তে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া বাহির হইব, সেই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদের যত প্রশ্ন আছে, সকলের সমাধান হইয়া যাইবে।

গেল রাজ্য—গেল মান

"আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এলাইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হই নাই"—মিঃ চার্চিল একদিন গর্বভরে এই কথা বলিয়াছিলেন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল গ্রেট ব্রিটেনে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করার ফলে সত্যই নাকি এই সংকট দেখা দিয়াছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। মিঃ চার্চিলের জামাতা মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিস সেদিন এক জনসভায় বলিয়াছেন—গতকল্য ভারতবর্ষ, আজ মিশর, আগামীকল্য যে সিংহল, ব্রহ্মদেশ অথবা সুদান ছাড়িবার ব্যবস্থা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? মিঃ চার্চিলেরও দুঃখের অবধি নাই। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী মিশর হইতে ব্রিটিশ সেনা অপসারণ সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, মিঃ এটলীর বিবৃতি আমাকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক আঘাত হানিয়াছে। ব্রিটিশ বিশেষ শ্রম ও যত্নে যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত লজ্জা এবং নির্বুদ্ধিতার সংগে পরিত্যক্ত হইতেছে, ইহাই মিঃ চার্চিলের মর্মবেদনার কারণ। সাম্রাজ্যবাদীদের এমন সোরগোলের হেতু আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু ব্রিটিশ শ্রমিক দল সত্যই যে বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতার পরম ঔদার্যের প্রেরণায়

ভারত বা মিশর ছাড়িয়া যাইবে, আমরা ইহা মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে মিশর হইতে ব্রিটিশ সেনা সরাইয়া লওয়া হইবে, ইহা ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে অনেক ছলনা চলিবে এবং নানা কৌশলে সেখানে ব্রিটিশ সেনার অবস্থানকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভারত সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতের সম্বন্ধে যতই উদার সিদ্ধান্ত করুন না কেন, ইংরেজ সহজে যে ভারত হইতে ব্রিটিশ সেনা অপসারিত করিতে রাজী হইবে, আমাদের এরূপ মনে হয় না। সেদিন পার্লামেণ্টে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়। আর্ল উইণ্টারটন প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, কোন অবস্থাতেই যেন ভারতস্থ ব্রিটিশ সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার অ-ব্রিটিশ অর্থাৎ ভারতীয় জঙ্গী-লাটের উপর অর্পণ করা না হয়। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী সুদৃঢ়ভাবেই ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, ইংরেজ মুখের কথাতেই ভারত ছাড়িবে না, এবং সামরিক শক্তির সূত্রে তাহারা এদেশে নিজেদের প্রভুত্ব যতদিন সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে, সুতরাং অচিরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে অবসান ঘটিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ পক্ষ ইহা বুঝিয়াই তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত নীতি সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করিতেছেন এবং স্বাধীনতা লাভে ভারতের জনগণের চেতনাকে দমন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ সেদিন বোম্বাইয়ের জনসভায় এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংরেজেরা একদিকে যেমন আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে, অন্যদিকে সেই সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যদলকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছে। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদিগকে সৈন্যদলে নিয়োগ করা হইতেছে এবং আদেশ পাইলে তাহারা কংগ্রেসকর্মীদের উপর গুলী চালাইবে, তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করা হইতেছে। কোন কোন স্থানে গান্ধীটুপিকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করিয়া সৈন্যদিগকে গুলীচালনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য সূত্র হইতেও উড়োজাহাজের সাহায্যে এবং বেতার প্রভৃতির পাকা ব্যবস্থার দ্বারা জনবিক্ষোভ দমনের জন্য গভর্নমেণ্ট পক্ষ সজ্জিত হইতেছেন, আমরা এইরূপে সংবাদ পাইতেছি। এই প্রসঙ্গে যুক্ত-প্রদেশের মন্ত্রি-সংকটের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ রফি আহম্মদ কিদোয়াই সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি-দানের জন্য আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু গভর্নর ইহাতে প্রতিবাদী হন, সুতরাং শাসন-ব্যাপারে বিদেশী রাজপুরুষদের জনমত দলনের স্পর্ধা এখনও দূর হয় নাই। বস্তুতঃ কোন জেতৃ-জাতিই স্বেচ্ছায় বিজিত দেশের শোষণ সম্পর্কিত স্বার্থ পরিত্যাগ করে না এবং স্বার্থ-সংস্কার-বশে সহজভাবে সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে অযৌক্তিকতাও দেখা দেয় না। ইহা চিরন্তন রাজনীতিক সত্য এবং ভারত সম্পর্কে এই সত্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদিগকে দৃঢ় থাকিতে হইবে এবং কোন দুর্বল মুহূর্তে আমরা যেন সেই লক্ষ্য হইতে নিজেদের দৃষ্টি অপসারিত না করি।

লবণ আইন রদের দাবী

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি লবণ আইন প্রত্যাহারের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতেছি, গভর্নমেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, প্রয়োজনীয় লবণের ঘাটতি পড়িবে, এইরূপ আশঙ্কা আছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় লবণ-বিধি প্রত্যাহার করা চলে না; অর্থাৎ গভর্নমেণ্টের অভিমত এই যে, লবণ আইন যদি প্রত্যাহার করা হয়, তবে দেশের লোকে বেশি করিয়া লবণ খাইবে; তাহার ফলে লবণের অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে না। বস্তুত দেশবাসীর প্রকৃত অভাব-অভিযোগ এড়াইবার ক্ষেত্রে এদেশের আমলাতন্ত্র সচরাচর যেরূপ উৎকট যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, এই যুক্তিও সেইরূপ অদ্ভুত। কারণ লবণ এমন জিনিস নয় যে মানুষে সস্তায় পাইলেই তাহা বেশি পরিমাণে খাইবে; গবাদি পশুর জন্য যে লবণ প্রয়োজন হয়, তাহাও একান্ত আবশ্যকস্বরূপেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। দরিদ্র এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে লবণটুকুও লোকের পক্ষে জুটে না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! কিন্তু দেশের লোকের জন্য লবণটুকুও পর্যন্ত তাঁহারা যোগাইতে পারিবেন না, এই ভয়ে বিদেশী গভর্নমেণ্ট ভারতের সর্বজনমান্য জননায়কের এই নিতান্ত সঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লবণের ঘাটতির আশঙ্কা ইহার মূলে কারণ নহে; গরীবের করভার হ্রাস করিতে তাঁহারা রাজী নহেন। এদেশের গরীবদের জন্য তাঁহাদের বেদনা নাই। আমরা যতদিন স্বাধীনতা অর্জন করিতে না পারিব এবং সেই সঙ্গে বিদেশীদের ভারত শোষণের সূত্র ছিন্ন করিতে সমর্থ না হইব, ততদিন এই বেদনার নিরসন ঘটিবে না।

দরিদ্রের বেদনা

দেশের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। দেশ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ ভারত হইতে আমরা বুভুক্ষিত নরনারীর শোচনীয় অবস্থার সংবাদ প্রতিনিয়তই পাইতেছি। লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারত হইতে দলে দলে অর্ধনগ্ন ক্ষুধিত নরনারী পাঞ্জাবে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু পাঞ্জাবেও এবার শস্যহানি ঘটিয়াছে। সমগ্র উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতের অবস্থাও অনুরূপ সংকটজনক। বাঙলা দেশের বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর হইতেও আমরা নিদারুণ অন্নকষ্টের সংবাদ পাইতেছি। বাঁকুড়া জেলার বিপন্ন নরনারীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে সেখানে কতকগুলি শস্যের দোকান খুলিবার জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে বারংবার অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু সে অনুরোধ এ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই; পক্ষান্তরে সেখানকার সরকারী গুদামের এক লক্ষ মণ পচা চাউল বাজারে ছাড়িয়া দিয়া বুভুক্ষু নরনারীদিগকে স্বাস্থ্য-হানির পথে অগ্রসর হইতেই সাহায্য করা হইয়াছে। এদিকে এই দারুণ দুর্দিনে মেদিনীপুরের কৃষকদের উপর কৃষিঋণ আদায়ের জন্য জুলুম চালান হইতেছে বলিয়া আমরা অভিযোগ শুনিতেছি। জনৈক বিশিষ্ট পত্রপ্রেরক জানাইতেছেন যে, চাষীরা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইতেছে; ইহা ছাড়া তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য তৈজস-পত্র, লাঙ্গল-বলদ, এমনকি ভিটাবাড়ি পর্যন্ত ক্রোক করিয়া নিলামে ছাড়া হইতেছে। মেদিনীপুর অভিশপ্ত অঞ্চল; সুতরাং সরকারী আমলাদের রোষদৃষ্টি সেদিকে থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু এই অবস্থার কি কোনদিন প্রতিকার হইবে না? গরীব চাষীদের সামর্থ্য থাকিলে তাহারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইতস্তত করিত না; পক্ষান্তরে সরকারী নির্যাতনের ফলে তাহাদের চাষ-আবাদের কাজ যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে অন্নাভাবে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িবে এবং এইভাবে একটা ব্যাপক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষই সৃষ্টি করা হইবে। বাঙলা সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যদি এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে অবহিত না হন, তবে জনসাধারণের মনে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কারণই সৃষ্ট হইবে। পরাধীন হইলেও এদেশে মানুষ আছে, তাঁহারা ইহা যেন স্মরণ রাখেন।

ভুলাভাই জীবনজী দেশাই

নদী যখন পর্বতগুহা হইতে বাহির হয় তখন হাতে কোন ম্যাপ লইয়া পথ চলে না। তবু সমুদ্র মোহানার অভিমুখেই তার যাত্রা নিত্য অগ্রসর হইয়া চলে। নদীর প্রাণবেগই তার পথের পাথেয়, সেই সম্বলে সমুদ্র সংগমে নিজের চরম চরিতার্থতা ও অবসান একদিন সে লাভ করে। মানুষের জীবনও অনেকটা এই পর্বতনিঃসৃত নদী-ধারার মতই। নদীর মতই অজানা জন্মগুহা হইতে বিশ্বের প্রান্তরে সে আসে এবং নদীর মতই জীবন-প্রবাহ-পথ ধরিয়া অন্তিম অবসানের অভিমুখে নিত্য সে অগ্রসর হয়। নদী সমুদ্র সংগমে নিজের চরিতার্থতা ও মুক্তিলাভ করে, কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে একথা তো বলা চলে না। ক্বচিৎ কদাচিৎ কোন মানুষ জীবিতাবস্থায় জানিতে পারে, কি তার সত্য লক্ষ্য, কি বিশেষ পরিণতিতে তাকে প্রকাশিত করিবার জন্যই তার জীবন-বিধাতা নিত্য তাকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ কেহ বলিতে পারে যে, জীবন তার সার্থক ও চরিতার্থ। মানুষের চলা ও নদীর চলার সঙ্গে এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই চরম বিভেদ রহিয়াছে। আমরা অধিকাংশ মানুষেই পৃথিবী ছাড়িবার আগে জানিতে পর্যন্ত পারি না, কেন এই জীবন প্রাঙ্গণে আমরা প্রেরিত হইয়াছিলাম। বলিতে পারি না কি ছিল আমাদের জীবনের লক্ষ্য!

ভুলাভাই দেশাই আজ লোকান্তরিত, দীর্ঘ ৭০ বৎসর এই পৃথিবীতে তিনি বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি জানিতে পারিয়াছিলেন, কী ছিল তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রেরণা? তিনি কি বলিতে পারিয়াছিলেন, অন্ততঃ নিজের কাছে যে, জীবন তাঁর ব্যর্থ হয় নাই, তিনি সার্থক ও ধন্য হইয়াছেন? এ প্রশ্নের জবাব দিবার সাধ্য তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরও নাই, এ প্রশ্নের জবাব তিনিই শুধু দিতে পারিতেন। অথবা, তিনি কি নদীর মত পথ না জানিয়াও পথ চলিতে চলিতে অন্তিমে পরম মোহানায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন? এ প্রশ্নের জবাবও দিবার কেহ নাই। তাই জীবিত বা লোকান্তরিত মানুষের জীবন সম্বন্ধে এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, জীবনের সত্য পরিচয় সত্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছে কিনা।

অতি সান্নিধ্যে ও অতি পরিচয়ে মানুষের সত্য রূপটি সম্যক দেখা সম্ভব হয় না। একটু দূরে ও ব্যবধানে রাখিয়া না দেখিতে পারিলে দৃষ্টি দেখার অবকাশ পায় না। মৃত্যু সেই ব্যবধান ও অবকাশ খানিকটা আনিয়া দেয়। কাজেই সত্য জীবনচরিত মৃত্যুর পরেই রচিত হওয়া সম্ভব। আত্মজীবনী আসলে জীবনী নয়; নিজের চোখে নিজেকে দেখা জীবনেরই আর দশটা কাজের মতই একটা বিশেষ কাজ মাত্র। সে আত্মজীবনী সাহিত্যের বিচারে সৃষ্টির সম্মান পাইতে পারে, কিন্তু তাকে জীবনচরিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। তবে প্রত্যেক সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ রচনাই প্রকারান্তরে বিভিন্ন নামে ও রূপে লেখকের আত্মজীবনী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ভুলাভাই জীবনজী দেশাই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলিতে এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল, তাঁর জীবনের মূল সুরটি ধরা স্বভাবত সম্ভব নয়, এই কথাটি জানাইবার জন্যই। দেশের ইতিহাসে তাঁর দান আছে, মূল্য বিচারে ভুলের সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই সতর্ক বাণীই ভূমিকার বক্তব্য। ভুলাভাইয়ের কর্মজীবনের দানের পরিমাণের উপরও তাঁর সত্য পরিচয় নির্ভর করে না, একথাও ভুলিলে চলিবে না। মানুষের সত্য মূল্য দিতে হইলে সত্যদ্রষ্টা হওয়া আবশ্যক—ভূমিকাতেও এই কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। কাজেই ভূমিকা কিছু দীর্ঘ হইল।

১৮৭৭ সালের ১৩ই অক্টোবর সুরাট জেলার বুলসারে ভুলাভাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সরকারী উকিল। দরিদ্রের ঘরে ভুলাভাই জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হইবে না। আর শিক্ষিত পরিবারেই তিনি জন্মলাভ করেন, ইহাও এই সঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা

চলে। শৈশবে ও বাল্যকালেই শিশু ও বালকের ভাবী জীবনের ইঙ্গিতসূচক কিছু কাজকর্ম চরিত্রে ও ব্যবহারে দৃষ্ট হয়, সজাগ চক্ষুর কাছে ধরা পড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা নায়কের ভূমিকা লইয়া আসেন, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে একথা খাটে, শৈশব ও কৈশোরেই তাঁদের ভাবী চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই জানা গিয়াছিল যে, অলৌকিক সৃষ্টি প্রতিভা লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন। আরও অনেকের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এক গান্ধীজীই হয়তো ব্যতিক্রম এ দৃষ্টান্তের। বিংশ

শতাব্দীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মানুষটির শৈশবে বা বাল্যকালে তাঁর ভাবী বিরাটত্বের কোন বিদ্যুৎ-আভাস তেমন দেখা যায় নাই। বিশেষত্ব তাঁর চরিত্রে তখন যা ছিল তা তাঁর ত্যাসক্তি ও সরলতা। সেই সত্য সাধনাকে কেবল করিয়া সরল বিশ্বাসে পথ চলিতে চলিতেই নিজের বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ঐশ্বর্য ; পরিচয়ের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন।

ভুলাভাইয়ের শৈশব শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবারে যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের জানা আছে, এর অধিক আমরা কিছু জানি না। ছাত্র জীবনেই জানা গেল মেধা ও বুদ্ধি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মেধা ও বুদ্ধিই ভুলাভাইয়ের জীবনে পথ দেখিয়া চলিবার প্রধান আলো। বুদ্ধির আলোতে পথ দেখা চলে, কিন্তু পথ চলিতে প্রাণবেগ আবশ্যক। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বীর ও কর্মীই এই প্রাণ-ঐশ্বর্যের জোরেই জীবনে ও সমাজে বিপুলে পরিবর্তন সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভুলাভাইয়ের জীবনের মূলশক্তি অবশ্য এই জাতীয় প্রাণবেগ নহে। আমাদের ধারণা, মেধা ও বুদ্ধিই ভুলাভাইয়ের সর্বস্ব ছিল না। মাথার নীচে হৃদয় বলিয়া বস্তুটিও ছিল, তাঁর বুদ্ধিকে পুষ্ট করিয়াই তা শেষ হয় নাই, বুদ্ধিকে চালনাও করিয়াছে।

ভুলাভাই বোম্বে এলফিনস্টোন কলেজ হইতে এম-এ পাশ করেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া পাশ করিয়াছিলেন। বি এ পাশের পর তিনি বিলাতে গিয়া আই-সি-এস পরীক্ষা দিবার জন্য ভারত সরকার হইতে একটি বৃত্তি পান। কিন্তু সে বৃত্তি গ্রহণ তিনি করেন নাই, এম-এ পাশ করিয়া আহমেদাবাদ-গুজরাট কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ তিনি গ্রহণ করেন। আই-সি-এস হওয়া তখন ভারতবর্ষের মেধাবী ছাত্র মাত্রেরই পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু ছিল। এ লোভ তিনি কেন সম্বরণ করিলেন? অর্থের অভাবের কথা উঠে না, কারণ ভারত সরকারের বৃত্তি তিনি পাইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া তিনি আই-সি-এস হওয়ার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন, তাহাও নহে। একটু চিন্তা করিলেই জানা যাইবে যে, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ হইতে জানা যায় যে, নিজের ভাবী জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তিনি করিয়া লইয়াছিলেন। বি-এ পাশ যুবক ভুলাভাই নিজের সম্বন্ধে আত্মসচেতন হইয়াছেন, ভাবী জীবন সম্বন্ধে প্ল্যান গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজের জীবনের নেতৃত্ব আপন হাতেই গ্রহণ করিয়াছেন—ভুলাভাইয়ের বুদ্ধির দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের গঠন ঐ বয়সেই সম্ভব হইয়াছিল—ইহা শুধু অনুমান নয়, সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা চলে। এই দিন তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধান্তের পথ রেখা ধরিয়াই তাঁর পরবর্তী জীবন শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

আই-সি-এস না হইয়া তিনি এম-এ পাশ করিয়া দুই বৎসর অধ্যাপনা করিয়া অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। ১৯০৫ সনে এডভোকেটশিপ পরীক্ষায় পাশ করেন এবং আইন ব্যবসাকেই জীবনের উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন। পিতা সরকারী উকীল ছিলেন, পুত্রের মধ্যে সে প্রতিভা পূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করে। তখন বোম্বে হাইকোর্টের আইনের ব্যবসা ইউরোপীয় ব্যারিস্টারদের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। কিন্তু ভুলাভাই দেশাই অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিতই শুধু করেন নাই, কালে বোম্বে হাইকোর্টের তিনি শ্রেষ্ঠতম আইনজীবীরূপে স্বীকৃত ও সম্মানিত হন।

ধন ও খ্যাতি ভুলাভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বে সরকারের ইচ্ছা ছিল এই লোকটিকে নিজেদের গোষ্ঠীভূত করিয়া লইবার। বোম্বে গভর্নরের শাসন পরিষদে একটি পদ তাঁহাকে লইতে বলা হইল, কিন্তু বিদেশী শাসক প্রদত্ত সম্মান ও ক্ষমতার এই দান তিনি গ্রহণ করেন নাই। এখানে তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তিনি ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ছিলেন না। সম্মানে আকৃষ্ট হইতেন না। চরিত্রের এ-তেজ তাঁর ছিল। তাঁর বুদ্ধি ছিল শান্তিপ্রিয়, একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই শান্তিপ্রিয় স্থির বুদ্ধি ক্ষমতার জ্বালা ও তাপ হইতে ভুলাভাইকে রক্ষা করিতে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। উপর্যুপরি কয়েকবার বোম্বে হাইকোর্টের জজের পদের প্রস্তাব তাঁর কাছে আসে, স্বভাবসুলভ নির্লোভ শান্ত মনে ইহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে বোম্বের এডভোকেট জেনারেলের পদ তিনি অস্থায়িভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই দেখা গেল যে, অতি সাময়িকভাবে হইলেও সরকারের সংগে এইভাবে তিনি একটু যুক্ত হইয়াছিলেন। এই সামান্য ও সাময়িক যোগসূত্র ছাড়া বিদেশী সরকারের সংগে ভুলাভাইয়ের জীবনে কোন সম্বন্ধই স্থাপিত হয় নাই। গান্ধীজীও প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজের হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা মনে রাখিলে ভুলাভাইয়ের জীবনের এই কাহিনীটুকু তাঁর দেশপ্রেম ও তেজস্বিতার উপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই বলা যায়।

রাজনীতিতে ভুলাভাই'র প্রথম প্রবেশ দেখি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়; তিনি হোমরুল লীগের সভ্য ছিলেন তখন। কিন্তু রাজনীতির সংগে এ যোগ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না কিংবা গভীরও ছিল না। ১৯১৯ সালে তিনি হোমরুল লীগের সংগে যোগসূত্র ছিন্ন করেন। রাজনীতির সংগে ভুলাভাইর সত্যিকার যোগের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯২৫ সালে। বার্দোলির কৃষক আন্দোলনের পর সরকার কর্তৃক ব্রুমফিল্ড কমিটি নামক এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ব্রুমফিল্ড কমিটির সম্মুখে বার্দোলির কৃষকদের পক্ষে তিনি আইনজীবী ছিলেন। এ-যোগ অবশ্য আইনজ্ঞের যোগ; কিন্তু এই সময়েই দেশের সত্যকার সমস্যা, জনসাধারণের দুরবস্থা ও প্রকৃত দেশকর্মীদের পরিচয় তিনি পান। ব্যক্তিগতভাবে কোন আন্দোলনে অংশ হয়তো তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মানসিক অংশ গ্রহণ বোধ হয় এই সময়েই আরম্ভ হয়, আমাদের ধারণা। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর বার্দোলি তদন্ত কমিটির সম্মুখে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি উপস্থিত হন। আমাদের ধারণা এই সময়েই ভুলাভাইর রাজনৈতিক জীবনের সত্যিকার দীক্ষা সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীর সংগে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি বড়লাটের সমানে সমানে চুক্তিপত্র আলোচিত হয়—গান্ধীজীর তখনকার বিপ্লবী ও মহাকর্মী রূপের পরিচয় নিশ্চয় ভুলাভাইর মনে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিবে। তদুপরি, শক্তিমান ও তেজস্বী সর্দার বল্লভভাইর পরিচয়ও তিনি পান। এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ভুলাভাইর অন্তর্নিহিত দেশকর্মী নিশ্চয় জাগ্রত হইয়া উঠিয়া থাকিবে, নিজ স্বভাব ও শক্তিমত দেশের কার্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণের সংকল্প নিশ্চয় তিনি এই সময়েই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

ভুলাভাইর উপযুক্ত স্থান ঘটনাচক্রে তাঁর জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার আহ্বান তাঁর কাছে আসে। এই সময় হইতেই ভুলাভাইর জীবনধারাটি একেবারে একটি নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন; এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দশ হাজার টাকা জরিমানাও তাঁকে দিতে হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভুলাভাইর জীবনের গতি ও ছন্দ এখন হইতেই একেবারে নূতনতর। পূর্ব-জীবনের সংগে সে-গতি ও ছন্দে কোন সাদৃশ্যই নাই। আরও একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। মতিলালের জীবনেও এই বিশেষত্ব অতি বিশেষভাবেই প্রকট হইয়াছিল। উভয়েই বুদ্ধিশালী, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও আইনজীবী, নিয়মতান্ত্রিকতা ইঁহাদের স্বভাব হওয়াই উচিত। কিন্তু বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, উভয়েই রাজনীতিতে ক্রমে ক্রমে চরমপন্থী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মতিলালের শেষ জীবনে যাহা দেখা গিয়াছে, ভুলাভাইর শেষ জীবনেও তাহাই দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সেই রাজনীতিতে চরম মত ও পন্থা উভয়েই গ্রহণ করেন।

জেল-জীবনের ধাক্কা ভুলাভাই'র স্বাস্থ্য বহন করিতে পারে নাই, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্বাস্থ্যের জন্য সরকার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই তাঁকে মুক্তিদান করেন। মতিলালের জীবনেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মন তাঁদের প্রস্তুত ছিল, কিন্তু দীর্ঘদিনের বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত শরীর কিন্তু জেল-জীবনের ক্লেশ বহনে সক্ষম ছিল না। এ বিষয়ে গান্ধীজী তুলনাহীন, দেহটির উপর তাঁর নিজের অধিকার প্রায় অলৌকিক, মনে হয় সন্ন্যাসী জীবনের কৃচ্ছ্রতায় তিনি নিজের স্বাস্থ্যকে স্ববশে আনিতে পারিয়াছেন। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ যোগীর, তাই শরীরও সেই ছন্দ মানিতে কিছুটা বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভুলাভাই অথবা মতিলাল জীবন-বৈরাগী ছিলেন না, জীবন-দর্শন তাঁদের জীবন-ভোগকে অস্বীকার করে নাই। জেল-জীবনের ক্লেশ দেশবন্ধু ও সেনগুপ্তের আয়ুর পরিমাণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছিল। অবশ্য ভুলাভাই ও মতিলাল পরিণত জীবন পর্যন্তই আয়ু পাইয়াছেন, বাঙলার এই নেতৃদ্বয়ের মত অসময়ে দেহত্যাগ করেন নাই। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া ভুলাভাই অতঃপর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপে যান। সেখানে থাকাকালীন জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগদান করেন। জেলের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মতিলাল, বিঠলভাই ও আরও অনেকেই ইউরোপে গিয়াছিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্যের দৈন্যই ইহাতে সূচিত হয় না, ভারতীয় জেলগুলির জঘন্য জীবনযাত্রা যে কত ক্লেশ ও অপমানকর, তাহাই ইহাতে স্পষ্ট হয় শুধু।

ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর ভুলাভাই কংগ্রেসের রাজনীতিতে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই একদিন দেশবন্ধু ও মতিলাল গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বরাজ পার্টি গঠন করিয়া। সত্যাগ্রহ আন্দোলন, গান্ধী-আরুইন চুক্তি, আবার সত্যাগ্রহ, আবার নেতৃবর্গের ও কংগ্রেস-কর্মীদের কারাবরণ—লর্ড উইলিংডনের কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করার নীতিতে দেশের একটা অসহ ও অচল অবস্থা আসিয়াছিল। সেই সময়ে গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসকে ভুলাভাই-ই পার্লামেণ্টারী নীতি গ্রহণ করিতে সম্মত করান। ফলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি গঠিত হয়। ভুলাভাই প্রথমে এই পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন, পরে তিনিই হন ইহার সভাপতি।

কেন্দ্রী পরিষদে কংগ্রেস পার্টির ও বিরোধী দলের নেতা ভুলাভাইর পরিচয় আজ সর্বজনবিদিত। এই পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর তিনি কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁর স্থলে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অভিষিক্ত হইয়াছেন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস ভারতবর্ষের অগ্রগতির একটি চূড়ান্ত অধ্যায়। সমস্ত নেতৃবৃন্দই জেলে আবদ্ধ। গান্ধীজীর মুক্তির পরও সেই অচল অবস্থা সমান রহিয়াছে, সরকারের দমননীতি ও মনোভাব একটুও পরিবর্তিত হয় নাই। লর্ড লিনলিথগো ভারতবাসীর অভিশাপ ও দুর্ভিক্ষের কলঙ্ক লইয়া বিলাতে ফিরিয়া যান। লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের শাসনকর্তা হইয়া আসেন। এই সময়ে ভুলাভাই একটা মীমাংসার জন্য অগ্রসর হন। লীগ সেক্রেটারী লিয়াকতের সঙ্গে একটা চুক্তি করেন বড়লাটের

ভুলাভাই দেশাই (সর্বাগ্রে) দিল্লীর লালকেল্লার বিচারকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, ফলে নেতৃবৃন্দ মুক্তি পান এবং গত বৎসরের সিমলা-বৈঠক ভুলাভাই'র চেষ্টার ফল। সিমলা-বৈঠকে ভুলাভাইও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে-বৈঠক ব্যর্থ হয়, যেমন বর্তমান সিমলা-বৈঠকও ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থতার হেতু যাই হউক, আমাদের বক্তব্য যে, ভুলাভাইর দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বের ফলেই সিমলা সম্মেলন সম্ভব হইয়াছিল। এ তাঁর শক্তিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভুলাভাই'র জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তির উল্লেখ করিয়া সশ্রদ্ধভাবে এ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।—আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস আজ ভারতবর্ষের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। "দিল্লী চলো"—নেতাজীর এই সংকল্পবাণীর প্রত্যুত্তর সরকার দিলেন দিল্লীর লাল কেল্লায়ই আজাদ হিন্দের সেনানীত্রয়ের বিচারের ব্যবস্থা করিয়া, সমগ্র দেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠি ঝড়ের সমুদ্রের মত। নেতাজীকে হাত বাড়াই দেশ সম্বর্ধনা করিতে পারে নাই, সে-দুঃখ গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বে হইয়া উঠিল। শাহ নওয়াজ ও তাঁর বন্ধুদে সমর্থনের জন্য কংগ্রেস অগ্রসর হইল—ভুলাভাই'র উপর ভার অর্পিত হইল তাঁদে পক্ষ সমর্থনের।

ভুলাভাই নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভ সংহত করিয়া মামলা পরিচালনা করেন,—শাহ নওয়াজ ও তাঁর বন্ধুদ্বয় মুক্তিলাভ করেন এ মামলা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মামলার অন্যতম। সরোজিন নাইডু বলিয়াছেন ঃ "বিচারে এই জয় ভুলাভাই নাম জগতের ঐতিহাসিক মামলার কাহিনী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিল।" অন্যান্য নেতৃবর্গ এই কথাই বলিয়াছেন। স্বয়ং জওহরলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেনঃ "আজাদ হি ফৌজের মামলায় তাঁর অতুলনীয় পক্ষ সমর্থ ও বক্তৃতাই ভুলাভাই'র স্মৃতিরক্ষার শ্রে ব্যবস্থা। যে-বক্তৃতায় অধীন জাতির স্বাধীনত দাবী ও বিদ্রোহ করিবার সহজাত অধিকা তিনি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাই ভুলাভাই'র শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ গান্ধীজীও এই অভিমত পোষণ করে ভুলাভাই'র এই দান জাতির ভাণ্ডারে অক্ষয় অমর সম্পত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

জীবনকে আমরা নদীর সঙ্গে তুল করিয়াছি, হাতে ম্যাপ নাই, তবু পথ চলি চলিতে সমুদ্রসঙ্গমে সে উপনীত হ মোহানার সন্ধান সে পায়। নাট্যকারের দৃষ্টি দেখিলে ভুলাভাই'র জীবন সেই পরম-সমাপ্তি সন্ধান পাইয়াছে বলিতে কোন সংকোচ বো করা উচিৎ নহে। দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতব স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত। ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম বীর দেশের দ্বারপ্রান্ত হইতে ফির গেলেন—এ দুঃখ ও গ্লানি সমস্ত জাতি সমস্ত দেশের। সমস্ত দেশের বেদনা ও দুঃখ নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া যেন ভুলাভা পরাধীনদেশের একক প্রতীক হইয়া এ গ্লা দগ্ধ করিতে প্রদীপের মত শেষবার লেলিহা শিখায় জ্বলিয়া উঠিলেন। বর্মার অরণ্যে মণিপুর—কোহিমার পার্বত্য অঞ্চলে বী সেনানীদের যে-প্রাণ ব্যয়িত হইল, সেই প্রাণকে চরম প্রণাম জানাইয়া তিনিও প্রাণ উৎসগ করিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধ শরীরের ও মনের সমস্ত শক্তিরসে এইদি জীবনের অন্তিম প্রদীপশিখা তিনি জ্বালিয়া ছিলেন। তারপর আর তাঁর বাঁচা সম্ভব হয় নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের একপ্রান্তে নেতাজী —অন্যপ্রান্তে লালকেল্লার বিচারকক্ষে সমগ্র দেশের প্রতীক ভুলাভাই,—ইতিহাসে এই দুই প্রান্ত চিরবন্ধনে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে।

সেই ভদ্রলোকটি

শ্রীবিমল মিত্র

নাড়াজোলের রায়েরা সাত পুরুষে যা করতে পারেনি, কালীঘাটের শশিপদ হালদার তিন বছরে তাই করে ফেলেছে। সেই কথাই বৈঠকখানায় বসে বলছিলেন তিনি।

তিরিশ বছর পরে চন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। শশিপদ হালদার মশাই নিজে উঠে ফ্যান চালিয়ে দিলেন। বললেন—সহজে ছাড়ছিনে তোমায় চন্দ্রনাথ, আজ এখানে খেয়ে যেতে হবে—

বাড়ীর ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। নতুন বাড়ি। যুদ্ধের পরে রাতারাতি একখানা তৈরী করে' ফেলেছেন। বললেন—ব্যবসা-ট্যাব্‌সা সব তুলে দিয়েছি—বেশী টাকা করে' কী হবে, ছেলেরা আলসে হয়ে যাবে, আমার সাধ্যি মত আমি করে গেলাম—এখন তাদের ভাগ্য তাদের হাতে—

চন্দ্রনাথ ভাবছিলেনঃ সেই শশিপদ! ইস্কুলে নিজের নামটা সোজা করে লিখতে পারতো না। তোত্‌লা ছিল—স্পষ্ট করে কথা বেরুত না। হাবাগোবা গোছের ছেলে, ক্লাশে পড়া পারতো না।

চন্দ্রনাথ বলতেন—তুই কিছুছু লেখা পড়া পারিসনে, তুই কি করবি শশিপদ, মানুষ হবি কি ক'রে তাই ভাবছি।

এককালে শশিপদ মানুষ হবে, মাথা তুলে দাঁড়াবে একথা কেই বা ভাবতে পেরেছে! শশিপদ নিজেই কি ভাবতে পেরেছে নাকি?

গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে শশিপদ তামাক টানতে লাগলো। তারপর লম্বা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে—সব প্ল্যানেট বুঝলে হে চন্দ্রনাথ, আমি ভেবে দেখেছি—সব প্ল্যানেট—নইলে—

নইলে যে কি হয় চন্দ্রনাথই তা'র উদাহরণ। প্ল্যানেট তা'কে মাথা তুলতে দেয়নি। রোগ, শোক, অর্থব্যয়, অশান্তি সারা জীবনটা লেগেই আছে চন্দ্রনাথের পেছনে। নিজের পৈত্রিক বাড়ীটা পর্যন্ত গেছে। ছেলে দুটি মারা গেছে। নিজের শরীরে দুটি অস্ত্রোপচার হয়েছে—এখনও স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপই চলছে! প্ল্যানেট নয় তো কী! গ্রহ আর কাকে বলে!

—তবে সব খুলেই বলি চন্দ্রনাথ তোমাকে—শশিপদ বলতে লাগলেন ঃ

—তবে এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার কাঁসারীপাড়ার বস্তীর বাড়ীতে বসে আছি। কোনও কাজ কর্ম হাতে নেই। ভাবছিলাম কী করা যায়। ছেলে দুটোর চাকরী হচ্ছে না। জানো তো সেই সময়টা! উনিশ শো আটত্রিশ সাল! বাবার আমলের কিছু দেনা ছিল—তা' বেড়ে বেড়ে সুদে আসলে অনেক দাঁড়িয়েছিল। সেই দেনা শোধ করবার জন্যে—বাড়ীটা বেচে দিয়েছিলাম। দিয়ে হাতে তখন হাজার দশেক টাকা রয়েছে। তাই ভাঙাচ্ছি আর খাচ্ছি। ভাবলাম একটা ব্যবসা লাগাবো, তা' কেই বা পরামর্শ দেয়, কেই বা ভরসা দেয়—এমন সময় পান্নালালের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল—

চন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন—পান্নালাল? পান্নালাল কে?

শশিপদ বললেন—পান্নালাল সরকার, আমি তাকে পেনো বলে ডাকি, সেই তো আমার ম্যানেজার, লম্বা গোছের চেহারা, আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ্—সামনের দিকটা একটা টাক আছে, তোত্‌লার মত কথা বলে...... আসবে 'খন রাত্রিবেলা। রোজ রাত্রে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে যায়—অদ্ভুত লোকটা হে!

শশিপদ বলতে লাগলেন—সেই পান্নালাল আমাকে বুদ্ধি দিলে কাঠের ব্যবসা করুন—। কাঠ হে কাঠ! শুকনো শাল, সেগুন, সুন্দরি, আম, কাঁঠাল, জারুল কাঠ! যে কাঠ দিয়ে এই জানালা দরজা তৈরী হয়, খাট পালঙ্ চেয়ার

টেবিল চৌকি তক্তপোষ হয়—নৌকা হয়—কড়ি-বরগা হয় সেই কাঠ! এই কাঠে যে এত রস তা কে জানে! পেনো না জানালে কি আমিই জানতুম?' পান্নালাল এর আগে চারবার গণেশ উল্টিয়েছে—চারটেই ছিল কাঠের কারবার। আমি ভেবে দেখলাম—পান্নালাল চারবার ব্যবসা ডুবিয়েছে—ওকে দিয়েই চলবে। তোমরা ছোটবেলায় বলতে আমার বুদ্ধিটা মোটা—এখন দেখ বুদ্ধি আছে কি না—

তা' সেই পান্নালালের হাতে আমি দশ হাজার টাকা দিলুম—সঙ্গে রইল আমার বড় ছেলে শৈলেশ। পান্নালাল বর্মায় চ'লে গেল—আর বড় ছেলে শৈলেশ গেল নেপালে। সেই দশ হাজার টাকার সেগুন আর শাল কাঠ কেনা তো হোল। আরম্ভ করতেই ছ'টি মাস লেগে গেল। কিন্তু বিক্রী হয় না। খদ্দের নেই। ওদিকে পাশের গোলা প্রেমজী ভীমজীর. বহু দিনের কারবার—সব লোক সেখানেই যায়। তা'র মাল বেশী—সে আরো নরম দরে ছেড়ে দিতে পারে। তা'র সব পাইকিরী খদ্দের—বড় বড় মহাজন—লটকে লট গাধা বোট তৈরীর কাঠের জন্য তার কাছে আসে। গভর্নমেণ্ট বড় বড় অর্ডার দেয় তাকে!

পান্নালাল বুদ্ধিমান লোক। গোলাটা ইন্সিওর ক'রে নিয়েছিল।

একদিন রাত্রে দাউ দাউ ক'রে আগুন জবলে উঠলো গোলায়। হৈ হৈ ব্যাপার। পাশের গোলা প্রেমজী ভীমজীর। আগুন ছাড়িয়ে পড়লো তা'দের গোলাতেও। দমকল এল—ইন্সিওর কোম্পানীর লোকজন এল—সাক্ষী সাবুদ ডাকা হোল—তদন্ত হোল—পান্নালাল দেখিয়ে দিলে কুড়ি হাজার টাকার মাল ছিল গোলায়। কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করলে। কিন্তু আগের রাতে যে মাল কাবার হ'য়ে গেছে গোলা থেকে—সে খবর কি আর পান্নালাল জানতে দিয়েছে!

পান্নালালের বুদ্ধির বহর দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। চেহারাখানা দেখলে অত বুদ্ধি আছে কে বলবে ভাই! মূলধন তো রাতারাতি ডবল্ ক'রে দিলে! কিন্তু পাশের প্রেমজী ভীমজীর জবালায় কিছু কি আর করবার যো আছে। তা' হোক্. পান্নালালের মাইনে দিচ্ছিলাম তিরিশ টাকা ক'রে মাসে, সেটা পাঁচ টাকা বাড়িয়ে প'য়ত্রিশ ক'রে দিলাম।

পান্নালাল একদিন বললে—প্রেমজী ভীমজী থাকতে আমাদের কোনও আশা নেই—ওকে ডোবাতে হবে. যে-করেই হোক্—হালদার মশাই—

বললাম—তা' কি ক'রে করবে পান্নালাল?

—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন—পান্নালাল বললে -কিন্তু মোটা কিছু টাকা পাশ ক'রে দিতে হবে মাসে মাসে—সেটা আমার চাই—ওদের ডোবাতে হবেই—

বুঝলে হে চন্দ্রনাথ! আমার তো ভয়ে পেটের মধ্যে পা দু'টো সেঁদিয়ে এল। রাজী তো হলাম। মাসে মাসে দু'তিন শো ক'রে খরচও হয়—শেষে এক হাজার দু'হাজার করেও খরচ হ'তে লাগলো। বছর খানেক যেতে না যেতেই ওদের কোম্পানী দিলে লালবাতি জেবলে। ব্যাপার কি না, পরে সমস্ত শুনলাম। প্রেমজী ভীমজীর মালিককে জাহান্নমে পাঠিয়ে ছেড়েছে পান্নালাল। মদ আর আনুষঙ্গিক যা' সব কিছুই আর বাকি রাখেনি। দু'দু'টো ফরাসী মেয়েমানুষ আর মদ ছ'মাসে কেল্লা ফতে করে দিলে......

তখন একচ্ছত্র সম্রাট! প্রেমজী ভীমজীর গোলা বিক্রী হ'য়ে গেল আমাদের কাছে। পান্নালালের বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পান্নালালের মাইনে আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে দিলাম—

তারপর বাধলো যুদ্ধ। প্রথমে ভাবলাম যাবে বুঝি সব। কে আর বাড়ী করবে—ওই কাঠ হয় বর্ষায় পচবে নয় চেলা করে বিক্রী করতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখ চন্দ্রনাথ বৃহস্পতি আমার তখন তুঙ্গী. ঠেকাবে কে? হঠাৎ ঊনিশ শো একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে নামলো। তারপর দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুর গেল। ভাবলাম সব বুঝি যায়!

তুমি তখন কলকাতায় ছিলে না চন্দ্রনাথ, নইলে তুমিও ভয়ে দিশেহারা হয়ে যেতে। সারা সহর একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এই তো দেখছ এখন ট্রামে বাসে ভীড়ে ভীড়ে ভীড়াকার—তখন ছিল একেবারে উল্টো। সন্ধ্যের পর ফাঁকা ফাঁকা ট্রাম চলেছে। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠে কার সাধ্য। তারপর গেল একদিন বর্মা! তখন আর দেখে কে! রাস্তায় দাঁড়ালে দেখতে পাই কেবল ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ী ঠেলা গাড়ী ক'রে মালপত্তর নিয়ে লোকজন চলেছে হয় হাওড়া নয় শেয়ালদ' ষ্টেশনের দিকে! এখন সহরে মাথা গোঁজবার জন্যে একটা গ্যারেজ পর্যন্ত ভাড়া পাবে না?তখন বড় বড় বাড়ী খালি পড়ে আছে, ভাড়া নেবার লোক নেই। ইয়া ইয়া বাড়ী জলের দরে ছেড়ে দিলে। আর ফার্ণিচার যা' সস্তায় গেল তা' আর কী বলবো। মানুষ নিজে পালিয়ে বাঁচে না, তার মধ্যে আবার ফার্নিচার কোথায় ঢোকাবে!

আমার তো ভারী ভয় হ'য়ে গেল চন্দ্রনাথ। অনেক ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। পান্নালাল বললে—এই মরসুম, থেকে যান—যদি প্রাণে বাঁচেন তো টাকা খাবার লোক থাকবে না—

হোলও তাই ভাই।

বর্মা যাবার দিন কতক পরেই কাঠ একেবারে রাতারাতি সোণা হয়ে গেল। বিশ্বাস করবে না ভাই—আগে কাঠ বেচে সারা জীবন লেগে যেত সেই দাম শোধ হ'তে, কিন্তু তখন থেকে আগাম টাকা নিয়ে দালাল আর ঠিকেদারেরা এসে হাজির। পান্নালালের তখন কী উৎসাহ! সকালবেলা এক দরে কাঠ বেচছে দুপুরবেলা আর এক দরে—বিকেললোই আবার আর এক দর হ'য়ে গেল। দিনের পর দিন কেবল দর বেড়েই চলছে। দরের যেন মা বাপ নেই। মা লক্ষ্মী যেন ঝাঁপিটা উপুড় করে ঢেলে দিলে আমার সামনে।

আমি যত খুসী পান্নালাল আরো খুসী।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা আর সোণার বেলপাতা দিলে চড়িয়ে। পান্নালাল বললে—ওটা করা ভাল, ভাল না করুন, খারাপ করতে কতক্ষণ মশাই!

ওই দেখনা চন্দ্রনাথ, মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে দেখছ মা কালীর ছবি, রেখে দিয়েছি মাথার ওপরে—মাসকাবারি পুরুত এসে রোজ ফুল বিল্বিপত্তর দিয়ে যায়—

চন্দ্রনাথ বললে—ওই যা' বলেছ, প্ল্যানেট হে—তোমার প্ল্যানেট্ ভাল তাই অমন পান্না-লালকে পেয়েছ—অমন বিশ্বাসী লোক পেয়েছিলে বলেই যা' হোক্—

শশিপদ তামাক টানতে টানতে বললে—বিশ্বাসী ব'লে বিশ্বাসী! চল্লিশ টাকা মাইনে দিতুম—ওইতেই সন্তুষ্ট, অমন দুর্ভিক্ষ গেল দেশে. রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজারে লোক মরেছে, কিন্তু পান্নালাল ওই চল্লিশ টাকাতেই চাকরী করেছে. একদিন মাইনে বাড়াবার জন্যে পর্যন্ত আর্জি করেনি। ভেবে দেখ আমার জন্যে চুরি, জোচ্চুরি, মিথ্যেকথা, জালিয়াতি, কিছু আর বাকী রাখেনি, কিন্তু নিজের জন্যে একটা পয়সার হিসেব গোলমাল করেনি কখনও—এমনি বিশ্বাসী লোক পান্নালাল বুঝলে চন্দ্রনাথ। বউটা মারা গেল পঞ্চাশ সালে, তা' দেশে যখন গেল তার আগেই নাকি বউ মারা গেছে। পরের দিন কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে এসেছে. পোড়ানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গদিতে এসে বসেছে। আমি কতদিন বলেছি ছুটি নাও, ছুটি নাও পান্নালাল। পান্নালাল বলতো—একটু ঝামেলা কমলেই ছুটি নেব স্যার—কিন্তু সে ঝামেলা আর কোনও দিন মেটেনি তা'র, সুতরাং ছুটি নেওয়াও হয় নি। তা' ভাই আমিও আমার কর্তব্য করেছি. চল্লিশ টাকা মাইনে পাচ্ছিল, আমি নিজে থেকেই ষাট টাকা মাইনে করে দিয়েছি, ও চায়ওনি। ধর না কেন, দশ হাজার টাকা ফেলে আজ চোদ্দ লাখ টাকার মালিক, এতো কেবল ওই পান্নালালেরই জন্যে—

শশিপদ লম্বা একটা হাই তুলে 'তারা' 'তারা' 'তারাপদ ভরসা' বলে স্বগতোক্তি করলেন।

বললেন—তোমার গল্প বল এবার চন্দ্রনাথ,—

চন্দ্রনাথ বললেন—আমার বলবার মত আর কীই বা আছে শশিপদ, সবই প্ল্যানেট। তুমি বাড়ী বেচে সেই টাকায় চোদ্দ লাখ টাকার মালিক হলে, আমিও বাড়ী বেচলুম কিন্তু ফকীর হ'য়ে গেলুম—বাড়ী বেচার টাকাটা খোয়া যেতে যেতে বে'চে গেছে ভাই, তাই রক্ষে—

শশিপদ গড়গড়া থেকে মুখ তুলে বললেন —কী রকম, টাকাটা কি চুরি হচ্ছিল নাকি?

—সে এক কাণ্ড ভাই। তবে গোড়া থেকেই বলি শশিপদ। রিট্রেঞ্চমেন্টের ধাক্কায় চাকরীটা যখন চলে গেল তখন ভারী মুস্কিলে পড়লাম। মাসে মাসে পেন্সন পাবো নব্বুই টাকা তা'তে আর কি হবে।

শেষে ঠিক করলাম চাষবাস করবো। সুন্দরবনের দিকে বাদায় কিছু চাষের জমি কিনে চাষবাস করবো, স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করবো—সারা জীবনই চাকরী করলাম। সরকারী চাকরীই হোক আর সওদাগরী চাকরী হোক—চাকরী সর্বত্রই সমান। চাকরীর মজা খুব বুঝে নিয়েছি—ভাবলাম এবার নিজেই চাকর রাখবো—

করলাম কি, বাড়িটা বিক্রী করলাম।

ষোল হাজার টাকা দর উঠলো। টাকাটা দু'তিন দিন কাছেই রাখলাম। তারপরে খবর পেলাম সুন্দরবনে এক ভদ্রলোক তাঁর জমিদারী বেচে দেবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। চোদ্দ হাজার টাকায় রফা হোল। একদিন জমিদারীও গিয়ে দেখে এলাম।

দিনক্ষণ দেখে একদিন টাকাটা নিয়ে রওনা হলুম। বিকেল বেলায় ট্রেণ ছাড়ল কলকাতা থেকে, সন্ধ্যে নাগাদ ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছুলুম। গাড়িতে ভীড় ছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বিছানার বাণ্ডিল আর সুটকেস একটা, আর একটা এটাচি কেস-এর মধ্যে টাকাগুলো ছিল। ডায়মণ্ডহারবারে আরো একটা কাজ ছিল—একদিন থাকতে হবে। ডায়মণ্ডহারবার স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই নেমে পড়েছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিক। ইচ্ছে ছিল সোজা গিয়ে উঠবো উকিলের বাড়ি। সেখান থেকে যাব আমার পার্টির বাড়ি। তারপর বেচাকেনা শেষ হলে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠবো—একটি লোকের খোঁজে। জানো তো সারাজীবন চাকরীই করে এলাম। ব্যবসার কিছুই বুঝি না। একজন কাজ জানা লোক দরকার—যার হাতে-কলমে যে কোনও ব্যবসায়এ অভিজ্ঞতা আছে।

উকিলের বাড়ির কাছাকাছি গেছি হঠাৎ খেয়াল হলো—আমার এটাচি কেস নেই।

সর্বনাশ! আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপতে লাগলো। আমার যে সর্বনাশ হ'য়ে গেল। আমার যে সমস্ত সেই এটাচি কেসের ভেতরে। সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো। যেন ভূমিকম্প শুরু হোল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে।

আবার যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথ দিয়ে ফিরে গেলাম।

আমার তখন জ্ঞান নেই ভাই। ওদিকে বাড়িও গেল, আবার এদিকে টাকাও গেল। পথের ভিখিরী হ'য়ে গেলাম যে। সে তুমি আমার অবস্থা কল্পনা করতে পারবে না। ভুক্তভুগী ছাড়া সে অবস্থা আর কেউ ধারণাতেও আনতে পারবে না।

সোজা স্টেশনে এলাম। স্টেশন মাস্টারের ঘরে একজনকে দেখলাম। তা'কে বললাম। পুলিশের কাছে গেলাম। ঝাড়ুদারদের জিগ্যেস করলাম। যে ট্রেনটিতে এসেছিলাম সেটি তখনও ইয়ার্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইন পার হ'য়ে, প্লাটফরম থেকে লাফিয়ে গাড়ির তলা দিয়ে গলে' গলে' গিয়ে সেই গাড়িতে উঠলুম। সে কি কষ্ট ভাই শশিপদ, কি বলবো! নিজের গাড়ি নিজে চিনতে পারলুম না—সমস্ত গাড়িটা খুঁজলুম। রাত হ'য়ে গেছে, অন্ধকারে দেখা যায় না মোটেই। দু'টো দেশলাই খরচ হ'য়ে গেল কাঠি জেবলে জেবলে খুঁজতে। কোথাও পাওয়া গেল না; শেষে হতাশ হ'য়ে স্টেশনেই আবার ফিরে এলাম।

এদিকে হয়েছে আর একটা ঘটনা।

এক ভদ্রলোক ডায়মণ্ডহারবারে তার বউকে দেখতে যাচ্ছিল। নামটা আমার মনে পড়ে না। সে ভদ্রলোকের স্ত্রী বহুদিন ধরে' অসুখে ভুগছে। শনিবার যায় আবার সোমবারে চলে' আসে।

সেদিন শনিবার। ট্রেনে উঠে সে ভদ্রলোকও ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন ঘুমিয়ে পড়েছে যে তখন গাড়ি গিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছেছে সে খেয়াল নেই। সব লোকজন যখন নেমে গেছে—ট্রেনকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলেছে একবারে ইয়ার্ডের ভেতরে। সেখেনেও ঘুম ভাঙেনি ভদ্রলোকের। যখন ঝাড়ুদাররা এসেছে গাড়ি পরিষ্কার করতে, তা'রা জাগিয়ে তুলেছে তাকে। ভদ্রলোক ঘুম ভেঙে দেখে—একেবারে ইয়ার্ডের মধ্যে এসে পড়েছে গাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠে গাড়ি থেকে নামতে যাবে, ঝাড়ুদারটা বললে—বাবু আপকা সমান ছোড় যাতা হ্যায়—

ভদ্রলোক চেয়ে দেখে মাথার কাছে বাঙ্কের ওপর একটা ছোট এটাচি কেস পড়ে' আছে।

এটাচি কেসটা তা'র নয়। তা' হোক্—ফেলে গেলে ঝাড়ুদারটাই নিয়ে নেবে।

এটাচি কেসটা নিয়ে বাইরে এসে আলোর তলায় ভদ্রলোক খুলে দেখে অবাক হ'য়ে গেল। শুধু অবাক নয় হতভম্ব হ'য়ে গেছে। এটাচি কেস ভর্তি নোট। থাক্ থাক্ করা নোট সাজানো রয়েছে থরে থরে। কত নোট বলা শক্ত। সমস্তই নোট, তা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই নোটভর্তি এটাচি কেস নিয়ে ভদ্রলোক ডাক্তারের বাড়ি চলে' গেল।

সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন—নিয়ে নিন্ মশাই, ও আপনার, ও আর কারু নয়—ভগবান আপনাকে দিয়েছে—আপনিই নিয়ে নিন—

ভদ্রলোক বললে—তাই কখনও হয় ডাক্তারবাবু—নিশ্চয় কেউ ফেলে গিয়েছে, যখন খেয়াল হবে নিশ্চয়ই খুঁজতে আসবে—

তারপর ডাক্তারবাবু আর সেই ভদ্রলোক দুজনে মিলে নোটের তাড়া গুণতে লাগলো। নোটের আর সীমা সংখ্যা নেই। সেই নোটের সংখ্যা গুণে দাঁড়াল পুরো চোদ্দ হাজার। দেখে তো ডাক্তারবাবু পর্যন্ত অবাক। এখন সেই নোট নিয়ে কী করা হবে তাই হোল সমস্যা।

ডাক্তারবাবু কেবল বলেন—নিয়ে নিন মশাই—বাড়া ভাত আর সাজা তামাক ফেলতে নেই শাস্ত্রে আছে—

কিন্তু ভদ্রলোকের মন তা'তে সায় দেয় না। নিজের স্ত্রীর অসুখ। সে-সব ব্যাপার ধামা চাপা রইল—। টাকাটা এখন ফেরত দেওয়া যায় কেমন করে তাই ভেবে অস্থির।

শেষে ভদ্রলোক উঠে বললেন—না আপনি বসুন, আমি একবার স্টেশনে ঘুরে আসি, যা'র টাকা সে একবার স্টেশনে আসবেই খুঁজতে—

ভদ্রলোক ছুটে এল স্টেশনে। স্টেশন তখন খাঁ খাঁ। চায়ের দোকানে দু'একটা লোক জটলা করছে।

ভদ্রলোক স্টেশনের প্লাটফরমে এসে ঘোরাঘুরি করছেন এমন সময় আমার সঙ্গে দেখা।

আমি তো পাগলের মত ঘুরছি—একে জিগ্যেস করি—ওকে জিগ্যেস করি, কুলিকে ডেকে প্রশ্ন করি স্টেশন মাস্টারকে ডেকে শুধোই; এমন সময় ভদ্রলোক এসে আমায় জিগ্যেস করলে—আপনার কিছু হারিয়েছে?

বললুম—হ্যাঁ মশাই, আমার সর্বস্ব হারিয়েছে, আমার সবকিছু খোয়া গেছে, আমি ভিখিরী আজ।

ভদ্রলোক বললে—আসুন তো আমার সঙ্গে—

আমি তো স্বর্গ পেলাম হাতে। বললাম—আপনি পেয়েছেন? আমার এটাচি কেস? চোদ্দ হাজার টাকা ছিল তাতে—দশ টাকার নোটের বাণ্ডিল সব—আপনি পেয়েছেন?

মনে হোল যেন তা'র পায়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি।

ভদ্রলোক বললে—আসুন আপনি আমার সঙ্গে—

আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এল। দেখলাম ঠিকই বটে।

আমারই এটাচি কেস। সেই সব টাকা ভেতরে আছে।

ভদ্রলোক বললে—গুণে দেখুন, ঠিক সব টাকা আছে কি না—

গুণবো আর কি! তখনও তখন হাত পা কাঁপছে। ভদ্রলোকই নিজে আবার সমস্ত গুণে দিলে। পুরোপুরি চোদ্দ হাজার টাকাই রয়েছে। একটি পয়সা কম বা বেশী নেই। মনে হোল ভদ্রলোককে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাই! তা'র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হোল। এখনও সম্ভব।

ভদ্রলোক বললে—আমি বাড়ি যাই এবার—আমার মশাই স্ত্রীর অসুখ—

বললাম—আপনি আমার যে উপকার করেছেন, আপনার ঋণ তা'র কি করে' শোধ করবো বুঝতে পারছিনে—আপনি এই পাঁচশো টাকা নিন, আমায় ধন্য করুন—

ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হয় না। বলে—আপনি টাকা ফেরৎ পেয়েছেন—এই টুকুই আনন্দের কথা—অন্য কোথাও পড়লে পেতেন কি না সন্দেহ—আপনার খুব সৌভাগ্য যে আপনি হারিয়ে যাওয়া টাকা আবার ফিরে পেলেন, এমন বড় হয় না।

আমি পাঁচশো টাকার নোট নিয়ে ঝুলোঝুলি, ভদ্রলোকও নেবে না। আমি দেখে তো অবাক হ'য়ে গেলাম। এমন লোকও পৃথিবীতে আছে! ভাবলাম একেই আমার দরকার। এই লোক দিয়েই আমার ব্যবসা চলবে এই রকম সাধু লোক না হ'লে তো তা'র ওপরে ব্যবসার ভার দেওয়া যায় না।

ভদ্রলোককে বললাম আমার প্রস্তাবের কথা। বললাম—আপনি যদি থাকেন, আমি বিশ্বাস করে' আপনার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি—

ভদ্রলোক বললে—কাঠের ব্যবসা যদি করেন তো আমি সাহায্য করতে পারি—ও সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে—

ভদ্রলোকের ঠিকানা নিলাম। বললাম আপনাকে আমি খবর দেব—

শশিপদ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে বললে—কাঠ? বল কি? কাঠের ব্যবসা?

—হ্যাঁ, কাঠের ব্যবসা! সেদিন আর উকিলবাড়ি যাওয়া হোল না। রাত্রে বাসায় গিয়ে ভেবে দেখলাম। ভাবলাম—না অমন লোককে দিয়ে ব্যবসা চলবে না। ব্যবসা চালাতে হ'লে চাই চালাক, চতুর, ধড়িবাজ লোক। মিথ্যে কথা বলতে হবে। লোক ঠকাতে হবে। হিসেবের ফাঁকি দেখাতে হবে। গভর্নমেণ্টকে ঠকাতে হবে, খদ্দেরকে ঠকাতে হবে। অমন সাদাসিধে সাধু লোক নিয়ে কি আর ব্যবসা চলে!

যা' হোক্, পরের দিন জমিদারী কেনা হোল। দলিল দস্তাবেজ তৈরী হোল, কবলা রেজিস্ট্রী হোল। জমিদার হ'য়ে বসলাম, তারপর......

দরজায় কড়া নড়ে' উঠলো। বাইরে কে যেন ডাকছে।

শশিপদ চীৎকার করে' উঠলো—কে?

—আজ্ঞে আমি—আগন্তুক বললে।

—ওই পান্নালাল এসেছে—। শশিপদ বললে—ওরে কে আছিস দরজা খুলে দে—

দরজা খোলা হোল।

—এই এরই কথা বলছিলাম—এই পান্নালাল—থাক্ থাক্ পান্নালাল—হয়েছে হয়েছে—বলে' শশিপদ পা জোড়া বাড়িয়ে দিলে।

পান্নালাল ঘরে ঢুকে শশিপদর পা ছুঁয়ে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে মাথায় বুলিয়ে দিলে। কিন্তু পান্নালালকে দেখে চন্দ্রনাথ চমকে উঠেছে। ভূত দেখলেও এত অবাক হয় নাকি কেউ!

পান্নালাল চন্দ্রনাথকে দেখে বললে—আপনি? এখেনে?

চন্দ্রনাথও অবাক হয়ে বললে—আপনি এখানে?

শশিপদও কম অবাক হয়নি। বললে—চেন নাকি তুমি চন্দ্রনাথ পান্নালালকে? পান্নালালকে তুমি চিনলে কি করে? বড় মজার ব্যাপার তো! বলে' হেসে উঠলো শশিপদ।

চন্দ্রনাথ বললে—এরই কথা তো এতক্ষণ বলছিলাম, এমন সৎ লোক, আমি এর ওপর চিরকৃতজ্ঞ ভাই, আমার নবজীবন দিয়েছে—পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি এই রকম সৎ হোত—তা' হ'লে আর......

পান্নালাল চলে' গেল। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য তা'র সমাধা হ'য়ে গেছে।

চলে' যাবার পর চন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ পরে কথা বেরুল। বললে—একি করে' হয় শশিপদ? এই এমন সৎ প্রকৃতির লোকই তোমার কারবারে ওই সব কাণ্ড করলো কী করে'? তোমার জন্যে জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যে কথা, সব কিছু করেছে......এ কি করে' হয় শশিপদ?

শশিপদ লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বললে—হয় চন্দ্রনাথ, হয়। ওরাই পারে! ওরা, জান চন্দ্রনাথ, নিজের জন্যে কিছু কাজ করতে ভয় পায়, কিন্তু মনিবের জন্যে ওরা সব পারে; মিথ্যে কথা, জাল জোচ্চুরি তো দূরের কথা খুন পর্যন্ত করতে পারে। এইটুকু যদি বুঝতে না পারলে তবে আর ব্যবসা করতে নামলে কেন? ওদের দিয়েই তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এত বড় রাজত্বটা চালাচ্ছে! ওরা ওই চল্লিশ টাকা থেকে ষাট টাকা পেলেই খুসী—তাইতেই ওরা পায়ের ধুলো নেয়, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে—সাহেবরা ওই জাতকেই বলে 'বাবু'—ওদেরই মাথায় হাত বুলিয়ে আমি করলুম চোদ্দ লাখ টাকা—আর ওকে দিই ষাট টাকা করে' মাইনে......

শশিপদর কথা শেষ হোল না, ভেতর থেকে খাবার ডাক এল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[৯]

আহতরা বর্মা স্টেট হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বর্মা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে রুগীদের সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। নেতাজী প্রতিদিন দুবেলা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক রুগীকে নিজে দেখতেন। তাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা হয়। এই দুর্দশা দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হন। তিনি নিজে কোনও-দিন কিছুমাত্র ভীত হননি। বিমান আক্রমণের সময় তিনি কদাচিৎ ট্রেঞ্চে যেতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বৃটিশের এমন কোনও গোলাগুলী তৈরী হয়নি, যার দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটতে পারে।' কি অসীম দেশভক্তি ছিল তাঁর। হৃদয়ে কি অসীম বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। তাঁর মতো মহান্ ব্যক্তিকে নেতারূপে পেয়ে ভারতবাসী ধন্য হয়েছে। তাঁর নিজের অসীম বিশ্বাস তিনি অপরের হৃদয়েও আরোপ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে এতো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রায়ই বলতেন,

"The power which could not prevent me to come out of India, cannot, prevent me to go back to India.

অর্থাৎ "যে শক্তি ভারত থেকে আসার পথে আমাকে বাধা দিতে পারেনি, সেই শক্তি আমাকে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথেও বাধা দিতে পারে না।" তাঁর এই বাণী আমাদের সৈন্যদের কাছে দৈববাণীর মতোই ছিল। তাইতো প্রত্যেকের প্রাণে যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছে, যে অসীম বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে এসেছে, তা নষ্ট হতে পারে না। নেতাজীর বাণী—এ যে দৈববাণী, নেতাজীর আদেশ—এ যে দেবতার আদেশ।

আমরা ফ্রণ্টে ছিলাম; কাজেই খবরের কাগজে সব খবর পেলেও আজ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সব খবর শুনে বুঝতে পারলাম, প্রকৃত ব্যাপারটা কতো ভয়ংকর। এই সমস্ত ঘটনার সময় ও পরে আমাদের রাণী ঝাঁসি রেজিমেণ্টের নার্সিং মেয়েরা যে বীরত্ব ও যোগ্যতা দেখিয়েছেন,• তা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। তাঁদের আপ্রাণ সেবাই আমাদের বহু রুগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দান চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জিয়াওয়াদীতে বস্তির পাশে অনেকগুলি আমবাগান ছিল। আমরা তার মধ্যেই কুটীর বেঁধে বাস করতাম। প্রায় প্রত্যেক বস্তিতেই আমাদের পঞ্চাশ-ষাট জন করে লোক থাকত। তারপর বাগানে থাকাতে বিমান থেকে আমাদের কেউ দেখতে পেত না। আমরা দিনের বেলা পথে বিশেষ চলাচল করতাম না। বেশির ভাগ বাইরের কাজই রাতে চলতো। গাছগড় হাস-পাতালের আমার পুরাতন বন্ধু লেঃ অর্ধেন্দু মজুমদারও কাজ করতো। এখানকার 'এরিয়া কম্যাণ্ডার' তখন কর্ণেল পি এন দত্ত। দুনম্বর হাসপাতাল, যেটি মনেয়াতে কাজ করতো, তার এখন কাজ বন্ধ। এখানে আজাদ হিন্দ দলের বহু লোক ছিল। তাদের কাজ ছিল—গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাটকা শাকসব্জী, ডিম ও দুধের ব্যবস্থা করা। এখানে প্রত্যেক গ্রামেই অনেক গরু ও মহিষ ছিল। রুগীদের জন্য প্রত্যহ অনেক দুধ কেনা হত।

নদীর তীরে নাসিলং নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানকার 'তাজি' অর্থাৎ সর্দারের সঙ্গে আমাদের বেশ জানাশোনা ছিল। আমাদের সেখানে যাওয়ার জন্য সে আমাদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতো। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা প্রায় দশজন ডাক্তার সেখানে বনভোজনের জন্য যাত্রা করি। জ্যোৎস্না রাত্রিতে গরুর গাড়িতে করে গ্রামে পেঁছিলাম। সর্দার আমাদের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করেছিল। আমরা রাতে সেখানে ঘুমালাম। সকালে নদীতে-ধরা টাটকা মাছ যথেষ্ট পাওয়া গেল। দলে আমরা প্রায় বেশির ভাগই ছিলাম বাঙালী। কাজেই টাটকা মাছ আমাদের কাছে পরম লোভনীয়। মাংস রাঁধলেন আমাদের কর্ণেল গোস্বামী। সকলে মিলেমিশে আর সব রান্না করা হল। খোলা পল্লীতে আমরা একসঙ্গে বহুদিন পরে আবার একটি পিকনিক বিশেষভাবেই উপভোগ করলাম। ফিরে এলাম সন্ধ্যার একটু আগে। অবশ্য আসবার সময় কিছু মাছ আমরাও সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। রাতে তিওয়ারী রকে মেজর চক্রবর্তীর কাছে খাওয়ার পর্বটা শেষ করে যে যার নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

এমনিভাবেই আমাদের এখানে দিন কাটছিলো। কয়েক ঘর বাঙালীও এখানে সপরিবারে বাস করতেন। এঁরা সকলেই আগে চিনির কলে কাজ করতেন। আমি যে গ্রামে থাকতাম তার কাছেই ছোট একটি নদী। নদীর ওপারেই 'ফিউ' নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামটিতে জাপানীদের অনেক রাশন ছিলো; বৃটিশ এ খবর জানতে পারে। কাজেই রোজ তিনচারবার করে এখানে বিমান আক্রমণ হোত। এই বিমান আক্রমণ এমন ধারাবাহিক কাজে পরিণত হয়েছিলো যে, এদিকে বিমান দেখলেই আমরা জানতাম তারা 'ফিউ'এর উপর আক্রমণ চালাবে।

তখন আমাদের দু'নম্বর ডিভিসন পোকোকুর ওদিকে যুদ্ধ করছে। শুনলাম, আমাদের কয়েকজন অফিসার নাকি এদিক থেকে পালিয়ে বৃটিশ পক্ষে যোগদান করেছে। এর কিছুদিন পরেই নেতাজীর একটি আদেশপত্র আসে। তাতে লেখা ছিলো, আমাদের কয়েকজন অফিসার বৃটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছে। আমার সৈন্যদের কাছ থেকে আমি এইরূপে কাজ মোটেই প্রত্যাশা করি নি। আমি প্রথমে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করি নি। জীবনে আমার অধিকাংশ সময়ই কারা অন্তরালে কেটেছে। সে জীবন যে কতোটা দুঃসহ তা আমি নিজে উপভোগ করেছি। সুতরাং আমার কোনও অফিসার বা সৈন্যকে আমি সেই দুঃসহ কষ্ট দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে বিশেষ দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বিশেষভাবে কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। আমার বাহিনীতে আমি এমন কোনও লোক চাই না, যারা সুযোগ পেলে অপর পক্ষে যোগদান করতে পারে। সুতরাং আমি জানাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরভিনয় না হতে পারে, তারজন্য সব প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। আমার প্রকৃত দেশভক্ত সৈনিক ও অফিসারদের জানাচ্ছি, তাঁরা যদি এমন কোনও সন্দেহভাজন লোককে দেখেন যে, অপরপক্ষে যোগদান করতে পারে, তাহলে, জানবেন তার ব্যবস্থা হবে চরম শাস্তি মৃত্যু। এই মৃত্যুদণ্ডের জন্য কোনও আদালতের দরকার হবে না, যে-কোনও দেশভক্ত, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মারতে পারে। এই আদেশ প্রত্যেককে প্রত্যহ শুনানো হবে। তারপর দিনস্থির করে, যারা পালিয়েছে সেই সমস্ত লোকদের প্রকাশ্য সভায় নানাভাবে অপদস্থ করা হবে।—তাদের প্রতি-মূর্তি তৈরী করে তাতে আগুন দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার আয়োজন হবে।

নেতাজীর আদেশ মতো নানাস্থানে পলাতক অফিসারদের খড়ের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাতে আগুন দেওয়া হয়। প্রত্যেককে বিশেষ-ভাবে প্রতিদিন 'রোল কলে' শুনানো হয় নেতাজীর এই আদেশ।

এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। যুদ্ধের অবস্থা ততো সুবিধে নয়, বৃটিশ সবেগে এগিয়ে আসছে। আমাদের রেজিমেণ্ট পরাজিত হয়েছে। বৃটিশ শুনেছি প্রায় টাঙ্গুর কাছাকাছি এসে পড়েছে। তখন কথা উঠলো আমাদের এখানকার লোকেরা যুদ্ধ করবে কি না? এখানে আমরা সবশুদ্ধ প্রায় তিন হাজার ছিলাম। তার মধ্যে হাজারখানেক রুগী, প্রায় পাঁচশো হাসপাতালের লোক ও প্রায় পাঁচশো আজাদ হিন্দ দলের লোক। পরে শুনলাম, নেতাজীর আদেশ—এখানে যুদ্ধ হবে না, আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ আমরা বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবো না, অনর্থক লোক ক্ষয় হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এইরূপ অবস্থা। এপ্রিলের আঠারো তারিখে দুপুরের দিকে প্রায় বাইশখানা 'ডবল বডি' বিমান দেখা গেলো। প্রথমে ভাবলাম তারা 'ফিউ' যাবে কিন্তু দেখা গেলো তারা চিনির কলের কাছাকাছি হঠাৎ নীচে নেমে বোমা ফেলতে সুরু করলো। স্টেশনের কাছাকাছি কয়েকটা বড় বড় ধানের গুদামে আগুন লাগলো। অল্প কিছুক্ষণ মেসিনগান চালানোর পর বিমানগুলি চলে গেলো। অনেকেই ছুটে গিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তা সম্ভবপর হল না। গুদামের ধান সব পুড়ে গিয়েছে। সেই বিমান আক্রমণের সময় দু'নম্বর হাসপাতালের মেজর রঙ্গচারী চিনির কলের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ছিলেন। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তৎক্ষণাৎ বোমার একটি বিরাট টুকরো তাঁর দেহকে একেবারে দু'টুকরো করে প্রায় একশো গজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে। কাছাকাছি একটি ট্রেঞ্চে চাপা পড়ে একটি বাঙালী ভদ্রলোকও সেদিন মারা যায়। তা ছাড়া কয়েকজন সিভিলিয়ান আহত হয়। মেজর রঙ্গচারী মারা যাওয়াতে আমরা সকলেই শোকাভিভূত হয়ে পড়ি, কারণ তিনি সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন। যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি মারা যান, তিনি এখানকার চিনির কলে কাজ করতেন। তিনি মারা যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী পাঁচটি শিশু সন্তানসহ একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। মিলের ম্যানেজারের সাহায্যে তাঁদের কিছু বন্দোবস্ত হয়।

এই ঘটনার পরই একদিন রাতে একটি বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। নদীর প্রায় তীরের কাছ দিয়ে আমাদের রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছিলো। তারা চারটী গোরুর গাড়ী ও কয়েকজন বর্মীকে রাইফেল হাতে যেতে দেখে। তখন বর্মী সৈন্যরা এমনিধারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো কতকটা ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। তবুও রক্ষী প্রথম বর্মীকে আটকায়। তাকে প্রশ্ন করায় সে জানায় সে বর্মাবাহিনীর একজন সৈন্য। তখন আমাদের রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের সঙ্গে কোনও অফিসার আছে কিনা। যদি থাকে তাকে ডাকতে ও আমাদের রক্ষীদলের কম্যাণ্ডার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। তখন বর্মীটি তাদের অফিসারকে ডেকে আনে। তাকে দেখতে ঠিক গোরার মতো কাজেই, আমাদের রক্ষীর সন্দেহ হল। বর্মী ও অফিসারটি আমাদের অফিসারের কাছে আসে। অফিসারটি বলে, সে বৃটিশ অফিসার। তখন আমাদের অফিসারটি তাদের দুজনকেই ধরে বেঁধে ফেলতে বলে। বাইরে আর যে বর্মীরা ছিলো তারা ব্যাপারটা সন্দেহজনক বুঝতে পেরে মেসিনগানের গুলী চালাতে সুরু করে। আমাদের পক্ষ থেকেও তখন গুলী ছোড়া হয়। বর্মীরা গরুর গাড়ি ও মেসিনগান ফেলে পালিয়ে যায়। আমাদের পক্ষে তিনজন মারা যায় ও পাঁচ সাতজন গুরুতররূপে আহত হয়। সেই বৃটিশ অফিসার ও বর্মীটিকে ধরে এরিয়া কম্যাণ্ডারের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাদের জাপানীদের কাছে পেঁছে দেবার জন্য স্থানীয় পুলিশের হাতে দেন। পরে শুনলাম তারা পালিয়ে গিয়ে আবার বৃটিশের সঙ্গে মিলিত হয়। এই বৃটিশ অফিসারটি কাছাকাছি পাহাড়ে রেডিও নিয়ে 'গেরিলার' মতো গুপ্তচরের কাজ করতো। এখানকার বর্মীদের বহু টাকা পয়সা দিয়ে তাদের হস্তগত করে। 'ফিউ'য়ে যে বিমান আক্রমণ হয় শোনা যায় এটী তারই নির্দেশে। মাঝে মাঝে একটি বিমান সন্ধ্যার একটু আগে খুব আস্তে আস্তে আকাশে ঘোরাঘুরি করতো। আমরা ভাবতাম হয়তো 'রেকি প্লেন' কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম নীচের থেকে খবর ধরবার জন্য এটী ঘোরাফেরা করতো। পালাবার সময় বর্মীরা গরুর গাড়িগুলি ফেলে পালায়, তাতে মেসিনগান, রেডিও সেট, বিস্কুট প্রভৃতি ছিলো।

বৃটিশ টাঙ্গু পেঁছে গেছে। দূরত্ব এখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল। আমাদের এখানে পেঁছতে খুব বেশী দেরী হবে না। আমরা আত্মসমর্পণ করলে আমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হবে তাই নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা সুরু করলাম। অবশ্য আমরা ভালো কোনও ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসমর্পণের একেবারে বিরুদ্ধে। তারা বলে, যখন একবার অস্ত্র গ্রহণ করেছি তখন তা ছাড়বো না। হোক নেতাজীর আদেশ। অনেক করে অনেকে আবার বুঝতে লাগলো। কিছু লোক আত্মসমর্পণ করার চাইতে মৃত্যু শ্রেয় ভেবে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। আবার কেউ কেউ খুব ভীত হয়ে পড়েছে যে ওদের হাতে ধরা পড়লে যা ব্যবহার করবে তা হবে অসহনীয়। প্রকৃতপক্ষে,—প্রত্যেকেই এক অনাগত অবস্থার জন্য বিশেষ-ভাবে বিচলিত। অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রত্যেকেই অপেক্ষা করতে লাগলো বৃটিশের আগমন।

চব্বিশে এপ্রিল ১৯৪৪ ঃ—বৃটিশ এগিয়ে আসছে। কাল শুনেছি এখান থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে আছে। কাজেই, আজ যে এখানে এসে পেঁছাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাসপাতালের কাজ যেমন চলছিলো তেমনি চলতে লাগলো। গ্রামবাসীরা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। আমাদের সকলেই বিষাদমগ্ন। জীবনে এমন দিন যে আসবে তা কেউ কল্পনা করে নি। ভেবেছিলাম আমাদেরও হবে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের তাই এই দুটির একটিও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হোল না। ধন্য তারা—যারা দিল্লীর পথে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্তত আজকের এই গ্লানি, এই অবমাননা তাদের সহ্য করতে হল না।

সকাল থেকেই কয়েকখানা প্লেন সারিবদ্ধ হয়ে রাস্তার উপর পাহারা দিতে লাগলো। তখনই বুঝতে পারলাম বৃটিশের অগ্রগতি সুরু হয়েছে। আমরা আমাদের কম্যাণ্ডার সাহেবের আদেশমতো ইউনিফরম পরে যার যার জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা প্রায় একটার সময় কয়েকটি ট্যাঙ্ক সোজা রাস্তা ধরে 'ফিউ'-এর দিকে এগিয়ে গেল। মাঝে কয়েকটি মেসিনগানের গুলীর আওয়াজ শুনলাম। 'ফিউ'-এ কিছু অসুস্থ জাপানী ছিলো, নদীর এপারে কোনও জাপানী ছিলো না। নদীর পুল ভাঙ্গা, কাজেই সন্ধ্যার আগে বৃটিশ পুল তৈরীর কাজে লেগে গেলো। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় অনেকগুলি ট্যাঙ্ক, ও সাঁজোয়া গাড়ি গ্রামের মাঝে ঢুকে পড়লো। এরা সকলেই বৃটিশ ভারতীয় সেনাদল। আমাদের কাছে এসে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে দু'চারটি প্রশ্ন করে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় শুনলাম বৃটিশের ডিভিসন হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের এখানকার উচ্চপদস্থ অফিসারকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখানে বেশীর ভাগই রুগী, আর আমাদের হাসপাতাল কাজ করছে বলেই হাসপাতালের তরফ থেকে মেজর থান ও মেজর পুরী অন্য দুজন অফিসারের সঙ্গে ডিভিসন হেড-কোয়ার্টারে গেলেন। আমরা স্বস্থানেই রইলাম আদেশের অপেক্ষায়।

মন কারও ভালো ছিলো না। কাজেই রান্না হয়নি। আমরা আমাদের এই দুঃখের দিনে চোখের জল রাখতে পারলাম না। বিরাট আশা, হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সবই আজ অনায়াসে মাটীতে মিলিয়ে গেলো। —(ক্রমশ)

—দশ—

ঘুম ভাঙতেই মণিকাদি তন্দ্রাজড়িত চোখে একবার সামনের সেলফের দিকে তাকালেন। টাইমপীসটা নির্ভুল নিয়মেই চলছে, যুদ্ধের এত বিড়ম্বনার মধ্যেও ওর কোন ব্যতিক্রম নেই। ঘরের ভেতর প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে—সকালটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হল।

ঘড়ির কাঁটা বলছে সাড়ে সাতটা। ...নে হতে আর এক ঘণ্টা সময়—নটার সময় ডিউটি দিতে হবে হাসপাতালে। মনটা বিরক্তিতে কালো হয়ে গেল। অভ্যাসবশেই ডাকলেন : খসরু !

ডাকটা আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়ল শূন্য ঘরের মধ্যে। তন্দ্রার শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর নির্মম সত্যটা সূর্যের আলোর মতোই প্রতিভাসিত হয়ে উঠল। খসরু নেই—খসরু পালিয়েছে। সম্রাট সাজাহানের শূন্য তখৎ-ই তাউস অধিকার করবার জন্যেই বোধ হয় চটপট উঠে পড়েছে দিল্লী এক্সপ্রেসে। অতএব—

অতএব জীবনটা একেবারে নীরস। শুধু নীরস নয়, মরুভূমি এবং সাহারা মরুভূমি। আপাতত এই মুহূর্তে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে একপেয়ালা চায়ের জন্যে। খসরু থাকলে এখন কী আর ভাবনা ছিল ? দরজায় এতক্ষণে কড়া নড়ে উঠত, খসরুর আদেশ আসত : চটপট উঠে পড়ুন দিদিমণি, জল চাপিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেত পাশের ঘরে স্টোভের গর্জন, নাকে আসত খিদে-চালানো মাখন-মাখানো ভালো টোস্টের গন্ধ। তড়াক করে মণিকাদি উঠে পড়তেন, নিশ্চিন্ত আরামে মন বলে উঠত : আঃ !

কিন্তু—কিন্তু এখন সেসব স্বপ্ন। যুদ্ধ মানুষের অনেক স্বপ্নকেই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, করুক—মণিকাদির আপত্তি ছিল না। কিন্তু আক্রমণটা তাঁর ঘাড়ের ওপরে কেন ? উঃ—খসরু ! ব্যাটার মনে-মনে এই ছিল। এত করে খাইয়ে-দাইয়ে—এত আদর-যত্ন করে—শেষে এই কাণ্ড। নাঃ—পৃথিবীটা ভালো লোকের জায়গা নয়। সব কৃতঘ্ন—সব বিশ্বাসঘাতক।

এমনকি ঘড়িটাও। যেন ঘোড়ার মতো চলেছে। একটু দাঁড়ানা বাপু। মোটা মানুষ, একটু হাঁফ ছাড়তে দে। কিন্তু ছাড়তে দিচ্ছে কই। দেখতে দেখতে পাঁচ-পাঁচটা মিনিট উড়ে গেল হাওয়াতে। আর দেরি করা চলে না।

মণিকাদি কম্বলটা আস্তে আস্তে সরালো গায়ের ওপর থেকে। অসম্ভব আশায় একবার অভ্যাস মতো তাকালো রান্নাঘরের দিকে। পৃথিবীতে কত মির‍্যাকলই তো ঘটে, কিন্তু এমন একটা কিছু কি ঘটতে পারে না ? বিবেকের দংশনে মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে খসরু। হঠাৎ তার মনে হয়েছে দিদিমণিকে এমন বিপন্ন অবস্থায় ফেলে আসা গুরুতর নৈতিক অপরাধ। আর সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে সে, লাফিয়ে উঠে পড়েছে উজানমুখী গাড়িতে। তারপর ভোর বেলা এসে নেমেছে হাওড়াতে, সোজা চলে এসেছে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের এই বাড়িতে, ঢুকেছে রান্নাঘরে, কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে ডাকছে : দিদিমণি—

কিন্তু বৃথা। কলিযুগে মানুষের বিবেক নেই—মির‍্যাকল-এর দিনও ফুরিয়ে গেছে অনেককাল আগে। সুতরাং রান্নাঘর শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। স্টোভের শব্দ আসছে না, আসছে না পেট আর প্রাণ-জুড়ানো মাখন-মাখানো টোস্টের গন্ধ। শুধু শীতার্ত ঘরটার ভেতরে রাত্রিচর ইঁদুরের গায়ের গন্ধ যেন জমাট ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘনীভূত আর বিস্বাদ হয়ে আছে।

মোটা মানুষ মণিকাদি উঠে পড়ল। একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিলে গায়ে। আগে চা-টা করে নিয়ে তারপর যেমন করে হোক সেদ্ধ-ভাত একটা চাপিয়ে দিতে হবে। নটার সময় ডিউটি, ভুললে চলবে না কোন উপায়েই।

শুধু একটা সান্ত্বনা : বাঁকুড়ার ঝি-টা পালায়নি এখনো। তিনকুলে কেউ নেই, পালাবার জায়গাও নেই। তাছাড়া অন্য পেশাও তার আছে বলে মণিকাদির সন্দেহ হয়। একমাত্র সেই আছে, কলতলায় বাসন মাজছে ছরছর করে। ও পালালেও মন্দ হ'ত না। সুখের পাত্রটা একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠত।

গজগজ করতে করতে মণিকাদি স্টোভ ধরালো। বহু পরিশ্রমে কাপ-পেয়ালা জড়ো করলে একসঙ্গে, খুঁজে আনলে চা-দুধ-চিনির কৌটো। তারপর চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগল : আর কতদিন এভাবে বিড়ম্বনা সহ্য করা যায় ! নাকি এবারে পালাতেই হবে কলকাতা থেকে ?

কিন্তু সুখ মণিকাদির কপালে ছিল না। দরজার কড়া নড়ে উঠল। হঠাৎ মণিকাদির হৃৎপিণ্ডটা উছলে উঠল একবার। খসরু ফিরে এল নাকি ? আহা তা যদি হয়—

কড়া নড়ছে। নাঃ খসরুর চেনা-হাতের মিষ্টি কড়া নাড়া এ নয়। অত সুখ ভগবান কপালে লেখেন নি। নিশ্চয় পেসেণ্ট। কপালের ওপরে বিরক্তির রেখাগুলো সংকুচিত হয়ে উঠল অর্ধবৃত্তের আকারে।

—দাঁড়ান আসছি—

এক চুমুকে বাকী চা-টা গিলে নিলে মণিকা। স্কার্ফটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে গায়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিলে এক মিনিটে। শাড়ি বদলাবার আর সময় নেই, সভ্যতা ভব্যতাও রসাতলে গেল মনে হচ্ছে।

দরজাটা খুলল মণিকা। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়ে নয়—হতভাগা হাড়-জ্বালানো মেয়ে। সুমিতা মৈত্র।

—ওঃ, তুই। কী মনে করে রে ?

—দর্শন দিতে এলাম।

—দরকার নেই দর্শনে।

সুমিতা ফেরবার জন্যে পা বাড়ালো : চলে যাব নাকি ?

হতাশভাবে মণিকাদি বললে, লাভ কী। একটু পরেই তো আবার আসবি জ্বালাতন করতে। তার চাইতে ঘরে আয় বাপু, বোস। যা বকবক করার ইচ্ছে থাকে করে যা।

সুমিতা হাসল : বাঃ, কী চমৎকার অভ্যর্থনার ভাষা। মণিকাদি, জন্মাবার সময় তোমার মুখে কী দিয়েছিল বলতে পারো ? নিশ্চয় মধু নয় ?

—না, কুইনাইন।

—তাই দেখতে পাচ্ছি। সেই কুইনাইনের জোরেই ডাক্তার হয়েছ তো ? শিখেছ লোককে গাল দেবার তৈরি আর চোস্ত বুলি ?

—তর্ক করিসনি সুমি—ভেতরে আয়। আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হসপিট্যাল ডিউটির সময় হয়ে গেল।

দুজনে চলে এল ভেতরে। সুমিতা বললে, দিব্যি চায়ের গন্ধ বেরিয়েছে তো। নিশ্চয় একা খাচ্ছ না মণিকাদি ?

—নিশ্চয় একা খাচ্ছি। সখ থাকে বানিয়ে নাও নিজের জন্যে।

—তাতে আপত্তি নেই—সোৎসাহে সুমিতা কেটলিটা স্টোভে চাপালো।

—আর শোন্ সুমি—মণিকা আদেশ দিলে : আমার জন্যে দুটো ভাত আর ডিম-সেদ্ধ বসিয়ে দিস তো লক্ষ্মীটি। এক্ষুণি খেয়ে বেরুতে হবে।

চা নিয়ে এল সুমিতা। আরাম করে বসল মণিকাদির ডেক-চেয়ারে। বললে নাঃ মুখটা তোমার যেমনই হোক না মণিকাদি, আতিথেয়তাটা ভালো। লোক তুমি নেহাৎ মন্দ নও দেখতে পাচ্ছি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন

প্রসাধন শুরু করেছে মণিকা। ভ্রুকুটি করে বললে, তোমার সার্টিফিকেটে আমার দরকার নেই। কিন্তু মতলব কী সেইটে আগে বলো দেখি। বিনা কাজে তো পা দাও না। আজ প্রায় সাত দিনের মধ্যে টিকিটিও দেখতে পাইনি।

—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম মণিকাদি। নতুন সংসার পেতেছি—তার দায়িত্ব কত, সে তো জানো।

—সংসার ?

সবিস্ময়ে হাঁ করলেন মণিকাদি ঃ তোর আবার কিসের সংসার রে ?

—বাঃ, সেই চারতলা বাড়িটা? বিনা পয়সাতে অত বড় একখানা বাড়ির মালিক হলাম, সেটা কি খালি পড়ে থাকবে নাকি? সংসার গুছিয়ে নিতে হবে না ?

—সংসার গুছিয়ে নিলি? বর পেলি কোথায় ?

—বর জুটল না—হঠাৎ সুমিতার প্রসন্ন হাসিটা যেন ম্লান হয়ে এল; কিন্তু বর না থাকলেই কি আর সংসার হয় না ? একবার গিয়ে দেখে এসো না—দেখলে আর ফিরতে চাইবে না।

—দরকার নেই দেখে—ঐকান্তিক তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করলে মণিকা ঃ কতগুলো বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়ে জুটিয়ে নিয়ে ওখানে পলিটিক্স করছিস তো ? সবশুদ্ধ একদিন জেলে যাবি, এই একখানা কথা বলে রাখলাম।

সুমিতা বললে, তা তো যাবই। কিন্তু তুমি অ্যাপ্রুভার হয়ো, গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না—বরং পরকালের কাজ হয়ে যাবে।

কী ভেবে হঠাৎ মুখ ফেরালো মণিকা।

একটা কথা শুনবি সুমিতা ?

—কী কথা ?

—বল, শুনবি কথাটা ?

সুমিতা হেসে ফেলল ঃ মুখ অত গম্ভীর করছ কেন ? ভাবটা যেন বলে ফেলবে আমার সাসপেক্টেড্ টি-বি'র লক্ষণ দেখেছ।

—না ঃ, ঠাট্টা নয়। —মণিকার মুখে গাম্ভীর্যের মেঘ তেমনি ঘন হয়েই রইলঃ আমার কথাটা শোন্। বিয়ে করে ফেল।

—বিয়ে ! —সুমিতার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এমনভাবে চমকে উঠল যে, আর একটু হলে হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটাই আছড়ে পড়ত ঝনঝন করে।

—হ্যাঁ, বিয়ে। এসব করে কোন লাভ নেই।

জোরে—অনেকটা যেন জোর করেই সুমিতা হেসে উঠল ঃ মণিকাদি কি আজকাল ডাক্তারী ছেড়ে ঘটকালির পেশা নিয়েছ নাকি? কিন্তু আমাকে ঝুলাবার চেষ্টা করছ কেন ? নিজের ইচ্ছে হয়ে থাকে বলো, আমি পাত্র জুটিয়ে আনি।

—বয়েস নেই, থাকলে তোর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতুম না। কিন্তু তোর তো সময় যায় নি। শোন্ সুমি, এর পরে যেদিন ক্লান্ত হয়ে উঠবি, সেদিন বুঝবি কী হারালি জীবন থেকে।

সুমিতা বললে, তোমার উপদেশ মনে থাকবে। কালই কাগজে বিজ্ঞাপন দেব পাত্র চাই বলে। দেখি কোন্ ময়ূর-চড়া কার্তিক বরমাল্য নিয়ে আসে আমার জন্যে।

মণিকাদি বললেন, আচ্ছা, বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

কিছু না। কিন্তু আমার এমন কপাল মণিকাদি—বর আর ধরা দিল না, ছিটকে পালিয়ে গেল। তাইতো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—অলিতে-গলিতে, আলোয়-অন্ধকারে। যদি কোনদিন ধরা দেয়, তুমি খবর পাবে বৈকি। কিন্তু এ যাত্রা বোধ হয় নিতান্তই শ্মশান-বাসর।

সুমিতা হঠাৎ উঠে পড়ল ঃ দেখি তোমার ভাতটা হয়ে গেল কিনা।

ভাত কিন্তু সত্যিই হয়নি। চড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাত যে ফোটে না, একথাটা মণিকাও জানে, সুমিতাও জানে। তবু সুমিতা সরে এল—পালিয়ে এল। কাল সারারাত মনের মধ্যে ঘুরেছে রমলা আর বাসুদেবের কথা। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু বুক ফেটে মরে গেলেও অনিমেষ ফিরে তাকাবে না। ফুলের মধ্যে তার বজ্র লুকিয়ে আছে।

অন্যায় হচ্ছে—অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছে এলোমেলো ভাবনাগুলো। এ উচিত নয়, একে দমন করা দরকার। চারতলা বাড়ির অত বড় সংসারের মধ্যেও মনটাকে সে তলিয়ে দিতে পারছে না, থেকে থেকে বিদ্রোহ করে উঠছে। সেকি দুর্বল—রমলার চাইতেও দুর্বল।

আজ সকালে সে কেন ছুটে এল মণিকাদির এখানে ? কী প্রয়োজন ছিল ? এইখানেই অনিমেষের সঙ্গে তার শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল বলে? সাতদিন হতে চলল আদিত্য-দার কোন খবর নেই, অনিমেষেরও না। সে কি অবচেতন মনের ভেতর থেকে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এখানে এলেই ওদের কিছু একটা খবর পাওয়া যাবে ? হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অভিশপ্ত, অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল সুমিতার। এগোতে পারছে না, পিছিয়ে যাবারও উপায় নেই। একি বিড়ম্বনা পেয়ে বসল তাকে ?

হঠাৎ মণিকাদির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। সুমিতা শুনতে পেল, মণিকা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। তার পরেই তীব্র উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠায় মণিকা ডাকলে, সুমি !

সুমিতা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। সমস্ত চেতনাটা চকিত হয়ে উঠেছে। টেলিফোনে কার খবর এল কে জানে। আদিত্যের, না অনিমেষের ?

—কী হল মণিকাদি ?

—একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ আছে সুমি।

সুমিতার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল, বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। কথা বলতে পারল না, শুধু মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বলভাবে।

—শীলা আফিং খেয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছে আমাকে।

মনের ভেতর থেকে ভয়ের গুরুভার পাথরটা নেমে গেল, কিন্তু জেগে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। সুমিতা বললে, শীলা? কোন্ শীলা?

—আমাদের শীলা রে। সেই যে শশাঙ্ক লাহিড়ীর—

—বুঝতে পেরেছি। —সুমিতার গলায় বেদনার সুর ফুটে উঠল ঃ কিন্তু অমন শান্ত-শিষ্ট মেয়েটা আফিং খেতে গেল কেন? শশাঙ্ক কী করছে ?

—শশাঙ্কের কোন খবর নেই।

—খবর নেই ?

—না, পালিয়েছে। কলকাতায় বোমা পড়বে—সেই ভয়ে আগে থাকতেই তার দামী দুর্মূল্য জীবনটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতা। দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। শশাঙ্ক লাহিড়ী পালিয়েছে। বীরের মতো অসবর্ণ বিয়ে করে বাপের অত বড় সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে সমাজে একটা আদর্শ স্থাপন করেছিল শশাঙ্ক। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে এবং এই যুদ্ধের সুযোগে শশাঙ্ক সে-সীমাটাকে বুঝে ফেলেছে। বহু কষ্টে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ থেকে সংগ্রহ করা দামী দুর্মূল্য প্রাণ। তাকে এত সহজে হারালে চলবে না, বরং জীইয়ে রাখলে ভবিষ্যতে অনেক শীলা আসবে। কারণ শশাঙ্কের রূপ আছে, শশাঙ্কের টাকা আছে এবং শশাঙ্কের অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে।

সুমিতা হঠাৎ হেসে উঠল।

—যাক, বিবাহিত জীবনের চরম পুরস্কার পেল শীলা। এর পরে আমার পত্রপাঠ বিয়ে করে ফেলা উচিত, কী বলো মণিকাদি ?

মণিকা কথা বললে না, ব্যথায় সমস্ত মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার পরেই পায়ে গলিয়ে নিলে একটা স্যাণ্ডাল, হাতে তুলে নিলে তার ডাক্তারী ব্যাগটা।

—একবার যাবি সুমিতা ? দেখে আসবি ?

—চলো। বাঁচবে তো ?

জানি না। ওরা স্টমাক পাম্প দিয়েছিল, কিন্তু বেশি তুলতে পারে নি। অনেকটাই কনজিউম করে ফেলেছে তার আগে। মরুক, ওর মরাই ভালো—। অনেক কষ্ট পেয়েছে, এবার রক্ষা পাবে।

(ক্রমশ)

শিশুমঙ্গল

মানসিক শক্তি ও শিশু-পালন

বিভাস রায়

যথার্থরূপে শিশু পালন করবার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী সে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। ছোটরাই হল ভবিষ্যৎ জাতির উপাদান, এদের অবহেলা করে গড়লে ভবিষ্যৎ জাতিকে, ভবিষ্যৎ সমাজকে অবহেলা করে নষ্ট করা হবে। অথচ এদের মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুললে ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনে আসবে সুখ ও শান্তি, গড়ে উঠবে সমাজের মেরুদণ্ড। শিশুদের বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নতি ও সমাজ সংস্কার করতে যাওয়ার মানে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

আমাদের দৈনিক জীবনের অনেক দুর্বলতা, ভয়, ছোট বড় বহু স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধি শুরু হয়, শিশুকালে যথারীতি গড়ে তোলার অভাবে। সামান্য অবহেলা ও অজ্ঞতা প্রাপ্তবয়সে নানাবিধ অসামাজিক ব্যবহার ও রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছোট বয়সে জ্ঞান, বুদ্ধি, উৎসাহ ও উদ্যমের যে প্রদীপ শিশুর অন্তরে জ্বলে—ইন্ধন অভাবে, অভিভাবকের অবহেলা, অজ্ঞতা ও অসাবধানতার ঝটিকায় তার শিখা নির্বাপিত হয়—অথচ সযতনে রক্ষা করলে সেই প্রদীপের আলো শত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবন আলোকিত করতে পারে। নিউরাসথেনিয়া, হিস্টিরিয়া থেকে আরম্ভ করে মস্তিষ্কবিকৃতি পর্যন্ত নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির কারণ অনেক সময় ছোটবেলায় অসাবধানতায় মানুষ করা।

ছোটদের জন্মগত প্রতিভা বা বিশেষত্বকে অবজ্ঞা করে ইচ্ছেমত গড়ে তোলার স্পৃহা অনেক পিতামাতাকে পেয়ে বসে, তাঁরা প্রায়ই 'শাসন' নামে এক নির্দয় অস্ত্রের দ্বারা কোমল মতির শিশুকে মানুষ নামে এক পদার্থ গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এতে শিশুর যা মানসিক ক্ষতি হয় তা পরবর্তী জীবনে আর সংশোধন করা সম্ভব হয় না। 'মানুষ' করতে গিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুকে 'অমানুষ' বা দুর্বল, বদমেজাজী অথবা একগুঁয়ে করে তোলা হয়। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব, কিন্তু বদ্ধমূল মানসিক ব্যাধি প্রায়ই চিকিৎসার সীমা পার হয়ে যায়।

পিতামাতার কর্তব্য শিশু পালনে মনোযোগী হওয়া। তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সঞ্চয়ের জন্য সচেতন থাকা। জাতি গঠন করার দায়িত্ব তাঁদের ওপরেই, যাঁরা শিশুদের মানুষ করে তুলবেন। এ-কাজে মায়ের সাহায্যই বেশী প্রয়োজন, কারণ শিশু মাকেই অনুকরণ করে—মার সুষ্ঠুরূপে শিশু পালন করতে হলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ বা আধুনিক ভদ্রতার এক ভেজাল আবরণ থাকলেই চলবে না—শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে, তার মনস্তত্ত্ব জানতে হবে—শারীরিক তথ্য জানতে হবে—খাদ্যাদি নিরূপণের বিজ্ঞানসম্মত উপায় জানতে হবে। মায়ের সমাজের তথা জাতির প্রতি গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শিশুর যে একটা প্রয়োজনীয় মানসিক দিক আছে ও ভবিষ্যৎ মনের বিকাশ ও শক্তি যে নির্ভর করে শিশু-জীবনে গড়া মনের ওপর, এ সত্য অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু একটি শিশুকে পরীক্ষামূলক প্রখর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে তার মানসিক দিক ও তার নানা বিশেষত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

জন্মাবার সংগে সংগেই সেই মুহূর্তে শিশুর মন ও তার বোধ বা চিন্তাশক্তি গড়ে ওঠে না—তখন শিশু ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করতে সমর্থ হয় না। ইচ্ছার দ্বারা হাত, পা, মাথা, মুখ নাড়া অথবা মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতর কেন্দ্রগুলোর কাজ ঠিকমত শুরু হয় না। এই সময় যা কিছু হয় বা শিশু যা করে থাকে, তা আপনা থেকেই ঘটে—যেমন কাঁদা, চোষা বা গেলা, এসব কিছুই কোন-না-কোন উদ্দীপকের সাহায্যে আপনা থেকে ঘটে থাকে। এইভাবে প্রতিবর্তী (reflex action)-র দ্বারা আপনা আপনি কোন কর্ম করতে করতে ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত হয়। এই ঘটনাগুলিকে সাহজিক প্রতিক্রিয়া বলে।

মাথায় যে আমাদের ব্রেন আছে এবং ব্রেন যে সমস্ত স্নায়ুর কেন্দ্র তা প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। ব্রেন থেকে ঘাড় দিয়ে সোজা নীচে শিরদাঁড়ার মধ্যে নেমে এসেছে এক স্নায়ু পদার্থ তাকে বলা হয় মেরুদণ্ড (Spinal Cord)। এই মেরু-মজ্জা থেকে বহু শিরা-উপশিরা বেরিয়ে ক্রিয়া ও সংজ্ঞা-বাহক, পেশী, ত্বক বা শরীরের বিভিন্ন স্থান ও যন্ত্রপাতিতে গিয়ে মিশেছে।

মস্তিষ্ক বা ব্রেন হচ্ছে খবরাখবর নেবার সেই অনুযায়ী কাজ করাবার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের (Commander-in-Chief) সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার—এইখান থেকেই হুকুম নীচের দিকে আসে। এর পর রয়েছে এক এক দলের সেনাপতি অর্থাৎ মেরুদণ্ড—তার নীচে বহু সাধারণ সেনানায়ক অর্থাৎ কোষ (Ganglion Cell)। তার পর অসংখ্য সাধারণ সৈন্য অর্থাৎ স্নায়ুকোষ। খবর অর্থাৎ কোন সংজ্ঞা যাচ্ছে ও আসছে এই রাস্তা দিয়ে। আমাদের স্নায়বিক তন্তুর মধ্যে এই যাওয়া ও আসা অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শরীরের মধ্যে অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ সর্বদা তৈরি রয়েছে—যদি চোখ বন্ধ করে বরফে হাত লাগাই 'ঠাণ্ডা' অনুভূতি স্নায়ুকোষ থেকে নার্ভ নিয়ে এল মেরুদণ্ডে—মেরুদণ্ড থেকে এই কোষ গেল মস্তিষ্কে—তখন বুঝলাম যে বরফে হাত দিয়েছি—তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক থেকে আর এক দিক দিয়ে নার্ভ মারফৎ খবর এল 'হাত সরাও' —হাত সরালাম বরফ থেকে কারণ ঠাণ্ডা অসহ্য মনে হচ্ছিল।

ব্রেনের বিভিন্ন স্থান শরীরের বিভিন্ন স্থানের জন্য সংরক্ষিত এবং বিভিন্ন প্রকার কাজ সমাধা করে। যেমন বহু বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর জন্য ঘরে বহু সুইচ আছে—যার দ্বারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী খোলা ও বন্ধ করা যায়—মস্তিষ্কেও সেই রকম ধূসর পদার্থের পূর্বোক্ত ধরণের সুইচ বা কেন্দ্র বর্তমান। আমাদের হাত, পা, মাথা, মুখ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের জন্যে রয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্র—এদের দ্বারা চালিত হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন স্থান। দৃষ্টি শক্তির জন্যে ব্রেনে রয়েছে এক স্বতন্ত্র কেন্দ্র, এমনি বাক্‌শক্তি, শ্রবণ শক্তির জন্যেও পৃথক পৃথক কেন্দ্র আছে, এদের জন্যেই আমরা দেখতে পাই, কথা বলতে পাই, শুনতে পাই। এই সব বিভিন্ন কেন্দ্র একটা আর একটার সংগে যোগসূত্রে ঠিক রেখেছে—এদের মধ্যে যোগ রয়েছে বহু ছোট ছোট স্নায়ু-শিরার দ্বারা।

আমাদের চার পাশের বিভিন্ন আকার ও প্রকারের বিভিন্ন সামগ্রী দুনিয়ার নানা বস্তু নানা রং, নানা শব্দ, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সব কিছুর এক স্মৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়ে মানস কেন্দ্রে চেতনার উদ্ভব হচ্ছে। দুনিয়ার এই বহু প্রকার ঘটনা-প্রবাহ, খবরাখবর, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি সবকিছু ধরে

তৈরী হয়েছে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধীশক্তি ধারণা ইত্যাদি—এরাই এক সূত্রে আমাদের মনের খোরাক যোগাচ্ছে।

ধরে নেওয়া যাক্, এক নতুন মস্তিষ্ক সর্বকিছু, ধারণাবিহীন অবস্থায় আছে, কোন অভিজ্ঞতার বা স্মৃতির দাগ সেখানে নেই। আমরা বাস করছি এক স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীন ঈথরের স্রোতের মধ্যে, এরই মধ্যে সামান্য কম্পনে আমরা দেখতে পাই সামনের বস্তু, শুনতে পাই যাবতীয় শব্দ। চোখের রেটিনা বা স্নায়ু কোষের মধ্য দিয়ে ব্রেনে দেখতে পাচ্ছি তীব্র ঘূর্ণায়মান পরমাণুকে স্থিরভাবে এক বস্তুরূপে কিংবা নানা রঙে। আকাশে মেঘ ডাকছে বা গাছে পাখী ডাকছে, তাইতে বেশী বা কম বাতাসের স্রোত হয়ে কানে ধাক্কা মেরে স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রবেশ করে নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে গেলে শুনতে পাচ্ছি শব্দ। আবার হাত দিয়ে স্নায়ু কোষের সাহায্যে মস্তিষ্কে পেঁাচাচ্ছে ঠাণ্ডা, গরম, শক্ত, নরম, গঠন ইত্যাদি বোধশক্তি। এইভাবে সাদা মস্তিষ্কের পাতায় দুনিয়ার সব কিছু স্মৃতি লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলেই আমাদের প্রথম জানার অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অন্ধকার ঘরে সূর্যালোক আনতে হলে যেমন জানলা দরজা উন্মুক্ত করে দেবার প্রয়োজন হয়, এ ছাড়া সূর্যালোক আনা সম্ভব নয়, মস্তিষ্কেও ঠিক তেমনি অনুভূতি আনতে হলে—পৃথিবীকে বিভিন্ন দিক থেকে জানতে গেলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বা স্নায়ু-কোষ সজাগ করতে হবে, কারণ চোখ, কান, নাক, আঙ্গুল ও শরীরের বিভিন্ন স্নায়ু-কোষের অনুভবই হলো বদ্ধ মস্তিষ্কের দরজা জানলা। এদের কাজ না হলে ব্রেন বা মস্তিষ্কের স্মৃতি চিত্রে কিছু নেবার ও রাখবার উপায় নেই। এরাই (অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, অনুভূতি) মস্তিষ্ককে সরবরাহ করবে নানা উপাদান নানা ভাবে, তবেই মস্তিষ্ক তাদের ধরে রেখে প্রয়োজন অনুসারে কাজে খাটাবে।

পূর্বেই বলেছি যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রয়েছে—এই সংযোগের দ্বারা নানা অনুভূতির ওপর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে আমাদের স্মৃতিচিত্রকে পাকা করেছে। এই সম্বিৎ-ঐক্যই অনুবন্ধ বা association of ideas, এইজন্য সব কিছু সুসংযোগে ও সুশৃঙ্খলে সমাধান হচ্ছে। যেমন আগুন—কোন এক সময় আমরা দেখে হাত দিতেই হাত গেল পুড়ে—এর পর যখন চোখ আগুন দেখলো—পূর্বের অভিজ্ঞতা—অর্থাৎ ব্যথা অনুভবের স্থানকে স্মরণ করিয়ে দিলে আগুনে হাত দেওয়ার পরিণাম—পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমরা আগুনে হাত দেওয়া থেকে বিরত হ'লাম। এইভাবে দৈনিক জীবনে বিভিন্ন প্রকার অনুভব-কেন্দ্রের মধ্যে মস্তিষ্কে সংযোগ স্থাপিত হওয়াতে আমাদের জীবনের সমস্ত কর্ম সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং বহু দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

এটা পরীক্ষামূলক সত্য যে, মানুষকে মানসিক শিক্ষা দিতে হলে—স্বভাব ও চরিত্র সুগঠিত করতে হলে—শিশুর স্নায়ুতন্ত্র সুসংযত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই স্নায়বিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা—আমাদের দৈনিক জীবনের সমস্ত আচরণ—সমস্ত অভ্যাস শুধু স্নায়ুর কার্যকরী শক্তি যেভাবে গড়া হবে, এরা সেইভাবেই সাড়া দেবে।

শরীর ও মনের মধ্যে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—মানসিক দুর্বলতা বা সবলতা ভাল বা মন্দ আচরণ, চিন্তাধারা ইত্যাদি সব কিছুরই স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—কাজেই শিশু শিক্ষার গোড়াতেই সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র—তাদের সংগঠন, ক্রমবিকাশ ও নানা বিশেষত্ব ইত্যাদি স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক।

মানসিক চিন্তাধারা, স্মরণশক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি সব কিছুই নির্ভর করে স্নায়বিক শক্তি ও শিক্ষার ওপর। শিশু জন্মাবার পরই প্রথম মানসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে পূর্বকথিত সুগঠিত স্নায়বিক প্রণালীর মধ্যে দিয়ে—নড়াচড়া শুরু হয় আপনা-আপনি নার্ভ প্রত্যাবৃত্তের দ্বারা।

স্নায়বিক সক্ষমতা ও ধীশক্তি নির্ভর করে মস্তিষ্কের অসংখ্য কোষের (cell) সংগঠন ও বিকাশের ওপর ও যেসব স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ পাওয়া যাবে তাদের সুসংযুক্ত ও সংগঠন করানো ও সাধারণ সুন্দর স্বাস্থ্য গড়ে তোলার ওপর।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে বহু সাধারণ ও অন্তর্নিহিত স্নায়ুকোষ (cell) থাকে—এরপর বয়স, শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোষগুলি অথবা এর মধ্যে কিছু কিছু সুগঠিত হয়ে কাজে আসে—বাকি বহু সেল কাজে লাগাবার চেষ্টা না করায় বা কোন উদ্দীপক না পাবার জন্য সারা জীবন অকেজো অবস্থাতেই থেকে যায়। যেসব সেল বা ব্রেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ মস্তিষ্কে জন্মাবধি অকেজো অবস্থায় থাকে তাদের কাজে লাগানো ও ঠিকমত বিকশিত করাবার ওপরেই নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন একজনের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া আলমারি ভরা বহু ভাল ভাল পাঠ্য পুস্তক রাখা আছে—এইসব বই পড়লে অর্থাৎ ঠিক মত কাজে লাগালে রীতিমত শিক্ষিত, গুণী ও জ্ঞানী হওয়া সম্ভব—কিন্তু উপরিউক্ত ব্যক্তি ভাল ভাল আলমারিতে রক্ষিত ও পাঠ্য পুস্তক-গুলি পৈত্রিক সূত্রে পেয়ে সারা-জীবন ব্যবহার না করে আলমারি বন্ধ অবস্থায় রেখে দিলেন—এক্ষেত্রে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, ভদ্রলোক ঐসব পুস্তকে লিখিত জ্ঞান না পড়েই জানতে ও শিখতে পারবেন? ঠিক তেমনি ব্রেনে নিহিত আছে বহু সেল—তারই মধ্যে দৈনিক কাজকর্ম ও শিক্ষার দ্বারা কিছু কাজে লাগানো হয় ও বাকি বহু সেল কাজে লাগানো হয় না বা উদ্বুদ্ধ করা হয় না অর্থাৎ এদের প্রকাশ করাবার সুযোগ দেওয়া হয় না। বহু মানুষের বহুমুখী প্রতিভা জন্মাবার সঙ্গে অন্তর্নিহিত রয়েছে মস্তিষ্কে অসংখ্য সেলের মধ্যে; কিন্তু প্রকৃত সুযোগ সুবিধার অভাবে বরাবরই তারা অন্তরালেই থেকে যায়। সেই জন্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই অন্তর্নিহিত অলক্ষ্য সেলগুলিকে সঞ্জীবিত করে তোলা—মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ করা। এদের গূঢ়-তত্ব নিহিত রয়েছে স্নায়ুর ভেতরে—আর এর ঠিক মত শুরু সম্ভব শিশুর মধ্যেই—যে সময় মস্তিষ্ক সাবলীল গতিতে বেড়ে চলেছে—যখন পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হচ্ছে—প্রথম আহরণ হচ্ছে নানা অভিজ্ঞতার, এই সময় শিশুকে গড়ে তোলা মানেই ভবিষ্যৎ মানুষকে গড়ে তোলা। মানুষের মনকে জানতে হলে, পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার আচরণ, কারণ আচরণই হল মনের প্রকাশ। সেই আচরণ শুরু হল শিশুকাল থেকে। মনোনিবেশ করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে শিশুর প্রত্যেক ভাবভঙ্গি, নড়াচড়া, কাঁদা হাসা, সব কিছু। এর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে শিশুর স্নায়বিক ক্রিয়া—শিশুর মন ও তার ক্রম-বিকাশ।

মানুষ জন্মায় এক জটিল যন্ত্রপাতির শরীর নিয়ে—যার দ্বারা শিশুকাল থেকে তার আবেষ্টনের বা পারিপার্শ্বিক নানাপ্রকার উদ্দীপনায় (stimulus) নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে।

শিশুর কান্না হাসি, খাওয়া, বলা, চলা ইত্যাদি আচরণ লক্ষ্য করলে স্নায়বিক প্রণালী তার ক্রিয়া ও মানসিক ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে পারা যায়। এর মধ্যে প্রায় সবই জন্মাবার পর থেকে আপনা-আপনি চলতে থাকে ও পরবর্তীকালে এগুলোর নানাভাবে উন্নতি সাধন হয়। এইসব স্নায়বিক ক্রিয়াকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি—

(১) যেগুলোর পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ ক্রমশ শিক্ষা ও সঠিক চালনার দ্বারা উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

(২) যেগুলো একইভাবে চলে, অথচ উন্নতি করা সম্ভব হয় না। যেমন কথা বলা, হাসা, কাঁদা, চলা ইত্যাদি এসব যদিও শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর দ্বারা চালিত, তা সত্ত্বেও

পরবর্তী জীবনে একে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং এর উন্নত ধরণের প্রকাশ দেখা যায়।

আবার শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া আপনা থেকেই চলতে থাকে এবং পরবর্তী জীবনে এদের উন্নতি সাধন করা হয় না—এরা সোজাসুজি স্নায়বিক ক্রিয়া হিসেবেই বিনা ঘষা মাজাতেই সংঘটিত হয়।

সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে শিশুর আচরণ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, শরীরের সব কিছু ক্রিয়াকর্মই উত্তেজিত হচ্ছে স্নায়ুর দ্বারা এবং কতকগুলো উত্তেজনা নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর, আর কতকগুলো হচ্ছে জন্মগত সহজ প্রবৃত্তি বা instinct। মনে রাখা উচিত যে, সব কর্মই নির্ভর করে স্নায়ুর উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার ওপর এবং এই সব ক্রিয়া এইভাবে উত্তেজিত হতে হতে ক্রমে এক অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন আর নতুন উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না যেমন প্রথম কোন কিছু দেখলেই আমাদের ঔৎসুক্য বিশেষভাবে দেখা দেয়, কিন্তু পরে সেটি দেখতে দেখতে এমন সহজ হয়ে যায় যে, চোখে পড়লে কোন ঔৎসুক্য ঘটতে পারে না। এইভাবে জন্মাবার পর হতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনিক জীবনের বহু রীতিনীতি, কাজকর্ম ইত্যাদি শিশু ক্রমশ আয়ত্ত করে নিজের জীবনে সেগুলো ঘটাবার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে।

শিশুর পরবর্তী জীবনের জন্য তার হাবভাব, রীতিনীতি, আচরণ সব কিছু যদি সুষ্ঠু সমাজের জন্য সুনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন মনে করা হয়, তবে এর জন্য কোন ওষুধ খাওয়ানো বা ইনজেকসন দেওয়া কিংবা কঠোর শাসন বা স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও জলবায়ুর কোন বিশেষত্ব প্রয়োজন হয় না। এর জন্যে এমন আদর্শমূলক আবহাওয়ার মধ্যে তাকে পালন করতে হবে যে তার মধ্যে থেকে শিশু যে অভ্যাস আহরণ করবে তা ভাল বা সুনিয়ন্ত্রিত হবে।

যেমন শিশুকে স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা প্রয়োজন —রোগের মধ্যে রেখে নীরোগ রাখা মুস্কিল— ঠিক তেমনি শিশুর সমস্ত অভ্যাস ও আচরণ সমাজের অনুকূলে রাখতে হলে যে অভ্যাস শিশু পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে অনুকরণ করে বা দেখে শুনে গ্রহণ করবে, তা ঠিক সেই প্রকার হওয়া আবশ্যক। এক কথায় শরীরের মত মনেরও একটা স্বাস্থ্য আছে সেটিকে ভাল করতে হলে শিশুর সামনে ভাল আদর্শ রাখতে হবে। দুঃখের বিষয় আমরা পরবর্তী জীবনে শিশুকে যেভাবে পেতে চাই সেভাবে তাকে গড়ে তুলি না বা তুলতে পারি না। আমরা আশা করি মানুষ চরিত্রবান হোক, সাহসী হোক, কিন্তু শিশুকাল থেকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন পথে তাকে চালিত করি, যাতে

তার 'মানসিক শক্তি' ব্যাহত হয় ও সে ভীরু হয়ে গড়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ মানুষকে যদি চরিত্রবান করতে হয়—তার জীবনের রীতিনীতি অভ্যাস যদি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে যথারীতি শিশুপালনে মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

আমরা কোন নতুন দেশে গেলে যেমন প্রথমে সেখানকার মানুষের ভাষা, দৈনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমাদের কাছে গোড়ায় অদ্ভুত লাগে, কিন্তু কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে মিশে ও দেখেশুনে ক্রমশ তাদের রীতিনীতি ইত্যাদি আয়ত্ত করে ফেলি—শিশুও ঠিক তেমনি প্রথম পৃথিবীতে এসে নানা জিনিস, নানা মানুষ ইত্যাদি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যায় ও আস্তে আস্তে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুসারে গড়ে ওঠে তার হাবভাব ও আচরণ। হাত দিয়ে খাওয়া বা চীনাদের মত কাঠি দিয়ে খাওয়া, ফলের খোসা ছাড়ান, জামা পরা, এই সব যেমন দৈনিক জীবনে চোখের সামনে করতে দেখে শিশু আপনা হতে গ্রহণ করে—তেমনি সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কর্ম ও উন্নতি দেখে ও শুনে শিশু আপনা হতে আহরণ করে। শিশুর আত্মচেতনা শুরু হয় তিন বছর বয়স থেকে অর্থাৎ একটি দু' বছরের শিশুর দিকে দেখলে তার মনে প্রশ্ন উঠবে, "কি দেখছ?" আর চার বছরের শিশু ভাববে 'আমার দিকে কেন দেখছো?' এই আত্মচেতনায় গড়ে-ওঠা শিশুর জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন—আত্মচেতনা ঠিক মত না গড়ে উঠলে অথাৎ কুশিক্ষা বা পারিপার্শ্বিক হানিকর আবহাওয়ার জন্য নিজের সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা গড়ে উঠলে ভবিষ্যৎ জীবনে নানা মানসিক ব্যাধি প্রকাশ পায়।

যিনি শিশু পালন করবেন তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিশু মাটির পুতুল নয়—তার প্রাণ আছে, আর মন ও একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে। তাই বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা এই নবাগত মানুষকে সাহায্য করতে হবে, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের দ্বারা তার মনের বিকাশকে গড়ে তুলতে হবে, তার প্রকৃতিগত মতি ও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা সম্মুখে চালিত করতে হবে।

অনুকরণ করার অভ্যাস শিশুর অত্যন্ত বেশী। সে তার পরিবেশের মানুষকে হুবহু নকল করতে চেষ্টা করে। সেইজন্যে মা বা যিনি শিশুকে পালন করবেন তাঁর স্বভাব হাবভাব শিশুর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কথা বলা, চলা সবই সে মাতার চমৎকার অনুকরণ করে। ডাঃ এরিক প্রিচার্ড তাঁর "সায়কোলজি অব্

ইনফ্যাণ্ট" প্রবন্ধে এক শিশুর কথা উল্লেখ করেছেন; সে যখন হাঁটতে শিখলো তখন অদ্ভুতভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো—চিকিৎসক ও সার্জন মিলে অস্থিসন্ধি ইত্যাদি পরীক্ষা করে কোন রকম গোলমাল পেলেন না—ইতিহাস নিয়ে জানা গেল যে এই শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন তার বাবার পা ভেঙেগেছিল—কিছুদিন পর তিনি যেভাবে খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলেন শিশুটি সেটা নিরীক্ষণ করে ঠিক সেইভাবে হাঁটতে শিখেছে। কিছুদিন ভালভাবে হাঁটিয়ে তার অভ্যাস দূরে করা হয়। এতে বোঝা যাবে যে, শিশু আমাদের অজ্ঞাতে কিভাবে পরিবেশ থেকে অনুকরণ করতে শেখে পরে সেগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার দাঁড়িয়ে যাওয়া অভ্যাসের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের আচরণ। ভাল বা মন্দ দুই অভ্যাসই একইভাবে শিশুর চরিত্রে প্রবেশ করে—সেটা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর। কিন্তু কোন অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হয়ে গেলে সেটা দূর করা কঠিন। কাজেই যেভাবে ও যে সময় শিশু অভ্যাসগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে গ্রহণ করবে—সেই সময় সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ জাতিকে সাহসী ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে বীর্যবান করতে হলে শুধু বসে বসে বাকচাতুরি করলে ও কপাল চাপড়ালে কোন ফল হবে না—ঘরে ঘরে শিশুদের প্রকৃত পথে চালিত করতে হবে—ভয়ডর দূর করাতে হবে। 'মানুষ' করার নামে কড়া শাসন করলে বা জবরদস্তি করলে আরো ক্ষতিকর পথে তার প্রকাশ হবে—সেইজন্য কোনকিছু সংদমন (repress) করার চেষ্টা না করে বুঝিয়ে ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। আর একটা কথা হচ্ছে কোন মিথ্যে অথবা ধাপ্পা দিয়ে শিশুর কোন ভয় বা কষ্ট উড়িয়ে দেওয়া, বা লাঘব করবার চেষ্টা করা উচিত নয়—এতে পরে যিনি বলেন তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও সংশোধন করা সম্ভব হয় না।

যখনই শিশুর আত্মচেতনার উদ্ভব হয় তখন থেকেই জ্ঞানে ও সজ্ঞানে সে চিন্তা করে তার আদর্শ—অর্থাৎ কেমন হতে হয়—কেমন হওয়া ভাল—যত বয়স হয় তার লক্ষ্য হয় সেই দিকে—সেই চিন্তাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। নানা উপায়ে অভিভাবক শিশুকে সুপথে চালিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শারীরিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা অর্থাৎ জবরদস্তি 'ভাল' করার চেষ্টায় ঘটে হিতে বিপরীত।

শিশুর মনের মধ্যে রেখাপাত করান ও আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল অভিভাবন (suggestion) অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বোঝান প্রয়োজন যাতে তার মনে সাড়া দেবে আর নিজের মনেই নিজে পথ বাৎলাবে। শিশুর মতি কোমল এবং তার অভ্যাস ও ব্যবহার সব কিছু সহজেই পরিবর্তন বা রূপান্তর করান সম্ভব। শিশুর অনুকরণপ্রিয়তার সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি—এই ভাবে সে যে শুধু পারিপার্শ্বিক মানুষের থেকে সব বাহ্যিক ব্যবহার অনুকরণ করে তা নয়—এমন কি বাবা মা'র মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি পর্যন্ত শিশুর মন স্পর্শ করে—চরিত্র সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করে। এ যেন ক্যামেরার ভেতর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ফিল্ম—সম্মুখের অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ প্রতিফলিত হয়ে রেখাপাত কচ্ছে। এই কারণে শিশুর কোমল মন সর্বদা কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত (suggestive)। তাকে যথারীতি সুচিন্তিত পথ প্রদর্শন করলে বা পরোক্ষভাবে ঠিক পথের ইঙ্গিত করলে সে সেই পথে চলবে এবং ভুল সংশোধন করবে: ইঙ্গিতের মধ্যে আমরা যেটা চাইনা সেটা উল্লেখ করে বারণ করার প্রয়োজন নেই। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে—সেই জন্যে নেগেটিভ সেণ্টেন্স বা নেতি-বাচক বাক্য ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন আমরা 'মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়' না বলে—বলবো 'সত্যি কথা বলা উচিত।'

এইভাবে নানাদিক ভেবে—অবোধ, চঞ্চল, অজ্ঞ শিশুর মনকে ঠিক মত গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন হয়—শিশু পালনে আগ্রহ, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা, স্থির ও ঠাণ্ডা মেজাজ, সহনশীলতা ও ধৈর্য। শিশুই ভবিষ্যৎ জাতি এবং এই জাতি গঠনের চাবি-কাঠি মা, বাপের বা অভিভাবকের হাতে—একথা স্থিরভাবে উপলব্ধি করলে আশা করি তাঁরা এ সহনশীলতা অভ্যাস করবেন।

শ্বাপদ-পালিকা মানব-জননী

সম্প্রতি আমেরিকার এক খবরে জানা গেছে, যে নিউ ইয়র্ক জুলজিক্যাল পার্ক বলে চিড়িয়াখানাটির রক্ষক মিঃ মার্টিনীর পত্নী মিসেস হেলেন ডেলানী মার্টিনি বাঘ, সিংহ ও চিতা প্রভৃতি

সিংহ-সুতা জাম্বেসী ও মার্টিনী-জায়া

শ্বাপদ শিশুদের মাতৃস্নেহে পালন করার অদ্ভুত ব্রত নিয়েছেন। তিনি মা-ছাড়া ছোট ছোট শ্বাপদ শিশুদের ঠিক মায়ের মতই যত্নে লালনপালন করে বড় করে তোলেন। তিনি 'জাম্বেসী' বলে একটি সিংহ-সুতাকে জন্মের পরই ঘরে আনেন। তাকে

মার্টিনী-জায়া শিশু-রাজপুতকে দুগ্ধ পান করাচ্ছেন

লালন পালন করে তিনি এখন এক বছরেরটি করে তুলেছেন। এছাড়া 'রাজপুত' বলে একটি ব্যাঘ্র শিশুকে নিতান্ত শিশু অবস্থায় বাড়িতে আনেন, তখন তার ওজন ছিল মাত্র ৩।৪ পাউন্ড—এখন সেটি বড় হয়ে ৪০০ পাউন্ড ওজনের একটি বড়সড় বাঘে পরিণত হয়েছে। 'বাঘিরা' বলে একটি কালো চিতা বাঘের বাচ্চাকেও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করে বেশ বড় করে তুলেছেন। মিসেস মার্টিনীর এ অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে অনেকেই বলেছেন—"হিংস্র পশুদের বশ মানিয়ে মিসেস মার্টিনী সত্যি অবাক করলেন।" কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কি আছে বলুনতো—পৃথিবীর সমস্ত মেয়েই তো ব্যাঘ্র সিংহের চেয়ে হিংস্র জীবদের বশ মানাতে সক্ষম, নয় কি?

নয়াযুগের লয়লা-মজনু

অধিকাংশ আমেরিকান সৈনিকই দেশ-বিদেশে গিয়ে প্রেম ও পরিণয় দুই-ই করেছে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার এক খবরে জানা গেছে—আমেরিকার প্যারাশুট বাহিনীর এক সৈনিক জো ক্যানানজির প্রেম ও বিরহের ব্যাপারটি উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। জো ক্যানানজি ইংলণ্ডে তার বিবাহিতা স্ত্রী প্যাম ক্যানানজিকে রেখে ম্যাসাচুসেটসে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। জো' এই প্যামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয় নটিংহ্যাম ক্যাসেলে—তারপর শেরউড ফরেস্টে জমে ওঠে তাদের প্রেমের মাখামাখিটা; প্যামের দেহে ছিল যক্ষ্মার বীজাণু। জো সে কথা জেনেই তাকে বিয়ে করেছিল। তবে প্যামের অসুখটা যে কতখানি মারাত্মক হয়েছে সে কথাটা জো টের পেলে গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে—যখন জো'র নামে এক টেলিগ্রাম এলো—"প্যামের জীবনদীপ দ্রুত নিভে আসছে—সে তোমাকে ডাকছে।" এই টেলিগ্রাম পেয়ে জো হতাশায় ভেঙে পড়লো, সে তার বন্ধুদের কাছে মনের বেদনা জানিয়ে বললে—"ইংলণ্ডে না

প্যামের রোগশয্যা পার্শ্বে—জো।

গেলে সে একেবারে ভেঙে পড়বে"—এই করুণ কাহিনীটি পেঁছিলো টউনটনের Gazette পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে—তিনি তাঁর কাগজে সেটি ছেপে দিলেন। এই খবর পড়ে মাত্র ছদিনের মধ্যে টউনটন শহরের বাসিন্দারা জো'র ইংলণ্ডে যাওয়ার বিমান ভাড়া ও রাহাখরচ বাবদ ২ হাজার ডলার চাঁদা করে তুলে পাঠালে তাকে। ম্যাসাচুসেটসএর কংগ্রেস প্রতিনিধি জো মার্টিন নিজেই চটপট তার পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সমুদ্র পার হয়ে জো আর প্যাম মিলিত হলো—প্যাম মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে জো'কে তার শয্যাপার্শ্বে দেখে আনন্দে হেসে উঠলো। যদিও এ মিলন তাদের ক্ষণস্থায়ী তবুও এর ইতিহাস চিরস্থায়ী হবেই।

রাষ্ট্রপতি আজাদের ঘরে চুরি

সিমলার এক খবরে প্রকাশ—গত শুক্রবারে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের চাকরবাকরদের চোখে ধুলো দিয়ে এক চোর রাষ্ট্রপতির বাসভবনে ঢুকে পড়ে। চোরটি প্রথমেই সোজা তাঁর রন্ধনশালায় যায়—সেখানে খাবার-দাবার ফলমূল যা কিছু ছিল চোরটি দিব্যি পেটপুরে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে, তারপর মৌলানা সাহেবের কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গা ঢাকা দেয়। যাই হোক জানা গেছে—সেইদিনই চোরটি ধরা পড়েছে এবং তার কাছ থেকে মৌলানার পোষাক-পরিচ্ছদও পাওয়া গেছে। এই ঘটনার পর থেকেই রাষ্ট্রপতির বাসভবনে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। চোরটি মনে হচ্ছে বুদ্ধিমান চোর—হয়তো তার ইচ্ছে হয়েছিল মৌলানা সাহেবের পোষাক পরে নকল রাষ্ট্রপতি সেজে সে নিজেই মন্ত্রিমিশনের বৈঠকে যোগ দেয়। রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করতে যখন বড় বড় চোর দেখা দিয়েছে—তখন রাষ্ট্রপতির ঘরে চুরি করবার ব্যবস্থা যে হবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

অনুবাদ সাহিত্য

খোলা জানলা

সাকি

[সাকি (এইচ এইচ মান্‌রো) এক সৈনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম হয় বার্মায় ১৮৭০ সালে। তিনি কিছুদিন বার্মায় পুলিশ বিভাগে কাজ করেন—তবে জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ইংলন্ডে অতিবাহিত করেন। ছোট গল্প লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গল্পগুলি প্রাণবন্ত কৌতুক রসের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।]

মাসীমা'র নীচে আস্‌তে খুব বেশী দেরী হবে না মিস্টার নাটেল—একটি বছর পনরো বয়সের আত্মবিশ্বাসী সপ্রতিভ কিশোরী বল্লো—'কিন্তু যতক্ষণ তিনি না আসেন আমাকে নিয়ে কাটাতে হবে আপনাকে ততক্ষণ।'

ফ্রামটন্‌ নাটেল্‌ এমন একটা লাগসই কথা বল্‌তে চেষ্টা করলো যাতে বোনঝিকেও একটু তোষামোদ করা হয় অথচ মাসীকেও উপেক্ষার ভাব না দেখানো হয়। মনের মধ্যে কিন্তু তার এই সন্দেহ উঁকি মারছিল যে, একদম অপরিচিত লোকদের সঙ্গে এইভাবে দেখা করতে থাকলে তার স্নায়ু-পীড়ার উপশম হবে কিনা—কারণ এরই জন্য সে পল্লীগ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

এখানে আসবার আগে তার বোন বলেছিল—"আমি ওখানকার যাদের চিনি—তাদের প্রত্যেকের নামে পরিচয়-পত্র দিয়ে দেবো। তা না হলে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখবে, কারও সঙ্গে মিশ্‌বে না, কথা বল্‌বে না—আর একা একা চিন্তা করে তোমার স্নায়ুকে আরও দুর্বল করে ফেল্‌বে।"

নীরবেই তাদের মধ্যে কিছুটা ভাবের আদানপ্রদান হয়েছে, এম্‌নি একটা ভাব বোনঝি আন্দাজ করে নিয়ে বল্‌লো—'এখানকার অনেক লোককেই বোধ হয় আপনি চেনেন?'

—'কাউকেই না। আমার দিদি এখানে এসেছিলেন বছর চারেক আগে—তিনি এখানকার কয়েকজনের নামে পরিচয় পত্র দিয়েছেন আমার সঙ্গে।'

'তাহলে বাস্তবিকপক্ষে আমার মাসীর সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না?' আত্মবিশ্বাসী কিশোরীটি বললো।

—'কেবল তাঁর নাম আর ঠিকানা ছাড়া।' সে স্বীকার করলো।

'ঠিক তিন বছর আগে তাঁর জীবনে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে'—কিশোরীটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লো—'সেটা নিশ্চয় আপনার বোন যখন এখানে ছিলেন, তার অনেক পরে।'

—'তাঁর দুর্ঘটনা?' ফ্রাম্‌টন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। তার মনে হচ্ছিল—এমন একটা শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থানে দুর্ঘটনার মত কোনও ব্যাপার যেন কিছুতেই মানায় না।

—'আপনি হয়তো দেখে বিস্মিত হচ্ছেন, কেন বছরের শেষে শীতের দিনে ঐ বড় ফ্রেঞ্চ জানলাটা আমরা খুলে রেখেছি।' খোলা জানালার ওপাশেই বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র। সেই জানলাটিকে নির্দেশ করে বোন্‌ঝিটি বল্‌তে লাগলো—'ঐ জানলা দিয়ে ঠিক তিন বৎসর আগে আমার মেসো আর মাসীর ছোট দুই ভাই শিকার করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। জলাভূমি পেরোবার সময় তাঁরা চোরা পাঁকে আট্‌কে যান। তাঁদের দেহ আর উদ্ধার করতে পারা যায় নি।'—এই কথা ক'টি বল্‌তে দুঃখে যেন বালিকাটির কণ্ঠস্বর বেধে যেতে লাগ্‌লো—'আমার দুঃখিনী মাসী সব সময়েই মনে করেন যে, একদিন না একদিন তাঁরা ফিরে আসবেনই—তাঁরা এবং তাঁদের একটা ছোট্ট ধূসর রংয়ের স্প্যানিয়েল—যে তাঁদেরই সঙ্গে হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। তাঁর ধারণা—যেমন ঐ জানলা দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি ঐ জানলা দিয়েই তাঁরা বাড়ি ঢুকবেন। এই জন্যই জানলাটি সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনিভাবে খোলা থাকে। বেচারী মাসী প্রায়ই বলে থাকেন, কেমন করে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। যখন বেরিয়ে যান, তখন তাঁর স্বামীর কাঁধের উপর ছিল একটা সাদা রংয়ের ওয়াটার-প্রুফ-কোট। দেখুন, মাঝে মাঝে এমনি নির্জন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আমার সমস্ত শরীর ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে—যেন মনে হয় সত্যই তাঁরা ঐ জানলা দিয়ে এখনই এসে পড়বেন।' সে একটু ভয়চকিত হয়েই থেমে গেল।

ফ্রাম্‌টন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, যখন মাসী ঘরের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করে তাঁর বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ঝড় বইয়ে দিলেন।

—'এই খোলা জানলাটার জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না আশা করি'—তিনি বল্লেন—'আমার স্বামী আর ভাইয়েরা শিকার থেকে এখনই ফিরে আসবেন, আর তাঁরা প্রত্যেক দিন ঐ জানলা দিয়েই আসেন কিনা।'

শীতকালে হাঁস শিকারের প্রচুর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তিনি হর্ষভরে বক্‌ বক্‌ করে অনেক কথাই বলে গেলেন। ফ্রাম্‌টন এই নিদারুণ প্রসঙ্গ থেকে কথার মোড় কম ভীতিজনক প্রসঙ্গে ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো—যদিও সে বুঝতে পারছিল মহিলাটির মনোযোগের মাত্র সামান্য একটু অংশই তার দিকে আছে—কারণ তাঁর চোখের দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে খোলা জানলার বাইরে ঘন ঘন ছড়িয়ে পড়ছিল। এটা সত্যই দুঃখজনক বিস্ময়ের কথা যে, সেই মর্মবিদারক ঘটনা বৎসরের যেদিন ঘটেছে—বৎসরের ঠিক সেই দিনটাতেই সে এখানে এসেছে এ'দের সঙ্গে পরিচিত হতে।

—'ডাক্তাররা নির্দেশ দিয়েছে—মানসিক উত্তেজনা আর শারীরিক পরিশ্রম থেকে আমাকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।'—ফ্রাম্‌টন ব্যক্ত করলো—তারও এই সাধারণ ভুল ধারণা ছিল যে, অপরিচিতেরা প্রথম পরিচয়ের সময়ে যেন অসুখ বিসুখের খুঁটিনাটি খবর শোনবার জন্যই উদগ্রীব হয়ে থাকে।

—'ও'।—মিসেস স্টেপলটোন অস্পষ্টভাবে বল্‌লেন। তারপরই সহসা তাঁর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো ক্ষিপ্র মনোযোগের ভঙ্গীতে—এ ভাবটা কিন্তু ফ্রাম্‌টন যে কথা বল্‌ছিল, তার জন্য নয়।

—'ঐ যে ওরা এসে পড়েছে এতক্ষণে—' তিনি উচ্চস্বরে বল্লেন—'ঠিক চায়ের সময়ই ওরা ফিরেছে, সারাদেহে একেবারে চোখ পর্যন্ত কাদা লাগা।'

ফ্রাম্‌টন একটু কেঁপে উঠ্‌লো এবং বোন্‌ঝির দিকে সহানুভূতি ও সমবেদনার দৃষ্টি দিয়ে তাকালো। বালিকাটি খোলা জানলার ভিতর দিয়ে এক দৃষ্টে চেয়েছিল—চোখে তার বিস্মিত ভয়ার্ত দৃষ্টি। ফ্রামটন ঘুরে বসে সেই একই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো।

গোধূলির অন্ধকারে তিনটি নরদেহ তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—একটি ক্লান্ত স্প্যানিয়েল তাদের পিছন পিছন আস্‌ছে। তাদের সকলের হাতেই বন্দুক—একজনের কাঁধে সাদা রংয়ের কোট।

ফ্রাম্‌টন সহসা তার ছড়িগাছি হাতে নিল, তারপর হলের দরজায় এবং বাইরে কাঁকর বিছানো রাস্তায় তার পলায়নপর মূর্তি মিলিয়ে গেল।

—'এই যে আমরা এসেছি, ডিয়ার,—'

সাদা ম্যাকিনটোস্‌ধারী ব্যক্তিটি বললো—'আমাদের আসতে দেখেই ছুটে চলে গেল, ও লোকটা কে?'

—'এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ, মিস্টার নাটেল না কি যেন একটা নাম।' —মিসেস স্টেপ্‌লটোন বল্লেন—'লোকটার মুখে নিজের অসুখ ছাড়া আর অন্য কথা শুনলাম না। আর তোমাদের দেখতে পেয়েই অসভ্যের মত কোনও কিছু না বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল—যেন সে ভূত দেখেছে।'

বোনঝিটি বেশ ভালমানুষের মত শান্তস্বরে বললো—'আমার মনে হয় ও'র এই রকম ব্যবহারের কারণ ঐ কুকুরটা। উনি বলছিলেন, কুকুর সম্বন্ধে ও'র একটা আতঙ্ক আছে। একবার নাকি গঙ্গার ধারে বেড়ানোর সময় কতকগুলো পারিয়া কুকুরের তাড়ায় ও'কে এক কবরখানায় ঢুকতে হয়। সেখানে একটা সদ্য খোঁড়া কবরের গর্তের মধ্যে ঐ ভদ্রলোক সারারাত কাটান—ওপরে ঐ সব বদমেজাজী বিদ্‌ঘুটে জীবগুলোর দাঁত-খিঁচুনি আর তর্জন-গর্জন শুনতে শুনতে। এই ব্যাপার কোনও লোকের স্নায়ুর শক্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?'

অনুবাদক—**শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়**

শব ও স্বপ্ন—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। মূল্য দুই টাকা।

শব ও স্বপ্ন একখানি তিন অঙ্কের নাটিকা। যুদ্ধ ও দেশাত্মবোধের পটভূমিকা লইয়া ইহার আখ্যানভাগ রচিত। কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী লটারীর টাকায় বড়মানুষ হইয়া জমিদারী কিনে এবং তাহার দত্তকপুত্র হিমাদ্রি সেই জমিদারীর ভার হাতে পাইয়া প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করিতে থাকে। পরে দেশকর্মী মুকুন্দলালের কন্যা উজ্জ্বলার উজ্জ্বল প্রভাবে পড়িয়া হিমাদ্রির হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। হিমাদ্রি, চিন্তাহরণ, 'ভূপর্যটক' কুনাল মিত্র, নয়নতারা, তাহার কন্যা অরুন্ধতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

আলাদীন—শ্রীনীরেন ভঞ্জ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, শনিবারের বৈঠক, ২৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আরব্য উপন্যাসের আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের কাহিনী সর্ববিদিত। আলোচ্য নাটকখানা সেই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। রূপকথার মতই সহজ ও সুললিত ভাষায় গ্রন্থকার নাটকখানা রচনা করিয়াছেন। দৃশ্য-সংযোজনা, সংলাপ, সংগীত সবদিক দিয়া নাটকখানাকে নিখুঁত বলা চলে।

রক্তের পাখা—শ্রীতড়িৎকুমার সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, ভট্টাচার্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একখানি তিন অঙ্কের নাটিকা। আদি রিপুর হস্তের ক্রীড়নক কয়েকটি আদম-সন্তানের চরিত্র বিশ্লেষণই নাটিকার বিষয়বস্তু। চরিত্র চিত্রণে লেখকের সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রকৃতি, বীথি, তরুণ, ব্যারিস্টার অনিন্দ্য রায় প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র বেশ সুস্পষ্ট। নাটকের ঘটনা-বিন্যাসেও বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট মনোরম, কিন্তু বহু ছাপার ভুল আছে।

সাইরেন—শ্রীসুধাংশুকুমার রায় প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। ২২ পৃষ্ঠার বই। মূল্য এক টাকা।

তিনটি বিভিন্ন নাটকীয় দৃশ্যে সাইরেনের নষ্টামি বর্ণিত হইয়াছে।

মহানগরী—(উপন্যাস) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম এ; জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা। ৩৫২ পৃষ্ঠা।

সুপ্রিয় চাকুরীর খোঁজে পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসে। তাহার আত্মীয় অতুলদা তাহাকে মিঃ দাসের গৃহশিক্ষকতার কাজ যোগাড় করিয়া দেন। মিঃ দাশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ধনী, সুশিক্ষিত দেশপ্রেমিক নেতা ব্যক্তি। মিঃ দাশের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করিবার সময় মিঃ দাশের নাতনী ইলা এবং তাহার বান্ধবী, রেবা, রিনি, অনুর সঙ্গে সুপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পরে মিঃ দাশের পুত্র স্মরজিতের সঙ্গেও তাহার বন্ধুতা গাঢ় হইয়া উঠে। স্মরজিৎ, ইলা, রেবা, অনু, রিনি—ইহারা রণজিৎ নামক একজন তরুণের অর্থ সাহায্যে 'প্রতিবাদ' নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করে। সুপ্রিয় তাহার সহকারী সম্পাদক হয়। রেবার সঙ্গে স্মরজিতের বিবাহের কথায় রণজিতের ঈর্ষা জন্মে। সে একদিন পকেট হইতে রেবাকে পিস্তল দেখায়। সে পিস্তল রেবা সুপ্রিয়কে রাখিতে দেয়। অনু রাত্রিতে আসিয়া পিস্তল লইয়া গিয়া সুপ্রিয়কে রক্ষা করে। এই সূত্রে অনুও সুপ্রিয়ের মধ্যে প্রেমের সূত্র ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইলার প্রেম এক সময় সুপ্রিয়ের কামনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। রণজিৎ বিলাত চলিয়া যায়। পুলিশ সুপ্রিয়ের ঘরে খানাতল্লাসী করে; কিন্তু পিস্তল না পাইয়া ব্যর্থমনোরথ হয়। ইলার সঙ্গে সুকুমার নামক একটি তরুণের বিবাহ স্থির হয়। মিঃ দাশ এই বিবাহের জন্য বরকে আশীর্বাদ করিতে যাইতেছিলেন, পথে শিয়ালদহ স্টেশনে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া মিঃ দাশের বন্ধু দেবেনবাবু মিঃ দাশকে শোনান। খবরটি এই যে, দার্জিলিংয়ের কাছে একটি চাবাগানে পুলিশ বিপ্লবী দলকে ঘেরাও করিয়াছিল; ইহাতে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হয়। সঙ্ঘর্ষের ফলে দুইজন যুবক আহত হয় এবং চা-বাগানের ম্যানেজার স্মরজিৎ রেবাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হয়।

রামপদবাবু বাঙলাদেশের প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিকদের অন্যতম। বর্তমান নাগরিক জীবনে তরুণ এবং তরুণীদের সংস্কৃতিমূলক চিন্তাধারাতে যে প্রাণপূর্ণ ছন্দোময় আবর্ত উত্থিত হইতেছে, তিনি তাহার বৈচিত্র্য অতি নিখুঁত ও সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মিঃ দাশ, ইলা, অনু, রেবা, ইহাদের চরিত্র সৃষ্টিতে রামপদবাবুর কলাকৌশল সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিঃ দাশের বিধবা কন্যার মধুর চরিত্র সকল অন্তর স্পর্শ করে। মানব চরিত্র বিশ্লেষণে রামপদবাবুর অন্তর্দৃষ্টি অতি গভীর। তাঁহার দার্শনিকতা কবিত্বের রসে সরস হইয়া জীবন্ত লীলায় চিত্তকে দোল দেয়। আধুনিক তরুণ এবং বিশেষভাবে তরুণীর বৈপ্লবিক সংস্কৃতির মূলীভূত মনোধর্মকে তিনি ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন। নাগরিক সুসংস্কৃত-রুচি তরুণ জীবনের এই বৈপ্লবিক প্রেরণার সঙ্গে গ্রাম জীবনে বাস্তব দুঃখ কষ্টের চেতনা কতখানি আছে, ধনী এবং নাগরিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আবদ্ধ দরিদ্র সুপ্রিয়ের অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি সেই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার রসসৃষ্টির ভাবগর্ভ গূঢ় ইঙ্গিতে আমাদের চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। রামপদবাবুর মহানগরী বাঙলার কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে, এমন কথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি।

প্রথম প্রণাম (উপন্যাস)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—রবীন্দ্র পাবলিশিং হাউস, ৫০নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ১৫৬ পৃষ্ঠা।

সুকবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন, বর্তমান যুগে বিশিষ্ট কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব সাম্প্রতিক; আলোচ্য গ্রন্থই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। বিচিত্র আদর্শ ও মনস্তত্ত্বের ঘাতপ্রতিঘাতে উপন্যাসের আখ্যানভাগ জমিয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চিত্র 'প্রথম প্রণামে' দেখা গেল। উচ্চশিক্ষিতা অশোকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস, প্রণবের দেশাত্মবোধ এবং গণসেবার দিকে আত্মচেতনা, রামনগরের পল্লীচিত্র, সরমার বৈধব্য জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী ও আদর্শ, সমীরের প্রণয়ভঙ্গজনিত নৈরাশ্য এবং মণিকার প্রেম প্রভৃতি অন্তরস্পর্শী হইয়াছে। প্রথম উপন্যাসেই লেখক দরদ দিয়া ঘটনা অবতারণা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন চরিত্র নৈপুণ্যের সহিত পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ণনাভঙ্গী, লিখনশৈলী, বাচনিকতা ও চরিত্রবিন্যাসে লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। পাঠক-পাঠিকাগণ উপন্যাসখানি পড়িয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রচ্ছদপট বিশেষ চিত্তাকর্ষক, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

জয়-সুভাষ—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—৪২বি নং শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

দেশাত্মবোধ ও উদ্দীপনামূলক কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ভাবের গাম্ভীর্য ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রত্যেকটি কবিতাকেই মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

ইংলণ্ড কি স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত?

আবার আসিয়াছি প্র-না-বি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। আমি বিলাতি একখানি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। সম্পাদক আমাকে জরুরী তার করিয়াছেন, ত্রি-দলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে প্র-না-বি'র মতামত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

প্র-না-বি'র সাঁওতাল পরগণার বাড়িতে পেঁছিয়ে দেখি, তিনি তখনো বেড়াইয়া ফেরেন নাই। আমি তাঁহার বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য তাঁহার আগমন সংবাদ দিলে আমি গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি।

প্র-না-বি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—আপনার আগমন সম্ভাবনা বহন ক'রে আপনার প্রেরিত টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি, আর সেই বিলাতি কাগজখানার জন্যে একটি বিবৃতিও আমি তৈরি করে রেখেছি।

এই বলিয়া তিনি আমার হাতে একটি টাইপ-করা বিবৃতি দিলেন। আমি আদ্যন্ত সেটা একবার পড়িয়া লইলাম। হাঁ, প্র-না-বি'র যোগ্য বিবৃতিই বটে। কাগজে বাহির হইলে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—বিবৃতিটা চমৎকার হয়েছে। তবে দু-একটা বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। আপনি বলেছেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র ঢেলে সাজা দরকার। কিন্তু এটা তো একটা শুভ সঙ্কল্প মাত্র—তা কি সম্ভব?

প্র না বি বলিলেন—ইতিহাসে কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব তা কি এত সহজে স্থির করা যায়? আমার মত এই যে কোন সম্ভাবনাকেই বিদায় করে দেওয়া উচিত নয়, সকল গুলোকেই হাতে রাখা দরকার।

আমি বলিলাম—সেকথা সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সুদূরতম সম্ভাবনাও তো দেখা যাচ্ছে না। একটা বিপ্লব হয়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা বিপর্যয় না ঘটলে সে দেশে নূতন শাসনতন্ত্র কায়েম হবার সম্ভাবনা কোথায়?

প্র না বি বলিতে লাগিলেন—ইংলণ্ডের তথা মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে নেপোলিয়ান ইংলণ্ড জয় করতে সমর্থ হন নি। তাঁর দ্বারা ইংলণ্ড বিজিত হলে ওদেশে একটা—একটা শুভ পরিবর্তন সাধিত হতে পারতো। নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ড জয় করতে পারলে হাউস অব লর্ডস ভেঙে দিতেন। তখন একমাত্র শাসন কেন্দ্র হত হাউস অব কমন্স'। ওদেশের রাজশক্তি, অভিজাতশক্তি খর্ব হয়ে গেলে ইংলণ্ডের অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থার একটা সমতা ঘটত। ইংলণ্ড এখনো হাজার বছরকার আগের চালে চলছে অথচ ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দশবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন, একই মহাদেশে মানুষের মনের এইরকম তাপবৈষম্য থাকবার ফলে ওখানে নিরন্তর ঝড়ঝঞ্ঝা উল্কা এবং বজ্রপাত ঘটছেই।

প্র না বি বলিতে লাগিলেন—আমার তো মনে হয় ইউরোপের অশান্তির প্রধান কারণ ইংলণ্ডের সঙ্গে বাকি ইউরোপের মানসিক এই তাপ-বৈষম্য। আর ইউরোপের তাপ-বিষমতার ফলে বায়ুমণ্ডলে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়—তার দ্বারাই পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আমেরিকা বলে একটা বৃহৎ জগৎ আছে বটে কিন্তু তার কোন স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি নেই। ইউরোপের রাজনীতির পরিপূরকভাবে সে নিজের পররাষ্ট্রনীতি চালনা করে থাকে।

আমি শুধাইলাম—ইউরোপের এই তাপ-বৈষম্য দূর করবার উপায় কি?

তিনি বলিলেন—তা জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে এই বিষমভাব দূর না হলে পৃথিবীতে শান্তি নেই।

আমি পুনরপি শুধাইলাম—কিন্তু ইউরোপের অশান্তির সঙ্গে ত্রি-দলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতার যোগ কোথায়?

প্র না বি বলিলেন—এ তো খুব স্পষ্ট। ত্রি-দলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হল কেন? কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নাকি দৃষ্টির সমতা লাভ করতে অসমর্থ হল। এখন একথা আমরা সবাই জানি যে লীগ ও কংগ্রেস যাতে দৃষ্টির সমতা লাভ না করে তার জন্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ব্যগ্রতার অন্ত নেই। এর কারণ কি? লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা মানসিক তাপ-বৈষম্য সৃষ্টি করাই কি উদ্দেশ্য নয়, যে তাপ-বৈষম্য ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে এমন প্রতিষ্ঠাজনক সুযোগ দান করেছে? ইউরোপের রাজনীতির পরীক্ষায় ইংরেজ জাত বুঝতে পেরেছে এই রকম একটা ভেদসৃষ্টি করা ছাড়া ক্ষুদ্র বৃটেনের প্রাধান্য বজায় রাখবার উপায় নেই। এ অনেকটা আমাদের পুরাণের সুন্দ উপসুন্দর লড়াই-এর মতো। ওরা লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করে,—বৃটেনের তাতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই! সেইজন্য বৃটিশ শাসন যেখানে গেছে সেখানেই ভেদ সৃষ্টির দ্বারা তার প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে। আয়র্লাণ্ড ছাড়া পেয়েও ছাড়া পেলো না। বৃটিশ সিংহের থাবায় তার বুকে মস্ত একটা ক্ষত রয়ে গেল।

আবার দেখুন প্যালেস্টাইনকে ভাগ করবার চেষ্টা করছে। আর শুধু কি প্যালেস্টাইনে? মিশর থেকে সুদানকে খণ্ডিত করবার চেষ্টা কি দেখছেন না? ওদিকে ত্রিপলিতানিয়া থেকে সাইরেনিকাকে স্বতন্ত্র করে নেবার চেষ্টা হচ্ছে U. N. O. প্রতিষ্ঠানের মারফতে। এই একই নীতির লীলা চলছে ভারতবর্ষে।

আমি শুধাইলাম—এখন এর প্রতিকার কি?

—প্রতিকার? প্র না বি বলিলেন, এর প্রতিকার হচ্ছে ইংলণ্ডে এই রকম একটা তাপ-বৈষম্য সৃষ্টি করা। রাজনৈতিক সংঘাতে ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা একবার বিপর্যস্ত হয়ে গেলে ওরা কি আর রাজনৈতিক-ঐক্য স্থাপন করতে সমর্থ হবে? কখনোই না। ওদের দেশে ভেদ যে অল্প তা যেন মনে করবেন না! প্রোটেষ্টাণ্ট, কাথলিক তো আছেই তা ছাড়া আছে ওয়েলশ, স্কচ আরো কত কি? তার পরে ইচ্ছে করলেই ইহুদি ও অন্যান্য সমস্যাকে খুঁচিয়ে তোলা অসম্ভব নয়। ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে এইসব গরমিল মিলে গিয়ে একটা কাজচলা গোছের সিদ্ধান্তে ওরা উপনীত হয়েছে বটে—কিন্তু সেই বন্ধন একবার ছিন্ন হয়ে গেলে আর হাজার বছরের মধ্যে বিষমের সমন্বয় অসম্ভব।

ওরা যখন বিষমে সমতা সাধন করতে পারবে না—আমরা তখন মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে থাকবো। এ অবস্থায় কি করা উচিত এবং কি উচিত নয় তা নিয়ে লম্বা লম্বা বিবৃতি দেবো—কেউ কেউ আবার ওদের পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহ দিতেও দ্বিধা করবো না—আসর খুব জমে উঠবে। আমি তখন আড়াইগঞ্জি এক বিবৃতি তারযোগে পাঠাবো—ইংলণ্ড এখনো স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়নি—অতএব আরও কিছুকাল পলিটিকাল নাবালকি করা তার পক্ষে অপরিহার্য।.........তখন ইংলণ্ড বুঝতে পারবে—'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সে-ও কাঁদিবে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—চমৎকার হয়েছে। ওদেশের লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।

প্র না বি বলিলেন—জ্ঞান বর্ধন না করলেও আনন্দবর্ধনে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করবে—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!

DAWNLI TEA
Sole distributors—
SANICO—2, BENFIELD LANE, CALCUTTA.

নবরূপে
নূতন
অলঙ্কার

ইরাণী
আমলা
ওরিয়েণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৯, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

দেশের কথা

(২৪শে বৈশাখ—৩০শে বৈশাখ)

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ—সরকারের আয়োজন—শাসন-পরিষদের পুনর্গঠন—বিদেশ হইতে চাউল আমদানী—মার্কিনের সহানুভূতি—কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি—ফরিদকোট রাজ্য—মেজর-জেনারেল চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-জয়ন্তী।

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ—সিমলায় বিলাতের মন্ত্রিত্রয় ও বড়লাটের সহিত কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের মীমাংসার জন্য যে আলোচনা হইতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। গত ২৯শে বৈশাখ (১২ই মে) সরকারী বিবৃতিতে তাহাই ঘোষণা করা হইয়াছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হইতে পারেন নাই। মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান (সামন্ত রাজ্যসমূহের জন্য হয়ত রাজস্থান) রাষ্ট্রসংঘে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন—অর্থাৎ ধর্মের বনিয়াদে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। যে প্রস্তাব আলোচনার ভিত্তি করা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের কোন কথা ছিল না—সময়ের উল্লেখ ত পরের কথা। সম্মেলনের ব্যর্থতা ঘোষণার পরেও মন্ত্রিত্রয়ের ও বড়লাটের সহিত কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধী মত প্রকাশ করিয়াছেন—মন্ত্রীরা ব্যর্থতা লইয়াই ফিরিয়া যাইবেন না—এদেশে বৃটিশ-শাসনের অবসান অনিবার্য।

সরকারের আয়োজন—আলোচনার ব্যর্থতার পরে সরকারের আয়োজন দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) যদি বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে, সেই জন্য পুলিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা দৃঢ় করা হইয়াছে ও হইতেছে।

(২) ইহার পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে ঘোষণার ব্যবস্থা হইতেছে। অনেকে আশা করিতেছেন, দুই বা তিন দিনের মধ্যেই সরকার সে সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশ করিবেন।

শাসন-পরিষদের পুনর্গঠন—বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত করা হইবে, একথা অনেক দিন হইতেই বলা হইতেছে। এতদিনে জানা গিয়াছে—রাজনীতিক পরিবর্তন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেই জন্য জঙ্গীলাট প্রভৃতি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সকল সদস্য পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। অবশ্য দাখিল করিলেই তাহা গৃহীত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, বড়লাট যখনই প্রয়োজন মনে করিবেন, তখনই পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইল বলা হইবে এবং তখন বড়লাট নূতন সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন। কিন্তু বড়লাটের শাসন-পরিষদের পুনর্গঠন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা বলা যায় না। তবে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন রাজনীতিক দল হইতে সদস্যদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ মিস্টার জিন্না এই ব্যাপারেও অসঙ্গত দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন—সদস্যদিগের শতকরা ৫০ জন মুসলিম লীগের সদস্য হইবেন! সামন্ত রাজ্যের শাসকগণ এই পরিষদে যোগ দিবেন না। তাঁহারা এখন—

"দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।"

বিদেশ হইতে চাউল আমদানী—ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ভারতের জন্য ৫ লক্ষ টন চাউল দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাঙলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার অস্থায়ী সরকারের পক্ষ হইতে চাউল প্রদানের প্রস্তাব বেতারে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু এদেশের ইংরেজ সরকার সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এবার কি হয়, দেখিবার বিষয়। এবার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া ভারত সরকার সম্মিলিত বোর্ডের দ্বারস্থ হইয়া খাদ্যদ্রব্য চাহিতেছেন। যদি ইন্দোনেশিয়া চাউল প্রদানের প্রস্তাব করেন, তবে তাঁহারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন না একথা অবশ্যই মনে করা যায়। তবে সরকারের মনের কথা—দেবতারাও জানিতে পারেন না—মানুষ কোন্ ছার।

মার্কিণের সহানুভূতি—সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড ভারতবর্ষের জন্য যে পরিমাণ গম বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনানুরূপ নহে বলিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এদিকে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মিস্টার ট্রুম্যানকে জানাইয়াছেন—বিলম্বে বৃষ্টি হওয়ায় ভারতবর্ষে শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া যে মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন; বাস্তবিক অবস্থা ভয়াবহ এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে পরিমাণ খাদ্য যাচঞা করা হইয়াছে, তাহা না হইলে অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিবে। মিস্টার ট্রুম্যান জানাইয়াছেন, মার্কিণ অবস্থা অবগত আছে এবং ভারতবর্ষের বিষয় সহানুভূতি সহকারেই বিবেচিত হইতেছে। সেই সহানুভূতি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা জানিবার বিষয়। এদিকে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারত হইতে অনাহারজীর্ণ—অর্ধনগ্ন নরনারী খাদ্যের সন্ধানে দলে দলে পাঞ্জাবে যাইতেছে—লাহোরের রাজপথেও তাহাদিগকে যাইতে দেখা যাইতেছে। বাঙলায়ও খাদ্যাভাব। পাঞ্জাবে যে অধিক খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাও নহে। যতদিন যাইতেছে, ততই উদ্বেগের কারণ প্রবল হইতেছে। কিন্তু উপায় কি? ভারত সরকার আজ যে বিদেশে ভিক্ষা করিতেছেন, তাহা "গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল" ব্যতীত আর কি বলা যায়?

কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। অন্য যাঁহাদিগের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাঁহারা নাম প্রত্যাহার করায় কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল এইবার চতুর্থবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তিনি যোগ্যতার পুরস্কারেই এই পদ চারিবার পাইলেন।

ফরিদকোট রাজ্য—ফরিদকোট সামন্তরাজ্যে প্রজার উপর অনাচারের যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সে সকল সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার যাঁহাকে দিয়াছিলেন, দরবার তাঁহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না, জানাইয়াছেন—এমন-কি উদ্ধতভাবে সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতজীকেও জানাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, ইহাতেই সেই রাজ্যের ব্যবস্থা বুঝিতে পারা যায়। বলাবাহুল্য বহু সামন্ত-রাজ্য সম্বন্ধেই নানা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি ভূপালরাজ্যে গিয়াছিলেন। তাঁহার তথায় গমনের অব্যবহিত পূর্বে দরবারের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে সেই রাজ্যের হিন্দু প্রজারা হরতাল করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভূপালরাজ্যের হিন্দু প্রজাদিগের অভিযোগ অবগত হইয়া আসিয়াছেন। বিলাত হইতে আগত মন্ত্রীরা ও বড়লাট যে বর্তমান আলোচনায় সামন্তরাজ্য সমস্যা সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন না, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মেজর জেনারল চট্টোপাধ্যায়—আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারল চট্টোপাধ্যায়—আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি বৃটিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া এতদিন পরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় উপনীত হইলে তাঁহাকে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে—বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হইয়াছে। তিনি সম্বর্ধনা সভায় বলিয়াছেন—সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রধান অন্তরায়সমূহের মধ্যে দুইটি। আজাদ হিন্দ ফৌজে সেই দুইটি অন্তরায়ই সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছিল। সেই ফৌজে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান—জাতিধর্মনির্বিশেষে ছিল। অর্থাৎ জাতীয়তার বহ্নিই সঙ্কীর্ণভাব—সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা ভস্মীভূত করিতে পারে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। সেইদিন হইতে সপ্তাহকাল নানাস্থানে নানারূপে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' ও 'দেশের'—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে।

"ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশের সঙ্গে সমলার প্রাকৃতিক দুর্যোগের যেন মিল রহিয়াছে"—কোন সাংবাদিক গান্ধীজীর নিকট এই মন্তব্য করিলে তিনি নাকি বলিয়াছেন—মেঘের আড়ালেই আছে বিদ্যুতের ঝলকানি। কাব্য দৃষ্টি দিয়া—"বিজুরি জরির আঁচল ঝলমল ঝলমল" অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টি দিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাতে কাব্যের ভাষাতেই বলিতে হয়-"স্ফটিক জল খুঁজিস যেথা কেবলি তড়িৎ ঝলকে"!

* * * * *

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস নাকি বলিয়াছেন - লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে দূরত্ব মাত্র তিন ইঞ্চি।। প্রসঙ্গত বিশু খুড়ো আমাদিগকে
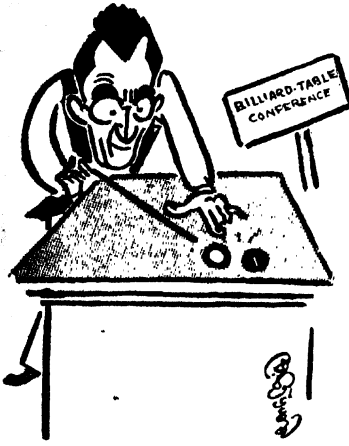
গোপাল ভাঁড়ের গল্প মনে করাইয়া দিলেন। গাধা এবং গোপালের মধ্যে দূরত্ব কতখানি মহারাজা এই প্রশ্ন করিলে গোপাল মহারাজা এবং তার মধ্যে যতখানি দূরত্ব তাহাই মাপিয়া বলিল—"মাত্র একহাত"!

* * * * * * *

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য আদেশ জারি করিয়াছেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ছাড়িতে কেন বিলম্ব করা হইতেছে এই প্রশ্ন করিলে বিশুখুড়ো একটি গল্প বলিলেন। একবার কোনও দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত এক গ্রামে আগুন লাগিলে গ্রামবাসীরা দমকল পাঠাইবার জন্য রাজদরবারে সংবাদ প্রেরণ করে। তাঁদের প্রার্থনাটি ছোট মাঝারি প্রভৃতি কর্তাদের হাত ঘুরিয়া প্রধান কর্মকর্তার নিকট পেঁছিলে তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া হুকুম দিলেন—"দমকল পাঠানো যাইতে পারে।" দমকল হুকুম পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল—কিন্তু তাহা অগ্নিকাণ্ডের তিন মাস পর।

* * * * *

আমেরিকা হইতে জাপানে প্রচুর খাদ্য রপ্তানি করা হইয়াছে; কিন্তু ভারতের জন্য এক পাউণ্ড খাদ্যও আসিয়া পেঁছায় নাই। ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন—এমন কি স্যার গিরিজাশঙ্কর পর্যন্ত! কিন্তু বিস্ময়ের কিছুই নাই. অনেকে না জানিলেও স্যার গিরিজাশঙ্কর নিশ্চয়ই জানেন যে, কলম তরবারি অপেক্ষা শক্তিশালী। পার্ল হার্বারের ক্ষত শুকাইবে কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারের ঘা চিরকাল দগদগে হইয়াই থাকিবে!

* * * * *

প্রস্তাবিত রেলওয়ে Strike শেষ পর্যন্ত হইবে কি না, জানি না, কিন্তু রেলওয়ে দল (বি এণ্ড এ) ইতিমধ্যেই 'ইস্টবেঙ্গল'কে Strike হানিয়াছে, তাহার মর্মন্তুদতা সর্ব-ভারতীয় রেলওয়ে Strike অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। 'গোলে'র মুখে মোহনবাগানের ব্যর্থতার আভাসও ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং মাভৈঃ ইস্টবেঙ্গল !

* * *

রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা দেড়শত টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁহারা Good conduct প্রমাণ করিতে পারিলে দশ

টাকা করিয়া পুরস্কার পাইবেন—এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বাঙলার নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডল। "উচ্চহারে যাঁহারা বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহারা Good conduct প্রমাণ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা শুধু নির্জলা খেতাব পাইয়া থাকেন। এই Consolation prizeটা অবশ্য পূর্বের মতই বলবৎ থাকিবে"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম সিমলায় রাষ্ট্রপতি আজাদের গৃহে ঢুকিয়া এক চোর নাকি অনেক ফলপাকড় খাইয়া গিয়াছে। "আজাদী" ফলই যে দেশ ও দশের কাম্য সেই কথা চোরেরও আজ অগোচর নয়।

* * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম, চীন বৃটেনকে একটি "পেণ্ডা"র বাচ্চা ধরিয়া উপহার দিয়াছে। 'পেণ্ডা' ভল্লুক শ্রেণীর একপ্রকার জীব। "একটি সাচ্চা ভল্লুকের বাচ্চা ধরিয়া

আমেরিকাকে উপহার দেওয়ার জন্য নাকি চীন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে"—পরবর্তী সংবাদটা অবশ্য শুনিলাম খুড়োর কাছে।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ উরস্টারের সঙ্গে প্রথম খেলায় ষোল রানে পরাজিত হইয়াছেন। সংবাদটি খুড়োকে শুনাইলে তিনি বলিলেন—"তাঁহাদের সংখ্যাও ষোলজন, সুতরাং উরস্টারের বণ্টন-প্রথার তারিফ করিতে হয়"—বুঝিলাম প্রথম পরাজয়টা খুড়ো হজম করিতে পারেন নাই।

* * * * * *

এদিকে কলিকাতায় আবার ফুটবল মরশুম শুরু হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিকালে একপশলা করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; বাজারে ইলিশ এবং কুচো চিংড়ির অল্পবিস্তর আমদানী হইতেছে; চায়ের দোকানের ভীড় কিছু কিছু করিয়া জমিয়া উঠিতেছে, এমনকি মা-কালীও হয়ত সন্দেশের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই আমরা সিমলা ছাড়িয়া ভারতের ভাগ্য-পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার জন্য গড়ের মাঠের দিকে তাকাইয়া থাকিব।

বৈদেশিকা

।। লেস্টাইন সম্বন্ধে ইঙ্গ-আমেরিকা কমিটির প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে । আরবদেশগুলিতে ইংরেজবিদ্বেষের ঝড় া যাইতেছে। এই কমিটি সুপারিশ য়াছেন যে, অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদিকে লস্টাইনে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিবার কার দেওয়া হউক, প্যালেস্টাইনের একা আরবদেরও হইবে না, ইহুদিদেরও র না, তাহা উভয়েরই রাষ্ট্র বলিয়া গণিত হইবে এবং কেহ কাহারও উপর ম এবং আধিপত্য করিতে পারিবে না; প্রতি আরব-ইহুদিদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মনোভাব তাহাতে প্যালেস্টাইনকে অবিলম্বে ধীনতা দিলে একটা গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। এব যে পর্যন্ত এই বিদ্বেষভাব দূর না তেছে সে পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে ম্যাণ্ডেট ই বলবৎ থাকিবে; যে শক্তির অধীনে লেস্টাইন থাকিবে তাহাকে এই নীতি কার এবং ঘোষণা করিতে হইবে যে, লেস্টাইনে শিক্ষাবিষয়ক, অর্থনৈতিক এবং জনৈতিক অগ্রগতির গুরুত্ব ইহুদিদের খানি আরবদেরও ঠিক ততখানিই এবং ভয় জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য য়ে যে স্তরবিভিন্নতা রহিয়াছে তাহা চাইবার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করা হইবে; মি-জায়গা বিক্রয়, ব্যবহার এবং ইজারা ওয়ার ব্যাপারে জাতিগত কোন বাধা থাকিবে । মোটের উপর কমিটির রিপোর্টে প্রধান বার সারাংশ ইহাই এবং মধ্য এবং নিকট প্রাচ্যে রবদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িবার সঙ্গত রণ এই কয়েকদফা সুপারিশের মধ্যেই হয়াছে। কিন্তু শুধু এই সুপারিশের বহর খিয়া আরবদের প্রতি অবিচারের মাত্রাটা ঝা যাইবে না, তাহা বুঝিতে হইলে একটু তীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হবে।

পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আরব শগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। যুদ্ধের সময় শত্রু তুরস্ককে পরাস্ত করিবার ন্য ব্রিটেন সঙ্গোপনে আরব দেশগুলিতে চর াঠাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ াইয়াছিল। আরব দেশগুলি আশা করিয়া- ল তাহাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেন তাহাদের ত্তা করিবে। ব্রিটেনও তুরস্ককে শক্তিহীন রিবার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব স্বাধীনতা গ্রামে সাহায্য করিয়াছিল; আরবদের ভরসা য়াছিল তুরস্ক যুদ্ধে হারিলেই তাহারা াধীন হইয়া যাইবে। তুরস্ক যুদ্ধে হারিল ট; কিন্তু আরব দেশগুলি প্রথম মহাযুদ্ধ- যে দেখিল যে তাহারা খাল কাটিয়া কুমীর ানিয়াছে; তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন য়াছে বটে; কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসীর শিকল ায় ঝুলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতা শুধু স্বাধীনতা পাওয়ার প্রতিকূলতা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্যালেস্টাইনে আরবদের নিজ বাসভূমে পরবাসী থাকিবার ষড়যন্ত্রও সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই যখন যুদ্ধ শেষে আরব জাতিদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে ঠিক সেই সময়ে ইহুদীদেরও সঙ্গোপনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের একটি 'ন্যাশনাল হোম' অর্থাৎ জাতীয় বাসভূমি হিসাবে তাহাদের দেওয়া হইবে। ইহুদীদের কাছে নানাপ্রকার সাহায্য যুদ্ধকালে প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার জন্যই এই প্রতিশ্রুতি। একদিকে প্যালেস্টাইনে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে ঐ প্যালেস্টাইনকেই ইহুদীদের বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করা যে পরিমাণ বিবেকশক্তির পরিচায়ক ততখানি বিবেকের জোর এক ব্রিটিশ জাতি ছাড়া আর কোন জাতির পক্ষে সচরাচর সম্ভব ছিল না। যুদ্ধশেষে এই বিপরীত প্রতিশ্রুতির ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। আরব জাতি প্যালেস্টাইনে স্বাধীনতা তো পাইলই না, লাভের মধ্যে দলে দলে বিত্তশালী ইহুদীরা আসিয়া প্যালেস্টাইনে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল। শিক্ষায় উন্নততর, আর্থিক ব্যবস্থায় আরও অগ্রসর বিদেশী জাতির সঙ্গে জীবন-যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরব জাতির পরাজয় অনিবার্য। ফলে বুঝা গেল প্যালেস্টাইন ইহুদীপ্রধান হইতে খুব বেশী সময় লাগিবে না। স্বাধীনতা চুলোয় যাক্ স্বদেশ বিদেশ হইয়া যাইবে এবং সেখান হইতে হয় বিতাড়িত নতুবা ইহুদীর ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে এই কল্পনা আরবের মনে ব্রিটিশ প্রীতি বাড়াইয়া দেয় নাই। বেপরোয়া হইয়া আরব সন্ত্রাসবাদীরা প্যালেস্টাইনে নিদারুণ অশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিল। ক্রমে জার্মানীতে নাৎসী অভ্যুদয় এবং ইতালিতে মুসোলিনীর পরাক্রম দেখিয়া সাম্রাজ্য চিন্তায় ব্যাকুল ব্রিটেন আরব অসন্তোষ কমাইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিয়া দিল যাহাতে যুদ্ধ বাধিলে আরব দেশগুলি ব্রিটিশের শত্রুপক্ষে সাহায্য না করে যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজের প্ররোচনায় করিয়াছিল। ইহার ফলেই ১৯৩৯ সালে 'হোয়াইট পেপারের' জন্ম। এই নূতন ব্যবস্থায় প্যালেস্টাইনে বিদেশী—এক্ষেত্রে ইহুদী —আমদানীর এবং জমিজায়গা অধিকার করিবার বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইল। অর্থাৎ প্রায় ২০ বৎসর ইহুদীকে সুয়োরাণী হিসাবে ব্যবহার করিয়া ১৯৩৯ সালে আরব-দুয়োরাণীর দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করা হইল। ব্রিটেন ম্যাণ্ডেটের অধীন হইবার পর প্যালেস্টাইনে ইহুদীর সংখ্যা ৪ গুণ বাড়িয়া যায় এবং বর্তমানে আরব জনসংখ্যা ইহুদী জনসংখ্যার দ্বিগুণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন আইনে ১৯৩৯ সালের পর হইতে ইহুদী আমদানী বাধাগ্রস্ত হইল; কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় এই প্রশ্ন চাপা পড়িয়া গেল। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের আগে হইতেই ইউরোপে বিশেষত জার্মানীতে এবং জার্মান অধিকৃত দেশে ইহুদীদের দুঃখের সীমা ছিল না। ইহুদীদের প্রতি একটা নৈতিক কর্তব্য বিজয়ী জাতিবর্গ অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না, বিশেষ করিয়া আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে ইহুদীদের আর্থিক এবং অন্যপ্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিরও নিদারুণ চাপে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিশেষত পূর্ববর্তী গভর্নমেণ্টের নীতি ছিল আরবদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের দলে টানা। এই উদ্দেশ্যেই 'আরব লীগ' স্থাপিত হইয়াছে এবং ব্রিটিশের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। নূতন গভর্নমেণ্টও আরবদের সন্তোষ বিধানেই তৎপর ছিলেন। ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদী সন্ত্রাস-বাদ আরম্ভ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কিছুকাল আগে প্রকাশ্যভাবে ইহুদীপক্ষ অবলম্বন করিয়া ১ লক্ষ ইহুদী প্যালেস্টাইনে প্রেরণের সমর্থন করিয়াছেন। ইহুদীদের দুঃখে সমবেদনায় কাতর হইয়া ট্রুম্যান মহাশয় তাহাদের প্যালেস্টাইনে প্রেরণে তৎপরতা দেখাইয়াছেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত জনবিরল যুক্তরাষ্ট্রে তাহা-দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বদান্যতা প্রকাশ করেন নাই। এদিকে ৬জন ইংরেজ এবং ৬জন আমেরিকাবাসীকে লইয়া প্যালেস্টাইনে অনু-সন্ধান কমিটি তৈরী হইল। এই দ্বাদশ ব্যক্তির রিপোর্টেই ১ লক্ষ ইহুদীকে ১৯৪৬ সালেই প্যালেস্টাইনবাসী করিবার সুপারিশ জানানো হইয়াছে। শুধু প্যালেস্টাইন নয় প্রতিবেশী আরব দেশগুলিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এই ব্যবস্থা তাঁহারা মানিয়া লইবেন না। আরব জননায়কগণ স্ট্যালিনের নিকটও নালিশ জানাইয়াছেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তির সংখ্যা যুদ্ধের ফলে অনেক কমিয়াছে; কিন্তু এখনও কাহারও একাধিপত্য হয় নাই। ইঙ্গ-আমেরিকার বিরোধিতা করিলে সাহায্য পাইবার একটি স্থান আছে, তাহা হইতেছে রাশিয়া। সমস্ত জগতের অনিবার্য গতি হইতেছে দুইটি পরস্পর বিবদমান ভাবী যুযুৎসু দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আরব দেশ-গুলি কোন দলে যায় ইহাই নির্ণীত হওয়ার দিন আসিয়াছে। প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ইঙ্গ-আমেরিকার রিপোর্ট আরব দেশগুলিকে স্ট্যালিনের দলের দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ—
সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন ছবির পরিচয়

হমরাহী (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী : ...্যাতির্ময় রায়; চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও আলোক-...ত্র : বিমল রায়; সুরযোজনা : রাইচাঁদ বড়াল; ...িকায় : রাধামোহন, বেদী মুখোপাধ্যায়, কাপুর, ...নতা বসু, রেখা মিত্র প্রভৃতি।

ছবিখানি গত ৪ঠা মে নিউ সিনেমা-চিত্রা-...পালীতে মুক্তিলাভ করেছে।

'হমরাহী' নিউ থিয়েটার্সের তথা ভারতের ...গান্তকারী ছবি 'উদয়ের পথে'র হিন্দী ...স্করণ। কাহিনী বাঙালী রসগ্রাহীদের ...ছে সুপরিচিত, হিন্দী চিত্রনাট্যও বাঙলারই বহু অনুসরণ। ছবিখানিতে বাঙলা ...স্করণের সব গুণই বর্তমান, কেবল অভিনয়ের ...ক ছাড়া, এর জন্যে মুখ্যত প্রধান ...কাভিনেতা রাধামোহনই দায়ী। বাঙলার ...ুকরণে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে গিয়ে ...ন্দী শব্দের উচ্চারণ এবং কথার মাত্রা ও ...র দিকে নজর রাখেননি, ফলে ভূমিকাটি কবারেই প্রাণহীন হয়েছে এবং তাঁরই ভূমিকা ...স্ব হওয়ায় ছবিখানিই গিয়েছে নীরস হয়ে। ...ী মুখার্জী পিতার ভূমিকায় বিশ্বনাথ ...ড়ীর কাছে পৌঁছতে না পারলেও ভালই ...ভিনয় করেছেন। বিনতা বসু হিন্দী ছবিতেও ...ন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যে অভিনয় করতে ...রেন তার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ...খানি মূল বাঙলা গান সন্নিবেশ করে ...রচালক একটু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। ছবি-...ন 'উদয়ের পথে'র দর্শকদের কাছে ততটা ...ন লাগবে বলে আশা করা যায় না।

মেঘদূত (কীর্তি পিকচার্স)—চিত্রনাট্য ও ...চালনা : দেবকীকুমার বসু; আলোকচিত্র : ...দ ইরাণী, বিদ্যাপতি ঘোষ ও গোবর্ধন প্যাটেল; ...যোজনা : কমল দাশগুপ্ত; দৃশ্যসজ্জা : চারু ...; ভূমিকায় : লীলা দেশাই, সাহু মোদক, ...ন্তী, আগা জানি, কুসুম দেশপাণ্ডে প্রভৃতি।

ছবিখানি গত ৩রা মে শ্রী-উজ্জ্বলা-সিটি-...শ্রীতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

প্রযোজকরা নামানুযায়ী সত্যিই এক ...র্তি স্থাপন করেছেন। ছবিখানি কেন যে ...। দেড়েকের ওপর তৈরী হয়ে গুদামজাত ...ছিল এতদিনে তা বোঝা যাচ্ছে। লড়াইয়ের ...রে বেশ মোটা কয় লক্ষ টাকা যে খরচ ...চে দৃশ্যসজ্জাদি দেখেই তা অনুমান করা ... সবচেয়ে আমাদের বিস্মিত করেছেন ...কীবাবু। রূপক কাহিনীর চিত্ররূপদানে ... যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিগণিত হয়ে...ছেন এতকাল তার কি একটুকু জেরও তার ...বাকী নেই? কালিদাসের অমন কাব্য-... ওপরেই তিনি যেন অভক্তি ধরিয়ে...ছেন। কাহিনীটিতে কোথাও নাট্যরস ... হতে পারেনি; দৃশ্যসজ্জা ও সাজ-

পোষাকাদিতে স্থান ও কালের বাছবিচার রাখা হয়নি মোটেই। নৃত্য ও গীতকেই মূল বস্তু ধরে নেওয়া ঠিকই হয়েছে, কিন্তু সে দিকদুটির মাধুর্য বিষয়েও তেমন নজর দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না—নাচে সোহনলাল ও সঙ্গীতে কমল দাশগুপ্ত কাউকেই প্রশংসা করা যায় না। যক্ষ পরিচারক হাস্যমুখ ও প্রিয়ার পরিচারিকা হাস্যমুখীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লঘুরস পরিবেশনে যতখানি যত্ন নেওয়া হয়েছে অন্যদিকে তার অর্ধেক যত্ন নিলে ছবি-খানি অন্তত দেখবার উপযুক্ত হতো। লঘুরস পরিবেশনে দেবকী বসু যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় এবার থেকে slap stick comedy তোলায় মনোনিবেশ করলে নতুন কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হবেন। আলোকচিত্র গ্রহণে তিনজন ঝানু কলাকুশলীর কেন দরকার হয়েছিল ছবিখানি দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

অভিনয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হাস্য-মুখের ভূমিকায় আগা জানি। ভাঁড়ামির মধ্যে দিয়ে হাস্যমুখই যা দর্শকদের জমিয়ে রাখে নয়তো, শেষ পর্যন্ত দেখা মনের ওপর পীড়ন ছাড়া কিছু নয়। সাহু মোদককে যক্ষের ভূমিকায় মানিয়েছে তবে অভিনয় জমেনি, আর প্রিয়ার ভূমিকায় লীলা দেশাইকে মানায়ওনি আর অভিনয়ও কিছু তার দেখবার নেই। সর্বদিক বিচার করে মেঘদূতকে ইদানীংকালের সবচেয়ে ব্যর্থ ছবি বলে আখ্যাত করা যায়।

রাজপুতানী (রঞ্জিত মুভীটোন)—চিত্রনাট্য, পরিচালনা : এ্যাসপী, আলোক চিত্র : ডি কে এমবর, সুরযোজনা : ভুলো সি রাণী; ভূমিকায় : বীণা, জয়রাজ, বিপিন গুপ্ত, গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি।

গত ১০ই মে প্যারাডাইস ও দীপকে মুক্তিলাভ করেছে।

ইতিহাসখ্যাত রাজপুত বীর রাণা প্রতাপ এবং তদীয় ভ্রাতা শক্ত সিংয়ের মধ্যে মেবারের সিংহাসন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তাকেই কেন্দ্র করে 'রাজপুতানী'র কাহিনী, যদিও ছবির নামানু-যায়ী শক্ত সিংয়ের প্রণয়িণী কাপুর্দেকেই কাহিনীর প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য যাচাই করতে যাওয়ার চেয়ে এটাকে একটা কল্পিত কাহিনী বলে ধরে নিলে ছবিখানিকে তবু কিছু উপভোগ করা যায়। কাহিনীটি তাহলে দাঁড়ায় এই : কাপুর্দে নাম্নী এক রাজপুত বীরাঙ্গনা শক্ত সিংয়ের প্রেমে পড়ে; কিন্তু শক্ত সিং রাজদ্রোহী বলে ঘোষিত হওয়ায় কাপুর্দে তাকে বিবাহ করতে নারাজ হয়। শক্ত সিং দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে শত্রুপক্ষ মানসিংয়ের সঙ্গে যোগদান করে; কিন্তু হলদীঘাটের যুদ্ধে সে প্রতাপ সিংকে নিরাপদে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার অপরাধে বন্দী হয়। প্রতাপ সিংয়ের গুপ্ত আশ্রয় পথ পাছে বলে ফেলে এই আশঙ্কায় শক্ত সিং নিজের জিভ কেটে ফেলে। কাপুর্দে শক্ত সিংয়ের বন্দীদশার খবর পেয়ে তাকে মুক্ত করার জন্য আসে এবং সে কাজে সফল হয়ে তাকে নিয়ে এক সামন্ত রাজার কাছে পৌঁছায়, যে প্রতাপ সিংকে সাহায্য করার ফলে মান সিং সেই হলদীঘাটেই পরাজিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের লক্ষ্য ও আদর্শ একতা, ত্যাগ ও

সংগঠনই হচ্ছে কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু এবং দেশাত্মবোধক উদ্দীপনাময় সংলাপ ও 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে ছবির পরিসমাপ্তি 'রাজপুতানী'কে সময়োপযোগী ছবি করে তুলেছে।

অভিনয়ে রাণা প্রতাপের ভূমিকায় বিপিন গুপ্তের বাচন ও অভিনয় মঞ্চঘেষা হলেও ভালই লাগে; বম্বেতে বিপিন মনে হয় স্থায়ী আসন করে নিতে পারবে। কাপুদের ভূমিকায় বীণার অভিনয় তার আগেকার কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গেছে। কেবল শক্ত সিংয়ের সঙ্গে প্রণয় দৃশ্য গুলিতে তাকে মোটেই ভাল লাগেনি। আর শক্ত সিংয়ের ভূমিকায় জয়রাজকে তো একজন বীরপুরুষ বলে কিছুতেই ধরা গেল না।

যুদ্ধদৃশ্যগুলি, বিশেষ করে সামনাসামনি অসিযুদ্ধ বেশ প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। পরিশিষ্টে রণসজ্জার গানখানি বেশ জমিয়ে দেয়, তা ছাড়া আর কোন গানই জমেনি। রঞ্জিতের আর সব ছবির মত খানিকটা ভাঁড়ামো আর ছ্যাবলামো ঢুকিয়ে যে কোথাও দেওয়া হয়নি এইটেই ছবিখানি দেখতে যাওয়ায় সবচেয়ে বড় আশ্বাস।

বিবিধ

গত রবিবার নীরেন লাহিড়ী তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের প্রথম ছবির মহরৎ কার্য সুসম্পন্ন ক'রেছেন।

পরিচালক বিমল রায় তাঁর পরবর্তী দ্বিভাষী ছবি সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্প অবলম্বনে রচিত কাহিনী 'অঞ্জনগড়'-এর মহরৎ গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সুসম্পন্ন ক'রেছেন।

* * * * * *

এই মাসে হাওড়াতে দুটি নতুন চিত্রগৃহের উদ্বোধন হ'য়েছে—'শ্যামশ্রী' ও 'পারিজাত'—শেষেরটিতে শহরের সমস্ত প্রমোদ গৃহের চেয়ে আসন সংখ্যা বেশী।

রবীন্দ্রনাথ

'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'—২৫শে বৈশাখ ভারতের গগনে এমন একটি প্রকাশ হয়েছিল, যাঁর কৃপায় আমরা এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলাম, আজ তাঁরই জয় দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে একদিন শ্রীঅরবিন্দকে বন্দনা করে বলেছিলেন, 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি'। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ ভারতের আত্মারই বাণীমূর্তি। ভারতের যিনি জীবন-দেবতা তিনি যুগে যুগে জগতে তাঁর ব্যথামাখা কথা ছড়িয়েছেন। মৃত্যুময় জগতের মনকে তিনি তাঁর অমৃতময় বাণী দিয়ে স্পর্শ করেছেন; জগৎ ভারতের কাছ থেকে মহাভয়ের ভিতর অভয় পেয়েছে। ভারতের জীবন-দেবতার সে ব্যথা গাথা হয়ে উঠেছে, প্রজ্ঞানপূর্ণ লাবণ্য নিয়ে সে জ্বালারাশি জগতের অন্ধকার উদ্ভিন্ন করেছে। যাঁকে পেলে অমরত্ব লাভ হয়, জীবনের সকল দুঃখ, সব পরাভব ঘুচে যায় বিশ্ববাসী তাঁর সন্ধান পেয়েছে। ভারতের ঋষি জগৎকে ডেকে বলেছেন, জেনেছি আমি তাঁকে জেনেছি যাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; অমৃতত্ব লাভ যদি করতে হয় এই পথে এসো, অন্য পথ নেই। মনের মূলে দেবতার যে লীলার স্পর্শ পেয়ে ভারতের ঋষিগণ বোলের ভিতর দিয়ে জগৎকে এইভাবে কোল দিতে গিয়েছিলেন, এ দেশের সাধকেরা তাঁর একটি সনাতন স্বরূপের পরিচয় পেয়েছিলেন। আমাদের রূপগোস্বামী মহারাজ তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এ সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর বচন উদ্ধৃত করেছেন। বচনটি এই—"ধন্যাঃ স্ফুরন্তি তব সূর্যকরাঃ সহস্রং যে সর্বদা যদুপতেঃ পদয়োঃ পতন্তি।" অর্থাৎ হে সূর্য, তোমার সহস্র সহস্র কর ধন্য, তারা আনন্দময় ছন্দে বিস্ফুরিত হইয়া যদুপতির পাদপদ্মে ছুটে গিয়ে পড়ছে। 'গীতার ইমম্ বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ং' উক্তিটি এতে আমাদের স্মরণ হয়। এক্ষেত্রে সাধকের অনুভূতির তাৎপর্য এই যে, সূর্য তাঁর জীবন-দেবতার আপন বেদনাময় বচন ধারায় অন্তরে মেতে বাইরে সহস্র হাত বাড়িয়ে তাঁরই পাদপদ্ম সেবা করছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাদপদ্ম সেবা বলতে রস সাধনাই বোঝায়। স্পর্শই রসের পরম ধর্ম, চুম্বন, আলিঙ্গন এই রসধর্মেরই বিলাস। পাদপদ্ম সেবাতে রতি রসের একান্ত পরিপূর্তি ঘটে; নিজের জীবনযৌবনকে দেবতার পায়ে অর্ঘ দেওয়া হয়। প্রেমের ছন্দে জীবনকে এইভাবে সরস করে বিশ্বময় জীবন দেবতার পরম স্পর্শ-রস সংবেদনে নিজেকে অর্ঘদানের সনাতন বাণীই ভারতবর্ষ জগতে প্রচার করেছে। অন্তরে তাঁর বাণী শুনে সেই সুরের সংগে বিশ্ব জগতে তাঁর নূপুরের ধ্বনিকে সংগে বিশ্ব জগতে তাঁর নূপুরের ধ্বনিকে মিশিয়ে নেবার রসতত্ত্ব সে জগৎকে জানিয়েছে। গায়ত্রীর মর্মকথাও বোধ হয় এই। রবীন্দ্রনাথকে গায়ত্রী সাধনারই মূর্ত বিগ্রহ বলা যায়। তিনি গায়ত্রীর অন্তর্নিহিত ঋত অর্থাৎ সত্য বা অমৃত অন্য কথায় জীবন-দেবতার মধুরাক্ষরা ধ্বনি, ব্রহ্ম সংহিতার ভাষায় শব্দব্রহ্মময় বেণুনাদের প্রসাদ-রস সাক্ষাৎ সম্পর্কে আস্বাদন করেছিলেন। সে ধ্বনি তাঁর অন্তরের তারে 'কোমল বচন গণে' বেদনা জাগিয়ে বেজে উঠেছিল এবং তার সকল প্রাণ ক্রিয়ার রসময় বিভঙ্গি তুলে দেবতার পায়ে তাঁকে প্রণত করেছিল। অন্তরের সুরের ব্যথা ভিতর দিয়ে তিনি চরাচরে জীবন দেবতার পাদ-পদ্মেই গাঁথা পড়েছিলেন। তার সব কর্ম হয়েছিল, জীবন দেবতার পদের লীলার ছন্দের পরম রস-স্পর্শগত আনন্দের আস্বাদন।

বন্ধুগণ, বিশ্বপ্রেম বা মৈত্রী শুধু মুখের কথায় সত্য হয় না; বিশ্বের শাশ্বলীন অপরিম্লান প্রেমের অপরোক্ষ ছন্দকে হৃদয়ে ধরে এবং সেই রসের সাড়াতেই তা জগতে সত্য হয়ে থাকে। বিশ্বের যিনি প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের কান দিয়ে তাঁর গান শুনেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের দান বিশ্ববাসীর কাছে এমন মাধুর্যময় হয়েছে এবং আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-গত সব কার্পণ্য দূর করে দিয়ে আমাদের অন্তরে তা অপরিমেয় মানবত্বের বীর্য সঞ্চার করছে। যাঁদের ভিতর দিয়ে প্রাণ-ধর্মের এমন প্রকাশ ঘটে, বিলাস ঘটে তাঁদের বিনাশ নাই। তাঁরা কালজয়ী। তাঁরা আদিত্যবর্ণ, সূর্যধর্মী পুরুষ, কালের অন্ধকার তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। কালের গতিপথে তাঁদের জয়রথ উদয়ের আলোই ছড়াবে, অস্ত আর সেখানে নাই। ভারতবর্ষ এমন পুরুষদের নিয়েই গর্ব করেছে এবং ভারতের কবিকণ্ঠ এঁদেরই বন্দনা গান করেছে। আমরা দেখতে পাই ভাগবতে নারদ ঋষি বীণাযন্ত্র বাজিয়ে এদেরই স্তব গান করছেন। ঋষি বলছেন, ধন্য তাঁরাই ধন্য, যারা ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা কত পুণ্যেই না করেছে; কারণ এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করলে প্রেমময় দেবতার সেবার জন্যেই মানুষের অন্তরে ব্যথা জেগে ওঠে। অন্য দেশের লোক বহুদিন বাঁচবে কিসে শুধু এই ভাবনাতেই থাকে, তাদের মন থাকে, কোন দেশের পর কোন দেশ জয় করবে, কেবল এই চিন্তায়। আর তারা এইসব স্বার্থকেই বড় করে দেখে। তারা এ সত্য বোঝে না যে, ঐ পথে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, দুঃখই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনায় প্রেমপূর্ণ ত্যাগের পথে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সব কর্মের ভিতর দিয়ে ত্যাগকে জীবন্ত করে তুলে মানুষ এখানে শ্রীহরির অভয়পদ লাভের অধিকারী হয়। নারদ ঋষি কোন যুগে বীণা বাজিয়ে ঐ গান গেয়েছিলেন, অঙ্কের আখরে তার হিসাব দেওয়া সহজ নয়। প্রসিদ্ধ পুরাণবেত্তা যাঁরা তাঁদেরও এক্ষেত্রে অনেকটা অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হবে; কিন্তু ভারতের আত্মার সেই সনাতনী বাণী রবীন্দ্রনাথের সুরেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। আপনারা সকলেই জানেন, কবি কত মধুর ছন্দে সে বাণীর অন্তর্নিহিত চেতনায় আমাদিগকে দৃপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এতেই ধরা পড়ে রবীন্দ্র-নাথের জীবনের বৈশিষ্ট্য। কবি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন; কিন্তু ভারতের চিন্ময় বিগ্রহকেই তিনি বিশ্ব বীজ-স্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং মনকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে, ভারতের সনাতনতত্ত্ব সাধনাঙ্গে পরিস্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বিশ্ববীজের ভিতর দিয়ে কামবীজের রসময় সাধনায় পরমার্থতা লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রেমকে ভিত্তি করেই কবির প্রেম বিশ্বে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল। রস সাধনার একটি নিগূঢ় কথা এই যে, ফাঁকার উপরে সে সাধনা চলে না, এ সাধনা ক খ থেকে আরম্ভ করে এ এস-এ পর্যন্ত ধরাধরি ছোঁয়াছুঁয়ির পথে এগিয়ে যায়। বস্তুত যে প্রেম, দেশের দুঃখ, জাতির দুঃখকে উপেক্ষা করতে পারে, সে প্রেম, প্রেমই নয়, বিশ্বপ্রেম তো দূরের কথা। আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই, বেণ রাজা তাঁর গরীব প্রজাদের উপর অত্যাচার করছেন দেখে সমাজপতি ব্রাহ্মণেরা বিচলিত হয়ে উঠলেন; কিন্তু কি করা যায়? রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্ররোচনা দেওয়া সে তো প্রেমের বিরোধী কাজ হয়। ব্রাহ্মণদের তো সমদৃষ্টি হওয়া উচিত; তাঁরা শান্ত হবেন এই তো শাস্ত্রের নির্দেশ। এক্ষেত্রে ঋষির নির্দেশ হলো এই যে, ব্রাহ্মণ যদি তাঁর সমদৃষ্টি এবং শান্ত অবস্থার দোহাই দিয়ে দরিদ্রের উপর প্রবলের অত্যাচারকে উপেক্ষা করেন, তবে তাঁর সমদৃষ্টি একটুও হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুর্বল বা ভীরু হয়েই পড়েছেন, এমন যারা দুর্বল, তাঁদের দ্বারা ব্রহ্ম সাধনা চলে না, তাঁদের ব্রহ্মত্ব ছেঁদা ঘড়ার জলের মতো সব নষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপ্রেমের নামে দুর্বলতাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। এদেশের উপর যখনই পশু শক্তির অত্যাচার ও নির্যাতন উদ্যত হয়েছে, তখনই কবি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে অন্যায়কে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর বজ্র গম্ভীর ধ্বনিতে অত্যাচারীদের বুক কেঁপে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জীবন ছিল; কিন্তু এইদিক দিয়ে দেশের রাজনীতির বলিষ্ঠ সাধনার ধারার সংগে কবির অন্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের জাতীয়তাবাদীদের এই হিসাবে তিনি গুরু ছিলেন; কিন্তু কবির এই যে স্বদেশ প্রেম, পাশ্চাত্য তথাকথিত পেট্রিওটিজমের সংগে তা ঠিক মিলবে না। কারণ তার মধ্যে জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত একটা বিদ্বেষ রয়েছে। এর দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের উপর পশুর মত ব্যবহার করছে; এ বস্তু ভারতের নয়। ভারতের দেশপ্রেম বা স্বাজাত্য বা স্বদেশের গর্বানুভূতি সেবার প্রেরণাই জাগিয়েছে, ভোগের কামনা, লুণ্ঠন বা দস্যুতার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় নাই। কবি যত কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছেন বোধ হয় আধুনিক জগতে আর কেহই তেমনভাবে করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেবের পর ভারতের বুক থেকে মহামানবতার এত বড় সাড়া জগৎ আর পায় নাই, একথা বলা যেতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, দান জিনিষটা প্রাণের কাজ এবং প্রাণের ধর্ম; সৃষ্টির মর্ম কথা এই দান। ব্রহ্ম যিনি তিনি প্রাণময়, এবং এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁর দান স্বরূপেই এসেছে। আর এই সৃষ্টির মূলে রয়েছে দৃষ্টি। তিনি নিজের মাধুরী দেখে, নিজের আনন্দে নিজেকেই ছন্দে ছন্দে দান করেছেন। প্রকৃত সৃষ্টি কার্যে এই আপন দৃষ্টি বা অন্য কথায় আত্মীয়তারই ব্যথা থাকে। কবির দানে, তাঁর গানের মূলে এইরূপ আত্মদৃষ্টিরই অপরিম্লান মাধুরী ছিল। কবির গীতি চরাচরে পরিব্যাপ্ত যিনি আত্মস্বরূপ তাঁর চরণেই তাঁর প্রণতি।

মহানির্বাণতন্ত্রের ভাষায় তোমাকে নমস্কার; কিন্তু এ তোমাকে নমস্কার নয় বস্তুত আমাকেই নমস্কার; তোমার মধ্যে যে আমি তাঁকে নমস্কার। কবির দৃষ্টি এমনই পরম প্রেমের স্পর্শ পেয়েছিল। নইলে কেহ কি এমন করে ভালবাসতে পারে? সমস্তটা জীবন সেবাব্রতে উৎসর্গ করে দিতে পারে! এই প্রেমের দৃষ্টি মূলে না থাকলে প্রাণের ধারা সৃষ্টিতে এমন করে অজস্রভাবে লীলায়িত হয়ে উঠতে পারে না। নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলে তবে নিজেকে বুঝে পাওয়া যায়। নিজের ভিতর বিশ্ব বীজের বিকাশ-বেদনায় কর্মসাধনায় প্রাণপূর্ণ এই যে চেতনা আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখতে পাই, জগতে সে জিনিষ বড়ই দুর্লভ। এমন মানুষ জগতে বেশী আসে না। যখন যে জাতির ভিতর এমন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে, সে জাতি এবং সে দেশ ধন্য হয়ে যায়। এরা নিজেদের বরাভয়প্রদ চিন্ময় প্রভাবে জাতির নিত্য সহায় এবং আশ্রয়-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মর্ত জীবনের দুঃখে কষ্টে, দ্বন্দ্ব সংঘাতের লাঞ্ছনা ও তাড়নার মধ্যে এদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় জাতি সান্ত্বনা লাভ করে এবং এঁদের চিন্ময় প্রসাদে অবসাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়। এঁদের তো মরণ নাই-ই; পক্ষান্তরে এঁরা মরণগ্রস্ত এবং মরণগ্রস্তকে অমৃত দিয়ে উদ্দীপ্ত করেন; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এখনও আমাদের কাছেই আছেন এবং থাকবেন। জাতীয় জীবনের সংকট-কালে আমরা কবির মুখে যেমন অভয়বাণী শুনেছি এবং তাতে বৃহৎ কর্মে আত্মনিবেদনে উদ্দীপিত হয়েছি, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণও তেমনই কবির প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করবে, তাঁর পদমূলে উপবেশনের সান্নিধ্য উপলব্ধি করে তেমনই আত্মবলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

এই হিসাবে ২৫শে বৈশাখের এই পুণ্য তিথিতে কবির যেমন মর্তলোকে আবির্ভাব ঘটেছিল, সেইরূপ তাঁর চিন্ময় জীবনের আবির্ভাবও আমাদের কাছে নিত্য হবে। আমরা বিষ্ণু পুরাণে দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সম্বোধন করে বলেছেন, আমি দেবতা নই, আমি গন্ধর্ব নই, আমি যক্ষ বা দানবও নই, আমি তোমাদেরই আপনার এবং এই আপনভাবের চেতনার ভিতর দিয়েই আমি জন্মগ্রহণ করে থাকি। আমাকে অন্যভাবে তোমরা দেখো না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তিনি বিশ্বপ্রেমিক; দেশ এবং কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে তার উদার দৃষ্টি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা বাঙালী, আমাদের পক্ষে তিনি আপনার। আমাদের বন্ধু, স্বজন, আমাদের ঘর, আমাদের সংসার, এদের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃষ্টিতে আমাদের পরিপুষ্টি করে তাঁর সৃষ্টি রসসঞ্চার করেছে। বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার নরনারীর মাধুর্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের অবদান মহিমায় সত্য করে জেনেছি, প্রত্যক্ষ এই প্রতিবেশ-প্রভাবকে অনায়াসে অবলম্বন করে প্রাণরসের বিলাস উপলব্ধি করবার পথ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বগুরু, কিন্তু সে সত্য অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে গিয়ে, আমরা যেন নিজদিগকে বঞ্চনা না করি এবং দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কবির যে বেদনা সে সম্বন্ধে চেতনা না হারাই। আমরা যেন দুর্বলতাকে প্রেমের জায়গায় নিয়ে না বসাই এবং স্বার্থ সংকীর্ণ ভীরুতাকে গভীর প্রেমের ব্যথা বলে ভুল বুঝে, অহিংসার বচনা না আওড়াই। আজ এইরকম ভণ্ডামি, ঘৃণ্য এই ধরণের মিথ্যাচার জাতির সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, ধর্মের মুখোস পরে অধর্ম এবং নিষ্ঠুর রাক্ষসের প্রবৃত্তি সমস্তটা জাতিকে দুর্গতির পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে। এগুলোকে ভেঙেচুরে দিতে হবে, এসব অনাচারের সঙ্গে কোনরকম গোঁজামিল চলবে না; কিন্তু সে কাজ হবে শুধু তাদের দ্বারা, যারা নিজেদের অন্তরে প্রাণের প্রবল সাড়া পেয়েছে। একাজ করবে তারাই যারা গতানুগতিক স্বার্থ সংস্কার ছেড়ে উঠতে পারবে। কথায় কথায় যারা ধর্মের বুলি আওড়িয়ে থাকেন, আজ বুঝে দেখবার দিন এসেছে যে, তাঁদের ব্যথা কোথায়? আজ তাদের শিখিয়ে দিতে হবে যে, যে কাজের মূলে ত্যাগ নেই, যে কার্যের মূলে প্রাণের প্রেরণা নাই, তা ধর্ম নয়। প্রাণের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম, মরণকে অতিক্রম করাই ধর্ম; গতানুগতিক ধারার মধ্যে জরা মরা নিয়ে জড়িয়ে থাকা ধর্ম হতে পারে না। ভারত ভূমি অমৃতত্বের এই সনাতন বাণীকেই জগতের সম্মুখে বিঘোষিত করেছে এবং এই অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সে এই মর্ত্য জগতে বিজয়লাভ করবে। স্বার্থকে ভোগকে যারা পাকা করবার জন্য এতদিন লাফালাফি করছিল, তাদের সব চেষ্টা দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এলো। সব ভেঙে পড়ছে, মানুষ এর ভিতর দিয়ে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততা কিছুই পাচ্ছে না। জয় করতে গিয়ে চারি-দিক ঘিরে কেবল ভয়ই এসে তাদের জড়িয়ে ধরেছে। ত্যাগের পথ ছেড়ে ভোগের পথের যে এই পরিণতি কবি অনেকবারই সে কথা বলেছেন এবং এ সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের অবদানের গরিমায় ঋষিদের প্রদর্শিত পরম সত্যকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি এবং অনার্যজুষ্ট অসত্য আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত না করে। অসুরদের দম্ভ দর্প দেখে আমরা কেঁপে উঠছি; পৃথিবী এদের পদভরে যেন টলমল করছে, কিন্তু এসবই বাইরের, ভিতরের জোর এদের নেই, প্রাণবলের কাছে এরা এলিয়ে পড়ে। সে শক্তি সুভাষচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র নিজের প্রাণপূর্ণ কর্মসাধনায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বৃহৎ বেদনা নিয়ে মানুষ যদি জাগে, তবে তার তেজের ছটায় সব দুর্বলতার জীর্ণকারী বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের সংস্কারগত যত দৈন্য যেগুলো জাতি, বর্ণ সম্প্রদায়ের নামে আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছে সব শূন্যে উড়ে যায়। সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রাণবলে সকল সাম্প্রদায়িকতা, সব প্রাদেশিকতা এবং উপদলীয় দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে আজ ভারতের আকাশে উজ্জ্বল মহিমা বিস্তার করছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এর মূলে অনেক-খানি আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। কবি সুরে সুরে তাপ ছড়িয়ে আত্মোৎসর্গের এই ভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনটা শুধু আগে একটা প্রতিবাদ মাত্র ছিল, রবীন্দ্রনাথের সুরের ঝঙ্কারেই তা আগুনের মতো জ্বলে উঠে-ছিল, সে কথা আমরা ভুলি নাই। তাই আশা আছে, এ জাতি মরবে না এবং অসুরের শক্তি একে পিষ্ট করতে পারবে না। ভারতের বাণী জগৎ একদিন পাবে এবং অমৃতত্বের স্পর্শে তার দানবীয় উন্মত্ততা ঘুচবে। আসুন, প্রার্থনা করি। রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত কণ্ঠ বাণী আমাদের মধ্যে প্রাণবল সঞ্চার করুক। আত্মদানের অমোঘ আহ্বানে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে অমরত্ব অর্জন করার প্রেরণা আমরা তাঁর কাছ থেকে আজও পাব। অমৃতের অধিকারী তিনি, তিনি গুরুরূপে সদাজাগ্রত থেকে আমাদিগকে অভয়দান করবেন।*

---

* হাওড়া রবীন্দ্র সমিতির অনুষ্ঠানে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

বিলাত হইতে যে মন্ত্রিত্রয় ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমাবধিই আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ ছিল। কারণ, বৃটেন যে সহসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিবে, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাহেতু আমরা তাহা মনে করিতে দ্বিধানুভব না করিয়া পারি না।

গত রবিবারে সিমলায় মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, তাহা আমরা পূর্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। কারণ তাঁহারা প্রথমেই

(১) ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠের তুল্যাসন দিয়া গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন;

(২) ভারতবর্ষকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করিবার ভিত্তিতে আলোচনা করিতেছিলেন;

(৩) সামন্ত রাজ্যসমূহের সমস্যার সমাধান পরে হইবে বলিয়া রাখিয়াছিলেন—অর্থাৎ যদি দুই সম্প্রদায়ে কোনরূপে মীমাংসা ঘটে, তবে সামন্ত রাজ্যসমূহের সমস্যা লইয়া মীমাংসার পথ বিঘ্নবহুল করা যাইবে।

আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিক হইতে দেখিলে মন্ত্রিত্রয়ের আগমন ব্যর্থ হয় নাই।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ে ঐক্য সাধিত হইতেছে না এবং না হইলে সাধু ও পরহিতকামী ইংরেজ কাহাকে স্বাধীনতা দিয়া যাইবেন—এই কথাই তাঁহারা সকল দেশকে বলিতেছেন এবং তাহাই ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের অযোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বায়বহুল প্রচারকার্য পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইলে যে ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবাসী সকলেই একযোগে কাজ করিতে পারেন, বিদেশে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা সুভাষচন্দ্র তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে নূতন জাতীয় পথে সমগ্র ভারতবর্ষ অনুপ্রাণিত হইয়াছে, তাহাতে ভেদনীতি ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে মন্ত্রিত্রয়কে এদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের কার্যফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আবার বিবর্ধিত হইয়া—অগ্নি যেমন মন্দির ধ্বংস করে, তেমনই—জাতীয়তা নষ্ট করিবার জন্য প্রবল হইয়াছে।

মুসলমানদিগের অসঙ্গত দাবীও যে তাঁহারা পূর্ণ করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহার প্রমাণ—হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান দুই ভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানই মুসলমানপ্রধান। এই তিনটির মধ্যে প্রথমোক্ত প্রদেশ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত কোন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে।

বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে—প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হন, তাহা হইলেও সেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা যে সম্পূর্ণ (যাহাকে ইংরেজিতে "এবসলিউট" বলা হয়) নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, তাহাই বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার জিন্না বলেন, হাওড়া ও হুগলী এই দুইটি শিল্পপ্রধান জিলা ও কলিকাতা হিন্দুপ্রধান হইলেও তাঁহার "পাকিস্থানের" জন্য বলি দিতে হইবে—কারণ, তাহা না হইলে বাঙলায় "পাকিস্থান" আর্থিক হিসাবে অচল হইবে। মূল কথা—সমগ্র বাঙলাই "পাকিস্থানে" প্রদান, মন্ত্রিত্রয়েব অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে করা যায়।

এখনও মিঃ জিন্না বলিতেছেন—বড়লাটের পুনর্গঠিত শাসন-পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হিন্দু সদস্যের সংখ্যার সমান করিতে হইবে।

কোন্ যুক্তিতে যে তাহা করা যায়, তাহা বলা যায় না। তবে যাহারা অতিরিক্ত আদরে "নষ্ট" হয়, তাহারা কোনরূপে অসঙ্গত দাবী করিতেই কুণ্ঠানুভব করে না। তাহাদের—"আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দাও" বুলিও শুনিতে পাওয়া যায়।

সিমলায় মীমাংসার চেষ্টা যে অসঙ্গত বনিয়াদে করিবার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা যেমন সত্য—তাহাতে যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ ও বিরোধ বিবর্ধিত করা হইয়াছে, তাহাও তেমনই সত্য।

বাঙলায় আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আশঙ্কিতও হইতেছি। এবার কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল কাহারও অবিদিত নাই। কেন তাহা হইয়াছিল, তাহাও অনায়াসে অনুমান করা যায়।

তাহার পরে পূর্ববঙ্গে রেলপথে যেসব অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহারও যে কোন প্রতিকার হইতেছে না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রাম না হইতেই রামায়ণ রচা হিসাবে কতকগুলি মুসলমান পত্র বাঙলাকে 'পূর্ব-পাকিস্থান' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং যিনি এবার বাঙলার প্রধান সচিব হইয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরুদেব মিস্টার জিন্নার আবদারের উন্নতি করিয়া বলিয়াছেন—গোটা বাঙলা না পাইলে "পাকিস্থান" পূর্ণ হইবে না।

অন্য কোন প্রদেশে যাহাই কেন হউক না, মন্ত্রিত্রয়ের আলোচনার ফলে যে বাঙলায় উৎকট সাম্প্রদায়িকতা বর্ধিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং তাহার ফল যে কল্যাণকর হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি।

বাঙলার ভূতপূর্ব মুসলিম লীগ সচিব-সঙ্ঘ যেভাবে—

(১) মুড়াপাড়ার হাঙ্গামায় ও

(২) কুলটীর মামলায়

বিচারেও বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা যেমন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তেমনই ঢাকায় যে হাঙ্গামায় বহু হিন্দু ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন, তাহার অভিজ্ঞতাও ভুলিতে পারি না। তখন যে পত্রে "দাও আগুন" কবিতা প্রকাশের পরেই পূর্ববঙ্গে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, সেই পত্রই বাঙলায় লীগ সচিব-সঙ্ঘের অন্যতম মুখপত্র।
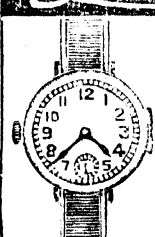
এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে।

এক মুসলিম লীগ সচিব-সঙ্ঘের সময়ে বাঙলায় দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে, আর সরকার খাদ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ে লাভবান হইয়াছেন! আবার দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং বর্তমান সচিব-সঙ্ঘ কি করিবেন, তাহাও বলা যায় না।

সকল দিক বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, বাঙলার আকাশে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছে, তাহা যে কোন মুহূর্তে ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত করিতে পারে।

বাঙলার সমস্যায় বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙালীকে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।

AC 4

"যুদ্ধের অবসান হলেও ন্যাশনাল সেভিংসের প্রয়োজনীয়তা কমেনি। জনসাধারণের তহবিলে বর্তমানে যে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে, প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি কিনে তাকে বিক্ষিপ্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যেই সে অর্থ সংরক্ষণ করে গঠনমূলক অনুষ্ঠানে তা নিয়োগ করতে হবে। যুদ্ধান্তের এই সংগঠন কার্যে স্বল্পসম্বলকেও যোগ দিতে হবে। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কেনাই নিজের ও দেশের স্বার্থ রক্ষার একটি উপায়।"

স্যর হোমি পি. মোডি, কে.বি.ই.,
টাটা সন্স লিমিটেডের ডিরেক্টর, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সদস্য ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান।

আসল কথা জেনে রাখুন

১ আপনি ৫, ১০, ৫০, ১০০, ৫০০, ১০০০ অথবা ৫০০০ টাকা দামের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারেন।

২ কোনো এক ব্যক্তিকে ৫০০০ টাকার বেশি এই সার্টিফিকেট কিনতে দেওয়া হয় না। এত ভালো বলেই তা রেশন করে দিতে হয়েছে। তবে দু'জনে একত্রে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কিনতে পারেন।

৩ ১২ বছরে শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়ে, অর্থাৎ এক টাকায় ১৷০ টাকা পাওয়া যায়।

৪ ১২ বছর রেখে দিলে বছরে শতকরা ৩½ টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া যায়।

৫ সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স লাগে না।

৬ দু'বছর পরে যে কোনো সময়ে ভাঙানো যায় (৫ টাকার সার্টিফিকেট দেড় বছর পরে) কিন্তু ১২ বছর রেখে দেওয়াই সব চেয়ে বেশি লাভজনক।

৭ আপনি ইচ্ছে করলে ১, ৷০ অথবা ।০ করেও সেভিংস ষ্ট্যাম্প কিনতে পারেন। ৫ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা হলেই তার বদলে একখানা সার্টিফিকেট পেতে পারেন।

৮ সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প পোষ্ট আফিসে, সরকার নিযুক্ত এজেন্টের কাছে অথবা সেভিংস ব্যুরোতে পাওয়া যায়।

টাকা খাটিয়ে শতকরা ৫০ বাড়াবার ব্যবস্থা করুন

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

শিক্ষা শিবিরের যোগদানকারী সভ্যগণ

আর একটু ভেতরে গিয়েই দেখলুম তাঁবুর গায়ে লেখা রয়েছে অফিসারস্‌ আমরা ভেতরে গেলুম।

ফিসাররা সবাই দেখলুম সামরিক পোষাক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক মশায় তখন ব্রতচারী শ্রীআলাজীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। দের মধ্যে শ্রীব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীসৌরেন শ্রীসুহৃদ বিশ্বাস,—একে একে সঙ্গেই আলাপ হল। এঁদের অমায়িক ভদ্র ব্যবহারে খুব খুশী সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের মধ্যে একটা হয়ে গেল। বাঙলার একজন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখেছিলুম, তিনি সত্যিই ডিকটেটার হবার উপযুক্ত ক। কি আত্মবিশ্বাস তাঁর। তাঁর মধ্যে একটা জিনিস দেখেছিলুম। তিনি সমশ্রেণীর অন্য সকলকে দাবিয়ে রেখে ন্ত শক্তভাবে নিজেকে সকলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। প্রথমটা বুঝতে পারি নি, পরে মনে হয়েছিল যে, আমাদের মত পরাধীন জাতির পক্ষে বর্তমানে ঠিক এ রকম ডিকটেটারই চাই। আমি লক্ষ্য করেছি সমশ্রেণীর অথবা অধীনদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করলেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে অতি বিনীত ব্যবহার করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

কিন্তু শিক্ষাশিবিরে এসে আমি অন্য জিনিস দেখলুম। শিবিরের সর্বাধিনায়ক থেকে নিম্নস্থ নায়ক পর্যন্ত সকলেই সাধারণ মানুষের মত। একটি শিক্ষার্থী এসে একজন অফিসারের সামনে দাঁড়াল ঠিক সৈনিকের ভঙ্গীতে। কি জিজ্ঞাসা করলে যেন। অফিসারও তার জবাব দিলেন। শিক্ষার্থীটি চলে গেল। অফিসারের মুখে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য দেখলুম না। পরেও আমি খুব লক্ষ্য করেছি, অফিসাররা সকলেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেন এবং আশ্চর্য হয়েছি এই দেখে যে, শিক্ষার্থীরা তাদের অফিসারকে কিছুমাত্র ভয় করে না, করে গভীর শ্রদ্ধা।

আমাকে সব ঘুরে দেখাবার জন্যে একটি লোক দেওয়া হল। রান্নাঘর, ভাঁড়ার কলতলা খাবার জায়গা সব দেখে ছেলেদের ক্যাম্পে গেলুম। খড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা করে শিক্ষার্থীরা বাস করছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করলুম। তারাও দেখলুম বেশ ভদ্র। দেখে সত্যি আনন্দ হল।

এমন সময় বিউগল বেজে উঠল। আমার সঙ্গীটি বললে, এবার জলখাবারের ডাক পড়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ছোট ছোট কলাইকরা বাটি হাতে নিয়ে এক জায়গায় সারি করে দাঁড়াল। নায়ক হুকুম দিচ্ছেন। তাদের চা ও পুরী আলুর দম দেওয়া হল জলখাবার।

টালা পার্কের শিক্ষা শিবির

একটু পরেই পাহারা বদল হল। দাঁড়িয়ে দেখলুম। হুকুম সব বাঙলাতে দেওয়া হচ্ছে দেখে সত্যি বড় ভাল লাগল।

ইতিমধ্যে ব্রতচারী নৃত্যের অনুষ্ঠান সুরু হল। দলে দলে ছেলেমেয়েরা নানা রকম নৃত্য-কৌশল দেখাতে লাগল। প্রায় হাজার দুই পুরুষ ও মহিলা দর্শক সেখানে দেখলুম।

সন্ধ্যার পরই সুরু হল তুমুল ঝড় আর জল। ইতিমধ্যে আনন্দ অনুষ্ঠান ভেঙে গিয়েছিল। দর্শকরা চলে গেছেন সব। মাঠে শিক্ষার্থীরা আর অফিসাররা ছাড়া বিশেষ কেউ নেই। আমি গিয়ে অফিসারদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিলুম। ক্যাম্পের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ ও তাঁর শিক্ষার্থী ছেলেদের সংগে গল্প করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দেখলুম ব্রজবাবু, সোরেনবাবু ও শম্ভুবাবু জলরোধক কোন পোষাক পরিচ্ছদ না নিয়েই ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে পড়েছেন ছেলেদের দেখাশুনো করতে। একটু সময় পরেই আমাদের পায়ের তলা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলল। আমি একবার বেরিয়ে দেখলুম শান্ত্রীরা ঠিক নিজের জায়গায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে। জল ঝড় তারা গ্রাহ্যও করছে না। সত্যি কথা বলতে কি, এই শিক্ষাশিবিরকে আমি ততটা গভীরভাবে নিতে পারি নি। অফিসারদের মধ্যে নেতৃসুলভ গাম্ভীর্য ও কঠোরতা না দেখে এই কাজের ওপর আমার একটা খেলো ভাবই এসেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও হাসিমুখে কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

অফিসারদের অনুরোধে সেই রাত্রিটা তাঁদের কাছেই কাটালুম। শিবিরের হাস-পাতালে ফোন ছিল। কাজেই বাড়িতে খবর পাঠাতে কোন অসুবিধে হল না।

ভোর বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটে বিউগ্‌লে বাজ্‌তে ঘুম ভাঙবার। তারপর সমস্ত সকাল বেলাটাই কাটত নানা রকম কুচকাওয়াজ ও ব্যায়াম শিক্ষায়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই শিক্ষার্থীরা কতকগুলো ক্লাসে যোগ দিত। এই ক্লাসগুলোতে সেবা, স্বাস্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষাশিবিরের আদর্শ প্রভৃতি ছেলেদের বুঝিয়ে দিতেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা।

রাত্রিতে সব কর্মতালিকার শেষে বসত শিক্ষার্থীদের মজলিস। তাতে শিক্ষার্থী, অফিসার সবাই যোগ দিতেন। কোন ভেদাভেদ থাকত না। নানা রকম হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে এই সময়টা কাটত বড় আনন্দে। আমি তিন দিন এতে যোগ দিয়েছিলুম। এতে শ্রীনির্মলচাঁদ বড়াল, কিশোর বাঙলার সম্পাদক [illegible] জে [illegible] ব্যানার্জি, রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেন প্রভৃতি প্রবীণ লোককেও হাসি মুখে যোগ দিতে দেখেছি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন অলওয়েজ প্রেসিডেণ্ট হয়ে কমিক করেছিল, আর একজন কমিক কীর্তন গাইছিল। দুটোই আমার খুব ভাল লেগেছিল।

একটি জিনিস দেখে আমি সব চাইতে বেশী মুগ্ধ হয়েছি। হাল্‌কা হাসি তামাসা চলেছে। একজন ছেলে উঠে হাসির ছলেই বক্তৃতা করছে। সবাই হাসছে। বলতে বলতে বক্তা বাঙালী জাতির দুঃখ দৈন্যের কথা, ভারতের পরাধীনতার কথা এমনভাবে বলতে লাগল, চারদিকে গোল হয়ে বসা ছেলেদের মধ্য থেকে এত সময় যে হাসির ঢেউ উঠেছিল, নিমেষে তা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই গম্ভীর। সে সময় নতুন কেউ আসলে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না যে সেটি বসেছে হাসির মজলিস।

বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে বহু ছেলে এসেছিল এই ক্যাম্পে। আমি অনেকের সংগে মিশে তাদের আন্তরিক ভদ্র ব্যবহারে খুশী হয়েছি। এ জিনিসটিকে তারা কিভাবে নিয়েছে, জানবার চেষ্টা করেছি। দেখলুম সবাই খুশী, সবাই শ্রদ্ধান্বিত। প্রত্যেকেই বলছে, আরো কিছু দিন শিবিরটা চললে বেশ হত।

এই আয়োজনের নেতাদের একটি ত্রুটি আছে বলে আমার মনে হয়। বর্তমান যুগে প্রচারকার্যটি সকলের বড়। প্রচারের দিক থেকে এই প্রচেষ্টার নেতাদের আরো বেশী তৎপর হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।

বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রের নিখিল বংগ নববর্ষ উৎসবের বিবরণ ও ফটো দেখে আমার মনে হয়, বাঙলা দেশে এটিই সব চাইতে বড় নববর্ষ উৎসব। নিখিল বংগ উৎ[সব] উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতি শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সাধারণ সম্[পাদক] শ্রীযুত নির্মলচাঁদ বড়াল মহাশয় এ[...] ধন্যবাদার্হ।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা সম্পর্কে এই পর্যন্ত যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা খুব উৎসাহবর্দ্ধক নহে। ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম খেলায় উরস্টার দলের নিকট ১৬ রাণে পরাজয় বরণ করিয়াছে। পরবর্তী খেলাতেও অক্সফোর্ড দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হইয়াছে। এই দুইটি খেলার একটি খেলাতেও ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ব্যাটিং, বোলিং, এমনকি ফিল্ডিং বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। বৈদেশিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞগণ যাঁহারা এই দুইটি খেলা দেখিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয় দলের ফিল্ডিং বিষয়ের নিন্দা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা ব্যাটিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যে ভাল সুফল প্রদর্শন করিবে ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বোলিং বিষয়ে বিনু মানকড় ও সিন্ধের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা বলিয়াছেন যে, এই দুইজন বোলার ইংলণ্ডের জলবায়ুর সহিত পরিচিত হইলে উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন। ব্যাটিংয়ে মার্চেণ্ট, হাজারী, গুলমহম্মদ ও আর এস মোদীর সুখ্যাতি তাঁহারা করিয়াছেন।

ভারতীয় খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্য প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর এই দলের সহিত 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়গণ পর পর দুইটি খেলায় নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করায় নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি জোর করিয়াই বলিয়াছেন "ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন খেলায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিবেন। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ এই পর্যন্ত যে ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ ইংলণ্ডের ম্লান আলো, অস্বাভাবিক পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থা ও খেলার অনভ্যাস। আলো ও জলবায়ুর সহিত পরিচিত হইলেই বিপরীত ফলাফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।" অধ্যাপক দেওধর ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে যত ভাল করিয়া জানেন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ তত জানেন না, সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

তিনজন খেলোয়াড় আহত

এই দুইটি খেলায় তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় খেলোয়াড় আহত হইয়াছেন। অতিরিক্ত শীতের মধ্যে খুব ছোটাছুটি করিয়া মুস্তাক আলীর কুচকিতে টান লাগিয়াছে। তিনি উরস্টারের প্রথম দিনের খেলাতেই আহত হন এবং সেই হইতে দৌড়াইতে পারিতেছেন না। তবে আশা আছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সুস্থ হইবেন। অমরনাথ উরস্টারের খেলায় চোখে আঘাত পান। তাঁহার আঘাত একটি চক্ষু একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। ইনিও উরস্টারের খেলায় আহত হন ও কোনরূপে এই খেলায় শেষ পর্যন্ত খেলেন। আব্দুল হাফিজ দ্বিতীয় খেলায় হাতে আঘাত পান। ইহাকেও দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করিতে ডাক্তারগণ বলিয়াছেন। এই তিনজন খেলোয়াড়ের উপর দলের শক্তি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে ইহারা দ্রুত আরোগ্যলাভ করুন ইহাই আমাদের কামনা।

উরস্টারের খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ

উরস্টার বনাম ভারতীয় দলের খেলা

খেলার ফলাফল :—

উরস্টারের প্রথম ইনিংস :—১৯১ রাণ (সিংগলটন ৪৭, হুপার ৩৫, হাউওয়ার্থ ২৭, মানকড় ২৬ রাণে ৪টি, অমরনাথ ৩২ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—১৯২ রাণ (আর এস মোদী ৩৪, মার্চেণ্ট ২৪, গুলমহম্মদ ২৯, পতৌদির নবাব ২৯, মানকড় ২৩, সারভাতে নট আউট ২৪, পার্কস ৫৩ রাণে ৫টি, হাউওয়ার্থ ৪৭ রাণে ৩টি ও জ্যাকসন ৬০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

উরস্টারের দ্বিতীয় ইনিংস :—২৮৪ রাণ (সিংগলটন ৬৩, হাউওয়ার্থ ১০৫, গিবনস্ ৩৪, জেলকিন্স ৩৫, মানকড় ৭৪ রাণে ৪টি ও সিন্ধে ৫০ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—২৬৭ রাণ (বিজয় মার্চেণ্ট ৫১, আর এস মোদী ৮৪, এস ব্যানার্জি ৫৯, পার্কস ৫৫ রাণে ২টি, হাউওয়ার্থ ৫৯ রাণে ৪টি, জ্যাকসন ২৫ রাণে ২টি ও সিংগলটন ৭২ রাণে ২টি উইকেট পান)।

অক্সফোর্ড বনাম ভারতীয় দল

খেলার ফলাফল :—

অক্সফোর্ড দলের প্রথম ইনিংস :—২৫৬ রাণ (সেল ৪৭, কেরন্স ৩৬, টমসন ৩১, ডোনেলী ৬১, মানকড় ৫৮ রাণে ৪টি, সিন্ধে ৭০ রাণে ৪টি ও হাজারী ৪০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—২৪৮ রাণ (হাজারী ৬৪, মানকড় ২৫, আর এস মোদী ৪৯, হাফিজ নট আউট ৩০, ম্যাসিণ্ডো ৫৫ রাণে ৪টি, হেনলী ৩৯ রাণে ২টি ও ট্রাভার্স ৪৮ রাণে ২টি উইকেট পান)।

অক্সফোর্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—৩ উইঃ ২৪৫ রাণ (সেল ৪৪, ডোনেলী ১১৬ রাণ নট আউট, মডসলী ৫৪ রাণ নট আউট, সি এস নাইডু ৬০ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

বিলাতের বিমান ঘাঁটিতে অমরনাথ, পতৌদি ও এস ব্যানার্জি

দেশী সংবাদ

৭ই মে—সিমলায় মহাত্মা গান্ধী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। মিঃ জিন্না অদ্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটকাল আলাপ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অকিনলেকের সহিত আলাপ আলোচনায় রত থাকেন।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বায়ার্সের বিরুদ্ধে নরহত্যার যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক তদন্তের পর মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হাসান আজ তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ অদ্য কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হইলে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

৮ই মে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অদ্য ২৫শে বৈশাখ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সহরের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত বহু সভা-সমিতিতে বিশ্বকবির অপূর্ব প্রতিভা ও তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

৯ই মে—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আচার্য কৃপালনী নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু এইবার নিয়া চতুর্থবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জঙ্গীলাট সমেত বড়লাটের শাসন পরিষদের সমুদয় সদস্য বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধিদল এবং বড়লাটের অভিপ্রেত ব্যবস্থা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাটের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

সিমলায় ত্রি-দলীয় বৈঠকের পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং কিয়ৎকাল আলোচনার পর বৈঠক স্থগিত থাকে। ইত্যবসরে মিঃ জিন্না এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে বৈঠক হয়। বিগত সাত বৎসরের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মিঃ জিন্নার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব ও ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভূখণ্ডের গবর্ণর মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিন তাঁহার প্রতি সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১০ই মে—দেরাদুনের সংবাদে প্রকাশ যে, ৮ জন হাবিলদার কেরাণী গ্রেপ্তার ও চাকুরী হইতে বরখাস্তের ফলে ৬ই মে হইতে দেরাদুনস্থ ৯নং গুর্খা রেজিমেণ্টে গত ১৪ই মার্চের বিদ্রোহের ন্যায় নীরব বিদ্রোহের ভাব দেখা যাইতেছে।

ফরিদকোট নামক দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তথাকার প্রজা সাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেই ফরিদকোট রাজ্যে যাইয়া উক্ত আদেশ অমান্য করিবেন।

১১ই মে—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আপোষ রফা সম্পর্কে মতৈক্য স্থাপিত না হওয়ায় সিমলায় ত্রি-দলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে।

অদ্য সিমলায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মিঃ জিন্নার মধ্যে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে লবণ কর রদ করা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

১২ই মে—সিমলায় ত্রি-দলীয় বৈঠকের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে মন্ত্রি-প্রতিনিধি দল এবং বড়লাট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ জনসাধারণ প্রতিনিধিদের উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সম্মেলনের অবসান হওয়ায় তাঁহাদের দায়িত্ব কোনক্রমেই শেষ হইয়াছে বলা চলে না।

কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বাঙ্গলার জনসাধারণ ও বঙ্গীয় আজাদ হিন্দ সাহায্য কমিটির পক্ষ হইতে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জিকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৩ই মে—সিমলার অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, মুসলিম লীগ সহযোগিতা করুক বা নাই করুক, আগামী সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবে। কংগ্রেসের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন যে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা চিন্তা করিয়াই কংগ্রেস এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সিমলার অপর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের আসন্ন বিবৃতিতে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা থাকিবে। খুব সম্ভব কোন্ তারিখ ভারত পূর্ণ স্বাধীন হইবে, তাহাও উল্লেখ থাকিবে।

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রি-সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। জানা গিয়াছে যে, স্বরাষ্ট্র সচিব রফি আমেদ কিদোয়াই প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ যে, গবর্ণর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার বিষয়ে গড়িমসি করায় স্বরাষ্ট্র সচিব পদত্যাগ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৭ই মে—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের জন্য বিরোধী দল যে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ৩২৭—১৫৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

মিঃ এটলী আজ কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষে আশানুযায়ী খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইতেছে না—সেখানকার অবস্থা গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

৮ই মে—ওয়াশিংটনের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড কর্তৃক ভারতের জন্য মাত্র ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ হইয়াছে। এই বরাদ্দ ভারতের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—এইরূপ মন্তব্য করিয়া ভারতের এজেণ্ট জেনারেল স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা মে মাসে ভারতে প্রেরণের জন্য যে গমের বরাদ্দ করিয়াছেন, ভারত তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিতেছে—কেননা, ভারত যে ৫০০,০০০ টন খাদ্য চাহিয়াছিল তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্র ভারতকে দিতে চাওয়া হইয়াছে।

পারস্যের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার ঘোষণা করেন যে, পারস্য হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৯ই মে—রোম বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেনেট অদ্য বৃটেনকে ৩,৭৪৪,০০০,০০০ ডলার (৯৩৭০০০০০০ পাউণ্ড) ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

১২ই মে—মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট এক ব্যক্তিগত পত্রে জানাইয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের খাদ্যাভাবের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট ঐকান্তিক সহানুভূতি সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করিতেছেন।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] ১১ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 25th May, 1946. [২৯ সংখ্যা

ন্ত্রিমিশনের ঘোষণা

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ন্ত্রিমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ রিয়াছেন। যুগপৎ বিলাতের কমন্স সভায় বং ভারতের সর্বত্র বেতারযোগে এই রিকল্পনা বিঘোষিত হয়। লক্ষ্য করিবার যয় এই যে, প্রত্যক্ষভাবে ভারতের পূর্ণ াধীনতা স্বীকার এবং ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ ন্যদলের অপসারণের নির্দিষ্ট কোন তিশ্রুতি এই পরিকল্পনার মধ্যে নাই; অথচ গ্র ভারত এমন কোন ঘোষণার জন্যই ব্যগ্র- বে অপেক্ষা করিতেছিল; সুতরাং মন্ত্রি- শনের এই ঘোষণায় জনসাধারণের মনে মন চমকপ্রদ উৎসাহ বা উদ্দীপনার সঞ্চার । নাই। বাস্তব বিচারের সূক্ষ্ম ধারা রিয়া বর্তমান প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে বির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ভারতের রাজনীতিক বস্থার কি সংস্কার সাধন করা যায়, মন্ত্রি- শন তাঁহাদের ঘোষণায় তৎপ্রতিই লক্ষ্য খিয়াছেন। ভারতের নির্বিঘ্নতা এবং রাপত্তার সম্বন্ধে মন্ত্রিমিশনের এই সতর্ক তনার মধ্যে এদেশের প্রকৃত স্বাধীনতার ন্য তাঁহাদের কতখানি আন্তরিক বেদনা ছে এবং কতখানিই বা তাঁহারা ব্রিটিশ ার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে কারান্তরে বঞ্চনা করিয়াছেন এক্ষেত্রে হাই বিবেচনা করিবার বিষয়। মাদিগকে একথা স্বীকার করিয়া তে হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে অতীতের ংস্কারমুক্ত হইয়া আমরা কোন বিবেচনা রিতে পারি না। প্রথমতঃ আমাদের বক্তব্য ই যে, মন্ত্রিমিশনের এই পরিকল্পনা অত্যন্ত টিল আকার ধারণা করিয়াছে এবং এ বিষয়ে মাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে,

মুসলিম লীগদলের একান্ত অযৌক্তিক পাকিস্থানী দাবী মিটাইবার আগ্রহই মন্ত্রি- মিশনের এই পরিকল্পনাকে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য মিশন মুসলিম লীগের দাবী অনুসারে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ- ভাবে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থান এবং হিন্দুস্থান দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নাই। উপরে উপরে দেখিতে গেলে এই দিক হইতে মিঃ জিন্নার হার হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার যথাসম্ভব খর্ব করিয়া এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলিকে দলবদ্ধ হইবার সুযোগ দান করিয়া তাঁহারা কার্যত মিঃ জিন্নার দাবী পোষাইয়া দিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনটি দলে বিভক্ত করিয়াছেন এবং শাসনতন্ত্র ও শাসনকার্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল বন্দোবস্ত এবং অধিকার এই দলগত যৌথ শাসনের হাতে থাকিবে এমন নির্দেশ দিয়াছেন। মিশন প্রদেশসমূহকে এইভাবে দলভুক্ত করিয়াছেন—(১) মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা; ইহারা (ক) দল; (২) পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, ও সিন্ধু অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থান, (খ) দল এবং বাঙলা ও আসাম, অর্থাৎ মুসলিম-লীগের পূর্ব পাকিস্থান, (গ) দল। ব্রিটিশ বেলুচিস্থানকে (খ) দলের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিশন খোলাখুলি ভাষায় পাকিস্থান স্বীকার করিয়া না লইলেও এই দল-বণ্টন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে কার্যত দুই ভাগ করিবারই ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদী ভারত এমন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারিবে না। ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিবেন, নতুবা কংগ্রেসের দীর্ঘকাল- ব্যাপী সাধনার কোন সার্থকতা থাকে না; প্রকৃতপক্ষে মিশন-পরিকল্পিত দল বিভাগের এই ব্যবস্থার পাকের মধ্যে পড়িলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

লক্ষ্য ও সাধনা

মন্ত্রিমিশনের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতের স্বাধীনতার দিনকে বিলম্বিত করিবার একটা দূরভিসন্ধি রহিয়াছে, এমন সন্দেহের কারণ ভারতবাসীদের মনে এখনও দেখা দিতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা যেভাবে প্রদেশগুলিকে তিনটি দলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক এবং প্রদেশসমূহের স্বাধীনতার পক্ষেও সে নীতি পরিপন্থী। অবশ্য, কোন দলের অন্তর্ভুক্ত থাকা না থাকার স্বাধীনতা প্রদেশসমূহকে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা কথায় মাত্র। শাসনতন্ত্র গঠিত হইবার পর যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে মিশনের নির্দিষ্ট এই দল-বিভাগ-ব্যবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে, এই ব্যবস্থা আছে ইহা ঠিক; কিন্তু আপাতত তাঁহারা যেভাবে দল ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই গণ-পরিষদ শাসন-ব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন এবং উক্ত পরিষদে মিশন-নির্দিষ্ট দলের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি থাকিবেন; সুতরাং দেখা যায়,

একবার যদি বর্তমান বিভাগানুযায়ী ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হয়, তবে দল হইতে বাহির হইবার জন্য প্রদেশগুলির যে ক্ষমতা, তাহাও কৃত্রিমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। দেখিতেছি, মিশন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্থানের ও আসামকে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের জনমতকে স্পষ্টত নির্মমভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রদেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকৃতির সর্তগুলি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং গণ-পরিষদে জনমতের সর্বাঙ্গীন প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে উন্নতি-বিরোধীভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে; তারপর গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত ভারতের সার্বভৌম অধিকারসম্মত হইবে কি না, এ সম্বন্ধেও মিশনের পরিকল্পনার মধ্যে কোনরূপে নিশ্চয়তা প্রদত্ত হয় নাই; সুতরাং পরিষদ যদি ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধীভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন এবং প্রাদেশিক দল বিভাগের মূলে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থানী যুক্তি সমর্থনের যে অভিসন্ধি রহিয়াছে বলিয়া অনেকে আশংকা করিতেছেন, যদি তাহা পূর্ণ না হয়, তবে ভারতের সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে পরিষদের সিদ্ধান্তকে সেনাশক্তির সাহায্যে ব্যর্থ করিতে না বসিবেন, ইহাতেই বা নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃতপক্ষে এভাবে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র সমস্যার সম্যক্‌ভাবে সমাধান হইতে পারে না। যদি সে সমস্যার সত্যই সমাধান করিতে হয়, তবে কোন প্রদেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বিশেষ দলভুক্ত করিবার এই যে নীতি, প্রথমত তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত যে সর্বোপরি হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বে ব্রিটিশ সৈনাদলকে অপসারিত করিতে হইবে।

অন্তর্বর্তী সাময়িক গভর্নমেণ্ট

গত ৩রা জ্যেষ্ঠ শুক্রবার বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালের জন্য নূতন গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে ইহার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্তর্বর্তীকালীন এই গভর্নমেণ্ট দেশবাসীর আস্থাভাজন এবং জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইবে বড়লাট এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গভর্নমেণ্টের জন্য লর্ড ওয়াভেল যে কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; প্রধানত একটা ব্যাপক গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণের কথাই তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, দুর্ভিক্ষের ছায়া ভারতের সর্বত্র প্রসারিত হইতেছে, সর্বাগ্রে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে এবং ভারতের জন্য খাদ্য সংস্থান করিতে হইবে; ইহা ছাড়া ভারতের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহার উপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা এবং অভিমতের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। বড়লাটের এই ঘোষণা হইতে স্বভাবতই আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিবে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, সাময়িক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট হইতে সমগ্র ভারতের জন্য যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইতেছে, দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কি এই প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সমুন্নতির সম্বন্ধে অত্যন্ত আশাশীল ব্যক্তিরাও এমন কথা বলিতে সাহস পাইবেন না; যদি তাহাই না হয়, তবে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত চূড়ান্ত ব্যবস্থায় বা ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টকে এই সকল ক্ষমতা দেওয়া হইল না কেন? মাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও যানবাহন এই কয়েকটি বিভাগের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিয়া প্রদেশগুলিকে অন্যান্য সব অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইল ইহার হেতু কি? এইক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন জাতির শাসনাধিকার অত্যন্তই সমুন্নত; কিন্তু সে দেশেও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতে এতটা অল্প অধিকার রাখা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে অনেকটা অযৌক্তিকভাবেই ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধিকার খর্ব করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে শাসন সমস্যা জটিল, দুরূহ, এমনকি, অকার্যকর করিয়া তুলিবার কারণই সৃষ্টি করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে নদী-নিয়ন্ত্রণ, বন্যা-প্রতিকার এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিষয়গুলি কোন প্রদেশই একাকী সুনির্বাহ করিতে পারিবে না; ইহার জন্য যদি প্রদেশে প্রদেশে মিলিয়া দলগত গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে হয়, তবে এই শ্রেণীর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের উপর ন্যস্ত করাই অধিকতর পরামর্শসিদ্ধ হইত না কি? অবশ্য স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সব দেশ এবং সব জাতিকেই কতকগুলি অন্তরায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, এবং ইহা সর্বাংশে সত্য যে, স্বাধীনতা পাকা ফলের মত কোন জাতিরই হাতে আসিয়া পড়ে না, তথাপি আমাদিগকে একথা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে যে, মুসলিম লীগকে পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কারই এ[illegible] মন্ত্রী মিশনের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়[illegible] কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ক[illegible] আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্র[illegible] একথা বলিতে হয় যে, আদর্শ-নিষ্ঠ[illegible] আমরা সব ক্ষেত্রে বড় করিয়া দেখি; [illegible] আমাদের সাময়িক ভাবাবেগে শত্রুপক্ষ স[illegible] না পায় এদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়ো[illegible] বর্তমানের এই সংকটমুহূর্তে আ[illegible] একটুও দুর্বল হইলে চলিবে না; সংকল্পে অবিরত আঘাতের উপর অ[illegible] হানিয়া আজ শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত ক[illegible] হইবে।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আশংকা

বাঙলা দেশের মফঃস্বলের নানাস্থান [illegible] চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ [illegible] যাইতেছে। ঢাকা এবং নোয়াখালির স[illegible] সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি [illegible] অবস্থা ইতিমধ্যেই সংকটজনক [illegible] ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১[illegible] সালের দুর্ভিক্ষে বাঙলার অর্থনৈতিক [illegible] সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে ইণ্[illegible] স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট সম্প্রতি তৎসম্প[illegible] তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া একখানি রি[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত হি[illegible] দেখা যায় বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশের [illegible] লক্ষ লোক অর্ধনিঃস্ব অবস্থায় উপনীত [illegible] চারিদিকে ক্রমেই অবস্থা যেরূপ দাঁড়াই[illegible] তাহাতে বাঙলা দেশ পুনরায় সেই দুর্ভি[illegible] সম্মুখীন হইতে বসিয়াছে এমন আশ[illegible] কারণ দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালে যে পর্[illegible] খাদ্যের অভাবের জন্য দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া[illegible] এইবার খাদ্যশস্যের প্রকৃত ঘাটতি তাহা আ[illegible] অনেক বেশী। সরকারী হিসাব অন[illegible] বাঙলা দেশে সাড়ে সাত লক্ষ টন খাদ্যশ[illegible] ঘাটতি ঘটিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। স[illegible] পক্ষ হইতে খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়িবার জন্য [illegible] বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত সংবা[illegible] বহু ভাষার ছন্দোবন্ধে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কিন্তু খাদ্যশস্য গভর্নমেণ্টের [illegible] বিক্রয় করিলেই যে সমস্যার সমাধান [illegible] এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? সম্প্রতি ব[illegible] চাউল কল সমিতি এ সম্বন্ধে একটি বি[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে [illegible] হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য সরকারী সং[illegible] ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য নষ্ট হইতেছে। সর[illegible] বিজ্ঞাপনে আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা ব[illegible] ছেন,—"যতখানি পারা যায় শস্য বিক্রি[illegible] দিন। স্মরণ রাখবেন প্রত্যেক মণ শস্য [illegible] করার ফলে এক একজন দেশবাসীকে [illegible]

মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রি করবেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক। অপরকে কষ্ট দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, তা অভিশপ্ত।" এক্ষেত্রে সরকারকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক মণ শস্য মজুত করার ফলে এক একজন দেশবাসীর মৃত্যু ঘটে বলিয়া তাঁহারা হিসাব দেখাইয়াছেন; কিন্তু সরকারী গুদামে প্রত্যেক মণ খাদ্য পচিয়া নষ্ট হওয়ার ফলে কতজন লোকের মৃত্যু ঘটে—তাঁহারা এই সঙ্গে সে হিসাবটা রাখিলেও ভাল হয়। আমরা শুনিতে পাইতেছি, বর্ধমানে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের গুদামে পাঁচশত বস্তা ময়দা পচিতেছে। অতীতে আরও বহু খাদ্যশস্য এইভাবে নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ৫০ হাজার মণ পচা চাউল বর্ধমানের বাজারে বিক্রয় হইয়াছে এবং এখনও সেখানকার বাজারে ২০ হাজার মণ পচা চাউল পড়িয়া আছে। চাউল কল সমিতি এই অভিযোগও উপস্থিত করিয়াছেন যে, সরকার দরিদ্র চাষীদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা প্রভূত লাভ করিতেছেন। সমিতির মতে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় চাষীদিগকে প্রতিমণ ধান সাড়ে ছয় টাকা দরে আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু রেশন-ব্যবস্থায় চাউল অনেক বেশী দরে সরকার বিক্রয় করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। এ সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের কি বক্তব্য আছে, আমরা জানিতে চাই। দলীয় স্বার্থের সংঘাত এবং দুর্নীতির ফলে বাঙলা দেশ বিগত দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইয়াছে, পুনরায় শাসনতন্ত্রের অনুরূপ দলীয় স্বার্থ এবং দুর্নীতির প্রভাব পাকিয়া উঠিয়া বাঙলা দেশকে সমধিক বিধ্বস্ত না করে, এজন্য দেশবাসীদিগকে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

কাপড়ের বরাদ্দ হ্রাস

আমরা দেখিতেছি, ভারত গভর্নমেণ্ট আগামী জুন মাস হইতে বস্ত্রের বরাদ্দ শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, বর্তমানের বরাদ্দেই দেশবাসীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতে হইতেছে, ইহার উপর কাপড়ের বরাদ্দ যদি আরও কমান হয়, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইবে সহজেই অনুমেয়। কাপড়ের বরাদ্দ অকস্মাৎ এইরূপভাবে কেন হ্রাস করা হইতেছে, ইহার কারণস্বরূপে আমাদিগকে জানানো হইয়াছে যে, মিলে শ্রমিক ধর্মঘট এবং কাঁচা মালের অভাবের জন্য গত ডিসেম্বর মাস হইতে কাপড়ের সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং দেশবাসীর বস্ত্র সংস্থান সমস্যায় বিপন্ন সরকারের পক্ষে উপায়ান্তর নাই; কিন্তু এই সমস্যার মধ্যেও বিগত ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত বিদেশে কত কাপড় রপ্তানি করা হইয়াছে, সরকার দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই হিসাবটা জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইতাম; কারণ মিল ধর্মঘট এবং কাঁচা মালের অভাব সত্ত্বেও ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী যে ব্যাহত হয় নাই, কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল কমিশনার মহাশয় সম্প্রতি বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত মিলগুলিকে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন—অতঃপর ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানি-যোগ্য বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং ইদানীং ভারতের বস্ত্রের অভাব ঘটিয়াছে; মিল-গুলিকে সর্বপ্রযত্নে সেই অভাবই পূরণ করিতে হইবে। দেশবাসীর প্রতি কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল কমিশনার মহাশয়ের এই দয়া ও সহানুভূতির অভাব নাই, জানিয়া আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা তাঁহাদের মুখে এই কথা বহুবার শুনিয়াছি যে, দেশের অবস্থার দিকে তাকাইয়া ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করা হইয়াছে; অথচ আলোচ্য নির্দেশে ইহা সুস্পষ্ট যে, এতাবৎকাল ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে এবং ৩১শে জুলাইয়ের পর পুনরায় সেই দানব্রত আরম্ভ হইবে। বিদেশী শাসনের এমনই মহিমা।

রাজবন্দীদের মুক্তি

অবশেষে বাঙলার রাজবন্দীদের শেষ দল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বিদেশী গভর্নমেণ্ট এবং তাহাদের প্রভাবাধীন প্রতিক্রিয়া-পন্থী শাসকের দল বাঙলার এই সব স্বদেশ-প্রেমিক বীর সন্তানকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জানি সহজে ইঁহাদের মুক্তি লাভ ঘটে নাই। এবারও ইঁহাদের মুক্তির প্রচেষ্টায় বিদেশী স্বার্থ-সেবীদের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা আসে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে রাজ-নীতিক বন্দীদের মুক্তিদানে বাধা দিতে গিয়া তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে বাঙলার সম্বন্ধেও তাঁহারা সচেতন হন। যুক্ত প্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কিদোয়াই রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের আদেশ দান করিলে গভর্নর তাহাতে প্রতিবাদী হন, এবং মুক্তিদানের কাজ অযথা বিলম্বিত হইতে থাকে, ইহাতে মিঃ কিদোয়াই পদত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং একটা জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট আসন্ন হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের আপোষ-আলোচনার সময় এ অবস্থা সুবিধাজনক নয়, ইহা বুঝিয়া বড়লাট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, ফলে যুক্ত প্রদেশের গভর্নরের স্বৈরাচারমূলক প্রবৃত্তি সংযত হয়। আমাদের মতে বাঙলার এই সব রাজবন্দী-দিগকে অনেক দিন পূর্বেই মুক্তিদান করা কর্তব্য ছিল; কিন্তু ইঁহাদের মুক্তি বিলম্বিত হইলেও এতদিনে যে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে ইহাতেও আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইঁহারা বীরত্বে ত্যাগে এবং দেশসেবার বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ সাধনায় বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। জগতের যে কোন দেশ, শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের ন্যায় দুহিতা এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনিল রায়, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ আচার্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্যভূষণ গুপ্তের ন্যায় বীর সন্তান লাভ করিয়া গর্ব বোধ করিতে পারে। স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় ইঁহাদের আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল আদর্শ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে এবং ইঁহাদের বীর্যময় কর্মোদ্যম ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। আজ আমরা ইঁহাদিগকে আনন্দের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ইঁহাদের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় এবং কর্ম-সাধনায় বাঙলা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, আমরা ইহাই আশা করি; কিন্তু এই সঙ্গে বাঙলার যেসব বীর সন্তান রাজ-নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তাঁহাদের সকলকেই অবিলম্বে মুক্তিদান করা হউক, আমরা ইহাই চাই। এদেশের রাজনীতিক অপরাধ, দেশ সেবারই অপরাধ; দেশসেবার অপরাধে ভারতবর্ষে কেহ এখনও বিদেশী শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, আমরা ইহা বরদাস্ত করিব না। স্বাধীনতার প্রেরণায় জাগ্রত ভারত সকল দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মদান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমরা চাই মুক্তি, চাই স্বাধীনতা। দেশসেবা এখানে আর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না পরন্তু দেশসেবকগণ শাসকদের কাছে সর্বোচ্চ সম্মানেরই অধিকারী হইবেন, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ

কিভাবে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে এবং তাহারই উপায়স্বরূপ কিভাবে ভারতবাসীর উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইবে, সেই সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন এক খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং মন্ত্রী মিশন বলিয়াছেন যে, ইহা বাঁটোয়ারা (Award) নহে, ইহা সুপারিশ (Recommendation) মাত্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই তিন দল সিমলায় যে আলোচনায় মিলিত হইয়াছিলেন, সেখানেও মন্ত্রী মিশন আলোচনার যোগ্য কতকগুলি প্রস্তাবকে 'ভিত্তি' (Basis) হিসাবে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগ একমত হইতে পারেন নাই। তাহার পর এই সুপারিশ। কিন্তু এই 'সুপারিশ'কে যদি কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই অথবা উভয়ের মধ্যে কোন পক্ষ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে মন্ত্রী মিশন পরবর্তী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন সে-সম্বন্ধে কোন আভাস দেন নাই।

যাহা হউক, মন্ত্রী মিশনের সুপারিশের খসড়া প্রকাশিত হইবার পর ভারতের জনমতে মোটামুটি কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। বৈদেশিক অভিমত সম্বন্ধেও একই মন্তব্য করা যাইতে পারে, বরং দেখা যাইতেছে যে দেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। লর্ড পেথিক লরেন্স বলিয়াছেন,—"ইহা ভারতের স্বাধীনতার 'ব্লু-প্রিন্ট' বা মূল কাঠাম।"

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—"ইহা একটি 'হুন্ডি', সুপারিশগুলি যদি যথার্থ পালিত হয় তবে এই হুন্ডির মূল্য আছে, নতুবা ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত।"

কোন্ কোন্ বিষয়ে আপত্তি উঠিয়াছে

(১) প্রদেশগুলিকে যেভাবে তিনটি 'গ্রুপ' বা বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাহা ভারতবাসীর মনঃপূত হয় নাই, (ক) হিন্দু-প্রধান কংগ্রেস প্রদেশ আসাম বলিতেছে,—সে কেন বাঙলার সহিত এক 'গ্রুপ' যুক্ত হইতে বাধ্য থাকিবে? (খ) মুসলমানপ্রধান কংগ্রেস প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বলিতেছে,— সে কেন 'খ' নামক গ্রুপের সহিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্ত হইবে? (গ) বেলুচিস্থান বিস্মিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছে—কেন তাহাকে আদৌ প্রদেশ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদে বা অন্তবর্তী গভর্নমেন্টে (Interim Goverment) কোথাও বেলুচিস্থানের স্থান নাই, (ঘ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু ও শিখেরা গণ-পরিষদে কোন প্রতিনিধিত্ব পায় নাই।

(২) শিখ সম্প্রদায় প্রবল আপত্তি করিতেছেন, মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে শিখেরা একটি 'ভিন্ন সম্প্রদায়' হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয়তার ব্যাপারে তাঁহারা মুসলমান-প্রধান 'ঘ' গ্রুপের মধ্যেই স্থান পাইয়াছেন এবং মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি সমন্বিত গ্রুপ পরিষদে মাত্র ৪টী আসনের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার দিক দিয়া এসম্বন্ধে শিখদিগের আপত্তি করিবার কিছু নাই। শিখেরা সাধারণ বা (General) সম্প্রদায়ের (?) সঙ্গে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে।

(৩) বাঙলা ও আসাম প্রদেশে বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় সদস্য আছেন। গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে যদি ই'হদেরও সমান অধিকার দেওয়া হয় তবে ই'হারা গণ-পরিষদে যে-কয়জন য়ুরোপীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন তাঁহারা সংখ্যায় কম হইবেন না। ক্ষুদ্র সংখ্যক য়ুরোপীয়দিগের তরফে এতগুলি প্রতিনিধি থাকা মোটেই গণতন্ত্রোচিত নহে।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে সুস্পষ্টতার অভাব আছে।

মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড পেথিক লরেন্স

একটি 'আলোচনা কমিটি' (Negotiating Committee) গঠন করিয়া তাহার মারফৎ দেশীয় রাজ্য ও ভারতীয় গণ-পরিষদের সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে। কিন্তু এই আলোচনা কমিটিতে দেশীয় রাজ্যের যে-সকল প্রতিনিধি থাকিবেন তাঁহারা কাহার মনোনীত বা নির্বাচিত প্রতিনিধি? দেশীয় রাজ্যের প্রজা-দিগকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার কোন ক্ষমতা নির্দেশ করা হয় নাই।

আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, দেশীয় রাজ্য-গুলি কোন্ গভর্নমেণ্টের সার্বভৌমত্ব (Paramountcy) মানিবেন। 'ভারত-সম্রাটের' সার্বভৌমত্বের অবসান যদি ঘোষিত হয়, তবে এই সকল দেশীয় রাজ্যগুলি প্রত্যেকে স্বয়ং সার্বভৌম হইয়া উঠিবেন? ইঁহারা কি নূতন ভারত ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের সার্ব-ভৌমত্ব স্বীকার করিবেন না?

(৫) অন্তবর্তী (Interim) গভর্ন-মেণ্টের কি ক্ষমতা থাকিবে? এই বিষয়ে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে কোন নির্দেশ নাই। 'অন্তবর্তী' গভর্নমেণ্টকে যদি কার্যত 'স্বাধীন গভর্নমেণ্টের' মত সামরিক শাসন পরিচালনার ক্ষমতা না দেওয়া হয় তবে তাহা থাকা আর না থাকা সমান। এই অন্তবর্তী গভর্নমেণ্টের মধ্যে 'বড়লাটের' স্থান ও ক্ষমতা কি হইবে?

(৬) গণ-পরিষদ গঠনের সম্বন্ধে যেভাবে ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা উল্টা পথে হাঁটিবার মত ব্যাপার। সর্ব প্রদেশের বা তিনটি গ্রুপের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া প্রথমেই কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের গণ-পরিষদ রচিত হইবে না। উপর দিক হইতে ব্যবস্থা চালু হইবে না, কিন্তু নীচের দিক হইতে অর্থাৎ প্রদেশের দিক হইতেও নহে। প্রথমেই মাঝামাঝি গভর্নমেণ্টের অর্থাৎ 'দোতলার' কাজ সারা হইবে। অর্থাৎ প্রথমে 'গ্রুপ' গভর্নমেণ্টের পরিষদ গঠিত হইবে। এক একটি গ্রুপের প্রদেশগুলি মিলিয়া যে গ্রুপ গণ-পরিষদ্ হইবে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন 'প্রাদেশিক' শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। তাহার পর ইচ্ছা করিলে প্রদেশগুলি গ্রুপ হইতে ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। ইহা একটি জটিল এবং কতকটা প্রহসনের মত ব্যাপার। আসাম নিজ উদ্যোগে তাহার প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবে না। প্রথমে বাঙলার সহিত মিলিয়া 'ঘ' গ্রুপে ঢুকিতে হইবে এবং গ্রুপ পরিষদ তাহার শাসনতন্ত্রটি বলিয়া দিবে। ইহার পরে গ্রুপ ছাড়িয়া যাইবার অধিকার থাকিলেও বিস্ময়ের সহিত একটা খট্‌কা লাগে যে, এতখানি পণ্ডশ্রমের সম্ভাবনাকে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে গ্রাহ্য করা হইল কেন?

গ্রুপ পরিষদ গঠিত হইবার পর কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের পরিষদ গঠিত হইবে। এই কারণেই বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনা যাইতেছে যে, পরিষদ-গঠনের ব্যাপারে মন্ত্রী মিশন উল্টা পথে চলিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

(৭) ধরিয়া লওয়া হউক, অনেক ঝকমারির পর কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন স্থাপিত হইল। কিন্তু এই ইউনিয়নের ক্ষমতার পরিধি কতদূর ব্যাপক হইবে? মন্ত্রী মিশন মাত্র তিনটি বিষয়ের অধিকার কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন—পররাষ্ট্র সম্পর্ক, দেশরক্ষা, যাতায়াত ও সংযোগ-রক্ষা (Communication)। আপত্তি উঠিয়াছে, মাত্র ঐ তিনটি বিষয়ের অধিকার লইয়া কোন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট সমগ্র দেশের জন্য কোন্ শাসনতান্ত্রিক উন্নতি সম্ভব করিতে পারিবে? মুদ্রা (Currency), শুল্ক (Custom) এবং সাময়িক পরিকল্পনা (Planning)—এই বিষয়গুলি হইতে সম্পর্কচ্যুত থাকিলে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াই থাকিবে। অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে

পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ জিন্না

ফাইন্যান্স ও অন্যান্য বহুবিধ দায়িত্বের ও কর্তব্যের সমতা রক্ষা করা অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, অন্যান্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও মাত্র আর্থিক কারণেই বিভিন্ন প্রদেশগুলি পারস্পরিক নির্ভরতা ছাড়া চলিতে পারে না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের হাত হইতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের উৎসাহ ও ক্ষমতার সুযোগ সরাইয়া রাখা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নহে, বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাও নহে।

(৮) ভারতের কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদ গঠিত হইলে কবে তাহার সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবে এবং কবে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইবে এবং পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহা স্বীকৃত হইবে কি না, অথবা কবে স্বীকৃত হইবে—এ বিষয়ে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে কোন উল্লেখ নাই।

(৯) ভারত হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলা যায় না। কিন্তু মন্ত্রী মিশনের সুপারিশে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

সমর্থন করিবার মত কি কি আছে?

মন্ত্রী মিশনের সুপারিশের অন্তর্গত আপত্তিকর বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সমর্থন করিবার মত বহু বিষয় ইহার মধ্যে আছে যাহার জন্য অনেকে ইহাকে সংশোধনযোগ্য তথা একরূপ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, বৃটেনের শ্রমিক গভর্নমেণ্ট যে চিরাচরিত গোঁড়া সাম্রাজ্যিক নীতির প্রকোপ হইতে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ইহার মধ্যে আছে।

(১) মুসলিম লীগের পরিকল্পিত 'পাকিস্থান' থিয়োরীকে মন্ত্রী মিশন সুস্পষ্ট-ভাবে অযৌক্তিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে 'কেন্দ্রীয়' শাসনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের মত দেশের সামরিক আত্মরক্ষার বিষয়টিকেও বিবেচনা করিয়া তাঁহারা 'ভারতীয় বাহিনীর অখণ্ডতাও' স্বীকার করিয়াছেন।

(২) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে 'বয়স্কের ভোটদান ক্ষমতার' (Adult Franchise) ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা ইহারই মধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

(৩) কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদের বিবেচনা ও বিচারের উপর কোন সর্ত আরোপ করা হয় নাই। গণ-পরিষদ গঠিত হইলে, সমগ্র শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার পরিবর্তন ও সংশোধন করিবার ক্ষমতা গণ-পরিষদের থাকিবে।

(৪) মুসলিম লীগের পাকিস্থান থিয়োরীকে অস্বীকার করিলেও, মন্ত্রী মিশন মুসলিম লীগের বর্তমান মনোভাবের অবস্থা অস্বীকার করেন নাই। 'পাকিস্থানের' মধ্যে যুক্তি না থাকুক, মুসলিম লীগের 'হিন্দু-বিরোধী' মনোভাব যে বাস্তব সত্য, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। এই মনোভাবকে যুক্তিবলে দূর করার উপায় নাই বলিয়াই তাঁহারা 'গ্রুপ' ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া কিছুটা পাকিস্থানী তৃষ্ণা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া ইহা বলা যায় যে, মন্ত্রী মিশন ইহার দ্বারা কোন পক্ষের প্রতিই অন্যায় করেন নাই। তাঁহারা যথাসাধ্য একটা কাজের পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(৫) লর্ড পেথিক লরেন্স, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মিঃ জিন্নার পত্রাবলী প্রকাশিত হইবার পর আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মন্ত্রী মিশন এই সুপারিশ রচনায় কংগ্রেসের বহু দাবী ও সংশোধন প্রস্তাবকে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) মন্ত্রী মিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে বহু আপত্তিকর বিষয় থাকিলেও, একটি

প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয় যে, তাঁহারা বিষয়টিকে যথাসাধ্য গণতন্ত্রোচিত আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশ-বিদেশের অভিমত

(১) আমেরিকার জনমত মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে খুসী হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য ও সুবিচার বলিয়া সকলেই অভিমত দিয়াছেন।

(২) ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলি অবশ্য একটু বেশি অহঙ্কারের সুরে কথা বলিতেছে। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

(৩) স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু খুব খুসী হইয়াছেন।

(৪) মিঃ চার্চিল ততটা খুসী হইতে পারেন নাই। তিনি মন্ত্রী মিশনের কার্য সম্বন্ধে কতগুলি 'নীতিগত' আপত্তি তুলিয়াছেন। কাজটা যেন একটু মাত্রাছাড়া হইয়াছে, তিনি এইরূপ মনে করেন।

(৫) মিঃ এমেরি সকলকে একটু আশ্চর্য করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বরং এমন কথাও বলিয়াছেন যে, 'অন্তবর্তী' গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিত ছিল।

(৬) সোভিয়েট রুশিয়া ও ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট দল প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতকে একটা বিরাট ধাপ্পা দিয়াছেন মাত্র।

(৭) ভারতবর্ষের বামপন্থী নেতা বলিয়া অভিহিত কেহ কেহ এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

ভাল-মন্দ দুই দিক

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু মন্ত্রী মিশনের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবের মধ্যে যথার্থ মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, কিন্তু সবই নির্ভর করে উহার সার্থক প্রয়োগের উপর।

নিরপেক্ষ সমালোচকগণ তাহাই বলিতেছেন। এই খসড়ার কাজ আধুনিক সিভিল সার্ভেণ্টদিগের মত যদি সঙ্কীর্ণচিত্ত পেশাদারী কেরানী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের হাতে দেওয়া হয়, তবে তাহা ভারতের দুর্ভাগ্যকে ঘোরতর করিয়া তুলিবে। অন্য দিকে, যদি দেশের আস্থাভাজন শ্রদ্ধেয় নেতৃবর্গ এই খসড়া অনুযায়ী ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেন, তবে ইহার দ্বারাই অনেক সৎকাজ সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

দুঃখের বিষয়, এই খসড়া ভারতীয় জনসাধারণকে তিন সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া রাখিল—সাধারণ (জেনারেল), মুসলমান ও শিখ। তেমনি ইহা পরোক্ষে একজাতীয়তার আর একটি বড় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সাধারণ বা জেনারেল সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের বহু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় মিলন সম্ভব হইবার একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে।

এই সম্পর্কে ভারতীয় খৃষ্টান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় যে মনোবল দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জর্জরিত ভারতবর্ষে খুব কম দেখা যায়। মন্ত্রী মিশনের কাছে গিয়া যখন বহু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শুধু 'রক্ষা-কবচ', 'বিশেষ প্রতিনিধিত্ব', 'স্বতন্ত্র নির্বাচন' ও 'স্বতন্ত্র দেশ' দাবী করিতেছিল, তখন এই দুই সম্প্রদায়ের নেতৃদ্বয় 'সাধারণে'র অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সঙ্কল্পকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও ইঁহারা কোন 'বিশেষ অনুগ্রহ' দাবী করেন নাই। বিচ্ছেদবাদী কতিপয় তপশীলী আদিবাসী, দ্রাবিড় ও শিখ নেতা লজ্জিত হইয়া মিঃ এণ্টনি ও মিঃ জনের আচরণ হইতে কিছুটা সৎশিক্ষা এখনও গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপারিশ ও ব্যাখ্যা

মন্ত্রী মিশনের সুপারিশের খসড়া প্রকাশিত হইবার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে লর্ড পেথিক লরেন্স ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ সাংবাদিকদিগের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া কয়েকটি অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আপত্তিকর মূল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই।

গান্ধীজী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রী মিশনের সহিত পত্রালাপে ব্যাপৃত আছেন। সুপারিশের খসড়ায় যাহা অস্পষ্ট ও অ-লিখিত আছে, সে-সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা ও উল্লেখ চাই। মিঃ জিন্নাও এযাবৎ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তিনিও মন্ত্রী মিশনের সহিত পত্রালাপ দ্বারা কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা দাবী করিতেছেন। নূতন দাবীও জ্ঞাপন করা হইতেছে।

মন্ত্রী মিশনের উদ্যোগের অধ্যায় এই পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছিয়াছে। ততঃ কিম্?

বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিমণ্ডলী ও বড়লাটের বিবৃতি

১। মন্ত্রী মিশনের ভারতাগমনের অব্যবহিত পূর্বে গত ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন:—

"ভারতবর্ষকে সত্বর পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়াই আমার সহকর্মিগণ ভারত যাইতেছেন। কি ধরণের শাসনতন্ত্র বর্তমান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হইবে তাহা ভারতীয়গণই স্থির করিবেন। সত্বর সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।"

* * * *

"আমি আশা করি, ভারত ও ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক। আমি বিশ্বাস করি, ইহাতে তাঁহাদের প্রচুর সুবিধাই হইবে।"

* * * *

"কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহি সংযোগ রাখা বা না রাখা ভারতী জনগণের স্বাধীন মতামতসাপেক্ষ। ব্রিটি সাধারণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সংযো তাহা আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা স্বাধীন জনগণের স্বাধীন মিলন। আমি মা করি, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করার অধিকার ভারতের আছে। যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমত হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদে কর্তব্য।"

২। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দায়িত্বভার বহ করিয়া আমরা, মন্ত্রিসভার সদস্যত্রয় ও বড়লা দুই প্রধান রাজনৈতিক দলকে সর্বভারতীয় ঐ বা বিভাগের মূল সূত্রে একমত হইতে সাহা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নয়াদিল্লী সুদীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা সিমলা কনফারেন্সে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সমবেত করিতে সম হইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ মতবিনিময়ের পরে উভ পক্ষই ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মীমাংসায় উপনী হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি উভয় মধ্যবর্তী অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করা এ কোন মীমাংসায় পেঁাছান সম্ভবপর হয় নাই সুতরাং উভয় পক্ষের অনুমোদিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় আমরা সত্বর নূত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা সর্বোত্ত মনে করি, তাহা উপস্থিত করা আমাদের কর্ত মনে করি। ইংলণ্ডস্থিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টে পূর্ণ অনুমোদনক্রমে এই বিবৃতি দেওয়া হইল।

৩। ভারতীয় জনগণ যাহাতে তাহাদে ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে তাহার আশু ব্যবস্থা করা সাব্যস্ত হইয়াছে। এ শাসনতন্ত্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতে শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালী সরকার গঠন করাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষ হউক আর বৃহৎই হউক, আমরা সকল শ্রেণ প্রতিই সুবিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আম মনে করি, ভবিষ্যৎ ভারত শাসনের কার্যক পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহি আছে এবং ইহা দ্বারা ভারতের আত্মরক্ষ সুব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষে অগ্রগতির পথও প্রশস্ত করা হইয়াছে।

লীগ ব্যতীত সকলেই সর্বভারতীয় ঐক্যের সমর্থক

৪। মিশনের সমক্ষে যে রাশীকৃত সা উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা এ বিবৃতির উদ্দেশ্য নহে। এইস্থলে ইহা উল্লে যোগ্য যে, মুসলিম লীগ সমর্থকগণ ব্যতীত ত সকলেই সর্ব ভারতীয় ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন।

৫। ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন নিবিষ্ট মনে ভারত বিভাগের সম্ভাব্যতার ক চিন্তা করিয়াছি। পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু চিরকাল তাঁহাদের উপর শাসন চালান, মুসলম গণের এই ভয় ও ভাবনা আমাদের নিকট বিশেষভ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ধারণা মুসলি জনগণের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বে রক্ষাকবচ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা দূর করা সম্ নহে। ধর্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও অন্য মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভার মুসলি জনগণের হস্তে ন্যস্ত করার ব্যবস্থার দ্বা ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা যাই পারে।

৬। আমরা সর্ব প্রথমেই মুসলিম লীগ উপস্থাপিত সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। এই পাকিস্থানের জন্য দুইটি অংশ:—একটি উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্থান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব লইয়া এবং অপরটি উত্তর-পূর্বে বাঙ্গলা এবং আসাম লইয়া দাবী করা হইয়াছিল। মুসলিম লীগ, প্রথমে পাকিস্থানের নীতি স্বীকৃত হইলে পরে সীমা নির্ধারণ ও আবশ্যক মত পরিবর্তনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণের নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের অধিকার ও দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত কোন কোন স্থান শাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পাকিস্থানের অংশীভূত করার প্রয়োজনীয়তার নীতির উপরেই পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবী করা হইয়াছিল।

পাকিস্থান অযৌক্তিক

১৯৪১ সালের লোক গণনার সংখ্যানুপাতে উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমানগণের সংখ্যা সামান্য নহে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	মুসলমান	অমুসলমান
পাঞ্জাব	১৬,২১৭,২৪২	১২,২০১,৫৭৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২,৭৮৮,৭৯৭	২৪৯,২৭০
সিন্ধু	৩,২০৮,৩২৫	১,৩২৬,৬৮৩
ব্রিটিশ বেলুচিস্থান	৪৩৮,৯৩০	৬২,৭০১
মোট	২২,৬৫৩,২৯৪	১৩,৮৪০,২৩১
শতকরা	৬২·০৭	৩৭·৯৩

উত্তর-পূর্বাঞ্চল	মুসলমান	অমুসলমান
বাঙ্গলা	৩৩,০০৫,৪৩৪	২৭,৩০১,০৯১
আসাম	৩,৪৪২,৪৭৯	৬,৭৬২,২৫৪
	৩৬,৪৪৭,৯১৩	৩৪,০৬৩,৩৪৫
শতকরা	৫১·৬৯	৪৮·৩১

ব্রিটিশ ভারতের অন্যত্র প্রায় ২ কোটি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান, ১৮ কোটি ৮ লক্ষ অমুসলমানের মধ্যে বাস করেন।

এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলিম লীগের দাবী মত পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘিষ্ঠতা সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরাও পাঞ্জাব, বাঙ্গলা এবং আসামের অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি সার্বভৌম পাকিস্থানের অন্তর্গত করার কোন যৌক্তিকতা দেখি না। পাকিস্থানের পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ জেলাগুলিকে পাকিস্থানের বাহিরে রাখার পক্ষেও সেই সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করা চলে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রশ্ন শিখদের অবস্থার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না

৭। কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানগুলি লইয়া ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা সম্ভব কিনা তাহাও আমরা চিন্তা করিয়াছি। মুসলিম লীগের মতে এই ধরণের পাকিস্থান সম্পূর্ণ অকার্যকরী হইবে; কারণ (ক) পাঞ্জাবের সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ (খ) শ্রীহট্ট জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম এবং (গ) কলিকাতা নগরী, যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৩.৬ মাত্র, তাহা সমেত পশ্চিম বাঙ্গলার বৃহদংশ পাকিস্থানের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় এই প্রকার বিভাগ করিয়া কোন মীমাংসা করা তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্তমান। বিশেষতঃ পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হইলে যথেষ্ট সংখ্যক শিখ সীমারেখার উভয় দিকে পড়িয়া যাইবে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান নহে।

দ্বিধা বিভক্ত ভারতের বিপদ

৮। উপরোক্ত জোরাল যুক্তি ছাড়া আরও অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুতর যুক্তিও বিবেচ্য। ভারতের যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সমস্ত বিভাগ বিচ্ছিন্ন করিলে ভারতের উভয় অংশই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতের রক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি আরও প্রবল। ভারতের সামরিক বাহিনীকে সমগ্র ভারতকে রক্ষা করার জনাই অখণ্ড করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বিধা বিভক্ত ভারতীয় বাহিনী শুধু তাহার সুপ্রাচীন সুনাম ও সুউচ্চ কর্মশক্তিই হারাইবে না, বরং ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। ভারতীয় নৌ ও বিমানবহরের কর্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। প্রস্তাবিত পাকিস্থানের উভয় অংশ ভারতের দুই সুভেদ্য সীমারেখায় অবস্থিত। রক্ষা ব্যবস্থার গভীরতার বিবেচনায় পাকিস্থান ভূখণ্ড অত্যন্ত অপ্রচুর।

৯। বিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুতর অসুবিধার কথাও আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি।

দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের হস্তে ক্ষমতা দেওয়া যায় না

১০। সর্বশেষে প্রস্তাবিত পাকিস্থানের ভৌগোলিক সংস্থাপন ও উভয় পাকিস্থানের মধ্যবর্তী ন্যূনাধিক সাতশত মাইল দূরত্বের কথাও বিবেচ্য। উভয়ের মধ্যে সমরকালীন বা শান্তিকালীন যানবাহন ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১১। অতএব বর্তমানে ব্রিটিশের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করার পরামর্শ আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে অক্ষম।

সিমলায় ত্রি-দলীয় সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণের সহিত রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ

মুসলমানদের আশঙ্কা প্রতিকারে কংগ্রেসের পরিকল্পনা

১২। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আমরা অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ-নিয়ন্ত্রিত, অখণ্ড ভারতে মুসলমান জনগণের সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ডুবিয়া যাইবার সত্যিকার আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়াছি। ঈদৃশ আশঙ্কার প্রতিকারার্থ কংগ্রেস এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন. এই পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রে বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব কম সংখ্যক বিষয় সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহা ছাড়া প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে যদি কোন কোন প্রদেশ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তাঁহার উল্লিখিত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাড়া তাঁহাদের ইচ্ছামত অন্যান্য বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

১৩। আমাদের মতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে যথেষ্ট শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। যাহার কয়েকজন মন্ত্রী বাধ্যতামূলক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী থাকিবেন ও অপর কয়েকজন মন্ত্রী ইচ্ছাধীন কেন্দ্রে ন্যস্ত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র সেই কয়েকটি প্রদেশের নিকট দায়ী থাকিবেন এমন একটি শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন বিষয়ে বক্তৃতা করা ও ভোটদান হইতে কোন সভ্যকে বঞ্চিত করা আবশ্যক হইবে।

এই প্রকার কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করার অসুবিধা ছাড়াও আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রে কোন ইচ্ছাধীন বিষয় গ্রহণ করে নাই, তাহাদের এই প্রকার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে একত্রীভূত হইবার অধিকার অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক

১৪। আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বেই আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বৃটিশ ভারতের সম্পর্ক আলোচনা করিব।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের যে সম্পর্ক এতাবৎকাল বর্তমান আছে, তাহা থাকা সম্ভবপর হইবে না। ইংলণ্ডেশ্বর তখন আর তাঁহার সার্বভৌমত্ব রাখিতেও পারেন না, অথবা নূতন ভারত সরকারের হাতে তাহা ন্যস্তও করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের যাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন। তাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ভারতের নব জাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত থাকিতে ইচ্ছুক। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কালেই কিভাবে তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা কার্যকরী করা হইবে তাহা সঠিকভাবে স্থিরীকৃত হইবে। সমস্ত রাজ্য সম্পর্কে একই ব্যবস্থা করা হইবে তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। এইজন্যই পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তেমন করি নাই।

অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

১৫। আমাদের মতে যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দলের মূলে দাবীর পক্ষে ন্যায্য এবং যে ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের স্থায়ী ও কার্যকরী শাসন প্রণালী প্রণয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, আমরা এখন তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক:—

(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হউক। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সর্ববিধ কর্তৃত্ব এই যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে ও এই সকল বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করার আবশ্যক কর্তৃত্বও ইহার থাকিবে।

(২) এই যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা পরিষদে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকভাবে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত বিষয়সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

(৪) দেশীয় রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী রহিবেন।

(৫) প্রদেশসমূহ শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ সম্বন্ধে দলবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয় স্থির করিতে পারিবেন।

(৬) যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক যৌথ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় এই বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথমে দশ বৎসর পরে এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারিবে।

ভারতীয়গণের দ্বারাই শাসনতন্ত্র রচিত হইবে

১৬। উপরোক্ত ধারার কোন বিস্তারিত শাসন-প্রণালী লিপিবদ্ধ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে চাই, যাহাতে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন।

আলাপ-আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, শাসনতন্ত্র রচনায় মূলনীতি সম্বলিত এই প্রকার কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা না হইলে ভারতের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কোন আশা নাই।

১৭। অচিরেই নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান কার্যকরী করিবার জন্য আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি

১৮। নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রধানতম সমস্যা ইহাকে সঠিকভাবে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় করা। প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা প্রতিনিধি পরিষদ গঠনই সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু ইহাতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটিবে! অল্পদিন পূর্বে নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদগুলিকে নির্বাচক হিসাবে ব্যবহার করাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা। ব্যবস্থা পরিষদের গঠন প্রণালীর দুইটি ব্যাপারে ইহাও একটু শক্ত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সভ্য সংখ্যা সর্বত্র প্রদেশের সমগ্র লোক সংখ্যার অনুপাতে ধার্য করা হয় নাই। আসামে এক কোটি অধিবাসীর ব্যবস্থা পরিষদে ১০৮জন সভ্য আর বাঙ্গলায় লোক সংখ্যা ইহার ছয় গুণ অথচ বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য সংখ্যা ২৫০। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ায়, কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ধরা হয় নাই। বাঙ্গলায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪৮ কিন্তু লোক সংখ্যায় তাঁহারা শতকরা ৫৫। কিভাবে এই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের মতে খুব ন্যায্য ও কার্যকরী উপায় হইতেছে:—

ক। প্রত্যেক প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বণ্টন করা। প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের কাছাকাছি দাঁড়াইবে।

খ। প্রাদেশিক আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

গ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যেরা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনি[ধি] নির্বাচন করিবেন।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব

আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্যে সাধারণ, মুসলি[ম] ও শিখ এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের বিষয় বিবেচন[া] করিলেই চলে। মুসলিম ও শিখ ছাড়া অন্যান্য সকলকেই সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা হইবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় জনসংখ্যা অনুপাতে অতি সামান্য প্রতিনিধিত্বই পাইতে পারেন পরন্তু ইহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদে[র] যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইবা[র] আশঙ্কা আছে। সেজন্য বিংশ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিশেষ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের পূ[র্ণ] প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৯। (১) আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে প্রত্যে[ক] প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ, মুসলিম [ও] শিখ সদস্যেরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বা[রা] তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিম্নোক্ত সংখ্যা[য়] প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন:

প্রতিনিধির তালিকা

'ক' বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মো[illegible]
মাদ্রাজ	৪৫	৪	[illegible]
বোম্বাই	১৯	২	[illegible]
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	[illegible]
বিহার	৩১	৫	[illegible]
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	[illegible]
উড়িষ্যা	৯	০	
মোট	১৬৭	২০	১[illegible]

'খ' বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	[illegible]
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	
সিন্ধু	১	৩	০	
মোট	৯	২২	৪	

'গ' বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
বাংগলা	২৭	৩৩	০	৬০
আসাম	৭	৩	০	১০
মোট	৩৪	৩৬	০	৭০
সর্বমোট বৃটিশ ভারত				২৯২
দেশীয় রাজ্যের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধি				৯৩
				৩৮৫

মন্তব্য—চীফ কমিশনারের প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের দিল্লী ও আজমীঢ়-মাড়ওয়ারের প্রতিনিধিদ্বয় এবং কুর্গ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য 'ক' বিভাগে যুক্ত হইবেন। ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের একজন প্রতিনিধি 'খ' বিভাগে যুক্ত হইবেন।

অনধিক ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি

(২) গণ পরিষদে জনসংখ্যানুপাতে অনধিক ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। ইঁহাদের নির্বাচন প্রণালী আলোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। প্রারম্ভে একটি সালিশী কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীতে সমবেত হইবেন।

(৪) প্রারম্ভিক সভায় কার্যসূচী স্থির হইবে, সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নলিখিত বিংশ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের, সংখ্যাল্পদের, উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থ এক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ইহার পরে প্রতিনিধিগণ পূর্বে ক, খ, গ বিভাগে বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবেন।

(৫) প্রত্যেক দল তাঁহাদের বিভাগে বর্ণিত প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সেই সকল প্রদেশ লইয়া কোন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এবং হইলে সেই মণ্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন। নিম্নে আট নম্বর উপধারায় বর্ণিত ব্যবস্থানুসারে কোন প্রদেশ মণ্ডলীর বাহিরে থাকিতেও পারেন।

(৬) প্রতি বিভাগের ও দেশীয়রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুনরায় সমবেত হইবেন।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদে যদি পনর নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন অথবা কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের ও দুই প্রধান সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকভাবে গৃহীত অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। গণপরিষদের সভাপতি কোন প্রস্তাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত কিনা তাহা স্থির করিবেন এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের যে কোন এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবী করেন, তাহা হইলে ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ নিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

(৮) নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পর যে কোনও প্রদেশ পূর্বে যে দল বা গোষ্ঠীর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান মত সাধারণ নির্বাচনের পরেই মাত্র ব্যবস্থা পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন।

২০। নাগরিকগণ, সংখ্যাল্প সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সংরক্ষণার্থ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। মৌলিক অধিকার, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রক্ষাব্যবস্থা এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাব উপদেষ্টা কমিটি গণপরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং এই সকল অধিকার কোন প্রাদেশিক গোষ্ঠী অথবা ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে তাহাও বলিবেন।

শীঘ্রই শাসনতন্ত্র রচিত হইবে

২১। মাননীয় বড়লাট অবিলম্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সালিশী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা আশা করি বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্য অগ্রসর হইবে এবং মধ্যবর্তী সময় অতি সংক্ষিপ্তই হইবে।

২২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদ ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সন্ধিপত্র রচিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

২৩। শাসনতন্ত্র রচনাকার্য চলিতে থাকাকালীন ভারতের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চলা অত্যাবশ্যক। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থিত এক অন্তবর্তীকালীন সরকার সত্বর প্রতিষ্ঠা করা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বর্তমান সন্ধিক্ষণে ভারত সরকারের এই গুরু-কর্তব্য পালনে সর্বাধিক সহযোগিতার প্রয়োজন। দৈনন্দিন শাসনকার্য চালনা ছাড়াও আমাদিগকে দারুণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকলের জন্য জনগণের সমর্থনপুষ্ট সরকার অত্যাবশ্যক।

মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয় এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই জনগণের আস্থাভাজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে সমর-সদস্য ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় সদস্য লইয়া এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের এই পরিবর্তনের গুরুত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং শাসন কার্যের দায়িত্ব পালনে এবং শীঘ্র ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার কার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ

২৪। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবং জনসাধারণের এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শেষ বক্তব্য এই। আমাদের, আমাদের গবর্ণমেন্ট এবং আমাদের দেশবাসীদের আশা ছিল যে, ভারতবাসীরা যেরূপ নূতন রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিতে চায়, তাহার গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের এবং আমাদের পরিশ্রম ও অশেষ ধৈর্য ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করি যে, সর্ববিধ মত গ্রহণ করিয়া এবং অশেষ বিবেচনাপূর্বক আমরা আপনাদের নিকট এখন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্তর্বিপ্লব ও অন্তর্কলহ ব্যতীতই আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম করিবে। আমাদের প্রস্তাব হয়ত আপনাদের সকল দলকে পরিপূর্ণ সুখী করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের সহিত আপনারাও ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, ভারতের ইতিহাসের এই পরম মুহূর্তে রাজনীতির দিক হইতে পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাব যদি আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে অন্য কোন বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনা করিতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। ভারতীয় দলসমূহের সহিত একযোগে ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া আমরা এই মত পোষণ করিতেছি যে, কেবল উক্ত দলসমূহের ঐক্য দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার আশা অতি অল্প। সুতরাং মারামারি, অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। এইরূপ শান্তিভংগের ফলাফল এবং স্থিতিকাল অনুমান করা কঠিন; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু অত্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই অবস্থাকে ভারতীয় জনসাধারণ, আমাদের দেশবাসী এবং বিশ্বের জনসাধারণ সমভাবে ঘৃণা করিবে।

সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ভাব লইয়া আমরা আমাদের প্রস্তাব আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, আপনারাও সেই ভাব নিয়াই তাহা গ্রহণ করিবেন এবং কার্যকরী করিয়া তুলিবেন। যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ মংগল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী নিজেদের সম্প্রদায় এবং স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আমরা আশা করি, নূতন স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সভ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। আমরা আশা করি, যে কোন অবস্থায়ই আপনারা আমাদের সহিত নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন। অবশ্য ইহা আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এই বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, বিশ্বে মহান জাতিপুঞ্জের মধ্যে আপনাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হউক এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হউক ইহাই আমাদের কাম্য।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার একদিক

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মুসলমান শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মুসলমান ও পরে ইংরেজের শাসনের ফলে তাহার মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলেও আজ পর্যন্ত গ্রামদেশে অথবা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে তাহার প্রাচীন রূপ অনেকাংশে বজায় আছে।

সারা ভারতবর্ষে গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে ধোপা নাপিত কামার কুমার ছুতার গয়লা কলু মালি মুচি হাঁড়ি ডোম প্রভৃতি জাতি বাস করিয়া সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ার করে অথবা বিশেষ বিশেষ কাজ করিয়া দেয়। গ্রামের শিল্পিকুলের ঘরে যাহা পাওয়া যায় না তাহা দৈনিক বাজারে অথবা সাপ্তাহিক হাটে কিনিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই গৃহস্থের আটপৌরে প্রয়োজন মিটিয়া যায়। পিতলকাঁসার বাসন অথবা কাঠের দরজাজানালা কড়িবরগা মানুষের রোজ লাগে না। ধানকাটার পর শীতকালে দু-তিন মাস ধরিয়া বিভিন্ন গ্রামে মেলা বসে, এবং প্রতি মেলাতেই বিশেষ বিশেষ জিনিসের আমদানি হয়। কোথাও গরুবাছুর হাতীঘোড়া, কোথাও কাঠের দরজাজানালা কড়িবরগা খুঁটি ছোটবড় নৌকা, কোথাও তাঁতের সরঞ্জাম সুতা কাপড় গামছা অথবা মশারি বেশি বিক্রয় হয়, এবং নানা গ্রামের লোক প্রয়োজনমত সেই সকল বস্তু খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এদিকে আবার কাঁসাপিতলের কারিগরদের মধ্যে এক শ্রেণী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন অথবা ধান মাপিবার পাই অর্থাৎ পিতলের কুনকে বেচিয়া পুরান ভাঙা বাসন-কোসন সংগ্রহ করিয়া ফেরে। গ্রামবাসিগণও তীর্থ করিবার উদ্দেশে গয়া কাশী বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া প্রতি তীর্থের বিশেষ বিশেষ শিল্পসম্পদ সাধ্যমত সংগ্রহ করে।

এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে সারা ভারতবর্ষে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ ও তাহা বিলির কাজ সুচারুরূপে হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। একজন কামার বহু খরিদ্দারের অভাব মিটাইতে পারে, একজন কলু অনেক গৃহস্থকে তেল যোগাইতে পারে। বংশবৃদ্ধির ফলে চাষীর ঘরে যে পরিমাণ অসুবিধা হয়, কারিগরের ঘরে তাহার চেয়ে বেশি হইবার কথা। ফলে পূর্বকাল হইতেই শিল্পী অথবা কারিগর শ্রেণীর লোক সময়ে সময়ে একই গ্রামে ঘন বসতি করিয়া নূতন কোন শিল্প উদ্ভাবনের দ্বারা অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইত। বর্ধমান জেলায় কামার-পাড়া এমন একখানি গ্রাম। সেখানকার কামারেরা পিতলের গিল্টিকরা গয়না গড়ে এবং কলিকাতার ব্যবসায়ী মহাজন তাহা ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন জেলায় পাইকারদের কাছে বেচিয়া থাকে। সকল জায়গার মাটি সমান নয়। হাঁড়ি গড়ার পক্ষে কোন কোন গ্রামের অথবা মাঠের মাটি ভাল। তাহার আশেপাশে কুমার জাতির ঘন বসতি হয় এবং বৎসরের মধ্যে সুবিধামত কোনও এক সময়ে তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া মাটির বাসন বেচিয়া আসে।

এমনই ভাবে পুরানো ভারতবর্ষে কালক্রমে তাঁতীর গ্রাম, সেকরার গ্রাম, তীর্থস্থান অথবা রাজধানীর মধ্যে পল্লীবিশেষে পটুয়া বা চিত্রকর, কাঁসারি, হাতীর দাঁতের কারিগর, সোনারুপার কর্মকার, অথবা পাথরের খোদাই-কারী জাতির ঘন বসতি হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের হাতের কাজ ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া দেশ-দেশান্তরেও বিক্রয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মাল রপ্তানির কাজ এক সময়ে আরব দেশের অধিবাসীর হাতে ছিল। চাঁদ সওদাগরের মত দেশী বণিকও একাজে যোগ দিতেন। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ অথবা ইংরেজ ব্যবসাদারগণ রপ্তানির ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লয়। যাহাই হউক, হিন্দু আমলের ভারতবর্ষ তদানীন্তন ইংলণ্ড, ফ্রান্স অথবা জার্মানি ইটালির মত দেশের চেয়ে শিল্পসম্পদে অনেক উন্নত ছিল। মালের বাজারও বহুদূরব্যাপী ছিল বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি পৈত্রিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া সুখে সংসার নির্বাহ করিত। সওদাগরের ছেলে সওদাগরি করিত, কামারের ছেলে কামার হইত, তাঁতীর ছেলে তাঁত চালাইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। চাকরিজীবীর ছেলেরও চাকরির অভাব ঘটিত না।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থায় কোথাও যে ত্রুটি ছিল না তাহা নহে। সমাজদেহে বুদ্ধিজীবীর আসন উপরে, কারিগর শ্রেণীর স্থান নীচে এবং চাষীর স্থান আরও অধম করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কেহ জলচল কেহ অজলচল। কাহারও বিদ্যাভ্যাস করিবার অধিকার আছে, কাহারও নাই। কেহ সোনা-রুপার গয়না ব্যবহার করিতে পারে, কেহ বা পয়সা থাকিলেও সমাজে সেরূপ গয়না পরিতে পায় না। কাহারও পক্ষে অপরের উঠান পর্যন্ত প্রবেশ করিবার অধিকার আছে, কাহাকেও বাহিরবাড়ির দাওয়ায় শুধু বসিতে দেওয়া হয়, ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। কেহ ব্রাহ্মণ পল্লীর ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে ডাক দিয়া যায়, যেন উচ্চবর্ণের সকলে তাহার ডাক শুনিয়া সতর্ক হইয়া যায়, কাহারও বা সেরূপ পল্লীর মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

সামাজিক মর্যাদায় যেমন ইতরবিশেষ ছিল, মানুষের আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তেমনই যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইত। বাণিজ্য-সেবী সহজে ধনী হইতে পারিত, কামার-কুমারের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। চাকরি-জীবী, রাজা অথবা জমিদারকে আশ্রয় করিয়া ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া শেষ বয়সে পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া অথবা তীর্থভ্রমণে দিন কাটাইত, তাহাদের উত্তরপুরুষ আলস্যে বা ব্যসনে ডুবিয়া থাকিত। শিল্পী অথবা কৃষকের অবস্থা সব সময়ে ভাল চলিত না, তবে কৃষকের চেয়ে শিল্পীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গরিব মরিত বেশি, ধনী বা সাধারণ গৃহস্থের তত কষ্ট হইত না।

এমনই ভাবে সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে দিন একরকম করিয়া কাটিতেছিল। এমন সময়ে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী পাঠান এবং মধ্য এশিয়ার মুঘল জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপনা করিলেন। তাহার ফলে উত্তরকালে সমাজদেহের আর্থিক অঙ্গে যে যে পরিবর্তন সাধিত হইল, তাহার আলোচনা করা যাক। পাঠান ও মুঘল লুণ্ঠকেরা যখন শাসক হইয়া বসিলেন তখন চাকরিজীবী হিন্দু জাতিগুলি নূতন সরকারের কাছে চাকরি আরম্ভ করে। শিল্পিগণের মধ্যে অনেকে রাজধানীর আশপাশে সমবেত হইয়া রাজদরবারের আশ্রয়পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার প্রভাব বড় শক্ত প্রভাব। ফলত খাওয়ায় পরায় চালচলনে, এমনকি ভাষা বিদ্যা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ইসলাম এবং পারস্য সংস্কৃতির ছাপ পড়িতে লাগিল। স্বভাবত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং প্রতি প্রদেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। কোন কোন জায়গায় শিল্পিকুল ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল। কোথাও বা চাকরিজীবী হিন্দুজাতির মধ্যে মুসলমানের স্পর্শজনিত নূতন উপজাতির উদ্ভব হইল। তাহা ছাড়া নানা জাতির লোকেই মুসলমানী আমলে পৈত্রিক বৃত্তিতে যথেষ্ট লাভ হয় না দেখিয়া চাকরিজীবী অশ্বারোহী অথবা পদাতিক সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিল।

অতএব পূর্বে হিন্দু আমলে সকল বৃত্তিকে একান্তভাবে বংশানুগ করিবার যে অভিপ্রায় এবং চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহার প্রভাব কিছু কমিয়া আসিল; কেননা রাজশ

অন্যে অপরের হাতে। কিন্তু গ্রাম্য সমাজ-জীবনের ধারা আর ঠিক আগের মত না বহিলেও খুব বেশি অদলবদল হয় নাই। মুসলমানী রাজশক্তি ভারতবর্ষে নূতন কোন অর্থনৈতিক সংগঠনের চেষ্টা করেন নাই, ফলে পুরাতনটিই ঈষৎ টাল খাইবার পর কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে রহিয়া গেল। গ্রামদেশে যে সকল শিল্পী বা দরিদ্র অবহেলিত জাতি ইসলামধর্ম আশ্রয়ের ফলে সামাজিক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, তাহারাও পূর্বে গ্রাম্য-জীবনের বৃত্তিমূলক সংগঠন ভাঙ্গে নাই,—এ বিষয়ে মোটামুটি পূর্বপ্রথা মানিয়া চলিত। মুসলমান নিকারি অল্প দিন পূর্বেও মাছ ধরিত না, শুধু কেনা-বেচার কাজ করিত। মুসলমান কলু বা জোলার পক্ষে সৈয়দের ঘরের মেয়ে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান পটুয়া বা চিত্রকর আগের মত আজও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মনসার ভাসান গাহিয়া পয়সা রোজগার করে। যশোহরের মধ্যে যাহারা পূজা-পার্বণে বাজনা বাজাইয়া থাকে, তাহাদের নামধাম, চালচলন সবই গরীব হিন্দুর মত, কেবল নৈমিত্তিক কর্মের সময়ে মৌলবী আসিয়া মুসলমানী নীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করাইতে সাহায্য করেন। ময়মনসিংহের বাজনদার মুসলমান নাগরচি জাতির যে স্থান, পশ্চিম বাংলার হিন্দু ঢুলির স্থান তাহা হইতে ভিন্ন নয়। ইসলামধর্মী জাতিবৃন্দের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য অবশ্য মৌলবীগণ পূর্বাপেক্ষা তৎপর হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমান জাতিবৃন্দ বাংলাদেশে এখনও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করিতে, এমন কি কখনও কখনও একসঙ্গে খাইতে বসিতেও ইতস্তত করেন।

এমনই ভাবে বিহারের হিন্দু এবং মুসলমান জাতিবৃন্দ, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জাতিবৃন্দ প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আর্থিক সংগঠনের মধ্যে লালিতপালিত হইয়া দিন যাপন করিতেছিল। এমন কি বিহারের আদিবাসী কোল উরাও' প্রভৃতি জাতিও এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিত। রাঁচী জেলায় কোল গ্রামে তেলের প্রয়োজন হইলে লোকে কলুদের মত ঘানি বসায় বটে, কিন্তু জাত হারাইবার ভয়ে বলদ না জুতিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘানি ঠেলে। তাহারা চাষবাস করিয়া দিনযাপন করে, জাতে উঠিবার জন্য গোমাংস ভক্ষণ বা মদ্যপান ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে। মাঝে মাঝে হিন্দু পরবে যোগদান করিয়া সাময়িক ভাবে উপবীত ধারণ করে এবং শুদ্ধাচারে থাকে। প্রতি প্রদেশে বৃত্তিগত ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এখনও সে ব্যবস্থা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় অনেকখানি বজায় রহিয়াছে। কেহ অপর জাতির বৃত্তি পারতপক্ষে গ্রহণ করিতে চায় না। এক সময়ে এ ব্যবস্থার দ্বারা সুফল ফলিয়াছিল, আজ অবস্থার দুর্বিপাকে কুফল ফলিতেছে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহারা সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করিত, তাহারা হিন্দু সমাজে কোন না কোন বর্ণের মধ্যে স্থান পাইয়া যাইত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ কর্মের মধ্যে প্রকট গুণকে বিচার করিয়া কাহার কোন্ বর্ণে স্থান হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিতেন; কর্মসংশিলষ্ট গুণের বিচার করিয়া কোন্ জাতি কোন্ কোন্ বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে অনুমান করিতেন। বিভিন্ন স্মৃতিকারগণের মতের মধ্যে এই জন্য কিছু তারতম্যও দেখা যাইত। মহাভারতে শান্তিপর্বে (৬৫ অধ্যায়) চীন, দরদ, অন্ধ, মদ্র পহ্লব প্রভৃতি দস্যু জাতির পক্ষে বর্ণাশ্রমে লিঙ্গান্তর গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিবার কথা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে —কোচ, ম্লেচ্ছ, সরাক প্রভৃতি জাতিকেও বর্ণ-সঙ্কর হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে; অথচ তাহারা পূর্বে যে হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে ছিল, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। জৈন অথবা বৌদ্ধদের মত যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেন না, তাঁহারাও 'হিন্দু' অথবা ভারতবাসীর মধ্যেই গণ্য হইতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মীরা হয়ত তাঁহাদের পাষণ্ড আখ্যা দিতেন। পরবর্তীকালে ইসলাম-ধর্মী আরব, পাঠান, তুর্কীর মত জাতি অথবা পার্শী, মালাবার প্রদেশের মোপলা (আরব) বা সিরিয়ান খৃষ্টানগণ ভিন্ন ধর্ম ও ক্ষেত্র-বিশেষে ভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও ভারতের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিল।

ইংরেজী আমল

এমনই ভাবে দিন চলিতেছিল। এমন সময়ে সওদাগরের বেশে ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সংগঠন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের গুণে ক্রমে শাসকের স্থান অধিকার করিলেন। রাজ-শক্তির সহায়তায় অতঃপর তাঁহারা ভারতে কাঁচামাল উৎপাদনের বৃদ্ধির আয়োজনের সঙ্গে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ভারতবর্ষের তাঁত শিল্প চামড়ার কাজ পিতল কাঁসার বাসনের ব্যবসায় দিনের পর দিন ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইল। 'রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনাকালে ইহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন।

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে চাকরিজীবী জাতিগুলির বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তবে উত্তর ভারতের মধ্যে প্রথমে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে বাঙালী চাকরিজীবী আইন-ব্যবসায়ী এবং শিক্ষক অথবা চিকিৎসক সম্প্রদায় নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। দক্ষিণ দেশেও তেমনই তামিল ভাষী জাতিবৃন্দ সরকারী চাকরিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। দেশী শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী মালের আমদানি ও বিক্রয় এবং দেশী কাঁচা মাল সংগ্রহ ও রপ্তানির দুইটি বড় কারবার দেশে দেখা দেয়। বাঙালী এবং তামিলনাদের লোক যেমন চাকরি উপলক্ষে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, উপরোক্ত দুইটি ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত তেমনই মারওয়াড়ী ভাটিয়া দিল্লীওয়ালা অথবা বোরা শ্রেণীর মুসলমানগণও ভারতের সর্বত্র, অবশ্য প্রধানত নূতন স্থাপিত শহর-গুলিকে আশ্রয় করিয়া, ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পূর্বে হিন্দু অথবা মুসলমানী আমলে বাংলার সেকরা বোম্বাই প্রদেশে কোঙ্কন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কারিগর দিল্লীতে দোকান খুলিয়াছিল, মাড়ওয়ারনিবাসী বণিক বা মহাজনের পক্ষে বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস করায় কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, বাংলার পণ্ডিতের পক্ষে অথবা কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের পক্ষে উড়িষ্যার রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বসবাস করার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু তখন দেশ দেশান্তরে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। ফলে যাঁহারা বাংলার মত দূরদেশে বহু কষ্টে আসিয়া পৌঁছিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি হইত না এবং কিছুকাল পরে আচারে-ব্যবহারে এবং ভাষায় তাঁহারা বাঙালীর অনেক-খানি গ্রহণ করিতেন। হয়ত ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে রাঢ়ী দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি পরস্পর হইতে বিশিলষ্ট সমাজ কালক্রমে এইরূপে গড়িয়া ওঠে। কিন্তু আজ রেলগাড়ির দৌলতে যাঁহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চাকরি অথবা ব্যবসায়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদের পক্ষে পূর্বের মত স্ব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশাচার হারাইবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা ছেলেমেয়ের বিবাহ অনায়াসে পুরানো দেশে পুরানো সমাজেই দিতে পারেন। ফলে স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে ভাষার এবং আচার-ব্যবহারে আগন্তুকগণের প্রভেদ স্থায়ী হইয়া থাকে।

সমাজের এই যেমন এক দিক, তেমনই আরও একটি দিক লক্ষ্য করিবার আছে। শিল্পী জাতিবৃন্দের মধ্যে যাহারা বিদেশী পণ্য প্রসারের ফলে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাদের অনেকেই দারিদ্র্যের তাড়নায়

শ্রমজীবী চাষীর পদে নামিয়া আসিল। বাজারে জনমজুর বা মুনিষমান্দেরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মজুরীর হারও কমিতে শুরু করিল! ভাল চাষীকে ভাগ বেশি দিতে হয়, জমির মালিক অধিক লাভের আশায় মন্দ চাষীকে জমি বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, জলসেচের জন্য স্বীয় কর্তব্যে অবহেলা দেখাইতে লাগিলেন; ফলে দেশে চাষেরও অবনতি ঘটিতে লাগিল।

শিল্পীকুলের মধ্যে কেহ কেহ গরীব চাষীমজুরে পরিণত হইল, কেহবা কোন উপায়ে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য চাকরির রাস্তা ধরিল। পূর্বে বলিয়াছি, চাকরিজীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থের অসুবিধা হয় নাই। তাঁহারা নবাবী আমলে যেমন নায়েব গোমস্তার কাজ করিতেন, এখনও তেমনই সরকারী অথবা বিদেশী মার্চেণ্ট আপিসে মুৎসুদ্দি অথবা ছোট-বড় কেরাণীর কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। মারওয়াড়ী অথবা বিলাতী বণিকের প্রতিযোগিতার ফলে কোণ্-ঠাসা হইয়া সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতির অনেকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মত চাকরি ওকালতি ডাক্তারীর বাজারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সর্বত্র লোকে দলে দলে পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া যে যেদিকে একটু আশার আলো দেখিতে পাইল, সেই দিকে ছুটিয়া নূতন নূতন বৃত্তি আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজি শাসনের আওতায় এইরূপে দেশে যে আর্থিক বিপ্লব সংসাধিত হইল, তাহার ফলে পুরাণ ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনের সৌধ প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশের মধ্যে কেহ গরীব হইয়াছে, কেহ ধনী হইয়াছে। যাঁহারা আর্থিক ইতিহাসের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মতে ইংরেজি শাসনের ফলে শুধু যে লোকে পৈত্রিক বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষে জনসমূহ সর্বসাকুল্যে আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক গরীব হইয়াছে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির প্রভাবে আগে যত লোক মরিত, অথবা যতটুকু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ থাকিত, আজ তাহা অপেক্ষা সবই যেন বেশি বেশি হয়, বহুদূর পর্যন্ত মৃত্যু ও দারিদ্র্যজনিত রোগের করাল ছায়া ছড়াইয়া পড়ে। উপরন্তু ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্যের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থাৎ বড়লোক এবং গরীবলোকের মধ্যে আয়ের তারতম্য আগে যত ছিল, আজ তদপেক্ষা বেশি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঁচিবার চেষ্টা

রোগীর দেহ যখন বিষে জরজর হয়, তখন ভিতরের রোগ বাহিরে নানা আকারে প্রকাশ পায়। পা ফুলিয়া ওঠে, গায়ে জ্বর হয়, কোন অঙ্গে ক্ষত দেখা দেয়, কখনও বা অন্ত্রের ব্যাধি জন্মায়। অধম বৈদ্য পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে এগুলির নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন; পায়ে পুলটিস দেন, জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পাচনের ব্যবস্থা করেন, ঘায়ে মলমের প্রলেপ দেন; কিন্তু রোগ তাহাতে সারে না; আবার নূতন নূতন উপসর্গ দেখা দেয়। উত্তম বৈদ্য জ্বরের বা ক্ষতের যন্ত্রণা উপশমের সামান্য চেষ্টা করিয়া মূল ব্যাধির চিকিৎসায় তৎপর হ'ন, কেননা মূল রোগ দূর হইলে উপসর্গগুলিও অল্পে অল্পে সমূলে দূর হয়।

আমাদের দেশের অবস্থা জীর্ণ অনাদৃত রোগীর মত। চিকিৎসকের সংখ্যার কিন্তু অন্ত নাই। ভারতমাতার সুহৃদ্গণেরও সীমা নাই; তিনি অধম বৈদ্যই হউক অথবা উত্তম বৈদ্যই হউক, সকলের চিকিৎসা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। এখন, মূল রোগের বৃদ্ধির সহিত আমাদের দারিদ্র্য রোগের চিকিৎসা কোন্ কোন্ উপায়ে চলিয়াছে এবং লোকে দুঃখের তাড়নায় কেমনভাবেই বা বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা দেখা যা'ক।

ইংরেজ জাতি দেশের শাসক। তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা এবং তাহার ফলাফলের আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কিছুদিন চেষ্টা এবং শক্তি প্রয়োগের ফলে রাজশক্তি যখন বেশ স্থায়ী হইয়া বসিল, তখন ইংরেজ লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য এক নূতন দিকে মন দিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ভিন্ন কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য জয় অথবা লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ জাতির হাতে তখন অনেক টাকা জমিয়াছিল। ঐ টাকা তো বেকার ফেলিয়া রাখা যায় না। আবার বিলাতে কলকারখানা খুলিলে মজুরীর হার বেশী হওয়ার ফলে মুনাফার অঙ্কে ঘাটতি পড়িবে; অথচ ভারতের মত দরিদ্র দেশে লাভের অঙ্ক তদপেক্ষা অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই ইংরেজ রেলগাড়ি, চটকল, নীল এবং চিনির কারখানা, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স প্রভৃতি নূতন নূতন কারবারে সঞ্চিত ধন খাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজের কাছে জাতের বালাই নাই। গরিব ভারতীয় প্রজা দলে দল নূতন কাজে ভিড় করিতে লাগিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ টাকা নির্বিঘ্নে থাকিবে এই ভরসায় বিলাতী কোম্পানীতে সঞ্চয়ের কড়ি গচ্ছিত রাখিতে লাগিল। ফলে ইংরেজ ধনীর লাভের অঙ্ক দিনের পর দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই লাভের অঙ্ক দেখিয়া দেশী লোকের মধ্যে যাহারই কিছু পয়সা আছে, সে বিদেশীর অনুকরণে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক বা ইনসিও-রেন্সের কারবার খুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাতে ইংরেজ বণিকের বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তাঁহারা বিলাতে ও ভারতবর্ষে গভর্নমেণ্টের উপর নানাবিধ চাপ দিয়া বড় শিল্পবাণিজ্যের বা মহাজনী কারবারে ভারতীয়দের অগ্রগতির পথে নানাবিধ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। কেবল সদর রাস্তার মত খোলা রহিল মজুরীর কাজ, কেরাণীর চাকরী, কাঁচা মাল খরিদ ও বিক্রয় এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের ব্যবসায়। মজুরীর কাজে শরীর খাটাইতে হয়; হাতের কাজে নৈপুণ্যের প্রয়োজন; ব্যবসাবাণিজ্যে শিক্ষাবুদ্ধি এবং পরিশ্রমের দরকার। তাই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে চাকরীর বাজারেই বেশী ভীড় করিতে লাগিল।

সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার সংকল্প

সরকার তখন ভাবিলেন, চাকরির বাজারে বড় কোলাহল শোনা যাইতেছে. ইহার একটা বিহিত করিতে হয়। আমার ঘরের পাশেই একটি বস্তি আছে। বস্তিতে বহু পরিবারের বাস, কিন্তু জলের কল মাত্র একটি। অথচ জল সকলেরই লাগে, কেহবা কলতলায় বসিয়া স্নান করিতে চায়। ফলে রোজ সকাল বেলা কলতলায় ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া থাকে। কেহ বলে, আমি আগে আসিয়াছি. আমার জল আগে চাই। কেহবা বলে, আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পার তো জল আগে লও। ফলে রোজই কলতলায় নানা যুক্তির মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াই থাকে। যাহার গলার জোর বেশি বা লজ্জা ঘৃণার বালাই নাই, সেই জেতে। চাকরির বাজারেও তাই। কেহ পুরুষানুক্রমে চাকরি করিতেছে, কেহবা সবে দুই পুরুষ হইল তাঁতের কাজ বা মুদির দোকান ছাড়িয়া এই পথে নামিয়াছে। ফলে পদপ্রার্থীদের মধ্যে কলহবিবাদ, ঈর্ষাবিদ্বেষ বাড়িতেই থাকে।

বিহারে বিহারী দেখে ভাল চাকরিগুলি ইতিমধ্যে অধিকাংশ বাঙালীর দখলে গিয়াছে তাহাদের রাগ হয়, বাঙালী আমাদের দেশে থাকে অথচ চালচলন সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, আমাদিগকে ঘৃণা করে অতএব সুযোগ পাইলে ইহাদিগকে তাড়াইতে হইবে। বাংলায় মুসলমান দেখে, ইতিমধ্যে সব ভাল কাজে উচ্চবর্ণ হিন্দু জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহাদের তাড়ানো প্রয়োজন। তপশীলভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ ও অপমানের বোধ তীব্রতর হইয়া ওঠে, তাহারাও সুযোগ খোঁজে। ইংরেজ সরকার দেখেন জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ-বিদ্বেষ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে তাঁহারা ভাবেন, ইহা ভারতবর্ষে চিরাচরিত অনৈক্যের আধুনিকতম বিকাশ অবশ্য এ কথা সত্য যে, পুরাণো দিনে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী এক রাষ্ট্রীয় শাসনের দ্বারা পুষ্ট একটি 'নেশন

পরিণত হয় নাই এবং ইহাও সত্য যে, বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টায় যখন ইংরেজ ভারতের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, তখন পরাধীনতার পঙ্কতিলক ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীর কপালে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক জাতিত্বের বোধও ভারতের সর্বত্র দেখা দেয়। কিন্তু ইংরেজ ভুলিয়া যান যে, যখন তাঁতী তাঁতের কাজ করিয়া সচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত; কামার কুমোর ধোপা নাপিত গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক জাতীয় ব্যবসায় হারায় নাই, যখন জনমত প্রতি জাতির বৃত্তি রক্ষা করিয়া চলিত, যখন স্বদেশে অর্থাৎ তীর্থসূত্রে আবদ্ধ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার অক্ষত অবস্থায় ছিল, তখন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সখ্যের বন্ধনে লোকে জীবনযাপন করিত। তখন হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্ম পৃথক হইলেও প্রতি ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির বৃত্তি স্থির ছিল বলিয়া ঈর্ষাদ্বেষের অবকাশ ছিল না। আজ ধনতন্ত্রের প্রভাবে ভারতের জীবনযাত্রা চাকরি মজুরি এবং ছোটখাটো কারবারের সংকীর্ণ গলি পথে ধাবিত হইতেছে বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে আশ্চর্য কি?

ভারতবর্ষের আয়তন রুশ বাদে অবশিষ্ট ইউরোপ খণ্ডের সমান। এখানে জগতের সমগ্র জনসমূহের পঞ্চমাংশ বাস করে; সর্বসমেত বাংলা, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু লইয়া বহু ভাষা প্রচলন আছে। তৎসত্ত্বেও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে সৌহার্দ্য আছে, ফরাসী বা জার্মান, ইতালী বা গ্রীস, ইংরেজ বা রুশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতির পরস্পর সম্পর্কের সহিত তুলনা করিলে আজই কি অথবা প্রাচীনকালেই কি, ভারতবর্ষকে তো স্বর্গরাজ্যের সমান বলিতে হয়। হিন্দু-মুসলমান, বর্ণহিন্দু বা তফশীলভুক্ত হিন্দুর সংঘর্ষ ইউরোপের তুলনায় কিছুই নয়।

তথাপি প্রজার মধ্যে চাকরি বা ব্যবসায়-সূত্রে প্রতিযোগিতা ও মনোমালিন্যের উদয় হইয়াছে দেখিয়া, রাজধর্মের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া ইংরেজ শান্তি স্থাপনায় মন দিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন, প্রতি প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসিগণকে চাকরির বাজারে সমধিক আদর দেখানো হইবে। বিহারে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ১৯৩৮ সালে অবস্থার চাপে এই ব্যবস্থার অন্যথা করিবার সাহস পান নাই। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। বাংলায় মুসলিম লীগের অধীন মন্ত্রিত্ব অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহাতে রাগ করিবার অথবা হতাশ হইবার কিছু নাই। কলতলায় যখন লোকের অত্যধিক ভিড় হয়, তখন কলের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়াই সকলের চেয়ে ভাল উপায়। ইংরেজের প্রসাদে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কতটুকুই বা ক্ষমতা ছিল? দেশের দারিদ্র্যের মূলে যেখানে সেখানে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এমন অবস্থায় শুধু বাহিরের ঘায়ে মলম লাগাইবার ক্ষমতাটুকু ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ তাহাদের শক্তিকে ব্যঙ্গ করা মাত্র।

উপায় কি?

রোগের আসল প্রতিকার হয়, দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে। আমাদের সমাজদেহে বহুবিধ দোষ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার ভিতর দিয়া যদি সেই সকল দোষের প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি, তবে স্বাধীনতা আসিবেই আসিবে। সে স্বাধীনতার অর্থ, সর্বসাধারণ মানুষের স্বাধীনতা। তাহাদের কল্যাণেই সকলের কল্যাণ। স্বীয় কল্যাণ সাধনের শক্তি যেন সকলে আয়ত্ত করে এবং বাহুবলের পরিবর্তে সংকল্পের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা যেন সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও সমর্থ হয়। আর যেন সকলেই সমান হয়, ধনবৈষম্য যেন সমাজ হইতে রোগের মত দূরীভূত হয়। সমাজের মধ্যে বংশ বা অর্থগত মর্যাদার ভেদ যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়, গুণেরই যেন যথার্থ সমাদর হয়। তবেই বলিব স্বাধীনতা সত্য সত্যই আসিল।

কেমন করিয়া সে ক্ষমতা আসিবে তাহা আজ আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। কিন্তু যদি সেই ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তে আসে, তাহা হইলেই কি এতদিনের আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য, ধনতন্ত্রের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জন্মিয়াছে, তাহার সবই ভানুমতীর ভেল্কির মত মন্ত্রবলে উড়িয়া যাইবে, অথবা তাহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসারও কোনও আয়োজন করিতে হইবে? আমার মনে হয়, সাম্য স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। তবে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও যে সে বিষয়ে কিছুই করা যায় না তাহাও নহে। বাংলাদেশ অথবা বিহারে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার ফলে বাঙালী বিহারী অথবা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, প্রজার পক্ষ হইতে সে বিষয়ে কি করণীয় তাহা বিবেচনা না করিয়া, রাজসরকারের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে কি করা যায়, তাহার আভাস দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অভিপ্রায় থাকিলে, এরূপ উপায়ের দ্বারা পুরাতন অন্যায়-অবহেলার অনেক প্রতিবিধান করা যায় এবং বর্তমান সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে অনেকাংশে প্রশমিত করা যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রথমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী ও তাহার ছায়ায় পুষ্ট স্বদেশী ধনতন্ত্রের প্রভাবে সমাজের সকল শ্রেণী ও জাতি সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। চাকরিজীবী আজও চাকরি করিতেছে; তবে আগে তাহারা যেমন সহজে ভূসম্পত্তির মালিক হইত, আজ তাহার পরিবর্তে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া বা কলকারখানার শেয়ার খরিদ করিয়া উত্তরপুরুষের জন্য আর্থিক সচ্ছলতার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু মুচি কামার কাঁসারি অথবা তাঁতীর কাজ অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরানো হিন্দু আমলে যাহারা কারিগর শ্রেণীর মত সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে ছিল, তাহাদের অবস্থা হইয়াছে খুব সঙিন। কেহ চাষীমজুর হইয়াছে, কেহ চটকলের কুলি হইয়াছে, কেহবা লেখাপড়া শিখিয়া ছোটখাট চাকরির চেষ্টা করিতেছে। সেখানে আবার প্রদেশবিশেষে কোথাও বাঙালী কোথাও তামিলের ভিড়, কোথাও ব্রাহ্মণ কায়স্থের অধিকার একচেটিয়া হইয়া আছে। চাষী শ্রেণীর অন্তর্গত জাতিপুঞ্জের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হাড়ি ডোম বাগদি বাউরি কেওরা মালি মুচিদের দারিদ্র্যের আর সীমা নাই। আদিবাসী কোল সাঁওতালদের দশাও তদনুরূপ হইতে বসিয়াছে।

অতএব আজ যদি বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে প্রতি জাতির সংখ্যা গণনা করিয়া প্রত্যেককে সংখ্যার অনুপাতে চাকরির বাজারে আসন দেওয়া হইবে, তবে বিচার সুবিচার না হইয়া হবুচন্দ্র রাজার বিচারের মতই হইবে। বিহারের গভর্নমেণ্ট যদি এই উদ্দেশ্যে বাঙালীর চাকরি পাওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হ'ন, বাংলার গবর্ণমেণ্ট যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, অথবা বাঙলাদেশে যত মারোয়াড়ী বা দিল্লীওয়ালা ব্যবসায় করিয়া থাকে, যত হিন্দুস্থানী কুলি মজুর মিস্ত্রী বা সাঁওতাল পরগণা অথবা পূর্ণিয়া জেলা হইতে আগত ধান কাটার কুলি আসে, তাহাদের সকলকে নূতন আইন প্রবর্তনের দ্বারা খেদাইয়া দেন, তাহা হইলেই যে ন্যায়ের দাবি ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে ইহা কেমন করিয়া বলিব?

যাহারা অনাদৃত ও অবহেলিত, অথবা জীবনসংগ্রামে নানা কারণে পারিয়া উঠিতেছে না, তাহাদিগকে বিশেষ আদর সহকারে জীবন যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা বা অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়ায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু সে চিকিৎসাপদ্ধতির আনুষঙ্গিক দোষও

একটি আছেঃ উহার ফলে প্রাদেশিকতার বৃদ্ধি, অথবা সম্প্রদায়গত ভাষাগত ধর্মগত দলীয় ভাব আশু লাভের সম্ভাবনায় পুষ্টি-লাভ করিতে পারে। যে বিভেদ পূর্বে অল্প ছিল তাহা চাকরি বা ব্যবসায়ে সুবিধা পাইবার আশায় উৎসাহ পাইয়া বিরাট হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ধানচাষের সময়ে মাঠে আল বাঁধিতে হয়। কিন্তু আলে সুবিধা হইতেছে বিবেচনা করিয়া কোন নির্বোধ যদি তাহাকে পাঁচিলের মত ব্যবধানে পরিণত করে তবেতো শেষ পর্যন্ত চাষই বন্ধ হইয়া যায়।

তবে উপায় কি? আমার মনে একটি সদুপায়ের চিন্তা আসিয়াছে। পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে স্বীয় এলাকার মধ্যে কোন জাতির কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেন না ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সকল জাতির উপরে আঘাত ও পরিবর্তনের মাত্রা সমান হয় নাই। বাঙলায় মুসলমানের যে অবস্থা, পাঞ্জাবে তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ, দুইশত বৎসর ধনতন্ত্রের ঝড়ে কাহার ঘর কতখানি ভাঙ্গিয়াছে, কে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। ইহার পর প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের উচিত, কি কি চাকরি তাঁহারা দিতে পারেন অথবা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা অনুসন্ধান করা। গুরু দায়িত্বপূর্ণ চাকরি—তাঁহাদিগকে জাতি ধর্ম ও প্রদেশ-নির্বিশেষে দিতে হইবে। বাঙলা দেশে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাষ্ট্র বা কেরল হইতে লোক আনিতে হইবে। নদীর সুব্যবস্থার জন্য উইলকক্সের মত ইঞ্জিনিয়ার পৃথিবীর যে-কোন দেশ হইতে আনিতে হইবে। কিন্তু নীচের স্তরে, যেখানে মোটামুটি কর্ম-কুশলতা থাকিলেই চলিয়া যায়, সেখানে কিছু-দিনের জন্য সমাজের অনাদৃত বা ধনতন্ত্রের দ্বারা নিষ্পেষিত মুমূর্ষু জাতিগুলিকে সমাদরের সহিত প্রথম আসন দিতে হইবে; কারণ তাহারা ব্যক্তিগত গুণের অভাবে এ অবস্থায় পৌঁছায় নাই, সমাজ-ব্যবস্থার দোষেই অবনত হইয়াছে। উপরন্তু ইহারা যাহাতে চাকরির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে যত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে উপরোক্ত জাতিবৃন্দের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই অবস্থা আগামী বার বৎসর চলিলেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষা-বিভাগের গণনায় এক পুরুষ বা বার বৎসর ধরিয়া অনাদৃতদের উন্নতি বিধানের একান্ত চেষ্টা করিলে দেশের বৃদ্ধিমান জনসাধারণ ন্যায়ের দৃষ্টিতে আপত্তি হয়ত করিবেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া কি বিহারে বাঙালী বাসিন্দা অথবা বাংলায় ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বিরুদ্ধে অনাদর বা প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে? তাহাদিগকে অবহেলা বা অনাদরে ভাসিয়া বেড়াইতে দিলেই কি উচিত কার্য হইবে? আমার মনে হয়, আপিসের চাকরি ডাক্তারী ওকালতী বা শিক্ষকতার কাজ তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইলে নূতন নূতন বৃত্তির পথে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। ধরুন, খাদির কাজ, উন্নত গ্রাম্যশিল্প শিক্ষা এবং তাহা প্রচারের চেষ্টা, বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কংগ্রেসের আঠার দফা গঠন কর্মের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি গ্রহণ করিতে পারেন। যাহাদের পক্ষে আপিসে চাকরি করিবার পথ আপাতত সংকুচিত হইবে, তাহারা স্বচ্ছন্দে এই পথে অগ্রসর হইয়া সরকারী চাকুরিয়া হইয়া জীবন-যাপন করিতে পারে। গভর্নমেণ্টের পক্ষে ইহাতে খরচও কম; উপরন্তু গ্রামদেশের উন্নতির পথও এতদ্দ্বারা পাকা হইবে। আবার যদি কেহ স্বাধীনভাবে কৃষি বা ব্যবসায়ের পথ লয় তবে গভর্নমেণ্ট কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার মারফৎ তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, জমিবিলির আয়োজন এবং ঋণ দান করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। বাংলাদেশ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, উড়িষ্যাও সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গভর্নমেণ্টকে ম্যালেরিয়া দূর এবং চাষের উন্নতি বিধানের জন্য নদীর সংস্কার, নৌকা চলাচলের বৃদ্ধি, জল নিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ নূতন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতেও চাকরির নূতন নূতন পথ খুলিতে পারে। উপরোক্ত ব্যবস্থাও যদি বার বৎসর ধরিয়া চালানো যায়, তবে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দোষ হয় না। উপরন্তু এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা খরচ অত্যধিক হইবার কথা নয়।

কিন্তু ভয় হয় পাছে আগামী বার বৎসর চাকরিতে সুযোগ লাভের আশায় উচ্চ বর্ণের কোন জাতি নিজেদের তপশীলভুক্ত করাইবার চেষ্টা না করে, দারিদ্র্যের চাপে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আবার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি প্রজার উপকার সাধন করিতে গিয়া এমন আইনের বেড়া সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা হয়ত স্বাধীনতাপুষ্ট ইংলণ্ড বা ফ্রান্সেও আগন্তুক ব্যক্তি অথবা তাহাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে লওয়া হয় না। যাহাতে ভেদবুদ্ধি পাকা না হয়, বর্তমান অধম চিকিৎসার ফলে যাহাতে বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ ও তপশীলীভুক্ত জাতিবৃন্দের মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ভাব স্থায়িত্ব লাভ না করে, সমাজ-দেহ আরও দুর্বল হইয়া না যায়, তাহার জন্য গভর্নমেণ্টকে দৃঢ়ভাবে একটি নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, 'আমরা আগামী বার বৎসর মাত্র বর্তমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। এই সুযোগে যে যেমন ভাবে পার শিক্ষা এবং চাকরির সুব্যবস্থা করিয়া লও। যে বৈষম্যের কাঁটা সমাজের দেহে ফুটিয়াছিল, তাহাকে এতদিন দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, আমরা তাহার বিপরীত নীতির কাঁটার দ্বারা সেই কাঁটাকে তুলিতেছি। বার বৎসর পরে দুই কাঁটাই ফেলিয়া দিবার সময় আসিবে। তখন হইতে আমরা সকল প্রজাকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমান ভাবে আমাদের সাধ্যমত উৎসাহ দিব।'

এরূপ ব্যবস্থার ফলে মনে হয় পুরাতন ক্ষতও সারিবে অথচ চিকিৎসার ফলে সমাজ-দেহে নূতন উপদ্রবেরও সৃষ্টি হইবে না। যদিও বা সাময়িক ভাবে দেখা দেয়, তাহাও স্থায়ী হইতে পারিবে না। গভর্নমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকলে সাবধান হইবে, জাতের দোহাই দিয়া সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধানের চেয়ে স্বীয় গুণের জোরেই তাহা অধিকার করিবার জন্য সকলে সচেষ্ট হইবে।

পাঠক এই ব্যবস্থার দোষগুণ সহানুভূতির সহিত ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন আশা করি। *

***প্রবন্ধটি দমদমে থাকার সময়ে পরিশিষ্টে উল্লিখিত পুস্তিকাখানি পড়ার পর লিখিয়া ছিলাম। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজও সমান গুরুতর রহিয়াছে। তাই পাঠকগণের নিকট চিন্তার কিছু খোরাক যোগাইবার আশায় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইলাম।**

পরিশিষ্ট

Bengali-Bihari Question, issued by the All-India Congress Committee, being report of Babu Rajendra Prasad together with the Resolution of the Working Committee (Jan. 11-14 1939).

"It is not as if the Congress Ministry in Bihar has introduced certain new rules which have created a departure from past practice. The question (of giving provincials "a fair share of the new posts") has been examined time after time and the Government has tried to achieve the object of remedying the deficiency in numbers of the people of the province in the services by devising and enforcing rules of domicile. The present Government it is said has done nothing more than enforcing the rule which have long been in existence. (p. 6-7).

"It is not possible to ignore the fact that the demand for creation of separate provinces based largely on desire to secure larger share in public services and other facilities offered by a popular national administration is becoming more and more insistent and hitherto backward communities and groups are coming up in education and demanding their fair share in them. It is neither possible nor wise to ignore these demands and it must be recognised that in regard to services and like matters the people of a province have a certain claim which cannot be overlooked." (p.21).

বিংশ শতাব্দীর ছে-চল্লিশ সাল থেকে আমি বহু হাজার বছর আগেকার পুরাণকারদের অভিনন্দন পাঠাচ্ছি। সত্যি—কি অমানুষিক প্রতিভা! ভাবতে গেলে মাথা আপনি নত হয়ে যায়,—দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের আবিভাব হয়। একাধারে সবজ্ঞ ঋষি ও বিশ্ব কবির সমন্বয় দেখতে পাই পুরাণকারদের মাঝে।

ভীমা বিকটদশনা লোল জিহ্বা দিগ্‌বসনা কালীমূর্তি কোনদিন, কোন সাধকের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন কি না—তাতে কারো কারো মনে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বের ধ্বংসাত্মিকা শক্তিকে বিপুলান্ধকারময়ী মহাকালী মূর্তিতে কল্পনা করার মাঝে একাধারে কবি ও দার্শনিক মনের পরিচয় মেলে—সন্দেহ নাই। ধ্বংসেরই পাশে পাশে চলে বিশ্বের চিরন্তন সৃষ্টি লীলা, তাই কালীর এক হাতে খাঁড়া থাকলেও আর আর হাতে থাকে বর ও অভয়। মহাসমরের বৈঠকের পাশে পাশে চলে যেন যুদ্ধোত্তর নবগঠনের পরিকল্পনা।

বিশ্বের যে সৌন্দর্য চতুর্দিকে উরু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববাসীর মন ভুলাচ্ছে—পুরাণকারেরা তাকে গড়ে তুললেন অনন্ত-যৌবনা উর্বশী করে, আর তাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পায় পুরু অর্থাৎ অধিক রব অর্থাৎ শক্তি বা ক্ষমতা যার—সেই পুরুরবা।

সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা দেবদেবীর বাহন ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার পরিকল্পনায়। জ্ঞান বিদ্যা ও চৌষট্টি কলা নিষ্কলুষ শুভ্র, তাই তার অধিষ্ঠাত্রী 'যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা—যা বীণা বরদণ্ডমণ্ডিত ভূজা যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা'—'নিঃশেষ জাড্যাপহা'—দেবী সরস্বতীর বাহন মরাল বা শ্বেত হংস।

কলা বা বিদ্যার নিষ্কলুষতার পরিচয় দিতেই যে এই শুভ্রতার পরিকল্পনা এ কথা আরও দশজনের মত আমিও বিশ্বাস করে বহুদিন থেকেই পুরাণকারদের প্রতিভার তারিফ করে আসছি। শিল্পীদের হাবভাব গতিভঙ্গীর মাঝে মরালগতিরই ছন্দ আছে—তাও পর্যবেক্ষণ করেছি।

কিন্তু একটি কথা আমি এতদিন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নি,—পুরাণকারদের উপর অচলা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের স্থির প্রজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দেহ পর্যন্ত জেগেছে। বাণীর বাহন শ্বেত হংস এটি ঠিকই বলা হয়েছে, কার্তিকের বাহন ময়ূর, দুর্গার সিংহ, শিবের বাহন ষাঁড়—এর ভেতরেও সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছি,—বুঝতে পারি নি কেবল লক্ষ্মীর কথা ঃ জগতে এত সুন্দর পশু পক্ষী থাকতে পুরাণকারেরা ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জন্য শেষে ব্যবস্থা করলেন কি না একটা পেঁচা!

লক্ষ্মী পেঁচার বর্ণ কালো নয়—তা জানি, কিন্তু চেহারা তার সত্যি সত্যি ভালো কি? ধনের লোভ জেগে ওঠে নি যে শিশুদের মনে তারা একে হঠাৎ দেখলে চমকে উঠবে না কি?

কুৎসিত আমি একে বলব না, (কারণ সত্যি কথা বলতে কি আমার ভয় করেঃ দেবী রুষ্টা হতে পারেন,—তা ছাড়া সংসারে থাকতে গেলে রোষের ভয় করতে হয় বই কি?) কিন্তু পেঁচার চেহারা একটু অদ্ভুত, একটু ভয়ংকর নয় কি? মাথা ও ধড়ের মাঝে গ্রীবার বালাই নেই,—কোমল গোলগাল ফুলো ফুলো মুখ,—চোখ দুটি তার মাঝে একেবারে হারিয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেছে,—চঞ্চলতার রসিকতার সর্বশক্তি এমন কি সম্ভাবনা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে কেমন ভীষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বসার ভঙ্গী একটু তেড়চা, সেটা হল ওর চাল। শব্দ নেই, গান নেই, মাঝে মাঝে বিরক্তি বা আনন্দে বা কিসে-কে-জানে এক অদ্ভুত বিকট কর্কশ হুংকার বেরিয়ে আসে, হঠাৎ শুনলে বুকের অন্তস্তল পযন্ত কেঁপে ওঠে।

আশ্চর্য,—তবু, বাড়ির আশে পাশে কোনা কানাচে এমনি ধারা একটা পেঁচার
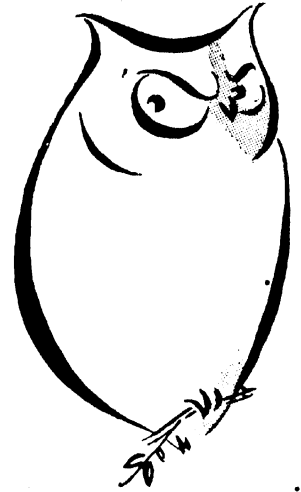
বসার ভঙ্গী একটু তেড়্চা......সেটা ওর চাল

আবির্ভাব হলে গৃহস্বামীর দেহে রোমাঞ্চ জাগে, সম্পূর্ণ বাইরে না হলেও অন্তরে। সে ভাবে গদগদ হয়ে জোড়পানি হয়ে দাঁড়ায়।

আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমি এদের অন্তরের রূপ অনুধাবন করেছি এবং তারই অনুধ্যানে আমি পুরাণকারদের পরিকল্পনার মর্মকথা উদ্ঘাটিত করেছি।

কথাটা একটু খোলসা করেই বলি—

কলিকাতা মহানগরীর এক বিখ্যাত বিপণিতে আমার এক নিকট আত্মীয় উচ্চ পদের কর্মচারী। অর্থের প্রাচুর্য যাদের শ্রমশক্তি হরণ করেছে,—বিভিন্ন পট্টী খুঁজে সুলভ মূল্যে বিভিন্ন জিনিস কিনবার প্রয়োজন ও

ক্ষমতা যাদের নেই,—তারাই প্রায় আসে এই ধরণের দোকানে। জনুতো থেকে সনুরু করে জড়োয়া নেকলেস টিকলি পর্যন্ত চাইলে যে ধরণের দোকান 'নাই' বলে না,—এ হচ্ছে সেই ধরণের দোকান।

আত্মীয়ের পাশে বসে গল্প করতে করতে নানা রকমের ক্রেতার মুখ দেখছিলাম। আর দেখছিলাম বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সঙ্গে কর্মচারীদের রকমারি ব্যবহার। হঠাৎ তিনটি

হঠাৎ তিনটি দেহীর আবির্ভাব......চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

দেহীর আবির্ভাব কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল,—পরম বিনয়ে গদগদ চিত্তে এগিয়ে এল অনেকে, মুখে আপ্যায়নের হাসি। আমার আত্মীয়টিও স্মিত হাস্যে নমস্কার করে এগিয়ে এলেন। অভ্যাগতের তরফ থেকে 'হুম্' করে কি রকম যেন একটা শব্দ হ'ল,—অথচ তার মুখের একটি রেখা বিচলিত হ'ল না,—হাসি ত দূরের কথা।

এ শব্দ আরও কোথায় যেন শুনেছি,—এই ধরণের মুখও কোথায় যেন দেখেছি। নবাগত তিনজনের একটি পুরুষ আর দুইটি মেয়ে। মেয়ে দুইটির একটি বয়স্কা,—বোধ হয় পুরুষটির স্ত্রী, অন্যটি কন্যা। মেদ বাহুল্যে মুখ গাল ফুলিয়ে নাক ডুবিয়ে শিরকে ক্ষুদ্র-দর্শন করে,—চক্ষুকে অদৃশ্য প্রায় করে তুলেছে। স্ফীত গর্দানের দুই পার্শ্বদেশ দিয়ে উপরের দিকে মনে মনে দুটো সরল রেখা টানলে শিরোদেশ প্রায় তার মধ্যে পড়ে যায়।

ঠিক এই মুখ কোথায় যেন দেখেছি,—কিন্তু কোথায়? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল ছাত্র জীবনের একদিনের কথা। রবিবারের সকালে একদিন সখ করে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। গড়ের মাঠের আশে পাশে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে এসপ্লানেডে ট্রাম ডিপোর পশ্চিমের বাগানটার একটা বেঞ্চে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ মস্ত বড় একখানা মোটর এসে থামলো। তা থেকে বেরিয়ে এল চৌদ্দ পনের বছরের একটি ছেলে। ঠিক এই ধরণের মুখ। সাথে তার পাঁচ ছয়জন বয়স্ক অনুচর, হাতে তাদের পাখা। দেখে বেশ কৌতূহল উদ্রিক্ত হচ্ছিল। ছেলেটির ধীরে ধীরে হাঁটা-টা কেমন অদ্ভুত ধরণের,—দেখে ঠিক মানুষের হাঁটা বলে মনে হয় না। বয়স্ক, অনুচরগুলির একজন আমার ঠিক সামনে দাঁড়ালে, আর একজন দাঁড়ালে হাত বিশেক দূরে। একটা লোক এসে ছেলেটার কোচাটা ঘুরিয়ে মালকোচা করে দিলে। তারপর ছেলেটা দৌড়ের কসরৎ করে হাত বিশেক দূরের লোকটার কাছে গিয়ে আবার সেখান থেকে হাঁস ফাঁস করতে করতে কোন রকমে এসে বসে পড়লো আমার সামনের সেই লোকটির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো চার পাঁচখানা তালের পাখা। একজন কর্মচারী গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়াশলাই এগিয়ে দিলে তার সামনে। ছেলেটির অদ্ভুত সেই মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঠিক এই ধরণের 'হুম'। বিরক্ত হয়ে হিন্দীতে আরও কি যেন বলেছিল তার কর্মচারীদের,—কিন্তু আমি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারিনি,—আমি শুনছিলাম যেন—হুম, হুম,—হুম—তা।

সেই ছেলেটির মুখের সঙ্গে নবাগত ক্রেতা ত্রয়ের মুখের যেন বিশেষ সাদৃশ্য আছে,—কিন্তু এই যেন সব নয়, 'আর কোথায় কি যেন আছে,—তন্ময় হয়ে স্মৃতির তলদেশ হাতড়াতে লাগলাম। ক্রেতাত্রয় আমারই সামনে কয়েকখানা জড়োয়া গহনা কিনে নিয়ে চলে গেল। আত্মীয় আমার চমক ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছ এত?...চেন এদের—যাঁরা এসেছিলেন?

না,—কি করে চিনব?

উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ধনী মিঃ ডি এ সেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর কন্যা। যুদ্ধের বাজারে প্রায় কোটি দুয়েক টাকা করেছেন ভদ্রলোক মিলিটারী কন্ট্রাক্ট নিয়ে প্রায় আশী লাখ আর ধান চালের ব্যবসায়ে কোটি টাকার উপর।

শুনেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতি মথিত করে এক চেনা মুখ আমার অন্তর্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হ'ল: ক্রেতাত্রয়ের মুখের আদলের সঙ্গে সে মুখ অবিকল মিলে গেল। আপনারা হয় ত অতিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন,—সে মুখ কার? উত্তরটা আপনারা জানেন; যুদ্ধের বাজারে সাধনা করে যে দেবীর কৃপা লাভ করেছেন ইনি, মুখে এসে যে আসন করেছে তাঁরই বাহন।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করবার সঙ্গে পুরাণকারদের প্রজ্ঞা স্মরণ করে দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো: সত্যিই কি নিপুণ পরিকল্পনা।

আমার উপলব্ধির সত্যতা যাচাই করবার জন্য পেঁচার বিবরণ নিয়েছি আমি এমন লোকের কাছ থেকে—যারা জীবনে বহু পেঁচা দেখেছেন। আমার উপলব্ধির সঙ্গে কোথাও এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি বিবরণের। দু' বিষয়ে কিন্তু তারা আমাকে সত্যিই নতুন যুগিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে পেঁচার সম্বন্ধে: পেঁচা না কি বেশীর ভাগ

—ছেলেটা দৌড়ের কসরৎ করে......

ধানের গোলার ভেতর। আর একটি হচ্ছে পেঁচার দিবান্ধতা: পেঁচা দিনের বেলায় দেখে না,—চলাফেরা তার রাত্রে,—মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর,—আর এই যুদ্ধের বাজার দেখে এ তথ্যে বোধ হয় আর কেউ অবিশ্বাস করতে চাইবেন না।

—কিন্তু আমি ভাবছি পুরাণকারদের কথা,—ওঁরা নিঃসন্দেহে ছিলেন সর্বজ্ঞ ভবিষ্যৎদর্শী ঋষি, নইলে হাজার হাজার বছর আগে থেকে তেরশ পঞ্চাশ সালের জীবিবিশেষের বাসা আর গতিবিধি সম্বন্ধে এমন নিখুঁত বাণী তাঁরা কি করে শোনাবেন?

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[১০]

রা তে শত চেষ্টাতেও কিছুতেই চোখে ঘুম এলো না—ভবিষ্যতে কি পরিণতি ...ব সেই চিন্তাতেই। মৃত্যুর জন্য ও নানা-...ম দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্য আমরা ...তুত ছিলাম, তার জন্য মোটেই ভয় পাই ... কিন্তু আজ এই অবস্থা পরিবর্তনে ভীত ...হলেও মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তা এসে ...খের ঘুম কেড়ে নিলো। সকালে হাতে ...ন কাজ ছিল না, কাজেই ঘটনা কত দূরে ... গড়িয়েছে, আর প্রকৃত খবর কি জানবার ...ন্য গাছগড় হাসপাতালে এসে হাজির হ'লাম। ...ল রাতে যে অফিসাররা দেখা করতে গিয়ে-...লেন, তাঁরা সকলেই ফিরে এসেছেন। ...ডিভিসন হেড কোয়ার্টারে শুনলাম তাঁদের ...ঙ্গে কোনোরূপ খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। ...না আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ ...মন চলছে তেমনি চলবে। সকালে কয়েক-...ন ব্রিটিশ অফিসার 'জিপ' গাড়ি নিয়ে হাস-...তালে এসে হাজির হয়েছে আমাদের ...য়েকজন অফিসারকে ডিভ হেড কোয়ার্টারে ...য়ে যাওয়ার জন্য। মল্লিকদা কয়েকটা ...সি পুষেছিলো এবার সেগুলি শেষ করতে ...বে। কাজেই আমিও দুপুরে সেখানে রয়ে ...লাম খাওয়ার জন্য। সারা দুপুর আমরা ...না রকম ভবিষ্যৎ চিন্তা করলাম! শুনলাম ...মানে ব্রিটিশ আমাদের সঙ্গে 'যুদ্ধবন্দী' ...সাবেই ব্যবহার করবে

সন্ধ্যার আগেই আমাদের গ্রামে ফিরে ...লাম। প্রথমে যতটা বিচলিত হয়ে পড়ে-...ছিলাম এখন কতকটা সে ভাব কাটিয়ে ...ঠলাম। পরদিন দুপুরে হুকুম হ'ল সন্ধ্যার ...ময় আমাদের মালপত্র নিয়ে আমরা যেন ...চিনির কলের কাছে হাজির হই। নিজে যে ...জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারা যায় শুধু তাই ...াকবে। তার বেশী কিছু নয়। কাজেই ...ওষুধের সব বাক্স গ্রামের সর্দারের জিম্মায় ...রেখে পিঠে পিঠে নিয়ে সন্ধ্যার পর চিনির ...কলের কাছে উপস্থিত হলাম। সেখানে ...শুনলাম রাতে আমাদের এখানেই থাকতে ...হবে। কলের কাছাকাছি, ছোট ছোট অনেক ...বাংলোয়, একটি রাজবাটীতে ও পাশের খালি ...গ্রামে আমাদের থাকার জায়গা দেওয়া হল। রাজ-...বাড়িটি বেশ বড়। সেখানে আমাদের হাস-...পাতালের রুগীদের রাখার ব্যবস্থা হল। ...রাতে একটি কুটীরে শুয়ে আরামে ঘুম দিলাম। এখন নূতন অবস্থার জন্য আমরা তৈরী হয়েছি—কাজেই মনের কোণে আর কোন চিন্তাকে স্থান দিলাম না। একবার মালয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। অবস্থা বিপর্যয়ে আজ আবার বন্দী হলাম—ব্রিটিশের হাতে।

প্রথমে এখানে একজন ব্রিটিশ মেজর আমাদের সব কিছু বন্দোবস্ত করছিলেন। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি এখনও আমাদের কাছেই ছিলো। তৃতীয় দিনে সেগুলি সব জমা হলেও কিছু সৈন্যের হাতে রাইফেল দিয়ে আমাদের ছোট একটি গার্ড পার্টি রইলো।

গ্রাম থেকে হাসপাতাল তুলে নিয়ে এসে রাজবাটীতে আমাদের হাসপাতাল খোলা হ'ল। হাসপাতালের কাজ আগের মতোই চলতে লাগলো। বাইরে আমাদের সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের তালিকা তৈরী হল। আমাদের পুরাতন পদবী, পুরাতন ইউনিট, নূতন ইউনিট, নূতন পদবী প্রভৃতি। সিভিলিয়ানদের আলাদা করে তাদের তালিকা দেওয়া হল। অন্যান্য সৈন্যদের থেকে হাসপাতালের ডাক্তার ও সিপাহীদের আলাদা করা হ'ল। আমরা সকলেই হাসপাতালে কাজ করতে লাগলাম। শুনলাম, আমাদের এখানে আরও কিছুদিন থাকতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের এখান থেকে সরানো হবে। প্রথমে যাবে অন্যান্য ইউনিট, সকলের শেষে যাবে রুগীরা ও হাসপাতাল।

এখানে আমাদের আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের অনেক জিনিসপত্র ছিলো, এমন কি নিজেদের প্রেস পর্যন্ত। অনেক জিনিসপত্র, কাগজ বোর্ড প্রভৃতি জমা ছিলো। ব্রিটিশের কয়েকজন অফিসার আমাদের জিনিসের তালিকা তৈরী করতে এসে কতকগুলি বাক্সের উপর H. E. Col. Chatterjee দেখে জিজ্ঞাসা করেন H. E. কথাটার অর্থ কি? আমরা বুঝিয়ে দিলাম, H. E. মানে হচ্ছে His Excellency. শুনে প্রথমে একটু আশ্চর্য হন, পরে সব পরিচয় দেওয়াতে বুঝতে পারলেন, ইনি হচ্ছেন আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী। এদের কথাবার্তায় বেশ মনে হল, এরা আমাদের গভর্নমেণ্টের বিষয় সব কিছু জানে! এরা বেশ মনোযোগ নিয়ে আমাদের দেওয়ালে টাঙ্গানো আজাদ হিন্দ ফৌজের ছবি দেখতে লাগলো।

ব্রিটিশের কোয়ার্টার মাস্টার—একবারে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের এখানে কতজন হিন্দু ও কত জন মুসলমান আছে। সেই হিসাবে তারা আমাদের 'ঝটকা' ও "হলাল" মাংস দেবে। আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার জানায়, তোমরা যা দেবে আমরা তাই খাবো! হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে না।

এখানে ব্রিটিশ আসার পরই আমাদের কয়েকজন অফিসারকে বিমানে করে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। কর্নেল আজিজ, কর্নেল দত্ত, কর্নেল জাহাংগীর, মেজর ঘোষ, মেজর খান ও মেজর পুরী এই প্রথম দলে ছিলেন। হাসপাতালের কর্নেল গোস্বামী আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। এখানে প্রথমে একজন ব্রিটিশ মেজর আমাদের দেখাশোনা করতেন। পরে তিনি বদলী হয়ে যাওয়াতে পাইওনিয়ার কোরের একজন লেঃ কর্নেল আমাদের ভার গ্রহণ করেন। আমরা ধরা পড়ার পর আমাদের সঙ্গে কেউ কোনো খারাপ ব্যবহার করে নি। আমাদের বাইরে যাতায়াত বন্ধ ছিলো, অবশ্য তার জন্য ব্রিটিশ পক্ষ থেকে কোনোরূপ রক্ষীর বন্দোবস্ত ছিলো না। আমাদের সৈন্যরাই রক্ষীর কাজ করতো। রাশনও আমাদের ভালোই দেওয়া হ'ত। ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যরা যে পরিমাণ রাশন পেতো আমরাও তাই পেতাম। তাছাড়া রুগীদের জন্য বাইরে থেকে ডিম ও দুধ কেনবার কোনো বাধা ছিল না। ব্রিটিশ এখানে আসার পরই সকলকে শুনিয়ে দেয়—জাপানীদের নোটের কোনো মূল্য নেই। জাপানী নোটের পরিবর্তে ব্রিটিশ কোনো মূল্য দিতেও প্রস্তুত নয়। কাজেই জাপানী নোট বাজে কাগজের মতো।

মাঝে মাঝে এখানে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে অনেক অফিসার আমাদের হাসপাতাল পরিদর্শন করতে আসতেন। তাঁরা আমাদের বিরাট হাসপাতাল দেখে আশ্চর্য হতেন। কেউ কেউ বলতেন, শুনেছিলাম ভারতীয়রা জাপানীদের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করছে, তাদের নিজেদের কিছুই নেই, কিন্তু এই হাসপাতাল দেখে সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি। অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন, শুনেছি আপনাদের মোটার প্রভৃতি কিছুই ছিলো না। পায়ে হেঁটে ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন, তা কি সম্ভবপর? আমরা জানাতাম, অবস্থা প্রায় তাই ছিলো। আমরা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিলাম। একদিন ব্রিটিশ পক্ষের একজন ভারতীয় অফিসার

মল্লিকদাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাসু এখন কোথায়?' মল্লিকদা ভাবলেন বুঝি আমার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন। তাই উত্তর দিলেন, 'সে এখানেই আছে। আপনি তাকে চেনেন নাকি?' উত্তরে তিনি বললেন, I mean Subhas Basu অর্থাৎ আমি সুভাষ বসুর কথা বলছি। মল্লিকদা আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন না, তিনি অতি-সাধারণ একটি বাসু নন, তিনি আমাদের পূজ্য নেতাজী।'

বৃটিশ পক্ষের বহু ভারতীয় ও বৃটিশ অফিসার এমনি ভাবে প্রায়ই হাসপাতালে আমাদের কাছে আসতেন। এ'দের মধ্যে অনেকে বেশ শ্রদ্ধার সংগে নেতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। অনেকে আবার কতকটা উপহাসের সংগে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তবে আমাদের কার্যকলাপ, নানা রকম ছবি এসব দেখে অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে, এতোবড় একটি সাধনা বিফল হল। একজন উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসার নিজের মুখে বলেছেন, "যদি আর দুটি দিন আগেও ইম্ফলের উপর আক্রমণ হত তা হলে আমরা পিছু হঠতে বাধ্য হতুম।"

হাসপাতালে দিনগুলো কাট্‌তো বেশ আমাদের। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বর্তমান আঁকড়ে, তাকেই উপভোগ করতাম। শুনলাম, আমাদের সৈন্যদের অল্প অল্প করে পাঠানো হচ্ছে। কিছুদিন পরে আমাদের রুগীদেরও 'এম্বুলেন্স' করে 'টাংগু' হাসপাতালে পাঠানো হতে লাগলো। কতক কঠিন রুগী ছিলো। তাদের বিমানে করে ভারতে পাঠানোর বন্দোবস্ত হল। সেই দলে গেলেন আমাদের কর্নেল গোস্বামী ও ক্যাপ্টেন রায়। আমরা কয়েকজন ডাক্তার ও প্রায় চারশো নার্সিং সিপাহী একটি দলে ভারতে আসার জন্য তৈরি হলাম! আমাদের লরী করে 'টাংগু' এরোড্রোমে নিয়ে এলো। কিন্তু শুনলাম বর্তমানে বিমান নেই, কাজেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হল 'জিওয়াওয়াদী'! এই ভাবে আমরা প্রায় দুটি মাস এখানে কাটালাম।

২০শে জুন সকালে আবার তৈরী হওয়ার জন্য আদেশ হোল! সকালে খাওয়া সেরে প্রায় দশটায় তৈরী হলাম। কয়েকখানা লরী করে আমরা প্রায় চারশো জন 'পেগু' এসে পেঁাছলাম। এখানকার জেলখানার লোহার গেট আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হল। পেগু জেলটি খুবই ছোট, মাত্র ৭০।৮০ জন কয়েদীর থাকবার মতো জায়গা আছে। কিন্তু তাতেই আমাদের চারশো জনকে ঢুকতে হল। আমরা ছাড়াও কয়েকজন জাপানী সৈন্য বন্দী হয়ে এখানে ছিলো। গেটের ভিতর প্রবেশ করতেই আমার রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার ও তিন-চারজন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য 'জয় হিন্দ' রবে আমাদের সম্বর্ধনা করলো। ভিতরে চারদিকে সরু বারান্দা ছিলো। আমরা বহু কষ্টে তার মধ্যে স্থান করে নিলাম।

এখানে যেমন থাকার অসুবিধা তেমনি অসুবিধা জল ও পায়খানার। তার উপরে মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি যেন আমাদের বিদ্রূপ করেই অসুবিধার মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুললো। দ্বিতীয় দিনে হুকুম হল আমাদের কাছে যা কিছু দ্রব্যসামগ্রী আছে তার তল্লাসী হবে। এখানে এরা আমাদের মূল্যবান সবকিছু জিনিস জমা নেয়। অবশ্য নামে জমা হলেও আমরা কোনও রসিদ পাইনি বা জিনিসও ফেরত পাইনি। ঘড়ি, আংটি, ফাউন্টেন পেন, সেফটি রেজর ও ছুরি সব কিছুই জমা হয়। এমন কি 'স্টেথস্কোপ' ও 'রেডক্রস' ব্যাজ পর্যন্ত বাদ যায়নি। রেডক্রস ব্যাজ ও স্টেথস্কোপ দিতে যথেষ্ট আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। দুদিন এখানে ছিলাম। এই দুদিনেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। এখানে ডাঃ ঘোষও বন্দী ছিলেন। তিনি স্থানীয় ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি ছিলেন। প্রথমে একবার তাঁকে এখানে বন্দী করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ছাড়া পান। আবার হঠাৎ তাঁকে বন্দী করা হয়।

২৩শে জুন সকালে আমরা তৈরী হলাম রেংগুন যাবার জন্য। এতোদিন আমাদের সংগে কোনও রক্ষী ছিলো না। কিন্তু এখান থেকে প্রতি লরীতে দুজন করে বৃটিশ সেনা আমাদের রক্ষী হয়ে লরীতে উঠলো। দুপুর বেলা বেশ জোরেই বৃষ্টি শুরু হল। সেই বৃষ্টিতে ভিজে আমরা রেংগুন সেন্ট্রাল জেলের সামনে উপস্থিত হলাম। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর শুনলাম এখানে স্থানের অভাব কাজেই আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। আবার লরীতে উঠে বসলাম। এবার লরী এসে দাঁড়ালো বর্মার বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত 'ইনসিন' জেলের সামনে।

জেলের প্রবেশপথে এখানেও আমাদের আবার একবার সকলের তালাসী নেওয়া হল। এখানে রক্ষী দল সকলেই বৃটিশ। গেটের ভিতর দিয়ে আমরা একেবারে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত জেলখানার ভিতরে উপস্থিত হলাম। নেতাজীর "তরুণের স্বপ্নে" এই জেলের নাম শুনেছি। কাজেই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পেলাম যে, যেখানে আমাদের পূজনীয় নেতাজী তাঁর জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বৎসর নানা কষ্টে অতিবাহিত করেছেন, অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁরই অনুগামী হয়ে আমরাও সেই পবিত্র জেলখানাতে বন্দী হিসাবে প্রবেশ করলাম। দেশকর্মীদের পদধূলিতে বৃটিশের এমন ধারা বহু জেলই তো ধন্য হয়েছে—বর্মায়, ভারতবর্ষে ও আন্দামানে।

ইনসিন জেলে

আমাদের আগেই প্রায় তিন হাজার আজাদী সেনা এখানে আশ্রয় পেয়েছে—কাজেই আমরা প্রবেশ মাত্রই 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দ্বারা তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। মেজর নেগি তখন এখানকার ক্যাম্প কম্যাণ্ডার। তিনি আমাদের থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করলেন। আমরা এগার জন ডাক্তার ছিলাম। আমাদের জেল হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা হল। কয়েক-দিন আগেই এখান থেকে একদল ভারতে চলে গিয়েছেন। তাঁদের সংগে কয়েকজন ডাক্তারও গিয়েছেন। বর্তমানে এখানে মাত্র দুজন ডাক্তার আছেন,—ক্যাপ্টেন মকসুদ ও ক্যাপ্টেন নাগরপ্পম। দোতালার একটি বিরাট ব্যারাকে আমরা সকলে থাকবার জায়গা করলাম। এখানে আসার পর বহু পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা হল এবং অনেকের খোঁজ-খবরও পাওয়া গেল। এখানকার সতেরো নম্বর সেলে শুনলাম নেতাজী থাকতেন। 'সেলের' দিকটা তালাবন্ধ—সেদিকে যাওয়ার উপায় ছিলো না। বড় বড় দোতালা পাঁচটি ব্যারাকে আমাদের লোকেরা থাকতো, আর আমরা সব কয়জন ডাক্তার ও আমাদের রুগীরা থাকতাম হাস-পাতাল ব্যারাকে।

এখানকার জেলে বালসেনা দলের প্রায় ত্রিশ জন গুর্খা বালক থাকতো। এদের দেশ-প্রেম সত্যিই অপূর্ব। এদের বাপ, মা রেংগুনেই থাকেন। তাঁদের কাছে এরা যেতে চায় না। তার চেয়ে জেলখানাতে থাকাই এর গৌরবের বলে মনে করে। এদের দেখে দুঃখ হ'ত—বয়স সকলেরই প্রায় দশ থেকে বারো। একজন অফিসার এদের দেখাশোনা করতেন, দুপুরে লেখাপড়া শেখাতেন—নানা দেশের ইতিহাস শোনাতেন ও ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস আলোচনা করতেন। এইসব ছেলেদের সাধারণ জ্ঞান বৃটিশ ভারতীয় অফিসারদে চাইতে কোনও অংশে কম তো নয়ই, বরং ঢে বেশী। আমি একজন বৃটিশ ভারতীয় অফি সারকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি এখান থেকে টোকিও আর কতোদূর? কারণ তাকে নাকি বলা হয়েছে, টোকিও জয় করার পর সে বাড়ি যাবার ছুটি পাবে। একজন ঠাট্টা করে উত্তর দেয়, টোকিও এখান থেকে মাত্র দুশো মাইল দূরে। শুনে অফিসারটি আশ্বস্ত হয়ে বলে যাক্ তাহলে শীগগীরই ছুটি পাওয়া যাবে অবশ্য সব বিষয়ে ভারতীয় সেনাদের অ রাখাই হচ্ছে বৃটিশের চিরাচরিত নীতি।

এখানে মকসুদ ও নাগরপ্পমের নিক রেংগুনের অনেক খবর শুনলাম। যা আমাদে একেবারেই অজানা ছিলো। প্রথমে নেতাজ রেংগুন থেকে পিছু হটতে রাজী হননি তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, "আমার প্রি সৈন্যদের এই দুরবস্থায় ফেলে আমি কিছুতে

আত্মগোপন করতে পারি না। তার চেয়ে বরং তাদের সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভীক বীরের মতো মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। তখন আমাদের উচ্চপদস্থ অফিসাররা বার বার তাঁকে অনুরোধ করে জানান, যে তাঁর জীবন বিশেষ মূল্যবান—এখনও দেশ স্বাধীন হতে পারেনি, এ অবস্থায় তিনি বেঁচে থাকলে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই দেশের কাজ করতে পারবেন। কাজেই অবস্থা বিবেচনায় তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার। অবশেষে তিনি রাজী হন এবং কয়েকজন অফিসার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে মৌলমেনে পেঁছে দিয়ে আসেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মেজর জেনারেল লোগানন্দন রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক হন। অনেকেই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। তখন তাদের বোঝানো হয় যে, বর্তমানে যুদ্ধ করা অনর্থক মৃত্যুবরণ করা। শুধু সৈন্যদের নয়, রেঙ্গুনের বে-সরকারী জনসাধারণেরও এতে ক্ষতি হবে। তার চেয়ে বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে আবার দেশসেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ২৭শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে। তারা বুঝতে পারছিল, রেঙ্গুনে বৃটিশকে বাধা দেওয়া বৃথা। তার চেয়ে 'মৌলমেন' থেকে যুদ্ধ করা অনেকটা সুবিধার হবে। জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে যাওয়ার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ সমগ্র রেঙ্গুন শহরের রক্ষার ভার গ্রহণ করে। অরাজকতার সময় খুন, লুঠতরাজ যথেষ্ট হয়ে থাকে, কাজেই তা বন্ধ করার জন্য আমাদের বাহিনী প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাদের রক্ষী রাখা হয় শহরের পথে, সশস্ত্র প্রহরী পুলিশের কাজ করে।

জাপানীরা যে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেছে বা তারা রেঙ্গুনে যুদ্ধ করবে না এ খবর বৃটিশ পায়নি। কাজেই রেঙ্গুন শহর অধিকার করবার জন্য তারা বিশেষভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলো। শুধু স্থলসৈন্য দ্বারা রেঙ্গুন জয়ে বিলম্ব হতে পারে ভেবে বৃটিশ নৌসেনা দ্বারা আক্রমণের বন্দোবস্ত করে। তাদের ইচ্ছা ছিলো নৌ-বিভাগের বিরাট কামানগুলি ব্যবহার করে রেঙ্গুন শহর প্রথমে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তারপরে তীরে অবতরণ করা হবে। কিন্তু এখানকার লোকেদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, ঘটনা দাঁড়ালো অন্য রকম। মে মাসের প্রথম দিকে বৃটিশের একখানি বিমান রেঙ্গুনের উপর দেখা যায়। জাপানীরা চলে যাওয়ার পর রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের ছাদের উপর ওখানকার যুদ্ধবন্দীরা সাদা চুন দিয়ে লিখে রাখে, "এখানে কোনও জাপানী নেই।" বিমানখানা সম্ভবত এই লেখা দেখতে পায়নি। তারপর আমাদের একজন অফিসার বিমানটিকে নীচে নামবার জন্য সঙ্কেত জানান। বিমানটি মিংলাডন এরোড্রোমে নেমে আসে। সেই পাইলটকে সব কিছু জানানো হয়। মোটরে চড়ে সেই পাইলট ও আমাদের অফিসার রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন ও শহর পরিদর্শন করেন। পরে সেই পাইলট 'ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট'এ ফিরে গিয়ে সব কিছু খবর জানানোর পর বৃটিশ বিনাযুদ্ধে চার তারিখে রেঙ্গুন অধিকার করে। প্রথমে বৃটিশ পক্ষের প্রধান অফিসার আমাদের লোকেরা যেভাবে কাজ করছে সেই ভাবেই কাজ করতে বলেন। এই ভাবে জাপানীরা চলে যাওয়ার পর থেকে বৃটিশের রেঙ্গুন অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের বাহিনী রেঙ্গুন শহরের নিরাপত্তা রক্ষা করে। আমাদের বাহিনী না থাকলে রেঙ্গুন শহরের অবস্থা যে কি ভীষণ হত তা কল্পনাও করা যায় না। অরাজকতার সময় লুঠতরাজ, খুন, জখম এতো চলে আর তাতে নিরীহ শহরবাসীদের যে কতো ক্ষতি হয়, কতো প্রাণহানি হয় তা স্বচক্ষে দেখেছি। যে সকল বৃটিশ অফিসার প্রথম রেঙ্গুনে আসেন, তাঁরা আমাদের বাহিনীর কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। শুধু রেঙ্গুন বলেই নয়—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিলো বলেই সারা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা রক্ষা পেয়েছে। এই সৈন্যদল গঠিত না হলে ভারতীয়দের যে কি অবস্থা হত তা কল্পনাও করা যায় না। একদিকে জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করা, অন্যদিকে সশস্ত্র দস্যু দলের কবল থেকে বাঁচানো। যুদ্ধের সময় চারদিকেই যথেষ্ট রাইফেল ও মেসিনগান পাওয়া যেতো, দুষ্ট গ্রামবাসীরা এই সকল সংগ্রহ করে অন্য গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে লুঠতরাজ করতো। এতে যে কতো প্রাণহানি হত তার হিসাব নেই। রেঙ্গুন শহর অধিকার করার কিছুদিন পরেই বৃটিশ আমাদের বাহিনীকে একত্র জড়ো করে। প্রথমে কিছুদিন তারা শহরেই ছিলো, পরে তাদের রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল ও ইনসিন জেলে এনে ভর্তি করা হয়। অল্পসংখ্যক অন্যান্য কয়েদী ছাড়া আমাদের বাহিনীই সারা জেল অধিকার করেছে। এখানে আমাদের প্রহরীর কাজ করছে একদল বৃটিশ সেনা। চারদিকে মেসিনগান—জেলের প্রকৃত আবহাওয়ার আস্বাদ আমার জীবনে এই প্রথম। (ক্রমশ)

বিবাহ করিয়া ভুলই করিয়াছি। ভুল বৈকি—রীতিমত ভুল। অন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ আমার মত লোকের পক্ষে।

আমার সমশ্রেণীর ব্যক্তিরা সময় সময় যে আমারই মত অন্ততঃ মনে মনে খেদোক্তি করিয়া থাকেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

দুর্মূল্যের বাজার। সাংসারিক নানা খরচের উপর আধুনিকা প্রেয়সীর কিছু প্রসাধন সামগ্রীও যোগাইতে হয়—কাজেই স্কুলের পর প্রাইভেট টিউশানিও করিতে হয় একটা।

শিক্ষকতা অবশ্য ছেলেদের স্কুলেই করিতাম কিন্তু প্রাইভেট টিউটর ছিলাম একটি ধনী দুহিতার। গোল বাধিল এইখানেই। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কম বেশী সন্দেহ করাই হয়তো নারী-চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। অবশ্য আমি মেয়েদের সাইকোলজী অধ্যয়ন করি নাই—তবে নিজের অর্ধাঙ্গিনীটির ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া আমার এ ধারণা জন্মিয়াছে।

যুবতী বা প্রৌঢ়া যে কোন মেয়ের দিকে একবার চাহিলে বা জানালার ধারে কি খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া অন্য বাড়ীর দিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া একটু সুর ভাঁজিলেই বাড়িতে যে খণ্ড-প্রলয়ের সৃষ্টি হয়,—আমি কোন মেয়েকে রোজ সন্ধ্যায় তার কাছে বসিয়া—রীতিমত তার মুখের দিকে চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াইয়া যাই, এ-কথা জানিলে বাড়িতে মহাপ্রলয় ঘটিবে নির্ঘাত জানিতাম—কাজেই স্ত্রী অমিতার নিকট মেয়ে গোপন করিয়া ছেলেই বলিয়াছিলাম।

কথাটা অমিতার নিকট গোপন করিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতাম। এই মিথ্যার কাঁটা সর্বদাই আমার মনে খোঁচা দিত। কিন্তু বলিলে প্রলয় অনিবার্য অথচ বর্তমান অবস্থায় কুড়ি টাকার টিউশানিটা চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিতেও বাধে। ভাবিয়াছিলাম অন্যত্র একটি ছেলে 'টিউশানি' যোগাড় করিয়া এটা ছাড়িয়া দিব কিন্তু কার্যতঃ হইয়া ওঠে নাই।

সত্য কথা বলিতে কি এই টিউশানিটা ছাড়িবার কল্পনা আমার মনে উদয় হইলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন আমি আমার ছাত্রীর রূপমুগ্ধ বা গুণমুগ্ধ। গুণ তাহার কিছু আছে কিনা জানি না। রূপের কথা বলিতে গেলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না—সে রীতিমত ভয়াবহ।

গাত্রবর্ণ কালো। শ্যামবর্ণ নয় অর্থাৎ ঝুলের ন্যায় ঘন কালো। দেহের গঠন যেন সহজ সরল একখানা বাঁশের কঞ্চি। তদুপরি শ্রীমতীর একটি চক্ষুর দৃষ্টি ভয়ংকরভাবে বাঁকা। অর্থাৎ যাহাকে ট্যাঁরা বলে,—তাহাই।

এ হেন ছাত্রীর ভাগ্যবান টিউটর আমি। সেই ট্যাঁরা চোখের যে কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বলিয়া বোঝান অসম্ভব। সেদিকে চাহিতে বাস্তবিকই আমার আতংক হইত।

আমি যা কিছু বলিবার বা বুঝাইবার—ছাত্রীর লিপ্‌ষ্টিক রঞ্জিত লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতগুলির দিকে চাহিয়াই সারিতাম।

ছাত্রীটি কালো বা ট্যাঁরা বলিয়া ঠাট্টা করিতেছি মনে করিয়াছেন? না তাহা নয়। কালো তো আমিও। ট্যাঁরাও হইতে পারিতাম। আমার কথাটা বুঝাইবার জন্য তাহার চেহারার একটু বর্ণনা দিলাম মাত্র।

তবে তাহাদের দারোয়ান, চাপ্‌রাসীর ঘন ঘন সেলাম, কুর্নিশ ও আদর আপ্যায়ন আমার বেশ ভাল লাগিত। সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিত মাসের শেষে কুড়িটি টাকা। এই লোভনীয় বস্তুটির জন্যই এ মাস্টারী ছাড়িবার কল্পনা মনে স্থায়ী হইত না।

সুখ-দুঃখের অম্ল-মধুরে দিন কাটিয়া যাইতেছিল মন্দ নয়। কিন্তু হঠাৎ বাদ-সাধিল বিধি নয়—আমারই ছাত্রী শ্রীমতী অনিন্দিতা।

সেদিন ছিল রবিবার। অমিতার ফরমাস্ মত রং এবং নম্বর মিলাইয়া উল কিনিতে দোকানে গিয়াছিলাম। উলের বোঝা লইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরিয়া দেখি বিপদ গুরুতর।

আলুলায়িত কুন্তলা অমিতা শয্যায় লুটাইতেছে। অজ্ঞাত আশংকায় বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কোথাও হইতে কোন দুঃসংবাদ আসিল নাকি? ভয়ে ভয়ে বলিলাম, কি হয়েছে অমিতা! শুয়ে আছ কেন? ওঠ। ওঠা তো দূরের কথা না উত্তর না নড়াচড়া। বিপুল উৎকণ্ঠায় টেবিলের ওপর উলের বোঝা ফেলিয়া অমিতার পাশে বসিয়া পড়িলাম। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম বেশ ঠাণ্ডা,—জ্বর হয় নাই। তবে? তাহার এলায়িত কেশের উপর হাত রাখিয়া ডাকিলাম 'অমিতা ওঠ লক্ষ্মীটি,—কি হয়েছে বল।'

এক ঝট্‌কায় আমার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া অমিতা সটান উঠিয়া বসিল এবং রাতের আকাশ হইতে খসিয়া পড়া তারার মতই তির্যক গতিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। আমি বজ্রাহত বনস্পতির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুটা সামলাইয়া ওঘরে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই অমিতা কেশবাস সংযত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে ঝড়ের বেগে পুনরায় আমার সম্মুখে আসিয়া একখানা সুগন্ধি 'এনভেলাপ্' আমার গায়ে ছুড়িয়া মারিল।

তাড়াতাড়ি খামখানা কুড়াইয়া লইয়া চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিলাম। স্বাক্ষরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সর্বনাশ! আমার এতদিনের কারসাজি সব ভেস্তে গেল।

লিপিকাখানি আমার ছাত্রীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ-বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং নিমন্ত্রণকর্ত্রী স্বয়ং অনিন্দিতা।

কি দরকার ছিল রে বাপু আবার দারোয়ান দিয়া চিঠি পাঠাইবার। মুখে তো বলাই ছিল। যত সব!

অমিতা তখন ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে—কি হয়েছে,—কি হয়েছে করছ—কিছুই জান না যেন। ন্যাকামী করতেও এত পার। আমার কাছে এত লুকোচুরির কি দরকার। একটু বিষ এনে দিলেই তো এ আপদ চুকে যায়। আজকাল তোমার অনাদর বেশ বুঝতে পারি। আজ কারণ জানলাম।

অপরাধীর মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমিতাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, শোন পাগলী শোন,—এই মেয়েটি হচ্ছে আমার ছাত্রের দিদি। ও-বাড়ির সকলেই আমাকে মাস্টারমশাই বলে ডাকে। আর ওরা বড়লোক কিনা ওদের কায়দা-কানুনই আলাদা। তাই জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়েছে।

নাঃ, কোন ফলই হইল না আমার কথায়। প্রিয়ার আঁখিজল শ্রাবণের ধারার মতই অঝোরে ঝরিতে লাগিল। আর এই মেয়েরা ইচ্ছা করিলেই এত চোখের জল আনিতে পারে আর আমরা পুরুষেরা সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলেও হাজার চেষ্টায় চোখ দিয়া এক ফোঁটা জলও বাহির করিতে পারি না।

হায়রে একচোখা ভগবান।

অমিতার কাছে যতই নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম সে ততই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নানারূপ

অকাট্যপ্রমাণ—(তাহার মতে) দাখিল করিতে লাগিল।

ছাত্রীর রূপ সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াও অমিতার রাগ অভিমান কিছুমাত্র কমাইতে না পারিয়া অবশেষে আমার এত সাধের কুড়ি টাকার টিউশানিটির ইস্তফাপত্র লিখিয়া অমিতার হাতে দিয়া তবে অমিতার মুখে হাসি ফুটাইতে পারিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কি আর বলিব। টিউশানি হইতে আমি কাটিয়া পড়িলেও অমিতার মনের মেঘ সম্পূর্ণ কাটিল না। সেই ছিন্ন হাল্কা মেঘখণ্ডে ভর করিয়াই অমিতার কল্পনা বহু দূরে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘন কালো মেঘ জমাট বাঁধিতে লাগিল। এবং পরিশেষে তাহা ঝড়-জলে পরিণত হইতে লাগিল।

অমিতার সচ্ছন্দ হাসি খুসী ভাব আর তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। নিরুপায় হইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেনকে সব খুলিয়া বলিলাম। সে হাসিয়া বলিল, আরে এর জন্য এত ভাবছিস্ কেন? একদিন কোন ছুতোয় তোর বৌকে ঐ রূপসী ছাত্রীটিকে দেখিয়ে দে—তবেই দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাবিয়া দেখিলাম কথাটা মন্দ বলে নাই। বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করিয়া ধন্যবাদ জানাইলাম।

সেই দিনই বাড়ি আসিয়া অমিতাকে বলিলাম—'শীগ্গীর তৈরী হয়ে নাও—চট্ করে। আমার ছাত্রের বাবা মিঃ ঘোষ আজ স্কুলে গিয়ে তোমাকে শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করেছেন। ছ'টার মধ্যে না গেলে মিঃ ঘোষ নিজেই আসবেন বলেছেন আমাদের নিয়ে যেতে।

অমিতা নিশ্চুপ বসিয়া রহিল দেখিয়া—পুনরায় বলিলাম—"উনি এলে বড় লজ্জার কথা হবে। নিজেদেরই যাওয়া উচিত কি বল! টিউশানি তো ছেড়েই দিয়েছি। তবু বিশিষ্ট লোক, নিজে এসে যখন বলে গেছেন যাওয়াই উচিত"।

প্রথমে অমিতা কিছুতেই রাজী হইতে চায় না। অনেক খোসামোদ কাকুতি মিনতির পর শ্রীমতী রাজী হইলেন। এবং যথাযোগ্য সাজসজ্জা করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কার্যসিদ্ধির জন্য সিদ্ধিদাতা গণেশের নামই নাকি দেবদেবীদের মধ্যে প্রশস্ত। কাজেই যাত্রাকালে 'দুর্গা' 'দুর্গা' না বলিয়া মনে মনে বার কয়েক গণেশের নাম আওড়াইয়া অমিতাকে লইয়া রাস্তায় নামিয়া একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া চড়িয়া বসিলাম।

পথে নির্বাক প্রেয়সীর দিকে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম,—মুখচন্দ্রের ভাব কিছুমাত্রও বদলাইয়াছে কি না। কিন্তু সে দুরাশা মাত্র। সে মুখ আষাঢ়ে আকাশের মতই মেঘ ভারাক্রান্ত।

নির্দেশ মত' মিঃ ঘোষের বাড়ির গেটে ট্যাক্সি থামিল। অমিতাকে লইয়া বাড়ির ভেতরে ঢুকিলাম—দরোয়ান যথারীতি সেলাম ঠুকিল এবং ট্যাক্সি থামিবার শব্দ শুনিয়া শ্রীমতী অনিন্দিতা স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলেন।

অনিন্দিতা বলিল,—"একি মাস্টারমশাই যে, আসুন। হঠাৎ আমাদের পড়ান ছেড়ে দিলেন কেন বলুন তো।"

বলিলাম,—শরীরটা কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

অমিতার দিকে চাহিয়া দেখিলাম চাপা হাসিতে তাহার মুখ চোখ ফাটিয়া পড়িতেছে। বলিলাম,—অমিতা,—এই আমার ছাত্রী অনিন্দিতা। আর—অনিন্দিতা, ইনি আমার স্ত্রী অমিতা। সিনেমায় যাচ্ছিলাম এই পথে—তা' অমিতার অনেক দিনের ইচ্ছা তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে—তাই এখানে নামলাম।

অনিন্দিতা অমিতার হাত ধরিয়া বলিল, "খুব খুশি হ'লাম সত্যি। আসুন ঘরে বসবেন চলুন।"

দেখিলাম, অমিতা আমার দিকে চাহিয়া আছে। দুই চোখে তার তীব্র ভর্ৎসনা দৃষ্টি অথচ উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ চাপিতে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বুঝিলাম অমিতার মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আনন্দে বুকখানা যেন দশ হাত ফুলিয়া উঠিল।

অনিন্দিতাকে বলিলাম—কিছু মনে কোরো না। আজ আমরা এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। নইলে সিনেমায় দেরী হয়ে যাবে। আজ তোমাদের চাক্ষুস পরিচয় হ'ল। আর একদিন মৌখিক আলাপ হবে।

বিদায় লইয়া ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম। ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিতেই অমিতা উচ্ছ্বসিত হাসিতে সিটের ওপর লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

হাসিয়া বলিলাম,—কিগো, এখন বুঝলে তো তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী যার—সে কখনও ঐ কদাকার মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে না।

অমিতা সোজা হইয়া বসিয়া আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—বাপরে বাপ, তুমি এত দুষ্টু! কি বিপদেই না আমাকে ফেলেছিলে—উঃ আর একটু হলে ওর সামনেই হেসে ফেলতাম।

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া ট্যাক্সি থামিল। ভাড়া চুকাইয়া বাড়িতে ঢুকিয়া অমিতাকে কাছে টানিয়া লইতেই অমিতা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল,—"আঃ ছাড় এখন যাই তাড়াতাড়ি উনুনটা ধরাই গে। খুব তো নেমন্তন্ন খেয়ে এলে। এখন চা করে—রান্না করিগে।"

বলিলাম,—"না না, আজ আর রান্না করতে হবে না। এখন শুধু তোমার সঙ্গে গল্প করব বসে বসে।"—"যাও পাগলামো কোর না—ছাড়। তুমি যে কত না খেয়ে থাকতে পার তা আমার জানা আছে গো মশাই।"

অমিতাকে আরো নিবিড় করিয়া কাছে টানিয়া লইলাম।

স্নানযাত্রা

পৃথিবীর কোনো দেশের লোক বোধহয় আমাদের মতো স্নানপ্রিয় নয়। কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট
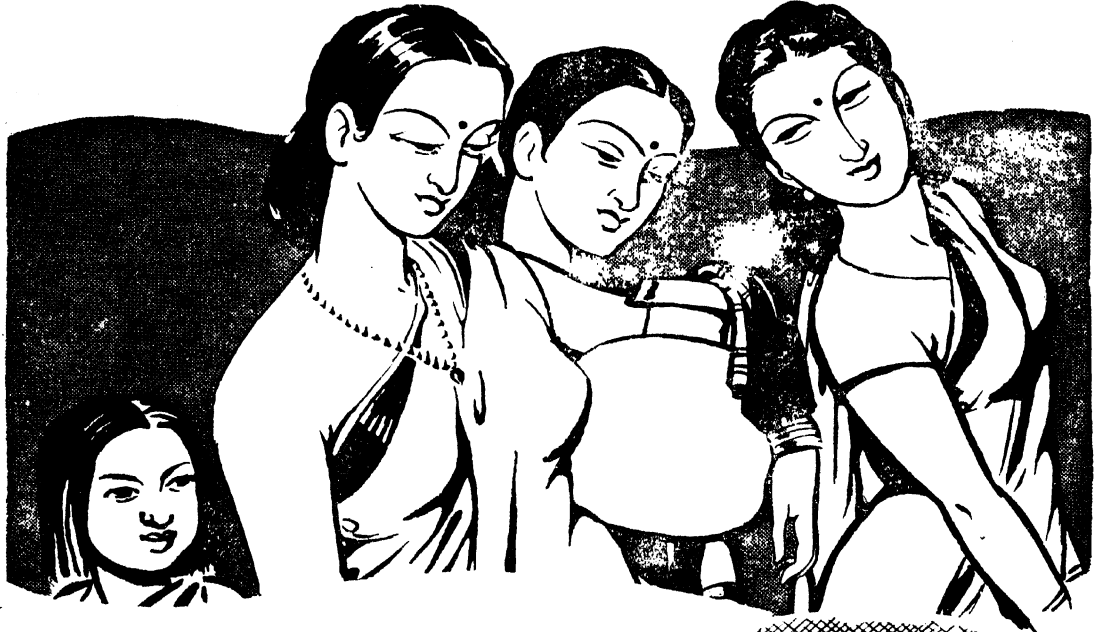
একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও একদিন সুষ্ঠুভাবে স্নান করতে না পারলে সেদিন আমাদের মন অতৃপ্তিতে ভরে থাকে। স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

SRK 5

সোল সেলিং এজেন্টস:—হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ, সুট নং ৫২, হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—এগার—

ঘরে তালা দিয়ে দুজনে রাস্তায় নেমে এল। নির্জন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। বন্ধ আর শূন্য বাড়িগুলো যেন ভয়াতুর চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তাকিয়ে আছে শূন্য দিগন্তের চক্রবালে—যেখানে মৃত্যুবজ্র বহন করে জাপানী বিমান দেখা দেবে। লোহার বিচ্ছিন্ন বেঞ্চগুলো সব ফাঁকা—মরা ঘাসে রাত্রির শিশির ঝিকমিক করছে। ব্যথা-বিদীর্ণ ভয়ার্ত কলকাতার চোখের জল যেন ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দিকে দিকে।

প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ট্রাম ধরতে হবে—ওখান থেকে বেলগেছিয়া।

—খেয়ে নিলে না মণিকাদি ?

—এসে খাব। —মণিকার স্বর ক্লান্ত শোনালো।

সুমিতা ভাবছে শীলার কথা। অবশ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, তবু চিনত শীলাকে। ছোট একটুকরো মেয়ে—। কথা বলে না, চুপ করে শোনে, মিস্টি করে হাসে। ভীরু চোখ, শান্ত স্বভাব। বলার চাইতে অনুভব করে বেশি। লেখাপড়া শিখেছে, তবুও গৃহকপোতী। পথে নামলে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়—বাইরের পৃথিবীটাকে ভয় করে, নিজেকে অনুভব করে একান্ত অসহায় বলে। তিনপুরুষ কলকাতায় কাটিয়েছে, তবু চাল-চলন দেখলে মনে হয় যেন গ্রামের একটি ছোট মেয়েকে হঠাৎ মহানগরীর এই জীবন-স্রোতের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে—এখানে সে যেমন বেমানান, তেমনি অসঙ্গত।

সেই শীলা। হঠাৎ এ কী করে বসল। অমন ভীরু ছোট মেয়েটা—পরিবারের শাসন মানল না, বাঘের মতো বিশুদ্ধ ব্যুরোক্র্যাট বাপের তর্জনকে ভয় করলে না, সমাজকে অস্বীকার করলে, বেরিয়ে এল শশাঙ্কের হাত ধরে। সেদিন সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—জলভরা মেঘের ভেতর যে প্রচ্ছন্ন বজ্র থাকে, এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এই জোরটা কি এসেছিল শীলার নিজের ভেতর থেকেই ? না—এই শক্তি সে পেয়েছিল শশাঙ্কের কাছ থেকে, পেয়েছিল তার প্রেম থেকে ? ভালোবাসা শীলার জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, ভীরু মেয়েটির ভেতর থেকে আর একজনকে জাগিয়ে তুলেছিল—যে কাউকে ভয় পায় না—পৃথিবীকে না, সমাজকেও নয়।

নিশ্চয় তাই—সুমিতা ভাবতে লাগল ঃ নিশ্চয়ই তাই। নিজের জীবনেও এই সত্যটাকে সে বুঝতে পেরেছে। অ্যাডোনিসের ভেতরেও হার্কিউলিস জাগে। লীলাসঙ্গিনী হয় বিপ্লবী-নায়িকা। হাত থেকে লীলাকমল ঝরে গিয়ে সেখানে আসে তলোয়ার। সে তলোয়ার অগ্নিদীপ্ত—বজ্রের চাইতেও গুরুভার। তবু তাকে বহন করতে হয়, সেই দানকে গ্রহণ করতে হয়। 'কী পেলি তুই নারী' বলে আক্ষেপ করা বৃথা—চোখের জল মূল্যহীন।

কিন্তু নিজের কথা থাক। শীলা। ভুল করেছিল। শশাঙ্ক ওকে লীলাকমল দেয়নি, তলোয়ারও নয়। যা দিয়েছে, তা বঞ্চনা। তাই আজ নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে শীলাকে। আফিং খেয়েছে। হয়তো বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না।

মণিকাদির অসন্তুষ্ট গুঞ্জনে চমক ভাঙল সুমিতার।

মোটা মানুষ, হাঁটতেও পারি না ছাই। একটা রিক্সা যদি পাওয়া যেত—কিন্তু বৃথা আশা। রিক্সা আছে, চলছেও অনেক। কিন্তু সব উজানের স্রোতে। বাক্স-প্যাঁটরা আর বাক্স-প্যাঁটরার সামিল মানুষ। হাওড়া-শেয়ালদার মুক্তিপথ দিয়ে খাঁচায়-বন্দী মহাপ্রাণীগুলো উড়ে পালাচ্ছে। চার আনার রিক্সা আড়াই টাকা।

মণিকা বললে, কী আর করবে, হেঁটেই চলো। —একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভাবটা এই ঃ যেন সুমিতারই কষ্ট হচ্ছে—তাকে একটা রিক্সাতে চাপিয়ে দিতে না পারলে মণিকার মন শান্তি পাচ্ছে না।

সুমিতা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, চলো, আর দু-পা রাস্তা—এক্ষুণি তো ট্রাম পাবে।

—অগত্যা।

শীলা। সুমিতা ভাবছে ঃ এই যুদ্ধ অনেক সত্যকে অনাবৃত করল, মুখোস খুলে দিলে অনেক মিথ্যার, উজ্জ্বল আর নির্মল করে তুললে অনেক বিভ্রান্তিকে। যেন সুমিতা বেঁচে গেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে কাল সারা-রাত্রির বিনিদ্র অস্বস্তিটার ওপর থেকে। ভালোই করেছে অনিমেষ—রক্ষা করেছে একটা স্বপ্নভঙ্গ থেকে—হয়তো শীলার মতো আফিংয়ের হাত থেকে। সেও তো রোমান্টিক ছিল, তারও তো এই রকম বিহ্বল আত্ম-বিস্মৃতি ছিল। কিন্তু অনিমেষ নিজেকে বাঁচিয়েছে, তাকেও বাঁচিয়েছে। লীলাকমল নাই রইল—নাই-বা রইল পদ্মপর্ণে নিজের স্বপ্ন-কামনার রক্তরাগ। তার চাইতে ঢের বড় সত্য হাতের এই তলোয়ার। আত্মরক্ষা করতে পারে—আঘাত করতে পারে—আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নিঃশব্দে পথ কাটতে লাগল। সুমিতা ভাবছে—মণিকাও ভাবছে। গাড়ির স্রোত চলেছে স্টেশনের দিকে। ওই পথ দিয়েই পালিয়ে গেছে শশাঙ্ক। পালিয়ে গেছে অনেক অসত্য—অনেক মিথ্যা—অনেক অভিনয়ের নিপুণ আর নিখুঁত চতুরতা।

মোড়। ট্রাম এল। যাত্রীর ভিড় নেই—দুজনে, তেমনি নীরবে ট্রামে উঠে বসল।

হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো সুমিতা। ন'টা বাজে। তার সংসার এখন মুখরিত। ছেলেমেয়েরা একদল বেরিয়ে গেছে। আর একদল খেয়ে-দেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে। ওদের শীলার কথা ভাববার সময় নেই—সুমিতার হৃদয়ের কথাও না। তার চাইতে ঢের বড়ো, অনেক বড়ো কথা ওরা ভাবছে। দেশ। দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ, মহাদেশ ছাড়িয়ে পৃথিবী। ওরা সেই দিনটাকে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে—যেদিন পৃথিবীতে সব মিথ্যা—সব অপমান—সব উৎপীড়নের সমাপ্তি হয়ে গেছে—যেদিন শীলারা এত সহজে ভুল করে না। আর যদি ভুলই করে, তাহলে আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এদের নিয়েই সুমিতার সংসার—এদের স্বপ্নই আগামী কালের, আগামী পৃথিবীর সংসার।

আর শীলার সংসার। ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে পড়ল মাত্র একটি আঘাতে। এতটুকু ভর সইলো না। চোরাবালির বনিয়াদ শিথিল হয়ে এক মুহূর্তে মাটির তলায় দুজনকে টেনে নিয়ে গেল।

মনের দিক থেকে হঠাৎ যেন জোর পেল সুমিতা। হঠাৎ যেন পুঞ্জীভূত আলস্য আর জড়তা—দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে সে পথ খুঁজে পেল। সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। শীলার সংসার ভাঙবে না—মরবে না শীলা। সে বেঁচে উঠবে—সামগ্রিক সংসারের ভেতর দিয়ে আবার ব্যক্তি-সংসারের নতুন ইঙ্গিত—নতুন সম্ভাবনায় ধন্য হয়ে উঠবে।

শীলা মরবে না।

কিন্তু শীলা বাঁচলো না। ওরা যখন পৌঁছুল, তার দশ-পনেরো মিনিট আগেই শীলা মরে গেছে। হাসপাতালের লোহার খাটে শাদা-চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে সে ঘুমিয়ে আছে। স্টমাক টিউব বসানোর চেষ্টায় গালের একদিকে একটুখানি চিরে গিয়েছিল—সেখানে একটুখানি কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে শুধু। আর কোনখানে কোন বৈলক্ষণ্য নেই—ঘুমিয়ে আছে শীলা। শশাঙ্ককে নিষ্কণ্টক করেছে, নিজেকে ভারমুক্ত করেছে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মণিকাদি। সুমিতা শুধু চিত্রকরা চোখে

তাকিয়ে রইল শীলার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে।

ডাক্তার বললেন, অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল মিস সেন—বাঁচানো গেল না। অনেকটা আফিং খেয়েছিল, খবরও পাওয়া গিয়েছিল ঢের দেরীতে। ততক্ষণে রক্তের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার বললেন, শুধু আত্মহত্যাই করেনি. সি হ্যাজ অলসো কিলড এ চাইলড উইথ হার।

আবার একটা আর্তনাদ। এবার শুধু মণিকা নয়, সুমিতাও।

শীলা মরে গেছে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করে গেছে শশাঙ্কদের পাপ—শশাঙ্কদের বীজাণু। বড়লোক শশাঙ্ক— অভিজাত শশাঙ্ক, মেয়েদের জীবন নিয়ে যারা অসঙ্কোচে ছিনিমিনি খেলতে পারে সেই শশাঙ্ক। কিন্তু এক শীলাই কি নিজেকে বলি দিয়ে নীল রক্তের এই অভিশাপকে ধ্বংস করতে পারবে। এত সহজেই কি এর সমাপ্তি ?

সুমিতা ভাবতে লাগল ঃ এত সহজেই কি এই রক্তবীজেরা পৃথিবী থেকে অপসৃত আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

খোলা জানলা দিয়ে সূর্যের আলো শীলার মুখে এসে পড়েছে। এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ওই সূর্য—পৃথিবীর আদিম দিনে তামস-বিজয়ী যে সূর্যকে অগ্নিমন্ত্রে বন্দনা করা হয়েছিল; অন্ধকারের পরপার থেকে অমৃতরূপে যে হিরণ্ময় দ্যুতির আবির্ভাব—যার ত্রিকালদর্শী নিরঞ্জন দৃষ্টি অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ দেখতে পায়।

* * *

রমলার ঘুম ভাঙল কবি ইন্দুর কণ্ঠস্বরে।

রাত্রির সে ভীরু লাজুক কবিটি আর নেই। এখন ওর মধ্যে দ্বিতীয় সত্তা জেগেছে। চীৎকার করে সমস্ত বাড়িটা মাথায় করে তুলেছে, মনে হচ্ছে যেন মারামারি বাধিয়েছে। কিন্তু মারামারি নয়, কাকে যেন প্রাণপণে একটা দুরূহ রাজনীতির জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানালোক বিতরণ করছে।

রমলা ঘর থেকে বেরিয়ে বললে, কী শুরু করেছ ইন্দু। মানুষকে কি একটু ঘুমোতেও দেবে না?

ইন্দু বললে, বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে মানে? ওসব জমিদার-গিন্নীর চাল ছাড়ো।

—না, শেষ রাত্রে উঠে তোমার মতো চ্যাঁচাতে শুরু করব। কবির ইমোশনটা যখন রাজনীতির ওপরে গিয়ে পড়ে. তখন তার চাইতে মারাত্মক দুর্ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটতে পারে না।

ইন্দু বললে, যাও—যাও।

—বটে ? —রমলা হাসল ঃ তাহলে শোনোঃ

হংস মিথুন, নীরের ঠিকানা কই—
অসীম সাগর—

ইন্দুর কাণ লাল হয়ে উঠল ঃ রমলাদি, থামো।

—থামবো মানে? —আড়চোখে কবির বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রমলা বলে চলল ঃ অসীম সাগর দুলিছে পাখার নীচে—

প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইন্দু মুহূর্তে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। আলোচনার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। দেখতে দেখতে সামনে থেকে পালিয়ে মান এবং কাণ বাঁচালো। ওর পলায়ন দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল রমলা। কত সহজেই মানুষটাকে যে বিব্রত করে তোলা যায়।

সুমিতার ঘরের সামনে এসে ডাকলে, সুমিতাদি!

ঘর থেকে বেরুল শোভা।—সুমিতাদি সকালে বেরিয়ে গেছে।

—কখন ফিরবে?

—বলে যায়নি।

রমলা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা অদ্ভুত দো-টানায় বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। সুমিতা নেই. সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন তার নোঙর ছিঁড়ে গেছে—এই স্রোতের ভেতরে নিজেকে সে সামলাতে পারছে না। সুমিতা যেন ওর শক্তি—ওর আশ্রয়। একদিকে বাসুদেব, অন্যদিকে আদর্শ। কোন্ পথে যাবে সে—আত্মরক্ষা করবে কী উপায়ে?

বাসুদেবের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট। রমল করেনি, বাসুদেবই করেছে। বলেছে কা আটটার মধ্যে আসবে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষি কোণায়। আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা ক থাকব। যদি না আসো, তাহলে জীবনে আ কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলে বাসুদেব। বুকে হাত দিয়ে, চোখের কো ছলছলিয়ে, গলার স্বরে একটা ভয়ঙ্ক দুর্ঘটনার অনিবার্য ইঙ্গিত এনে। সুমিত কথা সত্যি, খানিকটা অভিনয় করেছে বাসুদেব কিন্তু সবটাই অভিনয় নয়। নিজের কথাটা প্রাণ দিয়ে বোঝাতে গেলে খানিকটা অভি আসবেই—এটা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য।

বাসুদেবের চোখে কাতরতা—বাসুদে সমস্ত মুখ একটা সঙ্কল্পে নিষ্ঠুর। বোঝা যাচ্ছে, রমলাকে না পেলে নিজেকে ক্ষ করবে না, নিজের ওপর একটা নিষ্ঠ প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে আ কথাটা কল্পনা করেও রমলার অন্তরাত্মা চম উঠল।

(ক্রম

সন্দীপন পাঠশালা—(উপন্যাস) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

তারাশংকরের কোনও নতুন উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ ঘটনা। কিছুদিন পূর্বে অনেকের ধারণা হইয়াছিল তারাশংকরের প্রতিভা বোধহয় শেষ হইয়া গিয়াছে; পতনোন্মুখ জমিদার বংশের সহজাত অহংকার ও রাজসিক মর্যাদাবোধের মহিমময় চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার মানসচক্ষু বুঝি বা ঝলসাইয়া গিয়াছে, সে গণ্ডীর বাহিরে আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। সন্দীপন পাঠশালা সে আশংকা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। চাষীর ছেলে সীতারাম নিজে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও নর্মাল পরীক্ষা পাশ করিতে পারিল না; কিন্তু গ্রামের অন্যান্য চাষী ও অবজ্ঞাত শ্রেণীর ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শিক্ষকতাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহার পর নানারূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহার বহু সাধনার সৃষ্টি সন্দীপন পাঠশালা গড়িয়া উঠিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে গ্রামে বিনা-মাহিনার উচ্চ প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হইবার পর তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ। ইহারই ভিতর দিয়া একটি আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীর আশাহত জীবনের যে মর্মন্তুদ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে রসগ্রাহী পাঠকের মনে তাহা গভীরভাবে রেখাপাত করিবে। সেই সঙ্গে অবহেলিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার পথে যে সকল সমস্যা চিরন্তন প্রতিবন্ধক হইয়া জাতীয় জীবনের ভিত্তি-মূল ক্ষয়গ্রস্ত করিতেছে দরদী শিল্পীর তুলিকা-স্পর্শে সেগুলিও পাঠকের সম্মুখে বিভীষিকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে। কাহিনীটি আগাগোড়া এমন একটি সহজ স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িতে গিয়া মনেই হয় নাই ইহা উপন্যাস, মনে হইয়াছে যেন একটি বাস্তব জীবন-কাহিনী পড়িতেছি। ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন হইতে সুরু করিয়া আগস্ট বিপ্লব, পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের ক্রমাবর্তনের পটভূমিকায় সীতারাম মাস্টার যেন একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর সহিত তাহার কল্পনায় প্রেমের ছবিটি বড় মধুর, বড় করুণ। এই ঘটনাটি সীতারাম চরিত্রটিকে সকল দিক দিয়া সহজ মানুষে পরিণত করিয়াছে, এ চিত্রটি না থাকিলে তাহাকে বড় রুক্ষ কৃচ্ছ্রসাধক বলিয়া ধারণা হইত। এ কাহিনীটির ভিতরেও কয়েকটি জমিদার বংশের চিত্র আছে—তাহাদের মধ্যে ধীরানন্দ ও তাহার মাতা নিজ নিজ চরিত্রগুণে অসাধারণ—কিন্তু তাহারা সকলেই গ্রামের স্বাভাবিক প্রভাবশালী অধিবাসী হিসাবেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, পারিপার্শ্বিক পরি-বেশকে অতিক্রম করিবার মত কোনো অমানুষিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাহারা নহে। উপন্যাসটি ১৩৫২ সালের কৃষকে উদয়াস্ত নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হওয়ায় প্রত্যেক লাইব্রেরী ও সাধারণ পুস্তক-অনুরাগীদের সংগ্রহ তালিকায় ইহা সাগ্রহে স্থানলাভ করিবে।

Nation Betrayed?—A case against Communists. মূল্য ॥০। ইংরাজি পুস্তিকা—দ্বিতীয় সংস্করণ। সংকলক—ডাঃ এ জি তেন্ডুলকার। শ্রীযুক্ত এস কে পাতিল কর্তৃক কংগ্রেস ভবন, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত।

কম্যুনিষ্টরা কি জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল? সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের অবগতির জন্যই ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত তেন্ডুলকার এই পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করেন। ১৯৪২, ৪৩ ও ৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট মুখপত্র "পিপলস ওয়ার" পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদেরই কতকগুলি হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তিকাটি সংকলিত হইয়াছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অতর্কিত গ্রেপ্তারের পর হইতে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর দিয়া বিপর্যয়ের যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের আতংকগ্রস্ত ভারতবাসী সেদিন নেতৃত্বের অভাবে মুহ্যমান হইয়া নিজেদের বড় অসহায় বোধ করিয়াছিল। এই সময় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যুনিষ্টগণ ইচ্ছা করিলে দিশাহারা দেশবাসীকে সঠিক পথনির্দেশ করিতে সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া ইঁহারা কংগ্রেসের নিষিদ্ধ অবস্থার সুযোগ লইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপাভিখারী হইয়া তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে জাতিকে সকল উপায়ে ভুল পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে নানারূপ মিথ্যা উক্তি দ্বারা লোকচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়া, সর্বপূজ্য নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে ইতর ভাষায় গালাগালি করিয়া সেদিন তাঁহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন ক্ষুব্ধ দেশবাসী তাহার প্রতিবাদে স্বতঃপ্রবৃত্ত ঘৃণায় তাহাদের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, যেদিন যুদ্ধের বাজারে রাত্রিদিন কল-কারখানা চালাইয়া দেশী ও বিদেশী মালিকগণ দুই হাতে অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সময় দরিদ্র মজুরদের বন্ধু সাজিয়া ও তাহাদের অজ্ঞানতার সুযোগ লইয়া ইহারা জনযুদ্ধের নামে তাহাদের শেষ রক্ত-বিন্দুটি দিয়া যুদ্ধকার্যে সাহায্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছে; কিন্তু মালিকদের অপরিসীম লাভের সামান্যতম অংশও মজুরদের পাইতে দেয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ভোগী এই সকল ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ সেদিন শুধু তাহাদের দেশ-বাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, কম্যুনিজমের পবিত্র আদর্শকে তাহারা কলংকিত করিয়াছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোনও উপায়ে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া পরে এদেশে রুশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার একটি রাষ্ট্র গঠন করা। যুদ্ধের সময় বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহারা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল ও তাহার দ্বারা তাহাদের দল সংগঠনের সুবিধা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধের সময় যে কংগ্রেস হইতে তাহারা নিজেদের একটি আলাদা দল বলিয়া জাহির করিয়াছিল, কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবার পরেই সেই কংগ্রেসে ঢুকিয়া ক্ষমতালাভের জন্য তাহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় তাহাদের নিজেদের কথায় প্রকাশ—"আমরা জানি কংগ্রেসকর্মীদিগের মনে কম্যুনিজম-বিদ্বেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা এমন স্বদেশ প্রেমের ব্যাখ্যা করিব যে, কংগ্রেসকর্মীরা গলিয়া জল হইয়া যাইবে।" কম্যুনিষ্টদের দুর্ভাগ্য, কংগ্রেসকর্মীরা সেদিন তাহাদের কথায় জল হইয়া যায় নাই। অতঃপর কংগ্রেসে ঢুকিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিতে পারিয়া তাহারা সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করে। এই অর্থপুষ্ট দলটির প্রচারকার্যের ঢক্কে ভুলিয়া কেহ কেহ মনে করেন ইহারা কংগ্রেসে যোগদান করিলে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হইত। দুষ্ট গরু হইতে শূন্য গোয়াল যে অনেক শ্রেয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জনগণের স্মৃতিশক্তি বড় অল্প, সেইজন্য দেশের চরম দুর্দিনে কম্যুনিষ্টরা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার স্মারকলিপি হিসাবে শ্রীযুক্ত তেন্ডুলকারের সংকলিত এই পুস্তিকাটি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একখানি করিয়া রাখা উচিত।

Pakistan And Self-Determination—By Sudhir Kumar Das Gupta, Ganabani Publishing House, Calcutta. Price 8 As.

পাকিস্থান ভারতের রাজনীতিতে যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, শাসক-শ্রেণী তাহাকে স্বীয় আনুকূল্যে পুষ্ট করিয়া দেশের স্বাধীনতার পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টির সুযোগ পাইয়াছে। বস্তুত এক যুক্তিহীন লোভ ও লালসার বহিঃমুখে করিয়া পাকিস্থানের দাবী আজ শাসকের বিরুদ্ধে নয়, পরাধীনতার বিরুদ্ধে নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর কোনো স্বাধীনতাকামী দেশেই বোধ হয় আজাদীর পথে এমন গৃহ শত্রুর মাথা তোলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। এই অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে বহু বহিপুস্তক প্রণীত হইয়াছে। বহু যুক্তিতর্ক খাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু উহার দাবীদারদের নিকট কোন কিছুও কার্যকরী হয় নাই। আলোচ্য পুস্তিকাখানাও হয়ত তাঁহাদের মনে কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তবু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যাহাদের অভ্যাস আছে, এইটি তাহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি পুস্তিকাখানার গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিদ্যানিধি পঞ্জিকা—সম্বন্ধ নির্ণয় কার্যালয়, ৯৩।৪, হরি ঘোষ স্ট্রীট হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

পঞ্জিকা আচারনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রেরই নিত্য ব্যবহার্য। আলোচ্য পঞ্জিকাখানা পকেট সাইজের হইলেও, হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির প্রায় সবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্জিকাখানা হিন্দু মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ঘাড়ের ব্যথা

সুশীল রায়

ঘাড়ের ব্যথার ওপর প্রবন্ধ লেখার দরকার এর আগে কোনদিন মনে হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি এই অখ্যাত অসুখের কবলে পড়ে এর ওপর কিছু লেখার তাগিদ বোধ করছি।

বলতে পারেন, সামান্য ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে আমার এই মাথাব্যথা কেন, এটা এমন কি অসুখ যে, তাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তার গুণ-কীর্তন করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কীর্তনীয়া নই, গুণকীর্তন করতে আমি বসিনি।

ডিক্সনারী খুঁজে ঘাড়ের ব্যথা বলে কোন রোগের নাম পেলাম না। যক্ষ্মা আছে, নিউ-মোনিয়া আছে, হাঁপানী আছে, কটিবাত আছে, এমনকি চুলকানি পর্যন্ত আছে। কিন্তু ঘাড়ের ব্যথা নেই। মনে হচ্ছে, অভিধানকারের কোনদিন ঘাড়ের ব্যথা হয়নি। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যে তাঁর হয়েছে—এমন কথা অবশ্য বলছি নে। যক্ষ্মারা নামকরা রোগ, তাদের নাম অভিধানে থাকতে তাই বাধা। অন্ততঃপক্ষে অভিধানস্থ করার জন্যে ঘাড়ের ব্যথার একটি নামকরণ তবে করা দরকার। এ-রোগকে এমন অখ্যাত ও অপাংক্তেয় করে রাখার কোন মানে হয় না। বহুদিন ধরে উপেক্ষা করেও যখন এ রোগকে দমন করা গেল না, তখন একে স্বীকার করে নিতে বাধা কি ? রোগের তালিকায় এর নাম যোগ করে নেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। এ-রোগের কোন নাম নেই, বুঝবার জন্যে আমরা একে ঘাড়ের ব্যথা বলে উল্লেখ করে থাকি মাত্র। বুকের মধ্যে অদৃশ্য বীজাণুরা যখন চাক বেঁধে হৃৎপিন্ড কুড়ে কুড়ে খেতে আরম্ভ করে—আমরা সেই সম্মিলিত কর্মব্যস্ততার নাম দিই যক্ষ্মা। অনুরূপ অদৃশ্য আক্রমণ যখন ঘাড়ে এসে কামড় দিয়ে বসে, তখন তাকে শুধু মাত্র ঘাড়ের ব্যথা বলে উল্লেখ করবো কেন। ভাষাবিদ্ ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাই বাধ্য হচ্ছি।

রোগটা বেশ মজার। ঠিক কোন্ জায়গাটায় ব্যথা, বোঝার উপায় নেই। আঙুল দিয়ে এক জায়গা টিপে ধরলে মনে হয়, আঙুলের তলা থেকে পিছলে ব্যথাটা দু' ইঞ্চি তফাতে পালিয়ে গেছে। দু' ইঞ্চি তফাতে তাকে তাড়া করলে আবার সে সেখান থেকে ছিটকে যথাস্থানে ফিরে আসে। যতই বলি, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, ততই সে এমনিধারা লুকোচুরি খেলতে থাকে। ব্যথাটাকে ঠিক বাগিয়ে ধরতে পারিনি। একি অদ্ভুত রসিকতা, ঠিক বুঝিনে। যদি ধরা না-ই দেবে, তবে এমন স্কন্ধে এসে ভর করা কেন। জানিনে হয়ত আধুনিক প্রণয়লীলাই এমনি।

কয়েকদিন খুব কষ্টে কাটানো গেল। খাচ্ছি দাচ্ছি, চলছি ফিরছি—কিন্তু বড় সাবধানে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা করতে হচ্ছে। ডানে বাঁয়ে তাকাবার উপায় নেই। চোখের দৃষ্টি সব সময় সোজা রাখতে হচ্ছে। এর একটু ব্যতিক্রম হলেই ব্যথাটা সরোষ আক্রোশে ঘাড়ে কামড় দিয়ে বসছে। কামড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে অসাড়, চোখের দৃষ্টি হয়ে আসছে ঝাপসা। অথচ বাইরে থেকে আমাকে দেখুন, বুঝবেন না কী অন্তর্দাহে আমি জ্বলছি। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে প্রেমে পড়া আর প্রেমে পোড়া অনেক সহনীয় হয়তো। অসহ্য যন্ত্রণায় ভেতর ভেতর ছটফট করছি—এক এক সময় দম আটকে এসেছে। কী এর ওষুধ ? এর আবার ওষুধ কি ! এ যখন একটা রোগ নয়, তখন এর ওষুধের প্রশ্ন ওঠে কি করে ? আগে রোগের জন্ম, তার পরেই-না তার প্রতিষেধকের উৎপত্তি ! এ-রোগের জন্ম হয়ত হয়েছে আদিম কালেই, কিন্তু একে তোয়াক্কা করেনি কোন বৈদ্যশাস্ত্রী, তাই এর ভেষজও আবিষ্কৃত হয়নি আজ পর্যন্ত। শুভানুধ্যায়ীরা বললেন, বালিশ রোদে দাও ! হাসি পেলো। অসুখ হল ঘাড়ে, আর রোদে দেব বালিশ। হোঁচট খেলাম পায়ে, আর নাকের ডগায় দেব মলম ! তথাস্তু। বালিশই রোদে দেওয়া গেলো। ফল হল না কিছু। ফলের কোন প্রত্যাশাও অবশ্য করিনি।

যন্ত্রণায় এক এক সময় এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি যে, কাঁদবো না হাসবো—ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তাই এই দুটি প্রক্রিয়াই পরীক্ষা করে দেখেছি। বুঝেছি, ঘাড়ের ব্যথায় এ দুটি কাজ করা নিষেধ। কাঁদতে বা হাসতে গেলে শরীরে যে সামান্য আন্দোলন হয়, তাতেই ঘাড় টনটন করে ওঠে আরো। কাঁদা বা হাসার একটা মাঝামাঝি পথ আবিষ্কার করার জন্যে তাই ব্যগ্র হয়ে উঠতে হলো। সে পথ বড় বন্ধুর পথ, সেটার নাম সোজা রাস্তা। একটু বাঁকাচোরা রাস্তা একটু কাঁদা-হাসার চেষ্টা ঘাড়ের ব্যথার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক।

হাঁটা-চলায় যদি এত বিধিনিষেধ, তাহলে শয্যাশায়ী হওয়াই হয়ত ভালো। তাই চিৎপাত হয়ে শুতে গিয়েই, উঃ, মেরুদন্ড বেয়ে ঘাড়ের ব্যথাটা সারা শরীর ছড়িয়ে পড়লো। হাত নাড়তে পারিনে, পা টান করতে পারিনে—ভয় হয়, হাত-পা নাড়তে গেলেও ঘাড়ের ব্যথাটা আবার প্রবলভাবে প্রতিবাদ করে উঠবে হয়ত। তবে যাই কোথায়, করি কি ! চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে হাত-পা সুবিধামত ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে রইলাম চুপচাপ। কিন্তু একভাবে এরকম পড়ে থাকাই-বা যায় কতক্ষণ ! বাঁ-পাশে ফেরা চলবে কি না, চুপি-চুপি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম, উঁহু, ব্যথাটা সজাগ আছে, তাকে ধাপ্পা দেওয়া চলবে না। আবার একটু পরে ডানপাশে ফিরতে গিয়ে এমন প্রচন্ড কামড় খেলাম ঘাড়ে, জীবনে সে-যন্ত্রণার কথা ভুলবো না। আজ আরাম হয়ে গিয়েছি, তবুও সে-যন্ত্রণার কথা মনে হলে আজো শিউরে উঠি।

আমার বিছানার মাথার দিকেই ঘর থেকে বেরবার দরজা। দরজার ওপারে ছোট একটা ঘর। এ-ঘরটা আমার শোবার ঘর থেকে এক ফুট আন্দাজ নীচু। ছোট ঘরটায় আমি বসি। ইজিচেয়ার, মোড়া আর খবরের কাগজের রাজত্ব এ ঘরে। বিছানায় অনেকক্ষণ নজরবন্দী হয়ে শুয়ে থাকবার পর ইচ্ছে হলো পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসবো। অনেকক্ষণ শোবার পর একটু বসলে হয়ত আরাম পাওয়া যাবে মনে করে ওঠবার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করলাম। বাঁ হাতে ভর দিয়ে, ডান হাতে ভর দিয়ে, দুহাতে একসঙ্গে ভর দিয়ে নানাভাবে উঠতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, কোনভাবে ওঠাই ব্যথাটা পছন্দ করছে না, বারবারই ঘাড় ধরে আমাকে শুইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু উঠতে আমাকে হলো, অনেক কষ্ট স্বীকার করেও উঠে বসলাম।

এত সমীহ, এত সম্ভ্রম জীবনে কখনো কাউকে করিনি। অতি সন্তর্পণে, ব্যথাকে একটু বিরক্ত না করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মোড় ঘুরে পাশের ঘরে যাবার কথা ভাবতেই রক্ত জল হতে লাগলো। ও-ঘরে যে যাব, কিন্তু নামবো কি করে ও-ঘরে ! নামতে গেলেই যে ঘাড়ে ঝাঁকি লাগে ! তার ওপর কাগজপত্র আর মোড়ার পাশ কাটিয়ে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসাটাও ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার সামিল মনে হতে লাগলো। যা ভেবেছি, তাই। এক ফুট নামতে গিয়ে ঘাড়ে এমন ঘা খেলাম, চোখ অন্ধকার হয়ে গেলো, সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলো —মনে হতে লাগলো যেন পাতালে নামছি।

চেতনা ফিরে আসার পর সম্মুখে দেখলাম, ইজিচেয়ারটি কোল বাড়িয়ে বসে আছে—অদূরেই। প্রকৃতপক্ষে এ-দূরত্ব দূরত্বই নয়, কিন্তু আমার মনে হলো দূর চন্দ্রলোকে যেন আমার এ-আসনটি পাতা। এ-আসনে পৌঁছতে হলে আমাকে বহু শ্রম, বহু সাধনা, বহু বিজ্ঞানচর্চা যেন করতে হবে। ঠিক তাই। অনেক সাধনার পর ইজিচেয়ারে বসলাম। এ-আসনে বসবার জন্যে যে-মেহনত করতে হয়েছে, তার আর পুনরুক্তি করতে চাইনে। বলা বাহুল্য, বসেও শান্তি পেলাম না।

শান্তি তবে কিসে ? হাসা-কাঁদা, চলা-বলা সব বন্ধ; শোওয়া-বসাও কষ্টকর। ঘাড়ের ব্যথার রুগী তবে করবে কি? অগত্যা একটু পড়ার চেষ্টা করলাম। চোখের সামনে ধরলাম খবরের কাগজ। লাইনে লাইনে চোখ বুলানো মুস্কিল, চোখের সামনে তাই লাইনগুলো বুলিয়ে নিতে হলো। এক কথায়, ঘাড় এক চুল ফেরাবার উপায় নেই। চোখের দৃষ্টি ঠিক একটি বিন্দুতে স্থির রেখে খবরের কাগজকে ঠিক সেই বিন্দুর ওপর টেনে এনে পৌঁছে দিতে হচ্ছিলো। এভাবে অধ্যয়ন হয় না; তার ওপর খবরের কাগজকে টেনে টেনে বেড়াবে যে-হাত, তা-ও আবার সংযুক্ত ঘাড়েরই সঙ্গে। এতে ঘাড়ে টান লাগার কথা, ঘাড়েরও এই এতে আপত্তি করার আইনসঙ্গত কারণ আছে। সবই যদি আইন-সঙ্গতভাবে চলবে, তাহলে ঘাড়ের ওপর এ বে-আইনী আক্রমণ কেন। এর কোন বিচারক নেই।

ব্যথাকে বেকুব করার আর কোনও উপায় না পেয়ে ইচ্ছে হ'লো ছিঁড়ে ফেলি এই ঘাড়। তাহ'লেই সে আমাকে ছাড়তে বাধ্য হবে। আমাকে না ছাড়ুক, আমার ঘাড়কে ছাড়তে বাধ্য তাহ'লে হবেই। কিন্তু ছিঁড়বো কি, ছেঁড়ার জন্যে যে শক্তি দরকার, তা প্রয়োগ করার সামর্থ্যই এখন আমার নেই যে! কৌশল জানে বটে এই ব্যথা। সামান্য একটু জায়গায় আধিপত্য নিয়ে সে আমার সমগ্র শরীরটাকে করতলগত ক'রে ফেলেছে। এরি নাম বুঝি স্ট্রাটিজি! বুদ্ধি আছে বটে তার, কোথায় গিয়ে কামড়ে দিলে একেবারে বেকায়দায় ফেলা যায়, জানা আছে তাহ'লে। বুদ্ধির্যস্যই বটে! আমাকে একেবারে বেকুব বানিয়ে ছেড়েছে।

ঘাড় সিধে ক'রে বরাবর সোজা রাস্তায় তবু চলা যায়। তাই, কোথাও বেরতে হ'লে আগেই যাবার রাস্তাটা মনে মনে ছ'কে নিতাম। বাঁকচোর যত বর্জন করা যায়, চলতে সুবিধে তত। ঘাড়ের ব্যথা বাঁকাপথ বরদাস্ত মোটেই করে না। জানিনে, হয়ত সামান্য এই শিক্ষাটা দেবার জন্যেই সে আমাকে আক্রমণ ক'রে থাকবে।

কিন্তু আমি বলি কি, এত লোক থাকতে আমি কেন। বাঁকাপথে কে না চলছে, শিক্ষাটা তাদেরও তো দেওয়া দরকার। তা ছাড়া, বাঁকা-পথ সোজাপথ নিয়ে ঘাড়ের ব্যথার এত মাথা-ব্যথাই-বা কেন। পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড় পেতে নেবার দরকারটাই-বা কি। এই আপন-মোড়লত্ব ক'রে তার কি প্রয়োজন।

আমার তো মনে হয়, এই ঘাড়ের ব্যথা রোগটা যক্ষ্মারই কোনও জ্ঞাতিকুটুম্ব হবে। হাড়ের যক্ষ্মা ব'লে এক রকম রোগের কথা শুনেছি, ঘাড়ের যক্ষ্মা আজো শুনিনি অবশ্য। যাই হোক, এর হাত থেকে সম্প্রতি আমি রক্ষা পেয়েছি, বহুদিন বাদে চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দুনিয়াটা দেখার সৌভাগ্য আজ হ'য়েছে। চার দিক দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হ'লো—ঘাড়ের ব্যথা রোগটা একটা দরকারী রোগই বটে। আজকাল সবাই সোজা রাস্তার চেয়ে বাঁকা পথেরই যেন বেশি পক্ষপাতী হ'য়ে প'ড়েছে। কলকাতা থেকে কাশ্মীর যেতে হ'লে কেপ্-কমোরিন দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে সবাই—ব্যাপার অনেকটা এই রকম দাঁড়িয়েছে। আমার তো মনে হয়—সমগ্র দেশবাসী না হ'লেও দেশের যাঁরা মাথা, তারা একবার আমার মত শোচনীয় অবস্থায় যদি পড়তেন সব জটিলতা বর্জন ক'রে একটা সুস্থ ও সহজ রাস্তা আবিষ্কারের চেষ্টা তাহ'লে হয়ত হতো। আমাকে আক্রমণ করাটা ঘাড়ের ব্যথার একটা ব্যর্থ আক্রমণ হ'য়েছে।
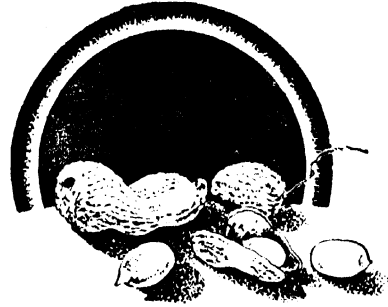
বিলাত হইতে আগত মন্ত্রিত্রয় ও বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের মীমাংসার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া আপনারা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি গঠনের সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থান রচনা তাঁহারা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন; কারণ পাকিস্থান রচনার সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদত্ত করা যায়, পাঞ্জাব ও বাঙলা সম্বন্ধে তাহার বিপক্ষেও সেইরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়। পশ্চিম বঙ্গের কয়টি জিলায় ও কলিকাতায় মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ—সে সকল জিলা মুসলমান প্রধান জিলাগুলির সহিত যুক্ত করিয়া পাকিস্থান রচনা করা হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার। ইহা জানিয়াও মিঃ জিন্না অসংগত ভাবে আবদার করিয়াছিলেন যে, পাকিস্থানকে পূর্বাঞ্চলে আর্থিক হিসাবে সবল করিবার জন্য হাওড়া ও হুগলী জিলা দুইটি ও কলিকাতা পাকিস্থানে দিতে হইবে। দেশরক্ষা হিসাবেও যে পাকিস্থান রচনা বিপজ্জনক তাঁহারা তাহাও দেখাইয়াছেন।

কিন্তু ভেদ-নীতির বশে এ দেশের ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদিগকে অসংগত অধিকার দিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে সহসা তাহাদিগকে এ কথা বলাও সংগত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই যে, গণতন্ত্রের মূল নীতি অনুসারে যখন মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ব্যতীত আর কিছুই পাইতে পারেন না, তখন তাঁহাদিগকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অর্থাৎ লর্ড মিণ্টো যে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মুসলমানগণকে সংখ্যানুসারে বিবেচনা না করিয়া অন্য কারণে তাঁহাদিগের গুরুত্ব বিবেচনা করিতে হইবে—তাহা অসংগত। সেই জন্য তাঁহারা পাকিস্থানের বিচারে অযথা সময় ও স্থান প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম কথা—কোন কোন প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশত্রয় সম্বন্ধে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসীরা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন সঙ্ঘে যোগ দিতে অসম্মত। পাঞ্জাব ও বাঙলা—গত লোক গণনায় মুসলমানপ্রধান দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই লোক গণনা যে অজস্র ত্রুটিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কথা—সচিবত্রয়ের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের গত নির্বাচনে মুসলিম লীগ অধিক সংখ্যক মুসলমান আসন লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বলিতেই হইবে—নির্বাচন যেরূপ অনাচারপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে অধিক কথা না বলাই ভাল—সে নির্বাচন ফলে নির্ভর করা যায় না।

তৃতীয় কথা—ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ গঠন কখনই সমীচীন নহে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা ইতিহাসের শিক্ষার বিরোধী বলিয়াও যেমন মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-পদ্ধতিতে তাহাই কায়েম করা হইয়াছিল, তেমনই এবার পাকিস্থান অসম্ভব বলিয়াও মন্ত্রিত্রয় প্রদেশগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপত্তিজনক। তাহাতেই পাকিস্থানের দিকে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হিসাবে তাঁহারা বাঙলা ও আসাম এক সংঘভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আসাম ইতিমধ্যেই তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে এক সঙ্ঘের এবং আসামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে আর একটি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা যে গণতন্ত্রানুমোদিত হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। সে বিষয়ে প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

বাঙলায়, অধিক না হইলেও, দুইটি সামন্ত রাজ্য আছে—কুচবিহার ও ত্রিপুরা। এই দুইটিই হিন্দুপ্রধান। ইহাদিগকে কি ভাবে সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই।

এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, পাকিস্থান পরিকল্পনানুসারেই গত লোক গণনায় ও গত নির্বাচনে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষেও যে মুসলিম লীগ সচিবসংঘ সাম্প্রদায়িকতার জন্য কর্তব্যে অবহেলা করায় লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলিয়াছেন।

মিঃ জিন্নার অসংগত দাবী বাঙলার মুসলমানদিগকে কিরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা একটি ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের অনুগ্রহদত্ত অর্থে পুষ্ট একখানি সংবাদপত্র বাঙলা ও আসামকে 'পূর্ব পাকিস্থান' ধরিয়া লইয়া আপনাকে সেই 'পূর্ব পাকিস্থানের' মুখপত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া হাস্যোদ্দীপনও করিয়াছিলেন।

বাঙলায় মধ্যে মধ্যে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহাও ভুলিবার নহে। এক মুসলিম সচিব সঙ্ঘের সময়ে ঢাকায় যে হাঙ্গামা হয়, তাহাতে বহু হিন্দু সামন্ত রাজ্য ত্রিপুরায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান জন্য বাঙলার তৎকালীন গভর্নর স্যার জন্ হার্বার্ট ত্রিপুরার মহারাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন।

গত ১৭ই মে মন্ত্রিগণের বিবৃতির কতকগুলি প্রস্তাবের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে একদল মুসলমান এক শোভাযাত্রা বাহির করে এবং কতকগুলি দোকান প্রভৃতি আক্রমণ করে। তাহারা "লড়কে লেংগে পাকিস্থান" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহারা কাহার সহিত "লড়িবে" তাহা জানা যায় না—হয়ত শান্ত হিন্দু প্রতিবেশীদিগের উপর অত্যাচারই তাহারা "লড়াই" বলিয়া মনে করে। চট্টগ্রামে এই হাঙ্গামা সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তথায় মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট চলিয়া যাইতে বলিলেই জনতা শান্তভাবে চলিয়া যায়। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি পূর্বাহ্নেই কেন শোভাযাত্রা নিবারণের ব্যবস্থা করেন নাই? আর জনতা যখন কতকগুলি লোকের ক্ষতি করিয়াছে, তখন অপরাধীদিগকে দণ্ডদানের ও শোভাযাত্রার আয়োজন ও পরিচালনকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কোন চেষ্টা হইয়াছে কি? মন্ত্রিত্রয়ের বিবৃতির ফলে যদি কোনরূপ হাঙ্গামা হয়, সেইজন্য নানাস্থানে সতর্কতা অবলম্বনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে কি তাহা হয় নাই?

মুসলিম লীগ বলিয়াছিলেন, তাঁহারা "পাকিস্থান" না পাইলে ভারতবর্ষের জন্য যে শাসনপদ্ধতি রচিত হইবে, তাহাতে সহযোগ করিবেন না। এখন লীগ কি করিবেন এবং অন্তর্বর্তী সরকারেও যোগ দিবেন কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। মিস্টার জিন্না যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সে সকল রক্ষা করিবেন কি না, অর্থাৎ রক্ষা করা মুসলমানদিগের পক্ষে কল্যাণকর বিবেচনা করিবেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে মুসলমানগণ যদি মনে করেন, উপদ্রবের দ্বারা তাঁহারা অসংগত অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, তবে তাহা যেমন হিন্দুদিগের পক্ষে তেমনই তাঁহাদিগেরও পক্ষে অকল্যাণকর হইবে।

সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য বিদেশী শাসকদিগের আগ্রহের কোন সংগত কারণ আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, কোন সভ্য দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থহানি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না—কারণ সেইরূপ কার্যে তাঁহারাও বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন।

যখন রাজনীতির ও শাসনতন্ত্রের গণ্ডি হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে হয়—তখন সকল সম্প্রদায়কে এই সত্য অনুভব করিতে হয় যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি যেমন সম্প্রদায় বিশেষেরই অপকার করে না, তেমনই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, শিল্প—এ সকল সমস্যার সমাধান সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা হইতে পারে না এবং সমাধানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হইয়া থাকেন।

বৈদেশিকী

প্যারিসে পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে বাত-বিতণ্ডা বিতর্কের মূল বিষয়ে সিদ্ধান্তের পরিমাণ এত কম এবং অসন্তোষজনক যে যাঁহারা শীঘ্র শান্তিবৈঠকে সন্ধিপত্র রচনা এবং স্বাক্ষর আশা করিতেছেন তাঁহারা হতাশ হইবেন। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডন বৈঠকে সচিববর্গ কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। তখন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন অক্টোবরে লণ্ডনে না হউক এপ্রিল-মে মাসে প্যারিসে তাঁহারা একমত হইতে পারিবেন এবং সন্ধিপত্র রচিত এবং গৃহীত হইবে। কিন্তু দেখা গেল সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লণ্ডনে প্যারিসে কোন তফাৎ নাই এবং ১৯৪৫ সালের অক্টোবরের সঙ্গে ১৯৪৬ সালের মে মাসের খুব তফাৎ নাই। জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং ইতালি এই তিনটি দেশ সংক্রান্ত ব্যাপার এত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাদের সম্বন্ধে চতুঃশক্তির সচিবগণের মতানৈক্য এত বেশি যে, তাঁহারা যে কবে একমত হইয়া সন্ধিপত্র রচনা করিতে পারিবেন তাহা বলা শক্ত। যে কারণেই হউক বিলম্ব ঘটাইবার দিকে উৎসাহ হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার এবং চটপট কাজ সারিবার আকাঙ্ক্ষা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। বার্নেস মহাশয় চাহিয়াছিলেন আগামী ১৫ই জুন শান্তিবৈঠক ডাকা হোক। মিঃ মলোটোভ বলিতেছেন, আহা-হা এত তাড়াতাড়ি কেন, একটু ধৈর্য ধরিয়া আগে সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে আমরা একমত হই এবং সর্তের একটা মিলিত খসড়া রচনা করি, তারপর শান্তি-বৈঠক ডাকিলেই চলিবে। ইতিমধ্যে বরং আগামী ৫ই জুন আবার একটা পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক ডাকা যাইবে এবং সেই বৈঠকে আমাদের সহকারিগণ ইতিমধ্যে খসড়া প্রস্তুত কার্যে কতদূর অগ্রসর হইলেন তাহা বিচার করা যাইবে। ব্রিটিশ মন্ত্রী বেভিন ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেছেন শান্তিবৈঠক ডাকিতে আপত্তি করার অর্থ হইতেছে যে সমস্ত জাতি যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মত প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া। একটা মাঝামাঝি পন্থা হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, শান্তিবৈঠকে যে সমস্ত খসড়া প্রথম উপস্থিত করা হইবে সেগুলি পূর্বাহ্নেই চতুঃশক্তিসম্মত না হইলে ক্ষতি নাই, শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সময় চতুশক্তি সম্মত হইলেই হইল, খসড়া সম্বন্ধে একমত হওয়ার অপেক্ষায় শান্তিবৈঠকের অধিবেশন পিছাইয়া দেওয়া কোন কথা নয়। এইসব বাদানুবাদের ফলে অবশেষে মোটের উপর ফরাসীসচিবের প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইল। তিনি বলিলেন, ১৫ই জুন আবার পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক বসুক, আবার সন্ধিপত্রের খসড়া রচনা করিবার চেষ্টা চলুক এবং পররাষ্ট্রসচিবদের ঐ বৈঠকে স্থির হোক শান্তিবৈঠক কবে বসিবে। মিঃ বার্নেস ইহা মানিয়া লইয়া শান্তি-বৈঠকের তারিখ ১লা অথবা ১৫ই জুলাই যাহাতে হয় তজ্জন্য সুপারিশ করিলেন।

শান্তিবৈঠকের তারিখ লইয়াই যেখানে এত মতভেদ, আসল ব্যাপারে অর্থাৎ সন্ধির সর্ত স্থিরীকরণে যে নিদারুণ তর্কাতর্কি চলিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ইতালির উপনিবেশ সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়া ইতি-পূর্বে জানাইয়াছিলেন যে, ট্রিপলিটানিয়ার প্রতি রাশিয়ার দৃষ্টি আছে, ওখানে রাশিয়া ট্রাস্টী হইতে চায়। তাহার জবাবে বৃটেন বলিয়াছিল যে, ইহার অর্থ 'আমার গলার অগ্রভাগে তোমার ছুরি আস্ফালন করা।' সৌভাগ্যের বিষয় মলোটোভ মহাশয় ট্রিপলিটানিয়ার প্রতি রাশিয়ার দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন। তিনি এবিষয়ে ফরাসী প্রস্তাব অর্থাৎ ট্রিপলিটানিয়ায় ইতালিই ট্রাস্টী হোক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বেভিন সাহেব বলিয়াছেন যে, ট্রিপলিটানিয়ায় যদি ইতালি ট্রাস্টী হয় তবে সিরেনাইকায় ব্রিটিশ ট্রাস্ট মানিতে হইবে। সিরেনাইকার সেনুসী জাতিকে নাকি যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে সিরেনাইকায় ইতালি জাতিকে আর প্রভুত্ব করিতে দেওয়া হইবে না। অতএব ব্রিটিশ প্রভুত্ব তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। জবাবে মলোটোভ বলিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ-প্রতিশ্রুতি পড়িয়াছেন কিন্তু তাঁহার বেভিনকৃত ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেন না। আবার পাল্টা জবাবে বেভিন বলিয়াছেন যে, মলোটোভকৃত ভাষ্যও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। এই ত হইল ইতালির উপনিবেশ সম্বন্ধে। যে সমস্ত প্রস্তাব হইয়াছে তাহা পররাষ্ট্র-সচিবদের সহকারীদের অভিনিবেশ সহকারে বিচার এবং বিশ্লেষণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইতালির সম্বন্ধে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় দাবী হইতেছে ১০ কোটি ডলার। আমেরিকার ডেলিগেট বার্নেস সাহেব এই দাবী স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তর্ক উঠিয়াছে টাকাটা কিভাবে আদায় করা হইবে। বার্নেসের মতে টাকাটা আদায় করা উচিত (১) বিদেশে ইতালির সম্পত্তি হইতে (২) অস্ত্রকারখানায় বাড়তি যন্ত্রসামগ্রী হইতে, (৩) বাণিজ্য জাহাজ এবং যুদ্ধ জাহাজ হইতে। মলোটোভ আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, যুদ্ধ-জাহাজে তো লুটের সামগ্রী, তাহা তো এমনিই রাশিয়ার অংশত প্রাপ্য, যুদ্ধক্ষতিপূরণের অঙ্ক ইহার বাইরে। উত্তপ্ত হইয়া বার্নেস জবাব দিয়াছেন, যুদ্ধে লুটের মাল প্রাপ্য তাহারই যে লুট করিতে পারে। ইতালির যুদ্ধ-জাহাজ একটিও রাশিয়া যুদ্ধে অধিকার করিতে পারে নাই, অতএব লুটের মালে ভাগ বসাইবার অধিকার তাহার নাই। লুটতরাজে সিদ্ধহস্ত তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক বৃটেন সর্বান্তঃ-করণে আমেরিকার এই জবাব সমর্থন করিয়াছেন। নৌবাহিনী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কমিটি ইতালিকে ৪৫টি নৌজাহাজ রাখিতে দিতে রাজী হইবার সুপারিশ করিয়াছেন, বাকীগুলি অবশ্য লুটের মাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে ইতালির সম্পূর্ণ নৌবহর ১৯৪৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাল্টায় ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার পর যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে। ইহাই হইল উপকারের প্রত্যুপকার!

জার্মানী সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রস্তাব ছিল, চতুঃশক্তিবর্গ একটি ২৫ বৎসর ব্যাপী চুক্তিতে আবদ্ধ হউন যাহাতে সম্মিলিতভাবে তাঁহারা জার্মানীর নিয়ন্ত্রীকরণ ঘটাইতে পারেন এবং পুনরায় জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা নির্মূল করিতে পারেন। সোভিয়েট রাশিয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে রাজী নহেন। তাঁহার মতে ইতিমধ্যে জার্মানী কতখানি নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছে তাহা আগে জানা প্রয়োজন। ৪ জনের একটা কমিশন বসিবার প্রস্তাব আমেরিকার ডেলিগেট করিয়াছিলেন, এই কমিশন জার্মানীর বিভিন্ন মিত্রশক্তি অধিকৃত বিভিন্ন এলাকায় নিরস্ত্রীকরণের পরিমাণ অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবেন। এই প্রস্তাব মলোটোভ সমর্থন করিয়াছেন।

অস্ট্রিয়ার ব্যাপারও এইবেলাই পররাষ্ট্র-সচিবদের সহকারীদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হোক—আমেরিকার এই প্রস্তাব মলোটোভ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, আগে যে সমস্ত ব্যাপারে হাত দেওয়া হইয়াছে তাহা শেষ হোক, তারপর অস্ট্রিয়ার ব্যাপার ধরা যাইবে।

প্র.না.বি.র পাতা

অটোগ্রাফ

আর কিছুই নহে, একখণ্ড কাগজে একটি স্বাক্ষর মাত্র—ইহারি জন্যে কত লোক পাগল। অটোগ্রাফ আদায় করিবার নূতন এক ধরণের পাগলামি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। কোন লোক কোনপ্রকারে বিশিষ্টতা অর্জন করিলেই তাহার স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—যে ব্যক্তি ভাল ফুটবল খেলিতে পারে, যে ব্যক্তি একদৌড়ে আর সকলকে হারাইতে সক্ষম—তাঁহাদের স্বাক্ষরের জন্যেও না কত আগ্রহ। যে কোন প্রকারে একবার বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারিলে আর তাহার রক্ষা নাই, সে বিশিষ্টতা যেমনি হোক, জলে-ভাসা সন্তরণ-বীরই হোক, কিংবা সাবান-গেলা সাবান-শহীদই হোক, আর গাছে চড়ায় পূর্ববর্তীদের রেকর্ডভঙ্গকারীই হোক। অমনি ছোট বড়, স্ত্রী-পুরুষ পকেট হইতে, আঁচল হইতে ছোট্ট খাতাখানি খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবেন—একটি স্বাক্ষর চাই। কোন কারণে যাহার খাতা জোটে নাই, সে এক টুকরা কাগজ আনিয়া ধরিবে—একটি স্বাক্ষর চাই। সংগ্রহকারীদের মধ্যে আবার যাহারা বেশী উৎসাহী, তাহারা শুধু স্বাক্ষরে সন্তুষ্ট নয়—দুই ছত্র বাণীও তাহাদের চাই। সে বাণী যেমনি হোক, আর যাহারি হোক—ফুটবল খেলোয়াড়ও যদি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে—তাহাতেও তাহাদের যেমন আগ্রহ—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও ঠিক তেমনি। অটোগ্রাফের খাতা মহত্ত্বের কুরুক্ষেত্র—সেখানে রথী, মহারথী, পদাতিক ও অশ্বারোহী এক ভূমিশয্যায় শায়িত। মহৎকে সম্মান প্রদর্শনের উপলক্ষে মহত্ত্বের এমন অপমান আর কোথাও দেখা দিয়াছে কি?

আসল কথা, প্রাকৃতজনের কাছে মহত্ত্বের বিশেষ মূল্য নাই, বিশিষ্টতা মাত্রই তাহাদের কাছে সমমূল্য। সংসারে কোনরকমে খানিকটা কোলাহল সৃষ্টি করিতে পারিলেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই কোলাহলের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ সব সময়ে সম্ভবপর নয়—স্বকালের মধ্যে তো নয়-ই, কাজেই সেদিক দিয়া চেষ্টাই হয় না—নির্বিচারে সকলের স্বাক্ষর খাতায় গাঁথিয়া রাখা হয়—তারপরে সম্পূর্ণ নির্বেদ। মহাকালের উপরে যে ভার অর্পিত—মহাকাল কিছুদিনের মধ্যেই খাতাখানি লুপ্ত করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দেন।

অনেক সময়ে ভাবিয়াছি অটোগ্রাফ আদায়ের মূলে রহস্যটা কি? বীর-পূজার ভাব? বিশিষ্টতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন? না, আর কিছু! আমরা যে আগের চেয়ে এখন বেশী বীরপূজক হইয়া উঠিয়াছি বা বিশিষ্টতার প্রতি বৈষম্য যে বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণ মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই ইহা অর্থহীন হুজুগ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অটোগ্রাফের একটা বিশেষ দ্যোতনা আছে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ মহত্ত্বকে, বিশিষ্টতাকে সম্মান করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। মহত্ত্বের সহিত ভীতির কণ্টক যদি সংযুক্ত না থাকিত, তবে হয়তো মানুষ মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইলেও হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়। এখন ভীতিকে বাদ দিয়া মহত্ত্বকে গ্রহণের যে সহজতম পন্থা মানুষে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারি নাম অটোগ্রাফ। মরা-বাঘের মুণ্ড, বা নিহত মহিষের শিং মানুষ যেমন নিশ্চিন্তভাবে বৈঠকখানায় ঝুলাইয়া রাখে—মহাপুরুষের অটোগ্রাফও ঠিক সেই মনোভাব হইতে সংগৃহীত ও রক্ষিত। অর্থাৎ ইহাতে মহত্ত্বের 'চিহ্ন' আছে—কিন্তু মহত্ত্বের কঠোরতা নাই, মহত্ত্বের প্রতি ক্লীবের সম্মানের ভাব আছে—কিন্তু বীরের ভীতির সম্মুখীন হইবার পরীক্ষা নাই—ইহা যেন একপ্রকার মহত্ত্বের আমসত্ত্ব, মহত্ত্বের নির্যাস রৌদ্রে শুকাইয়া বাক্সে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রয়োজনমতো বাহির করিয়া চাখিলেই হইল—গন্ধে ও স্বাদে আমের আভাস দেয় বটে।

যে কোন কারণেই হোক, যাহার মাথা একবার সহস্রের ভিড়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। একবার কোন রকমে তাহাকে চিনিতে পারিলে অটোগ্রাফ-আমসত্ত্ব সংগ্রাহকের দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। স্থান, কাল, পাত্রের বিচার নাই। রেলের স্টেসনই হোক, আর রেস্তোঁরাই হোক, স্বদেশ হোক কিংবা বিদেশ হোক—সময় হোক আর সময় না-ই হোক, তোমার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িবে। তুমি যদি অস্বীকার করো, তাড়া দাও, কটু কথা বলো, তবে তাহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যাইবে। পাঠক, জীবনে যদি সুখী হইতে চাও, তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিও তোমার মাথা যেন আর দশজনের মাথাকে কখনও ছাড়াইয়া না ওঠে।

মনে করো কলিকাতার কাজের কৃপণ মুষ্টি হইতে একটা দিনের ছুটি ছিনাইয়া লইয়া দুইশত মাইল দূরবর্তী এক বন্ধুর সঙ্গে কিংবা বন্ধুনীও হইতে পারে, সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ। সেখানে তুমি দু'চার ঘণ্টার বেশি থাকিতে পারিবে না, সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে। বিকালবেলা যখন সেই দূরবর্তী স্থানে পৌঁছিলে আকাশে তখন কালবৈশাখীর অতর্কিত মেঘ উঁকিঝুঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে। বন্ধুর বাসায় পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া চা-পান করিয়া দুইজনে যখন মুখোমুখি বসিলে—কালবৈশাখীর ঝড়, লাল ধূলির প্রলয়-গোধূলি সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গল্পটি দিব্য জমিবে মনে করিয়া যখন মনে মনে আগাম আনন্দ অনুভ করিতেছ—তখন, সেই উদ্যত ঝড়ের আক্রম অগ্রাহ্য করিয়া একদল—হাঁ, পাঠক, তুমি ঠিকই ধরিয়াছ—একদল অটোগ্রাফ সংগ্রাহ আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথা হইতে তাহার শুনিয়াছে যে, একজন বিশিষ্টের আবির্ভা হইয়াছে। আর কি তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা আসিয়া সলজ্জ বিন তোমার অটোগ্রাফ যাচ্ঞা করিল, স্তম্ভি বিস্ময়ে তোমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষ করিল এবং অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব বলি লণ্ঠনের আলো উস্কাইয়া দিয়া আরও একব দেখিয়া লইল। ধরো, তুমি যদি সাহিত্যিক হ তবে তোমার রচনার সঙ্গে তোমার মূর্তি 'কপি ধরিয়া' মিলাইয়া লইল। তোমার মনে পুষ্পিত গল্পগুলোর ততক্ষণে নির্বাণ লা ঘটিয়াছে। সময় অল্প! অটোগ্রাফ শিকারী দল যাইবার আগেই নির্দিষ্ট সময়টুকু চলি গেল, কাজেই মনের গল্প মনে লইয়া তোমাকে বিদায় লইতে হইল! ফিরতি ট্রে যখন চড়িলে, তখন কাহাকে অভিশাপ দিতেছ অটোগ্রাফ শিকারীদের না নিজের অদৃষ্টকে যাহাকেই দাও—তোমার জীবন হইতে এ একটা অমূল্য সুগন্ধ স্খলিত হইয়া পড়িল আর যাহার ফিরিবার সম্ভাবনা মাত্র না পাঠক, আমার কথা শোনো—জীবনে সুখ য পাইতে চাও, তবে অটোগ্রাফ সংগ্রাহকদের ক এড়াইয়া চলিও—তাহার একমাত্র উপায় তোম মাথা যেন কিছুতেই জনতার ঊর্ধ্বে উঠি না পায়। হিমালয় উন্নত, কিন্তু অসংখ অবনতশির বিন্ধ্যই সংসারে একমাত্র সুখী হিমালয়ে অভিযাত্রীর অভাব নাই—বিন্ধ্যে অটোগ্রাফ কেহ কখনও দাবী করে নাই।

সিমলার আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিয়া যাঁহারা দুঃখে বুক চাপড়াইতেছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বিশুখুড়ো জানাইতেছেন,—"আলোচনা ব্যর্থ হয় নাই, স্বাধীনতার ঘোষণাটা শৈলশিখর হইতে না করিয়া কুতুবমিনার হইতে করা হইবে মাত্র। ইহার কারণ এই যে,—এত বড় শুভ সংবাদটার পর মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ত' করিতে হইবে সুতরাং ইহার জন্য দিল্লীর লাড্ডুই প্রশস্ত বিবেচিত হইয়াছে।"

* * *

ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশদের চলিয়া যাওয়ার অর্থ—চল্লিশ কোটি নরনারীকে তাহাদের ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া যাওয়া"—এই কথা বলিয়াছেন মিঃ চার্চিল। সুতরাং এতগুলি কাচ্চাবাচ্চার তদারক করিবার জন্যই বৃটিশ নার্সের প্রয়োজন। ইহাই হয়ত

তাঁর এই উক্তির ভাষ্য। তাঁর এই মহতী ইচ্ছাকে আমরা অভিনন্দন জানাইতে পারিতাম—কিন্তু "পুতনা"র গল্প যে আমরা ভুলি নাই।

* * *

জনসাধারণের প্রতি ভদ্রতা এবং সৌজন্যসূচক ব্যবহার করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ বোম্বাই পুলিশবাহিনীকে একটি নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা কি করিবেন জানি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে ঢাকা-ময়মনসিং-ভৈরববাজার লাইনে গুণ্ডাদের প্রতি বাংলা পুলিশ একটু মাত্রা ছাড়াইয়া "সৌজন্য" প্রকাশ করিতেছেন। সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধিটা তাহারই পুরস্কার কিনা জানি না!

* * *

বিহার কলেজের কোন এক শ্রেণীর ছাত্ররা নাকি কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে যে পরীক্ষায় পাশ করিয়া না দিলে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মহত্যা করিবে। আমরা এতকাল জানিতাম প্রেমের পরীক্ষার ব্যর্থতাতেই এই

অস্ত্র কার্যকরী হয়, লেখাপড়ার ব্যর্থতায় তা কার্যকরী হইবে কি?

* * *

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে একটি বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করিয়াছেন যে—অতঃপর দার্জিলিং মেইলে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অফিসের বেলায় ট্রামে চড়িয়া যাঁহারা
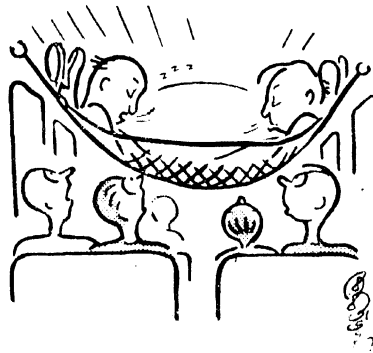
সহযাত্রীর কাঁধকে বালিশ করিয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য ট্রাম কোম্পানী যদি রেলওয়ের মত ঘুমাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন তাহা হইলে আমরা খুশী হইতাম।

* * *

আণবিক বোমা যাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহারা নাকি হিরোশিমাতে বোমা নিক্ষেপ না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া হিরোশিমার স্বর্গত অধিবাসীরা নাকি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। "বৈজ্ঞানিকদের অক্ষয় স্বর্গবাসের কামনাও হয়ত করিতেছেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জার্মাণীতে নাকি চুল হইতে খাদ্য সংগ্রহের একটি অত্যাশ্চর্য পন্থা আবিষ্কার করা হইয়াছে। ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে চালু হইলে চুলাচুলি অনিবার্য হইয়া

পড়িবে; সুকেশীদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছি।

* * *

একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী টেকচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় দিতে গিয়া প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন—"টেকচাঁদ ঠাকুর" বাংলা ভাষা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ঠাকুর বংশে; পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরটা পড়িয়া পরীক্ষক আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন কি না সেই সংবাদ অবশ্য পাই নাই।

* * *

খিদিরপুর হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত একটি খাল কাটিবার জন্য নাকি গভর্নমেণ্ট একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। খালের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যে একেবারেই অজ্ঞ সেই কথা স্বীকার করিতেছি। তবে এই কথা বোধ হয় অসংকোচে বলা যায় যে—অন্তত কুমীর আমদানির জন্য খাল কাটা হইতেছে না।

দেশের কথা

মীমাংসার চেষ্টার ব্যর্থতা—ফরিদকোট—মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব—চাউলের মূল্য—আসাম ও চর : নওয়াপাড়া—অন্তর্বর্তী সরকার সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ।

মীমাংসার চেষ্টার ব্যর্থতা—বিলাতের মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়ের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টায় যে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাহার প্রধান ও প্রবল কারণ মুসলীম লীগের দাবী—পাকিস্থান।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব—মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় গত ১৬ই মে দিল্লীতে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ঘোষিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব রোয়েদাদ নহে। প্রস্তাবে প্রথমতঃ মুসলীম লীগের দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে, ভারতবর্ষ খণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে বিভক্ত করা অসম্ভব—পাকিস্থান গঠন হইতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে যেরূপে ৩টি সঙ্ঘে বিভক্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্বের মধ্যে তাহাকে সাম্প্রদায়িকভাবে খণ্ডিত করিবার সম্ভাবনার বীজ রক্ষা করা হইয়াছে। কারণ, প্রস্তাবে প্রদেশগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ—

(১)

মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা।

(২)

পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু

(৩)

বাঙালা ও আসাম।

প্রথম দফার প্রদেশসমূহে হিন্দু প্রধান। দ্বিতীয় দফা মুসলমান প্রধান। তৃতীয় দফা মধ্যবর্তী। এই সকলের মধ্যে দ্বিতীয় দফার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত কোন সঙ্ঘে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। আসামও তৃতীয় দফায় আসিতে অসম্মত। বাঙলার সম্বন্ধে এখনও মত প্রকাশিত হয় নাই।

আরও কথা, সামন্তরাজ্যসমূহ কিভাবে কোন্ কোন্ দফায় বিভক্ত হইবে, তাহাও জানা যায় নাই।

কোন প্রদেশ কিভাবে ইচ্ছানুসারে কোন সঙ্ঘে যোগ দিতে বা কোন সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে পারিবে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রদেশসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্ভোগ করিবে অথচ প্রত্যেক সঙ্ঘের একতা রক্ষিত হইবে।

কতকগুলি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া কংগ্রেস ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন।

মোটের উপর প্রস্তাবের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ভারতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে—মহাত্মা গান্ধী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতে পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার গালাচার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়া কতদিনে বৃটিশ সেনা ভারত ত্যাগ করিবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেসকে সরকার গঠন করিতে আহ্বান করাই বিলাতের কর্তব্য ছিল। কারণ, কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রয়োজন বুঝিয়া কংগ্রেসই সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সহযোগ গ্রহণ করিতেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ মনীষী বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তাহার পর ভারতবর্ষ কি করিবে, তাহা তাহার বিবেচনা—সে যদি ৫০টি পাকিস্থান রচনা করিয়া ৫০টি গৃহযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া লয় সে তাহা করিতে পারে। তিনি বোধ হয় পাঞ্জাবের কথায় সর্দার শান্ত সিংহের উক্তি স্মরণ করিয়াছিলেন। সর্দার মহাশয় বলিয়াছেন—পাঞ্জাবে শিখরা কখনই মুসলমান প্রাধান্য স্বীকার করিবেন না—সে জন্য যদি রক্তপাত হয়, তাহাতে দুঃখ কি? কারণ, দেখা গিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য গত দুটি বিশ্বযুদ্ধে খৃষ্টানরা খৃষ্টানদিগকে বধ করিতে কুণ্ঠানুভব করে নাই।

ফরিদকোট—ফরিদকোট সামন্ত রাজ্যের দরবার দমননীতি যেন আরও উগ্রভাবে পরিচালিত করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যাঁহাকে তথায় যাইয়া অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের ভার দিয়াছিলেন, তিনি রাজ্যে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তিনিই রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহাতে যে দরবার কোনরূপে দমননীতির পরিচালনে শৈথিল্য দেখাইতেছেন এমন নহে।

চাউলের মূল্য—ঢাকা জিলায় স্থানে স্থানে চাউলের মূল্য ৩৫ টাকা মণ হইয়াছে। অবশ্য ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন চাউলের মণ একশত টাকা হইয়াছিল, তখনও যিনি তাহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই বা করেন নাই, সেই মিষ্টার সুরাবর্দী এবার আর অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব নহেন, পরন্তু বাঙালার প্রধান সচিব। বাঙালায় এবার আশুধানের ও বোরো ধানের ফসল যে আশানুরূপ হইবে, এমনও মনে হয় না। পাটের চাষও ভাল হয় নাই। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই আতঙ্কিত হইতেছেন।

আসাম ও চর-নওয়াপাড়া—আসামের সরকার তথায় বাঙালা হইতে গত মুসলমান কৃষকদিগের উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা করায় মুসলীম লীগের মুখপত্রসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক যে ঐ সকল বিষয়ে মুসলমানদিগের উপর কোনরূপে অনাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই—আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ এক বিবৃতিতে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি সম্মুখে বর্ষা এ সময় কাহাকেও উচ্ছেদ করিলে তাহার বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া আসাম সরকার বর্ষার সময় উচ্ছেদ বন্ধ রাখিয়াছেন।

এদিকে রাণাঘাট চর-নওয়াপাড়ায় চরে হিন্দু প্রজাদিগের উচ্ছেদের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী সরকার—মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে, তাহাতে কে কে গৃহীত হইবেন, তাহার আলোচনা চলিতেছে। মিস্টার জিন্না পাকিস্থান না পাইয়া কি করিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ করেন নাই। তিনি "অনেক চিন্তার পর" কি স্থির করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাঙালা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মনোনীত করা হইবে—শুনা যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ—মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে মুসলমানগণ "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" ধ্বনি তুলিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে—দোকানপাট নষ্টও করিয়াছে।

বর্ধমানে একটি মেলায় কোন মুসলমানের মিষ্টান্নের দোকানে সাইনবোর্ড না থাকায় হিন্দুরা দোকানীকে হিন্দুভ্রমে তাহার দোকান হইতে দেবসেবার জন্যও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া দোকানে দোকানদারের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে বলায় বিষম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতা যেন দিন দিন বর্ধিত হইতেছে।

মুদ্রাস্ফীতির চরম পরিণতি

গত যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় মুদ্রা মূল্য কিভাবে কমে গেছে সে খবর আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির চরম পরিণতির খবর এসে পৌঁছেছে বুদাপেস্ট থেকে। সেখানকার চাষী মজুর সবার কাছেই পকেট ভর্তি নোট কিন্তু তার দাম নেই আজ কিছুই। এমন কি বুদাপেস্টের গরীব চাষীরাও

১০ হাজার পেংগোর নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে এই চাষী...

সেখানকার ১০ হাজার পেংগোর (মুদ্রা) নোট জ্বালিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাচ্ছে—এটা দেখা গেছে। যুদ্ধের বিপর্যয় এই দেশে আসার আগে—এই ১০ হাজার পেংগোর নোটের মূল্য ছিল প্রায় এক হাজার পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় পনের হাজার টাকা—আর আজ তার মূল্য আধ ফার্দিংও নয়। ২০ হাজার পেংগোর এক তাড়া নোট গুণে দিলে তবে সেখানে একটি খবরের কাগজ কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাসে ট্রামেও ২০ হাজার পেংগো গুণে দিলে তবে এক যায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়া যায়। বুঝুন ব্যাপারটা! বুদাপেস্টের সবাই আজ পেংগো ফেলে ডলার সংগ্রহ করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। বুদাপেস্ট থেকে জার্মানরা সব সোনা লুটে নিয়ে যাওয়ার ফলেই নোটের দাম এই-ভাবেই কমতে কমতে এই পর্যায়ে এসে পড়েছে। যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশেও নোটের সংখ্যা হু-হু করে বেড়েছে। তাই নিয়ে ধনীরা ধনগর্বে মত্ত—কিন্তু এ অবস্থা যে এ দেশের হবে না তা কে বলতে পারে? সোনার দাম এদেশে যেভাবে বাড়ছে তাতে এমন আশংকা করা অন্যায় হবে কি—যে এ দেশ থেকেও সোনালুট হচ্ছে ও লুটছে কারা? তা আপনারাই খোঁজ করুন।

ভয়ংকর খুনে ডাক্তার

সম্প্রতি বিদেশের এক খবরে জানা গেছে যে, গত ১৯শে মার্চ তারিখে প্যারীর কোর্টে এক চাঞ্চল্যকর খুনের মামলার বিচার সুরু হয়েছে। এই মামলার আসামী হচ্ছেন ডাক্তার মার্শে পিতিয়োত্। প্যারীর র‍্যুলেশ্যুর রাস্তার এক নার্সিং হোমে তিনি ২৭ জনকে নৃশংসভাবে অদ্ভুত উপায়ে মেরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার পিতিয়োত্ বলেছেন—২৭ জন নয়; তিনি মোট ৬৩ জনকে খুন করেছেন—তবে তিনি যাদের খুন করেছেন তারা সবাই তাঁর দেশের শত্রু, জার্মানীর গুপ্তচর বা গেস্টাপো দলের সদস্য হয়ে তাঁর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাতেই এই মামলাটির দিকে সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ডাক্তার পিতিয়োতের এই ঘোষণার মূলে যে কত-খানি সত্য আছে তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের তোড়জোড় চলেছে পুরোদমে। তবে সবাই ঐ ডাক্তারের মানুষ খুন করার ব্যবস্থা ও উপায়ের কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠছেন। ডাক্তার পিতিয়ো কিভাবে এতগুলি মানুষকে খুন করেছেন ত জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠছেন না? সাক্ষ প্রমাণ থেকে যতটুকু জানা গেছে—তাতে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, যখন জার্মানরা ফ্রান্সে ওপর চড়াও হয়ে এগিয়ে আসছিল তখন যা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে যাচ্ছিলো, ডাক্ত পিতিয়োতের চরেরা তাদের পরামর্শ দিতো "ডাক্তারের কাছে যেও তিনিই সব ব্যবস্থা ক দেবেন।" এই সব লোক সহজ বিশ্বাসে লগে পত্র ও ধন-সম্পদ নিয়ে ডাক্তারের নার্সিং হো হাজির হতো। আসা মাত্র তাদের একটা ি কোণা ঘরে নকল পাহারাওয়ালার পাহারায় বসি রাখা হতো। তারপরে একে একে ভিতরে ডে এনে ডাক্তার পিতিয়োত বলতেন—"এবার সামা একটু অনুষ্ঠান আমাদের করতে হবে, সেটা হ উরুগোয়ার বৈদেশিক সচিব পাশপোর্ট দে আগে টীকা নেওয়ার সার্টিফিকেট দেখতে চা কাজেই জামার আস্তিনটা গুটিয়ে ফেলুন—আ একটি মাত্র ইনজেকসনেই সে কাজটিকে সহজস করে দিচ্ছি।" তারপরে ইনজেকসন দি বলতেন "ব্যস্ হয়ে গেছে আপনি এখন ঐ পা ঘরটিতে অপেক্ষা করুন", তারপর সেই লোকটি নিয়ে ঢুকিয়ে দিতেন আর একটি ঘরে। সেখা বিষের ক্রিয়ায় একে একে লোকগুলির জীবন দ নির্বাপিত হলে তখন তাদের মাথা কামিয়ে জা কাপড় খুলে নিয়ে চেহারাটাকে বিকৃত করে চুপি চুপি সেইন নদীতে ফেলে দেওয়া হে নয়তো ঐ ডাক্তারের বাড়ির বিশেষ রক বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ফেলে দেহটা জ্বালিয়ে দে হোত। অভিযোগে বলা হয়েছে, অল্পবি এইভাবে ২৭ জনকে খুন করে ডাক্তার পিতিয়ে টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, কাপড়চোপড়ে প্রায় ২ ৫০ হাজার পাউন্ড মোটমাট কামিয়েছেন। ডা পিতিয়োত-এর খুনের কাহিনীতে সারা পৃ চঞ্চল হয়ে উঠেছে—দেখা যাক এর শেষ পরিণ কোথায়?

গত ১৫ই ডিসেম্বর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ উঠে যাবার পর কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও লাহোরে পাঁচশোরও বেশি নতুন চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সমগ্র ভারতে বছরে দুশোখানা ছবি তোলার মত সরঞ্জাম ও লোক-বল থাকায় আজকাল ছবি তোলা যে কি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। কলকাতার কথাই ধরা যায়—এখানে সদ্যনির্মাণ সমাপ্ত এবং নির্মীয়মান বাঙলা ছবিরই সংখ্যা বেয়াল্লিশ; এছাড়া খান কুড়ি হিন্দী ছবিও আছে। এই অর্ধ শতাধিক ছবির জন্যে শব্দমঞ্চ রয়েছে পনেরটি আর কলাকুশলী রয়েছে চোদ্দখানা ছবি একসঙ্গে তোলার মত। অর্থাৎ যা ক্ষমতা তার প্রায় চতুর্গুণ ছবি এখন এখানে তোলা হচ্ছে। কলাকুশলী ও শিল্পীদের স্বভাবতই প্রায় চতুর্গুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে অথচ সে অনুপাতে সবাই যে পারিশ্রমিক বেশি পাচ্ছে, তা নয়। এদিকে কাঁচা ফিল্ম পাওয়াও এক সমস্যা দাঁড়াচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ উঠে গেছে বটে কিন্তু মাল তো স্বাভাবিক দিনের মত আমদানি হতে পারছে না! কোডাক কোম্পানীকে এর জন্যে খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এখনকার মত অস্বাভাবিক বেশি চাহিদার কথা তারা আগে থেকে ভাবতে পারতোই বা কি করে! তাছাড়া যে রেটে দিনদিন নুতন নুতন প্রতিষ্ঠান বেড়েই যাচ্ছে তাতে সুদূর ভবিষ্যতেও কাঁচা ফিল্মের অবস্থা উন্নততর হওয়াও আশা করা যায় না। স্টুডিও অবশ্য গোটা কয়েক বাড়ছে কিন্তু সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে এসে পেঁছনোর নিশ্চয়তা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এবং এ বছরের মধ্যে নুতন কোন স্টুডিও চালু হতে পারবে বলে মনে হয় না। তারপর স্টুডিও বাড়লে কলাকুশলী নিয়ে একদফা বেশ টানা-হিঁচড়া চলবে; এখনই তা আরম্ভ হয়ে গেছে। ওদিকে ছবি তৈরী হচ্ছে বেশি সংখ্যায় অথচ সেই অনুপাতে চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়ছে না। আবার ছবির আয় কমে যাওয়ার কথাটাও ভাববার মত। এর ওপরে বিদেশী বণিকরাও প্রতিযোগিতায় আসবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে কিছুই অনুমান করা যায় না। বিচক্ষণ ব্যবসাদারদের হাতে চিত্রশিল্পটি ন্যস্ত থাকলে ক্ষেত্র প্রসারের এ সুযোগটা নষ্ট হতো না, কিন্তু এখনকার শিল্প কর্ণধাররা নামিয়ে কোথায় নিয়ে ফেলবেন সেইটেই হয়েছে আশংকার বিষয়।

নূতন ছবির পরিচয়

সরবতী আঁখে (ওয়াদীয়া মুভীটোন)—

কাহিনী-চিনাট্য-পরিচালনা : রামচন্দ্র ঠাকুর; সংলাপ : সুলতান সিদ্দীকী, সারঙ পানি; গান : পণ্ডিত ইন্দ্র, তানবীন নকবী বালম; আলোক-চিত্র : মিস্ত্রু বিলমোরিয়া, একে কদম; শব্দযোজনা : চিমনলাল পঞ্চোলি; সুরযোজনা : ফিরোজ নিজামী; ভূমিকায় : বনমালা, ঈশ্বরলাল, হরিশ, আগা, সুমতী গুপ্তে প্রভৃতি। ফেমাস পিকচার্সের পরিবেশনায় ১০ই মে মিনার্ভায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

শাস্ত্রীজী স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাই কন্যা মাধবীকে উচ্চশিক্ষা লাভে বা স্বাধীনভাবে চলায় কোন বাধা দেননি। মাধবী গ্রাজুয়েট হয়ে মহিলা মন্দিরের প্রিন্সিপ্যাল হতেই তার প্রণয়ের উমেদার দাঁড়ালো এক এক করে অনেকগুলি। সকলেই চায় মাধবীকে বিবাহ করতে। মাধবীর জীবন এরা প্রায় অতিষ্ঠ করে তুললে; ওদিকে বাড়ীতেও মাধবীর বিবাহের জন্য নিত্য নূতন পাত্র আনিয়ে তার মাও তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলছিল। মাধবীর টান ছিল মাধবের ওপর অথচ মাধব মাধবীকে চাইলেও মুখে তা প্রকাশ করতো না। ইতিমধ্যে মাতৃবিয়োগ হতে মাধব সংসার ছেড়ে এক নর্তকীর আশ্রয়ে ওঠে। মাধবীও বিপদে পড়লো। প্রণয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অন্যতম উমেদার দুর্বৃত্ত শ্রীকান্ত কৌশলে মাধবী ও মহিলা মন্দিরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শেঠজীর আলিঙ্গনাবস্থার ছবি তোলে এবং পত্র পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশ করে মাধবীকে প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে বিতাড়িত করে। কলঙ্কিনী আখ্যাত হয়ে গৃহ থেকেও মাধবী বিতাড়িত হলো। আশ্রয়হীনা হয়ে মাধবী তার প্রাক্তন উমেদারদের দোরে দোরে পাণি-প্রার্থিণী হয়ে ঘুরলে, কিন্তু আশ্রয় পেলে না। মাধবের কাছেও আশ্রয় না পেয়ে শেষে দুর্বৃত্ত শ্রীকান্তের দরজায় এসে দাঁড়াতে হলো। মাধবী এরপর শ্রীকান্তকে বিপাকে ফেলে তার দুর্নাম রটিয়ে দেওয়ার অপরাধে রিভলবার দিয়ে গুলী করতে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীকান্তের প্রণয়িনী নলিনী সামনে পড়ে শ্রীকান্তকে বাঁচিয়ে দেয়, মাধবও এসে পড়ে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে দেয়। এর পর মাধব ও মাধবীর মিলন।

প্রথম অর্ধ হাল্কা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কাহিনীটি বেশ গড়িয়ে গেছে, শেষের দিকটা চিরাচরিত ঘটনা সমাবেশে একঘেয়ে। তবুও ছবিখানি খুব খারাপ লাগে না। প্রধানত বনমালার অভিনয়ই দর্শক খুসী হওয়ার উপকরণ; মাধবের ভূমিকায় ঈশ্বরলালও নিন্দনীয় নয়। পরিচালনার মধ্যে অভিনবত্ব বা মৌলিকত্ব কিছু পাওয়া গেল না। মোটামুটি হিসেবে ছবিখানিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম পর্যায়ে ফেলা যায়।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

মিনার-ছবিঘর-বিজলীতে এ বছরের চতুর্থ বাঙলা ছবি চিত্ররূপার 'শান্তি' মুক্তিলাভ করছে এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন ভূতপূর্ব চিত্র-সম্পাদক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বাগচী সুরযোজনা করেছেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মলিনা, ফণি রায়, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, সিপ্রা, রেবা, দুলাল, অজিত প্রভৃতি।

* * *

হিন্দী ছবির সঙ্গে এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে ক্রাউন সিনেমায় লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের সামাজিক চিত্র 'কমলা' যার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লীলা দেশাই ও নন্দ্রেকর।

* * *

আগামী ৩১শে মে অন্তত দুইখানি বাঙলা ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে—প্রথমখানি হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের বহু প্রতীক্ষিত 'বিরাজ বৌ' চিত্রা ও রূপালীতে এবং অপরখানি চিত্রবাণীর দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপিত 'এই তো জীবন' শ্রী ও উজ্জ্বলায়।

বিবিধ

জ্যোতির্ময় রায় 'অভিযাত্রী' নামে যে ছবিখানি তুলছেন তার শিল্পনির্দেশনের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন শম্ভো ঠাকুর।

* * *

অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য এবারে পরিচালনায় হাত দিচ্ছেন। বাণী পিকচার্স নামক নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবিখানি তিনি পরিচালনা করবেন যার কাহিনী লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

* * *

সুরশিল্পী তিমিরবরণ আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ-এর কাহিনী অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য প্রযোজনার কাজ সুরু করেছেন। বহুকাল পরে তিমিরবরণের এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

পরিচালক কালিপদ ঘোষ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী দেবতার' চিত্ররূপ দান ক'রবেন।

* * *

সিমলার রাজনীতিক বৈঠকের অবকাশে পিপলস্ থিয়েটারের 'ধরতী-কে লাল' সম্মিলিত প্রায় সমস্ত নেতা, বৈদেশিক ও দেশীয় সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখানো হয়। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় ছবি এ সম্মানে ভূষিত হয়নি। জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং বৈদেশিক সাংবাদিকরা যেভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাতে ছবিখানি সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা পোষণ করতে হয়। তাছাড়া বাঙলার গত দুর্ভিক্ষ যখন এর বিষয়বস্তু, তখন বাঙলা দেশ ছবিখানি দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকবেই।

মিনার
ছবিঘর
বিজলী

ডসেটের
রেড-ক্রস
বার্লি
স্বাস্থ্য ও
শক্তির
উৎস
ডসেট এণ্ড কোং (ইষ্টার্ণ) লিমিটেড
১২৭-বি, লোয়ার সার্কুলার রোড :: কলিকাতা

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়া পর পর দুইটি খেলায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিতে না পারায় অনেক ক্রীড়ামোদীই দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ খেলায় ভারতীয় দল অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় সেই নৈরাশ্যজনক অবস্থার অবসান হইয়াছে। বর্তমানে সকলেই ভারতীয় দল বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক বা টেস্ট খেলায় কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাহাই দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কিভাবে শক্তিশালী দল গঠন করিতে পারেন। প্রথম দুইটি খেলা দেখিয়া তাঁহারা ভারতীয় দল বিষয় যে ধারণা করিয়াছিলেন তাহা যে নয় তাহা দেখিয়াই তাঁহাদের মনে এই আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণ যে চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকুন তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে, আমরা চাই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ইংল্যাণ্ডে যে গৌরবময় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা টেস্ট খেলার সময়ও অক্ষুন্ন থাকে। সুপরিচালনার উপরই ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব আশা করি এই বিষয় চিন্তা করিয়াই কার্য করিবেন।

ভারতীয় দলের পর পর দুইটি খেলায় সাফল্য

ভারতীয় ক্রিকেট দল তৃতীয় খেলায় সারের ন্যায় একটি শক্তিশালী দলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। কেবল খেলায় জয়লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই দুইটি নূতন ইংল্যাণ্ডের রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯০৯ সালে কেণ্টের দুইজন খেলোয়াড় ফিল্ডিং ও উলী উরস্টারের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে ২৩৫ রান সংগ্রহ করিয়া রেকর্ড করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয় এস ব্যানার্জি ও সি টি সারভাতে শেষ উইকেটে সারে দলের বিরুদ্ধে ২৪৯ রান সংগ্রহ করিয়া সেই রেকর্ড ৩৭ বৎসর পরে ভঙ্গ করিয়াছেন। ইহাদের আরও কৃতিত্ব যে, ইহারা প্রত্যেকে শতাধিক রান করিয়াছেন। পূর্বের রেকর্ড সৃষ্টিকারীদ্বয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। সেই হিসাবে ইহাও একটি নূতন রেকর্ড। ইহা ছাড়া এই খেলায় সি এস নাইডু সারে দলের প্রথম ইনিংসে পর পর তিনজনকে আউট করিয়া হ্যাট্রিকের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। ভরতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের এই অসাধারণ নৈপুণ্য ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কেন ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

চতুর্থ খেলায় ভারতীয় দল কেম্ব্রিজ দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১৯ রানে পরাজিত করে। এই খেলায় পতৌদির নবাব ও আর এস মোদী শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হাজারী, সারভাতে ও সিন্ধের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বৃষ্টি বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহ সত্ত্বেও পতৌদির নবাব ও মোদী দৃঢ়ভাবে সহিত খেলিয়া রান তুলিয়াছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই জয়লাভ আনন্দদায়ক হইলেও কেম্ব্রিজ দল হিসাবে ইহাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা চলে না। অধ্যাপক দেওধর এই খেলা সম্পর্কে যে কথগুলি বলিয়াছেন তাহা সত্যই এই খেলা সম্পর্কে উচিত উক্তি হইয়াছে বলা চলে। অধ্যাপক দেওধর বলিয়াছেন, "এই জয়লাভ প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক নহে। তবে ইহা ভারতীয় খেলোয়াড়দিগকে পরবর্তী খেলার উৎসাহ জোগাইবে। কেম্ব্রিজ দল যেরূপ খেলিয়াছে বোম্বাই বা পুণার যে কোন দল ইহা অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিত।"
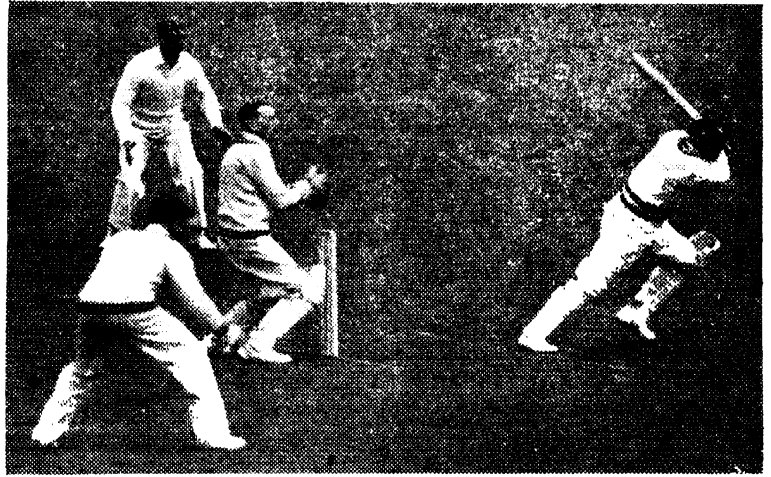
সারে ও ভারতীয় দলের খেলা

ভারতীয় দল প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। ভারতীয় দলের ৯টি উইকেট ২০৫ রান পড়িয়া যায়। ইহার পর সারভাতে ও ব্যানার্জি খেলা আরম্ভ করেন ও উভয়ে শতাধিক রান করিয়া ৪৫৪ রানে ইনিসংস শেষ করেন। সারে দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া ১৩৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। "ফলো অন" করিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩৮ রান করে। জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিতে ভারতীয় দলের একটি উইকেট পড়িয়া যায়।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় প্রথম ইনিংস :—৪৫৪ রান (সারভাতে নট আউট ১২৪, এস ব্যানার্জি ১২১, গুল মহম্মদ ৮৯, বিজয় মার্চেণ্ট ৫৩; বেডসার ১৩৫ রানে ৫টি। পার্কার ৬৪ রানে ৩টি উইকেট পান)।

সারে দলের প্রথম ইনিংস :—১৩৫ রান (ফিসলক ৬২, পার্কার ২০, সি এস নাইডু ৩০ রানে ৩টি, এস ব্যানার্জি ৪২ রানে ২টি, মানকড় ৮ রানে ২টি ও হাজারী ২০ রানে ২টি উইকেট পান)।

সারে দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—৩৩৮ রান (আর গ্রিগারী ১০০, ফিসলক ৮৩, এ বেডসার নট আউট ৩০, বিনু মানকড় ৮০ রানে ৩টি ও সারভাতে ৫৪ রানে ৫টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১ উইঃ ২৪ রান (বিজয় মার্চেণ্ট নট আউট ১৫, আর এস মোদী নট আউট ৪, এ বেডফার ১৪ রানে ১টি উইকেট।)

কেম্ব্রিজ বনাম ভারতীয় দলের খেলা

কেম্ব্রিজ প্রথম খেলিয়া ১৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে। ভারতীয় দল পরে খেলিয়া ৬ উইকেটে ৩৩৫ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। কেম্ব্রিজ দল তাঁহার প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩৮ রান করে। সারভাতে ও সিন্ধের বোলিং এই বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

খেলার ফলাফল :—

কেম্ব্রিজ দলের প্রথম ইনিংস :—১৭৮ রান (উইলাট ৩০, লেসিস্কট ৩২, হাজারী ৩৯ রানে ৪টি, সিন্ধে ৫৭ রানে ৩টি ও সারভাতে ৩৮ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—৬ উইঃ ৩৩৫ রান (পতৌদির নবাব ১২১, আর মোদী ১০৩, মুস্তাক আলী ৫৪, মিলস ৮২ রানে ২টি, বর্ডাকিন ৩৬ রানে ২টি উইকেট পান।)

কেম্ব্রিজ দ্বিতীয় ইনিংস :—১৩৮ রান (বর্ডাকিন ৩৫, সাটলওয়ার্থ ৪৩, সারভাতে ৫৮ রানে ৫টি, সিন্ধে ৪০ রানে ৩টি ও বিজয় হাজারী ২১ রানে ২টি উইকেট পান)।

সারের খেলায় এস ব্যানার্জির বেপরোয়া মারের দৃশ্য।

দেশী সংবাদ

১৪ই মে—অদ্য নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্বাচন হয়। খান বাহাদুর নুরুল আমীন স্পীকার এবং মিঃ তোফাজ্জল আলী ডেপুটী স্পীকার নির্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই মুসলীম লীগের সদস্য।

১৫ই মে—সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ফরিদপুরের শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘ কারাবাস অন্তে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৬ই মে—ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানকল্পে মন্ত্রিমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবগুলির সারমর্ম এইরূপঃ—(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে; উহা পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিবে, (২) বৃটিশ ভারতীয় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে একটি শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ গঠিত হইবে, (৩) যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে যেসব বিষয়ের তালিকা থাকিবে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশসমূহের উপর অর্পণ করা হইবে, (৪) যুক্তরাষ্ট্রের হাতে স্বেচ্ছায় যেসব অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহা ছাড়া অন্যান্য সমুদয় বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যসমূহের অধীন থাকিবে, (৫) প্রদেশসমূহের সমষ্টিবদ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে এবং উহাদের শাসন ও আইন পরিষদ থাকিবে, (৬) যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সমষ্টির শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান থাকিবে যে, যে কোন প্রদেশে ইহার আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে প্রথম দিকে দশ বৎসর পর এবং দশ বৎসর অন্তর শাসনতন্ত্রে বিহিত সর্তাবলীর পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে মন্ত্রিমিশন বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর প্রায় সকলেই অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী। সুতরাং পাকিস্থান গঠন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

১৭ই মে—ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, সম্মুখের দিনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। কাজেই ভারতের শাসন ব্যবস্থা কতিপয় যোগ্যতম ভারতীয় জননায়কের হস্তে অর্পণ করা উচিত। বড়লাট আরও বলেন যে, উল্লিখিত সরকারের কর্তাস্বরূপ এক গভর্নর জেনারেল ছাড়া আর সমস্ত সদস্যগণই ভারতীয় থাকিবেন।

ভারতের জঙ্গীলাট এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, সাময়িক গভর্নমেণ্টে সমরসচিবের পদে একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইবেন। বর্তমান প্রধান সেনাপতি সমরসচিবের অধীন থাকিবেন।

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত অতীন রায় এবং অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পাঘাচঙ্গ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনের মধ্যে এক মালগাড়ীতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কালনার সংবাদে প্রকাশ, পূর্বস্থলী থানার জামালপুর গ্রামে গতকল্য এক ভীষণ দাঙ্গায় চারজন নিহত হয়।

১৮ই মে—অদ্য নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর শিবিরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৈঠকে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়।

যেসব মৌলিক প্রভেদ হেতু সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা অদ্য তিন দলের মধ্যে লিখিত পত্রাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে নীতি নির্ধারণ, মন্ত্রিপ্রতিনিধি দল কর্তৃক উত্থাপিত মতৈক্য সংক্রান্ত প্রস্তাব, মুসলিম লীগের সর্বনিম্ন দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি এবং কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রস্তাবিত ঐক্যের ভিত্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯শে মে—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী সদস্য এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী দমদমে সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের আরও দুইজন নেতা শ্রীযুত আশুতোষ কাহালী এবং শ্রীযুত নরেন দাস মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত রসময় সুর এবং অপর তিনজন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কালনার সংবাদে প্রকাশ, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর থানার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ভাব দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বারোরপাড়া, ভাটুরিয়া এবং আরও কয়েকটি গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী তাহাদের বাসভূমি ছাড়িয়া দলে দলে কালনা ও নবদ্বীপ অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে।

২০শে মে—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বৃটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা হয়। কমিটির অদ্য সকাল বেলাকার অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে ভারত সচিবের নিকট পত্র লিখিবার ক্ষমতা দিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবাবলীর অন্তর্গত কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করিবার অনুরোধ জানাইয়া পত্রখানি লিখিত হইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বাঙলা সরকার অদ্য বাঙলা প্রদেশের সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

বর্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পূর্বস্থলী থানার কয়েকটি ইউনিয়নে কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে। গত ১৬ই তারিখ জামালপুরে প্রথম হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। পরে বারোরপাড়া, মৌনাপুর ও মাদাফরপুরেও হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়ে। এ পর্যন্ত তিনজন মারা গিয়াছে এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে মিরপুরে (সদর) এবং বন্দরহাটে (নারায়ণগঞ্জ) ৩৫৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

বিদেশী সংবাদ—

১৪ই মে—মিঃ হুভার এশিয়া ভ্রমণের পর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ১লা মে হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে কমপক্ষে ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন।

১৮ই মে—আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতে রাশিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিতেছে, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার সুস্পষ্টভাবে তাহার নিন্দা করেন। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯শে মে—তাব্রিজ রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, কুর্দিস্থানের নিকট কোন এক স্থান হইতে সশস্ত্র পারস্য বাহিনী আজেরবাইজান আক্রমণ করিয়াছে।

কলম্বোর সংবাদে প্রকাশ যে, নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে এবং ৪ শত ভারতীয় শ্রমিককে দ্বীপ ত্যাগের জন্য সিংহল সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে সিংহলস্থ ভারতীয়গণ ৪ঠা জুন হইতে হরতাল পালন করিবে।

২০শে মে—তাব্রিজ রেডিও পারস্য কর্তৃক আজেরবাইজান আক্রমণের সংবাদ প্রচার করিয়াছিল। সংবাদটি আরও বিশদ করিয়া তাব্রিজ রেডিও জানাইয়াছে যে, রবিবার প্রাতে সশস্ত্র পারস্য বাহিনী সাহিন্দেজ ও বাগচেমিসে হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ — ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। — Saturday 1st June, 1946. — ৩০ সংখ্যা

দৌত্যের পরিণতি

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের দৌত্য কিছুদিন মন্থর গতিতে চলিয়া এখন যেন বেশ একটু সন্দিহান অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্পর্কে গত ২৪শে মে এক হাজার শব্দে রচিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমান অবস্থায় মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত দিতে পারেন নাই। দেখা যায়, অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠন পরিকল্পনার উপরেই কমিটি বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মিশনের প্রস্তাবে অন্তর্বর্তীকালীন এই গভর্নমেণ্টের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয় নাই এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একান্তই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর বড়লাট এবং মন্ত্রী মিশন নিজেদের পক্ষের জবাব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের এতৎসম্পর্কিত বিবৃতিতে কতকগুলি বিষয় অনেকটা স্পষ্ট হইয়াছে, ইহা ঠিক; কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পূর্ববৎ অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদের অভিমত এই যে, মন্ত্রী মিশনের সর্বশেষ বিবৃতির ফলেও কংগ্রেসের দিক হইতে অবস্থার কোনই উন্নতি ঘটে নাই। আমরাও এইরূপ অভিমত পোষণ করি। পরে জানিতে পারিলাম, অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্টে দুইটি প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিত্বের হার কিরূপ হইবে, এই সম্পর্কে কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাটের এখনও পত্রালাপ চলিতেছে এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি লীগ ও কংগ্রেসকে সমানসংখ্যক আসন দিবার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী রহিয়াছেন; তাঁহারা লীগকে তিনটির অধিক আসন দিতে চাহেন না। এ সম্পর্কে বড়লাট এবং মন্ত্রী মিশনের মনোগত অভিপ্রায় কি আমরা জানি না; তবে আমরা এই কথাই বলিব যে, কংগ্রেস ভারতের বিপুল জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান; সুতরাং গণ-স্বাধীনতা বা গণ-তান্ত্রিকতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে শাসনতন্ত্র পরিচালনে কংগ্রেসকে প্রধান কর্তৃত্ব প্রদান করিতে হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের স্বার্থরক্ষার অছিলায় ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ কায়েম করিবার নীতি কিরূপ কূটকৌশলে পরিচালনা করা হয়, এতাবৎকাল আমরা তাহা দেখিয়া লইয়াছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সে সব ছলাকলা এখন আর খাটিবে না, একথা আমরা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিতেছি। আমাদের মতে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপরই আপাতত সব কিছু নির্ভর করিতেছে। অন্তর্বর্তী এই গভর্নমেণ্টেও বড়লাটের 'ভেটো'র ক্ষমতা থাকিবে; সেদিন কমন্স সভায় সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসনের মুখে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদিগকে শুধু এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে, বড়লাট দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনায় শাসন-পরিষদের সদস্যাদিগকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা প্রদান করিবেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রভৃতি ব্যাপারে বড়লাটের অবাধ অধিকারই রহিবে। কিন্তু বড়লাটের এই আইনগত অধিকার লইয়াও আমরা সূক্ষ্ম বিতর্কের অবতারণা করিতে চাহি না; কারণ শক্তিশালী কংগ্রেস-নেতৃগণ জনগণের অভিমতকে যদি শাসনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারেন, তবে বিদেশী শাসকদের স্বৈরাচার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই সংকুচিত হইয়া আসিবে এবং সেক্ষেত্রে তাঁহারা জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পাইবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী সংগ্রামশীল জননায়কগণের প্রতিপত্তির উপরই গণ-পরিষদের কাজ এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারতের চূড়ান্ত সন্ধি বা নিষ্পত্তির ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। আমরা গুরুত্বসহকারেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রস্তাবিত গণ-পরিষদের সার্বভৌম অধিকার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বীকার করিয়া লন নাই এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে; অধিকন্তু সেক্ষেত্রেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তকে নাকচ করিয়া দিতে পারেন কিংবা সেই অজুহাতে শাসনতন্ত্রগত সমস্যাকে বিলম্বিত করিতে পারেন, এমন কৌশল রাখা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অদূর-ভবিষ্যতে সত্যই পরিসমাপ্তি ঘটিবে, আমরা মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের ভিতর দিয়া এমন কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং এই সংগ্রামকে শক্তিশালী করিবার সুযোগই আপাতত আমরা গ্রহণ করিতে চাই। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে দেশের জনমতের মর্যাদা কতখানি

রক্ষিত হইবে এবং সেই কেন্দ্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া স্বাধীনতার দুর্জয় সংকল্পে জাতি কতটা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে, আমাদের লক্ষ্য শুধু এই দিকেই রহিয়াছে।

ব্রিটিশ সেনার ভারত ত্যাগ

ভারতবাসীদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি পাকা করিয়া তবে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনকে দেশে ফিরিবার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। বস্তুত এইসব কথার উপর আমরা কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি না; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট উদারতা পরবশ হইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন কিংবা জগতের কাছে চক্ষুলজ্জার দায়ে পড়িয়া তাঁহারা ভারতভূমি হইতে দলবল সরাইয়া লইবেন, এই সব কথায়ও আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন; আমরা তাঁহার মতই সমর্থন করি। পণ্ডিতজী অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধু স্বরাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারেই নয়, পররাষ্ট্রগত বিষয়েও এই গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন; আপাতত বড়লাট এই গভর্নমেণ্টের অধিনায়কস্বরূপে থাকিবেন বটে; কিন্তু কার্যত দেশের লোকের প্রতিনিধিগণের দ্বারাই শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। পণ্ডিতজী গণ-পরিষদের সার্বভৌম অধিকার দাবী করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম অধিকার ব্যতীত গণ-পরিষদ এই সংজ্ঞারই কোন সার্থকতা থাকে না। জগতের ইতিহাসে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, বিদেশী বিজেতৃ-শক্তির অনুগ্রহকে আশ্রয় করিয়া গণ-পরিষদ গড়িয়া উঠে না; পক্ষান্তরে অপ্রতিহত আত্ম-শক্তির প্রভাবে বৈদেশিক প্রভুত্বকে বিচূর্ণ করিয়াই তাহা সংগঠিত হইয়া থাকে এবং দুর্নিবার সংগ্রামের পথেই এই শক্তি সংহত হয়। সত্য বটে, ভারতবর্ষ বৈদেশিক শক্তিকে বৈপ্লবিক পথে চূড়ান্তভাবে তেমন বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই; তথাপি ভারতের সঙ্গে যদি সত্যই আপোষ নিষ্পত্তি করিতে হয়, তবে ব্রিটিশকে এখানেও সেই মৌলিক ভিত্তির উপরই গণ-পরিষদ গঠনে সম্মতি দান করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মনের অবচেতন স্তর হইতে পশুবলের সাহায্যে ভারতকে দমিত রাখিবার সতর্ক চেতনা বিস্মৃত হইতে হইবে। বস্তুত যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সেনা অপসারিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। পণ্ডিত জওহরলালও তাঁহার বিবৃতিতে এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। অবশ্য মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের প্রস্তাবে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের তৎসম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি একান্তই অস্পষ্ট এবং কতকগুলি দুরূহ জটিল সর্তের দ্বারা সংবদ্ধ। আমরা এই সব সর্তের ধাপ্পা বুঝি না। পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও ইহাই বলিব যে, এদেশের সঙ্গে সত্যই যদি আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বে ব্রিটিশ সেনা অপসারণের নীতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, হয়ত সেনাদল অপসারণের এই কাজ যথারীতি আরম্ভ হইতে কিছু সময় বিলম্ব হইতে পারে এই মাত্র। ভারতের ঘাড়ে ব্রিটিশ সেনা চাপাইয়া রাখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল এদেশে ভেদ-বিভেদের আগুন জ্বালাইয়া রাখিবে এবং সেই পথে এসিয়ার সর্বত্র শোষণ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবে, আমরা এই দুর্গতি আর কোনক্রমেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। ফলতঃ আমাদের সহ্যগুণ মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের স্কন্ধ হইতে ব্রিটিশ প্রভুরা নামিয়া গেলেই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারি।

রাজনীতিক বন্দীর সংজ্ঞা

বাঙলাদেশের রাজনীতিক নিরাপত্তা বন্দীরা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা বন্দিমুক্তি সমস্যার কিছুই সমাধান হয় নাই। আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এতদ্দ্বারা সরকারপক্ষের বিশেষ কোন উদারতারও আমরা পরিচয় পাই না; কারণ বাঙলাদেশের সকল শ্রেণীর রাজনীতিক বন্দিগণ অবিলম্বে মুক্তিলাভ করেন, ইহাই দেশবাসীর দাবী। বাঙলার দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীরা এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই। এদেশের এই সব বীর সন্তানগণ বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়া এখনও কারাকক্ষে রুদ্ধ থাকিয়া সাধারণ অপরাধীর ন্যায় নির্যাতন ভোগ করিতেছেন। ইহা ছাড়া, আরও এক শ্রেণীর রাজনীতিক বন্দী এখনও কারাগারে রহিয়াছেন। ইঁহারা আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাদিগকে রাজনীতিক বন্দীর পর্যায়ে ফেলিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে ইঁহারা ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন, দেশবাসী ইঁহাদিগকে রাজনীতিক বন্দী বলিয়াই জানে; কারণ ইঁহারা চোর-ডাকাত নহেন, রাজনীতিক উদ্দেশ্য বা অন্য কথায় স্বদেশসেবার প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ইঁহারা কাজ করিয়াছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় ইঁহাদিগকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিবার পক্ষে কোন যৌক্তিকতাই আমরা দেখিতে পাই না পক্ষান্তরে দেশের এই সব ত্যাগপরায় উৎসাহশীল যুবক যদি মুক্তিলাভ করেন, তবে বিপন্ন বাঙলার সমাজজীবনে ইঁহাদের সেব এবং সাধনার ফলে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। আমরা দেখিলাম, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই শ্রেণীর বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন; এ সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের বক্তব্য কি, আমরা তাহাই জানিতে চাই।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক

বাঙলাদেশের নানাস্থান হইতে ক্রমাগ চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ঢাকা, নোয়াখালী, রংপুর, পাবনা, বরিশাল ফরিদপুর, ময়মনসিংহ—এই সব জেল ইতিমধ্যেই চাউলের দর অনেক স্থানেই ২ টাকার অধিক চড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই অবস্থা, ইহার পর সংকট আরও কত গুরুতর আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া আম আতঙ্কিত হইতেছি। অথচ বাঙলা সরক দেশের এই সংকটকে যে বিশেষ কোন গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন, আমাদের এমন ম হয় না। কিছুদিন পূর্বে বাঙলার নূ সরবরাহসচিব খান বাহাদুর আব্দুল গফর আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছি যে, লীগ মন্ত্রিসভা খাদ্য সরবরাহ অব্যা রাখিবার চেষ্টা করিবেন। গত রবি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও সম্বর্ধনা সভায় আমাদিগকে এবম্বিধ আশ্ব প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙলাদে অবস্থা ১৯৪৩ সালের অপেক্ষা এখন অ ভাল। বাঙলা সরকারের হাতে বর্তম প্রভূত খাদ্যশস্য মজুত আছে। সৈন্যদ গতিবিধির প্রয়োজন হ্রাস পাওয়াতে গা সুবিধা এখন অনেক বেশী; ইহা ছ বণ্টন-ব্যবস্থাও বর্তমানে অনেক সুনিয়ন্ত্রি মিঃ সুরাবর্দীর বাক্‌পটুতার খ্যাতি আ কিন্তু সরকারের হাতে এত সব সুবিধা থ সত্ত্বেও বাঙলার মফঃস্বলে খাদ্যাভাবের নিদা সমস্যা দেখা দিল কি প্রকারে, ইহাই হইতে প্রশ্ন। বস্তুতঃ তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দেন ন চাউলের মণ যদি এইভাবে ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্যন্ত উঠার অব থাকে, তবে বিগত দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও বাঙলাদেশে অধিক লোকক্ষয় ঘটিবে, বিপর্যস্ত সমাজ দুর্নীতির প্রভাবে এলাইয়া পড়িবে। অন্নের মহার্ঘতা এবং তজ্জ খাদ্যাভাবের কি জ্বালা, মন্ত্রী মহোদয় তৎসম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই; স

তাঁহারা বক্তৃতা করিয়াই খালাস; কিন্তু তাঁহাদের কথা ও কাজে যে কতখানি তফাৎ থাকে, দেশের লোকে তাহা জানে। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইহাই শুনিয়াছি যে, অন্নসঙ্কট দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং বাঙলা দেশের অবস্থা সম্ভবত সে তুলনায় অনেক ভালো; কিন্তু কার্যত দেখিতেছি, বাঙলা দেশেই খাদ্যশস্যের দর অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দূরদেশ হইতে খাদ্যশস্য আনিয়া স্ব স্ব প্রদেশের অন্ন-সমস্যার প্রতিকার করিতে সর্বপ্রযত্নে ব্রতী হইয়াছেন; পক্ষান্তরে বাঙলা দেশ হইতে কিংবা বাঙলার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য অন্যত্র অপসারিত হইতেছে; শুধু তাহাই নহে, বাঙলা সরকারের গুদামে খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও মফঃস্বলে চাউলের মূল্য দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে নিরন্ন দলের শহরগুলির অভিমুখে ইহার মধ্যেই অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী খাদ্য সংগ্রহ, বণ্টন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার নিশ্চয়ই এসব কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। এই সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে নানারূপ আশঙ্কার উদ্রেক হইতেছে। আমাদের মনে হয় দেশের এই অন্নসংকট যতই পাকিয়া উঠিবে, ততই শোষক দলের দুর্নীতি জাল শাসনযন্ত্রের নানা কেন্দ্র হইতে গতবারের ন্যায়ই বীভৎস লীলায় সম্প্রসারিত হইবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্ত চুষিয়া নররাক্ষসের দল পদ, মান ও মর্যাদার আড়ালে সুকৌশলে পরিস্ফীত হইতে থাকিবে। সময় থাকিতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমরা সতর্ক হইতে বলিতেছি। ক্ষুধার জ্বালায় পোকামাকড়ের মত মানুষ মরিবে, আমরা এই অবস্থা কোনক্রমেই বরদাস্ত করিব না। বাঙলাদেশে যদি পুনরায় দুর্ভিক্ষ ঘটে, তবে সেই সঙ্গে প্রাণবান্ জাতির বৈপ্লবিক প্রেরণাও জাগিয়া উঠিবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে অগ্নিময় জ্বালা সম্প্রসারিত হইবে।

পরলোকে ডাক্তার শশিকুমার সেনগুপ্ত

গত ২৬শে মে ডাক্তার শশিকুমার সেনগুপ্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন পরম অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বন্ধু হারাইলাম। তাঁহার এই আকস্মিক বিয়োগে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। ডাক্তার সেনগুপ্ত চক্ষু-চিকিৎসকস্বরূপে বাঙলাদেশের সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই সব কথা কিংবা খুব বড় কথা নয়; ডাক্তার সেনগুপ্ত একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী এবং উদারচেতা জনসেবক ছিলেন। দেশবন্ধু দাশের সহকর্মীস্বরূপে তাঁহার কর্মতৎপরতার অনেক কথা আমাদের মনে আছে। নীরব এবং নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ তাঁহার জীবনে সকল দিক হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সংস্পর্শে যিনি কোনদিন গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্মক্ষেত্র হইতে তিনি কিছুদিন হইতে দূরে ছিলেন; তাঁহার নিরহঙ্কৃত প্রকৃতি নিভৃত সেবার মধ্যেই তাঁহার চিত্তকে সংস্থিত রাখিয়াছিল। কি সমাজে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে ডাক্তার সেনগুপ্ত যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, স্পষ্টভাবে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিতেন না। চিকিৎসক হিসাবে, বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে এবং কংগ্রেস সেবকস্বরূপে তাঁহার কর্মসাধনা সর্বদা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বৈরাচারের অবসান

ফরিদকোট পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। জনগণের অধিকার দমনে এ দেশের সামন্তরাজাদের আগ্রহ সুবিদিত; কাশ্মীরেই সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ফরিদকোট ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য হইলে কি হয়? এই রাজ্যের রাজপুরুষগণও স্বাধীনতার আন্দোলন দমন করিবার জন্য রুদ্র মূর্তি ধরিয়া বসেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালের কাছে ফরিদকোটের এই স্বেচ্ছাচারস্পৃহা সমূহরূপে বিচূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিতজী ফরিদকোট রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিষেধবিধি অমান্য করেন এবং প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ফরিদকোট রাজ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন যে, ১৪৪ ধারা বলবৎ রহিয়াছে এবং সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা তদনুসারে নিষিদ্ধ। পণ্ডিত নেহরু উত্তরে তাঁহাকে জানান যে, তিনি কোন বিধিনিষেধই মানিবেন না; তাঁহার কার্যসূচীতে যাহা আছে, তিনি তাহাই পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার মত সাহস ফরিদকোটের রাজকর্মচারীদের হয় নাই। পক্ষান্তরে ফরিদকোটের রাজা যাবতীয় বাধানিষেধ প্রত্যাহার করিতেই বাধ্য হইয়াছেন। ইহার মূলে একটি সত্য রহিয়াছে, তাহা এই যে, এ দেশের রাজন্যবৃন্দ যে ঘাঁটি হইতে তাঁহাদের স্বৈরাচারের মূলীভূত পশুশক্তি সংগ্রহ করিতেন, আজ সেইখানেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ফরিদকোট রাজ্যে গমন করিবার পূর্বে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন যে, সামন্ত রাজগণ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের প্রেরণাবশেই প্রজাদের স্বাধীনতামূলক আন্দোলন দমনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; ফরিদকোটের স্বেচ্ছাচারের মূলে সেই ব্রিটিশ স্বার্থের প্রেরণা ছিল। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে নিজেদের সেই স্বার্থের ঘাঁটি আর আগুলিয়া রাখিতে পারিতেছে না এবং এই দিক হইতে প্ররোচনার অভাবে নিজেদের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়াই ফরিদকোটের রাজাকে সোজাসুজি সুবুদ্ধির পথ ধরিতে হইয়াছে এবং গণ-আন্দোলনের অপ্রতিহত গতির কাছে স্বৈরাচারের প্রবৃত্তি সেখানে নত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, কাশ্মীরের রাজপুরুষদের স্বৈরাচারও অচিরে বিচূর্ণ হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর প্রভুত্বই ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূলে রহিয়াছে। এ দেশের যত দুঃখ-দুর্দশা বিদেশীদের স্বার্থের পাকে পাকে জড়াইয়া আছে এবং সে প্রভুত্ব বিধ্বস্ত হইলে নবীন ভারতের অভ্যুত্থান ঘটিবে ইহা সুনিশ্চিত; সুতরাং মানব-মহিমার অপরিম্লান পথে বিদেশীর প্রভুত্ব ধ্বংস করিবার সাধনাতেই আমাদিগকে সর্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

পরলোকে ডক্টর সুধীন্দ্র বসু

ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে ভারতভূমি একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রাণ প্রতিভাসম্পন্ন সন্তানকে হারাইল। শৈশব জীবনেই বাঙলার অগ্নিযুগের আদর্শ সুধীন্দ্রনাথের অন্তর উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি আমেরিকায় গমন করেন। প্রখর মনীষা প্রভাবে তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের বলিবার এবং লিখিবার দুই শক্তিই সমান ছিল। তিনি বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারকল্পে তাঁহার এই দুই শক্তিকে নিযুক্ত করেন। এদেশের বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লেখাগুলিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার গভীর মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তেজস্বী নির্ভীকচেতা পুরুষ ছিলেন; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সহজে ভারতে আসিতে সম্মতি দান করেন নাই; অনেক চেষ্টার পর তিনি একবার সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মনোবল এবং ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এদেশের যে ক্ষতি ঘটিল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা এই স্বদেশপ্রেমিক ভারতের বীর সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

অচ্যুত পটবর্ধন

দীর্ঘকাল গুপ্তভাবে অবস্থান করিবার পর তরুণ সমাজতন্ত্রী নেতা অচ্যুত পটবর্ধন ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধু ও সহকর্মিগণ পুনরায় লোকচক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন। সমগ্র দেশের দৃষ্টি আজ ইঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সকলেই আজ এই তরুণ বিপ্লবিগণের বিচিত্র জীবনের ইতিহাস জানিতে ব্যগ্র। দেশবাসী শ্রীযুত পটবর্ধনকে আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম তেজস্বী নেতা বলিয়াই জানে। কেমন করিয়া এই দীর্ঘকাল ইনি পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক অদ্ভুত ইতিহাস বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। শৈশবে মাত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একবার আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আত্মগোপনের কথা এবং আরও বহুপ্রকার চিত্তাকর্ষক কাহিনীও তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়।

প্রকৃত নেতার চরিত্রে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার, তাহা আমরা অচ্যুতের চরিত্রে দেখিতে পাই। দৃঢ়-সংকল্পের সঙ্গে তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সুমিষ্ট ও উদার স্বভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্র সহজেই জনসাধারণের চিত্ত হরণ করে। দীর্ঘকাল গুপ্তভাবে থাকিবার সময়ে বহুবার তাঁহাকে পুলিসের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে। কতবার অদ্ভুত উপায়ে তিনি পুলিসের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছেন।

পটবর্ধন-বংশের ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়কর। অচ্যুতের পিতা আমাদিগকে কার্ডিনাল নিউম্যানের ভদ্রলোকের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মাতা ৬০ বৎসর বয়সে হাসিমুখে কারাবরণ করেন। তাঁহাদিগের ছয় পুত্র ও এক কন্যা। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্ধনের চরিত্রে প্রফুল্ল হাস্যের অভ্যন্তরে অনমনীয় দৃঢ়তা ক্ষুরধার মনীষা ও শত্রুমিত্রের প্রতি সমভাবে অভাবনীয় উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সরল অমায়িকতা ও অনুগামীদিগের প্রতি একান্ত আপন-করা ব্যবহার বিস্ময়কর। অজ্ঞাতবাসের সময় একবার তিনি বোম্বাই নগরীর এক দূরবর্তী অংশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত তিনজন তরুণ সহকর্মীও বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্তদেহে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। প্রতিদিনই গৃহে ফিরিয়া তাঁহারা দেখিতেন যে, তাঁহাদের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া ও খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই অদৃশ্য পাচক ও রজক কে, সে সম্বন্ধে

তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন নাই। অবশেষে একদিন ঘটনাক্রমে ইহার রহস্য আবিষ্কৃত হইল। পৃথিবীতে এমন সৈন্যাধ্যক্ষ কয়জন আছেন, যাঁহারা তাহাদিগের সৈনিকদিগের বস্ত্র ধৌত করিতে ও খাদ্য রন্ধন করিতে অভ্যস্ত? অচ্যুতের পক্ষে কিন্তু ইহা একান্ত স্বাভাবিক। সেই কারণেই তাঁহার অনুগামীরাও তাঁহার প্রতি অপূর্ব নিষ্ঠা ও অনুরাগের ভাব পোষণ করেন।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাস হইতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই দীর্ঘ তিন বৎসর আট মাস কাল অচ্যুত স্বয়ং অপরাজিত থাকিয়া ক্রমাগত বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদিগকে ফাঁকি দিয়া বেড়াইয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহাকে বহুবার ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, বহুবার তিনি অতিকষ্টে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে এই গুপ্ত আন্দোলনের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদের মধ্যে সানে গুরুজী, নানা সাহেব গোরে এবং মহারাষ্ট্রের ভগৎ সিং বলিয়া খ্যাত নির্ভীক বিপ্লবী শিরু লিসায়ে অন্যতম। অচ্যুত কৌশলে পুলিশকে এড়াইয়া যান। ইহার কয়েক মাস পরে এই গুপ্ত নেতৃবর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন আলোচনা সভা হইবার কথা ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ ইহার সন্ধান জানিতে পারে এবং সুকৌশলে ও সুচতুরভাবে এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া এক ব্যাপক জাল বিস্তার করে। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত এস এম যোশী ধরা পড়িলেন, কিন্তু অপূর্ব ধীরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত অচ্যুত এবারও পুলিসের চোখে ধুলা দিলেন।

অচ্যুত যখন প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তখন তিনি পুলিস-বেষ্টনীর মধ্যে। পুলিস তখন প্রত্যেক গোপনীয় স্থানে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। সেই কড়া পাহারা অতিক্রম করিয়া লুকাইয়া থাকিবার বা পালাইবার কোনই উপায় নাই। সন্দেহজনক ব্যক্তি মাত্রেই ধৃত হইতেছেন। অচ্যুত একটি খোলা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন। বিদেশী শাসকের অর্থপুষ্ট পুলিস ভাবিতেও পারে নাই যে, তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে এইভাবে তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া নির্বিঘ্নে

পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন। সর্বত্রই তখন পুলিসের সন্ধান চলিতেছে। কোথাও যাইবার উপায় নাই। তাই অচ্যুত সারা রাত্রি সেই ঘোড়ার গাড়ীতেই ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

কিন্তু অচ্যুতের পরবর্তী কালের বৈপ্লবিক মনোভাব তাঁহার শৈশব ও বাল্য-জীবনের মধ্যে একেবারেই পরিস্ফুট হয় নাই। বাল্যে তিনি ছিলেন এক ধনী ব্যক্তির সুকুমার-দেহ ও দুর্বল-হৃদয় তনয়। বাহিরের খেলা-ধুলো ও শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আসক্তি ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাও যখন খেলাধুলো, সন্তরণ বা কুস্তিতে ব্যাপৃত থাকিতেন, অচ্যুত তখন উদাসীন ও ক্লান্তভাবে তাহা শুধু নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সমর্থকও ভাবিতে পারেন নাই যে, সেদিনের অচ্যুত ক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের নিকট অচ্যুতের নাম ১৯৪২ সাল ও তৎপরবর্তী সময়ে কিরূপ ভীতিপ্রদ ছিল, তাহা ভাবিতে কৌতুক বোধ হয়। বিশেষত যানবাহনকর্তৃপক্ষ হয়ত সর্বদাই সন্দেহ করিতেন যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মালবাহী গাড়ী অচ্যুতের দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য বুঝি লাইন হইতে বিচ্যুত হইবে। বোধহয় তাঁহারা ভাবিতেন যে, অচ্যুত একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার বা গণিতবিশারদ। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা জানিলে আশ্বস্ত হইতেন যে, স্কুলে পঠদ্দশায় অচ্যুত গণিতের একটি পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেকবারই প্রমোশনের সময় তাঁহাকে 'গ্রেস্' দিয়া গণিতে পাশ করাইতে হইত।

অচ্যুত কিন্তু গণিতের অজ্ঞতা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতার দ্বারা পূরণ করিয়া-ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন।

মাত্র চার বৎসর বয়সে অচ্যুত একবার গোপনে গৃহ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহার প্রপিতামহের প্রচুর অর্থ ছিল, কিন্তু কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অচ্যুতের সুন্দর চেহারা ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। অনুষ্ঠানের দিনে কিন্তু অচ্যুতকে আর পাওয়া গেল না। বহুকষ্টে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে বাহির করা হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরবর্তীকালে অচ্যুত অজ্ঞাতবাস ও আত্মগোপনের বিদ্যায় যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল অতি শৈশবকালে,—মাত্র চার বৎসর বয়সে।

অচ্যুতের পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান থিয়োসফিস্ট। সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। তাই রাও ও অচ্যুত যখন আমেদনগর শিক্ষা সমিতির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন অচ্যুতের পিতা তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্তা এনি বেশান্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। এই কলেজে আসিয়াই অচ্যুত ও রাও তদানীন্তন অধ্যক্ষ জর্জ আরুণ্ডেল ও বিশিষ্ট অধ্যাপক পি কে তেলাঙ্গএর সহিত পরিচিত হন। শ্রীযুত তেলাঙ্গ তখন বারানসীর শিক্ষক মহলে চরিত্র, মেধা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া রাও এবং অচ্যুত বিশেষভাবে উপকৃত হন।

সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ পরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। পটবর্ধনভ্রাতারা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাক্তার জ্ঞানচাঁদের সহিত একত্রে বাস করিতেছিলেন। জ্ঞানচাঁদের গৃহ তখন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের মিলিবার কেন্দ্র ছিল। এইখানে অবস্থানকালেই রাও নিখিল ভারত আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। আর অচ্যুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

এম-এ পাশ করিয়া অচ্যুত অতঃপর ইউরোপে গমন করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কাশীতেই অর্থনীতির অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিলেন। এই সময় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেশব্যাপী বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। রাও জেলে গেলেন। উমাশঙ্কর দীক্ষিত পশ্চাতে থাকিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। উমাশঙ্করের সঙ্গে কৃষ্ণ মেনন আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ মেনন অনুপ্রাণনাময় মনীষার সহিত দৈনিক "কংগ্রেস বুলেটিনে"র সম্পাদনা করিতেন। এই "বে-আইনী" পুস্তিকা প্রতিদিন "স্বাধীনতা আমার আত্মা ও রাজদ্রোহ আমার সঙ্গীত হউক" এই দৃপ্ত ঘোষণাবাণী লইয়া প্রকাশিত হইত।

অবশেষে অচ্যুত আর থাকিতে পারিলেন না। দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজের অধ্যাপনা লইয়া কালাতিপাত করিবেন, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিলেন এবং বোম্বাইএর "ছায়া মন্ত্রিসভায়" যোগদান করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই "শঙ্কর" নামক এক রহস্যময় নূতন ব্যক্তির আবির্ভাবে পুলিশ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা তখন ভাবিতেও পারে নাই—এবং অচ্যুত নিজেও ধারণা করেন নাই যে, ১৯৩২ সালের ঘটনাবলী দশ বৎসর পরবর্তীকালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের মহড়া মাত্র।

কিন্তু ১৯৩০ ও ১৯৩২এর আন্দোলন প্রত্যক্ষ স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। ইহাতে তরুণ কর্মীদিগের মধ্যে নিজেদের কার্যাবলী সম্বন্ধে একাগ্র ও নিবিড় চিন্তার সূত্রপাত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মুস্তাফা কামাল তুর্কীর স্বাধীনতা আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনও স্বাধীনতা লাভে আংশিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ভারত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল কেন? সমগ্র দেশময় বিভিন্ন কারাগারে আবদ্ধ তরুণ কর্মীদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া চিন্তাপূর্ণ আলোচনা চলিতে লাগিল। এই তরুণেরা জাতীয় আন্দোলনেরই ফল এবং স্বভাবতই বিশেষ-রূপে কংগ্রেসীভাবাপন্ন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে সমগ্র ভারত প্রভাবিত। কাজেই ইঁহারাও গান্ধীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ইঁহারা ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আন্দোলন-দুটিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিলেন। ইঁহারা দেখিলেন যে, এই ব্যর্থতার কারণ প্রথমত আন্দোলনের উপযুক্ত মশলা বা উপকরণের অভাব। ইহাতে প্রচুর উদ্দীপনা ও উৎসাহ ছিল, ছিল না শুধু উৎসাহকে কাজে লাগাইবার উপযোগী সংগঠন। দ্বিতীয়ত "স্বরাজের" সংজ্ঞা ভাল করিয়া নির্ধারণ করা হয় নাই, ইহা বড়ই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ভারতের শোষিত জনসাধারণ, ইহার বিপুলসংখ্যক কৃষাণ ও ক্রমবর্ধমান মজদুর-শ্রেণীর জন্য "স্বরাজ" কিরূপ মুক্তি আনয়ন করিবে, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তখনও পাওয়া যায় নাই।

যে সমস্ত কারাগারে এই ধরণের চিন্তা-ধারা তরুণ বন্দীদিগের মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিতেছিল, তাহার মধ্যে নাসিক সেণ্ট্রাল জেলের নাম সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। এইখানেই জয়প্রকাশ ও অচ্যুত, মাসানি, অশোক মেটা এবং আরও অন্যান্য অনেক তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল যুবক ছিলেন,—যাঁহারা উত্তরকালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের পথপ্রবর্তক হইয়া দাঁড়ান।

১৯৩৪ সালের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ও ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশের ভিত্তিতে এক কর্মপদ্ধতি রচনা করিবার জন্য পাটনায় সমবেত হন। ঠিক সেই সময়েই পাশাপাশি জয়প্রকাশ কর্তৃক সংগঠিত আর একটি সভার অধিবেশন হয়। আচার্য নরেন্দ্র দেবের

সভাপতিত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ইহাই প্রথম সম্মিলনী। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল যথারীতি সংগঠিত হয়।

এই বৎসরের কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায়ই অচ্যুতের বিতর্ক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তাঁহার বক্তৃতা তীব্র সমালোচনার সহিত দুর্লভ সৌজন্যের সমাবেশে একান্ত হৃদয়গ্রাহী হইত এবং বিতর্কমূলক আলোচনার একটি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল।

১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই খ্যাতি আরও বর্ধিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল সেবারকার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তিনি আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশনারায়ণ ও অচ্যুত পটবর্ধন—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের এই তিনজন সভাকে সেবার সর্বপ্রথম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করিতে আহবান করেন। সকলেই এই নির্বাচনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অচ্যুত স্বয়ং তাঁহাকে এই সম্মান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সহকর্মীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরামর্শ সভায় আহূত হইয়া স্বেচ্ছায় এই উচ্চ সম্মান হইতে অবসর চাহিতেছেন, এই দৃশ্য বাস্তবিকই অপূর্ব। বস্তুত অচ্যুত আত্মত্যাগের জীবন্ত উদাহরণস্থল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাওয়ের অনুবর্তী। অচ্যুতের ঘটনাবহুল জীবনের অনেকাংশই তাঁহার ভ্রাতার প্রীতি, স্বার্থত্যাগ ও কার্যাবলীর আদর্শে গঠিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৃটেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার যুদ্ধাদর্শ নির্দিষ্ট করিতে অনিচ্ছুক এবং ক্ষমতাত্যাগে অসম্মত হওয়ায় কংগ্রেসী সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিসভা হইতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং অচ্যুত কারাবরণ করিলেন। এই সময়ে তিনি অশোক মেটার সহিত একযোগে "The Communal triangle in India" নামে এক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাদেব দেশাই হরিজনে এই বইখানির চারি কলমব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সাম্প্রতিককালে লিখিত তিন চারিখানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের মধ্যে ইহা অন্যতম, একথা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু অচ্যুতের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি "ভারত ছাড়" আন্দোলনে তাঁহার বিশিষ্ট ও গৌরবময় অংশ। কালের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা এই আন্দোলনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিব, তখন অচ্যুত এবং তাঁহার সহকর্মীদের অংশও যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে ইহা অনেকাংশে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই রহিয়া গিয়াছে।

সাতারার কথাই ধরা যাক। ইহাকে ১৯৪২ সালের বারদৌলি বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলন একদিকে জনসাধারণের জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল ও তাহাদের হৃদয় নূতন সাহস, উৎসাহ ও দুঃখ-বরণের নূতন অনুপ্রেরণায় পূর্ণ করিয়াছিল। অপরদিকে ইহা প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী শাসককে বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

একবার খবর পাওয়া গেল যে, অচ্যুত সাতারার নির্দিষ্ট কতিপয় গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একটি বাছাই করা পুলিস বাহিনী তথায় পাঠান হইল। অনেক অনুসন্ধানের পরও তাঁহার সন্ধান না পাও পুলিস বাহিনীর কর্তা ব্যর্থ মনোরথ হ বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। ঘট ক্রমে অচ্যুতও সেই ট্রেনেই ফিরিয়া যাই ছিলেন। এমন কি উভয়ে একই কামরায় একই আসনে উপবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে অচ্যুত বিপদ উপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলে ঘনায়মান অন্ধকার তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সাহ দানে অগ্রসর হইল। আর পুলিস কর্মচা বিদেশী গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচ হাজ টাকা পুরস্কার, দ্রুত কর্মোন্নতি ও প্রতিপ মধুর স্বপ্নের রূঢ় অবসানে তাঁহার মন্দ ভাগে কথা চিন্তা করিতে করিতে মোহাবিষ্টের ন চলিয়াছিলেন। ভাগ্য তাঁহার সহিত মুহূর্তেই কি নিষ্ঠুর পরিহাস করিতেছি তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ভাবিতেও পারেন নাই যে, যাঁহাকে গ্রেপ্ত করিবার উপর তাঁহার অর্থপ্রাপ্তি ও পদোন্ন নির্ভর করিতেছে, সেই কৌশলী বিপ্লবী ম কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে অবস্থান করিতেছে পুলিস কর্মচারী পুণা স্টেশনে ট্রেন হই অবতরণ করিলেন, কিন্তু অচ্যুতের ও ইতিহা গতি অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অচ্যুতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাওএরও স্বার্থত অপরিসীম। তাঁহাদিগের একটি ভগিন নাম বিজয়া—১৯৪২ সালে বং ধারা অনুসরণে কলেজ পরিত্যাগ ক এবং পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। পরে অচ্যুত ও জয়প্রকাশ উভয়েরই সেক্রেটারীর ব করেন এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনের স অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হ'ন।

ভারতের যে কয়েকটি পরিবার ম সাধনায় নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ করিয় পটবর্ধন-পরিবার তাহাদের অন্যতম। ম কামী ভারত, ভাবীকালের স্বাধীন ভ চিরকাল শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে এই দেশহিতৈ পরিবারের গৌরবময় আত্মত্যাগের কথা স্ম করিবে।

মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ১৯১৫

টমাস হার্ডি

শুধু একটি মানুষ নিঃশব্দ পদক্ষেপে
ধীরে ধীরে মাটির ঢেলা ভাঙছিল মই দিয়ে,
তন্দ্রালু স্থবির একটা ঘোড়ার সাহায্যে;
ঘোড়াটি চলতে গেলেই ঝিমিয়ে পড়ছে—
মাঝে মাঝে মাথাও নাড়ছে ক্লান্তির সঙ্গে।

* * *

অগ্নিহীন ধোঁয়ার মরু শিখা উঠছে
সন্ধ্যায় জমা-করা চাপড়া ঘাসের স্তূপ থেকে।
যদিও অনেক রাজ্য, রাজাও অনেক মুছে যাচ্ছে......
তবু ত' আদিম পথে এ সবের ব্যতিক্রম নেই
এরা ঠিক একই ভাবে বয়ে চলবে।

* * *

ওখানে কোনো নারী তার প্রিয়তমকে নিয়ে
চুপিসাড়ে কথা বলছে আর এগিয়ে আসছে;
যুদ্ধের গর্জায়মান ইতিহাস থেমে যাবে,
গভীর রাত্রির অগাধ আকাশে যাবে ডুবে—
ওদের গল্প-শেষের অনেক, অনেক আগেই।

অনুবাদক—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

রজনীগন্ধা

শান্তা রায়চৌধুরী

সন্ধ্যায়

১

সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে, হে বন্ধু সুন্দর,
রজনীগন্ধার বনে এসেছিলে তুমি,
অস্ফুট গুঞ্জন করি পল্লব-মর্মর
নিশ্বসি' জাগায়েছিল স্তব্ধ বনভূমি।
তখনো ভাঙেনি ঘুম রজনীগন্ধার
নিমীলিত ওষ্ঠপুট পেলব-কোমল,
পরশন-তৃষ্ণা লাগি বাসনা-বিভোল—
দেহবৃন্ত স্বপ্নসুখে কাঁপে বার বার!
'ঘুমভাঙানিয়া' বন্ধু, তব স্পর্শ-সাথে
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে জাগে ফুলদলে;
অভিসার-যাত্রাপথে স্তব্ধ অর্ধরাতে
মিলনের দীপ্ত দীপশিখাখানি জ্বলে।
সে নিশীথে তব সাথে নব পরিচয়
জাগরণীস্মৃতি রবে অম্লান অক্ষয়॥

রাতে

২

জানো বন্ধু, সেইদিন স্তব্ধ অর্ধরাতে,
রজনীগন্ধার ফুলে 'উঠেছিলো জ্বলি'—
মিলনপ্রদীপশিখা; নীরবে নিভৃতে
সুখস্পর্শে দেহবৃন্ত উঠেছিলো দুলি?
আঁধার বিজন-কক্ষে শূন্য-বাতায়নে
রেখেছিনু জ্বালি মোর আঁখিদীপ-শিখা;
কে জানিত নির্বাপিত দীপ-হস্তে একা
বাহির হোয়েছো তুমি আমার সন্ধানে?
সহসা চমকি শুনি তব শ্রান্ত বাণী—
"'প্রাণভিক্ষু দীপিকারে' জ্বালো সখি জ্বালো",
দানের গৌরবে মোরে করি বিজয়িনী
তব দীপে জ্বলে ওঠে মোর আঁখি-আলো।
আজ দেখি তব দীপ্ত বহ্নিশিখাতলে
ম্লান ছায়াখানি ফেলি মোর দীপ জ্বলে॥

বৈশাখী রবি

সৈয়দ মুজতবা আলী

লক্ষ কোটি বৎসরের তমিস্রার ঘন অন্ধকারে
রুদ্রের তপস্যা শেষে জ্যোতির্ময় পুরুষ আকারে
রবি হল সপ্রকাশ। প্রথম প্রাণের জয়গান
বিদ্ধ করি অন্ধকার জড়ত্বেরে দিল আনি প্রাণ
যে সত্তা নিদ্রিত ছিল তাহার গভীর অন্তঃপুরে;
ধ্বনিয়া উঠিল শূন্য ভৈরবের বিজয়িনী সুরে।
এ বঙ্গের অন্ধকার

তোমার রুদ্রের তেজে ছিন্ন হল; জ্যোতির্ময়ম্বার
উন্মোচিত, উদঘাটিত। কী রুদ্রের তপশ্ছবি, রবি,
তোমার সৃষ্টিতে সপ্রকাশ। কী সম্পদ আজি লভি
তোমার তপস্যা-তেজে। তব কর স্পর্শ দিকে দিকে
রূপে-রসে-স্পর্শে-শ্বাসে তোমার আনন্দ দিল লিখে।
তোমার উদয় পূর্বভালে
তোমার মানসপদ্ম পদ্মার নীরের তালে তালে
শতদলে প্রস্ফুটিত। হংসবলাকার সাথে মিলে
মানসের অভিযান, ক্ষণিকায় কল্পনায় দিলে
পদ্মার অমরমূর্তি। গৌড়ভূমে সেই মন্দাকিনী
গৈরিক পশ্চিম তাই শ্যামল পূর্বেরে নিল চিনি
তোমার প্রসাদে।
তারপর তব জয়রথ
বাহিরিল ঘর্ঘরিয়া, রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
বঙ্গভূমি কেন্দ্র করি রবিরশ্মি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
দিক হতে দিগন্তরে; বিশ্বলোক মানিল বিস্ময়
সর্বকণ্ঠে শুনি তব জয়। তব হস্তে বঙ্গবীণা
ধ্বনিয়া উঠিল মন্দ্রে বঙ্গ নহে মূক হীনা দীনা।
তারপর সর্বশেষে—
রুদ্রের তপস্যা যেথা গৈরিক আতাম্র রুক্ষ বেশে
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যেথা তপ্ত রৌদ্র তাণ্ডবের তালে
ডমরু বাজায় খন, সপ্তপর্ণে তালে শালে
শ্বসিয়া দহিয়া উঠে, শেষ বিরাগের বীরভূমি
হে বৈশাখী রুদ্র কবি, ধন্য তব পদপ্রান্ত চুমি।

কন্‌গ্রেস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু,—

অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

কিছুকাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়। দিগন্তব্যাপী অনুর্বরতা তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ করে বহুযুগকে দরিদ্র করে রেখেছিল।

এমন সময় আশ্চর্য অল্পকালেই বৃহৎ শূন্যতার মাঝখানে কন্‌গ্রেস মাথা তুলে উঠল দূর ভবিষ্যতের অভিমুখে, মুক্তির প্রত্যাশা বহন করে, বহু শাখায়িত বিপুল বনস্পতির মতো। বিরাট্ জনসাধারণের মন আশ্চর্য দ্রুত-বেগে বদলে গেল; সেই মন আশা করতে শিখল ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন মোচনের সংকল্প করতে তার সংকোচ আর রইল না।

কিছু দিন আগেই দেশ যা অসাধ্য বলেই হাল ছেড়ে ব'সে ছিল, এখন তা আর অসম্ভব বলে মনে হ'ল না। ইচ্ছা করবার দৈন্য আজ ঘুচেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের এত বড়ো পরিবর্তন ঘটতে পেরেছে কেবল একজন মাত্র মানুষের অবিচলিত ভরসার জোরে, সেই ইতিহাসের বিস্ময়করতা হয়ত ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হতেও পারবে এমনতরো অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা মনে জাগছে।

সফল ভবিতব্যতার আশ্বাস নিয়ে আজ যে কন্‌গ্রেস অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিভার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালে কালে তার সংস্কার সাধনের তার সীমা পরিবর্ধনের প্রয়োজন নিশ্চয় ঘটবে তা জানি। কিন্তু চঞ্চল হয়ে বর্তমানের সঙ্গে হঠাৎ তার সামঞ্জস্যে আঘাত করে একটা নাড়াচাড়া ঘটাতে গেলে মন্দিরের ভিৎ হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড়ো রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চারিত্রশক্তি এদেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না সেকথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গড়ে উঠেছে, এখনো সেটাকে তাঁরি সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তুমি জানো আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীতকালে আড়ষ্ট ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে একথা আমি মানি নে। বর্তমান কন্‌গ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে তাও সত্য হতেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এই কন্‌গ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং একথাও যখন জানি এই কন্‌গ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ এ'কে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয় এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে থেকে কাটাছেঁড়া ক'রে নয়।

ইতিপূর্বে কন্‌গ্রেস নামধারী যে প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড়-করা দোহাই-পাড়া মুক্তি-ফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি সে তুমি জানো। হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোণার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্ম-শক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে। নবজীবনের তপস্যার সেই প্রথম পর্ব আজো সম্পূর্ণ হয় নি, আজো এ রয়েছে তাঁরি হাতে যিনি একে প্রবর্তিত করেছেন; শিবের তপোভূমিতে নন্দী দাঁড়িয়েছিলেন ওষ্ঠাধরে তর্জনী তুলে, কেননা তপস্যা তখনো শেষ হয়নি, বাইরের অভিঘাতে তাকে ভাঙতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

এইতো গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের সম্বন্ধেও ভাবনার কারণ প্রবল হয়ে উঠেছে। কন্‌গ্রেস যতদিন আপন পরিণতির আরম্ভ যুগে ছিল, ততদিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সে কালের কন্‌গ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত, আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত। এমন কি সেই দরবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না কিন্তু মনু বলেছেন সম্মানকে বিষের মতে জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনে বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে উঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বলে ফ্যাসিজ্‌ম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তা অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতারক্ষা করলে যথার্থভাবে কন্‌গ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হোত তা ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে; এই ব্যবহারে বিকৃতির মূলে আছে শক্তি-স্পর্ধার প্রভাব। খৃষ্টান-শাস্ত্রে বলে স্ফীতকায় সম্পদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপথ সংকীর্ণ কেননা ধনাভিমানী ক্ষমতা আনে তামসিকতা কন্‌গ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করেছে বন্ধুর মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস সাত্ত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্ত এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছে তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁ পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে। তার মধ্যে সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে উত্তাপ শক্তিগ ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত। ভিতরে ভিত কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বে গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবা পাই নি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্ত মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে কি সমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সতে যজ্ঞে যে কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্ব তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারে শক্তিপূজায় নরবলি সংগ্রহের কাপালি মুসোলিনী ও হিটলার যাঁদের আদর্শ। আ সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালে যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্র ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধ পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরু তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন ক কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথ কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি। এতদিন প অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করে কিন্তু আমি পলিটিসিয়ান নই, এই প্রস সে কথা কবুল করব।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলা দরকা গত কন্‌গ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙা

জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে এই অভিযোগ বাঙলা দেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস করে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে। চারদিকে সকলেই বিরুদ্ধ চক্রান্ত করছে, সর্বদা মনের মধ্যে এই রকম সংশয়কে আলোড়িত হ'তে দেওয়া মনোবিকারের লক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলন-কেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সেকথা বলা বাহুল্য। যে বিচ্ছেদের বাহন স্বয়ং ধর্মমত তার মতো দুর্লঙ্ঘ্য আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়-বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য। এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে। যে দেশের আচার অন্ধ জিদওয়ালা নয়, যে দেশের ধর্মভেদ সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করেনি সেই দেশে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্বতই সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস সেই সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীবভাবে বেড়ে উঠেনি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচ দশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।

কারণ যাই হোক প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন এক লেখায় ছিল, যে জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশিলষ্ট মড়মড় ঢলঢল করে, যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দাঁড় দিয়ে বেঁধে সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হ'য়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মুক্তি যাত্রাপথের রথখানাকে আজ কন্‌গ্রেস টেনে রাস্তায় বার করেছে। পলিটিক্সের দাড়িবাঁধা অবস্থায় চলতে যখন সুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কন্‌গ্রেস কর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য। কেননা সন্দিগ্ধ মন সকল প্রকার আঘাত ও অবৈধতাকে অতিমাত্র করে তোলে। তাই ঘটেছে আজ। সমস্ত বাঙলা দেশের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর অত্যাবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মন-শ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাঙলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুণ্ণ করে এ আশংকা তাঁর মনে থাকা, স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এতদিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন; সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হতে দিতে যদি তিনি শংকিত হন তাহলে বলব না যে সেই শংকা একাধিপত্যপ্রিয়তার লোভে। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ধ্রুব করে রাখেন। মহাত্মাজীর সেই বিশ্বাস যে সার্থক মোটের উপর তার প্রমাণ পেয়েছেন গুরুতর ভুলচুক সত্ত্বেও। এবং তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করতে তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না—সেও তিনি বিশ্বাস করেন। সকল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই রকম বিশ্বাসে অধিকার আছে। বিশেষত যখন তাঁর কৃত অসমাপ্ত সৃষ্টি গড়ে উঠবার মুখে। হয়ত মহাত্মাজীর সৃজনশালায় আরো অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ধৈর্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় না ঘটে তাহলে সমগ্রেরই হবে ক্ষতি। এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে। আমি নিজের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করব যে মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্য রকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতের অল্প লোকেরই। দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাব ত্রুটির মোচন হবে এবং সেই অভাব মোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন যোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব। সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মতো বলবো না তার ঊর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরও আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।

আমার মনে যে পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল, তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয়নি। সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হ'য়ে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের নানা আয়তনের জয়-তোরণের চূড়া, কিন্তু তাদের কোনোটারই ভিৎ গাড়া হয়নি বালির উপরে। যখন লুব্ধ মনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব, তখন দেশের সামাজিক চিত্তের মধ্যে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।

কিছুদিন হোল একটি বিরল-বসতি পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আছি সদ্য উন্মথিত রাষ্ট্রিক উত্তেজনা থেকে দূরে। অনেকদিন পরে ভারতবর্ষকে এবং আপনাকে শান্তমনে দেখবার অবকাশ পাওয়া গেল। দেখছি চিন্তা করে মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্সের ব্যবহার। একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে সেটা যন্ত্রশক্তি, আর একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি; আজ য়ুরোপে সংকটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।

বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির কোনোটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগ-শিক্ষাচর্চা। বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কি রকম, তা জানি; কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজো এই গরীব জাতের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেট ভরে অবিবেচক খালকাটীয়ের খরচায়। তা ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। একদিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই। এখন এসেছে সায়ান্স, শিক্ষিত বুদ্ধির 'পরে ভর করে। শুধু বুদ্ধি নয় তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল। অথচ আমাদের লড়তে হবে শূন্য তহবিল এবং জনসংঘ নিয়ে, যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত।

যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে, নয় অন্ধ হয়ে ছোটে। দেশের পলিটিক্সের আরম্ভ হয়েছিল এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে। সেইজন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেণ্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়। এই রিক্ততার সমস্যা নিয়েই একদিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, দুঃখ সয়েছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি। বিনা যন্ত্রশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে, এইটি প্রমাণ করতে তাঁর আসা। একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন, কোনোটাতে যে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন, তা বলতে পারিনে। কিন্তু পরাভবের মধ্যে দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরী করছেন যে-মন, তার সংকল্পিত অস্ত্র যথাযোগ্য সংযম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরি উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা। হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত; সে একই কেন্দ্রের চারিদিকে ধ্বংস সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়; তার সমাপ্তি সর্বনাশে।

হিংস্র যুদ্ধে ফৌজ তৈরী করা সহজ। বছরখানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে; কিন্তু অহিংস্র যুদ্ধে মনকে পাকা করে তুলতে সময় লাগে। অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান্, এমন কি পাশব শক্তির রীতিমত ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না; ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পৃথিবীতে আজ যেসব জাতি যে কোন রকম লড়াই চালাচ্ছে, তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। জাপানের তো কথাই নেই—বড় বড় অন্য সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষা সত্র খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন ভীড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্সকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে এসকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্সে প্রবীণ নই। একথা জানি, যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজী তার প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে, এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোন কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে, তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে। কন্‌গ্রেসের অভিমুখে যদি কোন কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা কোরব; দেখবো তাঁর কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে। কেননা দেশের জননায়কতার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ; তার ভালমন্দ ফলাফল বহুদূরব্যাপী, অনেক সময়েই তা অভাবনীয়। নিজের উপরে যার স্থির বিশ্বাস আছে, তিনি তা বহন করতে পারেন, কিন্তু এ সকল পলিটিক্যাল প্রয়াস আমার পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমি অনুভব করিনে। পরোধর্ম ভয়াবহঃ। আমার নিজের এতদিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণ-দেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে, নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণ সাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে। মহাত্মাজী যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন, তখন একান্তমনে কামনা করেছিলুম তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করবেন। কেননা আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করবে।

আজ আমি জানি, বাঙলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ী। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে—সেই ধূলি-চক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে এই বাঙলাকে। যে বাঙলাকে আমরা বড় ক'রব, সেই বাঙলাকেই বড় ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধন গ্রহণ করবেন এ আশা করে আমি সুদৃঢ় সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাঙলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায় সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

মংপু — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০।৫।৩৯

অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বক্তব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি। হিন্দু-মুসলমানের চাকরীর হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। দীর্ঘকাল চাকরীর অন্নে বাঙালীর নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক—তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে, শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে। এই দুঃখের ধাক্কাতেই আনবে যুগান্তর, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি, তার একটিমাত্র কারণ আছে। স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্যায় বিচার দেখলে শাসনকর্তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলাফল তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অন্ন বিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শান্ত করবার অবকাশ থাকবে না। পৃথিবীতে হিটলার-মুসোলিনীর দল অন্যায় করবার অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছেন নিজের প্রবল শক্তির থেকে। তারও একটা ভীষণ মহিমা আছে; কিন্তু আমাদের দেশে নীচের তলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেয়েছেন উপর-তলার প্রশ্রয় থেকে—এই অবিমিশ্র অন্যায়ে পৌরুষ নেই। তাই যারা অবিচার সহ্য করতে বাধ্য হয়, তাদের মনে সম্ভ্রম জাগে না, অশ্রদ্ধা জাগে। দেশশাসনের ইতিহাসে এই স্মৃতিটা হেয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা এই শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসন-কর্তাদের হাত বদল হবেই; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই তারা ভারত ভাগ্যের শরিক। অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর ক'রে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়

তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না। তাই আজ যে ব্যবস্থায় মুসলমানের জমার ঘরে ভুক্ত করেছে সুবিধা, দীর্ঘকালের হিসাবে সেটা রয়ে যাবে নিয়ত ক্ষতির ছিদ্ররূপে। তাবলে এই চিন্তায় হিন্দুদের সান্ত্বনার কথা নেই, কেননা আমাদের ইতিহাসে তহবিল সাধারণ তহবিল।

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৬)

[গত ১১ই মে, ১৯৪৬ 'দেশ' পত্রিকায় 'দেশ-নায়ক' শীর্ষক নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে অপ্রকাশিত ভাষণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত হয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে 'কন্‌গ্রেস' শীর্ষক পত্রটি ১৩৪৬ সালে আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে (জুলাই ১৯৩৯) প্রকাশিত। দেশ পত্রিকার পাঠকদের গোচরার্থে ইহা প্রবাসী হইতে পুনরুদ্ধৃত করা হইল। সম্পাদক—দেশ।]

ঊনিশে আষাঢ় (উপন্যাস)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—বিদ্যাসাগর বুক স্টল, ৪১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য ২॥০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুকবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থকারের 'প্রথম প্রণাম' উপন্যাস বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর মানুষের বুভুক্ষার আর্তনাদ এবং তজ্জনিত মৃত্যুই ঘটায় নাই, পারিবারিক বিচ্ছেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা অলক এবং সুজাতা ধনীর সন্তান হইয়াও দেশের ডাকে সাড়া দেওয়ার অপরাধে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা করে এবং মন্বন্তরবিধ্বস্ত সর্বহারাগণের জীবনরক্ষার জন্য পথে বাহির হয়। শেষে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দুইটি জীবন বিপন্ন, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়া মিলনের মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হইলে উপন্যাসের সমাপ্তিরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর চিত্র, গুরুদাসপুরের লঙ্গরখানা, হিমারোতপুরের হাসপাতাল, পদ্মার দৃশ্য প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রই নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অভয়বাবু একটি 'টাইপ' চরিত্র। ব্লাক মার্কেটের ভিতর অসদুপায়ে উপার্জন এবং এদিকে ব্রহ্মচিন্তা উপভোগ্য হইয়াছে। অলক, সুজাতা, কল্যাণী শ্বেতেন, অভয়বাবু প্রভৃতিকে বিস্মৃত হওয়া যায় না। মনে ইহারা ছাপ রাখিয়া যায়। উপন্যাসখানির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দলাভ করা গেল। এ গ্রন্থখানি যে পাঠকসমাজের চিত্তবিনোদন করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

নারীর রূপ—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আর এন চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, ২৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই উপন্যাসখানাতে লেখক প্রধানত নারীর দুইটি রূপ নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পুরুষের অসংযমের আগুনে একদল নারী যেমন ইন্ধন যোগাইবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, তেমনি আদর্শ, প্রেম ও একনিষ্ঠ কল্যাণকামনা দ্বারা তাহাকে নরকের দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনার জন্যও একদল নারীকে আমরা সর্বদা সচেষ্ট দেখিতে পাই। মণিবাবু সুদক্ষ কথাশিল্পী; তাঁহার এই নারীচরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ পাঠকদের মনে নূতন আলোকপাত করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। বইটির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও বহিরবয়ব অনিন্দনীয়। ৪৮।৪৬

গৌরীমা—২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীদুর্গাপুরী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

গৌরীমা ছিলেন এই বাঙলাদেশেরই মেয়ে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্যপাদোদকসেবিত এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি শৈশবেই তাঁহার মন পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি অনাসক্ত এবং ভগবদভিমুখী হইয়া পড়ে। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। আলোচ্য গ্রন্থে এই আজন্ম ব্রহ্মচারিণী কঠোর তপশ্চারিণী পুণ্যময়ীরই মহৎ জীবন কথা আলোচিত হইয়াছে। গৌরীমাতার বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন অবস্থার কয়েকখানা ছবি এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীমার দুইখানি ছবি পুস্তকখানার গৌরব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। গৌরীমার ভাগবত জীবনের এই পুণ্য কাহিনী আশা করি পাঠক পাঠিকাদের মনেও মহৎ প্রভাব বিস্তার করিবে এবং লোভ মোহময় সংসার ক্ষেত্রে তাহারা ত্যাগের ছবি দেখিয়া জীবনে মহৎ অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারিবে। ৭২।৪৬

যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য—শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত। প্রকাশক—গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

ইহা শ্রীঅরবিন্দের The yoga and Its Objects নামক ইংরাজী পুস্তকখানার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুত অনিলবরণ রায়। পুস্তকখানার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু উহার নামেই পরিস্ফুট। তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সকল পাঠকই যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য বিষয়ে অনেক জ্ঞান এই গ্রন্থ পাঠে লাভ করিতে পারিবেন। ৮০।৪৬

সাধন-সূত্র—শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত। প্রকাশক, গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তিকাখানাও শ্রীযুত অনিলবরণ রায় কর্তৃক সংকলিত ও অনুদিত। সমতা, সিদ্ধি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, শুদ্ধি, নিষ্ঠা প্রভৃতির সংজ্ঞা কি এবং সাধন মার্গে ইহাদের কার্যকারিতা কি, তাহা ইংরাজী ও বাঙলায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তিকাখানিকে সাধন সূত্রের একখানি কুঞ্জিকার মতই সাধকগণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। ৮১।৪৬

চুয়াচন্দন—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরমেশকুমার ঘোষাল এম এ, ৩৫, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য তিন টাকা।

বাঙলার কথা সাহিত্যে শরদিন্দুবাবুর স্থান কোথায় তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু মিষ্টি রচনা ও স্বচ্ছ প্রকাশ-গুণে আধুনিক কথাশিল্পের যে-কয়জন পূজারী সহজেই পাঠকদের মন হরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রথম পংক্তিতে শরদিন্দুবাবুকে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। প্রব্লেম-কণ্টকিত বন্ধুর কঙ্করময় পথে চলিতে চলিতে যাহারা এযুগের বাঙলা সাহিত্যের উপর আস্থা হারাইয়া বসেন, শরদিন্দুবাবুর গল্পে তাহারা শিশির-স্নিগ্ধ শষ্পের কোমল স্পর্শ পাইবেন।

চুয়াচন্দন ছয়টি গল্পের সমষ্টি। তন্মধ্যে চুয়াচন্দন গল্পটি সাময়িকপত্রে অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। ইহাকে অপূর্ব সৃষ্টি বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না। ইহা ভিন্ন রক্তখদ্যোৎ কর্তার কীর্তি, মরণ ভোমরা, বাঘের বাচ্চা, রক্ত সন্ধ্যা—ইহাদের সবকয়টিকেই ছোট গল্প হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ঐতিহাসিক কল্পনা তাঁহার রচনার প্রধান গুণ। আলোচ্য বইয়ের অধিকাংশ গল্পেই পাঠক ইহার প্রমাণ পাইবেন। গল্প বলিতে বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা বা উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই এবং কোন তত্ত্বের গ্রন্থিও তাঁহার গল্প বলাকে জটিল করিয়া তুলে না। এইটি কথা-সাহিত্যের বিশেষ গুণ। বইটির ছাপা নির্ভুল এবং বাঁধাই মনোরম। বইটি যে গল্পরসিকদের নিকট আদৃত হইয়াছে তাহা উহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সপ্রমাণিত। ৬৪।৪৬

সান্ধ্য প্রদীপ—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, ২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

প্রবীণ কথাশিল্পী সরস্বতী মহোদয়ার প্রতিভার পরিচয় পাঠকদের নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার অনাড়ম্বর ভাষা ও ভঙ্গীতে মিষ্টি করিয়া গল্প শুনাইবার নৈপুণ্য বাঙলা দেশের পাঠক গোষ্ঠীর একাংশে বহু পূর্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানায়ও সেই নৈপুণ্য অব্যাহত আছে। অসহায় বঙ্গ নারীর ভাগ্যের কোলে আত্মসমর্পণ, নিষ্ফল বিদ্রোহের ছটফটানি এবং পরিশেষে পতি-দেবতার পাদপীঠে আত্মসমর্পণ এই রকমভাবের একটি কাহিনী লেখিকা এখানে বিবৃত করিয়াছেন। পিশাচ সদৃশ পিতার অর্থ লালসায় বার্ধক্যের হাতে কন্যাকে বলিদান, শৈশব প্রণয়ের ব্যর্থতা ও তজ্জনিত মনোবেদনাভোগ, সব কিছু যন্ত্রণা মনে চাপিয়া বৃদ্ধ স্বামীর দম্ভের কবলে ধরা দেওয়া, প্রভৃতি বঙ্গসমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈচিত্র্যহীন চিত্রগুলি লেখিকা পাঠকদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন।

—বারো—

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। আর আধ ঘণ্টা সময়। যাবে কি যাবে না? আদর্শ আর সংকল্পকে একেবারে বিসর্জন দেবে, না বাঁধা পড়বে বাসুদেবের জীবনে? এ সময়ে সুমিতা থাকলে কাজ হত। সুমিতার মধ্যে শক্তি আছে—জোর আছে। তবু—

তবু মনে হয়েছে সুমিতাও একেবারে খাঁটি নয়। কোথায় যেন তারও ভাঙন আছে, অন্তত কাল রাত্রে তাই মনে হল। কাকে ভালোবেসেছে সুমিতা? আদিত্যদাকে? কে জানে?

কিন্তু কী করবে রমলা? বাসুদেব প্রতীক্ষা করবে। যদি না যায়, তাহলে বাসুদেব কী করে বসবে, কে জানে। তার জন্যে একটা মানুষ অসময়ে জীবনটাকে শেষ করে দেবে—নাঃ, অসম্ভব। অন্তত একবার দেখা করে আসা যাক, একবার বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক যে, এম-এ পাশ করে কলেজের অধ্যাপক হয়ে এসব ছেলেমানুষি শোভা পায় না। জীবনটাকে সহজভাবে দেখতে শিখুক বাসুদেব, বুঝতে শিখুক যে—

একটা অজ্ঞাত টানেই রমলা বেরিয়ে পড়ল।

বাসুদেব ঠিকই অপেক্ষা করছিল, ঘন ঘন অধৈর্যভাবে তাকাচ্ছিল হাতের ঘড়িটার দিকে। রমলাকে আসতে দেখে তার আগ্রহ-ব্যাকুল দুই চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল।

—এসেছ?

রমলা ম্লান বিষণ্ণ গলায় বললে, হাঁ আসতেই হল।

বাসুদেব বললে, চলো।

—কোথায় যেতে হবে?

—চলো কথা আছে।

একটা ট্যাক্সি নিলে বাসুদেব। দুজনে এল চৌরঙ্গীতে—ঢুকল একটা নিরিবিলি ছোট রেস্তোরাঁয়।

রমলা বললে, আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বেশ, আমিও খাব না।

—অমনিই রাগ হল? আচ্ছা, তাহলে চা নাও দু পেয়ালা।

চায়ের কথা বলে দিয়ে বাসুদেব একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালো রমলার দিকে। তারপরে সোজা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী ঠিক করলে?

রমলা টেবিলটার ওপরে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল, জবাব দিলে না।

বাসুদেব নাছোড়বান্দা। বললে, কী ঠিক করলে?

—তুমি ফিরেই যাও।

—আর তোমার কিছু বলবার নেই?

রমলা বললে, না। —তার গলা কাঁপতে লাগল।

—আমার চাইতেও তোমার কাজ বড়?

রমলা আবার চুপ করে রইল। একথার জবাব দেবে কি, জবাবটা তার নিজেরই জানা নেই। কে বড়, কে ছোট এটা যদি বুঝতে পারত তাহলে অনেক আগেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বুঝতে পারেনি বলেই তো এই বিপত্তিটা দেখা দিয়েছে।

—স্বীকার করি, যে কাজ তুমি করছ, তার দাম আছে। নিজের দেশকে ভালোবাসি না, এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই—বাসুদেবের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল ঃ কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব কাজ সকলের জন্যে নয়। আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেবার কী অধিকার তোমার আছে, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে তোমার মুখ থেকে জানতে চাই রমলা।

রমলা মুখ তুললে। গালের দুপাশে উত্তেজিত রক্তের কণিকা এসে জমেছে। সে নিজেই দুর্বল—নিজের কাছে নিজেই একান্ত-ভাবে অসহায়। বাসুদেবকে কেমন করে সংযত করবে, কেমন করে জয় করবে?

—কিন্তু আমি ছাড়া আরো তো মেয়ে আছে—রমলা আস্তে আস্তে বললে কথাটা। কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন অপরিচিত আর বেখাপ্পা-ঠেকল। সত্যিই আজ যদি সে শুনতে পায় যে, বাসুদেব আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে, তাহলে মনের দিক থেকে সেকি সুখী হতে পারবে একবিন্দুও?

বাসুদেব উত্তেজিত গলায় বললে, মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু তাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি নি। অনর্থক ওসব কথা বোলো না রমলা, অকারণে আমাকে আঘাত দিয়ো না।

রমলা বললে, আঘাত কেন পাও? কেন সহজভাবে বিদায় করে দিতে পার না আমাকে? তোমার জীবন থেকে, তোমার কামনা থেকে?

বাসুদেব যেন হিংস্র হয়ে উঠল ঃ সেই-খানেই তো আমার কাল হয়েছে। তা যদি পারতাম, তাহলে কোন সমস্যাই আজকে আর দেখা দিত না। অবজ্ঞা করতে পারি না, ভুলতে পারি না, আঘাত করে সান্ত্বনা পাই না। ওইতেই আমার মরণ হয়েছে—

বাসুদেব আরো কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল।

রমলা দু পেয়ালায় চা ঢাললে। একটা চুমুক দিয়ে বাসুদেব বললে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। অনেক বিরক্ত করেছি, আর করব না। আজ শুধু শেষ কথাটা শুনে যেতে চাই।

রমলা মৃদু গলায় বললে, আমার কথা তো শুনেইছ। অনেক কাজ—অনেক দায়িত্ব। এখন এসব ফেলে দিয়ে নিজের সুখ আমি বেছে নিতে পারব না।

বাসুদেব খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল —তার হতাশাক্ষিপ্ত জ্বলন্ত চোখের আগুন যেন দগ্ধ করতে লাগল রমলাকে। আর রমলা রইল মাথা নত করে—বাসুদেবের ওই অগ্নিময় চোখের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। শুধু দুজনের চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের সুরভিত ধোঁয়া কতগুলো এলোমেলো সর্পিল রেখায় উঠে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। আ কানে আসছে চৌরঙ্গীর ট্রাফিকের অবিরা গর্জন।

বাসুদেব বললে, এই শেষ কথা?

রমলা জবাব দিলে না।

বাসুদেবের মুখে দৃঢ়সংকল্পের এক কঠিনতা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই পকে হাত দিয়ে একটা ছোট শিশি সে বের ক আনল। নীল রঙ, চ্যাপ্টা ছিপি।

—দেখেছ?

—এ কী!

রমলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন গলায় বাসুদেব বল হাইড্রোসায়ানিক। ভালো জিনিস, বেশি স লাগবে না।

সভয়ে রমলা বাসুদেবের হাত আঁ ধরলে, না—না।

বাসুদেব তেমনি নিরাসক্ত গলায় বল তোমার ক্ষতি কী! তোমার আদর্শ আ সংকল্প আছে। এ তোমার মনেও থাকবে পৃথিবীতে কত মানুষই তো প্রত্যেক দিন এ

করে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে কে আর চোখের জল ফেলতে যাচ্ছে বলো ?

এতক্ষণে রমলা বাসুদেবের হাত থেকে জিনিসটাকে আয়ত্ত করে ফেলেছে। বাসুদেব কিন্তু জোর করেনি, খুব সামান্যতেই তার হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে।

রমলা বললে, না।

—আমাকে মরতেও দেবে না ?

—না। —রমলার চোখ এবারে জ্বলতে লাগল : ভেবেছ ইচ্ছে করলেই তুমি মরতে পারো ?

—আমার ওপরে তোমার দাবী আছে ?

—নিশ্চয়।

আধ ঘণ্টা পরে সেই ট্যাক্সিটাই আবার বেরিয়ে পড়ল রাজপথে। চলো গড়ের মাঠে, চলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, চলো লেকে। যুদ্ধ এসেছে, দুর্দিন এসেছে—তাতে ক্ষতি কী। জীবন এখনো রিক্ত হয়ে যায়নি—প্রেমের মৃত্যু ঘটেনি এখনো। সমস্ত দুঃখ সমস্ত ব্যথার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয় ভালোবাসা ধ্রুবতারার মতো চিরজাগ্রত হয়ে আছে। (ক্রমশ)

কল্পনা ও বাস্তব

বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কে কাহাকে অনুসরণ করে? সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বাস্তবের তল্পি বহন করিয়াই কল্পনা চলে। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ হইলে ইহাই স্বাভাবিক—কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি ঠিক সেই সম্বন্ধ? বরঞ্চ বলিতে হয় যে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে বর-বধূর সম্পর্ক। কল্পনার বধূকে বাস্তব বর অনুসরণ করিয়া সপ্তপদী গমন করিতেছে না কি? আমাদের শাস্ত্রে 'শব্দ ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এই শব্দ ব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতম রূপ—আর আধুনিক ভাষায় শব্দ ব্রহ্মের অর্থ দাঁড়াইবে—আইডিয়া বা কল্পনা। বিধাতাপুরুষের কল্পনাকে অনুসরণ করিয়া বাস্তব অবতীর্ণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলে যে আদিতে ছিল 'word'—এই—'word'—আইডিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। word বা আইডিয়া জগৎকে চালিত করিতেছে যেমন ঘোড়া গাড়ীখানাকে টানিয়া লইয়া যায়।

ইহা যদি সত্য হয়, আমার বিশ্বাস ইহাই একমাত্র সত্য, তবে আইডিয়া পরিচালিত ব্রহ্মাণ্ডের মতো সাহিত্য বস্তুটাই আইডিয়া-সম্ভূত এবং আইডিয়া পরিচালিত। সাহিত্যে যাহাকে রিয়ালিজম্ বলি, তাহা আইডিয়ার টানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সব সাহিত্যই মূলত Idealistic বা আদর্শিক। সাহিত্যে নিছক বাস্তব অশ্ব-বিচ্ছিন্ন গাড়িখানার মতো, যতই সুনির্মিত হোক না কেন—তাহার নড়িবার শক্তি নাই। যে নিজেই নড়িতে অসমর্থ মানুষকে তাহা চালিত করিবে কি ভাবে? কিন্তু মানুষ অবোধ শিশুর মতো সে বাহন-হীন গাড়িখানার মধ্যে ঢুকিয়াই গাড়ি-চড়ার সার্থকতা অনুভব করে—মনে করে তাহার গাড়ি চলিতেছে।

সাহিত্যের বাস্তবকে ইন্ধন বলা যাইতে পারে। এই স্তূপীকৃত ইন্ধন একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আকাশের বৈদ্যুতিক স্পর্শে সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ হইলে প্রজ্বলিত ইন্ধন তাহার সার্থকতা পায়। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই আইডিয়া। এই আইডিয়া আকাশে আকাশে অদৃশ্যভাবে নিত্য সঞ্চারিত হইয়া পর্বতের শিখরে শিখরে ইন্ধনের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ইন্ধনকে সঞ্চয় করিতে, সংগ্রহ করিতে হয়, আইডিয়ার করস্পর্শের অনুকূল করিবার নিমিত্ত শুকাইয়া তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আইডিয়ার উপরে মানুষের কোন হাত নাই—তাহার জন্য অসহায়-ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। রত্নাকরের শুষ্ক জীবনেন্ধনের উপর 'বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণ' কবে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।
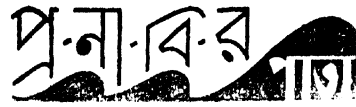
আইডিয়া শাশ্বত, ইন্ধন ক্ষণিক। আইডিয়া শাশ্বত বলিয়াই তন্মধ্যে আভাসে সর্বকাল, সর্বদেশ রহিয়া গিয়াছে—এই কারণেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে prophetic বলা হইয়া থাকে। ইলিয়াডের সংগ্রাম বর্ণনায় ভবিষ্যতের সমস্ত যুদ্ধই বর্ণিত হইয়া গিয়াছে আবার ইউরিপিডিসের 'Trojan women'-এর দুঃখে পৃথিবীর যুদ্ধাভিহত যাবতীয় নারীর দুঃখ চিত্রিত। আকাশের বিদ্যুৎ-সঞ্চারে যে-কাব্য প্রদীপ্ত, তাহা যে-কালের, যে-দেশেরই হোক না, তাহার শাশ্বত শিখা যেমন অনির্বাণ, তেমনি তাহার জ্যোতি মানবজীবনের অন্ধিসন্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেও সমর্থ।

রবীন্দ্র সাহিত্য আকাশাগ্নি দীপ্যমান। মুক্তধারা ও রক্তকরবীর দুটি অংশ তুলিয়া দিলে বুঝিতে পারা যাইবে যন্ত্র ও যন্ত্রবাদের পরিণাম কি ভয়াবহ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বাস্তবে একটা যন্ত্র দেখিয়া যাহা আমাদের মনে হওয়া উচিত অথচ হয় না—সেই নির্মমের কি মনোরম প্রকাশ।

[দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে......।]

পথিক

আকাশে ওটা কি গ'ড়ে তুলেছে? দেখ্‌তে ভয় লাগে।

নাগরিক

জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক

কিসের যন্ত্র?

নাগরিক

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ তো শেষ হ'য়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক

যন্ত্রের কাজটা কি?

নাগরিক

মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেছে।

পথিক

বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তর-কূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে; দিন রাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাবে।

নাগরিক

আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুৎ আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক

তা হ'তে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হ'ত। দেখ্‌তে পাচ্ছনা যেন দিন রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে। [মুক্তধারা]

ইহা চিরকালীন যন্ত্রের বর্ণনা হইলেও কলিকাতার নাগরিকদের সহিত এই বর্ণনার বিশেষ যোগ আছে। উত্তর-কূটের সর্বত্র যেমন ওই যন্ত্রটা পরিদৃশ্যমান—কলিকাতার সর্বত্র হইতে গঙ্গার নূতন শাঁকোটা তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ঊর্ধোত্থিত দুই লৌহভুজ

অতিকায় মহিষের উদ্ধত দুই শৃঙ্গের মতো আকাশটাকে যেন সর্বদা ঢুঁ মারিতে উদ্যত। মহিষ-ই বটে—যম রাজার বাহন। যন্ত্রবাহনে চাপিয়া• তিনি আসিতেছেন—ওই তাঁহার মহিষের প্রচণ্ড শৃঙ্গ, কলের চিমনির প্রশ্বসিত ধূমে তাহার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস—কলের চীৎকারে তাহার গর্জন আর লাল আলোয় তাহার রক্তচক্ষু। কিন্তু কলিকাতার নাগরিকদের প্রাণপুরুষ নাকি খুব মজবুৎ—তাহারা ভাবনা করে না। কিন্তু একি সাহস না চিত্তের অসাড়তা।

এই তো গেল যন্ত্রের রূপ—যন্ত্রবাদের পরিণামের রূপ আছে—রক্তকরবীতে। '

নন্দিনী

সর্দার, সর্দার, ওকি! ও কারা!

নন্দিনী

চেয়ে দেখো, ওকি ভয়ানক দৃশ্য। প্রেত-পুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কির দরজা দিয়ে?

সর্দার

ওদের বলি আমরা রাজার এঁটো।

নন্দিনী

মানে কি।......কিন্তু এসব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মন-প্রাণ কিছু কি আছে?

সর্দার

হয় তো নেই।

নন্দিনী

কোন দিন ছিল?

সর্দার

হয় তো ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায়......।

হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌তো, সে আমার ডাকে সাড়াই দিল না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হ'ল! [রক্তকরবী]

প্রেতপুরীর দরজা প্রতিদিন খুলিয়া যায় দশটা পাঁচটায়। দশটায় ইহারা প্রেতপুরীর ভিতরে ঢোকে—রাজার এঁটো হইয়া পাঁচটায় বাহির হয়। যে-কোন বড় কারখানা বা আপিস পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইলে রাজার এঁটোর এই শবযাত্রা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিয়াছি লালদীঘি পাড়ায় বেলা পাঁচটায় শোকাবহ শবযাত্রা। চোয়াল ভাঙা, গাল বসিয়া-যাওয়া, মুখ তোবড়ানো চলমান কঙ্কালের শ্রেণী! ব্লটিং পেপারে কালির মতো ইহাদের জীবন হইতে রূপ রস প্রাণ সৌন্দর্য ও শুভেচ্ছা কে যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। আশেপাশে ইহাদের তাকাইবার অবকাশ নাই—টলিতে টলিতে ইহারা চলিয়াছে। স্বয়ং উর্বশীও সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে ইহারা ফিরিয়া চাহিবে না। নন্দিনীকে ইঁহাদের চোখে পড়িবে কেমন করিয়া, প্রেমের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি ইহাদের আর বিশ্বাস নাই। যন্ত্রবাদের সবচেয়ে দুর্দৈব এই যে আইডিয়ার উপরে ভরসা চলিয়া যায়। যে রক্তধারা কলের নির্জীব একচ্ছন্দ হাসফাসানিতে সাড়া দিতে শিখিয়াছে নন্দিনীর ইশারায় তাহা নাচিয়া উঠিবে কেমন করিয়া?

যন্ত্রের প্রসারকে আমরা সভ্যতার প্রসার বলি—চারদিকে আজ কেবল ব্যবসাবাণিজ্য আর 'ইনডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং'-এর রব, প্রেতের শোভাযাত্রা বুদ্ধির ভূমিকা। তখন যন্ত্রের ফুৎকার ও চীৎকার ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আমার কানে প্রবেশ করিতেছে নন্দিনীর ওই আর্তনাদ 'গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।' নন্দিনীর কান্নায় কি আসে যায়—তাহার উপরেই যে আমাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[১১]

আমাদের হাসপাতাল ব্যারাকের প্রায় পাশ ঘেঁসেই শুরু হয়েছে জেলের উঁচু লাল প্রাচীর। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। প্রাচীরের উপরে মাঝে মাঝে রাইফেলধারী প্রহরী। ভিতরে বেশ আমোদেই দিন কাটাতাম, ভুলে যেতাম আমরা বন্দী। কিন্তু বাহিরের দিকে তাকিয়ে যখন উঁচু পাঁচিল দেখতাম, তখন বুঝতে পারতাম—আমরা বন্দী, বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নেই।

বৃটিশ আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর নাম দিয়েছে JIFC অর্থাৎ Japanese Inspired Fifth Collumnist—জাপানী প্রণোদিত পঞ্চম বাহিনী। এ নামকরণের কোনও সার্থকতা আছে কিনা জানি না। তবে বৃটিশ প্রহরীদের মুখে মাঝে মাঝে 'জিফ' কথাটা শুনে মনে হোত এদের বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমরা পঞ্চম বাহিনীর লোক। অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, আমাদের নিজের গভর্নমেণ্ট, আমাদের দেশপ্রেম সব কিছু উপেক্ষা করে দেশী ও বিদেশীর সামনে—আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে—জাপানীর পঞ্চম বাহিনী নাম দিয়ে দেশকে জানানো হচ্ছে—এরা দেশের শত্রু। বৃটিশ প্রোপাগাণ্ডাকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই—কারণ এরা রাতকে দিন ও দিনকে রাত করতে পারে। তবে দুঃখের বিষয়—এটি বৃটিশের পক্ষে নূতন নয়। অন্তত ভারতবাসী বৃটিশকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে।

এখানকার জেলে আমাদের ক্যাম্প কমাণ্ডারের কাজ করতেন—মেজর নেগি। একবার গেটের ভিতর ঢুকলেই যা কিছু বন্দোবস্ত সব আমাদেরই হাতে। বাইরে থেকে রোজই আমাদের রাশন আসতো। এখানেও রাসন বেশ ভালোই ছিলো। টাট্‌কা তরিতরকারী না থাকলেও টিনের তরকারী যথেষ্ট পাওয়া যেতো। আমি বহুদিন মেস-সেক্রেটারীর কাজ করেছি—কাজেই এখানেও সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলাম। আমাদের তেরজন ডাক্তারের আলাদা রান্না হ'ত। একটু কষ্ট করে দেখাশোনা করলে বেশ উপাদেয় খাবারই তৈরী হ'ত। হাতে কোনও কাজ ছিল না—কাজেই সেক্রেটারীর থেকে ক্রমশ রাঁধুনির পদে আমাকেই নামতে হ'ল। দিনের বেশীরভাগ সময়ই রান্নাঘরে কাটাতাম বলেই আমাদের 'লংগরী'ও যত্ন নিয়ে রান্না করতো।

আমাদের সৈন্যদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হোত 'ফেটিগের' জন্য। প্রতিদিন যতজন লোকের দরকার হ'ত, আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের অফিসারকে তা জানিয়ে দিতো। পরদিন সকালে একবেলার তৈরী খাবার নিয়ে তারা বাইরে যেতো—আবার বিকাল পাঁচটায় বা ছটায় ফিরে আসতো! এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ডকে মালপত্র উঠানো ও নামানোর কাজ করতো কতককে পথঘাট পরিষ্কার করার কাজেও লাগানো হ'ত। এরা মাঝে মাঝে আবার বেশ মারপিট করেও ফেরৎ আসতো! কখন কোনও গোরা বা ভারতীয় অফিসার এদের গালি দিলে এরাও ঝগড়া এমন কি দরকার হলে দু'ঘা কষিয়ে দিয়ে আস্‌তো। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলা যথেষ্ট ছিলো। তারা কাজ করতে মোটেই ভয় পেতো না, কিন্তু গালিগালাজ মোটেই বরদাস্ত করতে পারতো না। যেখানে যেতো, তাদেরই ব'লতো আমরা যুদ্ধে হেরে তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছি—কাজ যা করবার আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তা করবো—কিন্তু গালি বা অপমান সইবো না। কাজেই আমাদের বন্দীদেরও অপরপক্ষ বেশ সমীহ করতো। বৃটিশ পক্ষের ভারতীয় সেনাদের দেখাবার জন্যই মেজর নেগি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে আমাদের বালসেনা দলের ছোট ছোট ছেলেদেরও ফেটিগ দলের সংগে বাইরে পাঠাতেন। তাদের দেখে ও পরিচয় পেয়ে তারা আশ্চর্য হ'ত। বুঝতে পারতো কত বিরাট এদের প্রতিষ্ঠান।

এখানে রক্ষী দলের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই স্টেটস্‌ম্যান ও সাউথ ইস্ট এসিয়াটিক কম্যাণ্ডের খবরের কাগজ পড়তে পেতাম। তাতে যুদ্ধের খবর থেকে সবই কিছু কিছু পাওয়া যেতো। বৃটিশ মান্দালয় থেকে রেংগুন পর্যন্ত সোজা রাস্তা ও রেলপথ অধিকার করলেও, জাপানীদের এসব এলাকা থেকে একেবারে তাড়াতে পারে নি। জাপানীরা সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে, তারা এবার চেষ্টা করছে রাস্তা ও সিটাং নদী পার হয়ে, সান স্টেটের জংগলের মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্য। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাতের আঁধারে রাস্তা ও নদী পার হ'তে চেষ্টা করে এবং পারও প্রায়ই হয়ে যায়। এমনিভাবে রাস্তা পার হওয়ার সময় পথের পাশে বৃটিশের কোনও আড্ডা থাক্‌লে তা আক্রমণ করে, লুঠ করে। গ্রামের ভিতরে তখনও অনেক জাপানী ছিলো—তাদের তাড়াবার ভার পড়েছে গুর্খা সৈন্যদের উপর। কারণ একমাত্র গুর্খা ছাড়া জাপানীদের সংগে হাতাহাতি যুদ্ধ অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্মায় এখনও যুদ্ধ চলেছে। জাপানীরা তাদের গেরিলা পদ্ধতিতে এখনও স্থানে স্থানে বৃটিশকে বেশ উত্যক্ত করছে। রাস্তার দু'পাশে একটু দূরের বস্তীতে এখনও বহু-সংখ্যক জাপানী সৈন্য রয়েছে। জাপানীদের নিজের কাছে রেশন প্রভৃতি কিছুই ছিলো না, তারা গ্রাম থেকে, জোর জবরদস্তি করেই খাদ্য সংগ্রহ করতো; রাতের আঁধারে হঠাৎ তারা গ্রামে এসে হাজির হয়, সারাদিন জংগলে লুকিয়ে থাকে, আবার রাতে অন্য গ্রামে যায়। যেসব দলে জাপানীরা কম থাকে বা তাদের কাছে বিশেষ অস্ত্রাদি থাকে না, সুযোগ ও সুবিধা-মতো বর্মীরা তাদেরও কেটে ফেলে। সারা বর্মাতেই এমনি ভাবের গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে।

জেলের ভিতরে আমাদের দিন আমোদেই কাট্‌তো। ডাক্তার ছিলাম আমরা তেরোজন, অথচ কাজকর্ম বিশেষ ছিলো না। দুজন হাস-পাতালের রুগীদের দেখ্‌তো ও একজন ক্যাম্পের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দেখতো। বাকী সবাইর কাজ শুধু খাওয়া আর ঘুমানো। কাজেই স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আমাদের ক্যাপ্টেন যোশী, সুরু করলেন ব্যায়াম। প্রথমে সকলেই তাকে 'বজরংবল্লী' নাম দিলো, কিন্তু পরে দেখা গেলো সকলেই ভোর বেলা উঠে বেশ উদ্যমের সংগে ডন, বৈঠক শুরু করেছে। আমাদের হেমদা এতো কষ্টকর ব্যায়াম করতে রাজী নয়—কাজেই বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে বেশ আরামদায়ক কয়েকটি নূতন ব্যায়াম আবিষ্কার করলেন। আর মল্লিকদা বেশ উৎসাহের সংগে তাতে যোগ দিলেন। সকালে খানিকটা ব্যায়ামের পর চা ও জলযোগ—তারপর শুরু হল পড়াশোনা। কেউ বা বসতো খবরের কাগজ নিয়ে, কেউ বা রবার্ট ব্লেক সিরিজ নিয়ে, আর আমাদের মল্লিকদা

বসলেন বিরাট 'এনাটমী' নিয়ে। মল্লিকদা গাছগড় হাসপাতালে সার্জন ছিলেন। কাজেই এখানেও সার্জন নামে পরিচিত। আমি হেমদা ডাঃ উদম সিং প্রভৃতি বসতাম তাস নিয়ে। সারাটা সকাল তাস পিটে, খাওয়া, তারপর ঘুম। বিকালে স্নান, চা পান, তারপর বৃষ্টি হলে বারান্দায় পায়চারি করা, বৃষ্টি না হ'লে জেলের ভিতরের সোজা বড় রাস্তায় খানিকক্ষণ পায়চারি করা। সন্ধ্যার পর বেশ খানিকটা আলোচনা ও হৈ চৈ। ডাঃ কানাই দাস বেশ গাইতে পারতো। তার কাছে শুনতাম বাঙলা আর মকসুদের কাছে শুনতাম পাঞ্জাবী গান। তারপর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজ সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনাও হত। এই-ভাবে গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে বন্দীজীবন কাটাতে লাগলুম।

এখানে এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পর শুনলাম, এখানে থেকে আমাদের অন্য জায়গাতে যেতে হবে। বর্মার প্রত্যেক জায়গাতে বৃটিশ তাদের এতো সৈন্য সমাবেশ করেছে যে, তাদের স্থান সঙ্কুলান আর হচ্ছে না। কাজেই জেলটি তারা অধিকার করতে চায়। জেল থেকে প্রায় চার মাইল দূরে মাঠের মধ্যে আমাদের তাঁবুতে থাকার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জুলাই মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে নূতন আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হলাম। চারিদিকে বেশ সুন্দরভাবে কাঁটা তারের বেড়া, চারকোণে উঁচু মঞ্চের উপরে মেসিন গান লাগিয়ে বৃটিশ প্রহরী। এক একটি তাঁবুতে ষোলজন করে থাকার জায়গা। ১৬০ পাউণ্ডের তাঁবুতে ষোলজন থাকা অসম্ভব হলেও আপাততঃ তাই সম্ভব করা হল। স্নান ও অন্যান্য কাজের জন্য ক্যাম্পের ভিতরের দু'টি কূয়া ব্যবহার করা হত। পানীয় জল রোজই লরী করে এনে ভিতরে ট্যাঙ্কে ভর্তি করা হত। এখানেও আমরা একইভাবে দিন কাটাতাম। এখানে সব চেয়ে সুবিধা ছিলো যে, উঁচু লাল পাঁচিল আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরায় হ'তে পারে নি। বহুদূর মাঠ ও আশপাশের—ছোট ছোট বস্তীগুলি আমরা দেখতে পেতাম।—

আমাদের অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে কয়েক-জন বিশেষভাবে মর্মাহত হয়। পরে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ব্যাংককের একজন ধনী ব্যবসায়ী এইরূপ একজন। ভদ্রলোক অফিসার ট্রেণিং স্কুল থেকে পাশ করেন, আমাদের আত্ম-সমর্পণের জন্য কোনও কাজ করবার সুযোগ পান নি। তিনি রোজই আমাদের কাছে এসে অনেক কিছু বলতেন। অনেকে বিরক্ত হ'লেও আমরা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতাম। যোশী মারাঠী ব্রাহ্মণ। তাকেই শেষে তিনি 'গুরুদেব' বলে মানতে শুরু করলেন, আর তার উপদেশে বেশী বক্তৃতা না করে, সব কিছু লিখে রাখতে শুরু করলেন। এমন কি সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পর্যন্ত শুরু করলেন। আমার তাঁবুতে যোশী থাকতো কাজেই প্রায় রোজই সকাল থেকে তিনি আমা-দের তাঁবুতে পড়ে থাকতেন। তাঁকে শান্ত রাখার জন্য আমরাও মাঝে মাঝে একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করতাম। তিনি এলে পরেই একটি কাগজে লিখে জানাতাম, আজ আমার মৌনব্রত। কাজেই তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে হত। একজন শিখও এমনি ছিলো। তবে বেশীর ভাগই গালাগালি করতো। এই রকম কয়েকজনকে আমাদের সামলাতে মাঝে মাঝে বেশ বেগ পেতে হ'ত।

নেতাজী যখন রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যান, সে-সময়ে তাঁর শেষ দিনের হুকুমনামা জারী করেন। তাতে তিনি বলেন, "বিশেষ দুঃখের সঙ্গেই আমি আজ আমার সহকর্মীদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমার প্রাণ চিরদিনই তোমাদের কাছে থাকবে। আজ অবস্থার পরিবর্তন হলেও আমাদের এই ত্যাগ, এই দুঃখ কষ্টবরণ বৃথা হবে না। যাবার আগে আমি বর্মায় অবস্থিত আমার আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যকে এক পদ উচ্চ পদবী দান করছি।" তাঁর এই শেষ দিনের আদেশ মতোই আমরা সব ক্যাপ্টেন মেজর পদে উন্নীত হই। এ খবর আগে আমাদের কাছে 'জিয়াওয়াদীতে' পেঁছাতে পারে নি, কিন্তু রেঙ্গুন পেঁছানর পর আমরা সব শুনে মেজর বলেই নিজেদের পরিচয় দিতাম।

এখানেও তাঁবুতে দিন মন্দ কাট্‌ছিলো না। তবে যেদিন বৃষ্টি হতো সেদিন বেশ অসুবিধায় পড়তাম। এখানেও ভিতরের বন্দোবস্ত সব কিছু আমাদেরই হাতে ছিলো। এখানে আসার কিছু দিন পরেই শুনলাম, আমরা হয়তো খুব শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে যাবো। এখনও আমরা ভারতবর্ষে যাওয়ার পর কি অবস্থা হবে সে বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। তবে হাজার হলেও দেশের মাটীর জন্য সব অবস্থাতেই মানুষের প্রাণ কাঁদে। পরে শুনলাম, যারা বাস্তবিক রুগী নয়, অথচ স্বাস্থ্য খারাপ তাদেরই আগে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই হিসাবে তাদের তালিকা তৈরী করে দেওয়া হল। এই দলে প্রায় দু'শোজন হলো, তার মধ্যে ডাক্তার রইলাম আমরা সাত-জন। বাঙালী আমি ও হেমদা।

৪ঠা আগস্ট সকালে আমাদের তৈরী হওয়ার হুকুম হলো। সকালের খাওয়া শেষ করে তৈরী হলাম। গেট থেকে বেরোবার আগে লালটুপী মিলিটারী পুলিশের কতকগুলি বৃটিশ আমাদের আর একবার তালাসী নিলো এখানে আপত্তিকর জিনিস ছাড়াও তাদের ইচ্ছা মত জিনিস তারা আটকে রাখতে লাগল দেশলাইয়ের বাক্স সকলের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো। অনেককে চামচ ইত্যাদি হারাতে হ'লো। আবার জিনিসপত্র বেঁধে তৈরী হলাম। কয়েকখানা লরী আমাদের নিয়ে একে বারে রেঙ্গুন ডকে এসে হাজির হলো। এখানে পেঁছে দেখি, রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলখানা থেকেও প্রায় দু'শোজন আমাদের আগেই ডকে এসে পেঁচেছে। কিছু দূরেই একখানা ছোট জাহাজ তৈরী ছিলো। আমরা নৌকায় চড়ে জাহাজে হাজির হলাম। সন্ধ্যার অল্প পরে জাহাজ আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পুত্রবতী বিধবা

"প্রেমচন্দ"

পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যু হইলে সকলে কহিল, ভগবান যেন এরূপ মৃত্যুই দেন। অযোধ্যানাথের চার ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে চার জনেরই বিবাহ হইয়াছে, মেয়েটি এখনও কুমারী। অযোধ্যানাথ প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একখানা পাকা বাড়ি, দুইটি বাগান, কয়েক হাজার টাকার গহনা আর বিশ হাজার টাকা নগদ। বিধবা হইয়া ফুলমতী শোকের আবেগে কয়েকদিন প্রায় বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শেষে উপযুক্ত ছেলেদের মুখের দিকে চাহিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহার চার ছেলেই পরম সুশীল, চার বধূই একান্ত বাধ্য। ফুলমতী রাত্রে শুইতে গেলে চার বধূ পালা করিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিত। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে বধূরাই তাঁহার কাপড় ধুইয়া দিত। সমস্ত পরিবার তাঁহারই ইঙ্গিত মত চলিত। বড় ছেলে কামতানাথ এক অফিসে ৫০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরী করে। মেজ ছেলে উমানাথ ডাক্তারী পাশ করিয়াছে, এখন কোথাও ঔষধের দোকান খুলিয়া বসিবার চেষ্টায় আছে। তৃতীয় পুত্র দয়ানাথ বি এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া এখন নানা কাগজে প্রবন্ধ লেখে, কিছু কিছু রোজগারও হয়। আর চতুর্থ সীতানাথ সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও চতুর। সে প্রথম শ্রেণীতে বি এ পাশ করিয়া এখন এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। চার ছেলের মধ্যে কাহারও কোনও বিলাস-ব্যসন বা টাকা পয়সা নষ্ট করিবার বদখেয়াল নাই—যাহা থাকিলে বাপমায়ের জ্বালা বাড়ে আর বংশের মর্যাদা ডুবিয়া যায়। ফুলমতী ঘরের কর্ত্রী ছিলেন। বাক্সের চাবি অবশ্য বড় বধূর কাছেই থাকিত। যে কর্তৃত্বের গর্বে বৃদ্ধেরা কর্কশ প্রকৃতির ও কলহপরায়ণ হয়, বৃদ্ধার মনে সেইরূপ কর্তৃত্বের অহঙ্কার ছিল না। কিন্তু তবুও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়ির কোন শিশুর পর্যন্ত কোন খাবার কিনিবার উপায় ছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর আজ দ্বাদশ দিন। কাল ত্রয়োদশীর ক্রিয়াকর্ম। ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। সমাজের লোকজনদের নিমন্ত্রণ হইবে। তাহারই যোগাড়-যন্ত্র চলিতেছে। ফুলমতী নিজের ঘরে বসিয়া দেখিতেছিলেন যে, কুলীরা বস্তায় বস্তায় আটা আনিয়া রাখিতেছে। ঘি-এর টিন আসিতেছে। শাকপাতার টুকরি, চিনির বস্তা, দই-এর ভাঁড় সব আসিয়া পড়িতেছে। শ্রাদ্ধের দানের সব জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে—বাসন, কাপড়, খাট, বিছানা, ছাতি ছড়ি লণ্ঠন প্রভৃতি। কিন্তু কেহই ফুলমতীকে কোন জিনিস দেখায় নাই। নিয়ম অনুযায়ী এই সব জিনিস তাঁহার কাছেই আনা উচিত ছিল। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস দেখিতেন, পছন্দ করিতেন, কম বেশির বিচার করিতেন, তবে এই সব জিনিস ভাঁড়ারে তুলিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। কেন, আর কি তাঁহাকে দেখাইবার, তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই নাকি? আচ্ছা, আটা তিন বস্তা কেন আসিল? তিনি তো পাঁচ বস্তার কথা বলিয়াছিলেন। ঘিও তো পাঁচ টিন মাত্র আসিয়াছে। তিনি তো দশ টিন আনাইতে বলিয়াছিলেন? এই রকমভাবে তরি-তরকারী, চিনি, দই ইত্যাদি সব জিনিসেরই বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তাঁহার হুকুমে কে হস্তক্ষেপ করিল? তিনি যখন একটা বিষয় স্থির করিয়া দিলেন, তখন তাহাতে কম বেশি করিবার অধিকার কার?

আজ চল্লিশ বৎসর যাবত সংসারের প্রতি কাজে ফুলমতীর মতামত সকলের শিরোধার্য ছিল। তিনি এক শত বলিলে এক শত, এক টাকা বলিলে, এক টাকাই খরচ হইয়াছে। তাহাতে কেহই কোন কথা বলে নাই। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পর্যন্ত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতেন না। আর আজ তাঁহার চোখের সামনে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার আদেশ অবহেলা করা হইতেছে। এই অবস্থা তিনি কেমন করিয়া সহিয়া থাকিবেন।

কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু শেষে আর থাকিতে পারিলেন না। সকলের উপর আধিপত্য করাই তাঁহার স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কামতানাথকে গিয়া বলিলেন—আটা কি তিন বস্তাই এনেছ? আমি তো পাঁচ বস্তার কথা বলেছিলাম। আর ঘি বুঝি মাত্র পাঁচ টিন এনেছ? তোমার কি মনে নেই যে, আমি দশ টিন আনতে বলেছিলাম? খরচ বাঁচানো খারাপ বলে আমি বলি না। কিন্তু যে লোকটা কুঁয়ো খুঁড়েল তাঁর আত্মাই জলপিপাসায় কষ্ট পাবে, এটা কত বড় লজ্জার কথা?

কামতানাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিল না, নিজের ভুল স্বীকার করিল না, লজ্জিতও হইল না। মিনিটখানেক বিদ্রোহীভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে বলিল—আমরা পরামর্শ করে তিন বস্তা আটা আনাই স্থির করেছি। আর তিন বস্তা আটার জন্য পাঁচ টিন ঘিই যথেষ্ট। এই হিসেবে অন্যান্য জিনিসও কম করে দেওয়া হয়েছে।

ফুলমতী উগ্র হইয়া বলিলেন,—কার হুকুমে আটা কমান হল শুনি?

আমাদেরই হুকুমে।

তবে আমার কথা বুঝি কিছুই নয়?

কিছুই নয় কেন; কিন্তু আমাদের নিজেদের লাভ লোকসান আমরাও তো বুঝি?"

ফুলমতী অবাক্ হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। নিজেদের লাভ-লোকসান। বাড়িতে লাভ-লোকসান খতাইবার লোক ফুলমতী নিজে। অপর কেহ—তা সে হউক না কেন নিজের পেটের ছেলে, তাঁহার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবে কোন্ অধিকারে? ছোক্রার ধৃষ্টতা দেখ। এমনভাবে কথার জবাব দিল যেন বাড়িঘর উহারই; যেন এই ছোঁড়াই না খাইয়া না পরিয়া এই সংসারের সব জিনিস করিয়াছে। আমি তো পর! ইহার হৈচৈটা একবার দেখ।

ফুলমতী রাগে আগুন হইয়া কহিলেন—আমার লাভ-লোকসান তোমাকে দেখতে হবে না। আমার ক্ষমতা আছে, আমি যা ভাল বুঝব তাই করব। এখনই গিয়ে আরো দুই বস্তা আটা আর পাঁচ টিন ঘি আন। আর খবরদার, আবার যেন কেউ আমার কথার উপর কথা না কয়।

ফুলমতী মনে মনে কহিলেন যে, বড় বেশি ধমকানো হইয়া গেল। বোধ হয় এত কড়া না হইলেও চলিত। এত কড়া কথা বলিয়া ফেলিয়া এখন তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল। তাঁহার নিজের ছেলেই তো। হয়ত কিছু খরচ বাঁচাইতে চাহিয়াছে। মা তো নিজেই সব কাজে কম খরচ করেন, এই মনে করিয়াই হয়ত আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। যদি উহারা বুঝিত যে, এই কাজ কম খরচে সারিয়া ফেলা আমি পছন্দ করিব না, তবে কখনই উহারা আমার কথা অবহেলা করিতে সাহস পাইত না। কামতানাথ এখনও ঐ জায়গায়ই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ভাবভঙ্গীতে তাহাকে মায়ের কথামত চলিতে বিশেষ উৎসুক বলিয়া মনে হইতেছিল না। ফুলমতী কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। এত কাণ্ডের পরেও কেহ তাঁহার কথা অমান্য করিতে পারে এরূপ সন্দেহ তাঁহার মনে একবারও হইল না।

কিন্তু ইহার পরে যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তিনি বেশ বুঝিতে লাগিলেন

যে, দশ বারো দিন আগেও এই সংসারে তাঁহার যে আধিপত্য ছিল, তাহা আর এখন নাই। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি হইতে শ্রাদ্ধের কাজে চিনি, মিঠাই, দই, আচার প্রভৃতি আসিতেছিল। কেহই কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল না। আত্মীয় কুটুম্বেরাও যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা কামতানাথকে বা বড়বধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। কামতানাথ এসব কাজের বিলি ব্যবস্থার কি জানে? সে তো রাতদিন ভাঙ্গ খাইয়াই পড়িয়া থাকে। কোনও রকমে সাজগোজ করিয়া অফিসে যায়। তাহাতেও মাসে পনর দিন কামাই করে। অফিসের সাহেব পণ্ডিতজীকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন, তা না হইলে কবে তাহার চাকুরী যাইত। আর বড় বৌয়ের মত অশিক্ষিত মেয়ে এই ব্যাপারের কি বোঝে? সে তো নিজের কাপড় জামারও যত্ন জানে না, আর সে এখন এই সংসার চালাইবে। সব নষ্ট হইবে আর কি। সকলে মিলিয়া বংশের নাম ডুবাইবে। নিশ্চয়ই কোন না কোন জিনিস কম পড়িবে। এই সব ক্রিয়াকর্মের জ্ঞান থাকা চাই। কোন জিনিস এত হইবে যে, অনেক ফেলা যাইবে আবার কোন জিনিস হয়ত এত কম তৈয়ার হইবে যে, কেহ পাইবে, কেহ পাইবে না। আচ্ছা, ইহাদের হইল কি। আরে, বউ সিন্দুক খুলিতেছে কেন? আমার হুকুম ছাড়া বউ সিন্দুক খুলিবার কে? চাবি অবশ্য ওর কাছেই আছে; কিন্তু আমি না বলিলে সিন্দুক খুলিয়া ও টাকা দিবে কেন? আজ তো সিন্দুক খুলিতেছে এই ভাবে, যেন আমি কিছুই না। আমি তো এ ব্যাপার সহ্য করিতে পারিব না।

ফুলমতী উঠিয়া পড়িলেন। বড় বধূর কাছে গিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন—সিন্দুক খুলছ কেন বউ, কই আমি তো সিন্দুক খুলতে বলিনি? বড়বধূ নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—বাজার থেকে যে জিনিসপত্র এসেছে তার দাম দিতে হবে না?

'কোন্ জিনিস কি দরে কেনা হল, আর কতই বা কেনা হল আমি কিছুই জানি না। হিসাব কিতাব না হতে টাকা কেমন করে দেওয়া যাবে?'

'হিসাব-কিতাব সব হয়ে গেছে।'

'কে করল শুনি?'

'আমি কি জানি কে করল? ছেলেদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন না? আমি হুকুম পেয়েছি, টাকা দাও, টাকা দিচ্ছি।

ফুলমতী কোন মতে আত্মসংবরণ করিলেন। এখন রাগ করিবার সময় নয়। আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষে বাড়ি বোঝাই। এখন যদি তিনি ছেলেদের বকাঝকা করেন, তবে লোকে বলিবে যে, পণ্ডিত মহাশয় মরিতে না মরিতেই এদের ঝগড়াবিবাদ লাগিয়া গিয়াছে। বুকের উপর পাথর চাপা দিয়া ফুলমতী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিমন্ত্রিতেরা আগে বিদায় হউক, তখন বাড়ির সকলকেই একবার ভালরকম সমঝাইয়া দিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে কে তাঁহার সামনে আসে আর কি বলে। ইহাদের এত সরদারী কেন?

কিন্তু ফুলমতী নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রাদ্ধ-শান্তির কোন নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে কিনা, অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন হইতেছে কিনা, নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। খাওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। স্বজাতীয়েরা সকলে এক সঙ্গে খাইতে বসিয়াছিলেন। উঠানে কায়ক্লেশে দুই শত লোক বসিতে পারে। এই পাঁচ শত লোক এইটুকু জায়গাতে কেমন করিয়া বসিবে? মানুষের উপরে মানুষ বসিবে নাকি? দুই ভাগে খাইতে বসাইলে কি ক্ষতি হইত? না হয় বারোটার জায়গায় দুইটার সময় খাওয়া হইত। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? এখানে যে সকলের ঘুমের সময় চলিয়া যায়। কোন রকমে এই ঝঞ্ঝাট কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই শান্তিতে ঘুমানো যায়। লোকে এমন গায়ে গায়ে লাগিয়া বসিয়াছে যে, কাহারো নড়িবারও উপায় নাই। আর পাতাও যেন একটার উপরেই আর একটা দেওয়া হইয়াছে। লুচি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; সকলে গরম লুচি চাহিতেছে। ময়দার লুচি ঠাণ্ডা হইলে চুপসাইয়া যায়। এমন অখাদ্য লুচি কে খাইবে? ঠাকুরকে লুচি ভাজা বন্ধ করিতে কেন বলিল, কে জানে! লজ্জায় নাক কাটা যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিতেছি।

হঠাৎ গোল উঠিল, তরকারীতে লবণ দেওয়া হয় নাই। বড় বউ তাড়াতাড়ি লবণ পিষিতে বসিয়া গেল। ফুলমতী রাগে ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আর মুখ খুলিতে পারিলেন না। যাহা হউক, লবণ বাঁটিয়া সব পাতায় পাতায় দেওয়া হইল। এর মধ্যে আবার রব উঠিল—জল বড় গরম, ঠাণ্ডা জল চাই। ঠাণ্ডা জলের কোন বন্দোবস্তই করা হয় নাই, বরফ আনানো হয় নাই। বাজারে লোক ছুটিল, কিন্তু এত রাতে বাজারে বরফ কোথায়? খালি হাতে লোক ফিরিয়া আসিল। নিমন্ত্রিতেরা ঐ গরম জল খাইয়াই পিপাসা মিটাইল। শক্তি থাকিলে ফুলমতী ছেলেদের কান ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এমন জঘন্য ব্যাপার তাঁহার বাড়িতে আর কখনও হয় নাই। এই তো ব্যবস্থা। ইহারা আবার সংসারের কর্তৃত্ব করিতে চায়। বরফ একটা কত বড় জরুরী জিনিস। তাহা আনাইয়া রাখিতে হুঁসই হয় নাই। হুঁস কেমন করিয়া হইবে? গল্প করিয়া সময় পাইলে তো? নিমন্ত্রিতেরা এখন বলিবেই তো—সমাজের সব লোকদের খাওয়াইবার সখ আছে, অথচ বাড়িতে বরফ পর্যন্ত নাই।

আচ্ছা, আবার কিসের গোলমাল হইতেছে? আরে, আরে, সকলে যে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ব্যাপার কি?

ফুলমতী আর চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিজের ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া কামতানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে খোকা? সকলে উঠে যাচ্ছে কেন?

কামতা কোন জবাব দিল না। সেখান হইতে সরিয়া গেল। ফুলমতী রাগে ফুলিতে লাগিলেন। সহসা দেখিলেন বাড়ির ঝি যাইতেছে। ফুলমতী উহাকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন। তখন জানা গেল যে, তরকারীর মধ্যে একটা মরা ইন্দুর পাওয়া গিয়াছে। ফুলমতী মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, দেওয়ালে গিয়া মাথা ঠোকেন। অভাগারা ভোজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মুখ'দের কি জ্ঞান আছে যে, কত লোকের সর্বনাশ হইয়া গেল। লোকে উঠিয়া যাইবে না কেন? নিজের চোখে দেখিয়া নিজের ধর্ম কে খোয়াইবে? হায়, হায়। সব ক্রিয়া কর্ম মাটী হইল। কয়েকশ টাকা জলে গেল দুর্নাম যাহা হইল তাহার তো আর কথা[ই] নাই।

নিমন্ত্রিতেরা সব উঠিয়া গিয়াছে। পাতা[য়] পাতায় সব খাবার জিনিষ যেমন দেও[য়া] হইয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। ছেলে[রা] চার জনেই লজ্জায় মাথা ঝুঁকাইয়া উঠা[নে] দাঁড়াইয়া রহিল। এক ভাই অন্য ভাইকে দো[ষ] দিতেছিল। বড় বধূ জায়েদের উপর রা[গ] করিতেছিল। জায়েরা আবার সব দোষ কুমুদে[র] ঘাড়ে চাপাইতেছিল। কুমুদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াই[য়া] কাঁদিতেছিল। এমন সময়ে ফুলমতী রা[গে] ফাটিয়া পড়িলেন—কেমন, মুখে চুণকা[লি] পড়লো তো? না এখনও কিছু বাকী আছে লজ্জায় মাথা কাটা গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, শহ[রে] আর মুখ দেখাবার জো রইল না।

ছেলেরা কেহই কোন জবাব দিল ন[া]। ফুলমতী আরও ভয়ঙ্কর হইয়া বলিলেন[—] তোমাদের আর কি? কারো তো লজ্জাস[রম] নেই। যে লোকটা সারাটা জীবন পরিবা[রের] মানমর্যাদার জন্য সর্বকিছু লুটিয়ে দিল, ত[াঁর] আত্মাই তো কষ্ট পাচ্ছে। ওঁর পবিত্র আত্মা[কে] তোমরা এমন দাগা দিলে? সারা শহরের লো[ক] মুখে থুতু দিচ্ছে। এখন আর কেউ তোমা[দের] দুয়ারে থুতু ফেলতেও আসবে না।

কামতানাথ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াই[য়া] মায়ের কথা শুনিল। শেষে রাগিয়া উঠি[য়া] বলিল—খুব হয়েছে মা, এখন চুপ কর। [ভুল] হয়েছে মানি, ভয়ঙ্কর ভুল হয়ে গেছে। কি[ন্তু] তার জন্যে তুমি বাড়ির সব লোককে [খেয়ে] ফেলতে চাও নাকি? ভুল সকলেরই হয়। লো[কে] অনুতাপ করে, তার জন্যে কেউ আর [ফাঁসি] দেয় না।

বড়বৌ নিজের সাফাই গাহিল—আমি কি জানি ঠাকুরঝি (কুমুদ)কে দিয়ে এইটুকু কাজও হবে না? ওর কি উচিত ছিল না তরকারীগুলি দেখে শুনে কড়ায় চাপায়? টুকরি ধরে কড়ায় ঢেলে দিল! এতে আমার দোষ কি?

কামতানাথ স্ত্রীকে ধমক দিয়া বলিল—এতে কুমুদেরও কোনো দোষ নেই, তোমারও না, আমারও না। দৈবের ব্যাপার। কপালে দুর্নাম লেখা ছিল, হয়ে গেল। এত বড় ব্যাপারে মুঠো মুঠো করে তরকারী কড়ায় চাপায় না; টুকরি ধরেই দিতে হয়। এসব দুর্ঘটনা কখনো কখনো ঘটেই যায়, এতে আর লোক হাসানো, নাক-কাটানোর কথাটা কি? তুমি শুধু শুধু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছ।

ফুলমতী দাঁতে দাঁত ঘসিয়া জবাব দিলেন—লজ্জা তো নাই-ই, উল্টে আবার বেহায়ার মত তর্ক করে।

কামতানাথ নিঃসঙ্কোচে কহিল—লজ্জার কি আছে শুনি? কারো কিছু চুরি করেছি নাকি? চিনিতে পিঁপড়ে আর, আটায় পোকা এ আবার কেউ বাছে নাকি? আমি আগে দেখতে পাই নি বলেই তো এত গোলমাল। তা নয়ত চুপচাপ ইন্দুরটাকে তুলে ফেলে দিতাম; কাকপক্ষীও টের পেত না।

ফুলমতী চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন—কি বলছ! মরা ইন্দুর খাইয়ে সব্বার ধর্ম নষ্ট করে দিতে?

কামতা হাসিয়া উঠিল, বলিল—কি সব পুরানো আমলের কথা বলছ মা? এতে কারো জাত যায় না। এত সব ধর্মাত্মা লোক যে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন, এদের মধ্যে এমন কে আছে যে ছাগল ভেড়ার মাংস না খায়? পুকুরের শামুক কাছিম পর্যন্ত এদের জন্যে বাঁচতে পারে না। একটা ইন্দুরে কি হয় শুনি?

ফুলমতীর মনে হইতে লাগিল যে, প্রলয়ের আর বেশি দেরী নাই। যখন লেখাপড়া জানা লোকের মনেও এমন সব অধার্মিক ভাব উঠিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান ছাড়া ধর্মরক্ষার আর কেহই নাই। ম্লান মুখে তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

(২)

দুই মাস পরের কথা। রাত্রি হইয়াছে। চার ভাই সারাদিন কাজের পর বাড়ি ফিরিয়া কিছু একটা পরামর্শ করিতেছিল। বড় বধূও এই ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার। কুমুদের বিবাহের কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

কামতানাথ তাকিয়ায় ভর দিয়া বসিয়া বলিল—বাবার কথা ছেড়ে দাও, সে সব বাবার সঙ্গেই গেছে। মুরারী পণ্ডিত বিদ্বান ও কুলীন হতে পারে। কিন্তু যে লোক নিজের বিদ্যা ও কুল টাকা নিয়ে বেচে সে নীচ। ঐ নীচ লোকটার ছেলের সঙ্গে কুমুদের বিয়ে বিনা পণেও দেব না, পাঁচ হাজার তো অনেক দূরের কথা। ওকে দূর করে দাও, অন্য কোন পাত্রের খোঁজ কর। আমার কাছে তো মোটমাট মাত্র বিশ হাজার টাকা আছে। আমাদের চার ভাইয়ের প্রত্যেকের ভাগে মাত্র পাঁচ হাজার হয়। পাঁচ হাজার টাকা বরপণে দিয়ে দাও আর পাঁচ হাজার গানবাজনা, দান-সামগ্রীতে উড়াও, ব্যস্, তবেই আমরা শেষ।

উমানাথ বলিল—আমার ওষুদের দোকান খুলতে কম করে ধরলেও অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা চাই-ই। আমার ভাগের টাকা থেকে আমি এক পয়সাও দিতে পারব না। আর দোকান খুললেই কিছু রোজগার হবে না, অন্তত বছর পাঁচেক তো ঘরের টাকা ভেঙ্গেই খেতে হবে।

দয়ানাথ একখানা খবরের কাগজ দেখিতেছিল। চোখ হইতে চশমা খুলিতে খুলিতে বলিল—আমিও তো ভাবছি যে একটা কাগজ বার করব। প্রেস আর কাগজে অন্তত দশ হাজার টাকা মূলধন চাই। আমার যদি পাঁচ হাজার টাকা থাকে, তবে বাকী পাঁচ হাজার দেবার মত অংশীদার নিশ্চয়ই পাব। কাগজে লিখে লিখে তো আর আমার দিন চলে না।

কামতানাথ মাথা নাড়িয়া কহিল—আরে রাম বল, বিনা পয়সায় দিলেও কোন লেখা ছাপা হয় না, টাকা দিয়ে আবার লেখা নেবে কে?

দয়ানাথ প্রতিবাদ করিল—না, এমন কথা নয়। আমি তো আগাম টাকা না নিয়ে কিছু লিখিই না।

কামতা যেন নিজের কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল—তোমার কথা বলছি না ভাই। তুমি তো বেশ কিছু পাচ্ছ; কিন্তু সব্বাই তো আর পায় না।

বড় বধূ স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল—মেয়ের যদি কপালে সুখ থাকে তবে গরীবের ঘরে পড়েও সে সুখী হতে পারে। আর ভাগ্যে না থাকলে রাজপুরীতে গিয়েও কান্না ঘোচে না। সবই কপালের লেখা।

কামতানাথ স্ত্রীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—তারপর এই বছরেই আবার সীতার বিয়েও তো দিতে হবে।

সীতানাথ সকলের ছোট। মাথা নীচু করিয়া ভাইদের স্বার্থভরা কথা শুনিয়া শুনিয়া কিছু বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিল—আমার বিয়ের জন্য আপনারা ভাববেন না। যে পর্যন্ত আমি কোন কাজকর্ম না পাই, সে পর্যন্ত বিয়ের নামও আমি নিব না। আর সত্য কথা বলতে কি আমি বিয়ে করতেই চাই না। দেশে এখন ছোট ছেলেমেয়ের দরকার নেই, কাজের লোকের দরকার। আমার অংশের টাকা সবটাই আপনারা কুমুদের বিয়েতে খরচ করুন। সব কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, এখন আর পণ্ডিত মুরারীলালের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

উমা তীব্র স্বরে কহিল—দশ হাজার টাকা কোত্থেকে আসবে শুনি?

সীতা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—আমি তো আমার ভাগের টাকা দিয়ে দিতে বলছি।

'আর বাকী টাকা?'

'মুরারীলালকে বলুন যে, বরপণ কিছু কম করে নিক। উনি এত স্বার্থপর নন যে, এ অবস্থায় কিছু ছেড়ে দেবেন না। উনি যদি তিন হাজারে সন্তুষ্ট হন, তবে পাঁচ হাজারেই বিয়ে হতে পারে।

উমা তখন কামতানাথকে বলিল—দাদা, ওর কথা শুনছেন?

দয়ানাথ বলিয়া উঠিল—তা এতে আপনাদের লোকসানটা কি? ও নিজের টাকা দিয়ে দিচ্ছে, আপনারা খরচ করুন। মুরারী পণ্ডিতের সঙ্গে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমার তো এই ভেবেও আনন্দ হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে অন্তত একজনও তো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হচ্ছে। এর এখন টাকার দরকার নেই। সরকারী বৃত্তি তো পাচ্ছেই। পরীক্ষাটা একবার পাশ করতে পারলে কোন একটা চাকরী নিশ্চয়ই পাবে। আমাদের অবস্থা তো আর ওর মত নয়।

কামতানাথ দূরদর্শিতার পরিচয় দিল, কহিল,—লোকসান যারই হোক, একই কথা। আমাদের মধ্যে একজন দুঃখে পড়লে কি আর অন্য ভাইরা তামাসা দেখবে? ও এখনো ছেলে-মানুষ। ও কেমন করে জানবে যে, সময়ে এক টাকায়ও এক লাখ টাকার কাজ হয়। কে জানে কাল হয়ত ও বিলাতে গিয়ে পড়বার বৃত্তি পেয়ে যেতে পারে অথবা সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারে। তখন তো বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে চার পাঁচ হাজার টাকার দরকার হবে। তখন কার কাছে গিয়ে হাত পাতবে? আমি চাই না যে বরপণ দিতে গিয়ে ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাক।

এই যুক্তিতে সীতানাথও সরিয়া দাঁড়াইল। সসঙ্কোচে বলিল—হ্যাঁ, এমন হলে তো আমার নিশ্চয়ই টাকার দরকার হবে।

'এমন হওয়া কি অসম্ভব নাকি?'

'না, অসম্ভব মনে করি না, তবে কঠিন নিশ্চয়ই। সরকারী বৃত্তি সুপারিশের জোর না থাকলে পাওয়া যায় না। আমাকে চেনে কে?

'কখনো কখনো সুপারিশ ফাইলেই থেকে যায়, আর বিনা সুপারিশেই কাজ হাসিল হয়ে যায়।

'তবে আর আমি কি বলব? আপনি যেমন ভাল বোঝেন করুন। আমার কথা এই যে, আমি বরং বিলাত যাব না। তবুও কুমুদের ভাল ঘরে বিয়ে হোক।'

কামতানাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—ভাল ঘর পণ দিলেই মিলে না ভাই। তোমার বৌদি কি বল্বেন শুনলে তো? সবই বরাত। আমি তো বলি মুরারীলালকে জবাব দিয়ে দাও, আর এমন কোন পাত্রের খোঁজ কর যে, অল্পেই রাজী হয়। এই বিয়েতে আমি এক হাজারের বেশী খরচ করতে পারি না।

পণ্ডিত দীনদয়াল কেমন পাত্র?

উমা খুশী হইয়া বলিল—খুব ভাল। এম এ, বি এ না হোক, যজমানীতে বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

দয়ানাথ আপত্তি করিল—মাকে তো একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত।

কামতানাথ ইহার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না। বলিল—ওঁর তো যেন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সেই সব পুরোনো যুগের কথা। এক মুরারীলালকে পেয়ে বসেছেন। একথা বোঝেন না যে, আগের দিনকাল আর নেই। উনি তো চান যে, আমাদের সর্বস্ব নষ্ট হলেও কুমুদ যেন মুরারী পণ্ডিতের ঘরেই পড়ে।

উমা এক নূতন আশংকার কথা বলিল—মা নিজের সব গয়না কুমুদকেই দিয়ে দেবেন, দেখবেন।

কামতানাথ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিল না, বলিল—গয়নার উপর ওর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ওটা ওঁর স্ত্রীধন! যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন।

উমা কহিল—স্ত্রীধন বলে কি সেটা বিলিয়ে দিবেন নাকি? ওসব গয়নাও তো বাবার রোজগারের টাকায়ই হয়েছে।

'যার রোজগারেই হোক, স্ত্রীধনের উপর ওঁর পুরা অধিকার আছে।'

'এসব আইনের প্যাঁচ। বিশ হাজার টাকার ভাগীদার চারজন, আর দশ হাজার টাকার গয়না মার কাছেই থেকে যাবে? দেখে নেবেন 'এর জোরেই মা মুরারী পণ্ডিতের ঘরে কুমুদের বিয়ে দেবেন।

উমানাথ এতগুলি টাকা এত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারে না। ধূর্তের শিরোমণি সে। কোন একটা ছল করিয়া মায়ের সবগুলি গয়না বাহির করিয়া লইতেই হইবে। ততদিন পর্যন্ত কুমুদের বিবাহের আলোচনা করিয়া ফুলমতীকে বিরক্ত করা উচিত হইবে না।

কামতানাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—দেখ ভাই, আমি এসব চাল পছন্দ করি না।

উমানাথ একটু লজ্জিত হইয়া কহিল—গয়না কিন্তু দশ হাজার টাকার কম নয়।

কামতা অবিচলিত স্বরে কহিল—যত টাকারই হোক, আমি কোন অন্যায় কর্তে চাই না।

তা' হলে আপনি সরে দাঁড়ান, মাঝে থেকে কিছু বলবেন না।

আমি সরেই থাকব।

আর সীতা, তুমি?

আমিও সরে থাক্‌ব।

কিন্তু দয়ানাথকে ঐ প্রশ্ন করা হইলে সে উমানাথের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হইল। দশ হাজারের মধ্যে তো উহারও আড়াই হাজার পাওনা হইবে। এতগুলি টাকার জন্য যদি কিছু ছল চাতুরীও করিতে হয় তবে তাহাতে দোষ নাই।

(৩)

ফুলমতী রাত্রে খাওয়ার পর কেবল শুইয়াছেন, এমন সময় উমা আর দয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল। দুইজনেই মুখের চেহারা এমন করিয়া আসিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন কোন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। ফুলমতী ভয় পাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোদের দুজনকেই এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেনরে?

উমা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—খবরের কাগজে লেখা বড্ড বিপদের কাজ মা। যত আইন বাঁচিয়েই লেখ, কোথাও না কোথাও দোষ থেকেই যায়। দয়ানাথ একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। ওটা ছাপা হতেই পাঁচ হাজার টাকার জামিন তলব হয়েছে। কালের দিনের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারলে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে, আর দশ বছরের জেল হয়ে যাবে।

ফুলমতী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—আচ্ছা, তুই এমন সব কথাই বা লিখিস কেন? আমাদের যে এখন দুর্দিন। তোর বুঝি সে খেয়াল নেই? জামিন না দিলে কিছুতেই চলে না?

দয়ানাথ অপরাধীর মত ভাব দেখাইয়া জবাব দিল—আমি তো এমন কিছুই লিখি নি, কিন্তু ভাগ্যে দুঃখ থাক্‌লে কে খণ্ডাবে বল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এত কড়া যে, এক পয়সাও ছাড়বে না। দৌড়-ঝাঁপ করতে আমি আর কম করি নি।

তুই কামতাকে টাকার জোগাড় করতে বলিস্ নাই?

উমা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—তুমি তো ওঁর স্বভাব জানই মা। টাকা ওঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। দয়ার দ্বীপান্তরের সাজা হ'লেও সে এক পয়সাও দেবে না।

দয়া সমর্থন করিল—আমি তো ওঁকে এর বিন্দু-বিসর্গও জানাই নি।

ফুলমতী চারপাই হইতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—চলো, আমি বল্‌ছি। টাকা দেবে না বললেই হ'ল? টাকা পয়সা লোকে বিপদ আপদের জন্যেই রাখে, পুঁতে রাখবার জন্যে রাখে না।

উমানাথ মাকে বাধা দিয়া কহিল—না মা, ওঁকে কিছু বলো না। টাকা তো দেবেনই না, আরও উল্টে হায় হায় করতে থাকবেন। পাছে ওঁর চাকরীর কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে দয়াকে হয়ত বাড়িতেই থাকতে দেবেন না। উনি নিজেই হয়ত পুলিসে খবর দেবেন,—আশ্চর্য নয়!

ফুলমতী নিরুপায় হইয়া কহিলেন—তবে জামিন দেওয়ার কি বন্দোবস্ত করবি? আমার কাছে তো কিছুই নেই। হ্যাঁ, আমার গয়না আছে। গয়নাই নিয়ে যা, কোথাও বন্ধক রেখে জামিনের টাকা দিয়ে দে। আর আজ থেকে কান ধরে প্রতিজ্ঞা কর, কোনো কাগজে এক শব্দও আর লিখ্‌বি না।

দয়ানাথ কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল—তোমার গয়না নিয়ে প্রাণ বাঁচাব এমন কথা বলো না মা। না হয় পাঁচ সাত বছরের জেল হবে, জেল খাটবো। এখানে বসে বসেই বা কি করছি?

ফুলমতী বুক চাপড়াইয়া বলিলেন—কি যে তুই বলিস! আমি বেঁচে থাকতে কে তোকে গ্রেপ্তার করবে, করুক দেখি! মুখ পুড়িয়ে দোব না? লোকের গয়নাপত্র এমন দিনেও কাজে লাগবে না, তো এসব আছে কিজন্য? তোরাই যদি না থাকিস তবে গয়না ধুয়ে কি আমি জল খাব?

এই কথা বলিয়া ফুলমতী গয়নার বাক্‌স আনিয়া ছেলেদের কাছে রাখিলেন।

দয়া যেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে চাহিল, তারপর বলিল—আপনি কি বলেন? এই জন্যেই আমি বলেছিলাম যে মাকে কিছু জানিয়ে কাজ নেই। জেল-ই তো হত আর তো কিছু না।

উমা যেন দোষ কাটাইবার জন্য কহিল—এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে যাবে আর মা কিছুই জানবেন না, এ কেমন করে হতে পারে? এত বড় খবর শুনে আমি পেটে পেটে চেপে রাখতে পারি না। কিন্তু এখন যে কি করা উচিত আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই জেলে যাবি তাও সহ্য হয় না, আবার মার গয়না বন্ধক রাখতেও মন চায় না।

ফুলমতী ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—তোরা কি মনে করিস গয়নাগুলি তোদের চেয়েও আদরের? তোদের ভালর জন্যে আমার প্রাণ গেলেই বা কি, গয়না তো কোন্ ছার।

দয়া দৃঢ়ভাবে কহিল—মা, আমার কপালে যা আছে হবে, তোমার গয়না নিতে পারব না আজ পর্যন্ত তোমার কোন সেবাই আমি করতে পারি নি, আর এখন কোন্ মুখে তোমার গয়নাগুলি নিয়ে যাব? আমার মত কুপুত্রকে পেটে ধরেই তোমার এই কষ্ট। চিরটাকাল তোমাকে কেবল কষ্টই দিচ্ছি।

ফুলমতীও সমান দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—তুই যদি এগুলি না নিস তবে আমি নিজে গিয়ে এগুলি বন্ধক রেখে আসব। যদি ইচ্ছা

হয় তো পরীক্ষা করে দেখতে পারিস। চোখ বুজলে কি হবে ভগবান জানেন। কিন্তু যে পর্যন্ত বে'চে আছি, তোদের কোন কষ্টই হতে দেব না।

উমানাথ যেন নিরুপায় হইয়া কহিল—এখন তো আর আমাদের কোন উপায়ই নাই, দয়ানাথ। ক্ষতি কি, নিয়ে নে। কিন্তু মনে রাখবি যেই হাতে টাকা আসবে অমনি আগে গয়না ছাড়িয়ে আনতে হবে। লোকে ঠিকই বলে যে মাতৃত্ব একটা মস্ত তপস্যা। মা ছাড়া কে এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে? আমরা বড় অভাগা। মায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি থাকা উচিত আমাদের তার শতাংশের একাংশও নাই।

দুই ভাই যেন মস্ত বড় ধর্মসংকটে পড়িয়াছে এই ভাবে গহনার বাক্‌স লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। মা বাৎসল্যভরা দৃষ্টিতে উহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মনে হইল যেন তিনি ছেলেদের নিজের কোলের মধ্যে লইয়া তাঁহার আশীর্বাদের জোরে সকল বিপদ আপদ দূরে করিয়া দিতে চাহিতেছেন। আজ কয় মাসের পর তাঁহার স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয় নিজের যথাসর্বস্ব ছেলেদের মঙ্গল কামনায় অর্পণ করিয়া দিয়া তৃপ্ত হইল। তাঁহার কর্তৃত্বাভিমানী মনে যেন এইরূপ একটা ত্যাগ একটা আত্মসমর্পণের জন্য একটা ব্যাকুলতা ছিল। সেখানে প্রভুত্বের গর্ব বা প্রভুত্বের জন্য মমতার গন্ধও ছিল না। ত্যাগেই তাঁহার আনন্দ আর ত্যাগই তাঁহার গর্ব। আজ নিজের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়া পাইয়া, নিজের সন্তানদের মঙ্গল-কামনায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিয়া ফুলমতী আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলেন।

(৪)

আরও চারি মাস চলিয়া গেল। মায়ের গহনার উপর হাত সাফাই করিবার পর চারি ভাই তাঁহার মন রাখিয়া চলিতে লাগিল। বধূদেরও উহারা বলিয়া দিল যে মায়ের মনে যেন কষ্ট না দেওয়া হয়। একটু ভাল ব্যবহারেই যদি মা খুশী থাকেন তবে তাহাতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। চার ছেলেই নিজের নিজের ইচ্ছামতই চলিত, তবে একবার লোক দেখানো ভাবে মায়ের পরামর্শ লইত। কিংবা উহারা এমন ষড়যন্ত্রের জাল বুনিত যে এই সরলা নারী উহাদের মতেই সায় দিতেন। বাগানটা বেচিয়া ফেলা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না; কিন্তু চারজনে এমন মায়ার খেলা খেলিল যে, তিনি বাগান বেচার প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেলেন। কিন্তু কুমুদের বিবাহের ব্যাপারে কিছুতেই মতের মিল হইল না। মায়ের একান্ত ইচ্ছা যে পণ্ডিত মুরারীলালের ঘরে মেয়ে দেন, আর ছেলেরা দীনদয়ালকে কিছুতেই ছাড়িবে না। একদিন এ লইয়া ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার কলহও হইয়া গেল।

ফুলমতী কহিলেন—বাপের রোজগারে মেয়েরও অংশ আছে। তোমরা ষোল হাজারের একটা বাগান পেয়েছ, আর পঁচিশ হাজারের একটা বাড়ি। আর বিশ হাজার নগদ টাকার মধ্যে কুমুদের কি পাঁচ হাজার টাকা পাবারও অধিকার নেই নাকি?

কামতানাথ নম্রভাবে কহিল—মা, কুমুদ, তোমার মেয়ে, কিন্তু আমাদেরও তো বোন। তুমি তো দু'চার বছর পরে চলে যাবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক বহুকাল থাকবে। আমরা আমাদের সাধ্য থাকতে এমন কিছুই করব না, যাতে ওর অমঙ্গল হয়। কিন্তু অংশের কথা যদি বল, তবে আমিও বলি যে বাবার সম্পত্তিতে কুমুদের কোন অংশই নাই। বাবা বে'চে থাকলে অন্য কথা ছিল, ওর বিয়েতে তিনি যত ইচ্ছা খরচ করতেন, কারো কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু এখন তো আমাদের টাকা কড়ির হিসাব করে চলতে হবে। যে কাজ এক হাজারে হতে পারে সে কাজে পাঁচ হাজার খরচ করা কোন্ বুদ্ধির কথা?

উমানাথ সংশোধন করিল—পাঁচ হাজার কেন, দশ হাজার বলুন।

কামতা ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল—না, আমি পাঁচ হাজারই বলব। এক বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করার শক্তি আমার নাই।

ফুলমতী জিদ করিয়া কহিলেন—বিয়ে তো আমি মুরারীলালের ছেলের সঙ্গেই দেব, তাতে পাঁচ হাজারই লাগুক আর দশ হাজারই লাগুক। আমার স্বামীরই তো রোজগারের টাকা। আমিই প্রাণ দিয়ে টাকা বাঁচিয়েছি। আমার নিজের ইচ্ছামত খরচ করব। তোরা আমার পেটে জন্মেছিস্, আর কুমুদও আমারই পেটের মেয়ে। আমার চোখে তোরা ছেলেমেয়ে সবই সমান। আমি কারও কাছেই কিছু চাই না। তোরা বসে বসে তামাশা দেখ, আমি সব করে কর্মে নেব। কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে কুমুদের পাঁচ হাজার।

কটু সত্যের স্মরণ লওয়া ছাড়া এখন আর কামতানাথের অপর কোন পথ খোলা রহিল না। সে বলিল—মা, তুমি কেবলই কথা বাড়াচ্ছ। যে টাকা তুমি তোমার নিজের মনে করছ সে টাকা আর তোমার নাই, আমাদের। আমাদের অনুমতি ছাড়া তুমি ঐ টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করতে পার না।

ফুলমতীকে যেন সাপে ছোবল মারিল। কি বললি, আবার বল্ দেখি শুনি। যে টাকা আমি নিজে জমা করেছি সে টাকা আমার নিজের ইচ্ছায় আমি খরচ করতে পাব না? ও টাকা এখন আর তোমার নেই, আমাদের হয়ে গেছে। তোদেরই হবে, আমি আগে মরি তো।

না, বাবা মরার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হয়ে গেছে।

উমানাথ নির্লজ্জের মত বলিল—মা তো আর আইন-কানুন জানেন না, শুধু শুধু রাগ করেন।

ফুলমতী রাগে আগুন হইয়া বলিলেন—চুলোয় যাক তোদের আইন-কানুন। আমি এমন আইন মানি না। তোদের বাবা এমন কিছু বড়লোক ছিলেন না। আমিই না খেয়ে না পরে সংসার চালিয়েছি, পয়সা বাঁচিয়েছি, তা নয়ত' তোদের আজ দাঁড়াবার জায়গা থাকত না। আমি বে'চে থাকতে তোরা আমার টাকা ছু'তে পাবি না। তোদের তিন ভাইয়ের বিয়েতে আমি দশ দশ হাজার করে টাকা খরচ করেছি। কুমুদের বিয়েতেও আমি তা করব।

কামতানাথও রাগিয়া গেল, কহিল—তোমার এক পয়সাও খরচ করবার অধিকার নাই।

উমানাথ তখন দাদাকে বলিল—দাদা, আপনি শুধু শুধু মার সঙ্গে তর্ক করছেন। মুরারীলালকে লিখে দিন যে তোমার ছেলের সঙ্গে কুমুদের বিয়ে হবে না। ব্যস্ ছুটি। মা নিয়ম-কানুন কিছু বোঝেন না, শুধু তর্ক করেন।

ফুলমতী তখন সংযত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আইনে কি বলে, আমিও একটু শুনি তো?

উমা নিরীহভাবে বলিল—আইন এই যে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরাই সব সম্পত্তি পায়। মা কেবল ভরণপোষণের অধিকারী।

ফুলমতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন আইন কে তৈরী করেছে?

উমা শান্ত, গম্ভীরভাবে বলিল—আমাদের মুণি-ঋষিরা, মনু এ'রাই আর কে?

ফুলমতী কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন, তারপর আহত কণ্ঠে কহিলেন—তবে, এই সংসারে আমাকে তোমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে বে'চে থাকতে হবে?

উমানাথ বিচারকের নির্মমতা লইয়া বলিল—তা' তুমি যা বোঝ।

ফুলমতীর সমস্ত দেহমন যেন এই বজ্রাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। বড় দুঃখে তিনি কহিলেন—আমিই বাড়ি ঘর করেছি, আমিই সম্পত্তি করেছি, আমিই তোমাদের জন্ম দিয়েছি, একটু একটু করে বড় করেছি আর আজ এই সংসারে আমিই পর, আমিই কেউ নই। এই-ই নাকি মনুর আইন, আর তোমরাও এই আইন মেনে চলতে চাও। বেশ, ভাল কথা। তোমরা নিজেদের বাড়ি ঘর বুঝে নাও। আমি তোমাদের আশ্রিতা হয়ে থাকতে চাই না। মরে যাওয়াও এর চেয়ে ভাল। চমৎকার ব্যবস্থা। আমিই গাছ লাগালাম, আর আমিই গাছের ছায়ায় দাঁড়াতে পারব না। এই যদি আইন হয়, তবে চুলোয় যাক্ এমন আইন।

মায়ের এই দুঃখ ও ক্ষোভের কথায় যুবক চারজনের কোন পরিবর্তন হইল না। আইনের লৌহ-কবচ উহাদিগকে রক্ষা করিবে। এই সামান্য কাঁটায় আর উহাদের কি হইবে?

কিছুক্ষণ পরে ফুলমতী সেখান হইতে

উঠিয়া গেলেন। আজ জীবনে প্রথমবার তাঁহার বাৎসল্যভরা মাতৃত্ব অভিশাপ হইয়া তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। যে মাতৃত্বকে তিনি জীবনের আশীর্বাদ মনে করিতেন, যার চরণে নিজের সমস্ত অভিলাষ, কামনা অর্পণ করিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই মাতৃত্বই এখন তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের মত মনে হইতে লাগিল, যেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। দুয়ারে নিমগাছ মাথা নোয়াইয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন সংসারের চালচলন দেখিয়া সেও ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছে। আলো আর জীবনের দেবতা অস্তাচলে ফুলমতীর মাতৃত্বের মতই নিজে চিতায় জ্বলিতে লাগিল।

(৫)

ফুলমতী যখন নিজের ঘরে গিয়া শুইলেন তখন তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। স্বামীর মৃত্যু হইতে না হইতেই নিজের পেটের ছেলেরাও শত্রু হইয়া যাইবে এমন কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। যে ছেলেদের তিনি বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন তাহারাই আজ তাঁর বুকে এই শেল বিদ্ধ করিতেছে। এখন এই সংসার তাঁহার পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে তাঁহার কিছুমাত্র সম্মান নাই। যেখানে তিনি মানুষ বলিয়া গণ্য হন না, সেখানে অনাথার মত পড়িয়া থাকিয়া অন্ন ধ্বংস করিবেন, ইহা তাঁহার অভিমানী প্রকৃতিতে সহ্য হইবে না।

কিন্তু উপায়ই বা কি? তিনি যদি ছেলেদের ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া যান তবে তাঁরই তো নাক কাটা যাইবে। পৃথিবীর লোকে তাঁরই গায়ে থুতু দিক আর ছেলেদের গায়েই থুতু দিক, একই কথা। দুর্নাম তো তাঁহারই হইবে। সংসারের লোকে তখন বলিবে যে চার চার জন জোয়ান ছেলে থাকিতেও বুড়ী আলাদা হইয়া গেল, আর মজুরী করিয়া দিন কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। যাহাদিগকে তিনি চিরকাল নীচ বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছেন তাহারাই তাঁহাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া হাসাহাসি করিবে। না, না, সেই অপমান এই অনাদরের চেয়েও মর্মান্তিক হইবে। এখন সংসারের এসব কথা চাপিয়া যাওয়াই মঙ্গলজনক। হ্যাঁ, তবে এখন নিজেকে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। এতদিন তিনি কর্ত্রী হইয়া ছিলেন, এখন দাসী হইতে হইবে। ভগবানের তাহাই ইচ্ছা। পরের গালি ও লাথির চেয়ে নিজের ছেলেদের গালি ও লাথি খাওয়াই বরং ভাল।

তিনি ঘণ্টাখানেক মুখ ঢাকিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া খুব কাঁদিলেন। সারা রাত অসহ্য যন্ত্রণায় কাটিল। ঊষার কোল হইতে ভয়ে ভয়ে শরতের প্রভাত বাহির হইয়া আসিল, যেন কোন কয়েদী জেল হইতে চুপিসাড়ে পলাইয়া আসিল। দেরীতে উঠা ফুলমতীর অভ্যাস। কিন্তু আজ অতি প্রত্যুষেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন—সমস্ত রাত্রিতে তাঁহার মনের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। বাড়ির সব লোকই ঘুমাইতেছে, আর তিনি উঠান ঝাঁট দিতে লাগিলেন। সারা রাতের শিশিরে ভিজা পাকা উঠান তাঁহার পায়ে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। পণ্ডিতজী তাঁহাকে কখনই এত ভোরে উঠিতে দিতেন না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অভ্যাসেরও পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঝাঁট দেও

শেষ করিয়া তিনি উনান জ্বালাইলেন এবং চাল ডালের কাঁকর বাছিতে বসিয়া গেলেন। ক্রমে ছেলেরা জাগিল, বউরাও উঠিল। সকলে বৃদ্ধাকে শীতে জড়সড় হইয়া কাজ করিতে দেখিল; কিন্তু কেহই কহিল না, মা, তুমি কেন এসব করে কষ্ট পাচ্ছ? বোধ হইল সকলেই বুড়ীর গর্ব চূর্ণ হওয়ায় খুশীই হইয়াছে।

আজ থেকে ফুলমতীর এই নিয়ম হইল যে তিনি প্রাণপণ করিয়া ঘরের কাজ করিবেন আর সংসারের কোন কথায় তিনি থাকিবেন না। তাঁহার মুখে আগে আত্মগৌরবের যে জ্যোতি ছিল তাহার পরিবর্তে গভীর বেদনার ছাপ দেখা যাইতে লাগিল। যেখানে বিদ্যুতের আলো ছিল, সেখানে তেলের প্রদীপ টিম টিম করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ নিবাইয়া ফেলিতে সামান্য হাওয়ার বেশী আর কিছুই লাগে না।

মুরারীলালকে সম্বন্ধের প্রস্তাবে অমত জানাইয়া পত্র লিখিবার কথাবার্তা ঠিক হইয়াই ছিল। পরদিন সেই পত্রও লিখিয়া দেওয়া হইল। দীনদয়ালের সঙ্গে কুমুদের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল। দীনদয়ালের বয়স চল্লিশের কিছু উপরে, কুল-মর্যাদায়ও কিছু নীচে কিন্তু খাওয়া পরার কোন অভাব নাই। সে বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই বিবাহ করিতে রাজী হইয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল, বরযাত্রী আসিল, বিবাহ হইল আর কুমুদ বিদায় হইয়া গেল। ফুলমতীর প্রাণের ভিতর কি হইতে লাগিল তাহা কেহ জানিল না। কুমুদের প্রাণের ভিতর কি হইতে লাগিল তাহাও কেহ জানিল না। চার ভাই কিন্তু খুব খুশী হইল, যেন উহাদের হৃদয়ের কণ্টক উৎপাটিত হইল। কুমুদ উচ্চ বংশের মেয়ে, মুখ কেমন করিয়া খুলিবে? কপালে সুখ লেখা থাকিলে সুখ ভোগ করিবে, দুঃখ লেখা থাকিলে দুঃখ পাইবে। নিরাশ্রয়ের শেষ আশ্রয় ভগবান। যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল তাহার সহস্র দোষ থাকিলেও সে-ই তাহার উপাস্য দেবতা, তাহার প্রভু। প্রতিবাদ করিবার কল্পনাও সে করিতে পারিল না।

ফুলমতী বিবাহের কোন ক্রিয়া কর্মেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন না। কুমুদকে কি গয়নাপত্র দেওয়া হইল, নিমন্ত্রিতদের কিরূপ খাওয়ানো দাওয়ানো হইল, কে কি আশীর্বাদ দিল কিছুরই সঙ্গে যে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কহিতেন—তোরা যা কচ্ছিস্ ভালই কচ্ছিস্ আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন?

বিবাহের পরে কুমুদকে লইয়া যাইবার জন্য যখন দুয়ারে পালকী আসিয়া দাঁড়াইল আর কুমুদ মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন ফুলমতী মেয়েকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন আর তাঁহার কাছে তখনও যে নগদ পঞ্চাশ ষাট টাকা, ও অতি সাধারণ দুই চারখানা গয়না ছিল মেয়ের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—কুমুদ, আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল, তা নয়ত কি তোর বিয়ে আজ এভাবে হত, না তোকে এমনভাবে বিদায় হয়ে যেতে হত?

ফুলমতী কাহাকেও নিজের গয়নার কথা কিছুই বলিলেন না। ছেলেরা তাঁহার সঙ্গে যে কপট ব্যবহার করিয়াছে তাহা তিনি না বুঝিলেও ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে গয়না গিয়াছে তাহা তিনি আর কোন দিনই ফিরিয়া পাইবেন না, শুধু শুধু পরস্পরের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আর কোন লাভই হইবে না। কিন্তু তবুও এই সময়ে মেয়ের কাছে সব কথা বলা উচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। কুমুদ মনে মনে এই ধারণা লইয়া যাইবে যে, মা তাঁর সব গয়নাই বউদের জন্য রাখিয়া দিলেন, একথা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। এই জন্য তিনি উহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুমুদ সব কথাই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে গয়না আর টাকা আঁচল হইতে খুলিয়া মায়ের পায়ের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—মা, আমার কাছে তোমার আশীর্বাদই লাখ টাকার সমান। তুমি এগুলি তোমার কাছেই রেখে দাও, তোমাকে আরও কত বিপদে পড়তে হবে, কে জানে?

ফুলমতী কিছু বলিতে যাইতেছেন এমন সময় উমানাথ আসিয়া বলিল—কি কচ্ছিস রে কুমুদ? চল্ শিগ্‌গীর কর। যাত্রার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। সবাই ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার তো দু চার মাস পরেই আসছিস যা কিছু নিতে হয় তখনই নিতে পারবি।

ফুলমতীর কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়িল। তিনি বলিলেন—আমার কাছে এখন আর কি আছে উমা, যে আমি ওকে দেব। যা কুমুদ, ভগবান তোর শাঁখা সিন্দুর অক্ষয় করুন।

কুমুদ বিদায় হইয়া গেল। ফুলমতী আছাড় খাইয়া পড়িলেন। প্রাণের শেষ সাধও অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

এক বৎসর পার হইয়া গেল।

ফুলমতীর ঘরটা বাড়ির সব ঘরের চেয়ে বড় ছিল, আলো বাতাসও বেশি খেলিত। কয়েক মাস আগে তিনি সেই ঘরটা বড়বধূর জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নিজে একটা ছোট্ট কুঠরীতে থাকিতেন—যেন তিনি একটা ভিখারিণী মাত্র। ছেলে বউরা তাঁহাকে এখন আর বিন্দুমাত্রও ভক্তি শ্রদ্ধা করিত না। তিনি এখন বাড়ির দাসী মাত্র। সংসারের কোন লোক, কোন জিনিস বা কোন প্রসঙ্গেই তাঁহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। নিতান্ত মরণ আসে না বলিয়াই তিনি তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। সুখ বা দুঃখের এখন আর তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। উমানাথ ঔষধের দোকান খুলিল, বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইল, নাচগান, তামাশা হইল। দয়ানাথ এক প্রেস খুলিল, আবার জলসা হইল। সরকারী বৃত্তি পাইয়া সীতানাথ বিলাত চলিয়া গেল। আবারও উৎসব হইল। কামতানাথের বড় ছেলের পৈতা হইল, খুব ধুম-ধাম হইল, কিন্তু ফুলমতীর মুখে আনন্দের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। কামতানাথ মাস-খানেক টাইফয়েডে ভুগিয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। দয়ানাথ নিজের কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এবার বাস্তবিকই আপত্তিজনক এক প্রবন্ধ লিখিয়া ছয় মাসের জন্য জেলে গেল। উমানাথ ঘুষ খাইয়া এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াতে উহার ডাক্তারী ডিগ্রী কাটা গেল। কিন্তু ফুলমতীর চেহারায় দুঃখ বা শোকের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তাঁহার জীবনে এখন আর কোন আশা, কোন উৎসাহ বা কোন চিন্তা নাই। পশুর মত কাজ করা আর খাওয়া ইহাই তাঁহার জীবনের দুই কাজ হইয়া দাঁড়াইল। পশুরা মার খাইয়া কাজ করে, কিন্তু নিজের ইচ্ছায়ই খায়। ফুলমতীকে কেহ কাজ করিতে না কহিলেও কাজ করিতেন, কিন্তু খাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়—যেন বিষের গ্রাস মুখে তুলিতেন। এক মাস হয়ত মাথায় তেল পড়িল না, কাপড় ধোলাই করা হইল না, তাঁহার সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। তিনি যেন চেতনাশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি হইতেছে। চারিদিকে ম্যালেরিয়া হইতেছে। আকাশে মেঘ, মাটিতে জল। ভিজা বাতাস ম্যালেরিয়া জ্বর আর সর্দি কাশি বিতরণ করিয়া ফিরিতেছে। বাড়ির ঝি জ্বরে পড়িয়াছে। ফুলমতী সব বাসন মাজিলেন, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া সব কাজ করিলেন। তারপর উনুন ধরাইয়া উনুনে কড়া চাপাইয়া দিলেন। ছেলেদের তো ঠিক সময়ে খাইতে দিতেই হইবে।

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে কামতানাথ কলের জল খায় না। ঐ বৃষ্টির মধ্যেই তিনি গঙ্গা হইতে জল আনিতে চলিলেন।

কামতানাথ বিছানায় শুইয়া শুইয়া কহিল—তুমি রেখে দাও মা, আমিই নিয়ে আসব। ঝিটা তো আজ বসেই রইল। ফুলমতী মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুই ভিজে যাবি, তোর অসুখ করবে।

কামতানাথ বলিল—তুমিও তো ভিজছ। দেখো, আবার অসুখ হয়ে না পড়। ফুলমতী নির্মমভাবে কহিলেন—আমার কিছু হবে না। ভগবান আমাকে অমর করে দিয়েছেন।

উমানাথও সেখানেই বসিয়াছিল। তাহার

ঔষধের দোকান হইতে কিছুই আয় হইতেছিল না, এইজন্য সে বড়ই চিন্তাকুল ছিল। তাহাকে ভ্রাতা আর ভ্রাতৃবধূর মুখ চাহিয়া চলিতে হইত। সে বলিল—যেতে দিন দাদা। অনেক দিন বউদের জ্বালিয়েছেন, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হউক।

গঙ্গাতে ভরা জোয়ার। মনে হয় যেন সমুদ্র। অপর তীর দূরে ধূ ধূ দেখা যাইতেছিল। পাড়ের গাছগুলির বেশির ভাগই জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ঘাটও সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছিল। ফুলমতী কলসী লইয়া নীচে নামিলেন, কলসী ভরিয়া যেই উপরে উঠিবেন এমন সময়ে পা পিছলাইয়া গেল। সামলাইতে পারিলেন না, জলে পড়িয়া গেলেন। দুই চারবার হাত পা ছুঁড়িলেন, কিন্তু ঢেউ আর স্রোতের টানে জলের নীচে চলিয়া গেলেন। নদীর পাড়ের দুই চারজন পাণ্ডা চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে শীগ্গির এসো, বুড়ী যে ডুবে গেল। দুই চারজন লোক দৌড়াইয়াও আসিল। কিন্তু ফুলমতী তখন ঢেউয়ে ঢেউয়ে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন—সে ঢেউ দেখিলে ভয়ে বুক দুরুদুরু করিয়া ওঠে।

একজন বলিল—কে এই বুড়ী?

'আরে ঐ যে পণ্ডিত অযোধ্যানাথের বিধবা।'

'অযোধ্যানাথ তো মস্ত বড়লোক ছিলেন।'

'তা তো ছিলেনই, কিন্তু এর কপালে অনেক দুঃখ লেখা ছিল।'

'কেন, ও'র তো বড় বড় ছেলে রয়েছে সবাই তো বেশ রোজগার করে?'

'হ্যাঁ, সবই আছে ভাই, কিন্তু কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল।'

অনুবাদক—শ্রীযতীশচন্দ্র গুপ্ত

ইতর প্রাণীর ভাষা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

কথাই পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান বা ভাব প্রকাশের একমাত্র ভাষা নয়। জন্তু জানোয়ার কথা বলতে পারে না, কিন্তু ওরা পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান বা ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ। পাখীর কথাই ধরা যাক। মোরগছানা যখন খাবার অন্বেষণে এদিক-ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন হঠাৎ মোরগ-মাতার কণ্ঠের বিশেষ ধ্বনিতে ছানাগুলি চমকে ওঠে ও কালমাত্র বিলম্ব না করে মাটির উপরে অথবা নিকটবর্তী কোন ঝোপ বা অন্য কোন আশ্রয়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে বসে পড়ে। মায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনে ছানাগুলি বুঝতে পারে, তাদের সতর্ক করবার জন্য মায়ের এ সংকেত-বাণী। বিপদ কেটে গেলেই মায়ের কাছ থেকে আবার সংকেতধ্বনি আসে। সে ধ্বনি শুনা মাত্র ছানাগুলি বুঝতে পারে, বিপদ কেটে গেছে, অমনি ওরা চটপট উঠে পড়ে খাবার সন্ধানে বের হয়।

অনেক সময় বিশেষভাবে শীতের প্রারম্ভে অন্ধকার রাত্রিতে মাথার উপরে আকাশে পাখীর একটানা করুণ ডাক শুনতে পাওয়া যায়, ওরা সব দেশ ভ্রমণের যাত্রী। কত দূর দেশ হতে হয়তো ওরা এসেছে, আরো কত দূর দেশে হয়তো ওদের যেতে হবে। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ পথে উড়ে চলবার সময় ওদের দলছাড়া হয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা। গভীর নিশীথে অন্ধকারে একবার দলছাড়া হলে পুনরায় দল খুজে পাওয়া খুবই শক্ত। তখন ঐ ডাক লক্ষ্য করেই ওরা নিজের দলকে খুঁজে নেয়। ডাক শুনে অন্ধকারে নিজের দলের সঙ্গে সঙ্গে চলতেও ওদের সুবিধে হয়। সুতরাং তাদের কণ্ঠের সেই করুণ ধ্বনিও একরকম ভাষা।

আমরা সব সময়ে কি শুধু কথা বলেই মনের ভাব ব্যক্ত করি? শরীরে বা মনে আঘাত পেলে আমরা উঃ আঃ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে মনের ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি। সে শব্দ শুনে লোকে আমাদের মনের ভাব বুঝতে পারে। কোন-কিছুর সম্বন্ধে সম্মতি বা অমত জানাতে হলে আমরা শুধু একটু ঘাড় বা হাত নেড়ে তা জানিয়ে দিই। লোকে আমাদের সেই হাত বা ঘাড় নাড়া দেখে বুঝতে পারে, আমরা কি বলতে চাই। আমাদের কণ্ঠের উঃ আঃ ধ্বনি, হাত বা ঘাড় নাড়াও আমাদের এক রকমের ভাষা। জন্তু জানোয়ার কথা বলতে পারে না—আমাদের মতো ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সংযোগে কোন বাক্যও রচনা করতেও ওরা অসমর্থ। কিন্তু সময় সময় মনের ভাব ব্যক্ত করবার জন্য ওরা যেসব শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করে, তা অনেকটা আমাদের উঃ আঃ আহা প্রভৃতি ধ্বনির ন্যায় অর্থবোধক। মোরগ-মাতা যখন তার ছানাদের সতর্ক করে দেবার জন্য হঠাৎ ডেকে ওঠে, তখন তার সে ডাক বা ধ্বনির মধ্যে থাকে বিপদের বার্তা। ছানাগুলি সে ধ্বনির অর্থ বুঝতে পারে। মাকে কাছে দেখতে না পেলে কুকুরছানা কুঁই কুঁই করে ডেকে ডেকে অস্থির করে তোলে। মা দূর হতে সে ডাক শুনলে ছুটে আসে, তার ছানাদের কাছে। ছানাদের সে ডাকের অর্থ কুকুর-মাতার বুঝতে দেরি হয় না কুকুরছানার সেই কুঁই কুঁই রবও ওদের ভাষা। ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক, মাটিতে তাদের পা-ঠোকার শব্দ সেও ওদের এক রকমের ভাষা। কাছাকাছি কোন ঘোড়া সে ডাক শুনে বা পায়ের আস্ফালন দেখে অন্য ঘোড়া তার অর্থ বুঝতে পারে।

কোন কোন জন্তুর গায়ের গন্ধও তাদের এক রকমের ভাষা। বনে-জঙ্গলে হরিণ বা হাতী দল বেঁধে চরে বেড়ায়। শত্রুর তাড়ায় অনেক সময় ওদের দলছাড়া হয়ে পড়তে হয়। পুনরায় দলে ফিরে আসতে না পারলে ওদের বিপদ পদে-পদে। সেই সব দলছাড়া হরিণ কী করে পুনরায় দলে ফিরে আসে? মাটিতে বা ঘাসের উপর তাদের গায়ের যে গন্ধ লেগে থাকে, তা অনুসরণ করে ওরা নিজের দলের সন্ধান করে। হরিণ চরবার সময় তাদের মুখ ও পা থেকে তাদের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে ঘাসের মধ্যে ও মাটিতে। যৌন-সম্মিলনের সময় হলে পুরুষ হাতীর মাথা হতে মদস্রাব হয়। সে গন্ধ অতি উগ্র। নিবিড় অরণ্যে সে গন্ধ অনুসরণ করে স্ত্রী হস্তী পুরুষ হস্তীর সন্ধান পায়।

গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি লাঙ্গুলহীন উচ্চ শ্রেণীর বানর মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করে। রাগ, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, আহারের পর তৃপ্তি প্রভৃতি মনের ভাব ওরা প্রকাশ করে কণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবব্যঞ্জক মুখের রেখার পরিবর্তনের দ্বারা। একজন ফরাসী ভদ্রলোক আফ্রিকার বন থেকে গ্রামোফোন করে শিম্পাঞ্জির গলার নানা রকম ধ্বনি রেকর্ড করে এনেছিলেন। সেসব রেকর্ড তার পোষা শিম্পাঞ্জির নিকট বাজাবার সময় শিম্পাঞ্জিটির মুখে তিনি কখনো বিস্ময়, কখনো ভয়, কখনো-বা আনন্দের আভাষ ব্যক্ত হয়ে উঠে দেখতে পান। সে অবস্থায় ছবি তুললে ছবিতেও ওদের মুখের সে ছাপ পড়ে। তা দেখে তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কুকুর চ্যাঁচায়, গোঁ গোঁ করে, ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। কুকুরের ডাকের এসব ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি অন্য কুকুরের নিকট নিতান্ত অর্থহীন নয়। সেসব ডাকের অর্থ আমরাও কিছু কিছু বুঝতে পারি। নতুবা রাত্রিতে কুকুরের ডাকে চোর তাড়াবার জন্য আমরা বাইরে উঠে আসতুম না। কুকুর শুধু ডেকেই নয়, নানা রকমের মুখভঙ্গি ও অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারাও নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে। কুকুর রাগলে দন্তপাটি মেলে দেয়, পিঠের লোম খাড়া হয়ে

ওঠে, আনন্দ হলে প্রভুর গায়ে পা দেয় তুলে বেশী আনন্দ হলে প্রভুর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দেয়, জিভ দিয়েও প্রভুর মুখ, গা চেটে দেয়। এসবই ওদের মনের ভাব প্রকাশের ভাষা। এ-ভাষা আমাদের চেয়ে ওদের স্বজাতি কুকুরেরা বোঝে বেশী।

অতি শৈশবে আমরা কথা বলতে পারিনে। 'চলি চলি পা' করে মা যেমন আমাদের হাঁটতে শেখায়, তেমনি আধো আধো বুলি উচ্চারণ করে মার কথার সংগে সংগে কথা বলতেও শিখি। কিন্তু অতি শৈশবেও শিশু ক্ষিদে পেলে বা কোন রকমের কষ্ট হলে কাঁদে। আনন্দ হলে ওদের কণ্ঠ হতে যে কলধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা ক্রন্দন নয়। এই ক্রন্দন বা আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করতে ওদের কে শেখায়? শিশুর এই ক্রন্দন বা আনন্দধ্বনি ওদের জন্মগত সংস্কার Instinct- লব্ধ ভাষা। এ-ভাষা তাদের শিখতে হয় না।

শিশুর ভাষার কথায় এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরের ভাষা তাদের জন্মগত সংস্কার না তাদের মায়ের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বুলি? এর উত্তর পাওয়া গেছে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের পরীক্ষা থেকে। ফরাসী ভদ্রলোকটি একটি শিম্পাঞ্জিকে পাঁচ বৎসরকাল অন্য শিম্পাঞ্জির কাছ থেকে দূরে রেখে নিরালায় প্রতিপালিত করেন। এই পাঁচ বৎসর শিম্পাঞ্জিটি তার স্বজাতি অন্য কোন শিম্পাঞ্জির ডাক বা কণ্ঠ-ধ্বনি শুনতে পায়নি। অন্য কোন শিম্পাঞ্জিকে চোখে দেখবার সুযোগও তার ঘটেনি। পাঁচ বৎসর পর দেখা গেল, শিম্পাঞ্জির সব রকমের ভাষাই সে বুঝতে ও উচ্চারণ করতে সমর্থ। জন্মাবার পর থেকে তার এ-ভাষা শিখবার কোন রকম সুযোগই ঘটেনি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জন্মগত সংস্কারবশেই সে তার স্বজাতির ভাষা আয়ত্ত করেছে। অবশ্য আমাদের ভাষার সংগে তাদের সে-ভাষার কোনই মিল নেই। সে-ভাষা শুধু একটু উঃ আঃ, উঁহু, আহা প্রভৃতি ধ্বনি অথবা আমাদের আনন্দের চিৎকার অথবা কান্নার শব্দের মতো।

পতঙ্গ অতি নিম্নশ্রেণীর জীব। ওদের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। অথচ পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ওদের মধ্যে যে কোন রকমের ভাষা প্রচলিত নেই, তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। মৌমাছি যে চাকের মধ্যে নৃত্য দ্বারা নতুন জায়গায় মধু আবিষ্কারের সন্ধান দেয়, সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে।* ওদের গায়ের গন্ধও ওদের এক রকমের ভাষা। ফুল থেকে মধু আহরণ করবার সময় ওদের গায়ে ফুলের যে-গন্ধ লেগে থাকে, সেই গন্ধে অন্য মৌমাছি জানতে পারে, কোন্ ফুলে ওরা মধুর সন্ধান পাবে। বাসার ভিতরে বা বাইরে পিঁপড়ে পরস্পরের মধ্যে কিভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করে তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। বাসা নির্মাণে, শত্রুর সংগে লড়াই আহার সংগ্রহ করা প্রভৃতি ব্যাপারে ওদের কাজের মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলা, কর্মবিভাগ, একতা ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে দেখা যায়, তাতে সহজেই মনে হতে পারে, অন্ধ সংস্কারবলে চালিত হলেও পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কোন-না-কোন রকমের ভাষা হয়তো ওদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু মৌমাছির মতো ওদের ভাষা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

জন্তু জানোয়ার বা পাখীর ভাষা জন্মগত সংস্কার হলেও কোন কোন পাখী শিক্ষা দ্বারা মানুষের কণ্ঠের অনুকরণে কথা বলতে বা নানা রকমের ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। দাঁড়ে বসে পোষা ময়না, টিয়ে ও তোতা হরিনামের বুলি যেমন আওড়ায়, তেমনি আবার নানা রকমের বুলি উচ্চারণ করে লোককে গালা-গালিও দিতে পারে। এসবই ওদের শেখানো বুলি। শুধু মানুষের শেখানো বুলিই নয়, কোন কোন পাখী অন্য পাখীর ডাকও অনুকরণ করতে পারে। ফিঙে, হরবোলা, দোয়েলের ডাকে অনেক সময় অন্য পাখীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। সে ডাক তাদের জন্মগত সংস্কার নয়, নিজেদের চেষ্টাকৃত শিক্ষা। চড়াইকে কেনেরি পাখীর খাঁচায় রাখলে সে কেনেরির ডাক অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। নাইটিঙ্গেলের সংগে কেনেরিকে রেখে দেখা গেছে, কেনেরিও নাইটিঙ্গেলের মতো গান গাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাখীর সব ডাকই তাদের জন্মগত সংস্কার নয়, কতক কতক ডাক ওদের নিজেদের চেষ্টাকৃত শিক্ষা। মোরগছানাকে আলাদা রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কতক কতক ডাক জন্মকাল থেকে না শুনেও বড় হয়ে ওরা ডাকতে পারে। সেসব ডাক ওদের জন্মগত সংস্কার। কিন্তু সব ডাকই নয়, কোন কোন ডাক শেখে ওরা অন্য মোরগের ডাক শুনে।

আমরা যে ভাষায় কথা বলি, জন্তু জানোয়ার কি আমাদের সে ভাষা বুঝতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে যারা জন্তু জানোয়ার পোষেন, পোষা কুকুর বেড়াল যাদের বিশেষ প্রিয়, তাঁরা হয়তো খুব জোরের সংগেই সাক্ষ্য দেবেন, পোষা জন্তু জানোয়ার তাঁদের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু তাই কি? পোষা জন্তু জানোয়ারের কথায় কুকুরের কথাই হয়তো আমাদের সকলের আগে মনে আসবে। সত্যি সত্যি কি কুকুর আমাদের কথার অর্থ অনুসরণ করতে পারে? খুব সম্ভব নয়। আমাদের কথা বা আদেশ অনুসরণ করে কাজ করবার সময় কুকুর তার অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করে। খুসীমনে স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরকে যদি বলা যায়, 'তোকে চাবুক মারবো', তাতে সে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বরং সে আনন্দে ঘন ঘন লেজই নাড়তে থাকবে। যদি ওর দিকে অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রন্দনের ভঙ্গিতে ওকে বলা যায়—"ওরে, তোর জন্য মাংসের হাড় এনেছি", সে কথায় তার চোখে মুখে মোটেই উল্লাসের ভাব ব্যক্ত হয়ে ওঠে না, বরং লেজ গুটিয়ে সভয় দৃষ্টিতে সে মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবু একথা সর্বজনবিদিত, সব বিষয়ে না হোক, কুকুরকে শেখালে কোন কোন বিষয়ে মানুষের কথার বা আদেশের অর্থ অনুসরণ করে ওরা চলতে পারে। বুদ্ধিমান কুকুরকে শেখালে আড়ালে থেকে আদেশ করেও তাদের দ্বারা কাজ করানো যায়।

পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে আবেদন-নিবেদন জানাবার জন্যও ভাষার প্রয়োজন হয়। জন্তু জানোয়ারের কি সেরকম কোন ভাষা আছে? ওরা কি নিজেদের মধ্যে পরস্পরের কাছে আবেদন-নিবেদন জানাতে পারে? কুকুরকে শেখালে সে তার মনিবের কাছ থেকে খাবার চাইতে পারে, অবশ্য তার নিজের ভাষায়। পোষা বিড়াল খাবারের লোভে মনিবের পেছনে পেছনে ঘোরে ও মিউ মিউ করে ডেকে অস্থির করে তোলে। খাবার দিলেই তার ডাক বন্ধ হয়। এই মিউ মিউ ডাক তার খাবার জন্য আবেদনের ভাষা। বনে-জঙ্গলে বুনো জন্তুও কি পরস্পরের মধ্যে খাবার জন্যই হক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হক তাদের মনের আবেদন-নিবেদন জানাতে পারে? বাচ্চা অবস্থায় ক্ষিদে পেলে জন্তু জানোয়ার ডাকে। সে ডাকের অর্থ তার মা বুঝতে পারে। সেরূপ ডাক তাদের জন্মগত সংস্কার। কিন্তু বড় হয়ে তার স্বজাতির কাছ থেকে খাবার পাবার জন্য জন্তু জানোয়ার ডেকে বা অন্য কোন উপায়ে তাদের মনের আবেদন জানায় কি না, তা জানা নেই। অন্তত আজ পর্যন্ত সেরকম বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

* দেশ, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৫২।

ক্ষয়রোগের প্রতিকার

ডঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

ক্ষয়রোগের প্রতিকার করা সাধ্য হ'লেও খুব সহজ নয়। হয়তো একদিন হয়ে যাবে এখনকার চেয়ে খুবই সহজ, যখন এর বিরুদ্ধে তেমন একটি অব্যর্থ ওষুধের আবিষ্কার হবে। কালাজ্বরের বিরুদ্ধে, সিফিলিসের বিরুদ্ধে, নিউমোনিয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধ যেমন এক একটি অব্যর্থ ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে, ক্ষয়রোগের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নি। সুতরাং এই রোগশত্রুকে কোনো একটি অমোঘ মৃত্যুবাণের দ্বারা বধ করতে না পেরে অন্য উপায়ে একে পরাস্ত করবার জন্য অন্য দিক দিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত অ্যাটম্ বোমার আবিষ্কার হয়নি, ততদিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রত্যেক জাতিকে অনেক রকমের তোড়জোড় করতে হয়েছে, কিন্তু ঐ মোক্ষম অস্ত্রটি আবিষ্কারের পর থেকে যুদ্ধ সমস্যা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। সকলেই জানে যার হাতে অ্যাটম বোমা আছে তার যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয় হবে,—অবিশ্যি যে পর্যন্ত না অপরপক্ষ অ্যাটম বোমা অপেক্ষা আরও মারাত্মক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম না হয়। ক্ষয়রোগের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাটম বোমার আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি বটে, কিন্তু তাই বলেই কি ঐ রোগের বিরুদ্ধে অন্য কোনো অস্ত্র নেই? অনেক কাল পর্যন্ত আমরা তাই মনে ক'রে এসেছি বটে, কিন্তু এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে সেদিন আর নেই। এই রোগের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে সংগ্রাম করবার অনেক উপায় আমরা এখন জানি এবং সেই সকল উপায়ের দ্বারা যে যথেষ্টই সুফল হয় তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। এখনও যদি ক্ষয়রোগের নাম শুনলেই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি, সময় থাকতে তার বিরুদ্ধে যদি উপস্থিত জানিত উপায়গুলিকে প্রয়োগ না করি, তবে যে পরাজয়কে আমরা স্বীকার ক'রে নেবো, সে হবে একটা ক্ষয়কারী রোগের বিষের কাছে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মানববুদ্ধির অতি লজ্জাকর পরাজয়। তেমনভাবে হার মানা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই পক্ষে অনুচিত

অন্যান্য রোগের যেমন চিকিৎসা হয়, ক্ষয়রোগের চিকিৎসা তার থেকে অনেক বিষয়েই স্বতন্ত্র। এখানে কেবল ডাক্তারেই রোগের চিকিৎসা করে না, অধিকাংশ চিকিৎসাটা রোগী নিজের পক্ষ থেকে নিজেই করে। ডাক্তারে বারে বারে এসে তাকে শুধু উপদেশ আর সাহায্য দিয়ে যায় মাত্র, যখন যেমন দরকার হয়। এ চিকিৎসা ওষুধের দ্বারা নয়, এর অধিকাংশই নির্ভর করে শরীর রক্ষা সম্বন্ধে বাঁধাধরা কয়েক প্রকার নিয়ম রক্ষার উপর। এই দিক দিয়েই রোগটিকে জয় করতে হয়—ঝটিতি নয়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে। চিকিৎসকের বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত নির্দেশ মেনে চলতে হয়, যেমনভাবে শত্রুজয় করতে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতা শিখে নিয়ে সৈন্যদল অধ্যক্ষের নির্দেশ মেনে চলে। রোগের প্রথম অবস্থা থেকে সেই শিক্ষা অনুসারে চলতে অভ্যস্ত হলে রোগটি তাতেই নিশ্চিতরূপে পরাজিত এবং আরোগ্য হয়ে যায়। পূর্বেকার দিনে অনেকে যেমন যোগ সম্বন্ধে সাধনা করতো, এও যেন কতকটা তেমনি ধরণের এক সাধনা। এর দ্বারা সেরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রোগী যেন এক একটা নতুন রকমের মানুষ তৈরী হয়ে যায়। তাদের মনের ভয় আর অনিশ্চিতের সন্দেহ দূর হয়ে যায়, অব্যবস্থিত চরিত্র ঘুচে যায়, আত্মনির্ভরতা আসে, আর বিশেষ ক'রে তারা শেখে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা, অসাধারণ ধৈর্য, আর কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। মৃত্যুর সমস্ত সম্ভাবনাকে দূর ক'রে দিয়ে বেঁচে ওঠাই হয় তাদের প্রধান লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্য থেকে তারা সহজে ভ্রষ্ট হয় না। বেঁচে থাকার কর্তব্য যে কেমন করে পালন করতে হবে এ তারা ভালোমতেই শিখে নেয়। তারপর যখন সেরে ওঠে তখন নতুন মেয়াদ আর নতুন প্রেরণা নিয়ে তাদের জীবনের কাজ শুরু ক'রে দেয়। যারা এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে সেরে উঠতে পারে, ক্ষয়রোগ তাদের কোনো ক্ষতি করে যায় না, বরং যুদ্ধ জয়ের শিক্ষার দ্বারা নতুন মানুষ তৈরী করে দিয়ে যায়।

কেমন ক'রে ক্ষয়রোগের প্রতিকার করতে হয় আর কেমন ক'রেই বা এর বিষক্রিয়াকে পরাজিত করতে হয়, সেটা আমাদের সকলেরই জেনে রাখা দরকার। এই সকল জ্ঞানের যত বেশী প্রচার হয় ততই ভালো। এতে লোকের মনের বিভীষিকা অনেক ঘুচে যাবে, আর আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কারো এই দুর্ভাগ্য ঘটলে তখন তাদের অনেক সাহায্য এবং সাহস দেওয়াও যেতে পারবে। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারবে যে, ক্ষয়রোগ মানেই ফাঁসীর হুকুম নয়, এরও রীতিমত প্রতিকার আছে এবং সে প্রতিকার কেবল বিশ্বস্তভাবে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা। অনেক রোগী না বুঝে এই নিয়ে তর্ক করে, অবিশ্বাস করে, আস্থাহীন হয়ে ডাক্তারের নির্দেশ খানিকটা মানে আর খানিকটা অবহেলা করে। এই ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারণগুলো জানা থাকলে সকলেই বুঝতে পারবে যে, এ স্থলে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই, আর হতাশ হবারও কোনো প্রয়োজন নেই, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা যে পন্থা সার্থক বলে প্রমাণ হয়েছে, সেই পন্থাটি অবলম্বন করলে রোগ নিশ্চয়ই তাতে সেরে উঠবে।

প্রকৃতি দত্ত তিনটি মহৌষধ ক্ষয়রোগের প্রতিকারকল্পে আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে রয়েছে—১। **বিশ্রাম,** ২। **বাতাস,** ৩। **পথ্য।** বিবেচনা পূর্বক এই তিনটিকে প্রয়োগ করতে পারলেই হাতে হাতে তার ফল পাওয়া যায়। রোগ সারাবার মূল উপায় এই তিনটি। পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার দ্বারা এই কথাই জানা গেছে যে—

১। শরীরের যে অংশকে ক্ষয়রোগ আক্রমণ করেছে সেই অংশের ব্যবহারটি সম্পূর্ণ স্থগিত রেখে হাড়ভাঙ্গা অঙ্গের মতো অব্যবহার্য অবস্থায় বিশ্রাম দিয়ে কিছুকাল ফেলে রাখতে পারলেই ক্ষয়রোগ আপনা থেকে আরোগ্য হয়ে যায়।

২। চব্বিশ ঘণ্টা সম্ভব না হলেও দৈনিক যদি অন্তত ছয় ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত খোলা জায়গায় মুক্ত বাতাসে থাকতে পারা যায় এবং দিনরাত্রি সর্বক্ষণই যদি বহমান বায়ুগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ক্ষয়রোগ আরোগ্যের পক্ষে তাতেই অনেক কাজ হয়।

৩। এমন পথ্য যদি রোগীকে দেওয়া যায়, যার দ্বারা তার শরীরের হ্রাস প্রাপ্ত ওজন বেড়ে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়েও কিছু বেশী হতে পারে, তবে সেই পথ্যের দ্বারাই ওষুধের মতো আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হয়।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার এই তিনটি মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি শিখে নিয়ে যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করতে পারলে এই রোগের মারাত্মক কবল থেকে

অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেমন তেমন ভাবে প্রয়োগ ক'রে কোনো লাভ নেই, সমুচিত শিক্ষার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। যে রোগের কোনো আক্রমণাত্মক চিকিৎসা নেই তার জন্য সংরক্ষণাত্মক চিকিৎসারই ব্যবস্থা করতে হয়। শত্রু যখন দুর্গ আক্রমণ করে তখন যদি তাকে মারবার উপযুক্ত কোনো অস্ত্র না থাকে, তখন দুর্গ সুরক্ষিত করতে থাকাই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। দুর্গটিকে দুর্ভেদ্য ক'রে রাখতে পারলেই শত্রু অবশেষে পরাজিত হ'য়ে ফিরে যায়। আমরা তাই সেই উপায়গুলির কথাই এখানে আলোচনা করছি।

বর্তমান সংরক্ষণাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছে বিশ্রাম। বিশ্রামে যে কিছু উপকার হয় এটা আগের থেকেই জানা ছিল। শুধু ক্ষয়রোগে কেন, সকল রোগের পক্ষেই বিশ্রাম উপকারী। কিন্তু এখানে ঘরে বসে কাজকর্ম ছেড়ে অল্প বিস্তর বিশ্রামের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে বলা হচ্ছে রোগীকে সর্বক্ষণ বিছানাতে শায়িত অবস্থায় ফেলে রেখে পরিপূর্ণ রকমের বিশ্রাম দেবার কথা, পিঠের মেরুদন্ডটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলে যেমনভাবে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতে হয়। চিকিৎসার গোড়া থেকেই এমনি ভাবের সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে পারলে যে কতখানি উপকার হয় সে কথা বলা যায় না। আগে এমনি পরিপূর্ণ বিশ্রামের এতটা উপকারিতার কথা জানা ছিল না, তাই কোনো চিকিৎসায় কিংবা কোনো কোনো পথ্যের দ্বারা বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যেতো না। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, ঐরূপ বিশ্রাম না দিয়ে ঔষধপথ্য প্রয়োগ করতে থাকা, আর ছিদ্রপূর্ণ পাত্রের ছিদ্র না বুজিয়ে তার মধ্যে জল ভরতে থাকা, দুইই সমান অনর্থক।

জীবনী শক্তিকে টেঁকসই রাখতে হলে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা আমরা একটু বিচারপূর্বক ভেবে দেখলেই বুঝতে পারি। নিরবচ্ছিন্নভাবে খাটাতে থাকলে কোনো যন্ত্রই টি'কতে পারে না। এমন যে আমাদের হৃদযন্ত্র থাকে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে হচ্ছে, সেও প্রত্যেকটি ক্রিয়ার পরে একবার ক'রে থামে সুতরাং মোট হিসাব করলেই দেখা যাবে যে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে বারো ঘণ্টার মতো বিশ্রাম পায়। আমরা প্রত্যেকেই দেখি যে শরীরের কোনো একটি অঙ্গকে কিছুক্ষণ যাবৎ খাটালেই সে অঙ্গটি অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তারপর কিছু বিশ্রাম দিলেই সে আবার নতুন ক'রে খাটতে পারে। কিন্তু অবসন্ন অঙ্গকে বিশ্রাম না দিয়ে টেনে টেনে খাটাতে গেলে সে তেমন খাটতেও পারে না, আর একেবারে অকর্মণ্য অবস্থায় পৌঁছে বিশ্রাম দিলেও তখন তার অবসন্নতা ঘুচতে অনেক দেরী হ'য়ে যায়। পাঁচতলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হ'লে যদি আমরা এক দমে সেটা করতে যাই তাহলে আমাদের খুবই হাঁপিয়ে পড়তে হয়, তার অস্বস্তিটা দূর করতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। কিন্তু একটু থেমে থেমে যদি প্রত্যেক ধাপটা ওঠা যায় তাহ'লে আমাদের কিছুই অস্বস্তি বোধ হয় না, তার কারণ প্রত্যেকটি প্রয়াসের পরেই আমরা অল্প একটু বিশ্রাম নিতে নিতে উঠি, কাজেই অবসন্নতা ঘটবার কোনো অবকাশ থাকে না। কিন্তু এই সকল কথাও বলা যায় কেবল সুস্থ শরীরেরই সম্পর্কে। অসুস্থ শরীরের পক্ষে আরও কম খাটুনি এবং বেশি বিশ্রামের দরকার হয়, নতুবা সে অল্পেই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। কোনো হাড় ভেঙে গেলে সেটিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বেঁধে রাখতে পারলে তবেই তাতে জোড়া লাগে। ফুসফুস ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলে তার পক্ষে একথা আরও বিশেষ করেই প্রযোজ্য। সেইজন্যই সমস্ত শরীরটিকে বিশ্রাম দিতে হয়, কারণ তখনকার শরীর দিয়ে যেমন কোনো পরিশ্রমই করা যাক, নাড়ির দ্রুতগতির সঙ্গে তাতে ফুসফুসের ক্রিয়াটাই আরো দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মাত্রা আরো দ্বিগুণ চারগুণ দ্রুততর হতে থাকে। অথচ ক্ষয়রোগে সেই যন্ত্রটাই বিশেষরূপে আক্রান্ত, তাকেই বিশেষ ক'রে বিশ্রাম দেবার প্রয়োজন। সুতরাং শরীরের সকল রকমের ক্রিয়া-চাঞ্চল্যকেই তখন স্থগিত রাখা দরকার। ফুসফুসকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু সকল রকমের অঙ্গচালনাকে স্থগিত রাখার দ্বারা ফুসফুসের পরিশ্রম অনেক লাঘব করা যায়। দুটি ফুসফুসের মধ্যে একটি মাত্র আক্রান্ত হ'লে তখন তাকে কৃত্রিম উপায়ে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব। বক্ষ-গহ্বরের বায়ু শূন্য স্থানে যদি বাইরের বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তবে সেই বায়ুর চাপে ফুসফুসটি একেবারে সংকুচিত হয়ে যায়, তখন ক্রিয়াশূন্য হ'য়ে সেটি বিশ্রাম পায়। এই উদ্দেশ্যেই এ পি করা হয়। কিন্তু সকল অবস্থায় তা সম্ভব হয় না। তখন অন্য উপায়ে যথাসম্ভব বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়।

এ ছাড়া পরিশ্রমের দ্বারা শক্তিক্ষয়ের কথাটাও বিশেষরূপে বিবেচ্য। খাদ্যাদির দ্বারা শরীরে দৈনিক যেটুকু শক্তির সৃষ্টি হয়, ক্ষয়রোগের অবস্থায় কোনো কিছুর জন্যেই তার ব্যয় হতে দেওয়া চলবে না, রোগের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবার জন্যে পারতপক্ষে তার সমস্তটুকুকেই সঞ্চিত এবং সংহত করে রাখতে হবে। শরীরের সকল রকম ক্রিয়াতেই অল্পাধিক শক্তির ব্যয় হয়, তবেই সেই ক্রিয়াটি ঘটতে পারে। এমন কোনো ক্রিয়া নেই যা বিনা শক্তি ব্যয়ে ঘটানো সম্ভব। কোনো ভারী জিনিসকে উঁচু করে তুলতে হলে যেমন তাতে খানিকটা শক্তি ব্যয় আছে, শরীরের প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই তেমনি শক্তি ব্যয় আছে। অবশ্য কোন ক্রিয়াতে কতখানি শক্তি খরচ হবে সেটা নির্ভর করে সেই ক্রিয়ার গুরুত্বের উপর। যে জিনিসটি যতখানি ভারী, আর যতখানি পর্যন্ত উঁচুতে তাকে তুলতে হবে, এই দুই-এর একত্রিত পরিমাপের উপর নির্ভর করে যে কতখানি শক্তিকে ঐ ক্রিয়াটির জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রত্যেক ক্রিয়াতে এই শক্তির খরচকে নির্দিষ্ট একটা হিসাবের মধ্যে ধারণা করবার জন্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এক পাউন্ড ওজনের জিনিসকে এক ফুট উঁচুতে তুলতে গেলে যতটা শক্তির দরকার তার মাপ এক ফুট-পাউন্ড। ওজনের মাপ করা হয় পাউন্ডের দ্বারা, আর দূরত্বের মাপ করা হয় ফুটের দ্বারা, এই দুই-এর সংমিশ্রণে যে ক্রিয়াটি ঘটে তার দরুণ শক্তিব্যয়ের মাপ করা হয় ফুট-পাউন্ডের দ্বারা। সেই মাপ অনুযায়ী দেখা গেছে যে, আমাদের হৃদযন্ত্রটিকে এক একবার সংকুচিত ক'রে রক্তস্রোতের নাড়িতে এক একটি স্পন্দন আনতে প্রত্যেক বারেই ঠিক দুই ফুট-পাউন্ড ক'রে শক্তিব্যয় হয়। আমাদের বিশ্রামের অবস্থায় স্বাভাবিক নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে প্রায় সত্তর-আশি বার। বিশ্রাম ছেড়ে একটু কিছু পরিশ্রম করলেই এই নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি বার আরো বেড়ে যায়। চলাফেরা বা উঠে দাঁড়ানো মানেই কিছু পরিশ্রম, কারণ তাতেও নাড়ির গতি ঐ পরিমাণে বাড়ে। যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে খুব সামান্যই পরিশ্রম, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে এক ঘণ্টা যাবত ঐরকম সামান্য পরিশ্রমেই কতটা বেশি শক্তিক্ষয় হ'য়ে যায় সেটা একবার ভেবে দেখুন। তখন প্রতি মিনিটে নাড়ির গতি কুড়ি বার বেশি মাত্রায় চলছে, আর প্রতি ঘণ্টায় হয় ষাট মিনিট। সুতরাং ২০×৬০×২ ফুট-পাউন্ড=২৪০০ ফুট-পাউন্ড শক্তি তাতেই বেশি মাত্রায় খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এক বোঝা কয়লা নিচের থেকে তিন তলার উপরে টেনে তুলতে যতটা শক্তি লাগে তাও এই পরিমাণের চেয়ে বেশি নয়।

ক্ষয়রোগের অবস্থায় কোনোমতেই এতটা শক্তির অপব্যয় হ'তে দেওয়া যায় না। শক্তিব্যয়ে এই রোগে ক্ষতি হবার অনেক কারণ আছে। প্রথমত যে কোনো পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াটাও বেড়ে যায়, তাতে রোগাক্রান্ত ফুসফুস যন্ত্রটার ক্ষতি হয়। আর দ্বিতীয়ত জ্বরের দরুণ নাড়ির গতি এমনিতেই সাধারণ অপেক্ষা দ্রুতবেগে চলছে, তাকে আরো বেশি দ্রুত হ'তে উত্তেজিত করা হয়। সুতরাং পরিশ্রম মাত্রই ক্ষয়রোগে অনিষ্টকারী।

শরীরের দ্বারা দুই রকম পরিশ্রমের ক্রিয়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে এক রকম ভিতরের পরিশ্রম, আর এক রকম বাইরের পরিশ্রম। ভিতরের পরিশ্রমকে রোধ করতে পারা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াটি নিত্য চলতেই থাকবে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও কিছু চলতে থাকবে, খাওয়া এবং হজম করার ক্রিয়াও চলতে থাকবে, এবং মূত্রাদির ক্রিয়া আর ঘর্মাদির ক্রিয়াও চলতে থাকবে। ক্ষয়রোগে শরীরে জ্বর লেগে থাকার দরুণ এই সকল ক্রিয়া সাধারণ অপেক্ষা আরো দ্রুতবেগে চলে, তাকে নিবৃত্ত করা কিছুতে সম্ভব নয়। ক্ষয়রোগের ট্যুবারকুলিনের বিষক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবার বিরুদ্ধে স্থানীয় কোষগুলি যে উত্তেজিত হয়ে অনবরতই সংগ্রাম ক'রে চলেছে, তাতেও কিছু বেশি মাত্রায় আভ্যন্তরিক পরিশ্রম হচ্ছে, এবং সেটিও নিবারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল ভিতরের পরিশ্রমগুলিকে কমাতে না পারলেও বাইরের যা কিছু পরিশ্রম আছে, সমস্তই আমরা বন্ধ ক'রে দিতে পারি। মাংসপেশীর দ্বারা আর মস্তিষ্কের দ্বারা যত কিছু পরিশ্রম করা যায়, সেগুলিকে আমরা ইচ্ছা করলে বর্জন করতে পারি। এর দ্বারা ভিতরের পরিশ্রমকেও আমরা কিছু কমিয়ে আনতে পারি। ঘুমের সময় আমাদের তাই হয়। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল ক'রে দিয়ে যখন আমরা ঘুমোই তখন বাহ্য অঙ্গের মাংসপেশীগুলির ক্রিয়াকলাপ স্থগিত থাকে ব'লে নাড়ির গতি মন্থর হয়ে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও ধীরে ধীরে চলে, ভিতরের অন্যান্য যন্ত্রও ধীরে ধীরে কাজ করে, আর শরীরের উত্তাপও কিছু কম হয়। না ঘুমিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে অসাড়ভাবে শুয়ে থাকলেও অনেকটা তাই হয়। এই চুপচাপ শুয়ে থাকাকেই আমরা বলি পরিপূর্ণ বিশ্রাম। যদিও তাতে হিসাবমত ঠিক পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয় না, কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে, শুয়ে থাকার চেয়ে বসে থাকায় প্রায় দ্বিগুণ পরিশ্রম, বসার চেয়ে পায়ে হাঁটায় আরো দ্বিগুণ পরিশ্রম, আর হাঁটার চেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠায় আরো দ্বিগুণ পরিশ্রম। সব রকমের পরিশ্রম বাঁচিয়ে সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিশ্রাম নেবার উপায় শুয়ে থাকা।

ক্ষয়রোগে শরীরবস্তু নিত্য নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে যেতে থাকে এবং সেইজন্যই রোগীর শরীরের ওজন ক্রমশ কমে যেতে থাকে। এই কারণেই একে বলা হয় ক্ষয়রোগ। বিশ্রাম না দিলে কিছুতেই এ ক্ষয়ের নিবারণ হ'তে পারে না। যে অংশটা ভেঙে গিয়ে ধ্বসে পড়ছে তাকে রীতিমত মেরামত করে তুলতে হলে আগে বিশ্রাম দেওয়াই প্রয়োজন। বসতবাড়ির কোন অংশ ভেঙে পড়লেও তার ব্যবহার পরিত্যাগ ক'রে কিছুকালের জন্য তাকে মিস্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, নতুবা আগের মতো ব্যবহার করতে থাকলে কখনো তার মেরামত হতে পারে না। এতে অনেক অসুবিধা আছে বৈকি, কিন্তু মেরামতির প্রয়োজনে এটুকু অসুবিধা ভোগ করতেই হবে। শরীরকে কিছুকাল বিশ্রাম দিয়ে দিলেই ভিতরকার জৈবপ্রকৃতি মিস্ত্রীরূপে ধীরে ধীরে তার ক্ষয় এবং ক্ষতির মেরামত করতে থাকে।

রোগীরা প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়। তারা বলে যে, একটু নড়াচড়া না করতে পেলে খাদ্য হজম হবে না, ক্ষুধা হবে না, ঘুম হবে না। কিন্তু মুক্ত-বাতাসে শুয়ে থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবার যে কত গুণ, তা তারা প্রথম প্রথম না বুঝলেও কিছুকাল পরেই বুঝতে পারে। প্রথমটা অভ্যাস করাই কিছু কঠিন। কিন্তু ঐ অবস্থায় থাকতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে ক্ষুধাও বেড়ে যেতে থাকে, আর খাদ্যও আশ্চর্যভাবে হজম হ'য়ে যেতে থাকে। অক্সিজেনপূর্ণ মুক্ত বাতাস রোগীর পক্ষে প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই বাতাসের গুণেই অসাড় অবস্থায় শুয়ে থেকেও খাদ্য যথারীতি হজম হয়ে যায়, আর ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এ ছাড়া বিশ্রাম নিতে থাকলেই পূর্বে যে ক্ষয়টা হচ্ছিল, তা নিবারণ হ'য়ে যায়, বীজাণুর বিষক্রিয়া যে অনুপাতে চলছিল, তার অনেকটাই স্থগিত হয়ে যায়। সুতরাং রোগী তাতেই অনেকটা সুস্থ বোধ করে, জ্বর কমে যাওয়াতে সে দেহে ও মনে স্ফূর্তি পায়, ক্ষয় নিবারণ হওয়াতে তার বিকৃত হজমশক্তিটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তখন ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে, আর রক্তহীনতা ও ক্লিষ্টতা ঘুচে গিয়ে মুখে-চোখে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটে উঠতে থাকে। বিশ্রামের সঙ্গে যে চিকিৎসাই করা হোক, সেটা গৌণ; বিশ্রামই এই সকল উপকারের মুখ্য কারণ।

বিশ্রামের দ্বারাই কেমন ক'রে যে রোগটির আরোগ্য হওয়া সম্ভব, সেটা বুঝতে পারা কিছু কঠিন নয়। যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা কেমন করে যে ফুসফুসের মধ্যে ট্যুবারকল জন্মায়, সেকথা পূর্বে বলেছি। ঐ ট্যুবারকলগুলি প্রথমে পোকাধরা ফলের গুটির মতো ফুসফুসের এক স্থানে খুব অল্প সংখ্যাতেই হয়। তখন সেগুলো বিন্দু বিন্দু বুদ্বুদের ন্যায় ফুলে ওঠে। তার মধ্যেই গ্রেপ্তার হ'য়ে থাকে রোগের বীজাণুগুলি। স্থানীয় কোষসকল তাড়াতাড়ি সেগুলোকে দুর্ভেদ্য গণ্ডি দিয়ে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করে, যাতে বীজাণুগুলি তার বাইরে এসে আবার কোনো নতুন ট্যুবারকল না রচনা করতে পারে, কিংবা তার বিষটা বাইরে ছড়িয়ে শরীরের কোনো অনিষ্ট না করতে পারে। এই গণ্ডি যে প্রথমে খুব দুর্বল আর কাঁচা রকমের হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রথম অবস্থায় সেই গণ্ডিকে খুব সাবধানেই রক্ষা করা দরকার, যাতে কিছুতে ভেঙে না যায়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে শুয়ে থাকলেই তা সম্ভব। উপযুক্ত বিশ্রামের দ্বারা এই গণ্ডিটি কিছুমাত্র নাড়াচাড়া না পেলে ধীরে ধীরে সেটা ক্রমশ পোক্ত হয়ে উঠতে থাকে। তার পরে যখন সেটা খুবই মজবুত আর দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে, আর এদিকে শরীরও ক্রমে ক্রমে সবল হ'য়ে ওঠে তখন বীজাণুগুলির একটিও গণ্ডিকে অতিক্রম করতে না পেরে তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে ক্রমশ আপন খাদ্যের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, আর তার থেকে নির্গত নিস্তেজ রকমের ট্যুবারকুলিনের দ্বারা শরীরের কোনো অনিষ্ট না হ'য়ে তার প্রতিরোধশক্তি বরং আরও বেড়েই যায়। অবশ্য এতটা উন্নতি হবার জন্য অনেক দিনের বিশ্রাম দরকার, তাই রোগীকে অনেককাল স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হয়।

কিন্তু বিশ্রাম না নিলে কী হয়? নাড়াচাড়া পেয়ে ট্যুবারকলের চারিদিকের সে কোষনির্মিত গণ্ডিটা ভেঙে যায়, তখন বীজাণুগুলি ঐ নাড়াচাড়ার ফলেই চারিদিকে চারিয়ে পড়ে, আবার নতুন নতুন ট্যুবারকলে সৃষ্টি করতে থাকে, আর তার নবতেজপ্রাপ্ত ট্যুবারকুলিনও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সতেজ বিষক্রিয়া প্রকাশ করতে থাকে। এর ফলে জ্বর বেড়ে যায়, ভিতরকার দাহ বেড়ে যায় আর ক্ষয়ের মাত্রাও অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য একবার বিশ্রামের অবহেলা করে তাতে ক্ষতি হচ্ছে দেখে আবার যদি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যায়, তাহলে আবার প্রকৃতি ভাঙা গণ্ডির চারিদিকে নতুন করে গণ্ডি রচনা চেষ্টা করে, এবং কিছুকাল নাড়াচাড়া না পেলে আবার সেটা ক্রমে ক্রমে মজবুত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তবু তাতে আরোগ্যের পথে আরো খানিকটা দেরী পড়ে যায়। এই রে... হলে আর কালবিলম্ব না করে যাতে অল্পের উপর দিয়ে প্রথম অবস্থাতেই তাকে আরো... করে আনা যেতে পারে সেই চেষ্টা করাই ভালো। সেইজন্য এখনকার চিকিৎসার নিয়ম এই ক্ষয়রোগ হয়েছে জানবামাত্রই রোগীকে আ... বিছানায় শুইয়ে একদফা একেবারে ... সপ্তাহের জন্য তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রা... অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে,—তখন রোগ... জ্বর থাকুক কিংবা নাই থাকুক। এই সপ্তাহ একান্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুয়ে থাক... পারলে অনেকের রোগ তাইতেই সেরে য... কারণ তখন রোগকে গ্রেপ্তার করবার প্র... গণ্ডিটাই মজবুত হবার সুযোগ পায়। অনেকে হয়তো অল্পদিন শুয়ে থাকবার পরেই জ্বর তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায়, কিন্তু তবুও তাদের ছয় সপ্তাহকালই ধৈর্য ধরে শুয়ে থ... দরকার। বিজ্বর অবস্থাতেও কিছুকাল নিয়ম পালন করে গেলে তাতে

পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। তবে যাদের রোগটি কিছু বেশি অগ্রসর হয়েছে তাদের ছয় সপ্তাহে বিশেষ কিছুই ফল হয় না, তাদের আরো অনেক কালই ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়। স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসার এইটেই বিশেষত্ব, সেখানে রোগীদের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতে হয়, ডাক্তারের হুকুম ব্যতীত তাদের একটুও নড়বার অধিকার থাকে না। তাতেই অনেক রোগী সহজেই সেরে ওঠে।

লোকে প্রায়ই বলে থাকে, নিতান্ত দরকার পড়লে কখনো-সখনো একবার একটু উঠতে দিলে তাতে এমনই বা কী ক্ষতি আছে? কিন্তু ক্ষতিটা যে কেমনভাবে হয় তা পূর্বেই বলেছি। একবার একটু অবহেলায় যে গণ্ডীটা ভেঙে যায়, হয়তো অনেক অনুতাপে আর অনেক ধরাবাঁধাতেও সহজে তার পূরণ হয় না। কোনো গণ্ডি একবার একটুমাত্রও ভেঙে গেলে সে আর কিছুতে জোড়া যায় না, তখন আবার সেই গোড়া থেকে নতুন ক'রে তাকে ঘিরে আরো বৃহত্তর গণ্ডি রচনা করবার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য যাতে আরোগ্যের একমাত্র উপায় স্বরূপ গণ্ডিটা একবার না ভাঙতে পারে এমন ব্যবস্থাই করা উচিত। এ সম্বন্ধে একটু-মাত্র অবহেলাতেই যে গণ্ডিটা নিশ্চিত নষ্ট হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যাতে দৈবাৎ তা ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনাও হতে দেওয়া উচিত নয়।

এই রোগে বক্ষপিঞ্জরের ভিতরের দিকের দেয়ালটা অনেক সময় ট্যুবারকলের প্রদাহের দ্বারা স্থানে স্থানে ফুসফুসের সঙ্গে জুড়ে যায়। সুতরাং জোরে হাসলে কাসলে বা খুব চেঁচিয়ে কথা বললে, সবেগে হাতখানা মাথার উপর দিকে তুলে প্রসারিত করলে, কিংবা শরীরের ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলে অথবা দাঁড়ালে জোঁড়ের স্থানটা তাইতেই ছিঁড়ে গিয়ে কিছু অনিষ্ট করতে পারে। এমন অনিষ্টের সম্ভাবনামাত্রই হতে দেওয়া উচিত নয়। যখন খুব জ্বর হচ্ছে তখন রোগীকে নিজের চেষ্টায় হাত পা নাড়তে দেওয়া কিংবা পাশ ফিরতে দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়। তখন তাকে শয্যাগত অবস্থাতেই মলমূত্র ত্যাগ করাতে হয়, স্বহস্তে খেতে না দিয়ে তাকে অপরের সাহায্যে খাইয়ে দিতে হয়। তখন তাকে লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না, কিছু লিখতে দেওয়া হয় না, নিতান্ত মন ভোলাবার জন্য একটু আধটু ছাড়া কিছু বই পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয় না। এমন একান্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকা যদিও কঠিন বটে, কিন্তু আপন মঙ্গলের জন্যই বাধ্য হয়ে এটা রপ্ত করে নিতে হয়। সকল রকমের মানসিক চাঞ্চল্য এবং মানসিক পরিশ্রমও সেই সঙ্গে ত্যাগ করতে হয়। মনে কোনো উত্তেজনা এলেই তাতে শরীরের ক্ষতি, কারণ উত্তেজনা ঘটলেই নাড়ীর গতিবেগ বেড়ে যায়, ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে বেশি মাত্রায় রক্ত চলাচল হতে থাকে, তাতে জীবাণুর থেকে নির্গত ট্যুবারকুলিনের বিষ আরো বেশি মাত্রায় চারিদিকে ছড়াতে থাকে,—আর তারই ফলে জ্বর বেড়ে যায়, ক্ষুধা কমে যায়, ওজন কমে যায়, আর প্রতিরোধশক্তি উত্তরোত্তর কাবু হয়ে পড়ে। সুতরাং কেবল শরীরের বিশ্রামই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে মনের বিশ্রামও বিশেষ দরকার। বেশি জ্বরের সময় কোনো কথা না বলে কিংবা কোনো মনশ্চাঞ্চল্য না এনে চুপচাপ একটা অর্ধসচেতন অবস্থায় পড়ে থাকাই শ্রেয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মনকে শান্ত ও নিরুৎসুক রাখার এই অভ্যাসটি আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নয়।

আমরা যেমনভাবে বিশ্রাম নিতে বলছি তেমন উপায়ে নিজের বাড়িতে কোনো খোলা জায়গায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারলে অনেক ক্ষয়রোগ তাতেই সেরে যায়, স্যানাটোরিয়ামে যাবার দরকারই হয় না।

বিপদের সম্ভাবনা একেবারে কেটে গিয়ে রোগ থেকে মুক্তি পেলে তবেই এই পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবস্থা থেকে মুক্তি নেওয়া যেতে পারে। যেমনি জ্বরটি ছেড়ে গেল আর শরীর সুস্থ বোধ করতে লাগলো, অমনি বিছানা ছেড়ে সুস্থ ব্যক্তির মতো চলাফেরা করা চলবে না, তাহলেই পুনরায় জ্বর দেখা দিয়ে রোগটি আবার চেপে ধরবে। অচল অবস্থা থেকে সচল অবস্থায় ফিরে আসতে হলে তার আগে অনেক রকমের বিবেচনা করতে হবে, আর খুব ধীরে অগ্রসর হতে হবে। বিশ্রামের অবস্থা থেকে কখন যে মুক্তি দেওয়া দরকার সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে ট্যুবারকলগুলির চারিদিকে ঘেরা গণ্ডির অবস্থার উপর। যখন এমন অবস্থা হবে যে প্রকৃতির গড়া সেই গণ্ডি খুব মজবুত হয়ে গিয়ে কিছুতেই আর ভাঙবে না, তখনই রোগী নিশ্চিন্তে নড়াচড়া শুরু করতে পারবে। গণ্ডি মজবুত হয়েছে কিনা সেটা অবশ্য বাইরের থেকে বোঝা যায় না, রোগীর লক্ষণ দেখে এবং একটু একটু পরিশ্রম করতে দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে হয়, আর সেই পরিশ্রম ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যেতে হয়। রোগীকে উঠে বসতে দেওয়াও তার পক্ষে তখন পরিশ্রম, দাঁড়াতে বা এক আধ পা চলতে দেওয়া তার চেয়েও বেশি পরিশ্রম। এগুলিও প্রথমে অত্যন্ত সাবধানে এক আধবার মাত্রই করতে দিতে হয়। যখন দেখা যায় যে, জ্বর হওয়া অনেকদিন থেকেই বন্ধ হয়েছে এবং নাড়ির গতিও একেবারে স্বাভাবিকের মতো হয়ে গেছে, শরীরেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তখন অল্পে অল্পে এমনি ধরণের পরিশ্রম শুরু করতে হয়। প্রথমে শুধুই কিছুক্ষণ উঠে বসতে দেওয়া, তার পরে খাটে পা ঝুলিয়ে বসতে দেওয়া, তারপর উঠে দাঁড়ানো, দুই এক পা চলা, বিছানা পরিষ্কারের সময় চেয়ারে গিয়ে বসা, তারপর দৈনিক একবার করে পাইখানায় যেতে দেওয়া। কিছুদিনের জন্য এই পর্যন্তই করতে দেওয়া চলবে। যখন দেখা যাবে তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, তখন ধীরে ধীরে বেড়াতে দেওয়া যাবে, প্রথম দুইদিন এক মিনিট করে, তারপরে দুইদিন দুমিনিট, তারপরে তিন মিনিট। এমনিভাবে চলতে দেওয়া ক্রমশ বাড়াতে হবে। যদি দেখা যায় যে, দৈনিক এক ঘণ্টা পর্যন্ত বেড়িয়েও নাড়ীর গতির কোনো পরিবর্তন হলো না বা জ্বর দেখা দিল না, তখন বোঝা যাবে রোগী খানিকটা সুস্থ হয়েছে। বিশ্রামের অবস্থায় নাড়ির গতি কোনোদিন ৯০ থেকে ১০০র বেশি হ'য়ে গেলে (স্বাভাবিক নাড়ির গতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ পর্যন্ত) তৎক্ষণাৎ আবার তাকে দুই একদিনের জন্য বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিতে হবে। এত রকমের সাবধানতা রোগীর নিজের পক্ষে বুঝে চলা সম্ভব নয়, সুতরাং এ বিষয়ে চিকিৎসকের মত না নিয়ে কিছুই করা উচিত নয়, একথা বলা বাহুল্য।

নির্বিঘ্নে বেড়াতে পারলেই যে রোগী সেরে উঠেছে, এমন মনে করা উচিত নয়। রোগের বীজাণুরা তখনো ট্যুবারকলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তাদের ট্যুবারকুলিন নামক বিষটি তখনো হয়তো ঐ অল্প পরিশ্রমের দ্বারা শরীরের মধ্যে অল্প মাত্রায় ছড়াচ্ছে। তাতে তখন রোগীর পক্ষে উপকারই হয়। অল্প অল্প ট্যুবারকুলিনের বিষকে হজম করতে পেরে তার প্রতিরোধশক্তি উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে, সুতরাং এতে ট্যুবারকুলিন ইনজেকসন দিয়ে চিকিৎসা করার মতো কাজ হয়। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হয়। পরিশ্রম একটু অতিরিক্ত হয়ে গেলেই তা বিষ খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বেশি পরিশ্রম করলেই বেশি ট্যুবার-কুলিন শরীরের মধ্যে চারিয়ে পড়ে, প্রতিরোধ-শক্তিটুকু তাকে দমন করতে না পেরে কাবু হয়ে যেতে থাকে, সুতরাং তাতে আবার জ্বর দেখা দেয় এবং শরীরের ক্ষয় হতে থাকে। সুতরাং রোগীকে এমনভাবেই পরিশ্রম করতে দেওয়া দরকার, যাতে তার অপকারের বদলে উপকার হতে পারে। সুতরাং বারে বারে নাড়ী পরীক্ষা করে এবং টেম্পারেচারের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেড়ানো ছাড়া অন্য কোনো রকমের পরিশ্রমই তাকে করতে দেওয়া তখন উচিত নয়।

পরিশ্রমেরও একটা মাপকাঠি আছে। কোন রকমের পরিশ্রমে কতটা ক্যালোরি মূল্যের এনার্জি অর্থাৎ শক্তির খরচ হয়, সেই হিসাবেই

এর বিচার করা হয়। ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা মেপে দেখেছেন যে, ঘুমের সময় খরচ হয় ৬৫ ক্যালোরি, জেগে শুয়ে থাকার সময় ৭৭ ক্যালোরি, উঠে বসাতে ১০০ ক্যালোরি, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোতে ১১৫ ক্যালোরি, বেশভূষা করতে ১১৮ ক্যালোরি, গান করতে ১২২ ক্যালোরি, হেঁটে বেড়ানোতে (ঘণ্টায় ২॥ মাইল বেগে) ২০০ ক্যালোরি, জোরে হাঁটলে ৩০০ ক্যালোরি, সাঁতার কাটলে ৫০০ ক্যালোরি, ছুটতে থাকলে ৫৭০ ক্যালোরি, এবং কসরৎ করলে কিংবা প্রাণপণ জোরে ছুটলে ৬৫০ ক্যালোরি পর্যন্ত মূল্যের এনার্জি খরচ হয়। এমন কি শুয়ে শুয়ে শিশুরা যখন কাঁদে, তখন তাদের এনার্জির ডবল মাত্রায় খরচ হতে থাকে। লেখা কিংবা দাবা খেলা, তাতেও এনার্জির খরচ আছে। সুস্থ অবস্থাতে এগুলো উপকারী, কারণ এতে যেমন একদিকে ব্যয় হয়, তেমনি অন্যদিকে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে এবং অধিক খাদ্য খেয়ে শরীরের অধিক পুষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষয়-রোগের অবস্থায় সে কথা নয়, সহ্যসীমা যে পর্যন্ত এসে পেঁছেচে তার অতিরিক্ত করতে গেলেই তাতে উল্টো বিপত্তি হবে। সুতরাং ধীরপদে বেড়ানোর বেশি অর্থাৎ ২০০ ক্যালোরি মূল্যের বেশি কোনো পরিশ্রমই তাকে করতে দেওয়া উচিত নয়।

এমন কি যখন রোগটি আপাতদৃষ্টিতে আরোগ্যই হয়ে গেছে বলে বিবেচনা হয় এবং রোগীকে স্বাভাবিকভাবে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে দেওয়া হয়, তখনও তাকে বলে দেওয়া হয় যে, অভ্যস্ত কাজগুলি ছাড়া সে অনভ্যস্ত কোনো কাজই করবে না এবং কাজের অবসর পেলেই পারতপক্ষে বিশ্রাম নেবে। কোনো কিছু খেলাধুলা করা তার পক্ষে চলবে না, তা সে যতই হাল্কা ধরণের পরিশ্রম হোক। কারণ এটা বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দৈনিকের অভ্যস্ত কাজে মানুষের পরিশ্রম যতটা হয়, অনভ্যস্ত কাজে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়। হঠাৎ ছুটে ট্রাম ধরতে কিংবা গাড়ি ধরতে যাওয়া, রোখের বশে কোনো একটা ভারী জিনিস তোলা, পা শূন্যে রেখে দুই হাত দিয়ে ঝোলা, মোটরের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে স্টার্ট দেওয়া—এই সকল অবিবেচনার কাজ করতে গিয়ে কত আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগী যে হঠাৎ পুনরায় রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই রোগ অতিশয় ক্রূর, এর সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে গিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং যথেষ্ট পুষ্ট দেখালেও এ সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে, কোনো কিছু দুর্বল মুহূর্তে গণ্ডি ভাঙার সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তবু এ রোগ যত ক্রূর হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশ্রামই এর উপযুক্ত প্রতিকার। রোগীদের এই কথাটাই পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দেওয়া হয়। পরিশ্রমে কোনো অপকার হচ্ছে কিনা, সেকথা তৎক্ষণাৎ তারা বুঝতে পারে না। যেদিন কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করা হয়, তার ফলটা দেখা দেয় চব্বিশ ঘণ্টা পরে, কারণ বীজাণুদের বিষটা শরীরে সঞ্চারিত হয়ে অনিষ্ট ঘটাতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সময় লাগে। তারপর ধীরে ধীরে সেটা প্রকাশ পায়। তখন প্রথমে আসে একটা ক্লান্তির ভাব। তারপর দেখা দেয় মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, নড়াচড়া করতে অনিচ্ছা। রোগীদের শিখিয়ে দেওয়া হয় যে, ঐ ক্লান্তির ভাবটা অনুভব করতে থাকলেই তৎক্ষণাৎ তারা সব কিছু ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়বে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নিতে থাকবে। কয়েকদিন মাত্র এমনি বিশ্রাম নিয়ে নিলেই আবার সেই ভাবটা কেটে যাবে।

ক্ষয়রোগীদের পরিশ্রম সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। হেঁটে বেড়ানোই তাদের পরিশ্রমের সীমা, এ ছাড়া অন্য কোন পরিশ্রমই তারা চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না নিয়ে করবে না। জ্বর থাকলে, নাড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা চঞ্চল থাকলে এবং শরীরের ওজন না বাড়লে করবে না। এমন জোরে চলবে না, যাতে হাঁপ লাগে, কিংবা ক্লান্তি বোধ হয়। দ্রুতপদে কখনই চলবে না, কখনই ছুটবে না। পাহাড়ে কখনো উঠবে না। বিধিবদ্ধভাবে এবং হিসাব করে আপন ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব ততটুকু হাঁটবে, হাঁটবার সময় অনবরত কথা বলতে থাকবে না। যতটা পরিশ্রম হচ্ছে, ততটা খাওয়া হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ যতটা দৈনিক ব্যয় হচ্ছে, ততটা দৈনিক সঞ্চয় হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য-সম্ভাবনা আবার ঘটিয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহার জের মিটে নাই। দুর্ভিক্ষকে দ্বিবিধ-রূপে দেখা যায়—(১) যখন খাদ্যদ্রব্য মূল্য দিলেও পাওয়া যায় না; (২) যখন খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসম্ভব। বাঙলা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এক দিনের জন্যও দ্বিতীয় অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। সরকারের ব্যবস্থা যে তাহার জন্য প্রধানত দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই যখন সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় সরকার বরাদ্দ খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাসে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, বাংলা অন্য কোন প্রদেশকে বঞ্চিত করিয়া—দুর্দশা-গ্রস্ত রাখিয়া আপনি অধিক খাদ্য চাহে না বটে, কিন্তু তাহার অধিবাসীদিগের দুর্ভিক্ষ-জনিত দৈহিক দৌর্বল্য আজও দূর হয় নাই বলিয়া সে স্বতন্ত্র ব্যবহার দাবী করিতে পারে।

এই অবস্থায় এবার আবার দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত হইয়াছে এবং সেই ছায়া দিন দিন ঘনীভূত হইতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকার কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণ-সমূহের জন্য বাঙলায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন মনে করা যায়:—

(১) মে মাসে অতিবৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গে আশু ধানের চারা বসিয়া গিয়াছে, আশু ধান্য বপনে বিলম্ব ঘটিতেছে। বাঙলাতে আমন ধানের পরেই আশু ধান্যের ফলন অধিক, কাজেই আশু ধান্যের ফলনের ক্ষতির ফল ভয়াবহ হয়।

(২) প্রকাশ, বাঙলায় মজুদ খাদ্য ও শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(৩) বাহির হইতে নিরন্নের সংখ্যা বাঙলায় এত বর্ধিত হইতেছে যে, বাঙলা সরকার অন্যান্য প্রদেশের সরকারগুলিকে সেই সেই প্রদেশের নিরন্নদিগকে ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৪) কোন কোন জিলায় চাউলের ও গমের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে দরিদ্রের পক্ষে সে সকল ক্রয় করা সম্ভব নহে। অনেক দোকানে চাউল নাই। যে চাউল পাওয়া যায়, তাহা অখাদ্য।

বাঙলায় সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না এবং সরকারই স্বীকার করিয়াছেন, সরকারের হিসাব নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু চাউলের মূল্য যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালের

মূল্যের মতই বর্ধিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি।

উপরে যেসকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সকল ব্যতীত বাঙলায় খাদ্যাভাবের আরও কারণ আছে—

(১) খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য সরকার কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই।

(২) সরকারের ব্যবস্থার ত্রুটিতে এখনও সরকারী ও বিসরকারী গুদামে যে বহু খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য বিকৃত হইতেছে, তাহার প্রমাণ গত ২৫শে মে তারিখে ফেণী হইতে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদেই বুঝিতে পারা যায়:—

"মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে মহকুমার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান কর্মচারীর পরীক্ষায় স্থানীয় অসামরিক সরবরাহ বিভাগের গুদামে বহু পরিমাণ আটা ও ময়দা বিকৃত ও মানুষের অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।"

এইরূপ আপত্তিকর ব্যবস্থার জন্য যেন কেহই দায়ী নহে।

৩) ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ও তাহার পর অন্নকষ্টে বহু লোকের মৃত্যু ঘটায় এবং আরও বহু লোক শ্রমাক্ষম হইয়া পড়ায় কৃষিকার্যের অসুবিধা ঘটিয়াছে।

(৪) এবার বোরো ধানের ফসলও আশানুরূপ হয় নাই।

আরও একটি কারণে আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। সরকারী কর্মচারীরা বারবার বলিয়াছেন—ভয় নাই। কিন্তু ভরসা কোথায় তাহাও জানা যায় না। সচিব সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। মুসলমান নির্বাচনকেন্দ্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের পূর্বাহ্নে বাঙলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব খান বাহাদুর আবদুল গফরান বলিয়াছেন—"১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ব্যাপারের পুনরাভিনয় হইবে না।" ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যিনি ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন, তিনিই আজ বাঙলার প্রধান সচিব। আর তিনিই গত ২৫শে মে এক ভোজানুষ্ঠানে বলিয়াছেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলার যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় এবার অবস্থা অনেক ভাল।

কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনিই বলিয়াছিলেন—বাঙলায় বাঙলীর জন্য খাদ্যাভাব নাই এবং স্যার মহম্মদ আজিজুল হক ও শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই মিথ্যা প্রচারকার্যে বাঙলার কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ কমিশন দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মুসলিম লীগের সর্বাধ্যক্ষ মিষ্টার জিন্না—বাঙলায় বহু লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর পরে বলিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের সমর্থনে মিষ্টার জিন্না বলিয়াছিলেন—যখন সেই সচিব সঙ্ঘ কার্যভার পাইয়াছিলেন, তখন ভাণ্ডারে কিছুই ছিল না।

এবার সচিবরা যাহা বলিতেছেন, তাহা যে মিথ্যা নহে, তাহাই বা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে?

এবার দুর্ভিক্ষ কেবল বাঙলায় নহে। অন্য কোন কোন প্রদেশে—বিশেষ দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ এমন হইয়াছে যে, দলে দলে নিরন্ন পাঞ্জাবেও অভিযান করিয়াছে। কাজেই বাঙলায়

অন্য কোন প্রদেশ হইতে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

সচিবরা বলিতেছেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শোচনীয় অবস্থার পুনরভিনয় হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—বাঙলার নানাস্থানে ইতিমধ্যেই চাউলের মূল্য ২৫ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। কাজেই সচিবদিগের উক্তির সহিত দৃষ্ট অবস্থার সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব হইতেছে না।

বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছিল—বহু লোক জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। এবার কি হইবে? আর সেবার—লর্ড ওয়াভেলের বাঙলায় আগমনের পূর্বাহ্নে কলিকাতা হইতে দুর্গতদিগকে — বলপ্রয়োগ করিয়াও — অপসারিত করিয়া যেরূপ আশ্রয়ে রাখা হইয়াছিল, তাহা যে কোন সভ্য—এমন কি অর্ধসভ্য সরকারের পক্ষেও কলঙ্কজনক। আশ্রয়ে ওষধপথ্যের ব্যবস্থা শোচনীয় ছিল এবং তথায়

বাঙলায় খাদ্যের অবস্থা কিরূপ তাহা সরকার জানাইয়া দেন নাই। যদি বলা হয় দেশের লোক ভীতিবিহ্বল না হয়—এই জনাই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা হইতেছে না, তাহা হইলে উত্তরে বলা অনিবার্য—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকার যেরূপ কার্য করিয়াছেন, তাহাতে লোক কারণ না থাকিলেও ভয় পাইতে পারে—মনে করিতে পারে অসত্যের অভিযান চলিয়াছে।

সংবাদপত্রই সর্বাগ্রে বিপদের সম্ভাবনা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষায় জাতির দায়িত্ব

স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন:—

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মতিথি দেশের সর্বত্র মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় কবিগুরুর প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা কি ব্যাপক। মানসলোকের স্রষ্টারূপে তিনি সমগ্র জাতিকে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মতিথিপালন সেই ঋণশোধেরই একটা সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র তাঁহার দানের তুলনায় এই প্রযত্নকে কি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিব? বিশ্বভারতীরূপে যে বাস্তব কীর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার ভার তাঁহার দেশবাসী গ্রহণ না করিলে আর কে করিবে? তাঁহার পৈতৃক বাসভবনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দায়িত্বও তাঁহাদেরই। কবিগুরুর কীর্তির বাস্তব রূপকে রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রতি জাতিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে।

এই সব কাজের জন্য যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন--বড়ই দুঃখের বিষয় তাহা আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হইল না। রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের এই অপূর্ণতা সমগ্র জাতির পক্ষে পরম লজ্জার কারণ হইয়া আছে। উৎসবের মধ্যেই সমস্ত উৎসাহের পরিসমাপ্তি ঘটিলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। দেশবাসীর নিকট আমরা পুনরায় সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সাধ্যানুসারে দান করিয়া এবং দান সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারকে অচিরে পূর্ণ করিয়া সমগ্র জাতিকে আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করেন।

সমস্ত দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে:—সাধারণ সম্পাদক নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতি ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা অথবা ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়:—

(১) বাঙলার সচিব সঙ্ঘ ও বাঙলার গভর্নর এখনও বাঙলায় খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে দেশের লোকের সহযোগ আহ্বান করেন নাই; প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

(২) যাহাতে গুদামে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য বিকৃত না হয়, সে ব্যবস্থা হয় নাই।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সচিব সঙ্ঘ নিরন্নদিগকে যে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেও শৃগাল আশ্রিতের পদ ভক্ষণ করিয়া গিয়াছিল!

আমাদিগের মনে হয়, বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ ও গভর্নর কি করিবেন, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যদিগকে খাদ্য সম্পর্কে সচিব সঙ্ঘের সহিত সহযোগ করিতেও বলিয়াছেন। কিন্তু সচিব সঙ্ঘ সহযোগের মনোভাবের পরিচয় দেন নাই।

জানাইয়া দিয়া থাকেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রকে নানারূপ বিধিনিষেধে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশে অক্ষম করা হইয়াছিল। সরকারী দুর্গতাশ্রয়ের অব্যবস্থাও প্রকাশে বাধা দেওয়া হইয়াছিল! এবারও তাহাই হইবে কি না, আমরা বলিতে পারি না অর্থাৎ সংবাদ গোপনে ও মিথ্যা প্রচারকার্যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবে কি না বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু বিপদ যে ঘনীভূত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মন্ত্রী মিশনের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। বিশু খুড়ো আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—"মন্ত্রী মিশনের ঐতিহাসিক (শব্দটা খুড়োর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) ঘোষণার ফলে সমগ্র বৃটিশ জাতি না হউক অন্ততঃ মন্ত্রিত্রয় অচিরেই ভারত কুইট করিবেন।" তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন হইয়া যাইব কি না এই কথা খুড়োকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। স্বাধীনতার সঙ্গে ত পরিচয় নাই, কি জানি বোকার মত প্রশ্ন করিয়া যদি ঠকিয়া যাই!

* * * * *

রক্ষণশীল দলের জনৈক সদস্য—সহকারী ভারত সচিবকে একটি প্রশ্নের নোটিশ দিয়াছেন। মন্ত্রী মিশনের ঘোষণার ফলে যে পরিস্থিতির সম্ভাবনা আছে তাহাতে ভারত হইতে বৃটিশ নারী এবং শিশুদিগকে সরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইবে কি না ইহাই এই প্রশ্নের মর্ম। ইহা যদি মস্করা না হইয়া সত্যকারের প্রশ্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা উত্তরে জানাইতে পারি যে রক্ষণশীলতার সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নারী ও শিশু ছাড়া অন্যদের সরাইয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

* * *

সহযোগী "আজাদ" বলিতেছেন—যে যা-ই বলুক আর যে যা-ই করুক—মোছলমান তার পাকিস্তানের দাবী ছাড়িবে

না।—প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনে পড়িয়া গেল—"সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা"। এই আদর্শে নবীনতা না থাকুক কাঁচাত্ব আছে।

* * * * *

রেলপথের সাধারণ শ্রেণীর যাত্রীদের কি কি সুবিধার ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ড নাকি গান্ধীজীর মতামত প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সমস্ত যাত্রীদের সম্বন্ধে তাঁরা এতই উদাসীন যে, অন্যে বলিয়া না দিলে তাদের কিসে ভাল হইবে সেই কথা বোর্ড বুঝিতেই পারিতেছেন না। গান্ধীজীর মতামতও পাঠ করিলাম কিন্তু রেলওয়ে বোর্ডের দুর্ভাগ্য যে—এই ব্যাপারে তিনি শুধু "রামনামের" ব্যবস্থাই করেন নাই; সুতরাং সস্তায় কিস্তি মাৎ আর হইল না!

* * *

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় রাশিয়ার নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উত্তরে স্ট্যালিন জানাইয়াছেন যে, মন্ত্রী মহাশয়ের প্রার্থনা বড়ই বিলম্বে

পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ ইতিমধ্যে তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া সারা, হাঁড়িকুড়িতে আর কিছুই নাই। ফ্যানটুকু আছে কিনা, সেই সংবাদ মন্ত্রী মহাশয় নিলে পারেন, স্ট্যালিন হয়ত জানেন না যে, মন্ত্রী মহাশয়ের পোষ্যবর্গের মধ্যে ফ্যানও পরম আহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ—আমেরিকান সৈন্যরা যে সমস্ত ডাচ, পোলিশ ও ফ্রান্স তরুণীদের পাণিপীড়ন করিয়াছেন, তাহাদিগকে একটি "কনে-জাহাজে" করিয়া নিউইয়র্কে নিয়া যাওয়ার সময় 'কনেরা' নাকি কি এক অজ্ঞাতনামা রোগে আক্রান্ত হন, তাহাতে কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত হইয়াছে। স্বামীদের হইতে বিচ্ছিন্ন নববিবাহিতাদের একপ্রকার রোগ হয়—তাহাতে মৃত্যু হয় না, শুধু ছটফটানি বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ব্যাপারে মৃত্যুটা সত্যই বিভ্রান্তিকর। যাহা হউক, ডাক্তার ছাড়িয়া কনেদিগকে বরদের হাতে ছাড়িয়া দিলে রোগ সারিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

* * *

দিল্লীতে হিন্দুদের এক ফুটবল খেলার মাঠে মুসলমানদের এক ছাগল নামিয়াছিল—তাহাতে এক দাঙ্গা হইয়া

গিয়াছে। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, ছাগলের সঙ্গে মানুষের খেলিতে আপত্তি থাকিলে হিন্দুরাও ভেড়া নামাইয়া দিতে পারিতেন—দাঙ্গার বদলে একটি দর্শনীয় ফুটবল খেলা হইত!

* * *

আর একটি ফুটবল মাঠের খবর আসিয়াছে ডিব্রুগড় হইতে,—এখানে ছাগল নয়, পুলিস। জর্জ ইনস্টিটিউসনের সঙ্গে পুলিসের খেলায় কনেস্টবলেরা মাঠে নামিয়া নাকি ছাত্রদিগকে মারধর করিয়াছে। গোলযোগ বাঁচাইবার জন্য ছাত্ররা একটি "গোল" খাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। খেলায় এই নীতি পালন করিলে এইবারে আই-এফ-এ শীল্ড নির্ঘাত পুলিসের!

* * * * * * *

খান বাহাদুর আমীন স্পীকার নির্বাচিত হইলে ইউরোপীয় দলের নেতা বলিয়াছেন—

"Khan Bahadur on his election as Speaker should consider himself divorced from the Party."

কিন্তু পার্টিকে তালাকনামা দিতে তিনি নিশ্চয়ই রাজী হইবেন না—বলিলেন বিশু খুড়ো।
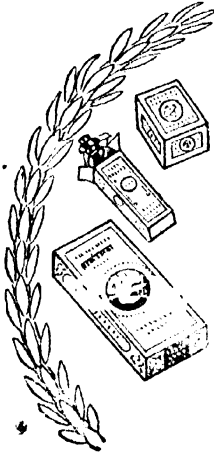
দেশের কথা

(৭ই জ্যৈষ্ঠ—১৩ই জ্যৈষ্ঠ)

রেল ধর্মঘট—চাউলের মূল্য—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব—জিন্নার উক্তি—ফরিদকোট ও কাশ্মীর—কংগ্রেসের মত—খাদ্য-সমস্যা—মহাত্মা গান্ধীর ভাষ্য।

রেল ধর্মঘট—সমগ্র ভারতে রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, এ সময় রেল ধর্মঘট হইলে দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যশস্য চলাচল প্রায় বন্ধ হইবে এবং তাহাতে দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় অনিবার্য হইবে। কিন্তু রেলের কর্মচারীদিগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহারা খাদ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর কার্য করিতে সম্মত। কয় বৎসর রেলে সরকার যে অচিন্তিতপূর্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কর্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা উচ্চপদস্থ (অনেকেই ইংরেজ) তাঁহারাই অধিক লাভবান হইয়াছেন—কারণ ভাতা প্রভৃতির সিংহ ভাগ তাঁহারাই পাইয়াছেন। রেল কর্মচারীরা মধ্যস্থতায় সম্মত। কিন্তু মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলে উভয় পক্ষকেই তাঁহার নির্ধারণ মানিতে হয়। সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ধর্মঘট নিবারিত হইতে পারে। ধর্মঘটের বিজ্ঞাপনদানের আর বিলম্ব নাই।

চাউলের মূল্য—বাঙলার মফঃস্বলে ইতোমধ্যেই চাউল দুর্মূল্য হইয়াছে। কোন কোন স্থানে চাউল ২৫ হইতে ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। অথচ বাঙলার সচিব সঙ্ঘ ও বাঙলার গভর্নর এই অবস্থা দূর করিতে পারিতেছেন না এবং দূর করিবার কি চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও দেশের লোক জানিতে পারিতেছে না। কাজেই লোকের উৎকণ্ঠা দিন দিন আশঙ্কায় পরিণত হইতেছে। এবার বাঙলায় বোরো ও আশু ধান্যের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে অবস্থা ও ব্যবস্থা দেশের লোককে জানাইয়া না দিলে—কিছুতেই লোক তুষ্ট হইতে পারিবে না। গত দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতায় তাহারা মিথ্যা প্রচারকার্যের বিপদ বিশেষরূপে বুঝিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে—দিল্লীতেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। বাঙলা যে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। চট্টগ্রাম, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ ও বর্ধমান এই হাঙ্গামায় বিশেষরূপ পীড়িত। বর্ধমানের হাঙ্গামা একটি মেলায় মুসলমানের মিষ্টান্নের দোকান মুসলমানের বলিয়া বোর্ড দিতে দোকানদারের অস্বীকৃতি হইতে উদ্ভূত হয় এবং কয়খানি গ্রামেও ছড়াইয়া পড়ে। পাঞ্জাব সরকার তথায় যেরূপ উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিবাদের উদ্ভব হইতে পারে সংবাদপত্রে সেরূপ উক্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বাঙলায় সেরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকায় কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টিও করিয়াছেন। গত ২৭শে মে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই তাঁহাদিগের অতিরঞ্জনের স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব—মন্ত্রিমিশন তাঁহাদিগের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের কোন কথা নাই, কতদিনে বৃটিশ সেনাদল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে তাহারও উল্লেখ নাই। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সহিত সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়নের অধিকার প্রদান করা হইবে কিনা তাহা বলা হয় নাই। মিশন বলেন, তাঁহারা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠাসহকারে কাজ করিলে তবে চলিবে, নহিলে নহে। আর তাঁহারা ফতোয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যেভাবে প্রদেশগুলিকে তিনটি সঙ্ঘে বিভক্ত করিয়াছেন—নূতন শাসন পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যদিগের ভোটে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারিবে—নহিলে নহে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রস্তাব নির্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহাত্মা গান্ধীর ভাষ্য—সঙ্ঘ গঠন সম্বন্ধে মহাত্মাজী কিন্তু মিশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন, পাঞ্জাবও শিখদিগের মাতৃভূমি—শিখরা কেন ইহার বিরুদ্ধে বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সহিত এক সঙ্ঘে যাইবেন? উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যখন সেই সঙ্ঘে যাইতে অসম্মত তখন তাহাকে কেন সেই সঙ্ঘভুক্ত হইতে বাধ্য করা হইবে? আসাম হিন্দু প্রধান —সে যখন বাঙলার সহিত সঙ্ঘভুক্ত হইতে চাহে না, তখন তাহার সঙ্ঘমুক্ত হইবার অধিকার কেন থাকিবে না। মিশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—তাহাতে প্রস্তাবে স্বীকৃত প্রদেশসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, কোন প্রদেশ যদি কোন সঙ্ঘে যোগ দিতে অসম্মত হয়, তবে কে তাহাকে যোগ দিতে বাধ্য করিতে পারে?

কংগ্রেসের মত—কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে গ্রহণ বা বর্জন কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—প্রস্তাবের কতকগুলি অংশের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতীত চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং তাহা অসম্পূর্ণ থাকিতে তাহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসও সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্বন্ধেও মিশন ও বড়লাট তাঁহাদিগের নির্ধারণ জ্ঞাপন করেন নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু মিশনের বিবৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—মিশন বৃথা কথার "মার প্যাঁচ" করিতেছেন কেন? কিন্তু কথার ফাঁদে ভারতীয়দিগকে ফেলাই হয়ত মিশনের উদ্দেশ্য। কংগ্রেসকে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে।

জিন্নার উক্তি—মিস্টার জিন্না মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে অনেক ত্রুটি (অবশ্য মুসলিম লীগের মতে) দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু পরে বলিয়াছেন, তিনি মুসলিম লীগের মত প্রভাবিত করিবেন না—লীগের সিদ্ধান্ত লীগের কার্যকরী সমিতি ও লীগ প্রকাশ করিবেন। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তিনি হয়ত আপাতত লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তিনি মিশনের প্রস্তাবে বুঝিয়াছেন—মিশন লীগের দাবী মানিয়া পাকিস্থান স্বীকার করিয়াছেন—তবে দুই খণ্ডে। পঞ্জাবে শিখরাও তাহাই মনে করেন।

ফরিদকোট ও কাশ্মীর—সামন্ত রাজ্য ফরিদকোটের মত কাশ্মীরেও গণ-আন্দোলন হইয়াছে এবং দরবার তাহা দমিত করিবার জন্য বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন। কাশ্মীরে অবস্থা অধিক শোচনীয়। ফরিদকোট দরবার জওহরলালের প্রেরিত ব্যক্তিকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। জওহরলাল তথায় গিয়াছেন এবং তাঁহার গমনে বাধা দিবার সাহস দরবারের হয় নাই। রাজ্যের রাজাও তাঁহাকে প্রজার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। যেন তিনি মন্ত্রৌষধিঅভিবন্ট সর্পের দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশ্মীরের হাঙ্গামা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। জওহরলাল বলিয়াছেন, সমান্ত রাজ্যসমূহের শাসকগণ যদি কালোচিত পরিবর্তনের বিরোধী হন, তবে তাঁহারা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না; কিন্তু তিনি সামন্ত রাজ্যসমূহের উচ্ছেদ চাহেন নাই।

খাদ্য সমস্যা—সমগ্র জগতেই যেন খাদ্য-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কত খাদ্যদ্রব্য সাহায্য লাভ করিতে পারে, তাহা বলা যায় না। ভারত সরকার বিদেশ হইতে সাহায্য লাভের চেষ্টাই বিশেষভাবে করিতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় কিন্তু অনেক ত্রুটি আছে।

বন্দীদিগের মুক্তি ও সম্বর্ধনা—বাঙলায় নির্বিঘ্নতা রক্ষার অজুহাতে যাঁহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছিল, এতদিনে তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করা হইয়াছে।

বম্বের পর ক'লকাতায় পুনরাবৃত্তি। কিছুদিন আগে বম্বেতে 'চালিশ ক্রোড়' নামক হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী বিষয়ক ছবিখানি মুসলমান দুর্বৃত্তদের গুণ্ডামির জন্যে প্রদর্শন স্থগিত রাখার খবর আমরা দিয়েছি। এই ধরণের একটি ব্যাপার গত সপ্তাহে নিউ সিনেমায় ঘটেছে। নিউ সিনেমায় দেখানো হচ্ছিল 'হমরাহী', যে ছবিখানি ভারতের বোধ হয় কোন শহরেই দেখানো বাকি নেই এবং কোন বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই আপত্তি কোথাও শোনা যায়নি। 'চালিশ ক্রোড়' আমরা দেখিনি, তাতে কি আপত্তিকর আছে না আছে আমরা জানি না, কিন্তু 'হমরাহী' আমরা কয়েকবার দেখেছি, এর বাঙলা সংস্করণ 'উদয়ের পথে'ও এই ক'লকাতাতেই বৎসরাধিককাল দেখানো হয়েছে, কিন্তু এতে যে সাম্প্রদায়িক কিছু আছে যা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত দিতে পারে তা কোনবারই আমাদের নজরে পড়েনি, না কোনদিন আর কেউ আপত্তি জানিয়েছে। 'হমরাহীতে' একদল মুসলমান সেদিন যে আপত্তি জানিয়েছে তা যেমনি হাস্যাস্পদ তেমনি অযৌক্তিক—নিতান্ত বাতুলও সে কথা মনে করতে পারে না। এ প্রদেশের বড় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে সেদিনের দুর্বৃত্তরা নিজেদের দাবী করাতেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছি, নয়তো ব্যাপারটা নির্বোধ গুণ্ডাদের কাজ বলে উড়িয়ে দিতাম।

ঘটনার দিন সন্ধ্যার প্রদর্শনী আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরে জনকয়েক মুসলমান নিউ সিনেমার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে জানায় যে, 'হমরাহী'তে মুসলমানদের অপমানকর বস্তু আছে। তারা ছবিখানি দেখেছে কিনা জানতে চাইলে ম্যানেজার উত্তর পান যে, তারা ছবি দেখেননি তবে একখানি দৈনিক উর্দু কাগজে পড়েছেন যে ছবিখানিতে আপত্তিকর বিষয় আছে। ম্যানেজার তখন তাদের ছবিখানি দেখে মতামত পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তারা রাজি হয়ে চলে যায় বটে, কিন্তু বিরামের কিছু পরেই প্রদর্শনী গৃহে গোলমাল, চেয়ার ভাঙা, আগুন লাগানো ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে যায়। শেষে পুলিশ ও মিলিটারী পুলিশের সহায়তায় অবস্থা আয়ত্তে আসে! খোঁজ নিয়ে আপত্তিকর কারণটি যা জানা গেল তাতে না হেসে থাকা যায় না। ছবিতে অম্বিকা নামের একটি শ্রমিক চরিত্র আছে, যে মালিকের টাকা খেয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে শ্রমিকদের সভা পণ্ড করে দেয়। দোষের মধ্যে অম্বিকার পরনে ছিল লুঙ্গী। আপত্তি হ'ল এইখানেই—লুঙ্গী যখন পরনে তখন অম্বিকা নাম থাটি হিন্দু নাম হোক আর নাই হোক মুসলমানদের নিশ্চয়ই অপমান করা হয়েছে। হায় আল্লা! লুঙ্গীই শেষে মুসলমানীর প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো! অর্থাৎ ধরে নিতে হবে যে, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশের সব অধিবাসী, মধ্যবিত্ত বাঙালী যারা বাড়িতে ধুতির বদলে লুঙ্গী ব্যবহার করে সবাই-ই মুসলমান। গোঁড়া সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন মুসলমান পাণ্ডারাও তাদের অনুচরদের এ যুক্তি শুনলে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবেন।

নিউ সিনেমার কর্তৃপক্ষ অম্বিকার লুঙ্গী পরা অংশটুকু কেটে বাদ দেওয়ায় আর কোন কিছু ঘটেনি। এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার হচ্ছে যে, 'হমরাহী' সকল প্রদেশের সেন্সার কর্তৃক ছাড়পত্র পেয়েছে, এমন কি মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি থেকেও; তা সত্ত্বেও এই সব গুণ্ডামি। এটা সত্যিই ভাববার বিষয়। প্রশ্ন জাগে এবার থেকে কি সবাইকে মুসলমান গুণ্ডাদের শাসন মত চলতে হবে? 'চালিশ ক্রোড়'এর ব্যাপার নিয়ে বম্বের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বাবুরাও প্যাটেল যে মন্তব্য করেছেন, সেই কথাই তুলে বলতে হয়—

"কতক কতক মুসলমানদের অসহনশীলতা ভারতের বাকি লোকে কি ধরণের প্রমোদ উপাদান পাবে না পাবে তাই হুকুম করে যাচ্ছে। শীগগিরই এরা কি খাওয়া হবে না হবে হয়তো তাও ঠিক করতে বসবে। সব কিছুই মুসলমানদের দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে হবে। আমরা যদি অন্য প্রমোদবস্তু দেখি ওরা আমাদের পর্দা কেটে দেবে, অন্য জিনিস খেলে আমাদের পেট কেটে দেবে।

"মনে হচ্ছে যেন চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য জনকয়েক গুণ্ডা মুসলমানের করুণার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যারা আমাদের নির্দেশ দেবে কি করবো, কি দেখবো, কি খাবো, কি পরবো আর কি বলবো। মুসলমান গুণ্ডারা চল্লিশ কোটি লোকের সেন্সার হয়ে তথা শাসক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ এদের কেউ কেউ মানুষের প্রাণের কথা না ভেবে চট করে ছোরা বের করে বসতে পারে।......সমস্যা হচ্ছে যে গুণ্ডাদের তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক, তাদের হাতে আমাদের জীবনধারা চালিত হতে দেব কি না।"

* * *

রাধামোহন 'হমরাহী'তে হিন্দী ভাল বলতে পারেননি বলে আমরা যে সমালোচনা করেছি, তা নিয়ে গোরক্ষপুরের প্রবাসী হিন্দী ভাষী এক বাঙালী ভদ্রলোক একখানি চিঠি পাঠিয়েছেন রাধামোহনের হাত দিয়ে। দীর্ঘ বলে চিঠিখানি প্রকাশ করা গেল না; চিঠির মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে যে, রাধামোহন যে হিন্দী বলেছেন তা পাকা হিন্দী ভাষাভাষীরই মত, কোন ত্রুটি হয়নি এবং তাঁর হিন্দী বলা ভারতের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে। কয়েকটি পত্রিকা অবশ্য নিন্দা করেছেন তবে তারা সম্ভবত, এই চিঠির সুর অনুযায়ী, কোন বদ মতলবেই তা করেছে, আমরাও এই দলে পড়ি। পত্রকার নাই জানুন, কিন্তু রাধামোহন জানেন যে, আমরা তার বন্ধু, ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে এবং কোন বিষয়ে তার সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে কোন সংঘাত হয়নি বা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও আমরা নামিনি যে জন্যে অকারণ তার নিন্দা করবো। হিন্দী ভাষায় আমরা পণ্ডিত নই, তবে দৈনন্দিন কাজ-কারবারের খাতিরে অসংখ্য হিন্দী ভাষীদের মুখ থেকে হিন্দী শুনে হিন্দী ভাল বলা হচ্ছে না হচ্ছে সে জ্ঞানটা নিশ্চয়ই হয়েছে এবং হিন্দী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ লোকেরও এ জ্ঞানটা আপনা থেকেই হয়ে যায়। হিন্দী ভাষায় আমাদের পাণ্ডিত্যের কথা না ধরলেও, সেদিন আমাদের সঙ্গে বসে যে সমস্ত হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছবিখানি দেখলেন, তারাও যখন আমাদেরই মতে সায় দিয়েছেন, তখন আমাদের ধারণা অভ্রান্ত মনে করবো না কেন? বাইরের পত্রপত্রিকায় 'হমরাহী' স্তুতিতে রাধামোহনের হিন্দী উচ্চারণ নিয়ে সমালোচনা সবাই করেনি, কিন্তু যারা করেছে তাদের অধিকাংশই নিন্দা করেছে; রাধামোহন এখনও একজন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেননি বা লোকের সঙ্গে এমন কোন শত্রুতা করছেন না যার জন্যে অপরের উস্কানিতে সমালোচকরা তার নিন্দে করবেন। রাধামোহনের হিন্দী বলা নীরস হয়েছে বলে আমরা আশা করেছিলুম যে তার মত উচ্চশিক্ষিত (এম-এ বি-এল) ব্যক্তি নিজের ত্রুটিটা ধরবারই চেষ্টা করবেন, তার বদলে অপরের লেখা নিজের প্রশস্তি নিজেই আমাদের পাঠিয়ে দেবেন ভাবতে পারিনি।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের নূতন বাঙলা ছবি হচ্ছে শ্রী-উজ্জ্বলায় চিত্রবাণীর দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপিত 'এই তো জীবন'। ছবিখানি স্টুডিও মহলে তারিফ পেয়েছে বলে শোনা যায়। পরিচালক নতুন—সানু সেন ও ধীরেশ ঘোষ তবে তারা কাজ করেছেন তাদেরই গুরু নীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে। ভূমিকায় আছেন—সুনন্দা, জহর, তুলসী লাহিড়ী, শ্যাম লাহা, জীবেন, সীতা, মনোরমা, প্রভা, অমিতা প্রভৃতি।

রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনা

যদিচ ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মতিথি—কিন্তু বাঙলাদেশের পক্ষে গোটা বৈশাখ মাসটাই সুদীর্ঘ একটা রবীন্দ্র জন্মদিবস। ২৫শের আগে এবং পরে সারা বাঙলাদেশে শত শত স্থানে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছে। শত শত অত্যুক্তি নয়—বরঞ্চ ন্যূনোক্তি। এতে করে কবিগুরুর প্রতি দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশিত হয়।

এবারকার রবীন্দ্র জন্মোৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই উপলক্ষে কলকাতায় চার পাঁচটি রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় হয়েছে। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয় করেছেন শ্যামা আর অরূপরতন। আর কল্‌কাতার সাহিত্যিকগণ করেছেন 'ডাকঘর' ও 'মুক্তধারা'।

এটি শুভ লক্ষণ—কেননা রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার সময় এখনো আসেনি। এ কথা অবশ্য সত্য যে, বিসর্জন, চিরকুমার সভা ও শেষ রক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখনো কখনো অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সব ঘটনাকে সাধারণ শ্রেণীতে ফেলা চলে না, যেহেতু এই সব নাটকের দর্শক বিশেষভাবে রবীন্দ্র নাটকেরই দর্শক। যাঁরা কল্‌কাতার রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শক—তাঁরা এখনও রবীন্দ্রনাথের নাটক উপভোগ করতে পারেন কিনা সন্দেহ।

কবে রবীন্দ্র নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের [illegible] হবে তা জানিনে, কিন্তু যতদিন তা না [illegible]চ্ছে ততদিন এগুলোকে মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ [illegible] সাধারণের সম্মুখে আনা বিশেষ [আ]বশ্যক। এতে স্বল্প খরচে রবীন্দ্র নাটকের [র]স গ্রহণে সাধারণের শিক্ষা হতে থাকবে এবং কিছুকাল ধরে এই রকম চললে—সাধারণের [রু]চি মার্জিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় তখন রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের [গ্র]হণযোগ্য সম্পদ হয়ে উঠতে আর বাধা থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করবার জন্যে, [তা]র রস গ্রহণ করবার জন্য শিক্ষিত এবং [মা]র্জিত রুচির প্রয়োজন। কিন্তু সব চেয়ে [বে]শি প্রয়োজন প্রতিভাসম্পন্ন প্রযোজকের। [প্র]তিভাবান নাট্যকারের নাটকের রসস্ফূর্তির [জ]ন্য প্রতিভাবান প্রযোজক অত্যাবশ্যক। অনেক [স]ময়ে নাট্যকার নিজেই নিজের প্রযোজক। [শে]ক্সপীয়র, মলিয়ের, ইবসেন, শ—এ'রা একাধারে [না]ট্যকার ও প্রযোজক। রবীন্দ্রনাথ একাধারে [প্র]তিভাবান্ নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজক। [তি]নি জীবিত থাকতে নিজের নাটকের [প্র]যোজনা নিজে করে রসোম্বোধনে ও রস গ্রহণে [স]হায্য করে এসেছেন। এখন তাঁর অভাব [হ]য়েছে। তাঁর নাটকগুলো যেমন অসাধারণ তার জন্যে তেমনি প্রয়োজন অসাধারণ টেকনিকের তজ্জন্য আবার আবশ্যক শক্তিমান প্রযোজকের।

এবারে যে নাটকগুলোর অভিনয় হল তার বৈশিষ্ট্য এই যে, নূতন প্রযোজনার ছাঁচে সেগুলোকে ঢালবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রযোজনার নূতনত্বের অনুপাতে সেগুলো সফলতা লাভ করেছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্য, আর অরূপরতন, ডাকঘর ও মুক্তধারা তত্ত্ব নাট্য। এই দুই শ্রেণীর নাটকই দুরভিনয়। রঙ্গমঞ্চে এদের সাফল্য সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে প্রযোজনার নৈপুণ্যের উপরে এবং যেহেতু সব অভিনয়ই উৎকর্ষের একটা নির্দিষ্ট মানের নীচে নেমে পড়েনি, এবং কোন কোনটিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখা গিয়েছে তখন বুঝতে হবে শক্তিশালী প্রযোজকের অভ্যুদয় নিশ্চয় ঘটেছে। অভিনয়ের গুণে এবং প্রযোজনার গুণে শ্যামা, মুক্তধারা, ডাকঘর খুব উতরে গিয়েছে। কিন্তু অরূপরতন নাটক হিসাবে প্রায় অসম্ভবের কোঠাভুক্ত। তত্ত্বরসের দ্বারা মানবরস এতে অভিভূত ফলে এর অভিনয়ের দ্বারা সুনাম অর্জন করা সহজ নয়। কিন্তু অভিনয়ের গুণে ও প্রযোজনার নৈপুণ্যে তা সম্ভবপর হয়েছে। এই নাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর। অরূপরতনের অদৃশ্য রাজা নামক প্রধান চরিত্র তার চেয়েও প্রধানতর ব্যক্তি হচ্ছেন গিয়ে অদৃশ্যতর প্রযোজক। তাঁরই নির্দেশে ও পরিকল্পনায় নাটকটির সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রোত্তর রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনা-কলায় শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর নূতন মান সৃষ্টি করেছেন বললেও চলে। এবারে আশা করা যায় তাঁর এই প্রতিভা এখানেই স্থগিত না থেকে নূতন নূতন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্র-রসিক ব্যক্তিগণকে আনন্দ দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাটককে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলবার উদ্দেশ্যে সময়োচিত আনুকূল্য প্রদর্শন করবে।

বিবিধ

বম্বের অম্বালাল প্যাটেল ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেডের স্বত্ব কিনে নিয়েছেন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন জাঁদরেল লোক আছেন, যাঁরা এটিকে নতুন ভাবে সংগঠন করায় ব্যস্ত আছেন।

* * *

বিখ্যাত তুলা বণিক এবং বম্বে চিত্রশিল্পের সবচেয়ে বড় মহাজন যিনি কয়েকটি ব্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে বম্বে চিত্রজগতে ঘুরতেন সেই শেঠ গোবিন্দরাম সাকসেরিয়া গত সপ্তাহে পরলোকগমন করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি বম্বে টকীজ ও ডায়মণ্ড পিকচার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

* * *

বম্বেতে কাঁচা ফিল্মের এমনি টান পড়েছে যে, সাড়ে সাতাশি টাকার রোলের দাম হাজার টাকাও হচ্ছে, অবশ্য চোরা বাজারে।

* * * *

উড়িষ্যার গভর্নমেণ্ট ঘাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য প্রদেশে প্রমোদ-কর প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল শক্তিশালী সারে দলকে শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে পরাজিত করিবার পরই কেমব্রিজ দলকে ইনিংসে পরাজিত করে। পরপর এইভাবে দুইটি খেলায় সাফল্য লাভ করায় একজন বৈদেশিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ উক্তি করেন "ভারতীয় দলের ইনিংসে জয়লাভ করা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।" ইনি যখন এইরূপ উক্তি করেন তখন অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন "অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে।" কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় দল স্কটল্যাণ্ড ও শক্তিশালী এম সি সি দলকে পরপর দুইটি খেলায় ইনিংসে পরাজিত করায় ইহাই কি প্রমাণিত হয় না যে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন? স্কটল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার বিশেষ কদর নাই, সুতরাং স্কটল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করায় ভারতীয় দলের প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু এম সি সি দল সম্পর্কে তাহা বলা চলে না। এই দল ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কাউণ্টির বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। খেলা আরম্ভের পূর্বে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিল "এইবার ভারতীয় দল প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। এতদিন যে সকল দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে তাহার তুলনায় ইহা অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন।" এই সকল উক্তি যদি সত্যই হয় তবে ভারতীয় দল শক্তি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হইবে ২২শে জুন তাহার পূর্বে এই অপূর্ব সাফল্য ভারতীয় খেলোয়াড়দিগকে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করিল তাহা টেস্ট খেলায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে। প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

লিস্টার বনাম ভারতীয় দল

লিস্টার বনাম ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিনদিন ব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এত বাধা সৃষ্টি করে যে, প্রথম দুইদিন খেলা অনুষ্ঠান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। লিস্টারের অধিনায়ক প্রাকৃতিক অবস্থার সাহায্য লইবার জন্য টসে জয়ী হইয়া ভারতীয় দলকে ব্যাট করিতে দেন। কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিজয় মার্চেণ্ট একাই এই খেলার সকল দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া অপূর্ব ব্যাটিং করেন। প্রথম ইনিংসে ১১১ রান নট আউট ও দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫৭ রাণ নট আউট থাকেন। লিস্টার দলের প্রথম ইনিংসে অমরনাথের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস :—৭ উইঃ ১৯৮ রাণ (বিজয় মার্চেণ্ট নট আউট ১১১, হাজারী ২৭, টি বল ৩৩ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

লিস্টার দলের প্রথম ইনিংস :—১৪৪ রাণ (বেরী ৬৭, অমরনাথ ১৯ রাণে ৪টি, মানকড় ২২ রাণে ২টি ও সি এস নাইডু ৬১ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—৬ উইঃ ১০৭ রাণ (বিজয় মার্চেণ্ট ৫৭ রাণ নট আউট)

লিস্টার দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১ উইঃ ২৪ রাণ।

স্কটল্যাণ্ড বনাম ভারতীয় দল

এডিনবরা মাঠে স্কটল্যাণ্ড বনাম ভারতীয় দলের দুইদিন ব্যাপী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করেন। ভারতীয় দলের খেলার সূচনা নৈরাশ্যজনক হয়। একমাত্র হাজারী দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া শতাধিক রাণ করায় ভারতীয় দল দিনের শেষে ২৪৭ রাণ সংগ্রহ করিতে পারে।

দ্বিতীয় দিনে স্কটল্যাণ্ড খেলা আরম্ভ করিয়া প্রথম ইনিংস ১০১ রাণে শেষ করে। সারভাতে ৩০ রাণে ৫টি ও হাজারী ৩৯ রাণে ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসও ৯০ রাণে শেষ হয়। সারভাতে ৪২ রাণে ৭টি উইকেট পান। স্কটল্যাণ্ড দল এক ইনিংস ও ৫৬ রাণে পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—২৪৭ রাণ (বিজয় হাজারী ১০২ রাণ, সারভাতে ৩০ রাণ, ম্যাককেনা ৭৭ রাণে ৬টি উইকেট পান)।

স্কটল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস :—১০১ রাণ (এচিসন ৫৭, সারভাতে ৩০ রাণে ৫টি ও হাজারী ৩৯ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

স্কটল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস :—৯০ রাণ (সারভাতে ৪২ রাণে ৭টি উইকেট পান)

ভারতীয় বনাম এম সি সি দল

লর্ডস মাঠে ভারতীয় বনাম এম সি সি দলের তিনদিন ব্যাপী খেলা হয়। খেলার প্রথম দিন হইতেই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে ও শেষ দুইদিন প্রবল বারিপাত হয়। ভারতীয় দল টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় দল ৭ উইকেটে ৩৭৩ রাণ করে। মার্চেণ্ট ১৪৮ রান, বিজয় হাজারী ৯৪ রান ও মোদী ৪৮ রাণ করেন। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য হইতেছে মার্চেণ্ট ও মোদীর একত্রে দ্বিতীয় উইকেটে ১২৮ রান ও মার্চেণ্ট ও হাজারীর একত্রে পঞ্চম উইকেটে ১১৭ রান লাভ। দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির মধ্যে খেলিয়া হিন্দেলকার ৭৯ রান করেন। ভারতীয় দল ৪৩৮ রান লাভ করে। পতৌদির নবাব ও মুস্তাক অসুস্থ হওয়ায় খেলায় যোগদান করিতে পারেন না। এম সি সি দল প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৯ রাণে শেষ করে। অমরনাথ ও মানকড় এই বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। ফলো অন করিয়া তৃতীয় দিনে ১০৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। এই ইনিংসেও মানকড় ও অমরনাথ মারাত্মক বোলিং করেন। এম সি সি দল খেলায় এক ইনিংস ও ১৯৪ রানে পরাজিত হয়। এম সি সি দল ইতিপূর্বে কখনও ভারতীয় দলের নিকট এইরূপ শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন নাই।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—৪৩৮ রান (বিজয় মার্চেণ্ট ১৪৮, বিজয় হাজারী ৯৪, হিন্দেলকার ৭৯, আর এস মোদী ৪৮, সিন্ধে নট আউট ২১, ওয়াট ৪৫ রানে ৪টি, ডেভিস ৮৪ রানে ২টি ও গ্রে ১০৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস :—১৩৯ রান (ইয়ার্ডলী ২৯, সিংগলটন ২০, ভ্যালেণ্টাইন ২৪, অমরনাথ ৪১ রানে ৪টি, মানকড় ৪০ রানে ৩টি ও হাজারী ২৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১০৫ রান (সিংগলটন ২২, ওয়াট ২৩, মানকড় ৩৭ রানে ৭টি ও অমরনাথ ৪২ রানে ৩টি উইকেট পান)।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রাচ্যবাণী রচনা প্রতিযোগিতা

প্রাচ্যবাণীর নিম্নলিখিত পৃষ্ঠপোষক, আজীবন সভ্য ও সদস্যগণ আগামী জুলাই মাসে প্রাচ্যবাণীর এক বিশেষ অধিবেশনে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য স্ব স্ব নামের পার্শ্বে লিখিত বিষয়বিশেষের জন্য পুরস্কার দান করিবেন :

১। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, এফ-আর এ- এস, এফ-আর-এ-এস বি, সভাপতি, প্রাচ্যবাণী :—"প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবন (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত)", নগদ ৫০৲ টাকা।

২। ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, কোষাধ্যক্ষ, প্রাচ্যবাণী :—"রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস", নগদ ত্রিশ টাকা।

৩। মিঃ পূর্ণচন্দ্র সিংহ, পেট্রন, প্রাচ্যবাণী :—"সংস্কৃত সাহিত্য পঠনপাঠনের উপযোগিতা", নগদ ১০০৲ টাকা।

৪। মিঃ কে কে সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, চিটাগং এঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক কোম্পানী, পেট্রন, প্রাচ্যবাণী :—"মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন", নগদ ৫০৲ টাকা।

৫-৬। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে, এম-এস-সি, আজীবন সভ্য, প্রাচ্যবাণী :—(ক) "বর্ণপ্রথা—ইহার উৎপত্তি, ক্রমপুষ্টি ও বর্তমান উপযোগিতা", (খ) "আলঙ্কারিকদের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে কালিদাস" (এই শেষোক্ত প্রবন্ধটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবে), প্রত্যেকটির পুরস্কার নগদ ২৫৲ টাকা।

৭। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সেন, সভ্য, প্রাচ্যবাণী মন্দির :—"কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন", নগদ ২৫৲ টাকা।

৮। মিঃ এস সি রামপুরিয়া, আজীবন সভ্য, প্রাচ্যবাণী :—"বর্তমান ভারতে জৈনধর্ম", নগদ ৫০ টাকা।

৯। ডক্টর রমা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী :—"ওমর খৈয়াম", "হাফিজ" বা "সাদি", নগদ ২৫৲ টাকা।

সর্বসাধারণ এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। লিখিত প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আগামী ১৫ই জুন, ১৯৪৬ অথবা তৎপূর্বে প্রেরণীয়—

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণী, ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, পোঃ আঃ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশী সংবাদ

২১শে মে—বাঙ্গলার বিখ্যাত ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা রায় এবং ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত সত্য গুপ্ত অদ্য প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই দিন শ্রীযুত রমেশ আচার্য, শ্রীযুত রবি সেন এবং শ্রীযুত ভুপেন দত্তও উক্ত জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীযুত আচার্য ও শ্রীযুত সেন আর এস পি দলভুক্ত।

২২শে মে—বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধিদল ও বড়লাট দেশীয় রাজ্যের সহিত চুক্তি ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলারের নিকট এক বিজ্ঞপ্তি পেশ করেন। উহাতে তাঁহারা বলেন যে, বর্তমানে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের যে সার্বভৌম অধিকার বৃটিশ সরকারের হস্তে রহিয়াছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উহা ভরত গভর্নমেণ্টকে হস্তান্তর না করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহকেই প্রত্যর্পণ করিবেন।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সমালোচনা করিয়া মিঃ জিন্না এক বিবৃতিতে বলেন যে, "মন্ত্রী মিশন মুসলমানদের সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন—ইহা পরিতাপের বিষয়।"

ভারত গভর্নমেণ্ট এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১লা জুলাই হইতে প্রতি পোষ্ট কার্ডের মূল্য দুই পয়সা হইবে।

২৩শে মে—শ্রীযুত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, শ্রীযুত অনিল রায়, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার এবং শ্রীযুত ধীরেন্দ্র সাহা রায়—এই পাঁচজন নিরাপত্তা বন্দী অদ্য সেণ্ট্রাল জেল হইতে দীর্ঘদিনের কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করেন। বাঙলার রাজনীতিক নিরাপত্তা বন্দিগণের মধ্যে ইঁহারাই ছিলেন সর্বশেষ দল। এই দলের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সমস্ত রাজনীতিক নিরাপত্তা বন্দীই এক্ষণে বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইলেন।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনরধিবেশন হয়। এইদিন রাষ্ট্রপতি আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৯০ মিনিটকাল আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকারের পর রাষ্ট্রপতি জানান যে, অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠন সম্পর্কে বড়লাটের সহিত তাঁহাদের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

গোহাটীতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, আসামের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামকে বাঙলার সহিত সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা হইলে তাহা প্রতিরোধ করার জন্য ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আসামে একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইবে।

কাশ্মীরে জাতীয় মণ্ডলের লোকদের সহিত পুলিশ বাহিনীর এক সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলীতে ছয়জন নিহত হইয়াছে। জনতা সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া নানাস্থানে জমায়েৎ হয়। তাহারা রাস্তাঘাট, সেতু, টেলিফোন এবং বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি বিনষ্ট করে। এ পর্যন্ত ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৪শে মে—অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কমিটি ১ হাজার শব্দ সম্বলিত এক প্রস্তাবে বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যেহেতু মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবে প্রস্তাবিত সাময়িক গভর্নমেণ্টের কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য কমিটি বর্তমানে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব গ্রহণ

করিবার পর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সম্ভবত আগামী ৯ই বা ১০ই জুন তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির পুনরায় অধিবেশন হইবে।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার রবার্ট হাচিংস বলেন যে, বিদেশ হইতে প্রতিশ্রুত পরিমাণ খাদ্যশস্য সময় মত আমদানী না হইলে খাদ্যাভাবের দরুণ আগামী আগষ্ট মাসেই ভারতের বরাদ্দ ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবে।

খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব জানান যে, আগামী মে ও জুন মাসের জন্য ভারতে যথাক্রমে মোট ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৭ শত টন এবং ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২ শত টন গম এবং গমজাত দ্রব্য জাহাজযোগে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া ভারত সরকারকে জানান হইয়াছে। চাউল আমদানী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মে ও জুন মাসে ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে মোট ৮৫ হাজার টন চাউল জাহাজযোগে আমদানীর সম্ভাবনা আছে।

২৫শে মে—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এম্প্লয়িজ এসোসিয়েশনের ২৭তম বার্ষিক সভার সভাপতিরূপে বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রী মিশন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, কংগ্রেস যদি তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহা আত্মহত্যার সামিল হইবে।

কাশ্মীরের গোলযোগ সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত পাঁচদিনে শ্রীনগর সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোট ৮ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক আছেন।

২৬শে মে—হিন্দু ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থ চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ শিবমূর্তি ভঙ্গের প্রতিবাদে অদ্য বালীগঞ্জে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়া বিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গকারী দুর্বৃত্তগণকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করার নিমিত্ত সভায় গভর্নমেণ্টের নিকট দাবী উত্থাপন করা হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেনঃ—"কাশ্মীর রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে আমি বলিতে চাই যে, তাঁহাদের কার্যাবলী তাঁহাদের নামের উপর গভীর কলঙ্ক লেপন করিতেছে এবং এরূপ কলঙ্ক লইয়া কোন গভর্নমেণ্টই বাঁচিতে পারে না।" পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর যাত্রা আপাতত স্থগিত রাখিয়াছেন।

অদ্যকার হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, "বৃটিশ গভর্নমেণ্টের তরফে মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদল ও বড়লাট কর্তৃক প্রচারিত হোয়াইট পেপার চারদিন যাবৎ তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করার পরও আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস অক্ষুন্ন আছে যে, বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন দলিল রচনা করিতে পারিতেন না।"

২৭শে মে—আজ ফরিদকোটের রাজার সহিত জওহরলালজীর দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে রাজ-সরকার যাবতীয় বাধানিষেধ প্রত্যাহারে রাজী হইয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ ফরিদকোটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"আমরা রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ চাহি না। আমরা চাই দায়িত্বশীল শাসন। রাজন্যবর্গকে সময়ের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে হইবে। তাঁহারা যদি গণ-জাগরণকে উপেক্ষা করেন, তবে তাঁহারা নিজেদেরই সর্বনাশ করিবেন।"

বাঙলার মফস্বল অঞ্চলে ধান চাউলের মূল্য ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার সরিষাবাড়িতে ইতিমধ্যেই চাউলের মূল্য ৩২৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩৭টি রেলওয়েতে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় দুই লক্ষ ৫০ হাজার রেলকর্মী ধর্মঘটে যোগ দিয়াছে।

লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, উপনিবেশগুলি বৈদেশিক ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ নীতি স্থির করিবে।

জেরুজালেমের সংবাদে প্রকাশ, ঊর্ধতন আরব পরিষদের তরফ হইতে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এক ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, প্যালেস্টাইন হইতে সমুদয় বিদেশী সৈন্য অপসারণই আরবের মুখ্য জাতীয় দাবী।

২৫শে মে—পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ওয়াশিংটনে ২০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি আন্তর্জাতিক খাদ পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

২৭শে মে—আমেরিকার আইওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বস পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধে তিনিই প্রথম মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপ নিযুক্ত হন। গত ৪০ বৎসর যাবৎ তিনি ভারতী স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারত-মার্কিন মৈত্র প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন।

ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীর চতুর্থ বার্ষিক উপলক্ষে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটো সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বৃটেন এবং মার্কি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে তাহারা চাপ দিয়া ও হুমকি প্রদর্শনের স্বা সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর তাহাদের ইচ্ছ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ]   ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 8th June, 1946.   [৩১ সংখ্যা

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা

মহাত্মা গান্ধী মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের সরকারী ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। এ পর্যন্ত তিনি মিশনের প্রস্তাবকে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করিয়াই আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু এ সম্পর্কে গান্ধীজীর সুর একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে 'গুরুতর ত্রুটি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"মূলত ও আইনত ব্যাখ্যা করিলে এই কথাই মনে হয় যে, সরকারী ঘোষণা পত্রে চমৎকার খোলা কথা বলা হইয়াছে; তথাপি মনে হইতেছে সাধারণে ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছে, সরকারী ব্যাখ্যা যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আর তাহাই যদি সত্য হয় এবং সরকারী ব্যাখ্যাই যদি বলবৎ হয় তবে লক্ষণ অশুভ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে সরকারী ব্যাখ্যাই সকল বিষয়ে বলবৎ হইয়াছে এবং কার্য ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যাই চালানো হইয়াছে। এদেশে যিনি আইন-প্রণেতা তিনিই বিচারক তিনিই আবার দণ্ডের প্রয়োগকর্তা। এ কথা আমি এতদিন বিনা দ্বিধায় বলিয়াছি; কিন্তু সরকারী ঘোষণা পত্রে সাম্রাজ্যবাদী এই রীতি ছাড়িয়া নূতন কথা বলা হয় নাই কি?"

মহাত্মাজীর নিজের বিশ্বাস এই যে, অন্ততঃ মন্ত্রী মিশনের ঘোষণায় সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত নীতি অনুসৃত হয় নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে এই সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহই রহিয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মন্ত্রী মিশন ভারতবাসীদের হাতে শাসনাধিকার ছাড়িয়া দিবার কথা অবশ্য বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন, তাঁহারা তেমন কোন উদ্যমে প্রবৃত্ত হন নাই। মহাত্মাজী মিশনের প্রস্তাবের যে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির মূল কারণ এইখানেই রহিয়াছে এবং মন্ত্রী মিশনের কথা ও কাজ এক রকম না হওয়াতেই তাঁহাদের প্রস্তাবের ব্যাখ্যার উপর এতটা জোর দিতে হইতেছে। বস্তুত মিশনের কথায় যদি আন্তরিকতা থাকিত, তবে কার্যের সঙ্গে কথার এই বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না বলিয়াই দেশবাসী মনে করে। মহাত্মাজী মিশনের প্রস্তাবের যে কয়েকটি ত্রুটির কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিচার করিলেই এ সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। প্রথমত অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠনের কথাই ধরা যাউক। মন্ত্রী মিশনের সিদ্ধান্ত বহুদিন হইল ঘোষিত হইয়াছে, আমরা অনেকেই মনে করিয়াছিলাম, এই ঘোষণার অন্তত সপ্তাহ-খানের মধ্যেই সম্ভবতঃ অন্তবর্তী গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা গঠিত হয় নাই; ইহার কারণ একমাত্র ইহাই হইতে পারে যে, মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের প্রস্তাবে নিজেদের মনোগত যে ব্যাখ্যা তাহাই কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার অপেক্ষায় আছেন। ফলতঃ ভারতের জনমতের দাবীকে তাঁহারা সরলভাবে এবং সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইতে চাহিতেছেন না। তারপর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ই যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বা ব্রিটিশ মিশনের আন্তরিক হইত তবে শাসন-ব্যাপারে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সর্ববিধ কর্তৃত্বও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ত নৃপতিদের বর্তমানে যে সম্পর্ক রহিয়াছে, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সঙ্গেও তাঁহাদের সেই সম্পর্ক বজায় রাখা হইত। মহাত্মাজী সত্যই বলিয়াছেন, এদেশের সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা চাহেন না। তাঁহারা বৈদেশিক রাজশক্তির হাতে গড়া এবং এদেশের জনগণের স্বাধীনতা দমন করিবার উদ্দেশ্যেই বিদেশী রাজশক্তি তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ভারতে নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৈদেশিক রাজশক্তি নিজেদের ঘাঁটি এদেশে পাকা রাখিবার জন্য তাহাদের চিরবশংবদ সামন্তরাজগণকে যে প্রভাবিত করিবে না, এই সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি? এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সেনাদল যদি সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হইত, তবে এই সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে সেরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় নাই; পক্ষান্তরে দেশের ভিতরে শান্তি রক্ষার জন্য এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালে ভারতে ইংরেজ সেনা রাখা হইবে, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে ইহাই নির্দেশিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে আমরা ইহাই বলিব যে, একজন ব্রিটিশ সেনাও যতদিন এ দেশে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হইয়াছে এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না এবং আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশ সৈন্য যতদিন এদেশে থাকিবে ততদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থও এদেশে বলবৎ রহিবে এবং জনগণের স্বার্থকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিয়াই সাম্রাজ্য-বাদীদের সেই স্বার্থ এদেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভে চেষ্টিত হইবে। বিশেষতঃ সামন্ত রাজাদের ঘাঁটি হইতেও এই নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে

পারে। সুতরাং মন্ত্রী মিশনের ঘোষণা এবং এতাবৎকাল পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা বিবৃতি সত্ত্বেও আমাদের মনের কোণ হইতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন ঘটে নাই। মহাত্মাজী নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভয়ের কারণ এখনও রহিয়াছে। বস্তুত মন্ত্রী মিশনের কথায় সত্যই যদি আন্তরিকতা থাকে তবে কথার মারপ্যাঁচ ছাড়িয়া তাঁহাদিগকে কাজের পথে আসিতে হইবে এবং সোজা কথায় তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ভারত-বাসীদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পরন্তু তাঁহাদের সেই স্বীকৃতিতে এ দেশের লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সেনাদল অপসারণের নীতিও তাঁহাদিগকে অবিলম্বে অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা জানি, এই সব বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বড়লাট সেই চিঠির জবাবও দিয়াছেন। এই জবাবে কি আছে আমরা বলিতে পারি না; তবে ৯ই জুন দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সে পত্র সম্পর্কে আলোচনা হইবে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দেশবাসী এই সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিবে।

স্বাধীনতার মূল্য

দশ সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল মন্ত্রী মিশনের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; এতদিনে এই আলোচনা শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। সেদিন সাম্রাজ্য সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি যে, কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং নব লব্ধ ক্ষমতা পাইয়া ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই থাকুক, কিংবা তাহারা সাম্রাজ্যের বাহিরেই যাউক, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহাদের সঙ্গে সখ্য ভাবই বজায় রাখিবেন। এটলী সাহেব এতদূর পর্যন্ত আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কী কিছুদিন পূর্বে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিতে চলিয়াছে, বর্তমান যুগের ইতিহাসে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বলা বাহুল্য এই সব উক্তি এবং বিবৃতি সত্ত্বেও আমাদের মনের সন্দেহ দূর হইতেছে না। আমাদের এখনও এই বিশ্বাস যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দান-স্বরূপে আমাদের স্বাধীনতা আসিবে না; কারণ শক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, সমগ্র ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা। সুতরাং জাতির শক্তিকে সংহত করিবার উপরই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদিগকে এই সত্য একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দিকে তাকাইয়া থাকিবার মত সময় আর নাই। স্বাধীনতা আমাদের চাই, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি এবারও আমাদিগকে প্রতারিত করেন তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে যাহাতে আমরা শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারি, সেজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে সত্য কখনও মিথ্যা হয় না, মানুষের মনোবৃত্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে ভাবাবেগের বশে যদি আমরা অস্বীকার করি, তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইতে হইবে। ভারতের ইতিহাস এই সত্যই প্রতিপন্ন করে যে, ব্রিটিশ জাতি এ পর্যন্ত ভারতের সম্বন্ধে যত রকম প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, কোনদিনই সরলভাবে তাহা প্রতিপালন করেন নাই। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট স্বরূপে লর্ড লিটন বহুদিন পূর্বেই এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্য আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। আমরা জানি, তাহারা মুখে যতই বলুক না কেন, নিজেদের স্বার্থ তাহারা ছাড়িবে না এবং ইহাতে আমরা অন্যায়ও কিছু দেখিতে পাই না। এ জগতে অকৈতব প্রেমের দৃষ্টিতে কোন বিজেতৃ জাতিই বিজিত জাতিকে কোনদিন দেখে নাই এবং এখনও দেখিতেছে না, শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতেও কোনদিন যে তাহাদের এতৎসম্পর্কিত দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিবে এমন কোন সম্ভাবনাও নাই; পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক দিকচক্রবালে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের কুয়াসাই ক্রমশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকেও আমাদের স্বার্থ বুঝিয়া চলিতে হইবে; অপরের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করিবার যুক্তি এক্ষেত্রে নিতান্তই অনর্থক।

বাঙলায় অন্নাভাব

সেদিন প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি লোক যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে না। মহাত্মাজী চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্টের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে যে, দেশে যে খাদ্য আছে, তাহাও দ্রুততার সঙ্গে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে প্রেরিত হইতেছে না; অধিকন্তু, কোন কোন স্থানে খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে।" এদিকে দেখিতেছি, বাঙলা গভর্নমেণ্টে মন্ত্রীরা দেশের লোকের মোটা মাহিয়ান পকেটে পুরিয়া মুসলিম লীগে প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত আছেন; প্রসঙ্গ তাঁহারা এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছেন যে দেশে ধান ও চাউলের অভাব নাই এবং সম থাকিতেই তাঁহারা প্রচুর খাদ্যশস্য মজু করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের কল্যা বাঙলা দেশে আর দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী সম্প্র চাঁদপুরে গিয়াও এই ধরণের কথা বলিয়াছে এবং দেশে অন্নাভাবের কোন কারণ ঘটে নাই অধিকন্তু অন্নাভাবের কথা প্রচার নেহাৎ কুলোকের একটা কারসাজি এ কথা শুনাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহার কয়েকদিন পূ বাঙলার খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টার জেনারে শ্রীযুত এস কে চ্যাটার্জি বেতার বক্তৃতার দ্বা আমাদিগকে জলের মত পরিষ্কার করি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, দেশের লোকের সম্মু খাদ্য সংকট প্রকৃতপক্ষে দেখা দিব কোন কারণ ঘটে নাই এবং খবরের কাগ ওয়ালারাই এ সম্বন্ধে যত রকম অনিষ্টে মূল; তাঁহার মতে লোকে খবরে কাগজে প্রকাশিত ফসল বিনষ্ট হওয় বিবরণ এবং সারা ভারতবর্ষে খাদ্য সমস্ সম্বন্ধে হতাশজনক সংবাদ পাঠ করিয়াই বিচলি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রসমূহে এই সম্পর্কে দোষী করিবার পূর্বে চ্যাটার্জি সাহেবের বোঝা উচিত ছিল যে, সমগ্র ভারতে খাদ্য সমস্যার প্রশ্ন সংবাদপত্রসমূহ আ উত্থাপন করে নাই। স্বয়ং বড়লাট এবং ভা গভর্নমেণ্টের খাদ্য সচিব বারংবার এই আশং ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, বা হইতে যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ না পাইলে দে ব্যবস্থা যে এলাইয়া পড়িবে, এমন কথা ভা গভর্নমেণ্টের খাদ্য সচিবই স্বয়ং বলিয়াছে তাহা ছাড়া বাঙলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে আ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সংবাদপ গুলিতে পরে সে সংবাদ প্রকাশিত হইয়া চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়ে উদরপূর্ণ করিয়া দে ব্যাপী অন্ন সমস্যাকে এইভাবে উড়াইয়া দে যায়; কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তব অবস্থার পরিব ঘটে না। সত্য কথা এই যে, সর পক্ষের আশ্বাসবাণী মানিয়া লই পারিলে আমরা সুখী হইতাম; কি দেখিতে পাইতেছি, বাঙলার সর্বত্র চাউ মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে এবং নানাস্থ চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, শুধু তাহা ন বাজারে যথোচিত মূল্য দিয়াও চাউল পা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় বাঙলার ম ও সরকারী কর্মচারীদের উক্তিতে আমরা একা আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। প

এ সম্বন্ধে অতীতের তিক্ত আশঙ্কা এখনও আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথা রহিয়াছে। আমরা এ সত্য বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না যে, বিগত মন্বন্তরের সময় যাঁহারা খাদ্য-ব্যবস্থার মালিক ছিলেন এবং দরিদ্রের অন্ন মুষ্টি লইয়া যাঁহাদের আওতায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে শকুনি গৃধিনীর বীভৎস লীলা প্রশ্রয় পাইয়াছিল, আমাদের অদৃষ্টের ফেরে তাঁহারাই পুনরায় বাঙলার নরনারীর খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ভার হাতে পাইয়াছেন। আমরা এ কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে, বিগত দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী হেপাজতে খাদ্যশস্য মজুত থাকিতেও বহু লোক অনাহারে মরিয়াছে এবং দুর্নীতির খেলাতে প্রতি এক হাজার টাকা অন্যায় লাভের দরুণ এক একটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হইয়াছে। এই যে সব নরপিশাচ, ইহারা বাঙলাদেশে এখনও রহিয়াছে এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ-নীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহারা এখনও দেশের রক্ত চুষিয়া পূর্বের মতই পরিস্ফীত হইয়া যে উঠিবে না এ সম্বন্ধেই বা নিশ্চয়তা কোথায়? পক্ষান্তরে অবস্থা দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাতেই পিশাচের দল মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, নতুবা সরকারী গুদামে চাউল মজুত থাকিতে নানাস্থানে আজ এমন ভাবে চাউলের অভাব দেখা দিবার পক্ষে অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। সরকার পক্ষ হইতে আমাদিগকে ঘটা করিয়া এই কথা শুনানো হইতেছে যে, ১৯৪৬ সালে বাঙলা-দেশে খাদ্য ব্যবস্থায় কোন রকম ত্রুটি রাখা হয় নাই; ইহা ছাড়া যান বাহনের সুবিধা আছে, বহু বড় বড় গুদাম তৈয়ারী হইয়াছে, বহু সংখ্যক কর্মচারীর দল আছে, ইহার উপর ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসিতেছে, নেপাল হইতে ২ লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাইবে; কিন্তু শুধু কথায় লোকের উদর পূর্তি হয় না; শাসন বিভাগীয় কর্তারা যেন এই সত্য বিস্মৃত না হন এবং বিবৃতি দান করিবার পূর্বে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন সচেতন থাকেন। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া এ কথাটা ভুলিয়া না যান যে, উদরান্নের জন্য প্রপীড়িত বাঙলা তাঁহাদের পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার আরাম বিলাসে বিজৃম্ভিত আন্তরিকতাহীন উক্তি ও বিবৃতির অন্তর্নিহিত দায়িত্বহীনতা এবং নির্মমতা আর বরদাস্ত করিবে না।

প্রতিকারের উপায়

সরকার পক্ষের উক্তি এবং সরকারী বিবৃতিতে যাহাই বলা হউক না কেন, বাঙলা-দেশে অন্ন সমস্যা সত্যি সত্যই যে জটিল আকার ধারণ করিতেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং আমাদের মত এই যে, সরকারী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটিই বাঙলা দেশের এই অন্নসংকটের মূলে অনেক অনেকখানি রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশবাসী যদি দুর্নীতি দলনে বদ্ধপরিকর না হয় এবং দেশের মানবতার প্রেরণায় তাহারা আজ না জাগে, তবে সরকারী ব্যবস্থায় এই অবস্থার প্রতিকার হইবে না; পরন্তু দুর্নীতির জালই সম্প্রসারিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগ সম্পর্কিত দুর্নীতি এবং অসাধু মুনাফাখোরদের পশুবৃত্তি বাঙলার অন্ন সংকটের মূলে রহিয়াছে। তরুণ সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ আদর্শের অনুপ্রাণনাই বাঙলা দেশকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে। বাঙলার তরুণের দল এই সংকটে জাগ্রত হউন এবং তাঁহারা সংকল্প করুন যে, দেশের একটি নরনারীকেও তাঁহারা অন্নাভাবে মরিতে দিবেন না। মানুষের প্রাণরক্ষাই সকল নীতির শ্রেষ্ঠ নীতি এবং সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই সত্য তাঁহারা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। বাঙলার লোভী নর-পিশাচদিগকে দলন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার গ্রামে গ্রামে যুবকদিগকে লইয়া সংঘ গঠিত হউক। আমরা জানি, বাঙলায় কর্মীর অভাব নাই। এই সব কর্মীর দল আজ আগাইয়া আসুন এবং পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার কোন বিচার না করিয়া নরপিশাচ দলের স্বরূপ কঠোর হস্তে উন্মুক্ত করুন। ইহারা একজনও রেহাই না পায় আমরা ইহাই দেখিতে চাই, এবং মানুষকে প্রাণে মারিয়া পিশাচের দল এখানে পদ, মান ও অর্থে পুষ্ট হইবে, বাঙালী জাতিকে এই কলঙ্ক আর যেন বহন করিতে না হয়। বাঙলা দেশ কতকগুলি অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর পিশাচের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে, ইহার চেয়ে বাঙালী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়, তাহাও আমরা শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

ট্রেনে নারী হরণ

বাঙলাদেশের অবস্থা দিন দিন দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিতেছে। অন্ন কষ্ট বস্ত্র কষ্ট এ সব তো আছেই, ইহার উপর ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং ময়মনসিংহ-ভৈরব-বাজার অঞ্চলে ট্রেন পথে ডাকাতি ও নারী হরণের যে ধরণের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি এবং সত্যই যে আমরা নিজেরা সভ্য জাতি বা সভ্য শাসনে বাস করিতেছি এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। অবস্থা দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি, অবশেষে রেল গাড়ীই কি যত রকম দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে পরিণত হইল? কিন্তু সাধারণের গতিবিধির মধ্যে নারী হরণের ন্যায় দুষ্কার্য সাধন করা সহজ নয় এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দীর্ঘ-কালের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া এমন কাজ সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের মতে এক্ষেত্রে পুলিশের উদাসীনতা আছে এবং রেল কর্তৃপক্ষও এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। মালতীবালা অপহরণের বিবরণে দেখিতেছি সুতিয়াখালী নামক যে স্টেশনে বালিকাটি অপহৃতা হয়, সেই স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টারই তাহার উপর প্রথমে পাশবিক অত্যাচার করে বলিয়া অভিযোগ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে এক্ষেত্রে রেল কর্মচারীরও যোগ ছিল; স্পষ্টতঃ পুলিশ, রেল কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের যোগেই এই অঞ্চলে এমনভাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া দৌরাত্ম্য সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। কিরূপ নৈতিক অধোগতির ফলে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের নিজেদের উপর নিজেদের ধিক্কার আসিতেছে। আমরা জানি, নারীহরণ-কারী ও নারী ধর্ষণকারীদের দমনের জন্য আইনে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু সরকারী উদ্যোগ এক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হইবে, তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু সরকারের দিকে আমরা তাকাইয়া থাকিতে বলি না। আমাদের বিশ্বাস, দেশে এখনও মানুষ আছে এবং মানুষের তাজা রক্ত এখনও এদেশের লোকের ধমনীতে সঞ্চারিত হয়। নারী-নির্যাতনকারীদিগকে দমন করিবার জন্য প্রবল জনমত সংগঠিত হওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে বুকের রক্ত দিয়াও নারীর মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। নারীর প্রতি মর্যাদা বোধই সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি। এ দেশের প্রকাশ্য পথে-ঘাটে যদি এইভাবে নারীনিগ্রহ চলিতে থাকে, তবে সভ্য জাতিস্বরূপে আমাদের যত দাবী সব বৃথা এবং মানব সমাজে আমাদের মুখ দেখানোও উচিত নয়।

রেল ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত

আগামী ২৭শে জুন হইতে রেল ধর্মঘট আরম্ভ হইবে বলিয়া নিখিল ভারত রেলকর্মী ফেডারেশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের দাবী এই যে, সর্বসাধারণের আস্থাভাজন নেতাদের মধ্যস্থতায় যাহাতে এ সম্বন্ধে মীমাংসা হয় গভর্নমেণ্ট এখনও সেজন্য চেষ্টা করুন এবং যতক্ষণ গভর্নমেণ্টের হাতে ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ ঘটনার সহিত বোঝাপড়া করিবার চূড়ান্ত দায়িত্ব গভর্নমেণ্টই গ্রহণ করিবেন, এই ধরণের জিদ এবং আইন-প্রয়োগে ধর্মঘট-দমনের ডিক্টেটরী হুমকি তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। দেশের বর্তমান অবস্থায় রেল ধর্মঘটের মত একটি বিপর্যয়কর ব্যাপার কেহই কামনা করেন না।

নটীর পূজা (এচিং) শিল্পী : শৈলেশ দেববর্মা

রামমনোহর লোহিয়া

১৯৩১ সালে যখন রামমনোহর লোহিয়া পি এইচ ডি উপাধি অর্জন করিয়া জার্মানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন এদেশের রাজনৈতিক জলরাশি সবেমাত্র সমাজতন্ত্রের নবোত্থিত ঢেউ-এর আলোড়ন অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বা চেতনা পরিলক্ষিত হইত না। সমাজতন্ত্রের মর্মকথাও বহুলাংশে অপরিজ্ঞাত ছিল। রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান কথা ছিল অসহযোগ—পিকেটিং, বিলাতি বস্ত্র বর্জন, হরতাল, স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ, জেল-বরণ ইত্যাদি।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যেই একটি নূতন ধারা আবির্ভূত হইতে থাকে। উহার মূলে ছিল এই চিন্তা যে, এই রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের কিরূপ রূপান্তর সম্ভব হইবে। অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কয়েকজন চিন্তাশীল যুবকের মনে শুরু হইয়া ইহা ক্রমে গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নের ফলে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। নূতন চিন্তা বন্যা-প্রবাহের মত। ভৌতিক প্রতিবন্ধক দিয়া এই চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। কংগ্রেস আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সমস্ত প্রবীণ ও ভূয়োদর্শী নেতার সন্দেহাকুল শিরঃসঞ্চালন সত্ত্বেও অনিবার্যরূপেই বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর মন অধিকার করিয়া ফেলিল।

এই চিন্তাধারার বিকাশে রামমনোহর লোহিয়ার দান বিরাট। ১৯৪২-এর পূর্বে ইনি বিশেষভাবে লোকলোচনের সম্মুখে আসেন নাই। কিন্তু ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার মেধা ও রাজনৈতিক ধারা-অন্তর্ধারা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও বাস্তব উপলব্ধি গোড়া হইতেই এই বিকাশের পথে অতি প্রবলভাবে কার্য করিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও বার্লিন ইউনিভার্সিটির শিক্ষাপ্রাপ্ত এই তরুণ যুবক দীর্ঘকাল সমাজতন্ত্রী দলের মস্তিষ্কভাণ্ডাররূপে কাজ করিয়া ইহার আদর্শকে যুক্তি ও বুদ্ধির কাঠিন্য দ্বারা কার্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯৩১ সালে জার্মানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি লোভনীয় চাকুরীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিবার বাসনা তখন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নবীন কর্মীদের মধ্যে তিনি তাঁহার মনের মতন সংগী দেখিতে পান ও এই দলের কার্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সামান্য সূচনা হইতে ক্রমে সমাজতন্ত্রী দল বর্তমানে যে বিপুল প্রভাবের অধিকারী হইয়াছে, ইহার মূলে রামমনোহরের অনুপ্রেরণা ও অক্লান্ত আত্মবিলোপকারী পরিশ্রম যে কিরূপ কার্য

করিয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার গুণমুগ্ধ সহকর্মীরাই বলিতে পারেন।

সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র "কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী" যখন প্রকাশিত হয়, তখন লোহিয়া তাহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে ইহার বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত ইহার সম্পাদকতা ও অধ্যক্ষতার কাজ করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তরুণ জওহরলাল কংগ্রেসের পুরাতন কাঠামোকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সাজিতে চাহেন। কংগ্রেসের নবীকরণের কল্পনা তাঁহার মনকে অধিকার করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বৈদেশিক বিভাগ স্থাপন করেন এবং লোহিয়াকে এই বিভাগের পরিচালনা-ভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অধিকারের জন্য ডাঃ লোহিয়া এই কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সংগে কংগ্রেসের এই নবসৃষ্ট বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁহারই চেষ্টায় এই বিভাগের উদ্যোগে "বহির্ভারতীয় বিভাগ" প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় বিভাগ গঠিত হয়।

এই বৎসরই—১৯৩৬ সালে—তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। এ আই সি সি'র অধিবেশনে তিনি চিন্তাশীল বাগ্মীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

তাঁহার রচনাভংগীও অতীব মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী। উহা একান্ত স্বাচ্ছন্দ্যপ্রবণ; উহার মধ্যে কোন প্রকার আড়ষ্টতা নাই। তিনি ধীরে ধীরে লিখিয়া থাকেন ও যত্নের সহিত শব্দচয়ন করেন। কিন্তু পাঠকের মনে ঐ লেখা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার লেখনী তাঁহার রসনার তুল্য শক্তিমান। উভয়েই বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে পারে এবং শ্রোতা ও পাঠককে তাঁহার সহিত একমত হইতে বাধ্য করে।

লোহিয়ার রচনাবলীর মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহীতার আর একটি কারণ তাঁহার ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মার্জিত মনে অন্ধ সংস্কারের কোন স্থান নাই। তিনি স্বাধীন চিন্তার দৃঢ় সমর্থক। তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত গ্রহীষ্ণু। রচনার এই বাধাহীন, নির্মুক্ত গতিশীলতা ও সাবলীলতাই তাঁহার বক্তব্যকে এমন কৌতূহলোদ্দীপক ও আগ্রহের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে।

লোহিয়ার বয়স মাত্র ৩৬। তিনি ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বংগদেশ, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশেই তিনি অধিকাংশ সময়ে কাজ করিয়াছেন। তিনি ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী। এই ভাষাজ্ঞান তাঁহাকে আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগ সংস্থাপনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

লোহিয়ার পিতা হীরালাল একজন গোঁড়া গান্ধীবাদী। ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বৃদ্ধ হীরালাল গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া পদব্রজে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিতে করিতে কলিকাতা হইতে তাঁহার দিল্লী অভিযান শুরু করেন। বালক লোহিয়া বরাবরই রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি গয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ

করিয়া রামমনোহর শিক্ষালাভার্থ কলিকাতায় আসেন ও এখান হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপ যাইতে মনস্থ করেন এবং জার্মানীকেই তাঁহার অধ্যয়নের কেন্দ্ররূপে মনোনীত করেন। জার্মানীতে অবস্থান ও বিদ্যাভ্যাস তাঁহার মানসিক উন্নতির পক্ষে প্রভূত সহায়ক হইয়াছিল। জার্মানদিগের নিকট হইতে তিনি সম্পূর্ণতার প্রতি অনুরাগ ও কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তাহাদিগের আগ্রহ শিক্ষা করেন। জার্মানীতে বাস তাঁহার মানসিক শক্তিকে আরও তীক্ষ্ম ও প্রখর করিয়া তুলে।

১৯৩৮ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে কলিকাতায় ডাঃ লোহিয়া অভিযুক্ত হন। এই মামলা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁহার সতেজ আত্মপক্ষ-সমর্থনে স্বয়ং বিচারক অভিভূত হন ও রামমনোহরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেন। ঐ সময়েই একই কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে অপর একটি রাজদ্রোহের মামলার শুনানী চলিতেছিল। কিন্তু একদল বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি এই মামলার বিচারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রামমনোহর লোহিয়া সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একজন প্রবন্ধকার তাঁহাকে দিয়াশলাই কাঠির সহিত তুলনা করিয়াছেন; ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি-প্রজ্বলনের ক্ষমতা কিন্তু বহিঃপ্রকাশ নাই। বাহির হইতে দেখিতে গেলে লোহিয়া অত্যন্ত শান্ত ব্যক্তি। তিনি ধীর ও নীরব; কিন্তু তাঁহাকে উত্তেজিত করা সহজ। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বা ভারতের পরাধীনতার কথা উত্থাপন করিলে লোহিয়ার বাহ্যিক চেহারায় সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তাঁহার মুখে বিদ্রূপাত্মক হাস্য দেখা দেয় ও অনেক সময়েই তাঁহার গভীর অন্তর্বেদনা নির্মম সমালোচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

কিন্তু লোহিয়া কেবলই একজন চিন্তাশীল কর্মীমাত্র নহেন। তাঁহার সখ্যতাস্থাপনে প্রভূত ক্ষমতা আছে। তিনি অতি সুমিষ্ট আলাপ করিতে পারেন। তাঁহার মনোহর কথোপকথনে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। তিনি প্রচুর চা ও ধূমপানে অভ্যস্ত এবং বন্ধুদিগের সহিত একত্র হইয়া চা ও সিগারেট খাইতে ভালবাসেন।

বাস্তব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি একান্ত উদাসীন। কিন্তু তিনি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহজ-বুদ্ধির অধিকারী। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি যখন মাদ্রাজে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে গৃহে ফিরিবার মতন রেলভাড়াও ছিল না। তিনি মাদ্রাজে নামিয়াই "হিন্দু" পত্রিকার অফিসে প্রবেশ করিলেন ও উহার সম্পাদকের সহিত তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাঁহার উপর বৈদেশিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনার ভার দিতে সম্পাদককে রাজী করিয়া উহার অফিস হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, উহার প্রথম নিবন্ধটি ঘটনাস্থলেই রচনা করিয়া কলিকাতা যাইবার উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিতেও ভুলেন নাই।

১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহে উহার অন্যতম পরিচালকরূপে লোহিয়া অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ-নারায়ণ, শ্রীযুত অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি প্রভৃতি বিশিষ্ট সহকর্মীদিগের সহিত একযোগে তিনি বিদ্রোহের শীর্ষাগ্র গঠন করেন। গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই আন্দোলনের পরিচালনা করিয়াছেন ও উহাতে প্রেরণা যোগাইয়াছেন। বিশেষভাবে কংগ্রেস রেডিওর পরিচালনাকার্যে তাঁহার দক্ষতায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও চিন্তাশীলতাসম্পন্ন মেধাবী ব্যক্তির পক্ষে সংগঠনমূলক প্রতিভা ও কর্মশক্তির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, এই সাধারণ ধারণা লোহিয়ার জীবনেতিহাস হইতে সমর্থন করা যায় না। বিপুল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেভাবে কংগ্রেস রেডিও সেই কষ্টকর দিনে পুলিশের সতর্ক-চক্ষু অবহেলা করিয়া প্রতিরোধের ও সংগ্রামের বাণী জনগণের সম্মুখে দিনের পর দিন ঘোষণা করিতেছিলেন, তাহা অসাধারণ। শ্রীমতী ঊষা মেহতা তাহার কথঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত সংবাদপত্রের মারফৎ আমাদিগকে দিয়াছেন। কিন্তু সেই গৌরবময় প্রতিরোধের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজিও অলিখিত রহিয়াছে। সেই ইতিহাস এবং তাহাতে লোহিয়ার বিশিষ্ট ভূমিকা—যেদিন সম্পূর্ণরূপে আমাদের গোচরীভূত হইবে, সেই দিনই আমরা এই কঠোরকর্মা আদর্শবাদী পুরুষের মহত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব।

এতদ্ব্যতীত রেডিওযোগে ঘোষিত বক্তৃতা ও নির্দেশাবলী সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাদের উচ্চস্তরের রচনা। প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায় এই ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের দায়িত্ব, প্রতিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য তাহাদের কর্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইত। কেমন করিয়া অত্যাচারী বিদেশী শাসককে বাধা দেওয়া যায়, সে বিষয়েও খোলাখুলি উপদেশ থাকিত। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণাবলীর অধিকাংশই রামমনোহরের লেখনী-নিঃসৃত।

কর্মীদিগের জন্য লিখিত তাঁহার কতকগুলি পুস্তিকাও বিশেষ প্রসিদ্ধি[illegible] করিয়াছে। ইহার মধ্যে "লর্ড লিনলিথগো[illegible] লিখিত খোলা চিঠি" ও "বিদ্রোহিগণ অগ্[illegible] হও" এই দুইখানির বিশেষভাবে নাম [illegible] যাইতে পারে।

১৯৪৪ সালের মে মাসে লোহিয়[illegible] গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর দুর্গে লইয়া যা[illegible] হয়। সেখানে উভয় হাত-পা শৃঙ্খলিত অবস্[illegible] একটি কীটপূর্ণ সেলে তিনি তিন মাস আ[illegible] থাকেন। এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নির্যা[illegible] তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কারাগ[illegible] অবস্থানকালে তিনি ১৫ হইতে ২০ সের ও[illegible] হ্রাসপ্রাপ্ত হন। এই কারাবাস তাঁহার প[illegible] অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তাঁহ[illegible] সংবেদনশীল চিত্তে এই নির্মম কারা-জীব[illegible] ছাপ গভীরভাবে অঙ্কিত হয়। অধ্যাপ[illegible] হ্যারল্ড ল্যাস্কিকে লিখিত তাঁহার একটি চি[illegible] হইতে এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব জানা যা[illegible]

স্বাধীন জীবনের স্বারপ্রান্তে উপনী[illegible] হইয়া আজ তাঁহার দায়িত্ব বিপুল। ভারতে[illegible] রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডল আজ উত্তপ্ত ও দ্র[illegible] পরিবর্তনশীল। দীর্ঘ উৎপীড়ন ও অত্যাচা[illegible] নিপীড়িত জনসাধারণ আজ স্বাধীনত[illegible] আস্বাদন লাভে ব্যগ্র ও চঞ্চল। তাহাদের জা[illegible] চেতনা আজ উদ্বেলিত হইয়া বিপুল প্লা[illegible] দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ভাসাই[illegible] লইয়া যাইবে, এই সম্ভাবনা আজ প্রত্যক্ষ[illegible] কিন্তু এই সংগ্রামের পশ্চাতে যেমন শ[illegible] প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সংহতি ও পদ্ধতি[illegible] কঠোর নিয়মানুবর্তিতার। নতুবা আপনভা[illegible] আপনি পিষ্ট হইবার আশঙ্কা। সমগ্র বামপন্[illegible] ভারত আজ লোহিয়া, জয়প্রকাশ ও অন্যা[illegible] বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাদের দিকে আগ্রহা[illegible] দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে; তাঁহাদের নিকট হই[illegible] নির্দেশ প্রত্যাশা করিতেছে। এই সংকটা[illegible] মুহূর্তে একটি ভ্রান্তিকর কার্যে স[illegible] আন্দোলন বিনষ্ট হইয়া যাইতে পা[illegible] কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে এখনও গান্ধীজ[illegible] প্রভাব বিপুল। সাধারণভাবে কংগ্রেস সমা[illegible] তন্ত্রী দল ও বিশেষভাবে লোহিয়াও গান্ধ[illegible] অনুরক্ত। এই গান্ধী-আনুগত্যের সহি[illegible] নবোন্মেষিত প্রবুদ্ধ জনমতের দাবী সামঞ্জ[illegible] কতদূর সম্ভব, এ প্রশ্ন আজ অনিবার্যভা[illegible] প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনকে আলোড়[illegible] করিতেছে। যদি এই সামঞ্জস্য অসম্ভব হয়, ত[illegible] আমাদের বামপন্থী আন্দোলন কি গান্ধীবা[illegible] পর্বতগাত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, অথ[illegible] গান্ধী নিরপেক্ষভাবে আপন সত্ত্বাকে আবিষ্ক[illegible] করিয়া অন্তর্নিহিত শক্তিবলে অগ্রসর হইবে[illegible] বিদ্রোহী ভারত আজ লোহিয়া ও তাঁহ[illegible] সঙ্গিগণের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর দা[illegible] করিতেছে।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

"রাশিয়ার চিঠি"র উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমা লাভ। সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি।

"একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল; ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্য-হাটের খিড়কি মহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনাফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল; বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয়নি; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।......

"রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগী সোনার ডিম পাড়ে সে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগীটাকে শুদ্ধ সে জবাই করে।

"বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।......

"যান্ত্রিক উপায়ে অর্থ লাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল তখন থেকে মধ্যযুগের সিভল্‌রি অর্থাৎ বীরধর্ম বণিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাসহরণ ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধন-সম্পদের স্রোত পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।...এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না—চীনকে খেতে হ'ল আফিম; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল।"

ভারতবর্ষের আধুনিক রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল কথাটি এই। যে-সময় জগতে যন্ত্র-যুগের আবির্ভাব হয়নি সে-সময় ভারতবর্ষ তাৎকালিক শিল্পে অন্যান্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না, বরং অনেক বেশি অগ্রসর ছিল—তার পণ্য বিদেশের হাটে বহু সমাদৃত হত। কিন্তু যে-সময় যন্ত্রযুগ আরম্ভ হল সে-সময় ভারতবর্ষ যদি নতুন শিল্প-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নতুন অর্থনৈতিক জীবন আরম্ভ করতে পারত, তাহলে আজ যে সমস্ত দেশ শিল্পে সমৃদ্ধ এবং জগতে শক্তিমান্‌ ভারতবর্ষও তার চেয়ে কোনও অংশে হীন হত না। কিন্তু সেই সময়েই আঘাত পড়ল। সাম্রাজ্যের আঘাত শুধু যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করল তাই নয়, আঘাতটা প্রথমত পড়ল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপই তাই। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কথায়, ভারতের জীবিকা এখন কৃষির অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করছে। আমাদের শিল্পপদ্ধতি নতুন কালের নতুন রূপ ধরার বদলে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। সমস্ত দেশের ভার বহন করতে হল কৃষিকে। কিন্তু সেখানেও সাম্রাজ্যবাদের লোভ রেহাই দিল না। শুরু হল কৃষি নিয়ে নাড়াচাড়া। সেচ এবং রক্ষাকার্যের যে ভার রাষ্ট্রের উপর ছিল সে ভার গেল উড়ে; উপরন্তু জমিকে চড়ানো হল নীলামের কাড়াকাড়িতে—একশালা দুশালা বন্দোবস্তে যে সবচেয়ে বেশী আদায় করতে পারে তাকেই জমি দেওয়া হল। তার উপর বিদেশী জিনিসের মূল্য হিসেবে কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি হত। এই সব কারণে গত শতাব্দীতে, বিশেষত গোড়ার দিকে, দুর্ভিক্ষের কমতি ছিল না।

কিন্তু তখনও আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা বিশেষ জাগেনি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে সময় চিন্তায় ও কর্মে সমাজের মধ্যে অগ্রসর ছিল সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও বেশ পরিপুষ্ট এবং সরকারের অনুগ্রহেই পরিপুষ্ট। পাশ করলেই চাকরি মেলে,—সংসারে অভাব থাকে না বরং স্বচ্ছলতা দেখা দেয়। সেই জন্য তখনও চেতনা জাগেনি। কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ যখন সে অবস্থা কেটে গেল, মধ্যবিত্ত সমাজেও ভাঙন ধরল তখন আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে জাগরিত হতে আরম্ভ করেছে। সেই সময় কংগ্রেসের জন্ম।

কংগ্রেসের ইতিহাস সকলেরই সুপরিচিত —এর পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। ক্রমে ক্রমে কি ভাবে কংগ্রেসের নীতি আবেদন-নিবেদনের পালা কাটিয়ে সবল আন্দোলনে পরিণত হল সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই আন্দোলনগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, আন্দোলনগুলি প্রথমে ছিল ভাব-প্রধান এবং আবেগপ্রধান—কিন্তু যেমন দিন কেটেছে এবং আমাদের মধ্যে ভাঙন বেড়েছে ততই ঐ আন্দোলনগুলির ভাবপ্রবণতা ও আবেগপ্রবণতা কেটে গিয়ে তার মধ্যে রুক্ষ শুষ্ক এবং রুদ্র রাজনীতিক চেহারা দেখা দিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ তুলনা করলেই এ কথা বোঝা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের মূল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়িয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করেনি। তার যে পরিমাণ গভীরতা ছিল, সে পরিমাণ ব্যাপকতা ছিল না। আর তখনও মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়নি। তাই যে আঘাত তখন বাঙালী পেয়েছিল সে আঘাতটা হৃদয়ে আঘাত, উদরে নয়। সেই জন্য স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ভাবাবেগের এত প্রাধান্য। কিন্তু যেমন সমাজের চেহারা বদলিয়েছে এবং আমাদের আর্থিক দুরবস্থা তীব্রতর হয়েছে তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও স্বরূপ বদলিয়েছে এবং তার মধ্যে ভাবাবেগ ততই কমে তার রুক্ষ শুষ্ক চেহারাটাই ফুটে উঠেছে।

এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে এই যে, ক্রমশ আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাটাই বড় হয়ে উঠছে। ইতিহাসের নিয়মে তাই ঘটা

স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে রাজনীতির চেহারা সব সময়েই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অর্থ-নীতির উপর। কিন্তু যে সময় আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকে, সে সময় সে কথাটা আপাতত সে রকম প্রবল ভাবে চোখে পড়ে না। যে সময় আর্থিক অবস্থা হীন হয়, তখন সেটা খুব প্রবল ভাবে চোখে পড়তে থাকে। আমাদের দেশ ভাঙনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা। যত দিন যাবে, আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা দূরে থাক, প্রাণধারণের সমস্যাই আমাদের প্রবল হয়ে উঠবে।

সেই জন্য একটা কথা আমাদের স্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকার। যে সময় মানুষের বা সমাজের আর্থিক ঋদ্ধি থাকে, সে সময় তার মনে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, তা অনেকটা ভাবাবেগপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের দাবীর চেহারা অন্য—সে দাবীর পিছনে আছে বাঁচবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং প্রাণধারণের ব্যাকুল চেষ্টা। এর ফলে এখন রাজনৈতিক কার্যক্রমেরও বদল হওয়া দরকার। আগে যেখানে ডাক দেওয়া চলত মানুষের হৃদয়াবেগকে, এখন শুধু তা চলে না। ডাক দেওয়ার সংগে সংগে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম কি তা জানান দরকার। তা না হলে প্রশ্ন উঠবে, স্বাধীনতা চাই, কিন্তু কার স্বাধীনতা এবং কি ধরণের স্বাধীনতা? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব চাই।

এ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেই জন্য স্বাধীনতার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডাক দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে, এমন কি শ্রেণীসংগ্রাম পর্যন্ত বন্ধ রাখার প্রস্তাব গান্ধীজী করেছেন। আগে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই। কিন্তু জগতের নিয়ম হচ্ছে, সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে এই সমস্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে এবং বিদেশী ধনতন্ত্রের সংগে যোগ দেয় দেশী ধনতন্ত্র। সে সময় আর শ্রেণী সংগ্রামকে ধামা-চাপা দেওয়া যায় না—সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

আমরা ক্রমশ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সেই জন্য যত দিন যাবে আমাদের এই শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে চোখ বুজে থাকা চলবে না। ভবিষ্যতে যে কোনও আন্দোলন হোক না কেন, তার মধ্যে এই কথাটা প্রবল হয়ে উঠবে এবং এর যথোচিত সমাধান না হলে আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠবে না।

এই কারণে কংগ্রেসের একটি সুস্পষ্ট অর্থ-নৈতিক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। কংগ্রেসের যেমন একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রম আছে এখন তার সংগে একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংযুক্ত হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক কার্যক্রম এখন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা হলে ক্রমশ ক্রমশ সে কার্যক্রম অবাস্তব হয়ে যাবে।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা: করাচী প্রস্তাব

কংগ্রেস অর্থনৈতিক ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি ধারায় চিন্তা করে এসেছে তার একটা হিসেব নেওয়া দরকার। এই চিন্তাধারার দুটি দিক আছে। প্রথমত, চাষী মজুরদের অধিকার এবং দাবী কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কংগ্রেস মাঝে মাঝে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই-টাই সবটা নয়। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থ-নৈতিক চেহারা কি হবে সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তাধারা আছে। তাতে চাষী মজুরদের কথা প্রত্যক্ষত না থাকলেও সেটা মজুরদেরই কথা, কারণ কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায় কি ধরণের হবে তার উপর চাষী মজুরদের সুখ-সুবিধাও নির্ভর করছে। সুতরাং দুই দিক একসংগে না আলোচনা করলে সমস্ত চিত্রটি চোখে পড়বে না।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধি-বেশনে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে জনসাধারণের মৌলিক আর্থিক অধিকার এবং মজুরদেরও মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ছিল। প্রস্তাবটি হতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি:—

In order to end the exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of the starving millions. The Congress therefore declares that any constitution which may be agreed to on its behalf should provide, or enable the Swaraj Government to provide for the following:

* * *

2. (a) The organisation of economic life must conform to the principle of justice, to the end that it may secure a decent standard of living.

(b) The State shall safeguard the interests of industrial workers and shall secure for them, by suitable legislation and in other ways, a living wage, healthy conditions of work, limited hours of labour, suitable machinery for the settlement of disputes between employees and workmen, and protection against the economic consequences of old age, sickness, and unemployment.

3. Labour to be freed from serfdom and conditions bordering on serfdom.

4. Protection of women workers, and specially, adequate provision for leave during maternity period.

5. Children of school going age shall not be employed in mines and factories.

6. Peasants and workers shall have the right to form unions to protect their interests.

সেইসংগে চাষীদের সম্বন্ধে বলা হল:

7. The system of land tenure and revenue and rent shall be reformed and an equitable adjustment made on th[e] burden on agricultural land, immediately giving relief to the smaller peasantry by a substantial reduction of agricultural rent and revenue now paid b[y] them, and in case of uneconomic holdings, exempting them from rent, s[o] long as necessary, with such relief a[s] may be just and necessary to holder[s] of small estates affected by suc[h] exemption or reduction in rent, and t[o] the same end, imposing a graded ta[x] on net incomes from land above [a] reasonable minimum.

* * *

16. Relief of agricultural indebtedness and control of usury—direct an[d] indirect.

অর্থাৎ "জনসাধারণের উপর শোষণ ব[ন্ধ] করতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সং[গে] অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের প্রকৃত অর্থ[-]নৈতিক স্বাধীনতা চাই। সেইজন্য কংগ্রেস স্থি[র] করছেন যে কংগ্রেসের তরফে যে কোন শাসনত[ন্ত্রে] সম্মতি দেওয়া হোক্ তার মধ্যে নিম্নলিখি[ত] মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে, অথবা যা[তে] স্বরাজ সরকার তার ব্যবস্থা করতে পারে[ন] সে সম্বন্ধে নির্দেশ থাকবে:—

২। (ক) আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে[র] সংগঠন করতে হবে ন্যায়ের ভিত্তিতে[,] যাতে প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান ভ[াল] হতে পারে।

(খ) রাষ্ট্র মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষ[ণ] করবে। প্রয়োজন মত আইন কর[ে] বা অন্য উপায়ে মজুরদের জন্য এম[ন] মজুরীর হার নির্ধারণ করতে হ[বে] যাতে ভালভাবে জীবনধারণ ক[রা] যায়। তা ছাড়া, কাজের স্বাস্থ্যক[র] পরিবেশ, মজুরীর নির্দিষ্ট সম[য়,] মালিক-শ্রমিক বিরোধ হলে তা[র] সালিশী ব্যবস্থা এবং বৃদ্ধ বয়[সে] অসুস্থতার জন্য বা বেকার থাকা[র] সময় যাতে অর্থকষ্ট না হয় তা[র] ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মজুরদের অবস্থা যাতে ক্রীতদাস[ের] মত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। স্ত্রী-মজুরদের যথাযথ রক্ষাব্যব[স্থা] করতে হবে, বিশেষত অন্তঃসত্ত্বা থাকার স[ময়] ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। পড়বার বয়সের ছেলেরা খ[নি] বা ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত হবে না।

৬। চাষী ও মজুররা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে।

* * *

৭। বর্তমানে যে সমস্ত ভূমিরাজস্ব খাজনার ব্যবস্থা আছে তার সংস্কার কর[তে] হবে। যাতে জমির উপর বেশী চাপ না প[ড়ে] তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট চাষীদে[র] সাহায্য ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য তাদে[র]

দেয় খাজনা ও রাজস্ব কমাতে হবে। যেখানে তাদের জমির পরিমাণ অর্থনৈতিক হিসাবে লাভজনক নয়, সেখানে যতদিন প্রয়োজন খাজনা মাপ করতে হবে। যারা ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক তারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদেরও সাহায্য করতে হবে। সেজন্য একটা নির্দিষ্ট ন্যায়সংগত আয়ের উপর যাদের আয় তাদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে ট্যাক্স বসাতে হবে।

* * *

১৬। কৃষিঋণের লাঘব করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসীদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৯৩১—১৯৩৬

ইতিমধ্যে আরম্ভ হল বিশ্বব্যাপী মন্দা। আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনও চলছে, তার ফলে অত্যাচার উৎপীড়নেরও কমতি নেই। এইভাবে কিছু বছর কাটবার পর কংগ্রেস বে-আইনী আর রইল না, একটা রাজনৈতিক সন্ধি হল। সেই সময় এলো নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন নির্বাচন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন কংগ্রেস তার আদর্শ ঘোষণা করল, তেমনি নির্বাচনী ইস্তাহারে সে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমও ঘোষণা করল। নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হল :

At the Karachi session of the Congress in 1931 the general Congress objective was defined in the Fundamental Rights resolution. That general definition still holds. The last five years of developing crisis have however necessitated a further consideration of the problems of poverty and unemployment and other economic problems. With a view to this the Lucknow Congress laid particuler stress on the fact that "the most important and urgent problem of the country is the appalling poverty, unemployment and indebtedness of the peasantry, fundamentally due to antiquated and repressive land tenure and revenue systems, and intensified in recent years by the great slump in prices of agricultural produce," and called upon the Provincial Congress Committees to frame full agrarian programmes.

অর্থাৎ "করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেসের মৌলিক উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সেকথা আজও সত্য। তার উপর গত পাঁচ বছর ধরে যে সঙ্কট ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার প্রয়োজন হয়েছে। এইজন্য লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বলা হয়েছিল যে, এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে এদেশের সেকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে যে ভয়াবহ দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং ঋণ দেখা দিয়েছে তারই সমস্যা। তার উপর কৃষিজ দ্রব্যের দাম মন্দার সময়ে কমায় সেই সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এইজন্য কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কৃষি সম্বন্ধে নতুন করে কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলা হয়।

এই অনুসারে কংগ্রেস নতুন করে কৃষি সম্বন্ধে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীটী উদ্ধৃত করলাম :

..AGRARIAN PROGRAMME: 1936
(Resolution 12, Lucknow Congress 1936)

1. Freedom of organisation of agricultural labourers and peasants.
2. Safeguarding of the interests of peasants where there are intermediaries between the State and themselves.
3. Just and fair relief of agricultural indebtedness including arrears of rent and revenue.
4. Emancipation of the peasants from feudal and semi-feudal levies.
5. Substantial reduction in respect of rent and revenue demands.
6. A just allotment of the State expenditure for the social, economic and cultural amenities of villages.
7. Protection against harassing restrictions on the utilization of local natural facilities for their domestic and agricultural needs.
8. Freedom from oppression and harassment at the hands of Government officials and landlords.
9. Fostering industries for relieving rural unemployment.

অর্থাৎ "১। কৃষি মজুরদের এবং চাষীদের সংগঠনের অধিকার। ২। যেখানে রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যে নানা মধ্যস্বত্ব আছে সেখানে চাষীদের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা। ৩। কৃষিঋণ এবং বাকী খাজনার ন্যায়সংগত মাপ। ৪। সামন্ত যুগোচিত নানারকম আবওয়াবের হাত হতে নিষ্কৃতি। ৫। খাজনার ও রাজস্বের হার ও পরিমাণ যথেষ্ট কমান। ৬। গ্রামগুলির সামাজিক আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধার জন্য সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যয়। ৭। স্থানীয় যেসব জিনিস পারিবারিক প্রয়োজনে বা কৃষির প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারা যায় সেসব জিনিষ ব্যবহারের অবাধ অধিকার চাই। ৮। সরকারী কর্মচারী ও জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। ৯। গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।"

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই সব কথারই পুনরাবৃত্তি ছিল। শিল্প-মজুরদের সম্বন্ধেও করাচী প্রস্তাবের পুনরুক্তি করা হয়।

এ পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস চাষী ও মজুরদের সম্বন্ধে জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে যে সমস্ত কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু এদেশে চালাবার কথা বলেছিলেন। বস্তুত এ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা হাতে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বেশী কথা বলে লাভ হয় না। কিন্তু তবু আদর্শের একটা দাম আছে। কংগ্রেস চাষী-মজুরদের সম্বন্ধে কি ভাবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলে তার ফল সমাজের স্তরে স্তরে দেখা যাবে।

কথা ও কাজ : ১৯৩৭—১৯৩৯

ক্রমশ ক্রমশ অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করল। বিশ্বব্যাপী মন্দা ক্রমশ কেটে গিয়ে শুরু হল যুদ্ধোদ্যম এবং দাম-চড়া। সেই সঙ্গে এদেশেও তার ছায়া কিছু পড়ল। অন্যদিকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, কংগ্রেস নতুন চেহারায় আবির্ভূত হল। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস কেবল আন্দোলন করেছে এবং দাবী জানিয়েছে, কিন্তু এইবার তার পরীক্ষা শুরু হল। এই শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ, অথচ সে যে সমস্ত দাবী জানিয়েছে সে দাবী কাজে পরিণত করার দায়িত্ব সে অস্বীকার করতে পারে না। এ প্রায় উভয়সংকট। নেহরুর কথায় :

It is an embarassing position for our Ministers. On the one hand, they have to face the inherent contradictions and obstructions which flow from the present Constitution; on the other, they are responsible to and have to satisfy all manner of people and Committees. ....Urgent and vital problems shout for solution, and the very spirit we have evoked in the masses demands such a solution.

জনসাধারণের মনে একটা বিরাট আশার সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এই শাসনতন্ত্রে আমাদের ন্যূনতম দাবীর অতি অল্প অংশও পূরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে তখন প্রশ্ন জাগল : এখন কর্তব্য কি। নেহরু স্পষ্টই লিখেছেন—

The major problems of poverty, unemployment, the land, industry, clamoured for solution, and yet they could not be solved within the framework of the existing constitution and economic structure. (Unity of India p. 107).

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে আলোচনা করা দরকার, মন্ত্রিসভাগুলি কতটুকু করতে পেরেছিলেন। মোটামুটি কয়েকটা কথার উল্লেখ করব। যেমন, বিহার সরকারের কথা ধরা যাক।[1] প্রথমে ভূমিসংক্রান্ত সংস্কার। "১৯১১ সালের পর হতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত খাজনা বৃদ্ধি হয়েছিল সে সমস্ত মকুব করা হয়। (খ) যেখানে জমি বালিচাপা পড়েছে বা অন্যভাবে নষ্ট হয়েছে অথবা জমিদার সেচের বন্দোবস্ত অবহেলা করায় জমি অব্যবহার্য হয়েছে সেখানে আংশিক বা সম্পূর্ণ খাজনা মকুব। (গ) যেখানে ফসলের দাম স্থায়ীভাবে পড়েছে সেখানে খাজনা কমি। (ঘ) অন্যত্রও খাজনা কমি ও উচিত খাজনা নির্ধারণ। (ঙ) প্রজার দেয় বাকী খাজনার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত

1. Vide Congress and the Masses by Dr. H. C. Mookherjee.

স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে রাজনীতির চেহারা সব সময়েই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অর্থ-নীতির উপর। কিন্তু যে সময় আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকে, সে সময় সে কথাটা আপাতত সে রকম প্রবল ভাবে চোখে পড়ে না। যে সময় আর্থিক অবস্থা হীন হয়, তখন সেটা খুব প্রবল ভাবে চোখে পড়তে থাকে। আমাদের দেশ ভাঙনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা। যত দিন যাবে, আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা দূরে থাক, প্রাণধারণের সমস্যাই আমাদের প্রবল হয়ে উঠবে।

সেই জন্য একটা কথা আমাদের স্পষ্ট ভাবে বোঝা দরকার। যে সময় মানুষের বা সমাজের আর্থিক ঋদ্ধি থাকে, সে সময় তার মনে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, তা অনেকটা ভাবাবেগপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের দাবীর চেহারা অন্য—সে দাবীর পিছনে আছে বাঁচবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং প্রাণধারণের ব্যাকুল চেষ্টা। এর ফলে এখন রাজনৈতিক কার্যক্রমেরও বদল হওয়া দরকার। আগে যেখানে ডাক দেওয়া চলত মানুষের হৃদয়াবেগকে, এখন শুধু তা চলে না। ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম কি তা জানান দরকার। তা না হলে প্রশ্ন উঠবে, স্বাধীনতা চাই, কিন্তু কার স্বাধীনতা এবং কি ধরণের স্বাধীনতা? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব চাই।

এ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেই জন্য স্বাধীনতার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডাক দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে, এমন কি শ্রেণীসংগ্রাম পর্যন্ত বন্ধ রাখার প্রস্তাব গান্ধীজী করেছেন। আগে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই। কিন্তু জগতের নিয়ম হচ্ছে, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে এবং বিদেশী ধনতন্ত্রের সঙ্গে যোগ দেয় দেশী ধনতন্ত্র। সে সময় আর শ্রেণী সংগ্রামকে ধামা-চাপা দেওয়া যায় না—সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

আমরা ক্রমশ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সেই জন্য যত দিন যাবে আমাদের এই শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে চোখ বুজে থাকা চলবে না। ভবিষ্যতে যে কোনও আন্দোলন হোক না কেন, তার মধ্যে এই কথাটা প্রবল হয়ে উঠবে এবং এর যথোচিত সমাধান না হলে আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠবে না।

এই কারণে কংগ্রেসের একটি সুস্পষ্ট অর্থ-নৈতিক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। কংগ্রেসের যেমন একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রম আছে এখন তার সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংযুক্ত হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক কার্যক্রম এখন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা হলে ক্রমশ ক্রমশ সে কার্যক্রম অবাস্তব হয়ে যাবে।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা: করাচী প্রস্তাব

কংগ্রেস অর্থনৈতিক ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি ধারায় চিন্তা করে এসেছে তার একটা হিসেব নেওয়া দরকার। এই চিন্তাধারার দুটি দিক আছে। প্রথমত, চাষী মজুরদের অধিকার এবং দাবী কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কংগ্রেস মাঝে মাঝে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই-টাই সবটা নয়। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থ-নৈতিক চেহারা কি হবে সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তাধারা আছে। তাতে চাষী মজুরদের কথা প্রত্যক্ষত না থাকলেও সেটা মজুরদেরই কথা, কারণ কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায় কি ধরণের হবে তার উপর চাষী মজুরদের সুখ-সুবিধাও নির্ভর করছে। সুতরাং দুই দিক একসঙ্গে না আলোচনা করলে সমস্ত চিত্রটি চোখে পড়বে না।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে জনসাধারণের মৌলিক আর্থিক অধিকার এবং মজুরদেরও মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ছিল। প্রস্তাবটি হতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি:—

In order to end the exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of the starving millions. The Congress therefore declares that any constitution which may be agreed to on its behalf should provide, or enable the Swaraj Government to provide for the following:

* * *

2. (a) The organisation of economic life must conform to the principle of justice, to the end that it may secure a decent standard of living.

(b) The State shall safeguard the interests of industrial workers and shall secure for them, by suitable legislation and in other ways, a living wage, healthy conditions of work, limited hours of labour, suitable machinery for the settlement of disputes between employees and workmen, and protection against the economic consequences of old age, sickness, and unemployment.

3. Labour to be freed from serfdom and conditions bordering on serfdom.

4. Protection of women workers, and specially, adequate provision for leave during maternity period.

5. Children of school going age shall not be employed in mines and factories.

6. Peasants and workers shall have the right to form unions to protect their interests.

সেইসঙ্গে চাষীদের সম্বন্ধে বলা হল:

7. The system of land tenure and revenue and rent shall be reformed and an equitable adjustment made on the burden on agricultural land, immediately giving relief to the smaller peasantry, by a substantial reduction of agricultural rent and revenue now paid by them, and in case of uneconomic holdings, exempting them from rent, so long as necessary, with such relief as may be just and necessary to holders of small estates affected by such exemption or reduction in rent, and to the same end, imposing a graded tax on net incomes from land above a reasonable minimum.

* * *

16. Relief of agricultural indebtedness and control of usury—direct and indirect.

অর্থাৎ "জনসাধারণের উপর শোষণ বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের প্রকৃত অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা চাই। সেইজন্য কংগ্রেস স্থির করছেন যে কংগ্রেসের তরফে যে কোন শাসনতন্ত্রে সম্মতি দেওয়া হোক্ তার মধ্যে নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে, অথবা যাতে স্বরাজ সরকার তার ব্যবস্থা করতে পারেন সে সম্বন্ধে নির্দেশ থাকবে:—

২। (ক) আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন করতে হবে ন্যায়ের ভিত্তিতে, যাতে প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান ভদ্র হতে পারে।

(খ) রাষ্ট্র মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজন মত আইন করে, বা অন্য উপায়ে মজুরদের জন্য এমন মজুরীর হার নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভালভাবে জীবনধারণ করা যায়। তা ছাড়া, কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মজুরীর নির্দিষ্ট সময়, মালিক-শ্রমিক বিরোধ হলে ভাল সালিশী ব্যবস্থা এবং বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থতার জন্য বা বেকার থাকার সময় যাতে অর্থকষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মজুরদের অবস্থা যাতে ক্রীতদাসদের মত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। স্ত্রী-মজুরদের যথাযথ রক্ষাব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষত অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। পড়বার বয়সের ছেলেরা খনি বা ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত হবে না।

৬। চাষী ও মজুররা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে।

* * *

৭। বর্তমানে যে সমস্ত ভূমিরাজস্ব ও খাজনার ব্যবস্থা আছে তার সংস্কার করতে হবে। যাতে জমির উপর বেশী চাপ না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট চাষীদের সাহায্য ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য তাদের

দেয় খাজনা ও রাজস্ব কমাতে হবে। যেখানে তাদের জমির পরিমাণ অর্থনৈতিক হিসাবে লাভজনক নয়, সেখানে যতদিন প্রয়োজন খাজনা মাপ করতে হবে। যারা ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক তারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদেরও সাহায্য করতে হবে। সেজন্য একটা নির্দিষ্ট ন্যায়সংগত আয়ের উপর যাদের আয় তাদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে ট্যাক্স বসাতে হবে।

* * *

১৬। কৃষিঋণের লাঘব করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসীদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৯৩১—১৯৩৬

ইতিমধ্যে আরম্ভ হল বিশ্বব্যাপী মন্দা। আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনও চলছে, তার ফলে অত্যাচার উৎপীড়নেরও কমতি নেই। এইভাবে কিছু বছর কাটবার পর কংগ্রেস বে-আইনী আর রইল না, একটা রাজনৈতিক সন্ধি হল। সেই সময় এলো নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন নির্বাচন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন কংগ্রেস তার আদর্শ ঘোষণা করল, তেমনি নির্বাচনী ইস্তাহারে সে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমও ঘোষণা করল। নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হল ঃ

At the Karachi session of the Congress in 1931 the general Congress objective was defined in the Fundamental Rights resolution. That general definition still holds. The last five years of developing crisis have however necessitated a further consideration of the problems of poverty and unemployment and other economic problems. With a view to this the Lucknow Congress laid particuler stress on the fact that "the most important and urgent problem of the country is the appalling poverty, unemployment and indebtedness of the peasantry, fundamentally due to antiquated and repressive land tenure and revenue systems, and intensified in recent years by the great slump in prices of agricultural produce," and called upon the Provincial Congress Committees to frame full agrarian programmes.

অর্থাৎ "করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেসের মৌলিক উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সেকথা আজও সত্য। তার উপর গত পাঁচ বছর ধরে যে সংকট ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার প্রয়োজন হয়েছে। এইজন্য লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বলা হয়েছিল যে, এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে এদেশের সেকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে যে ভয়াবহ দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং ঋণ দেখা দিয়েছে তারই সমস্যা। তার উপর কৃষিজ দ্রব্যের দাম মন্দার সময়ে কমায় সেই সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এইজন্য কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কৃষি সম্বন্ধে নতুন করে কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলা হয়।

এই অনুসারে কংগ্রেস নতুন করে কৃষি সম্বন্ধে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীটী উদ্ধৃত করলাম ঃ

..AGRARIAN PROGRAMME: 1936
(Resolution 12, Lucknow Congress 1936)

1. Freedom of organisation of agricultural labourers and peasants.
2. Safeguarding of the interests of peasants where there are intermediaries between the State and themselves.
3. Just and fair relief of agricultural indebtedness including arrears of rent and revenue.
4. Emancipation of the peasants from feudal and semi-feudal levies.
5. Substantial reduction in respect of rent and revenue demands.
6. A just allotment of the State expenditure for the social, economic and cultural amenities of villages.
7. Protection against harassing restrictions on the utilization of local natural facilities for their domestic and agricultural needs.
8. Freedom from oppression and harassment at the hands of Government officials and landlords.
9. Fostering industries for relieving rural unemployment.

অর্থাৎ "১। কৃষি মজুরদের এবং চাষীদের সংগঠনের অধিকার। ২। যেখানে রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যে নানা মধ্যস্বত্ব আছে সেখানে চাষীদের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা। ৩। কৃষিঋণ এবং বাকী খাজনার ন্যায়সংগত মাপ। ৪। সামন্ত যুগোচিত নানারকম আবওয়াবের হাত হতে নিষ্কৃতি। ৫। খাজনার ও রাজস্বের হার ও পরিমাণ যথেষ্ট কমান। ৬। গ্রামগুলির সামাজিক আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধার জন্য সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যয়। ৭। স্থানীয় যেসব জিনিস পারিবারিক প্রয়োজনে বা কৃষির প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারা যায় সেসব জিনিষ ব্যবহারের অবাধ অধিকার চাই। ৮। সরকারী কর্মচারী ও জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। ৯। গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।"

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই সব কথারই পুনরাবৃত্তি ছিল। শিল্প-মজুরদের সম্বন্ধেও করাচী প্রস্তাবের পুনরুক্তি করা হয়।

এ পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস চাষী ও মজুরদের সম্বন্ধে জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে যে সমস্ত কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু এদেশে চালাবার কথা বলেছিলেন। বস্তুত এ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা হাতে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বেশী কথা বলে লাভ হয় না। কিন্তু তবু আদর্শের একটা দাম আছে। কংগ্রেস চাষী-মজুরদের সম্বন্ধে কি ভাবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলে তার ফল সমাজের স্তরে স্তরে দেখা যাবে।

কথা ও কাজ ঃ ১৯৩৭—১৯৩৯

ক্রমশ ক্রমশ অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করল। বিশ্বব্যাপী মন্দা ক্রমশ কেটে গিয়ে শুরু হল যুদ্ধোদ্যম এবং দাম-চড়া। সেই সঙ্গে এদেশেও তার ছায়া কিছু পড়ল। অন্যদিকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, কংগ্রেস নতুন চেহারায় আবির্ভূত হল। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস কেবল আন্দোলন করেছে এবং দাবী জানিয়েছে, কিন্তু এইবার তার পরীক্ষা শুরু হল। এই শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ, অথচ সে যে সমস্ত দাবী জানিয়েছে সে দাবী কাজে পরিণত করার দায়িত্ব সে অস্বীকার করতে পারে না। এ প্রায় উভয়সংকট। নেহরুর কথায় ঃ

It is an embarassing position for our Ministers. On the one hand, they have to face the inherent contradictions and obstructions which flow from the present Constitution; on the other, they are responsible to and have to satisfy all manner of people and Committees. ....Urgent and vital problems shout for solution, and the very spirit we have evoked in the masses demands such a solution.

জনসাধারণের মনে একটা বিরাট আশার সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা গেল যে,এই শাসনতন্ত্রে আমাদের ন্যূনতম দাবীর অতি অল্প অংশও পূরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে তখন প্রশ্ন জাগল ঃ এখন কর্তব্য কি। নেহরু স্পষ্টই লিখেছেন—

The major problems of poverty, unemployment, the land, industry, clamoured for solution, and yet they could not be solved within the framework of the existing constitution and economic structure. (Unity of India p. 107).

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে আলোচনা করা দরকার, মন্ত্রিসভাগুলি কতটুকু করতে পেরেছিলেন। মোটামুটি কয়েকটা কথার উল্লেখ করব। যেমন, বিহার সরকারের কথা ধরা যাক।[1] প্রথমে ভূমিসংক্রান্ত সংস্কার। "১৯১১ সালের পর হতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত খাজনা বৃদ্ধি হয়েছিল সে সমস্ত মকুব করা হয়। (খ) যেখানে জমি বালিচাপা পড়েছে বা অন্যভাবে নষ্ট হয়েছে অথবা জমিদার সেচের বন্দোবস্ত অবহেলা করায় জমি অব্যবহার্য হয়েছে সেখানে আংশিক বা সম্পূর্ণ খাজনা মকুব। (গ) যেখানে ফসলের দাম স্থায়ীভাবে পড়েছে সেখানে খাজনা কমি। (ঘ) অন্যত্রও খাজনা কমি ও উচিত খাজনা নির্ধারণ। (ঙ) প্রজার দেয় বাকী খাজনার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত

1. Vide Congress and the Masses by Dr. H. C. Mookherjee.

জমি বিক্রি হবে না। (চ) আবওয়াব আদায় ফৌজদারী আইনের অপরাধ হয়ে দাঁড়াল। (ছ) বখাস্ত জমি সম্বন্ধে ব্যবস্থা। যাতে জমি ফেরৎ পায় তার বন্দোবস্ত। তা ছাড়া কৃষি আয়কর স্থাপিত হল, এ ছাড়া চেষ্টা হল কুটীর-শিল্পের উন্নতির। অর্থ দিয়ে এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে কতকগুলি কুটীরশিল্প শেখানোর ব্যবস্থা হয়। জেলের কয়েদীরা যাতে মুক্তি পেলে সাধু উপায়ে জীবনধারণ করতে পারে সেজন্য তাদের নানারকম কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রায় ১১০০০ নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়, তাতে প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র ছিল।

সেইসঙ্গে আখের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং মদ্যপান নিবারণ চেষ্টা বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম চেষ্টা। ১৯৩৭ সালে বিহার চিনি কল নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে সমস্ত চিনি শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় এবং আখের সর্ব-নিম্ন দর বেঁধে দেওয়া হয়।

অন্যান্য কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীও অনুরূপ চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিঋণ লাঘবের জন্য আইন, মাদকতা বিসর্জন, ঋণ আদায় এক বৎসরের জন্য স্থগিত ইত্যাদি ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশে হয়েছিল।

কিন্তু এদিকে যেমন এইসব নানাধরণের প্রচেষ্টা চলছিল তেমনই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যাবলী যে বিরোধের সৃষ্টি করে নি তা নয়। মাদ্রাজে আইনের সাহায্যে জোর করে রাষ্ট্রভাষা প্রচার চেষ্টা তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তার চেয়েও প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল বোম্বায়ের ধর্মঘট-সালিশীর আইন। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী একটি আইন করতে চান যে, প্রথমে মৌখিক সালিশীর চেষ্টা না করে একেবারেই ধর্মঘট করা চলবে না। ধর্মঘটের অধিকারে এই হস্তক্ষেপ মজুররা কোনদিনই বরদাস্ত করেনি, এবারও করল না। কিন্তু এই নিয়ে ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে যায় এবং গুলী চলে। পণ্ডিত নেহরু এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

The Act as a whole is decidedly a good measure, but it has, according to my thinking, certain vital defects which effect the workers adversely and take away from the grace of the measure. The manner it was passed was also unfortunate.

এইভাবে কংগ্রেস কিছু কিছু নতুন হাওয়া আনতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। নেহরুই লিখেছেন ঃ

The only course open to us was to go as far as we could towards this solution—it was not very far—and to relieve somewhat the burdens on the masses, and at the same time to prepare ourselves to change that constitution and structure. A time was bound to come when we would have exhausted the potentialities of this constitution, and have to choose between a tame submission to it and a challenge to it. Both involved a crisis. ......As I have indicated, I was dissatisfied with the progress made by the Congress Ministries. It is true they had done good work, their record of achievement was impressive....Still I felt that progress was slow and their outlook was not what it should be. Nor was I satisfied with the approach of the Congress leadership to the problems that faced us. ....What alarmed me was a tendency to put down certain vital elements which were considered too advanced or which did not quite fit in with the prevailing outlook. (Unity of India pp 107-8).

আসল সমস্যা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথমবার ক্ষমতা হাতে পাবার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস যে সমস্ত কৃষি ও শিল্পের কর্মসূচী স্থির করেছিল তার মধ্যে খুব বৈপ্লবিক ধরণের কথাবার্তা না থাকলেও অন্যান্য দেশে যে সমস্ত প্রগতিমূলক আইন আছে তার অনেক ব্যবস্থাই তার মধ্যে ছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হবার পর তার মধ্যে অনেকগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের শাসন ইতিহাসে এ এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। এ সময়ে বহু প্রদেশে যা কাজ দুই তিন বৎসরে হয়েছে তা পূর্বে দীর্ঘকালে হয়নি—এমনকি সে সম্বন্ধে ভাববার সাহস বা ইচ্ছা কোনটিই তৎকালীন শাসন-কর্তাদের ছিল না। কিন্তু তবু পণ্ডিত নেহরুর আক্ষেপের সঙ্গে অনেকেই সায় দেবে। তার কারণ দুটি। প্রথমত, আমাদের সংস্কার আমরা দ্রুত চাই, আমাদের দেরী সইছে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের গতিবেগ সে হিসেবে আকাঙ্ক্ষিতরূপে দ্রুত ছিল না। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। কংগ্রেসের কার্যক্রমের পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সে দৃষ্টিভঙ্গিও যে যথেষ্ট রকম আধুনিক বা প্রগতিশীল তা বলে সকলে মনে করতেন না এবং যাঁরা সে কথা বলতেন তাঁরা অপ্রিয়ভাজন হতেন। নেহরু যেমন এ জিনিস পছন্দ করতে পারেন নি, তেমনি অনেকেই তা পারে নি।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণ কি? বাস্তবিকই কংগ্রেসের কার্যক্রম খুব বৈপ্লবিক রকমের ছিল না। কৃষি ও শিল্প উভয় দিকের কথাই ধরা যাক্। ১৯৩১ সালের করাচী প্রস্তাবে, ১৯৩৬ সালের কৃষি সম্বন্ধে কর্মসূচীতে, ১৯৩৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে, ১৯৩৭ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসে গৃহীত কৃষি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে—কোথায়ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা নেই। শিল্পের বেলাতেও তেমনি জোর করে বোম্বাইয়ের ধর্মঘট-আইন পাশ করা, বড় শিল্পের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনও কার্যক্রম না থাকা—ইত্যাদি কারণেও শ্রমিকদের মধ্যে সন্দেহ জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অথচ কংগ্রেস যে ধনিক-মালিকদের প্রতিষ্ঠান, তা নয়। লুই ফিশারের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী স্বয়ং সে সন্দেহের নিরসন করেছেন। তবু সাধারণত যেসব কর্ম-সূচী বৈপ্লবিক বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, তা কংগ্রেস গ্রহণ করতে বিলম্ব করেছে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মেলে আমাদের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগের মধ্যে। রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস যেমন ক্রমেই বিপ্লবী হয়ে উঠছে, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে তেমনটি হতে পারছে না, তার কারণ কংগ্রেস চায় স্বাধীনতা লাভের আগে শ্রেণী-সংগ্রাম যেন প্রবল না হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন,

So long as Congress is not in full power, it must adopt the line of ameliorative programme....to embark on a radical programme till that power is achieved is hazardous. It will introduce closs conflicts which would be harmful to the national movement in more ways than one.

অর্থাৎ "যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না আসছে, ততদিন শুধু ঠেকা দিয়ে যেতে হবে। তার আগে বৈপ্লবিক কর্ম-সূচী গ্রহণ করা বিপজ্জনক। তা হতে শ্রেণী-সংগ্রাম শুরু হবে এবং তাতে জাতীয় আন্দোলনের বিবিধ ক্ষতি হবে।"

এইখানেই আসল প্রশ্ন! এখন আমাদের ভিতরের ঝগড়া স্থগিত রেখে সকলে এক হয়ে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আসল প্রশ্ন স্বাধীনতা এবং যতদিন দেশের স্বাধীন বিকাশ না হবে, ততদিন কোন শ্রেণীরই সমস্যা মিটবে না। যাঁরা তথাকথিত কতকগুলি বৈপ্লবিক কথা আওড়ান, তাঁদের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, তাঁদের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে, এখন শ্রেণী সংঘর্ষই চলুক, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই স্থগিত থাক্। এটা যে চরম প্রতিবিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাগ-বাঁটোয়ারা নীতির নামান্তর, তা তাঁরা বোঝেন না বা বুঝে বোঝেন না। কাজেই তথাকথিত শ্রেণী-সংঘর্ষের নাম করে যাঁরা কংগ্রেসের কার্যসূচীকে আক্রমণ করেন, তাঁদের কথা ধরছি না। কিন্তু তাঁদের কথা বাদ দিলেও আমাদের সত্যই ভাববার সময় এসেছে যে, ইতিহাসের ধারায় আমরা সামাজিক বিকাশের যে স্তরে এসে পেঁৗছেছি, তাতে অ[illegible] বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়ায়ের জন্য ভিতরে শ্রেণী-সংগ্রাম চাপা দিয়ে রাখা চলবে কি না এইটিই এখন আসল সমস্যা।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের যে উক্তি উদ্ধৃত করে[illegible] তা হতে বোঝা যায়, তিনি স্বাধীনতা লাভে[illegible] পূর্বে কিছুতেই শ্রেণী-সংঘর্ষকে বড় হ[illegible] দিতে চান না। বলা বাহুল্য, আজকের দি[illegible]

এ মতে অনেকেই সায় দেবেন না, কারণ যেসব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী রয়েছে, তারাও সাম্রাজ্যবাদেরই স্তম্ভ। সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে হলে এদেরও আঘাত করতে হবে। পণ্ডিত নেহর্ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে ঠিক একমত নন; বাইরের লড়াইয়ের খাতিরে ভিতরের লড়াইকে উপেক্ষাও করা চলে না, অথচ সেইটেই যদি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠে বহিঃ-সংগ্রামকে নষ্ট করে তা-ও চান না—এই হল তাঁর সমস্যা। তিনি লিখেছেন,

In Europe, where class and other conflicts were acute, it had been possible for this co-operation on a common platform. In India these conflicts were still in their early stages and were completely overshadowed by the major conflict against imperialism. The obvious course for all anti-imperalistic forces to function together on the common platform of the Congress Socialism was a theoretical issue, except in so far as it affected the course of the struggle till political freedom and power were gained. অথচ, Liberty and democracy have no meaning without equality and equality cannot be established so long as the principal instrument of production are privately owned....I think India and the world will have to march in this direction of Socialism unless catastrophe brings ruin to the world.

সেইজন্য উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দরকার। সে সম্বন্ধে নেহর্র উক্তি হচ্ছেঃ

The march to Socialism may vary in different countries and the intermediate steps might not be the same. Nothing is so foolish as to imagine that exactly the same processes take place in different countries with varying backgrounds. India, even if she accepted this goal, would have to find her own way to it, for we have to avoid unnecessary sacrifice and the way of chaos, which may retard our progress for a generation. (Unity of India p. 118).

এই নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে নেহর্ যে কথাটা স্পষ্ট করে বলেন নি, হয়তো মনে ভেবেছেন, গান্ধীজী সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করেই তা বলেছেন। গান্ধীজী বলেন,

My ideal is equal distribution, but so far as I can see, it is not to be realised. I, therefore work for equitable distribution. (Young India 17.3.27).

অর্থাৎ "আমার আদর্শ হচ্ছে ধন-বণ্টনে সাম্য। কিন্তু তা কাজে হয়ে ওঠে না—সেইজন্য আমি ধন-বণ্টনে ন্যায়ের জন্য চেষ্টা করি।" গান্ধীজী বলেন,

The greatest obstacle in the path of non-violence is the presence in our midst of the indigenous interests that have sprung up from British rule, the interests of monied men, speculators, scrip holders, landholders, factory owners and the like. All these do not always realise that they are living on the blood of the masses, and when they do, they become as callous as the British principals, whose tools and agents they are. (Young India, 6.2.30).

অর্থাৎ,

"অহিংসার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যের এদেশী স্বার্থবাহের দল—বড়লোক, ফাটকাবাজ, অংশীদার, জমিদার ফ্যাক্টরী-মালিক প্রভৃতিরা। এরা সকলে সবসময় বোঝে না যে, এরা জনসাধারণের রক্ত চুষে বেঁচে আছে। কিন্তু যখন তা তারা বোঝে, তখন তারা তাদের বৃটিশ মনিবদের মতই উদাসীন হয়ে দাঁড়ায়।" সেইজন্য অহিংসা প্রকৃতভাবে পালন করতে গেলে এই সব শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। গান্ধীজীর কথায়,

No man could be actively non-violent and not rise against social injustice, no matter where it occured.

কিন্তু এই বিদ্রোহের চেহারাটা কি? রক্তপাত? তা নয়। গান্ধীজীর কথা হল এই যে, যারা অত্যাচারী শ্রেণী, তাদের শুধু মুখের কথায় স্বার্থত্যাগ করানো সম্ভব হবে না, সুতরাং অসহযোগ পদ্ধতি দরকার। তাঁর কথায়,

Not merely by virbal pursuation. I will concentrate on my means. My means are non-co-oparation. No person can amass wealth with the co-operation, willing or forced, of the people concerned. (Young India 26.11.31).

অর্থাৎ "শুধু মুখের কথা নয়। আমি আমার নিজের উপায় চালাতে চাই। সে উপায় হচ্ছে অসহযোগ। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহযোগিতা না থাকলে কেউ অর্থ জড় করতে পারে না।" সেই সঙ্গে গান্ধীজী আরও বলতে চান,

I do not teach the masses to regard the capitalists as their enemies, but I teach them that they are their own enemies (Young India 26.11.31).

এইজনাই তাঁর ন্যাসীবাদ। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—

If you will benefit the worker, the peasant and the factory-hand, can you avoid class-war?

তার উত্তরে তিনি বলেন,—

I can most decidedly, if only the people will follow the non-violent method. By the non-violent method, we seek not to destroy the capitalist, we seek to destroy capitalism. We invite the capitalist to regard himself as a trustee for those on whom he depends for the making, the retention and the increase of his capital. Nor need the worker wait for his conversion. If capital is power, so is work. Either power can be used destructively or creatively. Either is dependent on the other. Immediately the worker realises his strength, he is in a position to become a co-sharer with the capitalist instead of remaining his slave. (Young India 26.3.31).

অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম না করেও চাষী-মজুরদের স্বার্থ স্থাপিত করা যায়। তার জন্য অহিংস উপায় অবলম্বন করতে হবে। আমরা ধনতন্ত্রকে বিনাশ করতে চাই, কিন্তু বড়লোককে নয়। তারা নিজেদের ন্যাসী বলে মনে করবে। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয়, তাহলে ন্যাসীরা কি বিড়লা-টাটাদের মত উদার-হৃদয় দাতা ছাড়া অন্য কিছু নয়? তার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, তা নয়। ন্যাসীবাদ ঠিকমত বুঝলে দয়া-দাক্ষিণ্যের দরকার হবে না। সকলেই সমান হবে।

(It the trusteeship idea catches philanthropy, as we know it, will disappear. A trustee has no heir but the public. In a State built on the basis of non-violence, the commission of trustees will be regulated. (Harijan, 12.4.42).

এইভাবে ন্যাসীবাদের মূলকথা দাঁড়ায় এইঃ প্রত্যেক লোকের মধ্যে সহজাত পার্থক্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু সুবিধা-সুযোগের কোনও পার্থক্য থাকবে না। সহজাত পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে কোন শ্রেণী গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। বরং বুদ্ধির আধিক্য বা সহজাত ক্ষমতার প্রাচুর্য সমাজের সংস্কারে লাগবে। এইভাবে যে সমাজের অভ্যুদয় হবে, তার মধ্যে শ্রেণী-সহযোগিতা থাকবে না, থাকবে শ্রেণীর বিলোপ। এই বিলোপ সাধন হবে হিংসার মধ্য দিয়ে নয়, মনোভঙ্গী বদল করে।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীঃ জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ও অগ্রবাল পরিকল্পনা

কংগ্রেস যে গান্ধীজীর ন্যাসীবাদ গ্রহণ করেছে, তা নয়। কিন্তু সরকারীভাবে তা গ্রহণ না করলেও একথা ঠিক যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেস কার্যক্রমের পিছনে খুব বেশী আছে। শুধু যে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই-ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তা নয়, কংগ্রেস কর্ম-সূচীতেও এর পরিচয় মেলে।

এখন সেইজন্য এই প্রশ্ন হতে আরও বড় প্রশ্নে আসা যাক্। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে ভবিষ্যৎ ভারতের মোট অর্থনৈতিক কাঠামোটা কি? ন্যাসীবাদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শ্রেণীর বিলোপ-সাধন, এই হল তার একটা বড় খুঁটি: কিন্তু আর খুঁটিগুলি কি?

এ সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। মোটের উপর কয়েকটি প্রধান কথা আলোচনা করছি। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় আমাদের রাষ্ট্র-গঠনও যেমন গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীভূত হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ঝোঁকটা থাকা দরকার কেন্দ্রীকরণের দিকে নয়, বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। সেইজন্য আর্থিক জীবনের ভিত্তি হবে গ্রামীণ ব্যবস্থা ও সহজ উৎপাদন পদ্ধতি। অগ্রবালের পরিকল্পনায় সে কারণে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে কৃষির উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ সাধনকে। তার জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্র, ন্যূনতম আয়, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন, কৃষির উন্নতি, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও মৌজাওয়ারী ব্যবস্থার প্রবর্তন, কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে চাই কৃষির সঙ্গে যোগ আছে এমন শিল্প, যথা গো-পালন, ট্যানিং ও চামড়ার কাজ,

ফল-সংরক্ষণ ইত্যাদি। তারপর আসবে কুটীর-শিল্প। তারপর আসবে মৌলিক শিল্প, যথা দেশরক্ষার জন্য দরকারী শিল্প, ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদন, খনি ধাতু এবং বনজ শিল্প, কলকব্জা উৎপাদন, জাহাজ ইঞ্জিন মোটরগাড়ি এরোপ্লেন তৈরি, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এগুলি হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারপর থাকবে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্প, (Public Utilities), যথা যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যাংক ও বীমা প্রভৃতি। এখানেও যাতে গরীব চাষীর উপকার হয়, প্রধানত সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই সংগে ভাবতে হবে ব্যবসার কথা। যদি কতকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটই আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি হয়, তাহলে ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা খুবই কমে যাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যতদূর সম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণতার চেষ্টা করতে হবে।

কংগ্রেস এ দৃষ্টিভংগির দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ব্যাপারের বিভিন্ন দিকে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তা হতে কতকগুলি কথার আভাস পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস বহিঃরাষ্ট্র কর্তৃক ভারত শোষণের চিরকাল প্রতিবাদ করে এসেছে এবং ভবিষ্যৎ কালেও সে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী নয়। কিন্তু তা বলে একেবারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার প্রয়োজন নেই। আসল প্রয়োজন হচ্ছে, বাইরের আঘাতে আমাদের ভিতরের কাঠামো যাতে আঘাত না পায়। সেইজন্য আমরা দরকারমত বহিঃ-ব্যবসা-বাণিজ্য করব, কিন্তু তা হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রস্তাব হচ্ছে,

All import and export trade must be done under a system of licenses, which should be freely given. (1)

ভিতরে আমাদের আর্থিক চেহারা হবে কি রকম? গান্ধীজীর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম এ'দের বক্তব্য নয়। ২১।১২।১৯৩৮ সালে কমিটির সভাপতি প্রদত্ত মন্তব্যে দেখা যায়,

A question is raised, however, as to whether it is open to the Planning Committee to consider the establishment or encouragement of large scale industries, except such as may be considered key industries, in view of the general Congress policy, in regard to industry.......But there appears to be nothing in the Congress resolutions against the starting or encouragement of large scale industries, provided this does not conflict with the natural development of village industries .... Now that the Congress is, to some extent, identifying itself with the State it cannot ignore the question of establishing and encouraging large scale industries....It is clear, therefore, that not only is it open to this Committee and to the Planning Commission to consider the whole question of large scale industries in India, in all its aspects but that the Committee will be failing in its duty if it did not do so. There can be no Planning if such Planning does not include big industries. But in making our plans we have to remember the basic Congress policy of encouraging cottage industries." 2

অর্থাৎ যে পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্পের কথা নেই, সে পরিকল্পনা পরিকল্পনাই নয়। তবে বৃহৎ শিল্প এমনভাবে গড়তে হবে, যাতে কুটীরশিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি নষ্ট না হয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতে বড় যৌথ ব্যাংক থাকবে, ছোট ব্যাংকও থাকবে, লংনীর সুবিধার জন্য নিয়ন্ত্রিত স্টক-এক্সচেঞ্জ থাকবে, আর থাকবে চাষীদের উৎপন্নদ্রব্য ধরে রাখবার জন্য গুদামের ব্যবস্থা ও তার জন্য অর্থের বন্দোবস্ত।৩ শিল্পের মধ্যে ব্যবস্থা থাকবে, যাতে একচেটিয়া ব্যবসা না গড়ে ওঠে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনের সুবিধা হলে তা-ও কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে খানিকটা দিতে হবে। বন্দোবস্ত করতে হবে বৃহৎ শিল্পের, এবং তার মধ্যে যেগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে না, সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে। সেই সংগে মনে রাখতে হবে, আমাদের এই বিরাট দেশের অন্তর্বাণিজ্যও হবে বিরাট (তা কমে যাবে না), বরং বহির্বাণিজ্যের চেয়ে তার পরিমাণ বেশী-ই হবে। তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সংগে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য—এসবের পরিকল্পনা তো আছেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুটি পরিকল্পনায় একেবারে মৌলিক পার্থক্য আছে, দুয়ের দৃষ্টিভংগি এক নয়। একটির গোড়ার কথা হচ্ছে ন্যাসীবাদ, স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ পদ্ধতি। অপরটির গোড়ার কথা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণাধীন আধুনিক শিল্প ও ব্যবসার ব্যবস্থা। শিল্প ও ব্যবসা হবে যথাসম্ভব রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি। যেখানে তা হবে না, সেখানে তা থাকবে রাষ্ট্রের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু তা বলে বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা থাকবে না তা নয়, বরং সেটাকে এমন-ভাবে কাজে লাগাতে হবে, যাতে তার ফলটা সুফল হয়।

দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য ও ঐতিহাসিক পরিবেশ

কংগ্রেসের মধ্যে যে বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রচলিত, তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম। কংগ্রেস সেই সব চিন্তাধারাকে কাজে পরিণত করবার কি চেষ্টা করেছে এবং তা কতদূর সফল হয়েছে, তারও একটা হিসেব নেবার চেষ্টা করেছি। এখন দরকার সেগুলিকে বিচার করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা।

আমরা সম্প্রতি কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছি? আমাদের দেশে দ্রুত বিবর্তন ঘটছে। তার উপর সাধারণত সামাজিক বিবর্তন যে গতিতে হয়, মহাযুদ্ধ বা অনুরূপ সংকটের সময় সে বিবর্তনের গতিবেগ বহুগুণে বেড়ে যায়। এই মহাযুদ্ধেও তেমনই বিবর্তনের গতিবেগ অসম্ভব বেড়েছে। তার ফলে দুটি জিনিস দেখা দিয়েছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও ফুটে উঠেছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্য অধীন দেশগুলিকে চরম শোষণ করা হয়েছে। সেইজন্য অধীন দেশগুলিতেও দেখা দিয়েছে নবজাগরণ, জনগণ অধীর হয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ আঘাত করবার জন্যে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন সাম্রাজ্য-বাদ ও জনশক্তির মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে, তেমনই জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের মধ্যেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন হল এই যে, আমাদের দেশে এতদিনে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে দু-চারজন বড় বড় ধনিক-বণিক ছিলেন, কিন্তু পূর্ণাংগ ধনতন্ত্র ছিল না। বাস্তবিক সাম্রাজ্য-বাদ চায় না যে, অধীন দেশগুলিতে ধনতন্ত্র গড়ে উঠুক। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, যুদ্ধের তাগিদে, এদেশে পূর্ণাংগ না হলেও অন্তত ধনতন্ত্র বেশ কিছুটা প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। এদেশী ধনতন্ত্রের সংগে এখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের রফা হতে চলেছে, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল-টাটা-বিড়লা-ন্যাফিল্ড চুক্তি তার নিদর্শন।

বাস্তবিক এ ঘটতে বাধ্য। জগৎ-ইতিহাসের আলোচনা করতে গিয়ে স্টালিন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'লেনিনিজম্'-এ বলেছেন যে, ইতিহাসের ধারায় দেখা যায় যে, অধীন দেশগুলির বিকাশের প্রথম অবস্থায় দেশী বুর্জোয়া সমাজেরও খানিকটা বৈপ্লবিক সম্ভাবনা থাকে, কেননা অন্যান্য শ্রেণীর মত তারাও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে সমান লাঞ্ছিত। কিন্তু যত দিন কাটে এবং অধীন দেশের ধনতন্ত্র পুষ্ট হয়, তখন বিদেশী ধনতন্ত্রের সংগে তার একটা রফা হয়ে যায় এবং তার সমস্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায়, বাইরের সাম্রাজ্যবাদের সংগে যেমন লড়াই চালাতে হবে, তেমনই দেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাতে হবে, কারণ ও দুটি একই জিনিসের দুই দিক।

আজ ইংরেজ যুদ্ধক্লান্ত এবং হৃতসর্বস্ব। তার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। যেসব দেশ ইংলন্ডের দেনদার ছিল, তাহারাই আজ তার

1. **Handbook of National Planning Committee** (Vora & Co., Bombay). ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। ঐ ১০-১১ পৃষ্ঠা।
৩। ঐ ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা।

পাওনাদার। কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলি শিল্পে এত অগ্রসর হয়েছে যে তাদের পণ্য-সম্ভার এখন তারাই উৎপাদন করতে পারবে, সেখানে ইংলণ্ডের বাজার নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যত্রও আমেরিকা সমস্ত বাজার দখল করতে চায়। অথচ এই আসন্ন বেকার-সমস্যা যদি বন্ধ করে পূর্ণ-নিয়োগ নীতি (Full Employment) ইংলণ্ডে চালাতে হয় তাহলে তার পণ্য বিক্রি হওয়া চাই। সেইজন্যই যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ইংলণ্ডে জোর রপ্তানি চালানোর এত জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষও হাতছাড়া হলে সমূহ বিপদ। সেই জন্য ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা রফা করা দরকার। পূর্বে ভারতে শিল্পবিস্তার একেবারেই করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই—তাছাড়া এদেশী ধনতন্ত্রকে কিছু না ছেড়ে দিলে তারা জনগণের সঙ্গে যোগ দিলে সমূহ বিপদ। সেইজন্যই আজ ইংরেজের নীতি হচ্ছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যদি রফা করতেই হয়, সে রফা হোক ভারতীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে—তাতে ভারতীয় জনশক্তির বিরুদ্ধে সহায় পাওয়া যাবে ভারতীয় ধনতন্ত্রকে এবং তাহলে ভারতীয় বাজার আরও কিছুকাল ধরে রাখা যাবে।

সুতরাং আমরা ইতিহাসের যে অধ্যায় শুরু করছি, তার প্রধান কথা হল দুটি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ আঘাত হানবার দিন এগিয়ে আসছে, তেমনই এদেশেও আর শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। একথা আর কোনক্রমেই বলা চলবে না যে, যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা না আসে, ততদিন পর্যন্ত সকল শ্রেণীর স্বার্থ এক। বরং স্বীকার করতে হবে যে, স্বাধীনতা পাবার জন্যই এই শ্রেণীসঙ্ঘর্ষকে স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ এদেশের ধনতন্ত্র যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের চর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে দূর করতে হলে তার অনুচরদেরও নিশ্চিহ্ন করতেই হবে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি উপায়ে তা সম্ভব হবে? পূর্বেই বলেছি, কংগ্রেসে এ সম্বন্ধে নানা মত আছে। ন্যাসীবাদে বিশ্বাস করলে বলতে হবে, দেশী ধনতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হবে কোনও সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা নয়, আপনা-আপনিই, হৃদয়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কংগ্রেসের পরিকল্পনায় বিশ্বাস করলে বলতে হবে, হৃদয়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নয়, জনগণের অধিকৃত রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বে দেশী ধনতন্ত্র থাকবে, কিন্তু নির্বিষ অবস্থায় থাকবে।

এখন এগুলি বিচার করা দরকার।

প্রথমত, ন্যাসীবাদের কথা। ন্যাসীবাদের তত্ত্ব যদি ভালভাবে আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই তত্ত্ব একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি। গান্ধীজী অবশ্য একে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ রাখতে চাননি, এটাকে প্রচার করেছেন তাঁর সমস্ত জীবনদর্শন দিয়ে, চেষ্টা করেছেন এটাকে একটি সর্বকালিক সর্বজনীন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করে যাওয়া কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, মহামানবের পক্ষে আরও সম্ভব নয়, কেননা তাঁদের দৃষ্টি বর্তমানকে অতিক্রম করে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যাতায়াত করে। সেইজন্য দেখা দরকার, কোন্ পরিবেশে এই ন্যাসীবাদ প্রচারিত হয়েছে। এ কথা তো ঐতিহাসিক সত্য যে, ধনতন্ত্রের বিকাশের এমন এক যুগ থাকে যেসময় সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে অত্যাচারিত দেশী ধনতন্ত্রও বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকে। সেসময় কোনও আন্দোলন করতে হলে সংগ্রামী দলের মধ্যে দেশী ধনতন্ত্রকেও টেনে নেওয়া চলে, শুধু বিদেশী-বিতাড়নের যোগসূত্রেই সমস্ত শ্রেণীকে একসঙ্গে বাঁধা চলে। ন্যাসীবাদ হচ্ছে ইতিহাসের এই অবস্থার কথা। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের সে পর্যায় অতিক্রম করে এসে থাকি তাহলে আর ন্যাসীবাদ বজায় রাখা সম্ভব নয়। যদি ধনতন্ত্র তার সমস্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনা হারিয়ে অপর পক্ষে যোগ দেয় তাহলে আর তাদের মন-বদলের মরীচিকার আশায় বসে থাকা চলে না, তখন শ্রেণীসংঘর্ষকে অস্বীকার করা মানে প্রতিক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ডি-কলোনিজেশন' তত্ত্ব নিয়ে সময় সময় আলোচনা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলতে চান যে, যে-সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জগৎময় 'কলোনি' স্থাপনা করে এতদিন তাদের শোষণ করে আসছে এখন তারা ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে আসছে এবং তাদের কলোনিগুলিকে আপনা-আপনিই ছেড়ে দেবে। কিন্তু একথা যে কতদূর অসত্য তার প্রমাণ তো এইবারকার মহাযুদ্ধেও পাওয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে প্রাণ বলি দিতে হল, শোষণ এতই তীব্র হয়ে উঠল। দেখা গেল, গলিতনখদন্ত হলেও ব্যাঘ্রের কখনই আমিষে অরুচি হয় না। এক্ষেত্রেও গান্ধীজীর বৃহৎ মানবিকতা যেমন বার বার আঘাত পেয়েছে, ইংরেজদের হৃদয়-পরিবর্তন কিছুতেই হয়নি, সেইজন্য বার বার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হয়েছে, তেমনই এদিকেও একথা সত্য যে, যত দিন যাবে এবং আমাদের ধনতন্ত্র যত পুষ্ট হয়ে যাবে ততই তাদের আর দলে টেনে রাখা যাবে না এবং তাদের কীর্তিকলাপকেও স্বীকার করে নেওয়া চলবে না। যে পরিবেশে সকলে এক সঙ্গে থাকা সম্ভব সে পরিবেশ অতীত হয়ে গেল। এখন নতুন পরিবেশে নতুন করে ভাবতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি হৃদয়-বদল সম্ভব না হয়, জাতীয়তাক্ষেত্রেই বা তা হবে কেন?

এইটে উপলব্ধি করেই কংগ্রেস হৃদয়-পরিবর্তনের কথায় ভরসা না রেখে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিয়েছে। তা যদি হয় তাহলে ন্যাসীবাদের কথা বাদ দিয়ে এই নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ কি সেটাই বিচার্য।

এর খুটিনাটি এখানে আলোচ্য নয়—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করেছি। তা হতে দেখা যায়, তাঁরা বড় বড় শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কথা বলেছেন। এবারকার নির্বাচনী ইস্তাহার পড়ে দেখলেও দেখা যাবে তার মধ্যে কয়েকটি কথা এইবার সর্বপ্রথম স্বীকৃত হল। যেমন, সকলের সমান সুযোগ সুবিধার অঙ্গীকার।

(Equal rights and opportunities for every citizen of India, man or woman.)

সেই সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে আমাদের আর্থিক সমস্যার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার।

(The country has not only been kept under subjection and humiliated, but has also suffered economic, social, cultural and spiritual degradation. During the years of war this process of exploitation....reached a new height leading to terrible famine and wide-spread misery. There is no way to solving any of these urgent problems except through freedom and independence. The content of political freedom must be both economic and social).

রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতা সমেত না হলে অর্থহীন একথাটা এর পূর্বে এত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি। সেই সঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ এইবার প্রথম নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষিত হল, মৌলিক ব্যবসাগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে তা-ও এই প্রথমবার নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লিখিত হল। তা ছাড়া, আগে পণ্ডিত নেহরু বলতেন, প্রথমে স্বাধীনতা পরে 'সোস্যালিজম্', এখন তিনি বলছেন ও দুটি একই সঙ্গে চলবে, আমাদের কর্মসূচী হবে Progressive Socialism.

কিন্তু আমরা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি তাতে এ সমস্ত কথা যথেষ্ট নয়। দুটি কারণ আছে। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব যতই ফুটে উঠছে ততই আমাদের সংগ্রামের শেষ পর্ব এগিয়ে আসছে। সুতরাং আমাদের ইতস্তত করার সময় নেই, দৃঢ়চিত্তে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এইজন্য সম্প্রতি কথা উঠেছে যে কংগ্রেস আর প্ল্যাটফর্ম নয়, পার্টি। অর্থাৎ কংগ্রেস শুধু সকল রকম দলের মত প্রকাশের একটা আসর নয়, তা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি। যত দিন যাবে ততই সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধতার প্রয়োজন আরও বেশী অনুভূত হবে। কিন্তু কংগ্রেস যদি আর প্ল্যাটফর্ম না থেকে পার্টিতে পরিণত হয়, তাহলে তাকেও কতকগুলি বিষয়ে অবহিত হতে হবে। পার্টি কি ধরণের হওয়া উচিত? লেনিন বলেছিলেন যে,—
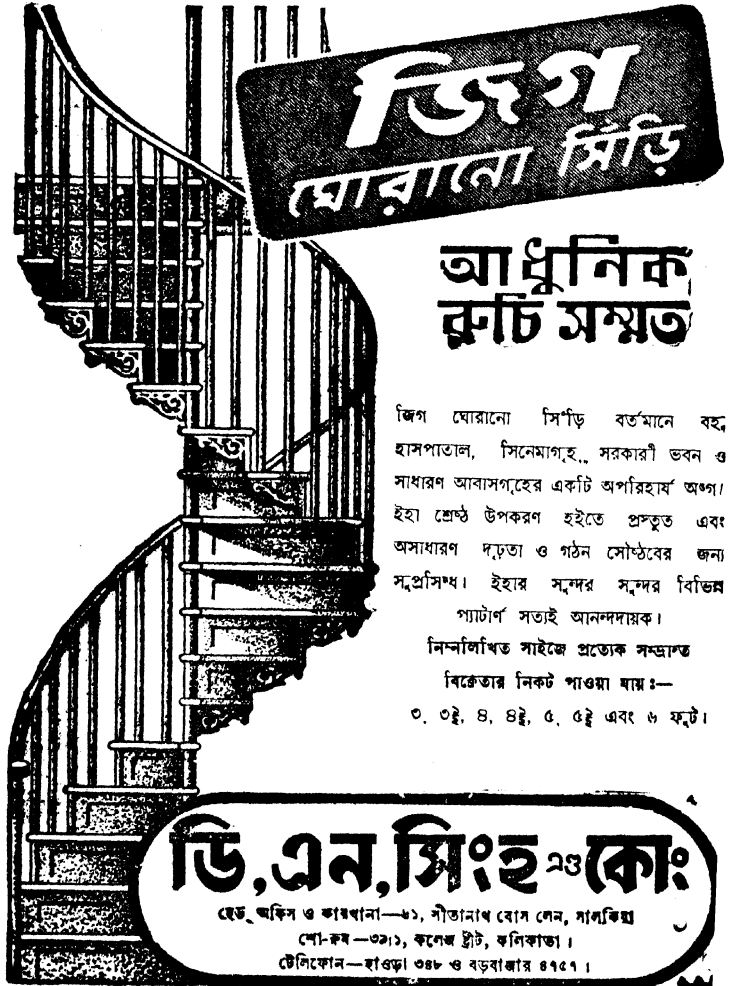
The role of vanguard can be fulfilled only by a party that is guided by the most advanced theory, কারণ, without a revolutionary theory there can be no revolutionary movement (Lenin: "Select works," Vol. II).

আজ যদি কংগ্রেসকেই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তার আদর্শ হওয়া উচিত সর্বোচ্চ,—সর্বনিম্ন নয়। তা না হলে সে পার্টি হিসেবে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে না।

এই প্রয়োজনীয়তার দিক্ থেকে বিচার করলে কংগ্রেস আদর্শ এখনও বহুদূর অগ্রসর হওয়া দরকার, তা অনেক পিছিয়ে আছে। এখন পর্যন্ত যে সব কথা শোনা যাচ্ছে তা অতি সামান্য সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক মোটেই নয়। তার উপর আবার দেশময় কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলী হওয়ায় দেশে একটা বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে। একথা স্বীকার করা ভালো যে, ১৯৩৭ সালেও কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব আমলাতন্ত্রের হাওয়া কাটাতে পারলেও জনগণের আশা পূরণ করতে পারে নি। তার চেয়ে এখন আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি। একদিকে শুরু হয়েছে জনশক্তির অভিযান, অন্যদিকে ঘনিয়ে আসছে বিপ্লবের দিন—সেইজন্য আমাদের প্রস্তুত হবার সময় এসেছে। অবস্থা এতই বদলেছে যে, এবার জন-আশা পূরণ করতে হলে ১৯৩৭ সালের চেয়ে হাজার গুণ বৈপ্লবিক কর্মসূচী দরকার এবং তা কাজে পরিণত করা দরকার। কংগ্রেসকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের সেইজন্য এখন একটি সুচিন্তিত ও বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী দরকার

তেরো

আদিত্য যখন রংঝোরা বাগানে এসে দাঁড়ালো, তখন সেখানে একেবারে প্রলয় কাণ্ড চলছে।

রবার্টসের বিকৃত মৃতদেহটা জলের থেকে তুলে আনা হয়েছে পরদিন সকালে। খবর গেছে থানায়—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে পুলিস। ব্যাপারটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে একে ফেলা চলবে না, এর ভেতরে বিরাট একটা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। শহরের পথেঘাটে, মিলে ফ্যাক্টরীতে দিনের পর দিন যে আগুন অলক্ষ্যে ধুমায়িত হয়ে উঠছে—এ তারই একটি বহিস্ফুলিঙ্গ। সুনিশ্চিত এবং আশংকাজনক।

রবার্টসকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু শুধু রবার্টসকে নয়—এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটা প্রবল ও প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। অপমানিত মানুষের রক্তে রক্তে সাড়া উঠেছে—শ্রেণী-সংঘাতের সাড়া। বিপ্লবের লাল ঘোড়া দিগন্তের আকাশে ঝোড়ো মেঘের কেশর ফুলিয়েছে। এখন থেকে এর প্রতিবিধান না করলে কল্পনাতীত পরিণাম অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে বর্মা ফ্রন্টে দুঃসংবাদ। রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। মান্দালয়ের ওপরে চলেছে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। মিত্রবাহিনী এক পা এক পা করে "শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ" করছে আসামের দিকে। ব্রিটিশ সিংহ তার ঔপনিবেশিক সুপ্তি-গুহা থেকে চমকে জেগে দেখতে পাচ্ছে সামনে বন্দুকের উদ্যত নল!

সুতরাং ঘরের বিদ্রোহ আগে দমন করা দরকার। বাইরের আঘাতে যখন চারদিক টলমল করছে, তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতটাও নড়ে ওঠে, তখন পরিণামে ইংলিস-চ্যানেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উইনস্টন চার্চিলের মেঘমন্দ্র আশ্বাস-বাণীতেও নয়।

রবার্টসের হত্যার মধ্যে এতগুলি সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

চারদিকে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে ইয়োরোপীয়ান প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন। এই যদি সূত্রপাত হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি সত্যি সত্যিই লালবাতি জ্বালিয়ে লিকুইডেসনে গেল নাকি? ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়ানদের নিশ্চিন্ত ব্যবসা বাণিজ্যকেও কি এমনি করেই লালবাতি জ্বালাতে হবে? এর মধ্যে নীল বিদ্রোহের পূর্বাভাস লুকিয়ে নেই তো?

অতএব থানা আর সদর উজাড় করে পুলিস এসে পড়েছে।

ইতিমধ্যে আদিত্য এসে পেঁৗছেছে রংঝোরা বাগানের দরজায়। একরাত একবেলা অসহ্য ট্রেনের কষ্ট গেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি। তার ওপর তিন মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে—ক্লান্তিতে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছে আদিত্যের।

কিন্তু বাগানের গেটের সামনেই জমেছে লাল-পাগড়ী। সেই সঙ্গে একদল কুলি। শহরের ইয়োরোপীয়ান ডি-এস্-পি একখানা টেবিল পেতে নিয়ে জেরা করছেন তাদের। যেটা বাঙলাতে ভাল আসছে না, সেটার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন দারোগা এবং যাদব-ডাক্তার। বাগানের অন্যান্য বাবুদের চাইতে পুলিসের সহযোগিতায় যাদব ডাক্তারই বেশী অগ্রণী। রবার্টস তাকে লাথি মেরেছিল—সে ব্যথাটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। তাই বলে যাদব ডাক্তার অকৃতজ্ঞ নয়। রবার্টসের অনেক প্রসাদ পেয়েছে সে—হুইস্কির সে সব ঋণ যদি সে বেমালুম ভুলে বসে থাকে তাহলে অধর্ম হবে যে। পরকালে সে কি বলে জবাবদিহি করবে!

ডি-এস্-পি'র চোখে আগুন জ্বলছে। টেবিলের ওপরে তিনি টোটাভরা রিভলবারটা খুলে নামিয়ে রেখেছেন। ওর একটা মনস্তাত্ত্বিক সার্থকতা আছে। ইংরেজ রাজত্ব যে এখনো বানচাল হয়ে যায়নি, ওটা তারই নিদর্শন। দরকার হলে ডি-এস-পি এই মুহূর্তে ওটাকে হাতে তুলে নিতে পারেন—সব কটা ব্লাডি-নিগারকে একেবারে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু ডি-এস-পি বলেছেন, তিনি অত্যন্ত সদাশয় লোক বলেই তা করবেন না। ইংরেজ সরকার বিচার করে—প্রতিহিংসা নেয় না। সুতরাং কুলিরা যদি অপরাধীদের খবরটা দিয়ে দেয়, তাহলেই সমস্ত জঞ্জাল মিটে যাবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে তাদের অদৃষ্টে যে বিস্তর দুঃখ আছে, এ নিশ্চিত।

এই সময়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়ালো আদিত্য। জিজ্ঞাসা করলে, এই কি রংঝোরা বাগান? ডি-এস-পি উঠে দাঁড়ালেন বিদ্যুৎবেগে। আদিত্যের সমস্ত অবয়বের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা দেখে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে, লোকটি বিপজ্জনক। বজ্রকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইজ দ্যাট?

মুহূর্তে আদিত্য বুঝতে পারল, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

—এটা কি রংঝোরা বাগান?

—হ্যাঁ—তুমি কি চাও?

—অনিমেষ ব্যানার্জিকে।

—অনিমেষ ব্যানার্জি!—ডি-এস-পি বল্লেন, অল্ রাইট। আই হ্যাভ্ এ ক্লু। তোমার নাম কী?

—আদিত্য রায়।

—অল্ রাইট। মিস্টার আদিত্য রায়, আই অ্যারেস্ট ইউ।

অপরিসীম বিস্ময়ে আদিত্য বললে, অ্যারেস্ট? কেন?

—এই বাগানের ম্যানেজার লিওপোল্ড রবার্টসের হত্যা সম্পর্কে।

ভয় পেল না আদিত্য, হতবুদ্ধি হয়ে গেল না। শুধু অসীম বিস্ময়ভরে সে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * * *

আদিত্য বাগানে পেঁৗছেছে এই খবরটা যখন ধরমবীর পেল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আদিত্যকে গ্রেপ্তার করে ইন্সপেকসন বাঙলোতে রাখা হয়েছে—তাকে যথাসময়ে সদরে চালান করে দেওয়া হবে।

অসহায়ভাবে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল ধরমবীর। একটু আগে যদি জানতে পারত তাহলে কখনও এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পেত না। হয় নিজে স্টেশনে যেত অথবা লোক রাখত—সোজা আদিত্যকে নিয়ে আসত তার গোলায়। কিন্তু আদিত্য যে এমন হঠাৎ বাগানে এসে পেঁৗছে যাবে, এ কথাই বা কে কল্পনা করতে পেরেছিল।

শুনে অনিমেষের মুখ পাংশু হয়ে গেল তিনদিন পরে আজ সে বিছানার ওপরে উঠে বসতে পেরেছে। খবরটা যখন এসে পেঁৗছুল তখন একটা কাপে করে সে দুধ খাচ্ছিল

খবর পাওয়া মাত্র হাত থেকে কাপটা ঝন্ ঝন্ করে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, কাঠের মেজে দিয়ে গড়িয়ে চলল দুধের স্রোত।

অনিমেষ বললে, আমি যাব।

ধরমবীর কাছে এসে দাঁড়ালো। একটা হাত রাখলে অনিমেষের কাঁধে। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

—বাগানে।

—কেন?

—আদিত্যদা'কে যে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে—

—তুমি গিয়ে কী করবে?

—ওদের বুঝিয়ে বলব যে—

ধরমবীর সস্নেহে হাসলঃ ব্যানার্জি বাবু, দেশের কাজ যা-ই করো, তুমি এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ। পুলিসকে তুমি কী বোঝাবে? যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমাকেও গ্রেপ্তার করবে—কী লাভ হবে বলতে পারো।

লাভ! সত্যিই কোনো লাভ হবে না। কিন্তু শুধু কী লাভালাভের কথাটাই ভাবছে অনিমেষ? আদিত্য। উজ্জ্বল নীল চোখ। একটু কুঁজো ধরণের মানুষ, অতিরিক্ত পড়াশোনা করার জন্যেই বোধ হয় ঘাড়টা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়ছে তার। মাথার বিশৃঙ্খল ঝাঁকড়া চুলগুলো কাঁধ বেয়ে প্রায় পিঠের ওপরে নেমে এসেছে। গায়ের খদ্দরের জামাটা ছোট বোন পিংড়ীর এক্সপেরিমেণ্টের একটা অপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু এই সমস্ত আপাত-বৈসাদৃশ্যের আবরণের নীচে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে শানানো তলোয়ার। সেই তলোয়ারের আঘাতেই একদিন কবি অনিমেষের রজনীগন্ধার স্বপ্ন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল—সেই তলোয়ারের ঝলকেই একদিন পথ দেখতে পেয়েছিল অনিমেষ।

আজ আদিতকে—সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আদিত্যকে খুনের অপরাধে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ অনিমেষের কিছু করবার উপায় নেই—কিছুই না।

অনিমেষ ক্ষীণস্বরে বললে, তা হলে?

ধরমবীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বললে, একটা কিছু হবেই। এই কুলি ব্যাটারা পচাইয়ের নেশায় সাহেবকে খুন করে যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—তাতে—

ধরমবীর থেমে গেল। কুলি লাইনের দিক থেকে প্রবল আর্তনাদ আসছে। খুব সম্ভব আসামীর হদিস পাওয়ার জন্যে ওখানে কিছু কড়া ওষুধ প্রয়োগ করেছে পুলিস।

ধরমবীর বললে, লোকগুলোকে মারাপিট করছে বোধ হয়।

অনিমেষ বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠলঃ আদিত্যদা'কে না তো?

—না—অতটা নয় বোধ হয়। আচ্ছা—আমি দেখছি। তুমি চুপ করে বসে থাকো ব্যানার্জি-বাবু, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। যা করবার আমরাই করব।

অনিমেষ চুপ করেই বসে রইল। কিছু ভাবতে পারছে না। চিন্তায় দুর্ভাবনায় বোঁ বোঁ করে ঘুরছে দুর্বল মস্তিষ্কটা। আদিত্যদা'কে গ্রেপ্তার করেছে, অথচ তার কিছুই করবার নেই।

রবার্টসকে খুন করেছে কুলিরা। কারো মতামতের অপেক্ষা করেনি, কারো কাছ থেকে নির্দেশ নেয়নি। বাঘ-শিকারকরা সাঁওতালী রক্তে যখন আগুন ধরেছে, তখন সে আদিম প্রবৃত্তিকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি—প্রতিহিংসা নিয়েছে। কিন্তু এ পথ নয়। রবার্টসের মতো একজনকে হত্যা করে অত্যাচারের মূল উপড়ে ফেলা যায় না—অত্যাচারকে সুযোগ দেওয়াই হয় মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব আন্দোলনের পেছনেই এ ইতিহাস আছে। একটি হত্যার ছুতোকে অবলম্বন করে বহুকে হত্যা করবার বহু-বাঞ্ছিত অবকাশ পায়, সুবিধে পায় বিপ্লবকে সমূলে উৎপাটন করবার। কুলিরা সেই ভুলই করে বসেছে। এ ভুলের জন্যে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অনেক মূল্য দিতে হবে। আদিত্যকে দিয়েই তার সূত্রপাত।

কারা খুন করেছে? তাদের নাম অনিমেষ জানে। আদিত্যকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় তাদের নামগুলো গিয়ে পুলিসকে বলে দেওয়া। কিন্তু সে রকম একটা কথা বিকৃত-মস্তিষ্কেও কল্পনা করা চলে না।

তা হলে উপায়? আদিত্য। তাদের সংগঠনের প্রাণস্বরূপ। শুধু প্রাণই নয়—তাদের মধ্যে আদিত্য নেই একথা ভাবতে গেলেও একান্তভাবে দুর্বল আর অসহায় বলে মনে হয় নিজেদের, অথচ কিছু করতে পারছে না অনিমেষ, গিয়ে একবার দেখা করে আসবে সে উপায়ও তার নেই।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল ধরমবীর।

—ব্যানার্জিবাবু, ভারী গোলমাল শুনে এলাম।

—কী হয়েছে?

পুলিসে খবর পেয়েছে তুমিই এ সব সাঁওতালদের দিয়ে করিয়েছো, আর আমার গোলায় লুকিয়ে আছো। ওরা তোমাকে ধরতে আসছে।

—বেশ, ধরুক—

—না।—ধরমবীরের চোখ জ্বলে উঠলঃ যতক্ষণ জান আছে তা হতে দেব না।

—কী করবে?

—যা করব তা শোনো। আমার ভালো গাড়ি জোতা আছে—তুমি এখুনি স্টেশনে চলে যাও। গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে দশটার ট্রেনটা ঠিক ধরতে পারবে।

—কিন্তু ওরাও তো পেছনে ছুটতে পারবে—শহরে টেলিগ্রাম করতে পারবে—

—কিছুই করতে পারবে না—ধরমবীরের কণ্ঠস্বরে যেন আগ্নেয়গিরি আভাষিত হয়ে উঠলঃ মহাত্মাজীর হুকুমে একদিন পথে নেমেছিলাম। আজ দেখছি মানুষ এত ছোট যে, মহাত্মাজীকে বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তাদের মতো ছোট হয়ে গিয়েই আমার কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করব।

অনিমেষ সবিস্ময়ে বললে, তার মানে?

—সব কথার মানে বুঝতে চেয়ো না ব্যানার্জিবাবু। কিন্তু তুমি আর দেরী কোরো না—পালাও

—তারপর?

—আমরা আছি।

অনিমেষ ধরমবীরের মুখের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নেই ধরমবীর। খুব খানিকটা কড়া মদের নেশা করলে চোখ মুখের অবস্থা যে রকম হয়—ধরমবীরকে দেখলে অনেকটা তাই মনে হতে পারে। অনিমেষের ভয় করতে লাগল, শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনাটা।

—তুমি কী করতে চাও জানতে না পারলে আমি এখান থেকে যাবো না।

—কী ছেলেমানুষি করছো ব্যানার্জিবাবু—এবার যেন দস্তুরমতো একটা ধমক দিলে ধরমবীরঃ তোমার শরীর এখনো সারে নি। তুমি রওনা হয়ে যাও—তোমার গাড়ি তৈরী।

অনিমেষ আর কথা বলতে পারল না। কথা বলবার কিছু তার ছিলও না।

আধ ঘণ্টা পরেই ধরমবীরের কাঠ গোলায় পুলিসবাহিনী এসে দর্শন দিলে। ধরমবীর যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করলে ডি এস পি সাহেবকে, আদর করে বসতে দিলে। তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হুজুরের আদেশ কী?

হুজুর সংক্ষেপে জবাব দিলেনঃ সেই ব্লাডি ব্যানার্জিকে বার করে দাও।

—কে ব্লাডি ব্যানার্জি?

হুজুর গর্জন করে উঠলেন।

—চালাকি কোরো না। হোয়ার ইজ ব্যানার্জি?

—আমি জানি না।

সাহেব বললেন, বলবে না?

—আমি জানি না।

—তা হলে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ধরমবীর উঠে দাঁড়ালো: নো, ইউ ওণ্ট্ অ্যারেস্ট্ মি।—এব হ্যাঁচকা টানে ঘরের কাঠের দেওয়ালটা থেকে বন্দুকটা নামিয়ে আনলঃ আই নো হাউ টু ডিফেণ্ড মাই লিগ্যাল রাইটস্—

প্রায় মিনিটখানেক সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এমন একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে কমই ঘটেছে। তারপরে সগর্জনে বললেন, অ্যারেস্ট হিম—স্ন্যাচ দি গান!

বন্দুক উদ্যত রেখে ধরমবীর বললে, প্রসিড ওয়ান স্টেপ, অ্যান্ড—

সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকালো। কী করা যাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত একটা পাথরের মতো স্তব্ধতা চারদিকে বিরাজ করতে লাগল।

কিন্তু ধরমবীর কাউকে কিছু ভাববার সময় দিলে না। অপ্রস্তুত আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে একটা লাফ দিয়ে সোজা সে কাঠের বারান্দা থেকে মাটিতে নেমে পড়ল, তারপর দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

এতক্ষণে সাহেবের চমক ভাঙল।

—হাঁ করে সব দেখছ কি? ইউ ফুলস্! ফলো হিম—অ্যারেস্ট!

ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিসবাহিনী ছুটল জঙ্গলের দিকে—তন্ন তন্ন করে ধরমবীরকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় ধরমবীর? ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ভেতর কোন্ নিভৃত আশ্রয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—কে বলবে?

ততক্ষণে ঝোরার পাশে নিবিড় একটা ঝোপের মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছে ধরমবীর। ওরা খুঁজুক—খুঁজে বেড়াক ওকে। ধরমবীর জানে পুলিস জীবনে তাকে ধরতে পারবে না—আজকেই রাতারাতি চেনা পথ দিয়ে সে সোজা চলে যেতে পারবে সিকিমে। ঠিক এই রকম একটা ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিল বলেই আগে থেকে নগদ টাকাগুলো এনে সে পেট-কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ডুয়ার্সে কাঠের কারবার তার গেল; কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নেই। বরাবর নিজের ভাগ্য নিজের হাতে সে গড়ে তুলেছে—এবারেও সে পারবে—এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

একটা ভালো ব্যবসা গেল, অনেকগুলো টাকাও গেল। ডান্ডী সত্যাগ্রহের সময় এর চাইতে বড় ত্যাগ সে করেছিল। সেদিন মহাত্মাজী তাকে ডাক পাঠিয়েছিলেন—আজ ডাক দিয়েছে ব্যানার্জিবাবু। ডাক যেই দিক—তার লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক। চিরকাল ধরমবীর আজাদীর সৈনিক। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। নিজের জন্যে তার ভাবনা নেই। একা মানুষ—বাঙলাদেশে না হয়, বাঙলার বাইরে—বাঙলার বাইরে না হয় ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষে না হয় ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে যেখানে হোক সে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারবেই। ডান্ডী সত্যাগ্রহের সময় সে কোনো কথাই ভাবে নি, আজও ভাববে না। হাতে যতক্ষণ তার বন্দুক আছে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত, ততক্ষণ সে নির্ভয়।

পুলিশ তাকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজুক। তাকে তারা খুঁজে পাবে না কখনো। আর এই ফাঁকে ব্যানার্জিবাবু নিশ্চয়ই সাড়ে দশটার ট্রেন ধরে কলকাতার দিকে সরে পড়তে পারবে। ধরমবীরের বিশ্বাস আছে যে ধরা পড়বে না।

হাতের বন্দুকটা মাথায় দিয়ে ঝোপের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ধরমবীর। তার ঘুম পাচ্ছে। (ক্রমশ)

পরমায়ু—শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

'দেশ' পত্রিকার পাঠকগণের নিকট ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন দেখি না। 'দেশের' "স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ" বিভাগে তাঁহার রচনা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে এবং সেসব রচনা পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার রচিত "পরমায়ু" গ্রন্থে যে ঊনিশটি রচনা স্থান পাইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ রচনাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই পুস্তকখানা নূতন বাহির হইলেও 'দেশ' পত্রিকার পাঠকগণের নিকট উহা একেবারে নূতন মনে হইবে না।

পশুপতিবাবুর এ সকল রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি শুধু দুরূহ ও জটিল বিষয়গুলি জলের মতো সহজ করিয়াই যে লেখেন শুধু তাই নয়, সেগুলি রসাল ও চিত্তাকর্ষক ভাষাতে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ন্যায় কঠিন বিষয়ও তিনি এমন ভাবে বিবৃত করিতে পারেন যে, রচনার কোন জায়গাই কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয় না; এবং একবার মাত্র পড়িলেই উহা অধিত হইয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে এই রচনাগুলি স্থান পাইয়াছে—কতদিন বাঁচিবে, শরীরের কলকব্জা, গন্ডের প্রভাব, অভ্যাস, শরীরের পুষ্টি, কোন দেশে কি খায়, স্বাস্থ্যে শ্রেষ্ঠ কারা, ক্ষুধা ও রুচি, বায়ু গ্রহণ, পরিশ্রম, বিশ্রাম, হাসি কান্না, শিশুদের সম্বন্ধে, চল্লিশের পরে, বার্ধক্যে, রোগের কারণ, নিবার্য রোগ, মনের রোগ, মনের সুস্থতা। ইহাদের প্রত্যেকটিই সুলিখিত এবং আগাগোড়া কাজের কথায় পূর্ণ। সংসারে সুস্থ দেহ ও প্রফুল্ল মন লইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া বাঁচিতে হইলে একজন লোকের যাহা কিছু জানা দরকার, মনে হয় তাহার প্রায় সব কথাই পশুপতিবাবু এই বইখানার মারফতে ক্ষীণজীবী বাঙালীদের নিকট সহজ ভাষায় ও মনোরম ভঙ্গীতে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি অকপটভাবে মন খুলিয়া স্বাস্থ্যহীন বাঙালীকে সুস্থ থাকার বাণী শুনাইয়াছেন। আশা করি, বাঙালী মাত্রেই এই বইটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব স্বাস্থ্য গঠনে মনোযোগী হইবেন। বইখানার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ইহার একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

OLD CALCUTTA CAMEOS—By B. V. Roy M.A. (With a forward by Amal Home, Editor, Calcutta Municipal Gazette)—Asoke Library, 15/5, Shyhmacharan De Street, Calcutta. Price Rs. four only.

কলিকাতার ন্যায় বিরাট নগরীর গোড়াপত্তন কাহিনী জানিতে কার না কৌতূহল হয়। এই কৌতূহল দমনে আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠকদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এই শহরের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ, তৎকালীন কলিকাতাবাসী ইংরাজদের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, চালচলন, পোষাক-আসাক, খানাপিনা প্রভৃতি এবং বাঙালী সমাজের চালচলনের খুটিনাটি, তাদের জীবন-যাত্রা, অর্থাদির লেনদেন, জমিজমা, দান দাতব্য, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য ও বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া

হইয়াছে। তৎকালীন অনুষ্ঠিত বিবিধ অপরাধ-সমূহ ও উহাদের নানারূপ শাস্তি শীর্ষক পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। সেকালের যান-বাহন, অর্থাজন ও দ্রব্যমূল্যাদি এবং প্রমোদ গৃহ তথা রঙ্গমঞ্চাদির সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা এই পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায়। মোটকথা, প্রাচীন কালকাতার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ছায়া এই পুস্তক পাঠে প্রতিভাত হইবে। কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি বইটির গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত অমল হোমের ভূমিকাটি নানা তথ্যে পূর্ণ। ছাপা কাগজ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

সাহিত্যের স্বরূপ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা এদেশে অনেকেই করিয়াছেন এবং এবিষয়ে বাঙলা সাহিত্যে বহু-পুস্তকেরও অভাব নাই। কিন্তু নিছক সাহিত্য নিয়া আলোচনা বোধ হয় খুব বেশী হয় নাই। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'স্বরূপ' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকে সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। তবে, 'সাহিত্যের স্বরূপ এখনও বিকাশের পথে; কোথাও গিয়া সে স্থিতিলাভ করে নাই, আর সেই স্থিতি-লাভের অর্থ সাহিত্যের মৃত্যু'—সুতরাং সাহিত্যে 'শাশ্বত স্বরূপ' সম্বন্ধে তিনি শেষ কথা লিখিতে না বসিয়া সাহিত্যের গতিপথ অনুসরণ করিতে করিতে যে সকল কথা বিশেষভাবে মনকে দোলা দিয়াছে, তিনি শুধু তাহাই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

সাহিত্যের প্রাণধর্ম ও তত্ত্ববুদ্ধি, আর্টের প্রয়োজন ও অপপ্রয়োজন, সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা—এই কয়টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বইটি বিভক্ত। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে মূল সুরটি রহিয়াছে, বিভিন্ন নামের প্রবন্ধগুলি পরস্পর তাহারই সেতু রচনা করিয়া দিয়াছে। তাই বইটি আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ। লেখকের চিন্তা গভীর এবং মন অনুভূতিপ্রবণ। ভাব ও চিন্তার গভীরতা এবং তৎসহ প্রখর শিল্পবোধ লেখককে এই আলোচনা একাধারে তত্ত্ব ও রস-সমৃদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে।

ললিতা—শিল্পকলা সম্বন্ধীয় সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্র। অফিস—২২৩।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা।

আমরা ললিতার চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইলাম। এই সংখ্যায় শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের 'শিল্পীর দায়িত্ব', শ্রীমতী লীলা রায়ের পিকাসো ও নবতম ফরাসী চিত্র', 'সংগ্রাহকের' 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ধাতব খোদাই' এবং হ্যান্স হলবিনের জীবনের কয়েকটি ছেঁড়াপাতা' উল্লেখযোগ্য রচনা। তাহা ছাড়া কলিকাতায় চিত্র প্রদর্শনীর বিবরণ ও চিত্রাবলীতে সংখ্যাটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। পত্রখানা মুদ্রণ-সৌষ্ঠভ ও শিল্প-সম্পদের দিক দিয়া বেশ লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পার্ল বাক—গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—রূপশ্রী পাবলিশার্স, ২১,, ডবলু সি ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা পার্ল বাকের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী।

BEHAR HERALD—72nd annual number 1946—Editor M. C. Samaddar, Patna, Price Re. 1|-.

আমরা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত পাটনার বেহার হেরাল্ড পত্রের ৭২তম বার্ষিক বিশেষ সংখ্যাখানা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং, খেলাধুলা, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু প্রবন্ধে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। প্রবন্ধগুলির সবই সুলিখিত এবং যুগোপযোগী। বিশেষ করিয়া সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সমাজ ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রবন্ধগুলি মূল্যবান তথ্যরাজিতে পূর্ণ। 'কিশোর দল' বিভাগের রচনাগুলিও উপভোগ্য। মঞ্চ ও পর্দা এবং শিল্প ও শিল্পী বিভাগের রচনাগুলিও বিশেষ উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। মাত্র এক টাকা মূল্যে অর্ধশতাধিক রচনা-পূর্ণ এরূপ একখানি বিশেষ সংখ্যা পাইয়া পাঠকগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

চয়নিকা—মাসিক পত্র। সম্পাদক—সতীকুমার নাগ। ৪২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। নববর্ষ সংখ্যা। মূল্য ছয় আনা।

বহু প্রবন্ধ, গল্প ও অন্যান্য রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

পরিক্রমা—গ্রীষ্ম-সংকলন। কল্যাণী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। পরিক্রমা প্রকাশিকা, ২, সত্যেন দত্ত রোড, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

ত্রৈমাসিক গল্প-কবিতা সংগ্রহ। আলোচ্য সংখ্যাতে শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দিনেশ দাশ প্রভৃতির কবিতা এবং আরও গোটা দুই গল্প-প্রবন্ধ আছে।

নিত্য যোগ সাধন—ব্রাদার লরেন্স প্রণীত "The practice of the presence of God" গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। পকেট সাইজ, সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে হইলে নিত্য-দিনের অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা মনকে কিভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, এই পুস্তিকায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। একটি সহজ ভগবদভিমুখী চিত্তের অকপট প্রকাশ বইখানার সর্বত্র দেদীপ্যমান। পাঠে পাঠক মাত্রেই মনের উন্নতি ও চিত্তের প্রসার-লাভের ইঙ্গিত পাইবেন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[১২]

জাহাজের একেবারে নীচের ডেকে আমাদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যেখানে তিনশো লোকের জায়গা হতে পারে, সেখানে আমরা চারশো লোক। তার উপর ভাদ্রের গরম! প্রথমে ভিতরে ঢুকতেই মনে হল যেন অন্ধকূপ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভিতরের আলো নজরে পড়লো। নীচে থেকে উপরে যাওয়ার সিঁড়ির পথে ভারতীয় প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। সকাল ছটার সময়ে উপরের ডেকে যাওয়া যায় বেলা বারোটা পর্যন্ত। তারপর আবার পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত মাত্র এক ঘণ্টা। এই সময়টুকু ছাড়া বাকী সময় কাটানো একেবারেই অসম্ভব। তবু নীচেই পড়ে থাকতে হত; সেই গরমে চেষ্টা করে ঘুমানো যায় না; তাই কিছু সময় তাস খেলে কাটাবার চেষ্টা করতাম। প্রথম রাত ছিল 'ব্লাক আউট।' পরদিন থেকে জাহাজে আলো জ্বলছিলো। সকালে যখন উপরের ডেকে এসে বসতাম—তখন সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে রাতে অনিদ্রার সারা গ্লানি কেটে গিয়ে আয়াসে চোখ বুজে আসতো। তাকিয়ে থাকতাম ঐ অসীম নীলের দিকে। পাঁচটি বছর আগে কতকটা এই সময়েই একবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম। সেদিন গৃহ ছাড়ার ব্যথা প্রাণে জেগে উঠলেও অসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে প্রাণে শান্তি পেতাম, তাই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাকিয়ে থাকতাম অসীমের পানে। আজও সেই সমুদ্র—জাহাজ হেলে দুলে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে চলেছে দেশের দিকে; অথচ সে আনন্দ, সে প্রাণ কোথায়? আমরা যেন চলেছি নির্বাসিত বন্দীদল। কোথায় স্বপ্ন দেখেছিলাম সগৌরবে স্বাধীন ভারতে পোঁছাবো—দিকে দিকে হবে জয়ধ্বনি, সে স্বপ্ন গেলো ভেঙ্গে; চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই পুরাতন পরাধীন ভারতবর্ষ।

বর্ষার সময় হলেও সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। আশংকা করেছিলাম, অশান্ত সমুদ্রে খুব কষ্ট পেতে হবে; কিন্তু সমুদ্র শান্ত থাকায় বিশেষ কিছু কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু নীচেকার ডেকের গরম ও বদ্ধ বাতাসে আমরা সকলেই অসুস্থতা বোধ করছিলাম। আমাদের জাহাজখানা একাই আসছিলো—পথে আরও কয়েকখানা জাহাজকে যাতায়াত করতে দেখলাম। জাহাজের খালাসী সকলেই প্রায় চট্টগ্রামের লোক। শুনলাম, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা কলিকাতা পোঁছাতে পারবো। জাহাজে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। কোন রকমে এবার স্থলে নামতে পারলে অন্ততঃপক্ষে একটু বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে। তারপর অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়াতে রান্নাবাড়াও প্রায় বন্ধ। কাজেই কোন বেলা দুটি জুটছে, কোন বেলা উপবাস।

এইভাবে নানা কষ্টে চারদিন কাটানোর পর ৮ই আগস্ট আমরা সকালের দিকে পোঁছলাম ডায়মণ্ডহারবার। ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ সংগম পার হয়ে গঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করলো। দুপাশে অসংখ্য জাহাজ ও নৌকার পাশ কাটিয়ে আমাদের জাহাজ শিবপুরের বোটানিক্যাল বাগানের পাশ দিয়ে খিদিরপুরে এসে পোঁছালো। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। দুপাশেই পরিচিত কতো জায়গা আজ পূর্ণ পাঁচ বছর পরে দেখছি। জাহাজে যে সকল বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য ছিলো, তারা নেমে গেল। রইলো শুধু সেই দল—যারা আমাদের প্রহরীর কাজ করবে। উপরের 'পোর্ট হোল' দিয়ে দেখলাম—অল্পক্ষণ পরেই লাল টুপী—বৃটিশ মিলিটারী পুলিশে 'ডক' ভর্তি হয়ে গেছে। বুঝতে দেরি হল না, আয়োজন, আড়ম্বর—সবই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য।

পরে আমরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। এক-একজন করে নামতে লাগলাম ডকে। দুপাশে একহাত দূরে দূরে দুলাইন মিলিটারী পুলিশ পিস্তল ঝুলিয়ে রোষকষায়িত নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে সারবন্দী লরী দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক লরীর পাশে উন্মুক্ত সঙ্গীনসহ রাইফেলধারী গুর্খা সৈন্যদল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের লরীতে বসিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেক লরীতে ছ'জন করে গুর্খা প্রহরী। কয়েকটি রাস্তা পার হয়ে লরী একটি জায়গায় এসে থামলো—আমাদের নামতে হুকুম দেওয়া হল। এখানে আসার পর গুর্খা ছাড়াও দেখলাম—ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ—তাদের উঁচু পাগড়ী মাথায় দিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটি কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা জায়গাতে। আমরা নামার পর আবার সারি দিয়ে দাঁড়ালাম—হুকুম হল, সঙ্গের 'মেসটিন' বার করে ডান হাতে নেওয়ার জন্য। তারপর এক-একজন করে সেই কাঁটা-তার-ঘেরা জায়গায় প্রবেশ। ভিতরে ভাত-তরকারী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কয়েকজন লোক। তারা আমাদের মেসটিনে ভাত ও তরকারী দিতে লাগলো। তারপর হুকুম হল, এখানে বসে খেয়ে নাও। ক্ষিদে পেলেও মনের অবস্থা এতোই খারাপ যে, ইচ্ছা করেও কিছু খেতে পারলাম না। কলের জলে টিন ধোওয়ার পর আবার হুকুম হল, সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াও। তারপর চারিদিকে গুর্খা প্রহরী আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললো। এবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একটি জায়গাতে আমরা উপস্থিত হলাম।

এখানে বৃটিশ ও ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ আর একবার আমাদের বেশ করে তালাসী নিলো। প্রত্যেকের জিনিসপত্র খোঁজ করে আপত্তিজনক কাগজপত্র সর্বকিছু আটক করা হল। এই সব কাজ শেষ হতে রাত প্রায় বারোটা বাজলো। একজন গুর্খা অফিসার হুকুম শুনালো, এখানেই এখন শুয়ে পড়—আবার ভোর বেলায় অন্য জায়গাতে যেতে হবে। রাতে কাঁটাতারের বাইরে অসংখ্য গুর্খা প্রহরী রাইফেল, মেসিনগান ও স্টেনার গান-সমেত পাহারা দিতে লাগলো।

ভোর প্রায় চারটের সময় আবার তৈরি হলাম। কাছেই লাইনে রেলগাড়ি। আমরা তাতেই চড়লাম। প্রত্যেক গাড়িতে দুজন ও চারজন করে গুর্খা প্রহরী। নির্বিকার এদের মুখ। কোথায় যাচ্ছি—তাও বুঝতে পারছি না। সকাল বেলা গাড়ি চলতে লাগলো। পরিচিত দেশ, পরিচিত রেল লাইন ও পরিচিত সব স্টেশন। তবু কোথায় চলেছি, কিছুই জানি না। দমদম স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি দাঁড়ালো। এখানে কাছেই আমার বাড়ি। আজ সাড়ে তিন বছর বাড়ির কোনও খবর পাইনি। এতো কাছে—বাড়ির প্রায় কাছ দিয়েই যাচ্ছি; অথচ কোনও খবর দিতে পারি নি। এই সময়ে প্রাণের যে কি অবস্থা তা লিখে জানানো যায় না। অন্যদিকের একটি গাড়িতেও প্ল্যাটফরমে 'ডেলী প্যাসেঞ্জাররা' পান মুখে দিয়ে ছোটাছুটি করছে। সেই পুরাতন বাঙলা দেশ, সেই ধুতী সার্ট-পরা বাঙ্গালীর দল। গাড়ির জানালা দিয়ে শুধু তাদের তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

বেলা প্রায় এগারটার সময় পোঁছলাম ঝিকরগাছা। আবার তেমনিভাবে দুপাশে গুর্খারা সারিবন্দী আমাদের পাশে পাশে চললো। স্টেশন থেকে অল্প দূরেই খুব

উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া জায়গা, ভিতরে কয়েকটি কুটীর। আমাদের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রক্ষীদল বিদায় নিলো। কাঁটাতার প্রায় বারো ফুট উঁচু—তার বাইরে রাইফেলধারী ভারতীয় সেনা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

বছর ছ'সাত আগে এই ঝিকরগাছাতেই সরকারী ডাক্তার ছিলাম কিছুদিনের জন্য। কিন্তু স্থান পুরাতন হ'লেও আবেষ্টনী সবকিছুই একেবারে নূতন। স্টেশনের কাছাকাছি বাজার থেকে সুরু করে এখানকার সব এলাকা এখন মিলিটারী অধিকার করেছে।

আমরা যেরূপে ক্যাম্পে ঢুকলাম এগুলির নাম হচ্ছে 'খাঁচা'। এই রকম আরও অনেকগুলি খাঁচা আছে এখানে। এক কথায় পুরো জায়গাটিই হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড বন্দী-শিবির। আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীরা ছাড়াও বৃটিশ ভারতীয় বহু বন্দী এখানে আছে। এখানে পৌঁছানর পর আবার সুরু হল তালাসী। বলা বাহুল্য এখানে সকলেই ভারতীয়। তারা শুধু যে আমাদের সাধারণ তল্লাসী নিয়ে ক্ষান্ত হল তা নয়। আমাদের সঙ্গে যা কিছু জিনিষে জাপানী গন্ধ আছে সব কিছুই তারা আটক করলো। এর মধ্যে জাপানী কাপড়, মশারি, এমন কি কম্বল পর্যন্ত। তারপর যে জিনিষটি তাদের পছন্দসই সেগুলিও আটক হল। এর মধ্যে বিছানার চাদর, সিভিলিয়ান জামা, কাপড়, হাসপাতালের বড় কম্বল সব কিছু। এর আগে এসব জিনিষে কেউ হাত দেয়নি। এখানকার ভারতীয়দের ব্যবহার মোটেই প্রশংসনীয় নয়। এর আগে গুর্খারাও প্রহরীর কাজ করেছে। তারা শুধু হুকুম তামিল করেছে ঠিকভাবে। তা'ছাড়া নিজেরা কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এখানকার ভারতীয় সেনারা 'ধরে আনতে বললে—বেঁধে আনে'—এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছে।

ক্যাম্পের ভিতরে যে ক'টি কুটীর ছিলো, তা' আমাদের চারশো জনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হলেও তাতেই কোন রকমে স্থানসংকুলান করতে হল। তারপর প্রতি মিনিটে হুকুম জারী হ'তে লাগলোঃ ঘরদোর শীঘ্র পরিষ্কার করে নাও। খাওয়া এগারটার মধ্যে সারা চাই। খাওয়ার পর চল্লিশজন কাঠ আনতে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে খাওয়া ও ঔষধপত্রের বন্দোবস্ত মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবে আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি, কাজেই অভিযোগ আমাদের কিছুই ছিলো না।

আমরা পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জমাদার ও সুবেদার সাহেব আমাদের নামের লম্বা চওড়া তালিকা প্রস্তুত করলেন। তারপর হুকুম হল কাল থেকে একটি করে ফর্দ আসবে, তাতে যাদের নাম থাকবে তারা যেন অফিসে হাজিরা দেয় সকাল নটার সময়। এখান থেকে সুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। বিরাট অফিস। তাতে ছোট ছোট এক একটি ঘরে এক একজন ভারতীয় অফিসার—কাগজের তাড়া ও কালি কলম নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন।

প্রত্যেক অফিসার প্রতিদিনে প্রায় দশ বারোজনকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে সব কিছু লিখে রাখতে লাগলেন। আমাদেরও পালা এলো। অফিসারের বেলায় কড়াকড়ি একটু বেশী। সকালে একজন নায়ক আমাদের নিয়ে যেতো সঙ্গে করে আবার বেলা প্রায় বারোটায় ফিরিয়ে আনতো ক্যাম্পে। আবার খাওয়ার পর বেলা দুটোয় সেখানে নিয়ে যেতো আবার প্রায় পাঁচটায় ফেরৎ আনতো।

আমাদের দরকারী ও অদরকারী বহু প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হয়। দশদিন এখানকার ক্যাম্পে ছিলাম। অন্য ক্যাম্পে যারা ছিলো তাদের সংগে দেখা করা বা কথাবার্তা বলার কোনও সুযোগ আমাদের ছিলো না। দশদিন পরে খবর এলো—আমি, ডাঃ হেম মুখার্জি ও ডাঃ উদম সিং প্রায় সত্তরজন নার্সিং সিপাহীসহ লক্ষ্ণৌ-এর ডিপোতে ফিরে যাবো। সকাল থেকেই হুকুমের পর হুকুম জারী হতে লাগলো। চারটের সময় ক্যাম্প থেকে বাইরে এলাম। সেখানে আরও একবার তালাসী নেওয়া হল। তারপর পথখরচ হিসাবে প্রত্যেকে পেলাম ছ'টাকা করে। অর্থাৎ প্রতিদিন দু'টাকা হিসাবে তিন দিনের পথখরচ। সন্ধ্যার পর গাড়ীর পাশ প্রভৃতি তৈরী করে আমাদের স্টেশনে পেশছে দিলো। রাত দুটোয় কলিকাতায় যাওয়ার গাড়ী। আমরা প্ল্যাটফরমের উপর এসে শুয়ে পড়লাম। স্টেশনে একটি পান বিড়ির দোকান ছিলো। সেখানে সুভাষ মার্কা' বিড়ি বিক্রী হচ্ছিলো। বিড়ির বাণ্ডিলের উপর সুভাষচন্দ্রের ছবি। আমাদের সংগের বহু লোকের কাছেই নেতাজীর ছবি ছিলো, কিন্তু তা আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সুভাষচন্দ্রের এই ছবি পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে চেষ্টা করতে লাগলো। দোকানের বিড়ি সব মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। দোকানদার বাঙালী। তার সংগে বসে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলাম। সে আমাকে জানালে, প্রত্যেকে এই সুভাষচন্দ্রের ছবির জন্য লালায়িত। তারা বিড়ি না' পেলেও শুধু ছবিটাই চায়। অনেকে ছবি নেওয়ার পর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তাকে জানালাম —এরা সকলেই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যদল। নেতাজীকে এরা প্রকৃত দেবতার মতোই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তাঁর একটি ছবি সংগে রাখতে পারলে এরা নিজেকে ধন্য মনে করে। সমস্ত জিনিষপত্রই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে—কাজেই নেতাজীর কোন ফটো এদের কাছে নেই।

রাত প্রায় দুটোর সময় গাড়ীতে চড়ে বসলাম। এখান থেকেই আমরা কতকটা মুক্ত। সংগে কোনও প্রহরী নেই। ভোর বেলায় শিয়ালদা' এসে পেশছলাম। আগে থেকেই কতকগুলি লরী প্রস্তুত ছিলো। তারা আমাদের নিয়ে প্রথমে উপস্থিত হল হাওড়ার কাছাকাছি একটি ক্যাম্পে। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব। কাজেই সেখান থেকে একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে একটি ক্যাম্পে আমাদের নামিয়ে দিলে। এটী একটি 'রেস্ট ক্যাম্প'। অনেকে এখানে রেংগুন যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। জায়গা খোঁজা, জলের বন্দোবস্ত এসব করতে করতেই দিন কেটে গেলো। শুনলাম আজ আমাদের যাওয়া সম্ভবপর হবে না।

পরের দিন সকালে খবর নিয়ে শুনলাম আজ হয়তো যাওয়া হ'তেও পারে। যদি যাওয়া হয় তো বেলা চারটেয় আমরা খবর পাবো। হেমদা আমাকে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সাড়ে তিন বছর বাড়ীর কোনও খবর পাইনি। আজ বাড়ী গেলেও থাকবার উপায় নেই। কাজেই আমি ভাবলাম একেবারে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসেই বাড়ী যাবো। কিন্তু শেষকালে অনেক ভেবে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবার দেখলাম আমার চিরপরিচিত কলিকাতা সহর। যুদ্ধের বাজারে এখানেও এসেছে অনেকখানি পরিবর্তন। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হয়তো অনেক দুঃখে ও লজ্জায় কালো রঙে মুখ ঢেকেছে। সারা ময়দান ছড়িয়ে শুধু মিলিটারী ক্যাম্প। ট্রামে চড়ে বসলাম। দুপুরে পেশছলাম আমার বাড়ী—দমদমে।

বহুদিন পরে আত্মীয়স্বজনের সংগে মিলনক্ষণটুকু যে কতো মধুর, কতো আনন্দময় তা শুধু যাদের জীবন কেটেছে দীর্ঘ প্রবাসে, তারাই উপভোগ করতে পারে। অনেকে আমাকে মৃতের কোঠায় ফেলে রেখেছিলেন। মাত্র দু'ঘণ্টা বাড়ীতে ছিলাম। তারপর ফিরে এলাম ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে চারটার সময়। শুনলাম আজই লক্ষ্ণৌ যেতে হবে। তৈরী হয়ে নিলাম। সন্ধ্যায় কতকগুলি লরী আমাদের হাওড়া স্টেশনে পেশছে দিলো। রাত দশটায় এখান থেকে মিলিটারী স্পেশ্যাল আমাদের নিয়ে দীর্ঘ পথে পাড়ী জমাল। বাড়ী থেকে আসার সময় কিছু টাকা সংগে এনেছিলাম, কাজেই পথে খাওয়া-দাওয়া বেশ হল।

সারারাত—পরেরদিন—এমনিভাবে গাড়ীতেই কাটলো। পরেরদিন ভোরে আমরা লক্ষ্ণৌ পেশছলাম। এখান থেকে পেশছলাম আমাদের পুরাতন পরিচিত 'ট্রেনিং সেণ্টারে'। এখানে আস্তে আস্তে আমাদের পরিচিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন ডাক্তার এসে পেশছলেন। ডাঃ বীরেন চক্রবর্তী ও ডাঃ দেবেন গাঙ্গুলী আমাদের আগেই এসে পেশছেচেন। ক্রমে আমরা সবশুদ্ধ সতেরজন ডাক্তার ও প্রায় সাতশো নার্সিং সিপাহী জমা হলাম। আমরা একটি ব্যারাকে আলাদা থাকতাম। কাজকর্ম ছিলো না, কাজেই দিন কাটতো তাস খেলে আর ঘুমিয়ে। শুনলাম এখানেও আমাদের আবার কিছু জিজ্ঞাসাবাদ প্রভৃতি হবে। এখানে এসে খবরের কাগজে দেখলাম -ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জন্য সারা দেশে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমাদেরও এখানে একটি 'কোর্ট মার্শাল' সুরু হল। তার আগেই কাগজে গভর্নমেণ্টের নীতি বেরিয়েছে। তাতে লেখা ছিলো—ডাক্তার প্রভৃতিদের কিছু সাজা দেওয়া হবে না। এখানে মাত্র কয়েকটি বাঁধা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর শুনলাম, আমাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। টাকা পয়সাও কিছু পাওয়া যাবে না।

৪ঠা ডিসেম্বর এখান থেকে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত রেলের পাশ দেওয়া হল। আমরা এদিকের ছিলাম মাত্র পাঁচজন। ক্যাপ্টেন ইলিয়াস পাটনায় নেমে গেলেন। আমি, হেমদা, দেবেন ও বীরেন চক্রবর্তী একেবারে সোজা হাওড়ায় নামলাম। এ'রা তিনজন ঢাকায় যাবেন, আমি সোজা বাড়ী ফিরে এলাম। শেষ হোল বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ নানা দুঃখকষ্টের জীবন।

পরিশিষ্ট

কয়েকটি তথ্য

নেতাজী মালয়ে আসার আগে পূর্ব এসিয়ার ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সিংগাপুর শহরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়।

নেতাজী মালয়ে আসার পর ও স্বাধীন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর নেতাজী পূর্ব এসিয়ার ইনডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি, আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি হন।

নেতাজী কোন প্রকার Rank বা পদবী ব্যবহার করতেন না। দিনরাত সর্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাতে মাত্র এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা বিশ্রামের সময় পেতেন।

জাপানী গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে একটি বিমান উপহার দেয় সর্বদা ব্যবহারের জন্য।

জাপানী গভর্নমেণ্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টকে উপহার দেওয়ার পর মেজর জেনারেল লোগানন্দন সেই দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর হন। আন্দামান ও নিকোবর যথাক্রমে স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ নামে অভিহিত হয়।

বাঙলার দুর্ভিক্ষে খবরে নেতাজী বিশেষভাবে ব্যথিত হন। তিনি দশ লক্ষ টন চাল পাঠাবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। বার বার বেতার মারফৎ এ খবর ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ পক্ষ একেবারেই নীরব থাকেন।

মেজর জেনারেল চাটার্জি ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হন।

কর্নেল ভোঁসলে, কর্নেল চাটার্জি, কর্নেল কিয়ানী ও কর্নেল লোগানন্দন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বপ্রথম মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

[শেষ]

বাতলীন

বাতের মূল কারণটী সমূলে নষ্ট করিতে
বাতলীনই সক্ষম।

মিঃ এস এন গুহ, ইনকমট্যাক্স অফিসার, বরিশাল লিখিতেছেন—"ঘাড় ও পৃষ্ঠ প্রবল বাতাক্রান্ত হইয়াছিল বহু চিকিৎসায় কোন ফল পাই নাই কিন্তু পর পর ৩ শিশি বাতলীন সেবনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।"

প্রস্রাব, দাস্ত ও রক্তশোধক **বাতলীন**—সেবনে গেটেবাত, লাম্বাগো, সাইটিকা, পংগুজনক অবস্থা ও সর্ব বাতবিষ, প্রস্রাব ও দাস্তের সহিত ধৌত হইয় অতি সত্বর রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আয়ুর্বেদোক্ত ১২৪ প্রকার বাত ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

মূল্য বড় শিশি—৫৲ টাকা, ঐ ছোট—২৸৹
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সোল এজেণ্টস্—

কো-কু-লা লিঃ

৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন কলিঃ ৪৯৬২ গ্রাম—**দেবাশীষ**
এজেন্সী নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

★ **মাসিক বসুমতী** ★

১৩৫৩'র বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'মাসিক বসুমতী'র বর্ষ শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয়ও নতুন করে শুরু করা গেল,—এখন থেকে ফটোগ্রাফী 'মাসিক বসুমতী'র অন্যতম অঙ্গ হবে। আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যে 'মাসিক বসুমতী'কে আরও বিচিত্র মনে হতে থাকবে আপনার। কিন্তু এর জন্য আপনার সহযোগিতাই সব চেয়ে বেশী কাম্য। 'মাসিক বসুমতী' এখন থেকে আপনার এ্যালবামের শ্রেষ্ঠ ছবিটি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে। সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন।

প্রতি সংখ্যা ৸৹ যাণ্মাসিক ৫৲ বার্ষিক ৯৲

● পুণর্মুদ্রিত হইল ●

মাইকেল গ্রন্থাবলী
(বহু নূতন তথ্য সম্বলিত)
১ম ভাগ ২৷৷৹
২য় " ১৷৷৹

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
৸৹

শিক্ষা
স্বামী বিবেকানন্দ
৸৹

বৃত্রসংহার
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৲

জ্যোতিষ রত্নাকর
২৲

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী
চণ্ডীদাস—১৷৷৹
বিদ্যাপতি—১৷৷৹

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মৃত্যুবরণ

শ্রী আদিত্য ওহদেদার

কয়েকদিন আগে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। কোন কাজে নয়, এমনি বেড়াতে। আসলে কলকাতা যেতে হল একটা বিশেষ কাজে এক ডাক্তার বন্ধুর সংগে। কাজ সারা করে হাতে দুদিন সময় পেলাম। বন্ধুকে বললাম, হাতের কাছে কোথায় যাওয়া যায় বলতো ? খানিক ভেবে সে বললে, চল মুর্শিদাবাদ। সেখানে বড়দি রয়েছে। অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখাটাও হবে, বেড়ানও হবে।

মুর্শিদাবাদ ! নামটি ঘিরে অনেক ইতিহাস জড়ানো। সানন্দে রাজি হলাম সেখানে যেতে।

শুধু একটি দিন থাকব, এই ইচ্ছে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং কেবলমাত্র একটা দিনই ছিলাম। কিন্তু সেই একটি দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জীবনের একটা নতুন পরিচয়ের মুখোমুখি করিয়েছে আমাকে।

খুলেই বলব ঘটনা।

মুর্শিদাবাদ পেঁৗছলুম খুব ভোরে। খানিক বিশ্রাম ও জলযোগের পর বেলা আটটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সমস্ত শহরটা দেখলাম। নবাব প্রাসাদ—হাজার দুয়ারী, অস্ত্রাগার, মুকবাড়া ইত্যাদি যাকিছু দেখবার কিছুই বাদ দিলাম না। বাড়ি যখন ফিরলাম, তখন বেলা প্রায় একটা। হাতের কাছে গঙ্গা—গেলাম সেখানে স্নান করতে। তারপর খাওয়াটা সেরেই ফের বেরলাম—এবার ওপার, সেখানে সিরাজদ্দৌলার কবর। তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে।

নদীতীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেঁৗছলুম কবরস্থানে। অত্যন্ত নির্জন জায়গা। অযত্ন-রক্ষিতভাবে পড়ে আছে। কেমন যেন বেদনা হয়। মনে পড়ে পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের কথা—সেদিন সেই হতভাগ্য যুবক নবাবের সে কী বিপুল প্রয়াস বৈদেশিক শত্রুকে দেশে অধিকার বিস্তার না করতে দেবার। যাক্ সে কথা।

বাড়ি ফিরলাম প্রায় সন্ধ্যায়। সমস্ত দিন হেঁটে ক্লান্ত যে হইনি, এমন কথা বলব না। বন্ধুবর বিশেষভাবেই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। জলযোগের পর একটু বিশ্রামের জন্য শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি খানিক গা এলানোর পর আবার বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে পাতলা জ্যোৎস্নার আবছায়া আলো। তিথিটা সপ্তমি-অষ্টমীর কোলঘেঁষা। আমি গঙ্গার তীর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খানিক দূরেই নবাব প্রাসাদ—তটপ্রান্ত ঘেঁষে চলে গেছে প্রাসাদ-উদ্যান। সেইখানে বিশ্রাম-মঞ্চের কোন বেঞ্চিতে খানিকক্ষণ বসব—এই ছিল ইচ্ছা। চারিদিক নির্জন—সাড়াশব্দ কানে আসে না। সামনে অপরিসর গঙ্গা—সাদা জরির কাঁচুলির মত মাটির ওপর দিয়ে চলে গেছে। ওপারের বালি মিশানো মাটি চিক চিক করছে।

একটু এগুতেই সামনে পড়ল একটা বাদাম গাছ। বেশ বড় গাছটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া-আলোর জাল বুনেছে। তার নীচে একটা বসবার পাথর। সেখানে একটি পুরুষ-মূর্তি দেখতে পেলাম। গাছতলাটি নদীর অত্যন্ত কাছে। পাথরটির ওপর বসলে পা দুলিয়ে নদীর জল ছোঁওয়া যায়। আমার সেই-খানেই বসতে সাধ হল। লোকটির কাছে আসতেই আমাকে বললেন, আসুন, বসুন। আজ রাত্রে সত্যি ঘরে থাকা যায় না।

এমন কথা যাঁর মুখ থেকে বেরয়, তাঁকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয় বৈকি। প্রথমেই যা চোখে পড়ল, সেটা তাঁর শরীরের ঋজু দীর্ঘতা। দেহের কোথাও যেন দৃষ্টিকটু বাহুল্য নেই। বেশভূষায় অযত্ন মনোভাব সুপরিস্ফুট। চুল উস্কুখুস্কু। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ক্লিষ্ট ও অস্বাভাবিক।

হয়ত কবিতা লিখে থাকেন ভদ্রলোক। এখুনি হয়ত তাঁর রচিত অপ্রকাশিত কবিতা শোনাতে শুরু করবেন ! একটু ইতস্তত করে তাঁর পাশে বসলাম। কোন কথা বললাম না। একটু যেন অনাবশ্যক গাম্ভীর্য ধারণ করলাম। রূঢ় এমন বলাও চলে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তা নয়। ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। অনেকটা আমাকে উপেক্ষা করেই। আমি অপ্রস্তুত হলাম খানিক। তাঁকে উত্তর দিই নি, অতএব তিনি মনক্ষুন্ন হয়েছেন—এই ভেবে কিছু বলবার জন্যে প্রায় মুখ খুলেছি, তিনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : To cease upon midnight with no pain ! Keats নিশ্চয় সেদিন মরতে চেয়েছিলেন, তাই এমন লাইন তাঁর কলম থেকে বেরুল। আপনার কি মনে হয় ?

তিনি আমার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন।

বুঝলাম, তাঁর মাথায় কোন বিশেষ ভাবের ভূত চেপেছে, তাই নিজের ভাবের মত্তরসেই মজে আছে তাঁর মন; অপরের ব্যবহারের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। একটু স্বস্তিও পেলাম তিনি আমার অহেতুক গাম্ভীর্যকে আমল দেননি বলে।

বললাম, অত্যন্ত ভালো-লাগার অনুভূতির সংগে মৃত্যু-কামনা জড়িয়ে থাকা বোধ হয় স্বাভাবিক। আমাদের ঘিরে অনেক দুঃখ, অনেক দৈন্য, অনেক আঘাত ও বেদনা রয়েছে। তাই সহসা অতি আনন্দের প্রাবল্যে আমাদের মন মৃত্যুকে বরণ করতে চায়, যাতে পুনরায় পৃথিবীর সেই দুঃখ-দৈন্য বেদনাভরা বন্ধনে বাঁধা না পড়ে। আমাদের বাঙালি কবিকেও দেখুন না—চাঁদের আলো দেখে তাঁর হৃদয়ে যে আনন্দের বেগ এল, তাতে তিনি গেয়ে উঠলেন, এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।

কাব্যিক বিশ্লেষণ ? বেশ, বেশ। স্পষ্টই চোখে পড়ল তাঁর ঠোঁটের প্রান্তে একটা মৃদু উপহাসের বাঁকানো রেখা।

ভদ্রলোককে রসিকজন ভেবে বেশ গুছিয়ে খানিক বলেছিলাম এবং তাঁর সপ্রশংস অনুমোদন পাব, এমন আশাই করেছিলাম; কিন্তু উল্টে এই উপহাস-হাসি। যথেষ্ট বিরক্ত হলাম। চুপ করে বসে রইলাম উদাসীনভাবে।

রুক্ষ চুলগুলির ওপর আঙুল বুলিয়ে মাথাটায় এক ঝাকুনি দিয়ে তিনি ফের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মৃত্যু কি ? বিশ্লেষণ করুন না আপনার অমন সুন্দর ভাষায়।

খানিক উষ্মার স্বরেই জবাব দিলাম, আমার মস্তিষ্ক যথেষ্ট সুস্থ মশাই। এই সময় মৃত্যুর বিশ্লেষণ করবার ত মনের অবস্থা নয়।

কিন্তু চাঁদের আলোয় মৃত্যুর কথা তো মনে হয়—আপনিই তো বল্লেন।

মৃত্যুকামনা করা আর মৃত্যু কি, তার বিশ্লেষণ করা দুটো এক নয়।

তিনি আবার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন, তা জানি। কিন্তু ... কিন্তু সত্যি মৃত্যু কি? Biologistরা বলেন protoplasmic cells নিষ্প্রাণ দ্রব্য থেকে যখন আর energy সৃষ্টি করতে পারে না তখনি মৃত্যুর দিন হানা দেয়। This cessation is death. আর physiologistরা বলেন হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হলেই মৃত্যু। তাতে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়, আর তার ফলেই শরীরের cells অক্ষম হয়ে যায়। কেমন সুন্দর বিজ্ঞানের যুক্তি! এই আমার হৃদয়—ধুক্ ধুক্ করছে, তাই আমি বেঁচে আছি। হঠাৎ কি যেন হ'ল—হার্টের ক্রিয়া থেমে গেল, ধুক্ ধুক্ শান্ত শব্দ বন্ধ হল—ব্যস আমার মৃত্যু! কিন্তু সেই কী-যেন-হল, সেইটে কি?

আমি চুপ করেই আছি। তিনি আমার দিকে চেয়ে হস্ত উত্তোলন করে আবৃত্তির ভঙ্গীতে বললেন, চিরপ্রশ্নের বেদীর সমুখে বিরাট নিরুত্তর। তবে কবিরা একটা মনগড়া বস্তু

খাড়া করেছেন বৈকি। পড়েছেন নিশ্চয় Longfellowর সেই লাইনগ‍ুলোঃ—

> There is no death! What seems so
> is transition:
> This life of mortal breath
> Is but a suburb of the life elysian
> whose portal we call death.

এতো খালি মৃত্যুশোকের আশ্বাস। লোকে যাতে মৃত্যুতে বিচলিত না হয় তাই কৌশলে এই ছন্দোজালের সৃষ্টি। বেশ শোনায়। কিন্তু যে ব্যক্তিটি বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চোখের সামনে ছিল, সহসা সে অন্তর্ধান করল, তার সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বটি অপসৃত হল,—তবু বলতে হবে মৃত্যু নেই। শরীর থেকে জল, oxygen, কি nitrogen বেরিয়ে, অন্যরূপ matter সেই একই রইল, তাতে আমার প্রয়োজন কি? আমি সেই ব্যক্তিটিকে চাই যে। সে কি আর আসে? আর what is the life elysian? স্বর্গের বার্তা কেউ পেয়েছে কি?—একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা সাজানো কথা।

তিনি থামলেন যেন দম নিতেই। আমি চুপ করেই রইলাম। হয়ত লোকটির মস্তিষ্ক সুস্থ নয়, কিন্তু জ্ঞানীর মস্তিষ্ক, অসুস্থতাতেও উর্বর এবং কর্ণপাতের যোগ্য। দেখাই যাক না কতোদূর তাঁর বক্তৃতা চলে—এই মনোভাব নিয়ে মনোযোগী শ্রোতার মত বসে রইলাম।

তিনি ফের সুরু করলেন, This life of mortal breath! সত্যি, এই জীবনের নিঃশ্বাস একদিন থেমে যাবে। কিন্তু কী সুন্দর এই জীবন।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, জানেন এই যে বাদাম গাছ দেখছেন, এরই তলে একদিন দুটি প্রাণ অনুভব করেছিল—কী সুন্দর এই জীবন।

ভদ্রলোককে এবার আমি বাগে পেলাম। তাঁর সে উপহাস-দৃষ্টি ভুলি নি। তাই সেইরকমই হেসে আমিও বললাম, বাঃ আপনার ভাষাও এবার বেশ রূপ ধরেছে। কল্পনার রঙটা বেশ গাঢ় করে লাগাবেন।

তিনি চুপ করে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর সে দৃষ্টিতে কী যেন দেখলাম। আপনা থেকেই ছোবল তোলা মনটা যাদুমন্ত্রে নুইয়ে পড়ল।

তিনি বললেন, ঠাট্টা করছেন?

আমার মুখ থেকে বেরুলঃ বোধ হয় করেছিলাম। কিন্তু শুধরেছি। আপনি দয়া করে বলে যান।

সামনে গঙ্গার মৃদু স্রোতে অতি কুচি কুচি ঢেউগুলো তীরের প্রান্ত দিয়ে যেন সেতার বাজিয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়েছে জলে—যেন অভ্রের গুঁড়োয় নদীর বক্ষোবাস ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। একটা সিরসিরে বাতাস রয়ে সয়ে বাদাম গাছটার উপরের ডালপালা কাঁপিয়ে চলেছে।

বিগত দিনের স্মৃতি বেদনার মধ্য দিয়ে মনে করলে কণ্ঠে যে সুর বাজে, সেই সুরের রেশ পেলাম ভদ্রলোকের কণ্ঠে। তিনি শুরু করলেনঃ সেদিনও ঠিক এই তিথি। সপ্তমী চাঁদের হাল্কা জ্যোৎস্না এমনি মধুর ছিল সেদিন। আজিমগঞ্জ থেকে নৌকো এসে লাগল এইখানে। সাতাশ বছরের যুবক নৌকো থেকে নামতেই দেখলে, জল তুলে উপরে উঠছে একটি কিশোরী মেয়ে। সঙ্গে তার একটি ছোট ছেলে—বোধ হয় তার ভাই। মেয়েটি পিছন ফিরে একবার দেখলে—নিছক কৌতূহল। যুবকের মুগ্ধ অবাক দৃষ্টি তারই ওপর তখনো বাঁধা। লজ্জা পেল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে একটু দ্রুত পায়ে চলতে সুরু করলে। কিন্তু অদৃশ্য হবার আগে আর একবার পিছন ফিরে যুবকের মুগ্ধ দৃষ্টিকে আরও খানিক অবাক করে দিলে।

অপরূপ সুন্দরী সে নয়, কিন্তু একটা বিস্ময়কর লাবণ্য ছিল তাকে ঘিরে। সেদিনের সেই কৌতূহলপূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টি যুবকের মনে গাঁথা রইলো।

এই বাদাম গাছ। এই গাছের তলায় তার পরদিন আবার মিলিত হল। মেয়েটির সলজ্জ দৃষ্টিতে মুকুলিত হল কি যেন অস্ফুট ভাষা। সাহসী হল যুবক—পূর্ণিমা রাত্রে যেদিন তারা পুনরায় মিলিত হল যুবক মেয়েটির হাত ধরে বল্লে, তোমায় আমি চাই।

জীবনে তারা দুজনকে পেয়েছিল। প্রত্যহ তারা অনুভব করেছে—এই পৃথিবী কি সুন্দর।

ভদ্রলোক থামলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও বলবার ভঙ্গীতে কাহিনীটি রীতিমত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। খানিক চুপ করে রইলাম। তারপর কি যেন বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বলবার আগেই তিনি আচমকা উঠে পড়লেন। তাইত, আমি কতক্ষণ এখানে রয়েছি? আমায় যে বাড়ি যেতে হবে।

তিনি বেশ জোর পায়েই চলতে সুরু করলেন। শুনতে পেলাম তাঁর আবৃত্তি-কণ্ঠঃ অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ হে মোর মরণ!

বসে বসে লোকটির কথা ভাবতে লাগলাম। বেশ শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি, কিন্তু মস্তিষ্কটি নিশ্চয় বিশেষ সুস্থ নয়। যাই হোক তাঁর জীবনে কোন নারীর আবির্ভাব যে সৌরভমণ্ডিত, বেশ বোঝা যায়।

খানিক পরে বাড়ি ফিরলাম। বন্ধুবর ততক্ষণে বেশ একচোট ঘুম দিয়ে উঠেছেন। বললেন, ধন্যবাদ তোমাকে! এত বেরিয়েও আশা মেটেনি? আবার কাব্যি করতে বেরিয়েছিলে।

বললাম, কি করি, তোমার মত ডাক্তার মানুষ হতাম তো নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা বুঝতাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ির লোকদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আশপাশ বেশ নিঃঝুম।

হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠলোঃ দত্ত মশাই! দত্ত মশাই! বাড়ি আছেন?

দোর খুললেন দত্ত মশাই নিজে—বন্ধুর ভগ্নিপতি। আরে মহিম যে! কি ব্যাপার? নীলিমা কেমন আছে?

—আর কেমন আছে। সেই জন্যেই তো এলাম। চলুন একবার শীগগীর, রাত বুঝি কাটে না আজ। ওদিকে দাদাও আজ সমস্ত দিন ধরে কেমন যেন হয়ে গেছেন। কেবলি বলছেন, আমরা যদি চলে যাই তুই সাবধান হয়ে থাকিস; মাকে দেখিস।

ছেলেটির চোখে জল এল।

আরে, কান্না কিসের? চল, চল আমি যাচ্ছি। আমাদের বাড়ি ডাক্তারও এসেছেন—তাঁকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। বন্ধুকে বললেন, অরুণ চল একটু আমার সঙ্গে। একটা রুগী দেখবে।

আমিও সঙ্গ নিলাম। একটু পরেই পাঁচরাহা বাজারের একটা ছোটখাট পাকা বাড়িতে প্রবেশ করলাম। রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর মাথার কাছে যে লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখলাম তাতে বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। এই তো সেই লোক—গঙ্গার ধারে খানিক আগে অতক্ষণ যাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাদের হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমাকে বললেন, আপনি ডাক্তার? একবার এঁকে দেখুন না, যদি আপনি কিছু করতে পারেন।

আমি বন্ধুকে দেখিয়ে বললাম, ইনি ডাক্তার—আমার বন্ধু। তিনি বন্ধুর হাত চেপে ধরে বল্লেন, আপনি পারবেন একে বাঁচিয়ে তুলতে।

বন্ধু তাঁকে শান্ত করে রোগীর কাছে গেল। আমি দেখলাম রোগীকে। বিবাহিতা তরুণী বয়স বেশ অল্প। রোগের পাণ্ডুরতা সারা চোখেমুখে। কিন্তু তবু কি সুন্দর—যেন ম্লান-হয়ে-আসা একরাশ ঝরে-পড়া যূঁই।

অপরূপ সুন্দরী সে নয়, কিন্তু একটা বিস্ময়কর লাবণ্য ছিল তাকে ঘিরে। একি সেই মেয়ে?

বন্ধু রোগীকে পরীক্ষা করল। কিন্তু করবার যে কিছু আর নেই, তা বোঝা গেল তার মুখের ভাবে। রোগী একবার চোখ মেলে চাইলে। ভাষাহীন দৃষ্টি। ভদ্রলোক তার মাথা অতি সযত্নে হাতে নিয়ে মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বললেন নীলিমা এই যে আমি। বড় কষ্ট হচ্ছে? নীলি, দেখ নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনি তোমায় সারিয়ে তুলবেন।

রোগী তখন চোখ বুজেছে। তারপর আর একবার চোখ মেলেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

বাড়ির সকলে কেঁদে উঠল। এমন সোণা লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চলে গেল—দুই প্রৌঢ় নারী এই বলে কাতর চীৎকার করতে লাগলেন

সমগ্র বাঙলায় দুর্ভিক্ষ আর আসন্ন নহে—দুর্ভিক্ষ প্রলয়মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। প্রথমেই বাঁকুড়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, অন্নাভাবে মাতা তাহার সন্তানকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহার পর বহু জিলা হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—চাউলের দর প্রতিমণ ৪০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

একদিকে এই ব্যাপার; আর একদিকে বাঙলার খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল অঙ্কের যাদুর ধারা দেখাইতে চাহিতেছেন—বাঙলায় এবার আর দুর্ভিক্ষ হইবে না।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে লোক মরা আরম্ভ হইবার কয় মাস মাত্র পূর্বে প্রধান সচিব হইয়া খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন—বাঙলার মফঃস্বলে চাউল প্রতিমণ ৩৫৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। সে অবস্থায় লোক কিরূপে বাঁচিতে পারে?

এবারও ইতিমধ্যে দর সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। আর এবারও আমাদিগকে শুনান হইতেছে ভয় নাই! ইহা যে নিরবচ্ছিন্ন নির্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা বলা বাহুল্য। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন—লোকের খাদ্য হ্রাস করিলেই আর ভাবনা থাকিবে না; এবার ডিরেক্টর-জেনারেল বলিতেছেন—স্বচ্ছল অবস্থাপন্নগণ বিশেষ যাঁহারা ইউরোপীয় প্রথায় বাস করেন, তাঁহারা যদি মাছ, মাংস দুগ্ধ প্রভৃতি খাইয়া ভাত বর্জন করেন, তবে সাধারণ লোক চাউল পাইবে, কেননা চাউল দরিদ্রের আহার্য। সেবার লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছিলেন, এদেশের লোক এত অল্প আহার্য পায় যে, তাহাদিগের পক্ষে আর আহার্যের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব নহে। আর আমরা ডিরেক্টর-জেনারেলকে বলি, এদেশে ধনী কয়জন?

আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি খাদ্য বিষয়ে সরকারের সহিত সহযোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু সহযোগ কে চাহিতেছে। বাঙলার সচিবসঙ্ঘ বা বাঙলার গভর্নর কেহই এ পর্যন্ত দেশের লোকের সহযোগ চাহেন নাই এবং তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া মনে হয়, সহযোগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাতই হইবে। যেন তাঁহারা যে ভৈরবী চক্রে বসিয়া সাধনা করিতেছেন, তাহাতে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। যেন টেনিসনের 'বসনবিলাসী'-দিগের সেই ভয়ার্ত আর্তনাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতেছে বটে, কিন্তু সে কেবল—"Like a tale of little meaning though the words are strong:.

আমাদিগের বিশ্বাস, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যেমন—সচিব সঙ্ঘ সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, এবারও হয়ত "লোকহিতার্থ" তাঁহারা সেই ব্যবস্থাই করিবেন এবং সেই অবস্থায় যে সব ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে সরকার আর্থিক হিসাবে লাভবান হইবেন ও বহু লোকের জীবনান্ত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙলার সম্বন্ধে বিশেষভাবেই প্রয়োগ করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন—লোক মূল্য দিলেও খাদ্যদ্রব্য পায় না। লোক আহার্য পাইতেছে না—দেশে আবশ্যক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নাই। যে স্থানে তাহা আছে, তথা হইতে অন্যত্র অবিলম্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা চাই। ইহাতে সরকারের ব্যবস্থা-বন্ধ্যাত্ব বুঝায়। আবার কোথাও কোথাও খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত আছে, অথচ লোক খাইতে পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থা কেবল এই দেশেই সম্ভব।

মহাত্মাজী এদেশের লোকের দুর্নীতির ও লোভের কথাও বলিয়াছেন।

বাঙলার কথায় রাউল্যান্ড কমিটি বলিয়াছেন, দুর্নীতি এত প্রবল হইয়াছে যে, তাহা দূর করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা দূর করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হইয়াছে কি? কমিটি সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এই দুর্নীতিপরায়ণতা কেবল বে-সরকারী লোকের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে নাই—পরন্তু সরকারী লোকের মধ্যেও দেখা যায়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যিনি বাঙলার গভর্নর ছিলেন তিনি যেমন, তাঁহার গঠিত সচিব সঙ্ঘের সচিবগণও তেমনই নিরন্নদিগের জন্য কোনরূপ দয়া দেখান নাই; আর সচিব সঙ্ঘের সাধু চেষ্টায় নিরন্নদিগের জন্য যে খাদ্যদ্রব্য সরকারের দ্বারা ক্রীত হইয়াছিল, তাহাতেও সরকার প্রভূত পরিমাণ লাভ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব প্রদেশের সচিব সর্দার বলদেব সিংহ এক দফায় ২০ লক্ষ টাকা লাভের কথা বলিয়াছিলেন—আর কলিন গার্বেট এক দফায় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লাভের হিসাব দিয়াছিলেন।

এইরূপে বাঙলা সরকার যে টাকা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কত লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিত, তাহা কি সচিবগণ বা গভর্নর কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

আমরা বাঁকুড়ার যে পীড়াদায়ক সংবাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এবারও সরকারের সাহায্যপ্রদান ব্যবস্থার আবশ্যক সংস্কার হয় নাই। লর্ড নর্থব্রুক যখন বড়লাট, তখন তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—দরিদ্রদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া—প্রয়োজন বুঝিয়া—সাহায্যদান করিতে হইবে; এ দেশে বহু লোক—বিশেষ মহিলারা—সাধারণ সাহায্যদান কেন্দ্রে যাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

যাহাতে "টেস্ট রিলিফ" কাজ চলে, তাহাই বা কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে?

আমরা কংগ্রেসকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলিব। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এবার তাহা এখনও নিষিদ্ধ নহে। কাজেই কংগ্রেসকে এ বিষয়ে কাজ করিতে হইবে। সহযোগ করিবার আগ্রহ না দেখাইয়া কংগ্রেস বলুন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবেন—সরকার তাঁহাদিগের সহিত সহযোগ করুন, যদি সহযোগ না করেন—তবে যেন তাঁহাদিগের কার্যে বাধা না দেন। তাহার পরে কংগ্রেসকে উপযুক্ত কর্মী লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যাঁহারা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে চোরাবাজারে কারবার করিয়াছেন এবং যাঁহারা সাহায্যদানের সময় লাভবান হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে উরসদংশনদষ্ট অঙ্গুরীর মত বর্জন করিয়া কাজ করিতে হইবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যিনি বাঙলার সচিব সঙ্ঘের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন, তিনিই এবার প্রধান সচিব—সে কথা মনে রাখিতে হইবে। আর মনে রাখিতে হইবে, যিনি সে সময়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের খাদ্যসদস্য ছিলেন "এখনও তিনি সেই পদে মজুদ আছেন।

বাঙালীকেই বাঙালীকে রক্ষা করিতে হইবে। সে জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহার জন্য দেশ প্রস্তুত। দেশে আজ প্রকৃত কর্মীর অভাব নাই—সেই কর্মীদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া সাফল্যলাভ করিতে হইবে। সে বিষয়ে দেশের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য কোনরূপেই সরকারের (বিদেশী সরকারের) কর্তব্যের তুলনায় অল্প নহে।

আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গত রবিবারে কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বাঙলার সর্বত্র দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ দিবস পালিত হইয়াছে। এবার দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী।

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—
সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার পাঠক

আমার পাঠক কে জানি না। তাহারা সংখ্যায় কয়জন তাহাও জানি না। আদৌ কেহ আছে কিনা তাহাও অনিশ্চিত। তবে যখন লেখাই ব্যবসা তখন পাঠক আছে ধরিয়া লইয়া সান্ত্বনা পাইতে আপত্তি কি! আর সে সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে লিখি কোন্ ভরসায়! মিথ্যা সান্ত্বনাই বা মন্দ কি।

লেখকদের ওই এক মস্ত বিপদ যে তাহারা পাঠককে চেনে না। দোকানদার খদ্দেরকে জানে, খেলোয়াড় দর্শককে চেনে, শিক্ষক ছাত্রকে দেখে, অভিনেতা শ্রোতাকে দেখে, এমন কি তস্করেরও সুপ্ত গৃহস্থের নাসিকা গর্জন শুনিয়া তবে অগ্রসর হয়। কিন্তু লেখকে তাহার পাঠককে চেনে না—অন্তত আমি তো চিনি না। নিন্দুকে বলিবে থাকিলে তবে তো চিনিবে। কিন্তু যে বাঙলাদেশে উন্মাদের সংখ্যা অজস্র—সেখানে আমার একজনও পাঠক নাই—ইহা কি বিশ্বাস করিতে মন সরে? নিন্দুক তুমি বাঙলা দেশেরই নিন্দুক, আমার নও।

কিন্তু পাঠক চিনিতে বাধা কি? একদিন দোকানে গিয়া কিছু সময় বসিয়া থাকিলে অবশ্যই আমার পুস্তকের এক আধজন ক্রেতা আসিবে। কিন্তু সে না হয় ক্রেতাকে চিনিলাম —পাঠক কোথায়? আর একথা সুবিদিত, যে বই কেনে সে কদাচিৎ পড়িয়া থাকে। শিখণ্ডীর পশ্চাতে যেমন অর্জুন, ক্রেতার পিছনে তেমনি পাঠক। কোথায় আমার সেই আত্মগোপনকারী পাঠক যে অপরের অর্থে ক্রীত পুস্তক একান্ত মনে বসিয়া পড়িতেছে। তাহার অস্তিত্ব একেবারেই অমূলক—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? আছে, আছে বাঙলা দেশের আটাশটি জেলায় আমার আটাশ জন পাঠক নিশ্চয় আছে। 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।'

কিন্তু আমি তো দুইজন—প্র-না-বি আর প্রমথনাথ বিশী কাহার পাঠক বেশি? অধিকাংশ পাঠক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিবে—(মাত্র একজন থাকিলে তাহার better half) প্রমথনাথ বিশী আবার লেখক নাকি? প্র-না-বি লেখে বটে তবে না লিখিলেই বোধ করি ছিল ভালো। আজকাল রাজসভায় বিদূষকের পদটা লোপ পাওয়াতে প্র-না-বি গণরাজের সভায় প্রবেশ করিয়াছে আর মাথার foolscap পাট করিয়া লইয়া তাহাতে সাহিত্য রচনা করিতেছে। লোককে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে প্রমথনাথ বিশীর সংক্ষিপ্ত রূপ প্র-না-বি। পাঠকদের মধ্যে যাহারা আবার কোলরীজ ও ম্যাথু আর্নল্ড পড়িয়াছে তাহারা প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া শপথ করিয়া বলে যে দুইয়ের সত্তা কখনো এক হইতেই পারে না। এখন কোনো প্রমদানাথ বিশ্বাস আসিয়া যদি প্র-না-বি'র বইয়ের কপিরাইটের দাবী করে তবে প্রমথনাথ বিশীকে কি বিপদেই না পড়িতে হইবে। মুখের চেয়ে মুখোস প্রবল হইয়া উঠিলে এমনি হয়—আর মুখ কদাচিৎ মুখোসের চেয়ে অধিকতর চিত্ত-কর্ষক হইয়া থাকে। প্র-না-বি'র আড়ালে প্রমথনাথ বিশী অন্তর্হিত!

কিন্তু এ যেন বিজ্ঞাপনের মতো এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মতো শোনাইতেছে। কাজেই দু'চারটা সত্য ঘটনা বলি যাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে আমার পাঠকের অভাব নাই। অনেক সময় ট্রামে যাইতে যাইতে আমার পাঠককে দেখিয়াছি। লোকটা অদূরে বসিয়া দেশ পত্রিকা পড়িতেছে। দেশ যখন—প্র-না-বি'র পাতা ছাড়া আর কি পড়িবে। লোকটার আগাগোড়া একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম। সাধারণের ধারণা পাঠকের মনেই কেবল লেখককে দেখিবার আগ্রহ আছে—কিন্তু তাহারা তো জানে না পাঠক দেখিবার আগ্রহ লেখকদের কত প্রবল। লোকটাকে আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া লইলাম। কিন্তু ওই আপাদমস্তক কথাটায় বোধকরি একটু অত্যুক্তি ঘটিল। লোকটার একটি পায়ের স্থলে একটি কাঠের দণ্ড সংযুক্ত। তবে তাহার মস্তক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই—নতুবা সে প্র-না-বির পাতা পড়িতে যাইত না।

আচ্ছা লোকটা প্র-না-বির পাতার কোন অংশটা পড়িতেছে? যে অংশ লিখিবার সময়ে আমার নিঃসঙ্গ হাসি শুনিয়া অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য চাকুরি ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল—সেই অংশটা কি? নিশ্চয়ই। লোকটাও যে হাসিতেছে। জিরাফ-গ্রীব হইয়া লোকটার দিকে উঁকি মারিতে চেষ্টা করিলাম। 'আবার ছটফট করেন কেন'—পাশের যাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিল। নামিবার সময়ে লোকটির কাছ ঘেঁষিয়া আসিলাম—ইস কি তন্ময় ভাব, কি মৃদুমন্দ হাসি!—কিন্তু প্র-না-বির পাতা কোথায়? এযে নবযৌবন সালসার বিজ্ঞাপন।

এক সময়ে লেখক তাহার পাঠককে জানিত। লেখকের সহিত পাঠক একই আসরে বসিত—এই "সহিতই" সাহিত্যের প্রাণ। এখন লেখকের সহিত পাঠকের পরিচয় না থাকায় সাহিত্যের প্রাণ যেন অন্তর্হিত হইয়াছে—অন্তত তাহার যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনকার লেখক অনির্দিষ্ট অদৃশ্য পাঠকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে—সে বাণ কোথায় গিয়া পড়িল, কাহার গায়ে আঘাত করিল, লক্ষ্যের ধারে কাছেও গেল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। এমন হয় বুঝিয়াই লেখকগণ পাঠকের ভরসা ছাড়িয়া নিজের উপরে ভরসা করিয়া লিখিতে বাধ্য হয়। ফলে সাহিত্য ক্রমেই আত্মমুখী ও ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। যে কোনো লেখকের সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, তখনকার সাহিত্য ছিল উভয়মুখী ও সমগ্র গোষ্ঠীর সম্পত্তি। একান্ত আত্মমুখিতা সাহিত্যের একপ্রকার রোগ আর যাহা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত বস্তু অহা সমগ্রের কাজে লাগিতেই পারে না। এখনকার সাহিত্যিকগণ দান করে—দানের মূল্য যতই হোক তাহা গ্রহীতার পক্ষে পরস্বমাত্র। তখনকার দিনে পাঠকও ছিল সাহিত্যের পরোক্ষ স্রষ্টা।—তাহারি নিকষে লেখকের সুবর্ণের পরীক্ষা চলিত, নূতন নূতন রক্তরেখা অঙ্কিত করিয়া দিত। এখনকার লেখক শূন্যে সুবর্ণের পরীক্ষা করে—কোথাও দাগ পড়ে না।

হোমার তাঁহার শ্রোতাদের চিনিতেন, সফোক্লিস এথেন্সের দর্শকদের চিনিতেন; কালিদাস তাঁহার রাজকীয় শ্রোতাদের চিনিতেন; শেক্সপীয়র লণ্ডনের 'বীফ ও বীয়ার'ভোগী জনতাকেও জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ সেভাবে তাঁহার পাঠককে কি জানিতে পারিয়াছেন?

বস্তুতঃ 'পাঠক' শব্দটাই সাহিত্য-সম্বন্ধে আধুনিক যুগের সৃষ্টি। তখনকার দিনে ছিল শ্রোতা ও দর্শক—তাহারা শুনিত ও দেখিত—লেখকের সহিত একই আসরে বসিয়া শুনিত ও দেখিত। এখনকার পাঠক পড়ে, দোকান হইতে বই কিনিয়া লইয়া ঘরে গিয়া একাকী বসিয়া পড়ে, সে লেখক নিরপেক্ষ, যাহা সে পড়িতেছে তাহাতে তাহার সমর্থন থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার সহযোগিতা নাই। এখনকার সাহিত্য লেখকের এক পায়ে ভর করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে, তাহার চাল দ্বিপদের স্বাভাবিক চলার ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, প্র-না-বি তাহার পাঠককে চেনে না। পাঠক, তুমি কেমন আমি জানি না। তুমি কালো কি গৌর, তুমি স্থূলে না রুগ্ন, তুমি আমার রচনা পড়িতে পড়িতে আমার প্রতি রুষ্ট হইলে কি শিষ্ট বচন প্রয়োগ করিলে তাহা জানি না। জানিবার উপায়ও নাই। তুমি আমার লেখা বসিয়া পড়ো, না পড়িতে পড়িতে বসিয়া যাও, আমার রচনার আঘাতে কখনো শয্যাশ্রয় করিতে বাধ্য হও কিনা—এসব জানিবার কৌতূহল আমার থাকিলেও জানিবার উপায় কোথায়? আর আমার যদি কোন পাঠিকা থাকে তবে তাহাকেও বলি—পাঠিকা তুমি তন্বী না গৌরী, তোমার দৃষ্টির স্বর্ণমৃগী আমার রচনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয় না ব্যাধির আশঙ্কা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, কিছুই জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে সপ্তাহে সপ্তাহে প্র-না-বির পাতার বাণ নিক্ষেপ করিতেছি তাহা কোথায় কি অনর্থ ঘটাইল বা সার্থকতা লাভ করিল কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার

একটা সার্থকতাও আছে। পাঠক, তুমিও আমাকে জানো না ইহাই কালো মেঘের রজত-রেখা। জানিনে ভাগ্যক্রমে যে দু'চার জন পাঠক আছে তাহাও নিশ্চয়ই থাকিত না। অতএব বৃথা আক্ষেপ না করিয়া যুগধর্ম মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সে কালের রাজপুত রাজাদের যেমন তলোয়ারের মাধ্যমে বধূর সহিত বিবাহ হইত—একালের সাহিত্যিকদের সেই দশা। পুস্তকের মাধ্যমে, পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকের সহিত তাহাদের পরিচয়। সুতরাং অজ্ঞাত পাঠকের উদ্দেশ্যে আমি লিখিয়া যাইতেছি—আর তুমি অদৃশ্য লেখকের উদ্দেশ্যে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছ। ভাগ্যিস সে-সব কানে আসে না। আসিলে এতদিনে হয়তো লেখাই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

বিয়ে হল—কনে পেলনা টের!

ইংলণ্ডের এক সংবাদপত্রে ভারী একটা অদ্ভুত বিয়ের খবর বেরিয়েছে—জানা গেছে —ল্যামবেথের ক্লিভার স্ট্রীট নিবাসিনী মিস আইভি মে প্যাডমোর একেবারেই টের পাননি যে তিনি মিসেস মেয়েস হয়ে গেছেন যতক্ষণ না তিনি এক টেলিগ্রাফে খবর পেলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতেই প্রক্সি প্রথায় তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে চার্লস মেয়েসের সঙ্গে। এই বিয়ের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মেয়েটি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন—"গত বছর মে মাসে জার্মান বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে

মিস আইভি মে তারে খবর পেলো তার বিয়ে হয়েছে।

মেয়েস যখন এখানে আসেন—তখন তাঁর সঙ্গে আলাপটা জমে ওঠে—কিন্তু বিয়ে করার উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি মেয়েসের ছিল না বলে সে এখানে মাত্র দু'সপ্তাহ থেকেই চলে যায় তার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায়—টাকা রোজগার করতে। তারপর থেকেই আমরা দুজনে চেষ্টা করেছি এত দূর দেশ থেকেই প্রক্সি প্রথায় আমাদের বিয়েটা যাতে হয়—কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ জানান তা সম্ভব নয় কোনও মতেই। কাজেই হতাশ হয়ে দিন গুণছিলাম—হঠাৎ কদিন আগে আমি টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম যে, আমার বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েসের সঙ্গে—তার কদিন পরেই পেলাম বিয়ের সার্টিফিকেট—আফ্রিকা যাত্রার পাশপোর্ট ও একখানি টিকিট। হঠাৎ এমনভাবে কবে যে আমার বিয়ে হয়ে গেল তা টের পেলুম না—সেই দিনটির খবর আগে একটু টের পেলে মনে মনে এতদূর থেকে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মিলতে পারতুম। সেইটে যে পারলুম না এই আমার সবচেয়ে দুঃখ!" মিস প্যাড্‌মোর এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছেন—ওদেশের মায়েরা সবাই নিশ্চয় বলছেন—'এমন বিয়ে হয়নি মা কারুর!'

দার্শনিকের হলিউড দর্শন

সম্প্রতি হলিউডের এক খবরে প্রকাশ, যে, ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ঘুরতে ঘুরতে হলিউডে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে তিনি জগৎ-প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শার্লি টেম্পল ও বিখ্যাত অভিনেতা জুনিয়ার ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে পণ্ডিত রাধা-কৃষ্ণণের একটি ফটোও তোলা হয়েছে। তারপর তিনি হলিউডের স্টুডিওতে "সিন্দবাদ দি সেলার" বলে চিত্রটির এক দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ দেখতে যান। ছবি তোলা দেখে তিনি বল্লেন—"ব্যাপারটা তো ভারী মজার!" শুধু তাই নয়। তিনি যে গড়ে বছরে একটি করে সিনেমার ছবি দেখেন সে কথাও স্বীকার করেন। দার্শনিক রাধা-কৃষ্ণণের এই স্বীকৃতিতে বোঝা যায় তিনি সমস্ত কিছুকেই উদার দর্শনের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। এর পরে সিনেমা দর্শনই যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন সে কথা অস্বীকার করবে কে?

চার্চিলের সার্ট-বিভ্রাট

সম্প্রতি চার্চিল সাহেব যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন সে খবর আপনারা জানেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে ম্যানহ্যাটানের এক দর্জির দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন যে তাঁরা সেখান থেকে তাঁর সার্ট তৈরী করে পাঠাবেন। কিন্তু প্রথমেই যে সার্টগুলি সেখান থেকে এসে পৌঁছুলো, তা আর চার্চিল সাহেবের গায়ে চড়ে না। ব্যাপারটা কি? চার্চিল সাহেবের মাপ নেওয়ার সময় তাঁরা জানতে চায় যে, তাঁর মাপ কতো আর বগল থেকে হাতার ঝুলটা কত লম্বা। সেই মতো মাপ দিয়ে তিনি জানান যে, গলা ১৭॥" আর বগল থেকে হাতের ঝুল ২০ ইঞ্চি। ব্যস্, দর্জিরা ঐ মাপের অনুপাতে সার্টের অন্যান্য অংশের মাপ ঠিক করে নিয়ে সার্ট তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন কোনও সার্টই গায়ে ওঠে না।—দর্জিকে জানানো হলো—দর্জিও চার্চিল সাহেবকে তার করে জানালেন—"শিগ্গির একটা পুরানো সার্ট পাঠান—সেটা দেখেই জাম তৈরী করে পাঠাবো।" দর্জি ব্যাচারার দোষ কি বলুন? অমন বেয়াড়া বেঢপ্ চেহারার অনুপাত কি অংক কষে বের করা যায়?

চীনে একটি মহিলা নাকি একসঙ্গে আটটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। "ডিওন কুইন্সদের" মর্ষাদা ম্লান হইয়া গেল দেখিয়া আমেরিকা নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন। আমেরিকার সৈন্যদের

মধ্যে যাঁহারা এখনও ভারতে আছেন, তাঁহারা ষষ্ঠীর ব্রতকথা শিখিয়া গেলে উপকৃত হইবেন।

* * * * * * *

কানাডার সহকারী স্বাস্থ্যসচিব মহাশয় বলিয়াছেন—"পিতামাতারা যদি ছেলে-মেয়েদের নিকট মিথ্যা বলা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে আর পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না।" আমরা বলি—এই সঙ্গে স্ত্রীদের সঙ্গে মিথ্যা বলিবার নির্দেশ স্বামীদিগকে দিয়া রাখা ভাল, কেননা সচিব মহাশয় হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, স্ত্রীদের সঙ্গে "সদা সত্য কথা কহিবে" নীতি অনুসরণ করিলে বর্মা ফ্রন্টের যুদ্ধ থামিলেও গৃহযুদ্ধ লাগিয়াই থাকিবে।

* * * * * * *

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীদের উড়িবার জন্য নাকি এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করা

হইতেছে। পাল্টা জবাবে লীগ মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই ডুবিবার জন্য সাবমেরিনের ব্যবস্থা করিবেন।

* * * * * * *

স্টেটসম্যান কাগজের জনৈক পাঠক আটার পরিবর্তে শটি ব্যবহারের সুপারিশ জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—শটি তৈয়ার করার ঝামেলা অনেক, তাছাড়া ইহার ফলনও সর্বত্র হয় না। ইহা অপেক্ষা কচু সুলভ, তৈয়ার করাও সহজসাধ্য, একটু পোড়াইয়া নিলেই অপূর্ব ভিটামিনযুক্ত খাদ্য "কচুপোড়া" প্রস্তুত হইয়া যায়।

* * * * * * *

মেয়েরা ওজনে কম বলিয়া এরোপ্লেনে ভ্রমণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক সীটের দাবী জানাইয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ

প্রকাশিত হইয়াছে। মেয়েদের সঙ্গে সমানে উড়িতে হইলে পুরুষদিগকে অতঃপর Slim হওয়ার সাধনা করিতে হইবে।

* * * * * * *

সম্প্রতি নানা স্থান হইতে চাউলের দর বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁকরের দর বৃদ্ধির সংবাদ এখনও পাইতেছি না বলিয়াই আমাদের আতঙ্কটা এখনও পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায় নাই!

* * * * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—রৌপ্যের অভাব হেতু অতঃপর সিকি-আধুলি প্রভৃতি নিকেল দিয়া তৈয়ার করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"নিকেলের প্রাচুর্যই যে চিরকাল থাকিবে, তাহার ত কোন নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং খোলামকুচি দিয়া সিকি-আধুলি তৈয়ারের হুকুম দিয়া দিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।"

* * * * * * *

কলিকাতার চিঁড়িয়াখানায় নাকি শীঘ্রই গোটাকয়েক আফ্রিকার সিংহ আমদানী করা হইবে। বিশু খুড়ো বলেন—"শুনিতেছি,

বৃটিশ সিংহ নাকি শীঘ্রই Extinct হইয়া যাইবে, অন্তত Specimen-এর জন্যও কি কিছু রাখা যায় না?"

* * * * * * *

বাঙলার ভূতপূর্ব গভর্নর মিঃ কেসি এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"আমরা জেব্রা এবং জিরাফ জাতীয় প্রাণীদের দিকে যেভাবে তাকাই, এদেশের (অর্থাৎ ভারতের) অগণিত নিরক্ষর চাষীরাও বৃটিশদের দিকে ঠিক সেই-ভাবে তাকাইয়া থাকে।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"চাষীরা নিরক্ষর হইলেও Nature Studyটা ইহাদের বেশ আসে।"

* * * * * * *

মাছ-মাংস-তরিতরকারীর দর কমাইবার জন্য সরকারী প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের মধ্যে নাকি একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আশা করেন, মাছ ও তরি-তরকারীর দর অচিরেই নাকি কমিবে, কিন্তু মাংস সম্বন্ধে কোন আশ্বাস তাঁহারা আপাতত দিতে পারিতেছেন না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, কতকদিন আগে দুই বৎসরের কম বয়সের পাঁঠা-ছাগল কাটিতে নিষেধ করিয়া একটি হুকুম জারী করা হইয়াছিল। সেই পাঁঠা-পরিকল্পনার সুফল কি এখনও ফলে নাই, না পাঁঠারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবার আগে হত্যার যোগ্য হইবে না বলিয়া নূতন কোন পরিকল্পনা করা হইতেছে?

আলাপের সূত্র

বিয়ে-বাড়ির ভিড়ের মধ্যেও আপনি হয়তো একান্ত নিঃসঙ্গতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। চেনাশোনা সবাই কে কোথায় সরে পড়েছে। চারদিকে কেবল অপরিচিত মুখ। হঠাৎ আপনার পাশের ভদ্রলোক তাঁর সিগরেট কেস্ থেকে এগিয়ে দিলেন আপনার প্রিয় সিগরেট ভার্জিনিয়া নাম্বার টেন। মুহূর্তের মধ্যেই আলাপ জমে উঠলো। বন্ধুর মতো তার সঙ্গে তখন সহজভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

NUMBER TEN VIRGINIA magnums TEN CIGARETTES

নাম্বার টেন
ভার্জিনিয়া

সত্যিকার ভালো সিগরেট

জেম্‌স্ কার্লটন লিমিটেড

NTK. 130.

তাহার পক্ষে সহজ

কিন্তু আপনার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আপনার এরূপ আনাড়ীর মত চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। জি, জি, ফ্রুট স্কোয়াস ও সিরাপ গ্রহণ করিয়া আপনি টাটকা ফলের সুগন্ধ ও পুষ্টিকর সমস্ত উপাদানগুলি পাইবেন। অধিকন্তু আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে ও আপনি স্নিগ্ধ, সতেজ ও প্রফুল্ল হইবেন। নানা প্রকারের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে:— জুস—কমলালেবু, কলা, কাল জাম, ফলসা, মিশ্রিত ফল, লেমন। স্কোয়াস্—কমলা লেবু, লেমন বার্লি, লাইমজুস কর্ডিয়াল।

SQUASHES and SYRUPS

জি, জি, ফ্রুট প্রিজার্ভিং ফ্যাক্টরী—আগরা।

—বিক্রয় ডিপো—

কলিকাতা—বোম্বাই—দিল্লী—কাণপুর—বেরিলী।

জি, জি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ্।

দেশের কথা

(১৪ই জ্যৈষ্ঠ—২০শে জ্যৈষ্ঠ)

ফরিদকোটে পণ্ডিত জওহরলাল—কাশ্মীর—বাঙলায় দুর্ভিক্ষ—রেল ধর্মঘট—মিস্টার জিন্নার মত পরিবর্তন—মিশনের প্রস্তাব—গান্ধীজীর মত।

ফরিদকোটে পণ্ডিত জওহরলাল—ফরিদকোট দরবার তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য শ্রীযুত দ্বারকানাথ কাচরুকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কিন্তু গত ২৭শে মে পণ্ডিত শ্রীযুত জওহরলাল নেহরু যখন তাঁহাকে ও আরও কয়জনকে সঙ্গে লইয়া ফরিদকোট রাজ্যে গমন করেন, তখন রুদ্ধশ্বার মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—ফরিদকোট রাজ্যের রাজা পণ্ডিতজীর সহিত বহু সময়-ব্যাপী আলোচনার ফলে অনেকগুলি আপত্তিকর ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন। পণ্ডিতজী ফরিদকোটে বলিয়াছেন, তিনি সামন্ত রাজ্যের উচ্ছেদ চাহেন না; সে সকল রাজ্যে গণতন্ত্রানুমোদিত শাসন প্রবর্তনই তাঁহার কাম্য।

কাশ্মীর—কাশ্মীর রাজ্যে গণ-আন্দোলন যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আশঙ্কার বিষয়। কাশ্মীরে কাশ্মীরী পুলিশ তাহাদিগের নিরস্ত্র ভ্রাতা-ভগিনীদিগের উপর লাঠিচালনা করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে—কয়জনকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। পুলিশের গুলীতে নিহতের সংখ্যাও অল্প নহে। ওদিকে হিন্দু ও শিখ সংখ্যাল্পদিগের প্রতিনিধি সমিতি ডক্টর স্যার গোকুলচাঁদ নারাঙের নেতৃত্বে মত-প্রকাশ করিয়াছেন—বর্তমান আন্দোলন কাশ্মীরে মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দুদিগের পক্ষ হইতেও স্বতন্ত্রভাবে ঐ কথা বলা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদে যেমন শাসক মুসলমান হইলেও অধিকাংশ প্রজা হিন্দু, কাশ্মীরে তেমনই শাসক হিন্দু হইলেও প্রজাদিগের অধিকাংশ মুসলমান। কিছুদিন হইতে মুসলমানরা হিন্দুর প্রাধান্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভও করিয়াছেন। বর্তমান আন্দোলন—বিলাতের মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে ভারতবর্ষে প্রকারান্তরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আয়োজনকালে—সেই বিরক্তির অভিব্যক্তি কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। আন্দোলনকারীরা 'মহারাজা দূর হও' ধ্বনি তুলিয়াছেন। বোধ হয়, আন্দোলনকারীদিগের অন্যতম নেতার বিচারে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষ—বাঙলায় মফঃস্বলে চাউলের দাম স্থানে স্থানে ৪০ টাকা মণ হইয়াছে। অথচ বাঙলা সরকারের খাদ্য-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল বলিতেছেন—বাঙলায় এবার দুর্ভিক্ষ হইতেই পারে না। তিনি হিসাবের ইন্দ্রজালের আশ্রয়ও গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানাস্থানে যেভাবে সরকারের সঞ্চিত খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পচিয়া অখাদ্য হইয়াছে, তাহারও সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্বৈর-ক্ষমতা-পরিচালনবিলাসী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না। মাতা অন্নাভাবে সন্তানকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। অথচ বলা হইতেছে, দুর্ভিক্ষ নাই—হইতেই পারে না। গত ২রা জুন কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ "প্রতিরোধ দিবস" পালিত হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস এখনও কোন কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে; লোক খাইতে পাইতেছে না; যেস্থানে অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত আছে তথায়ও লোক অনাহারে মরিতেছে, আর সেরূপ স্থান হইতে অন্যত্র অবিলম্বে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে না; এসব সরকারের ব্যবস্থার বন্ধ্যাত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি আমাদিগেরও দুর্নীতির ও লোভেরও নিন্দা করিয়াছেন। অবশ্য এই 'আমাদিগের' মধ্যে তিনি সরকারী কর্মচারীদিগকেও লইয়াছেন। আজও সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জনগণের সহযোগ প্রার্থনা করেন নাই—জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করেন নাই। সাহায্যদান-ব্যবস্থারও যে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইতেছে, এমন মনে করা যায় না। যদি অবস্থা এইরূপ থাকে, তবে এবার লোকক্ষয় কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা মনে করিলে আতঙ্কিত হইতে হয়।

রেল ধর্মঘট—রেল ধর্মঘট বোধ হয়, নিবারিত হইল না। যদি ইতিমধ্যে কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না হয়, তবে আগামী ২৭শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে ধর্মঘট আরম্ভ হইবে। সরকার রেল কর্মচারীদিগের দাবী খণ্ডন করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ধর্মঘট বন্ধ করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সহায়তা চাহিয়াছেন বটে কিন্তু শাসন-পরিষদের সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল শাসাইয়াছেন,—এখন যদি ধর্মঘট করা হয়, তবে তাহা বে-আইনী হইবে। এখনও ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহৃত হয় নাই। সুতরাং স্যার এডওয়ার্ড মনে করিতে পারেন, আইনের বলে তিনি ধর্মঘটকারীদিগকে পিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কি মনে করেন, যখন বহু লোক দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন আইনের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে ভীত করা যায়? তিনি যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন, তবে যে তিনি ব্যাপারটি আরও জটিল করিয়া তুলিতে পারেন, এরূপ মনে করিবার কারণ যে আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

মিস্টার জিন্নার মত পরিবর্তন—মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে মিস্টার মহম্মদ আলী জিন্না যে মত পরিবর্তন করিবেন, তাহা পূর্বেই বুঝা গিয়াছিল। তাঁহার অনুবর্তীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, লীগ মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে তাঁহারা আর লীগে থাকিবেন না; কোন কোন চতুর বলিয়াছিলেন, "এক লম্ফেতে পাকিস্তান পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া তাঁহারাই কৌশলে পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য মিশনকে বর্তমান প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন। মিস্টার জিন্নাও বলিয়াছেন—প্রস্তাবে পাকিস্তান প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, কেবল একটু রকম ফের। এখন তিনি বলিয়াছেন—কেবলই কলহে আর তাঁহার মত নাই; তিনি মুসলমানদিগের ও মুসলমানাতিরিক্তদিগের সাহায্যে ভারতে মুসলমানদিগের দুঃখকষ্টের অবসানই করিতে চাহেন।

মিশনের প্রস্তাব—মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব যতই আলোচিত হইতেছে, তাহার ত্রুটি ততই সপ্রকাশ হইতেছে, অর্থাৎ তাহার বর্ণক্ষেপ যতই দূর করা হইতেছে, ততই তাহার অসারতা ও অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে পাঞ্জাবেই প্রথম ঝটিকার আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা। আর মুসলিম লীগ যে উহা গ্রহণের মনোভাবই দেখাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়—ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব যে রচিত হইয়াছে সে কেবল বৃটেনের স্বার্থরক্ষার্থ—প্রকৃতপক্ষে ভেদনীতির পরিকল্পনাই হইয়াছে—পাকিস্তান কায়েম করিবার ব্যবস্থাই হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর মত—মহাত্মা গান্ধী মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে যে আন্তরিকতা আছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার নানা ত্রুটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন—(১) বৃটেনের সেনাবল অপসারণের সময় নির্দেশ করা হয় নাই, (২) সামন্ত রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা সর্বতোভাবে অস্পষ্ট; সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য, (৩) প্রদেশসমূহের সঙ্ঘে যোগদানের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হইয়াছে, (৪) ভারতবর্ষকে সার্বভৌম স্বাধীনতা প্রদানের কোন কথাই নাই। এই সব ত্রুটি যে মিশনের ইচ্ছাকৃত তাহা মহাত্মাজী না বলিলেও অনেকের বিশ্বাস ত্রুটি ইচ্ছাকৃত—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার্থ।

লতিফা

মোসে স্মিল্যান্স্কি

[প্যালেস্টাইনের ইহুদী আরব জাতিবিদ্বেষ বর্তমান পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা। আলোচ্য গল্পে এই সমস্যা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পটির লেখক মোসে স্মিল্যান্স্কি একজন বিখ্যাত ইহুদী লেখক। ১৮৭৪ সালে রুশিয়ায় তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ১৮৯১ সালে তিনি প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। তদবধি তিনি প্যালেস্টাইনেই আছেন ও সেখানে হিব্রু সাহিত্য রচনায় এবং প্রসারে অগ্রণীর স্থান দখল করেছেন। শুধু ইহুদীদের কাহিনীই তাঁর গল্পের উপজীব্য নয়— সুদূর গ্রামবাসী আরব ও বেদুইনদের কথাও তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়ে ওঠে। তাঁর লেখার শক্তি ও মাধুর্য অনস্বীকার্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো যে কোন দেশের সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারে।]

"লতিফার চোখ না দেখে থাকলে চোখ কত সুন্দর হতে পারে তা জানা যায় না।" এই কথা আমি যখন বলতাম তখন আমি ছিলাম ছোট ছেলে—আর লতিফা ছিল ছোট একটি আরব মেয়ে—তখনও শিশু বললেই চলে।

তারপর এতগুলো বৎসর চলে গেছে—আমি আজও এই কথাই বলি।

সময়টা ছিল জানুয়ারী মাস, বর্ষাকাল। আমি একদল আরবের সঙ্গে ছিলাম ক্ষেতে—তারা আমার প্রথম আঙ্গুর ক্ষেত তৈরী করছিল। আমার মনে ছিল উৎসবের আনন্দ, আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছিল তারই আভাস। দিনটা ছিল সুন্দর, উজ্জ্বল। বাতাস ছিল পরিষ্কার, মৃদু, ঈষদুষ্ণ এবং তেজোদায়ক। পূর্ব দিকে দণ্ডায়মান সূর্য থেকে সব জিনিসের উপর ঝরে পড়ছিল একটা প্রাতঃকালীন রক্তাভ দ্যুতি। নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ফুসফুসকে পূর্ণ মাত্রায় ভরে ফেলে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছিল। চতুর্দিকের সব কিছুই ছিল সবুজ এবং অকর্ষিত পাহাড়ের উপর লাবণ্যময় সুন্দর বন্য ফুলগুলো দুলছিল।

ইট এবং 'ইঞ্জিল' পরিষ্কারকারিণী আরব মেয়েদের মধ্যে আমি একটি নতুন মুখ দেখলাম। সে মুখটি একটি চৌদ্দ বৎসর বয়সের সজীব সতেজ কিশোরীর—তার পরনে নীল পোষাক। একটা শাদা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে তার মাথাটি ঢাকা, আর অপর প্রান্ত পড়েছে তার কাঁধে।

আমি লিখে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "তোমার নাম কি?"

সুন্দরী লাজুক মেয়েটি তার ছোট মুখটি আমার দিকে ফেরালো—আর তার কালো চোখ দুটি চক চক করে উঠল।

"লতিফা।"

তার চোখ দুটো ছিল সুন্দর—বড়, কালো এবং দ্যুতিময়। চোখের মণি দুটো সুখ এবং জীবনের আনন্দে টলমল করছিল।

"সেখ সোরাবজীর মেয়ে" বললে আতালা নামে একজন তরুণ আরব; সে সেই মুহূর্তে একটা বড় পাথর সরাচ্ছিল। সে যেন এখনই কথাগুলো বাতাসে ছুঁড়ে দিল।

"সুন্দর গ্রীষ্মের রাতে ঠিক দুটি তারার মতন"......আতালা দুষ্টু চোখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তার সুন্দর দৃঢ় কণ্ঠে গান গাইতে লাগল।

সেদিন থেকে আমার কাজে দেখা দিল নতুন আগ্রহ। যখনই নিজেকে ক্লান্ত বা বিষণ্ণ মনে হত তখনই তাকাতাম লতিফার দিকে; ম্যাজিকের যাদু স্পর্শ লেগেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আমার বিষণ্ণতা এবং অবসাদ যেত কেটে।

সময় সময় আমি অনুভব করতাম যে লতিফাও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায়ই তার চোখের দীপ্তি আমি অনুভব করতাম এবং কখনও কখনও তার দৃষ্টিতে বিষাদও মাখানো থাকত।

একবার আমি আমার ছোট ধূসর রংয়ের গাধাটায় চড়ে মাঠে যাচ্ছিলাম। কুয়োর ধারে দেখা হল লতিফার সঙ্গে—তার মাথায় কলসী। সে শ্রমিকদের জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছিল।

"লতিফা, কেমন আছ?"

"আমার বাবা আমাকে কাজ করতে যেতে দেবে না"......কথাগুলো তার ঠোঁট থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এল যে মনে হল যেন সে বহুদিনের চাপা দেওয়া কোন কিছুর হাত থেকে তার হৃদয়কে মুক্ত করতে চাইছে। তার গলার স্বর বিষণ্ণ যেন কোন বিপদপাত হয়েছে।

"কাজ করার চেয়ে তোমার কি বাড়িতে থাকতে বেশী ভাল লাগে না?"

লতিফা আমার দিকে তাকালো, তার চোখ দুটো হয়ে উঠল ম্লান—যেন তার চোখের উপর ছায়া পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নীরব রইল।

"আমার বাবা আগরের শেখের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়।"

"আর তুমি কি চাও?"

"আমার বরং মরণ ভাল......"

আবার সে নীরব হল। তারপর সে প্র[illegible] করল: "হাওয়াজা, একথা কি সত্যি আপনাদের জাতের লোকেরা মাত্র একবার বি[illegible] করে?"

"সত্যি, লতিফা।"

"আর আপনারা স্ত্রীদের মারেন না?"

"না। যে নারী পুরুষকে ভালবাসে ও পুরুষ যাকে ভালবাসে, তাকে কি মারা যায়

"আপনাদের মধ্যে মেয়ে যাকে চায় তা[illegible] বিয়ে করতে পারে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আর আমাদের ওরা বিক্রী করে ভারবা[illegible] পশুর মতন......"

এই মুহূর্তগুলোতে লতিফার [illegible] দুটো আরও সুন্দর দেখালো—আরও গভ[illegible] আরও কালো। একমুহূর্ত পরে সে বল[illegible] "আমার বাবা বলে যে আপনি যদি মুসল[illegible] হতেন, তবে আমাকে সে আপনার হা[illegible] তুলে দিত......"

"আমার হাতে?"

আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও সশ[illegible] হেসে উঠলাম। যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ চোখ দু[illegible] তুলে লতিফা আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম: "লতিফা, তুমি ইহু[illegible] ধর্ম গ্রহণ কর, আমি তোমায় বিয়ে করব।"

"বাবা তাহলে আমাকে ও আপনা[illegible] —দুজনকেই হত্যা করবে।"

পরদিন শেখ সোরাবজী আমার আঙ[illegible] ক্ষেতে এল।

বৃদ্ধ সোরাবজীর মুখে ছিল সুন্দর শা[illegible] দাড়ি, মাথায় দীর্ঘ টুপি, একটা তেজস্বি[illegible] শাদা ঘোড়াতে চড়ে সে আসত। ঘোড়াটা সতে[illegible] লাফিয়ে লাফিয়ে চলত।

সে শ্রমিকদের অভিবাদন জানা[illegible] শ্রমিকরাও সবাই সবিনয়ে প্রত্যাভিবাদন জানি[illegible] নীরব হয়ে রইল। আমার প্রতি সে এক তীব্র দৃষ্টি হানল এবং তিক্ত কণ্ঠে আম[illegible] অভিবাদন জানাল। আমিও সমান শৈত্যে সঙ্গে জবাব দিলাম। শেখ ও ঔপনিবেশিকে[illegible] মধ্যে প্রেমের ব্যত্যয় ছিল না; তারা সব ইহুদীদের ভীষণ ঘৃণা করত।

তার মেয়েকে দেখে শেখের রাগ গেল চ[illegible] সে সগর্জনে বললে: "এই ইহুদীর কা[illegible] আসতে তোকে আমি বারণ করি নি?"

"মুসলমান হয়েও তোমরা যারা কাফেরে[illegible] কাছে শ্রম বিক্রী কর, তোমাদেরও ধিক্!"

তার হাতের ছড়িটা কয়েকবার লতিফার মাথায় ও কাঁধে পড়ল। ভীষণভাবে রেগে যাওয়ায় আমি তার দিকে এগোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু লতিফা, বিষন্ন, কালো, অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকালো—যেন আমায় নীরব থাকার জন্যে অনুরোধ জানালো।

শেখ এবং তার মেয়ে চলে গেল। শ্রমিকরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

"শেখ সোরাবজী হৃদয়হীন" একজন বললে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেঃ "সে আর এখন অর্ধেক মজুরী দিয়ে শ্রমিকদের সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটানোর সুযোগ পায় না বলেই এতটা ক্ষেপে গেছে। ইহুদীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।"

ঠোঁটে মৃদু দুষ্টু হাসির লহর খেলিয়ে আতালা বললেঃ "ও আজ কেন রেগেছে আমি তা জানি!"

লতিফা আর কাজ করতে ফিরে এল না।

যে বাড়িতে সাধারণত আমি আহারাদি করতাম সে বাড়ি থেকে আসার পথে কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন বিকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হল। সে বাড়ির বাইরে মাটিতে রেগো বিক্রীর জন্যে বসে ছিল। আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো দেখলাম আরও সুন্দর আরও বেশী করুণ।

"কেমন আছ লতিফা?"

"ধন্যবাদ, হাওয়াজা!"

তার গলা কাঁপছিল। লতিফা প্রায়ই রেগো বিক্রয় করতে আসত এবং সর্বদা দুপুর বেলাতেই আসত......

একদিন আতালা আমায় বলল ঃ "হাওয়াজা, লতিফা আগরে গেছে: শেখের ছেলে তাকে বিয়ে করেছে—লোকটা কুৎসিৎ আর বেঁটে......" তার কথাগুলো আমার বুকে ছুরির মত বিঁধল।

পরে আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে লতিফার স্বামীর বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে, লতিফা পালিয়ে চলে এসেছিল বাপের বাড়ি—আবার তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্বামীর বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কয়েক বৎসর চলে গেল। আমি নিজের তৈরী করা বাড়িতে বাস করছিলাম। অন্যের কালো চোখ আমাকে লতিফার কালো চোখের কথা ভুলতে বাধ্য করেছিল।

একদিন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে দুইজন বৃদ্ধা আরব রমণী মুরগী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"তোমরা কি চাও?"

একজন নারী উঠে দাঁড়াল এবং আমার দিকে তাকাল।

"হাওয়াজা মুসা?"

"লতিফা?"

হাঁ, লতিফাই; এই কুঞ্চিত শীর্ণ মুখ বৃদ্ধা নারী। সে "বৃদ্ধা হয়ে পড়েছিল—কিন্তু তার চোখে সেই পুরনো দিনের দ্যুতির অবশেষ তখনও ছিল।

"আপনি দাড়ি রেখেছেন, কেমন যেন বদলে গেছেন—" সে আমার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে মৃদু স্বরে বলল।

"তুমি কেমন আছ? তুমি এত বদলেছ কেন?"

"হাওয়াজা, সবই আল্লার দয়া!"

সে নীরব হল। তারপর বলল ঃ "হাওয়াজা মুসা বিয়ে করেছেন?"

"হাঁ, লতিফা।"

"আমার তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে......"

আমি স্ত্রীকে বাইরে ডেকে আনলাম। লতিফা বহুক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার চোখে জল......

তারপর থেকে আমি আর লতিফাকে দেখিনি।

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক

রঙ্গজগতে

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তৎকারণে প্রমোদগৃহের আয় বৃদ্ধি দেখে প্রমোদ ব্যবসায়ীরা রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছেন। যুদ্ধের দরুণ মালমসলার দুষ্প্রাপ্যতা হেতু প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যায় প্রমোদগৃহ নির্মাণ সম্ভব হয়নি তবুও টুকটাক করে গুটি সাতেক নতুন চিত্রগৃহ এবং একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছে, কমপক্ষে নটি চিত্রগৃহের এই বছরের মধ্যেই উদ্বোধন হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাছাড়া নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আরও প্রায় পনেরটি চিত্রগৃহের। প্রমোদগৃহ বাড়ছে ভাল কথাই, জনসাধারণ বেশ করে প্রমোদ উপভোগ করার

নবাগতা শ্রীমতী অশ্রুতা রায়। এলায়েড ফিল্মসের পরবর্তী চিত্রে ইহাকে দেখা যাইবে।

সুযোগ পাবে—বেশি সংখ্যক ছবি দেখবে, বেশি নাটক মঞ্চস্থ হতে পারবে। জনসাধারণের লাভ কিন্তু ঐখানেই সীমাবদ্ধ। আরাম ও সুখসুবিধা বলে যে কিছু আছে ব্যবসায়ীরা বোধহয় অভিধানে সে শব্দগুলি খুঁজে পান না। নতুবা এই হালে মাত্র কমাস আগেও যেসব প্রমোদগৃহ উদ্বোধিত হয়েছে আর ত্রিশ বছর আগেকার তৈরী গৃহগুলির মধ্যে জনসাধারণ তেমন পার্থক্য খুঁজে পায় না কেন? বাইরেকার একটু আকারের পরিবর্তন ছাড়া তৎকালের এবং হালফিলের তৈরী প্রমোদগৃহগুলির মধ্যে তফাৎ তো কিছু দেখা যায় না—অবশ্য একমাত্র তফাৎ যা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে উন্নততর প্রক্ষেপণ; এটা অবশ্য আপনা থেকেই হতে বাধ্য হয়, কারণ প্রক্ষেপণযন্ত্র বিদেশীদের, তারা অনবরতই যন্ত্রের উন্নতি করে যায় এবং প্রতিবছরই উন্নততর মডেল বাজারে ছাড়ে আর পুরনো মডেল আমদানী ও বিক্রী বন্ধ করে দেয়—সুতরাং নতুন চিত্রগৃহকে নতুন যন্ত্র বসাতেই হয়, তা নয়তো আমাদের প্রমোদব্যবসায়ীরা পুরনো যন্ত্র সস্তায় পাওয়া গেলে তাই নিয়ে কাজ চালাতে দ্বিধা করতো না। নতুন চিত্রগৃহের সঙ্গে পুরনোদের তফাৎ তাই শুধু এইটুকুই। নয়তো কি নতুন আর কি পুরাতন সেই কষ্টদায়ক ঘিঞ্জী আসন, অপরিসর যাতায়াত পথ, ভ্যাপসা গরম, পানবিড়িওয়ালাদের কর্ণবিদারক চীৎকার, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঞ্জাল, ময়লা জীর্ণ পোষাক পরা পরিচারক দল, পানের পিচ ফেলায় উৎসাহিত করার জন্য গায়েতেই পানের দোকান, হলের বাইরে পা ছড়িয়ে বেড়াবার বা বিশ্রাম করার জায়গার অভাব, টিকিট বিক্রীর বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা, রাস্তায় গুণ্ডাদের টিকিট বিক্রী, প্রদর্শন আরম্ভ হওয়ার আগে পেঁছলে অপেক্ষা করার জায়গার অভাব, বিরামকালে বিরক্তিকর শ্লাইডের প্যারেড—সব কিছুই একই। প্রমোদ-ব্যবস্থার নামে লোককে পীড়ন করার এর চেয়ে ভাল উদাহরণ জগতের আর কোন দেশে পাওয়া যায় বলে আমরা শুনিনি। সিনেমা বা থিয়েটার শুধু প্রমোদ-গৃহই নয়, অবসর বিনোদনেরও স্থান এবং দেখাও গিয়েছে যে এরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ প্রমোদগৃহগুলিই বেশী দর্শক আকর্ষণ করে। প্রমোদ আহরণ আজকাল একটা অতি প্রয়োজনীয় বিলাস এবং তা যদি এমন ন্যাক্কারজনক আবহাওয়ার মধ্যে পেতে হয় তো মন বিশ্রাম ও সরসতা লাভ করার চেয়ে ক্লান্তি ও বিকৃতিই লাভ করে বেশি। কোন কোন দেশে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দর্শকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রমোদগৃহের ওপরে নানারকম নির্দেশ থাকে। আমাদের এখানে স্বাস্থ্যের হানি রোধ করার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কতক নিয়ম পালন করার আইন আছে, কিন্তু তা পালন করা তো হয়ই না, পালন করা হচ্ছে কি-না তাও দেখবার ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ প্রমোদগৃহে মশা, ছারপোকার উৎপাত ছবি বা নাটক উপভোগে মস্ত অন্তরায় হয়ে ওঠে। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে না কোথাও, বাথরুমগুলি ব্যবহারের অযোগ্য এমনি নোংরা দুর্গন্ধময়। প্রমোদগৃহগুলিতে প্রতিদিন সহস্রজনের আসা যাওয়া ঘটে; নানা উপায়ে বহু রোগের জীবাণু আমদানী হয় কিন্তু প্রতিষেধক ব্যবহারের কোন ব্যবস্থাই নেই। আমাদের দেশের লোক নিতান্তই নির্বিরোধী বলেই এই সমস্তই বরদাস্ত করে যায়, অন্য দেশ হলে ভিন্ন কথা হতো। এসব দিক উপেক্ষা করে যাওয়ার সময় চলে গিয়েছে। প্রমোদগৃহের মালিকরা নিজেদের থেকে দর্শকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাহা তাদের বাধ্য করার জন্যে দরকার মত আই প্রণয়ন করাও উচিত।

বিবিধ

মোটামুটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ভারতে প্রায় পঞ্চাশটি স্টুডিওর ৬৫টি শব্দযন্ত্রে ২৭৫ জন পরিচালক ৩৫০ খানি ছ তোলায় বর্তমানে রত আছে; যার জ কলাকুশলি নিযুক্ত রয়েছেন আলোকচিত্রশিল্প ও শব্দযন্ত্রী ১০০-এর কিছু বেশি জন ক —সংগীত পরিচালক প্রায় ১৫০ আ মুখ্যভূমিকায় অভিনয়শিল্পী ১০০০-এ কিছু বেশি জন।

* * *

সুপরিচিত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বঙ্গী চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের সম্পাদক এস এ বাগড়ে রক্সী সিনেমার ম্যানেজার পদ ছে মেট্রো সিনেমার সহকারী ম্যানেজার পদ গ্রহ করেছেন। 'চিত্রপ্রদর্শন ক্ষেত্রে এস এম

অভিজ্ঞতা মেট্রোকে অচিরেই দিশী দর্শকপ্রধান চিত্রগৃহে রূপান্তরিত করে তুলতে পারবে বলে আমাদের আশঙ্কা হয়।

*　*　*

ন্যাশনাল সিনে-ইণ্ডাস্ট্রিজ নামে বিশ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে কলকাতায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে যার মূলে আছেন এম্পায়ার টকীর মিঃ হেমাদ ও মিঃ খেমকা।

*　*　*

উদয়শঙ্করের 'কল্পনার' সর্বভারতীয় স্বত্ব শোনা গেল বিশ লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়েছে এবং কিনেছে কলকাতারই কেউ। ভারতীয় ছবির এইটেই সর্বাধিক মূল্য।

*　*　*

বিলেত ফেরতা মিস শীলা দত্ত অরোরা ফিল্মসের আগামী চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার চুক্তি করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

*　*　*

চোরাবাজারে বা যুদ্ধের ঠিকাদারিতে কিছু পয়সা করে এখন ছবি তৈরীতে নেমে দু'পাঁচ হাজার খরচে দু'এক রীল কোনক্রমে তুলে রীলগুলি কাঁধে নিয়ে পরিবেশক পাড়ায় দাদন যোগাড়ের আশায় ঘুরে বেড়াতে বহু প্রযোজককেই দেখা যাচ্ছে আজকাল।

*　*　*　*　*　*

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার সম্প্রতি বম্বে গেছেন নীতিন বসু পরিচালিত বম্বে টকীজের 'নৌকাডুবি' চিত্রে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাদানের জন্য। রবীন্দ্র-সংগীতে অনাদিবাবু যোগ্য ব্যক্তি, এবং আমাদের ভরসা আছে 'নৌকাডুবি' চিত্রে সেই যোগ্যতার পরিচয় আমরা পাব।

*　*　*　*　*　*

প্রেমেন্দ্র মিত্র আওয়ার ফিল্মসের হয়ে যে ছবিখানি তুলছেন তার নাম 'কঙ্কনতলা লাইট রেলওয়ে'। বলা বাহুল্য কাহিনী তার নিজেরই রচনা।

*　*　*　*　*　*

এম্পায়ার টকীর শান্তারাম হেমাদ ও মেট্রোপলিটন পিকচার্সের বজরঙলাল খেমকা মিলিতভাবে টালিগঞ্জে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর বিপরীত দিকে এক চলচ্চিত্র রসায়নাগার স্থাপন করছেন—নাম, ক্যালকাটা ফিল্ম লেবরেটরী।

*　*　*　*　*

আফ্রিকার চলচ্চিত্র 'রাজা' নামে খ্যাত শ্যামজী শেঠ গত এপ্রিলে রাজকোটে পরলোকগমন করেছেন। ষোল বছর বয়সে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি আফ্রিকায় যান এবং নানা জিনিসের ব্যবসায়ে অল্পকালের মধ্যে 'ধনপতি' হয়ে ওঠেন। আফ্রিকার চলচ্চিত্র ব্যবসায়েই শুধু নয়, বম্বের চলচ্চিত্র শিল্পেও তার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খাটছে।

*　*　*　*

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহে দু'কোটি আট লক্ষ লোক টিকিট কিনে ছবি দেখে।

খেলাধূলা

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের সকল খেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। মোহন-বাগান ক্লাব কোন খেলায় পরাজিত না হইয়া লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগান অপেক্ষা একটি মাত্র পয়েন্ট কম পাইয়া দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইয়াছে। ইহাদের পরেই তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে বি এ রেল দল। তবে লীগ তালিকার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ও ভবানীপুর এই তিনটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার সম্ভাবনা আছে।

নিম্নস্তরের খেলা

লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধের খেলা দেখিয়া কোন দিনই আনন্দলাভ করা যায় নাই। বাঙলার ফুটবল খেলার স্ট্যান্ডার্ড যে খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশিষ্ট ক্লাব সমূহের পরিচালকগণ খেলোয়াড় তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা না করিয়া খেলোয়াড় আমদানী করিবার জন্যই বিশেষ ব্যস্ত। ইহাদের 'আমদানী' মনোবৃত্তি কতদিনে শেষ হইবে বলা কঠিন। এখনই ইহারা যে অবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে খেলার মাঠে গিয়া বুঝা ভার বাঙলা দেশে আছি না বাঙলার বাহিরে আছি। মোহনবাগান ক্লাবের পরিচালকগণের সম্বন্ধে আমাদের অন্যরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু ইহারা বর্তমানে 'আমদানী' রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। হকি দল গঠনে ইহারা প্রথমে এই রোগের কবলে পড়েন, তাহার পর দেখা যাইতেছে, ফুটবল দল গঠনে রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই, বরঞ্চ শয্যাশায়ী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সত্যই দুর্ভাগ্যের বিষয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এই 'আমদানীর' বিরুদ্ধে বহু উক্তি করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। সেইজন্য মনে হয় ইহাও বোধ হয় অরণ্যে রোদনে পরিণত হইবে।

সমর্থকদের গুণ্ডামী

বাঙলার ফুটবল খেলার ইতিহাসে আলোচনা করিলে দেখা যায় দলের সমর্থকগণ পরিচালকের ত্রুটিবিচ্যুতিতে বিরক্ত হইয়া খেলার শেষে পরি-চালককে আক্রমণ করিয়াছেন। কখনও কখনও খেলোয়াড় সমর্থকগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যাইবে না দল পরাজিত হইয়াছে বলিয়া সমর্থকগণ উত্তেজিত হইয়া গুণ্ডার ন্যায় বিজয়ী দলের খেলোয়াড়-গণকে আক্রমণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের তাঁবুতে পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া আসবাবপত্র নষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি মহমেডান স্পোর্টিং ও ভবানীপুর দলের লীগের খেলার শেষে ইতিহাসের এই অংশটি পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর ফুটবল মাঠে আরও কি ঘটনা ঘটিবে তাহা দেখিবার জন্যই আমরা উদগ্রীব হইয়া বসিয়া আছি। তবে এক এক সময় মনে হইতেছে বাঙলা দেশে ফুটবল খেলা বন্ধ করিয়া দিবার মত অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। একে খেলাটি উত্তেজনা-বর্ধক তাহার পর সমর্থকগণ যখন সেই উত্তেজনার বলে পশু প্রবৃত্তি লাভ করিতেছেন, তখন সেই খেলা প্রচলন করিয়া লাভ কি? খেলাধুলার প্রধান উদ্দেশ্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলী আহরণের সুযোগ করিয়া দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন খেলা বন্ধ করিয়া দিলে ক্ষতি কি? তাহা ছাড়া ফুটবল খেলা আমাদের জাতীয় খেলা নহে। সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে জাতীয় সম্মানহানি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

প্রথম ডিভিসন

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েন্ট
মোহনবাগান	১৩	১০	৩	০	৩৫	৩	২৩
ইস্ট বেঙ্গল	১২	৯	২	১	৩৩	৭	২০
বি এ আর	১২	৮	২	২	২৭	৪	১৮
মহমেডান স্পোর্টিং	১২	৭	৩	২	১৩	৫	১৫
ভবানীপুর	১০	৭	১	২	১১	৭	১৫
কালীঘাট	১১	৬	১	৪	২৫	১৭	১৩
এরিয়ান্স	১২	৫	০	৬	১৭	১১	১০
ডালহৌসী	১১	৫	০	৬	২৪	১৮	১০
স্পোর্টিং ইউঃ	১১	৪	২	৫	১৪	১৫	১০
রেঞ্জার্স	১৩	২	২	৯	১৪	২৮	৬
ক্যালকাটা	১৩	৩	০	১০	২০	৩২	৬
পুলিশ	১০	১	০	৯	৬	৩৬	২
কাস্টমস	১০	০	০	১০	৫	৬৯	০

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত ইংল্যান্ড দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ আগামী ২২শে জুন হইতে লর্ডস মাঠে আরম্ভ হইবে। ইংল্যান্ড দল শক্তিশালী করিয়া দল গঠনের জন্য ট্রায়াল ম্যাচের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ট্রায়াল ম্যাচে যে সকল খেলোয়াড় খেলিবেন তাঁহাদের মধ্য হইতেই যে ইংল্যান্ড দল গঠিত হইবে তাহা নহে তবে অধিকাংশ খেলোয়াড় ট্রায়াল ম্যাচ হইতে নির্বাচিত হইবেন। ভারতীয় দল ইংল্যান্ড ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া যেরূপভাবে পর পর খেলায় জয়লাভে সমর্থ হইতেছেন তাহাতে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয় দল ৯টি খেলায় যোগদান করিয়া ৬টি খেলায় যেরূপভাবে সাফল্য-লাভ করিয়াছে ইতিপূর্বে কোন বৈদেশিক দলের পক্ষে ইংল্যান্ডে এইরূপ গৌরব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য প্রথম টেস্ট ম্যাচে খুব শক্তিশালী করিয়া দল গঠন করিবার প্রচেষ্টা হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? ভারতীয় ক্রিকেট দল ভ্রমণে যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে টেস্ট খেলায় তাহা অক্ষুণ্ণ রাখে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভারতীয় দল বনাম ইণ্ডিয়ান জিমখানা

মিডলসেক্সের অস্টারলী পার্কে ভারতীয় দলের সহিত ইণ্ডিয়ান জিমখানা দলের একদিন-ব্যাপী এক খেলা হয়। এই খেলায় ইণ্ডিয়ান জিমখানার পক্ষে অধ্যাপক দেওধর, এল কন-স্ট্যান্টাইন, ডি এন রায়জী, আর এস কুপার প্রভৃতি খেলোয়াড় যোগদান করেন। তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় দল অতি সহজেই ৬ উইকেটে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছে। খেলার ফলাফলঃ—

ইণ্ডিয়ান জিমখানা দলঃ—৯৭ রাণ। (আর এস কুপার ২২, কনস্ট্যান্টাইন ১৮, মানকড় ২৩ রাণে ৩টি, সি এস নাইডু ২০ রাণে ৩টি ও সিন্ধে ৫ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলঃ—৮ উইঃ ১৪৯ রাণ; (মার্চেণ্ট ৩০, মোদী ৫১, ক্লার্ক ৬৪ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ভারতীয় বনাম হ্যাম্পসায়ার দল

সাউদাম্পটন মাঠে ভারতীয় বনাম হ্যাম্পসায়ার দলের তিনদিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় ভারতীয় দল ৬ উইকেটে বিজয়ী হইয়াছে। তবে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৩০ রাণ করে। ইহা ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা কম রাণ। হ্যাম্পসায়ার দলের বোলার নট এই বিপর্যয়ের কারণ। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলিয়া খেলায় জয়লাভে সমর্থ হইয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

হ্যাম্পসায়ার প্রথম ইনিংসঃ—১৯৭ রাণ (আরনল্ড ৩৭, হিল ৪৯, হারম্যান ৪৪, সি এস নাইডু ৩৩ রাণে ৩টি, সিন্ধে ৪৬ রাণে ২টি ও এস ব্যানার্জি ২৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসঃ—১৩০ রাণ (মানকড় ৩০, মোদী ২৩, নিম্বলকার ২৪, নট ৩৬ রাণে ৭টি উইকেট পান)।

হ্যাম্পসায়ার দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৪২ রাণ (বেলী ৫৬, মানকড় ১৫ রাণে ২টি, সোহনী ২৮ রাণে ২টি, হাজারী ১৮ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪ উইঃ ২১২ রাণ (মার্চেণ্ট ৩৬, কানকড় ৩০, মোদী ৪১, হাফিজ ৪০, হাজারী নট আউট ২২, গুলমহম্মদ নট আউট ২৩, নট ৭৪ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 15th June, 1946. [৩২ সংখ্যা

দেশবন্ধু স্মরণে

১৬ই জুন বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিবার্ষিকী স্বরূপে বিশেষভাবে স্মরণীয়। একুশ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে বাঙলার সর্বত্যাগী, মহাসন্ন্যাসী, সিংহপ্রতিম নেতার দেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবনের অবসান হইয়াছিল, বাঙলার রাজনীতি-লোকে ইন্দ্রপতন ঘটিয়াছিল। বাঙালীর মনে সে দিনের সেই দুর্বিষহ স্মৃতি ম্লান হয় নাই। জগতের শ্রেষ্ঠতম মহামানব মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে প্রিয়তম নেতার শোকে মুহ্যমান সমবেত লক্ষ লক্ষ নরনারীর অশ্রুপ্লুত চক্ষের সম্মুখে কবি চিত্তরঞ্জন, বাঙলার চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহকে কেওড়াতলা শ্মশানের চিতা-হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল,—বাঙলার আশা-ভরসা, বাঙলার গৌরব, বাঙলার সর্বস্বকে জাতবেদাঃ বৈশ্বানর ভস্মসাৎ করিয়াছিল। বাঙলার সে এক ঘোরতর সঙ্কটের দিন, বাঙলার চরম সর্বনাশের দিন। গঙ্গার পূত সলিলে চিতাভস্ম ধৌত করিয়া, বাঙলার প্রাণধর্মের সাধনার মূর্ত বিগ্রহকে চিরতরে বিসর্জন দিয়া বাঙালী সে দিন শূন্য হৃদয়ে অশ্রু-সিক্ত নয়নে গৃহে ফিরিয়াছিল।

১৯২৫ সাল বাঙলার বুকে করাল রাহুর মত এক দুর্যোগময় বৎসররূপে দেখা দিয়াছিল। এই একই বৎসরে পর পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। ১৯২৫ সালে বাঙলায় যে দুর্যোগের মেঘ ঘনাইয়াছিল, তাহা আর বাঙলার ভাগ্যাকাশ হইতে অপগত হয় নাই। তাহার পর হইতেই আত্মকলহ, দলগত ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ ও অবিশ্বাসের ঘাতপ্রতিঘাতে বাঙলা এক সর্বনাশা আবর্তের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ একান্তভাবে মনে হইতেছে, যদি দেশবন্ধু জীবিত থাকিতেন! আমরা তাহা হইলে হয়তো বাঙলা দেশের ভিন্ন রূপ

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেখিতে পাইতাম। আজিকার এই পরম নৈরাশ্যের দিনে দেশবন্ধুর অভাব বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। বাঙলার জনগণের সহিত তাঁহার একাত্মবন্ধনভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে বাঙালী তাহার আপন প্রাণের বাণী শুনিতে পাইয়াছিল। তাঁহার রাজনীতিক কূটবুদ্ধির চালে অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। অসহযোগ আন্দোলনে বাঙলার সেনাপতি ও গান্ধীজীর দক্ষিণহস্তরূপে, সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া স্বরাজ্য দল গঠনে, কাউন্সিলে প্রবেশ-পূর্বক সরকারকে পদে পদে বাধাদানের ও আমলাতান্ত্রিক শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দৃঢ় সংকল্পে আমরা যে তেজস্বী, পুরুষসিংহ চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, সেই অমিততেজা চিত্তরঞ্জনের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পরম বৈষ্ণব, 'সাগরসংগীতে'র কবি, সাহিত্যিক, পরদুঃখে বিগলিতহৃদয়, সর্বস্বত্যাগী, দানবীর চিত্তরঞ্জনকে। একদা যে চিত্তরঞ্জন বিলাস ও ভোগের উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীন ছিলেন, তিনিই পরিণত প্রৌঢ়ত্বে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীরূপে সহজ মানুষের মত পথের ধূলায় নামিয়া আসিয়াছিলেন। ভোগে ও ত্যাগে —জীবনের সকল অবস্থায় দেশজননীর মহিমময়ী মূর্তি তাঁহার মনে সমভাবে সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি যে আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, যে ব্রত তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও উদ্‌যাপিত হয় নাই—দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল আজিও ছিন্ন হয় নাই। আমরা যদি তাঁহার স্মৃতিবাসরে তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাধা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া প্রাণপাতী সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তবেই আমাদের এই স্মরণব্রত সার্থক হইয়া উঠিবে।

সাম্রাজ্যবাদের বজ্রমুষ্টি

সাম্রাজ্যবাদীদের বজ্রমুষ্টি সহজে শিথিল হইবে না এবং স্বাধীনতার প্রেরণায় জাগ্রত ভারতের জনগণের নিকট হইতে আঘাত না পাইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়িবে না, আমরা একথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি; বস্তুতঃ যুদ্ধের পর ভারত-শোষণের দ্বারা নিজেদের ক্ষতি পরিপূরণের প্রশ্নই ব্রিটিশের কাছে বড় হইয়াছে এবং তাহারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ মিশনের প্রস্তাবের কূটনীতির পাক খুলিয়া বড়লাটের অবলম্বিত ব্যবস্থার ফাঁকে এই সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং মিশনের আলোচনা অবশেষে অচল অবস্থায় পৌঁছিবে এমন উপক্রম ঘটিয়াছে। কংগ্রেস প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয়ে ব্রিটিশের মতিগতি পরিষ্কারভাবে জানিতে চাহে। প্রথমতঃ কংগ্রেস এই দাবী করে যে, প্রস্তাবিত গণপরিষদকে সর্ব ক্ষমতা দান করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক মণ্ডলী গঠন বাধ্যতামূলক হইবে, কি তাহা দেশের লোকের ইচ্ছামত হইবে, ইহা সুস্পষ্ট জানা প্রয়োজন; তৃতীয়ত প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হইবে এবং বড়লাটের কর্তৃত্ব হইতে জনগণের অভিমতকে মুক্ত রাখিতে হইবে; চতুর্থত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনে অর্থাৎ সেই গভর্নমেণ্টের সদস্য সংখ্যা স্থিরীকরণে সাম্প্রদায়িক নীতি থাকিবে কি না কংগ্রেস ইহাও জানিবার জন্য দাবী করে; পরিশেষে প্রস্তাবিত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনে বাঙলা এবং আসামের শ্বেতাঙ্গদের ভোটদানের অধিকার থাকিবে কি না কংগ্রেস এই প্রশ্নও উত্থাপন করে। বলা বাহুল্য, এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে কংগ্রেস যদি সন্তোষজনক উত্তর না পায়, তবে তাহার পক্ষে ব্রিটিশ মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে গিয়া যদি বড়-

লাটের হাতে ক্রীড়নক হইয়াই চলিতে হয়, তবে কংগ্রেসের মর্যাদা আদৌ থাকে না; ইহা ছাড়া কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার নীতির ভিত্তিতে কংগ্রেস এবং লীগ অথবা বর্ণ হিন্দু, অনুন্নত সম্প্রদায় এইভাবে শাসন পরিষদে সদস্যপদ নির্দেশের মারাত্মক নীতি স্বীকার করিলে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শই জলাঞ্জলি দিতে হয়; বিশেষত এই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উপর বড়লাটের ভেটো অধিকার যদি শাসন নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে ভেদ-বিভেদের পথে বিদেশীর দাসত্বের নিগড়ে ভারতকে আবদ্ধ রাখার পথ সুদীর্ঘ করা হয়; তারপর ব্রিটিশ যদি সত্যই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে ব্রিটিশ সার্থবাহ দলকে গণপরিষদ গঠনে ভোট দিবার অধিকার দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই স্বার্থসেবীর দল এতকাল অন্যায়ভাবে ভোটের জোরে দেশের জনগণের অগ্র গতিকে প্রতিহত করিয়াছে; এই শ্বেতাঙ্গ দলকে একান্ত অসঙ্গত রকমে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে পাকা রাখিবার স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই অতিরিক্তভাবে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ কালেও ইঁহারা সেই অন্যায় অধিকার পরিচালনা করিবেন, গণ-তান্ত্রিকতার দিক হইতে ইহার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কংগ্রেস মিশনের প্রস্তাবে আপোষ-নিষ্পত্তিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদি মিশনের প্রস্তাবের কৌশলে কংগ্রেসকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করা হয়, তবে কংগ্রেস একান্ত ঘৃণাভরে মিশনের সহযোগিতা হইতে নিবৃত্ত হইবে এবং দুরন্ত সংগ্রামের মর্যাদাপূর্ণ পথেই জাতির মুক্তি সাধনে ব্রতী হইবে এবং কংগ্রেসের সেই রণসমুদ্যমে সমগ্র দেশের সাড়া দিতে বিলম্ব ঘটিবে না।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক

বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলের সর্বত্র চাউলের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঁকুড়া, ঢাকা, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল পাবনা শিলিগুড়ি, খুলনা সর্বত্র চাউলের মূল্যে সাধারণের সামর্থ্যের অতীত স্তরে পৌঁছিয়াছে। কোন কোন স্থানে সরকারী গুদামে পর্যন্ত চাউলের অভাব ঘটিয়াছে এবং বাজারে চাউল মিলিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে চাউলের মূল্য কোন কোন স্থানে ইতিমধ্যে যে হারে চড়িয়াছে, তাহাতে বাঙলা দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে রীতিমত দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। ২৫, টাকা হইতে ৪৫, টাকা পর্যন্ত যদি চাউলের মণ প্রতি দর হয়, তবে বাঙলা দেশের কয়জন লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া জীবনধারণ করা সম্ভব হইতে পারে, ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। অথচ একথা মুখ ফুটিয়া বলিলেই অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হইল! এমন শাসনব্যবস্থার বাহবা দেওয়া চাই। বাঙলা দেশের মন্ত্রীদের ইহাই হইতেছে অভিমত। ওদিকে ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যসচিব স্যার রবার্ট হাচিন্স সম্প্রতি বাঙলা দেশের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার চমৎকারিত্বও কম নহে। স্যার রবার্টের সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙলায় এ বৎসর যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট; সুতরাং বাহির হইতে খাদ্যশস্য সেখানে সরবরাহ করিতে হইবে না। তারপর যদি সত্যই বাঙলায় অন্ন-সমস্যা দেখা দেয়, তবে অন্যান্য প্রদেশের সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের যেরূপ দায়িত্ব আছে, বাঙলার ক্ষেত্রেও তাঁহারা সেই দায়িত্ব বহন করিবেন, তবে এই ক্ষেত্রে তাঁহারা বাঙলা দেশকে কতটা সাহায্য দান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা শুধু ভারতের বাহির হইতে আমদানী খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করিতেছে। স্যার রবার্টের উক্তির তাৎপর্য এই যে, আপাতত দক্ষিণ ভারতের জন্য খাদ্যব্যবস্থা করিতেই তাঁহারা সমধিক তৎপর রহিয়াছেন; এখন বাঙলার সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোনরূপ উদ্বেগের সৃষ্টি হয় নাই। বস্তুত বাঙলা দেশের প্রকৃত অবস্থাকে স্বীকার করিয়া না লইয়া নানা কারণ দর্শাইয়া তাহার গুরুত্ব উড়াইয়া দিবার দিকে স্যার রবার্টের নজর রহিয়াছে দেখা যায়। উদারন্নের যেখানে অভাব, সেখানে ভয় পাইও না, ভয় পাওয়া বড় খারাপ, এই ধরণের সদুপদেশ শুনিলেই লোকের মন হইতে ভয় দূর হয় না। গতবারের দুর্ভিক্ষের সময়ও সরকার পক্ষ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয়, দুই তরফ হইতেই এই ধরণের বিবৃতি পাইয়াছি; সেবারও তাঁহারা আমাদিগকে বার বার বলিয়াছেন—আতঙ্কগ্রস্ত হইও না; কিন্তু কার্যত দেখা গেল, তাঁহাদের বিবৃতি নিতান্তই শূন্যগর্ভ। দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশ ধ্বংস হইয়া গেল এবং সরকারী বিবৃতিসমূহ শ্মশানভূমিতে প্রেতের পরিহাসস্বরূপে পরিণত হইল। সেই শাসকের দল, সেই ধরণের বিবৃতি, ইহার পরিণতি ভিন্ন হইবে, এমন ভরসা আমাদের মনে কোনক্রমেই একান্ত হইতেছে না।

মন্ত্রীদের মারাত্মক নীতি

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের হাতে এত চাউল মজুত আছে যে, তাঁহারা বাঙলার অন্নাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের বাজারসমূহ একেবারে ভাসাইয়া দিতে পারিবেন। গত ৩রা জুনও তিনি আমাদিগকে এই কথা শুনাইয়াছেন যে, মফঃস্বল অঞ্চলের চারিদিকে সরকারী গুদামের চাউল ছড়ান আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সরবরাহ কার্য ত্বরান্বিত করা হইতেছে; কিন্তু আজ আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এই কথা বলিতে হইতেছে যে, মিঃ সুরাবর্দী এবং তাঁহার অধীন খাদ্য সরবরাহ বিভাগীয় কর্তা ব্যক্তিদের এই উক্তি নিতান্তই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। 'বরিশাল হিতৈষী'র ন্যায় বহুদিনের প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজ সেদিন স্পষ্ট ভাষাতে এ কথা লিখিয়াছেন যে, বরিশাল, কলাইয়া, নলচিটি, ঝালকাঠি এবং খেপুপাড়া গুদামে আদৌ চাউল নাই; সুতরাং সরকার বাজারে চাউল ছাড়িয়া দিয়া চোরা বাজারীদিগকে জব্দ করিবেন, এই হুমকি একান্তই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে; পক্ষান্তরে সরকারী খাদ্য বিভাগীয় কর্মচারীরা মফঃস্বল অঞ্চলে বণ্টন ব্যবস্থা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে চোরাবাজারীদেরই উদরপূর্তি করিবার সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঢাকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ঢাকার অসামরিক খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলার এই নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, রেশন ব্যবস্থানুযায়ী প্রত্যেক বয়স্ক নরনারীকে সপ্তাহে দুই সের এবং শিশুদিগকে তাহার অর্ধেক হারে চাউল সরবরাহ করিতে হইবে; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, সরকারী ব্যবস্থানুযায়ী এই চাউল যাহারা নিতান্ত গরীব এবং যাহাদের জমিজমা নাই অথবা যাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের কর কিংবা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় না, কেবল তাহাদিগকে দেওয়া চলিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য সকলকে বাজার হইতে চাউল কিনিয়া লইতে হইবে এই ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙলাদেশের বিশেষভাবে ঢাকা জেলার শিল্পী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদা[য়ের] অধিকাংশ ভূমিহীন এবং ইহাদের বেশী ভাগকেই খাদ্যশস্য বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয়। চাউলের দর যদি মহার্ঘ্য হয় এবং গভর্নমেণ্ট যদি তাহাদের কাছে চাউল বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হন, তবে ইহাদিগকে অনশনে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাতে এই হৃদয়হীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থায় চোরা বাজারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে; কারণ যা[হা] ধরিয়াই লওয়া হয় যে, সরকারী গুদাম হইতে যাহাদিগকে চাউল দেওয়া হইতেছে না তাহা[রা] অর্থশালী লোক এবং বাজার হইতে চাউল কিনিবার যথেষ্ট সামর্থ্য তাহাদের আছে, তা[ই] তাহাদিগকে বাজার হইতে চাউল সংগ্রহ করিতে বলা আর চোরাবাজারী দর দিতে বলা এক কথা এবং একইভাবে এমন নীতিতে চাউলের দর বৃদ্ধিরই সহায়তা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, সরকারী এই নীতি[র] ফলে সমস্যা ক্রমেই জটিলতর আকার ধা[রণ] করিতেছে। ঢাকা জেলায় সাভার, ধামর[াই]

প্রভৃতি থানায় লোকেরা ইতিমধ্যেই উপবাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; কারণ চৌকিদারী ট্যাক্স দিলেও ইহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা এমন নয় যে, বাজার হইতে ৪০৲ টাকা, এমন কি, ২৫৲ টাকা দরেও চাউল সংগ্রহ করিতে পারে। সরকারীর খাদ্য নীতি নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই এই যে সব কুব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে আমরা তৎসম্বন্ধে বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডলকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছি।

মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত

মুসলিম লীগ ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু খোলাখুলিভাবে গ্রহণ করে নাই। মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তা মিঃ জিন্না এতদিন রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ধরণের ফাঁকা হুমকি চালাইয়া কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও সেই কূটচক্রের পাকাটি লীগ হাতে রাখিয়াছে। সর্ব ভারতীয় ইউনিয়ান হইতে প্রদেশ বা প্রদেশমণ্ডলীর বিচ্ছিন্ন হইবার যে অধিকার ও সুযোগ মিশনের প্রস্তাবের মধ্যে রহিয়াছে, লীগ তাহার ভিতরে পাকিস্থান রচনার ভিত্তিভূমির সন্ধান পাইয়াছে এবং সেই বীজকে বিকশিত করিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে এবং সর্ব ভারতীয় ঐক্য ধ্বংস করিবার আগ্রহেই সে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছে। লীগ-কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মিঃ জিন্না স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথা বলিয়াছেন যে, মিশনের প্রস্তাবে পাকিস্থান দেওয়া হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার রাস্তা খোলা রাখা হইয়াছে। লীগের সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা বলিতেছেন, শাসন-তন্ত্র রচনাকারী গণপরিষদের সিদ্ধান্ত কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া লীগ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং গণপরিষদে শাসনতন্ত্র রচনা কালে যে কোন সময়ে প্রয়োজন হইলেই লীগ তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা পরিত্যাগ করিতে বা গণপরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। গণপরিষদের সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়াও লীগ সর্বভারতীয় গভর্নমেণ্ট হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রতিই লক্ষ্য রাখিবে এবং দশ বৎসর পরেও সেই চেষ্টা করিবে। বস্তুত লীগ চতুরতার সঙ্গে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে কংগ্রেসের প্রাধান্যকে খর্ব করিতে চায়, সেইরূপ গণপরিষদেও সেই দিকেই তাহারা তাহাদের সকল শক্তি নিযুক্ত করিবে। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের গণতন্ত্র বিরোধী নীতিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বে ব্রিটিশ সেনাদল অপসারণের প্রস্তাব করা হয় নাই, কূটনীতির খেলায় সেই সময় অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে, মিঃ জিন্না এবং তাঁহার দলবল এই-জন্যই এখনও হুমকি দেখাইয়া কাজ বাগাইবার ফিকিরে আছেন। ইহার উপর যেরূপ শুনিতেছি, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট যদি লীগের দলকে একান্ত অন্যায় এবং অযৌক্তিক-ভাবে কংগ্রেসের সমান সংখ্যক সদস্যের আসন দেওয়া হয়, এ দেশের স্বাধীনতার জন্য নখাগ্র পর্যন্ত উত্তোলন না করিয়া যদি তাঁহারা স্বাধীনতার সুদীর্ঘ সংগ্রামে আত্মোৎসর্গে নিরত কংগ্রেসের সমান মর্যাদা লাভ করেন, তবে তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে আর দেরী হইবে না, তাঁহারা এই ফন্দী পাকাইয়া চলিতেছেন। বস্তুত লীগ ভারতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের যে দাবী করে তাহাই অযৌক্তিক। সত্য মানিতে হইলে লীগ ভারতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নয়; যদি তাহাদের সেই দাবী অযৌক্তিকভাবে স্বীকার করিয়াও লওয়া হয়, তথাপি মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের এক চতুর্থাংশ মাত্র; এই অবস্থায় যদি হুমকির জোরে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহারা অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে কংগ্রেসর সমান সমান আসন দখল করিতে পারে, তবে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকম্পায় ভবিষ্যতে লীগের পরিকল্পনা পূর্ণ হইবে, এমন আশা লীগের মনে থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য নিজেদের স্বার্থ কায়েম করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন না এবং সেজন্য নিজেদের পশু শক্তি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইবে না ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আসিবে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না, কঠোরতর সংগ্রামে আত্মোৎ-সর্গের রক্তসিক্ত পথেই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি

গত ৯ই জুন রবিবার দেশের সর্বত্র রাজনীতিক বন্দী দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে এই আন্দোলন আজ নূতন নহে, সমগ্র বাঙালী জাতি বহুদিন হইতেই সকল শ্রেণীর রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়াছে; কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এ কথা সত্য যে, মিঃ সুরাবর্দী বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর নিরাপত্তা বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিনা বিচারে বন্দীকৃত দেশের এই সব স্বদেশ প্রেমিক সন্তানকে মুক্তিদান করা বর্তমান রাজ-নীতিক অবস্থায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল-শাসিত সব প্রদেশেই নিরাপত্তা বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীরাও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মাদ্রাজে কুলশেখরপত্তম খুনের মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণ এবং মধ্য প্রদেশে অস্তি চিমুর মামলায় দণ্ডিত বন্দীরা মুক্তি পাইয়াছেন; শুধু এক বাঙলাদেশের অবস্থাই স্বতন্ত্র রহিয়াছে। এখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা এবং টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দীরা এখনও কারাপ্রাচীরে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন; এমন কি ইঁহাদের অনেকের দণ্ডকাল বহুদিন উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ইহা-দিগকে মুক্তিদান করা হইতেছে না। বলা বাহুল্য, বাঙলার এই সব বীর সন্তানকে এই-ভাবে দীর্ঘকালের জন্য অবরুদ্ধ রাখিবার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী কিছুদিন পূর্বে আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, তিনি দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীদের নথিপত্র পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, বলা বাহুল্য, আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি, মন্ত্রীরা এই ধরণের মামুলী কৈফিয়ৎ অনেক ক্ষেত্রেই দিয়াছেন; কিন্তু কার্যত আমলাতন্ত্রের দ্বারাই তাঁহারা পরিচালিত হইয়া থাকেন এবং বাঙলার আমলাতন্ত্র সদা এদেশে বলিষ্ঠ রাজ-নীতিক সাধনার বিকাশ সম্ভাবনাকে ভীতির চোখে দেখিয়া থাকে; সেজন্য শান্তি ও আইন রক্ষার ভ্রান্ত অজুহাতে শাসন নীতিতে স্বৈরাচারকে তাহারা অব্যাহত রাখিতে চায়। মিঃ সুরাবর্দী বাঙলার আমলাতন্ত্রের এই কূটচক্র অতিক্রম করিয়া জনমতের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন কি না আমরা ইহাই দেখিতে চাই। যদি সে ক্ষমতা তাঁহার না থাকে অর্থাৎ তিনি যদি অবিলম্বে বাঙলার সকল শ্রেণীর রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করিতে সমর্থ না হন, তবে তাঁহার পক্ষে জনগণের প্রতি-নিধিত্বের কোন কথা বলা সাজে না, কারণ শুধু হিন্দু সমাজ নয়, বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ নবনির্বাচিত পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই তাঁহার নিকট রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

দেশের কথা

(২১শে জ্যৈষ্ঠ—২৭শে জ্যৈষ্ঠ)

মুসলিম লীগ ও মিশনের প্রস্তাব—অন্তর্বর্তী সরকার—শিখদিগের সংকল্প—রেল ধর্মঘট—রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি—দুর্ভিক্ষ।

মুসলিম লীগ ও মিশনের প্রস্তাব—মুসলিম লীগ যে আরও অধিক অধিকার লাভের চেষ্টায় মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আপত্তিজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা পূর্বেই বুঝা গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত ব্যবস্থা করিয়াই লীগের মত রচিত হইয়াছিল। সে কথা সত্য হউক আর নাই হউক, মিশনের প্রস্তাবের আপত্তিজনক অংশের অধিক ভাগই যে লীগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। লীগের অনেক সদস্য যে প্রস্তাব গৃহীত না হইলে লীগ ত্যাগ করিবার ভয়ও দেখাইয়াছিলেন, তাহা জানা গিয়াছে। ৬ই জুন মুসলিম লীগের কাউন্সিলের অধিবেশনে বহু মতে মিশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জানা গিয়াছে, লীগের কার্যকরী সমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বহু মত এত প্রবল হইয়াছিল যে, তাহা বর্জনের কোন সম্ভাবনাই আর ছিল না।

কংগ্রেস ও মিশনের প্রস্তাব—কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ মতভেদ লক্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেসের অগ্রগামী দলে প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরোধিতার ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী অরুণা আশফ আলী, শ্রীযুত রামমনোহর লোহিয়া, শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্ধন এক যৌথ বিবৃতিতে প্রস্তাব বর্জনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—আমাদিগের জাতীয় দাবীর জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার কিছুই প্রস্তাবে নাই। বোম্বাই শহরে সর্দার শার্দুল সিংহ কবিশেরের সভাপতিত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতেও প্রস্তাব বর্জনের সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একাধিক কর্মিসংঘকে বর্জন করিয়া কংগ্রেস প্রস্তাব—পরীক্ষামূলকভাবেও গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির দ্বারা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ বিষয়েও বোধ হয়, সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না যে, কংগ্রেস যদি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উহার প্রবর্তন অসম্ভবই হইবে।

অন্তর্বর্তী সরকার—বড়লাটের শাসন পরিষদের পরিবর্তন বহুদিন পূর্বেই হইবার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেও তাহা হয় নাই। বোধ হয়, মিশনের ও বড়লাটের উদ্দেশ্য—যদি প্রস্তাব সকল পক্ষের দ্বারা গৃহীত না হয়, তবে আর উহার পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইবে না। অথচ পুনর্গঠিত শাসন পরিষদকেই অন্তর্বর্তী সরকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ও হইতেছে। এই পরিষদ গঠনেও মিশনের অনভিপ্রেত মনোভাব দেখা যাইতেছে। ইহাতে কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়নের অধিকার দিবার কথা শুনা যাইতেছে। কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে হীন চেষ্টা হইয়াছে, তাহার পরে আবার যদি সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত সমান প্রতিনিধি লাভের অধিকার প্রদান করা হয়, তবে যে সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রস্তাব বর্জন করা সঙ্গত, এই মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পুনর্গঠিত শাসন পরিষদের ক্ষমতা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় নাই। প্রকাশ, বড়লাট গোপনে বলিয়াছেন, তিনি পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু প্রাদেশিক সচিব সঙ্ঘ সম্বন্ধে সরকারের লিখিত প্রতিশ্রুতিও যে পালিত হয় নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন, যখন বর্তমান ভারত শাসন আইনের বিধানেই এই পরিষদ বড়লাটের ইচ্ছানুসারে গঠিত হইবে, তখন বড়লাট পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং তিনি সেরূপ হস্তক্ষেপ করিলে সদস্যাদিগের প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে না।

শিখদিগের সংকল্প—শিখ সম্প্রদায় মিশনের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শিখদিগের প্রধান আপত্তি—মিশনের প্রস্তাবিত সংঘভুক্ত হওয়ায়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনপদ্ধতির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, মুসলমানদিগকে যখন অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তখন শিখদিগকে তাহাতে বঞ্চিত করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু শিখরা সাম্প্রদায়িকভাবে কোন অধিকার লাভ করেন নাই। এবার যে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সংঘভুক্ত করায় তাহাদিগের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শিখরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ৯ই জুন অমৃতসরে পন্থের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে, শিখগণ প্রস্তাবের প্রতিবাদে দেহের শেষ শোণিত বিন্দুও দিবেন। আকাল তক্তের সম্মুখে সহস্রাধিক শিখ ঐ প্রতিজ্ঞা করেন। ঐ প্রতিজ্ঞা গ্রহণকালে লক্ষাধিক শিখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্দার বলদেব সিংহ (সচিব) উপস্থিত ছিলেন। বক্তার পরে বক্তা মিশনের প্রস্তাব শিখদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধে আহবান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মিস্টার গিল বলেন—১৯৪২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষের যে সুবিধা আসিয়াছিল, আজ আবার তাহাই আসিয়াছে। শিখরা বলেন, মিশন শিখদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন। শিখদিগের পক্ষে আপত্তির যে বিশেষ কারণ আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

রেল ধর্মঘট—সমগ্র ভারতে রেল ধর্মঘটের বিষয় এখনও বিবেচিত হইতেছে। কর্মচারীরা আগামী ২৭শে জুনের মধ্যে মীমাংসা না হইলে ঐ দিন মধ্য রাত্রি হইতে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছেন। সরকার এত দিন মধ্যস্থতা স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। রেল কর্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি ২৭শে জুনের মধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের পুনর্গঠন হয়, তবে কর্মচারীদিগের পক্ষে ধর্মঘট স্থগিত করিয়া পরিষদকে মীমাংসা সম্বন্ধে বিবেচনার অবসর দেওয়া কর্তব্য হইবে। কারণ, বর্তমান সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল হয়ত নূতন পরিষদকে বিব্রত করিবার জন্যই মীমাংসার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতেছেন না।

রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি—এখনও ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় বহুলোক রাজনৈতিক কারণে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। আজও তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদিগকের মুক্তির দাবী জানাইয়া আন্দোলন হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ—সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহার অপসারণের কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যদিও বাঙ্গলায় সরকার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে—দুর্ভিক্ষ নাই, হইবেও না তথাপি পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব বঙ্গে লোকের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদে তাঁহাদিগের উক্তির অসারতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে সন্দেহ হইতেছে—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলা সরকার যেরূপ মিথ্যা প্রচারকার্য পরিচালিত করিয়াছিলেন—এবারও কি তাহাই আরম্ভ হইল?

বৈদেশিকা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের কার্যতালিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রধান স্থান অধিকার করিবে, তাহার মধ্যে স্পেন অন্যতম। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৯-৪৫ সালের বিরাট মহাযুদ্ধের যোদ্ধারা পাঁয়তাড়া করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয় ইউরোপের অক্ষশক্তিদ্বয়ের মনে বিপুল আত্মবিশ্বাস জন্মাইয়াছিল। কেননা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ বস্তুত জার্মানী, ইতালি এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ; এই যুদ্ধে ইংরেজ এবং ফরাসী নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ফ্রাঙ্কো অর্থাৎ জার্মানী এবং ইতালির সাহায্য করিয়াছিল। অক্ষশক্তি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, যেদিন আসল যুদ্ধ অর্থাৎ নাৎসী জার্মানী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে সেদিন ইংরেজ-ফরাসী জার্মানীর পক্ষে না থাকিলেও রাশিয়ার পক্ষে না গিয়া নিরপেক্ষ সাজিবে। চেম্বারলেন এবং দালাদিয়ের নাৎসী জার্মানীকে যতটা ভয় পাইতেন, তার চেয়েও বেশী ভয় পাইতেন রাশিয়াকে। ইহাই ছিল হিটলারের ভরসা; কেননা দুই ফ্রণ্টে, পূর্বে ও পশ্চিমে যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

জার্মানী এবং ইতালির সাহায্যে জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের কর্তা হইয়া বসিলেন বটে, কিন্তু বিরাট বিশ্বযুদ্ধে তিনি কোন পক্ষেই যোগদান করিলেন না। যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় এবং মিত্রশক্তির জয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অবস্থা স্বভাবতঃই খানিকটা সঙ্গীন হইয়া পড়িল। স্পেনের গণতন্ত্রী নেতারা মিত্রশক্তির জয়ে শক্তিমান হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, যাহাতে হিটলার-বান্ধব ফ্রাঙ্কোকে অপসারিত করিয়া স্পেনে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। এই আন্দোলনের একজন প্রধান হইতেছেন স্পেনের নির্বাসিত গণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টের নেতা সিনর জিরল। একথা ভাবা স্বাভাবিক যে, মিত্র-শক্তিপুঞ্জ তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু হিটলারের বন্ধু ফ্রাঙ্কোকে একযোগে স্পেন হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিবেন। কিন্তু ব্যাপারটা সম্প্রতি একটু ঘোরালো হইয়া গিয়াছে। একে তো যুদ্ধ যতদিন চলিয়াছিল, ইংরেজের চেষ্টার অন্ত ছিল না, যাহাতে অন্তত স্পেন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান না করে। এই চেষ্টা নানা কারণে সফল হইয়াছিল; এ হিসাবে ফ্রাঙ্কোর প্রতি ইংরেজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য না হইলেও অন্তরে স্বীকার্য। অবশ্য কূট রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বার্থের স্থান আছে। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাল বুঝিতে হইলে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে এই যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভয় অন্তত তিনটি প্রধান শক্তির মনে সর্বদা জাগিয়া আছে। যিনি যে চালই চালিতেছেন, ঐ অনাগত সংগ্রামের ভয়ই তাহার নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রক। অতএব আগামী যুদ্ধের ভয় হইতেছে বর্তমান আন্তর্জাতিক চাল-চালিয়াতি বুঝিবার চাবি-কাঠি। ঐ যুদ্ধে প্রধানত কোন্ শক্তি কোন্ পক্ষে যাইবে, সে সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা প্রধান জাতিপুঞ্জের মনে আছে এবং সেই ধারণা অনুসারেই প্রত্যেকেই চলিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া মনে মনে জানে যে, ইঙ্গ-আমেরিকার সঙ্গেই তাহাকে আগামী যুদ্ধে লড়িতে হইবে; ইঙ্গ-আমেরিকানরা বুঝিয়া নিয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে স্পেন এবং ফ্রাঙ্কো সম্বন্ধে রাশিয়া এবং ইঙ্গ-আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হইতে বাধ্য। প্রথমত সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর কোন বন্ধুত্ব সম্ভব নয়; গত যুদ্ধে স্পেন ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যোগ না দিলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে সৈন্য পাঠাইয়াছে। রাজনৈতিক মতবাদ এবং আদর্শেও বর্তমান স্পেন গভর্নমেণ্ট এবং রাশিয়ার গভর্নমেণ্ট পরস্পরবিরোধী। অতএব স্পেনের নির্বাসিত গণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টকে রাশিয়া সর্বপ্রকার সাহায্যদানে উৎসুক। সাফল্যলাভ হইলে স্পেন আগামী যুদ্ধে রাশিয়ার বিপক্ষে যাইবে না, এমনকি পক্ষেও যোগ দিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাই সোভিয়েট রাশিয়ার ডেলিগেট স্পেনের বিরুদ্ধে সিংহনাদ করিয়াছেন, সোভিয়েট আশ্রিত পোলাণ্ড তাই স্পেনের বিরুদ্ধে নিদারুণ অভিযোগ করিয়া এই প্রস্তাব আনিতে চাহিয়াছিল যে, ফ্রাঙ্কো গভর্নমেণ্ট বিশ্ব-নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং বিশ্বশান্তির বাধা জন্মাইতেছে; অতএব তাহার সঙ্গে জাতি-পুঞ্জ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন। ইংরেজের স্বার্থ হইতেছে স্পেনে এমন একটি গভর্নমেণ্ট থাকা, যে গভর্নমেণ্ট ইংরেজের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যাইবে না। ফ্রাঙ্কো গভর্নমেণ্ট থাকিলেই তাহা সম্ভব। অতএব ইংরেজ ডেলিগেট পোলাণ্ডের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবে স্থির হইল যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সাব কমিটি স্পেনের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবে। সেই রিপোর্ট নিরাপত্তা কমিটিতে গত সপ্তাহে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই সাব কমিটির নিকট ৩৫০ পৃষ্ঠার এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন সিনর জিরল। তাহাতে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাঁহাদের বক্তব্য সমস্ত কথা বলা হইয়াছে এবং যথাসম্ভব প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া জানানো হইয়াছে যে, স্পেনে আভ্যন্তরীণ অত্যাচার হইতেছে; গত যুদ্ধে অক্ষ শক্তিকে স্পেন সাহায্য করিয়াছে; যুদ্ধ শেষে জার্মান পলাতকদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং জার্মানীদের অর্থ সংরক্ষিত হইতেছে; বর্তমানে স্পেনে আণবিক বোমা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলিতেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য দলিলপত্র সাব কমিটি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তদন্তের শেষে নিরাপত্তা কমিটির নিকট গত সপ্তাহে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, যদিও বর্তমানে স্পেন বিশ্বশান্তি বিপজ্জনক করিয়া তুলিবার জন্য হাতেনাতে কিছু করে নাই, তথাপি তাহার দ্বারা বিশ্বশান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব নিরাপত্তা কমিটি বর্তমানে স্পেনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলেও যদি ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কো গভর্নমেণ্ট অপসৃত না হয় তবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ বৈঠকে জাতিবর্গ যেন স্পেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সুপারিশের পর বিতর্ক হওয়া সম্ভব হয় নাই, কেননা আমেরিকান ডেলিগেট এই রিপোর্ট অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার সময় চান এবং ব্রিটিশ ডেলিগেটও তাহা সমর্থন করেন। এদিকে বিলাতে হাউস অব কমন্সে রক্ষণশীল চার্চিল এবং শ্রমিক বেভিন উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে ফ্রাঙ্কোকে অপছন্দ করা এক কথা আর তাহাকে বাহির হইতে উৎপাটিত করিতে যাওয়া অন্য কথা। স্পেনের গভর্নমেণ্টে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য গৃহবিপ্লব ডাকিয়া আনিতে ব্রিটেন গররাজী। অতএব ফ্রাঙ্কোর আশু অপসারণের আশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

নবজন্ম

শান্তা রায়চৌধুরী

দিবসের প্রাণপূর্ণ হাসি-অশ্রু-মেলা,
ওগো বন্ধু, সব বুঝি হয়ে গেছে সারা,
আজ তাই জীবনের ম্লান সন্ধ্যাবেলা,
ক্লান্ত দুটি আঁখি হেরি অশ্রুজল-ভরা
এসে দাঁড়ায়েছ তুমি অস্তসিন্ধুতীরে;
তোমারে দেখাবে পথ ওগো পথহারা
রাত্রির রহস্য ভেদি'—তাই সন্ধ্যাতারা
ধূসর গোধূলিলগ্নে জাগে ধীরে ধীরে!
দিগ্‌ভ্রান্ত মুগ্ধ দৃষ্টি মেলি' তার পানে
শিহরি উঠিবে বুঝি পুলকে বিস্ময়ে,
যাহারে হেরিয়াছিলে পূরব-গগনে
পশ্চিম-দিগন্তে তারি নব-পরিচয়ে।
প্রভাতের 'শুকতারা' রজনীর কোলে
নবজন্ম লভি' 'সন্ধ্যা-তারা' হ'য়ে জ্বলে॥

অভিশাপ

অরুণ সরকার

বহু অপরাধ জমাট বেঁধেছে অভাগা দেশে,
তাই মোরা পরাধীন,
তাই আমাদের আপনার ঘরে ভিখারী বেশে
কাটে দুঃখের দিন।

জমেছে অনেক পাপ
জীবনের প্রতি পদে পদে দেখি বিধাতার অভিশাপ
সমাজের মাঝে কেমন সহজে মিশে
নিত্য জাতির প্রাণ-শক্তিকে জর্জ্জর করে বিষে।

যারা পিছে পড়ে আছে
সভ্য-যুগের জ্ঞানের আলোক যায়নি যাদের কাছে,
তাদের অক্ষমতা
অপরাধ নহে, ধরিনে তাদের কথা।

কিন্তু যাহারা সব জানে, সব বোঝে,
জীবন-মরণ প্রশ্নে জাতির
যখন দেখি যে তারাও মুক্তি খোঁজে;
নিজেদের 'পরে দায়িত্বটুকু সহজে এড়াবে ব'লে
ফাঁকা কথা ক'য়ে নানা সমস্যা তোলে,—

তখন মনের মাঝে
দুঃখ জাগেনা, বেদনা নাহিক' বাজে;
দুঃসহ লজ্জার
অনুভব করি চিরদাসত্ব মজ্জায় মজ্জায়।

তাঁর ও তরঙ্গ

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

দুপুর বেলায় ছাদে কাপড় শুকুতে দিতে এসে রেণুকা আনমনা হয়ে গেল। চোখ ঝলসানো আলোর দিকে তাকানো যায় না। আলসের ওপরে ভর দিয়ে বাড়ীর পিছন দিককার পোড়ো জমিটার দিকে চোখ পড়তে অতীত জীবনের স্মৃতিতে উন্মনা হয়ে উঠলো। সেখান থেকে চলে এসে বাড়ীর সদরের দিকের আলসেয় ঠেসান দিয়ে চিলে-কোঠার ছায়ায় দাঁড়িয়েও চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পেলো না। তিনতলার ছাদের ওপর থেকে একতলার চাতালে এঁটো বাসন-পত্রের দিকে চোখ পড়তে সে চোখ সরিয়ে নিয়ে সদর দরজার সামনেকার সরু গলির দিকে তাকালো। রেণুকার চোখ ওখানেও স্থির না থেকে সরুগলি ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগলো। রেণুকা ভাবতে লাগলো বড় রাস্তার কথা। গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে রাস্তা পার হোতো। ছেলেবেলায় কতবার যাওয়া-আসা করতে হতো ওই রাস্তায়। ক্রমে তার বয়স বেড়েছে, কত পরিবর্তন এসেছে, তবুও বড় রাস্তার কোনো ছবিই অস্পষ্ট হয়ে যায়নি মন থেকে।

রেণুকা অনায়াসে বলতে পারে এই নিঝুম দুপুরে কে কোথায় কি করছে। দোতলার ঘরে তার বৌদিদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। দাদার এখনো অফিস থেকে ফিরতে অনেক দেরী। কলের জল না এলে ঝি আসবে না। মুড়ি-মুড়কির দোকানের আর্ধেক পাল্লা বন্ধ করে দোকানদার ঘুমুচ্ছে। খদ্দেরের ডাকে এখুনি উঠে পড়ে জিনিষ বিক্রি করেই আবার তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়বে। রাধাকান্ত ময়রার দোকানের সামনেটা লাল সিমেন্টের পলস্তরা ধরানো। কাঠের সাধারণ শো-কেসের ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে আধখানা বিক্রি দৈ'এর ভাঁড়ের ওপরে মাছি বসছে। রাধাকান্ত ভিজে গামছা গায় দিয়ে সিমেন্টের মেঝের ওপরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। পাশের শীতলাদেবীর মন্দিরে ভোগ দেবার জন্যে কোন পুজার্থিনী ডাক দিলে সে ধড়মড় করে উঠে বসে চিনির সন্দেশ বিক্রি করবে। আর একটু এগিয়ে গঙ্গার ঘাট। ট্রাম-রাস্তার এপারে ওপারে ঘাটপাণ্ডাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সারি। রাস্তার এপার দিয়ে সারি সারি কয়েকখানা শাঁখার দোকান। এতো বেলাতেও প্রৌঢ়ারা কেউ কেউ নাতি-নাতনীদের সংগে করে স্নান করে ফিরছেন। শিশুদেব সকলেরই গাল ও কপাল শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্নে সমাচ্ছন্ন। ঘণ্টা বাজিয়ে বেলুড় দুটোর স্টীমার ছাড়লো।

বহুদিন আগে শোনা কথাগুলো, আজও রেণুকার স্পষ্ট মনে পড়ে:

"কী সুন্দর মুখশ্রী মেয়েটার! আজকাল এমন দেখা যায় না! সংগে বোধহয় ওর মা। যাওনা ঠাকুরঝি, কোন পাড়ায় বাড়ী জিজ্ঞেস করো না!"

"তোমার সবতাতে বাড়াবাড়ি রবীনের মা, সুন্দর মেয়ে দেখলেই তার খোঁজ নিতে হবে কেন বাপু! গায়ে-পড়া হওয়া কি ভালো?"

"এতে আর গায়ে পড়াপড়ির কি আছে ঠাকুরঝি, মেয়েটা কেমন ঠাকুর ঠাকুর দেখতে, তাই তোমায় আলাপ করতে বলছি।"

"আপনারই মেয়ে বুঝি! কিছু অপরাধ নেবেন না ভাই জিজ্ঞেস করলুম। আগে কখনও দেখিনি কিনা!"

"হ্যাঁ দিদি, ওই একটিই মেয়ে আমার। ঘাটে দেখবেন কি করে, সুখের দিনে কি আর মা গঙ্গাকে মনে ছিলো! আজ বছর-দুই কপাল পুড়েছে তাই শেষ বয়সে পরকালের কাজ করছি।"

"বাড়ি বুঝি এদিকপানেই!"

"হ্যাঁ দিদি! মেয়ে ইস্কুলের পাশ দিয়ে আনন্দ মিত্তিরের গলি, তারই পাঁচ নম্বর।"

"পাঁচ নম্বর! নারকোলগাছওলা বাড়িটা! ওমা, ওটা যে আমাদের নন্তুর মামার বাড়ি।"

"তাই নাকি ওমা! আমি যে নন্তুর মামীমা হই!"

"ওমা! তবে তো তুমি আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে!"

রবীনের মা শুধু শুধুই রেণুকার মুখশ্রীর প্রশংসা করেন নি। রবীনের জন্যে মেয়ে দেখে দেখে তিনি নাকি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় গঙ্গাতীরের পবিত্র পরিবেশের মধ্যে রেণুকাকে দেখে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল।

পছন্দ রেণুকাকে কে না করতো! বালিকা রেণুকাকে নিয়ে তার বাবা পাড়ায় বেড়াতে বেরুলে মেয়ের অজস্র প্রশংসা শুনে তাঁর গর্ববোধ হত। ছোটবড় নির্বিশেষে সকলেই রেণুকাকে একটু না একটু আদর করতে চাইতো। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গীরা বিভ্রান্ত হতো। একদা তারা নিজেদের অজ্ঞাতে বালিকা রেণুকার সংগে একাদিক্রমে দশ বছর ধরে খেলতে খেলতে নিজেদের বোনা জালের মাঝখানে আটকে পড়লো। সকলেরই সচেতন কৈশোর যৌবনের স্বপ্নে রঙীন হ'য়ে উঠলো। অনেকের অন্তরে যে কথা গুঞ্জরনের মত ছিলো, সেটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফলে ব্যবধান বাড়তে বাড়তে শেষে এমন হোলো যে, কেবল দু-জন ছাড়া আর কেউ রেণুকার চোখের দিকে সোজা চাইবার মত রইলো না।

এদের দু-জনের মধ্যে একজন কল্যাণ আর একজন অজয়। অত্যন্ত নিকটতম প্রতিবেশী এরা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবেশের মধ্যে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় তা এদের ছিলো।

"যাই বলো রেণুর মা, অজয় কল্যাণের মত অত বড় ছেলেকে রেণুর সংগে মেলামেশা করতে না দেওয়াই ভালো।"

"কী যে বলো দিদি! ওসব কথা মনেও ঠাঁই দিও না। এইটুকুন বয়েস থেকে একসংগে খেলা করেছে ওরা! আমার কাছে আমার সতুও যেমন ওরাও তেমনি।"

হঠাৎ সদর দরজার কড়া ধরে কে নাড়তে লাগলো।

আলোর তেজ ক্রমশঃ বাড়ছে। ছাদের দিকে তাকানো যায় না। রেণুকা আলসেয় ঝুঁকে দেখতে লাগলো, এমন সময় কে ডাকাডাকি করছে। একটু পরেই একখানা খামের চিঠি দরজার ফাঁক দিয়ে চাতালের ওপরে এসে পড়লো। সংগে সংগে গলি ধরে ডাক-পিয়নকে ফিরে যেতে দেখা গেল। যারই চিঠি হোক রেণুকার নড়তে ইচ্ছে করছে না। সে আবার আলসের ওপর চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

লোকজনের আনাগোনা, প্রতিবেশীদের সমালোচনা, এসব কিছুই রেণুকার কানে পোঁছাতো না।

"হ্যাঁগো সতুর মা, আমার অজয় তোমাদের এখানে আসে তো দেখি রোজই, কিছু দৌরাত্ম্যি করে না তো?"

"দৌরাত্ম্যি না করলে যে এক মিনিটও বাড়ি তিষ্ঠুতে পারি না ভাই! আমি অমন নির্জন ঘরে চুপচাপ থাকতে পারি না। ওরা কটায় মিলে দাপাদাপি করে বলেই একরকম করে দিন কেটে যায়।"

রোদ্দুরের তাপে রেণুকার মাথা জ্বালা করে উঠলো। খানিক ক্ষণ চুলের গোছাটা ছায়ায় রেখে আবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে রোদ্দুরে দিলো। আলসের ওপরে বাহুর ভর দিয়ে অবিশ্রান্ত পায়রার ডাক শুনতে শুনতে রেণুকা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

কি অদ্ভুত অসামঞ্জস্য ছিলো এই দুজনের মধ্যে। খেলতে বসে অসাধু উপায় অবলম্বন করলে রেণুকাকে কল্যাণের কাছ থেকে উপদেশ শুনতে হ'তো কিন্তু ঐ একই অপরাধে অজয় তাকে দু-চার ঘা বসিয়ে দিতো।

শৈশবের সঙ্গী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের স্বপ্ন—কল্যাণ ও অজয়, আজ তারা কত দূরে চলে গেছে।

রেণুকার মাথা ছায়ায়, আর চুলগুলো রোদ্রে ছড়ানো। ক্রমশ তার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে আরম্ভ করছে।

রেণুকার বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ে। সামনের গলিটায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, দু-পাশের দেওয়াল লাল সালুর নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কত আলো, কত ফুল! গলির মুখটাতে ঘোষালদের চওড়া রকটাতে সানাইদারেরা সানাই বাজাচ্ছে। রেণুকার মা সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তাঁর অভ্যর্থনার সুরে তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করছেন, না আর্তনাদ করছেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটিমাত্র মেয়ে তাঁর! ছেলে যদিও একটি, তাহলেও সে বড় হয়ে গেছে, বিয়ে দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে তাঁর আর তত ভাবনা হয় না। তাঁর স্বামীর কত আদরের মেয়ে ছিলো। জীবনে কখনো একদণ্ড তাকে চোখের আড়াল করেন নি। জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিনি জানেন। সেই মেয়ে আজ পর হয়ে যাবে। অজয় হাতা গুটিয়ে বরযাত্রীদের পরিবেশনের কাজে লেগে গেছে। কল্যাণ বাইরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বেনারসী পরে, সর্বাঙ্গ গয়নায় ঢেকে, মেয়েদের মাঝে রেণুকা বসে আছে। ঘরের ভিড় কমলে এক এক ফাঁকে অজয় এসে রেণুকাকে দেখে যাচ্ছে। কখন কখন চোখাচোখি হ'লে রেণুকা মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

"তোর খিদে পায়নি রেণু! একটু দই-মিষ্টি এনে দেবো, খাবি?"

"আমার খিদে পায়নি অজয়দা! তুমি তো সেই সকাল থেকে খাটছো, কিছু খেয়ে নিয়েছো তো?"

"আমায় আর তোকে শেখাতে হবে না। ঘুরেছি ফিরছি, আর একটা করে রসগোল্লা মুখে ফেলছি।"

এমন ছেলেমানুষের মত কথা কইতো অজয়দা যে মনে পড়লে হাসি আসে। অথচ এই অজয়দাই একদিন, যেদিন তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, দুপুরবেলায় সিঁড়ির মুখে তাকে একলা পেয়ে, তার একখানা হাত দু-হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে কত কথাই না বলেছিলো। রেণুকা যতই তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল, অজয় ততই অবুঝের মত শক্ত করে হাতখানা ধরে ছিল। অবশেষে যখন রেণুকার চোখে প্রায় জল এসে গেলো, তখন অজয় লজ্জিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো।

কল্যাণ কিন্তু কখনো তার মুখোমুখি হয়নি এই রকম কোন অঘটনের ভূমিকা নিয়ে।

বিয়ের তারিখের দিন সাতেক আগে চারখানা ফুলস্কেপ কাগজ ভর্তি করে কত কথাই তাকে লিখেছিলো কল্যাণ। রেণুকা কল্যাণের সে চিঠি সিঁড়ির নীচের পুরানো বইয়ের স্তূপের ভেতরে একখানা জরাজীর্ণ মহাভারতের তিনশো একাত্তর পাতায়, যেখানটায় শকুন্তলার উপাখ্যান আছে, তারই ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। চিঠিটার প্রতি ছত্রে ছত্রে ছিলো অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি। "তুমি আমার জীবনের মূর্ত স্বপ্ন, আমার যৌবন-কামনার রঙ" ইত্যাদি।

শুভদৃষ্টির সময়ে তার সবচেয়ে সঙ্কটের মুহূর্ত এলো। একদিকে পিঁড়ি ধরেছিলো অজয়দা, আর একদিকে কল্যাণদা। সে নির্ভয়ে দুজনের কাঁধে হাত রেখে বসেছিলো। রবীনের আর তার মাথার ওপর দিয়ে একখানা রঙীন চাদর ঢাকা দিয়ে সকলে বলতে লাগলো—"চোখ তুলে চাও রেণু, চাইতে হয়, লক্ষ্মী মেয়ে তাকাও ওর দিকে! ছিঃ অমন করেনা, অজয়, কল্যাণ সতু—ওরা কতক্ষণ পিঁড়ি উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে!

রেণু মুখ নীচু করে চোখ বুজে বসে ছিলো। চোখ মেলতেই প্রথমে দেখতে পেয়েছিলো অজয়কে, তার পরে কল্যাণকে। দুজনেরই মুখ হাসি হাসি। পিঁড়ি ঘোরানোর পরিশ্রমে দুজনেরই মুখ রাঙা হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে রবীনের দিকে তাকিয়েছিলো। বুক তার তখনো কাঁপছে, হাত দুখানা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কম্পিত হস্তেই সে মালাবদল করলো। বিয়ে-বাড়ির দিকে দিকে পান-ভোজনের সমারোহ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বৌদির বেনামী কল্যাণের লেখা পদ্য পড়ছিলো।

তাড়াতাড়ি অপরাহ্ন এগিয়ে আসছে। রেণুকা নিঝুম দুপুরে বাহুর শিথানে মাথা রেখে আলসের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুড়ি বছর তার বয়স, শূন্য সীমন্তে মন্দ-ভাগ্যের ইতিহাস লেখা। এইমাত্র সে একটু নড়েচড়ে বাহুতে সজল চোখ মুছে আবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

অনেক রাত্রে নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নিলো। সমস্ত রাত্রি বাসর-জাগবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা আসরে বসেছিলেন, একে একে তাঁরাও ঘরের টানে অদৃশ্য হয়েছেন। কর্মক্লান্ত আত্মীয়ারাও বাসরের রীতি রক্ষা করতে পারলেন না, তাই নিদ্রিত রবীনের পাশে রেণুকা একলা বসে রইলো।

জীবনে প্রথম যুবকের সান্নিধ্যে রেণুকার কত কী ভাবান্তর হয়েছিলো, আজ সে কথা সে ভাবছে না। সে কেবল নির্নিমেষ চেয়েছিলো তার ঘুমন্ত স্বামীর দিকে। কুমারী জীবনের সমাপ্তির কিনারায় আজ তার ভাগ্যকে তেমন মন্দ বলে মনে হ'ল না। রবীনের শুভ্র ললাটে চন্দনের পত্রলেখা।

সে রাত্রে রেণুকার চোখে ঘুম ছিল না। বাসর ঘরের সংলগ্ন বারান্দার সঙ্গে টানা ছাদের ওপরে সাময়িক চালা তৈরী করে নিমন্ত্রিতদের বসবার যায়গা করা হয়েছিল। আলোগুলো সবই প্রায় নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র সিঁড়ির কোনের দিকটায় একটা অল্প উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সারাদিন অনাহার ও শাড়ী-গয়নার গরমে রেণুকার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। রেণুকার কেন যেন মনে হয়েছিল নীচে গিয়ে মাথায় জল দিলে হয়তো শরীর ভালো লাগবে। বারান্দার রেলিং ধরে আস্তে আস্তে সে নামছিল। সিঁড়ি কোনখানটায় ঘুরে গিয়ে নিচের তলার দিকে নেমে গেছে, সব তার মুখস্থ। একটি একটি করে সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো।

"কে!" অত্যন্ত ভীতু গলায় রেণুকা জিজ্ঞাসা করলে।

"আমি"—জবাব যে দিল সে কল্যাণ।

"তুমি বুঝি বাড়ি যাওনি কল্যাণদা!"

"অনেক রাত হয়ে গেলো, তাই এখানেই শুয়ে পড়লাম।"

"ঘুম আসছে না বুঝি! আমারও ঠিক তাই। বাব্বাঃ, সমস্ত দিন ধরে খালি একরাশ গয়না আর কাপড় পরে বসে থাকা, এতে কি আর মাথার ঠিক থাকে?"

ব্যাপারটা রেণুকা হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করেছিল। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, তাবে কল্যাণ মর্ম বেদনা জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল তা যেন সে পায়নি, এমন ভাব দেখালে রেণুকা

কিন্তু সেই আবছা আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রেণুকাকে তার জীবনের একটা ক আঘাতকে গ্রহণ করতে হল। কল্যাণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, রেণুকা তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে কল্যাণ তাকে প্রশ্রয় ব ভেবে নিল। অমন যে ভীরু কল্যাণ তার পক্ষে কি কখনো তাকে অতো জোরে জড়িয়ে ধ সম্ভব? তার মুখ কল্যাণের বুকের ওপর প্রতিকারহীন প্রতিবাদ করতে করতে অবশেষে ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। বাসরে ফি এসে নিঝুম হয়ে পড়েছিল পরের দিন সকা পর্যন্ত।

সেই অজয়দা, কল্যাণদা আজ কোথায় আগুনের হল্কার মত বাতাস বইছে ছাদে ওপর দিয়ে। রেণুকার ইচ্ছে করছে আস্তে আস্তে আওয়াজ না করে একটু কাঁদতে।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রেণুকা, কল্যাণে ও রকম ব্যবহারে নিজেকেই অপরাধী ম হয়েছিল। তাই রবীন যখন প্রথম প্রথম তা প্রণয় বাণী শোনাতো, স্বভাবতই রেণুকে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হোতো। কি ক্রমে তার মন থেকে অপরাধীর সঙ্কোচ বে গেল। অনেকদিন বাদে রেণুকা যখন বা

বাড়ী ফিরে এলো তখন তার দিকে মানুষের চোখ পড়লে আর ফিরতো না।

পাড়ার মেয়েরা দেখতে এসে মন্তব্য করতো—"কি সুন্দরই হয়েছিস রেণু?" তাকে দেখতে সকলেই এসেছিল, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশিনীরা, কিন্তু যে দুজনকে তার সৌভাগ্য দেখানর জন্যে সে উৎসুক ছিল, তারা তো এলো না! অনুসন্ধানে জানলো যে যুদ্ধ এসে সব ওলোট পালট হয়ে গেছে।

অজয় ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, আর কল্যাণ এই সর্বনাশা যুদ্ধকে প্রতিবাদ করে গিয়েছে জেলে। অঘটন ঘটে গিয়েছে বাঙালীর সমাজ জীবনে। অজয়ের মাকে লোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—"তোমার অজয় বাঙালীর ভীরু বদনাম ঘোচাতে গিয়েছে।" আর কল্যাণের মাকে বলে—"তোমার কল্যাণ দেশের জন্যে জেলে গেছে।" কিন্তু দু'টি মায়ের মনেই বহুদিনের বিস্মৃত বীরাঙ্গনাদের আদর্শ রেখাপাত করে না। অন্তরালে দুজনেই পরমেশ্বরের কাছে সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে আবেদন জানান।

রেণুকা এই দু'টি মায়েরই মর্মবেদনার খোঁজ পেয়ে তাঁদের সে সান্ত্বনা জানিয়ে এল।

কিন্তু তবুও এক বছর আগে যেদিন সে শূন্য সীমন্তে এ বাড়িতে ফিরে এসেছিল সেদিন তার প্রথম মনে পড়েছিল অজয় আর কল্যাণকে। লোকে বলেছিল অত সুন্দরীর অদৃষ্ট কখনো ভাল হয় না। রবীনের মা বারে বারে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন সেই দিনটাকে যেদিন তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়ে প্রথম রেণুকাকে দেখেন। চল্লিশ দিন ধরে রবীন টাইফয়েডে ভুগে মারা গেলো। তারই শয্যাপার্শ্বে বসে রেণুকা তার দেহকে একটু একটু করে শেষ হ'য়ে যেতে দেখেছে। দু'বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি নিয়ে অহোরাত্র সে স্বামীর আরোগ্য কামনা করেছে, কিন্তু অবশেষে তাকে সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

নিরাভরণা মেয়েকে দেখে তার মা হাহাকার করে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনিও বেশিদিন এই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করেননি। আজ আট মাস হয়ে গেল রেণুকা কারো কাছে অন্তরের দুঃখ জানাবার সুযোগ পায়নি। যতদিন যাচ্ছে ততই অজয় ও কল্যাণের কথা মনে পড়ছে।

নীচের কলে জল আসবার মত শব্দ হচ্ছে। রেণুকার চুলের ওপর থেকে রোদ্দুর সরে গেছে অনেকক্ষণ। ক্রমশ তার দিবা স্বপ্নের ঘোর মিলিয়ে এলো। এখুনি ঝি আসবে, নিচেয় যাওয়া দরকার। কাজ থাকলেই রেণুকার ভাল লাগে। চাতালের ওপর একখানা চিঠি পিয়ন ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সেটার কথা মনে হতে রেণুকা তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে গেল।

চিঠি তারই নামে। তারই শাশুড়ী তার চিঠির জবাব দিয়েছেন। রেণুকা তাঁকে অনুনয় করে পত্র দিয়েছিল, তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে। রেণুকা জানিয়েছিল যে, তার মা নেই, প্রকৃতপক্ষে তিনিই তার মা। নিজের শ্বশুরবাড়ী থাকতে সে ভাই ভাজের হাত-তোলা হয়ে থাকতে চায় না।

সে পত্রের জবাবে সে পেয়েছে আর এক দফা অভিসম্পাত। তাঁর চাঁদের মত ছেলেকে সে গ্রাস করেছে। তার মত 'কুলক্ষণে রাহু'কে তিনি সংসারে স্থান দিতে পারবেন না।

রেণুকা ভাবতে লাগলো তার গতি কি হবে! এই ব্যর্থ জীবন যৌবন নিয়ে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! আবার তার মনে পড়লো বাল্য সঙ্গীদের কথা। অজয়দা যুদ্ধে গেছে। বন্দরে বন্দরে কত মেয়ে পুরুষের ভিড়, তার কথা কি অজয়দার মনে আছে!

আদর্শের জন্যে কল্যাণদা জেলে গেছে। তার পৃথিবীর পরিধি, তার আত্মীয়ের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে! তার কি মনে আছে একদিন এক উৎসবরাত্রির শেষে কোনও একটি মেয়েকে সে ভালোবাসা জানিয়েছিল?

কলের জল এসে গেছে। ঝি বোধ হয় এ বেলা আর এলো না। বৌদি ওপরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। দাদার অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরী আছে। সদর দরজাটা খুলে রেখে রেণুকা নিজেই বাসন মাজতে বসলো। দরজাটা খুলে রাখলো কারণ দাদা এসে ডাকাডাকি করবে, তখন এ'টো হাতে খিল খুলে দেওয়া শক্ত।

কল থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। ময়লা ফেলা গাড়ীর চাকার আওয়াজ হচ্ছে। মহানগরী দিবানিদ্রা থেকে জেগে উঠলো। রেণুকার দিবাস্বপ্ন অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে।

বাসন মাজা শেষ করে রেণুকা যখন বারান্দা ধুতে আরম্ভ করেছে, তখন তার দাদা সত্যেন্দ্র অফিস থেকে ফিরলো। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই রেণুকাকে ধমক দিতে লাগলো। "সদর দরজা হাট করে খুলে বাহার দিয়ে বাসন মাজবার দরকারটা কি!" ছেলেবেলাকার সতু আজ সত্যেন্দ্র হয়েছে। চাকরি করছে। স্ত্রী পুত্র নিয়ে চিরাচরিত নিয়মে সুখে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করছে। তার কথা বলবার ধরণে বোঝা যায় যে, সে তার সংসারে রেণুকার আবির্ভাবে একটু বিব্রত হয়েছে।

দাদার মনের কথা সে বেশ বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ওপর তলায় তার বৌদি দরজা বন্ধ করে শুয়ে-ছিলেন। নীচের তলায় কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে তিনি দরজা খুলে বাইরে এলেন। ঘুম-জড়িত চক্ষে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েই বললেন—

"ও মা! ঝি বুঝি এ বেলা এলো না! তা আমায় একবার ডাকতে হয়! তোমার ঐ কেমন দোষ একা কাজ করে বাহাদুরি নেবার।"

রেণুকা জবাব দিলো—"এর মধ্যে আবার বাহাদুরি নেওয়া কোনখানটায় দেখলে! শুয়েছো তো সেই বেলা এগারোটার সময়।"

তার দাদা ততক্ষণে ওপরে চলে গেছে। নিম্নস্বরে তার দাদা বৌদি কি যেন আলাপ করলো। কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ সত্যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"কেন তুমি কথা কও ওই ছোটো লোকটার সঙ্গে?"

কথাটা রেণুকার কানে গেল—"গালাগাল দিও না দাদা, আমায় সহ্য না হয় তাড়িয়ে দাও না!" রেণুকাও কম আদরে মানুষ হয়নি। চট করে সে ভুলতে পারছে না যে সে এই বাড়ীতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে।

জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে তার দাদা জবাব দিলো—"মেজাজ গরম করে বলছিস তো খুব, কিন্তু যাবি কোন চুলোয়! সব দিকই তো পুড়িয়ে খেয়ে বসেছিস!"

রেণুকা কাজ সারা করে কলতলায় গা ধুচ্ছিলো, এমন সময় এই মর্মান্তিক কথাটা তার কানে পেঁছুলো। কলের জলের ধারা তার সুপুষ্ট দেহের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে জবাব দিলো—"সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না দাদা, পষ্টাপষ্টি খুলে বলো না, তাহলে তো যা হয় করতে পারি।" রেণুকা অনেক শুনেছে, আজ আর সে ছেড়ে কথা বলবে না। সত্যেন্দ্র আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না—"মুখ সামলে কথা বলবি রেণু, বেশী বাড়াবাড়ি করিস তো টের পাবি বলে দিচ্ছি!"

রেণু স্বচ্ছন্দে জবাব দিলো—"টের আবার কি পাবো! টের খুবই পাচ্ছি! তোমরা দুজনে মিলে যা আরম্ভ করেছো, তাতে তো আর তিষ্ঠোতে পারছি না। তোমরা যা করছো আমার অদৃষ্ট মন্দ বলেই সহ্য করছি। কিন্তু মনে রেখো মাথার ওপরে ভগবান আছেন—তিনি এর বিচার করবেন!"

রেণুর বৌদি এই কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—"শাপমন্যি দিও না ঠাকুরঝি, তাতে ভাল হবে না।" তারপর স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন—"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছো তো বেশ? এদিকে দাঁতের বিষে আমার ছেলেমেয়েগুলোও যে বাঁচবে না! এমন করে দিনরাত শাপতাপ দিলে যে সব ছাই হয়ে যাবে!"

—"বের করছি ওর শাপ দেওয়া।" বলে সত্যেন্দ্র তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। তার স্ত্রী তাকে ফেরবার জন্যে সভয়ে পিছন থেকে অনুরোধ করতে লাগলো। রেণুকা নির্ভয়ে ধারা-স্নান করছে। নিচের চাতালে নেমে গিয়ে সত্যেন্দ্র থমকে দাঁড়ালো। রেণুকা চকিতে নিজের গায়ে ভিজে কাপড়

তুলে দিল। এক মুহূর্তের জন্যে একটা থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'লো এবং সংগে সংগে সদর দরজার কড়া সজোরে বেজে উঠলো। রেণুকা তার অংগের আচ্ছাদন আরও একটু পুরু করে দিয়ে স্নান সমাপ্ত করলো এবং উপস্থিত লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সত্যেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলো এমন সময় সে নিজেই এক হাতে দরজা এবং সত্যেন্দ্রকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

আগন্তুকের পরনে বৈমানিকের পোষাক। ছ' ফুট লম্বা দেহে প্রচুর শক্তির আভাস। "হাঁ করে দেখছিস কি রে সতুদা! চিনতে পারছিস না নাকি!" হতভম্ব সত্যেন্দ্রের পিঠে এক চড় মেরে অজয় জিজ্ঞাসা করলো।

"কে অজয়! আরে বাস, কি ফাইন চেহারা হয়েছে তোর! কবে ফিরলি? আয় ওপরে। রেণু, উনুন ধরে থাকে তো চা'এর জল চাপিয়ে দে।" রেণুর নাম শুনে অজয় চট করে পিছনে ফিরেই বললে—"আরে! রেণুই তো! নে শীগ্‌গীর করে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।"

দোতলায় উঠে অজয় সত্যেনের স্ত্রীর সংগে রসিকতা করলে, তার ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে হুড়োহুড়ি করলে, দু চারবার সশব্দে সত্যেনের পিঠ চাপড়ে দিলে, রেণুকে আবার চায়ের জন্যে তাড়া দিলে এবং অবশেষে রাত্রে এখানেই আহারাদি করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলো।

অজয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে বাড়ির গুমোট আবহাওয়া কেটে গেলো। সে চিরকালই সংকটত্রাণ ছেলে।

সে রাত্রে আহারাদির পর সকলে ছাদের ওপরে মাদুর পেতে অজয়ের গল্প শুনতে লাগলো। সুজলা বাঙলাদেশের ছোটখাট নদী নালা পেরিয়ে ইটালীর সমুদ্রতীরে একজন বাঙালীর ছেলে পেঁ'ছেছিলো। সচরাচর *মাটি থেকে যাদের পা উঁচুতে ওঠে না তাদেরই একজন মেঘের সংগে লুকোচুরি খেলে এসেছে। মানুষকে মরতে দেখেছে। হত ও হত্যাকারীদের এক সংগে দেখেছে। অজয় সকলকে শোনাতে লাগলো তার বৈমানিক* জীবনের দুঃসাহসিক কাহিনী।

একটু আগে রেণুকা নিচেয় গিয়েছিল তার দাদার ছোট মেয়েটির জন্যে দুধ গরম করে আনতে। তার অনুপস্থিতিতেই অজয় বিদায় নিলো। রাত হয়ে গেছে। অজয় তাড়াতাড়ি করে সিঁ'ড়ি দিয়ে নামছে। রেণুকাও তখন উপরে উঠছিল। সিঁ'ড়ির মোড়ে দু'জনের দেখা হ'ল। অজয় সস্নেহে রেণুকার মাথায় হাত দিয়ে বললে,—"কেমন আছিস রে?" রেণুকার চোখ ছলছল করে উঠলো—"ভালো নেই অজয়দা! শুনেছো তো সব?"

অজয় উত্তর দিলো—"হ্যাঁ এখানে এসেই শুনলাম। যাক যা হবার হয়ে গেছে। তার জন্যে দুঃখ করে কি লাভ?"

রেণুকা একটু হাঁসলো—"দুঃখের ব্যাপার অথচ দুঃখ করতে বারণ করছো। কিন্তু করবো কি বলতে পারো?"

সে রাত্রে রেণুকার চোখে ঘুম এলো না। রাত শেষ হয়ে আসছে। কল্যাণদার কথা আবার মনে পড়ছে। শেষ রাত্রিতে পুলিশ এসে কল্যাণদের বাড়ি ঘিরে ফেললো। ভোরের দিকে একটা গাড়ীতে চাপিয়ে পুলিশ কল্যাণকে নিয়ে গেলো। হাজার হাজার লোক জয়ধ্বনি করে উঠলো।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। তন্দ্রার ঘোরে রেণুকা জনসমুদ্রের গর্জন শুনছে। কারা যেন বিপ্লবের জয়ধ্বনি করছে, অগণিত জনতা তার কল্যাণদার জয়ধ্বনি করছে, তার দীর্ঘজীবন কামনা করছে। জনতা এগিয়ে আসছে, জনসমুদ্রের কলরোল আরও নিকটে এল। তন্দ্রাঘোরে রেণুকার সমস্ত দেহের রক্ত মুখে উঠে আসছে। রেণুকার ইচ্ছে করছে না নড়ে চড়ে এ স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। দিবসের কামনা, রাত্রে স্বপ্ন হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার তন্দ্রা ভেঙে গেলো তার দাদার গলার আওয়াজে। সূর্য তখনো ওঠেনি, খালি তার আগমনের ইসারায় পূর্বদিক রক্তাভ হয়েছে। তার বৌদিদি পর্যন্ত তার দাদার পাশে এসে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

"দেখছিস রেণু, কল্যাণ ফিরে আসছে! কত লোক এসেছে সংগে!"

রেণু চেয়ে দেখলো জনতার দিকে। তার মধ্যে সে কল্যাণকে খোঁজবার চেষ্টা করল।

"কল্যাণদা ছাড়া পাবে একথা তো শুনিনি?"

"আমি গুজব শুনছিলাম ক'দিন ধরে। কিন্তু এতো শীগ্‌গির তাতো জানতাম না?"

"কিন্তু কল্যাণদাকে তো দেখতে পাচ্ছি না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ দেখ দাদা, কল্যাণদা! দেখতে পাচ্ছো না! ঐ যে, ফুলের মালায় মুখ ঢেকে গিয়েছে? আঃ লোকগুলো আবার সামনে ভিড় করছে! ওদের জ্বলায় কি কিছু দেখা যাবে!"

রেণুকার প্রতি অজয় ও কল্যাণের মমতা সমানই আছে। পুরোনো সমাজের তুলনায় কিন্তু দুজনেই আপেক্ষিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অজয় চোখের সামনে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মানুষকে মরতে দেখেছে। রক্তপাতকে সে অহেতুক মনে করে না এবং সময় বিশেষে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে। অন্যায়ের ধ্বংসের মাঝে আগামী দিনের সুবিচারের সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে। কল্যাণ কিন্তু তা স্বীকার করে না। হত্যাকারীরা যতই শক্তিমান হোক না কেন তার চেয়ে শক্তিমানের আবির্ভাব হতে বেশী দেরী হয় না। এক শক্তি আর এক শক্তিকে শুধু প্রতিহত করবে। কিন্তু একে অপরকে ধ্বংস করবে এ ধারণাই ভুল।

"গোড়াতেই ভুল করছো কল্যাণ। যুদ্ধ অহিংসই হোক আর সহিংসই হোক এই সমাজ ব্যবস্থার মাঝখানে কোনো ধরণের সৈনিকই জন্মাতে পারে না। স্ত্রীর আমরণ বৈধব্যের বিনিময়ে দেশপ্রেম দেখানো গেলেও, স্ত্রীর প্রতি প্রেম সত্যি সত্যি মূল্যহীন নয়। সংসারকে এড়িয়ে সন্ন্যাসী হওয়াও আজকাল মর্যাদা পায় না। আমার মনে হয় নির্ভরশীল পরিবারের ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে, বৃহত্তর ক্ষেত্রের পরিবর্তনের চিন্তা করা অন্যায়।"

এ কথার জবাব না দিয়ে কল্যাণ শুধু একটু হাসে। কারাবাসের প্রতিক্রিয়া কল্যাণের ওপরে দেখা দিয়েছে। প্রায় কথারই জবাব না দিয়ে সে নীরবে শুধু হাসে। সময় সময় রেণুকার কাছে এ হাসি অসহ্য বলে মনে হয়।

এমন করে আরও ক'দিন কেটে গেলো। অজয় ও কল্যাণের প্রত্যাগমনের উন্মাদন স্তিমিত হয়ে এসেছে। অজয়ের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। রেণুকাদের বাড়ি আবহাওয়া আবার সেই পুরানো অবস্থা ফিরে এলো।

একদিন বোধ হয় বিতর্কের ঝাঁঝ সত্যেনে পক্ষে সহনাতীত হয়ে উঠেছিল। সে রাগে মাথায় রেণুকাকে সিঁ'ড়ির ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অজয় ও কল্যাণ ওদের বাড়িতে ঢুকলো। অসম্বৃত রেণুকা ওপর থেকে একেবারে সিঁ'ড়িতে ওঠবা মুখে চাতালের ওপর গড়িয়ে পড়লো রেণুকাকে ওই অবস্থায় দেখে দুজনে থমকে দাঁড়ালো। কল্যাণ যেন থতমত খেয়ে গেলে মনে হয় এই রকম একটা ঘটনার সামনে *দাঁড়ানো তার অভিপ্রেত নয়। অজয়ের কা এ রকম দৃশ্য খুব পরিচিত না* হলেও [illegible] শুশ্রূষা করতে এগিয়ে গেলো।

রেণুকার কপালের এক কোণ কে *গেছে। চুঁয়ে চুঁয়ে* রক্ত পড়ছে। সত্যে স্ত্রী এলো সাহায্য করতে, কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে সত্যেন সোজা বেরিয়ে গেলো বা থেকে।

অজয় কল্যাণকে কিছু তুলো, আই ও বরফ আনতে পাঠালো। রেণুকার বৌ অজয়ের নির্দেশমত খানিকটা দুধ গরম ক আনতে গেলেন। কাপড়ের ফালিতে করে [illegible] দিয়ে অজয় তখনো সযত্নে রক্তধারা মুছে দি রক্তস্রোতের একটা ধারা সীমন্তের মধ্য দি বয়ে গেছে। অসম্বৃতা রেণুকা অজয়ের সা

নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। অজয়ের বুকের ভেতরকার জমা নিঃশ্বাস কোনমতে আর চাপা থাকছে না। কত সমুদ্র সে পার হয়ে গেছে কিন্তু এমন ঝড় তার বুকে কখনো ওঠেনি।

"কল্যাণদা কোথায় গেলো?" মূর্চ্ছার ভাব কেটে যেতে দরজার দিকে তাকিয়ে রেণুকা জিজ্ঞাসা করলো।

"তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। তুমি বেশী নড়াচড়া করো না।"

"কল্যাণদা ফিরে আসবে তো?"

"এখুনি আসবে, তুমি কথা কোয়ো না।"

অজয় নিজের মনে রেণুকাকে শুশ্রূষা করে চলেছে। অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ অজয় বললো—"এমন করে কত-দিন চলবে রেণু?"

এ কথার জবাব রেণুকার তৈরী ছিলো—"চলবে না অজয়দা! কিন্তু করবো কি বলো!"

"আমি তো বলতে পারি এখনই। এ সমস্ত সমস্যার কথা দিনরাত ভেবেছি। উত্তরও তৈরী হয়ে রয়েছে মুখে। কিন্তু তোমার পছন্দ হবে তো?"

অজয় জবাব প্রত্যাশা করলো। কিন্তু রেণুকা জবাব দেবে কি করে, সমাধানের প্রকৃত রূপ না জেনে। সে খালি বললে—"কল্যাণদা এখনও ফিরছে না কেন?"

এর কয়েকদিন পরে, অজয় একদিন সোজা-সুজি কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করলো রেণুকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মতামত। কল্যাণ দেশ-সেবা, ত্যাগ-ব্রতের আদর্শ, ইত্যাদি ধরণের গোটাকতক জবাব দিলো। অসহিষ্ণু হয়ে অজয় কল্যাণকে বললো—"ও সমস্ত বাজে কথা ছাড়ো। রেণুকাকে তুমি বিয়ে করো। আমি জানি রেণুকার এতে অমত হবে না।"

কল্যাণ জবাব দিলো—"তা হয় না।"

অজয় ধমকে উঠলো—"কেন হয় না?"

কল্যাণ বললে—"সমস্যা শুধু রেণুকাকে নিয়ে নয়, সমগ্র সমাজ নিয়ে। এতগুলো মানুষের সংস্কারে আঘাত করা অন্যায় নয় জানি, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু যাই বলো না কেন অজয়, ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে বৃহত্তর ভবিষ্যতের সর্বনাশ করা অত্যন্ত বোকার কাজ। আমি যদি তোমার পরামর্শ মত কাজ করি, তাহলে আমার ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যাবে।"

উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল অজয়—"এই মহামানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশসেবা করার অর্থ কেউ বুঝবে না কল্যাণ। তোমার এ কথার অর্থ দায়িত্ব এড়ানো।"

কল্যাণ এই অভিযোগের কোন জবাব দিল না। তার মুখে সেই মৃদু হাসি। ক্ষমাসুন্দর চক্ষে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো। এই প্রতিরোধের কাছে অজয় হার মানলো।

সেইদিন শেষ রাত্রে বাড়ির দরজা খুলে রেণুকা এসে পথে দাঁড়ালো। অজয় এগিয়ে এসে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিতে সে জিজ্ঞাসা করলো—কল্যাণদা কই; সে এলো না?

সামনের দিকে চলতে চলতে অজয় বললে —নাঃ, তার ঠিক সুবিধে হলো না।

রেণুকা অগ্রগমন বন্ধ না করেই জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে কি হবে?

অজয় সহজভাবেই জবাব দিলো—কী আর হবে! কল্যাণ পেছিয়ে গেলো বৃহত্তর মহত্তর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আসলে ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু আমি তো আর কিছুতেই ভয় পাই না।

অজয়ের সবল বাহুকে আশ্রয় করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলতে চলতে রেণুকা আবার শুনতে পেলো অজয় বলছে—"তোমার কোন ভয় নেই রেণু। আমার কাছে তুমি ভালই থাকবে। আমি আর যুদ্ধে ফিরে যাচ্ছি না। নিজের দেশ মরে যাচ্ছে, আসল লড়াই আমাদের ঘরে, আর আমরা কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে লড়াই করছি!

এমন সময় রেণুকা অন্ধকারে হোঁচুট খেয়ে অজয়ের হাত সজোরে আঁকড়ে ধরলো। অজয় বললো—"আর একটু সাবধানে চলো রেণু। বেশীক্ষণ অন্ধকার থাকবে না।"

রৌদ্র দগ্ধ ভারতবর্ষ

আজ ছাব্বিশে বৈশাখ। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। গাড়ীর গতি দ্রুত। রুক্ষ প্রান্তর পার হইয়া চলিয়াছি—ভূ-দৃশ্য দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই বাঙলাদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বিহার প্রদেশে পড়িয়াছি কি না! দুইদিকে লাল মাটির রিক্ত মাঠ, নির্জলা নদী, শালের অরণ্য, দিগন্তে পাহাড়ের রেখা এখনো দেখা দেয় নাই। প্রখর রৌদ্রের ঘাম তেল-ঘষা দৃশ্য মরীচিকার মতো কম্পমান।

গাড়ীর মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী। আমি এবং আর এক ভদ্রলোক ও তাহার ভৃত্য। কামরার শার্সি ফেলা, পাখা ঘুরিতেছে, গাড়ী দুলিতেছে। ভৃত্যটি তাহার প্রভুর জন্য ইকমিক কুকারে রান্নায় নিযুক্ত। ভদ্রলোকটি টাইম টেবল পড়িতেছে আর এক একবার ধূমায়িত কুকারের দিকে তাকাইয়া আসন্ন আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমি একাকী বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি। ডান দিকের জানলা দিয়া তাকাইয়া আছি—মাঝে মাঝে বাম দিকের জানলাতেও তাকাইতেছি—দুইদিকের দৃশ্যে মিলাইয়া লইবার জন্যে দুইদিকে একই দৃশ্যের রূপান্তর।

গাড়ীর মধ্যেই যা কিছু প্রাণের লক্ষণ, গাড়ীতেই যা কিছু ধ্বনি এবং গতি, বাহিরের দৃশ্য নিশ্চল, নির্জীব, জীবন চিহ্ন বিবিক্ত—এ যেন পৃথিবীর প্রান্তর নয়—কোন মৃতগ্রহের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি—চন্দ্রলোকের প্রান্তর কি ইহার চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন? কেবল স্টেশনে আসিয়া যখন গাড়ী থামে তখন দু'দশজন লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পানি পাঁড়ে জল লইয়া আগাইয়া আসে, স্টেশন মাস্টার কালো টুপি ও স্থূল দেহ লইয়া ব্যস্ততা দেখায়, দু'চারজন যাত্রী ওঠা-নামা করে, বড় বড় প্রাচীন গাছের তলে মধ্যাহ্ন তন্দ্রায় অন্য গাড়ীর যাত্রীরা ঢুলিতে থাকে, সিগন্যালম্যান প্রাণপণে সিগন্যাল টানে, ঘণ্টিওয়ালা ঘণ্টা মারে, গার্ড নিশান দোলায়—গাড়ী আবার নড়িয়া ওঠে। নিস্তব্ধের অদৃশ্য সুতায় মাঝে মাঝে স্টেশনের শব্দ মণিগাঁথা বিচিত্র এই হার, নির্জীবতার মরুভূমিতে স্টেশনগুলি প্রাণের মরূদ্যান।

স্টেশন ছাড়িয়া এবারে আর এক প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়াছি। চড়াই রেল লাইন—ইঞ্জিনের হাঁসফাস শব্দ বড়ই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। ঢেউ-খেলানো দগ্ধ মাঠ গাড়ীর গতি ও মোড় ঘুরিবার সংগে অপ্রত্যাশিতভাবে তরঙ্গায়িত হইতেছে—নিশ্চল ঢেউ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া একটার সংগে আর একটা মিশিতেছে, একটার ঘাড়ে যেন আর একটা ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতি দূরে একটা কলের চিমনি, প্রখর রৌদ্রে

দূরবর্তী বাড়ির অদৃশ্য-প্রায় শুভ্রতা। হঠাৎ এক সার তাল গাছ আসিয়া পড়িল। তারপরেই একটা নদীর শুষ্কখাত, নদী পার হইতেই শাল বন আরম্ভ হইল। গাড়ী প্রকাণ্ড শালবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। লাইনের ঠিক পাশের গাছগুলি ছোট, কিন্তু যতই দূরে যাওয়া যায় বনস্পতির সংখ্যা প্রচুর। বনের মধ্যে নিশ্চয় ঘন ছায়া আছে, কিন্তু গাড়ীর উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র।

ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশকে যদি দেখিতে হয় তবে এভাবে দেখা ছাড়া উপায় নাই—এইভাবেই তাহাকে দেখিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা। আজ সকালে যখন রওনা হইয়াছিলাম—ছিল ভেজা মাটি, খাল বিল, ধান পাট, আম জামের দেশ, ছিল পথের দুইদিকে ছায়া-ঘেরা পল্লী, ছিল ঝিল পুকুর আর বড় বড় নদী। তারপরে পৃথিবীর শ্যামলিমা ক্রমে ফিকা হইতে থাকিল—উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি লঘু হইয়া আসিল, মাটির কালো রঙে গেরুয়া মিশিয়া লাল হইয়া উঠিল, মাঠে ঢেউ দেখা দিল, শাল তাল জাগিতে আরম্ভ করিল—বস্তুবহুল চিত্রপট ক্রমে রেখাবিরল হইয়া উঠিতে উঠিতে অবশেষে আকাশ ও পৃথিবীর ন্যূনতম রেখায় আসিয়া ঠেকিল। ঊর্ধ্বে নভোরেখার ধনুষ্ক খিলান—নিম্নে পৃথিবীর একটি সমতলরেখা, আর এই দুইকে অভিষিক্ত করিয়া ঝরিতেছে সোনার রৌদ্র—যেন শূন্যে বিলম্বিত পাখীর উড়িয়া-যাওয়া একটি সোনার দাঁড়! কোন্ বিহঙ্গের আশ্রয় এই সনাতন সুবর্ণ দণ্ড জানি না! সে বুঝি ওই সোনার রৌদ্রে মাতাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—বিশ্বের দূরতম প্রান্তে?

আমার দুইদিকে রৌদ্রদগ্ধ ভারত—এই তো আমার ভারতবর্ষ! আধুনিক শহরের কল-মিলের ধোঁয়ায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন, আধুনিক শহরের নভোস্পর্শী অট্টালিকার অন্তরালে ভারতবর্ষ অন্তর্হিত, আধুনিক রাজনীতির বিষোচ্ছ্বাসে ভারতবর্ষ মলিন! কিন্তু ভারতবর্ষকে তো দেখিতেই হইবে!

ভারতবর্ষকে দেখিতে হইলে ভারতবর্ষের জনশূন্য প্রান্তরে আসা ছাড়া উপায় নাই। ভারতবর্ষ তাহার নির্জন মহাপ্রান্তরে পঞ্চাগ্নির হোমানল জ্বালিয়া মীন শান্ত সরোবরের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া আছে। মহাতপস্বী ভারতবর্ষ ঝটিকা-পূর্ব প্রকৃতির ন্যায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মহাপ্রান্তরগুলিতে ধ্যানস্থ। তাহার নেত্র মুদ্রিত, তাহার অঙ্গুলি মুদ্রায়িত, তাহার বক্ষাবিলম্বী অক্ষমালা গ্র সমূহের মতো অচঞ্চল। কে তাহার কা আসিল, কে চলিয়া গেল, সেদিকে তাহ দ্রুক্ষেপ নাই। সে কি পাইল এবং কি পাই না সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। দেশাতীত ও তপস্বী সমগ্র দেশ তাহার পদ্মাসন, কালাতী এই তপস্বী কাল-নাগকে সযত্নে কণ্ঠে ধা করিয়া রাখিয়াছে। তাহার নিমীলিত চক্ষু দেশ-কাল-সংস্কারের সপ্ততালভেদী অন্তর্লী দৃষ্টি বিশ্বের পরপারবর্তী মহাগ্র জ্যোতির্বিন্দুটির প্রতি একাগ্রে অভিনিবি এই আমার সেই ভারতবর্ষ! রৌদ্রদগ্ধ মরু প্রান্তরে একবার চকিতের মধ্যে যেন তাহা সাক্ষাৎ পাইলাম।

মনের মধ্যে হঠাৎ গুঞ্জরিয়া উঠিল—

'আমার ভারতবর্ষ নহে সে তো ভৌগোলিক সীম
সে যে এক অপূর্ব মহিমা

ওই দুটি ছত্র মনের মধ্যে তপস্বীর অঙ্গুলি চালিত জপমালার মতো ক্রমাগত আবর্তি হইতে থাকিল!

'আমার ভারতবর্ষ নহে সে তো ভৌগোলিক সীম
সে যে এক অপূর্ব মহিম

অপূর্ব মহিমাই বটে! আমার ভারতব ভাবৈক দেহ। কিন্তু এই মহিমাকে, এ ভাবস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার ক্ষেত্র কোথায় সে ওই তাহার রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর! সে ও তাহার নিস্তব্ধ নির্জনতা! কি পর সৌভাগ্যের ফলে জানি না, একজনের সংগে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি আকস্মিকভাবে সেই মহাতপস্বীকে আ দেখিতে পাইলাম।

সূর্য-নমিত দিগন্তের দিকে গাড়ি ছুটি চলিল।

খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এস কে চ্যাটার্জি বেতারযোগে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—দুর্ভিক্ষের কথা ভাবিয়া আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই, চাউল কিছু "বাড়ন্ত" আছে বটে, কিন্তু সেই ঘাটতিটা কম খাইলেই পূরণ করিয়া নেওয়া যাইবে। "নিয়মবদ্ধ একাদশীর ব্যবস্থা দিলে চাউলের সঙ্গে কর্পোরেশনের জলের ঘাটতিটাও পূরণ হইয়া যায়", এই মতটা দিলেন অবশ্যই বিশু খুড়ো, কেননা খাদ্য বিভাগে এমন জলের মত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার মাথা নিশ্চয়ই বিরল!

* * *

কোলাঘাট সরকারী গুদামে নাকি পোনর হাজার মণ আলু পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশব্যাপী খাদ্য পচানোর উৎসবে কোলাঘাটের এই দানকে যাঁরা নগণ্য মনে করিবেন তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি অষ্ট্রেলিয়া হইতে অবিলম্বেই পাঁচ হাজার টন আলু আসিতেছে!

* * *

চাঁদপুরের এক সংবর্ধনা সভায় বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—তিনি নাকি চাঁদপুরকে চাউল দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। চাঁদপুরবাসীর প্রতি লক্ষ্মী সুপ্রসন্না, তারা বৈভবের সম্ভাবনায় তাঁরা এখন হইতেই চাউল টাকা টাকা সেরে ক্রয় বিক্রয় শুরু করিয়া দিয়াছেন।

* * *

জার্মানীর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারতের ভাগে একখানা তেইশ বছরের পুরাতন ছোট জাহাজ
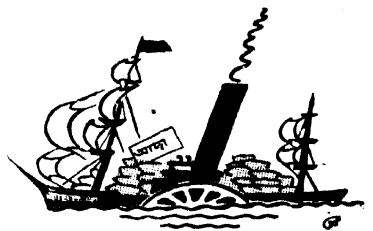
মিলিয়াছে। আদার বেপারীদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থার প্রয়োজন নাই বলিয়াই।

* * *

ট্রামওয়েটা বর্তমান কোম্পানীর হাতেই থাকিবে, না হস্তান্তরিত হইবে সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নাকি কোম্পানী গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও করিয়াছেন যে, ইতিমধ্যে মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধিটা বন্ধ করা হইবে না। আমরা কোম্পানীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশেই বাদুড় ঝোলা হইয়া তাঁহাদের এই মহান সংকল্পে সাহায্য করিতে থাকিব।

পয়লা আগস্ট হইতে পেট্রোল রেশনিং উঠিয়া যাইবে বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিলাম। আমাদের ট্রামে-বাসে যাত্রীদের দুঃখনিশা প্রায় ভোর হইয়া আসিল—আর এই-সঙ্গে পথচারীদের ভবযন্ত্রণা দূর হওয়ার সম্ভাবনাও হয়ত আসন্ন হইয়া আসিল"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে পড়িলাম—পৃথিবী নাকি আবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই, আসর

গরম করিবার জন্য রুশিয়া আর আমেরিকার তরজা বেশ জোরেই চলিতেছে।

* * *

পয়লা জুন হইতে একটার সময় জ্ঞাপক তোপধ্বনির ব্যবস্থা আবার চালু করা হইয়াছে। বারোটা বাজিয়া যাওয়ার তোপধ্বনি কবে করা হইবে তাহা অবশ্য মন্ত্রিমিশনের সফরের ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

* * *

জনৈক রিক্‌সাওয়ালার ন্যায্য ভাড়া দিতে অস্বীকার করায় কোনও পুলিশ সার্জেণ্টের সঙ্গে রিক্‌সাওয়ালাদের সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটা ঘটিয়াছিল জামাই ষষ্ঠীর ঠিক দুই দিন আগে। ষষ্ঠীর তারিখটা রিক্‌সাওয়ালারা মনে করিয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়াই জামাতৃপুঙ্গব অর্থাৎ সার্জেণ্টের আব্দার তারা গ্রাহ্য করে নাই।

* * *

মহাম্মডান স্পোর্টিং ভবানীপুরের সঙ্গে লীগের খেলায় হারিয়া যাওয়ার পর পূর্বোক্ত ক্লাবের একদল সমর্থক ভবানীপুরের খেলোয়াড়দিগকে বেদম মারধর করিয়াছে। দেখিতেছি "লড়কে লেঙ্গে" নীতিটা লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং আই এফ এ শীল্ডের বেলাতেও প্রয়োগ করা যায়।

ডাঃ আম্বেদকারকে আশ্বাস দিয়া মিঃ চার্চিল জানাইয়াছেন—তাঁহার পার্টি অস্পৃশ্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা
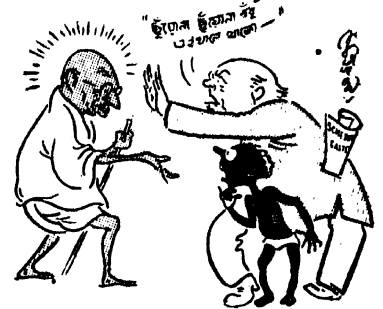
করিবে। "অর্থাৎ অস্পৃশ্যদিগকে অস্পৃশ্য করিয়াই রাখা হইবে, কিছুতেই হরিজনে পরিণত করিতে দেওয়া হইবে না"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

এইবারে যাঁরা ডার্বির টিকিট 'ড্র' করিয়াছেন তাঁহাদের নম্-ডি-প্লুমে দেখিলাম সাতটি রহিয়াছে "জয় হিন্দ"। আমাদের শ্যামলাল বলিল "পাকিস্থান"ও ছিল, কিন্তু সেই নামের টিকিট উঠে নাই।

রূপ-পরিচর্য্যায়
কেশকল্যান
ও
সন্ধ্যা গ্লো
KOHINOOR
কোহিনুর পারফিউম কোং
কলিকাতা

ক্ষয়রোগে বাতাস ও খাদ্য

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

বাতাস

বাতাসেই যে আমাদের জীবন একথা কে না জানে? কিন্তু সেই বাতাসই যে আবার রোগের চিকিৎসার পক্ষেও মহৌষধ একথা অনেকেই জানেন না। ঔষধ অর্থে যদি বোঝায় আরোগ্যশক্তিযুক্ত কোনো পদার্থ, তা'হলে সেইগুলির তালিকার মধ্যে বাতাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে। বস্তুত মুক্ত বাতাস এমন রোগকেও আরোগ্য করতে পারে, যার চিকিৎসা করা সকলের চেয়ে কঠিন। অথচ এই ঔষধ অতিশয় সস্তা, সকলের চেয়ে সহজপ্রাপ্য, আর সর্বাপেক্ষা আরামের সঙ্গে সকল বয়সে সকল অবস্থাতে সকলেই অনায়াসে সেবন করতে পারে। জ্ঞান যাঁর অনন্ত এমন কোনো বিশিষ্ট রাসায়নিকের নিজের হাতের বানানো এই অমূল্য ঔষধ। এর নকল আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। অথচ এটি আমাদের উপকারের জন্য সর্বত্রই বিদ্যমান রয়েছে, শুধু গুণগ্রাহিতার অভাবে আমরা এর যথেষ্ট সুযোগ নিতে জানি না। ঠিক মতো উপায়ে সেবন করতে পারলে এর ক্রিয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। বিশেষ ক'রে ক্ষয়রোগের পক্ষে এর উপকারিতার তুলনা নেই।

বাতাসের মধ্যে আছে অক্সিজেন যা আমাদের প্রাণবায়ু স্বরূপ। অক্সিজেন ভিন্ন কখনো কোনো জিনিসের দাহ হয় না। আমরা যা কিছু খাদ্য খাই, তারও দাহ হওয়া দরকার; নতুবা তার থেকে শক্তি উৎপন্ন হয় না। অক্সিজেন প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে শরীরের ভিতরে গিয়ে প্রত্যেক কোষে কোষে অনবরত এই খাদ্যদাহের কাজটি করাতে থাকে। বাতাসের মধ্যে কুড়ি ভাগ আছে অক্সিজেন এবং আশি ভাগ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস। বাতাসের এই অক্সিজেন খাদ্যপদার্থের সঙ্গে মিশে তাকে দাহ ক'রে অঙ্গার সংযুক্ত হ'য়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক বাষ্পে পরিণত হয়। সেটিকে আমরা বারে বারে নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে পরিত্যাগ করতে থাকি, আর তার বদলে পুনরায় অক্সিজেনপূর্ণ বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নতুন ক'রে গ্রহণ করতে থাকি। বাতাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে এই মোটামুটি কথা। বায়ুশূন্য জলতলে সাবমেরিন জাহাজে কেউ নামলে কিংবা বায়ুবিরল আকাশমার্গে এরোপ্লেনে কেউ উঠলে সেখানে তার অক্সিজেন সরবরাহের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়, নতুবা সে বাঁচে না। বাঁচবার জন্য অনবরতই আমাদের অক্সিজেনপূর্ণ বায়ু চাই।

কিন্তু মুক্ত বাতাসের কথা আরো একটু স্বতন্ত্র। স্রোতের জল আর আবদ্ধ জলে যে তফাৎ, মুক্ত বায়ু আর আবদ্ধ বায়ুতে সেই তফাৎ। বায়ু মাত্রেই অক্সিজেন আছে। আবদ্ধ ঘরের বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে না তা নয়। কিন্তু তবু আমরা আবদ্ধ ঘরে কিছুক্ষণ থাকলেই হাঁপিয়ে উঠি, বেশিক্ষণ থাকলে মাথা ধরে, অবসাদ আসে, মূর্ছার উপক্রম হয়, অনেকে ভিরমি পর্যন্ত যায়।—আর নিত্য নিত্য আবদ্ধ ঘরে বাস করতে থাকলে ধীরে ধীরে শরীরের ক্ষয় হ'তে থাকে, রক্তহীনতা দেখা দেয়, অনেক রকম সংক্রামক রোগ এসে পড়ে। কেন এমন হয়, আবদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও কিসের এমন দোষ? পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, কাউকে যদি মুক্ত বাতাসের মধ্যে রেখে তার নাকে নল লাগিয়ে কোনো আবদ্ধ ঘরের বায়ু অনবরত সেবন করানো হয়, তাতে তার কোনোই অস্বস্তি বা ক্ষতি হয় না,—আবদ্ধ ঘরের বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে, তাই তার শ্বাসপ্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কিন্তু কাউকে যদি আবদ্ধ ঘরের মধ্যেই ঢুকিয়ে রেখে নাকে নল লাগিয়ে বাইরের মুক্ত বায়ু অনবরত সেবন করানো হয়, তবু তার নানারূপ অস্বস্তি ঘটতে থাকে,—মুক্ত বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকলেও তাতে তাকে কিছুমাত্র আরাম দিতে পারে না। কিন্তু যেমনি সেই আবদ্ধ ঘরের মধ্যে পাখা চালিয়ে দিয়ে সেই আবদ্ধ বায়ুকেই আলোড়িত করতে থাকা হয়, অমনি সেই গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, অক্সিজেনযুক্ত বায়ু থাকলেই যথেষ্ট হয় না, আমাদের চাই আলোড়িত, স্পন্দিত এবং স্রোতযুক্ত বহমান বাতাস। অনেক স্থানের আবদ্ধ বাতাসই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু বসবাসের পক্ষে নয়। মুক্ত বাতাস আমাদের একান্তই প্রয়োজন এইজন্য যে, তা নিত্যই চঞ্চল ও বহমান থাকে। যে বায়ু বহমান তা জীবন্ত, কিন্তু যে বায়ু নিশ্চল তা মৃত। জীবন্ত বাতাসই আমাদের প্রয়োজন। সেই বহমান বাতাসটি আমাদের সর্বাঙ্গের সংস্পর্শে আসা চাই, কেবল নাক দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গ্রহণ করতে পারলেই আমাদের সকল প্রয়োজনীয়তা মেটে না।

এতদিন পর্যন্ত এই কথাটি বিশদভাবে জানা ছিল না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই তথ্য আবিষ্কারের পর থেকে ক্ষয়রোগ চিকিৎসায় একটা নতুন রকম পদ্ধতির সূত্রপাত হয়, বহমান মুক্ত বাতাসকে এর চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়। অল্প দিনের পরীক্ষাতেই দেখা যায় যে, মুক্ত বাতাসে রোগীদের রাখতে পারলে তার দ্বারা এমন আশ্চর্য রকমের উপকার হয়, যা অন্য কোনো রকম চিকিৎসার দ্বারাই হয় না। শুধু ফুসফুস সংক্রান্ত যক্ষ্মারোগেই নয়, এটা বিশেষরূপে দেখা গেছে যে, যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা সংঘটিত শরীরের যে-কোনো অঙ্গেই যে-কোনো চরিত্রের রোগ হোক, হাড়ে অথবা চর্মে অথবা গণ্ডে যেখানেই এ রোগ আক্রমণ করুক, এই এক মুক্ত বাতাসের চিকিৎসায় নিশ্চয়ই তার উপকার হবে। এর থেকেই আরো প্রমাণ হয় যে, মুক্ত বাতাসকে কেবল যে আমরা নাক দিয়েই গ্রহণ করে থাকি তা নয়, আমরা তাকে সর্বাঙ্গের চামড়া দিয়ে সেবন ক'রে শরীরের সর্বত্রই আপন উপকারে লাগিয়ে থাকি।

এটা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, উন্মুক্ত বহমান বায়ুকে গায়ে মুখে লাগতে দেওয়া, অর্থাৎ খোলা বাতাসে পড়ে থাকা সর্ববিধ যক্ষ্মারোগের পক্ষে সর্বোত্তম চিকিৎসা। প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডের মতো দারুণ শীতের দেশে এই চিকিৎসার সূচনা হয়, তারপর তার আশ্চর্য সুফল দেখে সকল দেশেই এই প্রথাটি অবলম্বিত হ'তে থাকে। এখন সকল দেশের স্যানাটোরিয়মে ঐ প্রথা মতোই কাজ করা হয়, রোগীদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় মুক্ত বাতাসে ফেলে রাখাই তার একটি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা। রোগী মাত্রকেই এই ব্যবস্থা অনুসারে চলতে হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়াতে মুক্ত বাতাসে দিবারাত্র পড়ে থাকা কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু বিলেতে কিংবা আমেরিকাতে, আর বিশেষ ক'রে শীতপ্রধান পার্বত্য দেশ সুইজারল্যাণ্ডে যে সেটা কত কঠিন তা আমরা এই গরম দেশে থেকে অনুমান করতেও পারি না। সেখানে প্রায়ই বরফ পড়ে, দারুণ বৃষ্টি দুর্যোগ হ'তে থাকে, কনকনে হাওয়া বইতে থাকে। আর শীতের দিনে তো কথাই নেই, তখন আবহাওয়ার টেম্পারেচার শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে যায়। সহজ মানুষেও তখন ঘরের দরজা জানলা বন্ধ ক'রে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে বাস করে। কিন্তু সেই শৈত্যপ্রচুর সুইজারল্যাণ্ডেই বেছে বেছে ইউরোপের লোকেরা বহুসংখ্যক স্যানাটোরিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে, কারণ ঐ ঠাণ্ডা পার্বত্য দেশের

আবহাওয়া ক্ষয়রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সেখানকার সূর্যালোকে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে। তা ছাড়া শীতের আবহাওয়াতে ক্ষয়রোগীদের সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। আবহাওয়ার রকম রকম উত্থানপতন থাকাই দরকার এবং তেমনি শীতগ্রীষ্মাদির উত্থানপতনযুক্ত আবহাওয়াই রোগীদের পক্ষে উপকারী। যে সকল দেশে শীতগ্রীষ্মের মধ্যে বেশি ভেদাভেদ নেই এবং যেখানে দিবারাত্রির টেম্পারেচারের মধ্যেও তত পার্থক্য নেই, সেই সকল দেশের আবহাওয়া রোগীদের পক্ষে তত বেশি উপকারী নয়, যেমন উপকারী ঐ সকল দেশগুলি যেখানে বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন কালে টেম্পারেচারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, আর বিশেষত যেখানে শীতের প্রখরতা আছে। তাই বেছে বেছে ঐ সকল দেশগুলিই তাদের জন্য মনোনীত করা হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের মত তুষারপাতের দেশে রোগীদের কোথায় শুইয়ে রাখা হয়, তা শুনলে অনেকেই হয়তো আশ্চর্য হ'য়ে যাবে। কেবল রাত্রিটুকু তারা ঘরের মধ্যে কাটায়, কিন্তু সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তারা পড়ে থাকে ঘরের বাইরে। প্রত্যেক রোগীর ঘরের সঙ্গেই খানিকটা ক'রে বাইরে বের করা বারান্দা আছে, তাকে বলে পর্চ। এই পর্চের তিন দিক খোলা, কেবল মাথার উপর আছে আচ্ছাদন। অতিরিক্ত শীত কিংবা দুর্যোগের দিনেও কয়েক প্রস্ত লেপ কম্বলের দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত ক'রে এবং কান মাথা ঢাকা দিয়ে খাটসমেত তাদের সেই পর্চে বের ক'রে দেওয়া হয়, তাদের চোখের সামনেই বরফ পড়তে থাকে এবং বৃষ্টি দুর্যোগ হ'তে থাকে। নিতান্ত যখন বৃষ্টির ছাঁট বা ঝড় তুষারের ঝাপ্‌টা আসে, তখন পর্দা ফেলে দেওয়া হয়। আবার একটু রোদ উঠলেই সেই পর্দা তুলে দেওয়া হয়। এমনিভাবে দারুণ ঠাণ্ডার সময়েও নিয়ম ক'রে রোগীদের দৈনিক ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত ঘরের বাইরে মুক্ত বাতাসে থাকতে হয় এবং ঐভাবে থাকা অভ্যাস করতে করতে তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে ওঠে। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, এতে তাদের ঠাণ্ডা লাগে না বা সর্দি হয় না? অবশ্য সর্বাঙ্গে তাদের যথেষ্টই আচ্ছাদন থাকে, যাতে সহজে তেমন ঠাণ্ডা না লাগতে পারে। তথাপি প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয় বৈ কি, কারণ এরূপভাবে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস লাগানো কারোর আগে থেকে অভ্যাস থাকে না। তবে কয়েক দিন অভ্যাস ক'রে নিলেই তাতে আর কষ্ট হয় না, বরং আরাম পাওয়া যায়। অনেকের এমন ধাত আছে, যাদের অল্পেই ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু ক্রমশ এটা অভ্যাস হ'য়ে যায়, আর ঠাণ্ডা লাগার ধাতটাও বদলে যায়। তা ছাড়া একটু আধটু সর্দি লাগলেও তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। তার চেয়ে মুক্ত বাতাসে না গিয়ে ক্ষয়রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া অনেক বেশি ক্ষতিজনক। দেখা গেছে যে, অত্যন্ত ঠাণ্ডায় মুক্ত বাতাসে থাকা অত্যন্তই উপকারী। শীতকালেই তাই স্যানাটোরিয়মের রোগীদের মুক্ত বাতাসে থেকে গরম কালের চেয়ে ডবল উপকার হয়।

শীতের সময় কেটে গিয়ে গরমের সময় পড়লে অনেক দেশে রাত্রেও রোগীদের জন্য ঘরের বদলে বাইরের বারান্দায় খোলা হাওয়াতে শোবার ব্যবস্থা করা হয়। ঘরটা থাকে কেবল তাদের খাওয়া, কাপড় ছাড়া এবং স্নানাদির জন্য। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তাদের তখন ঘরের বাইরে বাইরেই বিশ্রাম নিয়ে কাটে। অনেকের হয়তো বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, রাত্রের ফাঁকা হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। রাত্রের হাওয়া আরো নির্মল এবং শরীরের পক্ষে আরো বেশী উপকারী। তার কারণ রাত্রে গাড়ি চলাচল প্রভৃতি না থাকায় কোনো ধুলো ওড়ে না, আর কলকারখানা প্রভৃতির কাজ বন্ধ থাকায় বাতাসে তখন ধোঁয়া কিংবা কয়লার গুঁড়ো প্রভৃতিও কিছু থাকে না। সুতরাং রাত্রের মুক্ত বাতাস স্বভাবতই স্বাস্থ্যকর। সকলেই এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কাজের গতিকে যাদের সারাদিন ঘরের মধ্যে থেকে বন্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়, তারা যদি রাত্রে খোলা বারান্দায় কিংবা ছাদে শোয়া অভ্যাস করে, তাতে তাদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। আমাদের দেশের পশ্চিম অঞ্চলে গরমের সময় সকলেই বাইরে খাটিয়া পেতে শোয়, তাতে তাদের স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকে। কেবল বাঙলা দেশের লোকেই রাত্রের বাতাসকে বড় ভয় করে। অবশ্য তার কারণও আছে, সে ঐ ম্যালেরিয়ার মশা। বাইরে শুলেই মশা কামড়ে ম্যালেরিয়ার জ্বর হয়, আর লোকে ভাবে ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। কিন্তু বাইরে মশারি টাঙিয়ে তার মধ্যে শোবার ব্যবস্থা করলে কিছুই অনিষ্ট হয় না। আর একটা ভয় আছে হিম লাগার। মশারি খাটিয়ে শুলে সেটাও নিবৃত্ত হতে পারে। হিমটা অন্য কিছুই নয়, বাতাসের আর্দ্রতা। উপরে একটা কিছু আচ্ছাদন থাকলে সেটা আর গায়ে লাগে না।

ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচলের যতই সুব্যবস্থা থাক, বাইরের মুক্ত বাতাস তবুও যে তার চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ঘরের ভিতরকার বায়ুকে অপেক্ষাকৃত আবদ্ধ বায়ু বলেই গণ্য করতে হবে। বাইরের বায়ুতে যেমন ঘনীভূত অক্সিজেনপূর্ণ ওজোন বাষ্প থাকে, ঘরের বায়ুতে তা কখনো থাকে না। মুক্ত বায়ু সেবন করা বলতে যা বোঝায়, তা ঘরের ভিতর থাকার চেয়ে বাইরে থাকায় শ গুণ বেশি পরিমাণে হয়। ক্ষয়রোগীদের পা বিশেষ করে সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গার ম বায়ুটাই আবশ্যক। টাইফয়েড রোগীর পক্ষে যেমন প্রবল জ্বরে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রত্যহ তিন চারবার করে ঠাণ্ডা জলে স্ন করানো হয় এবং তাতেই তাদের উপকার হ ক্ষয়রোগেও তেমনি প্রত্যহ অনেকক্ষণ যা ঠাণ্ডা বাতাসে স্নান করানো দরকার, তাতে তাদের উপকার হবে। এখানে কথাটা যে স্নানের অর্থেই বুঝে নিতে হবে। টাইফয়ে রোগীকে যেমন ঠাণ্ডা জলে স্নান করা কোনো ভয় নেই, ক্ষয়রোগীকে তেমনি ঠাণ বাতাসে স্নান করাতে কোনো ভয় নেই।

আমাদের দেশে ক্ষয়রোগীদের পক্ষে এ যাদের শরীরে এই রোগের আশু সম্ভাব রয়েছে, তাদেরও পক্ষে, মুক্ত বাতাস লাগানো সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় বাড়ির খোলা ছাদে উপর থাকবার ব্যবস্থা করা। একতলা ঘরে পর্চ কিংবা বারান্দায় থাকার চেয়ে দোতল কিংবা তিনতলা বাড়ির ছাদের উপর থাকা অনে ভালো। সেখানে সহজে কোন ধুলো উ যায় না, বাইরের লোকের নজরেও পড়তে হ না, আর আলোবাতাসে রোগীর মুখনিঃসৃ সমস্ত বীজাণু শীঘ্রই মরে যায় বলে দ্বিতী কোনো ব্যক্তির সংক্রমণেরও তেমন ভয় থা না। ছাদের উপর যেমন নির্মল বাতাস পাও যায়, ভূমির কাছাকাছি তেমন নয়। ছাদে উপর বাঁশের খুঁটি বসিয়ে অনায়াসে একা চালাঘর রচনা করা যায়, হোগলা কিংবা খ দিয়ে ছেয়ে তার মাথার চাল প্রস্তুত হতে পারে এই ঘরের চারিদিকে একটু একটু দরমার দেয়া করে অধিকাংশ স্থানেই ঝাঁপ দিয়ে এমনভা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে অনায়াস ঝাঁপ খুলে দিলেই চারিদিক ফাঁকা হয়ে যা আবার বৃষ্টি বা রোদের সময় ঝাঁপ লাগিয়ে দিলেই ঘরের মতো হ'য়ে যায়। এমনি ঘ রোগীকে শুইয়ে রাখতে পারলে তাতে যে উপকার হয়, তেমন আর কিছুতে নয় আমাদের দেশে এমন ঘরে শীতের সময়ে কোনো কষ্ট নেই, এমন কি রাত্রেও একট স্থলে দুটো লেপ ঢাকা দিয়ে হাতে পা দস্তানা এবং মোজা চড়িয়ে আর কানে ও মাথ কিছু জড়িয়ে নির্ভয়ে ঝাঁপ খুলে রাখা যে পারে। কেবল গরমের সময় দুপুর বেলাতে একটু কষ্ট, তখন ঝাঁপের বদলে খস্‌খসে পর্দা দিয়ে তাতে জল ছিটিয়ে ঘরটি ঠাণ রাখতে হয়, আর ভিতরে পাখার দ্বারা রোগী বাতাস খাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এ আমাদের দেশে তেমন ব্যয়সাধ্যও নয়, ত এমন একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা ছাদের উপ করলে রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রেখে বাড়ি

অন্যান্য সকলকে রোগ সংক্রামণের সম্ভাবনা থেকে বাঁচাবার সমস্যাটাও খুব সহজ হয়ে যায়। এই ছাদের উপরকার ঘরেই রোগীর বাস করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কাজে না লাগতে পারে। যেমন যেমন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, তদনুসারে সে ঐ ছাদের উপর অল্প অল্প পায়চারীও করতে পারে। এমনিভাবে ছাদের উপর খোলা হাওয়াতে বাস করতে করতে অনেক রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে দেখা গেছে। আবার এমনও দখা গেছে, যারা এই রোগ হওয়াতে শহর ছেড়ে পাহাড়ে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে গাছতলায় বাস করেছে, তারাও অনেকে তাতেই আরোগ্য হয়ে গেছে। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, এর কারণ আর কিছুই নয়, তারা মুক্ত বাতাস পেয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম পেয়েছে, আর খাঁটি দুধ ও পুষ্টিকর টাটকা খাদ্য পেয়েছে।

খাদ্য

উপযুক্ত খাদ্যও এই রোগের আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। খাদ্যের দ্বারা কেবল যে শরীরের গঠনই হয় তা নয়, খাদ্যের দ্বারা অনেক ভাঙাচোরা মেরামতিও হয়ে থাকে। ইটের তৈরি ইমারতবাড়ি কোথাও ভেঙেচুরে গেলে যেমন নতুন ইটের দ্বারাই তার মেরামত করতে হয়, খাদ্যের দ্বারা গঠিত শরীরে কোথাও ঘুণ ধরলে তেমনি তার মেরামতের জন্য নতুন খাদ্যের জোগান আরও বেশি করে দিতে হয়, তার দ্বারা প্রকৃতি আবার ভাঙা শরীরটিকে পূর্বের ন্যায় গড়ে তোলে। তবে পূর্বের ন্যায় বলা এখানে ঠিক নয়, ক্ষয়-রোগে শরীরটিকে পূর্বের চেয়েও আরো অনেক বেশি পুষ্ট করে তোলা উচিত। এ রোগের চিকিৎসার এই হলো অন্যতম মূলমন্ত্র। পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারলে এবং সেই খাদ্য হজম করাতে পারলে রোগী তাতে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে। রোগীকে মোটা হতে হবে, তার ওজন বাড়াতে হবে। ক্ষয়রোগে আয়ের চেয়ে ভিতরে ভিতরে অতিরিক্ত দাহের জন্য ব্যয় হ'তে থাকে অনেক বেশি, তাই চর্বি কমে গিয়ে এবং শরীর শুকিয়ে গিয়ে মানুষ তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে যায়, আর সেইজন্যই একে বলে ক্ষয়রোগ। আরোগ্যের জন্য এর উল্টা ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ ব্যয়ের চেয়ে আয়ের এবং ক্ষয়ের চেয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

অন্যান্য রোগে যেমন পথ্য সম্বন্ধে নানা-রকম বাচবিচার ও ধরাকাটা করা হয়, ক্ষয়-রোগের পক্ষে সে নিয়ম নয়। এই রোগে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিষেধ নেই; জ্বর খুব বেশি না থাকলে ভাত রুটি লুচি প্রভৃতি সব কিছুই খেতে দেওয়া যায়। নিতান্ত কুপথ্য ভিন্ন যে ধরণের খাদ্যে রুচি আছে, তাই যথেষ্ট পরিমাণে খেতে হবে। রোগীদের শেখানো হয় যে, দৈনিক তিনবার করে রীতিমত পেট ভরে খাওয়া চাই। তার কারণস্বরূপে বলা হয় যে, একবারের খাওয়া তাদের নিজের দেহরক্ষার জন্য, একবারের খাওয়া বীজাণুদের জন্য, আর একবারের খাওয়া শরীরের ওজন বাড়াবার জন্য। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে খাদ্যের মাত্রা অনেকখানি বাড়ানো দরকার। তবে দুঃখের কথা এই যে, শরীরের যখন দরকার পড়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ করবার, কারো কারো পাকস্থলী ঠিক তখনই বেঁকে বসে, বেশি খাদ্য তারা কোনোমতেই গ্রহণ করতে চায় না। ঐ সকল রোগীরা প্রায়ই বলে, খেতে তাদের ইচ্ছা নেই। সে কথায় সায় দিলে চলে না। যুক্তির দ্বারা আদের সেই ইচ্ছাটি জাগাবার জন্য ঐভাবে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে শেখানো হয়। রোগ থেকে সেরে ওঠবার জন্য দেহের ওজনটা বাড়াতেই হবে, এমন কি সহজ অবস্থায় যা ছিল, তার চেয়েও কিছু বেশি করতে হবে। তবে ওজন বাড়াবার আগ্রহে যদি সহ্যসীমার চেয়ে বেশি মাত্রায় খেতে গিয়ে পেট খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা এসে পড়ে, তেমন করাও আবার ঠিক নয়। এমন ব্যবস্থা করা চাই, যাতে পেটও খারাপ না হয়, অথচ শরীরের পুষ্টিও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বেছে বেছে পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য খাদ্যগুলি রোগীকে খেতে দিতে হবে। পরিমিত মাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য অধিকাংশের পক্ষেই হজম করা সম্ভব, যতটা লোকে ভয় করে, ততটা ভয় করবার কোন কারণ নেই।

ভাত, রুটি, লুচি, ডাল, মাছ, তরকারি কিছু কিছু ফল প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যগুলিকে অদল-বদল ক'রে দৈনিক তিনবার যদি পেট ভরে খাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে উপরন্তু দৈনিক একসের ক'রে দুধ আর একটি কিম্বা দুইটি ক'রে ডিম (আধসিদ্ধ) নিয়মিত খাওয়া যায়, তাহলে কোনো কথাই নেই। দেহের ওজন তাতে নিশ্চয়ই বাড়বে। যাদের কোনো কালে এমন খাওয়া অভ্যাস ছিল না তারাও চেষ্টার দ্বারা এটা আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে। শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে শেখা কিংবা খোলা হাওয়াতে থাকতে শেখা যেমন অসম্ভব নয়, বেশি পরিমাণে খেতে শেখাও তেমনি অসম্ভব নয়।

কিন্তু এমন কোনো কোনো রোগী আছে যাদের বহুদিন একভাবে শুয়ে থেকে থেকে খেতে অরুচি এসে যায়, তখন কোনো শক্ত খাদ্য কিছুতেই তারা চিবিয়ে খেয়ে গলা দিয়ে গিলতে পারে না, গিলতে গেলেই তাদের বমি এসে যায়। এ রকম হ'লে তখন বাধ্য হ'য়ে শক্ত খাদ্য খাওয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতেই হয়। অগত্যা তখন যত রকমের তরল খাদ্য তাদের পান করতে হয়। শক্ত খাদ্য খেতে না পারলেও তরল খাদ্য না চিবিয়ে গিলে ফেলা অনায়াসেই চলে। এই তরল খাদ্যের মধ্যেও যত কিছু পুষ্টিকর জিনিস মিশিয়ে দেওয়া যায়। এই উপায়ে বরং তরল খাদ্যকেই শক্ত খাদ্যের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর ক'রে তোলা যায় এবং তার দ্বারা তাড়াতাড়ি ওজনও কিছু বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পরে।

রোগীর পথ্য ব্যবস্থায় প্রথমত এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, দুধ আর ডিম বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না। দুধের মধ্যে রয়েছে অতি উৎকৃষ্ট জাতির প্রোটিন, তাতে রয়েছে মাখন, আরো আছে সকল রকমের ভিটামিন এবং ক্যালসিয়ম। যারা শক্ত খাদ্য কিছু খাচ্ছে না তাদের পক্ষে দুই সের পর্যন্ত দুধ দিতে পারলেই সে অভাবটা পুষিয়ে যায়। তা ছাড়াও ডিম দেওয়া চাই। ডিমে রয়েছে চর্বি, লোহা, নাইট্রোজেন এবং একাধিক রকমের ভিটামিন। ডিম কাঁচা খাওয়ার চেয়ে এক মিনিটের জন্য ফুটন্ত জলে ফেলে রেখে তার-পরে খাওয়াই ভালো।

দুধকে সহজপাচ্য এবং সুস্বাদু করবার অনেক উপায় আছে। দুধের সঙ্গে একটু চুণের জল মিশিয়ে দিলে অনায়াসে তা হজম করা যায়। দুধের মধ্যে শুঁঠ ফেলে দিয়ে সিদ্ধ করলে তাতেও বেশ হজম হয়। দুধ সহ্য না হলে তার বদলে ঘরে পাতা দৈ দেওয়াও চলতে পারে। দৈ খাওয়াতে কোনো অনিষ্ট নেই। অনেকের এমন হয় যে, তাদের টাটকা এবং এক বলকা সাধারণ গরুর দুধ আদৌ সহ্য হয় না, কিন্তু টিনে ভরা গুঁড়া দুধ গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্তুত ক'রে দিলে সেটা বেশ সহ্য হয়। এর কারণ আর কিছুই নয়, স্বাভা-বিক দুধ পেটের ভিতর গিয়ে শক্ত শক্ত ছানার দলা বাঁধে, সেগুলো হজম করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। কিন্তু গুঁড়া দুধে মিহি রকমের দলা বাঁধে, তা হজম করা খুব সহজ। গুঁড়া দুধ স্বাভাবিক দুধের তুলনায় কিছু কম বলকারক তা নয়। কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডায় জমিয়ে এবং বাতাসে শুকিয়ে স্বাভাবিক গরুর দুধকেই গুঁড়ায় পরিণত করা হয়, তাতে তার খাদ্যগুণের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রোটিন ভিটামিন ও লবণাদি তাতে সমান পরিমাণেই বজায় থাকে। সে দুধ বীজাণু-সংক্রামিত নয়, তার আস্বাদটাও কিছু স্বতন্ত্র সুতরাং অনেক রোগীরা অনায়াসেই তা খেতে পারে। কোনো কোনো রোগী আবার এমন যে দুধ পেটে গেলে তারা অনায়াসেই তা হজম করতে সক্ষম, কিন্তু দুধের সম্বন্ধে তাদের এতই অরুচি ধরে যায় যে দুধের চেহারা দেখলে কিংবা তার নাম

করলেই তাদের বিবমিষা উপস্থিত হয়। এমন অবস্থায় নানা ছদ্ম উপায়ে রোগীদের দুধ খাওয়ানো চলতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মেলিনস ফুড দুধ দিয়েই প্রস্তুত করতে হয়, অথচ দুধের চেহারা বা আস্বাদ তাতে সম্পূর্ণই ঢাকা পড়ে যায়, সুতরাং দুধ দেওয়া হয়নি বা সামান্যই দেওয়া হয়েছে বললে রোগীরা এই চালাকিটুকু ধরতে পারে না। তেমনি গরম জলের পরিবর্তে সরাসরি গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে কফি, কোকো কিংবা চা প্রস্তুত ক'রে খেতে দিলে যদিও কেউ আস্বাদে বুঝতে পারে যে, তাতে দুধ আছে, কিন্তু সমস্তটাই যে দুধ একথা সহজে ধরতে পারে না। কোনো কোনো চিকিৎসক বিবেচনা করেন যে, পাঁচ রকমের আস্বাদযুক্ত জিনিস দুধের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে নতুনতর পথ্য প্রস্তুত ক'রে দেওয়াই অনেক সময় উৎকৃষ্ট উপায়। তাঁরা বলেন মিষ্টি কমলালেবুর রস, তার সঙ্গে কিছু আঙুরের রস, হয়তো কিছু আমের রস বা কয়েক ফোঁটা কাঁঠালের রস, কয়েক ফোঁটা ভ্যানিলা, কিছু কলার গুঁড়ো (ব্যানানা পাউডার), কিছু কফি এবং কোকো, তার কিছু চিনি,—এই সমস্ত জিনিস অদল-বদল ক'রে অথবা এর একাধিক সামগ্রীগুলো একত্রে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে নতুনতর এক রকমের সুস্বাদু পথ্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ঐ সকল ফলের রসের মধ্যে ভিটামিন ও লবণাদি আছে, তাই তাতেও যথেষ্ট উপকার আছে। কোকোতে কিছু ফ্যাট আছে, সুতরাং তাতেও কিছু উপকার আছে। দুধের সঙ্গে অনেক কিছুই রোগীর অজ্ঞাতসারে খাইয়ে দেওয়া যেতে পারে। যারা ভাত রুটি প্রভৃতি কোনোই কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাচ্ছে না, তাদের পক্ষে কার্বোহাইড্রেট দেবার উৎকৃষ্ট উপায় দুধ কিংবা অন্যান্য পানীয়ের সঙ্গে গ্লুকোজ অথবা সুগার অফ মিল্ক মিশিয়ে দেওয়া। চিনির তুলনায় সুগার অফ মিল্কের মিষ্টতা খুবই কম, অথচ খাদ্যগুণ যথেষ্ট সুতরাং যারা খেতে ইচ্ছুক হবে তাদের অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারবে।

যাদের পক্ষে দুধ কিছুতেই চলবে না, তাদের অন্য উপায়ে কিছু ফ্যাট জাতীয় বস্তু খেতে দিতে হবে। এরজন্য কডলিভার অয়েল প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন আকারে খেতে দিতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয়। যাদের তাও দেবার উপায় নেই তাদের ঘি মাখন প্রভৃতি নানাভাবে খেতে দিতে হয়।

প্রোটিন বস্তু তরল হিসাবে দিতে হ'লে এক উপায় আছে প্ল্যাজমন (Plasmon), আর এক উপায় আছে জেলাটিন (gelatin)। জেলাটিন অবশ্য প্রোটিনের স্থান পূরণ করতে পারে না, কিন্তু শরীরস্থ প্রোটিনের ক্ষয় নিবারণ করতে পারে। শুকনো জেলাটিনের গুঁড়ো ফলের রসের সঙ্গেও মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে, আবার দুধের সঙ্গেও মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এক বাটি দুধের মধ্যে এক চামচ জেলাটিন মিশিয়ে দিলে তার খাদ্যগুণ শতকরা আরো পঁচিশ ভাগ বেড়ে যায়, আর তা দুধকে হজম করাবার পক্ষেও সাহায্য করে। যারা দুধ খাবে না, তাদের পক্ষে আনাজ-তরকারির ঝোল অথবা সুপও উৎকৃষ্ট পথ্য। আলু পটোল কাঁচকলা ডুমুর কলাইশুঁটি বরবটি টোমাটো গাজর বাঁধাকপি পালংশাক লাউডগা সজিনা ডাঁটা প্রভৃতি দিয়ে রাঁধতে জানলে চমৎকার মুখ-রোচক ঝোল বানানো যেতে পারে। তার মধ্যে অল্প একটু বার্লি কিংবা আটা-ময়দা মিশিয়ে সেটাকে কিছু ঘন করে দেওয়াও যেতে পারে। ওর সঙ্গে রোগীর অজানিতে কিছু দুধের ক্রীম মিশিয়ে দেওয়াও যেতে পারে, তাতে একদিকে জিনিসটা যেমন খেতে সুস্বাদু হয়, অন্যদিকে তেমনি পুষ্টিকর হয়।

মোট কথা এই যে, পারতপক্ষে রোগীকে দুধ খেতে দেওয়া চাই এবং তা দৈনিক অন্তত এক সেরের চেয়ে কম পরিমাণে নয়। যদি আরো বেশি দেওয়া যায় এবং তা হজম করানো যায়, তবে তো খুবই ভালো, তাতে দেখা যাবে যে, তার শরীরের ওজন তাড়াতাড়ি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে কাঁচা-ঘাস-খাওয়া গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, এমন স্থানেই রোগীকে রাখা উচিত এবং সর্বাগ্রে তার ব্যবস্থাই করা উচিত। মুরগির ডিমও অন্যতম পুষ্টিকর খাদ্য, সুতরাং তার ব্যবস্থাও করা উচিত। তবে ওজন খানিকটা বেড়ে গেলে এবং তার পরে ক্ষুধা কমে যাচ্ছে ও হজমের গোল-মাল হচ্ছে দেখলে মাঝে মাঝে এগুলি বাদ দিয়ে দেবার দরকার হয়। আবার ওজন কমবার সম্ভাবনা দেখলেই এইগুলির মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়াতে হয়। এছাড়া ভাত রুটি লুচি এবং ছানা মাখন ঘি প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। খাদ্যগুলি যত ভেজাল-শূন্য এবং টাটকা হয়, ততই উত্তম। অনেকে অধিক জ্বরের সময় কঠিন খাদ্যগুলি খেয়ে হজম করতে পারে না। তাদের সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যে, জ্বরের সময় তারা তরল পথ্য খাবে, আর জ্বর যখন সর্বাপেক্ষা কম থাকবে, তখনই কেবল কঠিন খাদ্যগুলি খাবে। জলও রোগীদের প্রচুর মাত্রায় খাওয়া উচিত। মদ্যাদি এবং তামাক সিগারেট নস্য প্রভৃতি নেশার দ্রব্য পারতপক্ষে ত্যাগ করাই উচিত। অল্প সংখ্যায় পান খেতে কোন দোষ নেই, কিন্তু দোক্তার সঙ্গে নয়।

প্রতি সপ্তাহে কিংবা দুই সপ্তাহ অন্তর একবার ওজন নিয়ে দেখা দরকার যে, দেহের পুষ্টি বাড়ছে না কমছে। এর জন্য একই নির্দিষ্ট ওজনযন্ত্রে, একই রকমের নির্দি পোষাকে এবং ওজনের দিনে একই নির্দি সময়ে নিয়মিত এবং নিখুঁতভাবে ওজ পরীক্ষা করতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এব বয়স ও দৈর্ঘ্য অনুসারে ওজনের একট স্বাভাবিক তারতম্য ঘটে। সুতরাং কার পক্ষ কতটা ওজন স্বাভাবিকরূপে থাকা উচিত তার একটা হিসাব করে নিতে হয় এবং তা চেয়ে কতটা কম ওজন আছে তাও দেখে নি হয়। ওজনটা শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে অন্ত পাঁচ সের বেশি বাড়াতে পারলে তবেই সে সন্তোষজনক হয়। মনে মনে এই উদ্দেশ নিয়েই তদনুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। ত অনেকের পক্ষে অল্প খোরাক বাড়ালেই অম তার ওজন বাড়ে, আবার অনেকের প খোরাক অনেক বাড়ালেও তেমন ওজন বা না। এটা নির্ভর করে ভিতরকার দাহক্রিয়া উপর। কারো কারো শরীরে দাহক্রি স্বভাবতই বেশি হয়, কারো কারো কম রোগের সময় আবার তারও অনেক তারত ঘটে। সুতরাং এ নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কি বলা যায় না, প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে চে করে দেখতে হয়, কার পক্ষে কিসে সুফল হ কারো কারো শুয়ে থাকা অবস্থায় কিছুতে তেমন ওজন বাড়ে না, কিন্তু জ্বর বন্ধ হব অনেকদিন পরে উঠে বসলে এবং চলাফে শুরু করলে তখন ধীরে ধীরে ওজন বাড় থাকে। কারো কারো আবার একই স্থা একই অবস্থায় পড়ে থাকলে কিছুতে ও বাড়ে না, কিন্তু অল্প একটু ঠাঁইনাড়া কর অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করলে তো বটে এমন কি, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে পরিবর্ত করলে, খাদ্যের পরিবর্তন করলে, রাঁধুনি পরিবর্তন করলেও ওজন বাড়তে থাকে। এ জন্যই সাধারণত হাওয়া-বদল করতে বলা হ কেউ-বা সমুদ্রতীরে গিয়ে বিশেষ উপকার প কেউ-বা পাহাড়ে জায়গায় গিয়ে বিশেষ উপক পায়। কিন্তু জ্বর অবস্থায় কিংবা রো সক্রিয় অবস্থায় এমন অসমসাহসিকতা ক উচিত নয়। তখন এক স্থানে বিশ্রা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত—পদ্যভাগ, সপ্তম খণ্ড। প্রণেতা—কবিকিংশুক ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস। প্রাপ্তিস্থান—লীলামৃত কার্যালয়, ৪১ সি শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রতি খণ্ড সাধারণ ১।০ এবং স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১৲ মাত্র।

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত সপ্তম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এই খণ্ডের ভূমিকায় কবি শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মহাপুরুষের অলৌকিক লীলা লীলামৃতে ছন্দে ছন্দে মূর্ত হয়েছে। প্রাচীন ছন্দগুলি কাব্যরসনিগূঢ় হয়ে আনন্দদান করেছে, তা ছাড়া লেখকের লিপিকুশলতা গুণে প্রত্যেক খণ্ডই উপভোগ্য হয়েছে।" এমন পুস্তক পাঠে সকলেই আনন্দলাভ করবেন।

অতসী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, রমেশ ঘোষাল, ৫ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

অতসী—শৈলজানন্দবাবুর পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি প্রথমত নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পুস্তকাকারে 'অতসী' নামে মুদ্রিত হয়। প্রথম গল্প "ধ্বংসপথের যাত্রী এরা"র অতসী নামে মেয়েটির নাম থেকেই বোধ হয় পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে। দুঃস্থ ও অসহায় জীবনের যে সকরুণ রূপটি এই গল্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু দুঃখবাদী কথাশিল্পী শৈলজানন্দের হাতেই সম্ভব। মানুষের দুঃখ-বেদনার অন্তর্নিহিত অনুভূতিটুকুও তাঁহার লেখায় সূক্ষ্মভাবে ধরা দেয়। মনে হয় কথা-সাহিত্যে বেদনার বান ডাকাইতে শরৎচন্দ্রের ঠিক পরেই শৈলজানন্দের স্থান। আলোচ্য বইটির অন্যান্য গল্পেও এই বেদনার সুর অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। শেষ গল্প "আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে" একটি সমুজ্জ্বল পল্লীচিত্র।

হে সূর্য—অমরেন্দ্রনাথ সাঁতরা প্রণীত। শ্রীপাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

কয়েকটি আধুনিক কবিতার সমষ্টি। অভিশপ্ত তেরশ পঞ্চাশ বাঙলার বুকে যে গভীর ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বুজিবার নয়। তাহারই মর্মন্তুদ আর্তনাদ এই কবিতা পুস্তকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তীব্র অনুভূতিপ্রবণ কবিমন লেখকের আছে। তাই প্রতিটি কবিতা বেদনার উৎস-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছন্দ ও শব্দচয়নে কৃতিত্ব আছে।

গানের মুকুল—শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর বর্মণ, বীণাপাণি সঙ্গীত শিক্ষাশ্রম, চুঁচুড়া। মূল্য দেড় টাকা।

অন্ধগায়ক ও সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত কার্তিক-চন্দ্র রায় তাঁহার এই সঙ্গীত শিক্ষার বইখানা প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন। গানগুলি এবং উহাদের স্বরলিপি সবই কার্তিকবাবুর নিজেরই রচনা। গানগুলি কবিতা হিসাবেও আমাদের ভাল লাগিয়াছে, আর সেগুলি যে তিনি তান-লয়ের সঙ্গে মিলাইয়া রচনা করিয়াছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। আশা করি, বইখানার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্—(জ্ঞানামৃতসার সংহিতা) পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী শ্রীনির্মলানন্দ সরস্বতীকৃত পাদটীকা বঙ্গানুবাদ সমেত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক স্মৃতি-মীমাংসা-তীর্থ এম এ, পি আর এস, বিবুধভাজন প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রীকৃত বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—জানকীনাথ কাব্যতীর্থ এণ্ড সন্স, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

নারদপঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিবরণে দেখা যায় যোগীন্দ্রগুরু শ্রীগুরু শংকরের নিকট হইতে জ্ঞানামৃত তত্ত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মার নন্দন নারদ এই পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। এই গ্রন্থের পাঁচটি প্রকরণে যথাক্রমে পঞ্চবিধ জ্ঞানের উপদেশ আছে। পরম তত্ত্ব জ্ঞান, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, ভক্তিপ্রদ জ্ঞান, সিদ্ধিপ্রদ যোগসম্ভূত জ্ঞান ও বৈশেষিক বা তামসিক জ্ঞান। তন্মধ্যে হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞানই প্রাজ্ঞজনের মতে যথার্থ জ্ঞান। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণোপাসনা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ নাম, মন্ত্র ও কবচের উপদেশ এই গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের যোগ ও সাধনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই নারদপঞ্চরাত্র। বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব সাধক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট গ্রন্থখানা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। এইরূপ একখানা বিরাট ভক্তি গ্রন্থ নির্ভুল ও সুমুদ্রিত-ভাবে যত্নপূর্বক প্রকাশ করিয়া প্রকাশক মহোদয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্তমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইলেন। গ্রন্থের কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই উত্তম। মূল শ্লোকগুলি বড় অক্ষরে এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের সুবিস্তৃত ভূমিকাটিতে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা এবং বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক বহু জ্ঞানগর্ভ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাঙলার কুটীর শিল্প—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানা জ্ঞান-ভারতী গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। বাঙলা দেশের বহুবিধ কুটীর শিল্পের মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির সহিত কিশোরদের পরিচয় করাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। বইখানা আগাগোড়া কাজের কথায় পূর্ণ। পল্লী-বাঙলার অতি সাধারণ চিরপরিচিত কুটীরশিল্প-গুলির বিষয়ে সহজ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং অনেকগুলি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনীয় বিষয়সমূহ অধিকতর চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। মূল্যবান কাগজে সুমুদ্রিত, বহু চিত্রভূষিত এবং সুদৃশ্য বহিরাবরণ-বিশিষ্ট এই গ্রন্থখানার মাত্র দশ আনা মূল্য বিশেষ সুলভ হইয়াছে। গ্রন্থদৃষ্টে মনে হয়, স্বল্পমূল্যে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়া নিরক্ষর বাঙলাদেশে জ্ঞান বিতরণের শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রকাশক মহোদয় এই গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

কংগ্রেস ও শ্রমিক—শ্রীস্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—হ্যাণ্ডমেড পেপার ইণ্ডাস্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়া, ১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং উক্ত আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা মোটামুটি এই গ্রন্থে বিবৃত করা হইয়াছে। কংগ্রেস মজুর আন্দোলনের প্রতি উদাসীন বলিয়া কংগ্রেস বিরোধীরা, বিশেষত কমিউনিস্টরা সময় সময় যে সমালোচনা করিয়া থাকে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক উহার সমুচিত উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইটি নানা তথ্যে পূর্ণ। কংগ্রেসের শ্রমিকপ্রীতি সম্বন্ধে যাহাদের মন দ্বিধা-গ্রস্ত তাঁহারা গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

যৌবনোত্তর—শ্রীসুঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত, পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা। আট পৃষ্ঠার বই, মূল্য আট আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মোট আটটি কবিতার মধ্যে জীবন ও মনের যে বিচিত্র বিকাশ ধরা দিয়াছে, তাহা অনুভূতিপ্রবণ পাঠক মাত্রেরই মনকে দোলা দিবে।

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত বাণী—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।" আজিকার দিনে এই বাণী স্মরণের এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে দয়া এবং অনুগ্রহ একার্থবাচক নহে। কাহারো দুরবস্থা দেখিয়া তাহা দূরীকরণের যে প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলিতে পারি। কিন্তু সেই দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তির সুদিনে, তাহার অভ্যুদয়ের দিনেও যদি আমি অমর্ষহীন থাকিতে পারি, সেদিন যদি তাহার দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়া, তাহার পূর্বাবস্থার তুলনা করিয়া অন্তরের গোপনতম কোণেও কোনরূপ ঈর্ষা বা বিদ্বেষের অঙ্কুর উদ্ভূত না হয়, তবেই সেই অতীত দিনের দুরবস্থা দূরীকরণের প্রবৃত্তি দয়া নামে অভিহিত হইতে পারে। অনুকম্পা কথাটি দয়ার প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা চলে। যতদূর স্মরণ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে "অনুকম্পা" শব্দের ব্যবহার আছে,—"ভূতানুকম্পিনাং সতাং"। নির্মৎসর হৃদয়েই অনুকম্পা জাগ্রত হয়। একজনের হৃদয় বেদনা—সুখ দুঃখ অপরের হৃদয়ে যে স্পন্দন জাগ্রত করে, একজনের হৃদয়োত্থিত তরঙ্গ অপরের হৃদয়ে যে কম্পন উদ্রিক্ত করে, তাহারই নাম অনুকম্পা। সত্যের উপাসক সদ্ব্যক্তির নির্মৎসর হৃদয়েই এই কম্পন অনুভূত হয়। বৈষ্ণবগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন "জীব কৃষ্ণ নিত্য দাস"। সুতরাং জীবের হৃদয়বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। জীবের দুঃখে তিনি দুঃখিত হন, জীবের সুখে তাঁহার হৃদয়ে সুখের উদ্রেক হয়। বৈষ্ণবের হৃদয়ে হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা, ভয়, উদ্বেগ, মদ মাৎসর্যাদির স্থান নাই বলিয়াই তাঁহার হৃদয় অনুকম্পাপূর্ণ, সুতরাং জীবে দয়া বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ সাধন। সাধারণ মানুষ আমাদিগকেও এই সাধন গ্রহণ করিতে হইবে, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে জীবে দয়ার সর্বোত্তম উদাহরণ আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনিই এই দয়ার পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তাঁহার প্রকটকালেই ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিকট একজন ভক্তের প্রার্থনা এইরূপ—

> তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
> তার গুণ কহে হঞা সহস্রবদন॥
> নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পায়া।
> নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥
> জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
> মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
> করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
> তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়।
> জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
> সর্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥
> জীবের পাপ লয়া মুঞি করি নরক ভোগ।
> সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ॥
> এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবি গেলা।
> অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গে কহিতে লাগিলা॥
> তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
> তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
> কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
> ভৃত্য বাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
> ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
> বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
> অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব বল।
> তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপ ফল॥
> তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
> বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

(মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

নামে রুচি বলিতে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ বা গানে অনুরক্তি এবং নিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। এই সেদিনও মহাত্মা গান্ধী বাঙলার নানাস্থানে প্রার্থনা সভায় শ্রীভগবানের নাম গান বা শ্রবণের জন্য জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। সমবেত প্রার্থনার উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাসের কথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুক্তকণ্ঠেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক প্রার্থনা সভায় তিনি সমবেত প্রার্থনার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাঙলায় সমবেত প্রার্থনার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নাম গুণ ও লীলাদির উচ্চভাষণই কীর্তন নামে পরিচিত। সমবেত কণ্ঠে তান লয়সহকারে নাম ও লীলা কীর্তনের তিনিই প্রবর্তক। এই কীর্তন প্রাঙ্গণে তিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একই ভাবের ভাবুক করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙলার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ তাঁহার মহান্ অনুপ্রেরণায় মানবতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাঙালী তাঁহাকে "সংকীর্তনৈক পিতরং" বলিয়া বন্দনা করিয়াছে। এই নামে রুচি কি অপূর্ব ফল প্রদান করে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। বাঙলার বৈষ্ণব সমাজে যিনি ব্রহ্ম হরিদাস নামে পরিচিত, তিনি জাতিতে যবন। এই নামসিদ্ধ সাধক ভগবন্নাম মাহাত্ম্যে দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরের মত ব্রাহ্মণপ্রধান নগরে নিষ্ঠাবান পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীল কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন আচার্য অদ্বৈত যবন হরিদাসকে আপন পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে অন্নপাত্র দান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামধর্মের প্রথম প্রচারক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীল যবন হরিদাস। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নীলাচলবাসের পর হরিদাসও নীলাচলে বাস করেন। ক্রমে দেহ অসুস্থ হইয়া উঠিল, তিন লক্ষ নাম জপের সংখ্যা আর পূর্ণ হয় না। একদিন হরিদাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বলিলেন—

> অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
> বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
> এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
> লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে॥
> সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
> আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
> হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
> নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন॥
> জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
> এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
> মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদ হয়।
> এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
> এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
> এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—তোমার কামনা শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমাকে লইয়াই আমার যত কিছু সুখ, আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া উত্তর করিলেন, আমার শিরোমণিস্বরূপ কত কত ভক্ত তোমার লীলায় সহায়তা করিতেছেন, আমার মত পিপীলিকার মৃত্যুতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আজ মধ্যাহ্নে পুরীতে যাও, কল্য শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে সকালে এখানে আসিও। আমার সাধ তোমাকে অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে আসিয়া হরিদাসের কুটীরে দর্শন দিলেন।

> অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসংকীর্তন।
> বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্তন॥
> স্বরূপ গোসাঞী আদি যত প্রভুর গণ।
> হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্তন॥
> রামানন্দ সার্বভৌম এ সভার অগ্রেতে।
> হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে।
> হরিদাসের গুণ প্রভু কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ।
> কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
> হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
> সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
> হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
> নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলা।
> স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
> সর্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার।
> প্রভুমুখ মাধুরী পীয়ে নেত্রে জলধার॥
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
> নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দুরবগাহ আচরণ আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। তিনি স্বতন্ত্র

ভগবান; তিনি যখন জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমূর্তি সন্দর্শনে যাইতেন, তখন মহাবলবান্ শ্রীপাদ কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী তাঁহার অগ্রে অগ্রে লোক ঠেলিয়া পথ করিয়া দিতেন, সেই মনুষ্য-গহনে আচণ্ডালের ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু "অপরশা" অর্থাৎ কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া গমন করিতেন? ব্রহ্ম হরিদাস মহাপ্রস্থান করিলেন, তাঁহার এই মহাযোগেশ্বরপ্রায় স্বচ্ছন্দ মরণ দেখিয়া ভীষ্মের নির্যাণ কথা সকলের স্মৃতিপটে উদিত হইল। ভক্তগণ ভক্তশ্রেষ্ঠের এই মহাসৌভাগ্য দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি তুলিলেন, আর আমাদের ভক্তের ভগবান প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া—যবনের শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া—

হরিদাসের তনু কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে নাচে সবে করেন কীর্তন॥
এই মত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত করি তাহে শোয়াইল।॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দ নর্তন।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌর রায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥

সমাধিতে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধান হইল। পিণ্ডার চতুর্দিকে বেষ্টনী নির্মিত হইল। মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্র স্নানান্তে হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণপূর্বক শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইলেন, জগন্নাথের প্রসাদ-অন্নভিক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে আমি প্রসাদ মাগিতেছি আমাকে প্রসাদান্ন ভিক্ষা দাও। পসারীগণের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই প্রসাদ দানের জন্য চাঙগড়া উঠাইয়া ছুটিয়া আসিল। স্বরূপ দামোদর সকলকে নিষেধ করিলেন এবং মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর চারিজন বৈষ্ণবকে চারিখানি পিছোড়া সহ সঙ্গে রাখিয়া পসারীগণকে বলিলেন আমাকে এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জ আনিয়া দাও। পসারীগণের নিকট হইতে প্রসাদ সংগ্রহপূর্বক তিনি গম্ভীরায় ফিরিলেন এবং মহাপ্রভুর সম্মুখে ভক্তগণকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইয়া মহোৎসব সমাপ্ত করিলেন। মহোৎসবান্তে মহাপ্রভু উপস্থিত ভক্তগণকে বরদান করিলেন—

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্তন॥
যে তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন।
অচিরে হৈবে সবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল যাইতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্য হৈল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্য ১১ পরি)

'বৈষ্ণব সেবন' কথাটি আজিকালিকার দিনে পক্ষপাতদোষদুষ্ট সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে। মানব সেবা, অথবা দরিদ্রনারায়ণ সেবা, অথবা হরিজন সেবা ইত্যাদি কথাই বর্তমানে সুপ্রচলিত। সুতরাং বৈষ্ণব সেবন কথাটি একালে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভুর উপদেশের মর্ম একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিলে, তাহা পক্ষপাতশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কুলীন গ্রামনিবাসী গুণরাজ খান মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজখান শ্রীমান্ লক্ষ্মীকান্ত বসু ও সত্যরাজপুত্র রামানন্দ বসু পুরীধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে নিবেদন করেন, 'আমরা বিষয়ী গৃহস্থ, আমাদের সাধন কি, শ্রীমুখে আজ্ঞা করুন।'

প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন॥
সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়॥
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।
দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব তারে করিহ সম্মান॥

অবশ্য অধিকারী ভেদে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের কথাও শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন। পর বৎসর রথযাত্রা সমাপ্তির পর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে—

কুলীন গ্রামী পূর্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন॥

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনে তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইল কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরি

এই সমস্ত আলোচনায় মনে হয়, "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন" এই উপদে বাক্য এ যুগেও সর্বসাধারণের অবশ পালনীয়। সর্বজীবে—বিশেষত সর্বমানব মমত্ববোধ জন্মিলেই ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, মো আপনা আপনি তিরোহিত হইবে। জী দয়া সাধন সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে মানবের সর্বকল্যাণ সাধিত হইবে। তাহা হই একজন আর একজনকে স্বীয় স্বার্থসাধ উদ্দেশ্যে শাসন ও শোষণ করিবে ন একজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহা হত্যা করিয়া সেই কঙ্কালস্তূপে অন আপনার বিলাস বাসনের আরাম নিকে গড়িয়া তুলিবে না। সুতরাং এই জীবে-দ সাধনেই আমরা সর্বমানব পরস্পর দৃঢ় ঐ সম্বন্ধ হইতে পারি।

নামে রুচি সাধনে আপন আপন র অনুযায়ী যদি কেহ ইষ্টজ্ঞানে ভগবানের নাম ভিন্ন অন্য নাম মন্ত্রেরও উপাসনা করে সেই নাম-সাধনায় নামীর নিকট আপনা তথা সর্বমানবের কল্যাণ প্রার্থনা ক তাহা হইলেও স্বদেশের—তথা বিশ্বের স অমঙ্গল দূরীভূত হইতে পারে।

একবার কৃষ্ণনাম যাহার বদনে—তাঁহা বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান দেখাইলে বোধ হয় মানবকেই অসম্মান করার উপায় থাকে এক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সেবন বলিতে মানব-সে উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইতে হইবে। সু "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন" যুগোপযোগী আচার ধর্ম এবং এই স সর্বমানবের অবশ্য-পালনীয়, সর্বমানবের প্রান্তে ইহাই নিবেদন করিতেছি। মহাপ্রভু দয়ার অবতার, করুণার মূ বিগ্রহ। উড়িষ্যার কবি সদানন্দ মহা নাম দিয়াছিলেন হরিনাম মূর্তি। বৈষ্ণব কা বলে এবং কেমন করিয়া বৈষ্ণব তথা মানবের সেবা করিতে হয়, শ্রীমন্ মহ তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ দেখাইয়া গিয়া আজিকার এই স্বার্থদ্বন্দ্বের দিনে শ্রীমন প্রভুর নির্দেশিত পথে চলা একান্ত আব তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ স্মরণের সঙ্গে আমরা তাঁহাকেও—সেই কলক বিশ্বপ্রিয়কর বিশ্বম্ভরকে—বাঙলার বাং চিরস্মরণীয় শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনঃ স্মরণ করিতেছি,—তাঁহার অভয় চরণে নিবেদন করিতেছি।

[১৪]

শীলার মৃত্যুটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না সুমিতা।

শীলা মরে গেছে। কিন্তু মরে গেছে বললে কথাটা ঠিক হল না—শশাঙ্ক হত্যা করেছে তাকে। শশাঙ্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোক শশাঙ্ক। সমাজ সংস্কার করবার জন্যে শীলাকে বিয়ে করেছিল—চেয়েছিল একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। কিন্তু তার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর একথা কল্পনা করেছিল কে!

মনে আছে শীলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিনঃ যা করতে যাচ্ছ তার ভবিষ্যৎ ভেবেছ কি? এক মুহূর্তে চুপ করে ছিল শীলা। স্বল্পভাষী মানুষ, কোনোদিন বেশি কথা বলেনি, কোনোদিন সহজে নিজেকে উদ্ঘাটিত করতে চায়নি। কিন্তু সেদিন কথা বলেছিল। বলেছিল, আমি ওঁকে বিশ্বাস করি সুমিতাদি—উনি আমাকে কখনো ঠকাবেন না।

বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে শশাঙ্ক। কিন্তু কাকে দোষ দেবে সুমিতা? এই বিশ্বাসের ওপরেই তো অনাদি অনন্তকাল থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রেম। বারে বারে প্রেম আঘাত পেয়েছে—বারে বারে প্রেম মিথ্যার সংঘাতে রঙীন কাচপাত্রের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বনহংসীর বাণবিদ্ধ বুকের মতো ঝিলের জল রাঙা হয়ে গেছে। তবু প্রেম মৃত্যুহীন। শশাঙ্কেরা শীলাদের চিরকাল ঠকিয়ে আসছে—চিরদিন • ঠকাবে। তবুও শীলারা শশাঙ্কদের ভালোবাসবে—আফিং খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—

এক অনিমেষ কি এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল? কী জানি।

কিন্তু অনিমেষের কথা মনে পড়তেই সুমিতার মনটা ভয়ানকভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। আজ পাঁচ দিন আগে চা বাগান থেকে অস্বস্তিকর সেই খবরটা এসেছে, পাঁচ দিন আগে রওনা হয়ে গেছে আদিত্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—এর ভেতরে কারো কোনো খবর নেই। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে। এক লাইন পোস্টকার্ড লিখে একটা খবর দেওয়াও কি অসম্ভব ছিল?

মরুক গে। এখানে তার অনেক কাজ। এখানে তার সংসার। এই বিরাট সংসারের ভার আদিত্য তাকে দিয়ে গেছে। তার কর্তব্য সে করে যাবে—তার বেশি ভাববার অধিকারও নেই তার, সময়ও নেই।

—সুমিতাদি!

—কে, ইন্দু?

—রমলাদির কী হল বলো দেখি।

—রমলা? কেন—কী হয়েছে?

—কাল সকালে বেরিয়ে গেছে—এখনো ফেরেনি।

সেকি!—ভয়ে সুমিতা পাণ্ডুর হয়ে উঠলঃ গেল কোথায়?

—সে আমরা কেমন করে জানব। এখানে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হয়তো—

—আত্মীয়-স্বজন!—সুমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করলে ঃ আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে বলে তো জানি না। হোস্টেলে থেকে পড়ত, তারপর এখানে—তবে—

একটা কথা মনে পড়তেই চমক ভাঙল। বাসুদেব। এর মধ্যে বাসুদেবের কোনো হাত নেই তো? কিন্তু তাও কি সম্ভব? এমনভাবে না বলে কি কখনো চলে যেতে পারে রমলা? না—অতটা দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত রমলা নয়।

সুমিতা সন্ত্রাসে বললে, থানাগুলোতে খবর নাও। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করো। যদি কোনোরকম অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে থাকে—

ইন্দু বললে, তাই যাচ্ছি—

সুমিতা এল রমলার ঘরে। ছোট বিছানাটা যত্ন করে গুটোনো—ডালা খোলা অ্যাটাচিটা তার পাশেই পড়ে আছে। এটা ঠিক যে রমলা ইচ্ছে করে চলে যায়নি। এমনকি যে বইখানা পেনসিলে দাগ দিয়ে দিয়ে সে পড়ছিল, তার পাতাটাও তেমনি করে ভাঁজ করা আছে। একপাশে ময়লা শাড়ী জামাগুলো স্তূপাকার। শুধু নেই তার ব্যাগ আর শিলপারটা।

দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ মুখে সুমিতা খানিকক্ষণ রমলার বিছানার ওপরে চুপ করে বসে রইল। কী হল মেয়েটার। যুদ্ধ ব্ল্যাক-আউট। বিশৃঙ্খল কলকাতা। কোনো গুণ্ডা বদমায়েসের হাতেই গিয়ে পড়ল না তো শেষ পর্যন্ত? ভাবতেও আতঙ্কে যেন দম আটকে এল তার।

তবু বৃথা আশায় চারদিক একবার খুঁজলে সুমিতা। যদি একখানা চিঠি পাওয়া যায়—যদি কোনো হদিস মেলে—

কিন্তু বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না সুমিতাকেও। একটু পরেই এল ডাকপিয়ন আর তার সঙ্গে এল রমলার চিঠি।

রমলা লিখেছেঃ

সুমিতাদি, আমি পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি যে এত দুর্বল তা জানতাম না। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। তার মৃত্যু আমি সহ্য করতে পারব না। আমি জানি কতবড় অন্যায় আমি করছি। কিন্তু আজ যদি বাসুদেব আত্মহত্যা করে—তা হলে সেটাও কি অন্যায় হবে না? কোনটা বড় অন্যায় আর কোনটা ছোট তা বিচার করবার শক্তি আমার নেই—এ ত্রুটি আমি স্বীকার করি।

তোমার সঙ্গে দেখা করবার সাহস আমার নেই। জীবনে কখনো আর হয়তো দেখা হবে না। প্রণাম নিয়ো।—রমলা।

চিঠিটা হাতে করে সুমিতা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমনি করেই ঘটে নাকি? শীলা যেভাবে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—রমলাকেও কি তাই করতে হবে?

দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল হাসপাতালের ছবি। লোহার খাটে শুয়ে আছে শীলা। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। গালের একপাশে কয়েক ফোঁটা কালো রক্ত জমে রয়েছে। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো রমলার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে।...হঠাৎ সুমিতার যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। শীলা, না রমলা?

কিন্তু নিজেকে সংযত করলে সুমিতা। সবাই তো শশাঙ্ক নয়। পৃথিবীতে সব প্রেম এমনি করে ব্যর্থ হয় না। যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় সব প্রেমের মর্মগত নগ্ন স্বার্থপরতাই যে এমনভাবে উদঘাটিত হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বলতে পারে?

নিজের বাসর-ঘরে আগুন জ্বলেছে সুমিতার। রুদ্র দেবতার আহ্বানে বেরিয়ে চলে গেছে অনিমেষ। তাই কি পৃথিবীর যত প্রেম তাদের সকলের সম্পর্কে একটা অবচেতন ঈর্ষা জেগেছে সুমিতার মনে? শীলার মৃত্যুতে কি একধরণের আনন্দ পেয়েছে—একধরণের তৃপ্তি পেয়েছে সুমিতা—নিজেকে সান্ত্বনা দেবার, আশ্বাস দেবার একটা আশ্বাস আর অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে সে?

কথাটা ভাবতেও সুমিতা শিউরে উঠল। মনের মধ্যে অনুভব করলে যেন একটা প্রচ্ছন্ন সরীসৃপের বিষাক্ত নিশ্বাস। হঠাৎ নিজের মধ্যে এ কী বিচিত্র ভয়াবহ একটা সত্যকে আবিষ্কার করে বসল সুমিতা।

রমলার চিঠিটার দিকে আর একবার তাকালো সে। না—না, সুখী হবে রমলা, জয়ী হবে। বাসুদেবের প্রেমে হয়তো খাদ নেই—হয়তো রমলাকে না পেলে সে সত্যিই বাঁচবে না। ঘর যার ভেঙেছে—ভাঙুক। যে ঘর বেঁধেছে তার স্বপ্ন যেন মিথ্যে না হয়!

একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো বাইরে থেকে এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া এসে সুমিতার চুলে চোখে আছড়ে পড়ল।...

খাওয়ার ঘরে তখন তর্কের ঝড় সুরু

হয়েছে। রমলার তিরোধানের খবর সকলে রাখে না, যারা জানে তারাও চুপ করে আছে। অতএব তর্ক চলছে তাদের চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়ে।

—তা হলে শনিবার থেকে এশিয়া আয়রণে স্ট্রাইক?

—উপায় নেই।

—কিন্তু ওদের ইউনিয়ানের অবস্থা কি যথেষ্ট ভালো? শুনেছি রি-অ্যাকশনারী দলগুলো এর মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

—হাঁ—শেষ পর্যন্ত যদি কল্ অফ্ করতে হয়—

—কক্ষণো না। আজকে লেবারের আর সে অবস্থা নেই। নিজেদের দাবী দাওয়া ওরা বেশ বুঝে নিয়েছে। ওরা জানে হাজার অসুবিধে হলেও পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। একবার পিছিয়ে গেলে আবার এগোতে পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে।

—সে বেশ কথা। তার আগে স্ট্রেংথ একবার বোঝা দরকার তো। শেষ পর্যন্ত যদি—

—দ্যাখো—একটা জিনিস তোমরা বুঝতে পারছ না। মানলাম, ওরা এখনো যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। এটাও সত্যি যে কোনো কাজেই তোমরা সকলের সমর্থন সঙ্গে সঙ্গে পাবে না। কিন্তু একবার কাজটা সুরু হয়ে গেলে ঝোঁকের ওপরে সবাই এগিয়ে আসে—তখন আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

—হাঁ—বিশেষ করে ওদের রক্তে বিপ্লবের বীজ। সব সময়ে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। শুধু সুযোগ বুঝে ওদের জাগিয়ে দিতে হয়।

—কিন্তু কাজ বন্ধ হলে মজুরীও বন্ধ হবে। তখন খাবে কী?

—সে ব্যবস্থা যদি না করতে পারো তা হলে এতদিন ওয়ার্ক করছ কী? সেইখানেই তো ওদের ইউনিয়ানের শক্তি পরীক্ষা করবে। তা ছাড়া কালেক্শন করতে হবে—যেমন করে হোক স্ট্রাইককে বাঁচিয়ে রাখা চাই।

—মালিক এবার খুব স্টার্ণ অ্যাটিচুড নেবে বোধ হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক।

—দরকার হলে গুলি চালাতে পারে।

—সে তো আরো ভালো। যত বেশি গুলী চলবে তত বেশি করে শক্তি বাড়বে আমাদের। গুলির ভয়ে কোনো দেশে বিপ্লব বন্ধ হয়েছে কি কখনো? চিকাগোর পথ একদিন রক্তে লাল হয়ে গেছে, একদিন প্যারীর পথে হাজার মজুর রক্ত দিয়েছে—সোভিয়েটের তো কথাই নেই। কিন্তু ফল হয়েছে কী? কে জিতেছে?

—সে কথা সত্যি। তবে আমাদের অর্গানাইজেশন—

—এখনো অত শক্ত হয়ে ওঠেনি। হয়তো পিছিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু আজ পিছোলেও কাল আমরা এগোবই। এক আঘাতেই কোনো বিপ্লব কখনো সার্থক হয়নি। নাইন্টিন ফাইভের পরে এসেছে নাইন্টিন সেভেন্টিন। তোমরাও কি একেবারেই ক্যাপিটালিজ্মকে শেষ করে দিতে চাও নাকি? দিস্ ইজ অন্লি দি বিগিনিং অব্ দি এন্ড—

ঘরে ঢুকল সুমিতা।

—ব্যাপার কী, তোমরা যে ঘর-বাড়ি একেবারে ফাটিয়ে দিচ্ছ।

—সুমিতাদি—শনিবারে এশিয়াটিক আয়রণে স্ট্রাইক।

সুমিতা একটা আসন টেনে নিয়ে বসল: মালিকের সঙ্গে রফা হল না?

—নাঃ। ওরা আপোষের কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। সুতরাং ওদের একবার নিজেদের শক্তিটাই ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—ফ্যাক্টরীতে এখন ওদের কাজের চাপ। ওয়ার এমার্জেন্সী। ফেঁপে গিয়ে রিপ্রেশন চালাতে পারে তো?

—তা পারে। কিন্তু সুমিতাদি—কতদিন গুলী চালাবে ওরা? ওদের গুলী একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ মেরে কোনোদিন ওরা শেষ করতে পারবে না।

হঠাৎ বুক ভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলে সুমিতা। কেমন যেন জোর ফিরে পেয়েছে নিজের পায়ে। রমলা চলে গেছে—কিন্তু তার ভেতরে কোনো সংকেত নেই, পরাজয়ের কোনো ইঙ্গিত নেই। ব্যর্থতার আরো অনেকে আছে—এই ছেলেরা আছে, আছে এই মেয়েরা। শীলার ভাঙা সংসার নয়, রমলার ক্লেদাক্ত গতানুগতিক সংসার নয়—এদের নিয়েই সে গড়ে তুলবে সমস্ত মানুষের সংসার—ভাবী ভারতের সংসার।

* * *

রাত হয়ে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন মণিকাদি। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল।

—এত রাত্রে আবার কে জ্বালাতন করতে এল?

বিরক্ত মুখে গজ গজ করতে করতে উঠে গিয়ে মণিকা দরজা খুলে দিলে। তারপরে আতঙ্কে তিন পা পিছিয়ে এল।

—একে?

—আমি অনিমেষ।

—একি চেহারা তোমার?

—পরে বলব। এখন এক কাপ চা খাওয়ান তো মণিকাদি।

—ক্রমশ

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জিলার গ্রাম হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিবার পরে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার গ্রাম হইতে ঐরূপ সংবাদ আসিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রীলোক, দ্বিতীয় মুসলমান পুরুষ। যে দেশে আজও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে, সে দেশে কতজনের অনাহারে মৃত্যু হইলে তবে একজনের মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও দেখা গিয়াছে, বাঙলায় সরকার দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাব সংগ্রহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করা তো পরের কথা—দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কোন হিসাব যাহাতে না থাকে সেইরূপ ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, এদেশে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব নিরক্ষর চৌকীদারের সংবাদের উপর নির্ভর করে; চৌকীদার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যে সংবাদ দেয় তাহা বিশেষজ্ঞের সংবাদ নহে—কাজেই নির্ভরযোগ্য নহেঃ সেইজন্য পাছে হিসাবে ভুল থাকে সেই আশঙ্কায় তাঁহারা "অনাহারে মৃত্যু"র হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদিগের এই সত্যনিষ্ঠার মূলে কি আছে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এবার আমরা দেখিতেছি, বাঙলায় যেন—দুর্ভিক্ষ নাই এবং হইতেও পারে না—প্রচার জন্য সরকারী কর্মচারীরা যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, এমন কথা না হয় নাই বলিলাম। কিন্তু তাঁহারা যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহা করিতেছেন না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? কারণ, আমরা দেখিয়াছি, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অভাব আছে জানিয়াও সচিবসঙ্ঘ মিথ্যা প্রচার-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবার বাঙলা সরকারের খাদ্য-বিভাগের ডিরেক্টার জেনারল এইরূপ প্রচার-কার্যে "মূল গায়েন" হইয়াছেন—আর প্রধান সচিবও বে-সরকারী সরবরাহ সচিব সেই কথাই বলিতেছেন। তাঁহাদিগের অধিক রোষ সংবাদপত্রের উপর। কেন না, সংবাদপত্রে (১) চাউলের মূল্য অতিরঞ্জিত করা হইতেছে এবং (২) তাহাতে খাদ্য-দ্রব্যের অভাবের বিষয় পাঠ করিয়া লোক ভয় পাইয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমরা কিন্তু মনে করি, সংবাদপত্রে চাউলের যে মূল্য প্রকাশিত হয়, তাহার প্রমাণ থাকে; কিন্তু সরকারী প্রমাণ লোক জানিতে চাহিলেও জানিতে পারে না এবং তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা সরকারই প্রয়োজন হইলে, স্বীকার করিতে লজ্জানুভব করেন না। লোক যখন দেখে, বাজারে চাউল ৩০।৩৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে, তখন তাহাকে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ভয় পাইতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিব, যদি সরকার সংবাদপত্রের সংবাদে নির্ভর করিয়া কাজ করেন এবং আপনাদিগের অযোগ্যতা গোপণ করিবার জন্য অসঙ্গত চেষ্টা না করেন তবে তাঁহারা বহুলোককে অনাহারে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু আমরা আশঙ্কা করিতেছি, এবার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যেমন হইয়াছিল, সরকার তেমনই সংবাদপত্রে খাদ্য-দ্রব্যের অবস্থা সম্বন্ধে সত্য সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টাই করিবেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন দেশের সকল লোকই জানিয়াছে—বাঙলার খাদ্য-দ্রব্যের অভাব (যখন কলিকাতার রাজপথেও অনাহারে লোকের মৃত্যু হইতেছে) তখনও বাঙলা সরকার প্রচার করিতেছেন, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব নাই! সেইজন্য লোক যদি সরকারী কর্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালিত প্রচারকার্যে আস্থা স্থাপন করিতে দ্বিধানুভব করে, তবে কি সেজন্য লোককে দোষ দেওয়া যাইবে?

গত ৭ই জুন ভারত সরকারের খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী স্যার রবার্ট হাচিংস সাংবাদিকদিগের নিকট বাঙলায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে, বাঙলা সরকার চাউলের মূল্যে বৃদ্ধি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন—ঢাকা মুন্সীগঞ্জে চাউল ২৬ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে কি বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই?

তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গে বর্ষার অব্যবহিত পূর্বে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তিনি কেন ভুলিয়া যাইবেন যে, পশ্চিম-বঙ্গেও অনাহারে লোকের মৃত্যু হইতেছে।

তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এবার বাঙলায় ধানের ফসল (আউশ ধান) ভাল হয় নাই। আর তিনি যে কথা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

বোম্বাই প্রদেশ ও মাদ্রাজে ব্যবস্থা যেরূপ বাঙলায় সেরূপ নহে। অন্যান্য প্রদেশে সরকার সরাসরি উৎপাদকদিগের নিকট হইতে ধান ক্রয় করেন—বাঙলা সরকার এজেণ্টের মধ্যস্থতায় তাহা করেন। এই প্রথার ক্রম-পরিবর্তন হইতেছে।

বাঙলায় এই এজেণ্ট নিয়োগের ব্যাপারের কত প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এমন কি একজনকে এজেণ্ট করিবার সময় তৎকালীন বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সচিব (বর্তমানে তিনিই প্রধান সচিব) গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মুসলিম-লীগ-প্রীতি সর্বজনবিদিত। তাঁহার সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ আলোচনা ব্যবস্থা পরিষদে হইয়াছিল যে, বাঙলা সরকার নিজ পক্ষ সমর্থনে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলেন—পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশেই সরকার সরাসরি শস্য ক্রয় করেন—কেবল বাঙলায় তাহা হয় না এবং বাঙলায় ধানের কলগুলিকেও এজেণ্টের তাঁবে রাখা হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশে যে যে স্থানে এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে সকল স্থানেই সে ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া সরকারের সরাসরি ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া-ছিল। কিন্তু বাঙলায় এজেণ্টদিগের মারফতে শস্যক্রয়ই চলিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহাতে এজেন্সী প্রথার বিশেষ নিন্দা করা হয়—তাহার ত্রুটিগুলিও দেখাইয়া দেওয়া হয়। তথাপি যে সে প্রথা পরিবর্তিত হয় নাই, তাহার জন্য নিন্দা কেবল মালিকদিগেরই প্রাপ্য নহে—যে মিস্টার কেসীর শাসনকালে বাঙলা ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের শাসনাধীন ছিল, তাঁহাকেও তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি ও তাঁহার অধীন রাজকর্মচারীরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।

বাঙলার নূতন গভর্নর যদি রাউল্যাণ্ডস কমিটির রিপোর্ট পাঠ করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, অনাচারের ও দুর্নীতির কিরূপ বিস্তার লাভের কথা তাহাতে বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে অনাচার ও দুর্নীতি সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমাদিগের অভিজ্ঞতার ফলে আমা-দিগের আশঙ্কা হয়, যাঁহাদিগের অব্যবস্থায় ও অযোগ্যতায় এবং হয়ত বা অন্যান্য কারণেও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় নিবার্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া লোকক্ষয় করিয়াছিল, তাঁহাদিগের কর্মফলে বাঙলায় আবার সেইরূপ বা তাহারও অধিক লোকক্ষয় হইতে পারে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহযোগের জন্য আগ্রহ জানাইয়াছেন। কিন্তু কে তাঁহাদিগের সহযোগ চাহিতেছে এবং কে তাহা গ্রহণ করিবে? বোধ হয় ইহা তিনিও বুঝিতেছেন।

কিন্তু বাঙলায় লোকক্ষয় নিবারণ করিতেই হইবে। কংগ্রেস জানেন, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তখন হিন্দু মহাসভার চেষ্টা স্মরণীয়। এবার কংগ্রেস সরকারের সহযোগ না পাইলেও আর সকল প্রতিষ্ঠানের সাগ্রহ সহযোগ পাইবেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া সেইরূপ সহযোগ অর্জন করিয়া সুচিন্তিত পদ্ধতিতে বাঙালীকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য

জাপানের আর্থিক দুর্গতি

শ্রীদীনবন্ধু দাস

প্রাচ্য মহাদেশে আর্থিক উন্নতিতে জাপানের সমকক্ষ কেহ ছিল না। গত ১৯৩০ সালের আর্থিক সঙ্কটের সময়ে যখন ব্রিটেন ও অন্যান্য সকল দেশের মাল কাট্‌তি ভয়ানক কমিয়া গেল, তখন জাপান অতি সহজেই সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়া বন্যার জলের মতন হু হু করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বাজারগুলি দখল করিয়া লইল। এই দুই মহাদেশের গরীব জনসাধারণের জন্য মোটা কাপড় ও মোটা রকমের রকমারী জিনিসপত্র সস্তা দামে সরবরাহ করিতে জাপানের জুড়ি কেহই ছিল না, এইজন্য অনায়াসেই সে বাজার দখল করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ করিয়া জাপানের কার্পাস শিল্প প্রাচ্য দেশের এক অদ্বিতীয় সম্পদে পরিণত হইল। জাপানের উন্নতিশীল শিল্প দেখিয়া ঈর্ষান্বিত না হইয়াছে, প্রতীচ্যদেশেও এমন কেহ ছিল না। এদিকে জাপান মারণাস্ত্র তৈয়ারের ব্যাপারেও পিছাইয়া ছিল না। চীনের সঙ্গে ১৯৩৭ সালেই তাহার সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। তারপর ১৯৩৯ সালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধে। এই সময় জাপানও অন্যান্য শিল্পে ঢিলা দিয়া গোপনে ছুরি শানাইতে থাকে; ১৯৪১ সালে নিজেই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। অনেক দেশ দখলও করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। এদিকে যুদ্ধের দাবাগ্নির কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহার নিজের দেশের কৃষি-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বোমার আঘাতেও অনেক কল-কারখানা ঘর-বাড়ি নষ্ট হইয়াছে। অতঃপর যেটুকু সমৃদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, যুদ্ধে হারিয়া এবারে তাহাও যাইতে বসিয়াছে। জার্মানীর মত জাপানকে চারভাগ করা হয় নাই বটে, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়া জাপানের সর্বময় কর্তারূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন মার্কিন সমরনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থার। কিন্তু তাহা হইলেও বিদেশী শাসননীতির ফলে ক্ষতি জার্মানীর বেশি হইতেছে বা জাপানের বেশি হইতেছে, বলা শক্ত।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

যুদ্ধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় উভয়পক্ষ। যে পক্ষ হারিয়া গেল, তাহার ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে না, কারণ সে যে হারিয়া গিয়াছে! যে জিতিয়াছে, ক্ষতিপূরণের দাবী নিয়া সে উপস্থিত হয় বিজিত পক্ষের নিকট। যুদ্ধে যা ক্ষতি হইবার তা ত' হইয়াছেই, এবারে বিজয়ী পক্ষের ক্ষতিপূরণের ঠেলাও তাহাকেই সামলাইতে হইবে। ইহাকেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। পরাজিত পক্ষ যুদ্ধে হারিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া থাকে। গভীর দুঃখে তাহার মুখের বাক্য বন্ধ হইয়া যায়। যদি তাহার মুখে কথা সরিত, তবে সে বোধ হয় একথাই বলিত, 'হায় প্রভু, তোমার ক্ষতি পূরণ করিবার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত, তবে আর কথা ছিল কি, তবে ত' আমার নিজের ক্ষতি সামলাইয়া লইয়া তোমার সঙ্গে আরও কয়েক প্যাঁচ খেলিতে পারিতাম। চাই কি তোমাকে কুপোকাৎ করিয়াই ছাড়িতাম, ক্ষতিপূরণের দাবী লইয়া কথা বলিবার তোমার আর সাধ্য থাকিত না।' যাই হোক, সেই অসম্ভব যদি সম্ভব হইত সে কল্পনা করিয়া লাভ নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহা লইয়াই আলোচনা করা যাক। সত্য ঘটনা এই যে, জাপান যুদ্ধে হারিয়াছে, অতএব তাহাকেই এবারে শত্রুপক্ষের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

জার্মানী কিভাবে কি ক্ষতিপূরণ করিবে তাহার মোসাবিদা বাহির হইয়াছে, কিন্তু জাপান সম্বন্ধে এখনো সেরূপ কোন মোসাবিদার কথা জানা যায় নাই। তাহা হইলেও ক্ষতিপূরণ কি ভাবে কি দিয়া হইবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা নানাসূত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে।

প্রথম কথা, বিজয়ীপক্ষ জাপানে বিমানযান তৈয়ারের কারখানা যা কিছু আছে সে সমস্ত হয় নিজেদের দেশে সরাইয়া লইবেন, তা নয় ত এগুলিকে একে একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিবেন। বিমানপোত তৈয়ারের কলকব্জার উপর ক্রোধের কারণটা সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, বিজয়ী বীরদল জাপানের হাতে রাসায়নিক কারখানাও কিছুই রাখিবেন না স্থির করিয়াছেন। এ সমস্তই নিজেদের দেশে লইয়া আসিবেন। শুধু সার তৈয়ারের জন্য অল্পস্বল্প রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রাখিয়া দিবেন। জাপানের কৃষিকার্যে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার হয় এবং কৃষিকার্যে বাধা দেওয়ার অভিপ্রায় বিজয়ী পক্ষের নাই। তাঁহারা বরং জাপানকে চাষা বানাইতেই চাহিতেছেন।

ইস্পাত শিল্পের উপরও মিত্রশক্তির (ইঙ্গ-মার্কিনের) ক্রোধ দৃষ্টি রহিয়াছে। কারণ ইস্পাতই যুদ্ধ শিল্পের মূল ভিত্তি। তাছাড়া, ইস্পাত শিল্প প্রগতিরও প্রধান বাহন। যুদ্ধ বন্ধ করিতে গেলে শুধু যুদ্ধের অস্ত্র বানাইবার কলকব্জা ও সরঞ্জাম হাতের কাছ হইতে সরাইয়া লইলেই চলিবে না। কারণ, এ সমস্ত ফিরাইয়া আনিতে কতক্ষণ? তাই মিত্রশক্তি চাহিতেছেন, জাপানের শিল্প-সমৃদ্ধির মূলেই কুঠারাঘাত করিতে। শিল্প-সমৃদ্ধি হারাইয়া একেবারে চাষা বনিয়া গেলে কাহারও আর গৃহবিবাদ ছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন থাকিবে না। দুইবার ঠকিয়া এইবারে ইঙ্গ-মার্কিণ বীরবৃন্দ এই মোক্ষম কথাটা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই এবারে সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা হইতেছে। জাপানেও তাই, জার্মাণীতেও তাই। ইস্পাত কারখানা কতক কতক চীনে ও ফিলিপাইনে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

নিজ দ্বীপমালার বাহিরেও জাপানের অনেক কলকারখানা ছিল। রুশিয়া শেষ মুহূর্তে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাতেই তার এত প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়াস্থ জাপানীদের কলকারখানা নাকি রুশেরা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছে। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার জাপানের যুদ্ধ-পূর্ব সময়কার হিসাবেই ৩০০ কোটি মার্কিণ ডলার মূল্যের সম্পত্তি ছিল।

বহির্বাণিজ্য

বিজয়ীপক্ষ স্থির করিয়াছেন, জাপানকে আর বড় একটা বাণিজ্য করিতে দিবেন না। বাণিজ্য করিয়াই ত ইহারা যুদ্ধের শক্তি ও স্পর্ধা সঞ্চয় করিয়াছে। অতএব বাণিজ্য যথাসম্ভব বন্ধ করিতে হইবে। এশিয়ার আর সব দেশের লোকদের গড়পড়তা জীবনযাত্রার যাহা মান, জাপানে তাহার চেয়ে উঁচু মাপের জীবনযাত্রা তাহারা বরদাস্ত করিবেন না। লোহা-লক্কড় বা রসায়ন শিল্পে যেটুকু নেহাৎ-না-হইলে নয়, শুধু ততটুকুই তাহারা রাখিতে দিবেন। আর অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য পণ্য তৈয়ারের শিল্পেও দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু রপ্তানি করিলে তার বিনিময়ে জাপানী আপনার খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূরণ করিতে পারে, শুধু ততটুকু শিল্প তাহাকে রাখিতে দেওয়া হইবে।

জাপানের কার্পাস শিল্প চালু করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সর্ত এই যে, নূতন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। জাপান যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর তুলা আমদানী করিত। ভারত হইতে যত তুলা রপ্তানি হইত, তাহার শতকরা ৪৫ ভাগই কিনিত জাপান। এখনও পর্যন্ত ভারতের পক্ষে জাপানে তুলা বিক্রী শুরু করা সম্ভব হয় নাই। মার্কিনরা জাপানকে ১৩ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী

ধারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে, জাপানের তুলা আমদানীর বাজারটাও সরকারী কর্তৃত্বে মার্কিন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাহারা নিজ দেশ হইতেই তুলা আমদানী করিতেছে, অতএব ভারতবর্ষের পক্ষে এতে নাক ঢুকাইবার সুযোগ ঘটিতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে জাপানের কাপড় রপ্তানির যে বিরাট ব্যবসা ছিল, মার্কিনরা জাপানকে সেই রপ্তানি বাণিজ্য সুরু করার সুবিধা কোনকালেই আর দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। জাপানের রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ থাকিলে এশিয়া ও আফ্রিকার কাপড়ের বাজারে কাহারা মাল সরবরাহ করিবে এটা একটা বড় প্রশ্ন হইয়া দেখা দিবে। ভারতের পক্ষে আর সকল সুবিধাই ছিল; কিন্তু শীঘ্র যন্ত্রপাতি না পাইলে ভারতের কার্পাস শিল্প এই সুযোগ কাজে লাগাইতে পারিবে না বলিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। উত্তর চীনে, মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় সোভিয়েট রুশ এই সুযোগে আপন ব্যবসা গুছাইয়া নিতেছে।

জাপানকে কোন্ কোন্ মাল কি পরিমাণ রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে এ বছরের প্রথম ছ' মাস ও শেষ ছ' মাসের জন্য দুইটি আলাদা আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধপূর্ব রপ্তানি-বাণিজ্যের যা মূল্য ছিল, এখন জাপান তাহার একচতুর্থাংশের বেশী মূল্যের মাল রপ্তানি করিতে পাইবে না। যে সব মাল রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বাৎসরিক রপ্তানীর মোট মূল্য প্রায় ৬৭ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যে সকল মাল রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের নাম কাঁচা রেশম, আসল ও নকল রেশমজাত দ্রব্য, মাটির জিনিষ, চা, ক্যামেরা, বাইসাইকেল, কার্পাস শিল্পের যন্ত্রপাতি, রেডিও, রেডিও টিউব, আলোর বালব, খনির কাঠ, অলংকারপত্র ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য। এই সব জিনিষের মধ্যে কোন কোন কাঁচা মাল জাতীয় জিনিস রপ্তানির জন্য প্রস্তুত আছে, আর সব শিল্পদ্রব্যও শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া যাইবে বলিয়া জানা যায়। মার্কিন সৈন্যদল বিশেষ করিয়া রেশম উৎপাদন ও রেশমের সৌখীন জিনিস তৈয়ারের ব্যাপারে খুব উৎসাহ ও সুযোগ দিতেছে। কারণ মার্কিন দেশে এই সব জিনিষের খুব আদর। দেখা যাইতেছে, মার্কিনরা বিশেষ-ভাবে তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া জাপানে নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেখানে সোজাসুজি তাহাদের বিশেষ কোন স্বার্থ নাই, সেখানে তাহারা অনড়। এইরূপ নীতির ফলে জাপান বিশেষভাবে মার্কিনের লেজুড় হইয়া পড়িবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জাপানের সত্যকার সমৃদ্ধি উপেক্ষা করিয়া বিশেষভাবে মার্কিণ স্বার্থ উদ্ধারের সাধনা করিলে পরিণামে পৃথিবীর আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়া আসিবার পক্ষে অনর্থক বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে মাত্র।

জাপানের শিল্প

পূর্বেই বলিয়াছি জাপানের শিল্প কার-খানা বোমায় অনেক নষ্ট হইয়াছে। অতঃপর যুদ্ধে হারিয়া চীনে, ফরমোসায়, কোরিয়ায় ও মাঞ্চুরিয়ায় তাহাদের যা কিছু শিল্প সম্পত্তি ছিল, এবারে তাহাও গিয়াছে। বিমানপোত তৈয়ারের শিল্প, রসায়ন শিল্প এবং লোহা ও ইস্পাত শিল্পও এক রকম ধ্বংস করা হইবে। জাহাজ তৈয়ার শিল্পও ছাঁটিয়া ফেলা হইবে, শুধু জাপানের এক দ্বীপ হইতে আর এক দ্বীপে এবং উপকূল অঞ্চলের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে বাণিজ্য করিবার উপযোগী ক্ষুদ্রতর জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা থাকিবে। ৫০০০ টনের বেশী বোঝা বহিবার উপযোগ জাহাজ নির্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে

কার্পাস শিল্প, রেশম শিল্প এবং মা ধরার শিল্প এইগুলিকে চালু করা হইতেছে যুদ্ধের মধ্যে এ সব শিল্পের উৎপাদন খু কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে রেশম শিল ছিল জাপানের একটি প্রধান অবলম্বন, যুদ্ধে মধ্যে নকল রেশমের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় এখ জাপানী রেশমের পূর্বের কদর হইবে ন জাপানে খুব সুন্দর ও সৌখীন রেশমজা কাপড় ইউরোপ-আমেরিকার ধনীদের সাজসজ্জ ও আসবাবপত্রের জন্য ব্যবহার হইত। মার্কিন জাপানকে দিয়া ঐসব সৌখীন ও দা রেশমী কাপড় তৈয়ার করাইতেছে। জাপ পূর্বে এ অঞ্চলে মাছ ধরার শিল্পে অদ্বিতী ছিল—পূর্বের স্থান সে আর এখন ফিরি পাইবে না। একদিকে সোভিয়েট যুক্তরা
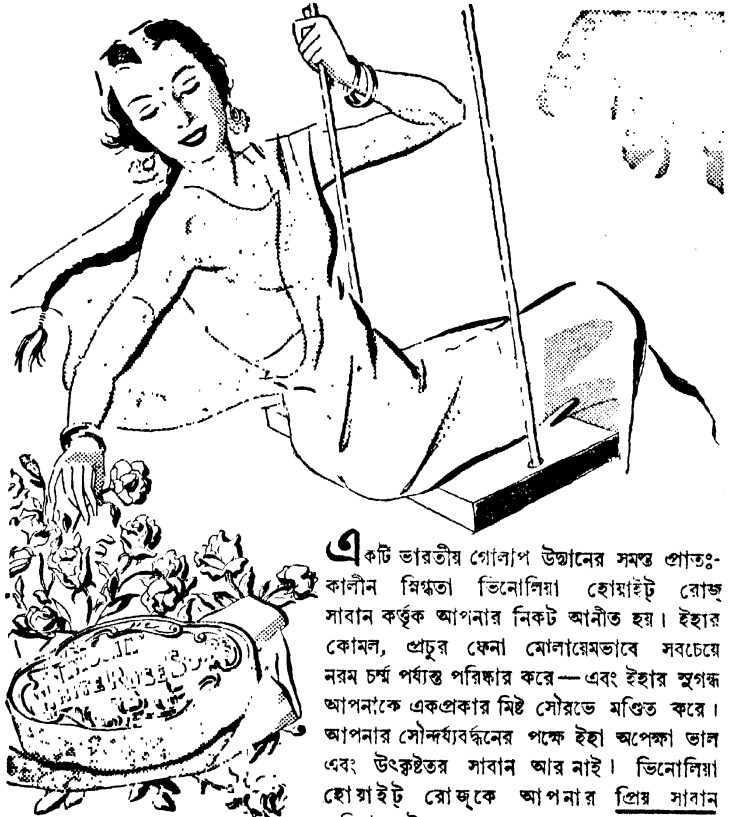
অপর দিকে মার্কিন উভয়ে মিলিয়া মৎস্য শিল্পের অনেকটা এবারে দখল করিয়া লইতেছে।

কার্পাস শিল্প

ভারতবর্ষের সাধারণ লোক জাপানকে সস্তা মনোহারী দ্রব্য ও কার্পাস শিল্প দিয়াই জানে। ১৯৩৯ সালের পর হইতে জাপানে কার্পাস শিল্পের উৎপাদন কমিতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের পরে রপ্তানি বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৩ সাল হইতে যুদ্ধের জন্য বহু কাপড়ের কল গলাইয়া ফেলা হইয়াছে। ফলে ১৯৪৪ সালে যুদ্ধপূর্বের একপঞ্চমাংশ মাত্র উৎপাদন হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্বে জাপানের যত সুতার কল ছিল, এখন তাহার একচতুর্থাংশ মাত্র কার্যোপযোগী অবস্থায় আছে। ১৯৩৭ সালে ১ কোটি ২৭ লক্ষ সুতাকল ছিল, এখন আছে মাত্র ২৮ লক্ষ। আরও লাখ তিনেক সুতাকল মেরামত করিয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে বলিয়া জাপানের বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধারণা। তাহাদের মতে সব মিলাইয়া বড় জোর জাপানের এখন স্বদেশের কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার মত ক্ষমতা আছে, রপ্তানি করা বর্তমান অবস্থায় তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের চাহিদা ভাল করিয়া মিটাইতে গেলেও আরও অন্ততঃ ২২ লাখ্ সুতাকল এবং ১৫ হাজার কাপড় বোনার কলের প্রয়োজন হইবে। এখন চিন্তার বিষয় হইল এই যে, কাপাস শিল্পের মত অত বড় একটা সমৃদ্ধ শিল্পের পতন হইলে জাপানের আর্থিক জীবনে সামঞ্জস্য সাধন হইবে কি করিয়া। বিজয়গর্বের প্রথম উল্লাসে জাপানকে খুব বেশী দাবাইতে গিয়া শেষে যেন মিত্রশক্তিকে পস্তাইতে না হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা আজ একসূত্রে বাঁধা।

খাদ্যশস্যের অবস্থা

বাঙালীদের মতই জাপানীরা ভাত খায়। জাপানে বিঘা প্রতি চালের উৎপাদন খুব বেশী ছিল। এসব দেশের প্রায় তিন চার গুণ। যুদ্ধের মধ্যে প্রতি একর জমির গড়পড়তা উৎপাদনের হার পড়িয়া গিয়াছে। চালের মোট উৎপাদনও খুব কমিয়াছে। কোন্ সালে কত উৎপাদন হইয়াছিল, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া গেল (মেট্রিক টনের হিসাব):—

১৯৩৫—৩৯ সালের বাৎসরিক গড়	১.২১ লক্ষ টন
১৯৪৩	১,১৭ ,, ,,
১৯৪৪	১,০৯ ,, ,,
১৯৪৫	৮৯ ,, ,,

যুদ্ধের পূর্বে দেশের চাহিদার ৮২-শতাংশ মাত্র দেশে উৎপন্ন হইত, বাকীটা আমদানী হইত কোরিয়া ও ফরমোজা হইতে। যুদ্ধের মধ্যে চালের উৎপাদন একতৃতীয়াংশ হ্রাস পাইয়াছে, তার উপরে আবার বিদেশাগত সৈন্য দল আসিয়া জুটিয়াছে, কাজেই অবস্থা যে খুব সহজ নয় বোঝাই যাইতেছে। তবে মার্কিনরা জাপানকে বেশ প্রচুর খাদ্য রেশন দিতেছে। অনেক বিদেশী সাংবাদিক এই লইয়া মার্কিন-নীতির নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, মিত্র-দেশীয় লোকেরা যেক্ষেত্রে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, সে স্থলে ভূতপূর্ব শত্রুদেশীয়দের প্রতি অতটা দরদ ও দাক্ষিণ্য কেন?

কৃষি ও পশুপালন

পূর্বেই বলিয়াছি মার্কিনরা জাপানকে চাষার জাতিতে পরিণত করিতে চাহিতেছে, তাই তাহারা কৃষির উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছে। তাহারা এই উদ্দেশ্যে জমিজমার আইন সংস্কারের উদ্যোগ করিতেছেন। যে সব জমিদার জমি ছাড়িয়া দূরে থাকে, তাহাদের জমি কাড়িয়া লওয়া হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। পশুপালন জাপানে বহুলোকের উপজীবিকা, জাপান পশুসম্পদে সমৃদ্ধ বলা যায়। মার্কিন শাসকগণ জাপানে পশুপালন কার্যের বিস্তার চাহিতেছেন। যুদ্ধের মধ্যে আপন প্রয়োজনেই জাপানে পশুসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। দুধ ও পনিরের উৎপাদনও যুদ্ধের মধ্যে বেশ বাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়। জাপানের শিল্পকার্যের গতি ব্যাহত করিলে বহুলোক যে বেকার হইবে, তাহাদের অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। এই কারণেই মার্কিণরা কৃষি ও পশুপালনের বিস্তার সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

"যাইবাৎসু" উচ্ছেদ

জাপানের শিল্প ব্যবসায়ে কতকগুলি বড় বড় ধনী পরিবারের প্রাধান্য দেখা যায়। মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, য়াসুদা এবং আসানো প্রমুখ সব বড় বড় পরিবারগুলির প্রত্যেকের কোন-না-কোন শিল্পে ও বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে—ইহারা বহু যৌথ প্রতিষ্ঠানের একপ্রকার মালিক বলিলেই চলে। বলাবাহুল্য, আর্থিক ক্ষমতার জোরে তাহারা রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের লোভ ইহাদের খুব বেশী। এই সমস্ত কারণে মার্কিন শাসকরা ডিক্রী জারী করিয়াছেন যে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে কোন 'যাইবাৎসু'র লোক থাকিতে পারিবে না। 'যাইবাৎসু' করায়ত্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের যে সমস্ত শেয়ার ছিল, সে সব জাপানী সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। বিনিময়ে তাহাদিগকে সরকারী কাগজ দেওয়া হইয়াছে। জাপান সরকার বেশী দিন এই সব শেয়ার ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না, তাঁহারা এগুলি জনসাধারণের নিকট বিক্রী করিয়া দিবেন। কিন্তু, কোটিপতি ধনী 'যাইবাৎসু'দের শেয়ার কিনিবার সামর্থ্য জাপানের সাধারণ লোকের হইবে না, একথাটা মার্কিন শাসকগণ বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। জাপানের আর্থিক জীবনের দিকে দিকে আজ সংকট ও বিপর্যয় জমা হইয়া উঠিতেছে।

NTK. 131

ম্যালেরিয়ায় ম্যালোজেন ২্, দদ্রোগে স্ত্রীরোগে ওপনসিল ২॥০, শক্তি রক্ত ও উদ্যমহীনতায় টিস্যুবিল্ডার সুপরীক্ষিত গ্যারাণ্টীড। জটীল পুরাতন রোগ সুচিকিৎসার নিয়মাবলী লউন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (গভঃ রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাথাধরা শরীর ব্যথা ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়

—ক্যাফারিন—

২টী ট্যাবলেট জলের সহিত সেবন করা মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করিবে। ২৫ প্যাকেট ১৵০, ৫০ প্যাকেট ২।০, ১০০ প্যাকেট ৪্; ডাকমাশুল লাগিবে না।

কুইনোডিন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লীহাদোকালিন, মজ্জাগত জ্বর, পালাজ্বর গ্রাহিক ইত্যাদি যে কোন জ্বর চিরদিনের মত সারে। প্রতি শিশি ১॥০, ডজন ১৫্, গ্রোস ১৮০্। ডাক্তারগণ বহু প্রশংসা করিয়াছেন। এজেণ্টগণ কমিশন পাইবেন।

ইণ্ডিয়া ড্রাগস্ লিঃ
১।১।ডি, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা।

সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে টান কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

প্রথম বার সেবনেই ইহার অসীম শক্তির পরিচয় পাইবেন। হুপিং কাশি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে প্রথম হইতে শ্বাসারি সেবন করিলে রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

●

মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০
ডাক মাশুল ॥০

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস. সি. শর্ম্মা এণ্ড সন্স।
সাহাপুর, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা

"বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"

শ্রী

দেশ পত্রিকার গত রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রাজনারায়ণ বসুর "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা" হইতে(১) একাংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"রাজনারায়ণবাবু বাঙলা কবিতার যে বিশাল ও ওজস্বী অবস্থার বিষয় কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা যে তাঁহার শিষ্যপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সৃষ্ট হইবে, তাহা প্রবন্ধ রচনাকালে তিনি মনে করিতে পারিয়াছিলেন কিনা" ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে, উক্ত বক্তৃতারও কয়েক বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ভাবী যুগের কবির যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিতে পারা যায়। রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে যাঁহারা চর্চা করেন তাঁহাদের সকলেরই নিকট রচনাটি নিশ্চয়ই সুপরিচিত; তবুও, "ভবিষ্যদ্-বাণী" হিসাবে সাধারণ পাঠকের কৌতূহলজনক হইবে মনে করিয়া উহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ বিঠূর গ্রাম কানপুরের অতি সন্নিকট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে ঐ স্থানে মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বনকে তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দেশ করে। উহার অনতিদূরে সীতা-পরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান।" এইস্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া ১৭৮৯ শকের ১১ই ফাল্গুন রাজনারায়ণ বসু "বাল্মীকির অক্ষয় কীর্তি" নামে একটি বক্তৃতা দেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯০ শক, জ্যৈষ্ঠ), তাহাতে তিনি বাল্মীকির গুণকীর্তনপ্রসঙ্গে বলেন—"কবির কি আশ্চর্য ক্ষমতা; পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে বাল্মীকি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি বোধ হইতেছে যে তিনি অদ্যাপি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমারদিগের মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে প্রবেশপূর্বক তাহার উপর সর্বাধিপত্য করিতেছেন। ...তিনি যশঃসুধাপানে চিরজীবী। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি এইরূপ অমরত্বে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, যাবৎ গিরি ও সরিৎ মহীতলে স্থিতি করিবে তাবৎ রামায়ণ কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহার এই প্রত্যাশা কখন বিফল হইবে না; যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী অবনিমণ্ডলে স্থিতি করিবে তাবৎ বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী রামায়ণরূপ মহা নদী মর্তলোকে বিদ্যমান থাকিয়া কাব্য-ভুবন পবিত্র ও উর্বর করত প্রবাহিত হইবে। ইংরাজী সভ্যতা সহস্র পরিমাণে ভারতবর্ষে প্রচারিত হউক না কেন তথাপি বাল্মীকির খ্যাতি কখনই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইবে না। বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ খণ্ডে তিনি আদৃত হইতেছেন ও উত্তরোত্তর আরো অধিক আদৃত হইতে থাকিবেন।" পরিশেষে তিনি অনাগত যুগের কবিকে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

"হা! কবে ব্রাহ্মদিগের২ মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন? বাল্মীকিরূপ কোকিল কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া রাম রাম এই মধুরাক্ষর কূজন করিয়াছিলেন; আমারদিগের কবি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাহা অপেক্ষা অসংখ্যগুণ মধুর ব্রহ্মনাম কূজন করিবেন। তিনি কোন মর্ত রাজার মহিমা কীর্তন করিবেন না; তিনি সেই পরমপুরুষের মহিমা কীর্তন করিবেন, যিনি "রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক প্রাণারাম"। কেবল অযোধ্যা কিংবা দাক্ষিণাত্য, কিংবা সিংহল দ্বীপ তাঁহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে না; অসীম বিশ্বরাজ্য তাঁহার বর্ণনা-ক্ষেত্র হইবে। তিনি বাল্মীকির ন্যায় সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কল্পিত ঘটনা সকল বিমিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন না; তিনি কেবল সত্যই বর্ণনা করিবেন। গ্রহনীহারিকা হইতে এখনও কিরূপ গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইতেছে, সূর্য আর এক দূরস্থ সূর্যকে কিরূপ প্রদক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পিণ্ড হইতে পৃথিবী কি রূপে বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে উপন্যাস-রচকের কল্পনা-শক্তির অতীত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল নিহিত রহিয়াছে, অবনিমণ্ডলের উপরিভাগে কি কি আশ্চর্য পদার্থ সকল আছে, এক কেন্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্রের গর্ভে কি কি চমৎকার জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকল আছে, তিনি অলৌকিক কবিত্বশক্তি সহকারে এই সকল বর্ণনা করিবেন। তিনি দেশভেদে কালভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্তন করিবেন। তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন, তেমনি পুরাবৃত্তে বিচারিত ঘটনা সকলে ঈশ্বরের হস্ত আমাদিগকে সন্দর্শন করাইবেন; তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনাকালে এইরূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীর-স্বন হইবে; কখন বা সুমন্দ মারুত-হিল্লোল-স্পন্দিত গোলাবের ন্যায় তাহা সুললিত হইবে। তিনি প্রকৃতিরূপ বীণাযন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ গান করিবেন যে, মর্তলোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে। বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গলোকবাসী দেবপুরুষ গান করিতেছেন। হা! এমন কবি কবে আমারদিগের মধ্যে উদিত হইবেন?

১। এই বক্তৃতার তারিখ ১৭৯৮ শক; মুদ্রাকর-প্রমাদবশত দেশ পত্রিকায় "১৮৯৮ সাল" রূপে ছাপা হইয়াছে।

২ কোনরূপ সংকীর্ণ অর্থ রাজনারায়ণ বসুর অভিপ্রেত ছিল না।

জগদীশ্বর অবশ্যই আমারদিগের এ প্রত্যাশা কোন-দিন পূর্ণ করিবেন।"৩

এই বক্তৃতার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর মাত্র, তিনিই যে ভাবীকালে "এই প্রত্যাশা পূর্ণ করিবেন" তাহা নিশ্চয়ই রাজনারায়ণ তখন কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু জীবিতকাল শেষ হইবার পূর্বেই (ইং ১৮৮৯) রাজনারায়ণ রবীন্দ্রের উদয় লক্ষ্য করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই তাঁহার 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, কবি-বিজ্ঞানীর যে অপূর্ব কল্পনা রাজনারায়ণের মনে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, বিশ্ব-পরিচয় রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাও অনেকাংশে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

পিতৃ-সুহৃদ রাজনারায়ণের সহিত রবীন্দ্রনাথের নানাভাবে যোগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল—এ বিষয়ে কেহ জানিতে উৎসাহী হইলে ১৩৪৬ সালের শনিবারের চিঠিতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত অনেক তথ্য পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থের স্বাদেশিকতা অধ্যায়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীরামকমল সিংহের সৌজন্যে মজিলপুর নিবাসী শ্রীকালিদাস দত্তের নিকট হইতে রাজনারায়ণকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। চিঠিখানি বহুস্থানে জীর্ণ হইলেও রাজনারায়ণ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের কিরূপ শ্রদ্ধার যোগ ছিল, এই চিঠি হইতে তাহা জানিতে পারা যায় বলিয়া এই প্রসঙ্গে উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বৌঠাকুরাণীর হাট আপনার যে ভাল লাগিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি ......অনুভব করিতেছি।

যোগীনবাবু ৪ আমাকে সুরভির জন্য কতকগুলি ইংরাজি কবিতার অনুবাদ পাঠাইতে অনুরোধ ....[করিয়া] ছিলেন। আমি তাঁহাকে ......[লিখি] ভাল কবিতা অনুবাদ কা......[করিলে] [মন্দ] হইয়া যায়—অতএব অনু......[বাদ] করিলেই তাহা-দের প্রতি......[অবিচার] করা হয়। অনুবাদ করিলে......কৃতঘ্নের মত কাজ করা হয়। অ [আমি] সম্প্রতি তাঁহার অনুরোধ-মতে একবার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুই-চারি ছত্র লিখিয়াই এমনি মন...... [বিকল] হইয়া গেল যে, সে কাজ......... [ত্যাগ] করিতে হইল। সুরভিতে আপনার রচিত গ্রাম্য উপাখ্যান পাঠ করিয়াছি—উক্ত প্রবন্ধের সরল, অকৃত্রিম ছাঁচের লেখা......[পড়িয়াই] আপনার লেখা বলিয়া ......[বুঝিয়া] ছিলাম।

[কিছুদিন] হইতে আপনি ভারতীর [সম্পর্ক] একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।... ভারতী আপনার নিকট হইতে......উৎসাহজনক সমালোচনা প্রত্যাশা করে, ইহাতে আপনার কৃপণতা করা উচিত হয় না।

সারস্বত সমাজে৫ গোল যথেষ্ট হইতে কিন্তু ভূগোল কিছুই হইতেছে না, এ সংক্ষেপে বলিলাম।

মেজদাদারা এখন কা......আছেন—আ ৫।৬......আপনি আমার প্রণাম জানিবেন যো......[যোগীন] বাবুকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ......[জনাইবেন]।

[১২৯০] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৩ "বাল্মীকির অক্ষয় কীর্তি" বক্তৃতার এই উপসংহার অংশ "ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণনা" নামে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা সংগ্রহ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগেও (১৭৯২ শক) মুদ্রিত আছে।

৪ রাজনারায়ণ বসুর পুত্র

৫। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাহিত্য স (১২৮৯); দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমা শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রি কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। এই 'সমাজ' নির্ধা করিয়াছিলেন "ভূগোলের পরিভাষা স্থির ক আবশ্যক" এবং তজ্জন্য একটি সমিতি নিয় করিয়াছিলেন। রাজনারাণ বসু পত্রদ্বারা বিষয় তাঁহার মত জ্ঞাপন করেন।

বৃন্দাবনে বিষ্ণুযজ্ঞ

গত দোলের কয়েকদিন পূর্বে বৃন্দাবন হইতে হঠাৎ টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত—নিম্বার্ক আশ্রমে বিষ্ণুযজ্ঞ হইতেছে, আমাদিগকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ। এদিকে নানারকম অন্তরায়, প্রথমত সেজন্য যাওয়া অসম্ভবই হইয়া পড়ে, কিন্তু পরে 'সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস নরোত্তম দাস করে এই অভিলাষ' আমরাও এই লোভ ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না এবং দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যোগাড় করিতে না পারিয়া মধ্যম শ্রেণীর কক্ষে বাক্সবন্দী অবস্থায় গাঠরীর উপর চতুর্দিক হইতে পিষ্ট এবং ক্লিষ্ট অবস্থায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে যে কষ্ট পোহাইতে হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে, কেবলই মনে হইতে লাগিল কখন মথুরায় গিয়া পৌঁছিতে পারিব। আশা ছিল, পরদিন সন্ধ্যার পর হয়ত বৃন্দাবন পর্যন্ত পৌঁছা যাইবে; আর ট্রেণ ভ্রমণের ক্লেশের অবসান ঘটিবে। পরের দিন সেই প্রত্যাশায় ঘড়ির ঘণ্টা গুণিতেছি, টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌঁছিবার কিছু আগে এক ভদ্রলোক আমাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হাথরাস গিয়া মথুরার গাড়ী ধরা সম্ভব হইবে না; কারণ ৫টার সময় গাড়ী হাথরাস ছাড়িয়া যাইবে এবং আমাদিগকে ভোর পর্যন্ত মথুরার গাড়ীর জন্য হাথরাস ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আমরা একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম, আর একটি বিনিদ্র রজনীর ভয়াবহ সম্ভাবনা আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এইভাবে চিন্তান্বিত অবস্থায় যেন নিতান্তই অসহায়ত্ব অনুভব করিতেছি, এমন সময় গাড়ী টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌঁছিল। ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে শুনিলাম কুলীরা বলিতেছে, মথুরা যানেবালা গাড়ি খাড়া হ্যায়। এই কথা শুনিয়া আমরা যেন ধড়ে প্রাণ পাইলাম। তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং কুলীর নির্দেশ মত একটি ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। এইবার মথুরায় পৌঁছিতে পারিব, ইহা ভাবিয়া যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলাম। বিছানাপত্র গোছাইয়া একটি কোণা ঘেঁষিয়া একটা বেঞ্চের উপর আরাম করিয়া বসিয়া লইলাম। গাড়িতে খুব বেশী ভিড় ছিল না।

কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের ভুল ভাঙ্গিতে বেশী দেরী হইল না। কথায় কথায় আমাদের পাশের একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল। ইনি নিজে একজন জমিদার। আমরা বাঙ্গালী বলিয়াই এই গাড়ির মধ্যে আমরা ভদ্রলোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কারণ সে গাড়ীতে আর কেহ বাঙ্গালী ছিলেন না। ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এবং শান্তিনিকেতনের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আবাগড়ের রাজাকে আমরা চিনি কিনা। তিনি ইহাও জানাইলেন যে, আবাগড়ের রাজা রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগী ব্যক্তি এবং বিশ্বভারতীর আজীবন সদস্য। কথাচ্ছলে তিনি ইহাও বলিলেন যে, রাজাবাহাদুর নিজের দেশেও শান্তিনিকেতনের অনুরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী আছেন। আবাগড়ের রাজার পরিচয় আমরা বিশেষ কিছু জানিতাম না। তবে পূর্বতন রাজাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ডের দখলীস্বত্ব লইয়া বাঙ্গালী মোহান্তদের মামলা প্রভৃতির কিছু কিছু খবর জানিতাম এবং ইহাও জানিতাম যে, রাধাকুণ্ডে গোবর্ধন প্রভৃতি অঞ্চলে এই রাজাদের জমিদারী আছে। আবাগড়ের বর্তমান রাজা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী এবং শান্তিনিকেতনের শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইহা ছাড়া শান্তিনিকেতনে তাঁহার একটি বাড়িও আছে, আমরা এসব কথা শুনিয়াছি। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গ ধরিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার

সন্তদাস বাবাজী

পরিচয় অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল এবং আলোচনা বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বকথার মধ্যে গিয়া পড়িল। আমরা বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইতেছি, ইহা শুনিয়া তিনি আমাদের প্রতি অনেকটা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরে কথায় কথায় বলিলেন যে, এই ট্রেণ মথুরায় যাইবে না। আপাতত আগ্রায় যাইবে। আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে মথুরার গাড়ি পাওয়া যায়; কিন্তু এই ট্রেণ সে গাড়ি ধরাইতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ অধিকাংশ দিনই ট্রেণ পৌঁছিবার পূর্বে সে গাড়ি ছাড়িয়া যায়; তবে আগ্রায় গিয়া মথুরার মোটর বাস পাওয়া যায় এবং অন্য একটি লাইনে গাড়িও আছে। ভদ্রলোক আমাদের এই অনুরোধও করিলেন যে, যদি আমাদের অসুবিধা না হয়, তবে আমরা সে রাত্রির মত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরদিন মথুরা গেলেই চলিতে পারে। কিন্তু আমাদের সেই রাত্রিতেই বৃন্দাবনে পৌঁছার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা অসামর্থ্য জ্ঞাপন করি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিধাতা আমাদের ইচ্ছায় বাদ সাধিলেন। ট্রেণে আগ্রা পৌঁছিলে শুনিলাম, মথুরার গাড়ি কয়েক মিনিট আগে ছাড়িয়া গিয়াছে এবং ষ্টেশনে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সকলেই বলিলেন যে, সে রাত্রিতে আর মথুরার যাইবার কোনই উপায় নাই। রাত্রিতে মোটর বাস চলে না। ট্রেণও আর নাই। অগত্যা রাত্রি আগ্রাতেই কাটাইতে হইবে, কিন্তু কোথায় কাটানো যায়, ইহাই দাঁড়াইল প্রশ্ন। কেহ কেহ রাত্রির মত ষ্টেশনেই অবস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু দীর্ঘ ট্রেণ ভ্রমণের পর আমাদের গা মাথা ঘুরাইতেছিল, ষ্টেশনে থাকিতে আমাদের তেমন রুচি হইল না। এই অবস্থায় এক হোটেলওয়ালার খপ্পরে পড়িয়া গেলাম। সে আমাদিগকে জলের মত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ধর্মশালায় উঠিলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইবে এবং সে কষ্ট স্বীকার করা আমাদের মত লোকের উচিত হইবে না; পক্ষান্তরে তাহার হোটেলে উঠিলে সকল রকমে আরাম আমাদের পক্ষে একান্তই অনায়াসলভ্য হইবে; অধিকন্তু আমাদের মত পদস্থ অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক যে তাহার আশ্রমে আরাম উপভোগ করিতেছেন একথাও সে আমাদিগকে জানাইতে ভুলিল না। আমরা অবশ্য সংশয়ী মন লইয়াই কুলীর মাথায় বিছানা দিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। আধ মাইলখানেক পথ অতিক্রম করিবার পরই এই আরামালয়; সরু খাড়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই আমাদের রীতিমত গাত্রকম্প উপস্থিত হইল; উপরে গিয়া আরামের যে ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহাতে আরও অবাক হইয়া গেলাম। হাত চারেক একটি ঘর, তাহার ভিতর একখানা আড়াই হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া চারপায়া রহিয়াছে। ইহাই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট শয্যা ও আসন। এদিকে ওদিকে তাকাইয়া বাঙ্গালী জনপ্রাণীর সন্ধানও মিলিল না। এক রাত্রিতে এই ঘরে থাকার জন্য এক টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে, ভোজন গ্রহণ করিলে অতিরিক্ত এক টাকা। বলা বাহুল্য ভোজনে আর রুচি হইল না; ঠিক করিলাম, বাজার হইতে পুরী কিনিয়া লইব; অকারণ এই প্রবঞ্চকটার ফাঁদে আর পড়িব না; কারণ তাহা হইলে সম্ভবত রাত্রিটা অনাহারেই কাটাইতে হইবে; কারণ সে যাহা খাইতে দিবে, বাঙালীর পক্ষে তাহা খাওয়া সম্ভব হইবে না। সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া খাটিয়ার উপর বসিয়া আছি, এমন সময় বারান্দা হইতে গুণ গুণ সুরে কাহার গীতধ্বনি আমাদের কাণে পৌঁছিল। ঔৎসুক্যভরে বাহিরে আসিয়া দেখি, শীর্ণকায় মুক্তকচ্ছ অনাবৃত শরীর পায়ে কাঠের খড়ম এক ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিলেন এবং ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা বাঙালী কি না। সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম এবং তাঁহাকে আমাদের ঘরে আনিয়া বসাইলাম। কথায় বুঝিলাম, ভদ্রলোকের মাথা একটু খারাপ। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি মিঃ বসুকে চিনি কিনা। আমরা বলিলাম, কোন বসু? ভদ্রলোক যেন ইহাতে কতকটা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন, মিঃ শরৎ বসু! আমরা বলিলাম তাঁহাকে না চিনে এমন লোক বাঙলা দেশে খুব কম আছে। ভদ্রলোক বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে চিনেন এবং শ্রদ্ধা করেন। ভদ্রলোক কেন এখানে এই অবস্থায় আছেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি

বলিলেন যে, তাঁহার দুই বন্ধু ডক্টর লোহিয়া ও জয়প্রকাশ নারায়ণ আগ্রা জেলে আটক আছেন। তিনি তাঁহাদের জন্যই এই বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছেন। দেখিলাম, ভদ্রলোকের কথা অসংবদ্ধ এবং তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচয় পাওয়া গেল। তবে তাঁহার যে কিছু পড়াশুনা আছে তাহা বেশ বোঝা গেল। তিনি বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা উত্থাপন করিয়া 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর চরিত্রের সম্বন্ধে কি কি যেন বলিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; ইহার পর বাজার হইতে পুরী আনাইয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কেহ কেহ হয়ত এই লোকটিকে সি আই ডি বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু তাহার কথাবার্তায় আমাদের মনে তেমন সন্দেহ হয় নাই; কারণ সি আই ডিরা কথাবার্তায় অনেক ঘোরফেরের মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক ধারা ধরিয়া চলে, ইঁহার কথাবার্তায় তাহার বিশেষ অভাব ছিল।

বলা বাহুল্য, রাত্রিতে বিশেষ ঘুম হয় নাই। ভোরে উঠিয়া মথুরার ট্রেন ধরিলাম। আগ্রা হইতে মথুরার দিকে গাড়ি চলিল; কয়েকটি স্টেশন পার হইয়াই যেন মনে হইতে লাগিল যেন ব্রজমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছি। লাইনের দুই ধারে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্বর্ণাভ গমের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের সারি, কোথাও বা কেলি-কদম্বের চিরহরিৎ পল্লবদলের সঙ্গে সুপক্ক পীতাভ নিম্বপত্রের সমুজ্জ্বল বর্ণমাধুরী আমার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। ট্রেনে দুই-ধারে গাঢ় নীল কণ্টকদ্রুমকুঞ্জ লাল রংয়ের ফুলে ফুলে ঢাকা—দিক-চক্রবালে কে যেন আবীর ছিটাইয়া দিয়াছে। নিবিড় মুক্তলতা-কুঞ্জের কোলে কোলে কোথাও ময়ূরেরা দল বাঁধিয়া ঘুরিতেছে, কেহবা পেখম খুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গ্রীবা-ভাঙ্গ কি সুন্দর, দাঁড়াইবার আর ঘুরিবার কি ঠাট! বর্ণের এমন জমকালো খেলা কাহাকে না মুগ্ধ করিবে? ভোরের হাওয়াটাতেও বেশ শীতের আমেজ রহিয়াছে—ভালোই লাগিতেছিল। স্টেশনে স্টেশনে নানা রংয়ের ঘাঘরা পরা মেয়েরা দলে দলে গাড়িতে উঠিতেছে, সবই আমার মনে একটা ছন্দের মত দেখা দিতে লাগিল। যাত্রীদের কাছেও শুনিলাম যে, সত্যই গাড়ি ব্রজমণ্ডলের ভিতর পড়িয়াছে। দিল্লী হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে মথুরায় আসিবার সময়ও গাড়ি ব্রজমণ্ডলের ভিতর পড়িলে আমাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। হয়ত ইহা সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়; মানুষ যে শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে পরি-বর্ধিত হয়, তাহার মনও তেমন হইয়াই উঠে। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেও সেই সংস্কার তাহার মনোমূলে সঞ্চারিত এবং পল্লবিত হইয়া থাকে। সকলের চোখ এই-জন্য একরকম নয়—মনস্তত্ত্বের গূঢ় বিশ্লেষণের ভিতর না গিয়াও বোধ হয়, এ কথাটা বলা চলে।

বেলা দশটার সময় ট্রেন মথুরা স্টেশনে পৌঁছিল। হাথরাস দিয়া না আসিয়া কেন টুণ্ডলা হইয়া আসিয়াছি, এজন্য টিকিট চেকারের কাছে কৈফিয়তে পড়িতে হইল, বুঝিলাম বে-আইনী কাজ হইয়াছে, কিন্তু এ বে-আইনী সজ্ঞানে নয়—অজ্ঞানে এবং কতকটা যে সহজ প্রকৃতিরই টানে লোকটিকে এইসব তত্ত্বকথা বুঝাইতে প্রবৃত্তি হইল না। কোন রকমে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনের জন্য এক্কায় উঠিয়া বসিলাম এবং বেলা ১১টার কিছু পরে নিম্বার্ক আশ্রমের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। আশ্রমে অবিরাম লোকের গতিবিধি চলিতেছিল। পথে গাড়োয়ানই এ সংবাদ দিয়াছিল যে কাঠিয়া বাবার আশ্রমে খুব বড় যাগ চলিতেছে। আশ্রমদ্বারে পৌঁছিয়াই সে পরিচয় পাইলাম। লাউড স্পীকারযোগে বক্তৃতাধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল—'এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ বিততাঃ ব্রহ্মণো মুখে'! এলাহাবাদের শ্রীযুত গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় আবেগময়ী স্বরলহরীতে গীতার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় আমরা সেখানে পৌঁছিলাম। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার ছুটিয়া আসিলেন, স্বয়ং মোহান্ত মহারাজ পণ্ডিত ধনঞ্জয় দাসজী এবং অন্যান্য সকল সাধুরা আমাদিগকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন। আমরা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহারা প্রথমে আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমাদের মনে নানা ভাবের তোলপাড় চলিতেছিল। রামদাস

কাঠিয়া বাবার আশ্রম

কাঠিয়া বাবার সাধনাপূত এই আশ্রম, ব্রজবিদেহী সন্তদাসের এই আশ্রম সাধনাভূমি—বৃন্দাবনের পবিত্র রজের স্পর্শ আমাদের দেহে এবং মনে হর্ষাবেগ সৃষ্টি করিতেছিল। সেই অবস্থাতেই আমাদিগকে বক্তৃতা করিতে হইবে; কিন্তু আমাদের মুখে আদৌ কথা ফুটিতেছিল না। সাধুরা ছাড়িলেন না, আমাদিগকে সভাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন এবং মাইক্রোফোনের সামনে আমাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমরা সেই অবস্থায় হয়ত ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা করিয়াছিলাম—কি বলিয়া-ছিলাম, একটুও স্মরণ নাই। তবে আমরা আগে যাইব অনেকেই এইরূপ আশা করিতেছিলেন, ইহাই শুনিতে পাইলাম এবং যাইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহারা দুঃখ করিতে লাগিলেন। কারণ উৎসব শেষ হইতে মাত্র একদিন বিলম্ব ছিল এবং কার্যসূচী পূর্ব হইতেই এরূপভাবে নিরূপিত ছিল যে, বিশেষ পরিবর্তন করিবার কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং বিশেষভাবে কোন বিষয় ভাঙিয়া বলিবার মত সুযোগ আমাদের পক্ষে তখন আর হয় নাই। পরদিন ১১টার পর অর্থাৎ গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া গেলে আমরা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতার পর খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটে। আমাদের বক্তৃতা তাঁহার খুবই ভালো লাগিয়াছিল, একথা তিনি বলিলেন। আমাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পরিচয় পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। শ্রীযুক্তা নিরুপমা বর্তমানে তাঁহার জননীর সঙ্গে বৃন্দাবন বাস করিতেছেন। মহা-প্রভুর কথা শুনিলে তিনি তন্ময় হইয়া যান। মহাপ্রভুর প্রেম মাধুরী সম্বন্ধে তিনি কত কথা আমাদিগকে শুনাইলেন এবং নিজের বিনয় ও দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহ জগত্তারিণী মেডেল প্রাপ্তির কথা উত্থাপন করা তিনি সে বিষয় চাপা দিলেন এবং তাঁহ উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমাদের প্রশংসা করি লাগিলেন। পরে শুনিলাম ইহার পরও তি একবার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জ আশ্রমে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা গোবর্ধ গিয়াছিলাম, এজন্য আমার আর তাঁহার সাক্ষ লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। ইহার পর যে উ লক্ষ্যে আমাদের এই আশ্রমে যাওয়া সেই কথা কি বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, আশ্রমে বিষ্ণু হইতেছিল। বিষ্ণুযজ্ঞ একটা বিরাট ব্যাপা শুনিলাম, উত্তর ভারতে এমন বিরাট আক বিষ্ণুযজ্ঞ আর কোনদিন হয় নাই। সন্তদ

বাবাজীর শিষ্য নিত্যধামগত অনন্তদাস মহারাজের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা ছিল এবং তদনুযায়ী এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিত-বর্গ বৃন্দাবনে নিম্বার্ক আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্মোপদেষ্টা, বক্তৃগণ এবং সাহিত্যিকদেরও সমাবেশ হয়। আমরা যাইবার পূর্বেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্মোপদেষ্টাদের বক্তৃতা হইয়া গিয়াছিল। একদিন কবি সম্মেলন হয়। ব্রজমণ্ডলের সাহিত্যিক এবং কবিরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেখিলাম। ইঁহাদের আলোচনাও শুনিয়াছি। ব্রজমণ্ডলের এই সব সাহিত্যিক এবং কবিগণের আলোচনায় মনে হইল, এদিক হইতে বাঙলা তাঁহাদের অনেক উপরে। কবিসভার যিনি সভাপতি ছিলেন তিনি একটি দোঁহা পড়িলেন; ইহাতে শব্দ সাজাইবার বড় জোর কৌশলের পরিচয় পাইলাম। দুই এক-জনের কবিতার মধ্যে রসধর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাও তেমন নিগূঢ় নয়। যাহা হউক, এই যজ্ঞের কয়েক দিন একটি বিষয় দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। প্রত্যহ দুই বেলা অন্তত এক হাজার করিয়া সাধু সন্ন্যাসী এবং অভ্যাগত নরনারীর সেবা চলিতেছে। সে আয়োজনও সামান্য নয়—চার্ব চোষ্য লেহ্য পেয়ে পূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের প্রতি জনকে এক টাকা করিয়া দক্ষিণাও দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এত বড় ব্যাপারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই। কোথা হইতে এত টাকা আসিতেছে, কেহই ঠিক রকম বলিতে পারেন না। এই দুর্দিনে এত বড় অন্ন দানের ব্যবস্থা সহজ ব্যাপার নয়। তারপর রন্ধন প্রভৃতির ব্যবস্থাও অনন্যসাধারণ বলিতে হয়। এক একজন সাধু কিরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন এবং তাঁহাদের কর্মকুশলতা কিরূপ অপরিসীম দেখিলে সত্য সত্যই শ্রদ্ধায় তাঁহাদের কাছে অবনত হইতে হয়। সকলের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি এবং সুমধুর ব্যবহার, কাহারও কথায় এমন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও একটি কর্কশ বাক্যও শুনিতে পাই নাই। সর্বদা সকলে সেবার জন্যই যেন প্রস্তুত আছেন। সদা প্রফুল্ল মুখ, ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতি পরম পণ্ডিত মোহান্ত ধনঞ্জয় দাসজী হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমের সকল কর্মীই এই সেবাধর্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় দাসজীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সে পরিচয় পাইবেন। তাঁহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা অপূর্ব। ভাগবত অতি দুরূহ শাস্ত্র, শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা চলে না; সেজন্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রয়োজন। মহান্ত ধনঞ্জয় দাসজী সেই প্রজ্ঞা বলের অধিকারী। এই বিরাট অনুষ্ঠানটি তিনি যেভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি।

যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন একটি বিরাট মিছিল বাহির হয়। এই মিছিল বৃন্দাবনের বিভিন্ন মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া যমুনা তীরে পৌঁছে। প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এই শোভাযাত্রায় নরনারীর মিলিত সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ব্রজবধূগণ নানা বর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া এই শোভাযাত্রার অনুগমন করিতেছিলেন। বর্ণের সে বৈচিত্র্য এবং পারিপাট্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমরা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা অনেক দিন ভুলিতে পারিব না। নিম্বার্কাশ্রমের সাধুগণের আমাদের প্রতি অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদেরই কৃপায় এবার আমাদের পক্ষে ব্রজমণ্ডলের প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটে। বৃন্দাবনধামের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ইহার পূর্বেও দর্শন করিয়াছিলাম; এবার দোলের সময় সেখানে উপস্থিত হই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে গোপাল মন্দিরে দুই দিন কিছু বলিবারও সৌভাগ্য ব্রজ-বাসী বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনের বাহিরে কোন দিন যাই নাই; এবার নিম্বার্কাশ্রমের কৃপায় সে সুযোগও ঘটে। দোলের দিন বৃন্দাবনে ছিলাম, বৃন্দাবনের দোলের হৈ হুল্লোড় কলিকাতার মত নয়; অনেক কম মনে হইল; কিন্তু দোলের পরদিন মথুরা ও রাধাকুঞ্জে আমাদিগকে এক বিষম পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হয়। এই দিন আমরা একটি মোটরবাসে ৩৫ জন গোবর্ধন, রাধাকুঞ্জ প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে বাহির হই। মথুরায় মোটর পৌঁছিবার পূর্বেই কয়েকটি ঘাঁটিতে আমরা হোলী উৎসবকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হই। বস্তা বস্তা ভর্তি ধূলি রাস্তার উপর হইতে যোগাড় করিয়া সেগুলি সুকৌশলে আমাদের গাড়ির ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলা হইতে থাকে। ধূলায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। চোখ নষ্ট হইবার উপক্রম। ড্রাইভার পূর্ব হইতে আমা-দিগকে সঙ্কেত করিয়া আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছিল; কিন্তু দুর্বার সে আক্রমণ—প্রতিহত করে কাহার সাধ্য? গাড়ির জানালার ভিতর দিয়াও ধূলা আসিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। শিশুরা ভীত এবং চোখের যাতনায় মাতৃ ক্রোড়ে কাঁদিয়া আকুল। সে এক মহা হৈ চৈ ব্যাপার। মথুরা ছাড়াইয়া একটু আগাইলে মনে হইল, গাড়ি আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। দলে দলে লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেবল ধূলা ছুঁড়িতেছে! আর সব ধূলা আমাদের গাড়ির ভিতরই আসিয়া পড়িতেছে। রাস্তায় ধূলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দুর্যোগপূর্ণ ধূলিঝঞ্ঝা কোন রকমে পাড়ি দিয়া আমাদের গাড়ি গোবর্ধনে পৌঁছিল। এখানে বিশেষ কোন উপদ্রব হয় নাই; কিন্তু রাধাকুঞ্জে অবতীর্ণ হইবামাত্র বিপুল বেগে আক্রমণ সুরু হইল। আমাদের উপর শুধু ধূলা নহে, কাদা, ঝাঁটা প্রভৃতিও নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পিঠের উপর ধূলার বস্তা দম দম শব্দে আসিয়া পড়িতেছিল। এইভাবে অক্ষত দেহে কোন রকমে রাধাকুঞ্জের তীরে পৌঁছিলাম। রাধাকুঞ্জের মোহন্ত শ্রীযুত নবদ্বীপ দাসজী আমাদিগকে পরম পরিচিতের মতো স্নেহে গ্রহণ করেন। তিনি সহজে আমাদিগকে ছাড়িতে চাহিতেছিলেন না; কিন্তু সঙ্গে আরও যাত্রীরা ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে তিনি রাধাকুঞ্জবাসী বৈষ্ণবগণের ভজন কুটীরগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে জানান এবং এগুলির সংস্কারকার্যে বৈষ্ণব সেবা-পরায়ণ সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। আমরা এই প্রসঙ্গে তৎপ্রতি সেবাব্রতী সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাধাকুঞ্জ হইতে আমরা পুরাতন গোকুল, তথা হইতে ব্রহ্মাণ্ডকুণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডকুণ্ড হইতে দাউজী বা বলদেও গমন করি। বলদেও ব্রজ-মণ্ডলের একটি বিশিষ্ট স্থান। স্থানটি অনেকটা শহরের মত। দাউজী বা বলদেও সঙ্কর্ষণদেব, এখানকার বিগ্রহ। ব্রজবাসীদের এটি একটি বড় তীর্থস্থান। যাত্রীদের মধ্যে ব্রজবাসী এবং ব্রজবধূদের সংখ্যাই বেশী দেখিলাম। আমরা যখন যাই, তখন প্রায় দশ হাজার যাত্রীর সমাবেশ ছিল। আমরা ঐ সময় মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারি নাই। অপরাহ্নে আমাদের মন্দির দর্শন ঘটে। বিগ্রহ খুবই সুন্দর। নৃত্যপর বলরামের মূর্তি। দাউজীর নিজের বড় সম্পত্তি আছে। দাউজী হইতে আমরা বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করি।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আমাদিগকে বৃষভানুপুরে বা বর্ষানা এবং নন্দগ্রাম দেখাইবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আশ্রমের দুইজন সাধু আমাদের পথপ্রদর্শক হন। বর্ষানা বৃন্দাবন হইতে অনেক দূরে। মথুরা হইতে ট্রেনে বা মোটর বাসে দিল্লী-মথুরা লাইনের কোশী স্টেশনে আসিয়া তথা হইতে মোটর বাস বা ঘোড়ার গাড়িতে বর্ষানা যাইতে হয়। পথেই নন্দগ্রাম, সঙ্কেত বা প্রেমসরোবর পড়ে। আমরা কোশী হইতে এক্কা গাড়িতে বর্ষানাতেই যাই। বর্ষানা একটি বড় গ্রাম। বৃন্দাবনের একজন ধনী মারোয়াড়ী বর্ষানার পাহাড়ের উপর বহু অর্থ ব্যয়ে রাধারাণীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মূল্যবান প্রস্তররাজিতে গঠিত এই মন্দির প্রভূত কারুকার্য খচিত। দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। বর্ষানাতে জয়পুরের মহারাণীর মন্দিরও খুব সুন্দর। এখানে এক রাত্রি থাকিয়া আমরা পর-দিন প্রথমে সঙ্কেত বা প্রেমসরোবর তারপর নন্দগ্রামে আসি। নন্দগ্রামও টিলার উপর মন্দির। নন্দগ্রাম হইতে ফিরিবার পথে রাস্তা হইতে যাবট দেখা যায়। গাড়োয়ান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, বাঙালীরা যাবটের প্রতি বড়ই অনুরক্ত এবং তাহারা বর্ষানাতে গেলেই যাবটে যাইতে হয়। বর্ষানা রাধারাণীর পিত্রালয়, বৃষভানুপুরী, আর যাবট তাঁহার শ্বশুরালয়—'যাবটে আহয়ে ধনী জটিলা মন্দিরে বিষম দুর্গম স্থান কে যাইতে পারে'? বাঙলার বৈষ্ণব-গানে আমরা এই কথা শুনিতে পাই। নরোত্তমও গাহিয়াছেন—যাবটে আমার কবে এ পাণি গ্রহণ হবে বসতি করিব কবে তায়।" যাবটে কিশোরীজীর মন্দির আছে। ব্রজবাসীগণের দৃষ্টিতে যাবট কিন্তু ততটা মাহাত্ম্যপূর্ণ নয়। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার এই দিকটা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না। আমরা বাঙালী; আমাদেরও যাবটে যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। রাস্তা হইতেই মন্দির দেখিয়া আমরা প্রণিপাত জ্ঞাপন করি; শুনিলাম, সেখান হইতে আরও দুই মাইলের মত মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। নন্দগ্রাম হইতে পুনরায় কোশী হইয়া আমরা ট্রেণযোগে মথুরায় পৌঁছি, এবং সেই রাত্রিতেই হাথরাসে আসিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরি। আর নিম্বার্কাশ্রমের সাধুদের স্নেহ, সঙ্গীদের প্রীতি, ব্রজমণ্ডলের পবিত্র স্মৃতি চিরদিনের জন্য অন্তরে লইয়া পরদিন পুনরায় এই জনকোলাহলময় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করি।

চলচ্চিত্র শিল্প চলেছে কোন পথে? আজ-কাল চিত্রানুরাগী ও চিত্র ব্যবসায়ীদের মনে এ প্রশ্ন জেগে উঠেছে এবং যে রকম হুড়হুড় ক'রে একটার পর একটা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, ছবি সংখ্যা যে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের যে হিড়িক লেগে গেছে তাতে এমন ধরণের চিন্তা জাগা স্বাভাবিক। কেউ বড় সঠিক নির্ণয়ও কিছু ক'রতে পারছে না। বাস্তবিকই এমনি বিশৃংখল অবস্থা বর্তমান রয়েছে যে কোন নির্ধারণে পৌঁছানো সম্ভবও নয়। ছবি তোলা হ'চ্ছে মুক্তিলাভ করার সম্ভাবনার দিকে নজর না রেখেই; চিত্রগৃহ হ'চ্ছে দর্শক পাওয়া যাবে কি না সেদিক না ভেবেই; যে পরিমাণ টাকা খরচ হ'চ্ছে তা উঠবে কি না সে হিসেব করে কেউ চলছে না; দর্শক কি পছন্দ করবে সে হুঁস কারুর নেই; কি ছবি তোলা হ'চ্ছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে পারে না কেউ—হুজুগ উঠেছে ছবি তোলার আর সিনেমা গড়ার, নির্বোধের মত দলে দলে সব ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাই নিয়ে। ছবিও তাই হ'চ্ছে তেমনি—কলা-কৌশলের বাহাদুরী যেমন কিছুই থাকে না, না থাকে অভিনয় শিল্পীদের নৈপুণ্য: আর সত্যি কথা বলতে কি কারুর যদি বা গুণ থাকেও তো তা দেখাবার কোন সুযোগও নেই—না অভিনয় শিল্পীদের না কলাকুশলীদের। গুণী আর নির্গুণ এখন এক নৌকোতেই ভেসে চলেছে আর সেই সংগে ভেসে যাচ্ছে চিত্রশিল্পে নিযুক্ত শতাধিক কোটি টাকা।

ভেবেচিন্তে হিসেব মত চলবার লোকের কেন যে এত অভাব হলো আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, নয়তো চিত্রশিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। তালেগোলে পড়ে সে সম্ভাবনা আজ নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। পৃথক পৃথকভাবে ছবি তুলতে আসছে শত শতজন; স্টুডিওর টানা-টানি তারা সবাই দেখেছেন এবং তার জন্যে বহু লোকসানও সইছেন, কিন্তু জনকয়েক মিলিত হ'য়ে যে একটা স্টুডিও করবেন সেদিকে কারুর চেষ্টা নেই। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এখন যারা ছবি তোলায় নামছেন, তারা ঠিক ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নামছেন না এবং এদের অধিকাংশই দু'একখানা ছবি তুলেই সখ মিটিয়ে নেবেন এবং সে রকম আর্থিক সাফল্য লাভ না ক'রতে পেরে শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ লোকসানের ব্যবসা ব'লে ভবিষ্যতের খাঁটি ব্যবসাদারদের পিছিয়ে যেতেই অনুপ্রাণিত ক'রবে। তাই এখন মনে হয় একটা কোন আইন ক'রে চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া দরকার, না হ'লে এই বিশৃংখল অবস্থা যাবেই না আর ভাল ছবিও হ'তে পারবে না; অথচ প্রমোদের নামে কোটি কোটি টাকা জলে যেতে থাকবে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

আসছে সপ্তাহের আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে মিনার্ভায় ইউনিটি প্রডাকসন্সের 'কুরুক্ষেত্র' যার ভূমিকায় রয়েছে শ্যামলী, সায়গল প্রভৃতি; আর প্যারাডাইস, দীপক, ছায়া, পার্ক-শো ও আলেয়াতে এক সংগে মুক্তিলাভ করবে তাজমহল পিকচার্সের সুশীল মজুমদার পরিচালিত ও অশোককুমার এবং নসীম অভিনীত 'বেগম'।

বিবিধ

কলিকাতার ন্যাশনাল ফিল্মস অব ইণ্ডিয়ার স্বত্বাধিকারী মঙ্গল চক্রবর্তী সম্প্রতি বম্বেতে গিয়ে দু'খানা দ্বিভাষী ছবিতে অভিনয় করার জন্য অশোককুমারের সংগে চুক্তি করে এসেছেন। প্রথম ছবিখানিতে নায়িকা হবেন ভারতী; দ্বিতীয়খানির নায়িকা কানন এবং পরিচালকও অশোককুমার। ছবি দু-খানি তোলা হবে ন্যাশনাল ফিল্মসের নবগঠিত স্টুডিওতে এবং আগস্ট থেকে কাজও আরম্ভ হবে।

* * *

গল্পদাদুর স্মৃতিবাসরের উদ্যোগে বিমল বসু ও বিজন গংগোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বাঙলার কিশোরদের জন্যে বিনা দর্শনীতে প্রমোদ বিতরণের আয়োজন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কিশোররাই অভিনয়ে, সংগীতে, যন্ত্র-সংগীতে, আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করবে।

* * *

গত বুধবার কথাচিত্র লিমিটেডের প্রথম বাঙলা ছবি 'পূর্বরাগ'-এর মহরৎ শ্রীভারত-লক্ষ্মী স্টুডিওতে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

* * *

বম্বেতে ফিল্মের অভাবে বেশির ভাগ ছবিরই কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হ'য়েছে। কাঁচা মাল যা আমদানী হয়েছে তা সামান্য নয়, বরং যুদ্ধপূর্ব দিনের চেয়ে বেশীই কিন্তু ছবির সংখ্যা এমনি বেড়ে গেছে যে কিছুতেই কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

* * *

অরোরা ফিল্মসের নবনিযুক্ত নায়িকা শীলা দত্ত গুম হ'য়ে যাবার যে গুজব রটেছিল তা সত্যি নয়, কারণ শীলা জানাচ্ছেন যে তিনি কলকাতাতেই ছিলেন এবং আরোরারই 'বন্ধুর পথে'-তে অভিনয় ক'রছেন।

* * *

বাণী পিক্চার্স লিমিটেডের অংশীদারদের মধ্যে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকও আছেন। অন্যতম অংশীদার ও চিত্রপরিচালক ধীরাজ ভট্টাচার্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কাহিনী নিয়ে প্রথম ছবির কাজ অচিরেই আরম্ভ ক'রবেন।

* * *

গত সপ্তাহে রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে রূপাঞ্জলি পিক্চার্সের প্রথম ছবি 'অলকনন্দা'র মহরৎ সুসম্পন্ন হ'য়েছে। মন্মথ রায়ের লেখা কাহিনীটি পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ৭ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 22nd June, 1946. [৩৩ সংখ্যা

...জ্যবাদীদের ফাঁদ

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতের বন্ধু নহেন এবং ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার পরম ব্রত লইয়া তাঁহারা এদেশে আসেন নাই! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহাদের পরম ব্রত এবং মন্ত্রী মিশনের সদস্যগণ সেই ব্রতের সাধনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের আবরণে তাঁহাদের আচরণের মধ্য দিয়া স্বার্থ-সাধনের বেদনাই কাজ করিতেছে। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত এ কথাটা স্বীকার করিতে হইয়াছে। গত ১৬ই জুন মন্ত্রী মিশনের সদস্যগণ ও বড়লাট ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়া যে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মহাত্মাজী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় বলেন, মিশন সাম্রাজ্যবাদের সংস্কার ধারায় পরিপুষ্ট; তাঁহারা অকস্মাৎ সে সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দরিদ্র ভারতকে দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। মিশন সাম্রাজ্যবাদ রাতারাতি বিসর্জন দিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই।' আমাদের পরাধীনতা আমাদের নিজেদের দুর্বলতারই যে ফল, একথা আমরাও স্বীকার করি এবং আমরা যদি দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতাম, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই যে মিশনের পক্ষে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক সংস্কার রাতারাতি কাটাইয়া উঠা স্বাভাবিক হইত, ইহা আমরাও বুঝি এবং জগতের ইতিহাসও সে অভ্রান্ত সত্যই প্রমাণিত করে; কিন্তু এইভাবে কূটনীতির খেলা খেলিয়া আমাদের জ্বালা বাড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? এই সেদিনও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'আমরা ইংরেজেরা কত বড় উদারচেতা ভাবিয়া দেখুন। আমরা ভারতবাসীদিগকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিতেছি। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে কোন শাসনতন্ত্র চাপাইতেছি না। আমাদের তিনজন মন্ত্রী সেখানে গিয়া কি করিতেছেন, একবার লক্ষ্য করুন।' ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রী মিঃ এটলির এই উক্তির ধাপ্পাবাজী অবশেষে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৬ই মে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন প্রদেশসমূহের মণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা ভারতবাসীদের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরে ১৬ই জুন বড়লাটের সঙ্গে তাঁহারা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা এবং তৎপরবর্তী শাসনতান্ত্রিক পরিণতির সমগ্র পরিকল্পনাই কৌশলক্রমে ভারতবাসীদের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের সাম্রাজ্য-স্বার্থের বনিয়াদ পাকা করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরবর্তী এই যুক্ত বিবৃতিতে এই যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে যে, ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অনেক চেষ্টা করিয়াও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হইল না। অতএব ব্রিটিশ মিশন এবং বড়লাটকে বাধ্য হইয়া অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে হইল। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুক্তি চিরন্তন। ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন এদেশে আসিবার পর হইতে ভারতের শাসনতন্ত্রগত সমস্যা যেভাবে সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে ব্রতের যে এই ফল ফলিবে, ইহা আমাদের জানাই ছিল। আমরা পূর্বে হইতেই বলিয়াছি যে, মোশ্লেম লীগকে তোয়াজ করিবার পথ ভারতের স্বাধীনতার পথ নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের পক্ষে যদি আন্তরিক হইত, তবে তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সত্যই যাহারা চায় এবং সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের হাতেই ভারতের শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা নিজেদের দলবল গুটাইয়া লইতেন এবং বিদায়ের পথ দেখিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই; একান্ত অবান্তর রকমে সৌহার্দ্যের ভাণ ধরিয়াছেন এবং শেষে নিজেদের সিদ্ধান্তই ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারে এই ধরণের মাতব্বরী করিবার কোন অধিকার তাঁহাদের নাই এবং স্বাধীনতা লাভে জাগ্রত কোন জাতিই বিদেশীর এমন স্পর্ধা এবং উপদেষ্টাগিরির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয় না; কিন্তু ভারতবর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। সাম্রাজ্যবাদকে তাহারা উৎখাত করিতে পারে নাই, সুতরাং ভারতবাসীদিগকে ব্রিটেনের উপদেষ্টাগিরির এই আঘাত স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে এবং অতঃপর তদানুষঙ্গিক অন্যান্য দুঃখও তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। মহাত্মাজীর উক্তিতে তাঁহার অন্তরের এই বেদনাই অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু দীর্ঘ পরাধীন অবস্থার পীড়নে জাগ্রত ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন বেদনাকেই ভয় করে না। সাম্রাজ্যবাদীদের সকল অভিসন্ধি বিচূর্ণ করিয়াই সে অগ্রসর হইবে। ইহা সুনিশ্চিত। পরিশেষে শুধু সংগ্রামের এই মনোভাব লইয়াই কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

সিদ্ধান্তের স্বরূপ

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন এবং বড়লাটের যুক্ত বিবৃতিতে ১৪ জন সদস্য লইয়া অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, এই ১৪ জনের কাছে সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠানো হইয়াছে। নূতন গভর্নমেণ্টে যোগদান করিবার জন্য ১৪ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তিই পৃথকভাবে বড়লাটের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট

গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে—সর্দার বলদেব সিং, স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুত জগজীবন রাম, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ এম এ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাব, ডক্টর জন মাথাই, নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান, স্যার নাজিমুদ্দীন, সর্দার আবদুর রব নিস্তার, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। প্রথমত, এই কথা শোনা গিয়াছিল যে, বড়লাট পাঁচজন লীগ, পাঁচজন কংগ্রেস এবং একজন শিখ ও একজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্য—এই বারজনকে লইয়া গভর্নমেণ্ট গঠন করিবেন। তারপর কংগ্রেস পনেরজন সদস্য লইয়া গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে বারজনকে বড়লাটের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, ডাক্তার জাকির হোসেন এবং রাজকুমারী অমৃত কাউরের নাম বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে সর্দার আবদুর রব নিস্তার, স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার এবং শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাবের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং এই পরিবর্তন সাধন করিবার পূর্বে বড়লাট কিংবা মন্ত্রী মিশনের সদস্যগণ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করা পর্যন্ত আবশ্যক বোধ করেন নাই। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এই কথা বলা হইতেছে যে, কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সদস্যদের সম-সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হয় নাই, কিন্তু মুসলমান এবং বর্ণহিন্দুদের সম-সংখ্যার কূযুক্তি কর্তারা এক্ষেত্রে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা সুস্পষ্ট। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে যে কয়েকজন মুসলমান সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে, ইঁহারা সকলেই মোশ্লেম লীগের বড় বড় চাঁই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মোশ্লেম লীগ দলের নেতা এবং তাঁহার সহকারী দুইজনকেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে ইচ্ছাপূর্বকই বাদ দেওয়া হয়। সর্দার আবদুর রব নিস্তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লীগ দলের একজন প্রধান পাণ্ডা। তিনি এ বৎসরের নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন, তথাপি জনগণের সমর্থনে বঞ্চিত এবং তাহাদের দ্বারা ধিক্কৃত এই ব্যক্তিকে একমাত্র লীগের প্রতি মর্যাদা রক্ষার দায়ে সদস্য পদে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙলা দেশের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্বের অধিকার পান। সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তন বশংবদ স্যার নাজিমুদ্দীন। ইঁহারই প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে এবং শাসন পরিচালন নীতির মহিমায় বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; বস্তুত বাঙলা দেশ উৎসন্ন যায়। স্যার নাজিমুদ্দীনের প্রতি কর্তাদের এই নেকনজর তাঁহাদের অনুগত বাৎসল্যেরই পরিচায়ক; কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ইহাতে অবমাননা বোধ করিবে। পার্শী সমাজের পক্ষ হইতে স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ারকে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে লওয়া হইয়াছে; এক্ষেত্রেও অনুগত পোষণে সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তন নীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; ইহার উপর ইঁহার মনোনয়নে মিঃ জিন্নার নাকি সুপারিশ আছে। কিন্তু সে কথা পরোক্ষ; প্রধান কথা হইতেছে এই যে, পার্শী সমাজের মধ্যে অনেক স্বদেশপ্রেমিক, যোগ্যতর ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনায় সরকারের পক্ষ সমর্থনকারীর কৃতিত্বকে এইভাবে মর্যাদা দিয়া ভারতের জাতীয়তার প্রতি অবমাননারই আঘাত করা হইয়াছে। স্যার নওসেরওয়ান ভারত সরকারের এডভোকেট-জেনারেল। তিনি সরকারের গোলাম। জনসাধারণের তিনি প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং সর্দার আবদুর রব এবং স্যার নওসেরওয়ানকে দলে টানিয়া বড়লাট জনমতকেই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং মিশনের ঘোষণায় মূলীভূত নীতিকে লঙ্ঘন করিয়াছেন। কিন্তু নূতন সিদ্ধান্তের প্রকৃত দোষ এইখানেই নয়, এই উদ্যমের মূলে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি এই যে, কংগ্রেস ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান,—প্রকারান্তরে মুসলিম লীগের এই অযৌক্তিক দাবীকেই ইহার ভিতর দিয়া ভারতের শাসনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। মন্ত্রী মিশন এবং বড়লাট মোলায়েম ভাষায় আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, গুরুতর সব প্রয়োজনীয় কাজ করিতে হইবে, এজন্য শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন করা এখনই প্রয়োজন; সুতরাং তাঁহাদিগকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল; কিন্তু ভারতের জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা যাহাকে শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট বলেন, সঙ্গীনের জোরে তেমন কোন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট গঠন করা যায় না। তাঁহাদের এই সত্যটি অন্তত উপলব্ধি করা উচিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যমদবলে অন্ধ ইঁহারা তাহা করেন নাই; পক্ষান্তরে এইভাবে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনে কংগ্রেসকে আহবান করিয়া কার্যত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের সমগ্র পরিকল্পনাই অপরিবর্তিতভাবে কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মিশনের প্রস্তাবে যে বহু ত্রুটি রহিয়াছে, কংগ্রেস তাহা খুলিয়াই বলিয়াছে; কিন্তু মন্ত্রী মিশন কিংবা বড়লাট সেগুলি সংশোধন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং সেইভাবে অভিপ্রেত শাসনতন্ত্রের ফাঁদে ভারতবাসীদিগকে ফেলিবারই চক্রান্তই চলিয়াছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের গোঁ এখনও পড়ে নাই, এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীরাও অন্ধ নয়; তাহারা ভারতের প্রতি ব্রিটিশ প্রভুত্বের দরদের পরিসীমা দেখিয়া লইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কোনরূপ প্রতিকূলতাই স্বাধীনতার পথে তাহাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। এই একই লক্ষ্যকে ধ্রুবতারাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস নব অভিযানে অগ্রসর হইবে।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণে অনাচার

বাঙলা দেশের অন্নাভাব উত্তরোত্তর সংকটজনক আকার ধারণ করিতেছে। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ দিনাজপুর জেলার রাইগঞ্জ, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে চাউলের মূল্য কিছুই হ্রাস পায় নাই; পক্ষান্তরে কোন কোন স্থানে চাউল বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক সর্বত্র দেখা দিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী সেদিন আসন্ন সংকটে জনসাধারণকে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিতে আহবান করিয়াছেন কিন্তু জনসাধারণের সাহায্য পাইতে হইলে দেশে যেরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা আবশ্যক সরকারের খাদ্যনীতি নিয়ামকগণ তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রীর সর্বাগ্রে ইহ উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল। প্রথমত অভাব গ্রস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য যথোচি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হইতেছে না তদুপরি বণ্টনের ব্যবস্থা সমধিক ত্রুটিপূর্ণ ইহার পর অন্নাভাবের এমন নিদারুণ সংকটে সময় জনসাধারণের উপর যতসব অখাদ্য কুখাদ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা সরকারী গুদাম হইতে আজকাল যে চাউ সরবরাহ করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত নিকৃ শ্রেণীর। সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ হইতে এই সংব আসিয়াছে যে, সেখানকার সরকারী গুদামে ৪১ হাজার মণ পচা চাউল ১০ টাকা মণ দ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইতেছে। এ চাউল মানুষের খাদ্য নহে। আমরা এই ধরণে অভিযোগ এই নূতন শুনিতে পাইতেছি ন সরকারী খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ত্রুটি হাজার হাজার মণ চাউল আটা পচিয়া ন হইয়া যায় অথচ বুভুক্ষু নরনারীরা এক ম অন্নের দায়ে হাহাকার করে। এই নিষ্ঠুর দ

শুধু পরাধীন এই দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব চাউল বা আটা যথাসময়ে কেন বিতরিত হয় নাই কিংবা বাজারে ছাড়া হয় নাই, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। আমরা জানিতে পারিলাম, সরকারী খাদ্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার এই অনাচারের প্রতি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং যে সব কর্মচারীর দায়িত্ব-হীনতার জন্য খাদ্যশস্যের এইরূপ অপচয় ঘটে তাহাদের প্রতি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। আমরা জানি সরকারী গুদামে খাদ্যশস্যের যেভাবে অপচয় ঘটে, তাহার সব সংবাদ প্রকাশ পায় না; স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর দল সে সব খবর চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; এক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে তদন্ত হইলে অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ পায় এবং এইসব অনাচারের প্রতিকার ঘটে। বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল সরকারী কর্মচারীদের এই ধরণের অনাচার দমনে কঠোরহস্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল এ বিষয়ে নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতি ধরিয়াই চলিতে-ছেন। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বাঙলা দেশের খাদ্যনিয়ন্ত্রণে কর্মচারী মহলের দুর্নীতির প্রভাবের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন; অথচ সুরাবর্দী সাহেবের দৃষ্টি এখনও তৎপ্রতি উন্মুক্ত হয় নাই। দেখিতেছি, বাঙলার অসামরিক সরবরাহ সচিব খান বাহাদুর আবদুল গফরাণ সেদিন সিরাজগঞ্জে গিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, জনগণের পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা পুরাপুরিভাবে যোগাইবার ক্ষমতা বাঙলা সরকারের নাই; সুতরাং তিনি সকলকে স্বল্প আহার করিতে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশ দেওয়া খুবই সোজা; এদেশের অধিকাংশ লোকই যথেষ্ট খাদ্য পায় না, কম খাইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হয়। এক্ষেত্রে তাহাদিগকে আরও কম খাইতে উপদেশ দেওয়া না খাইয়া থাকিতে বলারই সামিল। নিজেদের উদর পূর্ণ থাকিলে এই ধরণের উপদেশ দিবার প্রবৃত্তিও প্রশ্রয় পায়; কিন্তু মন্ত্রী সাহেব নিজে এই উপদেশ অনুসারে চলেন কি? সরকারী গুদামে একদিকে খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হইতেছে, অন্যদিকে লোককে কম খাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, এই অবস্থার মধ্যে এখনও বাঙলা দেশ হইতে খাদ্যশস্য বাহিরে রপ্তানি করা হইতেছে। বেঙ্গল ম্যানুফ্যাকচারার্স ও ট্রেডার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক বি ব্যানার্জি এবং সম্পাদক শ্রীযুত দেবতোষ দাশগুপ্তের বিবৃতিতে প্রকাশ বাঙলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানি করা হইবে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ রক্ষা করা হয় নাই এবং যে পরিমাণ চাউল বাঙলা দেশ হইতে রপ্তানি করা হইয়াছিল, তাহা এখনও বাঙলা দেশকে নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি এমন উদাসীন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যে এখনও বাঁচিয়া আছি, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ; কারণ অন্য কোন দেশে এই ধরণের অব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাঁচে না।

আজাদ হিন্দ ও ব্রিটিশ

আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত আনন্দমোহন সহায় গত ১৪ই জুন শুক্রবার তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সতী দেবী ও কন্যা ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের সাব-অফিসার শ্রীমতী ভারতী সহায় এবং তাঁহার ভ্রাতা আজাদ হিন্দ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রীযুক্ত সত্যদেব সহায়ের সঙ্গে দীর্ঘ প্রবাসের দুষ্কর কর্মজীবন যাপনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা ভারতের এই বীর সন্তান এবং তেজস্বিনী দুহিতৃগণকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। এদেশের স্বাধীনতার জন্য শ্রীযুত আনন্দমোহন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের অবদান অসামান্য; ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহাদের সে অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং তাঁহারা যেরূপ বীরত্ব এবং ধৈর্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার ও নির্যাতন সুদীর্ঘ-কাল সহ্য করিয়াছেন, সব দেশের স্বাধীনতা-কামী সন্তানদিগকে তাহা অনুপ্রাণিত করিবে। ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও, হংকং এবং মালয়ে আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অদ্যাপি কিরূপ নির্যাতন চলিতেছে, শ্রীযুত আনন্দমোহন দেশে ফিরিয়া সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্বন্ধে যেরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতের বাহিরে তাহা অনুসৃত হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজকে এখনও শত্রুর মতই দেখিয়া থাকেন। শ্রীযুত আনন্দমোহনের এই বিবৃতিতে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই, শাসন-সূত্রে শোষণই যাহাদের চিরন্তন নীতি এবং সেই পাপ ব্যবসায়ে যাহারা এতদিন প্রশ্রয় পাইয়াছে, ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর সন্তান-দিগকে তাহারা যে শত্রুর দৃষ্টিতে দেখিবে, ইহা আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় জাগরণের উপরই তাহাদের এই মতিগতির পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আজ ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, স্বদেশের স্বাধীনতার পথে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ভারতবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে এবং দেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতন তাহারা বরদাস্ত করিবে না; অধিকন্তু যাঁহারা তেমন নীতি অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের শত্রুস্বরূপে পরিগণিত হইবেন এবং কাজেও এদেশে শত্রুর মত ব্যবহার পাইবেন।

শ্বেতাঙ্গদের মুরুব্বিয়ানা

ভারতবাসীরা যাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে, অবিলম্বে তেমন ব্যবস্থা করিবার জন্যই ব্রিটিশ মিশন এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা নিজেদের ঘোষণাতে এই কথা বলেন; কিন্তু নিজেদের ঘোষিত এই নীতি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা গণ-পরিষদে শ্বেতাঙ্গদিগকে স্থান দান করিতে ইতস্তত করেন নাই। তাঁহাদের ঘোষণা অনুসারেই দেখা যায়, ভারতের প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য এক-জন করিয়া প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইতেছে; কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সমাজের দশ হাজার লোককে ৬ জন প্রতিনিধিত্বের অসঙ্গত অধিকার দান করিয়া মিশন উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মিশনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চারি দিক হইতে আন্দোলন উত্থিত হয় এবং স্বয়ং গান্ধীজী এইরূপ ব্যবস্থার অসমীচীনতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। দিল্লীর একটি সংবাদে দেখিতেছি, অবশেষে বাঙলা এবং আসামের ব্যবস্থা পরিষদের শ্বেতাঙ্গগণ মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা গণ-পরিষদের ভোটদান ব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবেন না। এই সংবাদ এখনও পাকা বলিয়া জানা যায় নাই; এই সংবাদ যদি পাকা হয় ভাল। বাঙলা ও আসামের আইন সভার শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ কোন দিনই এ দেশের স্বার্থের দিকে তাকান নাই; পক্ষান্তরে দেশবাসীর অগ্রগতি-মূলক সকল রকম প্রচেষ্টায় প্রতিবাদী হইয়াছেন এবং বিদেশী আমলাতন্ত্রের সর্বপ্রকার স্বৈরাচারে সহায়তা করিয়া এদেশের লোকের দুঃখদুর্দশা এবং অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন। রক্ত মাংসের মানুষ আমরা বাঙলা ও আসামের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সে সব গুণের কথা ভুলিতে না। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে শ্বেতাঙ্গ-সমাজের কোন রকম সর্দারী আমরা মানিব না। ভারতবাসীদের রচিত শাসনতন্ত্র মানিয়া লইয়া শ্বেতাঙ্গগণ যদি এদেশে থাকিতে চাহেন, তবে ভাল; নতুবা নিজেদের মান মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকিতে থাকিতে এদেশ হইতে তাঁহাদের অবিলম্বে বিদায় গ্রহণ করাই কর্তব্য।

পনেরো

টেবিলের এক পাশে একটা সবুজ আলো জ্বলছিল। আলোটা ক্ষীণ—ঘর-খানাকে উদ্ভাসিত করে তোলেনি, বরং একটা স্বপ্ন ছায়ায় ম্লান করে রেখেছে। গোটা কয়েক ধূপকাঠি জ্বলছে টিপয়ের ওপরে—বন্ধ ঘরের ভেতর রুদ্ধ সুগন্ধি আবর্তিত হচ্ছে। শেল্‌ফের ওপরে টিক টিক করছে ঘড়িটা। দেওয়ালে মণিকাদির একখানা ছবি—প্রথম কৈশোরে যে বয়সে মানুষ নিজেকে ভালোবাসতে শেখে বোধ হয় সেই সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। তারপর কৈশোরের আত্মপ্রেমকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে বহু ঝড়, বহু ভূমিকম্প, বহু বিপর্যয়। শুধু সেদিনের ছায়ামূর্তি নিয়ে দেওয়ালে মণিকাদির ফোটোটা জেগে রয়েছে। সেসকালে মণিকাদির চেহারা নেহাৎ মন্দ ছিল না।

ওই ফোটোটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল অনিমেষ আর পায়ের কাছে তেমনি নীরবে বসে ছিল সুমিতা। একটা পুরু কাশ্মীরী র‍্যাগ অনিমেষের গলা পর্যন্ত টানা—পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর মতো ম্লানিমা। সুমিতা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকেই। বাইরে বর্ষণ-মন্দ্রিত শীতের রাত্রি যেন স্বপ্নময়ী হয়ে উঠেছে। কাচের জানালায় ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলক। শীতার্ত অন্ধকার কলকাতা মৃত্যু ভয়ে যেন অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে।

অনিমেষ আস্তে আস্তে বললে, পালিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি।

সুমিতা শুনে যেতে লাগল, জবাব দিলে না।

অনিমেষ আবার বললে, ওতে করে নিজেদের অপরাধটাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল। কাজটা ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে।

সুমিতার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাচ্ছিল। কিন্তু রবার্টস তোমাকে মারবার পরে কুলি রণবীরের ওখানে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল এ খবর তো কেউ জানত না।

—বাগানের ডাক্তার খোঁজ পেয়েছিল। লোকটা সাহেবের স্পাই—ওর নজর কেউ এড়াতে পারে না। এ সব গণ্ডগোল ওরই বাধানো।

—তা হলে?

—তাই ভাবছি। ওরা যা বোঝবার সোজা বুঝে নিয়েছে। রবার্টস আমাকে মারবার পরে আমি কুলিদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি—কুলিরা রবার্টসকে খুন করেছে। সুতরাং আমরা সবাই খুনী—আদিত্য দাও।

—কিন্তু সত্যিই তো তুমি জানতে না।

—না—আমরা কেউ কিছু জানতাম না। কুলিদের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওরা কারো কথা শোনবার অপেক্ষা রাখেনি। নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যেই ওরা অপরাধীর বিচার করেছে।

—কিন্তু এর ফল যে ভয়ানক হল।

—হল বইকি। এ পথ আমাদের নয়। একজন রবার্টসকে খুন করা আমাদের কাজ নয় —আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবী জুড়ে রক্তবীজ রবার্টসদের ঝাড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু ওরা ভুল করল—ভয়ংকর ভুল করল। একপা এগোতে গিয়ে আমরা তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

—তাহলে?

অনিমেষ ক্লান্তভাবে হাসল ঃ আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে। অনেক অপচয়ের ভেতর দিয়ে করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সুমিতা নীরবে চিন্তা করতে লাগল।

অনিমেষ বলে চলল, কিন্তু আমাদের দমে গেলে চলবে না সুমি। বিপ্লবের ধর্মই যে এই। শক্তি আমরা যত বেশী সঞ্চয় করব—স্থানে অস্থানে সে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেই। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটবে—আমরাও রেহাই পাব না। তারপর যেদিন শেষ বিপ্লব আসবে—সেদিন আমরা অনেকেই চূর্ণ হয়ে যাব বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তবীজেরাও একেবারে নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে। এ তারই ভূমিকা।

—কিন্তু আদিত্যদা?

—বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। অনিমেষ ব্যানার্জিকে খুঁজতে যাওয়ার সঙ্গে বাগানের ম্যানেজার খুন হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু দুর্ভোগ বইতেই হবে।

—আর তোমার?

—এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অনিমেষ, বড় একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। আবার সমস্ত ঘরটায় ঘনিয়ে এল সংকেতময় একটা নিস্তব্ধতা। ধূপদানীতে ধূপকাঠিগুলো পুড়ে পুড়ে ঘরময় গন্ধের ইন্দ্র-জাল বিকীর্ণ করতে লাগল—সবুজ ল্যাম্পের ম্লান আলো যেন বিবশ একটা বিশ্রান্তি ঘনিয়ে আনতে লাগল। বাইরে বৃষ্টি চলেছে সমানে—যেন আকাশ জোড়া একটা তার-যন্ত্রে মল্লারের মূর্ছনা অনুরণিত হচ্ছে। উত্তরে বাতাসে যেন পূবালি হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে—যুদ্ধ-শঙ্কিত বেদনার্ত কলকাতার চোখের জল আকাশ থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে। কাচের জানলায় তেমনি বিদ্যুতের চমক।

অনিমেষ ভাবছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী ঃ দরকার হলে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাও। সত্যি কথা—কোনো ভুল নেই, কোনো সংশয় নেই। বিপ্লব কখনো সোজা রাস্তায় তীরের মতো উড়ে চলে না। তার লক্ষ্য নিশ্চিত, কিন্তু গতি পথ সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা কুটিল। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।' কিন্তু প্রতীক্ষা করা যায় না—অপেক্ষা করা যায় না। কুলিরা হয়তো ভুল করেছে—কিন্তু একেবারেই কি ভুল করেছে? অপমানে যখন হাড়গুলো পর্যন্ত ইলেকট্রিক আগুনে জ্বলে যাওয়ার মতো পুড়ে যায়—যখন প্রতিটি মুখের গ্রাস লজ্জা আর ক্ষোভের অশ্রুতে নোনা বলে মনে হয়—যখন সহিষ্ণুতার পাত্র মানুষের নিজের রক্তেই পূর্ণ হয়ে ওঠে—তখন কজনে বিচার করে চলতে পারে? অপেক্ষা করতে পারে কয়জনে? ঠিক যে কারণে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের হাতে একদিন রিভলভার গর্জন করে উঠেছিল, কালাপানির পারে আর ফাঁসির মঞ্চে তারা জীবনের জয়গান গাইবার শক্তি অর্জন করেছিল, আজ সেই কারণেই কুলিদের 'কাঁড়' এসে রবার্টসের ফুসফুস ফুটো করে ফেলেছে। কাকে দোষ দেবে অনিমেষ? পিছিয়ে যেতে হল—কোনো ভুল নেই। কিন্তু পিছোতে পিছোতে এমন এক জায়গায় মানুষ এসে দাঁড়াবে—যেখান থেকে পিছিয়ে যাওয়া চলে না। তারপরে 'আগে কদম'! আঘাত করো—ভাঙো—মিথ্যার আর শোষণের যে দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাক্ষসের মতো নরবলি নিচ্ছে, তাকে সেখান থেকে উপড়ে এনে বিসর্জন দাও অতলান্ত সমুদ্রের জলে। সেই সিংহাসনে বসাও নতুন যুগের দেবতাকে, মানুষকে, সমাজকে। শেষ সংগ্রামে সেইদিন জয় হবে।

গভীর গলায় অনিমেষ বললে, সুমি, আমরা জিতবই। তুমি ভেবো না।

সুমিতা হঠাৎ মৃদু রেখায় হেসে ফেলল ঃ না, আমি ভাবব না।

ঘরে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

না, সুমিতা ভাববে না। সত্যিই তার ভাববার কী আছে। সে তো সেনাপতি নয়, সৈনিক। তাকে যে পথে চলবার নির্দেশ দেওয়া হবে সেই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পথের লক্ষ্য সে জানে, কিন্তু পথ জানে না। সে জানে অনিমেষ, আদিত্য—আর পৃথিবীর বিপ্লবীরা—দেশ-দেশান্তের, যুগ-যুগান্তের সূর্য-মন্ত্রের সাধকেরা।

তবু পথ চলতে বাধা আসে। বাধা দেয় রমলা, বাধা দেয় শীলা। শীলা মরে গেছে, রমলা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বাসুদেবকে। একজন পথ খুঁজে পেল অপমৃত্যুর মধ্যে, আর একজন পথ খুঁজে নিলে দৈনন্দিন জীবনের মৃত্যুর মতো সংকীর্ণতার অন্তরালে। সুমিতা জানে ওরা দুজনেই পথভ্রষ্ট—রমলার পরিপূরক শীলা। তবুও পতঙ্গের মতো মন উড়ে যেতে যায়—পুড়ে মরতে চায়। আজও সুমিতা নিজেকে জয় করতে পারল না!

আজকের এই রাত্রি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন ঘরে সে আর অনিমেষ। সুমিতার মনে হল এ তাদের বাসর রাত্রি। তিন বছর আগে—তিন বছর আগে এমন একটি নির্জন ঘরে বর্ষাতরঙ্গিত রাত্রিতে যদি তার সঙ্গে অনিমেষের দেখা হত, তাহলে কী হত?

কী হত? ভাবতেও সমস্ত শরীর একটা নিষিদ্ধ আনন্দের নেশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু তিন বছর আগের রাত্রি আর নেই। এ তাদের বাসর বটে; কিন্তু লোহার বাসর। বাইরে বৃষ্টিতে স্বপ্নের মূর্চ্ছনা তার কানে এসে বাজছে না—যেন ক্রূর কুটিল একটা চক্রান্তের আভাস সে পাচ্ছে। উত্তর বাতাসে স্নিগ্ধ আমেজ নেই, মনে হচ্ছে লোহার বাসরের চার পাশে ঘিরে ঘিরে কালী নাগিনীরা গর্জে বেড়াচ্ছে—একটা ছিদ্রপথ পেলেই সেখান দিয়ে এসে লখীন্দরকে দংশন করবে।

এ কী করল সুমিতা। এ কোন রাহুর প্রেমে জড়িয়ে পড়ল। আজ মনে হচ্ছে এ পথ তার ছিল না। অতি কঠোর, অতি নিষ্ঠুর। সহজ স্বাভাবিক প্রেম—রমলার মতো ভালোবাসাকে জীবনে কেন মেনে নিতে পারল না? পুড়ে মরত? পুড়ে মরাই যদি পতঙ্গের ধর্ম হয় তবে আলোক তীর্থের পথে তার এই অভিযান কেন? তার পাখা ছিঁড়ে পড়ছে—সে আর সহ্য করতে পারছে না।

অনিমেষ ডাকলে, সুমি?

সুমিতা চমকে উঠল। বহুদিন পরে এমন কোমল গলায় এত মিষ্টি করে অনিমেষ তাকে ডেকেছে। রক্ত যেন ঝন ঝন করে উঠল। একটা রাত্রে ব্যতিক্রম হলে ক্ষতি কী। বিপ্লবীর জীবন কি এমনই শূন্যচারী যে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে সে মাটির কাছে নেমে আসতে পারে না? অথবা সে জীবন সমগ্রব্যাপী মহাজীবনের সাধনা করে বলে প্রতি দিনের ছোট বড় কামনার একটি ঝরা পাঁপড়িও কুড়িয়ে নিতে রাজী নয়?

অনিমেষ আবার ডাকলে সুমি?

সুমিতা কথা বললে না, শুধু কথার আলোয় উজ্জ্বল দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি অনিমেষের চোখের ওপরে ফেলল। ঘরে সবুজ আলোটার দীপ্তি তার দৃষ্টিকে আরো ঘন, আরো নিবিড় করে তুলল।

অনিমেষ বললে, কাছে এসো।

সুমিতার হৃৎপিন্ড দুটো প্রাণপণে শব্দ করতে লাগল, মনে হল কী একটা অসহ্য উদ্দাম আবেগে যেন তারা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়বে। আজ তার প্রথম মিলন রাত্রি এল নাকি। বিপ্লবী যাত্রী সূর্যোদয়ের দিগন্তে যাত্রা করবার পথে একটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাকে কি উপহার দিয়ে গেল?

নিরুত্তরে সুমিতা এগিয়ে এল, বসল অনিমেষের পাশে।

আজ তিন বছর পরে অনিমেষ সুমিতার একখানা হাত টেনে নিলে বুকের ওপরে। বরফের মতো ঠান্ডা হাতে অনিমেষের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগল—মনের মধ্যেও কোথায় যেন জমাট তুষারকণা তরল হতে সুরু করেছে সুমিতার।

অনিমেষ বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

চাপা গলায় ফিস ফিস করে জবাব দিলে সুমিতাঃ না, কষ্ট আর কী।

—জানি, তোমার ভালো লাগে না, কষ্ট হয়—ঘরের জন্যে মন টানে। কী হতে পারতে, অথচ কী হয়ে গেলে।

সুমিতা চোখ বুজে অনিমেষের বিচিত্র স্পর্শানুভূতিটা যেন নিজের চেতনার মধ্যে সঞ্চার করে নেবার চেষ্টা করছিল। তেমনি চাপা গলায় জবাব দিলে, না।

অনিমেষ হাসলঃ তার চেয়ে সেই রণেশ চৌধুরীকে অনুগ্রহ করলে আজ কোনো ঝঞ্ঝাট তোমার থাকত না। বড়লোকের ছেলে—বহুদিন মোটর নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরেছিল, অনেক সাধনা করেছিল। চৌধুরী-গিন্নী হলে আজ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতে।

সুমিতার চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আসছিল। কথা বলবার কিছু নেই—বলবার প্রেরণাও নেই। যুগ যুগান্তরের ক্লান্তি যেন আজ তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

অনিমেষ বললে, সুমি, অনেকের ঘর বাঁধবার জন্যে আমাদের ঘরটাকে নিতান্ত বাজে খরচ করতে হল। কিন্তু কে জানে—হয়তো সুযোগ আমাদেরও আসবে। আমরা সন্ন্যাসী নই—কিন্তু যুদ্ধ যখন সুরু হয়েছে, তখন রাইফেল ছাড়া আর কী ভাবতে পারি, বলো?

সুমিতা কিছুই বললে না। শুধু অনিমেষের বুকের ওপর নিজের মাথাটাকে এলিয়ে দিলে—বহুদিনের বহু অনিদ্রা সুযোগ পেয়ে আজ তার ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অসুস্থতা আর ক্লান্তি অনিমেষকেও কি দুর্বল করে ফেলেছে? মুহূর্তের জন্য সমস্ত মনটা তার বিদ্রোহ করে উঠল। কিন্তু সবুজ ল্যাম্পের স্বপ্নচ্ছায়া ছড়িয়েছে সুমিতার মুদিত চোখে, তার ম্লান মুখের ওপরে। রুক্ষ চুল থেকে কতদিন আগেকার একটা তেলের ক্ষীয়মান গন্ধ এসে মিশছে ঘরের ধূপের গন্ধের সঙ্গে—মণিকাদির কৈশোরে তোলা ছবিখানা যেন সকৌতুকে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ সস্নেহে সুমিতার চুলের ভেতরে আঙুল বুলাতে লাগল।

বাইরে কালী-নাগিনীর বিষ নিশ্বাস থেমে গেছে। কুটিল চক্রান্তের গুঞ্জন ছাপিয়ে রণিত হচ্ছে মল্লারের সুর। আজ সুমিতার বাসর। সুমিতা জানে এই প্রথম, এই শেষ। কাল থেকে অনিমেষের সময় থাকবে না, তারও না। একটি রাত্রির বর্ষণেই তার মরুভূমি চিরশ্যামল হয়ে থাকবে—একটি ফুলের গন্ধ তার চেতনাকে চিরদিন ঘিরে রাখবে। রাত্রির তমসা-তোরণ ভেদ করে যতক্ষণ সূর্য-সারথির আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিমির-যাত্রায় এই তার পাথেয় হয়ে থাক।

আজ হাসপাতালে মণিকাদির নাইট ডিউটি, সকালের আগে ফিরবে না।

* * *

বিলাতী সিনেমার বক্সে বসেছিল বাসুদেব আর রমলা।

সামনে সাদা পর্দায় মিউজিক্যাল কমেডির উত্তাল উল্লাস চলেছে। সমস্যাহীন জীবনে—বন্ধনহীন প্রেমে। ফ্ল্যাটে, মোটরে, হোটেলে, জাহাজে, সমুদ্রের ধারে। পৃথিবীতে এখন আর কিছুই নেই। এয়ারকন্ডিশনড্ ঘরের উত্তপ্ত আবহাওয়া সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। পুরু কুশন, দামী শীতের পোষাক আনন্দিত অনুভূতিটার তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

জীবন কত সহজ—কত নির্ঝঞ্ঝাট। ফুলের মতো সুন্দর পৃথিবী। ভালোবাসো, ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠো। অর্কেস্ট্রার তালে তালে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দাও—দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে নাচের ছন্দে অপূর্ব ভঙ্গিতে লীলায়িত করে তোলো, পুরুষের দেহে রক্তধারা উদ্বেল-উল্লাসে নাচতে শুরু করে দিক। তোমাদের মিলন-শয্যা বিছিয়ে আছে সী-বীচে, পাম-গ্রোভে, আলোকোজ্জ্বল

হোটেলে আর ক্যাবারেতে। পৃথিবীতে চির-তারুণ্যের কন্দর্প-উৎসব চলেছে।

বাসুদেব আস্তে আস্তে রমলাকে স্পর্শ করলে।

—তোমার ভালো লাগছে?

জড়িত মৃদুগলায় রমলা জবাব দিলে, হুঁ।

—কতদিন যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম? আজ যদি তুমি আমার জীবনে দেখা না দিতে, তা হলে হয়তো ওই হাইড্রোসায়ানিক—

বাসুদেবের মুখে হাত চাপা দিয়ে রমলা বললে, ছিঃ, চুপ করো।

বাসুদেব বললে, চুপ করব না। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, নতুন করে গড়ে তুলেছ আমাকে। আজ আমার জন্মান্তর।

রমলা বললে, আমারও।

রমলার আঙুলগুলো নিজের আঙুলের ভেতরে জড়াতে জড়াতে বাসুদেব বললে, জানো, আজকাল আমি রীতিমতো রোমাণ্টিক হয়ে উঠেছি।

—কবে তুমি রিয়্যালিস্টিক ছিলে?

—মনে নেই। আজ ভাবছিঃ "আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল-প্রেমের স্রোতে"—

রমলা বললে, থামো, কাব্যি রাখো। পাশের বক্সের ভদ্রলোক কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছো না?

—হি ইজ জেলাস। আহা বেচারা, আই পিটি হিম।

এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘরের ভেতরে চুরুট, প্রসাধন আর বিলিতি মদের চাপা গন্ধ ভাসছে একসঙ্গে। সমুদ্রতীরে নারিকেল-বীথি মর্মরিত হয়ে উঠছে, বালুবেলার ওপরে তরঙ্গে তরঙ্গে সফেন রোলার ভেঙে পড়ছে। নারিকেল-পুঞ্জের ভেতর থেকে যে বিচিত্র লতার পোষাক পরে নায়িকা বেরিয়ে এল সে পোষাকের অর্থ দেহশ্রীকে আবৃত করা নয়, তাকে আরো পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা। হঠাৎ কোথা থেকে চিতাবাঘের জাঙিয়া-পরা নায়ক এসে দেখা দিলে। তারপর মিলনের উত্তেজক রোমান্স। দর্শকদের রক্তে যৌবন কথা কয়ে উঠছে—পুরু গদী-আঁটা চেয়ারে বসে অদ্ভুত ভালো লাগছে প্রশান্তসাগরীয় স্বপ্নলোককে। রমলার হাতের ভেতর বাসুদেবের স্পর্শ ক্রমশ যেন মুখর হয়ে উঠছে।

বাসুদেব রমলার কাণের কাছে মুখ এনে বললে, যুদ্ধ থামলে আমরা ম্যানিলায় বেড়াতে যাব। নতুন করে আমাদের হনিমুন হবে ওখানে।

—বেশ।

কিন্তু যুদ্ধ থামলে! কথাটা রমলার কাণে যেন খট করে বিঁধল। যুদ্ধ থামলে! কী বলেছিল সুমিতা, কী বলেছিল আদিত্য-দা? যুদ্ধ থামলে নতুন যুগ আসবে আমাদের, আসবে নতুন জগৎ। সেদিন পরাধীনতা থাকবে না, অপমান থাকবে না, শোষণ থাকবে না। সেদিন আমরা আগামীকালের মানুষের জন্যে আগামী দিনের সমাজ গড়ে তুলব। আজ তার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি চাই—প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে। আর তারই প্রতিধ্বনি করে ইন্দু লিখেছিলঃ

ছেঁড়া তারে ঘেরা ভাঙা ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে
মৃত-সৈনিক ঊষার স্বপ্ন দেখে—

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

হাতে চাপ দিয়েছে বাসুদেব। কণ্ঠ মৃদু মৃদু কাঁপছে উত্তেজনায়ঃ দেখেছ, কী রকম এক্সাইটিং। মেয়েটা কী দারুণ ককেট্।

এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এল রমলা। ওসব ভেবে আর কোন লাভ নেই বাস্তবিক। যা হারিয়ে গেছে তা হারিয়েই যাক, যা পেছনে পড়ে আছে তা পেছনেই পড়ে থাকুক। সবাই সৈনিক হতে পারে না, রমলাও পারেনি। তার জন্যে অপরাধবোধ কেন? সুমিতাদি বৃহত্তমের সন্ধানে ছুটেছে, নিজের ছোট গণ্ডিটুকুতেই পরিতৃপ্ত আর পরিপূর্ণ হয়েছে রমলা।

সুমিতার নতুন যুগ যত দূরে—তার চাইতে রমলার ম্যানিলা হয়তো অনেক কাছে। সুতরাং এয়ারকণ্ডিশন্ড ঘরে গদীআঁটা চেয়ারে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল রমলা। সামনে ম্যানিলার নারিকেল বীথিতে চলেছে যৌবনের নির্লজ্জ উৎসব—জীবনে এ সত্যকেও তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

না—রমলা অস্বীকার করতে চায়ও না।

সিনেমা শেষ হল। বাসুদেব ট্যাক্সি ডাকলে।

রমলা বললে, কোথায় যেতে চাও?

—আমার বাড়িতে।

—ছিঃ, সেটা কি ভালো হবে? এখনো বিয়ে হল না—

—তার জন্যে কী হয়েছে? অত বড় বাড়ি আমার—লোকজন নেই তো। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ভেবেছো, কালই রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্ত করব।

—কিন্তু—

—তুমি বড় ভাবছ মনু। কালই তুমি আমার হচ্ছো, আর শুদ্ধু আজকের রাতটা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আর যাবেই বা কোথায়? ফিরতে হলে তো তোমাদের বিবেকানন্দ রোডের সেই পার্টি-অফিসে—

সাপের কামড় খাওয়ার মতো রমলা চমকে উঠ্ল।

—না, না যাব। তোমার ওখানেই চলো।

ট্যাক্সি চলল। শীতার্ত রাত্রি—চারদিকে চলেছে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। অর্ধাবগুণ্ঠিত আলোগুলো বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—যেন কতগুলো মড়ার চোখ শুধু জেগে আছে কলকাতার ওপরে। বাসুদেব দুহাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছে রমলাকে। বৃষ্টি-ভেজা পথ মোটরের চাকার নীচে ছিট্কে ছিট্কে সরে যাচ্ছে।

এমন সময় হাড়কাটা গলি থেকে বেরুল হেমন্তবাবু।

নেশায় একেবারে চুরচুরে হয়ে গেছে—ভালো করে চলতে পারছে না। যার ঘরে ছিল, পকেটগুলো বেশ করে হাতড়ে নিয়ে সে হেমন্তবাবুকে বার করে দিয়েছে রাস্তায়। তারও ক্লান্তি আছে, শীতের রাত্রে লেপের মধ্যে প্রেমের মতো একটা স্নিগ্ধ ঘুমে মগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রলোভন আছে। তা ছাড়া হেমন্ত-বাবুর সঙ্গে শাঁস নেই—সারারাত একটা ভবঘুরে বুড়ো মাতালকে বরদাস্ত করাও শক্ত।

অতএব হেমন্তবাবু বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।

টলতে টলতে একটা লাইট পোস্টকে আঁকড়ে ধরলে, তারপর আবার ছিট্কে সরে এল সেখান থেকে। ছেঁড়া ফ্ল্যানেলের জামার ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে হাড়ের মধ্যে—এমন চমৎকার নেশাটার ভিৎ অবধি কাঁপিয়ে তুলছে। মাথার ওপরে টপ টপ করে পড়ছে শীতের বৃষ্টি। অবচেতনভাবে হেমন্তবাবুর মনে হতে লাগলঃ এই রাত্রে এমন শীতে পথে পথে বেড়ানোটা কোন কাজের কথা নয়। কোথায় যেন তার জন্যে একটা আশ্রয় আছে, একটা উত্তপ্ত বিছানা আছে—যেখানে গিয়ে একটা পলাতক কুকুরের মতো সে লুকিয়ে থাকতে পারে। সেখানে গেলে একখানা লেপ সে পাবে—হিমে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আসা হাত-পা-গুলো উষ্ণতার আরাম পাবে, মাথাটা সেখানে এমনভাবে ভিজবে না। কিন্তু সে কোথায়, কতদূরে? নেশটা বড্ড বেশি হয়েছে হেমন্তবাবুর, কিছুই ভালো করে মনে পড়ছে না।

সপ্—

জুতোশুদ্ধু পা-টা পড়ল জলের মধ্যে। জুতো তো গেলই, জল মুখে চোখে পর্যন্ত ছিট্কে এল। খানিকটা দুর্গন্ধ পচা জল—বোধ হয় কোনো ডাস্টবিন্ থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে এসেছে।

শালার—একটা অশ্লীল গাল দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে হেমন্তবাবু। (ক্রমশঃ)

থার্মোমিটার ও টেম্পারেচার.

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যন্ত্রশালায় যত রকমের কৌশলপূর্ণ ও কুশলকারী যন্ত্র আছে তার মধ্যে জ্বর দেখার থার্মোমিটারকে একটি শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হিসাবে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া যেতে পারে। বহু প্রকার রোগের জ্বরই হলো সর্বপ্রধান লক্ষণ, আর সেই জ্বরের উত্তাপকে নিখুঁত-ভাবে মেপে দেখবার একমাত্র উপায় থার্মোমিটার। জ্বর মানেই দেহের উষ্মা। যে-রোগে দেহের যতখানি উষ্মা ঘটবে, ততই তার উত্তাপ বাড়বে। থার্মোমিটার যন্ত্র সেটা মেপে বলতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রের দ্বারা জ্বরের মাত্রা বুঝে রোগের প্রাবল্য কতখানি তাই যে কেবল নির্ণয় করা যায় তা নয়, নিয়মিতভাবে এর দ্বারা রোগীর সাময়িক উত্তাপ পরীক্ষা করে এবং পূর্বাপর জ্বরের উত্থানপতনের গতিবিধি পর্যালোচনা করে অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় যে, রোগটির কখন্ কতখানি পর্যন্ত বৃদ্ধি হচ্ছে আর কখন্ থেকে কেমনভাবে তার উপশম হচ্ছে। এগুলি চিকিৎসকের পক্ষে প্রয়োজন তো বটেই, কারণ এর দ্বারা তিনি রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার পন্থা সম্বন্ধে অনেক নির্দেশ পান, আর আরব্ধ চিকিৎসার ফলাফল কেমন হচ্ছে তাও বিচার করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকেও থার্মোমিটারের সাহায্যে অনেক উপকার পায়। জ্বরের মাত্রা দেখে তারাও বুঝতে পারে যে, রোগের গুরুত্ব কতখানি এবং তাকে সামান্য ভেবে তাচ্ছিল্য না করে কতখানি সাবধানে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, রোগীর মনে আরোগ্যের আশা জাগাবার পক্ষে থার্মোমিটার এক অব্যর্থ কলকাঠি। সহস্র স্তোকবাক্যও যা করতে পারে না, থার্মোমিটারের একটিমাত্র নির্দেশ তাই করতে পারে। ওর উত্তাপ-মানের পারদরেখা যত ডিগ্রি নীচে নামতে থাকে, রোগীর মনের আশা ও আনন্দ তত ডিগ্রি উপরে উঠতে থাকে। টাইফয়েড রোগীদের পক্ষে এবং বিশেষ করে ক্ষয়রোগীদের পক্ষে এর উপকারিতা যে কতখানি, তা আর বলবার নয়। সকলেই তাই একান্তমনে এরই নির্দেশের উপর নির্ভর করে থাকে। সকলেই জানে যে, থার্মোমিটার কখনো ভুল কথা কিংবা মিথ্যা কথা বলে না।

যন্ত্রটিকে যদিও এখন খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু প্রথমে কয়েক শতাব্দী ধরে বহু বৈজ্ঞানিকের বহু চেষ্টার ফলে এই যন্ত্রটির আবিষ্কার হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে আদিম তাপমান যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। চারিদিক বন্ধ একটি কাচের পাত্রে লাল জল দিয়ে আংশিকভাবে পূর্ণ করা হয়, তার মধ্যে ডোবানো থাকে একটি মাত্রা-চিহ্নিত কাচের সরু নল। পাত্রের ভিতরকার শূন্য অংশের বায়ু উত্তাপের দ্বারা প্রসারিত হলেই তার চাপে নীচেকার লাল জল নলের মধ্যে ঠেলে উঠতে থাকে, তার পরিমাপ দেখলেই বোঝা যায় কতটা উত্তাপ বেড়েছে। আবার ঠান্ডায় সেই ভিতরকার বায়ু সংকুচিত হলেই নলের মধ্যস্থ লাল জল তদনুযায়ী নীচে নেমে আসে, তখন বোঝা যায় উত্তাপ কতটা কমেছে। এর শতাধিক বছর পরে ১৭১৪ সালে ফারেনহিট নামে দানজিগ শহরের এক কারিকর ডিগ্রির মাপ কেটে কেটে এক থার্মোমিটার প্রস্তুত করেন এবং বরফের সঙ্গে নুন মিশিয়ে যতখানি পর্যন্ত ঠান্ডা করা যায় তাকেই তিনি ধরে নেন শূন্য ডিগ্রি বলে। এই ফাহরেনহিট নামটি চিরস্মরণীয় রাখবার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারেই এখনও আমরা জ্বরের তাপ নির্দেশ করে থাকি এবং আমাদের গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপের পরিমাণ সেই মাত্রা অনুসারেই বলে থাকি ৯৮·৪° এফ্ (98.4° F)। টেম্পারেচার সংখ্যার সঙ্গে 'এফ্' অক্ষরটি প্রয়োগ করা হয় তাঁরই নামের স্মরণার্থে। তাঁর তখনকার নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী বলা হতো যে-জল ৩২° ডিগ্রিতে বরফ হয়ে জমে এবং ২১২° ডিগ্রিতে সিদ্ধ হয়ে ফুটতে থাকে। কিছুকাল পরে সেলসিয়স নামে এক ব্যক্তি এই মাত্রা নির্দেশের পরিবর্তন করেন। ফাহরেনহিটের মাত্রা নির্দেশ উল্টে দিয়ে তিনি ফুটন্ত জলের মাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি বলে ধরে নিলেন এবং জলের বরফ জমা অবস্থার টেম্পারেচারকে ১০০° ডিগ্রি বলে ধরলেন। অর্থাৎ উত্তাপের সর্বোচ্চ সীমাকে তিনি ধরলেন শূন্য ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন সীমাকে ধরলেন একশত ডিগ্রি। পরবর্তীরা দেখলেন যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দুটি সীমার মধ্যবর্তী উত্তাপের ন্যূনাধিক্যের মাত্রাকে মেপে দেখবার জন্য তাকে পুরাপুরি একশত ডিগ্রিতে ভাগ করে নেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক—কিন্তু সেল-সিয়সের পদ্ধতি পুনরায় উল্টে দিয়ে তাঁরা জলের বরফ জমার টেম্পারেচারকে ধরে নিলেন শূন্য ডিগ্রি এবং ফুটন্ত অবস্থার টেম্পারেচারকে ধরলেন ১০০° ডিগ্রি। বৈজ্ঞানিক মহলে এখন এই পদ্ধতিটাই প্রচলিত, একে বলা হয় সেণ্টিগ্রেড (শতভাগে বিভক্ত) মাত্রা। অনেক দেশে জ্বর দেখবার জন্যও এই সেণ্টিগ্রেড মাত্রাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনুকরণে ফাহরেনহিটের মাত্রাই ব্যবহার করে থাকি। সেণ্টিগ্রেড মাত্রা অনুযায়ী আমাদের শরীরের স্বাভাবিক টেম্পারেচার ৩৭° ডিগ্রি, কিন্তু ফাহরেনহিটের মাত্রা অনুযায়ী সেটা দাঁড়ায় ৯৮·৬° ডিগ্রি। সেণ্টিগ্রেড ও ফাহরেনহিটের প্রত্যেক ডিগ্রির মাত্রার মধ্যেও অনেকখানি পার্থক্য আছে।

আমাদের স্বাভাবিক টেম্পারেচার যদিও ৯৮·৪ কিংবা ৯৮·৬ বলেই নির্দেশ করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সুস্থ অবস্থাতেও ৯৭° থেকে ৯৯° ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করতে থাকে। সেটা নির্ভর করে শরীরের ভিতরকার রক্ত চলাচলের সাময়িক অবস্থার উপর এবং বাইরের আবহাওয়ার টেম্পারেচারের উপর। ভোরের দিকে প্রায়ই সকলের টেম্পারেচার একটু কমে এবং বিকালের দিকে একটু বাড়ে। তবে সুস্থ অবস্থায় এটা ৯৭-এর নীচে যাওয়া উচিত নয় কিংবা ৯৯-এর উপরে উঠা উচিত নয়। কিন্তু রোগের বিভিন্ন অবস্থায় এটা অস্বাভাবিক রকমে নীচে নেমে কিংবা উপরে উঠে যেতে পারে। এমন রোগী দেখা গেছে, যার টেম্পারেচার ৭৫° ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে গেছে, আবার এমনও দেখা গেছে, যার ১১৫° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে গেছে এবং তা সত্ত্বেও তারা পরে বেঁচে উঠেছে। দেহের উত্তাপ ৯৯° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠলেই আমরা তাকে জ্বর বলি, কিন্তু কারো কারো স্বাভাবিকই টেম্পারেচার ৯৯° ডিগ্রি পর্যন্তও হতে দেখা যায়। অন্যান্য জন্তুদের স্বাভাবিক টেম্পারেচার আমাদের চেয়ে কিছু বেশি। ঘোড়ার স্বাভাবিক টেম্পারেচার ৯৯॥°, গরুর ১০১॥°, ভেড়ার ১০৪॥°, শূয়রের ১০২°, কুকুরের ১০১°, খর-গোসের ১০২॥°, আর মুরগির স্বাভাবিক টেম্পারেচার ১০৭° ডিগ্রি। মাছের টেম্পারেচার খুব কম, প্রায় ৫২° ডিগ্রি।

পূর্বকালে উত্তাপের উত্থানপতনের বিশেষত্বের প্রতি কারো বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। যদিও খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বছর আগে হিপোক্রেটিস বলেছিলেন যে, শরীর অসুস্থ হলে জ্বর হয়, আর রোগীর বগলে হাত দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তার জ্বর হয়েছে কিনা, কিন্তু তখন সাধারণত নাড়ির বেগ দেখেই প্রত্যেক রোগের গুরুত্ব নির্ণয় করা হতো। আমাদের দেশেও বহুকাল থেকে এই প্রথাই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং এখন পর্যন্তও

কবিরাজরা টেম্পারেচারের অপেক্ষা নাড়ির নির্দেশকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। নাড়ি দেখার শিক্ষা এবং সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পটুত্বের অনেক দাম আছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সকলের পক্ষে সেই পটুত্ব অর্জনের শক্তি সমান থাকে না এবং সকল রকমের জ্বরেই যে-নাড়ির অবস্থা থেকে সকল সময় নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায় তাও নয়। তাই সেকালের কোন কোন পণ্ডিত মনে করতেন যে, নিজের অনুভূতির উপর নির্ভর না করে জ্বর পরীক্ষার জন্য কোন একটা যন্ত্রের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। ১৬২৫ সালে স্যাংক্টোরিয়াস নামে একজন ইটালিয়ান পণ্ডিত আবিষ্কার করলেন জ্বর-দেখা এক ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার, আর সুস্থ এবং রোগের অবস্থায় টেম্পারেচারের কতখানি পার্থক্য হয় তাই নিয়ে অনেক গবেষণা করে এক পুস্তক প্রকাশ করলেন। তখনকার দিনে যে থার্মোমিটার প্রস্তুত করা হয়েছিল, তা ছিল এক ফুট লম্বা আর আধ ইঞ্চি পুরু। এর প্রায় একশত বছর পরে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে একজন জার্মান পণ্ডিত বললেন যে, রোগনির্ণয়ের জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করা উচিত, কারণ শরীরের বাইরের উত্তাপ দেখে ভিতরের রোগের অবস্থা সঠিক-ভাবে অনুমান করা যায়। তাঁরই একজন শিষ্য ১৭৫০ সালে ভিয়েনার হাসপাতালে প্রথম থার্মোমিটার ব্যবহারের সূত্রপাত করেন। তখন কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক টেম্পারেচার কত, তার কোন একটা সঠিক ধারণা ছিল না। কেউ কেউ বলতেন, স্বাভাবিক টেম্পারেচার বোধ হয় ১০৮° ডিগ্রি। ১৭৯৭ সালে জেমস কুরি কোন্ রকম জ্বরে কত টেম্পারেচার হয়, এই নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন। অবশেষে ১৮৩৫ সালে একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের স্বাভাবিক টেম্পারেচার ৯৮·৬° ডিগ্রি। তখন থেকে থার্মোমিটার নিয়ে অনেক রকমের পরীক্ষা চললো। ১৮৬৮ সালে দুইজন জার্মান পণ্ডিত পঁচিশ হাজার মানুষের টেম্পারেচার নিয়ে লক্ষাধিক পরীক্ষার পর সাব্যস্ত করলেন যে, টেম্পারেচার স্বাভাবিকের অপেক্ষা অর্থাৎ ৯৮·৬° ডিগ্রির অপেক্ষা বাড়লেই জ্বর বোঝায়, আর জ্বর মাত্রকেই নিশ্চিত কোন রোগের লক্ষণ বলে বোঝায়। রিংগার নামে একজন বিলাতি চিকিৎসক বললেন যে, থার্মোমিটারের দ্বারা টেম্পারেচার দেখে লুকানো ক্ষয়রোগ চেনবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়।

কিন্তু তখনকার দিনে টেম্পারেচার দেখাই একটা হাঙ্গামার বিষয় ছিল। থার্মোমিটার রোগীর গায়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে থাকতেই যন্ত্রের ভিতরকার পারদরেখা কোন্ সীমা পর্যন্ত উঠেছে, সেটা দেখে নিতে হতো, কারণ থার্মোমিটার বের করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই

...ার পারদরেখা তৎক্ষণাৎ সংকুচিত হয়ে নেমে যেতো। জেমস কুরি এইজন্য থার্মোমিটারের মধ্যে একটুকরা লোহখণ্ড ঢুকিয়ে দিতেন। টেম্পারেচার যতখানি পর্যন্ত উঠতো, লোহার টুকরাটি সেইখানে গিয়ে আটকে থাকতো, সেটা দেখে নিয়ে আবার ঝেড়ে ঝেড়ে তাকে নীচে নামিয়ে দিতে হতো। অতঃপর থার্মোমিটারের পারদাধারের উপরে এক জায়গায় ভিতরকার নলটি এমনভাবে সরু এবং সংকুচিত করে দেওয়া হলো যাতে পারদরেখা উত্তাপের তাড়নায় ঠেলে উপরের দিকে সহজেই উঠে যায়; কিন্তু নামবার সময় আর ঐ সংকুচিত স্থানটিকে অতিক্রম করে সহজে নীচে নেমে আসতে না পারে। ঐ পারদরেখাকে ঝেড়ে ঝেড়ে আবার নীচ নামাতে হয়। এমনিভাবেই আজ-কাল আমরা থার্মোমিটার ব্যবহার করে থাকি। প্রত্যেক বারেই জ্বর দেখবার পূর্বে থার্মো-মিটার ঝেড়ে নিতে হয়। আজকাল এমন উপায়ের আবিষ্কার হয়েছে, যাতে না ঝেড়েও পারদরেখা অন্যভাবে নামানো যায়, তবে সাধারণের মধ্যে তার চল হয়নি।

নিখুঁত থার্মোমিটার প্রস্তুত করা খুব সহজসাধ্য নয়। ওর পারদাধারের জন্য এক রকম স্বতন্ত্র কঠিন কাচের দরকার হয়, সেই কাচ প্রস্তুত করতে অনেক মেহনত করতে হয় এবং তাতে অনেক সময় লেগে যায়। কাঁচা অবস্থার কোন কাচ থেকে থার্মোমিটার প্রস্তুত করা যায় না। কারণ তার মধ্যে পারদ রাখলে কিছুদিন পরেই সেটা এমন সংকুচিত হয়ে যায় যে তাতে টেম্পারেচারের তারতম্য ঘটে, অল্প উত্তাপেই পারদরেখা অনেকখানি উঠে যায়। আবার থার্মোমিটারের ভিতরকার চুলের মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রপথটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমান মাপের করাও খুব কঠিন। প্রায়ই সেটা অল্পবিস্তর সরুমোটা হয়ে যায়, সুতরাং তাতে ডিগ্রির মাপকে তদনুযায়ী স্থানে স্থানে হ্রস্বদীর্ঘ করে চিহ্নিত করতে হয়। সস্তার থার্মোমিটারে এই সকল নানা কারণে অল্প-বিস্তর ভুলচুক হয়েই থাকে। দামী থার্মোমিটার যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত করা হয় বলে তার ভুলের মাত্রা খুবই কম হয়, আর যাও কিছু ত্রুটি থাকে, তাও সংশোধন করে নেবার জন্য থার্মোমিটারের সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া থাকে। নামজাদা প্রস্তুতকারকের থার্মোমিটারে সাধারণত ডিগ্রিতে দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তই ইতরবিশেষ ঘটতে পারে, কার্যক্ষেত্রে তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং নির্ভুল থার্মোমিটার খুবই বিরল, তবে আগেকার চেয়ে আজকাল যে এই যন্ত্রের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেক থার্মোমিটারে ৯৫° ডিগ্রি থেকে ১১০° ডিগ্রি পর্যন্ত মাত্রাগুলি সমবিভক্ত মাপরেখার দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে। প্রত্যেকটি ডিগ্রি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়, তার এক একটি ভাগকে দুই পয়েন্ট বলে ধরা হয়। ভিতরকার পারদরেখাটি অতি সূক্ষ্ম হলেও যাতে সেটা বাইরের থেকে মোটা আকারে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় তার উপায় করা থাকে। তবে খুব উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত হলেও যে থার্মোমিটারের পারদরেখাকে ঝেড়ে নীচে নামাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না তেমনি জিনিসই ব্যবহার করা উচিত। কেনবার সময় এটা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হয়।

নির্ভরযোগ্য ভালো থার্মোমিটার দিয়েই রোগীদের জ্বর পরীক্ষা করা দরকার। দীর্ঘ মেয়াদি টাইফয়েড রোগে এবং দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়রোগে বিশেষ করে নিখুঁতভাবে টেম্পারেচার দেখার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। যেখানে দুই-এক পয়েন্টের তারতম্যেই রোগীর মনে আশা-নিরাশার বিপর্যয় ঘটে এবং যেখানে দৈনিক তুলনামূলক তারতম্য লক্ষ্য করেই রোগীর সকল প্রকার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সেখানে কোন সস্তা বা সন্দেহ-জনক থার্মোমিটার ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়। যে থার্মোমিটারে বাতাস ঢুকে পারদ-রেখা ছিন্ন হয়ে যায় এবং যাতে খানিকটা ফাঁক রেখে পারাটুকু লাফিয়ে চলে যায়, তেমন জিনিস ব্যবহার করা নিরাপদ নয়।

টেম্পারেচার নেবার পদ্ধতি কয়েক প্রকারের আছে। সাধারণত আমরা বগলে থার্মোমিটার লাগিয়ে পাঁচ মিনিটকাল চেপে রেখে টেম্পারে-চার নিয়ে থাকি। এতে অনেক সুবিধা আছে, কারণ এতে বারে বারে যন্ত্রটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখবার দরকার হয় না। কিন্তু বাইরের আবহাওয়ার দ্বারা বগলের উত্তাপ অনেক সময় প্রভাবান্বিত হয়, অনেক সময় ঘাম হওয়াতে উদ্বায়নের দ্বারা বগলের চামড়া বেশি রকম ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর রোগা মানুষদের কুক্ষিদেশ গহ্বরযুক্ত হওয়াতে নিয়মিতভাবে থার্মোমিটার লাগালেও অনেক সময় চামড়ার সঙ্গে পারদা-ধারের সংস্পর্শ ঘটে না, তাই জ্বর থাকলেও সঠিক টেম্পারেচার ওঠে না। এই সকল নানা কারণে নির্ভুলভাবে রোগীর শরীরের উত্তাপটি জানতে হলে মুখের মধ্যে থার্মোমিটার লাগিয়ে টেম্পারেচার নেওয়াই প্রশস্ত। ওর পারদা-ধারটি জিভের নীচে লাগিয়ে কিছুক্ষণ মুখ বুজে থাকলেই তখনকার প্রকৃত টেম্পারেচার উঠে যায়। কতক্ষণের জন্য লাগিয়ে রাখতে হবে সে বিষয়ে আবার নানা মত আছে। পাঁচ মিনিটের অধিক রাখবার কখনই কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু কেউ কেউ বলেন, আজকালকার থার্মোমিটার তিন মিনিট বা দুই মিনিট রাখলেই যথেষ্ট। অবশ্য সামান্য সময়ের তফাতে বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হয় না, কারণ জ্বর হলে সেটা দুই মিনিটেও প্রকাশ পাবে, আবার পাঁচ মিনিটেও প্রকাশ পাবে, সময়ের তারতম্যে কেবল এক আধ ডিগ্রির পার্থক্য ঘটবে। কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেখানে প্রত্যহ জ্বরের উচ্চসীমার মাত্রা নিয়ে তুলনা করা হচ্ছে, সেখানে সেটুকুও অবহেলার বিষয় নয়। অতএব যেখানে পাঁচ মিনিটে টেম্পারেচার নেওয়া হচ্ছে সেখানে বরাবর তাই করা উচিত, যেখানে দুই মিনিটে নেওয়া হচ্ছে সেখানেও বরাবর তাই করা উচিত। পর্যবেক্ষণের স্থলে একটা ধার্য নিয়ম মেনেই চলতে হয়। টেম্পারেচার নেবার পূর্বে কিছুক্ষণ মুখ বুজে চুপ করে থাকা দরকার, কারণ মুখব্যাদান করে থেকে ভিতরে হাওয়া ঢুকতে দিলে তখনকার প্রকৃত উত্তাপটি কিছু কমে যায়। টেম্পারেচার নেবার আগে কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগীকে গরম কিংবা ঠাণ্ডা কিছু খেতে দেওয়া উচিত নয়, তাতেও প্রকৃত উত্তাপ নির্ণয়ের ইতরবিশেষ ঘটে। ছোটো শিশুদের মুখে টেম্পারেচার নেওয়া প্রায়ই অসম্ভব, বগলে নেওয়াও অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়, তাদের পক্ষে মলদ্বারে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার নেওয়া যেতে পারে। মলদ্বারের ভিতরের উত্তাপ মুখের উত্তাপের চেয়ে প্রায় এক ডিগ্রি বেশী হয়।

সুস্থ শরীরে মুখের টেম্পারেচার প্রায় ৯৮·৬° ডিগ্রি পর্যন্তই হয়। কিন্তু কারো কারো ৯৯° ডিগ্রি পর্যন্তও হতে পারে। সেটা জ্বর কিনা তা কয়েকদিন উত্তাপের তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায়। দেখতে হবে যে সারা দিনের মধ্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উত্তাপ কতটা এবং তার মধ্যে পার্থক্য কতটা। যার নীচু মাত্রা ৯৭-এর তলায় নেমে যায় বলে জানা আছে, তবুও উঁচু মাত্রা ৯৯ পর্যন্ত উঠে গেল, তার পক্ষে সম্ভবত সেটা জ্বর। কোন কোন স্ত্রীলোকের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ মাসের মধ্যে পনেরো দিন ৯৯ ডিগ্রি অথবা তার কিছু উপরে পর্যন্ত উঠে যায়, উত্তাপ পনেরো দিন নর্মাল থাকে। পর্যবেক্ষণেই তা ধরা পড়ে। কোনো রোগেই ঘন ঘন থার্মো-মিটার লাগাবার প্রয়োজন নেই. দৈনিক চার ঘণ্টা অন্তর চার বার টেম্পারেচার নেওয়াই সাধারণপক্ষে প্রশস্ত। কোন কোন রোগীর নিত্য নিত্য থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখা যেন একটা বাতিকস্বরূপ দাঁড়িয়ে যায়, তারা অনবরতই টেম্পারেচার নিতে উৎসুক হয়ে থাকে। এতে মনের উদ্বেগ বাড়ে এবং আরোগ্যের পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। যেখানে এমন অবস্থা দেখা যায়, সেখানে রোগীর কাছ থেকে থার্মোমিটার সরিয়ে ফেলাই উচিত। টেম্পারেচার দেখার মূল উদ্দেশ্য আরোগ্য বিষয়ে সাহায্য করা, যেখানে তারই বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা সেখানে ওর কোন সার্থকতা নেই।

ক্ষয়রোগে জ্বরই সর্বপ্রধান লক্ষণ, সুতরাং

জ্বর দেখেই তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, আর টেম্পারেচার অনুযায়ী রোগীকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করতে হয় অথবা উঠে বসা এবং চলাফেরা করবার অনুমতি দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর টেম্পারেচার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হয় এবং নাড়ি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকের ন্যায় মন্দীভূত হয়ে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোগীকে কোনোমতে উঠতে দেওয়া যায় না। এ স্থলে থার্মোমিটার প্রকৃত মাপকাঠির মতো প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে থাকে।

প্রচুর অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানে বিশেষভাবে জানা গেছে যে, ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় প্রতি পদে থার্মোমিটারের নির্দেশকে মেনে চলা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, তাকে অবহেলা করতে গেলেই অনিষ্ট হয়। এই রোগে থার্মোমিটার যেন নিখুঁত নিক্তির মতো কাজ করতে থাকে। তার কারণ এই রোগ যার আছে তার শরীরের ভিতরে কিংবা বাইরের ব্যবহারে কোন সামান্য মাত্র হেতু থাকলেই তদ্দ্বারা টেম্পারেচারের ইতরবিশেষ ঘটতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত রোগের প্রকোপ চলেছে, ততদিন টেম্পারেচার উঠতে থাকবেই। অনেক দিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে এবং আরো নানাবিধ উপায়ে সেই টেম্পারেচারকে কোনমতে স্বাভাবিকের মাত্রাতে নামিয়ে আনলেও নিষ্কৃতি নেই, সামান্য কিছু কারণ ঘটলেই আবার সেই অজুহাতে তাপ উঠতে শুরু হয়ে যায়। অল্প কিছু উত্তেজনা, হয়তো কোনো রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়া, নয়তো উৎসাহ সহকারে কিছুক্ষণ তাস খেলা, ক্ষয়রোগীর পক্ষে এই সকল সামান্য খুঁটিনাটিতেও জ্বর ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, খোলা বাতাসে যতদিন রাখা হলো ততদিনে ধীরে ধীরে জ্বরটি ছেড়ে গেল, আবার যেমনি ঘরের ভিতরকার আবহাওয়াতে ফিরিয়ে আনা হলো, অমনি আবার তাপ উঠতে লাগলো। এমন কি একটু সর্দি হলো, কি দাঁতের গোড়া ফুললো, কি কোষ্ঠবদ্ধতা বা হজমের গোলমাল ঘটলো, অমনি আবার তাদের তাপ উঠতে লাগলো। এটা আরো বিশেষ করে দেখা যায় রোগীরা কিছুকাল বিশ্রামের পরে চলাফেরা করতে শুরু করলে। হয়তো কয়েকদিন জ্বরটা একেবারেই আর উঠছে না দেখে রোগী ভাবলে এখন পর্যন্তও উঠতে না দেওয়া নিতান্তই বাড়াবাড়ি, সে কাউকে না জানিয়ে একদিন একটু ওঠাহাঁটা করলে। সেদিন তৎক্ষণাৎ কিছুই অনিষ্ট হলো না, কিন্তু জ্বর দেখা দিল তার পরদিন। এমনিই প্রায় হয় এবং যক্ষ্মা বীজাণুর অন্তর্বিষ এর জন্য সর্বাংশে দায়ী। ঐ বিষ গণ্ডীমুক্ত হয়ে বেশি মাত্রায় নির্গত হলে রক্তস্রোতের সঙ্গে যেমন শরীরের সর্বত্রই প্রবেশ করে, তেমনি মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিতে গিয়েও প্রবেশ করে। সেখানে নানাবিধ কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট একটি তাপনির্ধারক কেন্দ্র, সেইটিই এর দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং তখন কোনো কিছু একটা কারণ ঘটলেই সেই বিষ-প্রভাবদুষ্ট কেন্দ্র আর স্বাভাবিকের মতো তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না, বেহিসাবী রকমে ক্রিয়া করতে করতে তাপটা বাড়িয়ে ফেলে। তখন আবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া ব্যতীত তাকে শান্ত করবার উপায় থাকে না। ক্ষয়গ্রস্ত রোগীরা অনিয়মিতভাবে ওঠাহাঁটা করলেও তাই হয়। ওঠাহাঁটা মানেই খানিকটা পরিশ্রম, তার দ্বারা হৃদপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ আরো কিছু দ্রুততর হয়। সুতরাং তখন রোগ বীজাণুর বিষ বিশ্রামের অবস্থা অপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া পেয়ে রক্তস্রোতের সঙ্গে আরো কিছু বেশি মাত্রায় মিশে তাপনির্ধারক কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিপর্যস্ত করার ফলে টেম্পারেচার আরো খানিকটা বেড়ে যায়। তবে এই অনিষ্টের ক্রিয়াটি তৎক্ষণাৎ সফল হতে দেখা যায় না, এরজন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। হয়তো পূর্বদিন একটু অতিরিক্ত নড়াচড়া করা হয়েছে, পরের দিন সকালে উঠে দেখা গেল তাতেও শরীর বেশ সুস্থই আছে, টেম্পারেচার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রোগী ভাবলে তবে আর কী, রোগটিকে আমি জয় করে ফেলেছি। কিন্তু বিকালে শরীরটা খারাপ বোধ হলো, টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেল জ্বর হয়েছে। কারণ ঐ একই তাপনির্ধারক কেন্দ্রের বিষ-দুষ্টি হেতু অত্যধিক উত্তেজনা।

এই সকল দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কী? উপায় থার্মোমিটারের দ্বারা নির্দেশিত এবং বিশেষ বিচারপূর্বক নিয়ন্ত্রিত শয্যাবিশ্রাম। কবে যে এই বিশ্রাম ছেড়ে শয্যাত্যাগ করে উঠতে হবে সে কথা কেবল থার্মোমিটার এবং নাড়ির গতিই বলে দেবে, ওরই নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হবে। সুতরাং ক্ষয়রোগীর পক্ষে থার্মোমিটারটি দ্বিতীয় চিকিৎসকের মতো। তার নির্দেশকে অমান্য করা কিছুতেই চলবে না।

সুখের প্রকৃতি

পাঠক, সংসারে সুখী হইবার উপায় কি? আমি জানি না বলিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি যে তোমাদের আর দশজনের চেয়ে বেশি অসুখী, এমন মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিতে চাই না। তোমাদের আর দশজনের মতোই আমার জীবন সুখদুঃখের ছক-কাটা সতরঞ্চের ছাঁচ। আমার মাথা দশজনকে ছাড়াইয়াও ওঠে নাই—আবার ভিড়ের মধ্যে তলাইয়া যাইবারও মতো নয়। যে-ছাঁচে বিধাতাপুরুষ সহস্রকে গড়িয়াছেন, আমিও সেই সাধারণ ছাঁচেই গঠিত। তুমি শুধাইতে পারো—তা-ই যদি হয়, তবে আবার অপরকে প্রশ্ন করিবার কারণটা কি? এখানেই তো যত সমস্যা।

সংসারে সুখী আমরা অনেকেই। কিম্বা বলা উচিত যে, হরিণের চিত্রবর্ণ চর্মখানির মতো দুঃখের পটে সুখের ছিটে-ফোঁটা আমাদের অনেকেরই জীবনে পড়িয়াছে। আমরা সুখী না হইলেও কখনো কখনো সুখের স্বাদ পাইয়াছি। কিন্তু সে সবই যেন আকস্মিক! কেমন করিয়া হইল, কেমন করিয়া পাইলাম জানি না। সত্য কথা বলিতে কি, ব্যাপারটা যেন আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। যদি তুমি পণ করিয়া বসো যে, আজ তুমি সুখী হইবে—হইতে পারিবে কি? খুব সম্ভব না। হয়তো তোমার ওই প্রতিজ্ঞাই তোমার দুঃখের কারণ হইবে। জীবন-ধনুককে বাঁকাইয়া সুখের গুণ পরাইতে চেষ্টা করিলে দেখিবে—ধনুকখানাই ভাঙিয়া গেল—নয়তো ধনুকের দণ্ড ছিটকাইয়া উঠিয়া কণ্ঠবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে! দুঃখ ইচ্ছা করিলেও মেলে, না করিলেও মেলে—কিন্তু সুখের প্রকৃতি তেমন নয়। ইচ্ছা করিলেই সুখ পাওয়া যায় না। তবে কখনো কখনো যে পাওয়া যায়—তাহা নিতান্তই আকস্মিক।

অথচ সুখের সাধনাই মানুষের মৌলিক সাধনা। দুঃখের আত্যন্তিক প্রভাবের ফলেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন—দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইবে। কিন্তু পারিয়াছেন কি? দুঃখের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নহে দেখিয়া তিনি মানুষকে নিজের প্রকৃতিটা বদল করিতে উপদেশ দিয়াছেন! বাসনার নিবৃত্তি ঘটিলেই নাকি দুঃখেরও নিবৃত্তি ঘটে। তোমার গোয়ালে গরু আছে দেখিয়া রাত্রে বাঘ আসে। তিনি বলিতেছেন, গোয়ালটাকে শূন্য করিয়া দাও, বাঘ আর আসিবে না। কিন্তু গোয়ালটাকে শূন্য করিয়া ফেলিলে গো-রস পাইব কোথায়? গৌতম বলিবেন গো-রসের সুখ আর বাঘের দুঃখ দুটায় তৌল করিয়া দেখো—দুঃখের পাল্লাটাই ভারি—এ রকম ক্ষেত্রে গো-পালন বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। কিন্তু বাঘের হাত হইতে বাঁচিবার ইহাই কি একমাত্র সমাধান? গোয়ালটাকে লোহার শিক দিয়া

রক্ষা করিলে বাঘের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? গৌতম আর যাই হোন না হোন, তিনি রিয়ালিস্ট ছিলেন। তিনি সুখের কথা বলেন নাই, দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের সংবাদই দিয়াছেন। দুঃখ হইতে মুক্তি এবং সুখ কি এক বস্তু? হয়তো নয়। সংসারে খুব বেশি পাওয়া যায় তো ওই দুঃখ হইতে মুক্তিই সম্ভব। সুখ? কি জানি? অন্তত গৌতম জানিতেন না।

উপনিষদের ঋষিরা আনন্দের আশ্বাস দিয়াছেন। আনন্দ ও সুখ কি এক পদার্থ? বোধ করি নয়। সক্রেটিস বিষপাত্র হাতে লইয়া সুখ পান নাই নিশ্চয়—অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই পালাইয়া গিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেন। তৎসত্ত্বেও তিনি পালাইলেন না কেন? বিষ পান করিতে গেলেন কেন? তিনি যে ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাকেই কি তবে আনন্দ বলে? উপনিষদের আনন্দ, বৌদ্ধদের দুঃখ মুক্তি আর সংসারের সুখ—তবে কি একই বস্তুর প্রকারভেদ না তিন ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু? দর্শনের এই জটিল গ্রন্থি-মোচনের ক্ষমতা আমার নাই—তবে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, এই তিনের মধ্যে অধিকাংশ সাংসারিক জীব সুখ চায়—এবং অধিকাংশ সাংসারিক জীব সেই সুখ পায় না। অর্থাৎ সুখটাই একাধারে গণতান্ত্রিক কামনা এবং গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা!

সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জোর করিয়া বলা চলে যে, দুঃখই জীবনের নিয়ম, আর সুখ তাহার ব্যতিক্রম; দুঃখই অভ্যস্ত, সুখ আকস্মিক, দুঃখ কর্ণের কবচের মতো সহজাত আর সুখ অর্জুনের পাশুপত-অস্ত্র লাভের মতো ব্যক্তিগত সৌভাগ্য—দুঃখের কালো আকাশে সুখ—তারার ছিটে ফোঁটা। সুখের কপোত অতর্কিতে তোমার এক জানলা দিয়া প্রবেশ করিয়া পরমুহূর্তে আর এক জানলা দিয়া প্রস্থান করিবে। ইচ্ছা করিলেও সে যেমন আসিবে না, ইচ্ছা করিলেও সে তেমন থাকিবে না!

এমন চঞ্চল, অনিত্য বস্তুর জন্য মানুষের কেন যে আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারি না—অথচ মানুষ নাকি 'র‍্যাশনাল' অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন জীব!

সুখ মানুষের জীবন পরিধিকে তির্যক-ভাবে স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। পিছলিয়া চলিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম। দুঃখের বনস্পতির শিরোদেশে সুখের ফুলটি—ট্রেণ ছাড়িবার আগের শেষ পাঁচ মিনিটের মতো, হয়তো ফুটিয়া আছে। যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি ক্ষণিক! সুখের আকস্মিক তুলি প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরের রৌদ্রকে চন্দ্র-কিরণে পরিণত করিয়া দিতে পারে, কলিকাতায় মলিন রাজপথে ধাবমান ফিটন গাড়িখানাকে কুসুমপুরের রাজস্যন্দনে পরিণত করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়! আবার বহুযত্নে সংগৃহীত ফুলের বহু যত্নে গ্রথিত মালা লৌহ ফাঁসির দার্ঢ্য লাভ করিয়া প্রাণটাকে কণ্ঠগত করিয়া তুলিতেও তাহার এক মুহূর্তের অধিক সময় লাগে না! ইহাই সুখের পরিহাস। সুখ যদি জীবনের নিয়ম হইত তবে দুঃখকে বলিতাম তাহার বিকার—যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। কিন্তু তাহা তো নয়। দুঃখের অঙ্গুরীয়ে প্রদীপ্ত চুণির মতো সুখের কণা দীপ্যমান। সেই কণাটির প্রতিই মানুষের এত লোভ! সেটুকু পাইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই বা সে কী প্রয়াস! কিন্তু পিচ্ছিল রত্ন কখন যে অতল জলে স্খলিত হইয়া পড়ে! মানুষ একাধারে শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত—এক অর্ধ অপরার্ধের হাতে সুখের অঙ্গুরীয় তুলিয়া দিতেছে—অপরার্ধ তাহা হারাইয়া ফেলে—তখন দুই অর্ধের পরস্পরের জন্য সে কী রোদন! সুখের অঙ্গুরী যত যত্নেই রক্ষা করো না কেন—সফলতার সম্ভাবনা নাই—দুঃখের দুর্বাসা দেশ-কাল-পাত্রের সর্ববাধা-বিজয়ী।

আলাপের সূত্র

দোকানে ব'সে নানা মেজাজের খদ্দেরের সঙ্গে আপনাকে কারবার করতে হয়। কেউ সহজ সরল, কেউ আবার একটু প্যাঁচালো। এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে প্রায়ই এমন একটা অবস্থা আসে যখন অকারণেই আলাপটা বন্ধ হ'য়ে যায়, কথা দু পক্ষেরই আর যোগায় না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘিরে আসে। এই অবস্থায় হঠাৎ এক অদৃশ্য প্রেরণায় আপনি খদ্দেরকে একটি সিগরেট দিলেন—সিগরেটটা যে ভার্জিনিয়া নাম্বার টেন তা বলাই বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক অবস্থাটা কেটে গেল, হাসিমুখে আবার কথাবার্তা চললো। খদ্দের আপনার সম্বন্ধে ভালো ধারণা নিয়েই গেলেন।
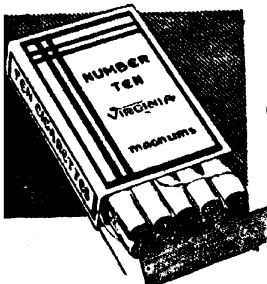
নাম্বার টেন ভার্জিনিয়া

সত্যিকার ভালো সিগরেট

জেমস্ কার্লটন লিমিটেড

NTK. 132

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত
কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

ভ্রষ্টলগ্ন—১৸৹ অনাগত—১৷৷৹
বিদ্যুৎলেখা—২৲ লোকারণ্য—২৷৷৹
শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী)—১৷৷৹

কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দশ আনা-ছ' আনা

বিন্দুর ছেলে যখন দশ আনা-ছ'আনা চুল ছাটবার আব্দার করেছিল, তখন সে নিতান্তই ছেলেমানুষ। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ইঙ্গিৎ আছে—চুলের ব্যাপারে সেইটেই বড়ো কথা। বন-মানুষের মাথায় কিম্বা পাহাড়ীদের মাথাতেও চুল থাকে অনেক অজস্র। কিন্তু সেই চুলকে পরিপাটি করে রাখার মধ্যেই কৃতিত্ব। জেমের "ভৃঙ্গসারে" মাথার চুল বাড়বেই, কিন্তু তার পারিপাট্য বিধানে যত্ন নেওয়াও কর্ত্তব্য।

ভৃঙ্গসার

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কেশতৈল

জেম কেমিক্যাল • কলিকাতা

টুপি

স্যামুয়েল কোসরফ

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে স্যামুয়েল কোসরফ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন রাশিয়ান। অতি আধুনিক ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে কোসরফের স্থান একটু স্বতন্ত্র। ... জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে যাঁরা এ পর্যন্ত ... লিখেছেন, অনেকের মতে কোসরফ্ তাঁদের ... শ্রেষ্ঠ। 'করোনেট' কোসরফের বিখ্যাত উপন্যাস। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কেই বাস করছেন।)

প্যারিসের বাইরে ফন্টেনব্লুর বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের এক স্থানে একটি কাচের আলমারী। আলমারীর মধ্যে নানা-রকমের সূচের কাজ করা সিল্কের কুশনের ওপর একটি টুপি রয়েছে। টুপিটি সম্রাট নেপোলিয়নের। এলবা থেকে ফিরে নেপোলিয়ন এই টুপিটা পরেই ওয়াটার্লুতে তাঁর সেনাদলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব অনেককাল আগের কথা—অনেক বর্ষ বছরেরও আগে।

—গাইডরা দর্শকদের প্রাসাদের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এই সব বলে।

কাচের আলমারীর ঠিক সামনেই এক নববিবাহিত কৃষক দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এসেছে গ্রাম থেকে। স্ত্রীলোকটির পিতা একজন কৃষক। স্বামীটিও দক্ষিণ ফ্রান্সের এক কৃষকের পুত্র। ওরা এখানে এসেছে মধু মাস যাপন করতে।

আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি তার রংচংয়ে ফিতেটা আঙুল দিয়ে নাড়ছে, আর লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে কালো টুপিটার দিকে। তাদের লাল মুখ এবং চওড়া হাতের প্রতিবিম্ব পড়েছে আলমারীর কাচের ওপর। শরীরটা যেন সামনের দিকে নুয়ে পড়ছে ক্রমশ—বিয়ের সময় মন্ত্রোচ্চারণরত পুরোহিতের সামনে যেভাবে নত হয়ে পড়েছিল।

স্ত্রীলোকটি আলমারীর দিকে তাকিয়ে বললে, এত বড় লোক আর দুটো হয়নি পৃথিবীতে।

—মহাপুরুষ। স্বামীটি একবাক্যে বললে, প্রায় গোটা পৃথিবীটাই ছিল তাঁর অধীনে।

—ঈশ্বর করুন, তাঁর আত্মার যেন শান্তি হয়।

—কিন্তু রাজা হওয়াটা মোটেই সুখের নয়—এ ঠিক। অন্তত আমার তো ভাল লাগে না। এতো দলিলপত্র সব পড়তে হয়...... দিন রাত......এ যেন কেমন অস্বাভাবিক,...... তাই না?

নিশ্চয়ই। বড্ড পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এমিল, আমার মনে হয়, রাজা হলে তুমি যা খুসী তাই করতে পারতে। মুরগীর খাঁচাটা এই গ্রীষ্মের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারতে তুমি—যা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। তার ওপর আবার পুরানো মদের পিপেগুলো ফুটো হয়ে গেছে, ফসলেও পোকা পড়েছে। রাজাদের তো আর বেশী কাগজপত্র দেখতে হয় না। কর্মচারীরাই বলে দেয় কি কি খবর আছে, রাজা শুধু একটি সই করে দেয়। তুমি সে কাজটুকু নিশ্চয়ই করতে পার, এমিল। পার না?

—খুব

—কিন্তু আমার বড় কষ্ট হবে। অবশ্যি, এ রকম একটা প্রাসাদে বাস করা খুব আরামের ঠিক, কিন্তু চাকর-বাকরগুলো যে তোমাকে সমস্তক্ষণ ঘিরে থাকবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। কিন্তু এমিল, তুমি যদি রাজা হতে তা হলে আমাকে মুখ বুজেই এ সব করতে হ'ত।

—কি করতে হ'ত?

—ওঃ, অনেক—সমস্তই করতে হ'ত। রাঁধুনীগুলো যাতে কিছু চুরি করতে না পারে সেজন্য রান্নাঘরের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হ'ত, মেয়েরা যে সব কাজ করে সে সব কাজ করতে হ'ত, জামা সেলাই করতে হ'ত, বাড়ি ঘরের তদারক করতে হ'ত।

—রাজা হওয়াটা কোনমতেই সুখের নয়। অন্তত আমার তো ভাল লাগে না।

—কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি যা ইচ্ছে তাই হতে পারতে এমিল। তোমার শরীরে এতো শক্তি......আর তোমাকে আমি এতো ভালবাসি!

সেখান থেকে তারা বাগানে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দুজনে বসে রইল—তাকিয়ে রইল পরস্পরের চোখের দিকে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর স্ত্রীলোকটি বলল, প্রাসাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগে আমাদের আর একবার টুপিটা দেখে আসা উচিৎ, এমিল।

—বেচারা নেপোলিয়ন।—এমিল বলল।

—বাস্তবিক দুঃখ হয়। একদিন যে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট ছিল আজ সে মৃত।

তারা টুপিটা দেখতে গেল। পরদিন সকালে তারা আবার গেল সেখানে। অজুহাত অবশ্যি একটা ছিল : নেহাৎ স্টেশনে যাবার পথে প্রাসাদটা পড়ে তাই একটু যাওয়া।

টুপিটা শেষবারের মত দেখে তারা বেরিয়ে এল।

ট্রেনে বসে স্ত্রীলোকটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল : চমৎকার কাটলো দিন কয়টা না এমিল?

—হাঁ।

স্ত্রীলোকটি এমিলের কানে কানে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি, এমিল।

এমিল সোজা হয়ে বসল, তারপর স্ত্রীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আমি ভেবেছিলুম, তুমি নেপোলিয়নকে ভালবেসে ফেলেছ।

—হ্যাঁ—তা ঠিক। কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ আলাদা, এমিল

—কেন?

—নেপোলিয়ন তো মরে গেছে। আমি তাঁর জন্যে দঃখিত। এতো বড় একটা মানুষ, অথচ তাকে রাজা হতে হয়েছিল......কি কষ্ট!

—কিন্তু আমি ভাবছিলেম আমার নিজের কথা—নেপোলিয়নের নয়। তাঁর পক্ষে রাজা হওয়াটা এমন একটা কষ্টের কিছু নয়। সে তো সব সময়েই একটা না একটা বড় কাজ নিয়ে থাকতই। আর তা ছাড়া সে ছিল সৈন্যাধক্ষ; সৈন্যাধক্ষেরা যা করতে পারে এমন কোন কাজ নেই।

—আর নেপোলিয়ন বিরাট বীরও ছিলেন...

—তাই বুঝি তুমি তাকে ভালবেসেছ?

আমি তো তোমাকেও ভালবাসি, এমিল। আমি ভাবি, একদিন তুমিও অমনি বড় হবে; আর লোকেরা তোমার টুপিটা অমনি যত্ন করে রেখে দেবে। কিন্তু......কিন্তু নাঃ, তুমি রাজা হয়ো না, এমিল।

এমিল নেপোলিয়নকে হিংসা করতে লাগল। জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে রইল।। বাইরে সবুজ মাঠ আর পপলারের দীর্ঘ সারি দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার সময় তারা আবার তাদের গোলা-বাড়ীতে ফিরে এল।

ভিজে মাটি আর লতায় সবুজ ঝোপ থেকে একটা মধুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখানে সেখানে ঘাস জন্মেছে ঘন হয়ে। চাষের সময় এসেছে আবার। কাজেই তাড়াতাড়ি ছুটির পোষাক পরিবর্তন করে কাঠের বড় জুতো জোড়া পড়ে নিল তারা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জুতোই ফ্রান্সের মাঠে ঘাটে অসংখ্য কঠিন দাগ এ'কে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হতে তখন মাত্র দু'-এক ঘণ্টা দেরী।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্ত্রীলোকটি এমিলের কানে কানে বলল, উঃ! বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরতে এতো আনন্দ! এমিল!

এমিল তার স্ত্রীর হাতে চাপ দিল।

—প্রাসাদে যারা থাকে তারা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট ভোগ করে। স্ত্রীলোকটি বলল।

এমিল তার স্ত্রীর হাতে আবার চাপ দিল।

—এতো কষ্ট!

এমিল তার হাতটা ছেড়ে দিল।

—নেপোলিয়নের টুপিটার কথাই তুমি ভাবছ।

—না, এমিল, আমি কিছু ভাবছি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, এমিল।

সে এমিলের গলা জড়িয়ে ধরল। এমিল তাকে চুম্বন করল—তার চোখের পাতায়, তার লাল সিক্ত মুখে। মাটির স্নেহে সিক্ত সে মুখ।

নেপোলিয়ন তারপর আর কোনদিন তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি। মাত্র একবার তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—প্রায় এক বছর পরে। এমিলের তখন একটি ছেলে হয়েছে।

—হিরের টুকরো ছেলে। এমিল বলত। ছেলের গলায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে তার মা বলত, ওকে আমি মেলায় নিয়ে যাব...... সেখানে একটা কাঁচের আলমারীর মধ্যে রেখে দেব।

কিন্তু সমস্যা হ'ল ছেলের নামকরণ নিয়ে।

ইতিহাসের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের নাম তারা একে একে মনে করতে লাগল, কিন্তু কোনটা পছন্দ হ'ল না। সবই যেন কেমন অদ্ভুত আর নিষ্প্রাণ।

মাঠে তখন আঙুর পেকেছে। কাজের আর শেষ নেই। তবুও অত কাজের মধ্যেও হঠাৎ বিশ্রামের কোন ক্লান্ত মুহূর্তে নেপোলিয়নের টুপিটার কথা তাদের মনে পড়ল।

তারা অনেক ভাবল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলের নাম রাখল জন।

অনুবাদক—মৃগাঙ্ক রায়

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ১৪ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 29th June, 1946. [৩৪ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট অগ্রাহ্য

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সুদীর্ঘ লোচনার পর প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী গভর্নণ্ট গঠনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গ্রেসের এই সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হই ই; বরং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে এইরূপই বে, আমরা পূর্ব হইতেই তাহা অনুমান রিয়া লইয়াছিলাম। কারণ ভারতকে স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের আন্তকতায় আমরা কোন দিনই একান্তভাবে শ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং হাদিগকে বিশ্বাস করিবার পক্ষে যত যুক্তির্ক যেদিক হইতে এতদিন শুনিয়াছি আমরা নটিই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি নাই। মাদের মতে ইংরেজ সবই এক। নিজেদের গসম্পর্কিত প্রশ্নে ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল, রনীতিক এবং শ্রমিক দলের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বস্তুত মন্ত্রী মিশন এদেশে আসিয়া জেদের স্বার্থকেই কায়েম করিবার ফন্দি লইয়াছেন এবং মনে এক, মুখে অন্য রকম লের কূটনীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। একদিকে সলিম লীগ, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গদিগকে জেদের ক্রীড়নক স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা গোড়া যেভাবে ধড়িবাজী চালাইতেছিলেন, কোন দেশ বা জাতির কাছে পড়িলে দিন পূর্বেই তাহারা সে ধড়িবাজী ভাঙিগয়া ত এবং এমন প্রবঞ্চনা বেশি দিন চলিত না; ন্তু ইঁহাদের এই খেলার দৌড় কতটা, কংগ্রেস তাহা দেখিয়া লইতেই বসে এবং সেক্ষেত্রে দের স্বরূপ দেখিয়া লওয়াই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে । প্রকৃতপক্ষে আমরা এই কয়েক সর মধ্যে মন্ত্রিমিশনের বহু তই দেখিয়া লইয়াছি। তাঁহারা এদেশে সিয়া ঘোষণা করিলেন, প্রাদেশিক মণ্ডলী করা প্রদেশসমূহের ইচ্ছাধীন; কিন্তু তু নিজেদের গড়া মণ্ডলীই দেশের লোকের ড় জোর করিয়া চাপাইয়া দিলেন। তাঁহারা র গলায় হাঁকিলেন ভারতবাসীরা নিজেরাই তাহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে, কিন্তু কার্যত তাঁহারা শ্বেতাঙ্গদিগকে গণ-পরিষদে নির্বাচিত হইবার অধিকার দিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপে বড়লাট বলিলেন, জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে, কিন্তু কার্যত জনগণের অনাস্থা-ভাজন লীগওয়ালাকে এবং একজন সরকারী কর্মচারীকে নূতন গভর্নমেণ্টে গ্রহণ করা হইল। বস্তুত মন্ত্রিমিশনের এই কূটনীতিক খেলায় মহাত্মা গান্ধীও শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। গত ২৩শে জুন তিনি খোলাখুলিভাবেই মন্ত্রিমিশনের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করেন। ঐ দিবস প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী বলেন, ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের উপর নির্ভর করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জগতে এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা আমাদের স্বাধীনতা প্রতিরোধ করিতে অথবা কাড়িয়া লইতে পারে। তাড়াহুড়া করিয়া স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ সম্ভবপর নয় এবং সে পথে স্বাধীনতা লাভ হইতেও পারে না; স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদিগকে ধৈর্য সহকারে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। মহাত্মাজীর এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যাইবে যে, আসন্ন সংগ্রামের জন্যই ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিলেও স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রাহ্য করিয়াছে; কিন্তু এতদ্দ্বারা কংগ্রেস সংগ্রামের পথেই আগাইয়া চলিল বুঝিতে হইবে; কারণ, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে এবং অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে যদি সহযোগিতা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী স্তরেও সহযোগিতা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের নির্দেশিত অন্তর্বর্তী গঠন পরিকল্পনায় যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে স্বীকার না করিয়া ভেদবিভেদের পাকে ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিবার কৌশল বিদ্যমান থাকে, তবে স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নিতান্ত ফাঁকা ভ্রান্ত মোহে জাতি প্রবঞ্চিত হইবে না। পক্ষান্তরে পরাধীনতার বেদনা জাতির অন্তরে প্রধূমিত হইয়া সাম্রাজ্য-বাদীদের বঞ্চনার সব জাল অচিরে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। ফলে স্বাধীনতার সাধনায় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জাতির অন্তরে একান্ত হইয়া উঠিবে এবং সেক্ষেত্রে অন্য কোন যুক্তি-তর্ক আর চলিবে না।

ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সূচনা

কংগ্রেস সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইয়াছে; বলা বাহুল্য, সে আপোষ-নিষ্পত্তিই চাহিয়াছিল। এই সম্পর্কে যে সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রী মিশন, বিশেষভাবে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মতিগতির জন্য কংগ্রেসকে সংঘর্ষের দিকেই শেষটায় আগাইয়া যাইতে হইয়াছে। কংগ্রেস স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, শুধু ভাষার দিক দিয়াই এই কথা বলা চলে; কিন্তু নীতির দিক হইতে নয়; কারণ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথা বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র গঠন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁহারা মন্ত্রী মিশনের যে ব্যাখ্যা নিজেরা বুঝিয়াছেন, তদনুসারেই চলিবেন। প্রাদেশিক মণ্ডলী গঠনের অধিকার সম্বন্ধে দেশের লোকের অবাধ স্বাধীনতার প্রশ্নই এই সূত্রে আসিয়া পড়ে। মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের এতৎসম্পর্কিত নির্দেশে জটপাকানো ভাষায় মণ্ডলী গঠনে প্রদেশসমূহের স্বাধীনতার কথায় দস্তুরমত মতদ্বৈধের সৃষ্টি করিয়াছেন। মিশন পরে দশ দিকে নাড়ায় সাড়া পাইয়া এই কথা বলিয়াছেন বটে যে, তাঁহারা মণ্ডলী

গঠন বাধ্যতামূলকই বলিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু কংগ্রেস এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লয় নাই। বৃটিশ প্রভুরা কৌশল করিয়া ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা খণ্ডিত করিবেন, কংগ্রেস ইহা ব্যর্থ করিতেই চায়; সুতরাং এই ক্ষেত্রেই সংগ্রাম আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন এই যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইবেন কিনা। তাঁহারা চালবাজীর দ্বারা কংগ্রেসকে একদিকে হাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে মুশ্লিম লীগকে পুষ্ট করিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিতেই কৌশল খাটাইয়াছেন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, লর্ড ওয়াভেল গোপনে গোপনে মোশ্লেম লীগকে তোষণের নীতিই আগাগোড়া চালাইয়াছেন। এবং কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধেই জিন্নার কাছে একরার দিয়াছেন। তিনি মোশ্লেম লীগই যে ভারতের মোশ্লেম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এই অসংগত দাবীর যৌক্তিকতাই সমর্থন করিয়াছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও যে সেই দলে ছিলেন, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। নিতান্ত নিরীহ-প্রকৃতি নিরামিষাশী চার্চিলের একান্ত ভক্ত এই ভদ্রলোকটিকে উপরে দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। ইনি গভীর জলের মাছ। তলে তলে ঘাই মারিয়া ফেরেন। গতবার আরুইন অলোচনার সময়ই এই গূঢ়চারী লোকটিকে আমরা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছি; প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীরও সায় সেই দিকেই রহিয়াছে। তিনি মুখেই বলিযাছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে দিবেন না; কিন্তু কার্যত মোশ্লেম লীগের অসংগত জিদকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া মিশনের সমগ্র প্রচেষ্টা সেই অসদুদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছে। এখন শেষ পর্যায় কি দাঁড়ায়, সমগ্র দেশ তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বড়লাট অতঃপর লীগের দলকে লইয়াই কি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন করিবেন এবং দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়াই পশুবলের আশ্রয় গ্রহণে জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসকে দমিত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? প্রকৃতপক্ষে তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করা হইবে। আমরা জানি, ব্যাঘ্র যদি শোণিতের আস্বাদ একবার পায়, তবে তাহার হিংস্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও ভারতের রক্ত শোষণ করিয়া সেই পিপাসা বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সহজে তাহারা নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না; জগতের অবস্থার চাপে পড়িয়াও শোষণের পিপাসাই তাহাদের নীতির পাকে পাকে জড়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে এবং শক্ত-রকমের আঘাত না পাইলে এই পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা যদি এইরূপই থাকে, অর্থাৎ যদি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখনও নিজেদের জিদ না ছাড়েন এবং কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে তাঁহাদের মতিগতির পরিবর্তন না হয়, তবে অচিরেই দেশব্যাপী সংগ্রামের সূচনা হইবে এবং দেশবাসী সেজন্য প্রস্তুতই আছে। পরাধীনের পশুর অধম এই জীবনের চেয়ে তাহারা মানুষের মত মরাকেই শ্রেয়ঃ মনে করে। প্রকৃতপক্ষে দিন দিন পোকা-মাকড়ের মত আমরা মরিতেছি। এমন মরণের অপেক্ষা রক্তস্নাত ভারতে মানুষের নূতন জাগরণ ঘটে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

বাংলার খাদ্যসংকট

বাঙলা দেশের খাদ্যসংকট উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ইতিমধ্যেই নানাস্থান হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে এবং খাদ্যাভাবে আত্মহত্যার খবরও পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৩ সালের শোচনীয় অবস্থা পুনরায় দেশে সকল দিক হইতে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, অবস্থা তদপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিবে, এরূপ আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে। সরকার পক্ষ হইতে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের দ্বারা কোন অঞ্চলে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা জানান হইতেছে বটে; কিন্তু সরকারী এই সরবরাহ প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যন্তই অকিঞ্চিৎকর; তদ্দ্বারা চাউলের মূল্য হ্রাস পাইতেছে না; কিংবা লাভখোর মজুতদারেরাও ভবিষ্যতের লোকসানের ভয়ে বাজারে চাউল ছাড়িবার জন্যও প্ররোচিত হইতেছে না। বস্তুত এই ধরণের ব্যবস্থার সাহায্যে বর্তমানের গুরুতর সংকট অতিক্রম করা সম্ভব নহে। এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান করিতে হইলে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ প্রথমত ত্বরিতভাবে হওয়া উচিত। তারপর সে সরবরাহের পরিমাণ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক; এইভাবেই জনসাধারণের মধ্যে আশ্বস্তির সঞ্চার হইতে পারে এবং লাভখোরদের বাজারে ফাটকাবাজী খেলিবার সুযোগও নষ্ট হয়। বাঙলা সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাতে এই প্রয়োজনের কোনটিই পূর্ণ হইতেছে না। প্রথমত অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে যথাসম্ভব সত্বর খাদ্যশস্য প্রেরিত হইতেছে না; দ্বিতীয়ত প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইতেছে। সরকারী ব্যবস্থার এই ত্রুটির কারণ তাহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। তাঁহারা একাধিকবার আমাদিগকে এই কথা জানাইয়াছেন যে, বাঙলার সমগ্র খাদ্যাভাব মিটাইবার উপযুক্ত খাদ্যশস্য তাঁহাদের হাতে নাই এবং তাঁহাদের হাতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে, তদ্দ্বারা বাঙলা দেশের মোট প্রয়োজনের শতকরা ছয় কি সাত অংশই মিটিতে পারে; এরূপ অবস্থায় ঘাটতি অঞ্চলে যথেষ্ট খাদ্যশস্য সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, ইহা সহজেই বোঝা যায়। বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর আব্দুল গফরানের মুখে আমরা কিছুদিন পূর্বে এমন কথাই শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙলা দেশের খাদ্যের সব অভাব মিটাইবার ক্ষমতা সরকারের নাই; কিন্তু কোন সভ্য দেশের সরকারই এই ধরণের কৈফিয়ৎ যোগাইয়া দেশের লোকদিগকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতে পারেন না; কিংবা সরকারী কর্মচারীরা এরূপ অবস্থায় আরামে বিলাসে মোটা বেতনস্বরূপে নিরন্নের রক্ত শোষণ করিতে সাহসী হন না। দেশের লোকের প্রাণ রক্ষা করাই সরকারের প্রথম কর্তব্য এবং আইন ও শান্তি রক্ষার চেয়ে এতৎসম্বন্ধীয় দায়িত্ব সরকারের পক্ষে অধিক; কারণ, মানুষের সুখ ও স্বস্তিতেই আইন ও শান্তি রক্ষার সকল ব্যবস্থার সার্থকতা। দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যদি অন্নাভাবে মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আইন ও শান্তির প্রশ্ন একেবারেই গৌণ হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশে অবস্থা ক্রমে যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে অবিলম্বে সমগ্র দেশের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সোজাসুজি সরকারের নিজের হাতে গ্রহণ করা উচিত এবং তজ্জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই সমস্যা সমাধানে সমধিক তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন; ইহার ফলে যে সব অঞ্চলে বাঙলা দেশের অপেক্ষা খাদ্যসংকট দেখা দিবার পক্ষে বেশী কারণ ছিল, সে সব স্থানেও খাদ্যসমস্যা বাঙলা দেশের মত একটা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা দেখিলাম, বিহার গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি এই সম্বন্ধে একটি নূতন কর্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কণ্ট্রোলের দরে কৃষকদিগকে কাপড়, চিনি, কেরোসিন দিতেছেন এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের ঘরের মজুত খাদ্যশস্য বাজারে বাহির করাইতে সুবিধা হইতেছে। এইভাবে কৃষকদিগকে খাদ্যশস্য বিক্রয়ে প্ররোচিত করা বাঙলা সরকারের উচিত। তাঁহারা খাদ্যশস্য কৃষকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে বাজারে নিজেরা ছাড়িবার

ব্যবস্থা করুন এবং যদি প্রয়োজন হয়, জনসাধারণের মনে আশ্বস্তি সঞ্চারের জন্য নিজেরা সাময়িকভাবে কিছু লোকসান দিয়াও খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবেন, এইরূপ নীতি অবলম্বন করুন। ইহাতে পরিণামে তাঁহাদের লোকসান হইবে না; পক্ষান্তরে জনসাধারণের মধ্যে আশ্বস্তি দৃঢ় হইয়া উঠিবে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক দরদ যাহাদের নাই, তাহাদের দ্বারা এমন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না; পক্ষান্তরে সব ব্যবস্থার ভিতর দিয়া দুর্নীতির পাক জড়াইয়া উঠিবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। বাঙলা দেশের খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিসম্পন্ন দেশসেবক কর্মীদের সাহায্য গ্রহণে সরকার প্রস্তুত থাকিলে এ সমস্যা এতটা গুরুতর আকার ধারণ করিত না বলিয়াই আমরা মনে করি; কিন্তু দলগত স্বার্থ ও মর্যাদার মোহ এখনও বাঙলা দেশের শাসকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত দেশসেবক, যাঁহারা সত্যকার ত্যাগী, কর্মী তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকার হইতে আজ বঞ্চিত। এরূপ অবস্থায় বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা বাস্তবিকই শঙ্কিত হইতেছি। দুর্ভিক্ষ তো আসিয়া পড়িয়াছে বলা যায়। এখন মৃত্যুর অভিযান প্রতিহত করিবার জন্য কাহারা আগাইয়া আসিবে? আজ কাহারা দুর্নীতিকে বজ্রহস্তে দলন করিয়া নিরন্নের মুখে অন্নমুষ্টি দিতে বলিষ্ঠ বাহু বিস্তার করিবে? দেশ তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছে।

কাশ্মীর রাজ্যে স্বৈরাচার

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের আহ্বানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দিল্লীর সাংবাদিক সভায় তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এদেশের সামন্ত রাজ্যগুলি এখনও স্বৈরাচারের কেন্দ্রস্থল হইয়া রহিয়াছে এবং স্বৈরাচারী বৃটিশ সরকারের নিকট হইতেই তাহারা এ কার্যে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। সমগ্র ভারতে আজ জনগণের জাগরণ ঘটিয়াছে; তথাপি দেশীয় রাজাদের চৈতন্য হয় নাই। তাঁহাদের স্পর্ধা এতদূর যে, তাঁহারা বন্দুক ও সঙগীন দেখাইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ন্যায় জনবরেণ্য নেতাকে ভীত করিতে চাহেন। কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট পণ্ডিতজীকে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশে বাধা দেন; শুধু তাহাই নয়, তাঁহাকে তাঁহারা গ্রেপ্তার করিবার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করেন; অথচ পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে এই ধরণের দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। তিনি কোনরূপ রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য কাশ্মীরে গিয়াছিলেন না; কাশ্মীর গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াও তিনি সেখানে যান নাই; পক্ষান্তরে কাশ্মীর যাত্রার পূর্বে পণ্ডিতজী আপাতত কিছুদিনের জন্য কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন যাহাতে স্থগিত হয়, জনসাধারণকে তেমন পরামর্শই প্রদান করিয়াছিলেন; এরূপ অবস্থায় পণ্ডিতজীকে বিনা বাধায় কাশ্মীরে যাইতে দিলে সেখানকার অশান্তি প্রশমিত হইবার পক্ষে অনুকূল অবস্থারই বরং সৃষ্টি হইত; কিন্তু কাশ্মীরের খুদে রাজার চাকর-লস্করের দল পণ্ডিতজীর কাশ্মীর যাত্রার কথা শুনিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠে। উজীর রায় বাহাদুর রামচন্দ্র কাক কলরব সৃষ্টি করিয়া হাঁকেন—কাশ্মীর ফরিদকোট নয়; অর্থাৎ ফরিদকোটের রাজ-সরকার পণ্ডিতজীকে বাধা দেন নাই বলিয়া কেহ যেন এমন মনে না করে যে, কাশ্মীর সরকারও তাঁহাকে বাধা দিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল হউন ভারতের সর্বজনমান্য জননায়ক,—হউন তিনি কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট; কিন্তু কাশ্মীর সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ডরায় না ইত্যাদি। কাক সাহেবের এমন ডাক-হাঁক শুনিয়া দেশের লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠে; তাহা এই যে, কাশ্মীর সরকারের এই বীরত্বের মূলে ন্যায়সঙ্গত কারণ যদি কিছু থাকিত, তবে ইহার মূল্য বর্তাইত; কিন্তু নিতান্ত নীতিগর্হিত স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে তাহাদের এই যে বীরত্ব, ইহার মূলে শক্তি যোগাইয়াছে কাহারা? এক্ষেত্রে এই সোজা সত্যটি উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হয় না যে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশই কাশ্মীরের এই স্বৈরাচারের মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং কাশ্মীরের বৃটিশ রেসিডেন্টের যদি সমর্থন না থাকিত, তবে কাশ্মীর সরকার কিছুতেই পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেন না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর রাজ্যে জন-জাগরণ ঘটে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা চাহেন না। ভারতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে সামন্ত রাজারা সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিবেন, মন্ত্রী মিশনের সিদ্ধান্তে ইহাই নির্দেশিত হইয়াছে। সামন্ত রাজাদের সেই সার্বভৌম ক্ষমতা কাহাদের স্বার্থে এবং কাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবে, কাশ্মীরের এই ব্যাপারে তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল। বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সামন্ত রাজ্যগুলিতেই নিজেদের ঘাঁটি পাকা করিয়া লইবার মতলবে আছে। ভারতবর্ষকে যদি সত্যই স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তবে জন-জাগরণের সাহায্যে ইঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল দেশবাসীকে সেই কর্তব্যেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কাশ্মীরের স্বৈরাচারী সরকার পণ্ডিত জওহরলালের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বস্তুত নিজেদের এবং সেই সঙ্গে সকল সামন্ত রাজ্যের স্বৈরাচার-শাসন-ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করিয়াছেন।

দুর্বৃত্তের দণ্ড বিধান

বিগত আগষ্ট আন্দোলনের সময় সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা জনসাধারণের উপর যেসব অত্যাচার হয়, তৎসম্পর্কে তদন্ত এবং দোষীদের সাজার ব্যবস্থা করিবার জন্য সুপারিশের নিমিত্ত বিহার ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিতর্কের সময় বিভিন্ন বক্তা সরকারী কর্মচারীদের নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা শুনিলেও মানুষের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। একজন বক্তা বলেন—এই পরিষদ ভবন হইতে কয়েক গজ দূরে দশজন তরুণকে গুলীর আঘাতে হত্যা করা হয়, পরিষদ প্রাঙ্গণ এখনও এই সব বীর যুবকের রক্তে রঞ্জিত রহিয়াছে। এইভাবে শুধু নরহত্যা নয়, গৃহদাহ, সতীত্ব নাশ, জননীর ক্রোড় হইতে স্তনন্ধয় শিশুকে কাড়িয়া লইয়া তাহার উপর উৎপীড়ন, কিছুই বাদ যায় নাই। বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত প্রস্তাবের পরিণতি কিরূপ দাঁড়াইবে, আমরা জানি না; যদি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করাও হয়, সেক্ষেত্রেও অপরাধী দুর্বৃত্তদিগকে দণ্ডিত করা বর্তমান অবস্থায় ভারতের কোন প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। কিন্তু বিহারের আমলাতন্ত্রে ইতিমধ্যেই যে এজন্য আতঙ্ক জাগিয়াছে, আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। পণ্ডিত ধনরাজ শর্মার উক্তিতে প্রকাশ, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনাতেই তথাকার সরকারী দপ্তর হইতে আগষ্ট আন্দোলন দমন সম্পর্কিত অনেক কাগজপত্র অদৃশ্য হইয়াছে। বৈদেশিক শাসনের আড়ালে নরপিশাচেরা অব্যাহতি পাইবে, ইহা আমরাও বুঝি। ভারতবর্ষ আজ যদি স্বাধীন থাকিত, তবে যুদ্ধ-অপরাধীদের মত ইহারাও সাজা পাইত; কিন্তু পরাধীন দেশ, এদেশ দুর্বল এবং দুর্বলের জন্য এ জগতে ন্যায়ও নাই, নীতিও নাই। এ সব সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আত্মদাতা ভারতের বীর সন্তানদের যাতনা লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের বেদনার ভিতর দিয়াই জাতি মনুষ্যত্বের মহিমায় জাগ্রত হইতেছে। কোন দেশেই স্বদেশপ্রেমিকের রক্তপাত বৃথা যায় না, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

Kobita
Pramatha nath Bisi

সবিতৃ-দেব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাজকুমারী রাজ্যশ্রী ছেড়েছে তার রাজ-আভরণ
ধরেছে কাষায়,
উদার নির্মল।

আভরণের আবরণে ঢেকেছিল তার যৌবন
মহত্তর জীবনের
প্রসন্ন সূচনার
স্বর্ণ করঙ্ক বাহিনী।

এখন তিনি রিক্ত, তাই পূর্ণ;
যেমন পূর্ণ নিরাবরণ সিন্ধু,
যেমন পূর্ণ নিঃস্বতার রাজতিলকিনী
গৌরীশৃঙ্গ চূড়া,
তেমনি পূর্ণ তোমার শেষ বয়সের কবিতা
অনাড়ম্বর মহিমায়।

অলংকার প'রে সে মন ভুলিয়েছে,
অলংকার ছেড়ে সে ক'রে নিয়েছে চিত্তজয়।

তারার ঐশ্বর্যে মন ভোলায় শর্বরী,
কিন্তু সবিতার জন্মলগ্নের আসন্ন প্রভাতে
খুলে ফেলে দেয় তার সমস্ত আভরণ
খুলে ফেলে দেয়
হীরামুক্তা চুনিপান্নার প্রবলা বৈদূর্যের চোখ-ভোলানো তুচ্ছতা।

বারে বারে তোমার কবিতা দাঁড়িয়েছে নবজন্মের প্রান্তে।
বারে বারে তোমার কবিতায় বেজেছে
নব জাতকের শঙ্খ।
এক জীবনে তুমি রচনা করেছ
বহু জন্মের জাতক।
নীহারিকার পুঞ্জিত স্বর্ণসূত্রভেদী
তোমার কবিতার গতি কোন্ নিরুদ্দেশে?
প্রাতঃ সূর্যদীপ্ত কোন সিংহদ্বারের পানে?
নতুন যুগের,
নতুন জগতের
নতুন জীবনের কোন্ দুর্নিবার লক্ষ্যে?
তুমি নব জন্মের প্রজাপতি।
নতুনের গায়ত্রী তোমার কবিতা,
নতুনের গঙ্গোত্রী তোমার কাব্য,
পুরাতনের বন্ধন ছেদী
সুদর্শন তোমার সংগীত,
রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রে স্নান-সমুজ্জ্বল
চিরকালের সবিতৃ-দেব তুমি।

...মারে বসেই আশঙ্কা করছিলাম ট্রেনের দুরবস্থা। কিন্তু কামরায় উঠে দেখি ...স্থা খুব খারাপ নয়। একটি ছোট ৭।৮ ...রর ছেলেকে বল্লাম, "তুমি ভাই ওই বাক্সটার ...র বসে আমাকে এখানে বসতে দেবে?" ...র্যের কথা এই যে, ছেলেটি দু'চার সেকেণ্ড ...যেন ভেবে কথাটা রাখল। দুষ্টু ছেলে হ'লে ...ত বলতো "আপনিই ওখানে বসুন না।" ...ধ্য ছেলে হ'লে কথাটা কানে না নিয়ে চুপ- ...বসে থাকত, যেন শুনতেই পায় নি।

...ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলার ধারে বসে ক্লান্ত ...দুটো বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইলাম ...ের শ্যামল সরোবরে বিহার করবার জন্য; ...রা কিন্তু পাখা বুজে চুপ করে বসে ...তেই চায়। বুঝলাম বড় বেশি ক্লান্ত ...। চোখ বুজে হাতে মাথা রেখে বসে ...ম -ঘুমইনি ঠিক, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ...র মধ্যে হাতুড়ি পেটার আওয়াজের মত ...ছিল "ক্যাবিনেট মিশন", "আপোষহীন ...ম", "ফুড কমিটি", "টাকায় দেড় সের চাল" ...রে এক পরিবারে একটি করে কাপড়!" হঠাৎ ...ের সহযাত্রিনী মৃদু ধাক্কা দিয়ে বল্লেন, ...চুর খাবেন? এই চানাচুরওয়ালা—এদিকে ...।" হাসিমুখে তাড়াতাড়ি মাথা তুলে উঠে ...লাম। কি যেন হ'ল এক মুহূর্তে। চানা- ...র লোভ? ক্ষিধে পেয়েছিল অবশ্য খুব। ...মনটাকে আসলে বোধ হয় স্নিগ্ধ করল ...ত্রিনীর ওই সস্নেহ স্পর্শটুকুই। পরম ...রে সংগে চানাচুর খেতে খেতে খুশীমুখে ...যাত্রিনীর সংগে গল্প জুড়ে দিলাম। মেয়েটির ...ও স্টীমারেও একসংগে এসেছি; পরিচয় ...য়েছিলাম,—দিনাজপুরে স্কুলের টীচার। ...। কালো,—জীর্ণ মুখে মস্ত বড় দুটি ...। চোখ দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা ...থায় যেন চলে যায়, কবে আর যেন কোন্ ...খানা মুখে ছিল এমনি বড় বড় দুটি চোখ। ...পনি অনেকটা আমার একটি পুরানো বন্ধুর ...দেখতে!" "সত্যি নাকি? কবেকার বন্ধু? ...থায় পড়তেন আপনি"—সামনের আকাশ ...লো হয়ে এসেছে, বৃষ্টির ঝাপটা নেমে এলো ...র মিনিটের মধ্যেই। ছাট এসে মুখ চোখ ...ড় ভিজিয়ে দিতে লাগল; জানলা বন্ধ ...তে কেউই চায়না; সকাল থেকে স্টীমার কোম্পানীর সুব্যবস্থায় একবিন্দু জলও কেউ স্পর্শ করিনি; তাই প্রকৃতির এই হঠাৎ-নামা ঝরণা-ধারায় মাথাটা, মুখটা পেতে দিয়ে সবাই-ই খানিকটা জুড়িয়ে নিতে চায়। বৃষ্টি ক্রমে বেড়ে গেল—সবাই একটু ইতস্তত করছে—কিন্তু জানলা বন্ধ করায় সবচেয়ে আপত্তি আমাদের বেঞ্চের কোণায় বসা স্কুলের একটি মেয়ের;—"না, না, জানলা বন্ধ কিছুতেই করব না, বৃষ্টির আরম্ভ দেখলুম, শেষ হ'তেও দেখব!"

ট্রেন কুষ্ঠিয়ায় এসে পেঁৗছেছে, কামরাও আমাদের এতক্ষণে কানায় কানায় ভরা। কয়েকটি মহিলা দরজার সামনে বাক্স নিয়ে বসেছেন, স্টেশনে ট্রেন থামতেই সবাই তাঁদের পরামর্শ দিল 'ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে রাখুন, এর উপর আর লোক উঠলে মারা পড়ব।' রুদ্ধ-দ্বারে প্রথম আঘাত করলেন একটি সুবেশা সুন্দরী মহিলা; সংগে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই, হাতে একখানি বই। মহিলাটি নিজে মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁর সংগের ছেলেরা কাতরস্বরে গাড়ির মধ্যে বারবার আবেদন জানাতে লাগলেন "খুলে দিন দরজাটা, মাত্র দু একটা স্টেশন পরেই বৌদি নেমে যাবেন,—একটুখানি তো পথ, খুলে দিন দয়া করে!" অপ্রস্তুত মুখ করে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে অগত্যা ঘোর অনিচ্ছায়ও দরজাটা খুলে দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল; সকলের ভাবটা "সত্যিই তো একটি তো মাত্র মহিলা, সংগে মালপত্র নেই, একটু পরেই নেমে যাবেন!"—কিন্তু হায়রে মানুষের দুরাশা! হায়রে তার হ্রস্ব দৃষ্টি। মহিলাটি ঢোকার সংগে সংগেই এক পলকের মধ্যে স্টেশনটি সরগরম হয়ে উঠল,—চোখে ধাঁধা লাগিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে গাড়িতে ঢুকতে লাগল এক বিরাট বাহিনী—নারী, পুরুষ, শিশু, আসবাবপত্র। আমাদের দিক থেকে আত্মরক্ষার কোনও পথই আর রইল না, এমনি ধরণের "ব্লিট্জের" সামনে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনও উপায়ই বুঝি থাকে না। তবে সরবে প্রতিবাদ করতে কেউ কার্পণ্য করিনি, বিশেষ করে যখন মালের পর মাল, বস্তার পর বস্তা সেই তিল স্থানহীন গাড়িতে একটার পর একটা কেবলি শিলাবৃষ্টির মত চারিদিকে এসে পড়তে লাগল। "এ আপনারা করছেন কি! মানুষকে মেরে ফেলবেন নাকি, গায়ের উপরে জিনিষ ফেলছেন!" কে কার কথা শোনে! একটি মাত্র জিনিসও বাইরে পড়ে রইল না এবং শিশুবাহিনী 'গাড়ির ভিতরটা সম্পূর্ণ অবরোধ করে ফেল্লেন, বাইরে দরজা ধরে ঝুলতে ঝুলতে চল্লেন পুরুষেরা—ঝড়টা একটু কেটে গেলে চেয়ে দেখলাম—নারী বাহিনী সংখ্যায় কিন্তু খুব বেশী নয়—সর্বসাকুল্যে ৩ জন ও শিশু মাত্র একটি। কিন্তু অবস্থার ফেরে আর মালের বহরে মনে হয়েছিল যেন কুরুক্ষেত্রের অক্ষৌহিণী সেনা। সুবেশা মহিলাটি একটা বেঞ্চির উপর হেলান দিয়ে বসে কতকটা নির্লিপ্ত কতকটা বিদ্রূপের সুরে আপন মনেই বলতে লাগলেন "এই ভীড়েই এরা এমন করে! পশ্চিমের দিকের গাড়ি তো দেখেননি:—বাবাঃ কি কষ্ট করে বেনারস থেকে এসেছি আমরা।" মহিলাটির কথায় সায় দিলেন দু একটি সহযাত্রিনী "তাতো ঠিকই:—সবাইকেই তো যেতে হবে, দরকার তো সকলেরই!" উদার যৌক্তিকতা ও সহৃদয় আলাপ আলোচনায় গাড়ির আবহাওয়াটা একটুখানি তরল হয়ে আসতে না আসতেই গাড়ি আবার থামল। "কি স্টেশন এটা, পোড়াদা বুঝি" সুবেশা মহিলাটি এবার নামবেন, আমার চানাচুর খাওয়ানো বন্ধুর মুখের আদল-আসা পথের বন্ধুটিও। বিদায় দিতে ও নিতে গিয়ে দেখি গাড়ির দরজায় আবার গোলমাল! এবার গাড়িকে রক্ষা করার ভার নিয়েছেন কুষ্ঠিয়ার আক্রমণকারীরা নিজেরা। বাইরে যাঁরা ঝুলতে ঝুলতে আসছিলেন তাঁরা আটকাচ্ছেন বাইরে, আর ভিতর থেকে তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন ওই দলেরই মহিলাবৃন্দ—বিশেষ করে ওদের মধ্যে যিনি বষীয়সী ছিলেন তিনি। এবার গাড়িতে ঢুকতে চাইছিল দুটি অত্যন্ত ময়লা কাপড়পরা মেয়ে—এদের বাধা দেওয়া—কাজটা খুবই সোজা —অন্তত তাইই সবাই ভেবেছিল। "তোমাদের তো থার্ড ক্লাসের টিকিট—এ গাড়িতে কেন—যাও, যাও অন্য গাড়িতে যাও।" "সে আমরা বুঝব—টিকিট যাই হোক না কেন, দরজা খুলে দাও তোমরা।" ধাক্কাধাক্কিতে দুটি মেয়ের একজন ভিতরে চলে এলো—বাইরের লোকগুলি সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতরের মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে উঠল 'ওরে বাবারে হাত চিপে দিল রে।" বাইরের মেয়েটি তখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভিতরে ঢোকার—চীৎকার, কান্না—ধাক্কাধাক্কি। এর মাঝে ট্রেন ছেড়ে দিল, মেয়েটিও ছাড়বে না, গাড়িতে ঝুলে পড়েছে—সংগে সংগে চীৎকার, কান্না "কি মানুষ গো তোমরা, গরীব দেখে এমনি ব্যাভার!" মেয়েটিকে অবশ্য অতি কষ্টে ঢোকানো হ'ল, কিন্তু

সকলেই বিরক্ত—সবচেয়ে অসন্তুষ্ট কুষ্ঠিয়ার সেই দল "দেখেছ মেয়ের আক্কেল, জায়গা নেই 'মরবার তবু ঢোকা চাই"—এবার আর ধৈর্য রইল না—কুষ্ঠিয়ার বর্ষীয়সী মহিলাটিকে ধমক দিয়ে উঠলাম "জায়গা তো আপনারা যখন উঠলেন তখনও ছিল না,—তবু তো আপনারা ঢুকতে দ্বিধা করেননি!" "তা আমি কি বলেছি।" "আপনারাই তো ওকে ঢুকতে দেননি, বেচারী যদি পড়ে যেত!"—"তা আমি কি জানি, গাড়িতে জায়গা নেই তাই বলেছি!" তর্ক করা বৃথা, তা ছাড়া একটু পরেই বুঝলাম মেয়েটিকে 'defend' করার দরকার আমার নেই; ("ও মেয়ে নিজের ভার নিজেই নিতে পারে") আমার গলা গাড়িশুদ্ধ লোকের গলা ছাপিয়ে উঠেছে তার কাংস্যানিন্দিত কণ্ঠস্বর, "গাড়ি চলেছে বলে নইলে দেখে নিতাম তোমাদের, সক্কলকে দেখে নিতাম, গরীব বলে এমন ব্যাভার! ভগবান সাজা দেবেন, খোদা দেখে নেবেন তোমাদের—গাড়ি না চল্লে আমিও দেখে নিতাম বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম সব।" "এই, গালাগালি করনা বলছি!" "করব না? নিশ্চয়ই গালাগালি করব—এমন লোক তোমরা" —গ্রাম্য মেয়ের গ্রাম্য ভাষার অশ্রাব্য গালাগালি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বয়ে চল্লো! "কি মুখ বাবা মেয়ের!"—প্রতিপক্ষ সবাই চুপ হয়ে গেলেন একে একে। দু'চারবার চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখে নিলাম ভালো করে—এমন তেজী, আত্মসম্মানী মেয়ে বাঙলা দেশে আর ক'টি আছে? ময়লা কাপড়ের মধ্যেও, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার মধ্যে ও সমবেত প্রতিরোধের মধ্যেও যে এমন দীপ্তশিখার মত জ্বলতে পারে, মাথা উঁচু করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

বাইরে সন্ধ্যার শান্তি ঘনিয়ে এসেছে। আমার পাশেই বসেছেন কুষ্ঠিয়ার সেই বর্ষীয়সী মহিলাটি—আমার বাঁ হাতটা সস্নেহে টেনে নিয়ে বল্লেন "এ হাতখানি খালি কেন গো?" রাগটা তখন পড়ে গেছে; হেসেই বল্লাম "এমনিই!"—"না, সবার হাতই অমনি দেখছি কিনা,—তাই মনে হ'ল, ওই দেখ না ওরও অমনি বাঁ হাত খালি।"—ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম সেই ময়লা কাপড় পরা মেয়েটিকে দেখাচ্ছেন! সত্যিই তারও এক হাত খালি। কুষ্ঠিয়ার দলের পরিচয় একটু একটু করে পাচ্ছিলাম। মহিলাটি তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছেন—সঙ্গে নূতন বৌ রয়েছে, ছেলে রয়েছে আর রয়েছে মেয়ে, নাতনি। বৌটির অল্প বয়স, মুখে কচি বয়েসের পরিপূর্ণ লাবণ্য, পরনে অল্প দামের রাঙা সাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, সযত্নে পাতা কেটে চুল বাঁধা। আমার একপাশে বসে বউএর শাশুড়ী, অন্য পাশে পালা করে করে বসছে একবার বৌ, একবার মেয়ে আর নাতনি। শাশুড়ীই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন—স্নেহের পরিবার। বৌটিরও শাশুড়ী, ননদের উপর খুব শ্রদ্ধা, নিজে বেশিটা দাঁড়িয়ে থেকে ও'দেরই বসতে দিচ্ছে। হাতে মাথা রেখে, চোখ বুজে শুনছি ওদের কথাবার্তা। "অ পরিষ্কার (মেয়েটির নাম) ভালো করে দেখ্ সব—আর তো তোর এ পথে আসা হ'বে না,—রাণীর (নাতনী) তো আবার এই প্রথম ট্রেনে চড়া, ওরই তাই সবচেয়ে আনন্দ। বৌমা,তোমার তো আবার খাবার সময় হ'ল, কি খাবে? খাওনা মা দুটো রসগোল্লা। ওরে ধীরু পরের স্টেশনে কিনে দিস্ বৌমাকে।"—পরিবারটির সুখদুঃখ সাচ্ছন্দ্য অসাচ্ছন্দ্যর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই কখন একটু জড়িয়ে পড়েছি,—হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল মনে;—মহিলাটি পাশের আর এক যাত্রীকে বলছেন, "হ্যাঁ ভাই, ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছি। এটা হল দ্বিতীয় বিয়ে। আগের বৌ পৌষ মাসে মারা গেছে, এই বোশেখে আবার বিয়ে দিলাম।" মাথা তুলে বৌটির দিকে তাকালাম—অতর্কিতে একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো—"হায়রে পৌষ মাসে যাদের মৃত্যু হ'লে বৈশাখ মাসেই আবার নূতন করে সানাই বেজে ওঠে—তাদেরই দল বাড়াতে চলেছ তুমি!"—বৌটির মুখে কিন্তু একটুকুও বিষাদ নেই, তার তো জীবনে এই প্রথম বসন্ত, আনন্দের বাঁশি এই একবারই বেজেছে—সবটু মাধুরী তাই আকণ্ঠ পান করতে চায়। বৌ খুব সপ্রতিভও, ননদকে জল ঢেলে দি ভাগ্নির হাত মুছে দিচ্ছে—শাশুড়ীকে বা বারে বলছে "মা, কাপড়টা ছাড়বেন এবা স্কুলের মেয়েটি প্রশ্ন করায় তাকে বু বলছে "আমি ভাই নূতন যাচ্ছি কিনা, লোকজন সব আমায় দেখতে আসবে, মাকে একটা ফর্সা কাপড় পরতে বলছি।" বর্ষীয়সী মহিলাটি এবার গল্প জুড়ে দিয়ে —সেই ময়লা কাপড় পরার সঙ্গেই। দু কখন নীরবে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়ে জানতেও পারিনি। "হ্যাঁ মা, এক হাত তো খালি কেন?" মেয়েটি এবার সলজ্জ বল্লো "ওই তো ওঠবার সময় ধাক্কাধাক্কি ভেঙ্গে গেলো!"—"আহা, তা ওই হাতের খুলে এই হাতেও দু'গাছি পরো। কো থাক তোমরা? খিদিরপুরে? চাঁদ মি বাড়ি? ওমা—ওদের যে আমরা ছোট থেকে জানি! ওরে ও পরিষ্কার, এই মে হ'ল চাঁদ মিঞার নাতনী—আলতা!"— পরিচয়ের সূত্র ধরে গল্পের স্রোত ঘনিষ্ঠতার দিয়ে বয়ে চল্ল। কত পারিবারিক কথা, কত দুঃখের আলোচনা! আমি চোখ বুজে ভাব জিন্না সাহেবের চোখা চোখা কথাগু "Muslims are a separate natio I am not an Indian."—চাঁদ মি নাতনী আলতা সে কথা শুনলে কি বল কি বলবে পরিষ্কারের মা?

—ট্রেন এতক্ষণে বুঝি শেয়ালদায় পৌঁছে গেল। মালের স্তূপের নীচে অতি কষ্টে জুতো জোড়া উদ্ধার করে ভীড় ঠেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ফিরে একবার দেখলাম—বৌটি শাশুড়ী তখনও কাপড় ছাড়াতে পারেনি। স্কুলের মে কিন্তু চুলটুল আঁচড়ে একেবারে ফিটফাট।

জীবন

রওশন্ ইজ্দানী

ধূমায়িত কুয়াশায় প্রচ্ছন্ন জীবন
কামনার পরিণতি মাগে
পথপ্রান্তে ধূলিতলে কত দুঃস্বপন
হতাশায় দীর্ঘ নিশি জাগে ...
নিদাঘ তপনে ঝরে লক্ষ অগ্নিকণা
দগ্ধ করে মাটীর ফসল
এ-জীবন স্রোতস্বিনী খরখলস্বনা
সিঞ্চে চলে বারি অবিরল,

সবুজের স্বপ্ন জাগে তৃণ-শস্য ফলে
শ্রান্তিহরা নিশি জাগে সুনীল বিথারে
দিবসের কুলে জাগে শূন্যে-জলে-স্থলে
কত নব সৃষ্টি-স্থিতি ধ্বংস-পারাবারে;

ভাঙাগড়া নিত্যানিত্য কত আয়োজন
গড়ে তোলে নিরন্তর মানব-জীবন।

এচিং   শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

কণাদ গুপ্ত

সন্ধ্যা হইয়াছে। কিন্তু তারাচরণ এখনও বাহির হয় নাই। চিন্তায় তাহার কপাল কুঞ্চিত।

মনিব্যাগে একটিও টাকা নাই। বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস—অযত্ন বিক্ষিপ্ত টাকাকড়ির যেখানে যেখানে আত্মগোপন করা অভ্যাস, সর্বত্র সন্ধান করা শেষ হইয়াছে। কিছুই মিলে নাই।

অবশ্য ইহাতে অন্নের অভাব হইবে না, হোটেলে টাকা দেওয়া আছে। চুরুটেরও ভাবনা নাই, দোকানে আজিও ধার মিলে। কিন্তু মদ খাওয়া চলিবে না, নগদ মূল্য না পাইলে শুঁড়িরা এক আউন্স মদও হস্তান্তর করিবে না।

অথচ সূর্যাস্ত হইতে না হইতে পায়ের পাতা হইতে মাথার চুল অবধি সমস্ত দেহটা লক্ষস্বরে চীৎকার করিতে থাকে—মদ, মদ।

এমন বিপদে তারাচরণ যে পূর্বে কখনও পড়ে নাই, এমন নয়। বহুবার। কিন্তু ঠিক সময়ে মগজে উপযুক্ত বুদ্ধি গজাইয়া তাহাকে কোথাও না কোথাও হইতে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। উপার্জন অবশ্য ঋণ। কিন্তু পাওনাদারেরা যাহাকে ঋণ বলিয়া অভিহিত করে, তারাচরণ সেইগুলিকেই তাহার বুদ্ধি প্রয়োগাৎ উপার্জন বলিয়া ঘোষণা করে। খুব অন্যায় করে না। তাহার পৈতৃক দেহটা অতিশয় লম্বা-চওড়া, তাহার উপর মদ দিয়াছে মেদ এবং রাঙা রঙ। ধীরে ধীরে গুরু-গম্ভীর স্বরে সে যখন কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট ব্যবসা, পরোপকার অথবা অপর কোন মানানসই, কিন্তু বিলকুল মিথ্যা অজুহাতে টাকা চাহিয়া বসে, তখন সংসারের শতেক ঘাটে জলখাওয়া অতি বড় দুঁদে লোকও ক্ষণিক মোহে অভিভূত হইয়া তাহাকে প্রার্থিত অর্থ না দিয়া পারে না। সে দিক হইতে তারাচরণ একজন জিনিয়াস্।

কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। তারাচরণ হিসাব করিয়া দেখিল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন পরিচিত সকলের নিকট হইতেই গড়ে নয়বার করিয়া বেশ মোটা অঙ্কের টাকা লওয়া হইয়া গিয়াছে। ইহার পর তাহার পক্ষেও আর আশা করা ধৃষ্টতা।

বাকী আছে শুধু একজন। নবগোপাল। তাহার কথা যে তারাচরণের এতক্ষণ মনে হয় নাই, এমন নয়; কিন্তু ওই মানুষটাকে ঠকাইতে তারাচরণেরও ঘৃণা হয়।

নবগোপালের সহিত তাহার বন্ধুত্ব বহুদিনের। প্রায় দশ বছর পূর্বে তাহাদের প্রথম পরিচয়। নবগোপাল তখন ইতালীয়ান সাহেব পরিচালিত একটি কাফেতে কাজ করে। বেলা দশটায় অফিস যায়, সন্ধ্যা সাতটায় ফিরে। কোন কোনদিন ফিরিতে ন'টাও বাজিয়া যায়। মাহিনা পায় ত্রিশ টাকা। মাঝে মাঝে মাখনের কৌটা, মদের বোতল প্রভৃতি চুরি করিয়া গোপনে বিক্রয়পূর্বক গড়পড়তা মাসিক আয়কে কোনওপ্রকারে ঠেলিয়া ঠুলিয়া পাঁচের কোঠায় লইয়া গিয়া ফেলে।

থাকে তখন মেসে। উত্তর-দক্ষিণ চাপা একটি ক্ষুদ্র ঘরে। পূবের দেওয়ালে ঘুলঘুলির মত দুটি জানলা, পশ্চিম দিকে ভাঙা দরজা। ঘরে আরও দুইজনের সিট। তাহাদের একজন সুবিধা পাইলেই নবগোপালের পিছনে লাগে। কোনও কারণ নাই। উদয়াস্ত কলম পিষিবার পর ভদ্রলোকের উন্নততর উপায়ে অবসর যাপনের যোগ্যতা থাকে না। দুর্দমনীয় অতৃপ্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষায় পিত্তবৃদ্ধি হইয়া নবগোপাল মাঝে মাঝে জণ্ডিসে ভোগে।

এই সময়েই তারাচরণের সহিত তাহার আলাপ হয়। কাফের একটি বয়ের নিকট নবগোপালের সস্তা চোরাই মদের স্টকের খবর পাইয়া তারাচরণ তাহার নিকট গমনাগমন সুরু করে। উভয়ের মানসিক গঠনে সাগরপ্রমাণ বৈষম্য থাকিলেও প্রথম প্রথম কেমন করিয়া যেন পরস্পরের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে।

সন্ধ্যার পর হোটেল হইতে বিষাক্ত মেজাজ লইয়া ফিরিয়া ঘরে প্রতীক্ষমান তারাচরণকে দেখিতে পাইলে নবগোপালের বিরক্তি-শীর্ণ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিয়া উঠিত। তারাচরণ জাত-মাতাল। জীবনের দৈনিক সংগ্রামে যাহারা বিক্ষত ও পর্যুদস্ত, মাতালের সঙ্গ বোধ করি তাহাদিগকে উৎসাহিত করে। মাতালের চরিত্রে কোথায় যেন বীরত্বের আভাস আছে। জীবনের শত লক্ষ দুঃখ-দৈন্যের সম্মুখে দীন, দরিদ্র, ধর্মভীরু ও নীতিপরায়ণ মানুষ যখন ভয়ত্রস্ত ও বেপথুমান হইয়া পরাজয় মানিতে পায় না, মাতাল তখন মদের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইয়া নেশার অন্তরাল হইতে জীবনকে কেমন উপহাস করে।

নবগোপাল নিজে বেশী খাইতে পারিত না। পাকস্থলীতে এক আউন্স পড়িলেই তাহার চোখ দুইটি রাঙা ও রগের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিত। অন্তরের সুপ্ত আশা ও জ্বালা অসংলগ্ন বাক্যের রূপে যুগপৎ মুখ দিয়া স্রোতের মত বেগে বাহির হইত। চীৎকার করিয়া বলিত, তুমি দেখে নিও তারা, হোটেলের চাকরী করে ক্ষয়ে যাবার জন্য নবগোপাল জন্মায় নি। একদিন না একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ব। আবেগে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ঊর্ধ্বে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হইত।

এই খেলো উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বোধ করি নবগোপালের প্রতি তারাচরণের ঘৃণার বীজ নিহিত ছিল। তারাচরণ একজন মস্ত ধনীর পুত্র। ভোগ ও উপভোগের পশ্চাতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির শেষ কড়িটি অবধি ব্যয় করিয়া অবশেষে সে সংসারটাকেই মরীচিকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। অসার বলিয়া যে বস্তুকে সে এমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, নবগোপালকে তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ মত্ত ধাবন করিতে দেখিয়া মনে মনে সে তাহাকে সত্যই উপহাস করিত।

কিন্তু নবগোপালও একদিন সত্য সত্যই বেশ গুছাইয়া লইল। সে অনেক কথা। কাফে হইতে বোম্বাইর এক মিলে ঈষৎ উচ্চ বেতনে

চাকুরী প্রাপ্তি, তাহার পর যুদ্ধ বাধা, তাহার মিলিটারীতে যোগ দেওয়া, একটি ঘাঁটিতে স্টোর-ইন্-চার্জ হওয়া, কণ্ট্রাক্টারদিগকে অংশীদার করিয়া স্টোরের মাল সরাইয়া চোরাবাজারে বিক্রয় করা প্রভৃতি অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করিবার পর নবগোপালের ব্যাঙ্কের পাস-বইয়ের অঙ্ক একদিন অযুত হইতে সরিয়া লক্ষে স্থির হইল। নবগোপালও চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ক্লাইভ স্ট্রীটে তিনগুণ অধিক ভাড়ায় একটি অফিস লইয়া ফলাও করিয়া কণ্ট্রাক্টরের ব্যবসা শুরু করিল।

ইহারই মধ্যে তারাচরণের হোস্টেলে একদিন নবগোপালের আগমন। বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া তারাচরণ মুখে প্রচুর খুসির কথা বলিল, কিন্তু মনে মনে প্রচুরতর বিস্ময় অনুভব করিল। মানুষ নিজের চোখে জগৎকে বিচার করে। তারাচরণ মনে করিত, গোটা জগৎটাই বুঝি তাহার মত সংসারের ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছে, শুঁড়ির দোকানে যে

গমনাগমন করে না, তাহা শুধু রুচিতে বাধে বলিয়া। কিন্তু নবগোপালের বর্তমান আকৃতি তাহার এই ধারণাকে যেন হাতুড়ির মত আঘাত করিল। সে এ কি হইয়াছে! মেসে থাকিতে তাহার যে দেহ ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মত রুগ্ন ও পাণ্ডুর ছিল, তাহা এখন রেসের ঘোড়ার মত সতেজ ও চিক্কন হইয়াছে। সার্টের হাতার তলা হইতে তাহার ঈষৎ ঘর্মাক্ত কব্জী দুইটিকে মুগুরের মত দৃঢ় দেখাইতেছে। এককালের শীর্ণ ও অস্থিসার মুখমণ্ডল এখন মাংসয় ভরিয়া যেন স্বাস্থ্যকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চোখ দুটি হইতে খুসির উজ্জ্বল আভা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যেন জগৎকে ঢাক পিটাইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছে—তোমরা দেখ, আমি সুখী, আমি পরম সুখী।

তাহার প্রশ্নের উত্তরে নবগোপাল সংক্ষেপে নিজের উন্নতির ইতিহাস বলিল। তারাচরণ লক্ষ্য করিল, তাহার ভাষণে সংযম আসিয়াছে, বাক্য পূর্বাপেক্ষা বিষয়াভিমুখী হইয়াছে।

কথা শেষ করিয়া নবগোপাল কহিল, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

তারাচরণ কহিল, বল।

—আমি মেসে থাকতে ঠিক সামনের বড় বাড়িটায় শোভা বলে একটা মেয়ে ছিল, মনে আছে?

মনে না থাকিলেও তারাচরণ কহিল, বল।

—তোমাকে তখন বলিনি। আমি সেই মেয়েটাকে—যাকে বলে—একটু ভালবাসতাম।

—বেশ তো।

একদিন সাহস করে ওর বাবাকে ঘটনাটা জানিয়ে পাণি গ্রহণের প্রস্তাবও করে ফেললাম।

—ওর বাবা রাজী হলেন?

—পাগল! মস্ত জমিদার ভদ্রলোক। খুব হেসে পিঠ চাপড়ে বললেন, বাপু, আগে স্ট্যাটাস তৈরী কর। আমার মেয়ের গৃহ-শিক্ষকের মাইনে তোমার বেতনের তিন গুণ। বয়েসটাকে ভাববিলাসে নষ্ট না করে পয়সা উপায় কর। বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপার সমানে সমানেই হয়ে থাকে।

তারাচরণ পকেট হইতে প্রকাণ্ড এক চুরুট বাহির করিয়া দুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজিয়া বলিল, তাহলে তো চুকেই গেল।

নবগোপাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যায় নি চুকে। শুনেছি, মেয়েটার এখনও বিয়ে হয় নি। আমার ইচ্ছে, আর একবার ভদ্রলোকের কাছে প্রস্তাবটা করি।

নবগোপালের কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া তারাচরণ চুরুট নামাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। অতীত অপমানের স্মৃতিতে তাহার নাসিকার প্রান্ত ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, মেসে থাকাকালীন মেয়েটির প্রতি যদি তাহার কোন অনুরাগ জন্মিয়াও থাকে, তাহা আজ আর বাঁচিয়া নাই। শুধু তাহার পিতাকে শিক্ষা দিবার জন্যই সে আজও শোভাকে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করিতেছে। তাহার চিত্তের এই নোংরামিকে তারাচরণ মনে মনে দেশী শুঁড়িখানার নোংরা আবহাওয়ার সহিত তুলনা করিল।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের ভঙ্গীতে মাতালের জড়ানো স্বরের অভিনয় করিয়া কহিল, বেশ তো, বাবা, বিয়ে করবে তো কোর। এখন, আপাতত চল একটু মালের দোকান থেকে ঘুরে আসি।

নবগোপাল ডান হাত দিয়া তারাচরণের বাহু চাপিয়া ধরিল। কহিল, না, মদ আমি আর খাই না।

—বল কি! একেবারে প্রতিজ্ঞা?

—প্রতিজ্ঞা বলে কিছু নয়। পয়সা, সময় বা স্বাস্থ্য—সংসারে কোনটাই নষ্ট করবার বস্তু নয়, এই আমি সার বুঝেছি এবং এই নীতি অনুসরণ করেই জীবনে উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি।

তাহার বক্তৃতা তারাচরণের বিরক্তিতে ইন্ধন জোগাইল। কহিল, তুমি তাহলে এস। আমি একলাই যাই।

নবগোপাল কহিল, তুমি হয়তো ভাবছ, কিছু পয়সা করে আমার চাল হয়েছে, আমি বড় কথা বলছি। কিন্তু তা নয়। আমার ওঠাপড়ায় ভরা জীবন আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। প্রথম যৌবনে নির্বুদ্ধিতার বশে নিজের উদ্যম ও সময় হেলায় অপচয় করেছি। আজ তার জন্য অনুতাপ করি। জীবনের গূঢ় অর্থ তখন উপলব্ধি করি নি। সম্মান ও সমৃদ্ধির ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিয়ে দশজনের জন্য বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকা। আমি সেই-ভাবেই বাঁচতে চাই। তুমি শুনেছ, আমাদের গ্রামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি এর মধ্যে বিশ হাজার টাকা দিয়েছি। মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দিলে লোকের এই কল্যাণ-টুকু করা সম্ভব হত না।

চোরাবাজারের ধনীদের মুখে জনকল্যাণের বক্তৃতা ধৈর্য ধরিয়া শুনিবার মত মন তারাচরণের ছিল না। সে শুধু কহিল, আচ্ছা, তুমি তাহলে এস। নবগোপাল আর একবার তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, তাহলে শোভার বাবার কাছে তুমি যাচ্ছ?

—আমি!

—প্রস্তাবটা তুমি করলেই ভাল হয়। ভদ্রলোক স্ট্যাটাস চেয়েছিলেন। যার স্ট্যাটাস হয়েছে, সে নিজে নিজের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যায় না। তুমি যদি আমাকে এটুকু সাহায্য কর, বড় উপকার হয়।

বলা বাহুল্য, তারাচরণ স্পষ্ট অসম্মতি জানাইয়াছিল। এবং সেইখানেই সেবারের কথা-বার্তা শেষ হয়। মাস ছয়েক পরে কিন্তু নব-গোপালের নিকট হইতে প্রজাপতির ছাপমার খামে রাঙা হরফের নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয় জানাইয়া দেয়, সে বিবাহ করিতেছে। তলায় নবগোপালের নোটঃ শোভার বাবা প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। আশা করি তুমি আসছ।

তারাচরণ যায় নাই। বরং সেদিন বারে গিয়া মদের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহা

বন্ধুদের মধ্যে এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আজিও আছে, যাহারা তাহাকে মদ্যপানের আতিশয্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য মাঝে মধ্যে উপদেশ দেয়। তারাচরণ মনে মনে হাসে। মানুষের যে বিচার-বুদ্ধির পরিণতি নবগোপালের দাম্ভিক আহাম্মকিতে অথবা শোভার বাবার নির্লজ্জ সুবিধাবাদে, সংযম ও সাধুতা দিয়া তাহাকে সযত্নে পোষমানার কি অর্থ থাকিতে পারে?

কিন্তু ইহার পরও তাহাকে কয়েকবার নবগোপালের বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল। এক সময় ধনের অভাব ছিল না বলিয়া তারাচরণের বহু লক্ষপতির সহিত পরিচয় ছিল। ব্যবসায়-সূত্রে তাহাদের কাহাকে কাহাকেও প্রভাবান্বিত করিবার জন্য নবগোপাল তাহার শরণাপন্ন হইত। তারাচরণ কখনও এড়াইয়া যাইত, কখনও বা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিত। খুশির নিদর্শন হিসাবে নবগোপাল তাহাকে কয়েক-বার হুইস্কির বোতল উপঢৌকন দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে গ্রহণ করে নাই। ক্ষেত্র বিশেষে মাতালদেরও ইজ্জত বোধ জাগ্রত হয়।

এই সূত্রে নবগোপালের স্ত্রীর সহিতও তাহার আলাপ হয়। শোভার বয়স বছর বাইশ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট দোহারা গড়ন। চোখে মুখে একটা দৃঢ় উৎসাহের দীপ্তি লইয়া আপনার সংসার গুছাইয়া তুলে। কয়েক দিন অল্পক্ষণ আলাপেই তারাচরণ বুঝিতে পারিল, ইহাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সুন্দর মিল হইয়াছে। শোভাও সমান কার্যপ্রিয়, সমান সংকীর্ণমনা, অপচয়ের প্রতি সমান ঘৃণাপরায়ণ। নবগোপাল তাহাকে আজিও ভালবাসে কিনা, তাহাকে এইভাবে বিবাহ করায় নবগোপাল তাহার বাবাকে অপমান করিয়াছে কিনা—এ সকল প্রশ্ন তাহার চিত্তকে এতটুকু নিপীড়িত করে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা থাকে যেন পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছির মত—সংসারের ঝড়ঝাপ্টা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সংযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা যে কোন প্রকারে একটা শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ বাসা নির্মাণ করিতে পারিলেই দাম্পত্য জীবনের পরাকাষ্ঠা লাভ হইল—একমাত্র এই লক্ষ্য রাখিয়াই তাহারা জীবনতরী পরিচালিত করে।

ইহা স্পষ্ট যে, তারাচরণ সম্বন্ধে শোভা ভাল ধারণা পোষণ করে নাই। সে যে মদ্য-পায়ী, ইহাই তাহার বিতৃষ্ণা অর্জন করিতে যথেষ্ট। তাহার উপর, কথোপকথন যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই চলুক না কেন, তারাচরণ যে মতামত জ্ঞাপন করে, তাহা শুনিলে শোভার গাত্রদাহ হয়। শান্ত, সুস্থ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপনের জন্য যুগ যুগ ধরিয়া বহুতর মনীষী বিচক্ষণ চেষ্টার দ্বারা যে সকল রীতি ও প্রথার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তারা-চরণ যেন সে সমস্তকে শিশুর কাকলীর মত অর্থহীন মনে করে। তাহার মতের বিপক্ষে শোভা কোন যুক্তি উত্থাপন করিলে তারাচরণ মুখ হইতে তাহার দীর্ঘ চুরুট নামাইয়া ক্ষণ-কাল তাহার দিকে স্তম্ভিতের মত তাকাইয়া থাকিত, যেন সে উন্মাদের প্রলাপ অপেক্ষাও অসংগত কিছু বলিয়াছে, তাহার পর প্রচণ্ড কলরব করিয়া হো হো করিয়া প্রকাণ্ড শরীরটা এরূপ হৈ চৈ করিয়া চেয়ারের উপর দোলাইতে আরম্ভ করিত যে, শোভার ভয় হইত বুঝি বা সে মদ্য পান করিয়াই তাহাদের বাড়িতে ঢুকিয়াছে।

তারাচরণের প্রতি শোভার বিরাগের অন্য কারণও ছিল। সম্পদ প্রসূত আত্মগরিমা অপরের নিকট যে খোসামোদের মাশুল আদায়ের দাবী রাখে, তারাচরণ তাহা তো কোনদিনই দিত না, উপরন্তু, সে আসিলে, তাহার নড়াচড়া, ওঠাবসা, এমন কি, প্রতিটি অংগ সঞ্চালন হইতে যেন এই ব্যংগযুক্ত অনুচ্চারিত অভিযোগ তীরের মত ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া শোভাকে বিদ্ধ করিত যে, তোমার স্বামী চোরাবাজারের ধনী, তোমার স্বামী চোরাবাজারের ধনী।......

এই তো মুখবন্ধ। ইহাতে তারাচরণ যে নবগোপালের অর্থে বারে খাইতে দ্বিধা বোধ করিবে, ইহাতে বিস্ময় নাই। কিন্তু মাতালের নীতি রবার দিয়া তৈরী। বাড়াইলে বাড়ে, কমাইলে কমে। যতই রাত্রি হইতে লাগিল, তারাচরণের দ্বিধা ততই অমাবস্যাভিমুখী চন্দ্রের মত ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে মিলাইয়া গেল। অবশেষে গায়ে জামা চড়াইয়া মুখে চুরুট গুঁজিয়া সে নবগোপালের গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় সে নবগোপালের বাড়ি পৌঁছিল। নবগোপাল তখন বৈঠকখানায় বসিয়া কয়েকজন মিস্ত্রী শ্রেণীর লোকের সহিত কথা বলিতেছিল। তারাচরণকে দেখিয়া ইংগিতে বসিতে বলিল। হাজার বিশেক স্টীল ট্রাংক মিলিটারিকে সাপ্লাই দিবার কণ্ট্রাক্ট সে এক সময় পাইয়াছিল। যুদ্ধ সহসা থামিয়া যাওয়ায় সে অর্ডার ক্যানসেল হইয়া যায়। উপস্থিত মিস্ত্রীরা যতটুকু কাজ করিয়াছে, তাহার পারি-শ্রমিক দাবী করিতেছে। নবগোপাল দিতে গররাজী। এই লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল। নবগোপাল মাঝে মাঝে টেবিলে ঘুঁসি মারিয়া চোখ পাকাইয়া মিস্ত্রীদের দাবীর অযৌক্তিক-তার প্রমাণ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়াই তারাচরণের অসহ্য বোধ হইল। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া কলরবের সহিত হাই তুলিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এই লোকটিই হয়তো খানিক পরে মস্ত এক নক্সা দেখাইয়া বলিবে, গরীবদের জন্য একটা স্কুল করে দেব ভাবছি, বাড়ির প্ল্যানটা কি রকম হল বল তো?

তাহার অনুমান একেবারে মিথ্যা দাঁড়াইল না। আধঘণ্টা পরে মিস্ত্রীরা নবগোপালের দাপটে একটা ক্ষতিকর আপোষে রাজী হইয়া চড়াই পাখীর মত কিচির মিচির করিতে করিতে প্রস্থান করিলে নবগোপাল তারাচরণের দিকে ঘিরিয়া কহিল, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে, একটা জরুরী পরামর্শ আছে।

তারাচরণ ভাবিতেছিল, টাকাটা কোন অছিলায় চাহিবে। কহিল, বল।

সেই যে হাসপাতালটা, যাতে আমি বি[illegible] হাজার টাকা দিয়েছিলাম—সেটা এখন আমাদে[র] বললেও বলা যায়—শোভার ভারী ইচ্ছে, সেটা[র] জন্য একটা আলাদা বাড়িই তোলা। পাকা [illegible] আর হবে? তা সে যাই হোক, তাই ভাবছিলা[ম] কি করলে কি ভাল হয়। বরং ভিতরে চ[ল] শোভার সামনেই সব কথা হবে।

—তা যেতে পারি। কিন্তু আমিও একা[টা] জরুরী প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছিলাম

তারাচরণ তাহার প্রয়োজন জানাইল। নব-গোপালের মুখ গাম্ভীর্যে গোল হইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কহিল, সে হবে 'খন তোমাকে নিয়ে একবার ভঞ্জের ওখানে যাব মনে করছিলাম। ওই লোকটার সুপারিশ না হলে টাটার কণ্ট্রাক্টটা পাওয়া যাবে না। অথচ আমি একলা গেলেও বিশেষ কাজ হবে না।

তাহারা উপরে উঠিল। শোভা তখন রান্নাঘরে ছিল। গ্যাসের উনানে নবগোপালের জন্য তাহার প্রিয় কি একটা খাদ্য বানাইতে-ছিল। নবগোপালের আহ্বানে রন্ধন রাখিয়া উঠিয়া আসিল। একটা গোল টেবিলের ধারে বসিয়া হাসপাতাল লইয়া আলোচনা শুরু হইল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রুগী ডাক্তার, ওয়ার্ড বিভাগ, মোট ব্যয় প্রভৃতি লইয়া অনেক কথাই হইল। তারাচরণ মনোযোগ দিয়া কিছুই বিশেষ শুনে নাই। শুধু হ্যাঁ হুঁ দিয়া আপনার ভূমিকা বজায় রাখিতেছিল। নেশার তৃষ্ণায় সে তখন ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতেছে। সহসা শোভার ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রশ্ন কানে আসিয়া তাহাকে নাড়া দিল:—

এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা নিয়েও আপনি বোধ করি কোন নূতন কথা বলবেন? বলবেন, এ সব কাজে হাংগামার মোটেই কোন প্রয়োজন ছিল না?

শোভা হয়তো ভাবিয়াছিল, অন্তত এই ব্যাপারে তাহাদের কাজের জন্য তারাচরণের নিকট হইতে প্রশংসা আদায় করিয়া লইবে।

কিন্তু তারাচরণ ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া আড়ামোড়া ভাঙিয়া সিধা হইয়া বসিয়া কহিল, ঠিক তাই। এ সব কোন কিছুরই দরকার ছিল না।

শোভা কহিল, কেন? যুক্তিটা শুনি।

—খুব সরল। এত ঘটা করে দাওয়াখানা বানিয়ে যাদের উপকারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন আমার বিশ্বাস, এ সবে তাদের

কার যতটুকু হয়, ক্ষতি হয় তার চেয়েও অনেক বেশী। ধনীদের এই সব বিলাস দেখলে আমার সেই পাগলা ডাক্তারের কথা মনে পড়ে, এক হাতে থাকত কলেরার জীবাণুভরা সিরিঞ্জ, অন্য হাতে থাকত স্যালাইন। রাস্তায় সুস্থ লোক দেখলে জোর করে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আগে তার শরীরে ভরে দিত কলেরার জীবাণু, তারপর ভিতরে যখন জীবাণুর কাজ শুরু হয়ে যেত, যখন প্রস্রাব বন্ধ হয়ে, মুখ নীল হয়ে, নাড়ীর আনাগোনা থেমে যাবার উপক্রম হত, তখন অমানুষিক মেহনত করে, তার শরীরে গ্যালন গ্যালন স্যালাইন ঢুকিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করত। শ্রম সার্থক হলে পাড়ার লোক ডেকে এনে গর্ব করে দেখাত, কত বড় মারাত্মক কেস তার হাতে বেঁচে উঠেছে।

শোভা পাংশুমুখে কহিল, এ ব্যাপারে এসব কথা আসে কেমন করে?

—খুবে স্বাভাবিকভাবে। হাসপাতালে ইনজেকসান দিয়ে আপনি ম্যালেরিয়া, কলাউঠা, বসন্ত সারাবেন, মানি; কিন্তু ইন্জেকসান দিয়ে কি দারিদ্র্য সারে? অথচ সেই তো এদের মূল রোগ। অত্যন্ত অল্প মজুরীতে অতিশয় পরিশ্রম করে এরা একশ' বছরের আয়ু ত্রিশ বছরে ফুঁকে দেয়। আর এদেরি ত্রিশ বছরও বেঁচে থাকার যোগ্যতা নেই, তারাই একশ' বছর ধরে সমাজের ওপর প্রভুত্ব করে। খুব সম্ভব, আপনি অত্যন্ত সরল, নাহলে বুঝতেন, সমাজের মর্মে যে ব্যাধির উৎপত্তি, মানুষের মর্মে ছুঁচ ফুটিয়ে তাকে আরাম করার কোন উপায় নেই।

তারাচরণের সহিত আলোচনা হইলেই এইরূপ মতবিরোধ ঘটে। শোভা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, কিন্তু কিছু তো করতে হবে। হাত পা গুটিয়ে চুপ চাপ বসে থাকলেই কি আপনা থেকে সব দুঃখ ঘুচবে?

তারাচরণ কহিল, করার বস্তুর তো অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের। গোটা পৃথিবীটাকে এক সংসার বলে ধরে নিয়ে আপনার মত একজন গৃহিণীকেই যদি তার পরিচালনার ভার দেওয়া যায়, আপনি কি রাখেন এই সব অব্যবস্থা? না, শ্রম করার ভার সমাজের প্রত্যেক সমর্থ লোকের মধ্যে বেঁটে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করেন যাতে দিনে তিন ঘণ্টার বেশী খাটার প্রয়োজন আর কারও থাকে না, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা চালাবার মত যথেষ্ট মজুরী পেতে আর কাউকে ভাবতে হয় না? বোধ করি, মানুষের ভাগ্যের ব্যবস্থা পুরুষের হাতে না রেখে দক্ষ নারীদের হাতে ছেড়ে দিলে অতি অল্পদিনেই এই নিয়মের প্রচলন হত। কি বল নবগোপাল?

বলিয়া তারাচরণ মাটিতে পা বাজাইয়া চেয়ারের হাতলে হাত ঠুকিয়া শব্দ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতিশয় বিরক্ত হইয়া শোভা উঠিয়া গেল।

কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অদূরে রান্নাঘর হইতে শোভার বাসন নাড়ার শব্দ ভাসিয়া আসিল। নবগোপাল কহিল, চল, ভঞ্জর কাছে একবার যাওয়া যাক্।

তারাচরণ কহিল, বার হয়ে।

তাহারা পথে নামিল। কলিকাতায় তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের মুক্তির জন্য উন্মত্ত আন্দোলন চলিতেছে। জনতা বিশেষ করিয়া বিক্ষুব্ধ ছাত্র দলের সহিত বুদ্ধিভ্রষ্ট পুলিসের অসম মল্লযুদ্ধে একদিকে যেমন নিষিদ্ধ সভা ও শোভাযাত্রার বিরাম নাই, অপর দিকে তেমনি মারধোর, গুলী চালনা, আহত নিহতেরও শেষ নাই। লরী পুড়িতেছে। ফিরিঙ্গী মহিলারা নিছক দুধের ছেলের হাতে অকথ্য অপমান সহিতেছে, কেবলমাত্র টাই ও টুপি পরার অপরাধে সরকারের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও রাস্তার কুলির হাতে যার পর নাই নির্যাতিত হইতেছে। বহুদূরে সাগরপারে দীর্ঘ নিশান্তে কোথায় যেন মুক্তির সূর্য মাথা তুলিয়াছে। তাহার আলোর স্পন্দন চল্লিশ কোটি মানুষের শতাব্দী ভোর নিদ্রার জড়িমা যুগপৎ ঘুচাইয়া তাহাদের ভাঙনের নেশায় মাতাইয়া তুলিয়াছে। যে বাধা দিবে, যে সম্মুখে দাঁড়াইবে, সে সাবধান।

ট্রাম, বাস বা কোন প্রকার যানবাহন চলিতেছিল না। আক্রান্ত হইবার ভয়ে নবগোপাল নিজের গাড়িও বাহির করে নাই। চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর উপর দিয়া উভয়ে নীরবে হাঁটিতে লাগিল।

সহসা নবগোপাল কহিল, তোমার মুখ থেকে কমিউনিজমের বাণী শুনব, আশা করি নি, তারা।

তারাচরণ জবাব দিল না। সঙ্গের সাথী চুরুট তাহার মুখেই ছিল। টানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার গোল ঢিমা আলো তাহার বিশাল মুখের উপর পড়িয়া একটা করুণ ও বিষণ্ণ আভা দান করিল। নবগোপালের বাড়ীতে ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া যে সকল কথা সে বলিয়াছিল, এখন মনে হইল, তাহা নিতান্তই বাজে। পাদ্রীকে ধর্মান্তরে দীক্ষিত করার চেষ্টা যেমন নিরর্থক ওই আবহাওয়ায় ওই সকল কথা আলোচনা করাও তেমনি হাস্যজনক। কিন্তু কি শান্তি, কি স্বস্তি, কি সুখের জীবন এই হীনবুদ্ধি দাম্ভিক ও কল্পনাবর্জিত দম্পতি যাপন করিতেছে। বিধাতা বোধ করি তাঁহার অপরূপ ঐশ্বর্যভরা বসুন্ধরা এই শ্রেণীর পশুঘেঁষা মানুষের ভোগের উদ্দেশ্যেই সৃজন করিয়াছিলেন। নাহলে, যাহারা আদর্শবাদী, পঞ্চভূতে গঠিত হইয়াও যাহারা জীবনকে পঞ্চভূতের উর্ধ্বে লইয়া যাইতে চায়, জীবন তাহাদিগকে শুধু কণ্টক বিছাইয়াই অভিনন্দন করে কেন?

নবগোপাল পুনরায় কহিল, তোমার দিকে যখন আমি তাকাই, তারা, কেবল এই ভেবে আমার দুঃখ হয় যে, প্রতিভার কত বড় অপচয়ই না তোমার মধ্যে হচ্ছে। ওরা বিড়লা, টাটার গর্ব করে, কিন্তু আমাদের দেশে তোমার মত ছেলেরা যদি শুঁড়ির দোকানে প্রতিভাকে না বিলিয়ে দিয়ে ব্যবসা ক্ষেত্রে নামত, বাঙলাদেশই কি দু'একজন বিড়লা, টাটার জন্ম দিতে পারত না?

তারাচরণ এবার বোধ করি কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, সহসা চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ ও বহুবাজারের মোড়ে বাঁ দিকে ফিরিতেই দেখা গেল, পূর্ব দিক হইতে অসংখ্য লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পলায়নের ভঙ্গীতে ইতস্তত সরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের কেহ কেহ চাপা স্বরে বলিতেছে, ভাগ্ যাও মিলিটারি, ভাগ্ যাও, মিলিটারি।

আতঙ্ক অতিশয় সংক্রামক। নবগোপাল তারাচরণের হাত ধরিয়া কহিল, চল, ফেরা যাক্ কি একটা গোলমাল হয়েছে।

তারাচরণ দ্বিধান্বিত হইয়া কি করিবে ভাবিতেছিল, সহসা চোখে পড়িল, বন্যার জলস্রোতের মত জনতা অতিশয় বেগে সম্মুখের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অদূরে বারো তের বৎসরের একটি সুদর্শন বালক তাহাতে না ভিড়িয়া দৃঢ়নিবদ্ধ খুঁটির মত অটল হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে উঁচু করিয়া ধরা একটি ত্রিবর্ণ পতাকা মাথায় পথের আলোর আভা লইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে ও দুলিতেছে। ক্ষণেকের জন্য তারাচরণ তাহার দুর্জয় মদ-তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। নবগোপালের কব্জী চাপিয়া ধরিয়া কহিল, অপচয় অপচয় করছিলে। ওই দেখ, ওখানে একটা কাঁচা, তরুণ প্রাণ নষ্ট হতে বসেছে। চল, আমরা বাঁচাই।

নবগোপাল ত্রস্ত হইয়া হেঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, তুমি ক্ষেপলে নাকি? ওর মধ্যে যেতে আছে? এখনই তো মিলিটারী এসে গুলী চালাবে।

দ্রুত পলাইয়া নবগোপাল নিকটবর্তী একটি বড় বাড়ির ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তারাচরণ থামিল না। দুই হাত মুঠো করিয়া সম্মুখে ধরিয়া জলপ্রপাতের মত জনতা ঠেলিতে ঠেলিতে বালকটির নিকট অগ্রসর হইল। উত্তেজনায় ও অজ্ঞাত আতঙ্কে বালকটির শরীর কাঁপিতেছিল। তারাচরণ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, সবাই পালাচ্ছে, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

বালকটি চমকিত হইয়া তারাচরণের দিকে মুখ ফিরাইল। ম্লান আলোয় তারাচরণ দেখিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কহিল, তুমি ভয় পেয়েছ? পালাচ্ছ না কেন?

অপরিচিত দরদীর নিকট হইতে সহানুভূতি পাইয়া বালকটি একেবারে উপচ্ছিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁ হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ধরা গলায় কহিল, না না, আমি পালাতে পারবো না, আমি কিছুতেই পালাব না। আমার হাতে ফ্ল্যাগ আছে।

তারাচরণ অতিশয় মমতার সহিত ছেলেটির মাথায় হাত দিয়া কহিল, থাকলেই বা, ফ্ল্যাগ নিয়েই পালাও না।

বালকটি বার বার জোরে জোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, পালাব না। আমি নিজে ফ্ল্যাগ চেয়ে নিয়েছিলাম। দেবার সময় ওরা বলে দিয়েছিল। ফ্ল্যাগ নিচ্ছ বটে, কিন্তু পালিয়ে যেন ফ্ল্যাগের অপমান কোর না।

বালকের কথা শুনিয়া তারাচরণ আনন্দে আত্মহারা হইল। তাহা হইলে আশা আছে। বহু দূরে দিক্ চক্রবালের গূঢ় অন্তরালে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে করিয়া কে বুঝি বসিয়া আছে। একদিন সে আসিবে, পৃথিবী হইতে নবগোপালের দলকে নির্মূল করিয়া এই বালকের মত নিষ্কলুষ আত্মায় জগৎ ভরিয়া তুলিবে।

ডান হাত দিয়া জোর করিয়া বালকের নিকট হইতে পতাকা কাড়িয়া লইয়া তারাচরণ কহিল, এখনই পালাও, লরী আসছে। ওই বড় ফটকটীর ভিতরে চলে যাও। ওখানে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে।

দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া বালকটি তারাচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

তাহার পিঠে জোরে ধাক্কা দিয়া তারাচরণ কহিল, এখনই পালাও, গুলীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমার হাতে ফ্ল্যাগ রইল, অপমান হবে না।

তাহার বিশাল মুখে বালক কি লেখা পাঠ করিল..কে জানে, সে অবিশ্বাস করিল না। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা ত্রস্ত খরগোসের মত দ্রুতপদে দৌড়িয়া ফটকের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

দৈত্যকন্যার পায়ের ঝুমুরের মত ঝমর ঝমর শব্দ করিয়া গুর্খা ও গোরা সৈন্যে ভরা লরী তারাচরণের নিকট আসিয়া সহসা সম্পূর্ণ ব্রেক কষিল।

বন্দুক উঁচাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে একজন আদেশ করিল, এই হট্ যাও।

তারাচরণ উত্তর দিল না। শুধু হস্তধৃত ত্রিবর্ণ পতাকাটিকে আরও উঁচু করিয়া ধরিল।

ক্রুদ্ধ ডালকুত্তার গর্জন ভাসিয়া আসিল, Swine! Fire!

দুড়ুম দুড়ুম করিয়া উপর্যুপরি কয়েকবার শব্দ হইল। সেই বজ্রনির্ঘোষের তলায় গোড়া-কাটা গাছের মত তারাচরণের পতনের শব্দ একেবারে ডুবিয়া গেল। ফলাফল দেখিবার অপেক্ষা না রাখিয়া মিলিটারী লরী যেমনি দ্রুত আসিয়াছিল, তেমনি দ্রুত সম্মুখের দিকে চলিয়া গেল।

প্রায় পনের মিনিটকাল নিকটবর্তী অঞ্চল-গুলি গভীর রাত্রির পথের মত নির্জন রহিল। তাহার পর তারাচরণের শবের চতুর্দিকে এক এক করিয়া ভিড় জমিতে আরম্ভ হইল। কেহ কেহ শবের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিল, বুলেটের আঘাতে দেহের উপর কয়টা ছিদ্র রচনা হইয়াছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জেলির মত পুঞ্জ পুঞ্জ রক্ত দেখিয়া কেহ বা স্ত্রীলোকের মত হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুকাল পরে জাতীয় এ্যাম্বুলেন্স আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। বড় বাড়ীর আশ্রিত জনতা ইতিমধ্যে দলে দলে ফটক পার হইয়া পথে নামিয়াছে। সকলের পিছনে আসিল নবগোপাল।

কৌতূহলী চিত্তে ভিড় ঠেলিয়া সে যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মাল্যভূষি[ত] শব মর্গে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে তো[লা] হইয়াছে। ভিতরে উঁকি দিয়া মুখ দেখিব[ার] জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু মাল্যস্তূপে চা[পা] ছিল বলিয়া বড় কিছুই নজরে পড়িল না।

গাড়ীতে তখন স্টার্ট দিয়াছে। একজ[ন] স্বেচ্ছাসেবক দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহ[ার] দিকে চাহিয়া নবগোপাল চীৎকার করি[য়া] জিজ্ঞাসা করিল, কি হল ভাই? কে মরল?

পাথরের মত ভাবহীন মুখে ও ভাবহ[ীন] স্বরে স্বেচ্ছাসেবক জবাব দিল, শহিদ।

ষোল

চারদিকে অন্ধকার—কালো কালির মতো অন্ধকার। তমসার নিশ্ছিদ্র যবনিকা দিয়ে কেউ যেন সব কিছুকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। সরু গলির মধ্যে চলতে চলতে নানাধরা ঠান্ডা দেওয়ালে বারকয়েক ধাক্কা খেলো হেমন্তবাবু। জুতো দিয়ে বেড়ালের মতো কী একটা জানোয়ারকে মাড়িয়ে দিলে, তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সেটা। ছুঁচো।

—শালার—

টলতে টলতে হেমন্তবাবু বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল।

—শালার যুদ্ধ বেধেছে। সব অন্ধকার। পড়ুক—পড়ুক, বোমা পড়ুক। বাবুরা তো পালিয়ে বাঁচল, আমি এন্ডি-গেন্ডি ছানাপোনা নিয়ে পালাই কোথায়?—বিড় বিড় করে হেমন্তবাবু বকতে লাগলঃ পড়—পড়, জাপানী বোমা—লাগ্ বাবা ভানুমতীর খেল। চুরমার হয়ে যা সব—খাস্তা হয়ে যা। খেঁদী মরুক—আমাকে ঘর থেকে বার করে দিলে। মরুক—মরুক—সব মরুক—

—কিন্তু—হেমন্তবাবুর নেশায় আচ্ছন্ন মগজের ভেতরে হঠাৎ চেতনার বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। নিজের বাড়ির কথা এতক্ষণে মনে পড়েছে—পঞ্চানন সিকদার লেনের সেই একতলা ঘরখানার কথা। হঠাৎ হেমন্তবাবুর কান্না পেল। মরবে, মরবে? তার ঘর আছে, ছেলেপুলে আছে। টুনু, বুঁচি, বিজলী আছে—স্ত্রী আছে। না—না কখনো বোমা পড়বে না। হেমন্তবাবু মরবে না, তারা মরবে না—সবাই বাঁচবে—বাঁচবে—

সবাই বাঁচবে। হেমন্তবাবুর মুখ চেয়ে এতগুলি প্রাণী বেঁচে আছে। মাথার ওপর টপ টপ করে বর্ষার জল পড়ছে—আস্তে আস্তে ফিরে আসছে সম্বিৎ। নাঃ—খুব অন্যায় হচ্ছে। আর নেশা করবে না হেমন্তবাবু। কাল থেকে এ পথে আর পা দেবে না সে। যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধ একদিন থামবে; এই ব্ল্যাক-আউট থাকবে না, সূর্য উঠবে, অন্ধকার মিলিয়ে যাবে ছায়া হয়ে। সবাইকে বাঁচতে হবে।

জোর পা চালিয়ে দিলে হেমন্তবাবু—নেশার ক্লিষ্ট পায়ে যতটুকু জোর পাওয়া যায়। ঘরের কথা মনে পড়েছে—মনে পড়েছে টুনু—বুঁচি—বিজলীর কথা—

কিন্তু ভালো করে মনে পড়বার আগেই মাথায় যেন প্রচন্ড একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল। চোখের সামনে অন্ধকার কলকাতা ভেঙে গেল হাজার টুক্‌রো হয়ে, শেষবারের মতো আলো দেখতে পেলো হেমন্তবাবু। রাশি রাশি আলো—অজস্র আলো—হাজার হাজার ফুল-ঝুরির ঠিকরে-পড়া গণনাতীত আলো!

ট্যাক্সি ড্রাইভার মুহূর্তের জন্যে ব্রেক্ কষলে, পরক্ষণেই বিদ্যুতের মতো ছুটিয়ে দিলে গাড়িটাকে।

রমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। ব্যাকুল গলায় বাসুদেব বললে, এই রোখো, রোখো, আদমী চাপা পড়ল যে—

ড্রাইভার গাড়ি থামালো না, বরং আরো স্পীড্ বাড়িয়ে দিলে।

—রোখো—রোখো—

—চুপ্‌চাপ রহ্ যাইয়ে বাবুজী—মাতোয়ালা থা—ড্রাইভারের কণ্ঠ নিরাসক্ত।

—তাই বলে—

ড্রাইভার যেন ধমক দিলে এইবার। পুরো বহরের ছয়হাত পাঞ্জাবী, গলার স্বরে কর্কশ নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরুলঃ বাস্ বাস্। পুলিশ পকড়নেসে আপ্‌কো ভি মুস্কিল হো জায়গে। উও মাতোয়ালা থা—মোটরটা আগ্‌সে আ পড়া—

তা সত্যি। মাতাল নিজের দোষে চাপা পড়েছে—তার জন্যে কে দায়ী? যে মাতাল সে গাড়ি চাপা পড়বেই—হয় বাসুদেবের, নইলে আর কারোর। বাসুদেবের ট্যাক্সির নীচে সে স্বর্গলাভ করল—এ দুর্ভাগ্য তার নয়, বাসুদেবেরই।

অতএব—

অতএব আরো জোরে ছুটিয়ে চলো মোটর। শীতের রাত্রি—গরম বিছানা, নিশ্চিন্ত আরাম। এমন সময় পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ার অর্থ যে কী শোচনীয় তা বাসুদেব জানে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কতদিন যে তার জের চলবে কে জানে।

তা ছাড়া যুদ্ধ থামলে রমলাকে নিয়ে পার্লহারবারে যাবে বাসুদেব, যাবে ম্যানিলায়। সে বহু দূরের পথ। এখানে এখনি তার ট্যাক্সি থামলে চলবে কেন।

ওদিকে বেশ জমিয়ে নিয়েছে আদিত্য।

জেলখানার একটি মনোরম ঘরে সে আশ্রয় পেয়েছে! আদিত্য ভাবছেঃ হমেনন্ত্—হমেনন্ত্! স্বর্গসুখ ভোগ করা আর কাকে বলে! দিল্লীর দেওয়ানী খাস যাঁরা গড়েছিলেন—তাঁদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে জেলখানার এই ইন্দ্রপুরী তাঁরা দেখতে পেলেন না!

কত বড় বাড়ি, আর তার কী রাজকীয় বন্দোবস্ত! আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর, লোহার শিকের বেড়া। অতি সাবধান, অতি সতর্ক। পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই এখন তাকে স্পর্শও করতে পারে। সে আজ রাজবাড়ির অতিথি—স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বলে মনে হচ্ছে! বাগানের ম্যানেজার খুন হয়েছে, অতএব কলকাতার আমদানী আদিত্যকে ধরে চালান দাও। কে ম্যানেজার, কী হয়েছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু কিছু না জানাতেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে বেশি কিছু বোঝবার আগেই তার শাস্তি হয়ে যাবে। বেঁচে থাকুন রাজা হবুচন্দ্র আর তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী। মানুষকে তাঁরা অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শুধু একটা জিনিস খচ খচ করছে মনে। অনিমেষের হল কি? অমনভাবে তাকে চিঠি দিয়ে ডেকে আনবার তাৎপর্যটাই বা কি হ'তে পারে? কিছুই করতে পারল না আদিত্য। লাভের মধ্যে ডি-এস-পি তাকে অনেক তর্জন-গর্জন করলেন, স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে পাঁয়তারা ভাঁজলেন অনেকখানি।

—বিশ্বাস করো সাহেব, আমি কিছু জানিনে।

—Perhaps you know many things about the murder Babu! Confess it like a nice chap and get rid of all these troubles!

—ইম্‌পসিবল্! আমি বলিটেছে—টোমাকে কন্‌ফেস করিটে হোইবে।

তুমি তো বলিটেছে—কিন্তু আমাকে কী কন্‌ফেস করিটে হোইবে। পত্রপাঠ মেনে নিতে হবে যে, আদিত্য রবার্টসকে খুন করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের দায়মুক্তি হয়ে যাবে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সে নিশ্চিন্তমনে পাইপ ধরাবে! আদিত্য পরোপকার করতে নেহাৎ অরাজী নয়; কিন্তু দধীচির মতো অত বড় আত্মত্যাগে তার আপত্তি আছে। তা ছাড়া উপকার করবার লোকের অভাব নেই সংসারে—সাহেবকে ঠিক অতখানি যোগ্য ব্যক্তি বলে কোনমতেই আদিত্য মেনে নিতে পারেনি।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। নিশ্চিন্তে হাজতে আশ্রয় পেয়েছে আদিত্য। কলকাতায় খবর পাঠিয়েছে, ওখান থেকে যতক্ষণ ব্যবস্থা না হয়—ততক্ষণ এখানেই বাস করতে হবে। তা ছাড়া যে রকম ব্যাপার—জামিন দিলে হয়।

সাহেব চটে বলেছে, আমি টোমাকে ডেখিয়া লইবে।

আদিত্যের হাসি পেয়েছিল। জবাব দিয়েছে, লইয়ো।—তারপর সাহেবের ভাষার প্যরডি করে বলেছেঃ শাদা চোখে ডেখিতে না পারিলে, মাইক্রোস্‌কোপ লইয়া ডেখিয়ো।

দুঃখের কথা, সাহেবের রসজ্ঞান নেই। সুতরাং ঘৃতাহুতি পড়েছে আগুনে। বলেছেঃ টুমি বড়্‌মাস আছে।

—তাতো বটেই। 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ'—ইতি দুই বিঘে জমি।

সাহেব খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে আদিত্যের মুখের দিকে। পাগল নয়তো লোকটা?

তারপর বলেছে, লে যাও।

—তোমারও দিন একদা আসবে বৎস—সেদিন আমিও তোমাকে ডেখিয়া লইবে—স্বগতোক্তি করে করে পুলিসের পাহারায় চলে এসেছে আদিত্য। নীল চোখ দুটোতে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আড়াল থেকেও বক্র ঝিকিয়ে উঠেছে। ক্তদূর মনে হচ্ছে কিছুই হবে না, দিন কয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে শুধু। কিন্তু কাজ নষ্ট হয়ে গেল। অনিমেষের কি হল—ব্যাপারটাই বা কি ঘটেছে আসলে কিছুই বুঝতে পারছে না।

সুতরাং আপাতত কম্বলাসনে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। যোগনিদ্রাই বটে! কম্বলের এই মনোহর শয্যায় যোগী ছাড়া শয়নানন্দ উপভোগ করা একটু শক্ত। লোহার খোঁচা খোঁচা তারের মতো কম্বলের রোঁয়া, তার সংঘর্ষে গায়ের ছাল-বাকলশুদ্ধ উঠে আসবার উপক্রম করে। পুলিসী শাসনের সুযোগ্য সহকারীরূপে তার ভেতরে কৌরব অক্ষৌহিণীর মতো অগণ্য ছারপোকা। হঠাৎ আদিত্যের একটা থিয়োরী মনে এল। রাজদ্রোহীদের দমন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ফাঁসিকাঠ নয়, তুড়ুং ঠোকবার মতো এই একখানা কম্বল বাধ্যতামূলকভাবে গায়ে জড়িয়ে রেখে তাদের তিনদিন ঠায় বসিয়ে রাখা। ব্যাস—আর দেখতে হবে না। ফাঁসির চাইতে সেটা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ এবং হিতকর হবে।

ঠিক আদিত্যের ভাববার প্রতিধ্বনি করেই যেন পাশের যোগশয্যা থেকে কে বললে, উঃ—শালার কি ছারপোকা রে! 'বাগ্‌' নয়তো 'বাঘ!'

বোঝা গেল লোকটির ইংরেজি বিদ্যা আছে। হঠাৎ আদিত্যের কৌতুকবোধ হল। একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছেও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে।

—ঠিক বলেছেন মশাই। একেবারে সোঁদরবনের বাঘ। চুষে আঁঠি বের করে ফেললে।

ঘরে দুর্গন্ধ অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আদিত্য টের পেলো সমর্থন পেয়ে পাশের বিছানার লোকটি উৎসাহিত হয়ে উঠে বসেছে।

—আপনিও ভদ্রলোক নাকি! বাঁচালেন মশাই, একটা কথা কইবার লোক পাওয়া গেল। খোট্টা আর মেড়োর পালের ভেতরে পড়ে প্রাণটা ছট্‌ফট করছিল। তারপর, এখানে ঢুকলেন কি মনে করে?

—সাধ করে কি আর ঢুকেছি! ধরে ঢোকালে আর কি করতে পারি বলুন?

—তা বটে। উত্তরে পাশের ভদ্রলোকটি খুশি হয়েছে বলে মনে হলঃ কী করেছিলেন?

আদিত্য নিরাসক্ত গলায় জবাব দিলে, বেশি কিছু নয়, এক ভদ্রলোকের পকেট হাতড়েছিলাম।

—আরে, একই দলের যে—ভদ্রলোকটি রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলঃ আমারও অবস্থা ওই রকম। বললাম, বিড়ি খুঁজছিলাম—তা বিশ্বাস করলে না। ব্যাটাদের ধর্মভয় নেই—ব্রাহ্মণ সন্তানকে এনে হাজতে ঢোকালে। পাপের ভরা ওদের পূর্ণ হয়ে উঠেছে মশাই, দেখবেন দুদিন পরেই জাপানী বোমা ওদের ঠাণ্ডা করে দেবে।

যাক—সঙ্গটা ভালো। একে ভদ্রলোক, তার ওপরে ব্রাহ্মণ সন্তান।

—ঠিক বলেছেন। ব্রহ্মশাপ ক্ষত্রিয় পরীক্ষিৎ এড়াতে পারলে না তো ম্লেচ্ছ ইংরেজ কোন্ ছার!

—আপনি রসিক লোক। বিড়ি আছে দাদা?

—না মশাই, কোথায় পাবো?

—ধ্যাৎ, কোন কাজের লোক নন আপনি। পয়সা-টয়সা লুকোনো আছে কোথাও? থাকে তো দিন, ওয়ার্ডার ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করলে মিলতে পারে।

—না পয়সাও নেই।

—ধ্যাৎ—কিছু হবে না আপনাকে দিয়ে—ব্রাহ্মণসন্তান আবার নিরাশচিত্তে কম্বলাসন গ্রহণ করলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'এই বুঝি প্রথম এলেন?'

—হুঁ—আর আপনি?

—এবার নিয়ে বার পাঁচেক হ'ল। কী করব মশাই। লেখাপড়া শিখিনি, চাকরী পাই না। ঘরে বউ আছে, ছেলেপিলে আছে। বাঁচতে তো হবে একরকম করে।

বাঁচতে হবে। সব চাইতে বড় কথা, সব চাইতে নিষ্ঠুর আর নির্মম সত্য। কিন্তু বাঁচবার তাদের অধিকার নেই। প্রতি পদে পদে তাদের খর্ব করো, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের ঠেলে দাও সুস্থ জীবন আর সহজ মনুষ্যত্বের সীমারেখার বাইরে—গ্লানি আর অপরাধের ক্লেদ-পঙ্কিল অন্ধকার গহ্বরটার ভেতরে। সেখানে তারা হাহাকার করুক, তারা আর্তনাদ করুক—আকাশ-ফাটানো গলায় স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে অভিসম্পাত করুক। কিন্তু তোমরা তা শুনতে পাবে না। তোমাদের ঘরে এখন 'জাজ্‌' রেকর্ডে নাচের সুর বাজছে, তোমাদের রুপালি পর্দায় এখন কোকোনাট গ্রোভের প্রেমস্বপ্ন মদির হয়ে উঠেছে, তোমাদের বেতারযন্ত্রে এখন কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে বিজয়ী বাহিনীর জয়যাত্রার ইতিহাস। সম্মুখের রণাঙ্গনে তোমাদের সেনাবাহিনী কামান গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে—ঔপনিবেশিক মুক্তিকার অধিকার নিয়ে ক্ষমতালুব্ধ শক্তির সংগ্রাম। তোমরা পেছনের কালো গহ্বরের দিকে তাকিয়ো না; উপনিবেশকে আয়ত্ত করো, কিন্তু উপনিবেশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো না। দুঃখ পাবে—লজ্জা পাবে, নিজেদের কীর্তির পরাকাষ্ঠায় নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তার চাইতে জাজ রেকর্ড, সিনেমার গান বেতারের প্রচণ্ড কলরব এবং রণাঙ্গনের কামান নির্ঘোষের মধ্যেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে তলিয়ে দাও—এত বড় জগৎ—এমন বিপর্যস্ত বিপ্লববিক্ষুব্ধ জগৎ তার মাঝেখানে বিন্দুবৎ হয়ে মিলিয়ে যাবে। মনে রেখো, অনেক মানুষকে অমানুষ না করলে তোমরা অতিমানুষ হতে পারবে না।

আদিত্য আস্তে আস্তে বললে, হাঁ, বাঁচতে হবে বইকি।

—কিন্তু বাঁচতে দিচ্ছে কে দাদা? যা যুদ্ধ বেধেছে। আমি চলে এলাম জেলে—ছেলে-পুলেগুলো না খেয়ে মরবে? ব্যাটারা এনে জেলে ঢোকাতে পারে, কিন্তু খেতে দিতে পারে না কেন বলতে পারেন মশাই?

—যেদিন খেতে দিতে পারবে, সেদিন আর জেলখানা থাকবে না। খেতে দিতে চায় না বলেই তো পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার জেল-খানা ওরা গড়ে রেখেছে।

লোকটি কি বুঝল, কে জানে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরে বললে, হুঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

বাইরে থেকে সেন্ট্রি ধমক দিলে রূঢ় গলায়।

—অ্যাই—বাত্‌চিত্ মত্ করো। চুপসে নিন্দ যাও—

ধর্মরাজ্যের ধর্মশালায় অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে দূরে কাছে সেন্ট্রির জুতোর শব্দ বিচিত্রভাবে পাষাণ-পুরীর অন্ত্য-প্রত্যন্তে পড়তে লাগল মূর্ছিত হয়ে, আর অকারণে কাণ পেতে শব্দটা শুনতে লাগল আদিত্য।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

প্রাগৈতিহাসিক

অমরজ্যোতি সেন

আমাদের এই জগৎ সংসারের ইতিহাস অত্যন্ত রহস্যময়। মাত্র দুইশত বৎসর পূর্বে এই জগৎ সংসারের ইতিহাসের বেশীরভাগ পাতাই আমাদের কাছে অপঠিত ছিল, মাত্র তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তখন আমাদের কাছে জানা ছিল। সত্য বলতে কি আমরা এখনও যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের নীচে বাস করছি, আমরা কে? কোথা থেকেই বা এলুম আর শেষ পরিণতিই বা কি? সুচিন্তিত গবেষণা, ধৈর্য ও একাগ্র সাধনার ফলে আমরা এখন জগৎ সংসার ও পৃথিবীর ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা পড়তে সক্ষম হয়েছি।

আজ পৃথিবী যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে, বহু বহু বৎসর পূর্বে কিন্তু এই রকম ছিল না। গোড়ায় সূর্য ও অপরাপর গ্রহ মিলিয়ে ছিল একটি বিরাট অগ্নিপিণ্ড, অসম্ভব গরম। যে কোন প্রকারেই হোক সেই বিরাট সূর্য থেকে কয়েক টুকরো সূর্য ছিটকে বেরিয়ে এল, কিন্তু আসল সূর্যের আকর্ষণ-মুক্ত হয়ে বেশীদূরে যেতে পারল না, যেন অদৃশ্য দড়িতে বাঁধা পড়ে তাদের পিতা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। আমাদের পৃথিবীও এই রকম করেই সূর্যের গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। প্রথম অবস্থায় নিশ্চয় খুবই গরম ছিল; কিন্তু সূর্য অপেক্ষা অনেক ছোট বলে' তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়েছে। সূর্যও অবশ্য ক্রমশ ঠাণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু খুব ধীরে। আমাদের পৃথিবীর মতো ঠাণ্ডা হ'তে কত লক্ষ বৎসর লাগবে বলা শক্ত।

পৃথিবী যেমন সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সেইরকম চন্দ্র ছিটকে বেরিয়েছে পৃথিবী থেকে। অনেকে মনে করেন, জাপান ও আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে যে বিরাট গহ্বরে প্রশান্ত মহাসাগর স্থান পেয়েছে, সেই গহ্বর থেকেই জন্ম হয়েছে চন্দ্রের।

জগৎ সংসারের এই অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের "সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়" নামক কবিতায়ঃ—

"বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হইতে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে,
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,

অ্যামিবা

প্যারামিসিয়াম

ইউগ্লিনা

পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্ট এক কোষী প্রাণী

অন্ধকার শূন্য মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।"

তারপর একদা......

"থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিবে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিবাইল নিজের হুতাশ।
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,—"

সেই সমস্ত সূর্যের টুকরো, সূর্যের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ জমাট বেঁধে এক একটি গ্রহ ও উপগ্রহে পরিণত হ'ল। আমাদের পৃথিবীও ক্রমশ ঠাণ্ডা ও শক্ত হ'ল। কিন্তু পৃথিবী তাপ হারাবার সময় অনেক কারণে সব দিকে চাপের মাত্রা সমান হ'ল না যে জন্য কোনদিক হ'ল উঁচু, কোনদিক হ'ল নীচু। এই রকম কোন এক ওলট-পালটের সময়ে হিমালয় পর্বত মাথা ঠেলে উঠেছে।

পৃথিবীর উপরিভাগ অবশ্য ক্রমশ ঠাণ্ডা হ'ল, কিন্তু অভ্যন্তর এখনও গরম আছে। এই ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়ার সময় পৃথিবীর উপরে বায়ুস্তরের জলীয় বাষ্প গলে' গিয়ে বৃষ্টি হয়ে নেমে এল। সেই বৃষ্টির জলে পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত গর্ত ভরে' যেয়ে সৃষ্টি হ'ল হ্রদ, সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের। এই ভাঙাগড়ার কাজ এখনও চলেছে, এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই মাঝে মাঝে হয় ভূমিকম্প, তাই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে জেগে ওঠে দ্বীপ। আজও বৃষ্টি পড়ে', তুষারপাত হয়, ঝড়ও বয়; পৃথিবীর গা ধীরে ধীরে চূর্ণ করে নদী বয়ে চলেছে সমুদ্রে, সেখানে স্তরের পর স্তর মাটি জমে তৈরী হচ্ছে পাথর; কবে আবার তা মাথা ঠেলে উঠবে।

এই রকমভাবে যে জগৎ সংসারের সৃষ্টি হ'ল, তা অবশ্য মাত্র কয়েক শত কিংবা কয়েক সহস্র বৎসরে হয়নি। যদি কেবলমাত্র পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি থেকে আর আজ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেই সময়টিতে বারো ঘণ্টার পরিবর্তে একটি চব্বিশ ঘণ্টা ভাগবিশিষ্ট ঘড়িতে সময় নিরূপণ করা হয়, তাহলে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র দেড় সেকেণ্ড আগে। এখানে এক ঘণ্টা ধরা হয়েছে ১০০,০০০,০০০ বৎসরকে আর ১,৬৬০,০০০ বৎসর এক মিনিটের সমান।

আমরা শুনে থাকি, পৃথিবী থেকে সূর্য, নক্ষত্র ও গ্রহাদি বহুদূরে অবস্থিত, কথাটা ঠিক। সূর্য আমাদের পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে, চন্দ্র সর্বাপেক্ষা কাছে তার দূরত্ব দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল।

যদি আমরা কল্পনা করি যে, আমাদের পৃথিবী একটি ছোট্ট বল যার ব্যাস মাত্র এক

ইঞ্চি, তাহলে সূর্য সেই তুলনায় হবে নয় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলক—যা পৃথিবী থেকে ৩২৩ গজ দূরে অবস্থান করবে। চন্দ্র থাকবে আড়াই ফিট দূরে, যার আয়তন হবে একটি মটরদানার মতো। আর সর্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্র থাকবে পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে।

পৃথিবীতে কবে কোনদিন জীবনের সূত্রপাত হ'ল, তা বলা বড় শক্ত। জীবন বলতে আমরা বুঝি, যা খাদ্য গ্রহণ করে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, নড়তে চড়তে পারে, বংশ বৃদ্ধি করে। এই হ'ল মৃতের সঙ্গে জীবনের পার্থক্য। পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল জলে, এক কোষী এক অপরিণত আণুবীক্ষণিক

জীব ছোট হোক অথবা বড় হোক তার খাদ্য চাই। প্রথম সৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র এক ফোঁটা জীবও তার উপযুক্ত খাদ্যের অনুসন্ধানে জলে বিচরণ করতে লাগল; কারণ তখনও মাটি এত ঠাণ্ডা হয়নি যার ওপর কোনো প্রাণী বাস করতে পারে। সেই ক্ষুদ্র এক ফোঁটা জীবেদের কেউ আশ্রয় নিলে কোনো হ্রদের একেবারে নীচে যেখানে ক্রমাগত মাটি এসে জমছে, যারা কালক্রমে জলজ উদ্ভিদে পরিণত হ'ল। কেউ কেউ আবার জলে ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করল, তারা ক্রমে তাদের দেহে পা গজাতে সক্ষম হ'ল যার সাহায্যে তারা জলের নীচে চলতে পারত। এরা হ'ল জলজ প্রাণী, চেহারা অনেকটা জেলি

আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। এই সম সমুদ্রের জোয়ারের লবণাক্ত জল এসে দি দু'বার তাদের ভিজিয়ে দিয়ে যেত, আবার সে সঙ্গে কোনো নতুন অতিথি নিয়ে আসত, আব হয়ত কোনো পুরনো বন্ধুকে ফিরিয়ে নি যেত।

যে সমস্ত গাছ জল থেকে কর্দমাক্ত স্থা আশ্রয় নিয়েছিল তারা ক্রমশ পৃথিবীর বু বাস করবার জন্য নিজেদের উপযোগী ক নিতে লাগল, নিজেদের সুরক্ষিত করবার জ দেহের চারিদিকে শক্ত ছাল জন্মিয়ে নিজে বাতাস ও জলের উপাদানকে খাদ্যে পরিণ করে' নিলে।

ওদিকে আবার আর একদল প্রাণী অথব মাছ সমুদ্র ত্যাগ করতে আরম্ভ করেছে তারা জলে ফুলকো (gills) দিয়ে আ মাটিতে ফুসফুস দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহ
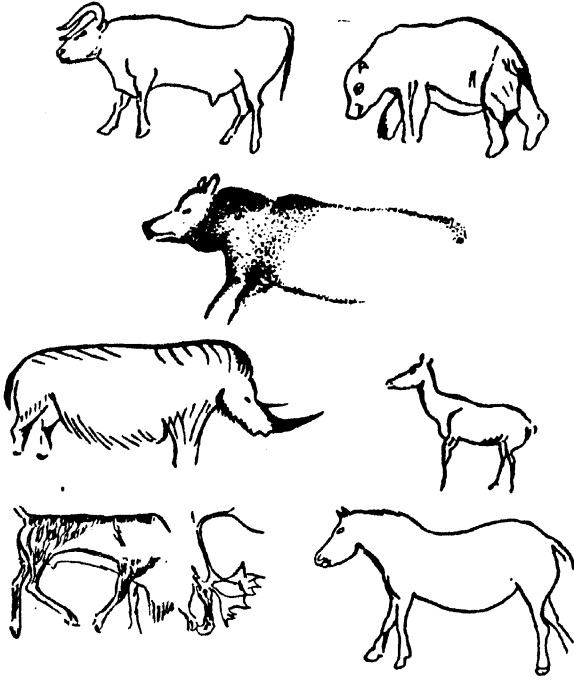
গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবি : প্রস্তর যুগ

প্রাচ্যে অভ্যুদয়

প্রাণীর আকারে। আজকালকার জীবদেহ ঐরূপ বহু সহস্র কোষের সমষ্টি। প্রথম যে জীব দেখা দিল, তা এক ফোঁটা জেলির মতো যার নির্দিষ্ট কোনো আকার অথবা অবয়ব নেই। এই এক ফোঁটা জেলির মতো যে সমস্ত প্রাণী, তাদের বলা হয় এক-কোষী (uni-cellular) জীব; যেমন অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ইউগ্লিনা ইত্যাদি। কালক্রমে এই সমস্ত এক-কোষী জীব থেকেই বহু কোষবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়েছে। তবে আজও ঐ সমস্ত এক-কোষী জীবদের দেখা যায়, যদি আমরা পুকুরের এক ফোঁটা মাত্র জল নিয়ে মাইক্রোস্কোপে দেখি।

মাছের মতো। আরও একদল, যাদের গায়ে আঁশ অথবা শক্ত আবরণী তৈরী হ'ল তারা বেশি পরিধির মধ্যে বিচরণ করতে পারত এবং ক্রমশ সমুদ্র পর্যন্ত পোঁছুতে সক্ষম হ'ল। সমুদ্রে এই সব জীব থেকে নানা রকম মৎস্য অথবা মৎস্য জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি হ'ল।

এই রকম করে' ত' কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেল, পৃথিবীও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, ওদিকে আবার হ্রদ ও সমুদ্রগুলি জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে ভরে' উঠেছে, আর থাকবার জায়গা কুলুচ্ছে না, অবস্থা অনেকটা আমাদের কলকাতা শহরের মতো। তখন তারা জলা জায়গায় অথবা পাহাড়ের নীচে কর্দমাক্ত জায়গায়

করতে শিখল, এরা হ'ল উভচর প্রাণী—যেমন ব্যাং, কুমীর ইত্যাদি। যারা ডাঙায় উঠে এল, তাদের অনেকেই আর জলে ফিরে যেতে চাইল না, তাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন হ'ল, মাটিতে চলবার উপযোগী তারা পা তৈরি করে' নিলে এবং ক্রমশ তারা সরীসৃপে পরিণত হ'ল। কতকগুলি সরীসৃপ এতই বিরাট আকার প্রাপ্ত হ'ল যে বেড়াল যেমন তার ছানা নিয়ে খেলা করে, এই সরীসৃপরা তেমনি হাতীর সঙ্গে খেলা করতে পারত। এই সমস্ত সরীসৃপদের নাম আপনারা শুনেছেন, যেমন ইকথিয়োসাওরাস, মেগালোসাওরাস, ব্রন্টো-সাওরাস ইত্যাদি।

এই সরীসৃপ শ্রেণীর কতকগুলি প্রাণী গাছের উ'চু ডালে বাস করত, তাদের পা কিন্তু খুব কমই ব্যবহৃত হ'ত, তারা এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করত, এই চেষ্টার ফলে হ'ল কি তাদের দেহের চামড়া খানিকটা প্যারাসুটের মতো তৈরি করে নিলে, ক্রমে সেই স্থানে পালক গজালো ও কালক্রমে পাখি হয়ে' তারা এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যেতে সক্ষম হ'ল, যেমন সে যুগের টেরোড্যাক্টিল।

পৃথিবী এই সময় বিরাটকায় প্রাণী ও গাছে ভর্তি ছিল। ঐ সমস্ত প্রাণীর দেহের আকারের তুলনায় মাথা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র কাজেই বুদ্ধি ছিল কম। এই সমস্ত অতিকায় প্রাণী স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারত না, সহজে খাবার সংগ্রহ করতেও পারত না। একদা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক এই সমস্ত জীব ও গাছপালাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নিলে যেখানে কালক্রমে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপ ও মাটির চাপে জীবদেহ চু'ইয়ে নির্গত হ'ল পেট্রল আর গাছ-পালা থেকে হ'ল কয়লা। কাঁচা কয়লায় গাছের ছাল অথবা পাতার ছাপ এখনও দেখা যায়। শুধু কয়লায় কেন? পাথরের গায়ে সে যুগের জীবজন্তু, পোকামাকড়, পাখি ও গাছপালার ছাপ দেখা যায়। এদের বলা হয় 'ফসিল' অথবা জীবাশ্ম। এই ফসিল থেকে এবং সেকালের জীবজন্তুর কঙ্কাল থেকে সে যুগের কিছু কিছু খবর পাই।

এইবার পৃথিবীতে এক শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি হ'ল যারা পূর্ববর্তীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এরা তাদের বাচ্চাদের স্তন পান করাতো যার জন্য এদের নাম দেওয়া হ'ল স্তন্যপায়ী (Mammal)। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বাচ্চাদের যত্ন নিত, অন্য জন্তুদের মতো বাচ্চা প্রসব করেই প্রকৃতির অথবা অন্য শত্রুদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিত না। তখনকার স্তন্যপায়ী জীবেদের মধ্যে অনেকেই এখনও বেঁচে আছে, তবে চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবেদের মধ্যে একদল অন্যান্য দলগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হ'ল, তারা দল বে'ধে বাস করতে শিখল, খাদ্য সংগ্রহেও অন্যান্য জন্তুদের অপেক্ষা বেশী কৃতকার্যতা দেখাতে লাগল, সামনের পা দিয়ে জিনিসও ধরতে পারত। তারপর একদিন সে পিছনের দুই পা দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হ'ল। কাজটা অবশ্য খুবই সহজ নয়, কারণ মানুষকে সাঁতার শেখার মতো দাঁড়াতে শিখতে হয়। এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবরা না ছিল বাঁদর না ছিল হনুমান, কিন্তু দুই শ্রেণী অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। এদের নর-বানর বলা যেতে পারে!

কুমীরের ফসিল

এরা অন্য জন্তুদের অপেক্ষা ভাল শিকারি হ'ল, নানারকম আবহাওয়ায় বাস করতে শিখল, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দল বে'ধে বিচরণ করত, কোনো বিপদের সূচনা দেখলে গলার আওয়াজও করতে পারত এবং সন্তানদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিত। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

আসল মানুষ (true man) বলতে যা বোঝায়, সে কখন ও কোথায় জন্মলাভ করল, সে বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি, আর তার জীবন যাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও কম জানি। হয়ত কখন কোথায় একটা হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল কিংবা কোথাও পাওয়া গেল মাথার একটা খুলি, তাই থেকে এই অতি প্রাচীন মানবদের সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা অথবা কল্পনা করে নিতে হয়।

তাকে দেখতে অবশ্য ভাল ছিল না, মাথায় আমাদের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। প্রখর সূর্য-কিরণ আর শীতের হাওয়ায় তার দেহের চামড়া হয়ে গিয়েছিল রুক্ষ্ম আর ঘোর বাদামি রং-এর, কারণ তখন সে কোনো প্রকার পরিধেয়ের ব্যবহার জানত না। মাথায় খুব লবা লম্বা চুল ত' ছিলই, তাছাড়া হাতে পায়ে আর গায়ের অনেক জায়গাই ঘন ও কর্কশ লোমে ভর্তি ছিল। হাতের আঙুল বাঁদরের মতো সরু ও লম্বা ছিল, কপাল ছিল ছোট আর চোয়াল ছিল দৃঢ়, কারণ দাঁতটাকে ব্যবহার করতে হ'ত। আগুনের ব্যবহার তার জানা ছিল না; আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ছাড়া আগুন সে দেখেইনি হয়ত।

তারা বাস করত গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোন এক কোণে। আজও আফ্রিকার পিগ্মি জাতিরা এইরকমভাবে বাস করে। গাছের কাঁচা পাতা, ফলমূল তার আহার্য ছিল, কখনও কখনও পাখির বাসা থেকে ডিমও চুরি করত আবার কখনও কোনো ছোটখাটো বন্যজন্তু ধরে খেত। যা কিছু খেত সে কাঁচাই খেত। রান্না ক'রে খেলে যে খেতে আরও ভাল লাগে, তখনও এ জ্ঞান তার হয়নি।
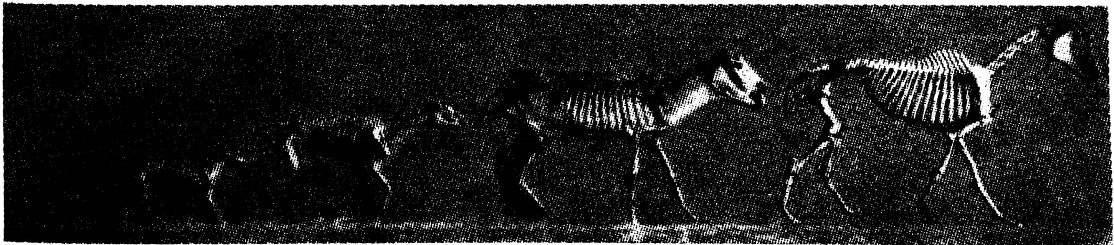
অশ্বের ক্রমবিবর্তন

পেলিওলিথিক যুগের ঐরাবত

দিনের বেলাটা খাবারের সন্ধানে অথবা শিকার করেই সে কাটিয়ে দিত, কিন্তু রাত্রি হ'লেই সে তার সঙ্গিনী ও সন্তানদের কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে গাছের কোটর কিংবা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করত, কারণ সব সময়ে চতুর্দিকে হিংস্র জন্তুদের ভয় ছিল। আজও পর্যন্ত আমরা শত্রুর ভয়ে শহরের আলো নিবিয়ে মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে লুকোবার চেষ্টা করি। তাদের থেকে আমরা কতখানি মানসিক সভ্যতা লাভ করেছি, তার উত্তর কে দেবে! তখন জগৎ ছিল অত্যন্ত হিংস্র (এখনই বা কি!) সব সময়ই যুদ্ধ, হয় মারো নয় মর। যে মরত তার মৃত্যু হ'ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তারা কিছু কিছু অল্পস্বল্প ভাষা জানত, যেমন হয়ত এক প্রকার চিৎকার করে জানিয়ে দিত "একটা বাঘ," আবার হয়ত আর একপ্রকার আওয়াজ করে' জানাত "এক দল হাতী" ইত্যাদি।

এরা তখনও কোনো অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শেখেনি, বাড়িঘর ত' দূরের কথা। তবে তারা অন্য জন্তু অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল আর বুদ্ধিও আস্তে আস্তে খুলছিল, যার সাহায্যে তারা সর্ব অবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে আজ পর্যন্ত শুধু বেঁচে নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। জীবনযুদ্ধে অন্য প্রাণীদের হারিয়ে দিয়ে আজ সে পৃথিবীর রাজা।

আরও কিছুদিন কাটবার পর তারা কিছু কিছু পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখল। কেউ হয়ত দেখলে যে ভোঁতা পাথর অপেক্ষা ছুঁচলো পাথর ছুঁড়ে শত্রুকে মারলে আরও ভাল করে' আঘাত করা যায়, অমনি সে লেগে গেল পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করতে, এই রকম করে' সে পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে শিখলে। আবার কোনোদিন কেউ হয়ত দেখলে যে বনে একটা বড় গাছ আর একটা বড় গাছের গা ঘেঁষে যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখন আগুন জ্বলে উঠেছিল, আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে সে হয়ত পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু কাঠে কাঠে ঘষে সে আগুন তৈরি করতে শিখলে শীত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। কোনদিন হয়ত আবার একটা কোনো শিকার করে আনা পাখি দুর্ভাগ্যক্রমে আগুনে পড়ে গেল। আগুন থেকে পাখিটা তুলে নিয়ে খেয়ে দেখলে ভালই লাগে, এই রকম করে রান্নার উপকারিতাও শিখতে আরম্ভ করলে। আর একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা ছবি আঁকতে পারত। পাথরের গুহার ভিতর, পাথরের দেওয়ালের গায়ে ছুঁচলো পাথর দিয়ে তারা তখনকার যুগের অনেক জীবজন্তুর ছবি এঁকে রেখে গেছে যা আজও দেখতে পাওয়া যায়। এর পরের যুগের শিল্পীরা আবার ছবিতে রং লাগাত। স্পেন দেশের উত্তরে ছবি এখনও দেখা যায়।

যে যুগের মানবের বর্ণনা দেওয়া হ'ল, তাদের বলা যেতে পারে পেলিওলিথি অথবা পিরেনিজ পাহাড়ের পর্বতগুহায় এই রকম পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ। এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তখন পৃথিবীর যতটুকু ছিল, তার অনেকটাই বরফে ভর্তি হয়ে গেল, এ বরফ ছিল বহুদিন তাই সে সময়টাকে বলা হয় তুষার যুগ। এই বরফ উত্তর মেরু থেকে ইংলণ্ড ও জার্মানী পর্যন্ত নেমে এসেছিল। তখন ভূমধ্যসাগর ছিল কয়েকটি হ্রদের সমষ্টি, লোহিত সাগর ছিল না। অনেকেই সেই কঠিন শীতে মারা গেল, যারা আরও উষ্ণ দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল, তারা বেঁচে গেল। এই শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ পরিধেয়ের ব্যবহার শিখলে, তখন থেকে শরীরের লোম ক্রমশ নিষ্প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ল।

তারপর বরফ আবার উত্তর দিকে সরে গেল, নতুন অরণ্য জেগে উঠল মধ্য এশিয়া ও ইয়োরোপের কোন কোন স্থানে আর সেই সঙ্গে জেগে উঠল আরও উন্নত শ্রেণীর মানব-জাতি যাদের বলা হয়, নিওলিথিক যুগের অথবা নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ। এরা যদিও আগেকার পেলিওলিথিক যুগের মানুষদের মতই পাথরের অস্ত্র তৈরী ক'রত, কিন্তু সেগুলি আরও ভাল ছিল। নিওলিথিক যুগের মানুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক চতুর ছিল।

সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল যে, তারা চাষ করতে জানত, কাজেই খাদ্যের অন্বেষণে আগেকার মতো আর বনে-জঙ্গলে ঘুরে

হ্রদবাসীদের বস্তি
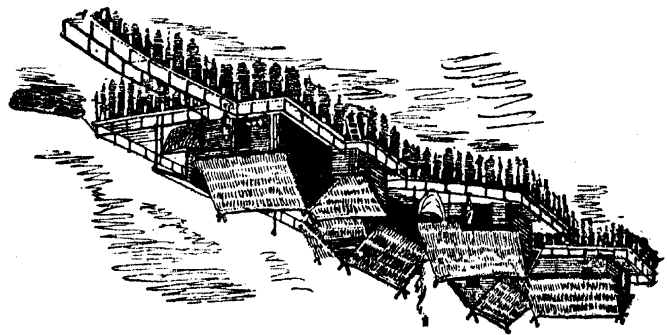
বেড়াতে হ'ত না, অনিশ্চিত হ'ল অনেকটা নিশ্চিত। তারপর তারা জানত মাটির পাত্র তৈরী করতে, কিছু কিছু কাপড় বুনতেও পারত। কুকুর, ছাগল, ভেড়া ও গরুকে গৃহপালিত করতে তারা জানত, আর জানত কুঁড়ে ঘরে বাস করতে। তারা সাধারণত এই রকম কতকগুলি ঘর একত্রে তৈরী ক'রত কোন হ্রদের মাঝখানে, যেখানে অরণ্যের জন্তু তাদের স্ত্রী-পুত্রদের আক্রমণ করতে পারবে না। অতএব বলা যেতে পারে, তারা নৌকোও তৈরী করতে পারত। তারা বন্যজন্তুর ছাল অথবা শণের আঁশ বুনে পরিধেয় তৈরী করত।

এই যুগের লোকেরা ক্রমশ উন্নতি করেই চলল, তারা ক্রমশ ধাতুর ব্যবহার শিখল যেমন তামা ও ব্রোঞ্জ। এই যুগ বোধ হয় দশ হাজার বৎসর স্থায়ী হয়েছিল।

তারপর! তখন ভূমধ্যসাগর ছিল না, ছিল কয়েকটি হ্রদের সমষ্টি, একথা আগেই বলেছি। কোন একটি হ্রদ ও অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝে যে প্রাকৃতিক পাথরের বাঁধ ছিল, তা একদিন গেল ভেঙে। মহাসাগরের জল এসে হ্রদগুলি পূর্ণ করতে লাগল, 'হ'ল ভীষণ বন্যা, হ্রদের সমষ্টি মিশে এক হয়ে' ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হ'ল। এই বন্যার উল্লেখ বাইবেল এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই বন্যাতেও বহু লোকের প্রাণহানি হ'ল, কিন্তু বন্যাশেষে আর এক নতুন যুগের অভ্যুদয় হ'ল, যা হ'ল ঐতিহাসিক যুগ এবং যার সূত্রপাত থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত সব ইতিহাস জানা আছে।

রোটারী মেশিনের ধারে

[কাপেক্‌শড্‌]

[চেকোশ্লোভাকিয়ার শক্তিমান দরদী লেখক কাপেকশড্‌-এর লেখা এই গল্পটি। উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা চেক ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে ইনি অন্যতম। চেক সাহিত্যে এ'র খ্যাতি কৃষি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সংবেদনশীল লেখনীর জন্য। বর্তমান গল্পটিতে আগাগোড়া তাঁর এই সংবেদনশীল মন এবং শ্রমিকচিত্ত উপলব্ধির পরিচয় পরিস্ফুট।]

সহকর্মীরা তার নাম দিয়েছে 'জড়ুগব কুবা'। 'কুবা'টি তার আসল নিজস্ব নাম আর বিশেষণটি লোকের দেওয়া ভূষণ।

কি অদ্ভুত বেগে যন্ত্রের ওপর দিয়ে যেন নেচে চলেছে ঐ লম্বা কাগজের ফালিটা। চওড়ায় তা' ওটি গজ দুয়েক হবে। আর তেমনি একটানা আতঙ্ককর শব্দ, যেন প্রচণ্ড ঝড়ের মাতামাতির আর দাপটের আওয়াজ। কে বলবে ছাপাখানার যন্ত্রের শব্দ শুধু, কে বলবে রোটারি মেশিনেরই রব মাত্র? কুবার ত মনে হয় যেন দৈনিক কাগজখানার সেই দু'লাখ পাঠকের দল ছাপাখানার বাড়ির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে এক নিঃশ্বাসে সবাই একই সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাগজখানার সব কটা কলমই পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কোনো কথা বললে সেখানে শব্দের মাঝে হারিয়ে যায়। কথা কইতে গেলে সেখানে তাই ইসারা আর ইঙ্গিতের সাহায্য নিতে হয়, নয়ত কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফুসফুসের সকল শক্তি এক করে চীৎকার করতে হয়।

কিন্তু তখন অপ্রয়োজনীয় আজে-বাজে কথাবার্তা বলারই বা সময় কোথায়? রবিবারের কাগজের দু'টি সংস্করণ এক সঙ্গে ছাপা হচ্ছে। সেখানে এক সেকেণ্ড সময় বাজে নষ্ট মানে পাঁচকপি কাগজ ছাপা বাকি প'ড়ে যাওয়া রাত্তির এগারোটা থেকে ভোর চারটে, এই যে পাঁচ ঘণ্টা কেবল ছাপার কাজ চলতে থাকে, তখন একটানা উত্তেজনার ঘোরে যন্ত্রদানবের এই বাহনেরা যেন নিজেদেরও ভুলে থাকে। মসৃণ সাদা কাগজের গতির দিকেই দৃষ্টি থাকে তাদের, আর কাগজখানির কোথাও হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে তখনি মেসিন বন্ধ করতে হবে, এই-টুকুই হুঁস থাকে তাদের।

কি যন্তরই মানুষ বানিয়েছে। কুবা কাজ করতে করতে অনেক সময় আপন মনে ভাবে। যে যন্তর হাজার হাজার খবরের কাগজ ছেপে মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে, সে যন্তর মানুষের হাড়গোড়ও তেমনি সহজেই চূর্ণ ক'রে দিতে পারে। কুবা আজ কাজ করার সময় আপন মনে তাই ভাবছে।

যে তিনটি কলকব্জা দিয়ে মেশিনটি বন্ধ করা যায়, তারই একটির ভার কুবার ওপর। আঁকা-বাঁকা পাক-খাওয়া কাগজের কোথাও ছিঁড়ে যেতে দেখলেই মেশিন বন্ধ করার দায়িত্ব তার। তুষারের মত সাদা চকচকে এই কাগজের সর্পিল গতির দিকে তাকিয়ে আছে কুবা। তার উন্নত ঋজু দেহটি সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের মূর্তির মত, যাতে পরনের ঐ সামান্যমাত্র আয়োজনের কোথাও যন্ত্রদানবের দাঁত ফুটে বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে না তোলে। খালি খোলা সরু হাত দুটি তার নড়ছে চড়ছে। হাতের পেশী দুটি যেমন শক্ত, তেমনি চওড়া। কালিঝুলি-মাখা হাত, বিন্দু বিন্দু ঘাম কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে গড়িয়ে পড়ছে মুখের দুপাশ দিয়ে।

কতো কি যে চিন্তায় বোঝাই তার মন এখন। স্রোতের মতো গতিতে তারা যেন তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। অথচ তার গতিবিধি হাবভাব দেখে কে বলবে যে, সে কিছু ভাবছে অথবা কি ভাবছে?

জ্বলন্ত প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের আগুন তার সব দেহে আর মনে। ঐ ত লোকটাকে দেখা যাচ্ছে মাথায় সিল্কের টুপি পরা, দেখা যাচ্ছে তাকে সিলিণ্ডার আর যন্ত্রটির মাঝ-খানের ফাঁকটুকু দিয়ে। এই লোকটি হোলো রোটারি মেশিনটির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। সকলে ডাকে ওকে ম্যানেজার বলে। কুবার যতো আক্রোশ ত ওরই ওপর। আজ রাত্তিরেই তার ইহলীলা ঘোচাবার সংকল্প ও মতলব করছে কুবা মনে মনে। চালু অবস্থায় এই সিলিণ্ডারগুলি আর ঐ যন্ত্রটির কি অসাধারণ ক্ষমতা, কুবা তাই স্মরণ করে। একবার সে নিজের চোখে দেখেছে ঐ ক্ষমতার পরিচয়। তখন সে কাজ করত কাপড়ের মিলে। যন্ত্রের পাকে প'ড় এক বেচারীর প্রাণটা কি তাড়াতাড়ি আর হঠাৎই বেরিয়ে গেলো!

তাইত সে ভাবে ঐ লোকটাকে একবার এই চলন্ত যন্ত্রের পাকে পাকে কোন গতিকে জড়িয়ে ফেলতে পারলেই বাস নিশ্চিন্ত। এটা সে ইচ্ছা করলেই পারে এবং আজ সে তাই করবে। মেশিনে নতুন সাদা কাগজ লাগাবার সময়ই এ কাজের সবচেয়ে সুবিধে। সকাল চারটের মধ্যে যখন হোক ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই হোলো আর কী! কতবারই ত নতুন কাগজ জড়াতে হবে মেশিনে। যে কোনো এই গোটানো কাগজের ফালি থেকেই মৃত্যু কত সহজেই ঘনিয়ে আসতে পারে।

দর দর ক'রে ঘাম ঝরছে শ্রাবণের ধারার মতো। তার ওপর আবার দেখতে দেখতে শুরু হয়েছে সেই পুরানো দাঁতের ব্যথাটা। যন্ত্রণায় তার মাথার ভিতরটা অবধি ঝিমঝিম করতে থাকে। এই দাঁতের কষ্টই তাকে সারলে—ঐ হয়েছে তার এক বিষম দুর্ভোগ প্রত্যেকদিনই রাত্তিরে ঠিক এই সময়টায় মেশিনের ধারে দাঁড়ালেই এই দাঁতের ব্যথা তাকে

যেন পাগল ক'রে তোলে। কি যে সে করবে, এই দাঁত নিয়ে ভেবে পায় না। একবার ভাবে, আপদ দাঁতগুলিকে বিদায় করতে পারলে বোধ হয় পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দিন পনেরো আগের কথা। সেদিন রাত্তিরেও যথারীতি ঐ দাঁতের যন্ত্রণাটা তার চাগিয়ে উঠেছিলো। কে একজন তাকে এক ওষুধ দিলে বাৎলে, লোকটার নাম তার মনে নেই। সেও তার কথা শুনে একচুমুকে আধ পাঁইট মদ অম্লান বদনে খেয়ে ফেললে। লোকটা বলেছিলো, খেতে খেতেই ও সব জ্বালা-যন্ত্রণা বাস একদম খতম, টেরটি পাবে না, এ আমি ব'লে দিচ্ছি। কুবা তার আগে মদ কখনো স্পর্শ করেনি, ও বস্তু যে কেমন, তা'ও জানতো না সে ঘুণাক্ষরেও। সত্যিকথা বলতে কি, খাওয়ার পর যন্ত্রণাটা একেবারেই সেরে গিয়েছিলো; কিন্তু খানিক পরে রোটারি মেশিনের ঐ ভারপ্রাপ্ত লোকটি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে তার দিকে একবার তাকিয়ে ব'লে যায়ঃ কি হে, কুবা কি আজকাল তা'হোলে আবার মদ ধরলে নাকি? তা' হ'লে বাপু তোমাকে দিয়ে আমাদের এখানে রাত্তিরের কাজ চলবে না। পনেরো দিনের নোটিশ দেওয়া রইলো, তারপরে মাইনেপত্তর নিয়ে স'রে পোড়ো।

কি সহজভাবেই লোকটা শুনিয়ে গেলো এই শক্ত শক্ত মর্মান্তিক কথাগুলি। কুবা জানত, এ কথার প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। কাজেই কোন কথাটি বললে না সে, মনে মনে রাগে তার সর্বশরীর যেন জ্বলতে থাকে। বাধ্য হ'য়ে কাজের চেষ্টা করতে হয়, ঘোরাঘুরি করতে হয় আর পাঁচ জায়গায় কাজের সন্ধানে। কিন্তু সেখানেও সাফ জবাব। কেউ বললে, 'ভায়া, বলি তোমার বয়েস কি কিছু কম? চাকরী করার দিন কি আর আছে তোমার?' অন্য জায়গায় সে শুনলে, 'আমাদের ছাপাখানায় কি কারিগর রেখে থাকি আমরা শুধু আমাদের কোম্পানীর ডাক্তারের বিদ্যা যাচাইয়ের জন্য, বাপু?' কাল এক ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার তাকে অম্লানবদনে অযাচিত উপদেশ দিলেন ধাঙগড়ের কাজের জন্য দরখাস্ত পেশ করতে, কেননা সে চাকরীটা তার হ'য়ে গেলেও যেতে পারে। অথচ তার বয়সটা এমন বেশীই বা কী! সাতচল্লিশ বছর। সেদিনও এমনি চাকরীর ধান্দায় বৃথা ঘুরে ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে দেখলে তার সংসারে আরো দুটি প্রাণী বেড়েছে—বৌ প্রসব করেছে একসঙ্গে দুটি যমজ সন্তান। ইতিমধ্যেই ত রয়েছে ঘর জুড়ে আরো ছ'টি। তার ওপর আবার......ক্লান্তিতে নিরাশায় ভেঙে পড়ে কুবা। ভাবে, যমজ সন্তানের এই সময়ে জন্মবৃত্তান্তটা ব'লে ম্যানেজারের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা হয়তো বিশেষ শক্ত হবে না।

পরের দিন লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে

লেও ফেলে কথাটা। লোকটার ভিতরে হানুভূতি জাগলো কিনা কে জানে, বাইরে কন্তু তা প্রকাশ পেলো নাঃ মাতাল নিয়ে ারবার করা বাপু আমাদের দ্বারা হবে না। াতালকে বিশ্বাস কি, কি জানি কোন্‌দিন বা ক ক্ষতি কিংবা খুন-জখম ক'রে বসে। যমজ ছেড়ে তোমার যদি এখন এক একবারে তিন-চারটি ক'রে 'পুত্র-কন্যে প্রবল বন্যে'র মত আসে ত আমি কি করবো?

এর পর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মন তার বিষিয়ে না উঠে পারে কি ক'রে? চারিদিক থেকে আজ সকলে যেন তাকে মরিয়া ক'রে তুলেছে। এর একটা হেস্তনেস্ত তাকে করতেই হবে এবং আজই। কেননা আজই তার নোটিশের মেয়াদ ফুরোবে। কাল থেকে এখানে আর ত তার আসার দরকার হবে না। রোটারি মেশিনের ধারে এখানে যদি তার আজ শেষ রাত্তির হয়, ম্যানেজারেরও তবে তাই হোক্‌।

মেশিন চলছে সমানভাবে, যন্ত্রদানব যেন মেতেছে, কোনদিকে হুঁস তার নেই একটুও। তার ওপর দিয়ে সমানে ব'য়ে চলেছে বিরাট লম্বা ঐ কাগজের ফিতেটা যেন স্রোতের মতন। একটানা অবিরাম ঘরঘর শব্দের মধ্য থেকে সে যেন শুনতে পাচ্ছে তার নতুন যমজ দুটি শিশুপুত্রের কাতরানি। কাগজের ফালির বুকে দেখছে যেন তাদের দুটি কোমল সুকুমার মুখ। ছাপাখানায় আসবার সময় সন্তান দুটিকে যেমনভাবে সাদা বালিসে মাথা রেখে হাতদুটি মুঠো ক'রে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এসেছে তেমনিভাবেই, যেন তারা দেখা দিচ্ছে ঐ গতিশীল কাগজের প্রবাহের বুকে। ক্রমে ভেসে ওঠে স্ত্রীর শান্ত সজল চাহনিভরা চোখ দুটি, আর ক্লান্তিহীন মুখখানি। সে মুখ-চোখের দিকে দীর্ঘ গত এক পক্ষকাল কুবা মোটে তাকাতেই পারেনি।

এ তন্দ্রা তার ছুটে যায় যখনি সিলিণ্ডার দুটির ঘোরা থামে, ইঞ্জিন সুদ্ধ মেশিন বন্ধ হয় নতুন ক'রে আবার মেসিনে কাগজ আঁটার জন্যে। এইবারে তার প্রতিজ্ঞা পূরণের সুযোগ। কিন্তু হাত ওঠে না, বুক কেঁপে ওঠে দুরদুর ক'রে। কেন যে এমন হয়, কুবা ভেবে পায় না। ঐ তো চোখের সামনে লোকটা ইঞ্জিনের মধ্যে হাত পুরে একেবারে রোটারি মেশিনের ধার ঘেঁষে নতুন সাদা কাগজ জড়াচ্ছে, তার হুকুমমত দুজন তাকে দরকারী যন্ত্রপাতি টেনেটুনে নেড়েচেড়ে এই কাজে সাহায্য করছে। একবার হাত ওঠালেই কুবা লোকটার ঐ হুকুম জাহির করা চিরকালের মত ঘুচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শরীর তার অবশ হ'য়ে আসে যেন। নিথর নিস্পন্দ কুবা, পাথরে গড়া মূর্তির মত। আর দুবার কাগজ পরানো বাকী। তবু তার হাত-পা অদ্ভুত-ভাবে কাঁপে যেন প্রবল জ্বরের কাঁপুনিতে।

........এইবার শেষবারের মত কাগজ পরাচ্ছে লোকটা। কিন্তু কুবা, সে যেন মাথাটা সরিয়ে তার দিকে একবার তাকাতে পর্যন্ত পারছে না! এই সময় সুযোগ বুঝে একবার ইঞ্জিনটি চালিয়ে দিলেই লোকটার ঐ বলিষ্ঠ উদ্ধত হাতদুটি দেখতে দেখতে যন্ত্রের গহ্বরে তলিয়ে যাবে।--আচ্ছা, এইবার আস্তে আস্তে. ....বাস্‌। লোকটার ভারী গলার হুকুম। সঙ্গের দুজন তাকে সাহায্য করছে। তার হাত-দুটি সিলিণ্ডারের ফাঁকে নতুন কাগজ লাগাতে ব্যস্ত। কুবা চমকে ওঠে। শেষ মুহূর্ত উপস্থিত।

কিন্তু কোথা থেকে কি যেন ঘটে যায়। বৈদ্যুতিক আলোগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হ'তে হ'তে একেবারে নিভে গেলো। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই যন্ত্রঘর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ঘরময় লোকগুলির তেমনি চীৎকার, আর গালি-গালাজের আওয়াজ। এইবার কুবা আর ঠিক থাকতে পারে না। ডানহাতের সকল শক্তি এক ক'রে সেই অন্ধকারের মধ্যেই সজোরে সে হ্যাণ্ডেলে হাত লাগায়। কিন্তু তার নিজেরই হাতখানি যেন ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। তা' হ'লেও প্রতিহিংসা পূরণের আনন্দে মুখখানা তার ঝলসে উঠেছে, অন্ধকারে কেউ দেখতে পেলে না তাই।

মেশিন কি আবার দমকা শব্দ ক'রে চলতে শুরু করেছে, ঘরঘর আওয়াজে ঘর ভ'রে যায় অমনি! সমস্ত গোলমাল শব্দ ছাপিয়ে কুবার কাণে যেন ভেসে আসে প্রবল যন্ত্রণার গোঙানি ....শত্রুর কাতরানি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কুবা।........কিন্তু কই, শব্দ হঠাৎ কি গেলো থেমে, যন্ত্র কি তবে গেলো আবার বন্ধ হ'য়ে? যন্ত্রণার গোঙানি কি তবে তারই মনের ভুল? শুধু ত কতকগুলি গলার একসঙ্গে আওয়াজই কানে আসছে। ঠিকই ত! ইঞ্জিন ত নিস্তব্ধ, লোকটা ত দিব্যি অন্ধকারে কথা কইছে, যন্ত্রণার বা কাতরানির লক্ষণটুকু নেই।

কুবার সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়। ভেবে পায় না, তবে এ কি হোলো। তার ওপর যে অন্ধকার, কিছুই যে ছাই ঠাহর হয় না। আবার আলো জ্বলে ওঠে। আবার যন্ত্রের কাজ শুরু হয়। এবার সত্যিই রোটারি মেশিন চল্‌ছে--ঐ তো তার একটানা পরিচিত শব্দ। আর ঐ যে কাগজ ছাপা হ'য়ে বেরিয়ে আসছে একের পর এক। রাতও আর বেশী নেই। ছাপাও আর বাকী নেই।

আকাশ ফরসা হ'য়ে আসে। দিনের প্রথম আলোর আভাস জেগেছে, ছাপা শেষ হ'য়ে গেছে। কুবা যেন বিভ্রান্ত, তার দেহে মনে হতাশা আর ব্যর্থ সঙ্কল্পের ভার। তার চেতনা ভাঙে লোকটার কথায়। মেশিন বন্ধ করার হুকুম দিয়ে নিজের কোটটা কাঁধে দুলিয়ে ঐ যে সে তার দিকেই আসছে। এসেই তার গায়ে এক ধাক্কা দিয়ে বলেঃ কি হে জড়্‌গব প্রভু, চাকরী-বাকরী কিছু মিললো এতদিনে? জানি মিলবে না, তোমার কি আর এ প্রেস ছাড়া গতি আছে? কাজেই এখানেই থেকে যাও, কি আর করবে? আরে, তোমার হাতে কি হ'লো হে, রক্ত পড়ছে যে! রোজ তোমাদের সাবধান করছি; তবু তোমাদের না হবে আক্কেল, না হবে হুঁস। আক্কেলও হবে, হুঁসও হবে সেইদিন, যেদিন তোমাদের মধ্যে কাউকে হাত দু'খানি রেখে যেতে হবে যন্ত্রের এই গর্তে। তার আগে নয়। আর, দ্যাখো কুবা তোমার ঐ দাঁতের ব্যথাটা--ঐ সিলিণ্ডারের ওখানটায় কাজ করলেই ওটা চাগিয়ে ওঠে বলেছিলে না, তা' তুমি স্ট্রিজেকের সঙ্গে জায়গা বদল ক'রে নিতে পারো। ওর জায়গাটায় ঠাণ্ডাও নেই, স্যাঁৎসেঁতেও নেই আর.........। বলতে বলতে লোকটা তুড়ি দিয়ে হাই তোলে। দরজার দিকে এগোতেও থাকে সেই সঙ্গে। --দেখুন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। তাড়াতাড়িতে এর বেশী কথা জোগায় না কুবার মুখে। তাও কথাগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না।—রাখো রাখো ঢের হয়েছে, উপস্থিত মঙ্গলটা আমার তেমন দরকার নেই, দরকার তোমার। তা' দ্যাখো, কড়াকড়ি না করলে আমাদেরই বা চলে কি ক'রে? যাক্‌ গে, তোমার হ'য়ে মালিকের কাছে দু'কথা বলতে তবে না হোলো.........শুধু ঐ সন্তান দুটির দৌলতেই কিন্তু এবারটা........আচ্ছা চললুম, তা'হ'লে। ব'লে লোকটা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তেলকালি আর রক্তমাখা হাত দুটিতে মুখ ঢেকে কালির একটা পিপের ওপরই বসে পড়ে কুবা। রোটারি মেশিনের ধারে ফোঁপানি আর চাপা কান্না শোনা যায় 'জড়্‌গব কুবা'র। অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়ায় তার দুই হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

অনুবাদক—গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের লুপ্ত শহর সপ্তগ্রাম

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ

স প্তগ্রাম ভারতের একটি সুপ্রাচীন স্থান; এই বিখ্যাত অংশ পূর্বে 'সাতগাঁও' নামে [পরি]চিত ছিল। হিন্দু শাসন সময়ে সপ্তগ্রামে বহু [রাজা] রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। [সপ্ত]গ্রাম শহর পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে [অব]স্থিত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্বেও [সরস্ব]তীর বিশাল বক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান [হই]তে আগত বাণিজ্যতরীগুলি বিরাজ করিত। [ইউ]রোপীয় লেখকগণ এই সরস্বতী নদীকে [সা]তগাঁ রিভার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [সরস্]বতী নদী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া পশ্চিম-[দক্ষি]ণ মুখে আদমজুড়, আমতা, তমলুক প্রভৃতি [স্থা]নের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বাণিজ্য-[পো]তগুলি দেশ বিদেশের রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রাম [বন্দ]রে বহন করিয়া আনিত। মূল সরস্বতী নদী [শিব]পুরের বোটানিকেল গার্ডেনের কিছু নীচে [সাঁ]খরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত [হয়]। সরস্বতী ও সপ্তগ্রামের প্রাচীন গৌরবের [অসং]খ্য পরিচয় পাইলেও আজ উক্ত ইতিবৃত্ত স্বপ্ন-[কা]হনীতে পর্যবসিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক [ইতি]হাস আছে; সুদূর অতীতে কাণ্যকুব্জে [প্রি]য়বন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্নিত্র, [মে]ধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিষ্মান্, [সব]ন ও ভব্য নামে সাতটি পুত্র ছিল। তাঁহারা [গৃহ]াশ্রমী না হইয়া নিভৃত নির্জন গঙ্গা-যমুনার [সঙ্গ]মস্থলে সাতখানি বিভিন্ন গ্রামে তপঃসাধনায় [ব্র]তী হইয়াছিলেন; সপ্তঋষির তপঃস্থলী বলিয়া [ঐ] স্থান সপ্তগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। যে সাতখানি [গ্রা]মে তাঁহারা তপঃশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রাম-[গু]লির নাম বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, [কৃষ্ণ]পুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেক-[জা]ণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাসা তীরে [উপ]স্থিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার নিকট ['প্রা]সিই' (Prasi) এবং 'গঙ্গারিডয়' [(G]anharidade) এই দুইটি রাজ্যের সংবাদ [আ]সিয়াছিল। ইহার পরে গ্রীক দূত মেগাস্থিনাস্ [পা]টলিপুত্র নগরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়া-[ছি]লেন। তিনিও মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ['প্রা]সিই' অর্থাৎ মগধ এবং উহার পূর্বদিকে [অ]ধীন 'গঙ্গারিডয়' রাজ্যের রাজধানী সপ্তগ্রামের [কথা] উল্লেখ করিয়াছেন। (Portuguse in [B]engal, Page 78).

বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা, নদীয়া জেলার [প]শ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত [সাত]গাঁ নামে অভিহিত এবং সপ্তগ্রাম এই বিভাগের [রাজ]ধানী ছিল। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত [ত্রি]বেণী তীর্থের গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের সমীপ-[দে]শে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের 'আদি-সপ্তগ্রাম [না]মক স্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম শহর [অব]স্থিত ছিল। এই স্থানটি হুগলী শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় চার মাইল এবং কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে অক্ষাংশ ২২°৫৮'২০" উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২৫'১০" পূর্বে অবস্থিত।

ভারতের প্রাচীনতম শহর সপ্তগ্রাম সমগ্র ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া সরস্বতীর বক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি করিত। সরস্বতীর বিশাল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সপ্তগ্রামের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া-ছিলেন—

"That the ships near the Godaveri sailed from thence to Cape Palimerno, thence to Tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni". (Calcutta Review 1846. Page 408).
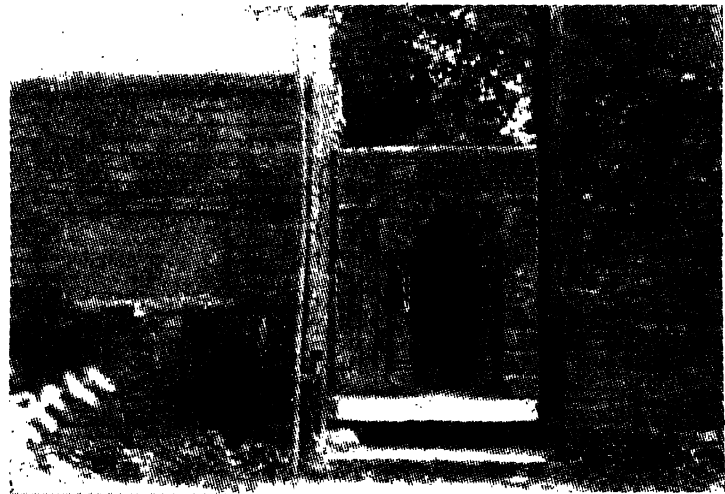
রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লীনির সময় হইতে পর্তুগীজদের আগমনকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম রাজকীয় বন্দর ছিল।

(By the banks of the Bhagirathi, Cal. Review).

সপ্তগ্রাম মহানগরে যেমন বহু লোকের বাস ছিল, সপ্তগ্রামের তলদেশবাহিনী সরস্বতী বক্ষেও সেইরূপ বহু অধিবাসী পোতপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। বাণিজ্যালয়, ধনীদিগের বিরাট প্রাসাদ, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের ধর্মমন্দির, বিস্তৃত রাজপথ এবং রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ সপ্তগ্রামের শ্রী ও সজীবতা রক্ষা করিত এবং এই স্থানের বণিক সম্প্রদায় শতসৌধ চূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া ভারতের জয়গান ঘোষণা করিত। প্রাচীন রোম প্রভৃতির বৈদেশিক বণিকেরা সপ্তগ্রামের সূক্ষ্ম বস্ত্র 'মসলিন' এখান হইতে লইয়া যাইত এবং উক্ত মসলিন রোমের রাণীরা পরিধান করিতেন। সপ্তগ্রামকে "গ্যাঞ্জেস রেডিয়ো" নামে তাঁহারা অভিহিত করিতেন।

(Hamiltons East India Gazetteer, Vol. II, Page 592.)

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস তাঁহার 'মনসামঙ্গল' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্বগুণ ধাম॥
জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি ঋষিমুনি সেবে তথি
তপজপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর॥
দেখিব ত্রিবেণী-গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপায় মধুকর।

সপ্তগ্রামের মিরা সাহেবের মসজিদ:—১৪৫৭ খৃঃ একটি হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হয়। পার্শ্বে আরব্য অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে, মসজিদ নির্মাণ করিলে কি ফল হয়, তদ্বিষয়ে লেখা আছে।

আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥
তীর্থকায সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কণকের ঝারা।
নানা রত্ন সুবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা॥"

পরবর্তীকালে স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাঁহার "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে" লিখিয়াছেন—

সৈয়দ ফকরুদ্দিন, তাহার পত্নী ও একটি খোজার সমাধি—১৩৩০ খৃঃ সুলতান ইজ্জুদ্দিন খাঁ, সৈয়দ ফকরুদ্দিন কর্তৃক সপ্তগ্রাম হইতে বিতাড়িত হন। ৮০ বৎসর বয়স্কা ফতেমা বিবি বর্তমানে এই মসজিদের 'খাদিম'।

"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।"

বিজয় সেন 'সেনরাজ বংশের' প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম রাঢ় দেশে রাজত্ব করেন এবং সেই সময় সপ্তগ্রাম তাহার রাজধানী ছিল। পরে তিনি পাল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া গৌড় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ত্রিবেণীর নিকটে নিজ নামানুসারে "বিজয়পুর" নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

(History of Bengal By R. C. Majumdar, Vol. I, Page—33).

বিজয় সেনের পর তাহার পুত্র বল্লাল সেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করেন। বল্লালের সময়ে কোন্ হিন্দু রাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না, তবে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুরারি শর্মা রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন এবং সপ্তগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মুরারি শর্মার পর রাজা শক্রজিৎ সপ্তগ্রামের শাসন-কর্তা হইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণরাম তৎপ্রণীত "ষষ্ঠীমঙ্গল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রাম যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কুল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক॥
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরয়ে কত গুণ বলিতে না পারি॥
নির্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন।"

রাজা শক্রজিতের বংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। সপ্তগ্রাম বিজয়ের পর মুসলমানগণ বহু হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন। ত্রিবেণীতে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির এবং সপ্তগ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরকেও মসজিদে পরিণত করা হয়। সপ্তগ্রাম জয়ী জাফর খাঁ ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাহাকে ত্রিবেণীর রূপান্তরিত মসজিদে সমাহিত করা হয়। স্যার হাণ্টার বলেন যে, জাফর খাঁ হিন্দু রাজা ভূদিয়ার সহিত যুদ্ধে ১৩১৩ খৃঃ নিহত হন। (Ibid, Pages 245—246).

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় লি[খিত] একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর [খাঁ] কাফেরদিগকে তরবারী ও বল্লম দ্বারা বিতা[ড়িত] করিয়া ঈশ্বরের নামে সপ্তগ্রামে মসজিদ নি[র্মাণ] করেন। ত্রিবেণীর শিলালিপি পাঠে জানা যায় [যে] জাফর খাঁ তুরস্ক জাতীয় ছিলেন; বঙ্গের [সুলতান] সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার [জন্য] ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। পূর্বে জাফর [খাঁ] বঙ্গেশ্বরের সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রামে[র] অভিযানের পূর্বে ইনি দেওকোটের শাসন-ক[র্তা] ছিলেন। সম্রাট গায়সুদ্দীন বুলবনের পৌ[ত্র] রুকনুদ্দীন কৈকায়স সাহ যখন বঙ্গদেশ শাস[ন] (১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০২ খৃষ্টাব্দ) করিতে ছিলেন, সেই সময়ে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকা[র] করেন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ইহা[র] পূর্ণ নাম নিম্নলিখিতরূপে লিখিত আছে—

"উলাঘ-ই-আজম্ হুমায়ুন জাফর [খাঁ] বরহাম ইংসিল।"

(Journal of the Asiatic Society of Bengal—1870, Page 285-286).

১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং উক্ত বৎসরে তাঁহা[র] মৃত্যু হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বারখান গা[জি] হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহার সমাধিও ত্রিবেণীতে আছে। জাফর খাঁর পর ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইজুদ্দীন ইয়াহ[ইয়া] "আজম-উল-মুলুক" উপাধি ধারণ করিয়া সপ্তগ্রাম শাসন করেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সৈয়[দ] ফকরউদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। হিজরী ৭২৯ অব্দে অর্থাৎ ১৩২[৮] খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে প্রথম টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। হিজরী ৯৫৭ অব্দ অর্থাৎ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের রাজ-

সপ্তগ্রামের বিখ্যাত সরস্বতী নদীর বর্তমান অবস্থা। ইউরোপীয় লেখকগণ এই নদীকে "সাতগাঁ রিভার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

...ন পর্যন্ত সপ্তগ্রামে টাঁকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে ...দ্রিত যে সমস্ত মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ...হা Catalogue of coins in the ...ndian Museum, Vol. II. পুস্তকের ... স্থানে (নং ৭৪, ৮২, ২২৪, ২২৭ ...ত্যাদি) উল্লিখিত আছে।

কতিপয় শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ইকরার খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে ...রবিয়ৎ খাঁ, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মজলিশ খাঁ, ৫০৫ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মসনদ খাঁ এবং ১৫১৩ ...ষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ...ছলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ রঘুনাথ ...াস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য দাস ও পিতা ...গাবর্ধন দাস সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাদের নিকট হইতে বার লক্ষ টাকা ...াজস্ব গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহারা প্রজাদের ...নকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করিত বলিয়া ...ানা যায়। এই সম্বন্ধে "চৈতন্য চরিতামৃতে" ...লখিত আছে

"হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন ত্রিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজিরে আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল, রঘুনাথে বান্ধিল॥"

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ তোগলক্ বঙ্গদেশকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন, যথা (১) লক্ষ্মণাবতী, (২) সাতগাঁ, (৩) সোনারগাঁ এবং উক্ত তিনটি শহর তিন বিভাগের রাজধানী হইয়াছিল। (Hunter's statistical Account of Bengal, Page 119.)

বাদশাহ মহা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে সোনার-গাঁয়ের শাসনকর্তা ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময় সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ইজুদ্দীন ইয়াহ খাঁ এবং লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কাদর খাঁ ফকরউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ফকরউদ্দীন প্রথমে পরাস্ত হন, কিন্তু কাদর খাঁর সৈন্যগণ অর্থলোভে ফকরউদ্দীনের পক্ষে যোগদান করিলে, তিনি জয়ী হন এবং সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। (সপ্তখব-উৎ-তওয়ারিখ, (১ম ভাগ, পৃঃ ৩০২) সৈয়দ ফকরুদ্দীন, তাহার পত্নী ও একটি খোজাকে সপ্তগ্রামে সমাহিত করা হয় এবং তাহাদের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সৈয়দ ফকরউদ্দীনের শাসন-কালে আফ্রিকাবাসী ইবনু বতুতা নামক একজন পর্যটক ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া-ছিলেন। তিনি সপ্তগ্রাম এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উধৃত হইল।

"আমরা মালদ্বীপপুঞ্জের সাহাই দ্বীপ হইতে ৪৩ দিন সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হই। এই দেশ অতি বিস্তীর্ণ, এখানকার সকল পণ্যই সুলভ কিন্তু বায়ুমণ্ডল সর্বদাই তমসাচ্ছন্ন। আমরা সর্বাগ্রে সাতগাঁ দর্শন করি। বঙ্গসাগরের উপকূলে ইহা একটি প্রকাণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগর। ইহার নিকটেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। অনেক হিন্দু তথায় তীর্থস্নান করিয়া থাকে। গঙ্গাবক্ষে বহুতর সজ্জিত সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশবাসীরা লক্ষ্ণৌতিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই সময় বাঙলার সিংহাসনে সুলতান ফকরুদ্দীন অধিরূঢ় ছিলেন। দেশের শাসনভার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইনি আপনার পুত্র মুই-জামুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু পরে তাহারই বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিয়াছিলেন; উত্তরকালে পিতাপুত্রে গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে সকল বিরোধ মিটিয়া যায়।

"সপ্তগ্রামে এক রৌপ্য দিরামে পঁচিশ রিখল (অর্থাৎ এক মণ তিন সের তিন পোয়া) চাউল বিক্রয় হইতে দেখিলাম। একটী রৌপ্য দিরাম প্রায় দশ পয়সা; আমাদের দেশের রৌপ্য দিরাম ও বঙ্গদেশের দিনারের মূল্য সমান। আমি নিজে তিন রৌপ্য দিনারে (তিন টাকা বার আনা) একটি পয়স্বিনী গাভী বিক্রয় হইতেছে দেখিয়াছি। এখানকার বলদ ঠিক মহিষের ন্যায় বলশালী। এক দিরামে আটটি করিয়া হাঁস ও মুরগী এবং পনেরটী পায়রা বিক্রয় হইত। একটী মোটা-সোটা ভেড়া দুই দিরামে (পাঁচ আনায়), এক রিখল শর্করা তিন দিরামে, এক রিখল গোলাপ জল আট দিরামে, এক রিখল ঘৃত (সাত পোয়া), চার দিরামে (দশ আনা) এবং এক রিখল সরিষার তৈল দুই দিরামে কিনিতে পাইয়াছিলাম।

"সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত ত্রিশ হাত লম্বা অতি উত্তম মসলিন বস্ত্র দুই দিরামে আমার চোখের সামনে বিকাইয়াছে। একটী পরমাসুন্দরী ক্রীত-দাসীর মূল্য এক স্বর্ণ দিরাম। আমি ঐ মূল্যে আসুয়া নাম্নী একটি পরমা রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী বালিকা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার একজন সঙ্গী লুলু নাম্নী একটী সুরূপা যুবতীকে দুই স্বর্ণ দিরামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

"ফকরউদ্দীন ফকিরদিগকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সইদা নামে এক ফকির সাতগাঁর শাসনকর্তা হন। সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্য অন্যত্র গমন করিলে, সইদা তাহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান তাহা অবগত হইয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন, সইদা পলায়ন করে, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হয়। আমি সাতগাঁয়ে পোঁছিয়া সেখানকার সুলতানকে দেখিতে পাই নাই—কারণ এই সময়ে তিনি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাতের ভবী ফলে আশঙ্কিত হইয়া, আমি তাড়াতাড়ি সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া কামরূপ যাত্রা করি।"

Sanguinette's I B N—Batoutah, (Pages 212—216).

লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন,—

"Satgaon or Saptagram (seven villages) was one of the oldest city of India and the ancient royal port of Bengal. When the Portuguese first began to visit Bengal, about 1530, Satgaon was still flourishing city." Bengal Past & Present, Vol. III, 1909.

শ্রীমদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সপ্তগ্রামে যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন শত বৎসরেও তাহা বলা যায় না বলিয়া 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লেখ আছে।

"কথো দিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সম্মান সহে॥

উদ্ধারণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দির। তিনি ১৫৪১ খৃঃ দেহরক্ষা করেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই মন্দিরের মধ্যে একটি 'মাধবী লতার' গাছ রোপণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি সেই মাধবীলতার কুঞ্জ দৃষ্ট হয়।

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সংকীর্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত কৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নহে বলিবার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে।
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে॥"

বঙ্গে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) সপ্তগ্রামের এলাকায় মালাধর বসু নামক একজন অতিশয় ধার্মিক, ধনী ও বিদ্যানুরাগী সুবিখ্যাত কায়স্থ বাস করিতেন। তিনি বহু সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে নিজ বাসগ্রামে আনিয়া বাস করান এবং তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন; তদবধি উক্ত গ্রাম 'কুলীন গ্রাম' নামে পরিচিত হইয়াছে। পরম বৈষ্ণব মালাধর বসু বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কারণ

তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে খ্যাত। তজ্জন্য হোসেন শাহ তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দান করেন। তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৫ শকে) রচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে (১৪০২ শকে) সুসম্পন্ন করেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীমদ্‌ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দিরে নিত্যানন্দ স্বহস্তে একটী মাধবীলতার বৃক্ষ রোপণ করেন; উক্ত মাধবীলতাকুঞ্জ এবং উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন; তাঁহার ফুল-সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্যমান আছে। "তাঁহার নামানুসারে উদ্ধারণ দত্তের বাসগ্রাম উদ্ধারণপুর বলিয়া খ্যাত।'

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এক প্রাচীন স্মৃতিমন্দির কৃষ্ণপুরে আছে; এই স্থানেই তাঁহার রাজবাটী ছিল। সপ্তগ্রামে বহু ব্যবসায়ী লোক বাস করিতেন; উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদি আমদানী করিতেন, তাঁহারা সুবর্ণবণিক আখ্যা লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে এই স্থানে একটী সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায় কেবলমাত্র বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি ঐহিক বিষয়েই যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পারত্রিক পরমার্থিক বিষয় চিন্তনেও তাঁহারা অগ্রগামী ছিলেন। প্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল, রাজা রাজেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের পূর্বপুরুষগণ সপ্তগ্রামে ব্যবসায়াদি করিতেন এবং এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সুবর্ণবণিকদের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥"

আকবরের রাজত্বের পূর্ব হইতেই সন্দ্বীপের অধিবাসী ফিরিঙ্গীগণ সাতগাঁয়ে ব্যবসা করিতে আসে। সাতগাঁয়ের প্রায় এক ক্রোশ দূরে বাঙালী রাজার নিকট হইতে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া বাঙালী ধরণের গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহারা ব্যবসায়াদি করিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—

"While Bengal was governed by its own princes a number of merchants resorted to Itugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage."

১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই জন্য সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইতে থাকে। জলপথে সরস্বতীর সাহায্যে সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া পর্তুগীজগণ আকবরের নিকট হইতে গঙ্গার ধারে হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। পর্তুগীজগণ হুগলীতে কোন্‌ বৎসরে আসেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাম্প্রায়ো (Samprayo) নবাবের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করেন বলিয়া "Hooghly Past & Present" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু ওম্যালী সাহেব (L. S. Omaly) ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররানির রাজত্বকালে হুগলীতে প্রথম পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (Hooghly Gazetteer, Page 48).

সিজার ফ্রেডারিক নামক জনৈক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খৃঃ সপ্তগ্রাম ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের গ্রামে সমবেত ও সমাগত হয়। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথী তটে বেতড় নামক গ্রাম; জোয়ারের সময় বেতড় হইতে নৌকাপথে গমন করিলে অতি অল্পক্ষণেই সপ্তগ্রামে পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানি বাণিজ্য-তরী চাউল কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাগজ, তৈল (Oil of Zerzeline) এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

প্রতি বৎসর পর্তুগীজগণ বেতড় নামক স্থানে বহু সংখ্যক খড়ের অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিত।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটের পার্শ্বে সরস্বতী নদীর উপর বাঁধান ঘাট।

যতদিন বেতড়ের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীতে বাণিজ্যপোতসকল ভাসমান থাকিত, ততদিন এই স্থান বহু লোকজনপূর্ণ একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইত। আবার পর্তুগীজ বণিকগণ যখন জাহাজ লইয়া ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে চলিয়া যাইত, তখন তাহারা এই সমস্ত গৃহে অগ্নিদান করিয়া দিয়া যাইত। কিছুকাল এইরূপ অস্থায়ীভাবে বাণিজ্য করিবার পর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে আকবরের ফারমানের বলে পর্তুগীজগণ হুগলীতে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্বে পর্তুগীজগণ কেবল বর্ষাকালে এখানে থাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিত; বর্ষা শেষ হইলেই তাহারা গোয়া নগরে চলিয়া যাইত।

পর্তুগীজগণ বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করত হুগলী ও সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিত। বঙ্গদেশীয় বণিকগণ স্বদেশী দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে নানাবিধ মশলা, গন্ধদ্রব্য, মুক্তা, প্রবালাদি আনয়ন করিত। পর্তুগীজ জলদস্যুগণের উৎপাতে এ দেশীয় বণিকগণের বহির্বাণিজ্য এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সপ্তগ্রাম ও হুগলীর নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত, লেখনীতে তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। তাহারা জোর করিয়া দেশী লোকদিগকে খৃস্টান করিত এবং দাসরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিত। সপ্তগ্রামের শাসন করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। সপ্তগ্রামের ধারে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করায় সমস্ত পণ্যবাহী নৌকার নিকট হইতে মাশুল আদায় করিয়া লইত। এতদ্ব্যতীত গৃহে অগ্নিদান, নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না, অধিকন্তু ফৌজদার মির্জা নজৎ খাঁ উড়িষ্যা রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দামোদর নদের পশ্চিম তীরে সেলিমাবাদের নিকটে পলাইয়া যান, পরে পর্তুগীজদের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করেন।

পর্তুগীজগণ ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তৎকালে ভাগীরথীর নাম 'দস্যু নদী' (Rogues River) ছিল। (Hedges diary, Vol. III Page 208) তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের অত্যাচারের জন্যই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। র‍্যালফ ফিট নামক একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিও নদীতে দস্যুবৃত্তির জন্য সোজা পথে না যাইয়া নির্জন স্থান দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

"We went through the wilderness because the right way was full of thieves." (Ralph Fitch, Page 113).

আকবরের সময় সপ্তগ্রাম 'বালঘকখানা' অর্থাৎ 'দস্যু-স্থান' বলিয়া পরিচিত ছিল।

"In Akbars time Satgaon was known as 'Balghak Khana' the house of revolt." —Bengal Past and Present, Vol. III, 1909.

যাহা হউক আকবরের সময়ে সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইউরোপীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া 'আইন-ই-আকবরিতে' লিখিত আছে।

"There are two emporiums a mile distant from each other, one called Satgong and the other Hooghly, with its dependencies, both of which are in the possessions of the Europeans." (Gladwins "Ayeen Akbari". Page 11).

আকবরের শাসনকালে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে আফগানগণ আসিয়া সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে এবং সপ্তগ্রামের অনেক প্রাচীন নিদর্শন সেই সময় নষ্ট হইয়া যায়।

সাজাহান ভারত সম্রাট হইয়া প্রজাগণকে পর্তুগীজদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সাজাহানের আদেশে ১৬৩২ খৃঃ বাঙলার তৎকালীন শাসনকর্তা কাসিম খাঁ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তিন মাস যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য হুগলী অধিকার করিয়া পর্তুগীজ বালকবালিকাদিগকে ক্রীতদাসরূপে এবং সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহের অন্তঃপুরে লইয়া আসে। হুগলী অধিকার করিবার পর সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় অফিসাদি হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সময় হইতে হুগলী মোগলদের রাজকীয় বন্দর হয়।"

"All the public offices were withdrawn from Satgaon, which soon declined into

a mean village, now scarcely known to Europeans."— Steuart's "History of Bengal", Page 235.

পর্তুগীজগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইবার পর ওলন্দাজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে। বাঙলাদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজ বণিকগণ ১৬১৭ খৃঃ স্যার টমাস রোর সাহায্যে একবার চেষ্টা করেন; তৎপরে হিউজেস্ ও পার্কার নামক দুইজন ইংরাজ বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন; কিন্তু উভয়েই অকৃতকার্য হন। অবশেষে ডাঃ বাউটন্ সাজাহানকে এক পীড়া হইতে আরোগ্য করিলে সম্রাট তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চান। কিন্তু ডাঃ বাউটন্ পুরস্কারের পরিবর্তে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিবার সনন্দ চান এবং সম্রাট সাজাহান সেইজন্য অনুমতি দেন। ১৬৫১ খৃঃ ইংরাজ বণিজগণ হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। হুগলীতে বণিক দলের অধ্যক্ষ জব্ চার্নকের সহিত রাজকর্মচারীদের মনোমালিন্য হয় এবং হুগলীর ফৌজদারের সহিত পরে যুদ্ধ হয়। হুগলীতে ঝগড়া করিয়া বসবাস করা অসুবিধা বুঝিয়া ইংরাজ বণিকগণ আওরঙ্গজেবকে দেড় লক্ষ টাকা পূজা দিয়া সুতানটীতে কুঠী স্থাপন করেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, ঠগীদের অত্যাচার প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুতানটীর কুঠী দুর্গে পরিণত হইল। এবং সপ্তগ্রাম ও হুগলীর ধনী, বিদ্বান সমর্থ ব্যক্তিগণ বাসস্থান ছাড়িয়া ইংরাজদের সুতানটীর দুর্গের নিকটে বসবাস আরম্ভ করিল।

মুসলমানদের অত্যাচার, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব এবং শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন অত্যাচার এবং সর্বোপরি মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণের পাশবিক অত্যাচারের জনাই সপ্তগ্রাম ও হুগলীর আজ এই দুর্দশা। বর্গীগণ যদি শুধু রাজস্ব আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে লোকে দেশ ছাড়িয়া পলাইত না। এইরূপ নির্মম অত্যাচার কাহিনী পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণের নিকট হইতে যদি বঙ্গীয় হিন্দুগণ কিছু সাহায্য ও সহানুভূতি পাইত, তাহা হইলে বাঙলা ও ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত, কিন্তু হিন্দুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দুগণই বিধর্মীর শরণাপন্ন হইয়া জীবন ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিল। ইংরাজ বণিকগণ 'মহারাষ্ট্র খাত (Marhatta ditch) খনন করিয়া কলিকাতায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ভাগীরথীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ের অধিকাংশ নরনারী তাহাদের সর্বকিছু ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল, পশ্চিম বঙ্গ শ্মশানের আকার ধারণ করিল।

বর্গীদের অত্যাচার কিরূপ হইত তাহা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৬)।

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগীর ভয়ে সব পলাইল॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়ে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়ে॥
একজন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে সবে ত্রাহি শব্দ করে॥
বাঙলা চৌআরি যত বিষ্ণু মণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
যার টাকাকড়ি আছে দেয় বরগীরে।
যার টাকাকড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥"

ব্যবসা-বাণিজ্য সপ্তগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করা হইলেও ইংরাজগণ 'চাক্‌লা-সাত্‌গাঁ' হইতে বাণিজ্যের শুল্ক ও বাজারের ভাড়া বাবদ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দেও প্রায় তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭২৮ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে 'সয়ার' (SAYER) খাতে যে টাকা জমা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে লেখা আছে—

"Buksh Bunder or Hooghly—The ground rent of 37 markets and gunges chiefly in the vicinity and dependent on the European settlement in the chuklah of Satgaon together with the customs levied on goods paying that grand emporium of foreign commerce in all Rs. 3,43,708; deduct from which already included under the head of Calcutta Rs. 45,767 making net Rs. 2,97,941."—Fifth report of the select committee of the House of Commons in the affairs of the East India Company. Vol. I, Page 265.

মিঃ ডি মর্ণি নামক একজন ইংরাজ পরিব্রাজক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃতে শিলালিপি দেখিতে পান। তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, একটি হিন্দু মন্দিরকেই জাফর খাঁ গাজির দরগায় পরিণত করা হইয়াছে। দরগার যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, সেই অংশ একটু সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা একটি হিন্দু মন্দিরের অন্তরাল ভাগ। প্রত্যেক দ্বারের উপরের খিলানে অর্ধচন্দ্রাকারে বহু কারুকার্য খোদিত আছে; তন্মধ্যে বহু হিন্দু মূর্তি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দিকের দ্বারের মূর্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মূর্তিগুলি এখনো সুস্পষ্ট আছে। কক্ষটিতে যে সকল সংস্কৃত শিলালিপি আছে, তাহা উক্ত কক্ষে অঙ্কিত রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্যগুলির পরিচয়জ্ঞাপক বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

জাফর খাঁ গাজীর দরগার (ত্রিবেণী) উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ "সীতা বিবাহ", "খরত্রিশিরসোবধঃ", "শ্রীরামেণ রাবণ বধঃ", "শ্রীসীতা নির্বাসঃ", "শ্রীরামাভিষেকঃ", "ভরতাভিষেকঃ" প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্", "চানূর বধঃ", "কংস বধঃ", "শ্রীকৃষ্ণবানাসুরেয়োর্যুদ্ধম্" প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে।

মুসলমানেরা এই মন্দিরের উপর অংশ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি বৌদ্ধ মূর্তি। ত্রয়োবিংশ জৈন

কৃষ্ণপুরে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট

তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকনুদ্দীন শাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহার সম্মুখ দিকে পার্শ্বনাথের মূর্তি আছে। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষ নাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত হিন্দু মূর্তিগুলি সম্ভবত মুসলমানদের নিকট আপত্তিজনক হয় নাই বলিয়া দরগার শোভা বর্ধনের জন্য থাকিয়া যায়।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে গৌড়, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমান শাসনকর্তাগণ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; এই সকল মসজিদ প্রস্তরফলকে শাসনকর্তার নাম, কার্যাদি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত আছে এবং উক্ত প্রস্তরফলক মসজিদের প্রাচীরে রক্ষিত আছে। সপ্তগ্রামে এইরূপ একটি মসজিদ আছে। এই সম্বন্ধে ব্লকমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে বিরচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য সমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটি "কুলুঙ্গী" আছে, উহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ইহাও একটি হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল। এই মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলি দেখিয়া বোধ হয় এইগুলি অপেক্ষাকৃত

আধুনিক। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিলে দুই ধারে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের দুইটি পাঁচ ফুট লম্বা গম্বুজ দৃষ্ট হয়, ইহার উপরিভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিত্রে মধ্যস্থলের একটি "কুলুঙ্গী" এবং প্রবেশপথের দক্ষিণে প্রাচীরে রক্ষিত একখানি শিলালিপি দেখা যাইতেছে। উহা আরব্য অক্ষরে লিখিত, উক্ত শিলালিপির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন, বৈধদান করেন ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হন—কেবল তাহারাই মসজিদ নির্মাণ করিয়া থাকেন। যাঁহার গৌরব চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়, যিনি মুক্তহস্তে সকলের উপকার করেন—তিনিই বলেন, মসজিদ সকল ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং আল্লা ব্যতীত কাহারও শরণাগত হইও না। মহম্মদের উক্তি এই যে, যিনি মসজিদ নির্মাণ করেন—তাহার উপরে, তাহার গৃহের উপরে এবং তাহার সঙ্গীদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা সংরক্ষিত হয়। যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, তাহার জন্য ঈশ্বর স্বর্গে একটি বাটী নির্মাণ করেন। * * * নসীরউদ্দীন ওয়াদিল আবুল মজফফর মহম্মদ শাহ রাজা; ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। তাহার অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তরবিয়ৎ খাঁ খুব উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন। হিজরী ৮৬১।" (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭)।

মসজিদের বহির্দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তার দিয়া বেষ্টিত একটি স্থান আছে; এই স্থানে তিনটি সমাধিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এই তিন স্থানে সৈয়দ ফকরউদ্দীন, তাহার পত্নী এবং একটি খোজার মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে। এই স্থানে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এই লিপির সহিত সমাহিত ব্যক্তিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। ফকরউদ্দীনের সমাধি স্তম্ভের গাত্র সংলগ্ন প্রস্তরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কোথা হইতে এই শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে, কিন্তু লেখাগুলি বড়ই অস্পষ্ট। চিত্রে তিনটি সমাধি, দুইখানি বৃহৎ শিলাখণ্ড এবং বর্তমান মসজিদের খাদিম (মোহান্ত) ফতেমা বিবি, বয়স ৮০ বৎসর এবং তাহার ধর্মপুত্র জব্বর খাঁকে দেখা যাইতেছে।

পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান জলস্রোত সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত। সেইজন্য পশ্চিম বঙ্গ, গৌড়, বিহার, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে সমুদ্রে গমন করিবার জন্য সরস্বতী নদীই সহজ ও সরল পথ ছিল। সেইজন্য স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথেই সমুদ্রযাত্রা হইত এবং সপ্তগ্রাম মহানগর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী তীরে বহু সমৃদ্ধ নগর ছিল—শিয়াখালা, জনাই, চণ্ডীতলা, বাক্‌সা, বেগমপুর, ঝাঁপড়দহ; মাকড়দহ; বেগড়ী, আন্দুল, মৌড়ী প্রভৃতি স্থানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশীয় বণিকগণ ভাগীরথী তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই গ্রামগুলিই সুবৃহৎ নগর ছিল এবং ধনী ও বিদ্বানের লীলাক্ষেত্র ছিল। আড়াই হজার বৎসর পূর্বে এই সরস্বতী তীরেই সিংহপুর রাজ্য (বর্তমান সিঙ্গুর) বর্তমান ছিল এবং সিংহবংশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ 'অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন এবং উক্ত স্থান জয় করেন। চণ্ডীমঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ বণিক-চাঁদেব প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর নামানুসারে চণ্ডীতলা গ্রামের নামকরণ হয়। গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত এবং হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও মুসলমানদের অত্যাচার, মগেদের উপদ্রব এবং বর্গীগণের উৎপীড়ন এই কয়টির সম্মেলনে জগদ্বিখ্যাত মহানগর সপ্তগ্রামের পতন হয়।

এখন আর সরস্বতীর সে বিশাল জলরাশিও নাই, আর ভারতের প্রাচীন শহর সপ্তগ্রামের সে কোলাহলও নাই; সমস্তই মহাকালের কবলে লুপ্ত হইয়াছে। কালচক্রে সকলই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগর এক্ষণে ত্রিশখানি কুটির লইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে, আর ক্ষীণতোয়া সরস্বতী সেই অতীত গৌরব কাহিনী গাহিতে গাহিতে অতি ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, বোধ হয় ভবিষ্যতে আর ইহার চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। যে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত ট্রয়, বাবিলন প্রভৃতি শহর এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, যে সর্বগ্রাসী কালের বশবর্তী হইয়া গৌড়, পাণ্ডুয়া, সিংহপুর, ভুরশুট, মহানাদ প্রভৃতির গৌরব-সূর্য অস্তাচলে চির নিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে সপ্তগ্রাম এবং সরস্বতীও অব্যাহতি লাভে সমর্থ হয় নাই।

* * * * * *

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার একমাত্র পুত্র ছিলেন; কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহার আদৌ মন ছিল না। কৈশোরে তিনি রাজৈশ্বর্য, পিতা-মাতা ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন, এবং অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্র সাধনপূর্বক বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার সুপবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলা-কথাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন কাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানত তাঁহাবই নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়া শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। এই সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকের প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

কৃষ্ণপুরের এই শ্রীপাটে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা গোবর্ধন দাস মজুমদার প্রতিষ্ঠিত সপ্তগ্রাম রাজবংশের কুলদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণরাধিকার' দারুময় যুগল মূর্তি এবং পরবর্তীকালে কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের' মূর্তি বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথ যে প্রস্তরের উপর বসিয়া কৈশোরে ভগবৎসাধনা করিতেন উহা এবং তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকাও উক্ত মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে। বর্তমান মন্দিরটি স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের মাতামহ নির্মাণ করাইয়া দেন; তৎপরে রাজর্ষি বনমালী রায়ের অর্থে ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার চেষ্টায় একবার ১৩১৬ সালে ও পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার এক ব্যক্তির অর্থে সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, এই শ্রীপাট ধূলিসাৎ হইতে আর বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মৃতিবিজড়িত এ শ্রীপাট বঙ্গবাসীর রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীগৌরগোপাল দাস অধিকারী এই শ্রীপাটের বর্তমান মোহান্ত; অর্থাভাবে দেবসেবা অসম্ভব হওয়ায় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী ১৩৫০ সাল হইতে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতেছেন; কিন্তু যেরূপ দীনভাবে বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের কুলদেবতার সেবা হইতেছে তাহা দেখিলে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতে হয়। জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারা যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহা সুনিশ্চিত।

প্রবন্ধান্তর্গত আলোকচিত্রগুলি শ্রীবিষ্ণুপদ কর কর্তৃক গৃহীত।

বাঙলায় খাদ্যসঙ্কট দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যে সচিবসঙ্ঘের উপর এ বিষয়ে প্রতীকারের ভর দিয়া বাঙলার গভর্নর, বোধহয়, নিশ্চিন্ত আছেন, সেই সচিবসঙ্ঘের আচরণে লোকের উৎকণ্ঠা আশঙ্কায় পরিণতি লাভ করা অনিবার্য। সেদিন একজন সচিব দুর্ভিক্ষ-দুর্গত বাঁকুড়ায় যাইয়া, লোকের দুর্দশায় সহানুভূতি প্রকাশ ত পরের কথা, অনায়াসে বলিয়াছেন,—সরকারের তহবিলে এত টাকা নাই যে, তাঁহারা সকলকে সাহায্যদান করিতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, লোকের যে ভিক্ষুকের মনোবৃত্তির অনুশীলন হইতেছে, তাহা দুঃখের বিষয়। যিনি সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধেও অজ্ঞ, তাঁহার নিকট হইতে লোক কি সাহায্য লাভের আশা করিতে পারে? লোককে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করাই সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য। লর্ড নর্থব্রুক যখন এদেশে বড়লাট, তখন বাঙলায় (বাঙলা বলিতে তখন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত) যে দুর্ভিক্ষে ২ কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যে একজনেরও অনাহারে মৃত্যু হয় নাই, তাহার কারণ, বড়লাট আরম্ভেই গেজেটে ঘোষণা করিয়াছিলেন—তিনি আশা করেন, লোক আপনাদিগের সাহায্যার্থ ও ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্যাদি আমদানী সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কর্তব্য পালন করিবেন; কিন্তু যাহাতে যে লোকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব, সে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সেজন্য সরকার সর্ববিধ চেষ্টা করিবেন। তাহাই করা হইয়াছিল এবং লোক রক্ষাও পাইয়াছিল।

তাহার পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে সচিবসঙ্ঘের প্রধান খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন, ভগবান যাহাকে মারিবেন কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে?

সরকার যদি বহুসচিব পোষণ করিয়া লোককে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া নির্বিকার থাকেন, তবে বলিতেই হইবে কুপোষ্য পোষণই হইতেছে এবং তাহাতে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা অপব্যয়।

আর ভিক্ষার মনোভাব কি কাহারও সচিবদিগের তুলনায় অধিক?

আর একজন সচিব বলিয়াছেন,—আহার অল্প কর। কিন্তু বড়লাট হইয়া আসিয়া লর্ড ওয়াভেলও স্বীকার করিয়াছিলেন, এদেশের লোক এত অল্প আহার পায় যে, তাহা আর হ্রাস করা যায় না।

এদিকে—এই সময়েও নানা স্থান হইতে সরকারী গুদামে বিকৃত অখাদ্য চাউল নষ্ট করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সেদিন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে আসানসোলে ও পাকুড়িয়ার সরকারী গুদামে প্রায় ২০ হাজার মণ পচা চাউল নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ চাউল মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এমনই অব্যবহার্য যে, বিক্রীত হয় নাই।

সরকারী কর্মচারীরা বলেন, যেসব চাউল ও আটা বিকৃত বলিয়া নষ্ট করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সে সকল ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কালে ও তাহার অব্যবহিত পরে অন্যান্য প্রদেশ হইতে তাড়াতাড়ি আনা হইয়াছিল—তখনই বিকৃত। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—

(১) মূল্য দিয়া সেইরূপ বিকৃত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কে দায়ী এবং যাহারা দায়ী তাহাদিগকে দণ্ডদানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

(২) বিকৃত বস্তু এই দীর্ঘকাল অতি যত্নে কি জন্য সরকারী গুদামে রাখা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাতন ঘৃত ও পুরাতন তেঁতুল যেমন বিদেশে পুরাতন মদ্যও তেমনই মূল্যবান হয়। চাউল সম্বন্ধে কি তাহাই?—তবে তাহার কি উত্তর পাওয়া যাইবে?

স্থানে স্থানে সরকারের অব্যবস্থায় যথাকালে চাউল প্রেরিত না হওয়ায় লোক অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। যে সরকার এইরূপ অব্যবস্থার জন্য দায়ী সে সরকার কিরূপে আপনার স্থিতি সমর্থন করিতে পারেন?

স্থানে স্থানে লোক দলবদ্ধ হইয়া চাউল চাহিয়া রাজপথে ঘুরিতেছে। যেন বাঙলার সর্বত্র সেই অশরীরীর উক্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"মৈঁ ভুখা হো! মৈঁ ভুখা হো!" কবে—কিরূপে বাঙলার আকাশ-বাতাসে আর এই ধ্বনি শুনা যাইবে না? কবে?

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম যে ধানের ফসল হইয়াছিল, তাহা সাধারণ ফসল অপেক্ষা ফলনে অধিক। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরবর্তী দুই বৎসর যদি ফসল ভাল না হইয়া থাকে, তবে সেজন্য কি সরকারকে দায়ী করিতে হয় না? ঈশপের উপকথার তারাদর্শক আকাশে তারার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া চলিতে চলিতে কূপে পতিত হইয়াছিল। তেমনই মিস্টার কেসি দামোদর উপত্যকার জলে সেচ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির দিকে এত মনোযোগ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য স্থানে সেচের স্বল্প-ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করিয়া অধিক শস্যোৎপাদনের সুযোগ ঘটে নাই। "খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি" চেষ্টায় বাঙলা সরকার গত ৩ বৎসরে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহার ফলে বাঙলায় খাদ্যদ্রব্যের কতটুকু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কি সরকার বাঙলার নিরন্ন ব্যক্তিদিগকে জানাইয়া দিবেন?

বাঙলা সরকারের কর্মচারীরা যেন মনে করেন—কৈফিয়ৎ দিয়া ত্রুটি গোপন করিতে পারিলে এবং অনেক কথা লিখিলেই লোকের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে। যতদিন সেরূপ বিশ্বাস নির্মূল করা না যাইবে, ততদিন সরকারের দ্বারা কি উপায় হইতে পারিবে?

সেদিন একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকের অন্নাভাবের কারণ—উৎপাদন হ্রাস, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নহে। বাঙলার বিষয় লক্ষ্য করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। বাঙলায় লোকসংখ্যা অন্য বহু দেশের তুলনায় অল্প—কারণ ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এবং যাহারা জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। অন্যান্য দেশ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে আর বাঙলা ব্রহ্মের দিকে চাহিয়া উপবাস করে। এই যে শোচনীয় অবস্থা ইহার প্রতীকারের কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে কি? অথচ বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগ আছে—সে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হইতে সেক্রেটারী সবই আছেন। মাসান্তে তাঁহাদিগের বেতন ও সফরের ভাতা লইতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন না।

বাঙলা সরকার বলিয়াছিলেন, তাঁহারা লোকের সহযোগ চাহেন। কিন্তু সে সহযোগ লাভ করিবার জন্য তাঁহারা কি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন?

সংবাদপত্রে অনাহারে মৃত্যুর যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে সকল যে সকল স্থান হইতে পাওয়া যায়, সে সকল স্থানে কি সরকারের কর্মচারীরা নাই যে সে সকল স্থানে অন্নাভাবের সংবাদ পূর্বাহ্নে তাঁহারা জানিতে পারিয়া তাহার প্রতীকার করেন না?

আমরা মনে করি, বাঙলার লোককে সরকারের সৃষ্ট বাধা না মানিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই।

ঘড়ি

আমার ঘড়িটির মতো এমন বশংবদ ভৃত্য আর পাইব না; দিন নাই, রাত্রি নাই কাজ করিয়া যাইতেছে। অবশ্য মুখে বক্ বক্ করিয়াই চলিয়াছে—কিন্তু ওই বকুনি তার কাজেরই অঙ্গ; বকুনি থামিলেই বুঝিতে পারা যাইবে তার কাজও থামিল। অনেকটা আমার অপর এক ভৃত্য রামচরণের মতোই আর কি! তার গজ্ গজ্ বক্ বক্-এর অন্ত নাই। কখনও যদি সে চুপ করিল—বুঝিতে পারা গেল, রামচরণ এবার অসুস্থ—সে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে।

ক্ষণে ক্ষণে ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ে। কালো আঁক-টানা চন্দ্রাকৃতি ফলকটার উপরে কাঁটা দুটি নিরন্তর জ্যামিতির সবগুলি কোণ রচনা করিতেছে। কখনও কখনও দুই বাহু টান করিয়া দিয়া ফলকটার পরিধি মাপিতেছে—আবার মধ্যাহ্নে ও মধ্য রাত্রে দুই বাহু যুক্ত করিয়া কাহার উদ্দেশে যেন প্রণতি জানায়! শাদা চাকতির উপরে কালো কাঁটার এই আবর্তন—অদ্ভুত! যেন জাঁতার হাতল ঘুরিতেছে। জাঁতাই বটে! কে যেন অলক্ষ্য হস্তে এক দিক দিয়া কালের অখণ্ড ফসল ভরিয়া দিতেছে—আর অনবরত, আর এক মুখ দিয়া সেকেণ্ড, মিনিটের চূর্ণকাল বাহির হইয়া হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে, প্রত্যেকটি কণা গণিয়া লওয়া যাইতে পারে! শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র যেমন বস্তুকণাকে ভাঙিয়া শক্তি-কণায় পরিণত করে—আমার ঘড়িটা তেমনি, কিম্বা ততোধিক শক্তি প্রয়োগে অলক্ষ্য, অদৃশ্য, অভাবনীয়, অখণ্ড কালকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ঘণ্টা, মিনিট সেকেণ্ডে পরিণত করিতেছে—কাল-জগতের সাইক্লোট্রন আমার এই ঘড়িটা!

বেচারা কাঁটা দুটি! কলুর বলদের মতো না আছে তাহাদের আবর্তনের শেষ, না আছে সময়ের ফসল হইতে তৈল নিষ্ক্রমণের অন্ত! সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট সময়টুকু লইয়া প্রস্থান করিতেছে—কিন্তু বেচারাদের ঘূর্ণির আর অন্ত নাই। অবশেষে এক সময়ে তাহাদের ক্লান্তি আসে, নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহারা থামিয়া—'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো।' অমনি বিশ্রাম ছাড়িয়া উঠিতে হয়—আচ্ছা করিয়া চাবি ঘুরাইয়া দম দাও। তখনি আবার শুরু হয় টিক্, টিক্, টক টক; কালের টিকটিকির টকটকানি। টিকটিকি তাহাতে আর সন্দেহ কি? টিকটিকির ধ্বনি যেমন গৃহস্থের যাত্রা নির্দেশ করে, কার্যারম্ভে বাধা দান করে—এরাও কি তেমনি নয়? বাহির হইতে যাইতেছিলে হঠাৎ ঘড়ির টিক্ টিক্ শুনিয়া একবার সে দিকে তাকাইলে—নাঃ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া যাইতে পারা যায়!

অমনি আবার কেদারাশ্রয় করিয়া অর্ধশায়িত হইয়া পড়িলে!

কাঁটা দুটির বিচিত্র চেহারা। একটি বেঁটে মোটা; অপরটি লম্বা রোগা; একটি ব্যস্ত-বাগীশ, তড়বড় করিয়া এক ঘণ্টায় ফলকাবর্তন শেষ করে, অপরটি ধীর মন্থর, সেই সময়ে এক ঘর হইতে মাত্র অপর ঘরে গিয়া পেঁছায়। কিন্তু তবু ওই ধীর মন্থরেরই মূল্য যেন বেশি, সে অপর ঘরে গিয়া না পেঁছিলে সময়-সঙ্কেত ধ্বনিত হইবার হুকুম নাই। কাঁটা দুটিকে দেখিয়া আমার অফিসের স্থূলোদর বড়বাবু আর কৃশোদর কেরাণীবাবুকে মনে পড়িয়া যায়। কিম্বা মফঃস্বল আদালতের তেলেমলিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপকান পরিহিত শীর্ণ, দীর্ঘ মোক্তার-বাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কি ওই মিনিটের কাঁটাটিকে মনে পড়ে না? বেচারা লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া এ এজলাস হইতে ও এজলাসে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে আর বর্তুলকায় হাকিম সাহেব ধীরে সুস্থে হেলিতে দুলিতে বহু সেলাম হজম করিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন! তবু দুইজনের পরি-শ্রমে ও মূল্যে কত প্রভেদ। মোক্তারের খাটুনি হাকিমের খাটুনির বারো গুণ, কিন্তু হাকিম কি মোক্তারের চেয়ে বারো গুণ বেশি পায় না?

পার্লামেণ্টের 'বিগবেন' হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরীর মণিবন্ধের শোভা অতিক্ষুদ্র ঘড়িটি! ঘড়ির জাতি ভেদ, শ্রেণী ভেদ আকৃতি ভেদ ও প্রকৃতি ভেদ বড় অল্প নয়! কেহ ঘণ্টায় একবার সময় জ্ঞাপন করে, কেহ দুইবার, কেহ বা চার-বার; আবার কোন কোন লাজুক প্রকৃতির ঘড়ি আদৌ সময় জ্ঞাপন করে না, এমন কি তাহাকে কানের কাছে স্থাপন না করিলে তাহার সচলতা অবধি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু বাহিরে তাহাদের যতই ভেদ থাক, ভিতরটা বোধ করি সকলেরই সমান; জড়ানো স্প্রিংটা নিয়মিত গতিতে ঢিলা হইতেছে আর কাঁটা দুটি চলিতেছে।

আচ্ছা, পৃথিবীর যেখানে যত ঘড়ি আছে সকলে যদি একযোগে হরতাল করিত, তবে কি হইত? সময়ের গতি কি বন্ধ হইত না? সময়ের বোধ কি ঘড়ির সৃষ্টি নয়? সময় ঘড়ির সৃষ্টি নয়। কিন্তু সময়ের যেরূপে আমরা অভ্যস্ত অবশ্যই তাহা ঘড়ির সৃষ্টি। মহাকালী যদি তাঁহার অঙ্গ হইতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টার অঙ্গুরী, বলয়গুলি খুলিয়া ফেলেন, তবে কি আর তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারিব? চিনিতে পারা দূরে থাকুক—তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেই পারিব না—কারণ আমরা যাহাকে দেখিতেছি বস্তুতঃ তিনি মহাকালী নন—তাঁহার অলঙ্কারগুলি মাত্র। এই অলঙ্কার-গুলিতেই সময়ের বোধ হয়, এই অলঙ্কারগুলি ঘড়ির সৃষ্টি ছাড়া আর কি?

মনে করো ঠিক মধ্যরাত্রে একদিন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিলে তোমার দেয়ালাবলম্বী ঘড়িটি দুই ধাতব হস্তে তাল ঠুকিয়া ধ্বনি করিতেছে, আর কান পাতিয়া যদি থাকো তবে শুনিতে পাইবে, পাশের বাড়িতে, সমস্ত শহরে, সমগ্র দেশে, পৃথিবীর যেখানে যত ঘড়ি আছে সকলেই দুই হাতে তাল ঠুকিয়া শব্দ করিতেছে। সে এক অপূর্ব জগৎ সংকীর্তন! মহাকালের মন্দির প্রাঙ্গণে যন্ত্র-বাউলের সে কি অপার্থিব সঙ্গত! মানুষে যখন নিদ্রায় অভিভূত যন্ত্র বাউল তখন একবার করিয়া মহাকালকে বন্দনা করিয়া লয়। সারাদিন তাহারা ঠুক ঠুক শব্দে হাতুড়ি চালাইয়া মহাকালের বলয় অঙ্গুরীয়ক তৈয়ারী করিতেছে, মধ্য রাত্রে সেগুলি তাঁহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া দিয়া হাতুড়ি-ফেলা হাতে তাল ঠুকিয়া নাম কীর্তন করিয়া লয়! এই যন্ত্র সংকীর্তন একবার শুনিতে পাইলে ঘড়ির সার্থকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না।

বিলাতে লেবার পার্টি কনফারেন্স হইয়া গেল। এখন ইংলণ্ডে লেবার পার্টি গভর্নমেণ্ট রাজ্য এবং সাম্রাজ্য চালাইতেছে, পার্লিয়ামেণ্টেও লেবার পার্টির গুরু সংখ্যাধিক্য। অতএব এবারকার লেবার পার্টি কনফারেন্স অন্যান্য বৎসরের কনফারেন্সের চেয়ে দুনিয়ার মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করিবে। এবার নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইলেন নোএল বেকার। গত বৎসরের সভাপতি হ্যারল্ড লাস্কি মহাশয় রাশিয়ার নিকট করুণ আবেদন জানাইয়াছেন, 'এতকাল তো তোমরা সন্দেহই করিয়া আসিলে, দোহাই তোমাদের, একবার বিশ্বাস করিয়া দেখ, আমরা তোমাদের ডুবাইব না। পশ্চিম ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মজুর শ্রেণীর দল হিসাবে আমরা কখনও ইংলণ্ডে এমন কোন গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করিতে পারি না, যে গভর্নমেণ্ট রাশিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে চায়।' বেভিন সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্টে বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিতর্কে তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতা রাশিয়ার কোন খবরের কাগজে ছাপা হয় নাই। তিনি ইঙ্গ-রুশ সন্ধি পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং স্ট্যালিন তাহাতে গররাজী। তিনি আর কি করিতে পারেন? জোর করিয়া ত আর তিনি প্রেম করিতে পারেন না। চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নাই, করিবেন না, কিন্তু রাশিয়া কোন সাড়া দিতেছে না। লাস্কি মহাশয় প্যালেস্টাইনে ইহুদী প্রেরণের জন্য ব্যস্ত আছেন, কনফারেন্সে কথা উঠিয়াছিল যে, অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদী যাহাতে প্যালেস্টাইনে প্রবেশাধিকার পায় তার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তৎপর হউন। বেভিন মহাশয় সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিয়া বলেন, "প্যালেস্টাইনে অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদী প্রেরণ মানে হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক ডিভিশন ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানো, আমি তাহাতে রাজী নই।" ইংলণ্ডের বামপন্থী শ্রমিকগণ স্পেন সম্বন্ধে একটা হস্তক্ষেপ নীতি অবলম্বন করিতে চায়। এ বিষয়েও বেভিন সাহেবের মত উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে যদি অন্যান্য দেশ স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিত তাহা হইলে এতদিনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পতন ঘটিত। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, স্পেনের সম্বন্ধে অন্য দেশগুলির মাথা না ঘামানোই ভাল; একমাত্র এই উপায়েই ফ্রাঙ্কোর পতন সম্ভব। অর্থাৎ স্পেন সম্বন্ধে চেম্বারলেন গভর্নমেণ্ট যেমন নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করিয়া ফ্রাঙ্কোকে জিতাইয়া দিয়াছিলেন বর্তমানে শ্রমিক গভর্নমেণ্টও সেই নীতি বজায় রাখিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতার ভিত্তি দৃঢ় করিতে সুযোগ দিবেন।

এ বিষয়ে চার্চিল এবং বেভিন একমত। একমত না হইয়া উপায় নাই। ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের প্রচুর স্বার্থ; সেখানে স্বার্থ বজায় রাখিতে হইলে ইউরোপের স্পেন, ইতালী এবং গ্রীসের সঙ্গে ভাব রাখা প্রয়োজন। ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞগণ ঠিক তাহাই করিতেছেন। রাশিয়ার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা এই তিনটি দেশ নিজেদের প্রভাব সীমার অন্তর্ভুক্ত করিতেছে।

ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির দরখাস্ত এবারও নামঞ্জুর হইল; লেবার পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টিকে দলে গ্রহণ করিবে না। ইহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের একই অভিমত। ইহারা নাকি রাশিয়ার পঞ্চমবাহিনী। বেভিন সাহেব লেবার পার্টি কনফারেন্সে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর পথে সবচেয়ে বড় বাধা হইতেছে এই সমস্ত ব্যক্তি।

প্যারিসে আগামী শান্তি বৈঠক সম্বন্ধে বেভিন সাহেব হতাশ হন নাই। তাঁহার আশাবাদ প্রশংসনীয়। কিন্তু বিশেষ অর্থপূর্ণ ঘটনা হইতেছে এই যে, এই পররাস্ট্র সচিবটির প্রভাবে একটি প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছিল যে, পৃথিবীতে শান্তির একমাত্র আশা হইতেছে, পৃথিবীতে সাম্যবাদের প্রসারে। অতএব শ্রমিক গভর্নমেণ্টের উচিত দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবিরোধী শক্তিবৃন্দের সমর্থন এবং সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারাও রক্ষণশীলদের বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি বেভিন সাহেবের আপত্তিতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

কনফারেন্সে প্যালেস্টাইন সমস্যা বেভিন সাহেব তো এক রকম এড়াইয়াই গেলেন। কিন্তু আর দীর্ঘকাল বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে চুপ থাকিতে পারিবেন না। গত এপ্রিল মাসে সম্মিলিত ইঙ্গ-আমেরিকা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে; রিপোর্ট অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদী প্যালেস্টাইনে আমদানী করিতে সুপারিশ করিয়াছে। ৭টি আরব দেশ এবং প্যালেস্টাইনের আরব কমিটির মতামতও জানা গিয়াছে। তাহাদের মতামত সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। সম্মিলিত কমিটির রিপোর্ট তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্যালেস্টাইনের আরব সমস্যা সমস্ত আরবদেশগুলি নিজেদের সমস্যা বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। প্যালেস্টাইন আরব দেশই থাকিবে, ইহুদীর দেশে পরিণত হইতে তাহারা দিবে না। যদি সম্মিলিত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে কাজ চলে তবে তাহারা সর্বপ্রযত্নে ইহার বিরোধিতা করিবে এবং এ বিরোধিতা অহিংস বা নিরামিষ লড়াই নয়।

আবার ইহুদীদের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপও আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি ১ লক্ষ ইহুদী আমদানীর প্রস্তাবটা তাহারা এই সর্তেই গ্রহণ করিয়াছে যে, এটা হইল প্রথম কিস্তি। অর্থাৎ এরপর সমানেই ইহুদী আমদানী করিতে হইবে যাহাতে প্যালেস্টাইন ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমিতে পরিণত হয়। ইহুদীদের এই দাবীর পিছনে হিংসামূলক শক্তিও রহিয়াছে। তাহাদের বেআইনী সৈন্য বিভাগে প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য রহিয়াছে, এই কয়েক মাসেই প্যালেস্টাইনের শৃঙ্খলা তাহারা নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে স্বয়ং ট্রুম্যান রহিয়াছেন। আবার আরবরাও সোজা চীজ নয়। বছর কয়েক আগে তাহাদের উৎপাতে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহাদের তুষ্ট করিয়াছিলেন। আবার এই যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের দাঙ্গা বাধাইবার শক্তিও বাড়িয়াছে। অতএব প্যালেস্টাইনের আরব ইহুদী সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-আমেরিকার কপালে অশেষ দুঃখ রহিয়াছে।

ফ্রান্সে এবং ইতালীতে নির্বাচন হইয়া গেল। যুদ্ধের পর ইতালীতে এই প্রথম নির্বাচন। গণভোটে ইতালী রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া গণতন্ত্রে পরিণত হইল। ইতালীতে রাজতন্ত্র নির্মূল হইল বলিয়া সেখানে সোস্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্ট পার্টির জয় জয়কার—একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেননা এই নির্বাচনের ফলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে, ক্যাথলিক পার্টি, তারপর সোস্যালিস্ট এবং তারপর কম্যুনিস্ট পার্টি। ক্যাথলিক পার্টির সংখ্যা অন্য দুই পার্টির সংখ্যার যোগফলের প্রায় সমান।

ফ্রান্সেও কম্যুনিস্টদের পরাজয়ই হইয়াছে বলিতে হইবে। ইতিপূর্বে প্রধানতঃ কম্যুনিস্ট এবং সোস্যালিস্ট পার্টিদ্বয় ফরাসী দেশের নবরাষ্ট্রের একটা খসড়া করিয়াছিল। গণভোটে সেই খসড়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই নির্বাচনে কম্যুনিস্ট এবং সোস্যালিস্টগণ কয়েকটা আসন হারাইয়াছে। নবরাষ্ট্রের খসড়ার বিরোধিতা করিয়াছিল অপেক্ষাকৃত দক্ষিণপন্থী এম আর পি দল (M. R. P.)। নির্বাচনে এই দলের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। কম্যুনিস্ট দল এখনও শক্তিমান, কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে বুঝা যাইতেছে তাহাদের ক্ষমতা কমিতেছে এবং ফ্রান্স একটু দক্ষিণ দিকে হেলিয়াছে।

করাচীতে কোন কোন সরকারী কর্মচারী মফস্বলে সফরে বাহির হইলে তাঁহাদের ঘোড়াগুলিকে গম খাওয়াইবার জন্য নাকি পল্লীবাসীকে বাধ্য করা হয়। অতঃপর পল্লীবাসীকে ঘোড়ার খাদ্য ঘাস খাইতে বাধ্য করিলেই করাচী আর "রাচী"র পার্থক্য ঘুচিয়া যায়।

* * *

করাচীরই অন্য একটি সংবাদে দেখিলাম—খাদ্যাভাবের জন্য বিক্ষোভ-প্রদর্শন করিতে একশত গাধা নাকি একটি
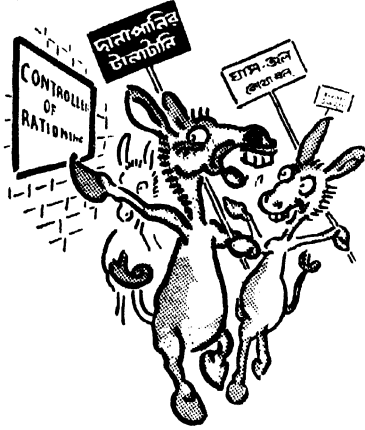
শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। খাদ্য-বিতরণের যাঁরা কর্তা তাঁদের কর্মকুশলতা গাধার কাছেও ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

* * * * *

নেত্রকোণার সংবাদে দেখিলাম সেইখানে কোন কোন অঞ্চলে লোকেরা নাকি কাঁঠাল খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে;—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া যাঁরা পরমানন্দে জীবনধারণ করিতেছে—তাঁরা কোন্ অঞ্চলের লোক সেই কথা খোলসা করিয়া বলার সময় আসিয়াছে।

* * * * *

ঢাকার সরকারী গুদাম হইতে নাকি এক লক্ষ মণ চাউল উধাও হইয়া গিয়াছে। সংবাদটি শুনিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—"সূক্ষ্ম কারিগরিতে ঢাকার জুড়ি নেই। এক লক্ষ মণ চাউল বেমালুম হাওয়া করে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়।"

* * * * *

মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি কর্পোরেশনের মানপত্রের উত্তরে বলিয়াছেন,—"আমি কর্পোরেশনকে গভর্নমেন্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিতে চাই।" আমরা এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত এবং

অধিকন্তু এই কথাও তাঁকে জানাইতে চাই যে, কোন কোন ব্যাপারে এই "ক্ষুদ্র সংস্করণটি" মূল সংস্করণকেও ছাপাইয়া গিয়াছে!

* * * * *

ধাঙড় ধর্মঘটের জন্য আমেদাবাদের মেয়েরা নিজের হাতে পথ-ঘাট ঝাঁট দিতেছেন। একমাত্র দাম্পত্য-জীবনের পথ-ঘাট-গুলি পরিষ্কার রাখিবার জন্য যাঁরা এতকাল সম্মার্জনী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন—

তাঁহাদিগকে খবরটা মন দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

* * * * *

দিল্লীতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ এখনও চলিতেছে, মুক্তিস্নান এখনও হয় নাই, কেহ মুক্তির জন্য স্নান করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন, কেহ ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইবার তোড়-জোড় করিতেছেন।—আমরা দূর হইতে দিল্লীর চন্দ্রগ্রহণের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া প্রায় চন্দ্রাহত হইতে চলিয়াছি!

* * * *

একজনের হৃদয়—অন্য একজনের হৃদয়ে স্থানান্তরিত করিবার একটি অপূর্ব শল্যবিদ্যার আবিষ্কার নাকি রাশিয়া করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শুনিলাম প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ হৃদয় দিয়া হৃদয়ের কথা (Heart to heart talk) শুনিবার জন্য নাকি রাশিয়া যাইতেছেন। স্ট্যালিন এই সুযোগে—"আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক" এর ব্যবস্থা করিবেন নাকি?

* * * * * *

চুম্বন হইতে যাহাতে কোন রকম রোগ আক্রমণ না হয় সেইজন্য নাকি অবিলম্বেই পেনিসিলিন লিপস্টিক ব্যবহার করা হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন,—"এই সঙ্গে ভেনিশিং লিপস্টিক আবিষ্কৃত হইলেই চুম্বনটা সর্বপ্রকারে নিরঙ্কুশ হইয়া উঠে!

* * * * *

যুদ্ধের সময় যে সব মার্কিন সৈন্য এই দেশ হইতে স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তাঁরা নাকি ইতিমধ্যেই এক হাজার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন,—"লেণ্ডলীজ শেষ হইয়া যাওয়ার অনিবার্য পরিণতি"—বলিলেন খুড়ো।

* * * * *

প্রসঙ্গত আমরা ট্রামে-বাসের পাঠককে দুইটি বিবাহের বিজ্ঞাপন উপহার দিতেছি, একটি কালিফোর্নিয়ার, বিজ্ঞাপন দিয়াছেন পাত্রী—"I loathe linen, desire

to wear silk underwear and would be grateful to a husband who could keep me supplied in undies. In return I will be a perfect wife."—অন্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন পাত্র, বৃটেনের—"Bachelor with two months supply of dried eggs seeks matrimony with girl owning frying pan." —বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

পর্যায় চাষের ফসল

বিশ্ব বিশ্বাস

আপনি হয়ত ট্রেণে কোথাও বেড়াইতে যাইতেছেন; দুই ধারে দেখিলেন বিস্তর জমি। অপর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের বাজারে দেশের বুকে যখন দুর্ভিক্ষের কালো ঘন ছায়া তখন এতগুলি ক্ষেত পতিত দেখিয়া আপনি হয়ত মনে মনে ধারণা করিয়া বসিলেন যে, বাঙলার চাষী অলস, পরিশ্রম করিতে চায় না, ভাগ্যের উপর দোহাই দিয়া অলসতার আরামে দিন কাটাইতে চায়। শুধু আপনার এ অভিযোগ হইলে হয়ত কান না দেওয়া চলিতে পারিত, কিন্তু এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায় ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েক-জন দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতের মুখ থেকে।

মিনু মাসানি তাঁহার একখানি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, নৈসর্গিক সম্পদে ভারত ধনী কিন্তু ভারতীয়রা গরীব। প্রত্যক্ষভাবে কথাটা পরস্পরবিরোধী হইলেও নিছক সত্য। এর কারণ দেশের এ সম্পদ তাহাদের আওতার বাহিরে এবং নিজেদের প্রয়োজনে তাহারা ইহাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। অলসতার দোষ আরোপ করা বৃথা। মানুষ মরিতে চায় না। মরিবার আগেও বাঁচিবার অবলম্বন খোঁজে। আজ চাষী-বাঙলার জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। অন্নবস্ত্রের সমস্যা এত তীব্রভাবে তাহাদের মধ্যে আর কোনদিন দেখা যায় নাই। আজ তাহারা অলসতার মধ্যে মরিতে চাহিতেছে......বাঁচিতে চাহিতেছে না এ কথা বলা মানেই মানবের মনস্তত্ত্বকে না বোঝা। বাঙলার চাষী আজ অলস নয়। হয়ত একদিন অলস ছিল যখন অল্প আয়াসে সারা বৎসরের খোরাক হইত কিন্তু সেদিন আর নাই; অতএব একথা আর বলা চলে না।

চাষারা খাটে......প্রাণপণে খাটে—অবশ্য তাহার যতটুকু সম্বল আছে তার মধ্যে। বেশীর ভাগ চাষীর ক্ষেত কম। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগির ফলে ক্ষেত কমিতেছে কিন্তু পোষ্য বাড়িতেছে অথচ ক্ষেত বাড়ানো খুব অল্প ক্ষেত্রে সম্ভব হইতেছে। মাটী না পাইলে তাহারা খাটিবে কোথায়? চাষের জন্য যে তাহাদের খাটিবার ইচ্ছা আছে তাহা পল্লীগ্রামের আলের পথে বেড়াইলেই বোঝা যায়। আলের পথ ভাঙ্গিয়া অথবা বনজঙ্গল কাটিয়া জমি একটু বাড়াইতে তাহাদের কী আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। জমি নাই বলিয়া তাহারা খাটিতে পারে না, আধিয়ার হইয়া বেশীর ভাগ জমিদারের জমিতে খাটে। তাহাও নানান বন্ধন, তিক্ততা ও অসুবিধার মধ্যে। আপনার বলিয়া কোন জিনিষ মনে না হইলে তাহা লইয়া কি কেহ খাটিতে পারে?

চাষীদের যদি অলসতার জন্য দায়ী করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের অলসতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে জমির অভাবই তাহাদের অলসতার জন্য দায়ী।

জমি পতিত বলিয়া চাষীদিগকে অলস মনে করা যায় না। এইসব জমি পতিত থাকিবার বহু কারণ আছে। হয় জলাভাবে ঐসব জমির চাষ হয় নাই নয় তো ঐসব জমিদারের খাস জমি। চাষীরা নিজ আয়ত্তের বাহিরের কোন কারণ না ঘটিলে জমি ফেলিয়া রাখে না কারণ তাহাদের মধ্যে জমির অভাব মারাত্মক সমস্যা। জমির অভাবের জন্য তাহারা তাহাদের ক্রমাগত প্রয়োজন বৃদ্ধির তালে তালে চাষ বাড়াইতে পারে না। তাই বলিয়া আমাদের মনে করা উচিত নয় যে তাহারা হাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকে এবং স্বেচ্ছায় অনাহারের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাহারা তাহাদের ক্ষেত ফেলিয়া রাখে না বা ক্ষেতকে বিশ্রাম দেয় না পরন্তু পর্যায় চাষের দ্বারা এক মাটিতে বহু ফসল তৈরীর চেষ্টা করে।

পর্যায় চাষে কিভাবে ফসল তৈরী হয় আমরা সেই বিষয়ে এই স্থলে আলোচনা করিব। আষাঢ় হইতে কার্তিক ধান্য ফসল ও পাটের সময় এবং কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যায়-ক্রমে আলু, পেঁয়াজ, কুমড়া যব গম ধনিয়া তামাক ঝিঙে কাঁকুড় তরমুজ শশা ও পটল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস জমিতে চাষ পড়ে ও মাটি তৈরী হয়। আষাঢ় হইতে কার্তিক চাষে দুইটি পর্যায় পড়িতে পারে। আউশ ধান ও আমন ধান। আউশ ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাট জন্মাইতে পারে এবং আউশ ধান কাটার পরে পাট বাড়িতে থাকে। কার্তিক হইতে চৈত্র চাষে দুইটি কোন কোন শস্যের বেলায় তিন চারটি পর্যায় পড়ে। হুগলী বর্ধমানের মাটিতে এই কালটুকুর মধ্যে প্রথমে আলু, আলু ওঠার পরে পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঙে, কাঁকুড়, তরমুজ, শশা পটল ও অন্যান্য তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। যদি রবিশস্য লাগান হয় তবে তা ওঠার পরে পেঁয়াজ অথবা তামাক এবং পরে তরিতরকারির চাষ হইতে পারে। বাঙলার চাষীদের পর্যায় চাষ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন বাঙলার চাষী অলস নয়।

পর্যায় চাষের সাফল্যের মূলে হইল জল। জলের অভাব হইলে এইভাবে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। আর জলাভাব বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রকট। সরকারী জল সরবরাহ ব্যবস্থা এত অ-পর্যাপ্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ যে, বরং আকাশের জলের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে কিন্তু সরকারী জলের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে না। যখন জল আসিবার কথা তখন হয়ত জল আসিল না এবং যখন হয়ত জলের দরকার নাই তখন জল আসিয়া হাজির। এর জন্য আবার দিতে হয় জলকর।

জলের অব্যবস্থার জন্য পর্যায় চাষের দ্বারা এক মাটিতে বহু ফসল তৈরীর চেষ্টা ফলবতী হয় না। পর্যায় চাষ হইলেই চাষীদের যে আর জমির প্রয়োজনীয়তা থাকে না অর্থাৎ বিস্তৃত চাষের (Extensive Cultivation) দরকার থাকে না তা নয়। জমির প্রয়োজনীয়তা থাকিয়াই যায় কিন্তু জমি জমিদারদের হাতে... যাহারা জমিতে খাটে না তাহাদের হাতে। তাহা করায়ত্ত করা চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার জন্য যে টাকার দরকার তা তাহাদের আয়ত্তের বাইরে। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিস্তৃত চাষের যেখানে সুবিধা না হয় সেইরূপ স্থলে অর্থনীতিবিদ্‌গণ এক মাটির উর্বরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করিবার (Intensive Cultivation) পরামর্শ দেন। বাঙলার চাষীদের তাহা আয়ত্তের বাইরে। অবস্থাপন্ন চাষীদের দ্বারা তাহা সম্ভব কারণ সারের ব্যয়ভার গরীব চাষীরা বহন করিতে পারে না। এই দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ হয় যে বিস্তৃত চাষ এড়াইয়া চলা বাঙলাদেশের চাষীদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যাহারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া ফসল বাড়াইতে পারে তাহারা তাহাই করুক কিন্তু যাহারা অর্থাভাবে তাহা না করিতে পারে তাহাদের জমি চাই-ই এবং পর্যায় চাষের জন্য জলের সুব্যবস্থা চাই-ই। যাহারা অর্থনীতি শাস্ত্র পড়িয়াছেন তাহারা দেখিয়াছেন যে Intensive Cultivationএ এমন এক সময় আসে যখন চাষে আর লাভ থাকে না। তখন চাষের জন্য অধিক জমি দরকার হইয়া পড়ে। অলসতা তাই চাষীদের সমস্যা নয়। চাষীদের সমস্যা জমির অভাব। তাই জমিদারী প্রথার উৎসাদন এবং বিনামূল্যে প্রত্যেক চাষীর প্রয়োজনানুযায়ী জমিবিলির আওয়াজ উঠিয়াছে। জমি বিলি কিভাবে হইবে তার উপর চাষীদের সমস্যার তথা বাঙলার সাম্প্রতিক পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। জমিদারের পরিবর্তে বিলাতের মত কতকগুলি ফার্মের মালিক অথবা মাটির কালো বাজার চাষী বাঙলার ঘাড়ের উপর যেন চাপানো না হয়। জমি পাইলে...জল পাইলে বাঙলার চাষী বাঙলার মাটিতে সোনা ফলাইতে পারে। অধিক শস্য ফলাও বলিয়া তখন আর কাহারও মাথা ফাটাফাটি করিতে হইবে না...বাইরে চাল চালান দিয়া এদেশে খাদ্যশস্যের অভাব কাহারও প্রচার করিতে হইবে না এবং দয়া করিয়া ক্ষুধায় আধপোয়া তণ্ডুলের ব্যবস্থা-করত এ সংসার জীবনের জ্বালা হইতে আর অব্যাহতি দিতে হইবে না।

নারীর অধিকার—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, -এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শিল্প সম্পদ প্রকাশনী, ৩নং ম্যাংগো লেন, কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

'নারীর অধিকার' গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখক নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যে দেশ নারী সমাজকে তার প্রাপ্য অধিকার তো দেয়ই নাই, বরং নানাভাবে তাকে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে সে দেশের লোকের জ্ঞানোন্মেষের জন্য নারীর অধিকার বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, ততই ভাল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। নিপুণ চিন্তাশীল লেখক হিসাবেও তিনি পাঠক মহলে পরিচিত। এইরূপ একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শুধু নারী সমাজের নহে, সমগ্র বঙ্গ সমাজেরই ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। সমস্ত বই এই কয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—নারীর মর্যাদা ও পুরুষ, সমাজ-ব্যবস্থায় নারী, পিতৃকুলাত্মক পরিবার ও নারী, ভারতে নারী আন্দোলন, নারীর অধিকার ও হিন্দু সমাজ, গোড়া হিন্দু আইন ও নারীর অধিকার, নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। এই পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে লেখক নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সকল বিষয়ই সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাতসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৯, ভালো বাঁধাই কাগজ ছাপা সুদৃশ্য এবং নির্ভুল।

গ্রন্থকার যামিনীবাবু একজন সুলেখক। তাঁহার লিখিত ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, ছেলেদের বিদ্যাসাগর, সুধী সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াও আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার সুমধুর এবং সরল ভাষায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুময় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ঠাকুরের মূল উপদেশগুলি পাঠ করিয়া সকলেই প্রীত হইবেন। লেখার ভঙ্গিটি আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগিয়াছে। ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের প্রচার পাওয়া উচিত।

পঞ্চভূত—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৸০

পঞ্চভূত, ঘড়ি, অরণ্যে, রূপকথা ও পিছু ডাক এই পাঁচটি গল্প লইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত। প্রথম গল্প 'পঞ্চভূত' লেখকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রেতলোকের নায়ক-নায়িকার মানব জন্মের প্রতি ধিক্কার এবং মানবজন্মে ফিরিয়া না যাইবার জন্য আকুলতা লেখক হাল্কা হাসির পরিবেশে সুনিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেকটি গল্পই ছোটো নাটকের টেক্‌নিকে লিখিত এবং অভিনয় উপযোগী। গল্পগুলি পড়িয়া যেমন অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি গল্পের চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে অভিনয় করিতে দেখিলে অধিকতর উপভোগ্য হইবে। প্রথম গল্প 'পঞ্চভূতে'র কয়েকটি রেখাচিত্র দেশ পত্রিকা হইতে গৃহীত; কোথাও চিত্রকরের নাম বা দেশ পত্রিকার স্বীকৃতি নাই।

বাংলা বর্ষলিপি ১৩৫৩ : সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ বাংলা ভাষায় একটি বর্ষলিপি (Year

Book) এর নিতান্তই অভাব ছিল। গত বৎসর হইতে সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার আচার্য বহু পরিশ্রম করিয়া ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই অভাব দূর করিয়াছেন। বাঙালী মাত্রই বাংলা দেশকে জানিতে চাহে—তাহার রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা প্রত্যেক বাঙালীর আজ একান্তই প্রয়োজন। সেই দিক দিয়া সম্পাদকের এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। বাঙলা তথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ ও সরল ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এমন একখানি পুস্তক বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

হাসি আর নক্সা—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য। প্রকাশক: আরতি এজেন্সী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। হাল্কা হাসির কবিতার বই, নানা চিত্রে শোভিত। ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, শিশুরা পড়িয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিবে।

সুভাষ বাহিনী—শ্রীসুধীরকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীসলিলকুমার মিত্র। এস কে মিত্র এন্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত পরিচ্ছদগুলি আলোচিত হইয়াছে:—স্বাধীনতা সংগ্রামের ২ শত বৎসর, বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর গোড়াপত্তন, সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, ফৌজের নায়ক যাঁরা, আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগপর্ব, "দিল্লী চলো", রাহু গ্রাসে, দেশসেবার পুরস্কার। আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা হইতে লালকেল্লার বিচার পর্যন্ত ইতিহাস—বিশ্রুত কাহিনীগুলি লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বইখানা বহু চিত্রে সমৃদ্ধ এবং পঠনীয় বিষয়ও এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক হইতে বেশী স্থান পাইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট মনোরম। গ্রন্থকারের ভাষা ঝরঝরে। উচ্ছ্বাস ও বাহুল্য বর্জিত হওয়ায় বইখানা ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে। ১১৩।৪৬

দুঃসংবাদ—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক: মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। মূল্য দুই টাকা।

দুঃসংবাদ পাঁচটি ছোট গল্পের সমষ্টি প্রথম গল্প 'দুঃসংবাদ' হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পটিতে লেখকের তীব্র অনুভূতি ও লিপিকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও পাঠকদের ভাল লাগিবে। মানুষের দুঃখ-বেদনা, বঞ্চনা ও বুভুক্ষা লেখক দরদ দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়। কিন্তু মূল্য একটু অধিক হইয়াছে।

লাফিং গ্যাস—শ্রীবিমল দত্ত এম এ প্রণীত। চারু সাহিত্য কুটীর, ১৯২।২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

শিশুদের হাসির গল্প লিখিয়া বিমলবাবু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। লাফিং গ্যাসে আটটি হাসির গল্প স্থান পাইয়াছে, আর গল্পগুলি প্রকৃতই হাসির গল্প। গল্পগুলি বালক-বালিকাদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। বইয়ের ছবিগুলিও সুন্দর হইয়াছে।

দেশের কথা

(৩রা আষাঢ়—৯ই আষাঢ়)

কংগ্রেসের নির্ধারণ—শিখ ও ফিরিঙ্গী—মাদুরায় হাঙ্গামা—জওহরলাল ও কাশ্মীর দরবার—দুর্ভিক্ষ—রেল ধর্মঘট—চাউল নষ্টকরা।

কংগ্রেসের নির্ধারণ—দীর্ঘকাল আলোচনার পরে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বৃটিশ মন্ত্রী মিশনকে ও বড়লাটকে জানাইয়াছেন (৯ই আষাঢ়) বড়লাট যে সকল সর্ত দিয়াছেন, সে সকল সর্ত স্বীকার করিয়া কংগ্রেস বড়লাটের পুনর্গঠিত শাসন পরিষদে যোগদান করিতে পারেন না। কংগ্রেসকে সম্মত করাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কংগ্রেস আপনাদিগের মত বর্জন করিতে অসম্মত হইয়া দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বড়লাট কংগ্রেসের ৪ দফা আপত্তির মধ্যে এক দফা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—যখন মুসলিম লীগ তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে পরাভূত সর্দার আবদর রাব নিস্তারকে মনোনীত করিয়াছেন, তখন কংগ্রেস তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন না—অপর দফাগুলির কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। এদিকে প্রকাশ পাইয়াছিল, বড়লাটের দপ্তর হইতে আসামে পরিষদের সভাপতিকে এবং বাঙলায় গভর্নরকে জানান হইয়াছে—ব্যবস্থা পরিষদ হইতে যাঁহারা শাসন-পদ্ধতি রচনা-সমিতিতে নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহারা প্রদেশসমূহের সংঘভুক্তির ব্যবস্থায় সম্মত। মহাত্মা গান্ধী বলেন, ঐ নির্দেশের দ্বারা মিশনের প্রস্তাব হত্যা করা হইতেছে। শেষে বাঙলা সরকার জানাইয়াছেন—তাঁহারা ঐরূপ কোন নির্দেশ দেন নাই। মিশনের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ শাসনপদ্ধতি রচনা-সমিতি গঠন। সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করে, কংগ্রেস সমিতিতে যোগ দিতে পারেন।

কিন্তু যতক্ষণ কংগ্রেসের আলোচনা শেষ না হয়, ততদিন সে কথাও বলা যায় না।

শিখ ও ফিরিঙ্গী—শিখ সম্প্রদায় প্রথমাবধি বকিয়া আসিয়াছেন, মিশনের প্রস্তাবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। মিশন যত সুবিধা সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অন্যতম—মুসলমানদিগকেই দিয়াছেন এবং শিখদিগের ন্যায়সঙ্গত দাবী অবজ্ঞা করিয়া শিখদিগকে অপমানিত করিয়াছেন। বড়লাট সর্দার বলদেব সিংহকে পুনর্গঠিত শাসন-পরিষদে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিখ পন্থ বোর্ড তাঁহাকে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বলিয়াছেন। শিখরা তাঁহাদিগের প্রস্তাব-বিরোধিতার সাফল্যকল্পে পাঞ্জাবের সর্বত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বলিয়াছেন—শিখদিগকে আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতিবাদ করিতে হইতেছে—কোন শিখ যেন এই ব্যাপারে সহযোগ দানে কুণ্ঠিত না হয়েন। সর্দার বলদেব সিংহ বলিয়াছেন—অবস্থা ভয়াবহ হইবে।

শিখদিগের মত ফিরিঙ্গীরাও মিশনের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা এতদিন ইংরেজের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ই পাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছেন—তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মিশন যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা অসহযোগের পন্থাবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে যে এ দেশ হইতে আমেরিকানরা বিবাহিতা ফিরিঙ্গী তরুণীদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রায় এক সহস্রকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয়, ফিরিঙ্গীদিগের আপনাদিগের অবস্থা বুঝিবার পক্ষে সহায় হইয়াছে। এখন কি ফিরিঙ্গীরা আপনাদিগকে ভারতীয় মনে করিয়া ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগ দিবেন?

মাদুরায় হাঙ্গামা—কাশ্মীর সরকার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশে বাধা দিলে, তাহার প্রতিবাদে এদেশে সর্বত্র যে হরতাল হয়, তাহা মাদ্রাজে প্রবল হইয়া হাঙ্গামায় পরিণতি লাভ করে। মাদুরায় সেই হাঙ্গামা লোকের মৃত্যুর কারণও হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল ও কাশ্মীর দরবার—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশে দরবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে কাশ্মীর দরবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। দরবার তাঁহাকে সে রাজ্য ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতীয় হিসাবে ভারতের সর্বত্র যাইবার অবাধ অধিকার তাঁহার আছে। শেষে কি জটিল অবস্থার উদ্ভব হইত বলা যায় না। কিন্তু মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নির্ধারণ স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করায় তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে যোগ দেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মধ্যে ২।৩ দিন তাঁহার অবস্থা আতঙ্কজনক হইয়াছিল—এখনও বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। সকলেই তাঁহার দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করেন।

দুর্ভিক্ষ—ভারতবর্ষে সর্বত্রই দুর্ভিক্ষে অবস্থা ঘোষিত হইতেছে। বাঙলায় কো কোন স্থান হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্বত্রই চাউল দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য। সরকার তাহার কোন প্রতিকা করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু বিবৃতি বিরাম নাই।

চাউল নষ্ট করা—যখন লোক দুর্ভি মরিতেছে, তখনও নানাস্থানে সরকার গুদাম হইতে বিকৃত অখাদ্য চাউ নষ্ট করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে আসানসোলে ও তাহার সন্নিকটে সরকার গুদাম হইতে প্রায় ২০ হাজার ম বিকৃত চাউল নষ্ট করার সংবাদ আসিয়াছে সরকার প্রথমে ঐ চাউল অল্প মূল্যে ম প্রস্তুতকারীদিগের নিকট বিক্রয়ের চেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু চাউল এতই বিকৃত তাহারাও তাহা ক্রয় করিতে অস্বীকার করেন তাহার পরে ঐ চাউল নষ্ট করিয়া ফে হইয়াছে। এইরূপে গুদামে চাউল ন করিবার জন্য কে বা কাহারা দায়ী?

রেল ধর্মঘট—সকলেই জানিয়া স্বস্তি শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, নিখিল ভারত রে কর্মচারী ধর্মঘট স্থগিত রাখা হইয়াছে। এখ রেল কর্মচারীদিগের দাবী সম্বন্ধে সন্তোষ জনক ও সম্মানজনক মীমাংসা হইলেই মঙ্গল

কম্পাউণ্ডার ধর্মঘট—কলিকাতার সরকার কয়টি হাসপাতালে কম্পাউণ্ডাররা ধর্মঘ করায় লোকের অসুবিধা চরমে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু বাঙলা সরকার কম্পাউণ্ডারদিগে অভিযোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা করি মীমাংসা করিতেছেন না!

রঙ্গজগৎ

...চিত্র কর্মীদের অবস্থার ওপরে সাধারণের দৃষ্টি কেন যে পড়ছে না কিছুতেই ... পাই না। শিল্পটি পয়সার দিক দিয়ে ফে'পে উঠছে এবং এই শিল্পে নিয়োজিত ...ধন যত বাড়ছে, কর্মীদের অবস্থা যাচ্ছে ... খারাপ হ'য়ে। ওপরের স্তরের দু'চারজন ...নয় শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলী বাদ ... প্রায় সকলেই বাড়ন্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে ...তিপাত ক'রছে। সম্প্রতি কয়েকটি ...ডিওতে ঘুরে অনেক তথ্য পাওয়া গেল। ...নেতাদের মধ্যে তারকা শ্রেণীরা প্রচুর ...র্জন ক'রছে, তবে পরিশ্রম অবশ্য বেশী ...তে হ'চ্ছে—বার তেরখানা ছবিতে একসঙ্গে ...নয় ক'রছে প্রথম পর্যায়ের প্রায় সব ...পীই। এরা ভাগ্যবান, সম্পদশালী এবং ...। টাইপ চরিত্রাভিনেতারাও এক একজনে ...পনরখানা ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় ক'রছে, ... এরা কম পেলেও সব যোগ ক'রে ভালই ... হয়। আর আছে চুক্তিবন্ধ শিল্পীরা, ... একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে। ...য় এরা অতি কম এবং অবস্থাও কারুর ...চ্ছল নয়। বাকী থাকে ফালতু অভিনেতারা ...দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে ছবির ব্যবস্থাপনা ...গ; প্রযোজকদের সঙ্গে সোজা চুক্তি এদের ...না, এদের নিয়োগ অনিয়োগ ব্যবস্থাপকের ...ে, ফলে এরা যা আয় করে তার অনেকটা ... ব্যবস্থাপনা বিভাগের ফড়েদের হাতে চলে ...। একজন ফালতুর সঙ্গে আলাপ ক'রে ...লুম যে, গত ছ'মাস ধরে সে উনিশখানি ...তে কাজ ক'রেছে কিন্তু সব মিলিয়ে ...শো টাকাও সে পায়নি। এই ফালতু ...ভিনেতা কাজ ক'রেছে এমন ছবির একজন ...পকের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখলুম যে, ঐ ...ক্তির জন্যে ব্যবস্থাপক প্রযোজকের কাছ থেকে ... টাকা নিয়েছে, কিন্তু ওর হাতে দিয়েছে ...টি টাকা মাত্র! ফালতু অভিনেত্রীদের ...বস্থার অন্ত নেই—শুধু টাকার ভাগই নয়, ...বস্থাপকদের নৈশবিলাসের সঙ্গিনীও হ'তে ... তাদের এবং বিনা পয়সাতেই। ছোটখাটো ...স অভিনেতাদেরও অনেককেই ঘুষ দিয়ে ...জ জোগাড় করতে হয়। এর পর কলাকুশলী-...র কথা। অভিনয়শিল্পীদের সুবিধা হ'চ্ছে যে, ...রা পাঁচ দশটা ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার ...যোগ পায় এবং প্রত্যেক ছবিতেই স্বতন্ত্রভাবে ...রিশ্রমিকও পায়, যাতে তাদের একুনে আয় ...লই হয়। কিন্তু কলাকুশলীদের তার কোন ...যোগ থাকে না। এরা সবাই এক একটা ...ডিওর বাঁধা চাকর—একসঙ্গে এদের দশ ...নরটা ছবিতে কাজ ক'রতে হ'চ্ছে বটে, কিন্তু ... একই মাইনেতে। বিভাগীয় প্রধানরা যা পায় ...তে তাদের চলে যেতে পারে কোন রকমে ...ন্তু তাদের সহকারীদের কাটে খুবই দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে। একজন আলোক চিত্র-শিল্পীর কাছে শুনলুম যে, তিনি বেতন পান চারশো টাকা মাসে আর তার প্রথম সহকারী পাচ্ছে ষাট টাকা—এর নীচে আরও তিনজন সহকারী কাজ করে, তারা কি পায় সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ এদের কাউকে বাদ দিয়ে ছবি হ'তেই পারে না। একজন পরিচালক আড়াই হাজার টাকা ছবি পিছু পাচ্ছেন, কিন্তু তার প্রথম সহকারী তিনশো টাকা চাইতেই প্রযোজক অবাক হয়ে যান; অথচ পরিচালকের বার আনা কাজ সহকারীদের দিয়েই হয়। এই

'কুরুক্ষেত্র' চিত্রে শ্যামলী। মিনার্ভায় প্রদর্শিত হইতেছে।

যখন অবস্থা তো ভাল লোক, কাজের লোক চলচ্চিত্রে যোগদান ক'রবে কিসের ভরসায়? ফিল্মে কাজ করে বলতেই খুব সুখ ও সম্পদশালী লোকের প্রতিকৃতি সামনে ভেসে ওঠে, কিন্তু যাদের না হ'লে সত্যই ছবি হ'তে পারে না তারা যে কি দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটায় বর্ণনা করা যায় না। এ কতকটা কাশ্মীরের মত, নামে ভূস্বর্গ অথচ অধিবাসী-দের অন্ন জোটে না, বসন জোটে না। ছবি ভাল করো ব'লে চেঁচালে হবে কি?—যাদের দিয়ে ছবি হবে তাদেরই যে অন্ন বসন জোটে না।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ চিত্রা ও রূপালীতে নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবি শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'। ছবিখানি তৈরী হ'য়ে রয়েছে আজ দু'বছর এবং নিউ থিয়েটার্সের নিজস্ব চিত্রগৃহ চিত্রায় হিন্দী ছবি দেখানো হ'লেও এতদিন এ ছবিখানির ঠাঁই হয় নি। ছবিখানি পরিচালনা ক'রেছেন অমর মল্লিক এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন ছবি বিশ্বাস, সুনন্দা, দেবী মুখার্জি, সিধু গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

* * * *

এ সপ্তাহে হিন্দী ছবি মুক্তি লাভ ক'রছে নিউ সিনেমায় আত্রে পিকচার্সের **'দুলহা'** যার ভূমিকায় আছেন চার্লি ও চন্দ্রপ্রভা; আর জ্যোতিতে দেখানো হ'চ্ছে মমতাজ শান্তি অভিনীত **'পূজারী'**।

* * *

আগামী রবিবার সকাল ৯টায় বিজলীতে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে **'অভ্যুদয়'** অভিনীত হবে। এই অভিনয়ে কয়েকজন নূতন নৃত্যশিল্পীকে দেখা যাবে।

বিবিধ

আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জির প্রথমা কন্যা অনসূয়া পাওনিয়ার পিকচার্সে যোগদান ক'রেছেন অভিনেত্রীরূপে।

* * * * *

বোম্বেতে মেট্রোর **'বেদিং বিউটি'** একাদিক্রমে ১৪শ সপ্তাহ ধরে দেখানো হ'চ্ছে—ভারতে বিদেশী ছবির দীর্ঘ প্রদর্শনের এইটিই রেকর্ড।

* * *

স্বর্ণলতা পতি বিলিমোরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রযোজক-পরিচালক নজীরকে বিবাহ করার জন্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রেছে।

* * *

বম্বের অভিনেত্রী রত্নমালা সম্প্রতি কলকাতায় অভিনয় করার জন্যে এসেছেন।

* * *

বম্বের এক খ্যাতনামা অভিনেতা ক'বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করলেও রেসের মাঠে সর্বস্ব খুইয়ে বসায় তার এমনি অবস্থা হয়েছে যে, এখন তার স্ত্রী বেরিয়েছে চাকরী করতে।

* * * * * * *

বাঙলার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ নরেশ ভট্টাচার্য বম্বের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পিকচার্সের **'ডাকবাংলো'** নামক ছবিখানির সুরযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন।

* * * * * *

চিত্র নির্মাতারা শুনে আশ্বস্ত হবেন যে গত সপ্তাহে কাঁচা ফিল্মের একটা বড় পরিমাণ বম্বে বন্দরে এসে পেণছেছে।

* * * * * *

ফেমস সিনে লেবরেটরী বম্বেতে এক কোটি টাকা মূলধনে তাদের রসায়নাগার এবং স্টুডিও নির্মাণ করছে—সম্পূর্ণ হলে এই রসায়নাগার পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ বলে পরিগণিত হবে।

* * * * * *

কলকাতার কোন কোন চিত্রগৃহের কর্তারা অম্বালাল প্যাটেলের ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড দেখাতে বাধ্য করার জন্য ভারত সরকারের নামে মামলা দায়ের করার কথা চিন্তা করছেন। তারা বলছেন, নিউজ প্যারেডে বহু জিনিস থাকে যা তারা বা তাদের পৃষ্ঠপোষকরা মোটেই পছন্দ ক'রে না, অথচ ভারতরক্ষা আইনে তাও তারা দেখাতে বাধ্য!

* * * * * *

আমেরিকার দুটি নতুন আবিষ্কার ছবি প্রক্ষেপণে প্রভূত উন্নতি আনবে—একটি হ'চ্ছে নতুন এক ধাতু যার নাম দেওয়া হয়েছে জারকোনিয়াম (Zirconium) যার সাহায্যে প্রক্ষেপণের আলো অনেক বাড়ানো যাবে অথচ খরচ যাবে কম; আর অপরটি হচ্ছে নতুন ধরনের কাঁচ যার মধ্যে দিয়ে প্রক্ষিপ্ত আলোর তেজ বাড়বে অথচ তাপ থাকবে না মোটেই।

কোনও একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেল যে, **'উদয়ের পথে'** কথাচিত্রের নায়িকা বিনতা বসুর সঙ্গে কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়ের শুভ-পরিণয় আগামী জুলাই মাসে সুসম্পন্ন হবে।

* * *

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের প্রথম হিন্দী ছবির কাজ নীরেন লাহিড়ীর প্রযোজনা ও পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছে।

* * *

উদয়শঙ্করের 'কল্পনা'র আমেরিকায় পরিবেশন স্বত্ব নেবার চেষ্টা করছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহঃসভাপতি সম্প্রতি বম্বেতে এসেছেন এবং তাকে ছবিখানি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে পদার্পণ [করি]য়া প্রথম খেলায় পরাজয় বরণ করে। কিন্তু [ই]হার পর সকল খেলাতেই অপূর্ব নৈপুণ্য দর্শন করে। বিশেষ করিয়া শক্তিশালী এম সি [সি] দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ইহাতে [ই]ংল্যান্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণ একটু চিন্তিত [হ]ইয়া পড়েন। অপর দিকে ভারতীয় দলের [স]মর্থকগণ আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা করিতে [থা]কেন। টেস্ট ম্যাচেও ভারতীয় দল ইংল্যান্ড [দ]লকে শিক্ষা দিবে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। [কি]ন্তু ইংল্যান্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণকে দেখা [গে]ল সেই সময় হইতেই টেস্ট খেলায় শক্তিশালী [দ]ল গঠন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া [গে]ইতে। এম সি সি'র খেলার পরও ভারতীয় দল [আ]রও কয়েকটি খেলায় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন [ক]রে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট পরিচালকগণ ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতেই ইংল্যান্ড দল [নি]র্বাচন করেন। অনেকেই আশ্চর্য হন দেখিয়া যে, নির্বাচকমণ্ডলী কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফল হয় প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল কিরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিবে সেই বিষয় কেহই সঠিক কিছু বলিতে পারেন না। এই সময় ভারতীয় দল নির্বাচন করা হয় না। ভারতীয় দলের অধিনায়ক প্রচার করেন যে টেস্ট খেলার আরম্ভের দিন তিনি দল নির্বাচন করিবেন। ইহাতে সকলেরই ধারণা হয় যে তিনি মাঠের অবস্থা দেখিয়া সেই অনুসারে দল গঠন করিবেন। খেলা আরম্ভের পূর্বের দিন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঠ বেশ কঠিন ও মসৃণ ভাব ধারণ করিল। খেলার আরম্ভের দিন প্রাতে মেঘ আকাশে দেখা দেওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টি আর হইল না। মাঠে উভয় দলের খেলোয়াড়গণ সমবেত হইলেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক দলের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে পরিচালকদের হাতে প্রদান করিলেন। দেখা গেল ভারতীয় দল হইতে সারভাতে, এস ব্যানার্জি, মুস্তাক আলী বাদ পড়িয়াছেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর বিশেষ সভ্য অভিজ্ঞ প্রবীণ খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর দলের নামের তালিকা পাঠ করিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এই কি হইল। এইরূপ শুকে মাঠ, মসৃণ পিচ, আর দলে একজনও, ফাস্ট বোলার নাই। ইংল্যান্ড দলের বাউয়েস, স্মেলস ও বেডসার নামক তিন তিনজন ফাস্ট বোলারকে দলভুক্ত করা হইয়াছে ইহা দেখিয়াও কিরূপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক এইরূপ দল নির্বাচন করিলেন?"

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞগণ যাঁহারা ভ্রমণের বিভিন্ন খেলায় "সারভাতের বোলিং ও ব্যাটিংয়ের অপূর্ব নৈপুণ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা পর্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিলেন, "সারভাতেকে দল হইতে বাদ দেওয়ার কোনই যুক্তি পাওয়া যায় না।" এই সময় হইতেই দেখা যায় ভারতীয় দলের সমর্থকগণ ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়েন। ইহাদের সেই আশঙ্কা ব্যর্থ হয় নাই। ভারতীয় দল খেলায় শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে পরাজয় বরণ করিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় দল এই পর্যন্ত টেস্ট খেলায় কখনও ইংল্যান্ডের নিকট ১০ উইকেটে পরাজিত হয় নাই। পতৌদির নবাবের অদূরদর্শিতার ফলে তাহাও সম্ভব হইল। যে খেলার উপর দেশের ও জাতির সম্মান নির্ভর করিতেছে, সেই খেলার দল নির্বাচন করিবার সময় পতৌদির নবাবের উচিত ছিল প্রধান খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরের সহিত আলোচনা করা। খেলার সময় বোলিং পরিবর্তনেও যথেষ্ট গলদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিজয় মার্চেন্টের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ অধিনায়ক দলে থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ত্রুটিবিচ্যুতির সুযোগ দিলেন কেন? ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য সকলে যখন তাঁহাকে দোষারোপ করিবে তখন তিনি কি যুক্তি প্রদর্শন করিবেন?

ইংল্যান্ড দলে তিনজন ফাস্ট বোলার ছিলেন। খেলার ফলাফলে দেখা যাইতেছে এই তিনজন বোলারই কার্যকরী ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এ ভি বেডসার ভারতীয় দলের উভয় ইনিংসেই অধিক উইকেট দখল করিয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছেন। ফাস্ট বোলারদের এই সাফল্য লক্ষ্য করিয়া পতৌদির নবাব হয়তো ইহার পরে অবশিষ্ট টেস্ট ম্যাচে ফাস্ট বোলারকে বাদ দিয়া দল গঠন করিবেন না কিন্তু যে পরাজয়-কালিমা ভারতীয় দলের ভাগ্যে আসিল তাহা তো আর মুছিয়া যাইবে না।

হার্ডস্টাফের ব্যাটিং সাফল্য

ইংল্যান্ড ও ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডের হার্ডস্টাফের প্রথম ইনিংসে ২০৫ রাণ নট আউট খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। তিনি মোট ৩১৫ মিনিট নির্ভুলভাবে খেলিয়া এই রাণ করেন। এইরূপে তিনিই ইংল্যান্ড দলের জয়লাভের পথ সুগম করিয়াছেন। হার্ডস্টাফের পূর্বে ১৯৩৬ সালে হ্যামন্ড ওভাল মাঠে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট খেলায় ২১৭ রাণ করেন। হ্যামন্ডের টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের আর কোন খেলোয়াড় দ্বিশতাধিক রাণ করিতে পারেন নাই। জে হার্ডস্টাফ হ্যামন্ডের সেই কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করিলেন।

খেলার বিবরণ

ভারতীয় দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। ১৫ রাণের মধ্যে মার্চেন্ট ও অমরনাথ আউট হন। মানকড় ও মোদী অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৪ উইকেটে ৭৫ রাণ হয়। হাফিজ পরে আসিয়া পিটাইয়া রাণ তুলেন কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস চা-পানের পূর্বে মাত্র ২০০ রাণে শেষ হয়। আর এস মোদী শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ৫৭ রাণে নট আউট থাকেন। ইংল্যান্ড দলের বোলার এ ভি বেডসার ৪১ রাণে ৭টি উইকেট দখল করেন। চা-পানের পর ইংল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। হাটন ও কম্পটন প্রমুখ দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ১৬ রাণের মধ্যে আউট হন। ওয়াসব্রুক ও হ্যামন্ড অবস্থার কিছু পরিবর্তন করেন। দিনের শেষে ইংল্যান্ড দলের ৪ উইকেটে ১৩৫ রাণ হয়। হার্ডস্টাফ ৪২ রাণ ও গিব ২৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। অমরনাথ ৪০ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার সূচনায় দেখা যায় হার্ডস্টাফ ও গিব দ্রুত রাণ তুলিতেছেন। পতৌদির নবাব একে একে অমরনাথ, হাজারী, মানকড়, গুলমহম্মদ, সিন্ধে, সি এস নাইডু প্রভৃতি সকল বোলারকে বল করিতে দিলেন, রাণ উঠা বন্ধ হইল না। ২৫২ রাণের সময় গিব ৬০ রাণ করিয়া আউট হইলেন। ইনি হার্ডস্টাফের সহযোগিতায় ১৮২ রাণ সংগ্রহ করেন। ইহার পর হার্ডস্টাফ সমানে পিটাইয়া রাণ তুলিতে থাকেন। চা পানের কিছু পূর্বে ইংল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংস ৪২৮ রাণে শেষ হয়। হার্ডস্টাফ ২০৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় ভাল খেলে। কিন্তু পুনরায় বিপর্যয় দেখা দেয়। দিনের শেষে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৬২ রাণ হয়। তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল রাণ তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু সফলতা লাভ করে না। মধ্যাহ্ন ভোজের প্রায় ৫০ মিনিট পূর্বে ২৭৫ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। একমাত্র অমরনাথ বেপরোয়া খেলিয়া ৫০ রাণ করেন।

ইংল্যান্ড দলের হাটন ও ওয়াসব্রুক প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করেন। ইংল্যান্ড দল ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস:—২০০ রাণ (আর এস মোদী নট আউট ৫৭ রাণ হাফিজ ৪৩, হাজারী ৩১, এ ভি বেডসার ৪১ রাণে ৭টি উইকেট)।

ইংল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংস:—৪২৮ রাণ (হার্ডস্টাফ ২০৫ রাণ নট আউট, হ্যামন্ড ৩৩, বেডসার ৩০, অমরনাথ ১১৮ রাণে ৫টি ও বিনু মানকড় ১০৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—২৭৫ রাণ (বিনু মানকড় ৬৩, অমরনাথ ৫০, হাজারী ৩৪, পতৌদির নবাব ২২, মার্চেন্ট ২৭, আর এস মোদী ২১, এ ভি বেডসার ৯৬ রাণে ৪টি, স্মেলস ৪৪ রাণে ৩টি ও রাইট ৬৮ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ইংল্যান্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—(কেহ আউট না হইয়া) ৪৮ রাণ হাটন নট আউট ২২ রাণ ও ওয়াসব্রুক নট আউট ২৪ রাণ।

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে এখনও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। মোহনবাগান এতদিন অগ্রগামী ছিল কিন্তু বর্তমানে উভয় দলের পয়েন্ট সমান হইয়াছে। উভয় দলেরই পাঁচটি করিয়া খেলা বাকি আছে। এই পাঁচটি খেলায় উভয় দলের মধ্যে যে যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিবে তাহার উপরই চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ভর করিতেছে। বর্তমানে উভয় দলের খেলার নৈপুণ্য বিচার করিলে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাই মোহনবাগান অপেক্ষা উন্নততর মনে হয়। সেইজন্য আশা হয় গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল পুনরায় এই বৎসরে তাহাদের সেই অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে। নিম্নে এই পর্যন্ত মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৬	২	১	৫৩	৮	৩৪
মোহনবাগান	১৯	১৫	৪	০	৪৬	৬	৩৪

দেশী সংবাদ

১৮ই জুন—অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্টের সদস্যদের নামের তালিকা হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও কংগ্রেসী মুসলমানের নাম বাদ দেওয়ায় এবং অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্টে কোন মহিলা সদস্য না রাখায় গান্ধীজী বিশেষ আপত্তি জানান।

বর্তমানে কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চলে সাতটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-বিরোধ অথবা ধর্মঘট চলিতেছে এবং উহাতে ২৩ হাজারের অধিক শ্রমিক লিপ্ত আছে।

বড়লাটের ১৬ই জুনের বিবৃতির শেষ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে বাঙলার গভর্নর ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এই অধিবেশন গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

কলিকাতায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৩ই জুনের হিসাবে প্রকাশ যে, বাহিরশূঁড়া রোডের দুঃস্থ শিবিরে ১৫০৫ জন পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশু বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাঙলা প্রদেশের ৬১৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তি আছে।

১৯শে জুন—আজ পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সীমান্তে কোহালায় পৌঁছিলে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া কাশ্মীর সরকার তাঁহার উপর এক নোটিশ জারী করেন। পণ্ডিত নেহরু উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে গেলে বেয়নেটধারী সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাকে বাধা দেয়। পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেওয়ান চমনলালও ছিলেন। তাঁহারা প্রহরীদিগকে সরাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে বেয়নেটের দ্বারা সামান্য আহত হন বলিয়া প্রকাশ।

২০শে জুন—কাশ্মীর রাজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরুকে ডোমেলের ডাক-বাংলোয় আটক রাখা হইয়াছে।

আগামী ২৭শে জুন মধ্যরাত্র হইতে সমগ্র দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট আরম্ভ করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিখিল ভারত রেলকর্মী সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেলওয়ে বোর্ড রেলকর্মী সঙ্ঘের কয়েকটি দাবী পূরণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু ও ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্য দিল্লীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেই আবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া গতকল্য মার্মাগোয়ায় এক জনসভায় পর্তুগীজ গভর্নমেন্টের উপনিবেশ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় পর্তুগীজ গভর্নমেন্টের উপনিবেশ বিভাগের

সাপ্তাহিক সংবাদ

আদেশে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ লোহিয়াকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৩শে জুন—কাশ্মীর প্রজামণ্ডলের নেতা সেখ আব্দুল্লার বিচার ১লা জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মাদুরা শহরে হরতাল হওয়ায় হাঙ্গামা বাধে এবং পুলিশের গুলীতে দুইজন নিহত হয়। এইদিন পণ্ডিত নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলিকাতা ও শহরতলীতে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার খবরে প্রকাশ যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী শ্রীনগর হইতে ৯৬ মাইল দূরবর্তী উরী ডাক বাংলোয় আটক রহিয়াছেন।

২২শে জুন—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের নির্দেশ অনুযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য মোটরযোগে উরী ত্যাগ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে রওনা হন।

২৩শে জুন—নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক কোন কিছুর উল্লেখ ছিল না বলিয়াই প্রথমে তিনি উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার সর্ত স্বরূপ প্রদেশগুলির মণ্ডলীবদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবের ১৯ ধারাকে বাধ্যতামূলকভাবে মানিয়া লইতে হইবে বলিয়া বড়লাটের তরফ হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন।

২৪শে জুন—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের ১৬ই জুনের বিবৃতিতে উল্লিখিত সাময়িক গভর্নমেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অদ্য সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকার হয়। আগামীকল্য পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে।

আর এম এস ইউনিয়নগুলি সহ নিখিল ভারত ডাক-পিয়ন ও ডাক-বিভাগীয় নিম্নপদস্থ কর্মচারী সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ভারত সরকার তাহাদের দাবীসমূহ পূরণ না করিলে তাহারা আগামী ১০ই জুলাই মধ্যরাত্রি হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবে। ধর্মঘটের নোটিশ অদ্য বিমানযোগে নয়াদিল্লীতে প্রেরণ করা হয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিটির উদ্যোগে প্রেরিত মার্কিন দুর্ভিক্ষ মিশনের সদস্যগণ অদ্য বিমানযোগে করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

দাসপুর দারোগা হত্যা মামলার যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বেরা এবং শ্রীযুক্ত কাননবিহারী গোস্বামী কয়েকদিন হইল মুক্তি পাইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই জুন—গতকল্য রাত্রে ডারবানে আনুমানিক একশত শ্বেতাঙ্গ যুবক ভারতীয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের শিবিরে হানা দিয়া তাঁবু টানিয়া নামায় এবং উহা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় টানিয়া লইয়া যায়। দুইজন মহিলা হাঙ্গামায় পড়েন; তাঁহাদিগকে পদাঘাত করা হয় বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু তাঁহারা আহত হন নাই।

১৯শে জুন—স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত মতভেদ বশত উক্ত দলের রাজনৈতিক সম্পাদক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে পদত্যাগ করিয়াছেন।

২০শে জুন—জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফ্‌তি বুধবার মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ মিশরের রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপনীত হন। রাজা ফারুক তাঁহাকে সম্বর্ধনা সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। দুই সপ্তাহ পূর্বে মুফ্‌তি তাঁহার ফরাসী দেশস্থ অবস্থান স্থান ত্যাগ করেন। তদবধি তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না।

২১শে জুন—প্যারিসে পররাষ্ট্রসচিবগণ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইতালীর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ৯০ দিনের মধ্যেই মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদলকে ইতালী ত্যাগ করিতে হইবে। সোভিয়েট সৈন্যদলও বুলগেরিয়ার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ৯০ দিনের মধ্যে বুলগেরিয়া ত্যাগ করিবে।

২২শে জুন—ডারবানে উম্বিলো রোড ক্যাম্পের সমস্ত ভারতীয় প্রতিরোধকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, জাপান যাহাতে পুনরায় বিশ্বশান্তির অন্তরায় না হইতে পারে, এই ব্যবস্থার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট রাশিয়া ও চীনের নিকট এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৪শে জুন—কমন্স সভায় সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেণ্ডারসন বলেন যে, ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি এখনও অনেক শোচনীয়। তবে ভারত সরকার আশা করেন যে, যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ভারতে পাঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা যদি ভারতে আসিয়া পৌঁছায় এবং অন্য কোন বিপর্যয় না ঘটে, তাহা হইলে আগস্ট মাস পর্যন্ত খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখা যাইবে।

স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের নিমিত্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের নির্দেশ দানের জন্য পোল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল, অদ্য নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফ্রান্সে এম আর পি, সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট এই তিন দল লইয়া মঃ বিদোলের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ]   ২১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 6th July, 1946.   [৩৫ সংখ্যা

[মন্ত্র]ী মিশনের দৌত্যের পরিণতি

প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহকাল ভারতের ভবিষ্যৎ [শাস]নতন্ত্র সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় [অতি]বাহিত করিয়া বৃটিশ মন্ত্রী মিশন [গত] ৩০শে জুন ভারত পরিত্যাগ করিয়া [লণ্ড]নে পৌঁছিয়াছেন। মিশনের মুখপাত্র [স্ব]রূপে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স [বিদা]য়কালে আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান [করি]য়াছেন যে, ভারতবাসীরা যাহা চাহে [অচি]রবিলম্বেই তাহারা তাহা লাভ করিবে, এই [আ]শা অন্তরে লইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিতে[ছে]ন। ভারত সচিবের এই উক্তি ব্রিটিশ রাজ[নৈ]তিক সুলভ স্তোকমূলক সদিচ্ছা মাত্র না [তাঁ]হার অন্তরের কথা আমরা ঠিক বুঝিয়া [উ]ঠিতে পারিতেছি না; তবে আমরা এই কথা [শু]নিতে পাইতেছি যে, তিনি দেশে [ফি]রিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়া [অ]ফিসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন, [অ]র্থাৎ ভারত সচিবের পদে জবাব দিবেন [ব]রূপে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার এইভাবে [কা]জে জবাব দিবার ইচ্ছার মূলে বার্ধক্যবশত [অ]সুস্থতা কতখানি আছে বিবেচনার বিষয়, [কি]ন্তু আমাদের মনে হয়, মিশনের ভারতে [দৌ]ত্য সম্পর্কিত ব্যাপারের সঙ্গেও ইহার [সম্ব]ন্ধ রহিয়াছে। স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, [মি]শন ভারতে আসিয়া যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত [হ]ইয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হয় নাই; কংগ্রেস [তাঁ]হাদের প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট [গঠ]নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই এবং স্থায়ী [শাসনত]ন্ত্র-পরিকল্পনাতেও কংগ্রেস মিশনের রায় [স্ব]ীকার করিয়া লয় নাই। এই সঙ্গে এ[কথা]ও মানিয়া লইতে হয় যে, কংগ্রেস মন্ত্রী [মি]শনের পরিকল্পনা ভারতের স্বাধীনতার [বি]রপন্থী হইবে বুঝিয়াই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ [ক]রিয়াছে। সুতরাং মন্ত্রী মিশনের সদস্যগণ

সত্যই যে ভারতের স্বাধীনতা মনে প্রাণে কামনা করেন, দেশের লোকে ইহা বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ মিশনের দৌত্যসূত্রে স্বৈরাচারী শাসকদের কূট পাকচক্রের মধ্যে কংগ্রেসকে জড়িত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। লর্ড ওয়াভেল নিজে এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে যোগ দিয়া চির দাসত্বের নাগ পাশে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া ফেলিবার ফাঁদই বিস্তার করেন; কিন্তু কংগ্রেস বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধীর দূরদর্শিতার জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। মিঃ জিন্না এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক; কারণ তিনি দেশের স্বাধীনতা কোনদিনই চাহেন নাই। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে জাল বিস্তার করিয়া তিনি বাদশাগিরি উপভোগ করিবেন এজন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; অথচ কতকটা আকস্মিকভাবেই তাঁহার এই সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বড়লাট অনেকটা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে, এইরূপ বুঝিয়াই তিনি অবাধে মিঃ জিন্নার আবদার পূর্ণ করিবার জন্য সদাব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইহা কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, কংগ্রেস একটা নির্দিষ্ট নীতি ধরিয়া চলিতেছে এবং সে নীতির ব্যত্যয় ঘটিলে কংগ্রেস কোনক্রমেই তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবে না। কংগ্রেসের নীতি-নিষ্ঠার এই সূক্ষ্ম গতি মন্ত্রী মিশন কিংবা বড়লাট ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাতে গান্ধীজীর প্রাথমিক সমর্থনের বাহিরের দিকটাই তাঁহারা বড় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থতা লাভ করে। অতঃপর তাঁহারা মিঃ জিন্নার দলবল লইয়াই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে বাধ্য হইবেন জিন্না সাহেবের অন্তরে এই আশা জাগিবে ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু মিশন তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলকেও সুর ঘুরাইয়া লইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহারা স্পষ্টভাবেই এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, শুধু মুসলিম লীগকে লইয়া অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে গেলে সমস্যা কিছুই মিটিবে না। পক্ষান্তরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুনই জ্বালাইয়া তোলা হইবে; সুতরাং তাঁহারা আপাতত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন; বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা ব্রিটিশের দিক হইতে ভারতের সমস্যার আদৌ সমাধান হয় নাই; শুধু সাময়িকভাবে সে সমস্যা চাপা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় সমস্যা সমাধানের মূল কেন্দ্র এখন দিল্লী হইতে লণ্ডনে স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র; ফলতঃ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন পরিকল্পনা এড়াইয়া এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। পক্ষান্তরে একমাত্র জনগণের প্রতিনিধিমূলক সাময়িক গভর্নমেণ্ট গঠনের দ্বারাই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে; কারণ কংগ্রেস তাহাদের গৃহীত সিদ্ধান্তে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, মিশনের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করিলেও দায়িত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের উপরই গৃহীত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস কর্তৃক কার্যে পরিণত করা না

করা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং কংগ্রেস সহযোগিতার পথ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছে বলা চলে না। কার্যতঃ সে সংগ্রামের ভাব লইয়াই চলিয়াছে। ব্রিটিশ মিশনের অভিজ্ঞতা হইতেও যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শুভ বুদ্ধির উদয় না হয়, তবে এই সংগ্রাম যে কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করিবে ইহা একরূপ অবধারিত।

আর কত দিন?

কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা বর্জনের পর ৮ জন সদস্য লইয়া একটি 'কেয়ার টেকার' বা সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণকারী গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্যার আকবর হায়দরী এবং স্যার গুরুনাথ বেউর ব্যতীত অপর ৬ জনই ইংরেজ। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ লইয়া এই গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে বলিয়াই যে আমাদের আপত্তি তাহা নহে। বাস্তবিক যে ব্যবস্থা অনুসারে এই গভর্নমেণ্টের সদস্যদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের ৮ জন যদি ভারতীয়ও হইতেন তাহাতেও আমাদের পক্ষে ঘোর আপত্তির কারণ থাকিত। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব এবং জনগণের সমর্থনই আমাদের কাছে ইঁহাদের যোগ্যতার পক্ষে বড় কথা। সে যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা ভারতীয় হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে বিদেশী স্বার্থবাহ শ্বেতাঙ্গেরই সমতুল্য মনে করি, বরং এ দেশের লোক হইয়া দেশের জনমতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাঁহারা আমাদের মতে শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষাও সমধিক ধিক্কার ভাজন এবং পদ ও প্রতিষ্ঠার মোহে তাঁহাদের চিত্তের এই দৈন্য দেশদ্রোহিতার সমান নিন্দনীয়। বস্তুত অন্যান্য স্বাধীন দেশে বিশেষ জরুরী অবস্থার ভিতর পড়িয়া যে নীতি অনুসারে 'কেয়ার টেকার' গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়, এখানে তাহা হয় নাই। অন্যান্য দেশে দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত উপদলীয় রাজনীতির মনোবৃত্তি বর্জিত রাজকর্মচারীদিগকে লইয়া 'কেয়ার টেকার গভর্নমেণ্ট' গঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু এক্ষেত্রে বিদেশীর আনুগত্য বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রধানতঃ বিদেশীদিগকে লইয়া এ গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং ইঁহারা যে দেশের জনমতের বিরোধী হইবেন, দেশবাসী ইহা স্পষ্টভাবেই জানে। এরূপ অবস্থায় শুধু 'কেয়ার টেকার' গভর্নমেণ্ট এই নামেই দেশের লোকে প্রবঞ্চিত হইবে না এবং যতদিন পর্যন্ত জনমত বিরোধী এই শাসকের দল দেশের ঘাড়ে দুষ্ট গ্রহের মত চাপিয়া থাকিবেন, দেশের লোকের মনে ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতিগতি সম্বন্ধে পুরাপুরি সন্দেহের ভাবই বিদ্যমান রহিবে। এইরূপ অবস্থায় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কোনরূপ আপোষ-মীমাংসা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই এদেশের জনমতের অনুকূলে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, তবে কতদিনের জন্য এই 'কেয়ার টেকার' গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে এবং কতদিনের মধ্যে জনগণের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা তাঁহাদের সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত। অন্তর্বর্তী সেই গভর্নমেণ্টে ভারতের স্বাধীনতাকে সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে পরন্তু সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠের স্বার্থ প্রভৃতি মামুলী অজুহাত তুলিয়া যদি নিজেদের কূটনীতির খেলা ইহার পরেও খেলিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। এদেশের লোক ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ধাপ্পাবাজীর শেষ দেখিয়া লইয়াছে; অতঃপর সেই ধরণের কাল-বিলম্বের কৌশল আর খাটিবে না।

শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের অত্যাচার

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের বিতাড়ন বিধির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং তথাকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন। মহাত্মা গান্ধী কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় বিরোধী এই সব বিধির সমর্থনকারী শ্বেতাঙ্গদিগকে গুণ্ডা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ইহাদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, গুণ্ডারা ভীরু স্বভাব বলিয়া আমি বহুদিন হইল জানি। মানুষের বিরুদ্ধে যাহারা অত্যাচার করে তাহারা গুণ্ডা, তাহারা নরপশু। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গেরা দস্তুরমত গুণ্ডামিই চালাইতেছে। সম্প্রতি এই শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের প্রহারে একজন ভারতীয় নিহত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে শ্বেতাঙ্গদের এই ধরণের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিনের সে কথা; কিন্তু এতকালেও শ্বেতাঙ্গদের সেই প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। প্রকৃত পক্ষে, শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই নয়; জগতের যে কোন স্থানে এশিয়াবাসীদিগকে দুর্ভাগ্যক্রমে শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে যাইতে হইয়াছে সেইখানেই শ্বেতাঙ্গেরা গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এশিয়াবাসীদিগের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইয়াছে এবং নিজেদের পশুবলের জোরে মানুষের অধিকার হইতে এশিয়াবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পাকা করিবার চেষ্টা করি
শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার শত গর্ব সত্ত্বেও কা
এই দুষ্প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত ব
তাহারা এখনও পরিত্যাগ করে
মানব সভ্যতার অগ্রগতি এবং তদনু
আদর্শ বা নীতি ইহার কোন যুক্তিই ইহ
পক্ষে খাটে না। আরও দুঃখের বিষয় এই
ইহাদের এই দুষ্প্রবৃত্তি সমগ্র শ্বেতাঙ্গ
কর্তৃক সমর্থিত হইয়া থাকে। দ
আফ্রিকায় যাঁহার কর্তৃত্বে ভারতীয়দের
বর্তমানে অত্যাচার এবং নির্যাতন চলিতেছে
জেনারেল স্মাটস্ খৃষ্টীয় সভ্যতার এ
ধারক বাহক এবং পরিপোষক বলিয়া শ্বে
সমাজে সম্মানিত হইয়া থাকেন; ব্রিটিশ
নীতির ক্ষেত্রেও জেনারেল স্মাটসের আদর
সম্মান সামান্য নহে; প্রকৃত পক্ষে জেনা
স্মাটসের অবলম্বিত এই নীতির পি
ইংরেজ, আমেরিকা এবং ওলন্দাজ গভর্নমে
সমর্থন রহিয়াছে। যদি না থাকি
জগৎব্যাপী এত বড় একটা বিপর্যয়ের
তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরু
এমনভাবে বৈষম্যমূলক বিধান লইয়া অগ্র
হইতে পারিতেন না। বস্তুত, দ
আফ্রিকার ভারতীয়গণ বর্তমানে যে সং
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার সহিত শুধু ভার
নহে, সমগ্র এশিয়া এবং শুধু এশিয়াও ন
সমগ্র মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভ
রহিয়াছে। বন্য বর্বরের বিধান মানুষ আ
মানিয়া চলিবে কি না এই প্রশ্নই দ
আফ্রিকায় ভারতীয়দের মানবতা
আন্দোলনের ভিতর দিয়া উদ্দীপ্ত হ
উঠিয়াছে। আমরা দৃঢ়ভাবেই বলি, আবে
নিবেদনের পথে শ্বেতাঙ্গ সমাজের শু
বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া এই সম
সমাধান হইবে বলিয়া আমরা বি
করি না। মানবতার মহিমায় জাগ্রত ভা
বাসীকেই এই অত্যাচারের প্রতিকার ক
করিতে হইবে এবং সেজন্য যদি প্রয়োজন
নিজেদের হৃদয়ের রক্ত পর্যন্ত উৎসর্গ করি
অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের
আমাদের ভগিনী যাহারা তাহারাই
ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাদের দ্বারা যথা
নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত হইতে থ
তবে মানুষ নামে পরিচয়
আমাদের বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ ন

পরলোকে শ্রীযুক্তা সরলা রায়

ডক্টর পি কে রায়ের সহধর্মিণী শ্রী
সরলা রায় গত ১৪ই আষাঢ়, শনি
ছিয়াশী বৎসর বয়সে পরলোক
করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রায় দেশবন্ধু চি
দাশের জ্যেষ্ঠতাত সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সং

দেশহিতব্রতী দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে বাঙলা দেশে মহিলাদের বারা পরিচালিত প্রথম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সত্তর বৎসর পূর্বে ঢাকায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা রায় অতঃপর কিছুদিন কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের নারী সম্পাদিকা ছিলেন। অতঃপর তাঁহার বন্ধু মহামতি গোখলের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রথম মহিলা ফেলো নির্বাচিত করিয়া তাঁহার জীবন-ব্যাপী শিক্ষা প্রচার ব্রতকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার পরলোকগমনে নারী সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটিল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধীর প্রাণনাশের চেষ্টা

মহাত্মা গান্ধীর প্রাণনাশের চেষ্টার সংবাদে সমগ্র ভারতে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। গত ২৯শে জুন রাত্রিযোগে গান্ধীজী স্পেশ্যাল ট্রেণে দিল্লী হইতে পুণা যাইবার সময় ট্রেণ-খানা রেলপথের উপর নিক্ষিপ্ত কয়েকখানা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেণখানার ইঞ্জিন কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত অপর কোন অনিষ্ট ঘটে নাই এবং গান্ধীজী রক্ষা পাইয়াছেন। ঘটনা দেখিয়া মনে হয় অসদভিপ্রায়ে দুষ্ট লোকেরাই রেলপথের উপর এই সব প্রস্তর রাখিয়াছিল; নতুবা এই স্থানের আশে পাশে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখান হইতে পাথরগুলি গড়াইয়া আসিয়া পড়িতে পারে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছেন—আমি কোন দিন কাহারও অনিষ্ট করি নাই এবং কাহাকেও আঘাত করিব, স্বপ্নেও কোন দিন এমন চিন্তা আমার মনে উদিত হয় নাই; এরূপ অবস্থায় অপরে কেন আমার অনিষ্ট সাধনে প্রয়াসী হইবে, আমি বুঝিতে পারি না।" মহাত্মাজীর মনে যে প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, এই ব্যাপারে অনেকেরই মনে সেই প্রশ্নের উদয় হইবে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ এখনও পশুত্বের স্তরে রহিয়াছে। আণবিক বোমা লইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের এত যে উন্মাদনা তাহার মধ্যেও আমরা মানুষের পশুবৃত্তিরই প্ররোচনা দেখিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে যে অনিষ্ট করে, মানুষ সে সব ক্ষেত্রে শুধু তাহারই অনিষ্ট করে এমন নয়। যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না, আজও জগতে এমন মানুষ আছে, তেমন মহাপ্রাণ উদারচেতা পুরুষের অনিষ্ট সাধনের জন্যও তাহাদের পশুবৃত্তি প্ররোচিত হইয়া থাকে। মহামানব-গণের অনেকের জীবনের ইতিহাস হইতেই এই-রূপ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতঃপূর্বেও মহাত্মাজীর ন্যায় মহামানবের জীবন নাশের জন্য কয়েকবার চেষ্টা হইয়াছিল; অনেকেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মাজীর প্রাণ নাশের জন্য যে সব নরপশু সেদিন এই ঘৃণিত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা কে আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; তবে ভারতবর্ষে এমন ঘৃণিত জীবের অস্তিত্ব এখনও যে আছে, ইহা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। আমরা আশা করি, দুষ্কৃত-কারীরা যাহাতে সমুচিত শাস্তি লাভ করে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ইহাদের চেষ্টা যদি সার্থকতা লাভ করিত, তবে শুধু ভারতের নহে, সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে কত বড় অনিষ্ট ঘটিত তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শিহরিত হইতেছি। মহাত্মাজী রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। আমরা এজন্য ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙলা দেশের অন্নসংকট ও প্রতীকার

বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় সংকটের কাল। অন্ন সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার মফঃস্বলে ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়াও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথচ অন্নসংকটের আশু প্রতি-কারের কোন লক্ষণও এপর্যন্ত দেখা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে অন্নাভাবের খবরই আমরা উত্তরোত্তর অধিক পাইতেছি, এবং অন্নাভাব-ক্লিষ্টের আর্তনাদই আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমরা দেখিলাম, বাঙলার খাদ্য সমস্যা সমাধানের সম্বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাঙলা সরকার প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিগণ এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিশিষ্ট বে-সরকারী ব্যক্তিদের লইয়া শীঘ্রই একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সমিতিতে কলিকাতার মেয়র, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানি, শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার, বাঙলার পাঁচটি জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় বণিক সভা, ভারতীয় বণিক সভা ও মুসলিম বণিক সভার একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস ও লীগের চারিজন করিয়া প্রতিনিধি, ইহা ছাড়া, তপশীলী দল, কমিউনিষ্ট দল, হিন্দু মহাসভা, শ্বেতাঙ্গ মহাজন এবং শ্রমিক দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। বলা বাহুল্য এইরূপ উপদেষ্টা সমিতি গঠনের দ্বারাই যে দেশের খাদ্য সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। বাঙলা দেশের খাদ্য ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটি দেখা দিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস সরকারী কর্মচারীদের অসাধুতা বা দুর্নীতিই প্রধানত তাহার মূলে রহিয়াছে। সেগুলি দূর করিতে প্রস্তাবিত সমিতির কতটা ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতির সদস্যদের মতের প্রভাব সেগুলির প্রতিকারে সরকারী কর্মচারীদের উপর কতটা কার্যকর হইবে, তাহার উপর সব নির্ভর করিতেছে। বস্তুত, সমিতির অধিকাংশ সদস্যের অভিমত জনস্বার্থের অনুকূল হইবে কি না, এই বিষয়েও প্রথমে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শুধু মূল্যবান উপদেশের অভাবে কোন কিছু আটকাইয়া নাই। প্রকৃতপক্ষে উপদেশ দানের অভাব আদৌ ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না; কার্যক্ষেত্রে জনস্বার্থে জাগ্রত ব্যক্তিদের সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি রাখাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বস্তুতঃ জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সেবাব্রতী কর্মীদের দ্বারা যদি সমগ্র ব্যবস্থা সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে শুধু উপরে উপরে জনমতের অনুবর্তনের একটা ভঙ্গী দেখাইয়া প্রকারান্তরে প্রকৃত সমস্যাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে গেলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। বিপন্ন বাঙলাকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি দলনে জনসেবক কর্মীদিগের সাহায্য গ্রহণ করাই আমরা প্রথম প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; এবং দেশের জন্য যাহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, একমাত্র তাহারাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অন্য কাহারও উপরে আমাদের আস্থা নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, গত-বারের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এক্ষেত্রে অপরাপর ধন, মান এবং প্রতিষ্ঠা-বানদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সত্যই সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছি।

রাজগীরের দৃশ্যাবলী

শিল্পী: শ্রীইন্দ্র দুগার

পঞ্চাশের বাংলা

দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা মন্বন্তর সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, তেরশ' পঞ্চাশ সালের বাঙলা সে ধারণাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। দেশে অনাবৃষ্টি হইতে অজন্মা এবং অজন্মা হইতে দুর্ভিক্ষ হয় এবং লোকে তখন একদিকে খাইতে না পাইয়া অন্যদিকে অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মারা যায়। কিন্তু পঞ্চাশের বাঙলায় দেখা গিয়াছে, যুদ্ধের নামে দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত শস্য-ভাণ্ডার ছলে বলে কৌশলে ছিনাইয়া আনিয়া রাশীকৃত করা হইয়াছে এবং উহার একাংশ গিয়াছে লোভ ও লালসার ইন্ধন যোগাইতে, অপরাংশ গিয়াছে জলে। একটা দেশের ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়া যে কবর খোঁড়া হইয়াছে, তাহার সহিত হাজার বেলসেনেরও কি তুলনা হইতে পারে? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তো তাহার নিকট কিছুই নয়।

এই অভিশপ্ত পঞ্চাশের বাঙলাকে সাহিত্যে ও শিল্পে রূপ দিবার একটা চেষ্টা কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর সকল বড় ঘটনাই, যে-দেশে সংঘটিত হয় সে দেশের শিল্প-সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। পঞ্চাশের বাঙলা পৃথিবীর সকল বড় ঘটনাকে হার মানাইয়াছে। কারণ এমন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যাহাতে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত কোন মারণাস্ত্রই বাদ যায় নাই—এক হিসাবে তাহাও ধ্বংসের দিক হইতে পঞ্চাশের বাঙলার নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে জাগে মরণোল্লাস—লোকে পতঙ্গের মত ক্ষণ-আলোকের ঝলকানিতে প্রাণ দেয়। কিন্তু পঞ্চাশের বাঙলায় যাহারা মরিয়াছে, কি সান্ত্বনা ছিল তাহাদের মরণে? মার চোখের সামনে কোলের শিশু মরিয়াছে, স্বামীর সামনে স্ত্রী মরিয়াছে, কোথাও বা দলবদ্ধভাবে চট মুড়ি দিয়া এক সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। অথচ সুজলা সুফলা বাঙলার শস্য ভাণ্ডার তখন অটুট ছিল, কিন্তু তাহার চাবিকাঠি ছিল দানবের হাতে। সারা পৃথিবী যখন যুদ্ধের উদ্দামতায় মত্ত, পঞ্চাশের বাঙলা তখন নীরবে মরিয়াছে।

পঞ্চাশের বাঙলাকে এ যাবৎ শিল্পে ও সাহিত্যে অনেকেই রূপ দিয়াছেন। এ নিয়া যাহারা সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু আমরা পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে, সার্থক সৃষ্টি প্রতিভা কাহারও লেখনীতে ধরা পড়ে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এখনো আমরা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। যে মানসিক নিশ্চিন্ত অবস্থায় সত্যিকার সৃষ্টিকার্য সম্ভব, সেরূপ অবস্থা আসিলে তখন হয়তো আমাদের সাহিত্যিকগণ পঞ্চাশের বাঙলাকে ঠিক ঠিক রূপ দানে সক্ষম হইবেন, আর আমরাও তখন বিগত দুর্দিনের দুঃখ-ভরা মুহূর্তগুলিকে সাহিত্যে রূপায়িত দেখিয়া বেদনার মাধুর্যে উহাকে উপভোগ করিতে পারিব। কারণ একথা সত্য যে, মানুষ বেদনার স্তূপে বসিয়া দুঃখের বারমাসী গাহিতে তৃপ্তিবোধ করে না। তখন বরং সে আশা ও সান্ত্বনার আলোক খুঁজিতেই ভালবাসে। কিন্তু শিল্পের মধ্য দিয়া যে কয়জন পঞ্চাশের বাঙলাকে রেখায়িত রূপায়িত করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোন জনকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না কেননা তাহারা বলিষ্ঠ তুলির টানে পঞ্চাশের বাঙলাকে চিত্রিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা দেশের রস-লোকের স্থায়ী সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। প্রসঙ্গত এখানে শিল্পী ইন্দু গুপ্তের নাম উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি তাঁহার "বাঙলা—১৩৫০" শীর্ষক যে অ্যালবাম প্রকাশিত হইয়াছে, উহা মন্বন্তর শিল্পের এক স্মরণীয় সম্পদরূপে গণ্য হইবে। শিল্পী মোট ছয়খানা মাত্র চিত্রের সাহায্যে একটি গোটা

পরিবারের ধ্বংসের রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঠিক এইভাবেই বাঙলার লক্ষ লক্ষ পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙলা ছিল ধনধান্যে পূর্ণ—কিন্তু এক সময় দেখা গেল, দানা নাই—ঘরে নাই বাহিরে নাই, হাটে বাজারে কোথাও নাই। কৃষক পরিবার খাদ্যের আশায় আসিল সহরে। এখানেও তাই। দল হইতে একটি একটি করিয়া লোক খসিয়া পড়িতে লাগিল। যে দুই একজন রহিল, তাহারা ডাস্টবিনেও খাদ্যকণা খুঁজিতে গিয়া দেখে সেখানেও শূন্যতা। শেষে তাহারাও মরিল। যে একজন বাকী ছিল, এক বৃক্ষতলে শত শত কঙ্কালের সহিত তাহারও কঙ্কাল মিশিয়া গেল। তারপর সেই কঙ্কাল রাশির স্তূপ ফুঁড়িয়া, ঊষার সঙ্গে সঙ্গে নবজীবনের সম্ভাবনা লইয়া অঙ্কুরিত হইল চারা গাছ। এ শুধু কয়েকটি জীবনেরই ইতিহাস নয়, গোটা দেশটার বিনষ্টির মহাকাব্য। শাসনের এবং উহার বাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে এইভাবে যাহারা প্রাণ দিল, দেশে নব-জীবনের সম্ভাবনা যদি সত্য কোন দিন আসে, সেদিনে এই অগণিত দধীচিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই সকল চিত্র এবং উহাদের শিল্পীরা তখন নিশ্চয়ই উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানে ভূষিত হইবেন এবং পঞ্চাশের বাঙলার অপরিসীম দুর্দশার মূলে যাহারা ছিল, আকাশে বাতাসে তখন তাহাদের প্রতি ধিক্কার পরিব্যাপ্ত হইবে।

---
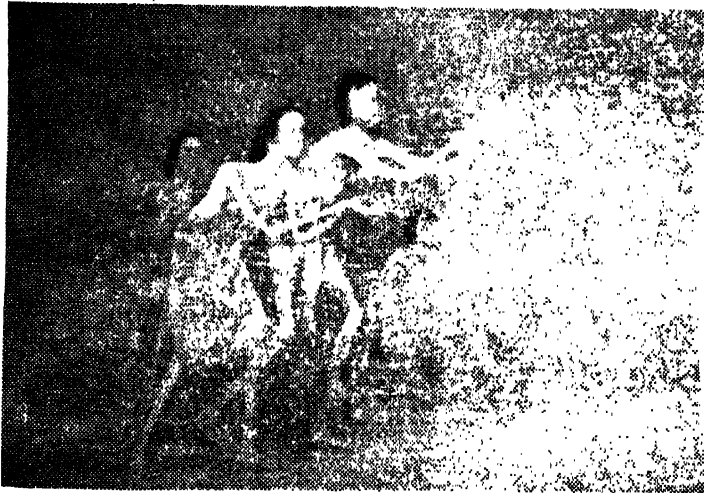
*Bengal In Agony—বাংলা ১৩৫০। শ্রীযুত ইন্দু গুপ্ত, প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানী কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

মৌনময়ী

কানাই সামন্ত

বোবা সেজে ব'সে আছেন নিঃসঙ্গিনী পৃথিবী
অরণ্যে-পর্বতে-মরুবিস্তারে-সপ্তসিন্ধুর কূলে কূলে।
অগণ্য বল্মীকস্তূপ-হেন মানবসমাজ
গ'ড়ে তুলেছে তা'র গ্রাম-নগর-গৃহ,
কীটের মত যা'র জীবনযাত্রা
স্বরচিত সুড়ঙ্গপথের অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।
দিশাহারা হয় সাধারণ মানুষ
অনাবৃত ভুবনের পরিপূর্ণ আলোকে—
গাল দেয় তাকেই অজ্ঞেয় অচেতন মূক ব'লে
প্রাণ যার অন্তহীন নিরন্তর-উৎসারিত ধারে
শ্যামল করে রেখেছে অরণ্য-পর্বত,
মুখর ক'রে রেখেছে দশ দিক,
চঞ্চল ক'রে রেখেছে মুহূর্ত পল।

মাঝে মাঝে আসে পথভ্রান্ত অতিথি
বাতুল—বেহিসাব—চিরশিশু—
নয়ন-ভরা অসীম কৌতুক—
চরণ-ভরা অশেষ জিজ্ঞাসা
অভ্যাসবন্ধন ছিন্ন ক'রে ফেলে অন্ধ-কীটের
মিলবে ব'লে সেই বিশ্বছন্দে
আনন্দিত যা'র আবর্তনে সমুদ্রে নাচে ঢেউ,
উদয়াস্তে ধায় রবি-চন্দ্র-তারা।
কারখানা-ঘরে ঘরে ঝনৎকার;
খনিতে খনিতে মসীশ্বাসিত আর্তনাদ;
অগণ্য পণ্যশালায় বাণিজ্য-হলহলা;
অসংখ্য রণক্ষেত্রে কামান-গর্জন।
কানে শোনে না সেই উৎকর্ণ প্রাণ,
চিরসরণীতে ফেরে চিরজীবন,
বাণীর প্রসাদ কামনায় ব্যাকুল-মনে ·
শূন্য প্রান্তরের আকাশে তুলে' তুলে' আতুর অঞ্জলি
বলে, কৈ গো ক্রন্দসী-বিগলিত সুরধুনীধারা!

বোবা সেজে' ব'সেছিল অনাত্মীয়া প্রকৃতি;
তখন কথা কয়। প্রকৃতিরই দানে
সংসার সাজায়—প্রকৃতিকেও সাজায় আনন্দ-বাউল
প্রেমে, করুণায়, সৌন্দর্যে, সঙ্গীতে, বাণীর বরণমালায়

বাণীর বরণমালায়!......হায়!
সব বাণী বাকি আছে তবু মনে হয়,
সব কথা বুকে ক'রে আছে আজও জননী।
নইলে স্তব্ধ কেন তালীবন
নীলাঞ্জনছবি সাশ্রু আকাশে?—
নয়নে স্বপ্ন এনে দিয়ে বিশ্বপরিবারের
হিমাচলচূড়ায় জেগে কেন থাকেন জননী
তুষারের আস্তীর্ণ আসনে
স্তিমিত নক্ষত্রলোকের সভার মাঝখানে?—
একাকিনী জাগেন কেন রাতের পর রাত?

অনুভব

শান্তা রায়চৌধুরী

বলো তো বন্ধু এ কী অভিনব অনুভব জাগে মনে
বার বার আঁখি ভ'রে ওঠে জলে কেন জানি অকারণে;
নীরব নিশায় এ কী বেদনায় একা জাগি বাতায়নে,
তারায় তারায় করে কানাকানি চাহি মোর মুখপানে।
আঁধারের দূতী ওরা কি বহিছে গোপন বেদনাখানি,
রাতজাগা কার দুটি আঁখি 'পরে দিবে সে বারতা আনি?
দীপনেবা ঘরে অসীম আঁধারে আঁখির প্রদীপ জ্বালি'
স্মৃতির দুয়ার পার হ'য়ে যেন বহু দূরে যাই চলি।
দেখিনু সেদিন পূজার ডালিটি ছিল ভরি ফুলে-ফলে,
আজ দেখি চেয়ে অর্ঘ্য কুসুম প'ড়ে আছে ভূমিতলে।
অজানা ব্যথায় আঁখিপল্লবে অশ্রুর মালা দোলে,
ফেলে-চলে-আসা দিনগুলি যেন কানে কানে এসে বলে—
"গত-জনমের রজনীগন্ধা এ-জনমে যাবে ঝরি'
শুধু অশ্রুসজল স্মৃতি-সৌরভে বন্ধুরে রবে ঘিরি'॥"

সুলতা

অমর সান্যাল

নূতন কলোনিতে সুলতারা হোস্টেল খুলে বসল। এ জায়গাটা ঠিক শহর বলা চলে না, আবার পাড়াগাঁ বললেও ভুল হবে। বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে সারি সারি পাকা ইমারত, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে লাল কাঁকরের রাস্তা শহরের দিকে, চারিদিকে পল্লীর প্রগাঢ় প্রশান্তি। জায়গাটা সুলতাদের ভালই লাগল।

পরিচয় হতে বিলম্ব হল না। লাল বাড়িতে স্কুলের মিস্ট্রেসদের আগমন সংবাদ নূতন কলোনিতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। রিটায়ার্ড ডেপুটি ও মুনসেফদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হল এবং সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ডেপুটি তেজেশবাবু এক মন্থররৌদ্র অপরাহ্নে হাজিরা দিলেন সুলতাদের হোস্টেলে। তেজেশবাবুর আগমনে সুলতারা বিশেষ বিস্মিত হল না। স্কুল কমিটির একজন মেম্বার, তিনিও কলোনির অন্যতম মাতব্বর ব্যক্তি।

সুলতাই অভ্যর্থনা করল।—আসুন তেজেশবাবু, ভারী খুশী হলাম আপনি আসাতে।

—ধন্যবাদের কোন প্রয়োজন নেই মিস্ চ্যাটার্জি। পাড়ায় নতুন এসেছেন আপনারা, খোঁজখবর নেওয়া কর্তব্য বলেই মনে করি আমি।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মিহি ও মোলায়েম করে সুলতা বলল,—অনেক ধন্যবাদ তেজেশবাবু; আসবেন মাঝে মাঝে। আমরাও একদিন রিটার্ন ভিজিট দিয়ে আসব আপনার বাড়িতে।

—না, না, আপনারা কষ্ট করবেন কেন! কাজের লোক আপনারা, আর আমি হলাম গিয়ে রিটায়ার্ড মানুষ।

বক্তব্য শেষ করেই তেজেশবাবু প্রস্থান করলেন। মিস্ট্রেসরা একযোগে ঘরে এসে সুলতাকে ঘিরে দাঁড়াল।

—বুড়োটি কে ভাই! প্রশ্ন করল মলিনা।

—ইনি হলেন তেজেশবাবু, স্কুল কমিটির একজন মহামান্য মেম্বার আর রিটায়ার্ড ডেপুটি। নিরিবিলি থাকতে দেবে না এরা। শুনে এলাম নতুন কলোনিতে রিটায়ার্ড লোকই বেশী, কিন্তু বুড়োর দলও তাড়া করে আসে!

মলিনা বলল,—বুড়োর পোষাকের ঘটা আছে, দেখলেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব আসে।

মিস্ট্রেসদের আলোচনার ফলে তেজেশবাবুর যাতায়াতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হল না। নিত্য অপরাহ্ন বেলায় তাঁর চুরুটের গন্ধে সুলতাদের হোস্টেলে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আজকাল আর সুলতা একা নয়, মিসট্রেসরা সকলেই ভিড় করে আসে তেজেশবাবুকে স্বাগতম্ জানাতে। নূতন কলোনির ঝাউবনের শন্‌শন্ শব্দের মত তেজেশবাবুর প্রাত্যহিক অভিযানও সকলের সহ্য হয়ে গেল।

শুধু মলিনাই বিদ্রোহ করে বসল।

—ও সুলতাদি, তোমার বুড়ো যে জ্বালিয়ে মারলে! বিকেলে হোস্টেলে থাকা আমার পোষাবে না ভাই, থাক তোমরা বুড়োকে নিয়ে!

রাগ করে বেরিয়ে গেল মলিনা।

বাইরের ঘরে আরামকেদারায় শুয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছেন তেজেশবাবু। সুলতারা চার পাঁচজন একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। অভ্যর্থনার স্মিত হাসি তাদের মুখে আজ আর নেই; খাড়া হয়ে বসলেন তেজেশবাবু।

কথা পাড়ল সুলতা।—আপনার এখানে আসা অনেকেই পছন্দ করছে না তেজেশবাবু।

নির্বিকারভাবে তেজেশবাবু বলেন,—কেন

আমি কি বাঘ না ভালুক! মানুষের কাছে মানুষই আসে।

পুরাতন মিস্ট্রেস সবিতা বলল,—মাপ করবেন তেজেশবাবু, আমরা শুধু মানুষ নই; মেয়েমানুষ! দুর্নাম আপনারও হয়, আমাদেরও।

জোরে হেসে উঠলেন তেজেশবাবু—যে বয়সে দুর্নাম হয় মানুষের সে বয়স আমাদের পার হয়ে গেছে সবিতাদেবী! তবে—

বাধা দিয়ে সবিতা বলল,—আপনার কথা ছেড়ে দিন তেজেশবাবু; আপনি টাকার মানুষ, তার উপর রিটায়ার্ড ডেপুটি। আমাদের মধ্য-বিত্ত সমাজে আপনার সাতখুন মাপ! কিন্তু এই গরীব বেচারাদের মুক্তি দিন আপনি।

আচ্ছা—বলে তেজেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ছড়িটা নিয়ে শান্তমুখে প্রস্থান করলেন।

সবিতা বলল,—এতগুলি জলজ্যান্ত মেয়ে দেখে বুড়োর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ষাটের কাছাকাছি বয়স, মাস তিনেক হল স্ত্রী মারা গেছে,—বুড়ো আসে পোষাকের বাহার দেখিয়ে প্রেম জমাতে!

সুলতা বলল,—কিন্তু মলিনারও সব বাড়াবাড়ি! যাই বল তোমরা, তেজেশবাবু লোক অতি ভদ্র।

ক্ষুন্নস্বরে সবিতা বলল,—তুমি হেড্ মিসট্রেস হলেও এসব ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কম সুলতা! তোমাদের স্কুলে আমার চাকুরী হল প্রায় ত্রিশ বছর। কমিটির অনেক মেম্বার দেখেছি আমি। বেশীর ভাগ লোকই, গার্লস স্কুলের কমিটি-মেম্বার হয় মিস্ট্রেসদের সঙ্গে ভাব করবার আশায়! এই তেজেশবাবুর কথাই—

সকলে সমস্বরে বাধা দিল,—আজ এই পর্যন্ত থাক সবিতাদি! যে নাটকের যবনিকা পড়ে গেছে, তাকে উলটিয়ে আর লাভ নেই!

সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্নের অলসতায় লাল বাড়ির চাঞ্চল্যও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নূতন কলোনির মাঠে মাঠে রোদের ঝিলি-মিলি, চারিদিকের আবহাওয়া গম্ভীরতার ভারে থমথম করছে।

হোস্টেলে ঘুমুচ্ছে সবাই, একা সুলতা ছাড়া। সুলতার বিছানার উপর ছড়ান একগাদা চিঠি—তার পাঠ্য-জীবনের প্রেমিক-দের অর্ঘ্যনিবেদন। প্রতি রবিবার সকালে স্বভাবত শান্ত সুলতা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সপ্তাহে এই দিনটি যেন তার কামনার ধন: কর্মহীন মধ্যাহ্নে আবদ্ধ কক্ষে লিপিকার পুরাতন রোমান্স সুলতার শিরায় শিরায় জাগিয়ে তোলে বিগত-যৌবনের ইতিহাস।

চিঠির তাড়া তিনভাগ করল সুলতা। প্রথম ভাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ম্যাট্রিক পাশ করে তারা দুজনেই ভর্তি হল এক কলেজে,—সে আর নীরেন। নীরেনের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করল সুলতা। গ্রামের স্কুল থেকে এসেছে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়ে। শহরের আবহাওয়া, অধ্যাপকবৃন্দের স্তাবকতা ও সমপাঠীদের সপ্রশংস-দৃষ্টি তাকে দিশাহারা করে দিল। তিন মাসের মধ্যে তার কদমছাঁট চুল লুটিয়ে পড়ল অক্সফোর্ড প্যাটার্ণে, ছ মাসের মধ্যে লজ্জাভীরু গ্রাম্যবালকের প্রথম প্রেমের চিঠি সুলতার হস্তগত হল। ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ করে নীরেন চলে গেল ডাক্তারি পড়তে, অদর্শনে অনুরাগে পড়ে গেলো ভাঁটা।

লিপিকার দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু বি এ ক্লাসে। কলেজে সুলতার নামডাক খুব, তাকে কেন্দ্র করে গোপন আলোচনা চলে অধ্যাপক মহলে, রস-পিয়াসী ছাত্রের দল তার চারিদিকে গুঞ্জন করে ঘোরে। এমনি সময় কলেজে ভর্তি হল সুশীল রায়। তার দামী মোটরকার, পরিপাটি পোষাক আর সুমার্জিত কথাবার্তা সুলতার মূর্চ্ছিত প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলল। নীরেনের প্রেমপত্রে সঙ্কোচের বাঁধন ছিল বড় বেশি, সুশীল রায়ের লিপিকা লেখা ছিল নূতন সাজে। পাতার ভাঁজে কামনার আবেশ উপচিয়ে পড়ছে। সুশীল যেন ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছে সুলতার মুখে এক মধুযামিনীর অন্তরালে। সুলতার প্রেমের এ অঙ্কও শেষ হল যেদিন সে শুনতে পেল, সুশীল রায়ের বিয়ে।

চিঠির শেষ ভাগের দিকে চোখ পড়তেই হু হু করে চোখ ছাপিয়ে জল এল সুলতার। এ এক অযাচিত প্রেমপত্র—ইংরাজীর ছাত্রী সুলতাকে লিখেছে ইতিহাসের ছাত্র সুবিনয়। সুলতা সেদিন সুবিনয়কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেন, তা সে নিজেও ভাল বুঝতে পারেনি।

পাঁচ বছর পরে সুবিনয়ের একখানি চিঠি আজ পড়তে আরম্ভ করল সুলতা।—"আপনাকে আমি সানুরাগে আহ্বান করছি আমার স্ত্রীর আসন গ্রহণ করতে।" আর কোন প্রেমপত্রের মারফৎ এ আহ্বান তার কাছে আসেনি। তবু সুলতার ভাল লাগে নীরেন ও সুশীলের প্রেমলিপি। সুবিনয়ের সঙ্গে বিয়ে হলেও সে অসুখী হত না বোধহয়, রোমান্সের পাথেয় তার সঙ্গেই থাকত!

ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দে সুলতা চমকে বসল। বিকেল হয়ে গেছে কখন, পাতলা মেঘে ছাওয়া আকাশের ছায়া পড়েছে মাটির উপর, সুলতা বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

নূতন কলোনির প্রান্তর ফুঁড়ে পায়েচলা পথ দিকচক্রবালে মিশে গেছে। লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছে সুলতা। বাতাসে মিশান দেবদারু আর ঘোড়ানিমের সুবাস। নেশা বিহ্বল হয়ে উঠল সুলতা। রক্তে তার বেজে উঠল কার অদৃশ্য সত্তার ধ্বনি, তার রিণিরিণি শব্দ তার কাণে সুস্পষ্ট বাজতে লাগল। আজ এই কর্মহীন অপরাহ্নে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সুলতা।

পথচলার আনন্দ নূতন করে অনুভব করল সে। চলার পথে সঙ্গী থাকলে আনন্দ হয়ত নিবিড়তর হয়ে উঠত! মাঠ একেবারে জনহীন নয়, এক জোড়া মূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে। পরিচিত মুখ বলেই মনে হল সুলতার। যুগলমূর্তিকে দেখে বিস্ময়ে সংকুচিত হয়ে গেল সে। মলিনা আর তেজেশবাবু! সুলতাকে কে যেন সজোরে কষাঘাতে ঠাট্টা করে বসল!

নূতন কলোনিতে আর একটি অতিথির সমাগম হল। সুলতাদের হোস্টেলের সামনে একটা ছোট একতলা বাড়ী খালি পড়েছিল অনেকদিন, কে বা কারা এসে সেই বাড়িতে আস্তা গাড়ল। খবর আনল সুলতাদের ঝি দাসীর মা।

—কলেজের পেফেছার! দুজন এয়েছে মেয়েনোক আছে সাথে।

সুলতা বলল,—বাবুদের নাম কি দাসীর মা?

—সুবিনয় আর যতীন।

সুলতার বুকের মধ্যে সহসা একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সুবিনয়ের সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়া কোনদিন কল্পনা করে নি সে। প্রত্যক্ষদর্শনের চেয়ে স্মৃতির মূল্য অনেক বেশী তার কাছে। তার নারীজীবনের সবচেয়ে বড় অহংকার সুবিনয়ের প্রেমভিক্ষা ও প্রত্যাখ্যান। নীরেন ও সুশীল তার জীবনের কলঙ্কের বিলাসমাত্র, এখানে সে গর্বিনী প্রার্থিতা। কিন্তু সঙ্গে মেয়েলোক আছে, বোধ হয় যতীনের স্ত্রী অথবা সুবিনয়ের মা! ট্রাঙ্ক খুলে সুলতা তাড়াতাড়ি সুবিনয়ের চিঠির তাড়া বার করল।—"আমাকে আপনি বিবাহ করুন বা নাই করুন, আমার জীবনে আপনি প্রথম ও শেষ।" মৃদু হাসি দেখা দিল সুলতার মুখে; সুবিনয় আবার স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছে!

সেদিনটাও কিসের একটা ছুটি ছিল মলিনার অপরাহ্ন ভ্রমণ রহস্য প্রকাশিত হওয়ার পর সকলেই তাকে নিয়ে ব্যস্ত, সুলতার মোহ চাপা পড়ে গেছে। আজ তার জন্য খুশী হয় সে, তাকে বিরক্ত করতে কারও শুভাগমন হবে না; সে ঘরে খিল এঁটে জানালায় দাঁড়াল।

সুলতার দোতলার ঘর থেকে সামনের বাড়ির ভিতরটা বেশ দেখা যায়। বারান্দায় চেয়ারে বসে গল্প করছে সুবিনয় আর সম্ভবত যতীন। সুবিনয়ের পরিবর্তন হয় নি একটুও

চোখে সেই রকম পুরু কাঁচের চশমা, গায়ে মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী, সেইরকম সর্বংসহা মুখশ্রী। দুজনের উত্তেজিত তর্কের দুএক টুকরা মাঝে মাঝে কানে আসছিল সুলতার —সোশ্যালিজম আর গান্ধীজম্। মনে মনে হাসল সুলতা,—ইতিহাসের ছাত্র সুবিনয় এখনও মনেপ্রাণে সোশ্যালিষ্ট! তর্কের বিষয়-বস্তুর কোনটিতেই বিশ্বাস নেই সুলতার। ইতিহাসের পাতার সঙ্গে তারও পরিচয় আছে। যুগে যুগে ডিক্টেটরদের পায়ের কাছেই লুটিয়ে পড়েছে সারা পৃথিবী, আজিকার দিনে একটি মাত্র নেতাই মূক, পঙ্গু ভারতবর্ষকে বলীয়ান করে তুলতে পারবে।

এতক্ষণে বাড়ীর তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখবার অবসর হল সুলতার। এ মুখও চেনা সুলতার, তারই সহপাঠিনী প্রমীলা! তিনি এসে তার্কিকদের থামিয়ে স্নানের জন্য তাড়া দিলেন। কি একটা দুর্বলতায় অস্থির হয়ে উঠল সুলতা। প্রমীলা কার স্ত্রী? যতীনের? সে জানে সুবিনয় লক্ষ্য করেছে তাকে, কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ কোন ভাষা নেই তার চোখে।

মলিনার ঘর থেকে হাসিঠাট্টার ঢেউ এসে লাগছে সুলতার কানে। এতবড় আকর্ষণও আজ তার কাছে ব্যর্থ হল। নূতন এক রহস্যের ঘূর্ণীপাকে পড়ে গেছে সে। প্রমীলা কার স্ত্রী?

সুবিনয়রা খেতে বসেছে। পরিবেশন করছে প্রমীলা স্বয়ং—তার মুখে মাখান তৃপ্তির আনন্দ। এও একটা মস্ত প্রহেলিকা মনে হল সুলতার কাছে। শেলী বায়রণ এ মেয়েকে তৃপ্ত করতে পারে নি, কীটসের প্রেমের ন্যাকামি এর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সুলতার চোখে পলক আর পড়ে না। এই তুচ্ছ ঘরকন্নার মধ্যে এত আনন্দ এরা খুঁজে পেল কি করে। প্রমীলার কথা ছেড়েই দিল সুলতা। অসামান্য মেয়ে ও কোনদিনই ছিল না, পড়াশুনায় ভাল এই মাত্র। কিন্তু এম এ. ক্লাসের মার্কামারা সোশ্যালিষ্ট ছাত্র সুবিনয় এই সামান্য ব্যাপারে এত মত্ত হয়ে উঠেছে কেন?

সমস্যার সমাধান সুবিনয়ই করে দিল। যতীন বাইরের ঘরে বসে, অন্দরে সুবিনয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে প্রমীলা। সুলতা বেশ বুঝতে পারল, সুবিনয় তার সামনে ইচ্ছে করেই এমন বেহায়াপনা করছে। সারা মুখ ঝাঁঝাঁ করতে লাগল তার, জীবনের একটি মাত্র বাস্তব আজ সমাধিলাভ করল। সুলতা ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশেই মলিনার ঘর। খোলা দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল সুলতা। অভিনববেশে সজ্জিত মলিনাকে ঘিরে মেয়েরা কলরব করছে। মলিনাকে যেন সুলতা আর চিনতে পারে না। সকলে তাকে বধূবেশে সুসজ্জিত করে দিয়েছে, তার চোখেমুখে নবঅনুরাগের চিহ্ন। সদ্য আঘাতপ্রাপ্ত সুলতা বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল। বৃদ্ধ তেজেশবাবুর মধ্যে কী এমন আনন্দের পশরা খুঁজে পেয়েছে মলিনা!

মেয়েরা সমস্বরে তাকে অভ্যর্থনা করল। সবিতা নিজে তাকে হাত ধরে টেনে আনল। সলজ্জ হাস্যে মলিনা বলল,—এস সুলতাদি।

সবিতা বলল,—মলিনার ভ্রমণরহস্য উদ্ঘাটিত করার গৌরব সবটুকু তোমার সুলতা। কিন্তু ধরা পড়ে লাভ হয়েছে চোরের, দারোগার নয়!

আর একটি মেয়ে বলল,—তাই সেদিন তেজেশবাবু একটুও রাগ না করে চলে গেলেন। বোধ হয় মাঠের দিকে, না মলিনাদি?

সুলতা ছাড়া সকলে হেসে উঠল। সুলতার মনে হল এ হাসি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে!

মলিনার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। আজকাল অপরাহ্ন বেলায় তেজেশবাবুর আগমন মিসট্রেসদের কাছে পরম কৌতুকপ্রদ ও প্রীতিকর হয়ে ওঠে। বিয়ের পরই মলিনারা কার্সিয়াং যাবে হানিমুন যাপন করতে।

বিয়ের সমস্ত ভার পড়েছে সুলতার উপর। অনেকটা জিদ করেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সে। সুবিনয়দের বাড়ির দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে সুলতা। দাসীর মার মারফৎ প্রমীলা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, এক কথায় সুলতা বিদায় দিয়েছে তাকে। চিঠির তাড়া কুচি কুচি করে মাঠের হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে এসেছে।

প্রমীলাই একদিন দেখা করতে এল। সুলতা ভাল করে চাইতে পারল না তার দিকে। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে প্রমীলাকে, এই মেয়েরই কলেজে পড়বার সময় ছিল কৃশ অ্যানিমিক চেহারা!

কথা আরম্ভ করল প্রমীলা।—পুরাণো আলাপ ভুলে গেলে সুলতা! আমরা দুজনেই ত তোমার চেনা!

সুলতা কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার মনে হল একটা চাপা রুদ্ধতায় তার কণ্ঠনালী আচ্ছন্ন রয়েছে। অনেক চেষ্টা করে সে বলল,—সুবিনয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কবে?

—সে এক মস্ত ইতিহাস! এম এ পরীক্ষার পর বসে আছি বাড়িতে, একদিন এল লম্বা এক চিঠি ওর কাছ থেকে। ঠিক প্রেমপত্র বলা চলে না; ভালবাসার একটি কথাও তাতে ছিল না। শুধু লেখা ছিল বিবাহের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, আর উপসংহারে ছোট একটি অনুরোধ—

প্রমীলা আর বলতে পারল না, গড়িয়ে পড়ল।

একটু পরেই প্রমীলা বিদায় নিল, এক-তরফা আলাপ আর কতক্ষণ চলে! সুলতা হিসাবের খাতা নিয়ে ঢুকল মলিনার ঘরে। সেইমাত্র মলিনা স্নান করে এসেছে, এলোচুলের ভার লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর, মিস্ট্রেস-সুলভ রুক্ষতা দূর হয়ে মুখের উপর ফুটে উঠেছে একটা নম্র কমনীয়তা।

সুলতার বিস্ময় আর ধরে না। কোন্ গৌরবে এরা রাতারাতি গরবিনী হয়ে উঠল! উগ্র সোশ্যালিজমপন্থী এক অর্ধোন্মত্ত পুরুষ আর এক বার্ধক্যজীর্ণ রিটায়ার্ড মানুষ! জীবনের পূর্ণতার পাত্র তবু কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে এদের, এদের কাছে আজ সে কৃপার পাত্র! সে সুলতা সিংহ, তার জন্য একদিন কলেজ ও ইউনিভার্সিটি চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছিল, কত সাহিত্য রচনা হয়েছে তরুণের স্বপ্নে তাকে উপলক্ষ্য করে, আজ সে পরাজয়ের কালিমা সাগ্রহে বরণ করে নেবে! মলিনার ড্রেসিং আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শিউরে উঠল সুলতা। এক বিগতযৌবনা নারীর ছায়া পড়েছে আরশীর গায়ে! উদ্গত অশ্রু গোপন করে সুলতা এক রকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * * *

দুদিন পরে বৈকালবেলা তেজেশবাবু একখানি চিঠি পড়ছেন। মেয়েলি হাতে লেখা চিঠি, —"মলিনার চেয়ে বাঁচার প্রয়োজন আমার অনেক বেশী। আমি কি আপনার স্ত্রী হওয়ার অযোগ্য? রূপে গুণে রিটায়ার্ড ডেপুটির গৃহকর্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা মলিনার চেয়ে আমার বেশী নয় কি?......মেল ট্রেন ছাড়ে রাত আটটায়, আপনার পথ চেয়ে অপেক্ষা করব স্টেশনে।" নীচে লেখা,—সুলতা সিংহ, হেড মিস্ট্রেস, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল।

চিঠি পড়ে লাফিয়ে উঠলেন তেজেশবাবু। সগর্বে তাকালেন একবার আয়নার দিকে; তাঁর ছাপ্পান্ন বছরের দেহকান্তিও অগ্রাহ্যনীয় নয়। মেয়েদের ঠুনকো মন আকৃষ্ট করবার পক্ষে যথেষ্ট। যাক্, এতদিন পরে সধবা দেবীকে চ্যালেঞ্জ করবার মত প্রমাণ একটা পাওয়া গেল বটে! ঘড়ির দিকে তাকালেন তেজেশবাবু, সাতটা বেজে গেছে। চিঠি নিয়ে তিনি ছুটলেন সুলতাদের হোস্টেলে।

কল্যাণপুর স্টেশন। সুদৃশ্য বেশে সজ্জিত এক নারী প্ল্যাটফরমে সাগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। তার দুচোখে অসীম ভরসা,—সে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে!

আটটা প্রায় বাজে। দূরে ঝড়ের মত একটা শব্দ, মেল ট্রেন আসছে।

শিশুর গৃহশিক্ষা

শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী পি এইচ ডি (লণ্ডন)

ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের চরিত্র ও মানসিক শক্তিসমূহকে বিকাশ করুক—ইহা সকল বাপ-মা-ই চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিশুদের মনস্তত্ত্ব না জানা থাকায় প্রায়ই তাঁহাদের আশা নিষ্ফল হয়। শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে শিশুর মনটিকে—শিশু কি চায়, উহার প্রবৃত্তি কোন্ দিকে, উহার মানসিক উন্নতি কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।

বর্তমানে যে ভাবে বঙ্গদেশে শিশুশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। অভিভাবকদের ধারণা যে প্রহার বা ধমক না দিলে ছেলেপিলেরা বেয়াড়া হইয়া যাইবে। শিক্ষকগণ মনে করেন যে, বেত্র-শাসন ভিন্ন পাঠাভ্যাস করান বা ক্লাসের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এই রকম মনোবৃত্তি থাকার ফলে আমাদের দেশের গৃহে ও বিদ্যালয়ে একটা দমননীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শিশুদের সহানুভূতি দ্বারা না বুঝাইয়া আমরা তাহাদের পীড়ন করিয়া থাকি। আমরা মনে করি অভিভাবকেরা যত বেশি কঠোর হইতে পারেন, শিশুরা তত বেশি পাঠে মনোযোগ দিবে এবং সুসভ্য হইবে। কিন্তু ঐরূপ নীতি অনুসরণ করা যে কত ভুল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, যে-সব ছেলে-মেয়ে শৈশবে কঠোর শাসনে ছিল তাহারা পরবর্তী কালে মানসিক-বিকারের লক্ষণ প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছিল। ভীতিপ্রদ পারিবারিক শাসন-পদ্ধতি শিশুমনকে কিছুক্ষণের জন্য দমাইয়া রাখে বটে, কিন্তু তাহার ফলে শিশুমন ভাঙিয়া পড়ে এবং পরে বেপরোয়া হইয়া উঠে। অনেক বাঙালী মা-বাপ প্রায়ই, অভিযোগ করেন, তাহাদের ছেলেরা বড় হইয়া আর তাহাদের কথা শোনে না। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে, কারণ, শিশু সহানুভূতির বদলে পাইয়াছে প্রহার, কাজেই বড় হইয়া সে হইয়া উঠে বিদ্রোহী। স্বাধীনতার স্থলে উচ্ছৃঙ্খলতাই অনেক সময় তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের একটি বড় সত্য এই যে, মানুষ কিছুই ভোলে না। মনের গভীর প্রদেশে আমাদের সমস্ত স্মৃতি লুক্কায়িত থাকে। যে শিশু বিশেষ তাড়না গঞ্জনা লাভ করিয়াছে, সে তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা মোটেই ভোলে না এবং তাড়না-কারীর সম্বন্ধে একটা অজানা (unconcious) ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে থাকে। এই কারণেই বহু ছেলেমেয়ে ক্রমশ তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে মনে মনে দূরে সরিতে থাকে। এই জন্য শিশু-পরিচালনার একটি মূল সূত্র এই হওয়া উচিত যে, কঠোর শাসন বা দমন কমাইয়া দিতে হইবে।

মা-বাপের শিক্ষার উপর ছেলেদের চরিত্র গঠন নির্ভর করে। শিশুর প্রথম পরিচয় মা'র সঙ্গে। সুতরাং মা-ছেলের সম্বন্ধ যাহাতে সুমধুর হয় তাহার প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মাকে জানিতে হইবে শিশুর মন, শিশুর প্রবৃত্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙালী মহিলারা শিশুমনস্তত্ত্ব মোটেই পড়েন না। তাঁহারা অত্যধিক আদর দিয়া বা প্রহার করিয়া শিশুমন বিকৃত করিয়া ফেলেন। ফলত বাঙালা পরিবারে ছেলেতে মা'তে একটা কলহ লাগিয়াই আছে। অনেকে বলেন, কুসন্তান হইলেও কুমাতা হয় না। ইহা একেবারে ভুল। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে পরবর্তীকালে চোর হইবে না সুশিক্ষিত হইবে তাহা কি তাহার শিক্ষার উপর নির্ভর করে না? মাতার সুশিক্ষার অভাবে বহু সন্তানই প্রকৃত শিক্ষা পায় না। নবজাত সন্তান মাটির মত, তাহাকে যে ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিবে সে সেভাবেই গড়িয়া উঠিবে। সন্তানকে জন্মদান বা খাওয়ান-দাওয়ান—ইহাই শুধু মায়ের কর্তব্য নহে। শিশু বড় হইয়া যাহাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, আত্মবিকাশ করিতে পারে এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে—ইহাই মা-বাপের প্রধান কর্তব্য।

জন্মের কিছুকাল পর হইতেই শিশুর পরিচালনা বিশেষ যত্নের সহিত করা উচিত। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর বড় মূল্যবান। এই সময়ে শিশুদের বিভিন্ন ভাল অভ্যাস শিখান উচিত। যে মনোবৃত্তি শিশু এই সময়ে পিতা-মাতার সাহায্যে গঠন করিবে তাহাই উহার পর-বর্তীজীবনের চরিত্রের কাণ্ড-স্বরূপ হইবে।

নির্দিষ্ট সময়ে মল-মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মনোবৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, যে সব শিশু উক্ত ব্যাপারে উত্তম শিক্ষা পায় নাই তাহারা ভবিষ্যতে অবাঞ্ছনীয় ব্যতিক্রমগ্রস্ত হইতে পারে।

ঘুমের নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন। ঠিক সময়ে শিশুকে বিছানায় শোয়ান উচিৎ। অধিক রাত্রি কোনক্রমেই শিশুকে জাগাইয়া রাখা উচিত নহে। অনেক বাড়িতে দেখা যায় রাত্রি ১১।১২টা পর্যন্ত শিশুরা হুটোপাটি দাপাদাপি করিতেছে। ইহা খারাপ অভ্যাস। উত্তেজিত হইয়া গভীর রাত্রে শুইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার ফলে বিছানায় মূত্রত্যাগ হইতে পারে। ঘুমের ঘোরে বিছানা-ভিজান অনেক ছেলেপিলের অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ অনেক প্রকার। ভয়, উত্তেজনা, হিংসা, বিরুদ্ধতা জ্ঞাপন, অসন্তোষ—এ সবের জন্য উক্ত অভ্যাস জন্মে। উহার মন হইতে ভয়, বিদ্বেষ ইত্যাদি দূর করিতে হইবে।

খাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় বাঙালী পরিবারে নাই। ইহার কুফল আমরা জানি। শিশুর পক্ষে উহা বড় অহিত সাধন করে। মা'য়েরা যদি একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া নেন, তবে শিশুর ক্ষুধা ও অভ্যাসসমূহ একটি সুশৃঙ্খল ছাঁচে পড়িতে পারে। অনেক পরিবারে বড়রা যাহা খায়, শিশুরাও তাহাই খায়। ইহাও খারাপ। শিশুদের পরিপাক শক্তি বিবেচনা করিয়া তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক এই যে, বাঙালী ছেলেদের পেটুক তৈয়ার করা হয়। একটি শিশু এই মা'র সঙ্গে খাইল, পরে কাকার সঙ্গে আর একবার খাইতে বসিল, তারপর ঠাকুমার সঙ্গে। আত্মীয়স্বজনরা আদর করিয়া এই অভ্যাসটি করেন, তাহার ফল হয় বিষময়। খাদ্যলোভী ছেলের মানসিক শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। শৈশবে নানাবিধ বিষয়ে শিশুর আকর্ষণ থাকা উচিত। কিন্তু খাদ্যমাত্রতুষ্ট শিশুর পক্ষে আর কিছুর চর্চা করা সম্ভব হয় না। অনেক মূর্খ মাতাপিতা ছেলে কাঁদিলেই খাদ্যদ্রব্য দেন তাহাকে শান্ত করার জন্য। পরে ছেলে খাইবার জন্যই কাঁদিতে থাকে। এইজন্যই আমাদের ছেলেরা এত কাঁদুনে হয়।

স্বাবলম্বন শিশুকাল হইতেই শিখান উচিত। কিন্তু সেটি আমাদের দেশে হইবার জো নাই। একান্নবর্তী পরিবার থাকায় প্রত্যেক শিশুই ঠাকুমা, দিদিমা, কাকীমা প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শিশুর পক্ষে ইহা লোভনীয় পরন্তু অত্যধিক আদরের ফলে তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। ছেলেটি হয়ত তাহার পুতুলগুলি নিয়া খেলিতেছে, দিদিমা হঠাৎ তাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। কোলে-করা অভ্যাস শিশুর শারীরিক উন্নতির পক্ষে ভাল নয়। শিশুর পক্ষে প্রয়োজন ছুটোছুটি, হাঁটা ও শরীর যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া। আদর করিতে ইচ্ছা হয় ত বেশ এক মিনিট কোলে তুলিয়া নামাইয়া রাখিলেই হয়। কিন্তু কোলে চড়া মাত্র ছাড়ালেই শিশুরা আর হাঁটিতে বা দৌড়াইতে চাহিবে না। এই প্রকার ছেলেরা আয়াসপ্রিয় এবং মানসিক শক্তি চালনায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যাহাতে এই কু অভ্যাস সৃষ্ট না হয়। অনেকে ছেলেপিলেদের জন্য অনেক বাড়াবাড়ি করেন, যেমন উঠিতে বসিতে তত্ত্বাবধান করা। শিশুর স্নান করা, খাওয়া—এ সমস্ত নিজেরই আস্তে আস্তে শেখা উচিত। আমরা শুধু নেহাৎ প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিতে পারি মাত্র। কিন্তু শিশুদের কোন ক্রমেই অভিভাবকদের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা উচিত নয়। "আদুরে দুলাল" ছেলেরা চিরকাল আঁচল-বাঁধাই থাকিয়া যায়। বড় হইয়া বড় চাকুরী করিয়াও উহারা মানসিক ব্যাপারে দুগ্ধপোষ্য শিশুই থাকিয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তি আমাদের দেশে অনেক আছে। কোন কিছু বিপদ হইলে বা আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইলে এসব লোকেরা মুষড়িয়া পড়ে। "ঘরমুখো" বাঙালীর স্বভাব গৃহের অত্যধিক আদর বশত হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের প্রথম কতিপয় বৎসর যে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা হয় তাহাই চরিত্রের মূল ভিত্তি হয়। শৈশবে আরামপ্রিয়তা অভ্যাস হওয়াতে বাঙালীরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে ঢুকিতে চাহে না, কলকারখানায় শ্রমসাধ্য কাজ করিতে চাহে না।

পরের উপর নির্ভর করা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, অভিভাবকদের দোষেই ঐরূপ হয়। বাঙালী ছেলেদের বহু কর্তার অধীনে থাকিতে হয়। বাবা, জেঠা, কাকা ইত্যাদি সবার মনই ছেলেকে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহাদের

না বলিয়া ছেলে কিছুই করিতে পারিবে না। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "তুমি পড়াশুনা শেষ করিয়া কি করিতে চাও?" উত্তর হইয়াছে "বাবা জানেন", "মামাবাবুর ইচ্ছা..." ইত্যাদি। প্রত্যেক ছেলেরই একটি দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকা উচিত এবং তাহার লক্ষ্য স্থির শৈশবে হওয়া উচিত। অভিভাবকদের উচিত শিশুকে এই ব্যাপারে সাহায্য করা। কিন্তু শিশু অভিভাবকের পছন্দ করা ব্যবসায় গ্রহণ করিবে—এমন হইতে পারে না। ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied Psychollogy) দ্বারা কোন্ শিশুর কোন্ দিকে প্রতিভা আছে তাহা ধরা যায়। তীক্ষ্নদৃষ্টি মা-বাপও তাহা ধরিতে পারেন। আমাদের কর্তব্য শিশুকে তাহার ইচ্ছা ও প্রতিভানুযায়ী কাজ গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া। তারপর সে নিজকে নিজে অভিব্যক্ত করিবে।

শিশুর সম্মুখে মিথ্যা আদর্শ রাখিতে নাই। শৈশবে উচ্চভাব সমূহ শিশুর মনে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু সাধারণত শিশুরা শুনিতে পায় গভর্নমেণ্টের ভাল চাকুরী (আই-সি-এস, বি-সি-এস্) লাভ করাই জীবনের একমাত্র কাম্য। চাকুরীয়া মনোবৃত্তি শৈশবে গঠন করা অন্যায়। কারণ, কেহ বড় হইয়া উক্ত পদ লাভে সক্ষম না হইলে, তখন তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশাত্মবোধ শৈশবেই অঙ্কুরিত হওয়া দরকার এবং সর্বদা একটি উচ্চ জীবনাদর্শ শিশুর কাছে রাখা দরকার। জাতীয় উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুদের শাস্তি দেওয়া খুব কঠিন কাজ। অনেকগুলি বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমত অপরাধের স্বরূপ অনুধাবন করা উচিত। কতকগুলি অপরাধ শিশুরা জানিয়া শুনিয়া করে না। অজ্ঞতাবশত একটা কিছু বিপদ সৃষ্টি করিয়া বসিতে পারে। যেমন, দিয়াশলাই নিয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ আগুন ধরিয়া গেল। অথবা একটা গ্লাস হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এ সমস্ত ব্যাপার শিশুর ইচ্ছাকৃত নহে। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত।

দ্বিতীয়ত কতকগুলি অপরাধ লঘু। যেমন, ঘুমাইতে না যাওয়া, বই না পড়া, গণ্ডগোল করা, ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে লাগা—এসব ব্যাপারে শাস্তিবিধান খুব কঠোর প্রকৃতির হওয়া উচিত নহে। মিষ্টমুখে কথা বলিয়া বা শিশুর মনটিকে অন্যদিকে চালিত করিয়া তাহাকে বিরত করা যায়। দুষ্টুমি প্রায়ই নিষ্ক্রিয়তার জন্য হয়। কিছু করার নাই, তাই ছেলে একটা মজাদার ব্যাপার করার চেষ্টা করে বা পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। ঐ সময়ে বলা উচিত "এস, গ্রামোফোনটা চালানো যাক" বা "চল, একটা কাগজের নৌকা তৈরী করা যাক" অথবা "বেড়াতে যাওয়া যাক"। যাহাতে ছেলেকে একটি চিত্তাকর্ষক কার্যে লিপ্ত রাখা যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমাদের অভিভাবকরা বিকট স্বরে হয়ত বলিয়া উঠিলেন "চীৎকার থামাও, নয়ত মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব"। তারপর দু এক মিনিট পরেই ছেলের উপর উত্তম-মধ্যম পড়িতে থাকে। অথচ মনোবিজ্ঞান একটু জানা থাকিলে অতি সহজেই এসব দুষ্টুমি শান্ত করা যায়।

তৃতীয়ত ইচ্ছাকৃত ক্ষতিকর এক প্রকার অপরাধ আছে। যেমন চুরি, পরকে মার দেওয়া, ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ। স্কুল বা গৃহ হইতে পলায়ন। এসব ক্ষেত্রেও প্রহার করা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে অপরাধের মাত্রা বাড়িবে মাত্র। প্রথমে দেখা উচিত ছেলের মানসিক অবস্থা। কেন সে চুরি করিল? তাহার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করা উচিত। তাহাকে সহানুভূতি দেখাইয়া নূতন পথে আনয়ন করা কর্তব্য। যদি শিশু ও মা-বাপের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন থাকে, তবে সে শিশু কখনও খারাপ হইতে পারে না।

কিন্তু অনেক সময় একটু আধটু শাস্তির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু এমনভাবে শাস্তি দিতে হইবে যেন শিশু অনুতপ্ত হয়। অনুতপ্ত না হইয়া যদি সে রুষ্ট হয় তবে বুঝিতে হইবে শাস্তি ব্যর্থ হইয়াছে। শারীরিক লাঞ্ছনা যথাসাধ্য রহিত করা প্রয়োজন, কারণ তাহাতে শিশু ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। কত ছেলেপিলে তীব্র প্রহার খাওয়ার সময় মনে মনে বলে "আচ্ছা এখন মেরে নাও, বড় হয়ে আমি দেখাব।" পশুত্ব শিশুর মনেও পশুত্বের উদ্রেক করে। বাঙালী মা-বাপরা শিশু তাড়না অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন, অনেক মা পরের উপর রাগ করিয়া নিজের ছেলেকে বিনা অপরাধে প্রহার করেন। নিরপরাধ শিশু যদি লাঞ্ছিত হয়, তবে সে তাহার মা-বাপকে কখনও শ্রদ্ধা করিবে না। আর মা কিংবা বাপ যখন নিজেরাই চটিয়া থাকেন তখন তাহারা বিচারমূঢ় হন। এই সময় কিছুতেই প্রহার করা উচিত নয়, কারণ, ক্রুদ্ধ বাপ-মা'র শাস্তি দিবার অধিকার নাই। শাস্তি-দানে শুধু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই অধিকার।

শারীরিক গঞ্জনার পরিবর্তে নিম্নলিখিত দুই একটি বিধি অনুসরণ করিলে ফল ভাল হইবে। কথা না বলা খুব ফলদায়ক হয়। "তোমার সঙ্গে আমরা কেউ কথা বলব না" এ নীতি ব্যর্থ হয় না, কেননা, ছেলের পক্ষে একা থাকা অসম্ভব। অতি শীঘ্র সে অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং অপরাধ হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, সমস্ত পরিবারের লোকেরা যেন একসঙ্গে কাজ করেন। মা হয়ত ছেলেকে শাস্তি দিলেন এমন সময় পিসীমা আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া নিলেন এবং মাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফল বিপরীত হইবে। খাইতে না দেওয়া আর একটি ভাল অস্ত্র। তবে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। শাস্তিদানের সময় বুঝাইয়া দিতে হয় যে শিশুর ক্ষমতা আছে, গুণ আছে এবং ইচ্ছা করিলেই তাহার দোষত্রুটি সে সারিয়া ফেলিতে পারে।

বর্তমানে একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ যাহা এদেশে প্রবর্তন করা দরকার তাহা হইতেছে শিশুর যৌনশিক্ষা। অনেকে হয়ত জিনিসটা পছন্দ করিবেন না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিবেন বিষয়টা কত প্রয়োজনীয়। শিশুর যৌন ঔৎসুক্য প্রচুর আছে এবং তাহার পরিপূরণ দরকার। কোন্ শিশু মা'কে জিজ্ঞাসা করে না, "মা, আমি কি করে জন্মেছি?" সকলেই মিথ্যা উত্তর পাইয়া থাকে। কিন্তু শিশুরা বুঝিতে পারে উত্তরটি মিথ্যা এবং সে তখন অন্য লোককে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং হয়ত কেহ উহাকে সুযোগ পাইয়া বিপথগামী করিতে পারে। মা মিথ্যা উত্তর দেওয়ায় সে তাহার উপরও বীতশ্রদ্ধ হয়। শিশুকে প্রতারণা না করিয়া সত্য কথা বলা উচিত। কিন্তু শিশুর মনের উন্নতি ও তাহার বয়স লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে জ্ঞানদান করা উচিত। মা-বাবাই সর্বাপেক্ষা এ কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, কারণ তাঁহারাই শিশুর নিকটতম বন্ধু।

যৌন শিক্ষার উপর মানুষের মনের উৎকর্ষ অনেক নির্ভর করে। যে সব ব্যক্তির যৌন-জীবন অস্বাস্থ্যকর, তাহাদের সুখী হওয়া বা উন্নতি করা কঠিন। তাহাদের নানাপ্রকার মানসিক রোগ হইতে পারে। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করিবে শিশু তাহার যৌন মনোবৃত্তি যথাযথ

গঠন করিতে পারিল কিনা তাহার উপর। এই ব্যাপারে আমরা যদি সাহায্য না করি তবে বড় অন্যায় হইবে। যদি আমরা স্কুল কলেজ করিয়া নানা বিষয়ে ছেলেদের শিখাইতে পারি, তবে এ অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটি কেন যে শিক্ষায়তন হইতে বাদ পড়িবে তাহার কারণ বুঝা কঠিন।

শিশুর মনের উৎকর্ষের জন্য তাহার নানাবিধ চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে লিপ্ত থাকা উচিত। প্রত্যেক গৃহেই শিশুর একটি নার্সারী ঘর থাকা উচিত, সেখানে শিশুর খেলাধুলার জন্য নানাবিধ বস্তু থাকিবে-এবং তারই সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে। শিশুর জন্য কিছু খেলনা (খুব বেশী নহে), কিছু যন্ত্রপাতি (কাঠের কাজ করার জন্য) ড্রইং বই, রং-বাক্স এ সমস্ত থাকা দরকার। ছেলেদের ভিতর যে সৃজনীশক্তি থাকে তাহার স্ফূরণ হওয়া চাই। বাগান করা আর একটি উৎকৃষ্ট কাজ। নূতন গাছ গজাইতেছে, ফুল ফুটিতেছে—এসবে শিশুদের বড় উল্লাস হয়। মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা—এসব স্থানে শিশুদের নিয়মিতভাবে লইয়া যাওয়া উচিত। উহারা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করুক এবং বোধশক্তি জাগ্রত করুক—ইহা অভিভাবকদের দেখা দরকার। দুর্ভাগ্যবশত বাঙালী মা-বাপরা শিশুদের কালেভদ্রে মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখান বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে শিক্ষার অংগ হিসাবে কেহই উহা করেন না। অথচ উহাতে শিশুর জ্ঞান অনেক বাড়ে, বহির্জগতের সংগে সম্বন্ধ-স্থাপনও হয় এবং নানাবিধ ব্যাপারে ঔৎসুক্যও জাগ্রত হয়। পরে স্কুলে কলেজে সে নিজেই পড়াশুনা করিবে—কাহাকেও "পড়িতে বস্, পড়িতে বস্" এরূপ আদেশ দিতে হইবে না। যে সব ছেলেদের যন্ত্রপাতির কাজ ভাল লাগে তাহাদেরও সে সুবিধা দেওয়া উচিত। ছোট যন্ত্রের বাক্স একটি, কাঠের টুকরা, টিনের টুকরা, চাকতি এসব দিয়া উহারা নিজেরাই অনেক জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে। একটা কাজ নিয়া যদি ছেলেরা ব্যস্ত থাকে, তবে "দুষ্টুমি" অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থা খুব কম বাঙালী গৃহেই আছে। অনেকে ছেলেমেয়েকে সোনার হার বালা দেন যাহা উহাদের কাছে মূল্যহীন, কিন্তু যে সামগ্রী শিশুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাহা দেন না।

শিশুদের একা থাকিতে ভাল লাগে না। উহারা সংগ খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে ভাল শিশু-মিলনায়তন নাই। শিশুদের ক্লাব থাকা উচিত। এখানে উহারা গান বাজনা, লেখাপড়া এসব করিতে পারে। মাঝে মাঝে সকলে মিলিয়া ভ্রমণে যাইতে পারে। এইরূপ সংঘ জীবনের ফলে সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের বয়স্কদের মধ্যে সহযোগিতা মোটেই নাই। একটি কাজ করিতে গেলে পাঁচটি দল হইয়া উঠে। সমবায়-পদ্ধতি আমাদের ধাতে সহ্য হয় না। অথচ বর্তমান জগতে সমবায় শক্তির বিশেষ প্রয়োজন নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনে। ইহার অন্তত একটি কারণ এই যে, আমরা শৈশবে সংঘজীবন যাপন করি না। ছেলেরা নিজেদের ভাইবোন মা-বাপ ছাড়া আর কাহারও সংগে মিশিবার সুযোগ পায় না। দেশ বা বৃহত্তর সমাজকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করিতে আমরা শিখি না। প্রত্যেকেই নিজের গোষ্ঠির আয়তনে নিবদ্ধ থাকে। ফলত পরে গাংগুলীর ছেলে মুখুজ্যের ছেলের সংগে সহযোগিতা করিতে পারে না। যাহাতে শৈশব হইতে আমরা বৃহত্তর সমাজের কথা ভাবিতে পারি এবং নিয়মানুবর্তিতা শিখিতে পারি সেজন্য দেশে শিশু-সংঘ স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। শৈশব হইতে যাহারা একযোগে কাজ করিয়াছে তাহাদের নিয়মানুবর্তিতা মজ্জাগত হইয়া যায়। আজ বাঙলায় এই প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন।

অদ্য যাহারা শিশু, কল্য তাহারা বয়স্ক, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংসারী নাগরিক। বাঙালী ছেলেদের গঠনের উপর বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। গৃহ মস্ত বড় বিশ্ববিদ্যালয়—এইখানে যে শিক্ষা হয় তাহাই জীবনের ভিত্তি। কিন্তু বর্তমানে এই দেশে শিশু শিক্ষা বড়ই অনাদৃত। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। এম-এ, বি-এ পাশ করার অসুবিধা নাই বটে, কিন্তু সুস্থ, সুদৃঢ়, পরিপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ বড় কম বাঙালী মা'রা যদি শিশু মনোবিদ্যা একটু চর্চা করেন তবে ভাল হয়। হিতাকাংখী হইয়াও তাঁহার অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ সন্তানের অনিষ্টই করিয়া বসেন। যদি গৃহশিক্ষা সুচারুরূপে আরম্ভ করা যায়, তবে জাতির ও দেশের চেহারা বদলাইয়া দেওয়া যাইবে। আমরা যদি বাঙালীদের একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত করিতে চাই, তবে শিশুদের-যাহাদের ভিতর অব্যক্ত শক্তি লুক্কায়িত আছে-তাহাদের পূর্ণ মনোবিকাশের প্রচেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে।

ষোলো

চা বাগানে জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছে।

দু হাজার 'একার' প্ল্যান্টেশনের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। শীতের রাত্রে আকাশে ম্লান কুয়াশার অস্পষ্ট ছায়া আবর্তিত হচ্ছে—কিন্তু মেঘ নেই কোনোখানে। দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ-কূটকে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না—শুধু একটা অতিকায় কৃষ্ণতার ওপরে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে খানিকটা ম্লান তাম্রাভ দীপ্তি। ডুয়ার্সের বন অরণ্য জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে অপরূপ হয়ে আছে।

দু হাজার একার প্ল্যান্টেশনের ওপরে জ্যোৎস্না ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কুয়াশায় একটু-খানি ফিকে, একটুখানি বিষণ্ণ। তবুও আকাশ-গলা জ্যোৎস্না, পরম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না—প্রসর রাত্রির বাতায়নে প্রসন্ন আশীর্বাদের মতো পিছলে-পড়া চিরন্তন জ্যোৎস্না। চা-বাগানের বিস্তীর্ণ শ্যামলতার ওপরে তার চন্দলেপ পড়েছে, যেন কালো সাঁওতাল মেয়ের মুখে চন্দনের পত্রলেখা পরিয়ে দিয়েছে কেউ।

এমন রাত্রে বাগানের শোষিত পীড়িত কুলিরাও যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ওঠে। ওই জ্যোৎস্না যেন সাঁওতাল পরগণার পাহাড় আর মহুয়া ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় নেই—মহুয়াও নেই। আছে ফ্যাক্টরী, আছে ম্যানেজার, আছে ক্ষুদে লাটবাবুরা আর আছে অত্যাচার। তবু এমনি রাত্রে মহুয়ার বদলে ওরা সরকারী মদে বন্য যৌবনকে জ্বালিয়ে তোলে, এমনি রাত্রে ওদের মাদলে পাহাড় ভাঙা পাগলা ঝরণার ছন্দ লাগে।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। এ যুগ আলাদা, একালের রূপ স্বতন্ত্র। এদেশ সাঁওতাল পরগণা নয়। সহজ অরণ্য-জীবনের সরল কাব্য জীবনের জটিলতায় প্রত্যক্ষ সংঘাতের রূপ নিয়েছে। শুধু বিচ্ছিন্নভাবে এই চা বাগানেই নয়, সমগ্রব্যাপী বিপ্লব-সমুদ্রের জোয়ার এসে দোলা দিয়েছে ওদেরও ধমনীতে।

চা বাগানের পাশেই ফরেস্ট শুরু। ডুয়ার্সের যোজন ব্যাপ্ত শালবনের একটি প্রান্ত জ্যামিতিক ত্রিভুজের সূক্ষ্মাগ্রের মতো রং-ঝোরা চা-বাগানকে ছুঁয়ে গেছে। চা বাগানের পাশে সেই শালবনের ভেতরে কুলিদের বৈঠক বসেছে।

গভীর রাত—ঘুমন্ত অরণ্য। বাতাস নেই, শালের পাতায় শিরশিরানি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ঘুমিয়েছে হরিয়াল, ঘুঘু, বন-মুরগী। জঙ্গলের মধ্যে সতর্ক পায়ে চলা সম্বর আর চিতি হরিণের চোখেও যেন ঘুম জড়িয়ে এসেছে। শুধু ঝোপের আড়ালে হয়তো পাইথনের হিংস্র চোখ জেগে আছে অসতর্ক দুর্ভাগা শিকারের প্রতীক্ষায়।

আর জঙ্গলের মধ্যে জেগে আছে হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও হিংস্র একদল মানুষ।

শালপাতার ফাঁক দিয়ে হয়তো স্বপ্নের মতো মিষ্টি জ্যোৎস্না ঝিলিক দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তীব্রতর আগুনের আলোয় সে জ্যোৎস্না হারিয়ে গেছে। একরাশ কাঠ-কুটরো জেলে নিশীথ সভার আয়োজন করেছে কুলিরা। লাল আগুন ওদের কালো মুখগুলোকে বিচিত্রভাবে রাঙিয়ে দিয়েছে—যেন যজ্ঞাগ্নির কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে কতগুলো অগ্নিময় পুরুষ—দ্রুপদের হবি-হুতাশন থেকে প্রতিহিংসামূর্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের দল।

ছবির মতো সবাই নীরব হয়ে আছে।

—ঝং—ঝং—

স্তব্ধ বনভূমিকে চকিত করে দূরে কোথায় পাহাড়ীদের 'ঝাঁকড়ী' বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মানুষগুলো, নড়েচড়ে বসল একবার। তারপর কথা বললে হীরালাল

হীরালাল। কুলিদের সর্দার। তিরিশ বছর চাকরী করছে এই বাগানে। পনেরো বছর ভুগেছে ম্যালেরিয়ায়—পাঁচ বছর কালাজ্বরে। আর দীর্ঘ তিরিশ বছর বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে বাড়িয়েছে বিলাতী মালিকের লোভের পুঁজি। তারপর আজ বছরখানেক ধরে বুকের ভেতরে বাসা বেঁধেছে মরণ কীট,—যক্ষ্মা। তিরিশ বছর একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কার। নিঃশব্দে দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর পথে।

কিন্তু মরবার আগে জ্বলে উঠতে চায় একবার। দেখে যেতে চায় নতুন যুগের গোড়া পত্তন। এতদিন শুধু দিয়েই এসেছে—ফিরে পাওয়ার যে লগ্নটা এল তার পদধ্বনি একবার অনুভব করে নিতে চায় নিজের মধ্যে। অন্ধকারের শেষ পৈঠায় পা দিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখে নিতে চায় আকাশে সূর্য উঠছে।

হীরালাল ডাকলে, মংরু, জেমন!

ডাকটা একেবারে বেজে উঠল গমগম করে। কঠিন, গম্ভীর গলা। পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ীর শব্দ ছাপিয়েও যেন তার ডাক বনের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে পড়ল। মাথার ওপরে শালের ডালে ঝট্‌পট্‌ করে পাখা ঝাড়া দিলে একটা ঘুমন্ত পাখী।

বলিষ্ঠদেহ দুজন উঠে দাঁড়ালো। একজন সাঁওতাল, আর একজন ওঁরাও। নতুন আমদানী, চা বাগানের বিষ এখনো ওদের রক্তে ক্রিয়া করেনি। আগুনের আলোয় ওদের চোখে প্রতিহিংসারূপী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রেতচ্ছায়া।

--ঠিক আছে। এখন বৈঠ যাও। বিচার হবে।

নীরবে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নিরুত্তরেই বসে পড়ল।

—তোমরা তীর মেরেছিলে?

—হাঁ।

--কে মারতে বলেছিল?

--পঞ্চায়েত।

আবার স্তব্ধতা। শুধু সামনের আগুনটা পাতা পোড়ানোর একটা বিচিত্র শব্দ করে জ্বলে যেতে লাগল। আর দূরে বাজতে লাগল পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ী—ওরা ভূত তাড়াচ্ছে; রবার্টসদের প্রেতাত্মাগুলোকেই হয়তো।

—কে কে ছিল পঞ্চায়েতে?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন উঠে দাঁড়ালো। দুজন বুড়ো, তিনজন আধবুড়ো। সব চাইতে যে বুড়ো তার নাম দুলীরাম। কয়েক বছর আগে এই দুলীরামের ছেলেকে ইলেকট্রিক ডায়নামোর বেল্ট ভেতরে টেনে নিয়েছিল, রক্তাক্ত টুকরো কয়েক মাংস ছাড়া তার আর কিছু পাওয়া যায়নি। অনেক কায়দা কানুন করে কোম্পানী পুলিশের হাঙ্গামা এড়িয়েছিল আর দুলীরামের ক্ষতিপূরণ মিলেছিল নগদ একশো টাকা। কিন্তু ক্ষতিপূরণে ক্ষত শুকোয়নি।

—এক, দুই, তিন—হীরালাল গুণতে লাগল ঃ মোট সাত। সাতজন বরবাদ।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে একটা চরম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

হীরালাল চারদিকে তাকিয়ে নিলে একবার। শুভ্র ভ্রূরেখাটা আবর্তিত হয়ে গেল বিচিত্র ভঙ্গিতে। বনের মধ্যে এতক্ষণে একটু একটু হাওয়া দিয়েছে, পোড়া পাতাগুলো উড়তে লাগল, আগুনের একটা দীর্ঘ শিখা বেঁকে গিয়ে হীরালালের মুখটাকে যেন আরো বেশি করে রক্তাক্ত করে তুলল। হীরালাল বললে, পঞ্চায়েতের ভুল হয়েছিল। ব্যানার্জি-

বাবু কি কোনোদিন তোমাদের বলেছিল মানুষ খুন করতে?

সবাই নড়ে চড়ে উঠল, কেউ কথা বললে না।

—একটা দুটো মানুষকে খুন করে দাবী মেটে না, ওতে নিজেদেরই খুন ঝরে যায়, নিজেদেরই দুর্বলা করে ফেলে। আমি জ্বর হয়ে পড়ে ছিলাম, সেই ফাঁকে তোমরা এই কাজ করে ফেলেছ। কী লাভ হল এতে?

নির্বাক সভার ওপর একটা তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হীরালাল বললে, কারো লাভ হল না। মাঝখান থেকে পুলিশ এসে হাত বাড়ালো—বাবুরা বিনা দোষে জেলে চলে গেল। তোমার কাজ পেছিয়ে গেল দশ বছর। এর জন্যে দায়ী কে?

দায়ী কে তা সবাই জানে। তাদের উত্তর এত স্পষ্ট যে ভাষা দিয়ে তা বোঝাবার দরকার নেই। নীরবে নিজেদের অপরাধ তারা কবুল করে নিয়েছে।

হীরালাল বললে, এক—দুই—তিন—সাতজন আবার দাঁড়াও।

সাতজন ফের উঠে দাঁড়ালো।

—তোমরা ক্ষতি করেছ কাজের। ক্ষতি করেছ সমস্ত মজুরের, ক্ষতি করেছ দুনিয়ার যত গরীব পরিবারের। এর সাজা তোমাদের নিতে হবে।

অপরাধী সাতজন ছাড়া বাকী মানুষগুলো এককণ্ঠে সাড়া দিলে এইবারে ঃ আলবৎ।

—তা হলে সকলে একমত?

সমস্ত অরণ্য মুখর করে আবার সাড়া উঠল ঃ আলবৎ।

—তোমরা—তোমরা সাতজন শোনো। আজ রাতেই সব হেঁটে সদরে চলে যাও। কবুল করো দোষ—বলো আমরা সাহেবকে খুন করেছি। কী বলো আর সবাই?

—আলবৎ।

—কেউ বেইমানি কোরো না, কেউ পালিয়ো না। হয়তো মরতে হবে, হয়তো ফাঁস হবে তোমাদের। কিন্তু তোমরা মরলে তাতে দুনিয়ার মানুষের আরো বেশী লাভ হবে। এক আধটা দুশমন নয়—সব দুশমনের জান নেবার জন্যে হাতে হাতিয়ার তৈরী হবে তাদের। যাও—আজ রাতেই সব সদরে চলে যাও—

সভায় চাঞ্চল্য দেখা দিল, কিন্তু অপরাধীরা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো নিস্তব্ধ। সামনের আগুনটা এতক্ষণে প্রায় নিবে এসেছে, এতক্ষণে শালের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে ওদের চোখেমুখে। প্রতিহিংসাকঠোর অগ্নি-মূর্তিগুলো ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় অকস্মাৎ যেন বিচিত্র কোমল আর করুণ হয়ে গেছে।

—উঁ—উঁ—

কঠিন সংযম সত্ত্বেও একটা চাপা কান্নার গোঙানি ডোমনের বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, সামনে অফুরন্ত জীবনের আশা—রক্তে রক্তে উদ্বেলিত যৌবন। কদিন আগেই সাঙ্গা হয়েছে তার—প্রথম প্রেম, প্রথম মিলনের নেশা এখনো তার চেতনার ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে। তার ফাঁস হয়ে যাবে! ফুরিয়ে যাবে সমস্ত—মিটে যাবে জীবন?

অসহায় হাহাকারটা চাপা কান্না হয়ে বেরিয়ে এল ঃ উঁ—উঁ—

—চুপ—বাজের মতো গর্জে উঠল হীরালাল ঃ কাঁদে কে—কোন্ শুয়োরের বাচ্ছা? মরতে যে ডর করে, মারতে তার হাত ওঠে কেন? সে পুরুষ না মেয়ে মানুষ?

তিরিশ জোড়া চোখ পলকে ডোমনের ওপরে গিয়ে পড়েছে। তিরিশ জোড়া চোখে শুধুই ঘৃণা—অমানুষিক ঘৃণা—যে ঘৃণা দিয়ে তারা দেখত রবার্টসকে, যাদব-ডাক্তারকে। কোনোখানে এক বিন্দু সহানুভূতি নেই, এতটুকু আশ্বাস নেই!

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলে ডোমন। মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে ডুকরে উঠছে কান্নার উচ্ছ্বাস। ফাঁস হবে তার—সে মরে যাবে! পৃথিবীতে দুঃখ আছে—অপমান আছে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আছে চাঁদ, আছে শাল ফুলের গন্ধ, আছে বাঁশি, আর—

কিন্তু উপায় নেই। এ বিচার। এর নির্ধারণ মৃত্যুর মতো নির্ভুল।

শুকনো পাতা পড়ে. সম্মুখের আগু
আবার জ্বলে উঠেছে দপ দপ করে। কা
মূর্তিগুলোর গায়ে আবার ছড়িয়ে পড়ে
সেই আশ্চর্য আগ্নেয় রক্তাভা। আর হীরাল
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডোম
দিকে—গলা দিয়ে তার একটা শব্দ বেরু
বাঘের মতো যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে!......

......শালবনের মধ্যে রাত ঘনিয়েছে, আ
নিবিড়, আরো নিঃশব্দ। পাতায় পা
চলেছে বাতাসের কানাকানি—কুহেলিগ্র
জ্যোৎস্না জঙ্গলের মধ্যে আঁকছে অপর
পত্রলেখা।

আর আলো আঁধারির বনপথ দিয়ে এগি
চলেছে সাতজন। স্থির, অকম্প
সুনিশ্চিত। ওদের মধ্যে ডোমনকে চে
যাচ্ছে না। তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না তার
কাঁপছে কি না, তার চোখে ছড়িয়ে আছে কি
অপমৃত্যুর আতঙ্ক। অন্ধকার পথ দিয়ে ও
এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে—কে জানে হয়
ফাঁসি কাঠের দিকে।

কিন্তু ওরা জানে ঃ ওই ফাঁসি ক
চিরদিন থাকবে না। অনেক পাপ, অনে
মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টসরা নিশ্চিহ্ন হ
যাবে। ওদের সাতজনের মৃত্যুর পেছনে জে
উঠবে সাত হাজার—সাত লক্ষ—সাত কোটি
সংখ্যাতীত, গণনাতীত জীবন। ওই ফাঁ
কাঠে সেদিন মানুষের রক্ত ফুল হয়ে ফু
উঠবে—সে ফুল অহিংসার, সে ফুল মৈত্রীর
সে ফুল কল্যাণের। (আগামীবারে সমাপ

সবুজ নিশান উড়াইয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। দূরে বহুদূরে স্টেশন পড়িয়া ...ল। পরিচিত পথঘাট সমস্ত মিলাইয়া ...ল। ট্রেন চলিয়াছে। দুরন্ত তাহার গতি, ...রি তাহার আকর্ষণ।

...দিন শেষ হইয়া রাত্রি নামিয়া আসিয়াছে। ...বরাম অবিশ্রান্ত পথ চলা। শেষ নাই, অন্ত ...—অফুরন্ত পথ। চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত ...য়া আসে দেহ, মন বিকল হইয়া যায়, তবু ...মবার অবকাশ নাই। মানুষকে চলিতে ...বে, থামিয়া থাকিতে সে পারে না।

চলিষ্ণু পৃথিবী—মানুষ তাহার নিত্য-...গী। থার্ড ক্লাস কামরায় এককোণে বসিয়া ...য় বাহিরে চাহিয়া আছে। জ্যোৎস্না ...ঠিয়াছে। দীর্ঘছায়া মেলিয়া বনস্পতি সরিয়া ...ইতেছে। সম্মুখে যাহা রহিয়াছে, এক ...হূর্তে তাহা পিছনে পড়িয়া রহিল। দূরে ...মান্তের কুটীরে আলোকশিখা দেখা যায়, ...বার তাহা মিলাইয়া যায়। শান্ত মূক ...রাত্রীর বুকে বিক্ষোভ জাগাইয়া যন্ত্রদানব ...টিয়া চলিয়াছে, আর নিরুপায় নিঃসহায় ...নুষও সেই সঙ্গে চলিতেছে।

"আপনি কতদূর যাবেন ?" ক্ষীণকায় এক ...দ্রলোক প্রশ্ন করিলেন। রুক্ষ মুখভাবে, কঠিন ...র ধরণে মনে হয় যেন ধমক দিতেছেন। ...নি এতক্ষণ সঞ্জয়ের পাশে বসিয়া ঘুমাইতে-...লেন। স্টেশনের গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া ...য়াছে। সঞ্জয় উত্তর দিল—

"কোলকাতায় যাবো।"

"হুঁ। সেখানে আছেন কে ?"

"কেউ না।"

"বাবা মা কোথায় থাকেন ?"

"বাবা মা নেই।"

"কতদিন হোল তাঁরা গেছেন ?"

"মা গেছেন বছর নয় হোল। বাবা গেছেন ...ই পোষে।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ সঞ্জয়ের মুখের দিকে ...হিয়া রহিলেন তাহার পর কহিলেন—...র কে আছেন ?"

"আর কেউ নেই।"

"হুঁ"—ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ...য়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সঞ্জয় ...নিরুপায় হইয়া—জানালা দিয়া বাহিরে ...হল।

অপর্ণার বাবা রাজীব ঘোষের কথাটা সঞ্জয়ের মনে পড়িয়া গেল। রাজীব ঘোষ ধনী লোক, দশজনে তাঁহাকে চেনে মানে। উগ্র বিলাতি ধাঁচে তিনি নিজেকে গড়িয়াছেন এবং সেই আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া তুলিতেছেন। মেয়ে অপর্ণা তাঁহার শিক্ষা কিছুটা ব্যর্থ করিয়াছে। রাজীব ঘোষ অবশ্য অপর্ণার মাকে এজন্য দায়ী করেন। সে যাহাই হউক, অপর্ণার ধীর শান্ত স্বভাবের জন্য রাজীব ঘোষ তাহাকে কড়া কথা বলিতে পারেন না। অপর্ণার মুখ মনে পড়ে সঞ্জয়ের। কেমন যেন আত্মসমাহিত ভাব। চারিপাশে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ নাই। সমস্ত উগ্রতা তাহার কোমল দৃষ্টির শান্ত বিষণ্ণতার কাছে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। অপর্ণার কথা ভাবিতে সঞ্জয়ের এত ভাল লাগে। কদাচিৎ কখনো দেখাশোনা হয়, সামান্য কথাবার্তা অথচ মন মাধুর্যে ভরিয়া যায়। মহানগরীর কলমুখর জীবনের মধ্যেও কতবার অপর্ণাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে আর আশ্চর্যরকম ভাল লাগে। রাজীব ঘোষের তাচ্ছিল্যমিশ্রিত ব্যবহার মনে করিয়া সঞ্জয়ের চিত্ত বিমুখ হইয়া ওঠে। সঞ্জয়ের পিতার মৃত্যুর পর প্রতিবেশীর দায়িত্ব পালনের জন্য একদিন আসিয়াছিলেন। শুষ্ক বাঁধাধরা গৎ গাহিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার শোকাহত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গতকাল সে অপর্ণাদের বাড়ি গিয়াছিল বিদায় লইতে। রাজীব ঘোষ তাহাকে নানা রকমে উৎসাহিত করিয়া পরিশেষে কহিলেন—"বাক্ আপ বয়, ইয়ংম্যান তোমরা ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা কোরে এগিয়ে যাবে তবেই ত!" অপর্ণা কি কাজে ড্রইংরুমের দিকে আসিতেছিল—রাজীব ঘোষ ডাকিয়া কহিলেন—"এই যে অপর্ণা—সঞ্জয় কোলকাতা চলে যাচ্ছে, ভেরি স্যাড! এই ছেলেবয়স, মাথার ওপরেও কেউ নেই। যাহোক তুমি কিছু ভেবো না সঞ্জয়, ইউ উইল শাইন—নির্ঘাৎ।" সহসা হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন "বাই জোভ সাড়ে ছটা বাজে। আমি তাহোলে উঠ্‌ছি। অপর্ণা তুমি একটু সঞ্জয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলো—ওকে চা না খাইয়ে ছেড়ে দিও না।" ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাজীব ঘোষ বাহির হইয়া গেলেন।

অপর্ণা ও সঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। সঞ্জয় কহিল—"মিন্টু কোথায় ?" মিনটু অপর্ণার ছোট ভাই। অপর্ণা কহিল "খেলতে গিয়েছে।" অপর্ণাকে কেমন যেন বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সঞ্জয় হাসিল। তাহার নিজের মন দিয়া সে সকলকে বিচার করিতেছিল। এই চিরপরিচিত স্থান চির-দিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছে সে। প্রতিটি মুহূর্তে তাহার বিরহবিধুর। কত শিশুকালে সে এখানে আসিয়াছিল মনে পড়ে না। দারিদ্র্যের কষ্টের হাত এড়াইবার জন্য পশ্চিমের এই দূরে অখ্যাত শহরে তাহার বাবা কাজ লইয়া বাঙলাদেশ ছাড়িয়াছিলেন। দরিদ্র বলিয়াই হউক আর দীর্ঘ প্রবাসের জন্যই হউক আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাহাদের যোগসূত্র একেবারে ছিল না। গত তিন বৎসর সে কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিতেছে। তাহার পূর্বে বাঙলাদেশে সে যায় নাই। এ শহরের হিন্দুস্থানী আর প্রবাসী বাঙালীরাই তাহাদের আপদে বিপদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পাট চুকিয়া গেল। তাহার পিতা যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাতে সঞ্জয়ের পড়াশোনার খরচ চলিত, কিন্তু এমন সংস্থান তিনি রাখিয়া যান নাই যাহাতে সঞ্জয়ের ছাত্রজীবন অন্তত এখন অর্থ-চিন্তায় ব্যাহত হয় না। সে কলিকাতায় যাইতেছে আর সে ফিরিয়া আসিবে না। প্রতিটি মুহূর্তে সঞ্জয়ের দুঃসহ মনে হইতেছিল কঠিন বেদনার নির্দয় আঘাতে। অপর্ণা তাহার সঙ্গে গেট অবধি আসিয়াছিল। সহসা কি ভাবিয়া সে অপর্ণাকে কহিল, "চলো বেড়িয়ে আসি।" অপর্ণা তাহার অনুরোধে হয়ত বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু কহিল "আচ্ছা মাকে বলে আস্‌ছি।"—মিনিট দুই পরে সে ফিরিয়া আসিল। শীতের রাত্রি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কুয়াসার চিহ্নমাত্র নাই। তীব্র চন্দ্রালোক। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে অনুভূতি স্তিমিত হইয়া আসে। গাছের পাতার স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে মাটির বুকে। আলোছায়া ঘেরা আঁকাবাঁকা পথে সঞ্জয় ও অপর্ণা চলিতেছিল।

অনেক দূর চলিয়া তাহারা একটা ছোট পাহাড়ের নীচে আসিয়াছিল। ছোট একটা ঝরণা পাহাড়ের গা বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। রুপালী জলোচ্ছ্বাসের দিকে অপর্ণা চাহিয়া-ছিল। সহসা অনেক দূরে একটা হায়েনা হাসিয়া উঠিল। অর্থহীন বুকফাটা হাসি। কে যেন নিজের চরম দুর্গতির দিকে চাহিয়া আর্তরবে হাসিতেছে। অপর্ণা চমকাইয়া গিয়াছিল, সঞ্জয় তাহার চকিত দৃষ্টি দেখিয়াছিল। মুখে কহিয়াছিল "রাত অনেক হল, চলো এবারে যাই, কিন্তু তার আগে তোমার একটা গান শোনাতে হবে।" অপর্ণা গান গাহিয়াছিল। জ্যোৎস্নার পটভূমিকায় সুরের ছবি আঁকিয়া

দিল যেন। জীবনের স্তিমিত বিষণ্ণতার ছায়া মুছিয়া ফেলিয়া দুঃখের স্তব্ধ সায়রের সম্মুখে পেঁাছাইয়া দিয়া সে সুর। সঞ্জয়ের সমস্ত চিত্ত মুহূর্তে সে অনুভব করিল, সে অপর্ণাকে ভালবাসিয়াছে নিঃশেষে নিঃসংশয়ে। যে তাহার জীবনে সুরের স্পর্শে প্রাণ জাগাইয়াছে সে তাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়াই ভালবাসে।

গান শেষ হইলে আবার সেই আলোছায়া রেখায়িত পথে তাহারা ফিরিয়া গেল। অপর্ণা কি বুঝিয়াছিল কে জানে কিন্তু সঞ্জয় যাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাষও সে জানাইতে পারে নাই। অর্পণাকে পেঁাছাইয়া দিয়া নিঃসঙ্গ পথে চলিতে চলিতে সে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। সে মুহূর্তে সে সমস্ত ভুলিয়া অপর্ণাকে ভাবিয়াছিল।

প্রচন্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া ট্রেন থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তুমুল কোলাহল। ট্রেনের যাত্রীরা জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া তারস্বরে চেঁচাইতেছিল। দুই চারিজন নামিয়াও গেল। লোক কাটা পড়িয়াছে। সঞ্জয় শিহরিয়া উঠিল। তুমুল কোলাহল। অনেকক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়িয়া দিল, কোলাহল থামিয়া গেল।

একটা জীবনের পূর্ণ পরিসমাপ্তি। তাহার একটা ছোট কাহিনী নিশ্চয় ছিল— কিন্তু কয়জন তাহা জানে? নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মৃত্যু আসিয়া জীবনের পথরেখা মুছিয়া দিল। একান্ত নিরুপায় নিঃসহায় মানুষ! না পারে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে মৃত্যুকে রোধ করিতে।—সঞ্জয় চোখ বুঁজিল। বড় ক্লান্ত লাগিতেছিল। যদি কোনো কিছু না ভাবিতে হইত! কোনো কিছু নয়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই যদি না চিন্তার ধারা বহিয়া আনিত! সম্পূর্ণ বিস্মৃতি—পরিপূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি কি জীবনে আসে না। গভীর ঘুমের মত, হয়ত বা মৃত্যুর মত বিস্মৃতি।

"আর কত ঘুমুবে ওঠো এবারে!" সঞ্জয় চাহিয়া দেখিল রাত্রের সেই শীর্ণকায় সহযাত্রী ভদ্রলোক ডাকিতেছে। মহানগরীর আভাস পাওয়া যায়।—বড় বড় কলকারখানা।—ধোঁয়া ধুলোয় ভরা পথ। লরী মোটর চলিতেছে। ভদ্রলোক দু'খানা প্লেটে খাবার সাজাইয়াছেন। কহিলেন "ওই ঘটিতে জল রয়েছে মুখ ধুয়ে নাও। কখন থেকে যোগাড় কোরে বসে আছি তোমার ঘুমই ভাঙ্গে না।" সে বিস্মিত হইল— ভদ্রলোকের কি মাথায় ছিট্ আছে? আলাপ পরিচয়ও এমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই যাহাতে—। কিন্তু ভয়ে ভয়ে সে আর কিছু বলিল না। রগচটা মেজাজ, হয়ত বা চটিয়া গিয়া কি অনর্থ করিবেন। যথানির্দেশিত মুখ ধুইয়া আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। আহারান্তে একটা কাগজে তাঁহার নাম ঠিকানা লিখিয়া দিয়া ভদ্রলোক সঞ্জয়ের হাতে দিলেন—"রেখে দাও। যদি কখনো দরকার হয় যেও। কাঁচা বয়েস— একগুঁয়েমী কোরে আখের নষ্ট কোরোনা। দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই।" প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কাল রাত্রে তিনি সঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থাটা জানিয়া লইয়াছিলেন। স্টেশন আসিয়া পড়িল। হাওড়া স্টেশনের জনারণ্যে সঞ্জয় আর তাঁহাকে দেখে নাই।

মেসে নিজের ঘরের দুয়ার খুলিয়া সঞ্জয় খালি তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। বিছানা বাক্স মেঝেয় পড়িয়া রহিল। বেলা দশটা বাজে। যে যাহার মত কর্মব্যস্ত। কেহ কেহ আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া চলিয়া গেল। সঞ্জয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার বাবা মারা যাওয়ার সংবাদ কেহ জানে না। না হইলে হয়ত এক পশলা সান্ত্বনা বর্ষণ শুরু হইত।—কলিকাতার রাজপথের কর্মব্যস্ত জনপ্রবাহের কলোচ্ছ্বাস তাহার কানে আসিয়া পড়িতেছিল। সময় নাই। এখানে ভাবিবার থামিবার অবকাশ নাই। চলিষ্ণু পৃথিবী, মানুষও চলিতেছে অবিশ্রান্ত। মেসের চাকর আসিয়া স্নানের জন্য তাগাদা দিল, সঞ্জয় উঠিয়া পড়িল।

পরদিন হইতে সে কাজের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কাজ অন্য কিছু নয় ছাত্র পড়ানো। অন্য কাজ লইলে পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটিবে। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া নানাস্থানে দেখা করিল। কিন্তু মনোমত কিছু পাইল না। কলেজ খুলিবার দেরী নাই যাহোক একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সে যতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কাজের সম্ভাবনাও তত ক্ষীণ হইয়া আসিল। শেষে সঞ্জয় হতাশ হইয়া পড়িল, কিন্তু চেষ্টা ছাড়িল না। সেদিন সকালে শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা সরু গলির মধ্যে এক ছোট দোতালা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া ঠিকানা মিলাইয়া দেখিয়া কড়া নাড়িল। স্থূলকায় এক প্রৌঢ় আসিয়া দুয়ার খুলিয়া কহিলেন "কি চাই?"

"গণেশচন্দ্র হাজরা কি এ-বাড়িতে থাকেন?"

"আমিই গণেশ হাজরা। কি দরকার শুনতে পাই কি?"

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ছেলে পড়ানর লোক চাই—সেজন্যে এসেছি।"

"ও তা ভেতরে আসুন, পথে দাঁড়িয়ে ত আর কথা হয় না" সঞ্জয় তাঁহার সহিত ভিতরে আসিল। জীর্ণ পুরাতন বাড়ি। বসিবার ঘরে একখানা তক্তপোষ পাতা আছে—গণেশ হাজরা দেখাইয়া দিল—সঞ্জয় বসিল।

"তা আপনার কি করা হয়?"

বি এস-সি পড়ি।"

"আমার ছেলেকে অঙ্ক করাতে পারবেন সেকেন ক্লাশে পড়ে।" প্রশ্ন শুনিয়া সঞ্জয় অবা হইল, অবশ্য এই কয় মাসে এ শ্রেণীর লোকদে সহিত তাহার নানারকম পরিচয় হইয়া কাজেই মনের বিরক্তি চাপিয়া কহিল "পারবো

"পারলেই ভাল। আজকাল সব ফাঁকিবা মশাই। আমরা ত মশাই মুখ্যসুখ্য মানু আমাদের বড়বাবু বিস্বান লোক, মহাশ ব্যক্তি। এই তিনিই সেদিন বল্‌ছিলেন আজকাল বি-এ এম-এ পড়ে সব গাধা হয়।"

সঞ্জয় নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রা তাহার আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল। কি বলিবার কি আছে—কাজ করিতে হইলে এসব তুচ্ছ কথার উত্তর দিতে নাই তাহা ক্রমশ বুঝিতেছে। এবারে ভদ্রলোক উচ্চক ডাকিলেন—"ওরে ন্যাড়া এদিকে আয়। মাস্টার মশাই এসেছেন।" ন্যাড়া ওরফে নারা আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে হাফপ্যাণ্ট, হাতাকা ফতুয়া, মুখে একগাল হাসি। গণেশ হাজ তাহার দিকে দেখাইয়া কহিলেন "এই যে একে পড়াতে হবে। আমার আবার উঠতে হ অফিসের তাড়া আছে (সঞ্জয় পরে জানিয়াছি অফিস মানে কোনো মহাজনের আড়ত) আ উঠছি—ছেলেকে যদি বাজিয়ে দেখে নি চান্ ত দেখুন।" সঞ্জয় তাহার প্রয়োজন অনু করিল না। গণেশ হাজরা এবারে কণ্ঠস্ব একটু নামাইয়া কহিলেন "এই ঘরেই আপনা থাকতে হবে। কোনো অসুবিধে হবে না। দরকার টরকার হয় ন্যাড়ার মাকে বলবে মাইনে তাহোলে ওই আট টাকা, খাওয়া-দাওয় খরচ ত লাগছে না। তবে সকাল বিকে জলখাবার ব্যবস্থাটা কিন্তু আপনাকে কোর হবে।" সঞ্জয় একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল পরে কহিল "আচ্ছা আমি কাল আপনা জানাবো।"

"এর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে না পোষায় বলুন আরো দুটাকা ধরে দেবে ছেলের এডুকেশনের জন্য আমি কোনোদি তাকাইনে মশায়।" এডুকেশন কথাটা বলি হাজরা মশায় প্রায় হাঁফাইতে লাগিলেন। "এ যদি রাজি থাকেন তবে কাল থেকে আসবেন

"আচ্ছা কাল থেকেই আসবো।" সঞ্জ নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দশ টাকা মাহিনা থাওয়া থাকা। মন্দ কি উপায় একটা হইল। পরদিন রিক্সায় তাহ জিনিসপত্র চাপাইয়া সঞ্জয় গণেশ হাজরার বা আসিয়া পেঁাছিল। একতলার সেই জীর্ণ ঘ ঝাড়িয়া পুঁছিয়া সাধ্যমত ভদ্রস্থ করিয়া লই ছাত্র নারায়ণ অনেক সাহায্য করিল। সকা সন্ধ্যায় ছাত্র পড়ানো। দুপুরে স্নানাহার সা কলেজ, রাত্রে আহারান্তে নিজের পড়াশোনা সমস্তটা দিন সঞ্জয়ের নিশ্বাস ফেলি অবকাশ পর্যন্ত নাই। মাঝে মাঝে প্রশা

থা মনে পড়ে—প্রশান্ত সঞ্জয়ের বন্ধু। শান্তর সংসারে কেহ নাই, অগাধ সম্পত্তির লিক, দূরসম্পর্কীয় এক কাকা সমস্ত ত্বাবধান করেন। প্রশান্ত ছবি আঁকে, দেশ-দেশে ভ্রমণ করিয়া বৎসরের অর্ধেক সময় টাইয়া দেয়। ফার্স্ট ইয়ারে পড়িতেই শান্তর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় এক চিত্র র্শনীতে এবং সেই পরিচয়সূত্র একদা ধুত্বে পরিণত হয়। প্রশান্ত সঞ্জয় অপেক্ষা সে কিছু বড়। সঞ্জয় ও তাহার মধ্যে নিকটা দূরত্ব যেন আছে কিন্তু প্রশান্তর মুখে এসব কথা তাহার মনেও হয় না। শান্ত শিল্পী। প্রশান্ত দুনিয়াটাকে ন দূরে হইতে দেখে শোনে ার কৌতুকমিশ্রিত কেমন একরকম মন্ন হাসি হাসে। সঞ্জয়ের এক এক সময় জেকে প্রশান্তর কাছে যেন সংকুচিত মনে য়। কিন্তু সে সব মুহূর্তে তাহার দারুণ স্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে। প্রশান্ত বেশীদিন লিকাতায় থাকে না। আসে আবার চলিয়া য়। গত কয়েক মাস সে দক্ষিণ ভারতে রিয়া বেড়াইতেছে। বাধাহীন উন্মুক্ত জীবন।

সঞ্জয় নিঃশ্বাস ফেলে। সে পারে না। অথচ াহারও কোনো পিছনের টান নাই। তবু সে মন করিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ডানা লিয়া দিতে পারে না। প্রতিনিয়ত সে াপনার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া ড়িতেছে। জীবনের সংগ্রামে সে যত পিছাইয়া ড়িতেছে ততই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া ঠিতেছে। আর সর্বোপরি অপর্ণার চিন্তা াহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সে দরিদ্র াহার এ বাতুলতা কেন? বিদ্যা অর্থ কিছুই াহার নাই অথচ রহিয়াছে এক সদাজাগ্রত ম্মুখ চিন্তা। অসম্ভব বলিয়া যতই সে ুঝিতেছে ততই তাহার চিত্ত অধীর হইয়া ঠিতেছে। নিজেকে শত সহস্র রকমে বাঁধিয়াও স শান্তি পাইতেছে না। অকারণ আত্মগ্লানিতে স প্রতিমুহূর্তে ধিক্কার দিয়া ফিরিতেছে নজের মনকে। তাহার জীবন দুঃসহ হইয়া ঠিয়াছে। কেন এমন হইল? অপর্ণার দিক ইতে সে ত কোন সাড়াই পায় নাই।—প্রতি-বশী;—বহুদিন এক জায়গায় ছিল। দেখা-শানা সহজ আলাপ পরিচয়, ইহার বেশী ত কছুই নয়। কিন্তু তাহার এ খেয়াল কেন?

সঞ্জয় ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে বই-এর পাতা খালে—এক অক্ষরও তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ রে না। প্রশান্ত নাই। থাকিলে সঞ্জয় ুস্কিলে পড়িত। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ঞ্জয় শুধু ভয় করে না, সে দৃষ্টির সামনে সে ারুণ অস্বস্তি বোধ করে। চিরপরিচিত সেই পশ্চিমের দূর শহর মনে পড়ে। সেই ছোট বাগানঘেরা বাড়ি। অপর্ণাদের মস্ত বাড়ি। মনে পড়ে স্কুলের খেলার মাঠ। সঞ্জয় শৈশবে ফিরিয়া যায় আবার। কেমন যেন শান্ত হইয়া আসে চিত্ত। নিজের অজান্তে দুই চোখ সজল হইয়া আসে। পরমুহূর্তে সে সচেতন হইয়া ওঠে। এসব তুচ্ছ মনোবিলাস করিবার সময় তাহার কোথায়। এসব ছেলেমানুষী তাহার সাজে না। কঠিন পথ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। অপর্ণাকে সে ভুলিয়া যাইবে। একেবারে, নিঃশেষে। পড়াইবে পড়িবে আর কিছু নয়। পড়াশোনার মধ্যে সে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। অর্পণা কি দিনান্তেও এক-বার তাহার কথা মনে করে? বহিয়া গিয়াছে তাহার। আর মনে করিলেই বা কী! সঞ্জয়ের মত ছেলে রাজীব ঘোষের কাছে শুধু অপাত্র নয়, গুড্ ফর নাথিং। সঞ্জয় এই সব খেয়ালের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিবে না। এ সব স্বপ্নবিলাস তাহার জন্য নহে। সম্মুখে পরীক্ষা আসিতেছে—আর সময় নষ্ট নয়। পরক্ষণেই মন সংকুচিত হইল। অর্পণার কথা ভাবিলে সময় নষ্ট হইবে কেন? কত ভাল লাগে ভাবিতে। অশান্তি ত অর্পণাকে ভাবিয়া নয়—অশান্তি তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায়। অপর্ণা যেখানে থাকুক ভাল থাকুক তাহা হইলেই সে সুখী। আর কিছু সে চাহিবে না। শান্ত ধীর স্থির অপর্ণা, তাহার কালো চোখের চাহনিতে যে মাধুর্য আছে, তাহার স্মৃতি সঞ্জয়ের মন অভিষিক্ত করিয়া রাখিবে। এ সব সে কি ভাবিতেছে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সঞ্জয় মনকে লঘু করিতে চেষ্টা করে।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সঞ্জয় দেখিল তাহার ঘরের তক্তপোষের উপর একটি মেয়ে বসিয়া আছে। তাহার হাতে সঞ্জয়ের একখানা বই, মেয়েটি নিবিষ্ট মনে বই দেখিতেছে। এ মেয়েটিকে সে এ পর্যন্ত এ বাড়িতে দেখে নাই। ছাত্র নারায়ণের মুখে শুনিয়াছিল—তাহার এক খুড়তুতো বোন আছে, তাহার নাকি মাথা খারাপ। উপরের একটা ঘরে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। সেই নাকি? কিন্তু সে এখানে আসিল কি করিয়া? সঞ্জয় দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। মেয়েটি একবার মুখ ফিরাইয়া সঞ্জয়কে দেখিল কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না—যেমন বসিয়াছিল তেমনই রহিল। নারায়ণ স্কুল হইতে ফিরিয়া উপরে যাইতেছিল মাস্টার-মশাইকে এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যে মাস্টার-মশাই!"

সঞ্জয় কিছু বলিবার আগেই সে ঘরের মধ্যে তাকাইয়া মেয়েটিকে দেখিয়া তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "মা দেখে যাও বোকা বাইরের ঘরে এসে বসে আছে—মা—ওমা"। নারায়ণের আহ্বানে হাজরাগৃহিণী নামিয়া আসিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কাহার বাপান্ত করিতে করিতে মেয়েটিকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্যাপার দেখিয়া সঞ্জয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নারায়ণ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মাস্টারমশাই বড্ড ভয় পেয়ে গেছলেন না? ও সেই আমার খুড়তুতো বোন বোকা। এমনিতে কিছু বলে না—বেশ থাকে, তবে মাঝে মাঝে বড় উৎপাত করে। জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে একশা করে। একবার জানেন ঘরের মধ্যে আগুন ধরিয়া দিয়েছিল। আপনি ভয় পাবেন না। ওকে ঘরে শেকল দিয়ে রাখা হয়, আজ কেমন করে খোলা পেয়েছিল তাই।" নারায়ণ তাহাকে আশ্বাস দিয়ে চলিয়া গেল। সঞ্জয় ঘরে ঢুকিয়া ঘরের অবস্থা দেখিয়া থ' হইয়া গেল। এতক্ষণ এদিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই, তাছাড়া ঘরটা এমন আলো-আঁধারি যে বাহির হইতে ঢুকিয়া চট্ করিয়া কিছু চোখে পড়ে না। চোখটা একটু অভ্যস্ত হইলে তখন দেখা যায়। তাহার বই খাতা জিনিসপত্র সমস্ত চারদিকে ছড়ানো। কয়েকখানা খাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেঁড়া। আয়নাটা টুকরা টুকরা হইয়া মেঝেয় পড়িয়া আছে। চিরুণী কোথায় কে জানে? শ্রান্ত দেহে সঞ্জয় ছড়ানো জিনিসপত্রের মধ্যে বসিয়া পড়িল। বিকৃত মস্তিষ্ক। কিসের নির্দয় আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছে কে জানে? নারায়ণের মুখে শুনিয়াছে উহার মা বাবা কেহ নাই। জ্যেঠামশাই গণেশ হাজরা উহাকে প্রতি-পালন করিতেছে, কিন্তু কতখানি যত্ন যে উহার হয়, তাহা সঞ্জয় দেখিয়াই বুঝিয়াছে মাথায় এক ফোঁটা তেল নাই। পরনের শাড়ি রাস্তার ভিখারীর মত। অথচ সুস্থ মানুষ অপেক্ষা ইহাদের যত্ন হওয়া উচিত শতগুণ। উচিতের কথা কে কাহাকে শিখাইবে? সঞ্জয় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। সহসা একটা আর্ত চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিল। দুয়ার বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল-তার সঙ্গে হাজরাগৃহিণীর উচ্চ-কণ্ঠ—"থাকো তুমি আর ছেড়ে দিচ্ছিনে! বড় বাড় বেড়েছে। আজ কর্তা আসুক একটা এস্-পার কি ওস্পার কোরে ছাড়বো। এমনিতে তুমি ঠিক হবে? হাণ্টারের ঘা না খেলে তোমার শিক্ষে হবে না।" গর্জাইতে গর্জাইতে হাজরা-গৃহিণী গৃহকর্ম করিতে লাগিলেন। সঞ্জয়ের মন বিষাইয়া গেল। মাত্র জীবনধারণের জন্য কোন্ অন্ধকূপে সে আশ্রয় লইয়াছে? এর নাম বাঁচিয়া থাকা। ওই বিকৃতমস্তিষ্ক মেয়েটির অপেক্ষাও তাহার জীবন দুঃসহ। ও ত বুদ্ধিহীনা। আর সে বুদ্ধি, জ্ঞান, বিদ্যা আত্মসম্মানবোধ সমস্ত বিকাইয়া দিয়াছে, তুচ্ছ কয়েকটা টাকার বিনিময়ে। শুধু খাইয়া পরিয় বাঁচিয়া থাকা! কি হইবে? বি এসসি পাশ করিয়াই বা কোন্ স্বর্গলাভ হইবে? তাহাদে মেসে সে দেখিয়াছে কত এম এ, বি এ পাশ একটা চাকরীর জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয় ফিরিতেছে। পরাধীন দেশ। এদেশে তরু

শক্তিকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, নহিলে সমূহ বিপদ। কেহ জেলে পচিয়া মরে, কেহ দারিদ্র্যের আগুনে পুড়িয়া খাক্ হয়, আর বাকি যাহারা ভাগ্যের কাছে কাহবা পাইয়া আসে জন্ম হইতে, তাহাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে, সঞ্জয়ের সংশয় জন্মিয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্ব—ফাঁকা একটা কথা মাত্র। বিন্দুমাত্র সত্য নাই। চতুর্দিকে লাঞ্ছনা চতুর্দিকে পীড়ন। মেসের ম্যানেজারের ব্যঙ্গ মনে পড়ে। এক মাসের মেস খরচ বাকি পড়িয়া ছিল। ম্যানেজার উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিল, "আর পড়াশোনা রেখে দিন মশাই। ভাতকাপড় জোটানো কঠিন, বিদ্যে দিয়ে কি হবে?"—সঞ্জয় নির্বাক হইয়া খোঁচাটুকু হজম করিয়াছিল। উপায় কি? তাহার পর কত হীনতা স্বীকার করিয়া কতবার ব্যর্থ হইয়া শেষে গণেশ হাজরার কৃপায় সে একটু সংস্থান করিয়াছে মাত্র।

"এই যে অবেলায় শুয়ে পড়েছেন। শরীর গতিক ভাল আছে ত?" গণেশ হাজরা আসিয়া ঘরের সম্মুখে দেখা দিলেন। বিতৃষ্ণায় সঞ্জয়ের মন বিমুখ হইয়া উঠিল। তবু সে উঠিয়া বসিল কহিল "না এমনই।"

"একি বইপত্তর এমন ছড়ানো যে? আহাহা অমন সুন্দর আয়নাটা। কি ব্যাপার মশাই?"—তাঁহার কথা শেষ হইল না—অন্তরালে গৃহিণীর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"এদিকে এসো ত।"—হাজরা মহাশয় চলিয়া গেলেন। মিনিট কয়েক মাত্র—তাহার পর শোনা গেল তীব্র আস্ফালন। এ আক্রোশ কাহার উপরে, সঞ্জয় বুঝিল। কিন্তু এতটা সে আশা করে নাই। একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল, তাহার পর নির্দয় প্রহারের শব্দ। সঞ্জয়ের সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়া গেল সে এ বাড়ির কেহ নহে। ভালোমন্দ শোভন অশোভন সমস্ত তর্ক ভুলিয়া সে সোজা উপরে চলিয়া গেল। মেঝের উপর বোকা পড়িয়া আছে, গণেশ হাজরার হাতের বেত আর একবার উঠিতেই থামিয়া গেল। সে পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। সঞ্জয় বলিল—"ছেড়ে দিন্ মেরে ফেলবেন্ নাকি?" তাহার এই আকস্মিক আগমনে কর্তাগৃহিণী বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। ছেলেটার মাথাখারাপ নাকি? কিন্তু হাজরা মহাশয় সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—"কাকে ছেড়ে দেবো? বাপ মা জ্বালিয়ে গিয়েছে, মেয়ে তার লক্ষ গুণ জ্বালাচ্ছে। ওকে খুন কোরবো আজ যা থাকে কপালে। দেখুন কি সর্বনাশ ও কোরেছে।" সঞ্জয় চাহিয়া দেখিল বারান্দায় একরাশ জামাকাপড় আধপোড়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। হাজরা মহাশয়ের কণ্ঠ আর একপর্দা চড়িল—"দেখেছেন? কি সর্বনাশ

আমার কোরেছে। ও নিজে কেন পড়ে মল না? ওকে ছেড়ে দেব?"

সঞ্জয় কথা, কহিল আশ্চর্য স্বাভাবিক সুরে—"ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেন না কেন? সেখানে ত শুনেছি অনেকে ভালও হয়ে যায়, তাছাড়া এত উৎপাতও সহ্য করতে হয় না।"

"সে সব মহা হাঙ্গামার ব্যাপার, টাকাও লাগে অনেক, আমি গরীব মানুষ," গণেশ হাজরার কণ্ঠস্বর নামিয়া আসে। হাতের বেতখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"চলুন নীচে যাই।"—যাইবার পূর্বে আর একবার তর্জন করিয়া উঠিলেন—"দুয়োরে তালা দাও। আর কখনো ছেড়ে দিও না। রাত্রে আজ ওর খাওয়া বন্ধ, দেখি ওর তেজ কমে কিনা?"—

বোকা নিস্পন্দভাবে বসিয়া ছিল। তাহার মুখে ভাবলেশ মাত্র ছিল না। তীব্র বেদনায় সঞ্জয়ের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। কপালের পাশ দিয়া শিরাটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত হাতে পায়ে প্রহারের চিহ্ন। চোখে এক ফোঁটা জল নাই আছে জ্বলন্ত একটা চাহনি যাহার দিকে চাহিলে অন্তর শিহরিয়া ওঠে। হাজরা মহাশয়ের সহিত সঞ্জয় নীচে নামিয়া আসিল। অনেক রাত অবধি বোকাকে পাগলা-গারদে পাঠাইবার কথাবার্তা চলিল। সঞ্জয় বুঝাইয়া দিল ধরাপাড়া করিলে ও চেষ্টা করিলে বিনা পয়সায়ই বোকাকে লইবে। এ সম্বন্ধে সমস্ত ঝুঁকি সঞ্জয় লইবে। হাজরামশাইকে কিছুই করিতে হইবে না। শুধু অভিভাবক হিসাবে তাঁহার নাম থাকিবে মাত্র। সে রাত্রে হাজরামশায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে গেলেন। সঞ্জয় অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল।

সংসারে তাহার কেহ নাই। অথচ সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া অনুভব করে না। মনে হয় সে যেন অনেক বাঁধনে বাঁধা। পরীক্ষা সামনে অথচ পড়িতে পারিতেছে কই? নানা-রকম চিন্তায় সে সর্বদা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কেমন যেন অশান্ত, ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। ভাল লাগে না। ভাল লাগে না তাহার এই রুদ্ধ অপরিচ্ছন্ন ঘর, ভাল লাগে না এই রুচিহীন পরিবারের সংস্পর্শ। জানালা দিয়া আকাশের একটু অংশ চোখে পড়ে। অনেক তারা ফুটিয়াছে। কে যেন মুঠা ভরিয়া হীরক-খণ্ড ছড়াইয়া দিয়াছে। আকাশের নীল বুকে হীরার টুকরা বিঁধিয়া আছে। আকাশ মহা-শূন্য তাহার বেদনা বোধ নাই। শেষ রাত্রির দিকে সঞ্জয় ঘুমাইয়া পড়িল।

বোকা চলিয়া গিয়াছে। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হাঁটাহাঁটি করিয়া সঞ্জয় তাহাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইদানীং বোকা আর অত্যাচার করিত না এবং চিরদিনের মত আপদ বিদায় হওয়ার নিশ্চিন্ততায় কর্তা-গৃহিণীও শাসনের মাত্রা কমাইয়া দিয়াছিলেন। বোকাকে আর একদিন মাত্র সে দেখিয়াছিল। রাত তখন অনেক। সঞ্জয় আলো জ্বালিয়া পড়িতেছিল। বোকা কেমন করিয়া দুয়ার খোলা পাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। বাড়ির সকলে ঘুমাইতেছে। সঞ্জয় বোকাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? বোকা নিরুদ্বেগে আসিয়া বিছানার ধারে বসিল। সঞ্জয়ের টেবিলের উপরে তাহার মায়ের একখানা ছবি ছিল। বোকা দুহাতে সেটা তুলিয়া লইল। সঞ্জয় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিল। নারায়ণকে ডাকিবে কিনা ভাবিতেছে, সহসা দেখিল বোকার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে—সে এক দৃষ্টে ছবিখানার দিকে চাহিয়া আছে। ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহার দুই চোখ দিয়া। নিঃশব্দ বোবা-কান্না। এ অশ্রুর শেষ নাই, এ ব্যথার পরিমাপ নাই। কতক্ষণ কাটিয়াছিল কে জানে সহসা সঞ্জয় দেখিল গণেশ হাজরা চুপ করিয়া দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। চোখে তাহার ক্রূর সর্পের দৃষ্টি, মুখে ব্যঙ্গের হাসি। সঞ্জয় কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"দুয়োর খোলা, মেয়ে ঘরে নেই, আমি ভেবে মরছি এত রাতে কোথায় খুঁজতে যাবো? তা যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।" তারপর বোকার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যত পাগল তোমাকে মনে করি তত পাগল ত তুমি নও।" বলিয়া কেমন একরকম বিষাক্ত হাসি হাসিয়া সঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া বোকার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সঞ্জয় ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। সেই মুহূর্তে তাহার মনে হইল—আর নয় এই মুহূর্তে এ নরক ছাড়িয়া যাইবে সে। কিন্তু যাওয়ার আগে বোকার ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। এতই যখন সহিয়াছে তখন আসল কাজের ক্ষতি করিয়া যাইবে কেন—আসল কাজ? এই কি তাহার কাজ নাকি? গণেশ হাজরার সদ্যউক্তি মনে পড়িল। উত্তেজনায়, নিষ্ফল আক্রোশে তাহার প্রতিটি রক্তকণা উত্তাল হইয়া উঠিল। এ অপমানের শোধ লওয়া যায় না? শোধ? কঠিন উপহাসে সঞ্জয় মনে মনে হাসে। দরিদ্রের আবার প্রতিশোধ! নিরন্নের আবার আস্ফালন! কি করিতে পারে সে? কিছুই না, এতটুকু কিছু সে করিতে পারে না। বিষতিক্ত জীবন নিরুপায়, অসহায়। প্রতিকারহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঞ্জয়ের ক্ষমাহীন মন ছটফট করে।

বোকা চলিয়া যাওয়ার পর সঞ্জয়ও কাজে জবাব দিল। গণেশ হাজরা লোক চটাইতে ভালবাসেন না। নানারকম মিষ্ট কথায় সঞ্জয়কে আপ্যায়ন করিয়া কহিলেন সে যেন মনে করিয়া মাঝে মাঝে আসে—একেবারে ভুলিয়া যায় না যেন।

সঞ্জয় বাক্স গুছাইতেছিল। ছাত্র নারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইল। "মাস্টারমশাই আপনি চলে যাচ্ছেন?" তাহার হতাশা-ভগ্ন কণ্ঠস্বরে সঞ্জয় চমকিয়া গেল। 'এ অঙ্কটা পারছি না মাস্টারমশাই একটু দেখিয়ে দিন, বড় জোর ফলাও করিয়া তাহার দুই চারিটা কীর্তি-কাহিনী এবং নিতান্ত নির্বোধের মত প্রশ্ন এ ছাড়া সঞ্জয় নারায়ণের দিক হইতে আর কোনো সাড়াই পায় নাই। অথচ চলিয়া যাইবার মুহূর্তে তাহার এই আন্তরিক ব্যাকুল সুর সঞ্জয়কে স্পর্শ করিল। সংক্ষেপে কহিল, "হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো।" নারায়ণ "আচ্ছা" বলিয়া মাথা নাড়িয়া মাস্টারমশাই-এর কাজে সাহায্য করে। তাহার দুই চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে, এক সময় টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সঞ্জয়ের মনটা বিষণ্ণ হইয়া গেল। মানুষের মন যে কোথায় বাঁধা কে জানে? তবু যতবার বাঁধন কাটিবার পালা আসে ততবার অনুভব করিতে হয় যে তাহা কত দৃঢ় ছিল। জিনিসপত্র গুছানো হইলে একটা রিক্সা ডাকিয়া সঞ্জয় তাহাতে সমস্ত চাপাইয়া দিল। নারায়ণ হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

একটা কিসের উচ্ছ্বাসে সঞ্জয়ের কণ্ঠ-ফেনাইয়া উঠিল, সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহা রোধ করিল। (আগামীবারে সমাপ্য)

ক্ষয়রোগের আধুনিক চিকিৎসা

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় সূর্যের আলো যে উপকারী এ কথা আজ নতুন করে জানা যাচ্ছে। কিন্তু বহু পুরাকালের যুগ থেকেই মানুষ সূর্যালোকের উপকারিতা বুঝতে পেরেছিল। শীতে জড়োসড়ো হয়ে তারা দেহে রোদ লাগিয়ে প্রাণে স্ফূর্তি পেয়েছে, অন্ধকারে ভয় পেয়ে তারা সূর্যোদয়ের আলোকে আকুল আগ্রহে আহ্বান করেছে। ধ্রুববিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে তারা জানতো যে দেবতার প্রসাদস্বরূপ এই আলোই তাদের প্রাণরক্ষা করছে। তাই সূর্যকে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা দেবতা বলে জ্ঞান করতো। সর্বাপেক্ষা আদিম মিসরীয় সভ্যতার ইতিহাসে জানা যায় যে, সূর্যের উপাসনাই ছিল তাদের ধর্ম। আমাদের দেশে বৈদিক যুগে সূর্যদেবের উদ্দেশেই হবি এবং অর্ঘ্য প্রদান করা হতো, গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতাই ছিল একমাত্র বরেণ্য, আর ইউরোপীয় সভ্যতার আদিস্থান রোমেও ক্রিশ্চান ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সূর্যের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারিত হবার পর থেকে সূর্যালোকের উপকারিতার কথা ক্রমে ক্রমে সকলে বিস্মৃত হয়। আমাদের দেশেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সবিতার পূজা বিরল হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে ১৮৯৩ সালে ফিনসেন নামে এক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পুনরায় বলতে শুরু করেন সূর্যালোকের আশ্চর্য উপকারিতার কথা এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনি এই আলোকে চিকিৎসার কাজে লাগাতে থাকেন। অতঃপর রোলিয়ার নামে একজন সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসক যক্ষ্মা বীজাণু-গঠিত নানা রোগের চিকিৎসায় সূর্যালোককে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। আল্পস্ পর্বতের উপরে ৪০০০ ফুট উচ্চতায় লেইসিন (Leysin) নামক একটি স্থান তিনি এর জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেন, কারণ তিনি বলেন যে, ঐ স্থানের পার্বত্য উচ্চতায় যে অপেক্ষাকৃত বাধামুক্ত সূর্যালোক পাওয়া যায় তার আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিগুলি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক গুণে তেজস্কর। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল, কারণ ফুসফুসের যক্ষ্মা ছাড়া অন্যান্য যে কোন রকমের যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীরা তাঁর কাছে যেতে লাগলো, তারাই সেখানকার সূর্যালোকের চিকিৎসায় আশ্চর্য রকমে আরোগ্য হয়ে যেতে লাগলো। তিনি বললেন সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির দ্বারাই এই উপকার হয়।

এই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির কথাটা আগে একটু বোঝা দরকার। সূর্যের আলো দেখতে মোটের উপর সাদা। কিন্তু এই সাদা রঙের মধ্যে মিলিত হয়ে রয়েছে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো। এই সাতটি বর্ণকে বিভিন্নরূপে দেখতে পাওয়া যায় যখন সূর্যের আলোটি কোন প্রিজ্‌ম্ অর্থাৎ তিন পিঠওয়ালা কাঁচের উপর গিয়ে পড়ে। এই সাতটি রং তখন সেই প্রিজমের দ্বারা যথাক্রমে ছড়িয়ে যায়, আগে বেগুনি, তার পরে অতি নীল, সবুজ, হলদে, নারাংগী শেষে লাল। কিন্তু এই সাতটির আগে পিছেও বিভিন্ন তেজের বিভিন্ন ধরণের রশ্মি আছে যা আমাদের সহজ চোখে ধরা যায় না। বেগুনি রঙের আগেও যে আলোকরশ্মি আছে তারই নাম আল্ট্রাভায়োলেট অর্থাৎ বেগুনি-পারের আলো। আর লাল রঙের পরে যে রশ্মি আছে তার নাম ইন্‌ফ্রা-রেড অর্থ লাল-উজানি আলো। এর মধ্যে আবার উত্তাপেরও তারতম্য আছে। বেগুনি-পারের আলোর উত্তাপ সকলের চেয়ে কম। বেগুনির পর থেকে প্রত্যেকটি রঙে উত্তাপের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। লাল-উজানি আলোর উত্তাপের মাত্রা সকলের চেয়ে বেশী। এ ছাড়া লাল-উজানি রশ্মিগুলি উত্তাপ সমেত যে কোন কাঁচের অন্তরাল ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু বেগুনি-পারের রশ্মি কোন কাঁচের অন্তরাল আদৌ ভেদ করতে পারে না। তা ছাড়া লাল উজানি রশ্মি গায়ে লাগলে চামড়া ভেদ করেও খানিকটা যায়, কিন্তু বেগুনি-পারের রশ্মি চামড়ার আবরণ অল্পই ভেদ করতে পারে।

সূর্যের এই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিগুলিতে খুব কম উত্তাপ থাকলেও এবং তার বাধা ভেদের শক্তি খুব কম হ'লেও সেগুলি কিন্তু এক বিশিষ্ট প্রকারের রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন। আমাদের চামড়ার উপরে এক রকম স্বাভাবিক তেল থাকে, যার দ্বারা আমাদের চামড়াগুলি অল্পবিস্তর চিক্কণ দেখায়। এই তেলকে বলা হয় আর্গোস্টেরল (Ergosterol) বেগুনি-পারের আলোকরশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়াতে এই আর্গোস্টেরল ভিটামিন-ডি নামক পুষ্টিকর ও প্রাণরক্ষক পদার্থে আপনিই পরিণত হয়। সেই ভিটামিন-ডি চামড়ার দ্বারা শোষিত হ'য়ে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে আমাদের খাদ্যরূপে ক্রিয়া করে এবং জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে দেয় এবং তা যদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হ'য়ে প্রচুর পরিমা
শরীরে প্রবেশ করতে থাকে তাহ'লে তার শ
দ্বারা রোগের আরোগ্য ও বীজাণুনাশে যথে
সাহায্য হ'তে পারে। সূর্যালোকের আল
ভায়োলেট অংশটুকুর এই বিশেষ উপকারি
জন্যই আজকাল নগ্নগাত্রে বিধিমত রে
লাগিয়ে আলোকস্নানের ব্যবস্থা প্রচলি
হয়েছে এবং যক্ষ্মা সংক্রান্ত নানা
রোগে তেমনিভাবেই নগ্নগাত্রে রে
লাগিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু এর জ
যেখানকার রোদে যথেষ্ট আল্ট্রাভায়োলেট র
আছে সেখানকার রোদই প্রশস্ত। স্থানভে
ও কালভেদে এই রশ্মির অনেক তারতম্য ঘ
পরীক্ষায় দেখা যায় যে লেইসিনের রোদে য
আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি আছে এমন ত
কোথাও নেই। কিন্তু সেখানেও এই র
সকল সময়ে সমান থাকে না, হয়তো শী
চেয়ে গ্রীষ্মে বেশি, সকালের চেয়ে দুপ
বেশি। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য
লেইসিনে যাওয়া আবশ্যক এবং সময় বু
গায়ে রোদ লাগানো আবশ্যক।

কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এ
সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন ব্যবস্থা ব
দরকার যাতে ঘরে বসে সকলেই ঐ রশ্মি
সুযোগটুকু প্রয়োজনমত পেতে পারে।
থেকেই আজকালকার কৃত্রিম আল্ট্রাভায়ো
বাতির উৎপাদনের সূচনা। অবিকল সূ
লোকের মতো ইলেক্‌ট্রিক আলো প্রস্তুত ক
এবং তার থেকে অন্যান্য সমস্ত রশ্মিগুলি
বাদ দিয়ে বাতির মধ্যে কেবল আল্ট্রাভায়ো
রশ্মিগুলিকে এককালীন গ্রহণ করা হ
যথানির্দিষ্টভাবে রোগীর সর্বাঙ্গে বা
কোনো অঙ্গে লাগানো হয়। এতে স্বাভা
সূর্যালোকের চেয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘনস্থ
রশ্মিগুলিকে এককালীন গ্রহণ করা হ
সুতরাং পাঁচ ঘণ্টা রোদ লাগিয়ে যে কাজ
পাঁচ মিনিটমাত্র ঐ কৃত্রিম বাতির আ
লাগিয়েই সে কাজ হ'য়ে যায়। অথচ এর জ
ঘর ছেড়ে দেশান্তরে যাবার কোনো প্রয়ো
হয় না।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিগুলিকে সার্থকভ
প্রয়োগের জন্য কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞ
প্রয়োজন। এর দ্বারা দুটি উপকার বিশেষভা
লক্ষিত হয়। প্রথমত শীঘ্রই শরীরের যাবত
ব্যথা যন্ত্রণাগুলি দূর হ'য়ে যায়, আর দ্বিতী
গাত্রচর্মের অনেক উন্নতি হয়। এর দ্বারা আ

ফুসফুসের যক্ষ্মাতে কোনোই উপকার হয় না। কিন্তু কয়েকটি উপসর্গযুক্ত অবস্থাতে এর দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগটি যখন ফুসফুস অতিক্রম ক'রে পেটেও গিয়ে আক্রমণ করে, তখন এর দ্বারা অতি আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, এমন কি তখন পেটের রোগের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের ক্ষতগুলিও অভাবনীয়রূপে আরোগ্য হ'য়ে যেতে থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা হয় না। এর দ্বারা আরো বিশেষ উপকার পাওয়া যায় যখন যক্ষ্মা জীবাণু কর্তৃক কোনও হাড় কিংবা গাঁট আক্রান্ত হয়, আর যখন গণ্ডমালা বা গলগণ্ড জাতীয় রোগ জন্মায়। এই বীজাণুর দ্বারা চামড়ার রোগ (লুপাস) হ'লে তাতেও এই চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আর স্বরযন্ত্রের রোগেও এর দ্বারা আশু উপকার হয়। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির উপকারিতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ক্ষেত্র বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে এক এক সময় এর সুফল দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।

ফুসফুস আক্রমণকারী আসল যক্ষ্মাতে বর্তমান যুগের চিকিৎসাপদ্ধতি কিন্তু একেবারে অন্য প্রকার। সে চিকিৎসা কোনো ঔষধাদির দ্বারা নয়, মোটের উপর তাকে বলা হয় সার্জিক্যাল পদ্ধতি অর্থাৎ শল্য চিকিৎসা। তার কারণ এতে প্রধানত ঐ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সাহায্যে কয়েকপ্রকার শল্যাদির দ্বারা মেরামতির মতো এমন প্রক্রিয়া করানো হয়, যাতে শরীর যন্ত্রটি স্বাভাবিক প্রেরণাতেই আপন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই জাতীয় চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, যে-কোনো উপায়ে আক্রান্ত ফুসফুসটিকে কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া। ঐ যন্ত্রটিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার দ্বারাই তা সম্ভব হয় এবং যেহেতু তা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়, সেই হেতু সার্জিক্যাল উপায় গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের ফুসফুস হাপরের মতো একপ্রকার যন্ত্র, আর হাপরের মতোই নিত্য সেটি একবার করে বায়ুপ্রবেশের দ্বারা ফুলে ওঠে, আবার বায়ুনিষ্কাশনের দ্বারা সংকুচিত হয়ে যায়। এই ক্রিয়াটি কিন্তু সে নিজের থেকে করে না। হাপরেও যেমন কারিকরের হাতের ক্রিয়ার সাহায্যে খানিকটা ফাঁক পেলেই বাইরের থেকে হাওয়া ঢোকে, আবার চাপ পেলেই বেরিয়ে যায়, ফুসফুসেও ঠিক তেমনি। আমাদের বক্ষপিঞ্জরটি এমনভাবেই তৈরি যে, তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর উত্থানপতন ক্রিয়াতে সেটি একবার করে প্রসারিত হয় আবার পরক্ষণেই সংকুচিত হয়। আমাদের ফুসফুস দুটি ওরই পিঞ্জরের ভিতরে দুই পাশে দুটি গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। সেই গহ্বর দুটি ভ্যাকুয়াম অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সেখানে লেশমাত্র বায়ুর প্রবেশাধিকার নেই। তাই বাহিরের বায়ু কেবল নাক দিয়ে সেখানকার ফুসফুসের ফাঁকা জায়গাতেই মাত্র প্রবেশ করতে পারে—অবশ্য বুকের প্রসারণের দ্বারা তার মধ্যে যখন যতটুকু ফাঁক পায়। কিন্তু এমন যদি হয় যে, সেই ভ্যাকুয়াম গহ্বরের মধ্যে কোথাও ফুসফুসের অবস্থানের পাশাপাশি কোন উপায়ে কিঞ্চিৎ বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কী হবে? সেই ভ্যাকুয়াম নষ্টকারী বায়ু কোথাও নির্গত হ'তে না পেরে ফুসফুসের চারিপাশে ছড়িয়ে থাকবে এবং সেই পাশের বায়ুর স্থানীয় চাপ অবশ্যই ফুসফুসের ভিতরকার বায়ুর চাপের চেয়ে কিছু অধিক হবে। সুতরাং ঐ ফুসফুসের ভিতরকার বায়ুটি তার চাপে অবশ্যই নির্গত হয়ে যাবে এবং পুনরায় আর সেই ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং ফুসফুস যন্ত্রটি তখন চুপসে থাকবে, তার দ্বারা আর হাপরের মতো শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্ভব হবে না। সুবিধার কথা এই যে, ফুসফুস যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় নয়, সুতরাং তখন মাংসপেশীর দ্বারা বক্ষ-পঞ্জরগুলি ওঠানামা করতে থাকলেও ফুসফুস তার পাশের বায়ুর চাপে চুপসে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে, আর সে বায়ু গ্রহণের কোন রকম প্রয়াসই করবে না। এতে সে কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম পেয়ে যাবে যতক্ষণ না পাশের বায়ুর চাপ কমে যায় অথবা সে অন্যত্র সরে যায়। এই চুপসে যাওয়ার ফলে ফুসফুসের টুবার-কলগুলিও সংকুচিত হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগে তার মেরামতিও নির্বিঘ্নে চলতে থাকবে।

এই অদ্ভুত রকমের পরিকল্পনাটি প্রথমে মাথায় আসে একজন ইটালিয়ান পণ্ডিতের (Forlanini), তার পরে মাথায় আসে একজন আমেরিকানের (Murphy)। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগানো তখন খুবই কঠিন হয়। বুকের পাঁজরার মধ্যে একটি ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে তার ভিতর দিয়ে বুকের গহ্বরে অনায়াসেই বায়ু ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু জীবন্ত মানুষের বুকের মধ্যে কখনো কেউ ছুঁচ ফোটাতে সাহস করেনি—যদি ফুসফুস ফুটো হয়ে যায়, যদি হঠাৎ তাতেই সে মারা যায়? সুতরাং নিতান্তই যারা মরে যাবে বলে নিশ্চিত জানা গেছে, এমন সব মুমূর্ষু রোগীর শরীরে এই প্রতিক্রিয়াটি এক্সপেরিমেণ্ট স্বরূপ করা হতে লাগল। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখা গেল যে, তারা প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে সেরে উঠতে লাগল। তখন ক্রমশই এর বহুল প্রচলন ঘটতে লাগল, অনেকেই সাহস করে এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা কৃতকার্য হতে লাগল। এখন এই উপায়ে চিকিৎসা করা সকল দেশেই প্রচলিত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য বিশেষ রকম শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা থাকলে এ-কাজ কিছুই কঠিন নয়। এতে ইঞ্জেকশন দেবার মতোই বুকের মধ্য ছুঁচ ফুটিয়ে ঔষধের পরিবর্তে খানিকটা বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রকার চিকিৎসা অনায়াসেই প্রয়োগ করা চলে এবং তাতে অধিকাংশ স্থলেই সুফল পাওয়া যায়। রোগের যত প্রথম অবস্থাতে এটি প্রয়োগ করতে পারা যায়, ততই শীঘ্র এর দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। আজকাল এক্স-রে পরীক্ষার দ্বারা খুব প্রথম অবস্থাতেই এই রোগটি ধরা যায়। সুতরাং সন্দেহস্থল মাত্রেই কালবিলম্ব না করে এক্স-রে পরীক্ষা করানো উচিত। এক্স-রে পরীক্ষা বিষয়েও ক্রমশ আরো উন্নতি হচ্ছে, সুতরাং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এই রোগের সর্বপ্রথম সূচনামাত্রেই তা ধরা পড়বে এবং তৎক্ষণাৎ এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে এখনকার অপেক্ষা আরো অল্পকালের চেষ্টাতেই তা আরোগ্য হয়ে যাবে।

এই প্রকার চিকিৎসার নাম Artificial Pneumothorax, যাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এ, পি (A. P.) করা অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে বক্ষগহ্বর বায়ুপূর্ণ করা, চলিত কথায় বলা যায় গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া। এর দ্বারা ফুসফুস সম্যকরূপে বিশ্রাম পায় এবং চুপসে থাকে, আর এই চুপসে রাখা ও বিশ্রাম দেওয়া ছাড়া ফুসফুসের যক্ষ্মা আরোগ্য করা খুবই কঠিন। এই রোগে ফুসফুসের মধ্যে যে টুবারকল জন্মায়, সেগুলি ক্রমে একত্রে মিলে ক্যাভিটি (Cavtiy) বা ঘুণ ধরার মতো ক্ষুদ্র-পক্ষে অন্যান্য অংশের ফোড়ার মতোই ক্লেদ ও বীজাণুপূর্ণ এক-একটি গহ্বর। ফোড়া যখন ফেটে যায় কিংবা যখন অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বৃহৎ গহ্বর প্রস্তুত করে। এই গহ্বর প্রকৃতপক্ষে তাকে ক্লেদমুক্ত করে দেওয়া হয়, তখন সেই ফোড়া ক্রমে ক্রমে আপনিই শুকিয়ে যায়। চারি পাশের মাংসাদি তাকে চাপের দ্বারা অনবরত সংকুচিত করে রাখতে থাকে আর সেই অবসরে নূতন নূতন কোষের সৃষ্টির দ্বারা গহ্বরটি ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসের ভিতর ফোড়া কিংবা গহ্বর হলে যদিও তা ফেটে যায়, তবু তা ভরাট হবার উপায় নেই, কারণ বারে বারেই প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসটিকে ফেঁপে উঠতে হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্যেও সংকুচিত হয়ে বিশ্রামের অবস্থায় থাকবার উপায় নেই এই ফেঁপে ওঠার দরুণ ক্যাভিটির মধ্যে নিত্য নিত্য চাড় পড়বার সম্ভাবনা থাকে এবং সেগুলি সংকুচিত না হয়ে বরং আরো বেড়ে যায়। সুতরাং এই ফাঁপা যন্ত্রটির ভিতরকার ক্ষত আরোগ্য করবার একমাত্র উপায় তাকে কিছুকালের জন্য স্পঞ্জের ন্যায় সংকুচিত করে বিশ্রামের অবস্থায় রাখা। এ, পি করার দ্বারা

ঠিক এইটকুই সম্ভব হয়। অবশ্য একবার এ, পি করলে কিছুই হয় না, কারণ মাংসাদি পরিবেষ্টিত বন্ধ স্থানে বায়ুর চাপ অধিক কাল সমানভাবে থাকতে পারে না, কিছুদিনের মধ্যেই সে বায়ু-বিরল হয়ে তার চাপ কমে যায়। সুতরাং কিছুদিন অন্তর পুনঃ পুনঃ এ, পি করার দ্বারা ফুসফুসটিকে বায়ুর চাপে নিত্যই সংকুচিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষতগুলি শুকিয়ে ভরাট হয়ে না যায়। এমনিভাবে রাখবার জন্য ক্ষেত্রভেদে এক বছর থেকে চার বছর পর্যন্তও এ, পি করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত যুসফুসটি নিষ্ক্রিয় থাকে, ততদিন এক দিকের সুস্থ ফুসফুসটির দ্বারা দুই দিকের কাজ চলতে থাকে। যদিও তাতে কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু প্রথম অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে রোগীর বিছানাতে শুয়ে থাকবার দরকার হয়। একদিকে ফুসফুসের বিশ্রাম এবং অন্যদিকে সমস্ত শরীরের বিশ্রাম পেয়ে ভিতরকার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও একাগ্র হয়ে কেবল আরোগ্যের কাজেই তার সমস্ত শক্তিটুকু নিয়োগ করতে থাকে। এই শক্তি সকলেরই আছে, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ না পেলে তার কোন ক্রিয়া হয় না। এ, পি করার ফলে সেই সুযোগটুকু তাকে দেওয়া হয়।

দুঃখের বিষয়, এই এ, পি চিকিৎসার কতকগুলি অন্তরায় আছে। সকল রোগীর পক্ষে এই রীতি প্রয়োগ করা চলে না। যাদের এক দিকের ফুসফুসমাত্রই আক্রান্ত হয়েছে, কেবল তাদের পক্ষেই এ চিকিৎসা সম্ভব। দুই দিকের দুই ফুসফুসকে এককালীন নিষ্ক্রিয় রাখা চলতে পারে না, সুতরাং যাদের এক দিকের ফুসফুস সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, তাদের পক্ষেই এই চিকিৎসা করা যায়। যাদের এক দিকের ফুসফুস অধিকরূপে আক্রান্ত, আর অন্য দিকের ফুসফুস সামান্যরূপে আক্রান্ত, তাদের পক্ষেও এই চিকিৎসায় বিপদ আছে। কারণ অধিকরূপে আক্রান্ত ফুসফুসটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে সামান্য আক্রান্ত ফুসফুসটিকে ডবল পরিশ্রম করতে হয়, তাতে তার সামান্য ক্ষতগুলি তাড়াতাড়ি আরো বেড়ে যায়, তখন দুই দিকের কোনটিকেই আর আরোগ্য করা যায় না।

যাদের এক দিকের ফুসফুসমাত্রই আক্রান্ত, তাদের পক্ষেও অনেক সময় এ, পি করা সম্ভব হয় না। রোগের খুব প্রথম অবস্থায় এই চিকিৎসা সকলের পক্ষেই সম্ভব, কারণ তখনো পর্যন্ত কোন বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু রোগটি কিছুকালের পুরানো হয়ে গেলেই তার মধ্যে নানা বাধাবিঘ্ন এসে পড়ে। এ, পি করার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাধা যাকে বলে অ্যাঢিশন (Adhesions)। টুবারকলের ক্ষত যদি ফুসফুসের গভীরতর দিকে হয়, তাহলে এগুলি জন্মায় না। কিন্তু ক্ষত যদি ফুসফুসের গায়ের উপর দিকে ভাসা-ভাসাভাবে হয়, তাহলে শীঘ্রই সেখানে অ্যাঢিশন জন্মায়। অ্যাঢিশন অর্থ জুড়ে যাওয়া। ফুসফুসমাত্রই উপরের গাত্রে একটি পাতলা ঝিল্লির চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে, ঐ চাদরটি ফুসফুসের গায়ের সঙ্গে মোক্ষমরূপে আঁটা। এই চাদরের নাম প্লুরা (Pleura) বা ফুসফুস ধরা কলা। আরো এক প্রস্ত প্লুরা আঁটা থাকে বক্ষগহ্বরের ভিতরকার গায়ে গায়ে। আমরা যখন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকি, তখন এই দুই প্রস্ত প্লুরার পরস্পরের গায়ে গায়ে পিচ্ছিলভাবে সংঘর্ষ হতে থাকে। যখন কাউকে এ, পি করা হয়, তখন বাহিরের বায়ু এই দুই প্রস্ত প্লুরার মধ্যবর্তী স্থানে গিয়েই প্রবেশ করে এবং ফুসফুসটিকে তখন বক্ষগহ্বরের দেয়াল থেকে বায়ুর চাপে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখে। কিন্তু যখন ঐ ফুসফুসের উপরের গাত্রেই রোগের ক্ষত হয়, তখন এই সুযোগটুকু পাওয়া যায় না। তার কারণ উপরে ক্ষত হলেই তৎসংলগ্ন প্লুরাতেও তার প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং সেই প্লুরা তখন অপর দিকের প্লুরাতেও প্রদাহের সৃষ্টি করে নিকটস্থ বক্ষগহ্বর-গাত্রের প্লুরার সঙ্গে জুড়ে যায়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ফুসফুসটিই তখন স্থানে স্থানে আপন অবস্থানের দেয়ালের সঙ্গে জুড়ে যায়। যেখানে ফুসফুস মুক্ত অবস্থায় নেই, সেখানে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিলেও সে বায়ু তার চারিপাশে সঞ্চারিত হবার কোন পথ নেই। কিন্তু চারিপাশ থেকে সমানভাবে বায়ুর চাপ না পেলে ফুসফুসটি সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হতে পারে না। হয়তো প্রথমে খানিকটা আংশিকভাবে সংকুচিত হয়, তার পরে হয়তো প্লুরার জোড়ের জায়গাগুলি বায়ুর চাপে ধীরে ধীরে ছেড়ে গিয়ে তখন আবার আরো কিছু সংকুচিত হয়। যাদের ক্ষতের পরিমাণ অল্প, তাদের পক্ষে এতেই উপকার হয়, আংশিকভাবে সংকুচিত হলেও তারই সুযোগে ক্যাভিটি ভরাট হয়ে রোগ আরোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু যাদের অ্যাঢিশনগুলি প্রচুর এবং বলবান, তাদের পক্ষে যথোপযুক্ত এ, পি করা সম্ভবও হয় না এবং তার দ্বারা উপকারও পাওয়া যায় না।

ঐরূপ অবস্থায় ফুসফুসকে সংকুচিত রেখে বিশ্রাম দেবার জন্য অন্যান্য প্রকার উপায় আছে। ক্ষতযুক্ত ফুসফুস আপনা থেকেই সংকুচিত হতে চায়, কেবল তার চারিপাশের মাংসপেশীর নির্মিত বক্ষাধার বারে বারে প্রসারিত হয় বলেই তাকে ক্ষত অবস্থাতেও সেই সঙ্গে ফেঁপে উঠতে হয়। তথাপি ক্ষতের চারিপাশে এমন গণ্ডি রচনা হয়ে যায়, যা অনবরতই কুঁকড়ে গুটিয়ে গিয়ে ক্যাভিটিকে বুজিয়ে ফেলবার প্রয়াস করে। কেবল প্রশ্বাস নেবার প্রক্রিয়ার দ্বারাই এই আরোগ্য-প্রয়াসটি বারে বারে বাধা পায়। আমরা যখন বুক ফুলিয়ে প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে পেটটাও ফুলে ওঠে। তার কারণ বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরের অন্তরাল ক'রে যে মাংসপেশী নির্মিত মধ্যচ্ছদা (diaphragm) রয়েছে সেটি নিচের দিকে নেমে যায়, এবং তার দ্বারাই বক্ষগহ্বরের পরিসর অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। এই মধ্যচ্ছদার ওঠানামার দ্বারা শ্বাস-গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনেকখানি সাহায্য হয়, কারণ এর দ্বারা ফুসফুসটি নিচের দিকে স্থান পেয়ে অনেকখানি প্রসারিত হ'য়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসের ক্ষতস্থানে এতে বারেবারেই টান পড়ে। যদি ঐ মধ্যচ্ছদাটিকে কোনো মতে অকর্মণ্য ও নিশ্চল ক'রে দেওয়া যায়, তা'হলে ফুসফুসের নিচের দিকে প্রসারিত হবার তাগিদ এসে আর এই টান পড়তে পারে না, এবং এদিক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ফুসফুস উপর দিকে খানিকটা গুটিয়ে গিয়ে বিশ্রামের অবস্থায় থাকতে পারে। অতএব এ পি করা সম্ভব না হ'লে তখন এই উপায় অবলম্বন করা হয়। মাংসপেশী মাত্রই কাজ করে নার্ভের প্রেরণায়। মধ্যচ্ছদাকে যে কাজ করায় তার নাম ফ্রেনিক (phrenic) নার্ভ। এই ফ্রেনিক নার্ভটি কণ্ঠদেশের পাশ দিয়ে বক্ষদেশের ভিতর দিয়ে মধ্যচ্ছদায় নেমে গেছে। কণ্ঠদেশের চামড়া ছেদন ক'রে অতি অল্প আয়াসেই এই নার্ভটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নার্ভটিকে কেটে দিলে অথবা নষ্ট ক'রে দিলেই মধ্যচ্ছদার গতিবিধি স্থির হ'য়ে যায়, তখন কথঞ্চিৎ বা অনেকাংশে ক্রিয়ামুক্ত হ'য়ে সেই দিকের ফুসফুস সংকুচিত অবস্থায় বিশ্রাম পেতে পারে। এই বিশ্রাম সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকের আরোগ্যের পক্ষে এর দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য হয়। তবে কোন্ রোগীর পক্ষে এই অপারেশনটি উপকারী হবে সেটা বিশেষজ্ঞই স্থির করতে পারেন।

আরো একপ্রকার অপারেশন আছে, তার নাম scaleniotomy। স্কেলিন (scalene) নামক দুটি মাংসপেশী আমাদের বক্ষপিঞ্জরের উপরকার প্রথম দুটি পাঁজরার হাড়কে উপর দিকে টেনে ধরে রাখে, তার দ্বারা বক্ষগহ্বর অনেকটা স্ফীত অবস্থায় থাকে। এই দুটি মাংসপেশীকে ছেদন ক'রে দিলে তখন বক্ষ-পিঞ্জর নিচের দিকে ঝুলে পড়ে গহ্বরের আয়তন কিছু সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যায়। ফ্রেনিক অপারেশনের সঙ্গে কেউ কেউ এই অপারেশনটিও ক'রে থাকেন, তাতে ভিতরকার ফুসফুস আরো কিছু অধিকতর সংকুচিত হ'য়ে যাবার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য এই সকল অপারেশন খুব গুরুতর প্রকৃতির নয় এবং এর দ্বারা কোনো অঙ্গহানি হবারও সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক ক্ষতই কালক্রমে জুড়ে যায় এবং ছিন্ন স্থান পুনর্গঠিত হ'য়ে যায়। সুতরাং ফ্রেনিক নার্ভও পরে জুড়ে গিয়ে মধ্যচ্ছদার ক্রিয়া শুরু

র দেয় এবং স্কেলিন মাংসপেশীও জুড়ে য়ে পুনরায় আপন কর্তব্য করতে থাকে।

এক দিকের ফুসফুস আক্রমণকারী ক্ষ্মাতেই এমন কতকগুলি বিপরীত অবস্থা খা যায় যেখানে পূর্বোক্ত কোনো উপায়েই ছু ফল হয় না, অর্থাৎ ফুসফুসকে সম্যক শ্রাম দেবারও কোনো উপায় হয় না এবং গাভিটিও ভরাট হয় না। শোষযুক্ত পুরানো ফাড়ার মতো সেই ক্যাভিটি নিত্যই ক্লেদবস্তু র্গত করতে থাকে আর রাশি রাশি বীজাণু সের করতে থাকে। এই অবস্থায় সেই ক্যাভিটি ুজিয়ে ফেলবার কোনো ব্যবস্থা না করলে রাগী ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে অগ্রসর য়ে যায়। এমন অবস্থায় অন্য একপ্রকার অপারেশনের দ্বারা বক্ষপিঞ্জরের হাড়ের খাঁচাটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভেঙে দিয়ে তার ভিতরকার লে গহ্বরটিকেই সংকুচিত ক'রে ফুসফুসকে সংকুচিত হ'তে বাধ্য করা হয়। এই প্রকার অপারেশনের নাম থোরাকোপ্লাস্টি (thoraco-plasty)। থোরাক্স কথাটির অর্থ বুকের খাঁচা। এই অপারেশনে আক্রান্ত ফুসফুসটির দিকের দুই তিনটি পাঁজরার হাড়ের খানিকটা করে অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যে হাড়ের লম্বা লম্বা পাঁজরার দ্বারা খাঁচাটি নির্মিত হয়েছে এবং যে শক্ত শক্ত পাঁজরাগুলো একই অবস্থায় বজায় থাকলে তার ভিতরকার গহ্বরের পরিসর কিছুতেই কমবে না, সেই পাঁজরার হাড়ের খানিকটা ক'রে টুকরো যদি কেটে ফেলে দেওয়া যায় তাহ'লে তৎসংলগ্ন মাংসপেশী-গুলি আলগা হ'য়ে ঝুলে পড়ে নিশ্চয় তার ভিতরকার খাঁচাটা কুঁকড়ে এবং চুপসে যাবে, আর তার মধ্যে অবস্থিত ফুসফুসটিও অগত্যা তখন চুপসে যাবে। সুতরাং ক্ষতযুক্ত ফুস-ফুসকে বিরাম দেবার জন্য এই ব্যবস্থাই তখন করা হয়। এই অপারেশন যদিও পূর্বোক্ত অপারেশনগুলির চেয়ে কিছু কঠিন রকমের, কিন্তু এর দ্বারা অনেক রোগীকে আশ্চর্য রকমে আরোগ্য হ'য়ে যেতে দেখা গেছে। বস্তুত অন্যান্য উপায় যখন কার্যকরী নয়, তখন ফুস-ফুসকে আরোগ্য করার পক্ষে এইটাই খুব প্রশস্ত উপায়। এতে প্লুরার চাদর ভেদ ক'রে অস্ত্র প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হয় না, সব কাজ প্লুরার বাহিরে বাহিরেই সমাধা হ'য়ে যায়। পাঁজরার খানিকটা হাড় কেটে ফেলে দিলে যে আর কখনো সেখানে হাড় গজাবে না তাও নয়। কিছুকাল পরেই ধীরে ধীরে সেখানে হাড় গজিয়ে খাঁচা আবার অনেকটা পূর্বেকার মতোই হ'য়ে যায়। এমন কি বুকের উপরকার অপারে-শনের ক্ষতটি এমনিভাবেই ভরাট হ'য়ে যায় যে, গায়ে একটা জামা থাকলে তখন আর বোঝাই যায় না যে অপারেশন হয়েছিল।

এই যে সকল সার্জিক্যাল বা শল্য চিকিৎসার কথা বলা হলো এর প্রত্যেকটিরই ঐ একই উদ্দেশ্য, যে কোনো উপায়ে ফুস-ফুসকে কিছুকালের জন্য শ্বাস গ্রহণে বিরত ক'রে নিষ্ক্রিয় রাখা। একে ঠিক চিকিৎসা বলা যায় না। আসল চিকিৎসাটি করে প্রকৃতি, এই সকল প্রক্রিয়া তারই জন্য প্রকৃতিকে প্রয়োজনমত সুযোগ দিয়ে থাকে। শুধু এই সকল অপারে-শনের দ্বারাই নয়, সমস্ত শরীরের সম্পূর্ণ বিশ্রাম, সর্বদা বাহিরের মুক্ত বায়ু গ্রহণ, আর পুষ্টিকর পথ্যের দ্বারাও সকল দিক দিয়ে প্রকৃতিকে সাহায্য করবার জন্যই সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করা হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, এর দ্বারাই অনেক রোগী মারাত্মক অবস্থা থেকেও আরোগ্য হ'য়ে যায়। সুতরাং বুঝতে হবে যে এই রোগে নিতান্ত অন্তিম সময় ছাড়া কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতি হাল ছেড়ে দেয় না, তাকে সুযোগ দিতে পারলে সে নিজেই অনেক হতাশ অবস্থা থেকে রোগীকে আরোগ্যের পথে টেনে তুলতে পারে। এ রোগের যা কিছু ক্ষয় এবং ক্ষতি তা ধীরে ধীরেই ঘটতে থাকে এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব আভ্যন্তরিক আরোগ্যশক্তি সুযোগ পেলেই তা অক্লেশে নিবারণ করতে পারে। যে রোগটি এমন তাকে যমের মতো জ্ঞান করবার কোনো কারণ নেই। এ রোগ হ'লে যত শীঘ্র পারা যায় চিকিৎসার জন্য রোগীকে প্রকৃতির হাতেই সমর্পণ করা উচিত। ক্ষমতা থাকতে থাকতে প্রয়োজনমত সর্বাঙ্গীন বিশ্রাম-টুকু দিয়ে বাকি কাজটা স্বয়ং প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে সে নিজের চিকিৎসা নিজেই ক'রে নিতে পারে। আধুনিক যক্ষ্মা চিকিৎসার এই হলো মূলমন্ত্র। শুধু এ পি করলে বা অন্যান্য অপারেশনগুলি করলে যে কেবল তার দ্বারাই রোগ সেরে যাবে এমন কথা মনে করা উচিত নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামাদির সমস্ত নিয়মগুলি অবশ্যই পালন ক'রে যেতে হবে। যতদিন পর্যন্ত রোগটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে না গেছে ততদিন পর্যন্ত কোনো বিষয়েই কিছুমাত্র ঢিল দেওয়া চলবে না। প্রকৃতির চিকিৎসায় এই রোগ বহুদিনে অতি ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে মোটের উপর চার বছর লাগে। ততদিন পর্যন্তই সকল বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পুনঃ পুনঃ এক্সরে পরীক্ষার দ্বারা দেখে নিতে হবে যে, ফুসফুসে ট্যুবারকলের আর কোনো চিহ্ন মাত্র আছে কিনা। যখন দেখা যাবে যে, কিছুই নেই, তখনই কেবল রোগীকে নিয়মমুক্ত করা যাবে। অন্যান্য কোনো রোগের চিকিৎসায় এত বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যক্ষ্মার চিকিৎসায় এতটাই প্রয়োজন। এই রোগে আপাতঃসুস্থতাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। রোগী হয়তো জ্বরমুক্ত এবং অন্যান্য লক্ষণমুক্ত হ'য়ে গেছে, হয়তো সে দেখতে শুনতে বেশ মোটাও হয়েছে, কিন্তু ভিতরে তখনও রয়েছে ট্যুবারকলের ক্ষত। তা যদি হয় তবে তখনও হয়তো এ পি করতে হবে এবং তখনও রোগীকে নিয়মের অধীনে থাকতে হবে। তবে এ সকল কথা রোগের পরিপূর্ণ অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য। রোগের প্রথম সূচনা থেকেই এই চিকিৎসা আরম্ভ করলে আরোগ্য হতে খুব দীর্ঘকাল লাগে না। যদি খুব প্রথম অবস্থা থেকেই কিছুমাত্র কালবিলম্ব না ক'রে এ পি করার ব্যবস্থা শুরু করে দেওয়া যায় তাহলে বিফল হবার কিংবা দীর্ঘকাল পড়ে থাকবার কোনোই আশংকা থাকে না, রোগী নিশ্চয়ই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে সুস্থ হ'য়ে যায়। এমন চমৎকার উপায় থাকতেও, এখনো এর প্রতি সকলের তেমন আস্থা জন্মায় নি। তার কারণ অনেক স্থলেই প্রথম অবস্থায় এর প্রয়োগ হয় না। আমাদের দেশে প্রথমত রোগের প্রকৃত পরিচয় জানতেই অনেক বিলম্ব হ'য়ে যায়, কৃতবিদ্য ডাক্তারেরাও এই রোগ বলে সহজে সন্দেহ করতে চায় না এবং এক্সরে অথবা থুতু পরীক্ষা করতেও অযথা বিলম্ব ক'রে ফেলে। আর দ্বিতীয়ত এই রোগ জেনেও লোকে নানাবিধ তুকতাক করতে থাকে, নিতান্ত খারাপ অবস্থা না দেখলে কিছুতেই এই ধরণের চিকিৎসায় স্বীকৃত হ'তে চায় না। এই অযথা বিলম্বের কারণেই উপায় থাকলেও তার সময়-মত ব্যবস্থা করা যায় না, আর যখন করা যায় তখন তার থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে লোকে যখন এর আশু প্রয়োগের উপকারিতার কথা বুঝবে তখন এর সাহায্য নিতে আর একটুও বিলম্ব করবে না, আর তখন দেখবে যক্ষ্মা আরোগ্য করা আদৌ অসম্ভব নয়।

এই রোগের কয়েক প্রকার আনুষঙ্গিক চিকিৎসাও আছে। তার মধ্যে এক প্রকার চিকিৎসা স্বর্ণঘটিত ঔষধ (Gold) ইনজেকশন দেওয়া। এর দ্বারা যথেষ্টই উপকার হয়, যদি রোগী তা সহ্য করতে পারে। সহ্য করতে না পারলে এর দ্বারা অনিষ্টও হ'তে পারে। সুতরাং খুব সাবধানে এটা প্রয়োগ করা উচিত এবং বিচক্ষণ চিকিৎসকের হাতে এ বিষয়ের ভার দেওয়া উচিত। এ পি প্রভৃতির দ্বারা কিছু সুস্থ হ'লে তখন প্রায়ই এই চিকিৎসায় উপকার হয়। দ্বিতীয় প্রকার চিকিৎসা টুবারকুলিনের দ্বারা। বীজাণু বাদ দিয়ে বীজাণুর বিষ থেকে ট্যুবারকুলিন প্রস্তুত হয়। এর প্রয়োগও যথেষ্ট সাবধানে করা উচিত। কয়েকটি মাত্র স্থলেই এর দ্বারা উপকার হয়। তৃতীয় প্রকার চিকিৎসা ক্যালসিয়মের দ্বারা। এই রোগে শরীরের ক্যালসিয়াম যথেষ্টই কমে যায়। সুতরাং ক্যালসিয়ম প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই কিছু উপকার হয় এবং তা পুষ্টি দেবার পক্ষে সাহায্য করে। কিন্তু ক্যালসিয়মের দ্বারা আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যায় না।

সিরোলিন
'রচি'
SIROLIN
ROCHE
সর্দ্দি এবং কাসির জন্য

লম্বা হউন
৭ দিনের মধ্যে
গ্যারান্টী দিয়া
দুই হইতে ছয়
ইঞ্চি লম্বা হউন

দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ

নির্মলকুমার চক্রবর্তী

গায় শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে আসে আসে!"

ভা রতের জীবন-দ্বারে আজ গণ-দেবতার পদ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। দিকে ; আজ তাহার আগমনী গীতি ধ্বনিত া উঠিতেছে। দীর্ঘকাল বৈদেশিক ন-ক্লিষ্ট নরনারী আজ যেন রাজনৈতিক চক্রবালে নবারুণজ্যোতি প্রকাশিত দেখিয়া ন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ত্মা গান্ধী ও মৌলানা আজাদ প্রমুখ াদিগের মত আমরাও একথা মনে করি না কোন সংগ্রাম ব্যাতিরেকেই আমরা মাদিগের বাঞ্ছিত স্বরাজ লাভ করিতে র্থ হইব। ভারতের বর্তমান পরাধীনতা ও হার পূর্ণ রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির মধ্যে নও এক নিদারুণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অবস্থান রতেছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু থাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে ত্রির পর দিবা যেমন সুনিশ্চিত, দীর্ঘ ও ানিকর পরাধীনতার অবসানে অদূরে বিষ্যতেই স্বাধীনতার সূর্যকরোজ্জ্বল ীবন তেমনি আমাদের জন্য অপেক্ষা রিতেছে। নেতাজীর আশ্বাসবাণী নহে, কন্তু জাগ্রত ভারতের জনমতের বিক্ষুব্ধ কাশই তাহার প্রমাণ।

এই পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক দেশীয় াজ্যগুলির সমস্যা রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃর্গের নিকট গুরুতররূপে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্য-ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় এই দেশীয় াজ্যগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। হা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে ইহাদিগকে বর্তমান মবস্থায় রাখিয়া দেওয়া যায় না। স্বাধীন ভারতের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক বীপগুলির অস্তিত্ব ভারতবাসী কিছুতেই হ্য করিবে না। স্বাধীনতাকামী জনগণের এক বপুল অংশকে এইভাবে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার অধীনে রাখিয়া দেওয়ার কল্পনা যত শীঘ্র বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও রাজন্যবর্গের মন হইতে তিরোহিত হয়, ততই দেশের গভর্নমেণ্টের ও স্বয়ং রাজন্যবর্গের মঙ্গল। ভারতের নব-জাগ্রত চেতনার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন যে-কোন ব্যবস্থাই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য, এই সত্য উপলব্ধি করিতে এখনও বিলম্ব হইলে তাহা নিশ্চয়ই নিদারুণ অমঙ্গল প্রসব করিবে।

দুর্ভাগ্যবশত ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষিত প্রস্তাবগুলি এ বিষয়ে যথোচিত দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় নাই। সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার ও প্রদেশে বাহ্যত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক রন্ধনকার্যে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা দেশীয় রাজ্যের ৮ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্পেষিত করার প্রয়াস এবং গণতন্ত্রের বর্ধমান স্রোতকে স্তম্ভিত করার অপচেষ্টাই লক্ষিত হয়।

অবশ্য রাজন্যবর্গ একথা স্বীকার করিবেন না। যাঁহারা এতকাল বৃটিশ শাসনের ছায়াতলে (সময়ে সময়ে এই ছায়া উষ্ণ বোধ হইলেও) অবস্থান করিয়া ভারতের জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বক পরগাছার মতন অনায়াসক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আজ চেতনাপ্রাপ্ত, নবজাগ্রত জনসাধারণের বলিষ্ঠ দাবীর সম্মুখীন হওয়া কঠিন। তাই আজ গঠন-পারম্পর্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও এখনও তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত "অধিকারের" কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না।

ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে মানবীয় দাবীর ভিত্তিতে বৃটিশ ভারতের জনগণ আজ বৈদেশিক শাসনে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, স্বাধীনতার জন্মগত আকাঙ্ক্ষা হইতে যে দাবীর সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারে যে দাবীর সমর্থন, রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থার অবসানের দাবীর পশ্চাতেও সেই সহজ ও একান্ত সত্য মানবীয় অধিকারের প্রশ্নই জড়িত রহিয়াছে। আইনের প্রশ্ন এখানে একেবারেই অবান্তর। আইনতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের তাহাদিগের প্রজাদের উপর অধিকার থাকিতে পারে। বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের উপর বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আইনগত অধিকারও তদপেক্ষা কম নহে। কিন্তু অত্যুগ্র অত্যাচারের সময়ও ইংরাজ প্রভুরা একথা বলে নাই যে, তাহারা বিজেতা হিসাবে আইনগত অধিকারের জোরে আমাদিগকে শাসন করিতেছে। বরাবর শাসকশ্রেণী বরং এই কথাই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে যে ভারতের রাজনৈতিক নাবালকত্বের দরুণ তাহাদিগকে একান্ত বাধ্য হইয়াই আমাদিগের শাসন কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে। পরাধীনতাকে আইনের প্রশ্ন তুলিয়া চিরস্থায়ী করিবার স্পর্ধা প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্নমেণ্টেরও হয় নাই। স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার স্বীকার করিবার মত চিত্তের প্রসার আমরা আমাদিগের অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর নিকট হইতেও পাইয়াছি।

দেশীয় রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্য করিলে আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি যে গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতীয় অধিবাসীদিগের দাবী অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগের দাবী কোন অংশেই ন্যূন নহে। ভারতে বৃটিশ শাসন বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বাহুবল প্রত্যক্ষভাবে অধিকৃত অংশের অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের উপর যেমন প্রযুক্ত হইয়াছে তেমনি তথাকথিত দেশীয় রাজ্যের উপরও প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন্ অংশ সাক্ষাৎভাবে অধিকৃত ও শাসিত এবং কোন্ অংশ "প্যারামাউণ্টসির" মধ্যবর্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা অনেকাংশে আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়াছে। কিন্তু উভয় অংশই সমানভাবে ইংরাজের চরম কর্তৃত্বের আস্বাদন লাভ করিয়াছে। রাজন্যবর্গের মধ্যবর্তিতা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। ইহাতে ইংরাজের চরম কর্তৃত্বের কোন ক্ষতি হয় নাই। সুতরাং আজ যখন ঘটনাচক্রে ইংরাজকে বাধ্য হইয়া জনসাধারণের নিকট তাহাদের ক্ষমতা ত্যাগ করিতে হইতেছে তখন কেবল মাত্র বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের নিকটেই ক্ষমতা অর্পিত হইবে এবং তথাকথিত দেশীয় রাজ্যের বিপুল সংখ্যক অধিবাসিবৃন্দকে সেই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইবে, এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির মূলে কোনই যুক্তি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যেমন একদিন ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া পণ্যবিপণির অন্তরালে নিঃশব্দ চরণে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক "সুড়ঙ্গ পথের অন্তরালে রাজসিংহাসন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পাশবশক্তির সাহায্যে সেই সিংহাসনকে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—দেশীয় রাজ্যগুলির বিবর্তনের ইতিহাসও বহুলাংশে সেই সুবিধাবাদ ও বাহুবলেরই ইতিহাস। মোগল রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অষ্টাদশ

শতাব্দীতে অনেক সামন্ত রাজাই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, শক্তি পরীক্ষার জোয়ারভাঁটা ও অনুকূল অবস্থার সুযোগেই অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন যদি নৈতিক সমর্থনের অযোগ্য হয়, তবে এই দেশীয় রাজ্যের স্বৈচ্ছাচারী শাসন যে অধিকতর অসমর্থনীয় সে বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের দিক হইতে যেমন এই তথাকথিত স্বাধীন রাজন্যবর্গের স্বৈরশাসন সমর্থন করা যায় না, এই স্বৈরশাসনের নগ্ন স্বরূপ ও শাসিতদের দেহমনের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করিলে ততোধিক কঠোরভাবে ইহার সমালোচনা করিতে হয়। ভারতের এই দেশীয় রাজ্যগুলি এতকাল প্রতিক্রিয়ার দুর্গরূপে বিরাজ করিয়াছে। অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও দুর্দশার চূড়ান্ত উদাহরণরূপে ইহাদিগের সমকক্ষ কোন দৃষ্টান্ত মনে করা কষ্টকর। বৃটিশ ভারতের আপেক্ষিক উন্নতির প্রবাহও ইহাদিগের স্রোতোহীন বদ্ধজীবনে কোন তরঙ্গের সঞ্চার করিতে পারে নাই। মনে হয় গল্পের রিপ্ ভ্যান উইংকল-এর মতন—ইহাদের প্রগাঢ় সুসুপ্তির সুযোগ লইয়া জগৎ, এবং এমন কি পার্শ্ববর্তী বৃটিশ ভারতও কতটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহা ইহারা জানিতেও পারেন নাই। আজ সহসা চতুর্দিকের চাঞ্চল্যে ইহারা জাগরিত হইয়া আপন সিংহাসনের পার্শ্বেই নবজাগ্রত জনমতের কল্লোল শুনিতেছেন—জনগণের তূর্যধ্বনি তাহাদিগের কর্ণে অবোধ্য, অপরিচিত এক দূরাগত সুর বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাদিগের তন্দ্রা বিজড়িত, স্বপ্নাকুল চক্ষে সেই জন-আন্দোলনের চেহারা অস্বাভাবিক ও অনাত্মীয় ঠেকিতেছে। মানুষের সহজ দাবীর ভিতরে মানবদেবতার বন্দনাধ্বনি শুনিবার মতন কর্ণ ইঁহারা হারাইয়াছেন। মানুষের বলিষ্ঠ আকৃতিকে ভয় করিবার মতন বিকৃত চক্ষুর ইঁহারা আজ অধিকারী।

সমগ্র ভারতের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ৫৬২। ইহাদিগের মিলিত লোক সংখ্যা আট কোটি এবং আয়তন ছয় লক্ষ নব্বই হাজার বর্গ মাইল। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ এবং আয়তনের এক-চতুর্থাংশের উপর এই দেশীয় রাজাদিগের অধিকার। এই বিপুল সংখ্যক নরনারী এখনও দেশীয় রাজাদিগের স্বৈরাচারী শাসনের নিকট মস্তক অবনত করিবার লাঞ্ছনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে হেবিয়াস কর্পাস-এর অধিকার নাই। মাত্র প্রায় ৩০টি রাজ্যে তথাকথিত ব্যবস্থাপক সভার অস্তিত্ব বর্তমান; এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনোনীত সদস্যে পূর্ণ। ইহাদিগের ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আনুমানিক ৪০টির অধিক রাজ্যে কোন হাইকোর্ট নাই। অথবা শাসন কর্তৃপক্ষ হইতে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে পৃথক করা হয় নাই। অধিকাংশ রাজ্যেই রাজ্যের সমুদয় রাজস্ব রাজার ব্যক্তিগত আয় বলিয়া বিবেচিত হয়। একজন অভিজ্ঞ বিদেশী পর্যবেক্ষক এই রাজ্যগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ইহাদিগকে "anachromatic pools of absolutism in the modern world" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ভ্রান্তিজনক। ইহাদিগের অধিকাংশই সামান্য তালুক বা জায়গীর লইয়া গঠিত এবং তাহাদিগকে রাজ্যনামে অভিহিত করা যায় না। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতেই অবস্থা খানিকটা উপলব্ধি করা যাইবে।

বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক বলিতেছেন, যে এই সমুদায় বিষয়ে বিপুল পার্থক্য থাকিলেও একটি বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে মূলগত ঐক্য রহিয়াছে, তাহা এই যে ইহারা সকলেই "স্বাধীন", ইহাদিগের রাজ্য বৃটিশ রাজ্য নহে এবং ইহাদিগের প্রজারাও বৃটিশ প্রজা বলিয়া পরিগণিত নহে। আইনের দিক হইতে একথা সত্য হইলেও বলা বাহুল্য এই উক্তি যথার্থ ঘটনার একেবারেই বিরোধী। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতার স্বরূপ জানিতে আজ কাহারও বাকী নাই, তাঁহারা এতদিন ইংরাজের হাতে পুতুল-নাচ নাচিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও বর্তমান যুগের তূর্যধ্বনির সম্মুখেও সেই পুরাতন ও সনাতন ভূমিকার অভিনয় ছাড়িতে পারেন নাই। বরং এই কথাই অধিকতর সত্য যে বহু বিষয়ে ইহারা পৃথক হইলেও একটি বিষয়ে ইহারা সকলেই এক যে, এরা সকলেই বৃটিশ সার্বভৌম শক্তির অধীন।

	সংখ্যা।	রাজ্যের আয়তন (বর্গমাইল)	রাজ্যের লোকসংখ্যা।
যে সমস্ত রাজ্যের শাসকবর্গ স্বীয় অধিকারে নরেন্দ্রমণ্ডল (Chamber of Princes) এর সদস্য তাঁহাদিগের	১৩৫	৫,৭২,৯৯৭	৭,৫১,০৯,৩৪৪
যে সমস্ত রাজ্যের অধিপতিরা প্রতিনিধি মারফৎ নরেন্দ্রমণ্ডলে যোগ দেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা	১০৮	২০,৫৭৪	২৫,১৯,৯৮৯
নগণ্য তালুকদার জায়গীরদার ইত্যাদি ...	৩১৯	৪,৫৬৭	১৩,৬৭,৫২১

দেখা যাইতেছে যে তথাকথিত দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত নগণ্য। মধ্যস্তরের যে ১০৮টি রাজ্য নরেন্দ্রমণ্ডলে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী তাঁহাদিগের "রাজ্যের" লোকসংখ্যাও গড়ে মাত্র ২৫,০০০ এরও নিম্নে, এবং আয়তন অনধিক ২০০ শত বর্গ মাইল।

যে সকল রাজ্য নিজ অধিকারে নরেন্দ্রমণ্ডলে যোগ দিতে পারে তাহাদিগের মধ্যেও আবার মাত্র কয়েকটিই সমগ্র আয়তন ও জনসংখ্যার বিপুলাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে অবস্থা বোঝা যাইবে।

মাত্র ২০টি রাজ্যের মিলিত আয়তন ৩,৯৬,২৯১ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৫,৫৫,০৯,৬৭৫। সমুদায় ৫৬২টি রাজ্যের যুক্ত রাজস্ব মোট ৪৫ কোটি টাকার ভিতরে এবং ২৩টি রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই রাজ্যগুলির মধ্যে লোকসংখ্যা, আয়তন, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়েই গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। অধিকাংশ "রাজ্যের" অস্তিত্বই এই সমুদয় দিক হইতে বিবেচনা করিলে একান্ত অর্থহীন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির একজন

চকচকে পোষাক ও ঝকঝকে স্বর্ণ-সিংহাসনের পশ্চাতে বৃটিশ রেসিডেন্টের উদ্ধত নাসিকাই রাজ্যগুলিতে দৃষ্ট হয়। বস্তুতপক্ষে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে ইঁহাদিগের একটি কার্যও করিবার ক্ষমতা নাই. প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যে বৃটিশ প্রভুর ইচ্ছানুবর্তনের প্রতিদানে ইঁহারা নিরীহ প্রজার উপর আপনাদিগের ক্ষমতা জাহীর করিবার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আপন চাকচিক্যময় পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম বজায় রাখিতেছেন।

আমাদিগের বক্তব্য এই যে বৃটিশ ভারতের প্রত্যক্ষ শাসন ও দেশীয় রাজ্যের অপ্রত্যক্ষ শাসন উভয়েই সমভাবেই বৃটিশ শাসন, ভারতের উভয় খণ্ডেই বৃটিশ প্রতাপ সমানভাবে অনুভূত হয়। উভয় অংশই বৃটিশের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং যদি বৃটিশ ভারতের জনগণের নির্বাচিত গণ-পরিষদ কর্তৃক বৃটিশ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন ও অধিকার স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ নির্বাচিত অনুরূপ গণ-পরিষদ কর্তৃক দেশীয় ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার দাবীও সমান বলশালী। ইংরেজ যখন বৃটিশ ভারতের

জনগণের নিকট তাহার প্রত্যক্ষ শাসনাধিকার সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তখন দেশীয় ভারতের জনগণের নিকটও তাহার অপ্রত্যক্ষ অধিকার অর্পণ না করিবার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অন্যরূপে দেখিতে গেলে যখন বৃটিশ রাজ স্বয়ং তাহার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতেছে তখন তাহারই দেশীয় ক্রীড়নকগুলির ক্ষমতা-ত্যাগের প্রশ্ন আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। নৈতিক দাবীর দিক হইতে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগের আপন ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র লাভ করিবার অধিকার কোন অংশেই ন্যূন নহে।

মনে হয় দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ এইভাবে সমস্যাটিকে দেখিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা এখনও এই মনে করিয়া উৎফুল্ল যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের "প্যারামাউণ্টসী" বা সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইবেন। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে তাঁহারা বৃটিশের প্যারামাউণ্টসী হইতে যেমন অব্যাহতি লাভ করিবেন তেমনি বৃটিশ বেয়নেট দ্বারা জনসাধারণ ও তাহাদিগের বিশিষ্ট নেতাদিগকে লাঞ্ছিত করিবার সুযোগও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইবে। তাঁহাদিগকে এখন জনমতের সম্মুখীন হইতে হইবে। হয় জনমতের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সিংহাসন রক্ষা করিতে পারেন নতুবা জনমতের প্রচণ্ড চাপে তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইতে বাধ্য।

রাজন্যবর্গের সম্মুখে এখন এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে—তাঁহারা জনসাধারণের দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র চালু করিতে রাজী হইবেন অথবা জনমতের বিরুদ্ধে স্বীয় আত্মকর্তৃত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থাই অব্যাহত রাখিবেন। যদি তাঁহারা প্রথম পন্থা গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে নবোত্থিত ভাব-তরঙ্গের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। আর যদি তাঁহারা এখনও বাহুবলে নিজ মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রাখিতে কৃতসংকল্প হন তবে যে তাঁহারা আপন শ্মশান-শয্যা আপন হস্তেই রচনা করিবেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ যুদ্ধ পরবর্তীকালের বিপ্লবী ভারতের জনগণ বৃটিশ রাজের শাসন-মুক্ত হইয়াও কতকগুলি বিলাস-ব্যবসায়ী দেশীয় নকল রাজার অত্যাচার মানিয়া লইবে এই কল্পনা এখনও পোষণ করা বাতুলতারই নামান্তর। যাহারা দোর্দণ্ড-প্রতাপ বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা রাজন্যবর্গের বাহুবলকে পরাস্ত করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ। আর রাজন্যবর্গের এই বাহুবল ত নিতান্তই সামান্য। কয়েক সহস্র মাত্র অভুক্ত ও অর্ধ-ভুক্ত সৈন্য লইয়া তাঁহারা কোটি কোটি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জনসাধারণকে দমিত করিয়া রাখিবেন, ইহা একান্তই হাস্যকর কল্পনামাত্র। আজ ভারতের জনসাধারণ চতুর্দিকের ভয়াবহ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে এই রত্নখচিত মূল্যবান পরিচ্ছদভূষিত বিলাসী রাজন্যবৃন্দের অবস্থিতিকে সামঞ্জস্যবিহীন অবাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাদিগের অস্তিত্বের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহাদিগের মনে স্বাভাবিক ভাবেই গভীর সন্দেহের উদয় হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রজাশক্তির প্রতিকূলতাচরণ করিয়া বাহুবলে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা বর্তমান অবস্থায় একেবারেই অসম্ভব। স্বাধীনতা লাভের যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আজ বৃটিশ ভারতের জনগণের মনকে অধিকার করিয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষার প্লাবন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যেও অনিবার্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থার অবসানধ্বনি ঘোষণা করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই শাসকবর্গকে সুনিশ্চিতরূপেই জনশক্তির নিকট অবনত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাদিগের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই চিন্তাধারার আলোকেই রাজন্যবর্গকে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ক্যাবিনেট মিশন দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে কোন সুপারিশই করেন নাই। তাঁহারা কেবল ঘোষণা করিয়াছেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইবে এবং একটি নেগোসিয়েটিং কমিটি মারফৎ প্রদেশগুলির সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আলাপ আলোচনা চালান হইবে। এই নেগোসিয়েটিং কমিটিতে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

কিন্তু যে সময়ে সমস্ত বৃটিশ ভারতের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্যোগ হইতেছে সেই সময়ে দেশীয় রাজ্যের জন্যও নূতন শাসনতন্ত্র অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। এই শাসনতন্ত্র কে রচনা করিবে এবং ইহা কিরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, ইহাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বলাবাহুল্য সমগ্র ভারতের অখণ্ডতার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে সমগ্র ভারতীয় (দেশীয় রাজ্যসমেত) শাসনতন্ত্র রচনাকার্য রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি—সমন্বিত নিখিল ভারতীয় গণ-পরিষদে এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্র দেশীয় রাজ্যের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক গঠিত একটি স্বতন্ত্র গণ-পরিষদে মীমাংসিত হইবে। রাজন্যবর্গ যদি প্রজামণ্ডলীর এই দাবী মানিতে অস্বীকৃত হন তবে ইহা নিশ্চিত যে, প্রজাবৃন্দ তাহাদিগের অস্বীকৃতি উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাঁহারা সেই শাসনতন্ত্র মানিতে অসম্মত হইলে তাঁহারাই সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হইবেন। যে সকল নৃপতি এখনও বলপ্রয়োগ অথবা বিভেদমূলক কার্যকলাপের দ্বারা আপন স্থায়িত্বের আশা পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সে আশা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্র রচনা কার্য সমগ্র ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ যে সমগ্র ভারতেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ—ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সুতরাং একদিকে যেমন ইহারা একটি ফেডারাল গভর্মেণ্ট মারফৎ সমগ্র ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত থাকিবে অপর দিকে তেমনি ইহাদের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রণালী প্রদেশগুলির অনুরূপ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে সম্প্রতি একজন লেখক চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম বৃহৎ রাজ্যগুলি যাহারা প্রদেশগুলির মতন আপনা-আপনিই শাসন কার্যের মানরূপে (Unit of administration) বিবেচিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্য যাহাদিগকে সুবিধামত একত্র করিয়া শাসন কার্য সম্ভবপর হইতে পারে। তৃতীয় বিভাগে যে অসংখ্য নগণ্য তালুক ইত্যাদি পড়িবে তাহাদিগকে তিনি টিকিয়া থাকার অযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং পার্শ্ববর্তী বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন হইতেছে কেমন করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের গণ-পরিষদে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে এবং কেমন করিয়া প্রদেশসমূহের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইবে। বলাবাহুল্য জাতীয় বা কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদে উপযুক্ত সংখ্যায় জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রজাদিগকে ইহা সর্বাংশে উপলব্ধি করিতে দিতে হইবে যে দেশ তাহাদিগেরই এবং শাসন কার্যের দায়িত্ব প্রধানত তাহাদিগের। চতুর্থ প্রশ্নে—প্রদেশসমূহের সহিত সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠিবে না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে যখন প্রদেশগুলির মত অবিচ্ছিন্ন ভারতের স্বনিয়ামক অংশরূপেই দেখা হইবে তখন ভারতীয় অংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রশ্ন অবাস্তব। আন্তঃ-

প্রাদেশিক সম্বন্ধ বা যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা হইবে দেশীয় রাজ্যের সহিত প্রদেশ-গুলির যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ঠিক তদনরূপই হইবে।

আজ ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের অগ্নি-পরীক্ষার দিন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই আজ গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌম শক্তিও তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত বন্ধনমুক্তি দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎকে অধিকতর অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। সার্বভৌমিক শক্তির অবর্তমানে কিভাবে এই রাজ্যগুলি বাঁচিয়া থাকিবে এই প্রশ্নই এখন ইহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান যে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে ইহাদিগকে গণ-তান্ত্রিক চিন্তা ও কার্য প্রবাহের সহিত আপনাদিগকে সংযুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আত্মরক্ষা বর্তমানে অসম্ভব। কাশ্মীরে ও ফরিদকোটে যে পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল অভিনয় আমরা দেখিতেছি—তাহা রাজন্যবর্গের আত্মহত্যার সুনিশ্চিত পন্থা নির্দেশ করিতেছে।

সম্ভবত আজও কতিপয় রাজন্যবর্গ আছেন যাঁহারা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ক্ষীয়মান শক্তির উপর এখনও ভরসা স্থাপন করিয়া আছেন। ইঁহাদিগকে বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ও রাজ-নীতিবিদ ফেনার ব্রকওয়ের একটি লেখা হইতে উদ্ধৃতাংশ উপহার দিয়া শেষ করিতেছি। শ্রীযুত ফেনার ব্রকওয়ে বলিতেছেন, শ্রমিক গভর্নমেণ্ট পরিচালিত গণতান্ত্রিক বৃটেন কোনক্রমেই রাজন্যবর্গের পুরাতন সন্ধি জনিত অধিকারাদি বর্তমান রাখিতে পারে না। যে পুরাতন রক্ষণপন্থী বৃটেনের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং যে দেশীয় রাজ্যগুলির বাঁচিবার কোনও সার্থকতা নাই, এতদুভয়ের মধ্যে ২০০ শত বৎসর পূর্বেকার সন্ধিপত্র চিরস্থায়ী দলিল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বৃটেনের পক্ষে বহু পুরাতন যুগের এই স্মরণ-চিহ্নগুলিকে সমর্থন করা, প্রতিক্রিয়ার নিকট আত্মসমর্পণেরই নামান্তর।

ভারতের রাজন্যবর্গ এই কথা চিন্তা করুন ও বৃটিশ পক্ষপুটাশ্রয়ের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আপন প্রজাবর্গের স্বতঃউৎসারিত স্নেহ ও প্রীতিতে নিজেদের চিরস্থায়ী আসন রচনা করুন। গণ-শক্তির বিজয়-দুন্দুভি আজ দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। রাজন্যবর্গ ইচ্ছা করিয়া এই ধ্বনি শ্রবণ করিতে না চাহিলে তাঁহাদিগকেই ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইতে হইবে। জাগ্রত ভারতের বিজয় রথচক্র অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইবেই!

কং গ্রেস বৃটিশ মন্ত্রী মিশন ও লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত সন পরিষদে যোগদান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন বটে, ন্তু ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি রচনা মিতিতে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। ই সমিতিকে যে সকল ক্ষমতা দান করা হইয়াছে, সে সকলেরও কয়টিতে াপত্তি করিবার আছে এবং কংগ্রেস কয়টি বস্থায় আপত্তি জানাইয়াই তাহাতে যোগ তে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙলায়—ব্যবস্থা পরিষদ হইতে মিতিতে সদস্য নির্বাচন হইবে। আমাদিগের ন হয়, ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথমাবধি বিশেষ তর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বাঙলায় ংগ্রেস কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া াথী মনোনয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে—

(১) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, (২) ডক্টর ফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (৩) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ায়, (৪) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়।

বাঙলা হইতে যে ২৭ জন নির্বাচিত ইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কংগ্রেস ২৫ জনকে নোনীত করিবেন। এই ২৫ জনের মধ্যে নম্নলিখিত ৩ জনকে মনোনীত করিবার নর্দেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যেই য়াছেন :—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

" সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ক্তেই অবশিষ্ট—২২ জন। কংগ্রেসের ার্যকরী সমিতির নির্দেশ এই ২২ জনের ধ্যে—

তপশীলী সম্প্রদায় হইতে ৬ জন, মহিলা ২ জন, ফিরিঙ্গী একজন ও দেশীয় খৃষ্টান একজন থাকিবেন। সুতরাং অবশিষ্ট ৯টি আসনের জন্য যে কেহ প্রার্থী হইতে পারিবেন। হয়ত সকল সদস্যই প্রার্থী হইবেন। কারণ, কেহই মনে করেন না যে, তিনি শাসন পদ্ধতি রচনায় সাহায্য করিতে পারেন না। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকেরই আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও তেমনই অতিরঞ্জিত ধারণা থাকে।

আমরা কাহারও ত্যাগ সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য না করিয়াও একথা বলিতে পারি যে, সকল বিষয়ে সকলের যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে—সকল কাজ করিবার অবসরও না থাকা অসম্ভব নহে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি যে ৩ জনকে মনোনীত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাঁহাদিগের যাচাই করিব। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বাধা উপস্থিত করা যায় না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবার বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি—তাঁহার ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের রাজরোষে লাঞ্ছনা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না বটে; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগে যেরূপ যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় কেন দিয়া থাকুন না, শাসন-পদ্ধতি রচনা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদানের যোগ্যতার অনুশীলন তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া লোক জানে না। যদি এ বিষয়ে আমাদিগের ভুল হয় আশা করি, তাঁহারা সেজন্য অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমাদিগের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে—আমাদিগের বিশ্বাস—তাঁহারা যদি যোগ্যতর ব্যক্তির মনোনয়ন জন্য আপনারা প্রার্থী হইতে অসম্মত হয়েন, তবে তাহাতে তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধিই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আদর্শ অনেকে অনুসরণ করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা সেইরূপ কাজ করিলে তাহাই "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও" হইবে।

কংগ্রেস কি করিবেন, তাহা আমরা জানি না—তবে আমাদিগের বিশ্বাস, সেরূপ লোকের সমন্বয় ব্যতীত শাসন-পদ্ধতি গঠন সমিতিতে বাঙলার মর্যাদা থাকিবে না—বাঙলা সমিতিতে প্রাধান্য-পরিচয় দিতে পারিবে না। জগতের সকল সভ্যদেশের শাসন-পদ্ধতি অধ্যয়ন, তাহার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা—এ দেশের অবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের অবস্থার তুলনা ও ব্যবস্থা বিবেচনা এবং তাহার পরে শাসন-পদ্ধতির খসড়া রচনা সে সকল বিশেষজ্ঞের কাজ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেসের দলের যাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদে আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হয়ত সেইরূপ লোকের অভাবও ঘটিতে পারে। তাহা লজ্জার বিষয়ও বলা যায় না। কাজেই দেশের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া বাঙলার কংগ্রেস দল যদি আপনাদিগের গণ্ডীর বাহির হইতে সেরূপ লোককে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে কার্যভার গ্রহণে প্ররোচিত করেন, তবে তাহাতে কংগ্রেসের গৌরব বর্ধিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কংগ্রেস যে শাসন-পদ্ধতি গঠন সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন, তাহাতে কয়টি বিষয়ে তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইয়াছেন।

বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সেই কয়টি বিষয়ে আপত্তি জানাইয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করা কংগ্রেসের পক্ষে কর্তব্য—

(১) বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে য়ুরোপীয় সদস্যগণ সমিতিতে সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না। প্রথমে শুনা গিয়াছিল—য়ুরোপীয়রা আপনারা সদস্যপদপ্রার্থী হইবেন না বটে, কিন্তু সদস্য নির্বাচনে ভোট দিবেন।

সেই ব্যবস্থায় যে প্রত্যক্ষভাবে সদস্য না হইলেও তাঁহারা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন, এমন লোকের নির্বাচনে সহায় হইতে পারিবেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার বিবৃতিতে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি রচনায় য়ুরোপীয়দিগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করিবার আইনসঙ্গত বা নীতিসঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না। গান্ধীজীও সেই মত সমর্থন করেন এবং একাধিক আইনজ্ঞ তাহাই বলিয়াছেন। অথচ যে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে য়ুরোপীয়রা অসঙ্গত রূপ অধিক আসন লাভ করিয়াছেন, সেই বাঙলায় য়ুরোপীয়রা ভোট দিয়া দেশবাসীর অবাঞ্ছিত লোককেই সমিতিতে পাঠাইতে পারিবেন।

(২) বাঙলার প্রতিনিধিরা কিছুতেই প্রদেশগুলিকে মিশনের মতানুসারে সঙ্ঘভুক্ত করিতে সম্মত হইবেন না। এই সঙ্ঘভুক্তি যে অশেষ অনিষ্টের আকর, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শিখ সম্প্রদায় যেমন আসাম প্রদেশও তেমনই ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। কংগ্রেসের অগ্রগামী দলের যেমন—মহাত্মা গান্ধীরও তেমনই ইহাতে আপত্তি আছে।

(৩) শাসন-পদ্ধতি রচনায় সমিতির সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ মিশনের প্রস্তাব তাঁহারা ছিন্নভিন্ন ও পদদলিত করিতেও পারিবেন।

বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে তাহা মুসলিম লীগের ও য়ুরোপীয় দলের ভোটের আধিক্যে হয়ত গৃহীত হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক অসাফল্যের গৌরব সাফল্যের গৌরব অপেক্ষাও অধিক। কংগ্রেস যদি সেরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত না করেন, তবে কংগ্রেস আপনার নীতিভ্রষ্ট হইবেন।

আজ বাঙলার কংগ্রেসের দায়িত্ব অল্প নহে। কংগ্রেসকে সেই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে—সে শক্তি কংগ্রেসের আছে এবং তাহা সমগ্র জাতির সহানুভূতি ও সহযোগের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

কোন বিখ্যাত কবি বলেছিলেন—"বিধি লোথাকেই জড়িয়ে আছে আভিজাত্য।" আমার জীবনে এই সত্য অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি আমার মত ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবন অন্য কাহারও নেই।— বহুশতাব্দী আগে এক অ্যাসাইরিয়ান যোদ্ধা পরমযত্নে তা'র হীরক খচিত কবচে আমায় যুক্ত করে নেন। তারপর...দীর্ঘ বৎসর কেটেছে, হঠাৎ ভাবে কেমন করে জানিনা কিছুকাল এক সুন্দরী ইতালীয় সম্রাজ্ঞীর শিরোভূষণ হ'য়েছিলাম। সেই বৈচিত্র্য মনে হ'লে আজও আমার রোমাঞ্চ জাগে। আমার বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার তখনও অনেক বাকী ছিল, তাই এসে পড়লাম মোগল অন্তঃপুরের চোখ ঝল্‌সানো মণিমুক্তার মাঝখানে। দীর্ঘকাল সেখানেও আমি ঠাঁই পাইনি। নিউইয়র্কের একজন লক্ষপতি আমায় কিনে নিলেন। আমার দুর্ভাগ্য। পরে একজন দস্যু কর্তৃক অপহৃত হ'লাম, তারা বেচে দিল এক পারসিক বণিকের কাছে। অবশেষে ...বাংলার বিখ্যাত মণিকার "এস্‌ সরকার এণ্ড কোম্পানীর" আশ্রয়ে এসে আমার সব সৌভাগ্যের সূচনা হ'ল— আমার সকল দুঃখকষ্টের অবসানে এক অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত এখন ভরে উঠেছে।

আজ আমি এক অভিজাত কুলবধূর মনোরম বক্ষে পরমানন্দে শোভা পাচ্ছি

এস্‌. সরকার এণ্ড কোং

কল্পতরু মণিকার

১২৫ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন—বড়বাজার ৩১৪০

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।

প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য—৩৲

—প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ইহা একটি মাত্র ওষধি হইতে হোমিও ফার্মাকোপিয়া অনুসারে প্রস্তুত।

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী ঢাকা

শাখা—১২৪/২এ রসা রোড, কলিকাতা

ক'ংগ্রেস অস্থায়ী গভর্নমেণ্টে যোগদান না করার সিম্ধান্তই করিলেন। বিশ্ব-ড়ো বলিলেন,—"আমি কিন্তু কংগ্রেসের ন্ধির তারিফ করিতে পারিতেছি না। এই ভর্নমেণ্টের সদস্যের সংখ্যা নির্ধারণ এবং নোনয়ন করিতেন স্বয়ং বড়লাট; অনুমোদন রিতেন খোদ কায়েদে আজম: পরের কাঁধে ন্দুক রাখিয়া শিকারের এমন তোফা ্যবস্থাটিকে কিনা কংগ্রেস তোবা করিয়া সিলেন!"

* * * * * *

শেষের সংবাদে প্রকাশ, অস্থায়ী সরকার গঠনের পরিকল্পনা—বড়লাট ও মন্ত্রী মিশন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পরি-ত্যাগের মধ্যে "পৌষ মাস এবং সর্বনাশ" দুই-এর ছায়াই আমরা দেখিতেছি! যাহা হউক এইবারে শুনিতেছি—তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে। "এতদিনের তত্ত্বাবধানে অনভ্যস্ত সদস্যরা কি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন?"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, তিনি নাকি আজ চারিদিকে শুধু অন্ধকারই দেখিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"মহাত্মা না হইয়া তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ হইলে —"অন্ধকারে মহাঘোরে ভেংচি কাটে কে কাহারে" এর দৃশ্যটিও দেখিতে পাইতেন।

* * *

মন্ত্রী মহোদয়গণ যখন এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন—তখন তাঁহাদের পরি-চয় প্রসঙ্গে জনৈক সহযোগী আমাদিগকে

জানাইয়াছিলেন যে,—লর্ড পেথিক লরেন্স নাকি একজন পাকা পাচক। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়া—খুড়ো বলিলেন, "কাঁচা ইলিশের ঝালটা তিনি কি রকম রাঁধিবেন জানিনা, আপাতত জগাখিচুড়ি যা পরিবেশন করিয়াছেন তা কিন্তু সত্যই অখাদ্য!"

আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে শ্যামলাল একটি গল্প শুনাইল। এক ব্যক্তি নাকি স্বপ্ন দেখিতেছিল যে সে লুচি খাইতেছে। হঠাৎ জাগিয়া দেখিল লুচি নয়, বেচারী তার গায়ের ছেঁড়া কাঁথাটি চিবাইতেছে। আমাদের অবস্থাও তাই, স্বাধীনতার লুচির ভোজ ছেঁড়া কাঁথা চিবানোতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

* * *

আমেরিকাতে নাকি চৌত্রিশ মিনিটের মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের ঘর প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চৌত্রিশ মিনিটের মধ্যে "ঘর ভাঙার" দৃষ্টান্তের যেখানে অভাব নাই, সেইখানে এই কৌশল আবিষ্কার স্থানোপযোগীই হইয়াছে।

* * * * *

এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অ্যান্টনি সাহেব মন্ত্রী মিশনকে বলিয়াছেন, "সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুর পাড়ে ঘর, এখন কেন গো মামী দুধে নাই সর"—অর্থাৎ মিশন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রতি কোন সুবিবেচনা করেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা বলি—স্বখাত সলিলে না ডুবিয়া তাঁরা এখনও আসিয়া "মহামানবের সাগর তীরে" দাঁড়াইতে পারেন; কিন্তু ময়ূরপুচ্ছের মায়া কি সত্যই তাঁরা ত্যাগ করিতে পারিবেন?

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—লণ্ডনস্থ লীগের সেক্রেটারী ডাঃ আম্বেদকারকে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য মুসলমান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। "ডাঃ সাহেব কি করিবেন জানিনা, মুসলমান হইলে—হিন্দুদের ত্রিশঙ্কুর স্বর্গের অনুরূপ একটি নূতন বেহেস্ত লীগ সম্প্রদায় নিশ্চয়ই তাঁর জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন!"—কথাটা বলেন বিশুখুড়ো।

* * * * * *

জাপানের কোন কোন উৎসবে ঘোড়ার মিছিল বাহির হইত। জাপানীদের ধারণা দেবতারা নাকি সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মিছিলে যোগ দেন। বর্তমানে ঘোড়ার অভাবে সেই সব উৎসবে কাঠের ঘোড়া ব্যবহার করা হইতেছে। সংবাদদাতা এই সংবাদ পরিবেশন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন Japan's gods riding wooden horses. আমরা—জাপানের দেবতাদের চাউলের পরিবর্তে কাঁকর ভক্ষণের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম পাঁচ লক্ষ বৎসরেরও অধিক এক প্রাগৈতিহাসিক হস্তীর কঙ্কাল নাকি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"হস্তীটি নিশ্চয়ই তেলেজলে পুষ্ট একটি শ্বেতকায় হস্তী ছিল, তা না হইলে এতকাল পর্যন্ত তার হাড় টিঁকাইয়া রাখা সম্ভব হইত না।"

* * * * * * *

প্রসঙ্গত একটি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদও পাঠ করিলাম। অতঃপর শুধু শব্দ বা আওয়াজের সাহায্যে নাকি সমস্ত রোগের বীজাণু ধ্বংস সম্ভব
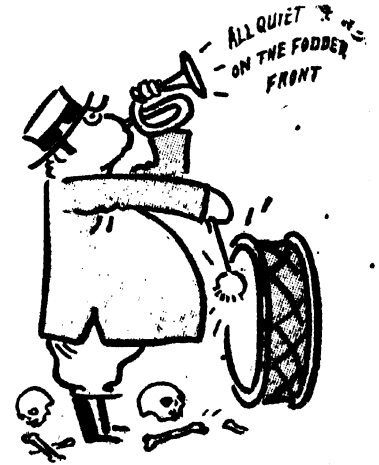
হইবে, মশা-মাছির অত্যাচার সংযত করা যাইবে, খাদ্যদ্রব্য তাজা রাখা যাইবে,—রোগ নিরাময় সহজ হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"আবিষ্কারটা মোটেই নূতন নয়, শুধু ঢক্কানিনাদের সাহায্যে খাদ্য বিতরণ, রোগ বিতাড়ন প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য বহুদিন হইতেই চলিতেছে!"

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
৫৭।১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)
কলিকাতা ফোন-বি.বি. ২৬৩৬

বাংলা সাহিত্যে অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

শ্রীপ্রভাকর গুপ্ত সম্পাদিত

১। ভাস্করের মিতালি মূল্য ১৲
২। দুয়ে একে তিন „ ১৷৷৹
৩। সুচারু মিত্রের ভুল „ ১৲
৪। দুই ধারা (যন্ত্রস্থ) „ ১৲
৫। হারাধনের দশটি ছেলে (যন্ত্রস্থ) „ ১৲

প্রত্যেকখানি বই অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

বুক সেলার্স এ্যাণ্ড পাব্লিসার্স
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৪০৫৮

টাক ও কেশ পতনের মহৌষধ

—ঃ কুঁচের তৈল ঃ—

চর্ম্ম ও কেশরোগ চিকিৎসক **ডাঃ এন সি বসু**, এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-পি-এইচ আবিষ্কৃত ও পঁচিশ বৎসর যাবৎ সহস্র সহস্র কেশরোগে পরীক্ষিত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা। ৩ শিশি ৪৲।
১নং আর জি কর রোড, শ্যামবাজার মার্কেট দোতলা, রুম নং ৫২, কলিকাতা।

শিল্পী ছবি আঁকে। বিকশিত পদ্মভরা সরোবর। পদ্মের কমনীয় পাঁপড়ি যেন স্পন্দিত হচ্ছে। সেই পদ্মের ওপর মধুমত্ত ভ্রমরের মৃদুগুঞ্জনে সংগীতের মূর্ছ্না...শিল্পীর কল্পনায় জাগে একখানি মুখ—সে মুখও তার তুলির রেখায় রূপ পায়। তবু জীবন্ত মনে হয় না সে চিত্র। শিল্পীর মন উন্মুখ হয় কিসের সন্ধানে। প্রাণে জাগে সুরভিত স্পর্শের আবেদন...শিল্পী পায় প্রেরণা। ...ছবিটি হয় নিখুঁত। শিল্প-সৃষ্টির এই প্রেরণাই আসে **শ্রীকল্যাণ** ব্যবহারে আর এর সুরভিত স্পর্শে মানুষ মাত্রই হয় মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত।

শ্রীকল্যাণ কেশ তৈল

কেশের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহায়

জেম কেমিক্যাল • কলিকাতা

—দি—

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মে মাসের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন অগ্রিম জমাসহ ও সংরক্ষিত তহবিলঃ—	৩৫,৫৮,৯০৮
নগদ কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদিঃ—	২,৩৮,৬৭,১৭৩
আমানতঃ—	৪,৫৭,৩০,২৪৪
কার্য্যকরী মূলধনঃ—	৫,৩১,১২,৭৯৭

গদ্য কবিতা

নীচে পৃথিবী— উপরে স্বর্গ, মাঝখানে আকাশমণ্ডল বা অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষ স্বর্গ ও মর্তের 'নোম্যান্স ল্যান্ড।' এখানে স্বর্গের বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং পৃথিবীর ধূলিকণা ও জলের শীকর মিলিত হইয়াছে। এখানে স্বর্গের হাত ও পৃথিবীর হাত মিলিত হইয়া নিরন্তর করমর্দন চলিতেছে। অন্তরীক্ষমণ্ডল স্বর্গও নয়, মর্তও নয়—কিন্তু তবুও যেন উভয়েরই। এই জগতের অধিবাসী ত্রিশঙ্কু-রাজ—সে স্বর্গ মর্তের মধ্যে অক্ষয় 'হাইফেনের' মতো বিরাজমান—নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সে স্বর্গ-মর্তকে নিত্যসংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মর্তকে যদি বলা যায় গদ্য আর স্বর্গকে যদি বলা যায় পদ্য—তবে এই অন্তরীক্ষমণ্ডল হইতেছে গদ্য কবিতার জগৎ—আর রাজা ত্রিশঙ্কু গদ্য কবিতার জগতের আদিমতম অধিবাসী।

স্বর্গ অনাদ্যন্ত কাল হইতে আছে, পৃথিবীও বহুকালের; স্বর্গ স্ব-সৃষ্ট, পৃথিবী কালের গতিকে সৃষ্ট হইয়াছে। পদ্য সৃষ্টি-পূর্বকাল হইতেই আছে; বেদ অপৌরুষেয়—সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যই এক হিসাবে অপৌরুষেয়। গদ্য যে শুধু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের তাহা নয়, তাহা মানবের সৃষ্টি, এবং মানবের প্রধান অবলম্বন। তবে গদ্য কবিতার জগৎ কি? তাহার প্রকৃতি কি? অন্তরীক্ষমণ্ডল অপেক্ষাকৃত হালের সৃষ্টি আর তাহার নিঃসপত্ন অধিবাসী ত্রিশঙ্কু তো পৌরাণিক আমলের ব্যক্তি।

গদ্য কবিতা হালের সৃষ্টি। হোমার পদ্য লিখিয়াছেন—গদ্য লিখিবার কল্পনাও মহা-কাল্পনিক কবিগুরুর মাথায় ছিল না। দান্তে গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখিয়াছেন। গ্যয়টে গদ্য ও পদ্য দুইই লিখিয়াছেন—কিন্তু গদ্যের পরিমাণই যেন অধিক। তাঁহাকে গদ্য কবিতা লিখিবার প্রস্তাব করিলে কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন না, একবার অন্তত ভাবিয়া দেখিতেন। গ্যয়টে আধুনিক মানুষ ছিলেন।

হোমারের কাব্য-স্বর্গের অধিবাসী কে? চির প্রফুল্ল কৌতুকময় অমরবৃন্দ। তাঁহার কাব্যে অবশ্য মানুষও আছে—কিন্তু আমাদের মতো দিনমজুর-খাটা মানবকের চেয়ে দেবতাদের সঙ্গেই যেন তাহাদের অধিকতর ঐক্য। সুরা-নীল সিন্ধুর উপকূলে তাহাদের বাস; স্বর্ণপাত্রে অগ্নিবর্ণ মদিরা তাহাদের পানীয়; গুরুভার লৌহচক্র অনায়াসে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের ক্রীড়া; কমল-উন্মীল উষাকালে রাজকুমারী নীল সমুদ্রের কূলে বসিয়া বস্ত্র

ধৌত করিলেও তাহাকে মানবী বলিয়া মনে হয় না; হোমারের উদার হাসি স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায় সমস্ত কাব্যখানিকে প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা কি মানব? ইহারা দেবতা-ই। আবার দান্তে-র De Monarchia-র গদ্য জগৎ অবশ্যই মানবের দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে আধুনিক মানবের মূলগত একটা পার্থক্য আছে। দান্তের মানুষ লক্ষ্য-সচেতন—যদিচ সে লক্ষ্য মধ্যযুগের মঠ-মন্দিরের অভিমুখী। তাহার লক্ষ্য সংকীর্ণ হইতে পারে—কিন্তু তবুও তাহার অস্তিত্ব আছে। আধুনিকের মতো সে বিভ্রান্ত নয়।

গ্যয়টে গদ্য কবিতা লিখিলে লিখিতে পারিতেন বলিয়াছি। তাঁহার ফাউস্ট প্রথম আধুনিক মানব; সে মহাশক্তিমান কিন্তু মহা-বিভ্রান্ত; যদিচ সে পদ্য জগতে বিরাজ করিতেছে কিন্তু তাহাকে গদ্য কবিতার জগতে বেমানান হইত না। তাহার অন্তরের সংশয়ের কুয়াশার উপাদানেই যে গদ্য কবিতার জগৎ প্রস্তুত। আগেই বলিয়াছি, অন্তরীক্ষমণ্ডল গদ্য কবিতার জগৎ; ইহার অধিবাসী ত্রিশঙ্কু; আধুনিক মানব গদ্য কবিতার জগতের অধিবাসী; আমরা সকলেই ত্রিশঙ্কু—ত্রিশঙ্কু আর একটিমাত্র নয়—দুইশত কোটি ত্রিশঙ্কু অর্ধ বিশ্বাসের সংশয় কুয়াশাবিজড়িত অন্তরীক্ষে পরস্পরের নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দোদুল্যমান। তাহারা না স্বর্গের, না মর্ত্যের; পায়ের তলায় তাহাদের কঠিন মৃত্তিকাও নাই, আবার স্বর্গের অমৃতপাত্রও তাহাদের করায়ত্ত হইল না—তাহারা মর্তের কৃপার পাত্র আর স্বর্গের কৌতুক। গদ্য কবিতার জগতের স্বরূপ শ্রেষ্ঠ গদ্য কাব্য স্রস্টার রচনাতেই প্রসঙ্গান্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

"নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হ'য়ে এই মহা অন্ধকার লোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্নমতন
নভস্তল— * * *
স্বর্গের পদ্যের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী।"

আধুনিক জগতের আমরা এখান হইতে কি দেখিতেছি?

"নিত্য নন্দন আলোক
দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্র সনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষা জর্জরিত
আমাদের নেত্র হ'তে।"

হোমারের কাব্যের অধিবাসীদের দেখিয়া, কালিদাসের কাব্যের অধিবাসীদের দেখিয়া—ঠিক এই ভাবটিই কি আমাদের মনে জাগ্রত হয় না? 'সুরা-নীল' সিন্ধুতীরের মানবদের 'স্বর্ণপাত্রে মদিরাপান কি আমাদের মনে অসূয়া জাগাইয়া দেয় না? আধুনিকী শকুন্তলাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কাঁটায় আঁচলখানা বাধিয়া যাইবার সুযোগ পর্যন্ত নাই পথ যে পীচ দিয়া বাঁধানো; বাগানের কাঁটা মালীর সতর্ক হস্তে উৎপাটিত। রাজচিত্রশালে চতুরিকার কৌশলে আবদ্ধ হইবার অবসর কোথায়? সেখানে যে টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়। একালের দুষ্মন্তগণ 'আনাকরথবর্ত্মণ' নয়—বিরহের প্রচণ্ডতম ধাক্কাও তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বিলাতি হোটেলের চেয়ে দূরতর স্থানে লইয়া যাইতে অক্ষম। তাই আমরা হোমার-কালিদাসের জগতের দিকে 'ঈর্ষা-জর্জরিত নেত্রে' তাকাইয়া থাকি আর মনের ক্ষোভে বলি ওসব 'রিয়াল' নয়, ওসব 'এস্কেপিজম'; যেন একমাত্র আমরাই সত্যের সংবাদ অবগত। বাস্তব ঘাড়ের উপরে বাঘের মতো আসিয়া পড়িয়াছে কাজেই লড়াইয়ের ভান না করিয়া আর উপায় কি?

আর গদ্য কবিতার জগৎ হইতে মর্ত্যের গদ্যলোকের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—

"নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হ'তে শুনা যায়।"

মর্ত্যের প্রাত্যহিক জগতের সংবাদ আছে ছড়ায়, পাঁচালীতে, লোক-সঙ্গীতে, লোক-সাহিত্যে, ময়মনসিংহ গীতিকায়—আধুনিকগণ যাহাকে বলে গণ-সাহিত্য। এই মর্ত্যজীবন হইতেও আমরা নির্বাসিত, তাই গণ-সাহিত্যের কোন প্রতিনিধি দেখিলেই আমাদের মন প্রবাসীর ব্যাকুলতায় বলিয়া ওঠে—

"ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগাদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের, গন্ধ, ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহুদিন রজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভ রাশি।"

কালিদাসের কাব্যজগৎ হইতে যেমন আমরা নির্বাসিত, ময়মনসিংহ গীতিকার লোক-সঙ্গীতের রাজ্য হইতেও আমরা তেমনি নির্বাসিত। আমাদের কাছে দুই-ই সমান 'আনরিয়াল'—লোক সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি

এক্সেকেপিজম্-এর এক নূতন প্রকারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কালিদাসের কাব্যের প্রতি আসক্তি যদি সূক্ষ্ম বিলাস হয়—গণ-সাহিত্যের আসক্তি স্থূল বিলাস ছাড়া আর কি? কারণ আমরা এই দুই জগৎ হইতেই সমানভাবে বিচ্ছিন্ন!

আমরা যে জগতের অধিবাসী তাহার নাম বায়ুমণ্ডল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, অর্ধ বিশ্বাস, খণ্ড-দৃষ্টি এবং নাস্তিক্যের উপাদানে ইহা রচিত। নাস্তিকতার এই জগতের যথার্থ নকীব গদ্য কবিতা। পদ্যের অসংশয় ছন্দ এবং গদ্যের নিশ্চিত প্রাঞ্জলতা, পদ্যের ঊর্ধ্বাশয়তা এবং গদ্যের স্বপ্রতিষ্ঠ স্থানুতা কিছুই ইহাতে নাই। সংশয় সাগরোত্থিত মেঘমালার মতো এই গদ্য কবিতা কোন্ নিরুদ্দিষ্ট শৈলমালার অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে! বৃষ্টিতে ইহার পরিণাম, না ঝটিকায় ইহার অবসান, না, নূতন ঊষার ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক আগেই ইহার নিঃশেষ অবলুপ্তি! এই তো গদ্য কবিতা। কিন্তু শুধু গদ্য কবিতাই বা বলি কেন? এ যুগের সব কবিতাই কি গদ্য কবিতা নয়?

স্রেফ হাসি—শ্রীবিমল দত্ত প্রণীত। চারু সাহিত্য কুটীর, ১৯২।২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বইখানা কতকগুলি হাসির গল্পের সমষ্টি। ভুলের দেশে ভুলো বাবু, পণ্ডুনাথের পলিসি, ব্যাকরণবাগীশের বেড়ান, বাঁদরের ব্রেন। আত্মারামের আত্মহত্যা প্রভৃতি গল্প শিশুদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিবে। শিশু সাহিত্য রচনা কঠিন কাজ; হাস্যরসমধুর শিশু সাহিত্য রচনা ততোধিক কঠিন। এই কাজে বিমল বাবুর যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় এই বইয়ে প্রকাশ পাইয়াছে।

১০৮।৪৬

FORWARD—Deshbandhu Number :—মূল্য ছয় আনা।

দেশবন্ধুর একবিংশতি মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ফরোয়ার্ডের দেশবন্ধু বিশেষ সংখ্যাখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ডাঃ যদুগোপাল মুখার্জি, কিরণশঙ্কর রায়, টি সি গোস্বামী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ প্রমুখ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের রচনাবলীতে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া দেশবন্ধুর বক্তৃতাবলী হইতে বহু সময়োপযোগী অংশ উদ্ধৃত করিয়া সংখ্যাখানার গৌরব ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশবন্ধুকে বুঝিবার ও তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক উপকরণ এই সংখ্যার মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে। ১২৫।৪৬।

কথা চয়ন—সম্পাদক শ্রীরঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়, ১২, হরীতকী লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

বিভিন্ন কথাশিল্পীর মোট দশটি গল্প এই 'কথা চয়নে' চয়ন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অনাদি যুগের হাওয়া, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাষাণী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুই বোন এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানা হীরে—এই কয়টি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, হাসিরাশি দেবী এই কয়জনের রচনাও ভাল লাগিয়াছে। সম্পাদনা নিতান্ত মামুলী ধরণের হইলেও, দশজন বিভিন্ন লেখকের দশটি নূতন রচনা একত্রে গ্রথিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ। মুদ্রণ ভাল নহে, কিন্তু প্রচ্ছদপট সুন্দর। ৮৯।৪৬

স্বামী রামতীর্থ—শ্রীশ্রীমৎস্বামী নিত্যকৃষ্ণানন্দ অবধূত প্রণীত। নিত্যানারায়ণ মঠ, পোঃ কর্মমঠ, ত্রিপুরা। মূল্য দেড় টাকা।

স্বামী রামতীর্থ পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরাণওয়ালা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভান্তর প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও ভাগবতজীবন যাপন করিতে থাকেন। বিদেশের নানা স্থানে তিনি নানাভাবে ভারতীয় প্রাণধর্ম প্রচার করেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার সাধনাপূত জীবনের অমৃত কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে স্বামীজীর উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। জীবন ও চরিত্র গঠনে এই সকল উপদেশ যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১২০।৪৬

উপদেশমালা—শ্রীশ্রীমৎস্বামী নিত্যকৃষ্ণানন্দ অবধূত প্রণীত। নিত্যানারায়ণ মঠ, পোঃ কর্মমঠ, ত্রিপুরা। মূল্য আট আনা।

জীবন ও চরিত্র গঠনপূর্বক অধ্যাত্ম জগতে উন্নতি লাভ করত ভূমার সান্নিধ্য প্রাপ্তির উপযোগী উপদেশাবলী সনাতন ধর্মভাণ্ডারে অফুরন্ত। আলোচ্য পুস্তিকায় তাহারই কতকগুলি চয়ন করা হইয়াছে। পুস্তিকাখানা হিন্দু যুবকবৃন্দের অবশ্য পাঠ্য। ১১৭।৪৬

সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম এ। কমলা পাবলিসিং হাউস, ৮।১এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের ছয়টি গল্পের বঙ্গানুবাদ। প্রত্যেকটি গল্পই বিশ্বসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। এইগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকদের উহাদের রস গ্রহণের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, এজন্য অনুবাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। এখানা প্রথম খণ্ড। আশাকরি অন্যান্য খণ্ডও যথাকালে অনুদিত ও প্রকাশিত হইবে। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম এবং বহিরাবয়ব মনোরম। ১০৯।৪৬

বর্ণাশ্রম—শ্রীপ্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী প্রণীত। প্রথম খণ্ড। প্রাপ্তি স্থান—ক্লাসিক পাবলিসার্স, ২-সি, কালীঘাট পার্ক, সাউথ।

লেখক বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে উদারমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে সকলেই আমরা এক মায়ের সন্তান। লেখা মানবতার আন্তরিকতায় পূর্ণ।

রুদ্রবীণা—সাধনা বসু ও প্রতিমা বসু সম্পাদিত। প্রকাশক—বুক হাউস, ২৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল গান দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছে তাহারই একশতটি গান আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে—ভূমিকায় সম্পাদিকাদ্বয় ইহাই জানাইয়াছেন। বাঙলার স্বদেশী গানের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক একটি সংকলন-গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। যে ক'খানি বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। 'রুদ্রবীণা' গ্রন্থটি স্বদেশী গানের অসম্পূর্ণ সংকলন গ্রন্থ হইলেও সম্পাদিকাদ্বয় বহু যত্ন সহকারে ও শ্রম স্বীকার করিয়া এমন অনেক জনপ্রিয় ও দুষ্প্রাপ্য স্বদেশী গান সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা অন্যান্য সংকলন গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুকুন্দ দাসের ৫ খানি গান। দু একটি ত্রুটি চোখে পড়িল, দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি সিনেমা সংগীত স্বদেশী সংগীতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র অনুভূতি লইয়া যে সকল সংগীত গীতকারেরা রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সংগীতের সহিত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক যোগসূত্র রহিয়াছে এবং যে সকল গান স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর অন্তরে আশা ও উদ্দীপনা যোগাইয়াছে সেই সকল সংগীতই স্বদেশী গানরূপে প্রচলিত। আলোচ্য গ্রন্থে এমন অনেক গান ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে যাহা নিতান্তই অবান্তর, স্বদেশী গানের সহিত এক গোত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় ও উদ্দীপনাময়ী বহু স্বদেশী গানের মধ্যে মাত্র একটি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে যে ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ছয়টি ও কাজি নজরুল ইসলামের সাতটি গান সংকলিত হইয়াছে প্রত্যেক গীতকারের গান বিক্ষিপ্তভাবে না দিয়া পর পর সাজাইয়া দিলে পাঠকদের পক্ষে সুবিধা হইত। "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি" গানটি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত নহে ইহা হরিদাস হালদারের রচনা। বইখানি সুদৃশ্য মসৃণ কাগজে মুদ্রিত, বাঁধাই উৎকৃষ্ট ও প্রচ্ছদপট চিত্র সুরুচির পরিচায়ক।

স্বদেশী গান (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীঅনাথনাথ বসু সংকলিত। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ, ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য ৷৷০

প্রথম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। স্বল্প পরিসরের মধ্যে চল্লিশটি গান একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে কয়খানি গান প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সবগুলিই জনপ্রিয় ও সুপরিচিত। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

দেশের কথা

(১০ই আষাঢ়—১৬ই আষাঢ়)

কংগ্রেস ও শাসন-পদ্ধতি রচনা-সমিতি—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—বড়লাটের শাসন পরিষদ—মিষ্টার জিন্নার আক্রোশ ও অভিযোগ—আমেরিকার দুর্ভিক্ষ মিশন—পোষ্ট কার্ডের মূল্য হ্রাস—শিখদিগের সংকল্প—দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনীভূত—মহাত্মাজীর ট্রেননাশের চেষ্টা—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা।

কংগ্রেস ও শাসন-পদ্ধতি রচনা সমিতি— কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি • বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি রচনা সমিতিতে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ পত্রে লর্ড ওয়াভেলকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, মিশনের যে প্রস্তাব ভিত্তি করিয়া এই সমিতি গঠিত হইবে, তাহার তিনটি অংশ সম্বন্ধে কংগ্রেস স্বীয় মতে অবিচলিতঃ—

(১) সমিতির সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে

(২) প্রস্তাবানুযায়ী প্রদেশ সংঘ গঠন বাধ্যতামূলক নহে

(৩) সমিতির সদস্য নির্বাচনে য়ুরোপীয়-দিগের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

অনেকের বিশ্বাস, সমিতিতে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেস রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ কাজ করিয়াছেন। ইহার ফলেই ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি রচনা, হয় কংগ্রেসের মতানুযায়ী করিতে বৃটিশ সরকার বাধ্য হইবেঃ—নহে ত যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য হইবে, তাহাতে বিপ্লব অনিবার্য হইবে। তাঁহাদিগের মতে কংগ্রেসের এই কার্যে কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ মিশনের ও বড়লাটের সংঘর্ষে কংগ্রেসের জয় হইয়াছে। অতঃপর কংগ্রেসকে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করিয়া সমিতিতে আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি— জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা ও অনুমোদন হইবে। বলা বাহুল্য, কমিটির এই অধিবেশন অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ, কংগ্রেসের এক সম্প্রদায়—বিশেষ অগ্রপন্থীরা মিশনের সমিতি গঠন প্রস্তাবের বিরোধী। শিখ সম্প্রদায়ের আপত্তিও কংগ্রেসকে বিবেচনা করিতে হইবে।

বড়লাটের শাসন পরিষদ— বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত করিয়া তাহাকে "অন্তর্বর্তী সরকার" নামে অভিহিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, কংগ্রেস মিশনের ও বড়লাটের প্রদত্ত সর্তে শাসন পরিষদে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং মিশন ও বড়লাট বুঝিয়াছেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা বাতুলের কল্পনা। তাঁহারা বলিতেছেন, এখন কয় মাসের আলোচনায় সকল পক্ষই শ্রান্ত। সুতরাং গণপরিষদে সদস্য নির্বাচন শেষ হইলে তাঁহারা আবার শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত করিবার কার্যে মনোযোগ দিবেন। আপাতত সরকারী কর্মচারী কয় জনকে লইয়াই পরিষদ রচনা করিয়া কার্য পরিচালনা করা হইবে।

বর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার পাইবেন—

স্যার ক্লড অচিনলেক (সমর)

স্যার গুরুনাথ বেউর (বাণিজ্য ও কমনওয়েলথ সম্বন্ধ)

স্যার এরিক কোটস (অর্থ)

স্যার এরিক কর্নাণ স্মিথ (সামরিক যানবাহন, রেল, ডাক ও বিমান)

স্যার রবার্ট হাচিংস (খাদ্য ও কৃষি)

স্যার আকবর হায়দারী (শ্রম, স্বাস্থ্য, খনি—ইত্যাদি)

স্যার জর্জ স্পেন্স (আইন ও শিক্ষা)

মিস্টার ওয়াক (স্বরাষ্ট্র, শিল্প, সরবরাহ)

মিষ্টার জিন্নার আক্রোশ ও অভিযোগ— কংগ্রেস বড়লাটের পুনর্গঠিত শাসন পরিষদে যোগ দিতে অসম্মত হওয়ায় মিস্টার জিন্না মনে করিয়াছিলেন—কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই পরিষদ গঠন করা হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়ায় তিনি বলেন—বড়লাট হয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়া পরিষদ গঠিত করুন, নহে ত গণ-পরিষদে সদস্য নির্বাচন স্থগিত রাখুন। বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তিনি বলিয়াছেন, মিশন ও বড়লাট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বড়লাট তাঁহাকে প্রথমাবধি আশ্বাস দিয়াছিলেন—১২ জনে শাসন পরিষদ গঠিত হইবে এবং তাহাতে কংগ্রেসের ৫ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, শিখ একজন ও অন্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের একজন সদস্য থাকিবেন। লর্ড ওয়াভেল উত্তর দিয়াছেন, তিনি কখনও ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তবে তাঁহার মনে ঐরূপ পরিকল্পনাই ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, তিনি কিরূপে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সহিত তুল্যাসন দিতে চাহিয়াছিলেন?

এদিকে তপশীলী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ডক্টর আম্বেদকার বলেন, বড়লাট তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, পুনর্গঠিত শাসন পরিষদে তপশীলী সম্প্রদায়ের ২ জন সদস্য গ্রহণ করা হইবে! ডক্টর আম্বেদকারের অভিযোগের কোন উত্তর বড়লাট দেন নাই। তিনি কি সত্যই ডক্টর আম্বেদকারকে ঐরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন?

আমেরিকার দুর্ভিক্ষ মিশন— এদেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়জন আসিয়াছেন। প্রধানত কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই এই মিশন এদেশে আসিয়াছেন। মার্কিনের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নির্দেশে মিস্টার হুভার ইতঃপূর্বে এদেশের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে আমরা যে সাহায্য পাইতেছি, তাহা আমাদিগের অভাবের ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে।

পোষ্ট কার্ডের মূল্য হ্রাস— এতদিনে পোস্ট কার্ডের মূল্য হ্রাস কার্যে পরিণত করা হইল। ইহাতে যে এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনীভূত— ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনীভূতই হইতেছে। সরকারেরর পক্ষ হইতে যত বিবৃতি প্রচার হইতেছে, তত খাদ্যদ্রব্য প্রদান হইতেছে না। নানাস্থান হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যথাকালে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যক চেষ্টা হইলে কখনই এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারিত না।

মহাত্মা গান্ধীর ট্রেননাশের চেষ্টা— গত ২৯শে জুন মহাত্মা গান্ধী যে স্পেশ্যাল ট্রেনে বোম্বাই হইতে পুণায় যাইতেছিলেন, পুণা হইতে প্রায় ৬৮ মাইল দূরে রেলপথের উপর পাথর ফেলিয়া তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা হয়! যিনি অহিংসার প্রতীক ও প্রচারক তাঁহাকে এইরূপে হত্যা করিবার চেষ্টা কিরূপ হীনতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। বোম্বাই-এর 'মর্নিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র বলিয়াছেন—রাজনীতিক কারণে হত্যার এই হীন চেষ্টা বোম্বাই হইতে যে ব্যক্তির দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইয়াছিল, সে তাঁহার গতিবিধি ও ট্রেনের সময় সবই অবগত ছিল। মহাত্মাজীর ট্রেন ঐস্থানে উপনীত হইবার ৩২ মিনিট মাত্র পূর্বে আর একখানি ট্রেন নির্বিঘ্নে ঐ পথ অতিবাহিত করিয়াছিল। কাজেই তাহার পরে পথের উপর পাথর রক্ষিত হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে মহাত্মাজী আহতও হন নাই।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা— রথযাত্রার সময় আমেদাবাদে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহা ভয়াবহ। পুলিশকে বার বার গুলী চালাইতে হইয়াছে। ৩রা জুলাই যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে হতের সংখ্যা ৩৩ জন—আহতের সংখ্যা ২৫০।—যাহারা এই সকল হাঙ্গামার সৃষ্টি করে, তাহারা কেবল এদেশের নহে—সমগ্র সভ্যসমাজের শত্রু।

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক
"দেশ"
প্রতি সংখ্যা চারি আনা
বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹
ঠিকানাঃ ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিমিরবরণ ও সম্প্রদায়

গত সপ্তাহে বহুকাল পর বিখ্যাত সুর-শিল্পী তিমিরবরণ একটি নাচের আসরের অনুষ্ঠান করেন নিউ এম্পায়ারে। সূচীর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ'; এর সঙ্গে ছিল খুচরো কতকগুলি নাচ—লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রকৃতির অভিশাপ, লোকনৃত্য, গীতোপদেশ, গুজরাটি লোকনৃত্য, তিন ধীবর, রাজপুত যোদ্ধ-নৃত্য, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন পিনাকী, অনাদি, ঘনশ্যাম, মেনন, দীপ্তেন্দু, লীণা সেনগুপ্ত, লিলি দাশগুপ্ত, দীপ্তি ঘোষ, বীথি বসু, মিনু সেনগুপ্ত, জয়া, চন্দ্রা, রুণু, সীতা মিত্র, বেণু রাউথ প্রভৃতি; আর সঙ্গীত পরিচালনা করেন অমিয়কান্তি—খুচরো নাচ এবং নৃত্যনাট্য, সবেরেই সুরযোজনা ক'রেছেন তিমিরবরণ।

খুচরো নাচগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত উপভোগ্য হ'য়েছিল। নৃত্যের পরিকল্পনা, সাজপোষাক ও সর্বোপরি শিল্পীদের নৃত্য-কৌশল আসরকে মাতিয়ে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল; প্রত্যেককেই পাকা শিল্পী ব'লে আখ্যাত করা যায়, তবুও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দীপ্তি ঘোষ, লীনা সেনগুপ্ত, লিলি, মিনু, অনাদি, পিনাকী, ঘনশ্যাম ও মেনন—যে কোন আসরে প্রশংসা পাবার মত যোগ্যতা এ'রা দেখিয়েছেন। এই নৃত্যগুলির সুর অধিকাংশ তিমিরের পুরণো রচনা, তবে অনুপভোগ্য হয়নি। প্রধান আকর্ষণ 'আলাদীন'কে কিন্তু এতখানি প্রশংসা করা গেল না। ওটা না নৃত্যনাট্য, না গীতিনাট্য আবার না মূক-নাট্য। শিল্পী ওপরের নামকরা সকলেই এতে আছেন, সাজপোষাকও হ'য়েছে সুন্দর; কিন্তু নাট্যবিন্যাস ও নৃত্য-পরিকল্পনা মোটেই দনদার হয়নি। সুরের জন্য তিমিরবরণ অবশ্যই প্রশংসা পাবেন এবং আজও যে তিনি সুর-স্রষ্টাদের অগ্রগণ্য, তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। যাই হোক, বহুকাল পরে সত্যি উঁচুদরের নাচ পরিবেশন করার জন্যে প্রযোজক তিমিরবরণ ধন্যবাদার্হ।

কুরুক্ষেত্র (ইউনিটি প্রডাকসন্স)—কাহিনীঃ কমলাকান্ত বর্মা; গান ঃ জামিল মজাহারি; পরিচালনা ঃ রামেশ্বর শর্মা; আলোকচিত্র ঃ জি কে মেহ্‌তা; শব্দ-যোজনাঃ মান্না লাডিয়া; সুরযোজনা ঃ গণপৎ রাও; দৃশ্যসজ্জা ঃ চারু রায়; ভূমিকায়ঃ সায়গল, শ্যামলী, নবাব, উধোদিয়া, বিমান, রাধারাণী প্রভৃতি।

এম্পায়ার টকীর পরিবেশনে ২২শে জুন থেকে মিনার্ভায় দেখানো হ'চ্ছে।

কিম্ভূতকিমাকার বলতে যা বোঝায় 'কুরুক্ষেত্র' হচ্ছে একেবারে তাই। কি যে গল্প কিছুই বুঝতে পারলুম না। দেখলুম

শুধু অর্ধোন্মাদ কতকগুলো চরিত্র, কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক; কাহিনীর মধ্যে কার কোথায় প্রয়োজন কিছুতেই ধরতে পারলুম না। মোটামুটি এই বুঝলুম যে 'কুরুক্ষেত্র' নামে একখানি ছবি তোলা হচ্ছিল এবং ছবিখানি যখন অর্ধপথে তখন তার নায়িকা দেশের

'পূজারী' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় মমতাজ শান্তি

দুর্ভিক্ষে বিচলিত হয়ে ছবি ছেড়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং আত্মত্যাগের চরম দেখায় নিজেকে লটারী-বৌরূপে দাঁড় করিয়ে।

ছবিখানি সমালোচনার অযোগ্য। খ্যাতনামা নেতাদের তারিফ ছাপিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টাটা সত্যিই নিন্দনীয়—এটাকে সোজা বাঙলায় জোচ্চুরি বলা যায়। আবার নেতাদেরও বলি, তারা সৌজন্যের খাতিরে পড়েও এইভাবে সার্টিফিকেট বিলিয়ে ছবি সম্পর্কে তাদের পাথুরে অজ্ঞতা অমনভাবে না প্রকাশ করলেই ভাল করবেন।

পূজারী (আরদেশর ইরাণী)—কাহিনী, সংলাপঃ ওয়ালি; গানঃ ওয়ালি ও পণ্ডিত ইন্দ্র; পরিচালনাঃ অসপি; আলোকচিত্রঃ আর এম রেলে; শব্দযোজনাঃ শোরাব ইরাণি ও এইচ ডি মিস্ত্রী; সুরযোজনাঃ হন্সরাজ বহেল; ভূমিকায়—মমতাজ শান্তি, বিপিন গুপ্ত, মাসুদ, মুস্তাফা, পি ডি লাল, যশোবন্ত দাভে, অনিতা শর্মা প্রভৃতি।

মানসাটার পরিবেশনে ২৮শে জুন জ্যোতি ও গণেশে মুক্তিলাভ করেছে।

এক পূজারী আর তার মেয়ে পূর্ণিমাকে নিয়ে কাহিনী। পূজারী পূর্ণিমাকে দেবতার অর্ঘ্যরূপেই পালন করতে থাকে—নৃত্যে-গীতে পূর্ণিমা দেবতার আরাধনা করে। একদা এক যোগী পূর্ণিমার নৃত্যে প্রসন্ন হয়ে বর দেয় যে সে রাজরাণী হবে। পূজারী না চাইলেও পূর্ণিমা শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে রাজরাণীই হলো এবং প্রাসাদে চলে গেল। পূজারী পূর্ণিমাকে মন্দিরে আসতে নিষেধ করে দিলে এবং অপর দিকে মরণব্রত গ্রহণ করলে। পূজারীর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ স্বর্গ থেকে লক্ষণকে পাঠিয়ে দিলে পূর্ণিমার বেশে মন্দিরে নাচবার জন্য; ওদিকে মন্দিরে পূর্ণিমা নাচচে শুনে রাজা পূর্ণিমাকে চিতারোহণের আদেশ দিলে—নারায়ণ রাজার বেশে পূর্ণিমাকে প্রতিরোধ করলে। ভগবানের এই লীলা প্রকাশ হতে দেরী হলো না এবং তারপর রাজ্যময় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

দেশের এই আমূল তোলপাড়ের পরেও এবং ভারতের এই নবজাগরণের দিনে কারুর কল্পনায় এ ধরণের কাহিনী ঠাঁই পেতে পারে আমাদের কল্পনাতীত। লোকেও যে এসব বরদাস্ত করতে পারে আমরা বিশ্বাস করি না। এই টানাটানির দিনে এমনিভাবে কাঁচামাল ও পয়সা অপব্যয় করার বিরুদ্ধে আইন থাকা উচিত। তাও তারিফ করার মত কিছু থাকলে একটু আশ্বস্ত হওয়া যেতো; সেদিক দিয়েও রম্ভা। জমকালো দৃশ্যসজ্জাদিতে খরচও বড় কম হয়নি। স্রেফ মমতাজ শান্তির নাম ভাঙিয়ে ছবিখানি চালাবার চেষ্টা ছাড়া প্রযোজকের আর কোনদিকে দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। আর পরিচালনা!—বাজখাঁই স্বর-ওয়ালা বিপিন গুপ্তকে মনে পড়ে তো?—বাঙলা মঞ্চের সেই উঠতী অভিনয়শিল্পী—তার মুখেও গান জুড়ে দেওয়া থেকে পরিচালকের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—নয়তো পূজারীর ভূমিকায় বিপিনের অভিনয় নিন্দনীয় হয়নি। আর যার নাম ভাঙিয়ে ছবিখানি চালাবার এত আয়োজন সেই মমতাজ শান্তি কিন্তু দর্শকদের নিরাশ করবে, তবে সেটা কার দোষ বলা শক্ত।

বেগম (তাজমহল পিকচার্স)—কাহিনী, সংলাপঃ এস এইচ মণ্টো, পরিচালনাঃ সুশীল মজুমদার; আলোকচিত্রঃ কে এইচ কাপাদিয়া, শব্দযোজনাঃ জে বি জগতাপ, সুরযোজনাঃ হরিপ্রসন্ন দাশ, দৃশ্যসজ্জাঃ রতীন ঠাকুর; ভূমিকায়—অশোককুমার, নসীম, ভি এইচ দেশাই, প্রভা প্রভৃতি।

কাপুরচাঁদের পরিবেশনায় ২১শে জুন প্যারাডাইস, দীপক, ছায়া, আলেয়া ও পার্ক-শোতে মুক্তিলাভ করেছে।

'বেগম' তোলা আরম্ভ হওয়া থেকেই ছবিখানি সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে এসেছিলুম। আর তাছাড়া, ফিল্মিস্তানের শত

স্টুডিওতে তোলা ছবি, অশোককুমার-নসীম রয়েছে প্রধান ভূমিকায়, তাই আশা ছিল পরিচালক সুশীল মজুমদার এবার বোধহয় ছবির মত ছবি একখানা উপহার দেবেন। কারণ এমন যোগাযোগ সব পরিচালকের ভাগ্যে জোটে না। ছবিখানি দেখে নিরাশ তো হয়েছিই উপরন্তু সুশীল মজুমদারের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের মনে দস্তুরমত সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। খরচের দিক থেকে কোন কার্পণ্য দেখা গেল না, সময়ও বৎসরাধিককাল নেওয়া হয়েছে তার ওপর তারকা ও কলা-কুশলীও প্রথম পর্যায়ের, তবুও ছবি ভাল না হলে কি মনে হয়?

'বেগম'-এর কাহিনীটি দুর্বল; অসাধারণ কিছু দেখাতে গিয়ে উদ্ভট দাঁড়িয়ে গেছে। নায়ক সাগর নামকরা শিল্পী। কাশ্মীরে গিয়ে পাহাড়ী মেয়ে বেগমার রূপে মুগ্ধ হয়; তাকে মডেল রেখে একখানা ছবি আঁকতে থাকে এবং ক্রমে তার প্রেমে পড়ে যায়। বেগমকে নিয়ে সাগর স্থানান্তরে চলে যায় কিন্তু সেখানে তার এক ভক্ত, মীনা, তার হুঁস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের কলাচর্চায় সাগর এমনিই ডুবে যায় যে বেগমের প্রতিও আর তার দৃষ্টি পড়ে না। বেগম ক্ষুব্ধ হলো, তার পরই মানসিক সংঘাত যার ফলে সাগর ও বেগমের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সাগরকে কাছে টেনে নিলে মীনা। তারপর অনেক দিন হয়ে গেছে। বেগম সাগরের পিতার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে; সাগরের কোন খোঁজ নেই। শেষে সাগরকে খুঁজে বের করার একটা পথ বের করা হলো—'জীবন-মৃত্যু ও রূপ' সম্পর্কে ছবির একটা প্রতিযোগিতা ঘোষণা হলো—সাগরের শ্রেষ্ঠ ছবিখানি নিয়ে এল মীনা; বেগম ছবি দেখে চিনতে পারলে কিন্তু মীনার কাছে সাগরের খোঁজ পেলে না। ঘটনাচক্রে সাগর বেগমের বাড়িতে আবির্ভূত

য়, তখন সে অন্ধ। পরিচয় গোপন করতে নইলেও পারলে না। বেগমের তত্ত্বাবধানে সাগর চোখ ফিরে পেলে। কিন্তু সমস্যা হলো নসীমা তার বিবাহিতা পত্নী অথচ সে ভালবাসে বেগমকে। সে কথা জেনে বেগমই তার উপায় বের করলে—ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় অভিনয় করতে বিষাক্ত সাপের দংশন নিয়ে আত্মহত্যা করলে এবং সাগরকে নসীমারই হাতে সঁপে দিয়ে গেল।

কাহিনীর বিন্যাস মোটেই সরল হয়নি, সরসও নয় কোথাও। কোন একটা দৃশ্যেও মনকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। অভিনয়ে সাগরের ভূমিকায় অশোককুমারের মধ্যে যদিবা কিছু পাওয়া যায় তো নাম-ভূমিকায় নসীম একেবারেই যেন পুতুলটি।

ছবিখানির মধ্যে তারিফ করার মত রয়েছে শুধু এর দৃশ্যসজ্জা। সংগীতের দিকটাকেও খানিকটা প্রশংসা করা যায়।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এই সপ্তাহে চিত্রা ও রূপালিতে নিউ থিয়েটার্সের বহুপ্রতীক্ষিত 'বিরাজ বৌ' মুক্তিলাভ করবে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীটির চিত্ররূপ পরিচালনা করেছেন অমর মল্লিক এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, দেবী মুখার্জি, সিধু গাঙ্গুলী, রঞ্জিৎ, সুনন্দা, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা, বুদ্ধদেব, শুক্তিধারা প্রভৃতি।

বিবিধ

লাহোরের অভিনেত্রী মনোরমা অভিনেতা অল নসীরকে বিবাহ করেছে এবং তার জন্যে মনোরমাকে বাপের কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।

* * *

বম্বের জুপিটার স্টুডিওতে বুলবুল নামে যে ছবিখানি তোলা হচ্ছে তার নায়ক মোবারক আর নায়িকা বিজয়া দাশ—হ্যাঁ, 'শেষরক্ষা'-র সেই নায়িকা।

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় সকল মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহার মনোভাবই অধিকাংশ দলের মধ্যে স্পষ্ট দেখা দিয়াছে। কয়েকটি দল নিয়মিত খেলোয়াড়দের পর্যন্ত না খেলাইয়া নূতন নূতন খেলোয়াড় লইয়া শক্তিহীন দল করিয়া খেলিতেছেন। এই সকল দলের হয়তো হইবার কোনই আশা নাই কিন্তু খেলায় শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন ইহার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার হইয়াছে এই যে চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া যে দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে সম্পর্কে জঘন্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন নানা প্রকার ভিত্তিহীন অবিশ্বাসযোগ্য রটাইতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, জানি অমুক ক্লাব অমুক ক্লাবকে করার ফলেই নিয়মিত খেলোয়াড়দের অমুক ক্লাবের পয়েণ্ট লাভের সুবিধা দিয়াছেন।" আবার কেহ বলিতেছেন পাইবার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয়িত হে। সুতরাং যে দল বেগ দিবে বলিয়া ধারণা সে দলকে শোচনীয় পরাজয় বরণ দেখা যাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি?" কেহ কেহ জোর করিয়াই বলিতেছেন, নিজ কানে শুনিয়া আসিলাম পয়েণ্ট দিলে কত টাকা দেওয়া হইবে।" এইভাবে জঘন্য গুজব যে প্রতিদিন সৃষ্টি হইতেছে শেষ করা যায় না। এই সকল গুজব দের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি আমরা জানি না এইটুকু আমরা বলিতে পারি ইহার দ্বারা লাভবান হইবে না বরঞ্চ ক্লাবের বিশেষ করা হইতেছে। এমন কি ইহার দ্বারা মাঠে যেটুকু প্রকৃত খেলোয়াড়ী আবহাওয়া তাহাও বিষাক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। যে কেবল ক্লাবের শত্রু তাহা নহে খেলার এমন কি দেশের শত্রু। আমাদের অনুরোধ সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ যেন সকল গুজবে কান না দেন এবং ইহার প্রচারে সাহায্য না করেন। দীর্ঘ দুই মাস ধৈর্য সহকারে তাঁহারা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন দেখিয়াছেন। প্রতিযোগিতা শেষ হইতে আর বেশী দেরী নাই তখন গুজবে অধৈর্য কেন?

লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। পরেই আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলার খেলোয়াড়গণের উচিত পরবর্তী প্রতিসমূহে বাঙলার সুনাম যাহাতে রক্ষা পায় জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়া লওয়া। ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া এইরূপ অবস্থায় খেলোয়াড়গণ যদি এখন বিভিন্ন খেলায় নিজ নিজ খেলার উন্নতি সচেষ্ট না হন তবে বাঙলার সুনাম কিরূপে হইতে পারে? গত বৎসর আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বাঙলা সাফল্য লাভ করে এই বৎসর তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া কোনবাঞ্ছনীয় নহে।

খেলাধূলা

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ বাতিল

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন বহু পূর্বেই বাঙ্গালোর এরিয়ান জিমখানার দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু এরিয়ান জিমখানার পরিচালকগণ ইহার পরও বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের ভ্রমণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কবে কোন জাহাজ যোগে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় যাইবেন তাহাও প্রকাশ করেন। ইহার ফলে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মনে ধারণা জন্মায় হয়তো বা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদকের এই সকল প্রচার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। ইহার পর যদি এরিয়ান জিমখানা দল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন তবে কেবল যে তাঁহারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে পড়িবেন এমন নহে খেলোয়াড়গণ কেহই রেহাই পাইবেন না।" ইহার পর জানি না কি ঘটনা ঘটে। বর্তমানে এরিয়ান জিমখানা প্রচার করিতেছেন "ভ্রমণ ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইল। ভারত সরকারের উপদেশেই এই ব্যবস্থা করিতে হইল।" এই সংবাদ নিশ্চয়ই নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। তাঁহারা এই এরিয়ান জিমখানার আচরণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাই আমরা দেখিতে চাই। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন—বর্তমানের প্রচার দ্বারা ইহারা একরূপ ফেডারেশনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহার পরও কি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের ইহাদের সকল কার্য উপেক্ষা করা উচিত?

ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম টেস্ট খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে যে নিরুৎসাহ দেখা দেয় পরবর্তী খেলাসমূহে তাহাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী হইলে চলিবে কেন? ভারতীয় দলকে এই মাসের ২০শে তারিখ হইতে ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যাণ্ড দলের সহিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। সুতরাং এখন হইতেই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার জন্য শক্তি সঞ্চয় না করিলে পুনরায় ভারতীয় দলকে পরাজয় বরণ করিতে হইবে। ভ্রমণ তালিকা যেরূপভাবে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পূর্বে মাত্র দুইদিন বিশ্রাম করিবার সময় পাইবেন। অবশিষ্ট দিনগুলি বিভিন্ন দলের সহিত খেলিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে। অধ্যাপক দেওধর এই জন্য ভারতীয় দলকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করিবার জন্য আমরা ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে এমন কি দলের অধিনায়ককে পর্যন্ত অনুরোধ করি। অধ্যাপক দেওধর বলিয়াছেন, "ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ নেট প্র্যাকটিশ করিবার সুযোগ পাইতেছেন না—সেই জন্য মনে হয় কাউণ্টী দলসমূহের সহিত যে সকল খেলা হইতেছে তাহাতেই স্বাভাবিক ব্যাটিং, ঠিক লেংথে বোলিং ও তৎপর ফিল্ডিং করিবার জন্য সকল খেলোয়াড়কে চেষ্টা করিতে হইবে। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট খেলায় যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা তাহাদের স্মরণে জাগিতেছে তাহার সকল কিছুরই মহড়া এই সকল খেলায় করিয়া লইতে হইবে। অমরনাথকে প্রথম টেস্ট খেলায় এক টানা অনেকক্ষণ বল করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ল্যাঙ্কাসায়ারের খেলাতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি। এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিতে হইবে। দলের সকল বোলারকেই সমানভাবে বল করিবার সুযোগ দিতে হইবে। কভার পয়েণ্টে পতৌদির নবাবকে ফিল্ডিং করিতে দেখিয়াছি। এই স্থানে "চৌখস" খেলোয়াড় ছাড়া দেওয়া উচিত নহে। দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার উচিত "প্রথম স্লিপে" ফিল্ডিং করা। ঐ স্থান হইতে প্রত্যেক বোলারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল কিছুই চোখে পড়িবে ও প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।"

ইহা ছাড়াও অধ্যাপক দেওধর অনেক কিছুই লিখিয়াছেন। আমরা সেই সকল লইয়া আর আলোচনা করিতে চাহি না। পরবর্তী টেস্টের জন্য যে ব্যবস্থা করিতে অধ্যাপক দেওধর করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে দেখিলেই সুখী হইব।

ভলিবল

বাঙলার ভলিবল পরিচালনা লইয়া দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছে। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইলাম—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একযোগে যাহাতে কার্য করেন, তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইতিপূর্বে কয়েকবার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—কেবল উভয় প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রাধান্য ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়। আমরা আশা করি এই বারের প্রচেষ্টা বৃথা হইবে না। বাঙলার মান সম্মানের কথা স্মরণ করিয়া দুইটি প্রতিষ্ঠান যদি সামান্য কিছু করিয়া স্বার্থত্যাগ করেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উভয়ের মিলনের আর কোনই অন্তরায় থাকিতে পারে না। দেশের স্বার্থের কথা ইহাদিগকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে তবেই মিলনের পথ সহজ ও সরল হইবে। ইহাদের মিলন হউক, বাঙলার ভলিবল খেলার সম্মান বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নৈহাটীতে বঙ্কিম জন্মোৎসব

আগামী ৭ই জুলাই রবিবার সকাল ৯ ঘটিকায় নৈহাটী কাঁটালপাড়া বঙ্কিম ভবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; 'দেশ' সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি সুধীবৃন্দ যোগদান করিবেন। সর্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।—(স্বাঃ) শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, সম্পাদক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নৈহাটী শাখা।

দেশী সংবাদ

২৫শে জুন—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রী মিশনের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকের পর কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এতদ্বিষয় ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুত আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত গতকল্য বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

২৬শে জুন—মন্ত্রী মিশন এবং বড়লাট এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এযাবৎ একটি অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হয় নাই; তবে ১৬ই জুনের ঘোষণার অষ্টম অনুচ্ছেদ তাঁহারা এতদ্‌সম্পর্কে পুনরায় চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প। যে পর্যন্ত না একটি নূতন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, সে পর্যন্ত ভারতের শাসনকার্য চালাইবার জন্য বড়লাট সরকারী কর্মচারীদের লইয়া সাময়িকভাবে একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে ইচ্ছুক।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ছয়শত শব্দ সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, অস্থায়ী বা অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস-সেবীরা কদাপি কংগ্রেসের জাতীয় রূপ পরিত্যাগ করিতে অথবা কৃত্রিম ও অসঙ্গত সংখ্যাসাম্য স্বীকার করিয়া লইতে বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারে না। ১৬ই জুনের বিবৃতিতে বর্ণিত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, কমিটি তাহা মানিয়া লইতে অসমর্থ। যাহা হউক, স্বাধীন, সম্মিলিত ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত গণপরিষদে কংগ্রেসের যোগদান করা উচিত বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী অধিবেশন অদ্য সমাপ্ত হয়। আগামী ৫ই জুলাই বোম্বাইতে আবার অধিবেশন হইবে।

বড়লাটের নিকট লিখিত ১৫০০ শব্দযুক্ত এক পত্রে গতকল্য রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বড়লাট ও মন্ত্রী মিশনের ১৬ই জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ বিশ্লেষণ করেন।

২৭শে জুন—মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের ১৬ই জুন তারিখের বিবৃতি অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত আপাতত পরিত্যক্ত হওয়ায় মিঃ জিন্না অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন।

বাঙলা হইতে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন এক সপ্তাহকাল পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা গবর্ণমেণ্টের এক প্রেস নোটে জানান হইয়াছে যে, আগামী ১৭ই জুলাই বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ ধার্য হইয়াছে।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত পুলিশ ব্যয় বরাদ্দ খাতে ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাবের আলোচনাকালে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে পুলিশী জুলুমের কথা বর্ণিত হয়। শ্রীযুক্ত রামবিনোদ সিংহ একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ডিনামাইট দ্বারা তাঁহার দ্বিতল বাসভবন উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গুলী করিয়া মারা হয় এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে পুলিশ দিবারাত্র গ্রাম হইতে

গ্রামান্তরে তাড়া করিয়া ফেরে। এক বিপ্লবাহিনী গ্রামটি দখল করে এবং মেশিনগান হইতে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়া গ্রামবাসিগণকে হত্যা করে।

২৮শে জুন—অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে বড়লাট ও মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই বলিয়া মিঃ জিন্না যে অভিযোগ করিয়াছেন, অদ্য মিঃ জিন্নার পত্রের উত্তরে বড়লাট মিঃ ওয়াভেল এক পত্রে তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, গণপরিষদের নির্বাচন তাঁহারা স্থগিত রাখিতে চাহেন না।

২৯শে জুন—নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক গবর্ণমেণ্টের ৮ জন সদস্যের নাম ঘোষিত হইয়াছে।

অদ্য সেনেট সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ করা হয়; উহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ১৫,৪০,৭৩৭ টাকা ঘাটতি হইবে।

মন্ত্রী মিশনের সদস্যগণ অদ্য সদলে নয়াদিল্লী হইতে বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

৩০শে জুন—মহাত্মা গান্ধী অদ্য বেলা ৯টা ১৫ মিনিটের সময় স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে দিল্লী হইতে পুণা পৌঁছিয়াছেন। অদ্য প্রত্যুষে বোম্বাই হইতে পুণার পথে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সঙ্গীদের স্পেশ্যাল ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় বাঙলা হইতে গণপরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়কে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, কংগ্রেস দল গণপরিষদে বাঙলার ২৭টি অ-মুসলমান আসনের জন্য ২৫ জন প্রার্থী দাঁড় করাইবেন।

কলিকাতায় আগামী ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সম্মেলন হইবে, তাহার জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১লা জুলাই—অদ্য অপরাহ্নে আমেদাবাদ শহরে রথযাত্রা শোভাযাত্রার উপর ইটপাটকেল বর্ষণের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। হিন্দু ও মুসলমান জনতা প্রথমে ইটপাটকেল ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করে এবং পরে দোকানপাট লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার গুলী চালায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছুরিকাঘাত চলিতে থাকে। ইহার ফলে ২৩ জন নিহত ও ১৬০ জন আহত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বে-সরকারী আমেরিকান খাদ্য মিশন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব অর্থসচিব শ্রীযুত এন রাঘবন গত শনিবার সপরিবারে বিমানযোগে পেনাঙ্গ হইতে কলিকাতায় আগমন করেন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ডাক কর্মচারীদের দাবী সালিশীতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে জুন—ডারবানের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, অদ্য রাত্রে ৫০ জন ভারতীয় সহ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ নাইকার ডারবানের উম্বিলো রোডস্থিত সত্যাগ্রহ শিবির অধিকার করিলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩০শে জুন—মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি প্রবাল বলয়ে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ৩-৩১ মিনিটের সময় জগতের চতুর্থ আণবিক বোমাটি যথারীতি বর্ষিত হয়। বিস্ফোরণের ফল আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৩০শে জুন—ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারির এবং অপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী গত বৃহস্পতিবার রাত্রে সোয়েকার্তার একটি হোটেল হইতে অপহৃত হইয়াছেন।

১লা জুলাই—গতকল্য দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ৪৯ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয়দের বিশিষ্ট দক্ষিণপন্থী নেতা মিঃ সোরাবজী রুস্তমজী আছেন।

কি করিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় আপনি নিজেই শিশুকে খাওয়াইতে পারেন।

প্রত্যেক মাতার অভিলাষ আপন শিশুকে নিজেই খাওয়ান। এই সেবায় যে তিনি শুধু অপরিসীম আনন্দই উপভোগ করেন তাহা নহে, তিনি জানেন যে আপন স্তন্যপানই শিশুর প্রকৃত খাদ্য এবং শিশুর গঠন ও শক্তির জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কখন কখন মাতৃস্তন্য একেবারে দুগ্ধশূন্য হয় অথবা তাহাতে খুব কম দুধ সঞ্চিত হয়। কিন্তু, বুদ্ধিমতী মাতা নিশ্চিতভাবে জানেন যে শিশুর জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে 'ওভালটিন' সেবনে এই অবস্থা কখনও আসিতে পারে না। 'ওভালটিন' মাতৃস্তন্যকে এ ভাবে সঞ্জীবিত করে যে উহাতে প্রচুর সর্ব্বগুণসম্পন্ন দুধ আসিয়া জমা হয়। অধিকন্তু 'ওভালটিন' মাতার বল ও জীবনীশক্তি সংগঠন করিয়া থাকে।

'ওভালটিন' একটী পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য। ইহা সুপক্ক বার্লির মণ্ড, টাট্‌কা পনির সংযুক্ত গোদুগ্ধ, মূল্যবান প্রাকৃতিক ভাইটামিন এবং অন্যান্য উপকরণ হইতে তৈয়ারী। বল, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি গঠনের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিকর উপাদান ইহা হইতে পাওয়া যায়। ডাক্তার এবং ধাত্রীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গর্ভবতী ও সন্তানবতী মাতার পক্ষে ইহার অসামান্য প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। 'ওভালটিনের' বদলে অন্য জিনিষ ব্যবহার বর্জ্জন করুন।

সমস্ত ডাক্তারখানায় এবং বড় বড় দোকানে বিক্রয় হয়।

ডিষ্ট্রিবিউটর্স—গ্রেহাম ট্রেডিং কোং (ভারতবর্ষ) লিঃ, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা এবং বোম্বাই, করাচি ও মাদ্রাজ।

ওভালটীন

'OVALTINE বলকারক পানীয় (খাদ্য)।'

'ওভালটিন' মাতার ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোত্তম।

OV/104

কিছু সময় অন্তর অন্তর ওভালটীনের টাটকা মাল নিয়মিতভাবে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়। সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য গবর্ণমেণ্ট ধার্য করিয়া দিয়াছেন। ইহার বেশী দিবেন না।

অবিকল জিনিষটী শুনতে হ'লে চাই

SONGSTER NEEDLES

ব্যাণ্ডটী খোলা না হয়, দেখে নিন।

SONGSTER
GRAMOPHONE
NEEDLES

উৎকৃষ্ট লাউড টোন নীড্‌ল

Made by
J. STEAD & Co. Ltd.
SHEFFIELD ENGLAND

পুরস্কার
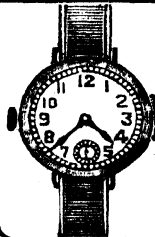
উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী চামড়ার সুটকেস্ প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

এন, পি, হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৮
কালকাতা

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　　সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ]　　২৮শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৩ সাল।　　Saturday, 13th July, 1946.　　[৩৬ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি পদে পণ্ডিত জওহরলাল

গত ২১শে আষাঢ় বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের প্রথম দিবসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রপতি পদে বৃত হইয়াছেন। ইতঃপূর্বেও কংগ্রেসের অধিনায়কত্বের এই গুরু দায়িত্বে দেশবাসী পণ্ডিতজীকে তিনবার বৃত করে। কার্যতঃ তিনি এই চতুর্থবার সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য; পরাধীন এই দেশে এই লক্ষ্যের অভিমুখে জাতিকে পরিচালিত করা সহজ ব্যাপার নয়। বিজেতৃ সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ চালাইয়া এপথে অগ্রসর হইতে হয়; সুতরাং কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির সম্মানার্হ মুকুট যিনিই শিরে ধারণ করিয়াছেন, এদেশে তিনি কোনদিনই কুসুমের পেলব স্পর্শ পান নাই; পক্ষান্তরে তাঁহাকে কণ্টকের আঘাত বরণ করিয়াই লইতে হইয়াছে এবং পুষ্পাসিঞ্চিত পথে তিনি রাজপ্রাসাদে অভিনন্দিত হন নাই, তৎপরিবর্তে বিদেশী অত্যাচারী শাসকবৃন্দের অন্ধ কারাকক্ষেই তাঁহাকে অবরুদ্ধ হইয়া নিগৃহীত ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের বীর সন্তান। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহার দুর্দম তেজোবীর্য কোনদিন প্রতিহত হয় নাই, বরং প্রতিকূল আঘাতে তাঁহার অন্তরের বহ্নিগর্ভ আবেগ পশুবলোদ্ধত শত্রুকুলকে পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার দুর্নিবার মনোবল পশুশক্তির পীড়নে এবং লাঞ্ছনায় সমধিক উজ্জ্বল হইয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ক্ষুরধার রাষ্ট্রনীতিক বুদ্ধির সঙ্গে দুর্ধর্ষ হৃদয়ের বলে পণ্ডিত জওহরলালের চরিত্র এক বিশিষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। তাই দেশ এবং জাতির অগ্রগতির পথে যখনই পরম সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহারা তখনই পণ্ডিতজীর নেতৃত্ব কামনা করিয়াছে এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতির সম্মানার্হ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। নবজাগ্রত ভারতের অন্তরমূলে পণ্ডিতজীর অবদান অসামান্য

শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। জওহরলালের আত্মদানের মহিমময় আদর্শের আলোকে জাতি বারংবার পথ পাইয়াছে এবং দুর্গম বাধাবিঘ্নকে প্রতিহত করিয়া প্রাণময় আবেগে স্বাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। জগতের পক্ষে আজ মহাসঙ্কটকাল দেখা দিয়াছে এবং পরাধীন ভারতের সম্মুখে এই সংকট বিশেষভাবেই আপতিত। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীর দল প্রবঞ্চনাপূর্ণ কূটনীতি এবং পশুবল, উভয়ত সমভাবে সম্বদ্ধ হইয়া রাক্ষসী পিপাসার জাল জগতের সর্বত্র নানাভাবে বিস্তার করিতে চাহিতেছে। এই সংকটকালে ভারতবর্ষ যোগ্য ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতিস্বরূপে লাভ করিল। পণ্ডিত জওহরলাল মস্তিষ্কের বল এবং হৃদয়ের বল—এই দুই শক্তিতেই সমভাবে সমৃদ্ধ। তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টির কাছে সাম্রাজ্যবাদীদের চাতুরী যেমন লুক্কায়িত থাকে না, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ের বলও তাহাদের পশুশক্তির কাছে পরাভূত হইবার নয়। ইহা ছাড়া, অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জওহরলালের মানবতাময় উদার আদর্শ তাঁহার শক্তিকে চারিদিক হইতে অধৃষ্য করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াই জওহরলাল আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,- আমরা আর ক্ষুদ্র জাতি নই যে, ইংরেজের নিকট হইতে ভিক্ষার দানস্বরূপে স্বাধীনতা লইতে যাইব। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না এবং ভারতবর্ষ ব্রিটিশের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিতে পারিবে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা ইহাই বুঝি এবং আমরা তেমন স্বাধীনতাই চাই। পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে দেশবাসী অচিরে বৈদেশিক শাসকদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে, আমরা এই আশায় দৃপ্ত হইতেছি।

মৌলানা আজাদের নেতৃত্ব

সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল কংগ্রেসের দায়িত্বভার বহন করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পণ্ডিত জওহরলালের হস্তে সম্প্রতি এই দায়িত্বভার ন্যস্ত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, শুধু ভারতের কেন জগতের ইতিহাসেও তাহার তুলনা বিরল। এত দীর্ঘ-কালের জন্য অপর কোন রাষ্ট্রপতিই কংগ্রেসের নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন নাই এবং প্রকৃতপক্ষে এরূপ সংকটসংকুল অবস্থার ভিতর দিয়াও এ 'পর্যন্ত কাহাকেও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হয় নাই। যুগ-বিপর্যয়কর মহাসমরের সমগ্র বেগ এই কয়েক বৎসরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে এবং এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পশুবল-দৃপ্ত নির্লজ্জ নীতি বীভৎস আকারে ভারতভূমিকে দলিত এবং মথিত করিয়াছে। এই সংগে সংগে লোকক্ষয় দুর্ভিক্ষের প্রলয়লীলা বাঙলা দেশকে শ্মশান করিয়া ফেলিয়াছে। শাসকদের কুব্যবস্থায় এবং অব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ নরনারী পোকা-মাকড়ের

মত মরিয়াছে এবং সেই শ্মশানভূমিতে শকুনি-গৃধিনীর দল ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তান-দের উপর অবর্ণনীয় এবং অকথ্য নির্যাতনে প্রমত্ত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এমন সংকটকালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জাতিকে স্বাধীনতার সাধনায় পরি-চালিত করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই; ক্ষুদ্রচেতাদের ভেদ এবং বিভেদ-সৃষ্টির শত সহস্র রকম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তিনি জাতিকে উদার আদর্শে সংহত করিয়াছেন। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীদের পদলেহনকারীদের নিন্দা এবং গ্লানি এই জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষের উপর অবিরত বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে মৌলানা সাহেবের নেতৃত্ব-প্রতিভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি নিন্দা এবং গ্লানিতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই; এমনকি, শরীরের দিকেও তাকান নাই। দীর্ঘ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে; কিন্তু আদর্শের অনুপ্রেরণা তাঁহার অতন্দ্রিত কর্ম-সাধনাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের সহিত আলোচনায় মৌলানা সাহেব যেরূপ রাজনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনীষিমণ্ডলে এবং রাষ্ট্রনীতি ধুরন্ধরগণের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বস্তুত তাঁহার ন্যায় নেতা পাইয়া যে কোন জাতি গর্বানুভব করিতে পারে এবং আমরাও সেজন্য গর্ববোধ করিতেছি। তিনি রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অতঃপর তাঁহার আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা জাতি সমভাবেই লাভ করিবে, আমরা এই আশা করি।

কংগ্রেসের নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটি

রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খান আব্দুল গফুর খান, মিঃ রফি আহম্মদ কিদোয়াই, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, রাও সাহেব পটবর্ধন, মিঃ ফকরুদ্দীন আহম্মদ, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সর্দার প্রতাপ সিং, শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই এবং ডক্টর বালকৃষ্ণ কেশকার এই কয়েকজন লইয়া তাঁহার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে একটি বিষয়ে নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইবে। এতাবৎকাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মকর্তৃগোষ্ঠী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, এই কমিটিতে তাঁহাদের বাহির হইতে কয়েকজন নূতন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এইভাবে যাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহারা অনেকেই উগ্রপন্থী এবং সমাজতন্ত্র মতাবলম্বী। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, রাও সাহেব পটবর্ধন এবং শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী ওয়ার্কিং কমিটিতে একমাত্র শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুই মহিলা সদস্যা ছিলেন, বর্তমান কমিটিতে দুইজন মহিলাকে সদস্য-স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের পদত্যাগ করিবার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে শিখ সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না, প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী সর্দার প্রতাপ সিংয়ের দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করা হইয়াছে। আসামের প্রতিনিধিস্বরূপে মিঃ ফকরুদ্দীন আহম্মদের নিয়োগও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; পূর্ববর্তী কমিটিতে আসামের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। সংগ্রামশীল কর্মনীতি নির্ধারণ এবং পরিচালনার দিক হইতে নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটি শক্তিশালী হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। জাতির ভাগ্য পরিচালনায় যাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই গুরুদায়িত্ব ভারে সংবর্ধিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

গণপরিষদ ও কংগ্রেস

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমি[তির] বোম্বাইয়ের অধিবেশনে দিল্লীতে ওয়াকি[ং] কমিটিতে গৃহীত মন্ত্রী মিশন সম্পর্কি[ত] প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমো[দিত] করিয়াছেন। প্রস্তাবের বিরোধী ... অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠনের পরিকল্পন[ার] ন্যায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাও যাহাতে অগ্রা[হ্য] হয়, সেজন্য যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে[ন।] ইহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এই পরিকল্প[না] গৃহীত হইলে জাতির বৈপ্লবিক মনোব[ৃত্তি] অনেকটা দমিয়া পড়িবে এবং আগস্ট প্রস্তাবে[র] মূলীভূত প্রেরণার সংগে জাতির চেতন[া] ধারা ছিন্ন হইবে। আমরা পূর্বেই বলিয়া[ছি] কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহ[ণে] এইরূপ কোন আশংকার কারণ নাই; কা[রণ] কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের নির্দেশমত ... কল্পনাকে সর্বাংশে স্বীকার করিয়া লইয়া[ছে] বা লইবে এরূপ নহে। রাষ্ট্রপতি পণ্ডি[ত] জওহরলাল বোম্বাই অধিবেশনের উপসংহা[রে] এ কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তাঁ[র] সুদৃঢ় অভিমত এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রী মিশ[নের] স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন পরিকল্পনাও গ্র[হণ] করিয়াছে বলা চলে না। কংগ্রেস গণপরি[ষদে] যাইতে সম্মত হইয়াছে মাত্র এবং কংগ্রে[স] যতদিন বুঝিবে গণপরিষদের ভিতর থাকি[য়া] সে তাহার লক্ষ্যবস্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনত[ার] আদর্শ সার্থক করিতে পারিবে, ততদিনই গণপরিষদে থাকিবে। কিন্তু কংগ্রেস য[দি] উপলব্ধি করিবে যে, গণপরিষদে অবস্থ[ান] করিলে স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে, [সেই] মুহূর্তেই সে পরিষদ হইতে বাহির হ[ইয়া] আসিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সংগে প্রত[্যক্ষ] সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। বস্তুত গণপরিষ[দের] ভিতরে গেলে কংগ্রেসের শক্তি কয়েক দিনে [বা] কয়েক মাসের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী[দের] নীতির মহিমায় এলাইয়া পড়িবে, ত[াহা] এতটা দুর্বল কিংবা জাতির মুক্তি সাধ[নায়] যাঁহারা প্রতিপদে মৃত্যুকে বরণ ক[রিয়া] লইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবল এতটাই [দুর্বল] এরূপ মনে করা সংগত নহে; এতদ্ব[ারা] নিজেদের দুর্বলতারই পরিচয় পাওয়া য[ায়।] প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ শক্তির সংহ[তি] সূত্রে এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক প[রি]প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ততটা দুর্বল ... সাম্রাজ্যবাদীদের চাতুরীর সংগে ... করিবার মত চাতুর্য বা বুদ্ধির প্রা[খর্য] কংগ্রেসের অধিনায়কদের আছে এবং সাম্রা[জ্য]বাদীরা জাতিকে ফাঁদে ফেলিবার চে[ষ্টা] করিলেও কংগ্রেস নির্বিবাদে পা বাড়াইয়া দি[বে না।] ব্রিটিশের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিগত আ[গস্ট] আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভের

...টা অন্ধতাও তাহার নাই। বস্তুত ...রেক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসের দাবী ...নুযায়ী অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট যদি ...ঠিত না হয় এবং প্রাদেশিক মণ্ডলী গঠনে ...ংগ্রেসের ব্যাখ্যা যদি স্বীকৃত না হয়, তবে ...ংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। সত্য এই যে. ...্রিটিশ শাসকের দল যদি তাঁহাদের ...থা না রাখেন, অর্থাৎ সত্যই তাঁহারা ...ারত ছাড়িয়া যাইতে রাজী না হন, ...বে সমগ্র জাতি তাঁহাদের সম্বন্ধে সমুচিত ...াবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না ...বং কংগ্রেস সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে।

...ন্ডট ব্যবস্থা

হবুচন্দ্র রাজা এবং তাঁহার মাননীয় মন্ত্রী গবুচন্দ্রের দেশে মুড়ি মিছরির সমান দর হইয়াছিল বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত বর্তমান ভারতে মুড়ির চেয়ে মিছরির মূল্য হ্রাস পাইবার অপূর্ব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের নিযুক্ত বস্ত্র নিয়ামক বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১লা আগস্ট হইতে সাধারণের ব্যবহৃত মোটা ধরণের কাপড়ের মূল্য টাকায় ১৫ পাই, মাঝারী ধরণের কাপড়ের মূল্য টাকায় ১২ পাই এবং সাধারণ মিহি কাপড়ের মূল্য টাকায় ৬ পাই বৃদ্ধি করা হইবে; কিন্তু সরেস মিহি কাপড়ের মূল্য আদৌ বৃদ্ধি করা হইবে না; পক্ষান্তরে ঐ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের মূল্য টাকায় ৯ হইতে ১২ পাই অর্থাৎ এক আনা হ্রাস করা হইবে। বর্তমান এই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের মূল্য এইভাবে বৃদ্ধি করার প্রস্তাবে সকলেই আতঙ্কিত হইবেন। প্রথমত কাপড়ের যে বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্রের পক্ষে নিজেদের অভাব পূর্ণই হয় না; তাহার উপর কাপড়ের মূল্য যদি এইভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে বর্তমান অর্ধনগ্ন অবস্থার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে নগ্ন অবস্থাতেই দিন যাপন করিতে হইবে। অনেকেই এই আশা করিয়াছিল যে, যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইলেই কাপড়ের এই সংকট কাটিয়া যাইবে। সরকারী বস্ত্র নিয়ামক বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে সে আশার একেবারে পরিসমাপ্তি ঘটিল। কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১লা আগস্ট হইতে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে কাজের সময় ৯ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৮ ঘণ্টা করিতে হইবে এবং ভারতীয় তুলার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কাপড়ের মূল্য যদি বৃদ্ধি করা না যায়, তবে শ্রমিকদের বর্ধিত বেতনের হার বহন করা মিলগুলির পক্ষে সম্ভব হইবে না। সরকারী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতার গভীরতা উপলব্ধি করিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কারণ এই সিদ্ধান্তে বর্ধিত মূল্যের যত চাপ সাধারণের উপর গিয়া পড়িয়াছে, অথচ যাহারা প্রথম শ্রেণীর মিহি কাপড় ক্রয়ে সমর্থ, সেই ধনীর দলকে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া ধনীর স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনের প্রতি এই সরকারী আগ্রহে ভারত গভর্নমেণ্টের নিয়ামক আমলাতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সত্যই সাধারণের উপর এই পীড়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কি তাঁহাদের পক্ষে এক্ষেত্রে একান্তই আবশ্যক ছিল? আমরা কোনক্রমেই তাহা স্বীকার করি না। গত কয়েক বৎসর হইতে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা অত্যধিক মাত্রায় লাভ করিয়া মোটা হইতেছে। গত ১৯৪৪ সালে বোম্বাইয়ের কলগুলি অংশীদারদিগকে শতকরা ২২৷৷৹ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেয় এবং ১৯৪৫ সালে ডিভিডেণ্টের পরিমাণ শতকরা ৩১ টাকায় দাঁড়ায়। বিশেষতঃ অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স ইহার পর উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং ১৯৪৬ সালের জন্য কলওয়ালাদিগকে ঐ ট্যাক্স দিতে হইবে না; ইহার ফলে লাভের মাত্রা তাহাদের পক্ষে আরও বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং সাধারণকে পীড়ন না করিয়া যদি কলওয়ালারা নিজেদের লাভের অঙ্কটা একটু ছোট করিতেন, তবেই শ্রমিকদের অতিরিক্ত বেতন পোষাইয়া লওয়া চলিত। শ্রমিকদের উপর দরদের ফন্দী দেখাইয়া এক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থই সাধারণের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া পাকা করিয়া লইতেছেন। তারপর, তুলার মূল্য বৃদ্ধির যে যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মূলেও গলদ রহিয়াছে। এদেশে সত্যই যদি তুলার অভাব ঘটিয়া থাকে, এবং সেজন্য মিলের কাজে অসুবিধা দেখা দেয়, তবে বিদেশে ভারত হইতে তুলা রপ্তানি করা হইতেছে কেন? সরকারী বিবরণেই দেখা যাইতেছে, ভারত গভর্নমেণ্ট জাপানের কাপড়ের কলগুলির জন্য ভারত হইতে ৩০ লক্ষ গাঁইট তুলা রপ্তানি করিতেছেন। ফলতঃ এদেশে গভর্নমেণ্ট যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহারা দরিদ্রের স্বার্থে অবহিত নহেন, ধনী—বিশেষভাবে শোষক সম্প্রদায়েরই তাঁহারা পরিপোষক। কারণ, তাঁহাদের পোষাকতার উপর ভিত্তি করিয়াই শাসকদের শোষণ-নীতি সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু শাসকদের এখন উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁহাদের এই নীতি চালাইবার দিন শেষ হইয়াছে; জাগ্রত ভারত দরিদ্রের উপর পীড়নের এমন নিষ্ঠুরতা এবং অন্যায় নির্বিবাদে সহ্য করিবে না।

মূলে কাহারা দায়ী

ঢাকা দীর্ঘদিন ধরিয়াই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রকাশ্য রাজপথে খুনাখুনি, ছুরি মারামারি, নিরপরাধ পথচারী ব্যক্তির প্রাণনাশ ঢাকার ন্যায় বাঙলা দেশের একটি বিশিষ্ট নগরীতে কেন মাঝে মাঝে এই ধরণের দৌরাত্ম্যের প্রাদুর্ভাব ঘটে—আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই। যাহাকে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা বলা হয়, খোঁজ লইলে দেখা যাইবে, ঢাকার এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার পিছনে তেমন সম্প্রদায় সম্পর্কিত কোন গুরুতর কারণও থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা সামান্য কারণকে সূত্র করিয়া এই আগুন জ্বলিয়া উঠে; সুতরাং বোঝা যায়, দুরভিসন্ধিপরায়ণ একদল লোক গোপনে গোপনে এইরূপ অশান্তি যাহাতে ব্যাপকতা লাভ করে, এমন উপাদান প্রস্তুত করিয়াই রাখে এবং ইহাদেরই প্ররোচনায় নিরক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তেজিত হইয়া যত অনর্থের সৃষ্টি করে। ঢাকার দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে যাহারা এইভাবে চক্রীস্বরূপে কাজ করে, তাহাদিগকে শায়েস্তা করিতে না পারিলে, এই দৌরাত্ম্যের স্থায়িভাবে অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সঙ্গে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে; কারণ এই মন্ত্রিমণ্ডল মুসলিম লীগের দ্বারা পরিচালিত এবং মুসলিম লীগের মূলনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাও জড়িত রহিয়াছে; ইহা ছাড়া মুসলমান সমাজের শিক্ষা এবং পদাভিমানী ব্যক্তিদের অনেকের কাছে লীগের এই সাম্প্রদায়িকতার দিকটাই একমাত্র আকর্ষণ; বস্তুত লীগের এই সাম্প্রদায়িক নীতিই তাহাদিগকে পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠায় নানাদিক হইতে তুষ্ট এবং পুষ্ট রাখিতেছে। এই সব কারণে সাম্প্রদায়িকতাকে জীয়াইয়া রাখা তাহাদের অনেকের পক্ষে একটা ব্যবসাস্বরূপে পরিণত হইয়াছে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যদি যথাসময়ে এ সম্পর্কে সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করিতেন, তবে ঢাকায় এই শোচনীয় ব্যাপার এতটা ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে অসম্প্রদায়িক এবং উদার সার্বজনীন আদর্শে শাসননীতি যতদিন সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই সব ব্যাপার ঘটিবেই এবং শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁহারা কোনভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থাগত সাম্প্রদায়িকতায় বর্বরতা ও অন্ধতা প্রশ্রয় পাইবে এবং অনুদার ব্যক্তি-স্বার্থ বলবৎ হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক।

ছোটদের ঘরকরনা শিল্পী : শ্রীদ্বিজেনকুমার সেন

জেলে শিল্পী: বীণা গোস্বামী

দশের কথা

(১৭ই আষাঢ়—২৩শে আষাঢ়)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—আমেদাবাদ ও ঢাকা—ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী—গণ-পরিষদ—সত্যাগ্রহ—বড়লাটের শাসন পরিষদ—রেলে প্রস্তর উপদ্রব—বাঙলার পরিষদে ইউ-রোপীয়গণ—ডাক কর্মচারী ধর্মঘট—কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—দীর্ঘকাল ... নানা বাধাবিঘ্নের পথ অতিবাহিত করিয়া ...ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠন ...াছে। পুরান কমিটির শেষ অধিবেশন ... ৬ই জুলাই বোম্বাই শহরে আরম্ভ হইয়া ...দিনে শেষ হয়। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ...ষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া বিলাতের ...ী মিশনের দুইটি প্রস্তাবের একটি ...ড়লাটের পুনর্গঠিত শাসন পরিষদে যোগ-... প্রত্যাখান করেন এবং ভারতবর্ষের শাসন ...তি রচনার জন্য গণ-পরিষদে যোগদানের ...াব গ্রহণ করেন। কার্যকরী সমিতির ...ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন নিখিল ভারত কংগ্রেস ...মিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল। আলোচনায় ...শেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। ২ শত ৪ জন ...স্য কার্যকরী সমিতির ভোটের সমর্থন ও ... জন বিরোধিতা করেন। ১৯ জন বক্তা ...তা করেন এবং মহাত্মা গান্ধী কমিটির ...স্য না হইলেও সকলের অভিপ্রায় অনুসারে ...তা করেন। সময়াভাবে ১৬ জন বক্তা ...তা করিতে পারেন নাই। মহাত্মাজী ...লেন—তিনি এখনও অন্ধকারে আলোকের ...ধান পাইতেছেন না; তবে তাঁহার ব্যক্তিগত ...—গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ...হা হইতে আমরা সুফল লাভ করিতে পারি ... না, তাহা দেখা হউক। এবার অগ্রগামী ...ল বহু মতে পরাভূত হইলেও তাঁহারা যে ...করা ২০টি ভোট পাইয়াছেন, তাহাতেই ...ঝিতে পারা যায়—কংগ্রেসে সে দলের প্রভাব ...বর্ধমান। সেই দলের শ্রীমতী অরুণা ...সফ আলী মহাত্মাজীকে বলেন—"আমরা এত-...ন আপনার কথা শুনিয়া ও আপনার নির্দেশ ...ালন করিয়া আসিয়াছি; এখন আপনাকে ...আমাদিগের কথা শুনিতে ও আমাদিগের ...র্দেশ পালন করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, ...তিনি যে স্বাধীনতা লাভ প্রয়াসের দীক্ষা ...দিয়াছেন, সেই দীক্ষার ফলেই যে শ্রীমতী অরুণা তাঁহাকে একথা বলিয়াছেন, মহাত্মাজী তাহা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া প্রীতই হইয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সত্যাগ্রহের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সিংহলে ভারতীয়দিগের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন।

আমেদাবাদ ও ঢাকা—আমেদাবাদে ও ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়, তাহা যে দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছে, তাহা অনেকেরই দুঃখের ও আশঙ্কার কারণ। এইসকল হাঙ্গামা মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট কিনা, তাহাও বিবেচ্য। তাহা হউক বা না হউক, এই সকল হাঙ্গামার পশ্চাতে যে কতকগুলি দুষ্ট লোক থাকিয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব ঘটাইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী—ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। যদিও পরিমাণ অধিক নহে, তথাপি তাহাতে যে ভারতবাসীর উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু চাউলের বিনিময়ে যদি ভারতকে কাপড় দিতে হয়, তবে ভারতবর্ষে বস্ত্র সমস্যা যে আরও জটিল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে ভারত সরকার সুভাষচন্দ্রের চাউল প্রেরণের প্রস্তাব অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। এবারও কি ইন্দোনেশিয়া হইতে চাউল আনিবার ব্যবস্থা হইবে না? কিন্তু মূল কথা ভারতবর্ষকে খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিবার কি ব্যবস্থা হইতেছে?

গণপরিষদ—কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটিতে গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইবার পূর্ব হইতেই প্রদেশসমূহ হইতে সদস্য প্রেরণের আয়োজন হইতেছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যোগ্যতাই যেন মনোনয়নের একমাত্র কারণ হয়—আর কোন বিবেচনার স্থান তাহাতে নাই।

সত্যাগ্রহ—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ তথায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের কুব্যবহারের প্রতিবাদে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দিন দিন প্রবল হইতেছে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তিনিও সেই সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে যাইবেন—এমন আভাস মহাত্মাজী দিয়াছেন। যদি তিনি সত্য সতাই তাহা করেন, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাতে কেবল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহা নহে—যে বিপ্লবের উদ্ভব হইবে, তাহার ফল সমগ্র জগতে পাওয়া যাইবে।

বড়লাটের শাসন পরিষদ—বড়লাটের শাসন পরিষদের পুরাতন সদস্যগণ কর্মভার ত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। যাঁহারা অস্থায়ী-ভাবে কার্য পরিচালন করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পুরাতন দলের ৩ জন মাত্র কাজ করিতে-ছেন। শুনা যাইতেছে, গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন শেষ হইলে বড়লাট আবার নূতন শাসন পরিষদ গঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন, তিনি নানা দলকে নানারূপে আশ্বাস প্রদান করাতেই এবার শাসন-পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্য যে তিনিই দায়ী আর মন্ত্রী মিশন তাহার কিছুই জানিতেন না—এমন কি মনে করা যায়?

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে য়ুরোপীয় দল—গণপরিষদে সদস্য নির্বাচনে য়ুরোপীয়গণ ভোট দিতে পারেন না, কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের য়ুরোপীয় দল জানাইয়াছেন—তাঁহারা ভোট দিতে বিরত থাকিবেন। ইহা উপরের নির্দেশে কিনা তাহা বলা যায় না।

রেলে গুণ্ডার উপদ্রব—রেলে গুণ্ডার উপদ্রব আর আসাম বেঙ্গল রেল পথে সীমাবদ্ধ নাই—ইস্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলেও উপদ্রব বর্ধিত হইতেছে। সকল রেলের সমবেত চেষ্টায় এই উপদ্রব নিবারণের উপায় করিতেই হইবে।

ডাক কর্মচারী ধর্মঘট—ডাক কর্মচারীদিগের ধর্মঘটের আশঙ্কায় ডাক বিভাগ ১১ই জুলাই হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য মণিঅর্ডার, রেজেষ্টারী পত্রাদি গ্রহণ বন্ধ রাখিলেন—বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। গত সোমবারে (৮ই জুলাই) কেবল কলিকাতা হইতেই ১৫ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইতে পারে নাই। ধর্মঘট ঘটিলে লোকের কিরূপ দুরবস্থা এবং সর্বত্র কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মীমাংসার জন্য সরকার কি আবশ্যক চেষ্টা করিয়াছেন?

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী—প্রধানত নূতন সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠিত হইতেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খাঁ এই বাহিনীর নায়ক হইবেন।

সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগ—সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগের দলের ব্যবস্থা পরিষদ সদস্যদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

গুরুদেব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমার ছোট মেয়ে দাড়ি-অলা ছবি দেখলেই
করে নমস্কার,
বলে, গুরুদেব।
বোঝাতে পারিনে তাকে ও তাঁর ছবি নয়।

মুখ বুজে আমার কথা শোনে,
কথা শেষ হ'লে দেখিয়ে বলে
—কেন ওই যে দাড়ি!
বোঝাতে পারিনে তাকে—ও তাঁর ছবি নয়!

একদিন এল তোমার ছবি
নূতন মাসিকের প্রচ্ছদে,
দাড়ি তখন স্বল্প—
উঠ্‌তি কেবল বয়স।

ছুটে এলো আমার মেয়ে,
কত কি বলে গেল আবোল তাবোল,
হঠাৎ তার নজর পড়লো
প্রচ্ছদের দিকে।
চেঁচিয়ে উঠল—এই যে।

কি ?
—গুরুদেব।
তোমাকে চিনলো কেমন ক'রে ?
দাড়ি তখন স্বল্প।
গর্ভেও কি তোমার মহিমা কাজ করেছে ?
মাতার স্তন্যে ?
পিতার রক্তে ?

স্বপ্নরূপে তুমি প্রবেশ করেছ মজ্জায়,
ধমনীতে ধ্বনিত তোমার ছন্দ,
গানের ভারে ভেঙে পড়েছে আমার স্নায়ুতন্ত্রী,
বসন্তের ফুলের ঐশ্বর্য যেমন ভাঙে মালঞ্চের বিতান।
পিতামাতার জীবনের তোরণে
প্রবেশ করেছ তুমি
ভাবী বংশধরের মজ্জায়।
তাই তোমাকে চেনে ওরা
সহজেই,
ছবিতে দাড়ি থাক্
আর নাই থাক্।

সূর্য সুষমা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হঠাৎ কে যেন ডেকেছে। দূরের
রিক্ত পলাশ কুঞ্জে
সন্ধ্যার শ্লথ চরণ; অথবা
রমণীরা চলে জল্‌কে।
সম্মুখ রণে পরাভূত, আর
সহসা শূন্য তূণ যে;
ভুলে গেছি সেই সূর্যকে, সেই
জীবনকে—উচ্ছলকে।

জীবনকে ভুলে গেছি; এবার নিভৃতে পলায়ন।
পলায়ন জ্বালাময় সংগ্রামের গভীরতা থেকে
নেপথ্যের অন্ধকারে। কোথা সেই একনিষ্ঠ মন,
কোথা সেই জলোচ্ছ্বাস, প্রেমের প্রগাঢ় আয়োজন
দেহমন ভাসাবার ? জীবনের স্বরূপ জানে কি ?
দুর্বল অক্ষম স্নায়ু। সর্বস্বান্ত জুয়াড়ী যৌবন।

হে রাত আমাকে ঢেকে ফেলো তুমি
হে রাত লজ্জা এ-কী এ,
সূর্যের বুকে একটি শপথ
ফুটবে না কোন দিন কি ?
যদিচ এখানে নপুংসকেরা
সিংহকে রাখে ঠেকিয়ে—
এ-কী এ ক্লান্তি ! হে সময়, তবু
সূর্য-আশা বিলীন কি ?

এখানে মৌসুম আসে জীবনের সায়াহ্ন প্রহরে;
(সময়ের ধুলো ওড়ে !) সবুজের ছায়াও থাকে না।
চৈত্রের বিদীর্ণ মাঠে আপ্রাণ উল্লাসে থরে থরে
ঢেলে দিয়ে দৃপ্ত প্রাণ, কাঁটাগাছে আকীর্ণ কবরে
সে জল ঝিমিয়ে পড়ে। কঙ্কালের মাঠ যায় চেনা
স্নায়ুর ছায়ারা তবু সূর্যসুষমা খুঁজে মরে।

এ গাঁ থেকে ও গাঁ যাবার ওই একটিমাত্র পুল ভরসা। কাঠের নড়বড়ে পুল ছিল এক সময়ে, দুধারে তল্‌তা বাঁশের ধরণা। যুদ্ধের কল্যাণে ভোল ফিরে গেছে আজকাল— পাকাপোক্ত কংক্রীটের থাম আর লোহার পাতের বাঁধন। মজবুত না হলে টন টন চাল-বোঝাই লরীর ভার সইবে কেমন করে!

আজকালকার কথা নয়। পুল পাকা হবার ঢের আগে থেকে কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতো নিবারণ আর রাধা। চোখ নেই নিবারণের। চোখের পাতা দুটো বন্ধ, আর কেমন যেন ফুলো ফুলো। গলায় কণ্ঠি, জাত-বোষ্টম।

মোলায়েম চেহারা ছিল রাধার। সে শুধু খঞ্জনি বাজিয়ে গানের ধুয়ো ধরতো, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে পয়সা কুড়াতো। গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে চলতো নিবারণ।

মাঝে মাঝে একলা দেখা যেতো নিবারণকে, যে সময়টা বাঁশঝাড়ের পিছনে শুকনো কাঠ-কুটো জড়ো করে রান্না চড়াতো রাধা মাটির মালসায়। কিই-বা রান্না! দুমুঠো চাল, আর কচু কিংবা ডুমুর কয়েকটা ফেলে দিতো হাঁড়ির মধ্যে। কিন্তু এই রাঁধতেই হাঁপিয়ে উঠতো রাধা। কোমরে শাড়িটা পাক দিয়ে নীচু হয়ে ইঁটের উনানে ফু দিতে দিতে রাঙা হয়ে উঠতো তার মুখ। হাত দিয়ে কপালের চুল-গুলো সরাতে সরাতে গালি পাড়তো রাধা— কেবল গেলা আর গেলা। একটি বেলা তার কামাই আছে? নিজের আর কি, দিব্যি ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে কেত্তন গাওয়া হচ্ছে, আর এদিকে মর শালী তুই জান দিয়ে! সাধে কি আর বলে, 'কাণা খোঁড়া, একগুণ বাড়া'।

কথাগুলো কানে যায় নিবারণের। কানে যাবার জন্যই অবশ্য বলা। নইলে অনায়াসেই মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে পারতো রাধা। কিন্তু তাতে কি আর মনের জ্বালা মেটে!

তুই আমায় কাণা বললি রাই!

গলাটিও ভারি মিষ্টি নিবারণের। আদর করে রাধাকে রাই বলে নিবারণ। খুব রাগলে বলে হারামজাদী আর ছোটলোকের বেটি। কিন্তু রাগে না নিবারণ চট করে। খুব রাগা-রাগির কিছু হলে মাথাটা পুলের থামে ঠেস দিয়ে সুর করে গাইতে থাকে: "ও কুব্জার বঁধু! রাধানাথ আর বলবো নাকো—"

ওরা এসেছে রতনপুর থেকে। অন্তত লোকে তো তাই বলাবলি করে। কুঞ্জ বৈরাগীর আখড়া বিখ্যাত আখড়া এ তল্লাটে। নানা জায়গা থেকে বোষ্টম এসে জড়ো হতো, আর রাতদিন খোল-করতালের আওয়াজে সরগরম হয়ে থাকত পাড়াটা। কুঞ্জ বৈরাগীর একমাত্র মেয়ে এই রাধা—বাপের আদরে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করতো। বাপ চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গেই নিখোঁজ হলো রাধা। চৈতনকেও পাওয়া গেল না কোথাও। ভারি মিষ্টি মৃদঙ্গের হাত ছিল চৈতনের। রাধার কথা মানুষে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল—এমনি সময়ে ফিরে এলো রাধা, সঙ্গে অন্ধ নিবারণ।

অনেক বছর পরে ফিরলো রাধা—ফিরে কিন্তু তার বাপের আখড়ার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলো না। খড়ের চালা ভূমিসাৎ করে সেখানে ফুলের বাগান করেছে জ্ঞানদা গোঁসাই। তার কাছে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারল না রাধা। আসবার সময় কেবল আঙুলগুলো মটকে বলে এলো: মরবি, মরবি, নির্বংশ হবি, বংশে বাতি দেবার তোর কেউ থাকবে না।

নিবারণের হাত ধরে গাঁ ছাড়লো রাধা। দুগাঁয়ের মাঝামাঝি পুলের ওপর এসে আস্তানা বাঁধলো। এই তার ভালো। নিবারণের গানের তালে তালে খঞ্জনি বাজায় আর আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে পথচলতি লোকদের দিকে। অন্ধ নিবারণের গলা, আর তরুণী রাধার কমনীয় দেহশ্রী পথচারীদের ভিড় জমিয়ে তোলে। রোজগারও নেহাৎ মন্দ হয় না তাদের।

নিবারণ তবু বলে মাঝে মাঝে—রাই, কতদিন আর এ তেপান্তরে থাকবো, তার চেয়ে চল গাঁয়েই ফিরে যাই। ইস্কুল বাড়ির দাওয়াতেই না হয় কাটাবো দুজনে।

খিঁচিয়ে ওঠে রাধা: তোমার সখ হয়ে থাকে তুমি যাও। গাঁয়ে আমি আর পা দিচ্ছি না। তবে একটা কথা বলছি তোমায়, কুঞ্জ বৈরাগীর ভিটে যারা চষে মাটি করে ফেলেছে, তারা মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে, মরবে, মরবে।

আন্দাজে হাতটা দিয়ে রাধার পিঠটা চাপড়ায় নিবারণ: তুই একটুতে বড্ড চটে যাস রাই। শাস্তি যিনি দেবার, তিনি ঠিক বিচার করে যাবেন, তাঁর কাছে মাপ নেই রে, মাপ নেই। তা বলে আমরা কেন নিমিত্তের ভাগী হই।

এই লোকটাকে যেন চিনে উঠতে পারে না রাধা। চৈতনকে সে চিনেছে হাড়ে হাড়ে। দরকার ফুরাতেই সরে পড়েছে সে, যেমন আর পাঁচজনে ক'রে থাকে। তারও যেমন বরাত, কণ্ঠি বদল করার আর লোক পায় নি যেন সে। ভাগ্যে এই নিবারণ ছিলো, নইলে বিদেশ বিভুঁইয়ে কি বিপদেই পড়তো রাধা। হোক অন্ধ, কিন্তু তবু তো পুরুষ মানুষ। হাত ধরে মাইলের পর মাইল চলা যায় সাহসে বুক বেঁধে। রাধার দিকে চেয়ে থাকে সবাই, সারা গায়ে যেন হুল ফুটতে থাকে রাধার। মরণ, যত সব আবাগীর ব্যাটাদের!

দিন কতক একটু কষ্ট হয়েছিলো তাদের, কাঠের নড়বড়ে পুলটা ভেঙে যখন ইঁট, চুণ, সুরকি দিয়ে পাকা গাঁথুনি শুরু হয়েছিলো। কি ভাগ্যি, শুকনা খটখটে ছিলো সময়টা, নয়ত ঘেঁটুবন পরিষ্কার করে মাঠের ওপর শুতে পারতো না কি তারা! বর্ষাকাল হ'লে ভিজে চুপসে যেতো দুজনে।

এখন অবশ্য আর কষ্ট নেই কোন। পুলের তলাটা পরিষ্কার ক'রে দিব্যি শুয়ে থাকে দুজনে। শুয়ে শুয়ে রাধা হাসে আর বলে: দেখলে, নাটসায়েব আমাদের দুঃখু দেখে কেমন পাকা ইমারত তৈরি করে দিয়েছে। না রোদের তেজ, না বর্ষার ঝাপটা—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও দিনরাত!

নিবারণও হাসে, সত্যি নাটসায়েবের তোর জন্যে ভাবনার অন্ত নেই, রাই। আমার কেবল ভয় হয় কোন্‌দিন হয়ত ভোঁ-গাড়ি এসে তোকে তুলেই নিয়ে যাবে এখান থেকে।

মোটরকে ভোঁ-গাড়ি বলে নিবারণ। কিন্তু কথাটা মনে ধরে না রাধার: ঝাঁটা মারি তোর ভোঁ-গাড়ির মুখে। গাড়ি আনলেই আমি যাচ্ছি কিনা!

মুখ টিপে টিপে হাসে নিবারণ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে: কিন্তু ধর চৈতনই যদি নিতে আসে? তখন যাবি তো আমায় ফেলে রেখে।

এবারে যেন জ্বলে ওঠে রাধা, কি করেছি আমি তোমার, যে রাত্তির দিন আমায় এমনি ক'রে জ্বালাবে তুমি! ফের যদি অমন করো তো, ঠিক আমি খালের জলে ডুবে মরবো একদিন।

বলতে বলতে কেঁদেই ফেলে রাধা। আঁচলটা চোখে চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। নিবারণের মুখটাও কেমন যেন শুকিয়ে আসে। দু'একবার রাধার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঝামটা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দেয় রাধা। তখন গুণ গুণ ক'রে গাইতে থাকে নিবারণ, "সখিরে কে বলে পিরীতি ভালো?"

গানটাও কিন্তু জমে না। উঠে যায় নিবারণ। খালের ধারে চুপ করে বসে থাকে আর হাতের লাঠিটা জলে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে নাড়ে।

রাধার কিন্তু এ কান্নার কোন মানে হয় না। ঘোষেদের মেজ শরিকের একটি ছেলে কদিন ধরে খালের ধারে এসে বসছে ছিপ নিয়ে। এদিকটায় সে কেন যে বসে, ভগবানই জানেন! এক হাঁটু জল, তাও কাদাগোলা, মাছ বিশেষ থাকবার কথা নয় এদিকটায়। তবুও সারা দুপুরটা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে

চুপটি ক'রে ফাৎনা ভাসিয়ে বসে থাকে ছেলেটি।

পায়ে পায়ে ঠিক সেই দিকেই এগিয়ে যায় রাধা অকারণে হাতের টিনের মগটা জলে ডুবিয়ে দেয় আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে ছেলেটির দিকে।

এ সুযোগ কিন্তু ছাড়ে না ছেলেটি। চোখ রাঙায় আর বলে,—কিগো বাছা, জল ঘোলাচ্ছ কেন? দেখছো না ছিপ নিয়ে বসেছি এখানে।

বড়ো আঘাটায় বসেছো বাবু, ফাৎনা ভাসানোই সার তোমার।

ছেলেটিও ছাড়ে না ঃ মাছ কি আবার ঘাট বুঝে আসে নাকি?

চুনোপুঁটির কথা জানিনে বাবু, কিন্তু বড়ো মাছ কি আর সব ঠাঁই আসে?

লাফিয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে। টেনে টেনে হাসে আর বলে ঃ খেলিয়ে তুলতে জানলে বড়ো মাছও ঠিক ডাঙায় ওঠে।

তাই নাকি বড্ড যে গুমোর! চোখ দুটো তেরছা ক'রে ভারি মিষ্টি হাসে রাধা।

হেঁয়ালি ছেড়ে ছেলেটি এবার আসল কথাটা পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসে রাধা, ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বলেঃ আস্তে গো আস্তে, আমার সোয়ামী অন্ধ বলে কালা নয় কিন্তু।

কালা নিবারণ সত্যিই নয়। তবে সব কথা ঠিক কানে যায় না তার। রাধা ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করে ঃ কে লা রাই, কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলি?

খেঁকিয়ে ওঠে রাধা, লোকে গরু বাঁধবার আর জায়গা পায় না। আর একটু হ'লে হোঁচট খেয়ে মরেছিলুম আর কি।

যেদিকে হোঁচট খাবার ভয়, সেদিকে যাসনি রাই ঃ কথার শেষে মুখ টিপে টিপে হাসে নিবারণ।

আচমকা যেন ধাক্কা খায় রাধা। কি যে আবোল তাবোল বকে নিবারণ। কথার যেন কোন ছিরিছাঁদ নেই। কেবল হেঁয়ালি আর হেঁয়ালি।

বুঝিনে বাপু তোমার কথার ঢং। নিজে তো দিব্যি ব'সে আছো পায়ের ওপর পা তুলে, রান্নাবাড়ার জন্যে জল তো আমাকেই বয়ে আনতে হবে, না কি?

জল তো রাধাই আনে। ছিরি কেষ্ট কেবল বাঁশী বাজায়, আর রাধার পায়ের আওয়াজ শোনে।

মুখে আগুন অমন ছিরিকেষ্টর।

কথাটা ব'লে আর দাঁড়ায় না রাধা। নিবারণের সামনে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় লাগে তার। সবই বুঝতে পারে নাকি লোকটা! বুঝতেই যদি পারে তো স্পষ্ট করে বলে না কেন মুখ ফুটে!

শুধু কি এই? হাটে যাবার পথে মাথার ঝাঁকা নামিয়ে রেখে হাত পা ছড়িয়ে বসে হারাণ দাস। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে ঃ না, আর পোষায় না এ বয়সে। ভূতের ব্যাগার আর পারি না খাটতে। নেও গো বাবাজী, গান ধরো একটা। তোমার গান শুনলে পথের ছেরোমটা যেন লাঘব হয় একটু।

গান শুনতে যে খুব উৎসুক হারাণ, এমন নয়। রাধার গা ঘেঁষে বসে বলে ঃ মাসীর খবর কি গো?

বাবাজী আর মাসী—দুটো সম্পর্কই হারাণের পাতানো, সুতরাং তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না কেউ। নিবারণ তবু বলতো প্রথম প্রথম ঃ বা হারুদা, বাবাজী আর মাসী এটা কি রকম হলো?

ওই বেশ রকম হ'লো। যে নামে ডেকে যে আনন্দ পায়,—কেউ বলে কালী, কেউ বলে কেষ্ট—মুলে সবই এক—বুঝলে বাবাজী।

বাবাজী ঠিক বোঝে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না হারাণ। এ কথার পরে অবশ্য এ নিয়ে আর প্রশ্ন চলে না। কেবল নিবারণ হাসে মুখ টিপে টিপে।

রাধা কিন্তু রেগে ওঠে; আমি তোমার মাসী হ'তে গেলাম কোন্ দুঃখে গা? আমি তোমার নাতনীর বয়সী!

ফিক্ ফিক্ করে হাসে হারাণ। আর বলে ঃ তবে তুমি কি আমার সেই মাসী! তুমি হচ্ছো আমার মালিনী মাসী।

মুখটা নিচু করে হাসে আর বেশ জোরেই বলে রাধা,—মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে বুঝি ভীমরতি ধরেছে!

এততেও কিন্তু দমে না হারাণ। হেসে হেসে দিব্যি জমিয়ে তোলে। নিখরচায় যে আড্ডা জমায়, তাও ঠিক নয়। যাবার সময় প্রায়ই আলু কিংবা বেগুন গোটা কয়েক হাতে গুঁজে দেয় রাধার,—আমার মাথার দিব্বি মাসী, বাবাজীকে আমার আলু সেদ্ধ ক'রে দিতেই হবে আজ। আহা, মিছরির মতন গলা, পেটে ভাত না পড়ে পড়ে মিইয়ে গেছে যেন। আলু আর বেগুন দেবার সময় ইচ্ছা করেই নিজের হাতটা একটু ছোঁয়ায় রাধার হাতে। সারা দেহের চামড়া আর মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে যেন ঝুলে পড়েছে হারাণের। গা ঘিনঘিন করে রাধার কিন্তু তবু হাতটা একেবারে সরিয়ে নেয় না। তরি-তরকারি প্রায়ই নিয়ে আসে হারাণ। আজ-কালকার বাজারে কেউ হাত তুলে দেয় নাকি এসব!

হারাণের পায়ের শব্দ ঠিক ঠাওর করতে পারে নিবারণ। ফিস ফিস করে বলে, ওই তোর আয়ান এলো রাই!

রাধা কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ঝাঁটা মারি তোমার রসিকতার মুখে। লজ্জাও হয় না তোমার যা তা কথা বলতে? কোন্ হারামজাদ আর কথা বলে ঐ বুড়োটার সঙ্গে?

সত্যিই ভয় পায় নিবারণ। কেলেঙ্কা বুঝি একটা করে বসে রাধা। গায়ে হা বুলোতে বুলোতে মিষ্টি গলায় বলে,—আচ্ছ পাগলী তো, ঠাট্টাও বুঝিস্ নে তুই! আহ কন্দুর থেকে লোকটা আনাজ-পাতি নি আসে হাতে করে, তার ওপর অমন মুখ ভ করতে আছে নাকি?

মুখ ভার করবার মেয়ে নাকি রাধা অন্তত কার কাছে আর কোন্ সময়ে মুখ ভ করতে হয়, তা বেশ ভালোভাবেই জানা আ তার।

হারাণের কিন্তু আজ ভারি হাসিখু ভাব। হাতের গামছাটা ঘুরিয়ে হাওয়া খে খেতে বলে ঃ আজ মাসী, কি এনেছি বলো তোমার জন্যে?

আমার ছেরাদ্দের চাল আর কি! গল ঝাঁঝালো হলেও রাগটা কপট। সেটা হারা বুঝতে পারে। নিবারণ তো বোঝেই।

জিভটা কেটে কানে আঙুল দেয় হারাণ ছি, ছি, মাসীর মুখে আজকাল কিছু আটক না। অমন কথা মুখে আনো কি করে?

রীতিমত যেন বিচলিত হয়ে পড়ে হারা তারপর একটু থেমে বাজরা থেকে সন্তর্প কাগজে মোড়া কি যেন বের করে; দেখি হা বাড়াও তো মাসী, এই দেখো কি এনেছি।

হাতটা অবশ্য তখুনি বাড়ায় রাধা কি মুখে বলে,—কি আবার ছাই-পাশ এনেছো —পচা আলু না ঘেয়ো কুমড়ো?

কথাটা কিন্তু আর শেষ করতে পারে উবু হয়ে বসে পড়ে বিস্ময়ে, তারপর বিস্ম ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠে বলে,—বাঃ, বাঃ, জিনিস তো!

কি জিনিস গো? আর থাকতে পারে নিবারণ।

কাচের চুড়ি গো বাবাজী। গেছ পলাশপুরের মেলায়। সারা মেলা ঘুরে হয়রাণ। ভাবলুম মাসীর জন্যে কি নে য হঠাৎ খেয়াল হ'লো মাসীর অমন লাল ট টুকে হাত দুটি খালিই যেন দেখে এসেছিল হঠাৎ থেমে গিয়ে কেমন যেন হাপাতে থ হারাণ। চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। বু ভিতরটায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে।

নিবারণ কিন্তু শান্ত গলায় বলেঃ চু গুলো নীল রংয়ের এনেছো তো হারু রাইয়ের ফর্সা হাতে নীল চুড়ি কিন্তু ভ মানাবে।

কথা কয় না হারাণ। চুড়িগুলো অ নীল রংয়ের নয়। অত হিসেব ক'রে রং মিলি আনবার মত বুদ্ধিও নেই হারাণের। তা হ'ে দিব্যি মানাবে চুড়ির গোছা রাধার হা কচি কলাপাতা রংয়ের ওপরে সোনালী ফু দেওয়া।

একটু দম নিয়ে হারাণ বলে,—হাত বের
। মাসী, পরিয়ে দিই নিজের হাতে।
নিবারণের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে রাধা।
অন্ধ লোকটাকে কেন জানি বড্ড ভয় করে
ার। কোথায় যেন আর একটা চোখ আছে
সেই চোখে সব কিছুই দেখে ফেলে
কটি। কথা বলে না মুখে, কিন্তু কেমন যেন
িকি হাসে। সেই হাসির কাছে আপনা
কেই যেন ধরা পড়ে যায় রাধা।

অনেকক্ষণ ধরে চুড়ি পরায় হারাণ। সময়
কটু লাগবে বই কি! এক গাছা, দুগাছা
। অনেকগুলো চুড়ির গোছা। কিন্তু তবু
ন একটু বেশী সময়ই নেয় হারাণ। ভারি
ন্তর্পণে পরায় চুড়িগুলো। তাড়াতাড়িতে
ড়ি ভেঙে যেতে পারে, তা' ছাড়া ভাঙা চুড়িতে
াধার হাত কেটেও তো যেতে পারে! তার
চেয়ে ধীরে সুস্থে পরাণোই ভালো। চুড়ি
পরানোতে দেরির কারণটা কতকটা স্বগতোক্তির
মতো করেই শুনিয়ে দেয় হারাণ।

হারাণ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে নিবারণ। ওর এই থমথমে ভাবটায় ভারি ভয় লাগে রাধার। তাকে ঠেলা দেয় আর বলে,—কি গো, চুপ করে আছো যে? কি ভাবছো?

ভাবছি না কিছু, শুধু আয়ানের কথা শুনছি।

আয়ানের কথা? মানে?

ওই তোমার চুড়ির ঝুনঝুন আওয়াজে অনেক কথা বলছে আয়ান, যে কথা সে সাহস করে মুখ ফুটে এতদিন বলতে পারে নি।

খেঁকিয়ে ওঠে রাধা,—তুমি পেয়েছ কি আমাকে? সময় নেই, অসময় নেই, কেন তুমি এমনি করে হেনস্তা করবে আমায়? এ চুড়ি আমি আজ পাথরে ঠুকে ভাঙবো। তোমার মনে যখন এত গরল, দরকার নেই আমার কারুর দেওয়া জিনিস নিয়ে।

খর খর ক'রে উঠে যায় রাধা।

তার পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চেঁচিয়ে বলে নিবারণ,—রাই, ও রাই, রাগ করিস নি শোন্। আমার মাথার দিব্যি, ও চুড়ি যদি ভাঙিস তো, মরামুখ দেখবি আমার।

চুড়ি অবশ্য ভাঙে না রাধা। ব'য়ে গেছে তার অমন সখের চুড়িগুলো পাথরে ঠুকতে। পুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। চাঁদের ম্লান আলোয় কিন্তু ভারি সুন্দর দেখায় ওর চুড়ি পরা নিটোল দুটি হাত।

সারা পায়ে কাপড়ের ফালি জড়ানো, উস্কোখুস্কো একমাথা চুল, বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে পুলের ওপাশে এস বসে মেয়েটি। বসেই মড়াকান্না শুরু করে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। তারপর কান্না থামিয়ে পিটপিট ক'রে চেয়ে থাকে নিবারণ আর রাধার দিকে।

গজ গজ করে রাধা,—মরণ মাগীর। নিকুচি করেছে চেয়ে থাকার। গরম খুন্তি পুড়িয়ে চোখদুটো গেলে দিতে ইচ্ছে হয়।

সাত সকালে উঠে কাকে গাল দিতে শুরু করলি রাই? তোর জ্বালায় কি পথও চলবে না লোকে? আস্তে আস্তে বলে নিবারণ।

থামো, থামো, পথচল্‌তি লোককে গাল দেওয়া আমার স্বভাব নয়। মরবার আর জায়গা পায়নি মাগী।

ব্যাপারটা আবছা বোঝে নিবারণ। কান্নার আওয়াজও গিয়েছিলো তার কানে। পুলের ওপাশে নতুন কেউ এসে বসেছে বুঝি। আহা, তা বসুক, পুল কি ওদের একার নাকি? অনেক দুঃখ পেলে তবে লোকে বসতঘর ছেড়ে ছুড়ে পথে এসে আস্তানা বাঁধে। তাই খুব নরম গলায় বলে নিবারণ, আহা, থাক্, থাক, কেষ্টর জীবকে হেনস্তা করতে নেই রাই। আমাদের দুমুঠো জোটে তো ওরও জুটবে।

সারা গাটা যেন জ্বলে ওঠে রাধার; ওঃ, দরদ যে একেবারে উথলে উঠছে। কাঁচা বয়সের মিঠে গলায় যে একেবারে মশগুল হ'য়ে গেলে!

নিবারণ হাসেঃ কাঁচা বয়স আর মিঠে গলা তো তোরই রাই। মশগুল হ'য়েই তো আছি, থাকবোও জন্ম জন্ম।

থাক্, ঢের হ'য়েছে ন্যাকামি। বেহায়া মাগী চেয়ে আছে দেখো ড্যাবড্যাব ক'রে।

সত্যিই চেয়ে ছিলো সৈরভি—নিবারণের দিকে নয় রাধার দিকে। ও যেন চীৎকারের হেতুটা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না; এতো রাগ করছে কেন মেয়েটি। পিছনে চাইবার মতো কিছু থাকলে ঘর ছাড়ে নাকি কোন মেয়ে? সতেরো মাইল পথ একটানা হেঁটে বিদেশ বিভূঁইয়ে বাসা বাঁধে কখনো? কিন্তু এসব কথা বলা যায় নাকি কাউকে? ফুঁপিয়ে আবার কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

কে কাঁদে রাই? কেমন যেন বিচলিত হ'য়ে ওঠে নিবারণ।

কে আবার? তোমার আদরের চন্দ্রাবলী গো, ছিরিকেষ্টর কুঞ্জে আসবে বলে বায়না ধরেছে।

গুন গুন করে গান ধরে আর মুচকে মুচকে হাসে নিবারণ। হাসির ভঙ্গিতে যেন জ্বলে ওঠে রাধা ঃ বলি অতো হাসির ঘটা কেন? বড্ড ফূর্তি যে।

ফূর্তি একটু সত্যিই হয়েছে রাই। ভাবছি, পালাটা বুঝি জমলো এবার।

মুখে আগুন তোমার পালা জমার। রাগ করে উঠে যায় রাধা।

সৈরভি তখনও চেয়ে আছে হাঁ ক'রে,—তবে এবার চেয়ে থাকে নিবারণের দিকে।

ভারি মুস্কিলে পড়ে যায় রাধা। যখন তখন চোখাচোখি হ'য়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটিরও যেন কাজ নেই আর। সদা-সর্বদা কেমন ভাবে যেন আগলে বেড়ায় রাধাকে।

সেদিন জামরুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবে কথা শুরু করেছে ঘোষেদের সেই ছেলেটির সঙ্গে। এদিকটা বেশ একটু নির্জন। পথ ছেড়ে ঠিক দুপুর-বেলা মাঠের মাঝখানে কে আবার আসতে যাবে? ভারি ভালো লাগে ছেলেটির কথা শুনতে। কিছুটা ভয় আর কিছুটা উদ্বেগ মিশে মোলায়েম গলার আওয়াজ। কিন্তু ভালো করে কথা বলবার জো আছে নাকি কারুর সঙ্গে! ঠিক এসে জুটেছে মেয়েটি। রাধার দিকে আড়চোখে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ায় রাধা। ভালো আপদ! ছেলেটি হাসে,—এটি আবার কে? এ রত্ন জোটালে কোত্থেকে?

রত্নই বটে। হাড়জ্বালানী, মরবার জায়গা পায়নি আর? মুখটা বেঁকিয়ে গজ গজ করতে থাকে রাধা।

মেয়েটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না কিছুতেই। তখনো হাসে ঠোঁটটা উল্টে, আর দাঁড়িয়ে থাকে কোমরে হাত দিয়ে।

রাধা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পথ আগলে দাঁড়ায় সৈরভি,—ও রাই, পুকুর-পাড়ে একরাশ হিঞ্চে শাক হ'য়েছে, যাবি তুল্‌তে রাই? গাটা রি রি ক'রে ওঠে রাধার। সাত পুরুষের কুটুম আমার। গায়ে প'ড়ে, আলাপ করতে লজ্জাও হয় না!

সৈরভিকে এড়িয়ে যায় রাধা। একেবারে নিবারণের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—যত সব আপদ! আর কোন চুলোতে মরতে জায়গা পায় না কেউ, সব জুটেছে এইখানে।

এক যমুনায় সবাই ডুবতে চায়, রাই। এ চুলোয় মরতে পারাও যে সুখের। নিবারণের গলাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

থামো বাপু, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। মরছি আমি নিজের জ্বালায়!

বুকের ঘা কি না, মোটে শুকোতে চায় না রাই।

চেয়ে চেয়ে দেখে রাধা। এত ঘুরিয়ে কথা ব'লে কি আরাম পায় লোকটা? এর চেয়ে বকে না কেন ওকে, কিংবা চুলের মুঠি ধরে গোটা কয়েক কিলও তো বসিয়ে দিতে পারে পিঠে, যেমন ভাবে কিল বসাতো চৈতন কথায় কথায়; আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রাধা আর বসে নিবারণের গা ঘেঁষে। নিবারণের কোলে মাথাটা রেখে শুতে গিয়েই কিন্তু চমকে ও উঠে বসে। আঃ! এখানেও চেয়ে আছে সৈরভি পুলের থামের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনিভাবে ঠোঁটটা উল্টে সে হাসছে। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হয় রাধার। ও বুঝি সত্যি

পাগলই হ'য়ে যাবে একদিন নিবারণের এই বাঁকা বাঁকা কথা, আর সৈরভির ঠোঁট উপ্চে হাসির জবালায়!

রাধার আর ভাবনার অন্ত নেই। কদিন ধ'রে কেমন সব কথা যেন বলতে শুরু করেছে ছেলেটি। এই খাল পার হ'লেই সোনারকাঠি গাঁ, সেই গাঁয়ে চলে যাবে দুজনে। ছি, ছি, এভাবে ভিক্ষে করবে নাকি সারাটা জীবন! লোক দেখলেই হাত পাতবে আর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনী গাইবে দুঃখের! এ জীবন সত্যিই ভালো লাগে না রাধার।

বিকেলে সেজেগুজে কাঁচপোকার টিপ একটা কপালে পরে খালের ধারে গিয়ে বসে বসে দেখে রাধা। চেহারা তার খারাপ নাকি! টানা দুটি চোখ, আর টিকোলো নাক। চেয়ে চেয়ে আশ যেন আর মেটে না রাধার। চোখটা তুলে আর একটু দূরে ও চেয়ে দেখে। পুলের প্রকাণ্ড ছায়ার পাশে ছায়া পড়েছে নিবারণের। বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে নিবারণ। এই লোকটার পাশে বসে সারাটা জীবন কাটাতে হবে তার!

বিকেলের ঝিরঝিরে হাওয়ায় কে'পে ওঠে খালের জল—রাধা, নিবারণ আর পুলের ছায়া অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। বুক কাঁপিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রাধা, আর পায়ে পায়ে সরে আসে খালের পাড় থেকে।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকে নিবারণ,—রাই, ও রাই, আমাকে নিয়ে চল্, এখনি বিষ্টি নামবে, ভিজে একসা হয়ে যাব।

সত্যিই বিষ্টি নামবে এখনি। কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে সারা আকাশ। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। প্রবল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। ঠান্ডা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে ধুলো আর শুকনো পাতার রাশ।

এমনি সময়ে নিবারণের হাত ধরে পুলের তলায় নিয়ে যেতো রাধা। পুলের খাড়া পাড় বেয়ে একলা নামতে ভয় করে নিবারণের। লাঠি ঠিক জায়গায় না ফেলতে পারলেই পা ফসকে পড়বে খালের জলে। জল হয়ত বেশী নেই,—কিন্তু অত ওপর থেকে এই কাদাপাঁকের মধ্যে পড়লে বাঁচবে নাকি নিবারণ !

চেয়ে চেয়ে দেখে সৈরভি।

রাধা আর আসবে না। সন্ধ্যার একটু আগে খালের পাশ দিয়ে চলে গেছে রাধা। ওর যাওয়ার ধরণ দেখেই মনে হয়েছিল সৈরভির, আর বুঝি ফিরে আসবে না রাধা। বৈ'চি ঝোপের কোণ ঘে'ষে বাঁক ঘুরেছিলো খালটা—সেই বাঁকের মুখে সে মিশিয়ে গিয়েছিলো।

রাই, ও রাই, বিষ্টি শুরু হয়েছে রে,—কোথায় গেলি এ সময় ? সত্যিই কাতর হ'য়ে পড়ে নিবারণ।

চেয়ে চেয়ে তখনো দেখে সৈরভি। তারপর কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই এগিয়ে যায় নিবারণের দিকে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে তুলে ধরে নিবারণের হাতটা।

এলি রাই? বাঁচলুম। কোথায় ছিলি এই ঝড়-বৃষ্টিতে? তাইতো বলি, রাই কি আমায় ভুলে থাকতে পারে কখনও ?

কোন কথা বলে না সৈরভি। হাত ধরে নিবারণ। একটা হাত দিয়ে সৈরভির মাথায় থাকে যেদিকটায়—সেখানে।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তীরের ফলার মত চোখে-মুখে এসে লাগে। কিছুটা এগিয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ে নিবারণ,—এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রাই? এ যে উল্টোপথ।

উল্টোপথ! চমকে ওঠে সৈরভি। নিবারণের হাত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে নিজের হাতটা। কিন্তু এবার হাত ছাড়ে না নিবারণ। একটা হাত দিয়ে সৈরভির মাথায় আর পিঠে হাত বুলোয় তারপর হো হো করে হেসে ওঠে আর বলে—ও, বৃন্দাবনের পালা শেষ হলো বুঝি। এবার মথুরায়—তা বেশ বেশ। কথাটা বলেই আবার ভীষণ জোরে হেসে ওঠে নিবারণ।

হাসির শব্দে এবার সত্যিই ভয় পায় সৈরভি। নিবারণের মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। ঠোঁটটা মুচকে মুখ টিপে হাসছে নিবারণ। কিন্তু দুটি চোখের কোণ বেয়ে নেমেছে বড় বড় দুটি জলের ফোঁটা— বৃষ্টির জলই পড়েছে বুঝি গড়িয়ে।

জাপানীর হাতে বন্দী...

মেজর সত্যেন্দ্র নাথ বসু

[মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু সিংগাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ এম্বুলেন্স বাহিনীর ডাক্তার হিসাবে জাপানীদের হাতে বন্দী হন। যুদ্ধের সময় জাপানীদের সম্বন্ধে এদেশে নানা রকম প্রচারকার্য চালান হইয়াছিল। যুদ্ধবন্দীদের উপর জাপানী-দের ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতার কথা পাঠকগণ এই প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারিবেন। ইনি বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভের পর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার তৎ-সম্বন্ধীয় কৌতূহলোদ্দীপক রচনা ইতঃপূর্বে ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক—'দেশ']

সিংগাপুরে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

কয়েকদিন থেকেই জাপানী ও বৃটিশ—দুইপক্ষের কামানগুলি ঘন ঘন গর্জন করে তাদের বিশ্বধ্বংসী গোলাবর্ষণ করছে। এই ভীষণ শব্দে প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে কানের পর্দাগুলি এই বুঝি ফেটে গেল। আশে-পাশে চারদিকেই ভীষণ শব্দে ঘন ঘন কামানের গোলা ফেটে পড়ছে। আহতদের আর্তনাদ, আর্তদের ইতস্তত ছোটাছুটি আর যারা চিরদিনের জন্যই এ সংসারের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে তাদের বীভৎস মূর্তি—সব কিছু মিশিয়ে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে, তা বোধহয় প্রকৃতপক্ষে নরকের দৃশ্য।

সারা আকাশ ছেয়ে গেছে জাপানীদের প্লেনে। মাঝে মাঝে বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে তারা নীচে নেমে আসছে; প্রাণভয়ে সকলেই আশ্রয় নিচ্ছে মাটীর নীচে গর্তে বা বড় বড় বাড়ির মধ্যে। হত্যার এক বিরাট পৈশাচিকময় মূর্তি নিয়েই প্লেনগুলি নীচে নেমে আসছে। তাদের ইঞ্জিনের ঘর্ঘর ধ্বনি, মেশিনগানের টিক টিক শব্দ নীচের অসহায় নরনারীর বুকে যেন ভারী লোহার মুগুর পিটছে। বিপদের চাইতে বিপদের ভয়ই বেশি, মৃত্যুর চাইতে মৃত্যুভয়টাই বেশী। চারিদিকে আর্তনাদ, প্রাণভয়ে ছোটাছুটি শুধু মানুষেরই নয়, এমন-কি গৃহ পালিত কুকুর-বিড়ালগুলিও ভয়ে ভয়ে মানুষের অনুসরণ করছে গর্তের নীচে প্রাণ বাঁচাবার জন্য। তারপর প্লেনের মেশিনগান থেকে টিক্ টিক্ শব্দে ছুটে আসছে অবিশ্রান্তভাবে অসংখ্য অগ্নিশেল। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু গুলী আর গুলী। মাঝে মাঝে বাজ পড়ার শব্দকেও হার মানিয়ে ভীষণ শব্দে ফেটে উঠছে বোমা। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার, তারপর শুধু আগুন আর আগুন। তার লেলিহান শিখা আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে যেন আনন্দে মেতে উঠছে। ক্রমে ক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে—হয়তো কোনও পেট্রল ডাম্পের আগুন। ভয়ে সকলের মুখ ফ্যাকাসে।

আমাদের হাসপাতালের বড় সিঁড়িটার নীচে প্রায় সব দেশের লোক আশ্রয় নিয়েছে। একজন গোরা—মাঝে মাঝে প্রলাপের মতো চীৎকার করছে—"Where's God? Where's Christianity?" অন্যান্যরা আপন মনে বিড় বিড় করে হয়তো নিজ নিজ ভাষায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে এ যাত্রায় প্রাণটা বাঁচাবার জন্য। প্লেনের শব্দটা একটু দূরে মিলিয়ে গেলেই ভয়ার্ত ফ্যাকাসে মুখগুলিতে একটু একটু করে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা তুলে কান পেতে শোনে দূরের আওয়াজ। তারপর নানা সম্ভব অসম্ভব স্থান থেকে বেরিয়ে আসে অনেকগুলি প্রাণী। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "যাক এবারটা রক্ষা পাওয়া গেছে।" আবার মুখে রক্তের ঝলক দেখা দেয়, অধরে ফুটে উঠে হাসির রেখা। ধূম-পায়ীরা মহানন্দে কয়েকটি দমে একটি সিগারেট নিঃশেষ করে খুব আরামের সঙ্গে মুখভরা ধোঁয়াটা বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে আলোচনা শুরু করে—কোথায় ফাটলো বোমাটা? প্লেনগুলি চলে যাওয়ার পর সকলেই যেন অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে পড়ে। বলে, আমি তো মাথা তুলে দেখেছি বোমাটা পড়েছে ঠিক "র‍্যাফেল স্কোয়ারের" পাশেই। কেউ বলে, না, না বোমাটা তো পড়েছে ঠিক আমাদের থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে। তারপর শুরু হয় নানা তর্ক। কতগুলি প্লেন ছিলো এই ঝাঁকে। কেউ বলে একুশ, কেউ সাতাশ, আবার কেউ বলে পঞ্চাশ। অথচ আক্রমণের সময় মাথা তুলে ক'জন যে প্লেন গুণেছে সেইটাই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন।

যারা এদিকে ছিলো, তারা এ যাত্রায় গেলো বেঁচে! যারা ওদিকে ছিলো অর্থাৎ বোমাটা যেদিকে ফেটেছে, সেদিকে যা ক্ষতি হয়েছে, তা হয়তো অনেকেরই ধারণার অতীত। এতক্ষণে সেখানকার হাহাকারের রবে আকাশও হয়তো কেঁদে উঠেছে। যারা বেঁচেছে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে অপরকে বাঁচাবার জন্য! গৃহহারা ছুটেছে নূতন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে; আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আগুন নেভাবার চেষ্টা হচ্ছে। আর যারা আগুনের মধ্যে আটকা পড়েছে তাদের আর্তনাদ লক্ষ্য করে অনেক নির্ভীক বীর ছুটে চলেছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। আগুনের লেলিহান শিখা যম-দূতের নির্মম প্রহরীর মতই মানুষের প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তার নিজের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। একদিকে ধ্বংসের বিচিত্র আয়োজন, অন্য দিকে অসহায় মানুষের আত্মরক্ষা ও আহত এবং দুর্গতদের সাহায্য করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা। সবলের আক্রমণ থেকে দুর্বলের আত্মরক্ষা? কিন্তু একমাত্র ভগবানের নাম ছাড়া অন্য কি অস্ত্র আছে আত্মরক্ষার?

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপানীরা সিংগাপুর দ্বীপে অবতরণ করার পর থেকেই এইভাবে যুদ্ধ চলেছে! মনে পড়ে ছাত্র-জীবনে "All quiet on the Western Front"-এর ছায়াচিত্র দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম, যুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলাম ঐ ছবিখানা দেখে। সেদিন কি একবারও ভেবেছিলাম যে, 'আমার জীবনে সত্যই একদিন শুনতে পাবো আধুনিক যুদ্ধ-যন্ত্রের ঝনৎকার, চোখের সামনে দেখতে পাবো বাস্তব যুদ্ধ? আজ বাস্তব জীবনে যুদ্ধের প্রকৃত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সেদিনের সেই ছায়া-ছবি ছেলেখেলার মতই মনে হচ্ছে।

অপ্রতিহতভাবে জাপানী বিমানগুলি আকাশ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে। বিমানধ্বংসী কামানগুলি নীচে থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করা সত্ত্বেও যাদুমন্ত্রে রক্ষিত অক্ষয় কবচধারীর মতো জাপানী বিমানগুলি অবলীলাক্রমে সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশের বিমান-গুলি হঠাৎ যেন ভোজবাজির মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। সকলেই নিজের নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে দুর্বলের সহায় ভগবানের নাম নিচ্ছে। মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনই মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, সে কতখানি অসহায়। কারণ ঐ মৃত্যুর কাছে তাকে মাথা নত করতেই হবে, যতই সে বিজ্ঞান গর্বে গর্বিত হোক না কেন।

খবরের কাগজে বহুবার পড়েছি, সিংগাপুর দ্বীপটি খুবই সুরক্ষিত। বৃটিশ সিংহ বহুবার গর্জন করে বলেছে, "Singapore is the Gibraltar of the East"—বহু সৈন্য সমাবেশ দেখে ও এখানকার নৌঘাঁটির নানা চমকপ্রদ খবর শুনে আমাদের মনেও ধারণা হয়েছিলো যে জাপানীরা খুব শীঘ্র মালয় জয় করলেও সিংগাপুর অধিকার করতে তাদের নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আট তারিখে সিংগাপুরে অবতরণ করার পর থেকে তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে এবং যেরকম বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে আসছে তাতে আমাদের পুরানো ধারণা একেবারেই ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ভীষণ-ভাবে হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে, বহু সামরিক ও বেসামরিক লোক হতাহত হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেরকম দ্রুতগতিতে তাদের 'Moral' হারিয়ে ফেলেছে তাতে এখানকার যুদ্ধের ফল যে কি হবে তা বেশ স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে। শত শত ভীত কাতর কণ্ঠে শুধু এই প্রার্থনাই

শ্নেছি, এভাবে আর সহ্য করা যায় না, শীঘ্রই এ যুদ্ধের অবসান হোক।

এইরূপ আবহাওয়া ও পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে যতোটা সম্ভব সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমাদের হাসপাতালের কাজ চলছে। সমুদ্রের প্রায় তীরেই "Union Jack Club"-এ আমাদের হাসপাতাল অস্থায়িভাবে কাজ করছে। যতোদূর সম্ভব চেষ্টা করেও আমরা প্রত্যেক রুগীর সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারি নি। সত্যি বলতে গেলে, তা' ছিলো একেবারেই অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তেই অ্যাম্বুলেন্স বোঝাই আহতেরা হাসপাতালে এসে পেঁাচাচ্ছে। তার মধ্যে কতকগুলি মৃত, আর কতক আসছে যাদের আয়ুর প্রদীপ নিবু-নিবু, কিন্তু প্রাণটুকু এখনো ধুক ধুক করছে। কারো বা গোটা হাত বা পাখানাই উড়ে গেছে, কারো বা দেহ থেকে বোমার টুকরো মাংস উঠিয়ে নিয়ে এক বিরাট বীভৎস ক্ষতের সৃষ্টি করছে। কারো কারো সারা দেহ আগুনে ঝলসে গেছে। এদের সুবন্দোবস্ত শেষ হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স বোঝাই আহত লোক এসে পেঁাছাচ্ছে। অনেককে বাইরের মাঠেই রেখে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা।

অবস্থা খারাপ জানতে পেরেই আমাদের কর্তৃপক্ষ মিলিটারী হাসপাতালে যে সমস্ত নার্সেরা কাজ করতেন, তাঁদের বারো তারিখে জাহাজের পথে ভারতের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু'দিন আগে Medical Auxiliary Serviceএর ছয়জন চীনা নার্স, যাঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাদের কাজে সাহায্য করতে এসেছেন। সেবার কাজে এ'রা বেশ নিপুণ। পেশাদার মিলিটারী নার্সদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেবা করে আনন্দ পাবার জন্য —নিজেরা ধন্য হবার জন্যই এ'রা এসেছেন সেবিকার কাজে। আর মিলিটারী নার্সেরা এসেছেন, তাঁদের উচ্চ পদবী ও মোটা মাহিনার লোভে। বৃটিশ মিলিটারীর প্রত্যেক নার্সই হচ্ছেন অফিসার। অবশ্য এ'দের মধ্যেও যে দু'চারজন খুব প্রশংসনীয়ভাবে সেবার কাজ না করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

চীনা নার্সদের মধ্যে একজন নিতান্ত বালিকা, আমার সঙ্গে একই ওয়ার্ডে কাজ করছিল। সে তার দুঃখপূর্ণ জীবনের কতকটা কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলো। বড়লোকের মেয়ে, স্কুলে লেখা-পড়া করছিলো, বাপ-মা জাপানীদের ভয়ে দেশছাড়া হয়েছেন, কিন্তু দুষ্টু মেয়েটি তাঁদের অবাধ্য হয়েই হাসপাতালে কাজ করার জন্য এখানে রয়ে গেছে। নিরুপায় হয়েই বাপ-মা পালিয়েছেন হয়তো ভারতবর্ষে অথবা অস্ট্রেলিয়াতে মেয়েটিকে এখানে কোনও আত্মীয়ের কাছে রেখে। তারপর অবস্থা যখন আরও খারাপ হয়ে এলো, তখন গভর্নমেণ্ট এই নার্সদেরও দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সর্ত ছিলো, তাদের বিনা ভাড়ায় ভারতবর্ষে অথবা অস্ট্রেলিয়াতে পেঁাছিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সেখানে চাকুরী যোগাড় করে অন্ন-সংস্থান করার ভার তাদের নিজেদের উপর। এমনি অসহায়ভাবে নারীর পক্ষে বিদেশ যাওয়া মোটেই লোভনীয় নয়, কাজেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে থাকাই তারা উচিত বিবেচনা করেছে। চীনারা বেশ ভালো করেই জানে যে, জাপানীরা দেশ অধিকার করার পর তাদের উপর চলবে অত্যাচারের স্রোত। সব শেষ করে বললে, "আমি একটি দুষ্টু মেয়ে, তাই এমন করে বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কাজেই সব কিছু বিপদের জন্যই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কোণে দেখা দিল দু'ফোঁটা অশ্রু। বিপদ যে তার কতখানি, তা উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু একটুখানি সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিই-বা করতে পারি আমি? মেয়েটির নিপুণ হাতের সেবা পেয়ে অনেক রুগীই ধন্য হয়েছে, আর উচ্ছ্বসিতভাবে করেছে তার কাজের প্রশংসা।

হাসপাতালের কাজ যথানিয়মে চলেছে। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে একটুখানি দুঃখ কষ্টের কাহিনী। দুঃখের মধ্যে বিপদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অসহায় নরনারীর প্রাণের বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের চেহারায়, কথাবার্তায় ও ভাবভঙ্গীতে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ এইভাবে কেটে গেলো। মুহূর্তগুলিও যেন আর কাটতে চায় না, মিনিটকে যেন ঘণ্টা বলেই মনে হচ্ছে। দুঃখ কষ্টের সময় কিছুতেই কাটতে চায় না অথচ আনন্দ ও সুখের সময় কত শীঘ্র শেষ হয়ে যায়।

বেলা তখন প্রায় চারটে। দোতলায় রুগীদের কাছে কাজে ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িখানা যেন ভূমিকম্পের ঝাঁকানির মতো ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ হাহাকার ভয়ার্তদের চারিদিকে ছোটাছুটি, কানে সব কিছু আওয়াজ এলেও কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একেবারে যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম! কি করা উচিত সব কিছু ভুলে গিয়ে সেখানেই মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে কতকটা স্থির হতেই চেয়ে দেখি সকলেই নীচের দিকে ছুটছে, আমিও তাদের অনুসরণ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলাম। সিঁড়ির মাথায় পেঁাছে দেখি, সেদিককার একটা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে সিঁড়ির উপর। পাশ দিয়ে কোনক্রমে নীচে নেমে এলাম। সামনের গেট দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করে দেখি— সেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সকলেই চারদিকে ছোটাছুটি করছে, অথচ কোথায় কে যাবে জানে না। পিছনের দিকে অনেকগুলি বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালা ছিলো। অনেকে সেখান দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় অনর্থক ছোটাছুটি করছে। মাত্র চারদিন আগে টারসেল পার্কে বারো নম্বর ভারতীয় হাসপাতালটি চোখের সামনে জ্বলে যেত দেখেছি, কাজেই আজকে মনে সাহস সঞ্চয় করে রুগীদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলাম। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে পিছনের দিকে রাস্তায় কতকগুলি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে। রুগীদের স্ট্রেচারে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে পাঠানো হতে লাগলো। এইভাবে সারা হাসপাতালের সকল রুগীকেই অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্লেনগুলি এখানে কর্তব্য শেষ করে, অন্যত্র কর্তব্যের আহ্বানে চলে গিয়েছে। কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সিং সিপাহী রাস্তার হোস পাইপ খুলে বাইরের আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে কয়েকজন রুগী ছিলো, তারা জীবন্ত পুড়ে যাওয়াতে, একটি দুর্গন্ধ আসছে। বাইরে আরও কয়েকজন পুড়ে মারা গেছে, অবশ্য তারা যে কারা তা চেনবার মোটেই উপায় নেই। ভিতরে একজন বেশ মোটা গোছের চীনা নার্স আমাদের একজন ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদছে। যতই তাকে বোঝানো হয় যে, প্লেনগুলি চলে গেছে ভয়ের কোনও কারণ নেই, সে ততই জোরে চীৎকার করে, 'Oh my Lord! 'Oh my Lord!' তার চেয়ে ডাক্তার বেচারার অবস্থা আরও কাহিল! যতই সে নার্সকে ছাড়িয়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে সেই নার্স আরও জোরে তাকে জড়িয়ে ধরে' চীৎকার করতে থাকে। আপাতত বিপদ কেটে গেছে, কাজেই এই করুণ দৃশ্য দেখেও কেউ হাস্য সংবরণ করতে পারে নি।

আমাদের হাসপাতালের তখনকার কম্যাণ্ডার মেজর ঘার্সালিওয়াল হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনে আমাদের দুরবস্থার কথা জানালেন। উপর থেকে তাঁরা হুকুম দিলেন, তোমরা যেখানে আছ সেইখানেই থাক। রাস্তার দিকের দেওয়াল কতকটা ভেঙে পড়েছিলো। জানালার সার্সী প্রায় সবই টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলি পরিষ্কার করা হল। বাইরে অনেক চেষ্টার পর আগুন নেভানো সম্ভবপর হয়েছে। হাসপাতালের সামনে ছোট একটি মাঠের পাশে একটি গ্যারেজ ছিলো। সেখানা কোথায় যে উড়ে গেছে, তার পাত্তা পর্যন্ত নেই। সামনে কয়েকটি মৃতদেহ পড়েছিলো, সেগুলি টেনে এনে সামনের ট্রেঞ্চে মাটী চাপা দেওয়া হল। অবস্থা একটু শান্ত হলে পর নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের

মধ্যে খোঁজ-খবর শুরু হোল। আমাদের বন্ধু শচীন দত্ত। তাকে বহুবার নানা অসম্ভব স্থানে আবিষ্কার করেছি। এবার অনেকক্ষণ থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হলঘরে একটি বিরাট টেবিলের নীচে চারদিককার চেয়ারের অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করলাম—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো। এমনিভাবে নানা সম্ভব-অসম্ভব স্থান থেকে সকলকে নিরাপদে আবিষ্কার করার পর আমাদের মধ্যে যেন একটি আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। ইতিমধ্যে দু'একজন বিশেষ অধ্যবসায়ী বন্ধু সেই বাড়ির একটি ঘরে সিগারেট ও মদের একটি বিরাট ঘাঁটি আবিষ্কার করে। আমাদের আগে এই বাড়িটি নাবিকদের ক্লাবরূপে ব্যবহৃত হোত। কাজেই বৃটিশ নাবিকদের বাবুয়ানীর সব কিছুই যথেষ্ট পরিমাণে এখানে সঞ্চিত ছিল। সেই লুট করা সিগারেট নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা হল।

কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে আমরা আবার নানা আলোচনায় রত হলাম। আপাতত বিপদ কেটে গেছে, তারপর সাধারণত একবার যেখানে বোমা পড়ে দ্বিতীয়বার সেখানে বড় একটা আক্রমণ হয় না। কাজেই আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত।

ইতিমধ্যে কে একজন খবর রটিয়ে দিলে যে, আমাদের আত্মসমর্পণের কথাবার্তা চলছে। কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে পারলেও আমরা অন্তর থেকে যেন তাই চাইছিলাম। পরাজয় যে নিশ্চিত তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে আর অনর্থক লোকক্ষয়ের আবশ্যক কি? আগেকার নির্দেশমতো সিঙ্গাপুরের সৈন্যদের উপর আদেশ ছিলো —"Fight to the last man and last bullet." প্রতি মুহূর্তেই শুনেছিলাম, শীঘ্রই বৃটিশের সাহায্যকারী বহু সেনা ও প্লেন সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবে। এ খবরে বিশ্বাস না করেও উপায় ছিলো না। এতোখানি পরাজয়ের পর হয়তো চাকা আবার উলটে যেতেও পারে, হয়তো প্লেনের সাহায্য পেলে বৃটিশ আবার নূতন বিক্রমে যুদ্ধ করতেও পারে। কিন্তু ক্রমে সব খবরই মিথ্যা প্রমাণিত হল। যুদ্ধ চলতে লাগলো আমাদের কানে আসতে লাগলো গোলাগুলীর আওয়াজ। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তখনও আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে—আত্মসমর্পণের খবর সত্য কি না। গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে তা মিথ্যা বলেই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যার পর আওয়াজ যেন ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। ভবিষ্যতে যা ঘটবার ঘটবে কিন্তু বর্তমানে কোনও প্রকারে যুদ্ধ ত' বন্ধ হোক। দিনের পর দিন শুধু বিভীষিকার মধ্যে বাস করে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, কাজেই শান্তির জন্য প্রাণ উৎসুক হয়ে উঠেছে।

রাত তখন আটটা। হঠাৎ সিঙ্গাপুরের সমস্ত কলরব ভেদ করে বেজে উঠলো "সাইরেন"! বিপদসূচক নয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী 'অল ক্লিয়ার'। সঙ্গে সঙ্গে যেন সিঙ্গাপুর যাদুমন্ত্রের মতো নীরব হয়ে গেলো। মনে পড়লো, কবিগুরুর একটি লাইন. "নীরব হইল রণকোলাহল নীরব সমর বাদ্য"।

সরকারীভাবে আমরা তখনো পর্যন্ত কোনও খবর পাই নি। কাজেই অনেকে অনেক রকম গুজব রটাতে লাগলো। পরে শুনেলাম, বৃটিশ পক্ষ থেকে জেনারেল পারসিভ্যাল বিনাসর্তে জাপানী সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আর সেই সঙ্গে সিভিলিয়ানদের পক্ষ থেকে সিঙ্গাপুরের গভর্নর স্যার টমাস শেণ্টনও আত্মসমর্পণ করেছেন জাপানীদের হাতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ বিশেষ গ্লানিকর হোলেও সে রাত্রিতে সিঙ্গাপুরের সমস্ত সামরিক ও বে-সামরিক ব্যক্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়—পঁয়ষট্টি হাজার ভারতীয়সেনা আর প্রায় তিরিশ হাজার ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ান সেনা—প্রায় এক লক্ষ বৃটিশ সেনা আজ এশিয়াবাসী জাপানীর হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। "প্রিন্স-অব ওয়েলস" ও "রিপালসে"র শোক ভুলতে না ভুলতে আবার বৃটিশের বুকে আঘাত এলো আত্মসমর্পণের রূপ ধরে। "অজেয় সিঙ্গাপুরে" আজ পরের হাতে তুলে দিতে হল। জানি না, এই পরাজয়ের কাহিনী বৃটিশ জগতের সামনে কি রূপে দাঁড় করাবে।

বহুদিন পরে কাল রাতে বেশ আরামে ঘুমোনো গেল। কলরব নীরব হয়েছে। প্রাণের ভয় কমে গিয়েছে। আজ সকালে আবার আমাদের হাসপাতালে রুগী ভর্তি শুরু হয়েছে। আমাদের উপর আদেশ হয়েছে যেখানে যেভাবে কাজ চলছে সেখানে তেমনি ভাবেই কাজ চলবে। সকালে এক কাপ চা' খাওয়ার পরে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটু শহরে বেড়াবার জন্য বাইরে এলাম। বিশেষ ইচ্ছা, জাপানীদের দেখা। যুদ্ধের সময় দু'একজন আহত জাপানী, আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো, তা ছাড়া তাদের সৈন্যদল দেখার সুযোগ আমাদের ঘটে ওঠেনি। যুদ্ধের আগে অবশ্য এদিকে বহু সিভিলিয়ান জাপানীদের দেখেছি। আমাদের আহত সিপাহীদের মুখে জাপানীদের অনেক গল্প শুনেছি। তারা কি পোষাক পরে, কিভাবে যুদ্ধ করে এই সব। ঘর থেকে বেরিয়েই পথে অসংখ্য জাপানীসেনা দেখলাম। ছোট ছোট চেহারা, বেশ শক্ত সমর্থ—চীনাদের সঙ্গে চেহারাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। বেশভূষা অনেকেরই দীনতার পরিচয় দেয়। তখন অবশ্য ভেবেছিলাম, এরা একেবারে 'ফ্রণ্টের' সৈন্য বলেই এদের পোষাকের এই দুরবস্থা। কিন্তু পরে দেখেছি, এদের আগে ও পিছনের সৈন্যদের একই অবস্থা। অফিসারদের পোষাকে আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। প্রায় অধিকাংশের বাঁ পাশেই ঝুলছে কোষবদ্ধ বিরাট তলোয়ার। আর একটি জিনিস যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে যে এদের অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেরই চোখে চশমা। মনে হয় জাপানের অধিকাংশ লোকেই হয়তো দৃষ্টিহীনতা রোগে আক্রান্ত।

বড় বড় ম্যাপ নিয়ে তারা খুবই ব্যস্ত-ভাবে, রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। আমাদের হাতে বড় বড় Red Cross Batch ছিলো, কাজেই পথে কেউ আমাদের বাধা দেয়নি। শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। চারিদিকে অনেক বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়েছে। টেলিগ্রাফের থাম ও অনেক গাছ পালা পড়ে অনেক জায়গাতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় এবং আশে পাশে নালায় চারদিকে অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বড় বড় বোমা পড়ে রাস্তায় বড় বড় অনেক গর্ত হয়েছে। কোথাও গর্তে জল পর্যন্ত উঠেছে। প্রলয়ংকর ঝড়-ঝঞ্ঝার পর পৃথিবী যেন শান্ত মূর্তি ধারণ করেছে, তাই চারিদিকে আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা যেখানে যেখানে ছিলো, সেখানে সেখানেই তারা তাদের সমস্ত হাতিয়ার জমা করছে। গাছতলা ও ছোট ছোট খোলা মাঠে নানা যুদ্ধাস্ত্র স্তূপাকারে জমা হয়েছে। ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, রাইফেল, মেশিনগান, পিস্তল, হাতবোমা ও অসংখ্য গোলা বারুদ সবই যেন অবসাদে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অথচ, একটি দিন আগেও এদের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায় সকলেই ছিল সন্ত্রস্ত। কৌতূহলী নগরবাসীরা বিশেষত বালক বালিকারা, বিশেষ বিস্ময়ের সঙ্গে জাপানীদের চালচলন ও অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই বেঁটে-খাটো জাপানীরা যে কি শক্তিবলে এতো শীঘ্র প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত ক'রে সারা মালয় জয় করলো সে প্রশ্নও আজ সকলের মনের মধ্যে জেগে উঠ্ছিলো। কতোখানি পার্থক্য বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে তা আজ স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত যেসব জায়গাতে ব্রিটিশ পতাকা "ইউনিয়ন জ্যাক" বিরাজ করছিলো ভাগ্য-দেবতার নির্মম পরিহাসে আজ সকালেই সেসব জায়গা অধিকার করেছে সূর্যমার্কা জাপানী পতাকা "হিনোমারু"। "ফোর্ট ক্যানিং" ও চৌদ্দতলা "ক্যাথে" বাড়ির ছাদে জাপানী পতাকা উড়ছে। ইতিহাসে কতো রাজ্যের, কতো সাম্রাজ্যের উত্থান পতন মুখস্থ করেছি আর

চোখের সামনেই সেই ইতিহাসের এক অধ্যায় ঘটতে দেখলাম। জাপানীদের দেশ কবির দেশ হলেও ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণা জন্মে গিছলো যে, জাপানী জিনিসমাত্রেই খেলো। কাজেই অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তারা যে ব্রিটিশকে পরাজিত করতে পারবে এটা ছিলো ধারণাতীত। আজ দেখছি জয়দৃপ্ত জাপানীরা সদর্পে চলেছে রাজপথের উপর দিয়ে—সভয়ে ও সসম্মানে শহরবাসীরা তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ তিন মাস আগেও এখানকার জাপানীদের সম্মান সাধারণ বণিকের মতোই ছিলো। প্রত্যেক জাপানীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে জয়ের উল্লাস, আনন্দের দীপ্তি। আর বৃটিশের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পরাজয়ের গ্লানি। শুনলাম, পনেরো তারিখের রাতে নাকি কয়েকজন উচ্চ পদস্থ বৃটিশ অফিসার আত্মসমর্পণের অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে আত্মহত্যা করেছেন, আবার অনেকে বন্দীজীবন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কাছে ছোট বড় নৌকা যা পেয়েছেন তাই নিয়েই অসীম সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। বেলা প্রায় বারোটা পর্যন্ত আংশিকভাবে শহর পরিদর্শন করে হাসপাতালে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে বেলুচ রেজিমেণ্টের সুবেদার লাল খান আমাদের হাসপাতালে এসে আমার খোঁজ করলেন। যুদ্ধের আগে প্রায় একবছর আমি এ'দের সঙ্গে ডাক্তার ছিলাম, সেই সূত্রেই আলাপ ও বন্ধুত্ব। শুনলাম তাঁর ভাই আহত হয়ে বারো নম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয় কিন্তু এগারই তারিখে হাসপাতাল পুড়ে যাওয়ার পর থেকে তার আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। কাজেই লাল খান সিঙ্গাপুরের সমস্ত হাসপাতালে তার খোঁজ করছেন। আমাদের হাসপাতালে সে ছিলো না, কাজেই সব শেষ বাকি রইলো বারো নম্বর হাসপাতাল। তারা কিছু রুগী নিয়ে শহরেই এক জায়গাতে কাজ করছে। লাল খানের একান্ত অনুরোধে তার সঙ্গে সেই সন্ধ্যাতেই বারো নম্বর হাসপাতালে পেঁছিলাম। এখানে তার ভাইকে খোঁজ করে পাওয়া গেলো তবে অবস্থা বিশেষ খারাপ। যাই হোক, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি যথেষ্ট খুসী হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। এই হাসপাতালে আমার কয়েকজন পুরাতন ডাক্তার বন্ধু কাজ করতেন। আজ তাঁদের সঙ্গে দেখা হল। বিশেষত ডাঃ বীরেন রায় ও সনৎ মল্লিক আমাকে দেখে খুবই খুসী হলেন! সেদিন হাসপাতাল পুড়ে যাওয়ার পর অনেকেরই খবর পাওয়া যায় নি; আজ সকলেরই খবর পাওয়া গেলো। ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেলো। পথে অনেক জায়গাতে জাপানী "সেণ্ট্রী" আমাদের পথরোধ করলেও হাতের "রেড ক্রস" দেখানোর পর পথ ছেড়ে দিলো। কেউ কেউ জাপানী ভাষায় কিছু প্রশ্নও করেছিলো তার মধ্যে শুধু 'ইণ্ডো' কথাটাই বুঝতে পেরেছিলাম। যাই হোক তারা ছেড়ে দিলেও রাতে পথে বেরুনো যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা বুঝতে পেরেছিলাম। (ক্রমশ)

—সতেরো—

ক ল' থেকে ফিরে মণিকাদি দেখল অনিমেষ আর সুমিতা তখনো বসে স নিশ্চিন্তে গল্প করছে।

হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মণিকা কুঞ্চিত কর বললে, সুমি, অনিমেষকে খেতে দনি এখনো?

—খায়নি। তুমি এলে এক সঙ্গেই খাবে লছে।

মণিকা চটে উঠল ঃ কেন? এক সঙ্গে ন? বেলা কটা বেজেছে খেয়াল আছে? গাঁকে এতক্ষণ না খাইয়ে রাখলি, তুই ানক ইরেস্‌পন্‌সিবল সুমি।

অনিমেষ হাসল, খামোখা বেচারাকে বকছ ণকাদি। ওর দোষ নেই।

—না, কারো দোষ নেই। তুই এখন তো সুমি। চটপট গরম জল নিয়ে আয় নমেষের। ঝিটা বাজার করে দিয়ে যায়নি ঝ এবেলা? নাঃ—সবাই মিলে হাড় ালিয়ে দিলে আমার।

নতুন গৃহিণীর সংসার পাতবার মতো তিব্যস্ত হয়ে উঠেছে মণিকা। নতুন সংসার কি। চিরকাল কেটেছে নিজের সংক্ষিপ্ত তরেখার মধ্যে, বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ জীবন-ার ভেতরে। খসরুর চিরন্তন রান্না, সপাতাল, ডিউটি, রোগী দেখে বেড়ানো। ড় ফিরে এক একদিন নিজেকে কেমন বলম্বনহীন, আশ্রয়হীন বলে মনে হয়েছে। গুপ্ত মাতৃত্ব আর রিক্ত নারীত্ব জীবন যুদ্ধের ঠন বর্মটার তলায় রক্তটাকে মাঝে মাঝে চঞ্চল র তুলেছে, ঘুম ভাঙ্গা নিশীথ রাত্রে নির্জন রুদ্র সেন স্কোয়ারটার মতো নিজেকেও বাভাবিক শূন্য বলে বোধ হয়েছে।

আজ অনিমেষ একান্তভাবে তারই আশ্রয়ে সেছে। আর তার দেখাশোনা করতে এসেছে মিতা। হঠাৎ যেন সব পূর্ণ হয়ে গেছে। ণকাদির কল্প কামনা এক ধরণের পরিতৃপ্তি জে পেয়েছে যেন, এতদিন পরে সংসার ধেছে সে।

খাওয়ার টেবিলে বসে মণিকা বললে, নাঃ— ত চলবে না। আমি বিকেলে নিজেই রুব, বাজার করে আনব। অনিমেষের এখন লো নিউট্রিশন দরকার।

অনিমেষ ছোট্ট করে হাসল ঃ কিন্তু আজ কেলে আমি চলে যেতে চাই মণিকাদি।

—সে কি! মণিকা আর সুমিতা দুজনেই এক সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

জোর করে হাসবার চেষ্টা করলে মণিকা ঃ পাগল, এখন এই শরীর নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কে তোমাকে? বাড়ির বাইরে তোমাকে এক পা বেরুতে দেওয়া হবে না।

অনিমেষ তেমনি ছোট করে হাসল, জবাব দিল না। সে হাসি সংক্ষিপ্ত, তার অর্থও সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ কোনোমতেই তাকে রাখা যাবে না। বাইরের ডাকে আজ সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ধরবার ক্ষমতা কারো নেই।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীযুত বিমল মিত্রের উপন্যাস "ছাই" ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

মণিকার স্নেহেরও নয়, সুমিতার প্রেমেরও নয়।

সুমিতার মুখের ভাত মুহূর্তে তেতো হয়ে গেছে। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—গার্ডেনে। রংঝোরা চা-বাগানে।

—চা-বাগানে!

—হাঁ। পালিয়ে এসে ভয়ানক হয়ে গেছে। তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না। ধরমবীর কি করেছে না করেছে, কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন আর আমার থাকা চলে না—ফিরে যেতেই হবে।

—কিন্তু পুলিস—

অনিমেষ হাসলঃ পুলিস আর কি করবে? ওদের হাঙ্গামাকে ভয় করি না, ভয় করি নিজের মনের অপরাধকে। কোন দোষ করিনি, কোন অন্যায় করিনি—কেন পালিয়ে আসব চোরের মতো, খুনীর মতো? বরং যারা খুন করেছে, তাদের এখনি এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার, তাদের বোঝানো দরকার, শক্তিকে অপচয় করবার কোন সার্থকতা নেই, আসন্ন আগামী বিপ্লবের জন্যে তাকে সংহত করতে হবে।

—কিন্তু এই শরীরে—

—ও কিছু না, দুদিনেই চাঙা হয়ে উঠব। অত সহজে মরলে কি আমাদের চলে?—প্রসন্ন হাসিতে অনিমেষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলঃ ইংরেজের দৈত্যকুলে আমরা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুগণ নৃসিংহের হাতে না মরা পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু নেই।

মেয়েরা দুজনেই চুপ করে রইল। একজনের দৃষ্টি হতাশায় ম্লান, আর একজনের মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। প্লেটের ভাত কারও আর মুখে উঠছে না।

—তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই, অবিলম্বে আদিত্যদার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অকারণে হয়রাণ হতে হচ্ছে বেচারাকে। আমি না গেলে কিছুই করা চলবে না। আর আদিত্যদা ফিরে না এলে এদিকের কাজকর্ম সব পণ্ড—

এ যুক্তির কোন প্রতিবাদ নেই। একটা আকস্মিক তিক্ততায় ভরে উঠল মণিকার মন। বৃথা—বৃথা। এদের নিয়ে দুদিনের জন্যেও নিজেকে পূর্ণ করে তোলবার কল্পনা অর্থহীন। এদের রক্তে রক্তে ঝড়ের রাত্রির ফেনায়িত সমুদ্রের আহ্বান। সেই মাতাল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে এরা উদয়-তীর্থের পথে নৌকো ভাসিয়েছে। হয় ভরাডুবি হবে—অথবা কোন একদিন, কে জানে কবে—সার্থকতার বন্দরে গিয়ে পেঁৗছুবে।

আর সুমিতা ভাবছিলঃ এক রাত্রির মোহ—এক রাত্রির স্বপ্ন। প্রথম এবং শেষ বাসর। তার মাথাটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল অনিমেষ, সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনের চরম সার্থকতা এসেছিল আকস্মিকভাবে, আকস্মিকভাবেই ঘটল তার শেষ পরিণতি। ক্ষণিকের জন্যে লোভ এসেছিল—ক্ষণিকের জন্য এসেছিল দুর্বলতা। কিন্তু নিজের হাতেই অনিমেষ শেষ করে দিলে তাকে, তার বিস্মৃতি-জাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। তিন বছর আগে যেমন করে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। সেদিন মন ছিল কাঁচা, সেদিনের স্বপ্নভঙ্গ বেজেছিল অত্যন্ত নির্মমভাবে, বুকের ক্ষতচিহ্ন থেকে অনেক রক্ত ঝরে পড়েছিল। কিন্তু আজ আর সে দুর্বলতা নেই—পথ চলতে নেমে অনেক কঠোর হয়ে গেছে—নিজের সীমার ওপারে মহাজীবনের নির্দেশ—আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে সর্বময় মানবতার নির্দেশ পেয়েছে সে। তবু একটি রাত্রির ফুল—একটি রাত্রির মাদকতা। বন্ধুর পথে চলতে চলতে যখন নিজের ভেতরে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসবে, সেদিন এই ফুলের গন্ধ, এই মাদকতার মাধুরী তাকে প্রাণ দেবে।

সুমিতা মৃদুকণ্ঠে বললে, আজকেই যাওয়া দরকার?

—হ্যাঁ, আজই।

মণিকাদি কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হ'ল না। বাইরের দরজায় সজোরে কড়া নাড়ছে কে যেন। এমনভাবে কড়া নাড়ছে, যেন ভেঙে ফেলবে।

পুলিস নয় তো! মুহূর্তে রক্তহীন হয়ে গেল সুমিতা আর মণিকার মুখ। প্রায়

আর্তকণ্ঠে মণিকা চীৎকার করে উঠলঃ কে?

—আমি বিকাশ। সুমিতাদি আছে?

বিকাশ। দলের ছেলে। সুমিতা ভাত ফেলে উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—সাংঘাতিক ব্যাপার সুমিতাদি।

—কি হয়েছে?

—এশিয়াটিক আয়রনে স্ট্রাইকারদের ওপর গুলী চলছে।

গুলী চলছে। মুহূর্তে ইঙ্গিতময় স্তব্ধতায় ভরে গেল সব। মণিকা তাকিয়ে রইল বিহ্বল দৃষ্টিতে, সাগ্রহ উত্তেজনায় অনিমেষের চোখ জ্বলতে লাগল।

সংশয়গ্রস্ত ক্ষীণ গলায় সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের কোন ছেলে—

—হ্যাঁ, ইন্দুর বুকে লেগেছে একটা।

ইন্দু! কবি ইন্দু! সুমিতার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরুল শুধু।

মুহূর্তে টেবিল থেকে উঠে এল অনিমেষ। চোখে আগুন; বিকাশকে বললে, চলো।

অনিমেষকে দেখে বিকাশ চমকে উঠল।—অনিমেষ-দা, আপনি এখানে?

—হ্যাঁ, আমি এখানে। সে সব কথা পরে হবে। এখন চলো। ইন্দু বাঁচবে তো?

—বলা যায় না—

—চলো, চলো—

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মণিকাদি দেখলে কেউ নেই। বিকাশ নেই, অনিমেষ নেই, সুমিতাও নেই। যেন ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

মণিকা পাথরের মতো বসে রইল টেবিলে। অনিমেষ আর সুমিতার অর্ধভুক্ত প্লেটের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। তারপর টপ টপ করে চোখের জল ঝরে যেতে লাগল নিজের প্লেটটার ওপরে।

না—সত্যিই যুদ্ধ বেধেছে কলকাতায়। আর থাকা চলে না। মণিকা এবার কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবে—যেখানে হয়, যতদূরে হয়। দৃষ্টির সামনে সমস্ত কলকাতা শূন্য, আর ঝাপসা হয়ে গেছে।

* * * * *

আসামীরা একরার করেছে এসে। জেল থেকে বেরিয়েই কলকাতায় ফিরেছে আদিত্য।

লক্ষ্যহীনের মতো পথ দিয়ে চলতে লাগল সে। ক'দিনের একটা ঘূর্ণি ঝড়েই সমস্ত আয়োজনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এশিয়াটিক আয়রনে গুলী চলবার পরের দিনই সুমিতার চারতলা বাড়ির সংসারে নজর দিয়েছিল পুলিস। অনেককে ধর-পাকড় করেছে, বাকী সব আবার কোন্ অন্ধকারের মধ্যে ছিটকে পড়েছে, তার ঠিকানা নেই। আবার তাদের খুঁজে বার করতে হবে, আবার কাজ শুরু করতে হবে নতুন করে।

অনিমেষ, সুমিতা জেলে। ইন্দু হাসপাতালে বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। কবি ইন্দু! ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারতলা শূন্য বাড়িটার দিকে আদিত্য একবার তাকালো। গোটা দুই শক্ত শক্ত তালা ঝুলছে লোহার গেটে। কে তালা দিয়েছে কে জানে—বোধ হয় পুলিস।

একবার থেমে দাঁড়িয়েই চলতে শুরু করেছিল আদিত্য, হঠাৎ হাওয়ায় একটুকরো ছেঁড়া কাগজ এসে তার জুতোর সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। কি মনে করে কাগজখানাকে তুলে নিলে সে।

কবি ইন্দুর কবিতার একটা ছেঁড়া পাতা। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। অনেকগুলো অক্ষর একেবারে ধুয়ে গেছে। তবু দুটো লাইন পরিষ্কার পড়া যায় এখনোঃ

ছেঁড়া তারে ঘেরা ভাঙা ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে
মৃত সৈনিক ঊষার স্বপ্ন দেখে—

মাথার ওপরে কর্কশ ধ্বনিতে বিমান উড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ! গণতন্ত্রের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে! ভারতের শৃঙ্খলিত বুকের ওপরে ট্যাঙ্কের চাকা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে—স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র আসছে বইকি। কিন্তু এ যুদ্ধে নয়—এ যুদ্ধে তার প্রস্তুতি মাত্র।

উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মতো তীব্র দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কালো আকাশের দিকে তাকালো আদিত্য। মৃত সৈনিকের চোখে ঊষার স্বপ্ন। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ-শিখর থেকে সাগর-প্রান্তের কলকাতা পর্যন্ত—আসমুদ্র হিমালয় সূর্য-সারথির রথচক্রে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে!

—শেষ—

কাশ্মীরে গণ আন্দোলন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার করিয়া কাশ্মীরের মহারাজা যে উৎকট স্বৈরাচার এবং ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছেন সমগ্র পৃথিবী তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছে। কিছুদিন ধরিয়া কাশ্মীরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় রাজ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জ যে আন্দোলন চালাইতেছিল, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ এবং কাশ্মীরের জননায়ক আটক বন্দী শেখ মহম্মদ আবদুল্লার বিচারে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করার জন্য পণ্ডিতজী কাশ্মীরে যাইতেছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে স্বৈরাচারের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জ তাহার বিরুদ্ধে বহুবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে—ভারতের ইতিহাসে আমরা তাহা দেখিয়াছি। গণ-তান্ত্রিক ভিত্তিতে নাগরিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবী লইয়া দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ বহুবার সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের সাহায্যে বন্দুক, সঙ্গীণ ও লাঠি দ্বারা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সে সংগ্রামকে দমন করা হইয়াছে।

বর্তমানে কাশ্মীরে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলা যাইতে পারে। মিশনের প্রস্তাবে দেশীয় নৃপতিদের সম্বন্ধে একটিও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। গণ-পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রজার অধিকার অথবা রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সকল বিষয় মন্ত্রী মিশন মহারাজ ও নবাবদের শুভেচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। উপরন্তু তাঁহাদের আরও আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কোন নূতন গভর্নমেণ্টের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না। মন্ত্রী মিশনের এই রূপ ঘোষণার ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং এই আতঙ্ক হইতেই কাশ্মীরের বর্তমান "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। কাশ্মীরের বিখ্যাত জননায়ক শেখ মহম্মদ আবদুল্লার নেতৃত্বে "কাশ্মীর ছাড়" ধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন সুরু হয়। কাশ্মীরের মহারাজা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শেখ মহম্মদ প্রভৃতি কয়েকজন জননায়ককে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। ফলে জনতা আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের দমনের জন্য সশস্ত্র স্টেট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয়। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী ও লাঠি চলে। ২ জন নারী সমেত ৬১ জন নিহত হয়। ৮০৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহারা তাহাদের ভ্রাতা ভগ্নীর উপর লাঠি চালাইতে অস্বীকার করে। ৪০ জন পুলিশকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন যদিও আজ নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বহুকাল পূর্বেই। তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

কাশ্মীর ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য। কাশ্মীরের বর্তমান রাজ-পরিবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই রাজ্যটি লাভ করেন। এই রাজ্যের আয়তনের ক্ষেত্রফল ৮৪ হাজার বর্গ মাইলের কিছু বেশী। লোক সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ। তাহার মধ্যে মুসলমান ২৮ লক্ষ ১৭ হাজার, হিন্দু ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার, শিখ ৫০ হাজার, বৌদ্ধ ৩৮ হাজার, খৃষ্টান প্রায় ২॥ হাজার এবং জৈন ৬ শত। রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ২॥ কোটি টাকা।

১৯২০—২১ সালে যখন বৃটিশ ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল তাহারই কিছু পর হইতে কাশ্মীরে গণ-আন্দোলন সুরু হয়। কিন্তু তাহা জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৮ সালের পূর্বে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বেকার সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং চাকুরীর জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সেই আন্দোলনের সহিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না। আন্দোলন প্রশমনের জন্য রাজ-সরকার হইতে চাকরী ব্যাপারে কিছু সুবিধা দেওয়া হইলে একদল সুবিধাবাদী লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আন্দোলনে নিরস্ত হয়; কিন্তু তাহাতে সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য বিন্দুমাত্রও লাঘব না হওয়ায় আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া যায় এবং আহা জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করে। কাশ্মীরের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। তাই প্রথম দিকে আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে বেশী যোগদান করে নাই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরের জননায়ক শেখ মহম্মদ আবদুল্লা দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত সীমান্ত সফরে বাহির হন। কাশ্মীরে প্রজা-আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে তিনি পণ্ডিতজীর পরামর্শ চাহেন। কাশ্মীরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতজী মহম্মদ আবদুল্লাকে বলেন যে, কাশ্মীর মুশ্লিম সম্মেলনের নীতি ও কর্মতালিকা জাতীয়তামূলক, সুতরাং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া একটি জাতীয় নাম দেওয়া উচিত। কাশ্মীর রাজ্যে একটি কংগ্রেস গঠন করা সম্পর্কেও পরামর্শ হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবে কোন দেশীয় রাজ্যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেস নামকরণে বাধা আছে। দুইজনের মধ্যে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনার পর স্থির হয় যে, কাশ্মীর মুশ্লিম সম্মেলনের নাম বদলাইয়া উহার একটি জাতীয় নাম রাখার চেষ্টা করা হইবে।

ইহার পর ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে কাশ্মীর মুশ্লিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রস্তাব আনা হয় যে, উহার নাম বদলাইয়া কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন নাম রাখা হউক। এই প্রস্তাবে গঠনতান্ত্রিক অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। কাজেই তখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। পরে জুন মাসে মুশ্লিম সম্মেলনের কার্যকরী সমিতিতে উক্ত প্রস্তাব ১৭—৩ ভোটে গৃহীত হয়। ইহার ফলে বিশিষ্ট হিন্দু ও শিখ জননায়কগণ আসিয়া ইহাতে যোগ দিতে সক্ষম হন। তাহার পর হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া জাতীয়তার ভিত্তিতে জনমত গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা জনসাধারণের প্রাণে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিলেন।

আর্থিক দুর্ভোগ হইতে মুক্তি লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা গণ-আন্দোলনকে যতখানি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে, বোধহয় অন্য কোনও কিছু ততখানি পারে না। কাশ্মীরের [illegible]

কার জনসাধারণের মধ্যে যে আর্থিক চরম দুর্গতি বিদ্যমান, তাহাই এই আন্দোলনকে ক্রমশ শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিল। কাশ্মীরের কৃষক ও শ্রমিকদের জীবিকার্জনের জন্য শীতকালে ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া বহু দূরে যাইতে হইত এবং এখনও হয়। জমির খাজনা অতি উচ্চ হারে আদায় করা হয় এবং সহরের অধিবাসীরাও নানা করভারে জর্জরিত। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রতি বৎসর বহু লোককে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। রাজ্যের শাসনকার্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সমস্যার প্রতি রাজ সরকার অত্যন্ত উদাসীন। প্রজারা ঋণভারে জর্জরিত। রাজ্যে শিক্ষারও একান্ত অভাব। সরকারী আয়ের শতকরা দশভাগেরও কম শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের বেশি নয়। স্ত্রী-শিক্ষা নাই বলিলেই চলে। অন্য দিকে দেখা যায়, রাজ্যের রক্ষীবাহিনীর জন্য ব্যয় করা হয় রাজস্বের শতকরা ১৯ ভাগ। রাজ-সরকারের নিজস্ব তহবিলে যায় রাজস্বের শতকরা ১৬ ভাগ।

প্রথম দিকে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে রাজ-সরকার খুব বেশী বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, মুসলিম সম্মেলনে রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া কিছুতেই যোগ দিবে না; কাজেই উহাকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ হইল। শেখ মহম্মদ আবদুল্লার আহবানে কাশ্মীরের পণ্ডিত ও শিখগণ সাড়া দিলেন। রাজ-সরকারের তখন টনক নড়িল।

কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন স্থির করিলেন, ১৯৩৮ সালের ৫ই আগষ্ট "দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা দিবস" উদ্‌যাপন করা হইবে। সমগ্র জুলাই মাস ধরিয়া জননায়কগণ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সফর করিয়া জনমত গঠন করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর হিন্দু প্রগতি দল শেখ মহম্মদ আবদুল্লার সহিত হাত মিলাইলেন। রাজ-সরকারের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল।

আন্দোলন দমনের তোড়জোড় চলিতে লাগিল। সর্বপ্রথমে রাজ-রোষে পড়িলেন রাজা মহম্মদ আকবর খাঁ। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইল। এই জনপ্রিয় নেতার কারাদণ্ডে সমগ্র রাজ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরকার শুধু এই নেতাকে কারারুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিতেও অগ্রসর হইলেন।

এদিকে ৫ই আগষ্ট তারিখ আসিয়া পড়িল। সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে সভা ও শোভা-যাত্রা করিয়া "দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা দিবস" উদ্‌যাপন করা হইল। সভায় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহাতে রাজ-সরকার রুষ্ট হইয়া পূর্ণউদ্যমে নিরস্ত্র প্রজাদের উপর দমননীতি চালাইতে লাগিলেন। সাধারণ দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি আন্দোলন দমনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ আধা-জঙ্গী আইন প্রবর্তন করিলেন। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষের অবাধে দমননীতি চালাইবার আরও সুবিধা হইল। অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া

পুলিশ রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া বসিল। ১৪৪ ধারা জারী করিয়া রাজ্যে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হইল এবং বিনা বিচারে বন্দিশালায় লোককে আটক রাখার পথ প্রশস্ত করা হইল। শেখ মহম্মদ আবদুল্লা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক নোটিশ জারী করিলেন যে, তাঁহারা কাশ্মীর রাজ্যে কোন আন্দোলন চালাইতে পারিবেন না। প্রজাদের তরফ হইতে তাহাদের সর্বনিম্ন দাবী জানাইয়া রাজ্যের বিশিষ্ট নেতৃগণ রাজ-সরকারের সহিত আপোষের শেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত করিলেন না। ২৬শে আগস্ট তারিখে শ্রীনগরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। কিন্তু ২৯শে আগস্ট আইন অমান্য করিয়া এক বিরাট জনসভা হইল। সেই সভায় শেখ মহম্মদ আবদুল্লা, বুধ সিং, গোলাম মহম্মদ সাদীক, মহম্মদ সৈয়দ, পণ্ডিত কশ্যপবন্ধু প্রমুখ কাশ্মীরের বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার ফলে বিক্ষুব্ধ প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আন্দোলনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পর সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিল। নানা স্থানে সভা-সমিতিতে নিরস্ত্র জনতার উপর লাঠি চলিতে লাগিল। বহু প্রজাকে গ্রেপ্তার করা হইল। সরকারী মুদু যষ্ঠি চালনার ফলে বহু প্রজার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। কাশ্মীরের ভূমি মানুষের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল।

আন্দোলনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, কাশ্মীরের রাজ-সরকার অনায়াসে তাঁহাদের 'গুণ্ডা' আখ্যায় ভূষিত করিলেন। কাশ্মীর ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বিশিষ্ট আইন-জীবিগণ, জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকগণ, ছাত্র-সমাজ', ব্যবসায়ী মহল কেহই এই আখ্যালাভে বঞ্চিত হইলেন না। আন্দোলন আগাগোড়াই শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে চালান হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-সরকার ইহাকে হিংসামূলক আন্দোলন বলিয়া রটাইতে লাগিলেন। প্রথম দেড় মাসের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যে ৯৫৭ জন গ্রেপ্তার হইলেন। প্রায় ৫০০ জনকে 'আধা-জঙ্গী' আইনের বলে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। বহু লোককে বিনা নোটিশে, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু আন্দোলন প্রশমিত হইল না।

সরকার যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপক ধরপাকড় ও লাঠি চালনায় আন্দোলন দমন করা যাইবে না, তখন তাঁহারা এক নূতন ফন্দী আঁটিলেন। কোন কোন অঞ্চলকে 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের উপর পাইকারী পিটুনী ট্যাক্স বসাইয়া দিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাইসুমা মহল্লা নামক একটি স্থানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মহল্লায় ২৫০ ঘর গৃহস্থের বাস। তাহাদের উপর ১২ হাজার টাকা পিটুনী ট্যাক্স ধার্য করা হয়। পিটুনী ট্যাক্স আদায় ছাড়া ধৃত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে মোটা রকমের জরিমানা আদায় করা হইতে লাগিল। জরিমানা না দিতে হইয়াছে, কাশ্মীরে এইরূপ রাজবন্দী খুব কমই আছেন। ২০০, হইতে ১০০০, টাকা পর্যন্ত জরিমানা অনেককেই দিতে হইয়াছে। জরিমানা আদায়ের জন্য ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, ছেলেদের পড়িবার বই, মেয়েদের অলঙ্কার, রান্নার বাসনপত্র পর্যন্ত ক্রোক ও নীলাম করা হইয়াছে। বহু ক্ষেত্রে একের অপরাধে অন্যকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে; প্রজার জন্য জমিদারকে জরিমানার টাকা দিতে হইয়াছে, এইরূপও দেখা গিয়াছে। যে সব সংবাদপত্র সরকারী নীতির সমালোচনা করিত তাহাদের সরকারী কোপে পড়িতে হইল। তাহাদের নিকট মোটা টাকা জামানত চাওয়া হইল। ফলে 'হামদার্দ' ও 'কেশরী' নামক দুইখানি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ছয়জন সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্দোলনের প্রথম দিকে ধর্মঘটে যোগদানের অপরাধে কাশ্মীরের একটি সিল্ক ফ্যাক্টরীর ২২ জন শ্রমিকের চাকুরী যায়। সর্বপ্রকার আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া পুলিশ ৪০০ লোকের উপর নোটিশ জারী করে। আন্দোলন যখন চরম অবস্থায় উঠে, রাজ-সরকার তখন নেতৃবৃন্দকে শুধু কারারুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, জেলের ভিতরেও বন্দীদের উপর নানারূপ অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। শ্রীনগর সেণ্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর একদিন নির্মমভাবে লাঠি চালান হয়। ফলে বহু লোক গুরুতররূপে আহত হয় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইত।

আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হইয়া যান। কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে সমর পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, তাহার অধীনে প্রায় সাড়ে তিন মাসকাল এই আন্দোলন চলিয়াছিল। সমর পরিষদ কর্তৃক প্রতিদিন প্রাতে একখানি করিয়া বুলেটিন প্রকাশিত হইত। তাহাতে আন্দোলনকারীদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে দৈনন্দিন নির্দেশ দেওয়া থাকিত।

আন্দোলনের যাঁহারা প্রাণস্বরূপ একে একে তাঁহারা সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া যাওয়ায় মোটা রকম জরিমানা আদায় করায় এবং জন-সাধারণের প্রাণে পুলিশ আতঙ্কের সঞ্চার করায় আন্দোলন ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। সাড়ে তিন মাসকাল প্রচণ্ড আন্দোলন চলার পর ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে সমর পরিষদের সেক্রেটারী আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত হইল বটে। কিন্তু বুভুক্ষু জনগণের প্রাণের তাগিদ মিটিল না। তাহার পর হয়ত ভিতরে ভিতরে আরও অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সংবাদ আমরা পাই নাই। মন্ত্রী মিশনের ঘোষণার পর প্রজাপুঞ্জ যখন দেখিল তাহাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইতেছে, দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনের জন্য তাহাদের যে দাবী তাহা চিরদিনের জন্য অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, চিরদিনের জন্য তাহাদের কণ্ঠরোধ হইতে চলিয়াছে, তখন তাহারা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। প্রচণ্ড গতিতে আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহা দমনের জন্য রাজ-সরকারও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালাইলেন।

কাশ্মীর রাজ্যের এই গণ-আন্দোলনকে অনেকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহারা আজ কোটি কোটি ভারতবাসীর বুকের স্পন্দন অনুভব করিতেছেন, যাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, স্বাধীনতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হতচেতন ভারতবাসীর প্রাণে আজ কিরূপ আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতবাসীকে আজ কিরূপ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারা আজ কিছুতেই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার মুক্তিকাম প্রজাপুঞ্জের দাবীকে আর কোনমতেই চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে না। একদিন না একদিন স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিবেই।
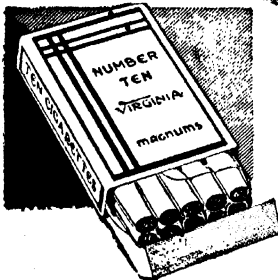
আলাপের সূত্র
চারপাশে অপরিচিতের মেলা—দীর্ঘ রেলপথ তাই আরো একঘেয়ে লাগছে। এরই মধ্যে আপনার ভার্জিনিয়া নাম্বার টেন-এর টিনটা খুলে পাশের ভদ্রলোকটিকে একটি সিগরেট দিলেন। সিগরেটের ধোঁয়ার সঙ্গে এতক্ষণের অপরিচয় ও গাম্ভীর্য কোথায় মিলিয়ে গেল—সিগরেট খেতে খেতে শুরু হয়ে গেল প্রাণখোলা আলাপ-পরিচয়।
NUMBER TEN
VIRGINIA
magnums
TEN CIGARETTES
নাম্বার টেন
ভার্জিনিয়া
সত্যিকার ভালো সিগরেট
জেমস্ কার্লটন লিমিটেড লণ্ডন
NTK 129

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট একটা মেসে আসিয়া সঞ্জয় উঠিল। আগের মেসে আর গেল না। পরীক্ষা দেওয়া তাহার হইল না। সকলের জীবনে সব সুযোগ হয় না। সে আবার চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের পথ দিয়া চলিতেছিল সে, হঠাৎ একখানা ঝক্‌ঝকে গাড়ী আসিয়া তাহার পাশে থামিয়া গেল—সঞ্জয় চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল প্রশান্ত। প্রশান্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া প্রশান্ত কহিল, "চট্‌পট উঠে পড়ো—তাড়া আছে।" সঞ্জয় উঠিয়া বসিল। প্রশান্ত গাড়িতে স্পীড দিয়া কহিল, "কোথায় রয়েছো? তোমার মেসে গেলাম, তারা বোললো ছমাস তুমি মেস ছেড়ে দিয়েছো। তোমার ক্লাসফ্রেন্ড অজয়ের সঙ্গে দেখা হোলো, সেও কিছু বোলতে পারলো না। আজকাল কি লোকালয় ছেড়ে নির্জ্জনে তপস্যা হোচ্ছে?"

উত্তরে সঞ্জয় একটু হাসিল। সে হাসি দেখিতে পাইল না। প্রশান্ত কহিল, "কি জবাব দিচ্ছনা যে?" সঞ্জয় কহিল—"পরে হবে, তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলো—কোথায় কোথায় ঘুরলে!" প্রশান্ত কহিল—"অরসিকেষু রসনিবেদন কোরে লাভ কি বল? ইচ্ছে হোচ্ছে তোমাকে দেখে একটু কবি কালিদাসের শ্লোক আওড়াই। বেশ শরীরটা হোয়েছে তোমার,—তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ তনু। মোক্ষলাভের আর কটা ধাপ বাকী আছে!"

সঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল। ফুল স্পীডে গাড়ী চালাইয়া প্রশান্ত চিৎপুরের দিকে একটা বস্তির সামনে আসিয়া গাড়ী থামাইল। প্রকান্ড ব্যাগটা হাতে লইয়া প্রশান্ত নামিল সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ও। সঞ্জয় ভাবিতেছিল প্রশান্তের এ আবার কী খেয়াল? ছোট ছোট খোলার ঘর আর তাহার মধ্য হইতে বিচিত্র সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

সঞ্জয় কহিল—"এখানে কেন?" প্রশান্ত কহিল—"রহস্য কঠিন। চলো দেখে উপলব্ধি কোরবে। জায়গাটা কিন্তু বেশ।" সঞ্জয় স্বীকার করিল। বস্তি হইলেও নোংরা নয়—বেশ লেপামোছা ঘর বাড়ি। এমনিই একটা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া প্রশান্ত দাঁড়াইল। কড়া নাড়িতেই দুয়ার খুলিয়া গেল। একটি মেয়ে আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেল। ঘরটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা দেওয়া। সঞ্জয় প্রথমটা লক্ষ্য করে নাই সে দেখিতে কেমন। কেমন যেন ধোঁকা লাগিতেছিল তাহার। এ কোথায় প্রশান্ত আনিল তাহাকে? এখানে তাহার কি কাজ? ও মেয়েটিই বা কে? প্রশান্ত তৎক্ষণে ব্যাগ খুলিয়া আঁকিবার সরঞ্জাম বাহির করিতে ব্যস্ত। একখানা অর্ধ সমাপ্ত ছবির বোর্ড বাহির করিয়া মাটির দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিল। সঞ্জয় অবাক হইয়া দেখিল একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের মুখের একাংশ। বাকি অর্ধাংশ এখনও আঁকা হয় নাই। এ মেয়েটির ছবি নাকি! সঞ্জয় বিস্মিত হইয়া মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তক্তপোষের উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুখের যে অংশ অনাবৃত তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জয় চমকিয়া গেল। এত সুন্দর! কোন্ শিল্পী একান্তে বসিয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া এ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে যেন। চোখের দৃষ্টিতে কি সকরুণ মিনতি। মেয়েটি এক মনে প্রশান্তের কাজ দেখিতেছিল। প্রশান্ত সমস্ত ঠিক করিয়া এবারে মেয়েটির দিকে ফিরিল কহিল—"এবারে তুমি রেডি ত?"

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। অদ্ভুত হাসি। মানুষের মর্মস্থল কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দেয় যেন। হাসি থামিলে কহিলঃ

"রেডি ত অনেকক্ষণ থেকেই হয়ে আছি—আপনারই ত সময় হয় না।"

প্রশান্ত কহিল—"হ্যাঁ দেরী হোয়ে গেল আজ। আজই শেষ হয়ে যাবে। তুমি মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দাও এবার।"

মেয়েটি ঘোমটা সরাইবে না। যেদিকটা ঢাকা ছিল হাত দিয়া সে দিকটা চাপিয়া কহিল—"না ঘোমটা আজ আমি খুলবো না। এ দিকটা নেই বা আঁকলেন।" প্রশান্ত হাসিল—শান্ত বিষণ্ণ হাসি। কৌতুকের চিহ্ন মাত্র ছিল না। সঞ্জয় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া দেখিতেছিল। মেয়েটির দৃষ্টিতে কি দারুণ মিনতি ঝরিয়া পড়িতেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কাটিল। অবগুন্ঠন খুলিল না। প্রশান্ত আবার কহিল—"সময় বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হোলে আঁকা যাবে না, ঘোমটা সরিয়ে দাও।" মেয়েটি তেমনিই বসিয়া রহিল। স্তব্ধ দুঃসহ মুহূর্ত। প্রশান্ত আবার জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া কঠিন স্বরে কহিল—"অনর্থক দেরী কোরো না। আমার সময় নষ্ট কোরবার জন্য এতগুলো টাকা মিছিমিছি তোমায় দিইনি।" মুহূর্ত মাত্র। মেয়েটি বিদ্যুদ্বেগে ঘোমটা সরাইয়া লইল। সঞ্জয় দেখিল বীভৎস রূপের নিদারুণ বিকৃতি। মুখের অর্ধাংশ দগ্ধ বিকৃত। চোখের নীচের পাতা নামিয়া আসিয়া জোড়া লাগিয়াছে কুঞ্চিত গণ্ডদেশে। চোখটা অস্বাভাবিকভাবে ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াছে। সে দৃষ্টি দেখিলে অন্তর শিহরিয়া ওঠে। বিপরীত সৃষ্টির এমন অদ্ভুত সমাবেশ সঞ্জয় জীবনে আর দেখে নাই। প্রশান্ত এক মনে আঁকিতেছে। মাঝে মাঝে তীব্র একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া মেয়েটির মুখের বিকৃত অংশে চাহিয়া দেখিতেছে। মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখের অপর অংশ অজস্র চোখের জলে সিক্ত হইতেছিল। সঞ্জয় বুঝিল উহার বিকৃত অংশের চোখ অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে, নহিলে এ কান্নায় সাড়া দিত। প্রশান্ত অতি দ্রুত আঁকিয়া চলিয়াছে। সঞ্জয় ভাবিতেছিল, প্রশান্ত শিল্পী, পাষাণ শিল্পী। রূপ ও অরূপ দুইই তাহার কাছে সমান। বিশ্ব-সৃষ্টিতে ভাল, মন্দ, বিপরীত রূপ লইয়া পাশাপাশি ফুটিয়া ওঠে; এক অংশ দেখিয়া অন্তর মুগ্ধ হয়, বিকৃত অংশ জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। সৃষ্টি কিন্তু নির্মম। সে নিষ্ঠুরভাবে দুই অংশকে পাশাপাশি আঁকিয়া রাখে। প্রশান্ত স্রষ্টা, প্রশান্ত নির্মম।

অনেক রাত্রে সঞ্জয় সেদিন মেসে ফিরিল। প্রশান্তর সঙ্গে তাহার বাড়িতে ফিরিয়া দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইয়াছিল। সঞ্জয় তাহার আর্থিক অবস্থার কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখিল। দৈনন্দিন জীবনের তিক্ততা দিয়া বন্ধুত্বের পাত্র পূর্ণ করিবার সাধ তাহার নাই। প্রশান্ত কহিল, তাহার দেশবিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী মানব মনের বিচিত্র বিকাশের ছবি। তাহার একটা কথা—"কত ছবি রোজ চোখে পড়ে, দেখতে মন্দ লাগে না"—সঞ্জয়ের মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সঞ্জয় ভাবিতেছিল, এমনি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়া সে কেন দুনিয়ার ছবি দেখিতে পারে না। ছবির ভালমন্দের সঙ্গে সে কেন নিজে জড়িত হইয়া পড়ে!

মেসে ফিরিয়া টেবিলের উপরে ম্যানেজারের চিঠি দেখিয়া সঞ্জয় খুলিল। এক মাসের মেস চার্জ বাকি পড়িয়াছে, অবিলম্বে যেন শোধ করা হয়, নহিলে ম্যানেজার মেসের নিয়ম স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য। সঞ্জয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিচিত্র পৃথিবী।

য়ুনিভার্সিটির সামনে ভীড়। বি, বি, এস-সি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সঞ্জয় পথ চলিতে চলিতে দেখিল, দেখিতে দেখিতে পথ অতিক্রম করিয়া আগাইয়া গেল। পরীক্ষা দিতে সে পারিল না। কোনোদিন পুস্তিকে

আশাও নাই। কিছুই সে পারিতেছে না। আশ্চর্য! পরিচিত অপরিচিত নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াছে। সব চেষ্টার এক ফল,—বিফলতা। হয় নাই, হইবে না। হইবে না, এই কথাটুকুর জন্য কতরকমে কতবার ঘুরিতে হইয়াছে। প্রত্যেকে একই উত্তর দিয়াছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন ভঙ্গীতে। কেহ রুক্ষ, কেহ কোমল, কেহ ব্যঙ্গে, কেহ পরিহাসে, কেহ শান্তভাবে কেহ সক্রোধে। সমস্তই সে নীরবে শুনিয়াছে। কিন্তু সে সব কথা তোলাপাড়া করিয়া ত কিছু লাভ নাই। মেসের চার্জ দিয়াছে সে আংটি বিক্রী করিয়া। কিন্তু ততঃ কিম্? সহসা হরিচরণ নন্দীর কথা মনে পড়িল—রুক্ষস্বভাব শীর্ণকায় ভদ্রলোক—সঞ্জয়কে ট্রেনে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, ঠিকানা দিয়াছিলেন। সঞ্জয় বি এস সি পড়ে শুনিয়া ভদ্রলোক চটিয়া গিয়াছিলেন। "বি, এস-সি পড়ে কি হবে শুনি? কোন্ কাজে আসবে?" সঞ্জয়কে নিরুত্তর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ফাস্ট বুক জানো ত? পড়েছিলাম ঘোড়ার পৃষ্ঠা অবধি। হরিচরণ নন্দীর লোহার আড়ত ওতেই চলে যাচ্ছে। বি, এস সি, হুঃ!"

বি, এস-সি ডিগ্রীর উপর ভদ্রলোকের বিরাগের হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া বোকা বনিয়া সে চুপ করিয়া গিয়াছিল। হরিচরণ নন্দীর ঠিকানা সে রাখিয়া দিয়াছে। একবার যাইবে নাকি? হয়ত কিছুই হইবে না। হয়ত চিনিতে পারিবে না সঞ্জয়কে। তবু একদিন যে আগ্রহ করিয়া ঠিকানা দিয়াছিল তাহার মুখের অন্য রকম কথাটা শুনিয়া আসিতে ক্ষতি কি? মন্দ লাগিবে না সঞ্জয়ের। সঞ্জয় মনে মনে হাসে।

তাহার রুম-মেট সংস্কৃত পড়ে। সেদিন শকুন্তলা নাটক হইতে পড়িতেছিল "পরিহাস বিজল্পিতং সখে।" সবই পরিহাস। এত ঘোরাফেরা এত কথার হেরফের, এত আস্ফালন আকুতি সবই পরিহাস। এ রসিকতার উৎস যে কোথায় সঞ্জয় তাহাই নির্ধারণ করিতে না পারিয়া বেকায়দায় পড়িয়াছে। সে যাই হোক হরিচরণ নন্দীর সঙ্গে রহস্যালাপটা একবার সারিয়া আসিতে দোষ কি? আংটি গিয়াছে ঘড়িটাও যাইবে। তাহার পর নিশ্চিন্ত।

সঞ্জয় মেসে ফিরিয়া স্নানাহার সারিল। চুল আঁচড়াইতে গিয়া আয়নায় ফুটিয়া ওঠা মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাসি পাইল। দিব্য সুশ্রী চেহারা। কিন্তু কোনো কাজেই আসিল না। স্মিথ কোম্পানীর বড় সাহেব গলিল না, হরিচরণ নন্দী গলিবে কি? সঞ্জয় চিরুণীটা আর একবার চুলের মধ্যে চালাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বিপুল কারখানা। নানা রকম লোক খাটিতেছে। গেটে দরোয়ান। সঞ্জয় ভাবিতেছিল পরিহাসটা বেশ ভাল রকম জমিয়াছে। হরিচরণ নন্দী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, লোহার আড়তদার। তাহার কোনো কিছুর সহিত ইহার মিল নাই। অথচ এই ঠিকানা। সঞ্জয় একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়। আবার ভাবিল, কি ব্যাপার,—একবার দেখিতে দোষ কি? এক বছরের বেশী হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কত কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। লোহার আড়তদারের কারখানার মালিক হইতে বাধা কি! নন্দী মশায়ের নাম-ঠিকানা লেখা কাগজটা বেয়ারার হাতে পাঠাইয়া দিয়া সে একটা ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল—ডাক আসিল। সঞ্জয় আধুনিক রুচিসম্মত সুসজ্জিত একটি অফিস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যাহাকে দেখিল, সে হরিচরণ নন্দী নয়, সুশ্রী সুদর্শন চেহারার এক ভদ্রলোক। সঞ্জয়কে স্মিত হাস্যে বসিতে বলিলেন। সঞ্জয় বসিতেই ভদ্রলোক কহিলেন—"আপনি বাবার সঙ্গে দেখা কোরতে চান, কিন্তু বাবা ত কারখানায় আসেন না। আমি এখানকার কাজ দেখি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত আমাকেই আপনার কথা বোলতে পারেন।"

সঞ্জয় সংক্ষেপে ট্রেনের মধ্যে আলাপের কথা এবং প্রয়োজন হরিচরণ নন্দীর কাছে আসিবার কথা খুলিয়া কহিল। ভদ্রলোক হাসিলেন, কহিলেন—"বেশ আপনি কাল আসবেন। আমি বাবার সঙ্গে কথা বোলবো এ সম্বন্ধে। বাবার আড়ত ধর্মতলায়। এই ঠিকানা। আপনি চান ত দেখা কোরতে পারেন। কিন্তু বাবা যদি আড়তে আপনাকে কাজ দেন তা হ'লে ত মুস্কিল।" সঞ্জয় ব্যাপার বুঝিতেছিল না। ছেলে কারখানা খুলিয়াছে নব্যপন্থায়। বাবা সেই আড়তেই পড়িয়া আছেন। সঞ্জয়ের ইতস্তত ভাবটা ভদ্রলোক লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় কহিলেন—"বাবা আড়ত ছাড়া কিছু বোঝেন না। কারখানার ওপরে তিনি খুসী নন। ওই আড়ত নিয়েই আছেন। আপনাকেও যদি আড়তেই রেখে দেন তাহোলেই মুস্কিল। আমার এখানে অনেক লোক দরকার। আপনাকে পেলে বেশ হোত। দেখাই যাক। আমি চেষ্টা কোরবো।"

আরও কিছুক্ষণ নানা কথা বলিবার পর সঞ্জয় নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পিতা পুত্রে কি কথাবার্তা হইয়াছিল, সঞ্জয় জানিত না। একদিন হরিচরণ নন্দীর চিঠি পাইয়া তাঁহার বাড়িতে গিয়া দেখা করিল। সঞ্জয় জানিল যে কারখানাতেই

তাহার কাজ হইয়াছে, তবে সম্প্রতি নন্দী মশাই কিছুদিনের জন্য মফঃস্বলে যাইতেছেন কতকগুলি ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে। সঞ্জয়কে তিনি কিছুদিনের জন্য সঙ্গে লইতে চান। অবশ্য সঞ্জয়ের যদি আপত্তি না থাকে। ফিরিয়া আসিয়া সে কারখানায় যোগদান করিবে। সঞ্জয়ের আপত্তি ছিল না! হরিচরণ নন্দী রুক্ষস্বরে কহিলেন—"সে কিন্তু আজ পাড়াগাঁ, তোমাদের মত সহুরে ছেলেদের মন টিকবে ত? বেশ কিছুদিন দেরী হবে। ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো।" সঞ্জয় হাসিল। হরিচরণ নন্দীর মুখ আরও গম্ভীর হইল—"হাসিটাসি নয়। বয়স নেহাৎ কাঁচা—অনেক দেখবে, অনেক শিখবে। শুধু যে হেসেই কিস্তিমাৎ হয় না, তাও বুঝবে।"

কিস্তিমাৎ যে কাঁদিয়াও হয় না, সঞ্জয় তাহা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। তবে হরিচরণ নন্দী নেহাৎ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া একটু অবাক করিয়াছেন। দিন দুই পরেই রওনা হইতে হইবে। সঞ্জয় বাড়ির বাহিরে আসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল, চাকরী হইয়াছে, কারখানায় না আসা পর্যন্ত ১০০৲ টাকা পাইবে। কথাটা তাহাকে বিন্দুমাত্র খুসী করিল না। হাতঘড়িটার দিকে চাহিল। এতদিন এটাকে বিক্রী করে নাই। এখন আর বাধা নাই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাওয়ার খরচ এটা বিক্রী করিয়া জোগাড় হইবে। একটা ঘড়ির দোকানে দরদস্তুর করিয়া সেটা বেচিয়া দিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিয়া অনেকদিন পরে সে ট্রামে উঠিয়া বসিল।

সঞ্জয় অপর্ণাকে চিঠি লিখিতেছিল—"অনেকদিন তোমাদের চিঠি পাইনি। আশা করি, সবাই ভালো আছো। আমি ভালো আছি। মাঝে মাঝে তোমদের খবর দিও। মিন্টু কেমন পড়াশোনা ক'রছে? আমি কিছুদিনের জন্য কোলকাতার বাইরে যাচ্ছি। বাঙলাদেশের গ্রাম কখনো দেখিনি, এবারে দেখবো। নীচের ঠিকানায় চিঠি দিলেই পাবো। তোমরা আমার শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—সঞ্জয়।"

চিঠি শেষ করিয়া আলো নিভাইয়া দিল। অপর্ণা কতদূরে? কোনদিন আর তাহার সহিত দেখা হইবে কি? দুস্তর ব্যবধান; সঞ্জয় আর পারে না, নিজেকে বড় শ্রান্ত বড় ক্লান্ত লাগে। মনে হয় সমস্ত তর্ক ভুলিয়া অপর্ণার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অপর্ণাকে বলে—তাহার সুখ-দুঃখের মাঝখানে অপর্ণা তাহার স্থান খুঁজিয়া লউক। অপর্ণার সান্নিধ্যে সে তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বের বোঝা নামাইয়া দিয়া নিজকে মুক্ত করিবে। এভাবে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে জর্জরিত করিয়া লাভ কি? রাজীব ঘোষের তীক্ষ্ন কঠিন ব্যঙ্গে সে টলিবে না। কিছুতেই না। সে অপর্ণাকে বলিবে সমস্ত বাধা ঠেলিয়া তাহার ডাকে সাড়া দিতে। কিন্তু অপর্ণা যদি সাড়া না দেয়?

অপর্ণার ধীর স্থির, শান্ত মুখখানা মনে পড়িল। কোনো কিছুর প্রয়োজনই যেন তাহার নাই। সঞ্জয়ের প্রতি তাহার আন্তরিকতার অন্ত নাই, কিন্তু সঞ্জয়ের অন্তরের সুরের সহিত তাহার মিল আছে কি? সহজ ভদ্র ব্যবহার—ইহার বেশী কিছুই সে মনে করিতে পারে না। সঞ্জয় নিঃসংশয়ে অনুভব করে—সে যদি অপর্ণার কাছে ছুটিয়া যায়, অপর্ণা তাহার বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া পরম করুণাভরে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। সঞ্জয় সহ্য করিতে পারে না। না—সে দৃষ্টি সে সহিতে পারিবে না। অপর্ণা থাকুক, যেখানে সে আছে,—ঐশ্বর্যের মাঝখানে। দরিদ্র সঞ্জয়ের শত দৈন্যের মাঝখানে সে তাহাকে ডাকিবে না। কিন্তু যদি কোন একদিন সে অপর্ণার দিক হইতে সাড়া পায়, সেদিন সে কোন বাধা মানিবে না। অশান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে সঞ্জয় ঘুমাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। ঘুম আসে না—ব্যথার জায়গায়ই বার বার আঘাত লাগে। কেহই নাই, তবু অপর্ণা ত আছে, কিন্তু সে থাকিয়াও নাই। দিন, মাস, বৎসর পার হইয়া যায়, বিস্মৃতির ঘনায়মান আঁধারে অপর্ণার ছবি যেন আলোক-রেখায় রেখায়িত, মুছিলে মোছে না, ভুলিতে গেলে বেশী করিয়া মনে পড়ে।

খেয়াঘাটে বসিয়া সঞ্জয় খেয়া পারাপার দেখিতেছিল। দুটো গ্রামের মাঝ দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। খেয়া নৌকা এপারের লোক লইয়া ওপারে পেণছাইয়া দিতেছে। ওপারে বর্ধিষ্ণু গ্রাম, হাট বসে। এপারের লোক দল বাঁধিয়া ওপার চলিয়াছে। পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা চলিয়াছে। কেমন যেন অলস স্তিমিত বিষণ্ণতা মনে আসে। বাঙলার পল্লী—উপন্যাসে সে ইহার কথা পড়িয়াছে। পশ্চিমের গ্রাম সে দেখিয়াছে,—রুক্ষ ধূসর মাটির বুকে ছোট ছোট পল্লী। পথে লাল ধুলো ওড়ে, রাঙামাটির পাহাড়। মেয়েরা দল বাঁধিয়া কাজ করিতে যায়। তাহাদেরও পরণে রাঙা শাড়ী। দীর্ঘ ঋজু দেহ, পায়ের তালে তালে ঘাঘরা দুলিয়া ওঠে। আর এখানে ক্ষীণদেহা বঙ্গবধূ আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া নদী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছে কত কষ্টে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, অনাহারে, অল্পাহারে দেহ শীর্ণ। ধীর স্থির শান্ত করুণায় অবিচল। তাহার মাকে মনে পড়িয়া যায়। তাহার মায়ের সহিত কোথায় যেন মিল আছে ইহাদের। তাহার মা-ও এই বাঙলাদেশেরই মেয়ে ছিলেন। এই নদীর স্বচ্ছ প্রবাহের সহিত, ওই ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের সহিত, এই শান্ত নীরবতার সহিতও সঞ্জয় তাহার মায়ের মিল খুঁজিয়া পায় যেন। জীবধাত্রী ধরিত্রী—আর সন্তানের জননী,—কোথায় যেন ইহাদের মিল আছে! সন্তানের মুখ চাহিয়া নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দেয় ইহারা।

রাত্রে সঞ্জয় হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিয়াছে, হরিচরণ নন্দী তাহাকে কাজ বুঝাইতেছেন। সঞ্জয় একমনে শুনিতেছে। পাকা ব্যবসায়-বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। ইহাকেই বলে ব্যবসায়। কাজ শেষ হইলে নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, নন্দী মহাশয় ডাক দিলেন, "এখনই শুতে যাবে? যদি ইচ্ছে থাকে ত চলো নদীর ধারটা ঘুরে আসি।" সঞ্জয় উৎসুক হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। ঘুমন্ত পল্লী। পায়ে-চলা সরু পথ দিয়া তাহারা চলিতেছিল। আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। খানিকটা দূরে একটা কি নিশাচর পাখী ডাকিয়া উঠিল। চারিদিক জ্যোৎস্নার মায়াজালে বন্দী। শীর্ণকায় হরিচরণ নন্দী আগে আগে চলিয়াছেন। সঞ্জয়ের কেমন যেন অদ্ভুত লাগিতেছিল। হরিচরণ নন্দীর রুক্ষ কঠিন স্বভাব। সদা-কোপান্বিত মূর্তি, জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়া কেমন একরকম দেখাইতেছে। সঞ্জয়ের মনে হইতেছিল যেন হরিচরণ নন্দী তাহাকে নিশির ডাকে ঘরছাড়া করিয়া পথে বাহির করিয়াছেন। কোথায় দূর পশ্চিমের সেই শহর, কোথায় কলিকাতা—আর কোন এক নির্জন পল্লীগ্রামে সে এই লোকটির সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই নির্জন পল্লীতে নন্দী মহাশয়ের কি কাজ? এখানে লোহা ত দূরে স্থান, কোনোরকম কারবারই ত নাই। ওপারের গ্রামের বাজার-হাটের উপর এপারের নির্ভর। অথচ দু'-তিনদিন হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে আসিয়া এখানেই নির্জন বাসে দু'-তিনদিন কাটিয়া গেল। সহসা শীতল বাতাসের স্পর্শে সঞ্জয়ের চিন্তায় বাধা পড়িল। নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। পাড়ে একখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা ছিল। নন্দী মহাশয় তাহাতে উঠিয়া সঞ্জয়কে ডাকিলেন—"এসো, এইখানে বসি।" সঞ্জয় নৌকায় উঠিয়া বসিল। খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া জলপ্রবাহ দেখিলেন। নদী বহিয়া চলিয়াছে—জ্যোৎস্না পড়িয়াছে জলের বুকে। অনেকক্ষণ পরে নন্দী মহাশয় কথা কহিলেন—"এই গ্রামেই আমি মানুষ হোয়েছিলাম। ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন, অনেক দুঃখেকষ্টে মা আমাকে বড় করেছিলেন। ধান ভেনে, গম পিষে, লোকের ফরমাস খেটে দিয়ে মা যা পেতেন, তাই দিয়ে কোনরকম চলে যেত এক একদিন হাঁড়ি চড়ত না, এমনি অবস্থা! ক্রমে বড় হ'য়ে পাঠশালা ছেড়ে শহরের স্কুলে পড়তে গেলাম। মা'র কাজেও সাহায্য

করতাম। সুখে দুঃখে একরকম দিন যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন সে সুখও ভাঙলো। এই যে নদীর ঘাট দেখ্‌ছো, এ-ঘাট তখন এখানে ছিল না। নদী ছিল আরও ওইদিকে, পাড় ভেঙে ভেঙে এখন এতটা সরে এসেছে। এই নদীর ঘাটে একদিন সন্ধ্যেবেলা জল নিতে এসে মা আর ফেরেনি। সবাই বল্‌লো, জলে ডুবে গিয়েছে—আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু—"

হরিচরণ নন্দী থামিয়া গেলেন। সঞ্জয় একমনে শুনিতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া চাহিয়া দেখিল, নন্দী মহাশয়ের দৃষ্টি দূরে কোথায় নিবদ্ধ। তিনি যেন প্রাণপণে কি এক অদৃশ্য শক্তির সহিত লড়াই করিতেছেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"মা জলে ডুবে মারা যাননি।—মামুদপুরের জমিদার বজরা ক'রে যাচ্ছিল—মাকে নিঃসহায় একলা পেয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে কথা জানা যায়, মা আত্মহত্যা করবার পর। পুলিসের তদন্তে সমস্ত প্রকাশ পেয়েছিল। মামুদপুরের জমিদারের বাগানবাড়িতে এমনি আরও অনেক হতভাগিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। জমিদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল—হয়ত মা আত্মহত্যা না করলে তার যাবজ্জীবন জমিদারী ক'রেই কাট্‌ত।

সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। যেদিন এসব কথা শুনলাম, সেদিনই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম—আমার বয়স তখন বছর বারো। শহরে গিয়ে এক আড়তদারের কাছে কাজ নিলাম। তারপর একটু একটু ক'রে উন্নতি ক'রে শেষে কোলকাতায় গিয়ে ছোট কারবার শুরু করি। তারপর যা ক'রেছি, সে ত তুমি দেখেইছো। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গাঁয়ে আর ফিরিনি। বছর দু'তিন হ'ল ওই জায়গাটুকু কিনে বাড়িটা করিয়েছি। এখানে আমাকে কেউ চিন্‌তে পারেনি। বায়ান্ন বৎসর আগে যারা ছিল, তারা প্রায় কেউই নেই—যারা আছে তারা আমাকে ভুলেই গিয়েছে। এই গাঁয়ে কেউ আস্‌তে চায় না, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সবারই অমত ছিল বাড়িটুকু করা। তবু আমি ওই দু'খানা ঘর তৈরী করিয়েছি। মাঝে মাঝে আসি। এসে যে সুখ পাই, তা নয়। তবু যেন শান্তি পাই। যেদিন এই নদীর ঘাট থেকে মা আর ফেরেনি, সেদিন থেকে সুখ বল, শান্তি বল, সব হারিয়েছি। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, অর্থ—সবই হয়েছে, তবু যেন থেকে থেকে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। রাত্রে যেন স্বপ্নের মধ্যে মা'র ডাক শুনতে পাই—"খোকা! খোকা!" চমকে উঠি, মনে হয়, মা যেন বন্ধ ঘরে হাতড়ে মরছে আমায় ডেকে। আমি সাড়া দিতে গিয়ে থেমে যাই। লোক বল্‌বে পাগল।

পঞ্চাশ বৎসর পার হয়ে গেছে, কিন্তু সেই দুর্ঘটনার কথা একটুও ভুলতে পারি নে। মনে হয়, কার অভিশাপে যেন সমস্ত জীবনটাই খাঁ খাঁ করছে; শান্তি কোনদিনই বুঝি পাবো না লোহার ওপর কি আর ফুলফল জন্মায়?" কারবার ক'রে লোহাই হয়ে গিয়েছে—মায়াদয়ার লেশও নেই। কি করে থাকবে বল? লোহার ঘা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন আর কোন কিছুতেই মন লাগে না। ব্যথা বল, মমতা বল, আমার মনে আর সে সব জন্মায় না। লোহার ওপর কি আর ফুলফল জন্মায়?"

হরিচরণ নন্দী শীর্ণ কঠিন হাসি হাসিলেন। সঞ্জয় তীব্র আঘাত পাইল মনে। ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। নন্দীমশাই কি বুঝিলেন কে জানে? কিন্তু আবার হাসিলেন, আগের হাসির সহিত ইহার কোনখানে মিল নাই। কেমন যেন উদাস শ্রান্ত সুরে কথা কহিলেন—"সত্তর বছর পার হয়ে গেছে, আরও কতদিন বাঁচবো জানি না, তবু মনে হচ্ছে তোমার কাছে কিছু শিখ্‌তে হবে। তুমি মনে শান্তি দিলে বড়। এমন ক'রে কাউকে আমি বলতে পারিনি। আজ যেন আমার শাপমুক্তি হ'ল। তোমার ঋণ কিছু দিয়ে শুধ্‌তে পারবো না বাবা। নন্দী-মশাই সঞ্জয়ের বলিষ্ঠ হাতের উপর হাত রাখিলেন—চোখে তাঁহার অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে। সঞ্জয় ব্যথিত বিস্ময়ে নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহিল। হরিচরণ নন্দীর কাহিনীর সুর যেন সম্মুখের জলকল্লোলে মিশিয়া দূরে হইতে দূরান্তরের পথে চলিয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়া সঞ্জয় দুইটি খবর পাইল। প্রথমটি প্রশান্ত আবার চলিয়া গিয়াছে—এবারে সে মধ্য ভারত ঘুরিয়া উত্তর-ভারতেও অভিযান চালাইবে। শেষ পর্যন্ত নাকি ভূস্বর্গ কাশ্মীর পর্যন্ত তাহার দৌড়। আর একটি খবর শুনিয়া সঞ্জয় প্রথমে বিশ্বাস করিল না, পরে যখন বিশ্বাস না করিবার আর কোনো উপায় রহিল না তখন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। খবর দুঃখের নহে, অত্যন্ত সুখের, যদিও সঞ্জয় এ সৌভাগ্যকে হর্ষোৎফুল্ল মনে প্রথমটায় গ্রহণ করিতে পারে নাই। সঞ্জয়ের ঠাকুরদাদার সহোদর ছোট ভাই বাড়ির লোকের সহিত বিবাদ করিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান সুদূর বর্মায়। সেই দেশেই তিনি সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেন। কাঠের ব্যবসায়ে তিনি লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের বাবা মৃত্যুঞ্জয়কে তিনি খুব স্নেহ করিতেন। সঞ্জয় তাহার বাবার মুখে ইঁহার অনেক গল্প শুনিয়াছে। কিন্তু দারুণ অভিমানেই হউক বা যে কারণেই হউক তিনি স্বদেশে আর ফেরেন নাই এবং কাহারও সহিত পত্রালাপ পর্যন্ত রাখেন নাই। বর্মা দেশেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রথমা স্ত্রী বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যে মারা যাইবার পর আর তিনি বিবাহ করেন নাই। মৃত্যুর সময় তিনি উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সঞ্জয়ের বাবা মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়া গিয়াছেন এবং উইলে লেখা আছে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এ সমস্ত অর্থের ও কারবারের উত্তরাধিকারী হইবে। গত এক

ৎসর ধরিয়া বর্মা গভর্নমেণ্টের সহিত বাঙলা রকারের এ বিষয় লইয়া নানারূপ তদন্ত ও ংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে। অবশেষে নেক অনুসন্ধানের পর তাহার সন্ধান লিয়াছে। যে পুলিশ ইন্সপেক্টরটি সঞ্জয়ের হিত কথা কহিয়া তাহাকে পূর্বাপর সমস্ত ঝাইয়া দিতেছিলেন, তিনি সঞ্জয়ের মুখের াব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। সঞ্জয় কমন একরকম করিয়া হাসিল।

তিনি চলিয়া গেলে সব প্রথম সঞ্জয়ের মনে ইল, প্রশান্তকে একখানা চিঠি লিখিয়া াহার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা ানাইতে হইবে। আর—? সে কথা এখন ক্। ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মস্ত বিষয় নির্ধারণ করিবে। এখন সে কথা ক্।

সুসংবাদ গোপন রহিল না। সহপাঠী রিচিত আত্মীয়ের ভিড় জমিয়া গেল। সঞ্জয় বাক হইয়া ভাবিতেছিল, এতদিন ইহারা াথায় ছিল? সঞ্জয় কেমন যেন হাঁপাইয়া ঠল।

অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, অপর্ণার কোন ার সে পায় নাই। এবারে সে আর ইতস্তত রবে না। আগে অপর্ণার সম্মতি লইবে, হার পর রাজীব ঘোষের সংগে দেখা করিবে। জীব ঘোষের অভ্যর্থনাটা নিশ্চয় আর এক ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর াবও সে মিটাইবে। আসল অভাব যখন টিয়াছে, তখন এগুলির একটা মীমাংসা বে বৈকি ? তবে সময় লাগিবে। সে সময়ের া সঞ্জয় অপেক্ষা করিবে। অপর্ণার জন্য চিরজীবন ধরিয়া অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছে; কিন্তু সে অপেক্ষার কথাও আর এখন ঠ না। কিন্তু অপর্ণা যদি সম্মতি না দেয়? হূর্তে সঞ্জয়ের হৃদস্পন্দন থামিয়া যায়। এবার সমস্ত পণ করিয়া খেলায় বসিবে, জিত, নয় হার। সে আব তিল তিল রয়া পুড়িতে রাজি নয়। অশান্ত হইয়া ঠ সঞ্জয়। প্রশান্তকে সে চিঠি লিখিয়াছে— যেন অবিলম্বে চলিয়া আসে। দারুণ কণ্ঠায় সঞ্জয় প্রশান্তের চিঠির উত্তরের গায় অপেক্ষা করে। প্রশান্ত এখন াহাবাদে আছে। ওখানে সে এতদিন করিতেছে? এক এক সময় তাহার মনে বুঝি সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে; কিন্তু গুণ আগ্রহে সে আশার আলোর শিখা বাইয়া রাখে।

একমাস পরে চিঠি আসিল; অপর্ণার ; মিনটুর। মিনটু লিখিয়াছে—

য় দা,

দিদি এখানে নেই। আপনার চিঠি দিদিকে না কেটে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবেন যে, দিদির বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। আপনি ভাবছেন যে, দিদির বিয়ে হ'ল, অথচ আপনাকে খবর দেওয়া হ'ল না। কিন্তু আপনার রাগ থাক্‌বে না যদি সবটা শোনেন। দিদির বিয়েতে আমরাও কেউ যেতে পারিনি, কারণ বাবার সম্পূর্ণ অমতে দিদির বিয়ে হয়েছে। মাস দু-তিন আগে আমার বড়-পিসীমার সংগে দিদি এলাহাবাদে গিয়েছিল। বড়-পিসীমা দিদিকে ওখানে কিছুদিন রাখবেন বলেছিলেন। বাড়ির কারুর আপত্তি ছিল না। কিছুদিন পরে দিদির চিঠিতে জানলাম যে, আমার পিসীমার বড়ছেলের এক আর্টিস্ট বন্ধু ওখানে আছেন। তিনি নাকি খুব সুন্দর ছবি আঁকেন। তারপর কিছুদিন গেলে সেই আর্টিস্ট বন্ধু দিদির সংগে বিয়ের প্রস্তাব করে বাবাকে চিঠি দেন। ভদ্রলোকের নাম প্রশান্ত সেন—খুব বড় জমিদারের ছেলে। কিন্তু আমাদের স্বজাতীয় নন। বাবাকে কোনদিনই গোঁড়া বলে জানতাম না; কিন্তু আশ্চর্য, বাবা ভীষণ চটে গেলেন এবং পিসীমাকে লিখে দিলেন, পত্রপাঠ দিদিকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখানে। দিদি কিন্তু এল না। তারপর শুনলাম, তাঁর সংগেই দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িশুদ্ধ সব'ই খুব shocked, কারণ দিদিকে ত জানেন, বরাবর ও কি রকম শান্ত ছিল। ও যে এমন ক'রে সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু ক'রবে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। দিদির সংগে আমাদের চিঠিপত্র লেখালেখি পর্যন্ত বন্ধ। আমার এক ক্লাস-ফ্রেন্ডের বাড়ির ঠিকানায় দিদি আমাকে চিঠি দেয় অবিশ্যি বাড়িতে কেউ জানে না। আপনার চিঠিটা ভাগ্যিস আমার হাতে পড়েছিল। দিদি এখন এলাহাবাদেই আছে, শীগ্গীরই নাকি কোলকাতায় ফিরে যাবে। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। একবার এখানে এলে খুব সুখী হবো। প্রণাম জানবেন। ইতি—মিন্টু।

সঞ্জয় সমস্ত চিঠিখানা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিল।

সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে। সঞ্জয় নিজের কেবিনের জানালা দিয়া দেখিতেছিল। চতুর্দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ডেকের যাত্রীরা ভয়ে বিবর্ণ। নীচের ডেক হইতে সকলে আসিয়া উপরে আশ্রয় লইয়াছে। বিপদসূচক তীব্র বাঁশী বাজিতেছে—জাহাজের ক্যাপ্টেনের মুখে প্রস্তরমূর্তির কঠোরতা। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ থাকিয়া থাকিয়া শোনা যাইতেছে। দূরে বহুদূরে নীল আলো ঝলসিয়া উঠিল। সঞ্জয় চাহিয়া দেখিল— উত্তাল সমুদ্র সহস্র তরঙ্গ-জিহ্বা মেলিয়া বজ্রাগ্নি যেন মুছিয়া ফেলিল। জাহাজ দুলিতেছে, কে যেন তীব্র রোষে ক্ষোভে জাহাজের গায়ে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে—শব্দের লক্ষ লক্ষ তরংগে যেন নিঃশব্দতার মহাসাগর রচনা হইয়াছে। সঞ্জয় অতিকষ্টে একটু একটু করিয়া আগাইয়া বাহিরে আসিল। প্রচণ্ড বাতাস তৃণের মত তাহাকে উড়াইয়া লইয়া উদ্বেল সমুদ্রে মুহূর্তের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। এতটুকু চিহ্ন রহিবে না।

বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে একটানা তীব্র সুরে। প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রতিটি যাত্রী দুঃসহ মুহূর্ত যাপন করিতেছে। এক মুহূর্ত, তাহার পরের কথা কেহই জানে না।

সংগীদের ডাকে সঞ্জয় শৈশবে কবে পাঠশালা পলাইয়া রথের মেলায় নাগরদোলায় চড়িয়াছিল। আরও একবার সুখ-দুঃখের হিসাব ভুলিয়া জীবনের দিকে চাহিয়া দেখে, জীবন হিসাবের খাতা নহে। সে চলিষ্ণু পথিক ছিল না, থাকিবে না। তবু তাহার কণ্ঠে জড়ান সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের সূত্রে গাঁথা মালা।

সঞ্জয় চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, প্রবল ধারাবর্ষণ নামিয়া আসিয়াছে, কিছুই চোখে পড়ে না। নিজেকে একমুহূর্ত স্থির রাখা যায় না জাহাজের অশ্রান্ত দোলায়—এক একবার নীল আলো ঝলসিয়া ওঠে উত্তাল সাগরের বুকে। যতদূর দেখা যায়, অসীম জলরাশির মধ্যে মৃত্যুর নীরব সংকেত আর জীবনের উদ্বেল শংকা এক হইয়া প্রলয় বিষাণে ফুৎকার দিতেছে।

সঞ্জয় ভুলিয়া গিয়াছে, কেন সে আজ ঝড়ের পথের যাত্রী, কেন সে সমুদ্রের বুকে প্রলয় দোলায় দুলিতেছে। বর্মাপ্রবাসী ঠাকুর-দাদার বিরাট ব্যবসায় ও প্রচুর অর্থের মালিক হইতে বাঙলা ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশে চলিয়াছে সে, এ মুহূর্তে সেকথাও যেন তাহার মনে পড়ছে না। আজ তাহার কেবল মনে পড়ে মায়ের মুখ, বাবার স্মৃতি, অপর্ণা-প্রশান্তর কথা। আজ কেহ নাই, কিছু নাই। জীবনের চির-নিঃসংগ পথে মানুষ চির-একা। কিন্তু এ মুহূর্তে একাকিত্বের অনুভূতি শূন্য করিয়া দেয় না অন্তর। সম্মুখে মৃত্যু পিছনে ফেলিয়া-আসা জীবন, দুইএর একীভূত পরিপূর্ণতা লইয়া মানুষ নিজের দিকে চাহিয়া দেখে, সেখানে বিদ্বেষ নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, দ্বন্দ্ব নাই। আছে পরিপূর্ণ ক্ষমায় ভরা আশীর্বাদ —যাহারা রহিল যাহারা গিয়াছে, যাহারা আসিবে, তাহাদের সকলের জন্য, পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর জন্য।

—শেষ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বহুমতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের গণ-পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ সমর্থিত হইয়াছে। অধিবেশনে বলা হইয়াছে, কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের কোন মত ত্যক্ত হয় নাই এবং কংগ্রেস স্বীয়সর্তে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য কার্যকরী সমিতি প্রস্তাবে তাঁহাদিগের ৩ দফা আপত্তি জানাইয়া গণ-পরিষদে যোগ দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সেই সকল সর্তের মধ্যে একটি এই যে, বাঙলায় ও আসামে ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যগণ গণ-পরিষদে সদস্য-নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন না। এখন জানা গিয়াছে, বাঙলার ইউরোপীয়রা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভোটদানে বিরত থাকিবেন। ইহার পরে হয়ত আসাম হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এমন কি, মনে করা সম্ভব নহে যে, যাহাতে কংগ্রেস গণ-পরিষদে যোগদানে সম্মতি প্রত্যাহার করেন, সেই ভয়ে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের "চালে" ইউরোপীয়গণ ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা দেখিয়াছি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঐরূপ সিদ্ধান্তের জন্য বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ইউরোপীয়দিগের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? দেশের শাসনপদ্ধতি রচনায় কেবল দেশের লোকেরই অধিকার। কাজেই ইউরোপীয়গণ ভোট ব্যবহার করিলে তাহা আইনসংগত ও নীতিসংগত হইত না, তাহা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন।

অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধেও যে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাঁহারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই কংগ্রেসের অগ্রগামী দলের লোক।

বাঙলা হইতে গণ-পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইবে। সেজন্য যে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহার আহ্বায়ক শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় জানাইয়াছেন, বোর্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রার্থীর আবেদন গ্রহণ করিবেন না। অর্থাৎ তাঁহারা আপনারা আলোচনা করিয়া সদস্য মনোনীত করিবেন।

এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথায় যে বহু লোক আবেদন করিতে এবং দ্বারে দ্বারে যাইয়া "ক্যানভাসিং" করিতে বিরত হইবেন, এমন মনে করিলে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করাই হইবে।

জনরব, বাঙলার কংগ্রেস দল কাহাদিগকে

মনোনীত করিবেন, তাহা অনেকটা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা সত্য হউক আর না-ই হউক

(১) ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য মনোনয়নে

(২) ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচনে

বাঙলার কংগ্রেস দল যে বহু ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষ ব্যবস্থাপক সভায় যে কংগ্রেস একটি আসন হারাইয়াছেন, সেজন্য লোকে যে নানা কথা বলিতেছে, তাহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না।

বাঙলার সমস্যায় যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙলাকে যে আসামের সহিত এক সংঘভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে আসামের বিশেষ আপত্তিও দেখা যাইতেছে। বাঙলার কতকাংশ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—যদি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত করিতে হয়, তবে বর্তমান বিহারের কয়টি জিলায় বাঙলার অধিকার অস্বীকার করা যায় না।

মিস্টার জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনার অন্যতম কেন্দ্র বাঙলায় যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের অধিকার নষ্ট করা না হয়, সে চেষ্টা গণ-পরিষদের করিতেই হইবে।

কংগ্রেসের কর্তারা বাঙলা হইতে তিনজনকে মনোনয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আর একজন শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও বলা যায়—শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন, তাহার পরিচয় তাঁহাদিগের থাকিলেও দেশের লোক তাহা পায় নাই। প্রত্যেক কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ও আলোচনার প্রয়োজন।

যাহাতে বাঙলা হইতে বিশেষ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া গণ-পরিষদে প্রেরণ করা হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙলার কংগ্রেসকে কাজ করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত করিবার জন্য মিশনের সদস্যগণ হীন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কংগ্রেস কখনই আপনাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কিছু মনে করিতে পারেন না। কাজেই সিমলায় আলোচনাকালে যেমন কংগ্রেস দুইজন মুসলমানকে—

(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ;

(২) খান আবদুল গফুর খান

মনোনয়নের দাবী জানাইয়াছিলেন—তেমনই মুসলমানরা যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই প্রদেশ হইতেও কংগ্রেসের পক্ষে এক বা একাধিক জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মনোনীত করা প্রয়োজন কি না, তাহাও বাঙলার কংগ্রেস দলকে বিবেচনা করিতে হইবে।

আমাদিগের বক্তব্য—আজ আর কোন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের আদর্শের আদর না করিয়া পারেন না। কাজেই যদি প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ কংগ্রেস দলে যদি আবশ্যক গুণ-সম্পন্ন প্রতিনিধির অভাব হয়, অথবা কোন যোগ্য ব্যক্তি কংগ্রেস দলের বাহিরে থাকেন—তবে তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের মনোনয়নে গণ-পরিষদে যাইতে প্ররোচিত করা কংগ্রেসের কর্তব্য।

যখন বুঝা গিয়াছিল, কংগ্রেস গণ-পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, তখন বাঙলায় কংগ্রেস দলের কেহ কেহ ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রদানের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে যে তাঁহার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হইবে এবং সম্ভব হইলেও সংগত হইবে, এমন মনে করা যায় না। সুতরাং মহিলা, দেশীয় খৃষ্টান, ফিরিঙ্গী—এই সকল সম্প্রদায় বাদ দিলে যে কয়জনকে মনোনীত করা হইবে, তাঁহাদিগের পরিষদে যোগ্যতাই একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় হয়। তাঁহারা বাঙলার বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া—বাঙলার সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিয়া—শাসনপদ্ধতি রচনার কার্যে আপনাদিগের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এমন লোক না হইলে বাঙলার পক্ষে অনিষ্ট অনিবার্য হইবে। আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বাঙলা অন্যান্য প্রদেশের নিকট আবশ্যক বিবেচনা লাভ করিতে পারে নাই। বাস্তবিক কোন প্রদেশ আপনার ক্ষমতা ব্যতীত আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং সেজন্য আমরা অন্যান্য প্রদেশকে দোষ দিতে পারি না।

আর সেইজন্যই আমরা আজ বলিব—বাঙলার কংগ্রেস যেন কোনরূপ ত্রুটিতে—যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে গণ-পরিষদে সদস্য মনোনীত করিয়া ভুল না করেন। সে ভুলের ফল সমগ্র প্রদেশের অধিবাসীদিগকে অতি দীর্ঘকাল ভোগ করিতেই হইবে, আর কিসে সে ভুল সংশোধিত হইবে, তাহাও অনুমান করা যায়।

প্র·না·বি·র পাতা

সিগন্যাল

রেলের সিগন্যাল দেখিলে আমার মন উদাস হইয়া যায়। কোথাও কিছু নাই, মাঠের মাঝখানে একটা সিগন্যাল কেমন যেন খাপছাড়া, কেমন যেন অসঙ্গত। ওই অসঙ্গতিই বোধ হয় মন উদাস হইয়া যাইবার হেতু। ওই উৎকর্ণ সিগন্যালটা নির্জনতার প্রান্তে মানব সংসারের বাণী বহন করিয়া তর্জনী তুলিয়া দণ্ডায়মান। ও যেন নিস্তব্ধতার প্রহরী। পথের মোড়ে যে পুলিশ হাত উঁচু করিয়া জনতা নিয়ন্ত্রণ করে, সিগন্যালটা তারই অনুরূপ। ও হাত নীচু করিয়া গাড়ীর আগমন-সংকেত জানায়, হাত উঁচু করিয়া থাকিলে গাড়ীর সাধ্য কি তাহার সীমা অতিক্রম করে? রাতের অন্ধকারে ওর লাল নীল দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়া সঙ্কেত-বার্তা জ্ঞাপন করিতে থাকে।

রেল গাড়ীতে চলিতে চলিতে হঠাৎ ওই সিগন্যালটা আসিয়া পড়ে—মন চঞ্চল হইয়া ওঠে; একটু পরেই আর একটা সিগন্যাল, তারপরেই গাড়ীতে ঝাঁকুনি লাগে—লৌহ মৃদঙ্গে গোটা কতক দ্রুত তাল পড়ে, লয়ের পরিবর্তন ঘটে, গাড়ী এক লাইন হইতে আর এক লাইনে চালিত হয়—তারপরেই স্টেশন। গাড়ী হয়তো থামে না—প্লাটফর্মের উপরে স্থিতিশীল জীবনযাত্রার আবছা ছবি হুস করিয়া চলিয়া যায়—আবার সিগন্যাল আসিয়া পড়ে, পর পর দুটো—তারপরেই আবার সেই ঢালা মাঠ—একটানা শূন্যতা—মহাকাব্যের পটভূমির যোগ্য বিরাট বিস্তৃতি, অখণ্ড নির্জনতা! সিগন্যাল-গুলি লৌহ দণ্ড তুলিয়া ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির তপোবনের শান্তিরক্ষা করিতেছে; দেখিয়া আমার মন উদাস হইয়া যায়!

দিনের সিগন্যাল দেখিয়া যেমন মন উদাস হয়, রাতের সিগন্যাল দেখিয়া তেমনি বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বড় স্টেশনের আকাশে ওই যে লাল নীল আলোর তারকামালা ওর মধ্যে কোন্‌টি আমাদের গাড়ীর অপেক্ষায়? ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়া ড্রাইভার এ সংকেত বুঝিতে পারে? হয়তো সংকেত বুঝিবার কোনো সরল উপায় আছে, কিন্তু আমার মতো অবিশেষজ্ঞের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না। নৌকার মাঝি তারার সঙ্কেত বুঝিতে পারে? হয়তো সংকেত ট্রেনের ড্রাইভার সিগন্যালের তারা দেখিয়া ট্রেন চালায়। মানুষ নূতন যানবাহন তৈরী করিবার সঙ্গে নূতন আকাশ ও নূতন তারার সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্ধকারের পটে ঘন লাল, নীল ওই আলোর বিন্দুগুলি কী বিপুল রহস্যেরই না কেন্দ্র! রাতের বেলা স্টেশনে গেলেই ওই তারাগুলির দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। স্টেশনের আর যে গুণই থাক—মুগ্ধভাবে সিগন্যালের আলোর দিকে তাকাইয়া থাকিবার অনুকূল স্থান রেলের স্টেশন নয়। কাজেই কাজের অবসরে, যেমন কুলি ডাকা, গাড়ীতে মাল তোলা, দু'পয়সার পান কিনিয়া দেওয়া প্রভৃতি, আমার চোখ ঘুরিয়া ফিরিয়া সিগন্যালের আলোর উপরে গিয়া পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটিল বুঝিতে পারা যায় না—লাল আলোটির স্থানে হঠাৎ নীল-আলো। গাড়ীর এঞ্জিনখানা ফুঁসিতে থাকে। ওই সংকেতের কি মোহিনী শক্তি—বিরাট গাড়ীখানা হঠাৎ নড়িয়া উঠিয়া চলিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ গাড়ীখানা অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যায়—কেবল গার্ডের গাড়ীর পিছনের লাল আলোটি বিদায়-লক্ষ্মীর নিটোল অনামিকা বেষ্টনী অঙ্গুরীর দীপ্ত চুনির টুকরার মতো জ্বলিতে থাকে। বিদায়ের শেষ চিহ্ন ওই অশ্রু-অরুণ নেত্র!

আজও মনে পড়ে, বাল্যকালে, সে কি আজকার কথা! পশ্চিমের কোন্ এক স্টেশনে সন্ধ্যাবেলাতে সিগন্যালের আলোর সারি দেখিয়াছিলাম! কোন্ স্টেশন সেটা? সে কি গয়া না মোগলসরাই? শীতের সন্ধ্যা; ধোঁয়াতে, কুয়াশায় অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। আমি প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান, এমন সময়ে চোখে পড়িল স্টেশন দিগন্তের নবোদিত তারকা-মালা, লাল, নীল, ঘনবর্ণ! সেই ছাপ আজও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। যখনই, যেখানেই সিগন্যালের আলো দেখি না কেন বালক কালের সেই সন্ধ্যা মনে পড়িয়া যায়।

এই আলোগুলির উপরে কবিরা কবিতা লেখে না কেন? (চেষ্টারটন লিখিয়াছেন!) নদীগিরি, অরণ্য পর্বত, আকাশ সমুদ্র মানুষের মনকে মুগ্ধ করে। এ সব মানুষের সৃষ্টি নয়। দেবতারা তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—মানুষ নিজেকে মুগ্ধ করিবার জন্য যে কয়টি বস্তু এ পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে রেলের সিগন্যাল তার মধ্যে একটি!

সত্য কথা বলিতে কি রেলে চড়িতে আমি ভালবাসি। রেলের গাড়ীই এ যুগের লৌহ-তুরঙ্গ। এই লৌহ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া আমি সংযুক্তার সন্ধানে কতবার না যাত্রা করিয়াছি! সেই যাত্রা পথের সন্ধিস্থান ওই লোহার সিগন্যালগুলি। অতর্কিতে এক একটা আসিয়া পড়ে—আর চমকিয়া উঠি! আমার সংযুক্তার দিল্লী আর কতদূর? যেদিন পৃথ্বিরাজ অশ্ব ধাবিত করিয়া দিল্লী চলিয়াছিলেন—দিল্লী কতদূর এ প্রশ্ন কি তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হয় নাই? তখন তাঁহার পথে সিগন্যালের কাজ কে করিয়াছিল? রাজপুতানার শুষ্ক মরুভূমিতে বনস্পতি আছে কি? গিরি চূড়াই ছিল খুব সম্ভবত তাহার অটল সিগন্যালের সঙ্কেত!

তারপরে যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তারও কিছু পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নয়—আর জৈব তুরঙ্গের স্থানে আসিয়াছে রেলের লৌহ তুরঙ্গ! এ যুগের পৃথ্বিরাজের দিল্লী পথের মাঝে মাঝে ওই সিগন্যালগুলি পথের ক্ষীয়মান হ্রস্বতা জ্ঞাপন করিতেছে! যেমন যুগ, তেমনি যোগ! কিন্তু তাই বলিয়া কি রহস্যের কিছু কমতি হইয়াছে?

রেলের জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছি। সারিবন্ধ টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপরে টিয়া পাখীর ঝাঁক, তৃণহীন প্রান্তর গোরুর গবেষণার স্থল, দীর্ণ মাঠ বৃষ্টির জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, জনহীন নদীর খাত, শালের বন, কয়লা খনির ধোঁয়া—হঠাৎ একটা সিগন্যাল আসিয়া পড়িল! কলম্বাসের নৌবাহিনীর সম্মুখে ভগ্ন বৃক্ষ পল্লব! স্টেশন নিকটবর্তী।

ক্রমে আলো মিলাইয়া আসিতে থাকে, আকাশে একটার পরে একটা কালো পর্দা পড়িতে পড়িতে অন্ধকার বেশ নিরেট হইয়া ওঠে, ওই যে অদূরে অনচ্ছ আকাশে নীল আলো—স্টেশন নিকটবর্তী! সংযুক্তার রাজধানীও আর দূরে নয়—পৃথ্বিরাজ চমকিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে! আমি যদি কবি হইতাম তবে সিগন্যালের উপরে কবিতা লিখিতাম—সে সম্ভাবনা যখন নিতান্তই নাই, তাই শাদা গদ্যে শুধু একবার জানাইয়া রাখিলাম রেলের সিগন্যাল আমার বড় ভালো লাগে। দিনের সিগন্যাল উদাস করিয়া দেয়, রাতের সিগন্যাল দেখিয়া বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

জলন্দার গড়

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

"আগে অই অন্ধকার জলন্দার গড়।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥"
(ঘনরাম)

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী যে গালগল্প নহে, তাহার মধ্যে সত্য ইতিহাস আছে, একথা বহুবার বলিয়াছি। অনুসন্ধান করিলে এ বিষয়ে এখনো অনেক কিছু জানা যাইতে পারে। বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার ইতিহাস আজিও যথাযথ আলোচিত হয় নাই। ইতিহাস অনুরাগী যুবকগণের এই পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজা রাজেন্দ্র চোল এই দেশ আক্রমণ করেন। তিনি দন্তভুক্তিতে ধর্মপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূরে, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ে মহীপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর মহীপাল তখন বিশেষ বিপন্ন। তিনি অনধিকারীর হাতে গৌড়রাজ্য হারাইয়া উত্তর রাঢ়ে মুর্শিদাবাদ জেলার গয়েসপুর অঞ্চলে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এবং এই জঙ্গলময় দুর্গম প্রদেশে বসিয়া বল সঞ্চয়-পূর্বক পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকেন। ধর্মপাল মেদিনীপুর অঞ্চলের রাজা ছিলেন, দন্তভুক্তি বা দাঁতন তাঁহার রাজধানী ছিল। বীরভূম জয়দেব কেন্দুলীর দক্ষিণে অজয় নদ তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। বীরভূমে দুবরাজপুরের নিকট দাঁতন দীঘি, কেন্দুলীর নিকটে অজয়তীরে দন্তেশ্বর শিব, রাজহাট, রাণীপুর গ্রাম প্রভৃতি দন্তভুক্তির অধিকারের প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। রাঢ়ে ধর্মপালের বংশীয় রাজাদের অধিকারের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধর্মপাল যে ইতিহাস বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের অনেক রাজার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। অজয় তীরে সুহ্মের প্রাচীন রাজধানী শ্যামারূপার গড়ে দন্তভুক্তিপতি ধর্মপালের সামন্ত কর্ণসেন বাস করিতেন। মর্ধমঙ্গলে আছে "ধর্মপাল রাজা মলো অরাজক দেশ। পাত্র মিত্র প্রজা লোক পায় বড় ক্লেশ"॥ ধর্মপালের মৃত্যু এবং রাজেন্দ্র চোলের রাঢ় আক্রমণের সুযোগ লইয়া শ্যামারূপার গড়ের গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি সোম ঘোষের পুত্র ঈছাই ঘোষ কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দিয়া শ্যামারূপার গড় দখল করিয়া লন। কর্ণসেন বাঁকুড়া জেলার ময়নায় গিয়া বাস করেন। কর্ণসেনের পুত্র লাউ সেন বা লবসেন গৌড়েশ্বরের সাহায্যে বল সঞ্চয় পূর্বক শ্যামারূপার গড় পুনরধিকার করেন। ঈছাই লাউসেনের যুদ্ধ লইয়াই ধর্মমঙ্গলের কাহিনী রচিত হইয়াছে।

লাউসেন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় ময়নাপুর হইতে বাহির হইয়া মঙ্গলকোটের পর জলন্দার গড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ধুলাডাঙ্গা, বিক্রমপুর, পদুমা, কালীঘাট, জানাবাজ, উচালন, মোগলমারি বারাকপুর, উলারগড়, বর্ধমান ও মঙ্গলকোট দেখাইয়া ঘনরাম লাউসেনকে জলন্দায় আনিয়াছেন। লাউসেন দ্বারিকেশ্বর বা দারুকেশ্বর ও দামোদর নদের জলে স্নান করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলায় জলন্দী বা জলন্দার গড় এখন "বনগ্রাম জলন্দী" নামে পরিচিত। চণ্ডীদাস নানুর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে তারা দীঘি; ধর্মমঙ্গলে তারা দীঘিও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জলন্দীর উত্তর-পূর্ব কোণে তারা দীঘি প্রায় দুই ক্রোশ। জলন্দী হইতে তারা দীঘি পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া বহু প্রাচীন নিদর্শন বর্তমান আছে। গ্রামে বর্তমানে প্রায় ছয় শত ঘর লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ তাঁতি বেনে নাপিত; কলু, শুঁড়ি কুশ মেটে (বাগদী), মুচি মাল (বেদে) প্রভৃতি জাতি জলন্দীতে বাস করে। গ্রামের মধ্যস্থলে গড়, গড় বেড়িয়া পরিখার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে। গড়ের পশ্চিম দিকে গড়দুয়ার, নিকটেই গড়ের দেবীর ভগ্ন মূর্তি। গড়দুয়ারে কোটালদের বাড়ি, কয়েক ঘর কোটাল আজিও আছে। ইহারা বাগদী, এখন চাষ করে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরে। পূর্বে গড় রক্ষা করিত। যুদ্ধ করিত। সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিয়া স্বর্গলাভ করিত। গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদ। গ্রামের পূর্বে বিলু, বিলের ওপারে গড়পাড়া গ্রাম, দীঘির পার গ্রাম। গড়পাড়া গ্রামেও গড়ের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। জলন্দার চারিপাশেই জলাভূমি, যেন প্রাচীন পরিখার সাক্ষ্য দিতেছে। জলন্দীর গড়ের অংশটুকুর মধ্যে এখন গন্ধবণিকের বাস। গ্রামে জলেশ্বরী দেবী আছেন। দেবীর ভগ্ন মূর্তির নিকটে

একটি ছোট তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। জয়দুর্গা দেবীর ভগ্ন মূর্তির মধ্যে অসুরের মুণ্ড দেখিলাম। মুণ্ডের পাগড়ী বা শিরস্ত্রাণ প্রাচীনত্বের নিদর্শন। জলন্দার গড়ে লাউসেনের সময়ে যে রাজা ছিলেন তাঁর নাম সামন্তশেখর, ঘনরাম বলিয়াছেন, জল্লাদশেখর। তারা দীঘির পূর্বে সাজনোর এবং রাউতাড়া গ্রামে রাজার সৈন্যনিবাস ছিল। নিকটেই বাঁধা কাম দলের মাঠ।"

স্থানীয় প্রবাদ—সামন্তশেখর রাজার আদরিণী কন্যার নাম তারা। রাজা কন্যার নামে একটি দীঘি কাটাইয়া দেন, সেই দীঘিই তারা দীঘি। কন্যার একবার বাঘ পুষিবার সাধ হয়। রাজা একটি বাঘের বাচ্ছা আনাইয়া দেন, বাচ্ছার নাম রাখা হয় কামদল। কামদল সোনার খাঁচায় থাকে। পরিচারক পরিচারিকার দল দণ্ডে দণ্ডে তাহার তত্ত্বাবধান করে। বাঘ ঘি খাইয়া দুধে আঁচায়। তাহার জন্য নিত্য মাংসের বরাদ্দ। বাঘ বড় হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ একদিন রাজার কুলদেবী চামুণ্ডা কি অপরাধে বাঁকিয়া বসিলেন। অমনি বাঘ খাঁচা ভাঙিগয়া বাহির হইয়া রাজ্যশুদ্ধ প্রজাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইতে লাগিল। রাজা কামদলের জ্বালায় তারা দীঘির তীরে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। কামদল সেখানে আসিয়াও হাজির। এদিকে ডাঙগায় বাঘ, ওদিকে জলে কুমীরের মত লাউসেন দেখা দিলেন। লাউসেন ধর্মের সেবক, সে ধর্মরাজ পূজার প্রধান পাণ্ডা, সকলকেই ধর্মরাজ পূজার উপদেশ দেয়। চামুণ্ডা পূজক সামন্তশেখরের সঙেগ লাউসেনের বিবাদ বাধিল। লাউসেন রাজাকে পরাস্ত করিয়া কামদলকে মারিয়া তারাকে বিবাহ করিল। কেহ কেহ বলেন, সামন্তশেখরও লাউসেনের হাতে মরিয়াছিলেন।

মধর্মঙ্গলের কাহিনী অন্যরূপ। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম—একদিন ইন্দ্রের সভায় ইন্দ্রপুত্র শ্রীধর নৃত্য করিতেছিল। সভায় সকল দেবতাই উপস্থিত। ব্যাঘ্রবাহনে আসীনা ভগবতী নৃত্য দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন। শ্রীধরকে বর লইতে বলিলেন, শ্রীধর বলিলেন, এত দেবতার মাঝে বাঘের উপর বসিয়া থাকিতে তোমার লজ্জা হয় না? ছি, ছি, তোমার নিকট আবার বর লইতে হয়। শুনিয়া ক্রোধে দেবী শাপ দিলেন, তুমি মর্তে বাঘ হইয়া জন্মিবে। ঘনরামের ধর্মমঙগলে আছে নর্তক শ্রীধর নৃত্য করিতেছিল, ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে দেবীকে দেখিয়া তাহার তালভঙ্গ হয়। তাই দেবী তাহাকে শাপ দেন। যাহা হউক শ্রীধর মর্তে ব্যাঘ্র হইয়া জন্মিল। জন্মিয়াই মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ভোজ্যের যে ফর্দ দিল, তাহা ব্যাঘ্র শিশুরা কখনও কল্পনাও করে না। বাঘের শিশুর নাম কামদল কে রাখিল কাব্যে তাহার উল্লেখ নাই। কামদলমাতা কামিনী হরিপালের রাজার হাতে লীলা সম্বরণ করিলে কামদল তারা দীঘির তীরে আসিয়া হানা পাতিল। রাজা সামন্তশেখর শিকারে গিয়া কামদলকে ধরিয়া আনিলেন। রাজা দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া পরমযত্নে তাহাকে রাখিলেন। একদিন নিজ হস্তে খাবার খাওয়াইতেছেন, বাঘ আসিয়া ঘাড়ে পড়িল, রাজা পলাইলেন। বাঘ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া রাজধানীতে উপদ্রব আরম্ভ করিল। রাজা সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলেন এবং এবার বিশেষ যন্ত্রণা

...তে লাগিলেন। হরগোরী একদিন ব্রাহ্মণ ...ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে জলন্দায় আসিয়া ভিক্ষা ...না পাইয়া রাগে বাঘকে বর দিয়া বলশালী ...করিলেন এবং খাঁচা হইতে বাহির করিয়া ...দিলেন। বাঘ কামদল রাজা প্রজা সকলকে ...খাইয়া ফেলিল। বাঘের উৎপাত শুনিয়া গৌড়েশ্বর আসিয়া নাকি বাঘের সংগে যুদ্ধে ...হারিয়া পলাইয়াছিলেন। লাউসেন কামদলকে ...বধ করেন।

কবি ঘনরাম লাউসেনের সম্পর্কিত ভ্রাতা ...পূরের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"...হাতে প্রাণ করিয়া কর্পূর পিছে ধান।
...তরাসে চঞ্চল চিত্ত চারি পানে চান॥
...গড়ের নিকটে কিছু কন করপুটে।
পুনঃ পুনঃ বলি শুন যেও না সংকটে।
দেখিলে দুর্জয় বাঘা পাছে আসি গিলে।
করতলে কত নিধি পরাণ বাঁচিলে॥
লাউসেন কয় ভায়া ভয় ভাব কিসে।
সংগে এস বাঁধ বাঘা ধর্মের আশীষে॥
প্রত্যয় না হয় মনে বেড়েছে বিরাগ।
প্রতি ঝোড়ে ঝোড়ে বলে দাদা অই বাঘ॥
বায়ে যত উড়ায় পথের ধূলা বালি।
তা দেখে তরাসে বলে বাঘ খায় তালি॥
কাকালি ধরিয়া পথ চলে কাছে কাছে।
তরাসে তরল তনু প্রাণ উড়ে পাছে॥
শুখাল শালের শাখা উড়ে মন্দ বাতে।
দেখে বলে এল অই নিতে হাতে হাতে॥"
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া লাউসেন—
"বুঝি সময়ের গতি শিমুলের গাছে।
কর্পূরে রাখিল বাঁধি বাঘ দেখি পাছে॥
চক্ষু জুড়ি অংগে দিল আচ্ছাদন শাখা।
পাণ্ডবের অস্ত্র যেন গাছে ছিল ঢাকা॥"

বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ...পি বাঙালী যুবকের মধ্যে আজিও অনেক ...পূরকেই দেখিতে পাই।

লাউসেন জলন্দার গড় হইতে জামতী ...। তথা হইতে গোলাহাট এবং গোলা ...টের পরই গৌড়ে গিয়া উপস্থিত হন। অর্থাৎ ...লাহাটের পরই মুর্শিদাবাদ জেলার গয়েস-...র অঞ্চলে গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের ...কালীন্তন রাজধানীতে গিয়া পৌঁছেন। ...লাহাট মুর্শিদাবাদ জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর ...খাতের উপরে আজিও বর্তমান। মনসা ...লে আছে—

...ব দুর্গা গোলাহাট বামেতে রাখিয়া।
...লিল সাধুর ডিঙ্গা পাটন বাহিয়া॥

জলন্দার গড় ও গোলাহাটের মাঝখানে ...থাও জামতী ছিল। কেহ অনুসন্ধান করিয়া ...তীর বর্তমান অবস্থিতি দেখাইয়া দিলে ... জামতী ও গোলাহাটের কথা লিখিলে ...কৃত হইব।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

প্রাচ্যবাণীর দিল্লী শাখা থেকে নিম্নলিখিত বিষয় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

১। হিন্দী সাহিত্যে জয়শঙ্কর প্রসাদের স্থান।

২। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং স্কুলের ছাত্রদের জন্য ৩০৲ টাকা।

প্রবন্ধ বাঙলা, হিন্দী, ইংরেজি বা অন্য যে কোনও ভাষায় লেখা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্য হাতের লেখায় ৪০ ফুলস্কেপ কাগজের অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ প্রেরণের শেষ-দিন—৩১শে জুলাই। পাঠাইবার ঠিকানা—

১। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যুগ্ম-সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী; ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা অথবা ২। অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, ৭, পাঁচকুয়া রোড (7, Panchkuin Road), নিউ দিল্লী।

মন্ত্রী মিশন ও লর্ড ওয়াভেল্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ-জনিত সন্তাপে তাপিত হইয়া কায়েদে আজম নাকি কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন। প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই, খুড়ো

টকে আরও অস্পষ্ট করিয়া বলিলেন— কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি !"

* * * * *

আম্বেদকার বলিয়াছেন—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর নাকি তাঁর আর মাত্র আস্থাও নাই। খুড়োর সাকরেদি শ্যামলাল এখন খানিকটা লায়েক হইয়াছে। খুড়োর কথারই জের টানিয়া লাল বলিল—"ডাক্তার সাহেব হয়ত বলিতে- মাঝি তরী হেথা বাঁধব নাকো আজ এই ঘাটে"। কবিতা আমরা অতশত বুঝি না, এইটুকু—তরীর প্রসঙ্গে বুঝিলাম যে, মিশন কোথায় যেন ভরাডুবি করিয়া দিয়া ।

* * * * *

দিল্লীর "ডন" বলিয়াছেন—মন্ত্রী মিশন ঘড়ির কাঁটাকে চল্লিশ বছর পেছনে রাখিয়া গেলেন। "বারোটা বাজিতে

লেন না এই হয়ত 'ডনের' বিক্ষোভ"—লেন বিশুখুড়ো।

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম পতৌদির নবাবের রাজ্যে নাকি প্রজাদের উপর গুলী বর্ষণ হইয়াছে। হার্ডস্টাফকে "গুলী" বিদ্ধ

করিতে না পারার মনের ঝাল কি এইভাবেই মিটাইবেন বলিয়া নবাব সাহেব স্থির করিয়াছেন ?

* * * * *

"খবরদারি গভর্নমেণ্টের সদস্যদের মধ্যে সাত জনই (K)-night :—একটিও "Dawn" নাই—হায় আপশোষ"—খুড়ো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

* * * * *

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের আর একটি পরীক্ষা সম্প্রতি হইয়া গেল এবং তাহার সুবিস্তৃত বিবরণও সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম; কিন্তু বুঝিলাম না কিছুই। শুনিলাম বোমার ধ্বংসাত্মকতা পরীক্ষার জন্য নাকি একটি জাহাজে দুই শত ছাগল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু বিস্ফোরণের পর দেখা গেল তারা পরম নিশ্চিন্তে ঘাস চিবাইতেছে। বুঝিলাম এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপব্যবহারের মারাত্মকতায়—নিশ্চিন্তে ঘাস চিবানো একমাত্র ছাগলের পক্ষেই সম্ভব!

* * * * *

প্রসঙ্গত বোমার মালিকদের বিবৃতির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহারা বলিতেছেন—"আণবিক বোমা হইল আমাদের "আদরের দুলাল"—(Baby); এর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু খবরদার কেউ কিছু বলিও না"—বুঝিলাম, কিন্তু কেউ কিছু না বলিলেও পেঁচোর দৃষ্টি হইতে কি শিশুটিকে রক্ষা করা যাইবে?

* * * * *

আইসল্যাণ্ডে টেস্টটিউব ভেড়া জন্মাইবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রাকৃতিক পন্থায় যেখানে অজস্র ভেড়া জন্মিতেছে সেখানে এই সংবাদ কিছুমাত্র কৌতূহল সঞ্চার করিবে না!

* * * * *

লণ্ডন হইতে মস্কোতে প্রাইভেট টেলিফোন কল্ নিষেধ করিয়া গভর্নমেণ্ট নাকি একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। "এটা কি "Connection" কাটিয়া দেওয়ার পূর্বাভাষ"? —জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * * *

ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে পুলিশরা কি—তখনও কাজ করিবেন, না কাজে ইস্তফা দিবেন—ভারত-সচিব মহাশয় নাকি পুলিশদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সংবাদটা শুনিয়া খুড়ো বলিলেন—পুলিশদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই উদ্বেগে মনে পড়িতেছে—On some fond breast the parting soul relies."!

একটি সংবাদে পড়িলাম—ফ্রান্সে অবিলম্বেই এত মাংস উৎপাদন হইবে যে, লোকে খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না। "আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদনের এত পরিকল্পনা মহাকাব্য

প্রণীত হইবে যে, লোকে পড়িয়া শেষ করিতে পারিবে না"—বলা বাহুল্য টিপ্পনীটা বিশুখুড়োর।

* * * * *

বিগত বৎসরে আমেরিকাতে মদ্যপানের খরচ হইয়াছে একশত নয় কোটি, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। টাকার হিসাবে অঙ্কটা
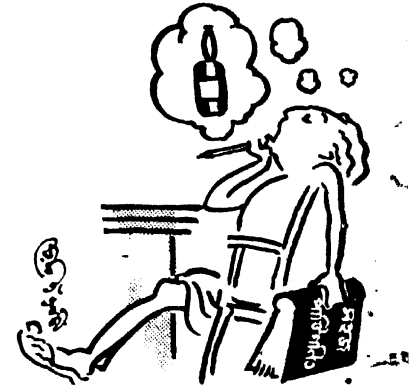
কত দাঁড়ায়—তা কষিতে কষিতে মদ্যপান না করিয়াই মাথাটা আপনা হইতে ঝিমঝিম করিয়া আসিতেছে।

* * * * *

একটি বিশেষ মার্কার তেল মাথায় মাখিলে নাকি চাকুরীর সুরাহা হয়, এই মর্মের একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করিলাম। চাকুরীর জন্য তেলের প্রয়োজন জানি, কিন্তু সেই তেল কি নিজের মাথায় মাখার জন্য?

* * * * *

আমেদাবাদে রথযাত্রার মিছিলের উপর ঢিল ছোঁড়াতে একটি সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি হয়—ফলে ২৩ জন হত এবং ১৬০ জন আহত হইয়াছেন। নিজের নাক কাটিয়া অন্যের যাত্রা ভঙ্গ—কথাটা কথাই শুধু নয়!

বৈদেশিকা

প্রায় দশ মাস ধস্তাধস্তির পর ইতালির সঙ্গে সন্ধিপত্র সম্বন্ধে চতুঃশক্তি একটা সিদ্ধান্তের কাছাকাছি উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। বার বার চতুঃশক্তি অর্থাৎ ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিবগণ মিলিত হইয়া শুধু বিতর্ক উপস্থিত করিতেছিলেন, সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিতেছিলেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সচিব বার্নেস মহাশয় শেষটায় মরিয়া হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এভাবে টানাটানি করা আর পোষাইতেছে না, ১৫ই জুলাই তারিখে ২১ শক্তির কনফারেন্স ডাকিয়া সন্ধিপত্রের ব্যাপারটা সকলের হাতে ছাড়িয়া দিব। রাশিয়ার তাহাতে ঘোরতর আপত্তি, আগে বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয় একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হোক, তারপর শান্তি বৈঠক ডাকা হইবে। মলোটোভ সাহেবের শেষ দাবী ছিল যে, অন্তত ইতালীর নিকট হইতে কি ক্ষতিপূরণ লওয়া হইবে তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ২১ শক্তির কনফারেন্স ডাকিতে তিনি মতস্করিবেন না।

গত ১৫ই জুন তারিখ হইতে চতুঃশক্তির বৈঠক বসিয়াছে। ২৬শে জুন অবধি পূর্বের মতই মতভেদ এবং কথা কাটাকাটিই চলিতেছিল। বেভিন মহাশয় তো বৈঠকের কার্যকলাপকে প্রহসন আখ্যায়ই ভূষিত করিয়াছিলেন। ২৭শে জুন হইতেই বৈঠকের মোড় ফিরিল। ইতিপূর্বে ডোডাকেনিজ দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটির দাবী করিয়াছিলেন সোভিয়েট রাশিয়া। মলোটোভ সাহেব হঠাৎ এই দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ইতালীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেও সহসা সোভিয়েট রাশিয়া উদারতা প্রদর্শন করিয়া বসিয়াছে। প্রথমটা তাহার দাবী ছিল ১০ কোটি পাউণ্ড, অবশেষে আড়াই কোটি পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসম্ভার লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতালীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী শুধু রাশিয়ার নয়, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি চুনো পুঁটিদেরও রহিয়াছে। বেভিন মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের ইতালীর নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী আগামী শান্তি বৈঠকে শোনা যাইবে। রাশিয়ার দাবী যখন মিটিয়াছে তখন শান্তি বৈঠকের তারিখ ফেলিতে আর কোন অসুবিধা হয় নাই, বরের ঘরের মাসী এবং কনের ঘরে পিসির কাজটা অধুনা ফ্রান্সই অনেকটা চালাইতেছে। ফরাসী সচিবের প্রস্তাবক্রমে ২৯শে জুলাই ২১ শক্তির সম্মিলিত বৈঠকের তারিখ স্থির হইয়াছে। বার্নেস মহাশয়েরই জয় বলিতে হইবে, অবশ্য মলোটোভ সাহেবের দয়ায়।

শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, ইতালী-যুগো-শ্লাভ সীমান্ত রেখা নির্ণয়ে এবং ত্রিয়েস্ত-সমস্যা সমাধানে এবারকার চতুঃশক্তি বৈঠক অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইতালীতে গণভোটে গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর সোভিয়েট রাশিয়ার সুর একটু বদলাইয়াছে। এবারকার বৈঠকে মলোটোভ সাহেবের সহযোগিতার হেতু বোধ হয় ইতালীর নূতন শাসনবিধি। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া এই নূতন গণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টকে চতুঃশক্তি বৈঠকে ইতালী সম্বন্ধে অর্থনৈতিক আলোচনায় উপস্থিত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। যতদিন ইতালীর ভূতপূর্ব রাজা উমবার্টো ইতালী ত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই তত দিন সোভিয়েট রাশিয়ার মনে হয়ত ভয় ছিল যে, গণভোট যাহাই হোক, রাজতন্ত্রীরা ইঙ্গ-আমেরিকার সাহায্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। হয়ত এই জন্যই ইতালীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যাহাতে চতুঃশক্তি বৈঠকে আলোচিত হয় সোভিয়েট-রাশিয়া এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন।

ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা এইঃ ত্রিয়েস্ত ইতালীও পাইবে না, যুগো-শ্লাভিয়াও পাইবে না। ত্রিয়েস্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, তাহার স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রক্ষা করিয়া চলিবে। মলোটোভ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই নূতন রাষ্ট্রের বিধিনিয়ম প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যটি যেন এই চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের পক্ষ হইতে কোন কমিটির হাতে দেওয়া হয়। নিয়মাদি যাহাই বিধিবদ্ধ হউক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে তাহা গৃহীত হওয়া চাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। এমনভাবেই 'স্বাধীন রাষ্ট্র ত্রিয়েস্ত' সৃষ্টি করা হইতেছে যে, তাহার সীমারেখা খুব বিস্তৃত হইবে না। এই রাষ্ট্রের জনসংখ্যার মধ্যে ইতালীয় জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথাপি ইতালীকে এই অঞ্চল দেওয়া হয় নাই। এদিকে ইতালী-যুগো-শ্লাভিয়ার সীমারেখা নির্ণয় ব্যাপারেও ইতালীর খুসী হওয়ার হেতু নাই। যদিও এই সীমারেখা চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয় নাই, তথাপি মোটের উপর একটা রফা হইয়াছে। আমেরিকার প্রস্তাবে সীমারেখা ছিল পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষিয়া অর্থাৎ ইতালীর অনুকূলে, ফ্রান্সের প্রস্তাব ছিল আরও পশ্চিমে। ফ্রান্সের প্রস্তাবই মোটের উপর গ্রাহ্য হইয়াছে। ফলে ভেনেৎজিয়া গিউলিয়ার একটা বৃহৎ অংশ, 'পোলা'র নৌঘাঁটি এবং ফিউম বন্দর ইতালীর হাতছাড়া হইল। এ ছাড়া ইতালীর 'কলোনি'-গুলিও তাহাকে ছাড়িতে হইবে এই সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ডোডাকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীস পাইবে এবং অন্যান্য অঞ্চল কিভাবে শাসিত হইবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছিলেও ইতালী যে এগুলি পাইবে না তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। পাছে ইতালী শক্তি চতুষ্টয়কে অকৃতজ্ঞ বলে হয়ত এই ভয়ে সমগ্র দক্ষিণ টাইরল ইতালীর হাতেই রাখিতে তাঁহারা রাজী হইয়াছেন।

জজেরা রায় দিয়াছেন, আসামী ইতালীর মনোভাবটা কি? সে কি কৃতজ্ঞতায় অবনত-শির? সুধীজন নিশ্চয় লক্ষ্য করিবেন, ইতালীর গণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট ৫০,০০০ ফ্যাসিস্ট বন্দীকে মুক্তিদান করিয়াছে এবং উগ্র জাতীয়তা-বাদ ইতালীবাসীদের নূতনভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে, ফলে আভ্যন্তরীণ মতভেদ কমিয়া যাইতেছে। সন্ধিপত্রের কঠোরতা ইতালীর পক্ষে শাপে বর হওয়া বিচিত্র নয়।

"...বর্ষাগ"—উপন্যাস, ৬১৫ পৃঃ, মূল্য চারি টাকা, রচয়িতা শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক দীপালী গ্রন্থমালা, ১২৩।১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বর্তমান যান্ত্রিকতার যুগে, সর্বব্যাপী অভাব, অশান্তি ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে, বাস্তবের কঠোরতায় জর্জরিত মন লইয়া সুদীর্ঘ উপন্যাস পড়িবার ইচ্ছা ও ধৈর্য একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস নহে। বাঙলা উপন্যাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ উপাদান ইহাতে নাই—যথা, জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার, গ্রাম্য দলাদলি, বিকৃত রাজনীতি, পল্লীর খুঁটিনাটি, নায়কের অসম সাহস, মাসিমা, চা, ড্রয়িংরুম, 'লন' দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় পক্ষের সর্পিল অভিসার, থাইসিস্, বায়ু-পরিবর্তন, করুণ রসাশ্রিত পরিণতি ইত্যাদি, ইহাতে দেখিতে পাইলাম না।

ইহাতে দেখিলাম কয়েকটি চিত্র, কলিকাতার সাময়িক সত্য ইতিহাস। Bernard Shaw যেমন "In Good King Charles's Golden Days" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছেন "A History-lesson", 'উপরাগ' সেইরূপ একটি 'History-lesson.' অতি উত্তম দর্পণে (মেলার দোদুল্যমান কুব্জ দর্পণে নহে) বসন্তবাবু যুদ্ধকালীন কলিকাতার মানসিক ও ব্যবহারিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত করিয়াছেন। বইখানিতে পাই এক একটি সামান্য ঘটনা অসামান্য সারল্যের সঙ্গে অতি সহজভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বিদ্বেষ বা একদেশদর্শিতা গল্পের প্রবাহকে পঙ্কিল করে নাই। জনসাধারণের মনে নৈতিক ও সামাজিক বোধের একান্ত অভাব ঘটিবার ফলে, হিংসার জ্বালাময় নিঃশ্বাসে সুকুমার বৃত্তিগুলি দগ্ধ হইয়া অর্থোপার্জনই একমাত্র কাম্যবস্তু হওয়ায় বড় হইতে ছোট অধিকাংশ নরনারী ঘুষ, চোরাবাজার, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার, যৌনলীলা প্রভৃতি বহুপ্রকার দুষ্কৃতি দ্বারা জাতির মুখে কলঙ্ক লেপিয়া দিল। সংবাদপত্রে বিভিন্ন ঘটনার বিষয় এই সময়ে যাহা পড়িয়াছি, তাহা অনবদ্য ভাষায়, অপূর্ব কলানৈপুণ্যে, অন্তরের গভীর দুঃখ ও সহানুভূতির সহিত বসন্তবাবু একটি মাত্র গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন; তাই নাম দিয়াছেন উপন্যাস। সত্যের জ্যোতিঃতে ঘটনার পারম্পর্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। 'A passage to India' নামক সুবিখ্যাত 'উপন্যাসে' মনীষী Forster সাহেব এ-দেশবাসীর সামাজিক জীবনে ইউরোপীয় প্রভাব ও আমাদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক ধারণা ও মৌখিক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় যে অপূর্ব সততা, সংযম ও দরদের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন (যাহার জন্য পুস্তকটির প্রচার কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল)—বসন্তবাবুর আলোচ্য পুস্তকে সেই ধরণের প্রকাশভঙ্গী দেখিতে পাই।

Co-educationএর ফলে এবং পিতা-মাতার অজ্ঞাতে সঞ্জাত এক অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া এই সুখপাঠ্য পুস্তকটি রচিত হইয়াছে। দৃঢ়চিত্ত সংস্কারবাদী ধনী পিতা ও স্নেহশীলা বাস্তববাদিনী জননীর চরিত্র অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। উপরাগ (অর্থাৎ 'গ্রহণ') লাগিল বিবাহিত দম্পতির জীবনে অতি অকস্মাৎ—একপ্রকার বিনা কারণে, সন্দেহবশে। গ্রহণ-মুক্তির পুণ্যক্ষণে, সংস্কার ভাসিয়া গেল স্নেহের লহরী লীলায়, মুক্তি আসিয়া প্রীতির বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া দিল।

বইখানি শিক্ষিত সমাজে সমাদরলাভ করিবে এবং যুদ্ধকালীন কলিকাতার সমাজ-চিত্রস্বরূপ ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গালি ও গল্প—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড; ১১৯নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

রসস্রষ্টা প্রমথনাথ বিশীর তেরোটি নূতন রচনা লইয়া আলোচ্য বইটি বাহির হইয়াছে। রচনাগুলি যদিও ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠকগণ ইহাদের রসাস্বাদন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এগুলিকে নূতন রচনা বলিলাম এই জন্য যে, ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী এবং আঙ্গিকের দিক দিয়া বাঙলা সাহিত্যে এ-সকল রচনার সত্য জুড়ি নাই। কোন কোন রচনায় প্র-না-বির নিজস্ব মৌলিক শ্লেষ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ বঙ্গের সম্ভাবনা লইয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে, কোনটিতে তিনি করুণ রসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছেন; কোনটিতে আবার হাসির আড়ালে কশাঘাত উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। রচনার একটি বাক্যকেও ব্যর্থ হইতে না দিয়া প্রতিটি লাইনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলাই বিশী মহাশয়ের বৈশিষ্ট্য। গালি ও গল্পে সেই বৈশিষ্ট্য নূতন রূপে দেখা দিয়াছে।

'অতি সাধারণ ঘটনা', 'বিপত্নীক' এবং অন্যান্য কয়েকটি রচনা ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত রচনাটি দাম্পত্য-প্রেম-বন্ধনের এক অশ্রুসজল কাহিনী। বাঙলা ভাষার ছোট গল্প সাহিত্যে এই লেখাটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহা বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। এরূপ রস-সমৃদ্ধ ছোট গল্প বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু নিছক রস পরিবেশনেই গল্পটির সার্থকতা নহে; অনেকেই এই লেখাটির মধ্যে নিজের স্বরূপ ও প্রতিফলন দেখিয়া চমকিত হইবেন। চারিজন মানুষ ও একটি তক্তপোষ এই মাত্র সম্বল করিয়া লেখক যেভাবে রস জমাইয়া তুলিয়াছেন এবং মানবীয় অসারতাগুলিকে যেভাবে চাবুক চালাইয়া চলিয়াছেন তাহাতে, হাস্যরস উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো মুখ বাঙলা পাঁচের মতো দেখাইলেও বিস্মিত হইব না। গালি ও গল্পের প্রত্যেকটি রচনাই এই রকম সার্থক সৃষ্টি।

পুস্তকের মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। ৭৬।৪৬

বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান সান্যাল এণ্ড কোং, ৮৫নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখক গোড়াতে জানাইয়াছেন, তিনি "বাঙালীর সামাজিক গড়নে 'নারী জাতির আত্ম স্বাতন্ত্র্যের' অন্দোলনকে তিনি 'সমাজ শাস্ত্রীর' চোখ দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন।" এই বিশ্লেষণ-কার্যের উপাদান সংগ্রহে তাঁহাকে বহু পুস্তক ঘাঁটিতে ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। বঙ্গ সমাজে নারীর জীবনবিকাশের যেসব অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা [illegible] করিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থে রূপলাভ করিয়াছে। লেখকের বলিষ্ঠ মন ও সংস্কারমুক্ত চিন্তা প্রশংসাযোগ্য।

বাপুজী (পেন্‌সিল ড্রয়িং)—শ্রীইন্দ্র [illegible] প্রণীত। নিরীক্ষা প্রকাশনী, ৪৮, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲

তরুণ শিল্পী ইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধীর পেন্সিল্ ড্রয়িং সুদৃশ্য কাগজে ও মনোরম প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধী মহারাজের শিষ্য' কবিতাটির ইংরাজি অনুবাদ সুদৃশ্য কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। উপহার দিবার পক্ষে একখানি উপযুক্ত ছবি।

হাওয়ার নিশানা—শ্রীচিত্তরঞ্জন [illegible] প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী, চিত্রিতা প্রকাশিকা, ৯এ, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'হাওয়ার নিশানা' মামুলি ধরণের উপন্যাস নয়। পড়িয়া মনে হইল, বইটি 'গল্পের বাহিরে গল্প' এই প্রচলিত ধারণাকে স্বীকার করে না, তাই হাটের আর দশটি উপন্যাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে নারাজ। বাঙলার কথা-সাহিত্যের চলস্রোতের মধ্যে পড়িয়াও নিজের মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়াছে।

পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে কয়েকটি জীবন। তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের কুশলী হস্তের লেখনীচালনায় সৃষ্টি হইতেছে নানা ভাব ও ধারণার। গল্প পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যাদিও পাঠকের অধীত হইয়া চলিতেছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির নানারূপ বিশ্লেষণও চরিত্রগুলির ক্রমগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু লেখকের জোরালো ভাষা ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর দরুণ বিষয়বস্তু আড়ষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই, এইটিই বইখানার বড় বিশেষত্ব। ইংরাজিতে যাকে বলে packed full of meaty reading—বইটি তাই। ছাপা বাঁধাই সুন্দর। ৮২।৪৬

তরুণের স্বপ্ন—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চলন্তি নাটক নভেল এজেন্সী, ২১৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিনটাকা।

এখানা 'তরুণের স্বপ্ন'—প্রথম পর্ব। এতদ্দৃষ্টে মনে হয়- লেখক এক ব্যাপকতর পরি-কল্পনা লইয়া উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। দেশহিতব্রতকে পুরোভাগে রাখিয়া একজোড়া তরুণ-তরুণীর জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই গ্রন্থের পাতায় [illegible] স্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে। লেখক নাটক, নভেল লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার তরুণের স্বপ্ন সফল হোক, ইহাই কামনা। ৭১।৪৬

সম্প্রতি বর্ম্বের ফেমাস সিনে লেবরেটরী চলচ্চিত্র-রসিক ও ব্যবসায়ীদের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। ভারতব্যাপী পত্র-পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণাদি আস্তে আস্তে যা প্রকাশিত হচ্ছে, লোকের ঔৎসুক্য তাতে আরও বেড়েই যাচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রাগার ভারতে হবে, তার জন্যে আনন্দ এবং গর্বও যে অনেকে ইতিমধ্যেই বোধ করছেন না এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু একটু বেশী তলিয়ে দেখতে গেলেই একটা মস্ত আশঙ্কাও মনে জেগে ওঠে। সত্যিই কি ফেমাস সিনে লেবরেটরী ভারতীয় চিত্রশিল্পের উন্নতির সহায়ক হবে? এখন যা দেখছি, তাতে ঠিক উল্টোই মনে হচ্ছে। কারণ ফেমাস সিনে লেবরেটরীর দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আমেরিকার গুটিকয়েক এমন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের নাম দেখছি, যারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কতিপয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পর্যায়ে পড়ে। আগে থেকেই আমরা খবর পাচ্ছি কিভাবে আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগীদারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিজেরাই টাকা খাটিয়ে ভারতের সর্বত্র চিত্রগৃহ খুলে গ্রামে গ্রামে ১৬ মি।মি ছবি দেখিয়ে বিদেশী ছবি ভারতীয় ভাষায় dub করে ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে আজকাল জাতীয়তাবোধ যে রকম তীব্র তাতে এখানে নিজেরা ষ্টুডিও খুলে নিজেদের ছবি তোলাই হোক আর dub করাই হোক, তার মধ্যে বিদেশীদের যথেষ্ট বাধা থাকবেই। সুতরাং যখন ভারতবর্ষে ভারতীয়েরই তৈরী তাদের মনোমত নির্মাণাগার তারা পাচ্ছে, তখন তাদের পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ করাই হবে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ এবং তার জন্যে সেই ভারতীয় চিত্রনির্মাণাগারকে অর্থ দিয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে এবং আধুনিকতম সমস্ত যন্ত্রপাতি যোগাড় করে দিয়ে তাকে নিজেদের কাজের সুবিধাজনক করে নেওয়াতে বিদেশীরা তৎপর হবেই। ফেমাস সিনে লেবরেটরীর ব্যাপার যা দেখছি তাতে সন্দেহ হবেই যে, এই বিরাট লেবরেটরীটি কার্যতঃ বিদেশী ব্যবসাকে কায়েম করে দেওয়ার কাজেই প্রধানতঃ সহায়ক হবে। আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, ফেমাস সিনে লেবরেটরীর যে এক কোটি টাকা মূলধন তার সবটাই ভারতবাসীর কিন্তু একটা প্রশ্ন করি, ফেমাসের কর্তৃপক্ষ এই বিরাট পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করার যে ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছেন সেটা কি শুধু দেশী চিত্রপ্রতিষ্ঠান-গুলির কাছ থেকে কাজ পাবার আসায়, না বিদেশীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ পাবার প্রতিশ্রুতিতে? শেষেরটাই বেশি সত্যি বলে আমাদের প্রতীয়মান হয়। তাই আশংকা হয়, পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ লেবরেটরীটির জন্যে গর্ব করার চেয়ে অনুতাপ করতে হবে যখন দেখব ফেমাস সিনে লেবরেটরীর ছাপ মারা ১৬মি।মি বিদেশী ছবি দেশী ভাষায়

নিউ এম্পায়ারে অভিনীত 'আলা দীন' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

রূপান্তরিত হয়ে ভারতের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ছেয়ে যাবে। আমাদের ধারণা অমূলক প্রমাণিত হোক এই কামনা করি।

* * * * *

আমাদের দেশে শিল্পীর কিরকম কদর, সেদিনের একটা ব্যাপার দেখে তা অনুমান করতে পারলুম এতদিনে। তিমিরবরণের নাম সঙ্গীতক্ষেত্রে বিশ্ববিশ্রুত—সম্প্রতি তিনি নৃত্যের অনুষ্ঠান করছেন তাও রসামোদীরা নিশ্চয়ই খবর রাখেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের জন্যে তিমিরবরণকে কি পরিমাণ এবং ধরণের কাজ করতে হচ্ছে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। তিমিরবরণ এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক এবং সুরসংযোজক এবং এই কাজেই তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত থাকবে আমাদের তাই ধারণা। কার্যত দেখলাম ঐ দুটি কাজ ছাড়াও তাকে আরও অনেক কিছু করতে হচ্ছে, যথা কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করা, নিজে সর্বত্র গিয়ে রাস্তায় পোষ্টারাদি লাগাবার ব্যবস্থার জন্যে এর তার কাছে ঘোরা, মহলার জন্যে শিল্পীদের ডেকে আনা ইত্যাদি। সেদিন ঐসব কাজে রত তিমিরবরণের চেহারা আমাদের যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছে। এতবড় একজন শিল্পী অথচ তার কাজে সহায়তা করার জন্য লোকাভাব! এর পিছনে আর কোন কারণ আছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু একটা কথা আমরা বুঝতে পারি যে, বড় বড় শিল্পীরই যখন এই অবস্থা, তখন শিল্পোন্নতি তো দূরের কথা বরং শিল্প অধোগতির পথই অবলম্বন করবে।

নূতন ছবির পরিচয়

বিরাজ বৌ (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী—শরৎচন্দ্র; চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা—অমর মল্লিক; আলোকচিত্র—শৈলেন বসু; শব্দ—অতুল চট্টোপাধ্যায়; সুরযোজনা—রাইচাঁদ বড়াল, প্রযোজনা—যতীন্দ্রনাথ মিত্র; ভূমিকায়—ছবি বিশ্বাস, সিধু গাঙ্গুলী, দেবী মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন, তুলসী, বুদ্ধদেব, রঞ্জিত রায়, সুনন্দা, বন্দনা, মায়া দেবী, মায়া বসু, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা প্রভৃতি। ছবিখানি ৫ই জুলাই চিত্রা ও রূপালীতে মুক্তিলাভ করেছে।

নিউ থিয়েটার্স যেন বাঙলা ছবি তোলা বন্ধই করে দিয়েছে—এখন নিউ থিয়েটার্সের কাছ থেকে পাওয়া বাঙলা ছবি একটা বার্ষিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে, তাই লোকের আগ্রহ থাকে বেশী, তাছাড়া বর্তমান ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের

কাহিনী; সুতরাং আগ্রহের মাত্রা একটু বেশীই হবে। গোড়াতেই বলা যায় যে, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে ছবি তুলতে পেরেছে যে কজন, অমর মল্লিক সেই অল্প কজন পরিচালকদের অন্যতম; ইতিপূর্বে 'বড়দিদি' ছবিতেই আমরা সে প্রমাণ পেয়েছি। কাহিনীটিকে যথাযথ এবং অক্ষত রাখা নিষ্ঠাটাই পরিচালক অমর মল্লিকের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এটা গুণ কি না বলা যায় না, কারণ পরিচালকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার দৌড় যাচাই করা যায় না। অনাড়ম্বর, সরলভাবে এবং রচনা অটুট রেখে চিত্ররূপ দেওয়া তাই একদিকে

'বিরাজ-বৌ' চিত্রে সুনন্দা ও ছবি বিশ্বাস

যেমন রচয়িতার গৌরব বাড়াতে সক্ষম হয় না, অপরদিকে পরিচালকের কৃতিত্বকেও ফুটিয়ে তুলতে পারে না। বই আর পর্দা দুটো স্বতন্ত্র জিনিস, এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সুতরাং পর্দায় যদি পর্দার বৈশিষ্ট্য না রেখে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য খাড়া করা যায় তাহলে প্রচুর অর্থ, সময় এবং শ্রম ব্যয়ে ছবি তোলার সার্থকতা কি? কাহিনীকে হুবহু অনুসরণ করার অতি নিষ্ঠাই 'বিরাজ বৌ'কে অনন্যসাধারণ ছবি হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে, যদিও তার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। ছবিখানি তবুও যে অতি উপভোগ্য লাগে, সেটা শুধু কাহিনীটিরই জন্যে। 'বিরাজ বৌ' কাহিনী যারা পড়েননি বা যাদের মনে নেই, তারা একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পড়ার আনন্দ উপভোগ করবেন এবং যাদের কাহিনীটি জানা আছে তাদের ভাল লাগবে, কাহিনীটি আবার পড়তে পারলেন বলে। কাহিনীকে যথাযথ রাখার জন্যে যা কিছু বাহাদুরীর দরকার তা অমর মল্লিক দেখিয়েছেন এবং তার জন্যে প্রশংসাও পাবেন।

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমে নাম ভূমিকায় সুনন্দাকেই প্রশংসা করতে হয়; বিরাজ-বৌ চরিত্রটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যে কল্পনার পরিচয় আমরা কাহিনীটিতে পাই তার সঙ্গে সুনন্দা অনেকটা মিল এনে ফেলাতে সক্ষম হ'য়েছেন। এর পরই পীতাম্বরের ভূমিকায় সিধু গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখ করতে হয়। ছবি বিশ্বাসের নীলাম্বর চলে গিয়েছে চরিত্রটির জোরে, অভিনয় কৃতিত্ব কিছুই পাওয়া যায় না। দেবী মুখার্জির জমিদার ছোট ভূমিকা হ'লেও ছাপ দেয়। বাকি ছোট ছোট ভূমিকাগুলির অভিনয় চলনসই পর্যায়ের ওপরে যেতে পারেনি।

ছবির মধ্যে চারখানি গান সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে, সে যেন দিতে হয় তাই দেওয়া, নয়তো গানের অবকাশও নেই আর দরকারও ছিল না। কলাকৌশলের দিক নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর যোগ্যতারই পরিচায়ক।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

১৯শে জুলাই তারিখে মুক্তিলাভ ক'রবে ব'লে ঘোষিত হ'য়েছে লক্ষ্মীদাস আনন্দ প্রযোজিত, কানন দেবী ও পরেশ ব্যানার্জি অভিনীত, দেবকী বসু পরিচালিত এবং কমল দাশগুপ্ত পরিকল্পিত সুরসমন্বিত গীতাঞ্জলি পিকচার্সের 'কৃষ্ণলীলা'। ছবিখানি দেখানো হবে কাপুরচাঁদের পরিবেশনায় প্যারাডাইস, বীণা, পার্ক শো ও ছায়াতে। ভূমিকালিপিতে দেবী মুখার্জি, কমল মিত্র, সুপ্রভা মুখার্জি প্রভৃতিরও নাম পাওয়া যায়।

* * * * *

ইস্টার্ন টকীজের বাঙলা ছবি 'নতুন বৌ'-ও উত্তরা-পূরবী-পূর্ণতে ঐ তারিখেই মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রেছেন প্রযোজক সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার নিজেই; ভূমিকায় আছেন অহীন্দ্র, জহর, দেবী মুখার্জি, প্রভা, রাণীবালা, সন্ধ্যা প্রভৃতি।

বিবিধ

আগামী রবিবার, ১৪ই জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে [illegible] সুরশিল্পী [illegible] নৃত্যনাট্য 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' অভিনীত হবে। এই অভিনয়ের সমস্ত লভ্যাংশই নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ [illegible] ভাণ্ডারে [illegible]। গত বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার এই [illegible] সাফল্যের [illegible] অভিনীত হয়েছে।

* * *

বিনতা বসু-জ্যোতির্ময় [illegible] সুসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে আ[illegible] বিবাহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে—অক্টোবরের নবাগতা তারকা শীলা দত্ত বিবাহ ক'রেছেন এক অস্ট্রেলিয়ান অফিসারকে; নর্তকী অরুণা দাস বিবাহ ক'রেছেন পাঞ্জাবে এক পাঞ্জাবী অফিসারকে; আর মণিকা গাঙ্গুলীর সঙ্গে শুনলাম বিবাহ সুসম্পন্ন হ'য়েছে এক রেল কোম্পানীর প্রচার-সচিবের।

* * *

বম্বে থেকে কলকাতায় আগতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডেভিড—এসেছিলেন ইহুদী সম্মেলনে যোগদান ক'রতে; পরিচালক ধীরুভাই দেশাই বেড়াতে; রতনমালা, কোন ছবিতে কাজ পেলে ক'রতে; আর, কৃষ্ণকুমারী ছবিতে অভিনয় ক'রতে। ডেভিডের অভিমান, জীবনে সে কখনও কোন স্তাবকের কাছ থেকে চিঠি পায়নি।

* * *

কাগজের বিজ্ঞাপন—'অসমাপ্ত ছবি সমাপ্ত করার জন্য দশ হাজার টাকা ধার চাই; ছবির সাফল্য নিশ্চিত; প্রচুর লাভের সম্ভাবনা

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হয় নাই। প্রথম ডিভিসনেরও অনেক খেলা বাকী আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইতিমধ্যেই প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ধারিত হইয়াছে। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ।

ইস্টবেঙ্গল দল এইবার লইয়া তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইল। ১৯৪২ সালে সর্বপ্রথম ইস্টবেঙ্গল এই গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯৪৫ সালে পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হয়। এই বৎসর গত বৎসরের অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইল। এই প্রসঙ্গে বলা চলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া মোহনবাগানের সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। কারণ মোহনবাগান ক্লাবও ১৯৩৯, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে এই তিন বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে। তবে এই বিষয় ভারতীয় দলের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। এই ক্লাব ১৯৩৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর পাঁচ বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কোন ভারতীয় দলের পক্ষে তাহা ভঙ্গ করা সম্ভব হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে হইবে কি না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৪০ সাল ও ১৯৪১ সালে পুনরায় দুইবার চ্যাম্পিয়ান হইয়া মোট সাতবার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে। এই স্থানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই একমাত্র ভারতীয় ক্লাব যে সর্বপ্রথম অ-ভারতীয় দলের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া ভারতীয় দলের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নে ১৯৩৪ সাল হইতে লীগ চ্যাম্পিয়ান দলের নাম প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করে তাহা ছিনাইয়া লইবার অধিকার এই পর্যন্ত কোন অভারতীয় দলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।ঃ—

১৯৩৪-৩৮ সাল—মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব; ১৯৩৯ সাল—মোহনবাগান ক্লাব; ১৯৪০-৪১ সাল—মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব; ১৯৪২ সাল—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব; ১৯৪৩-৪৪ সাল—মোহনবাগান ক্লাব; ১৯৪৫-৪৬ সাল—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

এইবারের ফলাফলের বলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান উভয় দলই সমান সংখ্যকবার চ্যাম্পিয়ান হইল। রাণার্স আপ বিষয়েও ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিম্নে উক্ত দুই দল কতবার রাণার্স আপ হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

মোহনবাগান ক্লাবঃ—১৯১৬ সাল, ১৯২০ সাল, ১৯২১ সাল, ১৯২৫ সাল, ১৯৪০ সাল, ১৯৪৫ সাল ও ১৯৪৬ সাল।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবঃ—১৯৩২ সাল, ১৯৩৩ সাল, ১৯৩৫ সাল, ১৯৩৭ সাল, ১৯৪১ সাল ও ১৯৪৩ সাল।

অখেলোয়াড়ী মনোভাব ব্যাধি

কলিকাতা ফুটবল মাঠে অখেলোয়াড়ী মনোভাব ব্যাধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার শেষ পরিণাম কি ভয়াবহ, কিরূপ মারাত্মক হইবে কল্পনাই করিতে পারা যায় না। ৩১শে মে ভবানীপুর ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের প্রথম বারের খেলার শেষে দেখা গেল ভবানীপুর ক্লাবের খেলোয়াড়গণ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকগণ কর্তৃক প্রহৃত ও ক্লাব তাঁবু ক্ষতিগ্রস্ত। ১লা জুলাই এই দুইটি দলের লীগের দ্বিতীয়বারের খেলার শেষে দেখা গেল পুনরায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকগণ কর্তৃক খেলার পরিচালক প্রহৃত—ফলে আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত। এই স্থানেই ইহার পরিসমাপ্তি হয় না। উক্ত উগ্র সমর্থকগণ ভবানীপুর ক্লাব তাঁবু আক্রমণ করিয়া আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া কর্মরত সাংবাদিকগণকে পর্যন্ত প্রহার করেন। ইহার পর ৬ই জুলাই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লীগের দ্বিতীয়বারের খেলার শেষে দেখা যায় উভয় দলের সমর্থকগণ করিতেছেন মাঠের মাঝামাঝি হাতাহাতি। ইহার শেষ হয় ক্লাব তাঁবুতে গিয়া, সোডা বোতল, ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়া। এই খণ্ডযুদ্ধের শেষে দেখা যায় মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মোহনবাগান ক্লাবের বহু খেলোয়াড় ও সমর্থক আহত হইয়াছেন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে পর পর তিনটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, তাহার সহিত জড়িত হইলেন বাঙলার খ্যাতনামা ক্লাবের সভ্য ও সমর্থকগণ, কত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ ঘটনা ইতিপূর্বে বাঙলার ফুটবল মাঠে কখনও হয় নাই, হঠাৎ কেন হইতেছে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির জন্য বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণের সুনাম ছিল কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাসমূহের পর তাহা কি আর থাকিল? বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ কি ইহা উপলব্ধি করিবেন না? ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য বিশিষ্ট ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ, এমন কি আই এফ-এর কর্তৃপক্ষগণ কি ব্যবস্থা করিতেছেন জানি না, কিন্তু ইহার পুনরাবৃত্তি হইতে না দেখিলেই সুখী হইব।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ইহাতে সকলেই বিশেষ করিয়া ভারতীয় ক্রীড়ামোদিগণ প্রবলভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল ইংলণ্ড দলকে "শিক্ষা দিবে" এই ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বজ্রাঘাত হয় যখন ভারতীয়, দল প্রথম টেস্ট [illegible] খেলায় [illegible] ১০ উইকেটে পরাজয় বরণ করেন। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করেন, [illegible] ভারতীয় দল দেশে ফিরিয়া আসুক, [illegible] হইয়াছে।" [illegible] ফলাফল [illegible] অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। দলের সৌভাগ্য [illegible] দুর্ভাগ্য কখন আসে বা যায়, কেহই [illegible] বলিতে পারে না। টেস্ট খেলা [illegible] দল [illegible] অসীম [illegible] হীন এই দলের সহিত সুবিধাজনক না হওয়ায় আরও দমিয়া যান। [illegible] দল ইংলণ্ডের কাউন্টী চ্যাম্পিয়ান স্থান অধিকারী শক্তিশালী [illegible] শোচনীয়ভাবে পরাজিত [illegible] আশা দেখা দেয়। সেই আশা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না ঠিক পরবর্তী ম্যাচে ভারতীয় দল ইয়র্কসায়ার দলের নিকট শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজয় বরণ করে। নিরাশা পুনরায় প্রবলভাবে দেখা দেয়। ল্যাংকাসায়ার দলের সহিত দ্বিতীয়বারের খেলায় ভারতীয় দল পুনরায় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। ভারতীয় দলের প্রথম খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্ট দ্বিশতাধিক রাণ করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। বিজয় মার্চেন্টের এই অপূর্ব নৈপুণ্য ইংল্যান্ডের দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছে। ভারতীয় দলের সমর্থকগণও পুনরায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল ভাল ফল প্রদর্শন করিবে বলিয়া আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হইবে কি না জানি না—না হইলেও আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব না, ভারতীয় ক্রিকেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্বাপেক্ষা যে উন্নততর হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই পর্যন্ত বহু খেলাতেই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ প্রমাণিত করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলকে পরাজিত করিলেও ঐ সকল কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহা কি সুখের বিষয় নহে?

ভারতীয় বনাম ল্যাংকাশায়ার

ভারতীয় বনাম ল্যাংকাশায়ারের দ্বিতীয়বারের খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

ল্যাংকাশায়ার প্রথম ইনিংসঃ—৪০৬ রান (ওয়াসব্রুক ১০৮ রান, ইকিন ১৩৯ রান, হোয়ার্ট ৭৩ রান, সোহনী ৮২ রানে ৫টি ও মানকড় ১৩৪ রানে ৪টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসঃ—৮ উইঃ ৪৫৬ রান (মার্চেন্ট ২৪২ রান নট আউট, মুস্তাক ৪০, হাফিজ ৪৩, নিম্বলকর ৩৫, সোহনী ৪৪, মানকড় ৪০, ইকিন ১২০ রানে ৩টি, গার্লিক ৬৫ রানে ২টি ও প্রাইস ৬৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

ল্যাংকাশায়ার দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৭২ রান (প্লেস ৩৭, ওয়াসব্রুক ২৭ রান নট আউট, মানকড় ৬২ রানে ৫টি ও হাজারী ৩৩ রানে ৩টি উইকেট পান।)

দেশের সংবাদ

২রা জুলাই—আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে [illegible] জন নিহত এবং ২৫০ জন [illegible] পুলিশ নয় রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে এবং [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়।

[illegible] পরশ্ব ও গতকল্য [illegible] শহরে [illegible] ১০ জন [illegible] ব্যক্তি মারা [illegible]

[illegible] রাজ্যে পার্লিমেন্টের [illegible] ফলে ১ জন নিহত [illegible] সভাপতি [illegible] হইয়াছে।

ঠিক উল্টোই [illegible] বাঙলা সরকার [illegible] কলিকাতা লেবুরেটরী [illegible] অভয় আশ্রম এবং [illegible] বে-আইনী ঘোষণা [illegible] করিয়াছিলেন, তাহা [illegible] করিয়া কলিকাতা গেজেটে এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] আজ সকালে ঢাকায় মৌলবীবাজারে এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। গতকল্য নবাবগঞ্জ অঞ্চলে ৬০ বৎসর বয়স্ক যে বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল, সে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ইহা [illegible] গত ৩০শে জুন হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে আজ পর্যন্ত [illegible] ৪ জন নিহত হইল।

৫ই জুলাই—অদ্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়। বৈঠকে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রিপ্রতিনিধিদের [illegible] রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, প্রথম প্রস্তাবে উহা অনুমোদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিরোধী আইন এবং সত্যাগ্রহীদের উপর [illegible] গুণ্ডামীর নিন্দা করা হইয়াছে।

আমেদাবাদের অবস্থা পুনরায় খারাপের দিকে যায়। অদ্য দশজন ছুরিকাহত হয়, তন্মধ্যে দুইজন মারা যায়।

৫ই জুলাই—চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনে এক [illegible] ১ ব্যক্তি নিহত ও প্রায় ১২ জন আহত হইয়াছে।

ঢাকা শহরে হাঙ্গামার ফলে এ পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হইয়াছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা আগস্ট হইতে বস্ত্রের ও [illegible] সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে।

গত ৩১শে মে হইতে বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লস্টার মিলের দশ হাজার শ্রমিক যে ধর্মঘট চালাইতেছিল, সাফল্যমণ্ডিতভাবে তাহার অবসান হইয়াছে।

৬ই জুলাই—অদ্য অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার্থ একটি গণপরিষদ আহ্বানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া এবং অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ তাহা [illegible] অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব

উত্থাপন করেন। বহু বৎসরের পর এই প্রথম নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনে দর্শকগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। মাত্র ৩৮০ জন সদস্যের মধ্যে আড়াই শতাধিক সদস্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লককর্মী ও নেতাদের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর শ্রীযুত যতীশচন্দ্র গুহ কয়েকদিন যাবৎ কঠিন পীড়ায় ভুগিবার পর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

ঢাকার দাঙ্গায় এ পর্যন্ত ১০ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭ জন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান।

৭ই জুলাই—দুইদিন ব্যাপী অধিবেশনের পর অদ্য রাত্রি সাড়ে আটটায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে গৃহীত গণপরিষদে প্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গতকল্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন অদ্য তাহা ২০৪—৫১ ভোটে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল ছাড়া আরও ১৯ জন বক্তা প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে ৯ জন উহা সমর্থন করেন এবং দশজন বিরোধিতা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-বিরোধী আইনের নিন্দা করিয়া এবং তথাকার ভারতীয় সত্যাগ্রহীদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাস দিয়া অপর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮ই জুলাই—বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি সিংহলবাসী ভারতীয়দের অধিকার ও নিরাপত্তার পক্ষে যে বিঘ্নকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের লীগ দলের সদস্য খান বাহাদুর হাজী ফজল মহম্মদ খান এবং সর্দার বাহাদুর সর্দার খান খুসো উক্ত পরিষদের লীগ দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল চারিটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

৯ই জুলাই—রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিম্নোক্ত ১৪ জনকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত করিয়াছেন:—(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৩) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (৪) খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, (৫) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, (৬) মিঃ রাজাগোপালাচারী, (৭) মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই, (৮) মিস মৃদুলা সরাভাই, (৯) ডাঃ বি কে কেমকার, (১০) শ্রীযুক্তা কমলা-দেবী চট্টোপাধ্যায়, (১১) রাও সাহেব পট্টবর্ধন, (১২) সর্দার প্রতাপ সিং, (১৩) মিঃ ফকরুদ্দিন আমেদ এবং (১৪) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। মিস মৃদুলা সরাভাই ও ডাঃ কেমকার উভয়ে জেনারেল সেক্রেটারীরূপে কাজ করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

২রা জুলাই—ডারবানের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত ২১শে জুন দক্ষিণ আফ্রিকা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শিবির হইতে অনুমান এক মাইল দূরে ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় কনস্টেবল কৃষ্ণস্বামী পিল্লাই প্রহৃত হন। আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীযুত পিল্লাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

৪ঠা জুলাই—রেঙ্গুণে স্পেশ্যাল জজ ইউটিন টুনের আদালতে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের প্রাক্তন অফিসার শ্রীযুত মণিলাল দোশীর মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রহ্ম [illegible] অধিকারে থাকার সময় ডাকাতি, বলপূর্বক অর্থ আদায় ও বে-আইনীভাবে আটক রাখার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সরকারীভাবে ফিলিপাইনের সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়।

প্যারিসে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে ত্রিয়েস্তে ও ইতালীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

৫ই জুলাই—প্যারিসে পররাষ্ট্র সচিব পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, আগামী ২৯শে জুলাই ইউরোপীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য ২১টি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইবে। পররাষ্ট্র সচিবগণ ইতালীর দেয় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ইতালীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ কোটি ডলার পাইবে।

রাণী বিভাবতী দেবী কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করিয়াছিলেন, ১লা জুলাই সেই আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে এবং রায়দান স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কেবলমাত্র বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট রুশিয়া ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তির হস্তে আসন্ন শান্তি-সম্মেলনের ২১টি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে বলিয়া সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভ প্যারিস সচিব সম্মেলনে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। চীনকে আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে লওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

৬ই জুলাই—দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৫০ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী (কয়েকজন নারী সহ) ৬ সপ্তাহ হইতে ৪ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

৭ই জুলাই—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১ লক্ষ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে পাঠাইবার আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আছে বলিয়া রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান গত ২রা জুলাই যে বিবৃতি দেন, প্যালেস্টাইনের আরব উর্ধ্বতন কমিটি তাহার একটি উত্তর দিয়াছেন। আরব কমিটি তাঁহাদের উত্তরে বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যত বিবৃতিই প্রচার করুন না কেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার ইহুদী বন্ধু সমর্থকরা যত চীৎকারই করুন না কেন, প্যালেস্টাইনের ও অন্যান্য স্থানের আরবরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্যালেস্টাইনে ইহুদীদিগের প্রবেশে বাধা দিবে।